মাসিক বসুমতী

তৃতীয় বর্ষ—প্রথম খণ্ড

(১৩৩১ সালের বৈশাখ-সংখ্যা হইতে আশ্বিন-সংখ্যা)

সম্পাদক

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী-বৈদ্যুতিক-রোটারী-মেসিনে"

শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মুদ্রিত ও প্রকাশিত

[বৈশাখ হইতে আশ্বিন, ১৩৩১]

চিত্রসূচী—বৈশাখ

জ্যৈষ্ঠ

আষাঢ়

ব্লেখা চিত্র—চশমা চটক্
[শিল্পী—শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র সিংহ

শ্রাবণ

ভাদ্র

আশ্বিন



অধরলাল সেন

যদি ভাল হয়, তা হ'লে আমি ড্যাম, আমার বাপ ড্যাম, আমার চৌদ্দপুরুষ ড্যাম। (সকলের হাস্য) আর ড্যাম মানে যদি খারাপ হয়, তা হ'লে তুমি ড্যাম, তোমার বাবা ড্যাম, তোমার চৌদ্দপুরুষ ড্যাম। (সকলের হাস্য) আর শুধু ড্যাম নয়। ড্যাম, ড্যাম, ড্যাম, ড্যা ড্যাম ড্যাম। (সকলের উচ্চ হাস্য)।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও প্রচার কার্য্য

সকলের হাস্য থামিলে পর, বঙ্কিম আবার কথা আরম্ভ করিলেন।

বঙ্কিম। মহাশয়, আপনি প্রচার করেন না কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে)। প্রচার! ওগুলো অভিমানের কথা। মানুষ ত ক্ষুদ্র জীব। প্রচার তিনিই করবেন। যিনি চন্দ্র-সূর্য্য সৃষ্টি ক'রে এই জগৎ প্রকাশ করেছেন। প্রচার করা কি সামান্য কথা? তিনি সাক্ষাৎকার হয়ে আদেশ না দিলে প্রচার হয় না। তবে হবে না কেন? আদেশ হয় নি, তুমি বকে যাচ্ছ; ঐ দুদিন লোকে শুনবে, তার পর ভুলে যাবে। যেমন একটা হুজুক আর কি! যতক্ষণ তুমি বল্‌বে, ততক্ষণ লোকে বলবে, আহা, ইনি বেশ বল্‌ছেন। তুমি থাম্‌বে, তার পর কোথায় কিছুই নাই!

"যতক্ষণ দুধের নীচে আগুনের জ্বাল রয়েছে, ততক্ষণ দুধটা ফোঁশ ক'রে ফুলে উঠে। জ্বালও টেনে নিলে, আর দুধও যেমন তেমনি; কমে গেল।

"আর সাধন ক'রে নিজের শক্তি বাড়াতে হয়। তা না হ'লে প্রচার হয় না। 'আপনি শুতে স্থান পায় না, শঙ্করাকে ডাকে।' আপনারই শোবার যায়গা নাই, আবার ডাকে, ওরে শঙ্করা, আয়, আমার কাছে শুবি আয়।

"ও দেশে হালদার পুকুরের পাড়ে রোজ বাহ্যে ক'রে যেতো, লোকে সকালে এসে দেখে গালাগালি দিত। লোক গালাগালি দেয়, তবু বাহ্যে আর বন্ধ হয় না। শেষে পাড়ার লোক দরখাস্ত ক'রে কোম্পানীকে জানালে। তাহারা একটা নোটিশ মেরে দিলে,—'এখানে বাহ্যে প্রস্রাব করিও না, তা করিলে শাস্তি পাইবে।' তখন একবারে সব



বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বন্ধ। আর কোনও গোলযোগ নাই। কোম্পানীর হুকুম—সকলের মানতে হবে।

"তেমনি ঈশ্বর সাক্ষাৎকার হয়ে যদি আদেশ দেন, তবেই প্রচার হয়, লোকশিক্ষা হয়; তা না হ'লে কে তোমার কথা শুনবে?"

এই কথাগুলি সকলে গম্ভীরভাবে স্থির হইয়া শুনিতে লাগিলেন।

[শ্রীযুত বঙ্কিম ও পরকাল]

[Life after death : argument from analogy]

শ্রীরামকৃষ্ণ (বঙ্কিমের প্রতি)। আচ্ছা, আপনি তো খুব পণ্ডিত, আর কত বই লিখেছ; আপনি কি বলো, মানুষের কর্ত্তব্য কি? কি সঙ্গে যাবে? পরকাল তো আছে?

বঙ্কিম। পরকাল! সে আবার কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, জ্ঞানের পর আর অন্য লোকে যেতে হয় না, পুনর্জ্জন্ম হয় না। কিন্তু যতক্ষণ না জ্ঞান হয়, ঈশ্বরলাভ হয়, ততক্ষণ সংসারে ফিরে ফিরে আসতে হয়, কোন মতে নিস্তার নাই। ততক্ষণ পরকাল আছে। জ্ঞানলাভ হ'লে, ঈশ্বরদর্শন হ'লে, মুক্তি হয়ে যায়—আর আসতে হয় না। সিধোনো-ধান পুঁতলে আর গাছ হয় না। জ্ঞানাগ্নিতে সিদ্ধ যদি কেহ হয়, তাকে নিয়ে আর সৃষ্টির খেলা হয় না। সে সংসার করতে পারে না, তার তো কামিনীকাঞ্চনে আসক্তি নাই। সিধোনো-ধান আর ক্ষেতে পুঁতলে কি হবে?

বঙ্কিম (হাসিতে হাসিতে)। মহাশয়, তা আগাছাতেও কোন গাছের কায হয় না, ফল হয় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। জ্ঞানী তা ব'লে আগাছা নয়। যে ঈশ্বর দর্শন করেছে, সে অমৃত ফল লাভ করেছে—লাউ, কুমড়ো ফল নয়। তাহার পুনর্জ্জন্ম হয় না। পৃথিবী বল, সূর্য্যলোক বল, চন্দ্রলোক—কোনও যায়গায় তার আসতে হয় না।

"উপমা—একদেশী। তুমি ত পণ্ডিত, ন্যায় পড় নাই? বাঘের মত ভয়ানক বললে যে বাঘের মত একটা ভয়ানক ল্যাজ কি হাঁড়ী-মুখ থাকবে, তা নয়। (সকলের হাস্য)

"আমি কেশব সেনকে ঐ কথা বলেছিলাম। কেশব জিজ্ঞাসা করলে—মহাশয়, পরকাল কি আছে? আমি না এদিক না ওদিক বললাম। বললাম, কুমোররা হাঁড়ী শুকোতে দেয়, তার ভিতর পাকা হাঁড়ীও আছে, আবার কাঁচা হাঁড়ীও আছে। কখনও কখনও গরুটরু এলে হাঁড়ী মাড়িয়ে যায়। পাকা হাঁড়ী ভেঙ্গে গেলে কুমোর সেগুলোকে ফেলে দেয়। কিন্তু কাঁচা হাঁড়ী ভেঙ্গে গেলে সেগুলি কুমোর আবার ঘরে আনে; এনে জল দিয়ে মেখে আবার চাকে দিয়ে নূতন হাঁড়ী করে, ছাড়ে না। তাই কেশবকে বললুম, যতক্ষণ কাঁচা থাকবে, কুমোর ছাড়বে না। যতক্ষণ না জ্ঞানলাভ হয়, যতক্ষণ না ঈশ্বরদর্শন হয়, ততক্ষণ কুমোর আবার চাকে দেবে, ছাড়বে না; অর্থাৎ ফিরে ফিরে এ সংসারে আসতে হবে, নিস্তার নাই। তাঁকে লাভ করলে তবে মুক্তি হয়, তবে কুমোর ছাড়ে, কেন না, তার দ্বারা মায়ার সৃষ্টির কোন কায আসে না। জ্ঞানী মায়াকে পার হয়ে গেছে। সে আর মায়ার সংসারে কি করবে?

"তবে কারুকে কারুকে তিনি রেখে দেন, মায়ার সংসারে লোকশিক্ষার জন্য। লোকশিক্ষা দিবার জন্য জ্ঞানী বিদ্যা মায়া আশ্রয় ক'রে থাকে। সে তাঁর কাযের জন্য তিনিই রেখে দেন; যেমন শুকদেব, শঙ্করাচার্য্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বঙ্কিমের প্রতি)। আচ্ছা, আপনি কি বল, মানুষের কর্ত্তব্য কি?

বঙ্কিম (হাসতে হাসতে)। আজ্ঞে, তা যদি বলেন, তা হ'লে আহার, নিদ্রা ও মৈথুন!

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিরক্ত হইয়া)। এঃ, তুমি ত বড় ছ্যাচড়া! তুমি যা রাতদিন কর, তাই তোমার মুখে বেরুচ্ছে। লোকে যা খায়, তার ঢেকুর উঠে। মূলো খেলে মূলোর ঢেকুর উঠে। ডাব খেলে ডাবের ঢেকুর উঠে। কামিনীকাঞ্চনের ভিতর রাতদিন রয়েছো; আর ঐ কথাই মুখ দে বেরুচ্ছে। কেবল বিষয় চিন্তা করলে পাটোয়ারি স্বভাব হয়, মানুষ কপট হয়। ঈশ্বর-চিন্তা করলে সরল হয়। ঈশ্বরসাক্ষাৎকার হ'লে ও-কথা কেউ বলবে না।

[শ্রীযুক্ত বঙ্কিম, শুধু পাণ্ডিত্য ও কামিনী-কাঞ্চন]

শ্রীরামকৃষ্ণ (বঙ্কিমের প্রতি)। শুধু পাণ্ডিত্য হ'লে কি হবে; যদি ঈশ্বরচিন্তা না থাকে? যদি



অধরলাল সেনের বাড়ী—১৭ নং বেণেটোলা

করছে, পাগলা! এরা বেহেড হয়েছে! আমরা কেমন স্যায়না; কেমন সুখভোগ করছি; টাকা, মান, ইন্দ্রিয়-সুখ! কাকও মনে করে, আমি বড় স্যায়না, কিন্তু সকালবেলা উঠেই পরের গু খেয়ে মরে! কাক দেখো না, কত উড়ুর পুড়ুর করে, ভারি স্যায়না। (সকলে স্তব্ধ)

"যারা কিন্তু ঈশ্বর চিন্তা করে, বিষয়ে আসক্তি, কামিনী-কাঞ্চনে ভালবাসা চ'লে যাবার জন্য রাতদিন প্রার্থনা করে, যাদের বিষয়-রস তেঁতো লাগে, হরিপাদপদ্মের সুধা বই আর কিছু ভাল লাগে না, তাদের স্বভাব যেমন হাঁসের স্বভাব। হাঁসের সুমুখে দুধেজলে দাও, জল ত্যাগ ক'রে দুধ খাবে। আর হাঁসের গতি দেখেছো? এক দিকে সোজা চ'লে যাবে। শুদ্ধভক্তের গতিও কেবল ঈশ্বরের দিকে। সে আর কিছু চায় না; তার আর কিছু ভাল লাগে না। (বঙ্কিমের প্রতি, কোমল-

বিবেক বৈরাগ্য না থাকে? পাণ্ডিত্য কি হবে, যদি কামিনী-কাঞ্চনে মন থাকে?

"চিল শকুনি খুব উঁচুতে উঠে, কিন্তু ভাগাড়ের দিকে কেবল নজর। পণ্ডিত অনেক বই শাস্ত্র পড়েছে, শোলোক ঝাড়তে পারে, কি বই লিখেছে; কিন্তু মেয়ে মানুষে আসক্ত, টাকা মান সারবস্তু মনে করেছে; সে আবার পণ্ডিত কি? ঈশ্বরে মন না থাকলে পণ্ডিত কি?

"কেউ কেউ মনে করে, এরা কেবল ঈশ্বর ঈশ্বর

ভাবে)। আপনি কিছু মনে করো না।

বঙ্কিম। আজ্ঞা, মিষ্টি শুনতে আসিনি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শ্রীরামকৃষ্ণ। কামিনী-কাঞ্চনই সংসার। এরই নাম মায়া। ঈশ্বরকে দেখতে, চিন্তা করতে দেয় না। দু একটি ছেলে হ'লে স্ত্রীর সঙ্গে ভাইভগ্নীর মত থাকতে হয়, আর তার সঙ্গে সর্ব্বদা ঈশ্বরের কথা কইতে হয়। তা হ'লে

দুজনেরই মন তাঁর দিকে যাবে, আর স্ত্রী ধর্ম্মের সহায় হবে। পশুভাব না গেলে ঈশ্বর-আনন্দ আস্বাদন করতে পারে না। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে হয়, যাতে পশুভাব যায়। ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা। তিনি অন্তর্যামী, শুন্‌বেনই শুন্‌বেন। যদি আন্তরিক হয়।

"আর—'কাঞ্চন'। আমি পঞ্চবটীর * তলায় গঙ্গার ধারে ব'সে 'টাকা মাটী', 'টাকা মাটী', 'মাটীই টাকা' 'টাকাই মাটী' ব'লে জলে ফেল্‌ দিস্‌লুম।"

বঙ্কিম। টাকা মাটী! মহাশয়, চারটা পয়সা থাকিলে গরীবকে দেওয়া যায়। টাকা যদি মাটী, তা হ'লে দয়া পরোপকার করা হবে না?

[শ্রীযুক্ত বঙ্কিম, 'জগতের উপকার' ও কর্ম্মযোগ]

শ্রীরামকৃষ্ণ (বঙ্কিমের প্রতি)। দয়া! পরোপকার! তোমার সাধ্য কি যে তুমি পরোপকার করো? মানুষের এতো নপর চপর, কিন্তু যখন ঘুমোয়, তখন যদি কেউ দাঁড়িয়ে মুখে মুতে দেয়, তো টের পায় না, মুখ ভেসে যায়। তখন অহঙ্কার, অভিমান, দর্প কোথায় যায়?

"সন্ন্যাসীর কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করতে হয়। তা আর গ্রহণ করতে পারে না। থুথু ফেলে থুথু আবার খেতে নাই। সন্ন্যাসী যদি কারুকে কিছু দেয়, সে নিজে দেয়, মনে করে না। দয়া ঈশ্বরের, মানুষে আবার কি দয়া করবে? দানটান সবই রামের ইচ্ছা। ঠিক সন্ন্যাসী মনেও ত্যাগ করে, বাহিরেও ত্যাগ করে। সে গুড় খায় না, তার কাছে গুড় থাকাও ভাল নয়। কাছে গুড় থেকে যদি সে বলে, গুড় খেয়ো না, তো লোকে শুনবে না।

"সংসারী লোকের টাকার দরকার আছে; কেন না, মাগ ছেলে আছে! তাদের সঞ্চয় করা দরকার, মাগ-ছেলেদের খাওয়াতে হবে। সঞ্চয় করবে না, কেবল পঞ্ছী আউর্ দরবেশ্, অর্থাৎ পাখী আর সন্ন্যাসী। কিন্তু পাখীর ছানা হ'লে সে মুখে ক'রে খাবার আনে। তারও তখন সঞ্চয় করতে হয়। তাই সংসারী লোকের টাকার দরকার। পরিবার ভরণপোষণ করতে হয়।

"সংসারী লোক শুদ্ধভক্ত হ'লে অনাসক্ত হ'য়ে কর্ম্ম করে। কর্ম্মের ফল—লাভ, লোকসান, সুখ, দুঃখ ঈশ্বরকে সমর্পণ করে। আর তাঁর কাছে রাতদিন ভক্তি-প্রার্থনা করে, আর কিছু চায় না। এরই নাম নিষ্কাম কর্ম্ম—অনাসক্ত হয়ে কর্ম্ম করা। সন্ন্যাসীরও সব কর্ম্ম নিষ্কাম করতে হয়, তবে সন্ন্যাসী বিষয়কর্ম্ম সংসারীদের মত করে না।

"সংসারী ব্যক্তি নিষ্কামভাবে যদি কাউকে দান করে, সে নিজের উপকারের জন্য, 'পরোপকারের' জন্য নয়। সর্ব্বভূতে হরি আছেন, তাঁরই সেবা করা হয়। হরিসেবা হ'লে নিজেরই উপকার হলো, 'পরোপকার' নয়। এই সর্ব্বভূতে হরির সেবা—শুধু মানুষে নয়, জীবজন্তুর মধ্যে হরির সেবা, যদি কেউ করে, আর যদি সে মান চায় না, যশ চায় না, মরবার পর স্বর্গ চায় না, যাদের সেবা করছে, তাদের কাছ থেকে উলটে কোনও উপকার চায় না, এরূপ ভাবে যদি সেবা করে, তা হ'লে তার যথার্থ নিষ্কাম কর্ম্ম, অনাসক্ত কর্ম্ম করা হয়। এইরূপ নিষ্কাম কর্ম্ম করলে তার নিজের কল্যাণ হয়। এরই নাম কর্ম্মযোগ। এই কর্ম্মযোগও ঈশ্বরলাভের একটি পথ। কিন্তু বড় কঠিন, কলিযুগের পক্ষে নয়।

"তাই বল্‌ছি, যে অনাসক্ত হয়ে এরূপ কর্ম্ম করে, 'দয়া' 'দান' করে, সে নিজেরই মঙ্গল করে। পরের উপকার, পরের মঙ্গল সে ঈশ্বর করেন—যিনি চন্দ্র, সূর্য্য, বাপ, মা, ফল, ফুল, শস্য, জীবের জন্য করেছেন। বাপ-মার ভিতর যা স্নেহ দেখ, সে তাঁরই স্নেহ, জীবের রক্ষার জন্যই দিয়েছেন। দয়ালুর ভিতর যা দয়া দেখ, সে তাঁরই দয়া, নিঃসহায় জীবের রক্ষার জন্য দিয়েছেন। তুমি দয়া কর আর না কর, তিনি কোন না কোনও সূত্রে তাঁর কায করেন। তাঁর কায আট্‌কে থাকে না।

"তাই জীবের কর্ত্তব্য কি? আর কি, তাঁর শরণাগত হওয়া; আর তাঁকে যাতে লাভ হয়, দর্শন হয়, সেই জন্য ব্যাকুল হয়ে তাঁর কাছে প্রার্থনা করা।

[ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু]

"শম্ভু বলেছিল, আমার ইচ্ছা যে, খুব কতকগুলা ডিস্‌পেন্‌সারী, হাসপাতাল ক'রে দিই, তা হ'লে গরীবদের অনেক

---

* পঞ্চবটী। রাসমণির কালীবাটীতে পঞ্চবটীতলায়, ঠাকুর রামকৃষ্ণ অনেক সাধন, তপস্যা করিয়াছিলেন। অতি নির্জ্জন স্থান সহজেই ঈশ্বর উদ্দীপন হয়।

উপকার হয়। আমি বললুম, হাঁ, অনাসক্ত হয়ে যদি এ সব করো, তো মন্দ নয়। তবে ঈশ্বরের উপর আন্তরিক ভক্তি না থাকলে অনাসক্ত হওয়া বড় কঠিন। আবার অনেক কায জড়ালে কোন্ দিক থেকে আসক্তি এসে পড়ে, জান্‌তে দেয় না; মনে করছি নিষ্কামভাবে করছি, কিন্তু হয় ত যশের ইচ্ছা হয়ে গেছে, নাম বার কর্‌বার ইচ্ছা হয়ে গেছে। আবার বেশী কর্ম্ম করতে গেলে, কর্ম্মের ভিড়ে ঈশ্বরকে ভুলে যায়। আরো বললুম, শম্ভু! তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, যদি ঈশ্বর তোমার সম্মুখে এসে সাক্ষাৎকার হন, তা' হ'লে তুমি তাঁকে চাইবে? না, কতকগুলা ডিস্‌পেন্‌সারী বা হাসপাতাল চাইবে? তাঁকে পেলে আর কিছু ভাল লাগে না। মিছরির পানা পেলে আর চিটেগুড়ের পানা ভাল লাগে না।

"যারা হাসপাতাল ডিস্‌পেন্‌সারী করবে, আর এতেই আনন্দ করবে, তারাও ভাল লোক; কিন্তু থাক্ আলাদা। যে শুদ্ধ ভক্ত, সে ঈশ্বর বই আর কিছু চায় না; বেশী কর্ম্মের ভিতর যদি সে পড়ে, সে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা করে, হে ঈশ্বর, কৃপা ক'রে আমার কর্ম্ম কমিয়ে দাও; তা না হ'লে, যে মন তোমাতেই নিশিদিন লেগে থাকবে, সেই মন বাজেখরচ হয়ে যাচ্ছে; সেই মনেতে বিষয়চিন্তা করা হচ্ছে। শুদ্ধ ভক্তির থাক্ একটি আলাদা থাক্। ঈশ্বর বস্তু আর সব অবস্তু, এ বোধ না হ'লে শুদ্ধ ভক্তি হয় না। এ সংসার অনিত্য, দুদিনের জন্য, আর এ সংসারের যিনি কর্ত্তা, তিনিই সত্য, নিত্য, এ বোধ না হ'লে শুদ্ধ ভক্তি হয় না।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আগে বিদ্যা (Science) না—আগে ঈশ্বর ?

শ্রীরামকৃষ্ণ (বঙ্কিমের প্রতি)। কেউ কেউ মনে করে, শাস্ত্র না পড়লে, বই না পড়লে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। তারা মনে করে, আগে জগতের বিষয়, জীবের বিষয় জানতে হয়, আগে সায়েন্স (Science) পড়তে হয় (সকলের হাস্য)। তারা বলে, ঈশ্বরের সৃষ্টি এ সব না বুঝলে ঈশ্বরকে জানা যায় না। তুমি কি বল? আগে Science না আগে ঈশ্বর?

বঙ্কিম। হাঁ, আগে পাঁচটা জানতে হয়, জগতের বিষয়ে। একটু এ দিক্‌কার জ্ঞান না হ'লে ঈশ্বর জানবো কেমন ক'রে? আগে পড়াশুনা ক'রে জানতে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ঐ তোমাদের এক! আগে ঈশ্বর, তার পর সৃষ্টি। তাঁকে লাভ করলে, দরকার হয় ত সবই জানতে পারবে।

"যদি যদু মল্লিকের সঙ্গে আলাপ কর্‌তে পারো যো সো ক'রে, তা হ'লে যদি তোমার ইচ্ছা থাকে, যদু মল্লিকের কখানা বাড়ী, কত কোম্পানীর কাগজ, ক'খানা বাগান, এও জানতে পারবে। যদু মল্লিকই ব'লে দেবে। কিন্তু তার সঙ্গে যদি আলাপ না হয়, বাড়ী ঢুকতে গেলে দারোয়ানরা যদি না ঢুকতে দেয়, তা হ'লে ক'খানা বাড়ী, কত কোম্পানীর কাগজ, ক'খানা বাগান, এ সব ঠিক খবর কেমন ক'রে জানবে? তাঁকে জান্‌লে সব জানা যায়,* কিন্তু সামান্য বিষয় জানবার আকাঙ্ক্ষা থাকে না। বেদেও এ কথা আছে। যতক্ষণ না লোকটিকে দেখা যায়, ততক্ষণ তার গুণের কথা কওয়া যায়, সে যেই সামনে আসে, তখন ও সব কথা বন্ধ হয়ে যায়। লোকে তাঁকে নিয়েই মত্ত হয়, তার সঙ্গেই আলাপ ক'রে বিভোর হয়, তখন আর অন্য কথা থাকে না।

[মানুষ জীবনের উদ্দেশ্য (End of life) ঈশ্বরলাভ] †

"আগে ঈশ্বরলাভ, তার পর সৃষ্টি বা অন্য কথা। বাল্মীকিকে রাম-মন্ত্র জপ করতে দেওয়া হলো, কিন্তু তাকে বলা হলো, 'মরা' 'মরা' জপ কর। 'ম' মানে ঈশ্বর আর 'রা' মানে জগৎ। আগে ঈশ্বর, তার পর জগৎ। একে জান্‌লে সব জানা যায়। ১এর পর যদি পঞ্চাশটা শূন্য থাকে, অনেক হয়ে যায়। ১কে পুঁছে ফেল্‌লে কিছুই থাকে না। ১কে নিয়েই অনেক। এক আগে, তার পর অনেক; আগে ঈশ্বর, তার পর জীব, জগৎ।

"তোমার দরকার ঈশ্বরকে লাভ করা। তুমি অত জগৎ, সৃষ্টি, Science, সায়েন্স এ সব করছো কেন? তোমার আম খাবার দরকার। বাগানে কত শ আম গাছ, কত হাজার ডাল, কত লক্ষ কোটি পাতা, এ

---

* "তস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি।"

† আগে ঈশ্বর—"Seek ye first the kingdom of heaven and মহতী বিনষ্টিঃ all other things shall be added unto you.—Jesus.

সব খবরে তোমার কায কি ? তুই আম খেতে এসেছিস্, আম খেয়ে যা। এ সংসারে মানুষ এসেছে ভগবান্ লাভের জন্ত। সেটি ভুলে নানা বিষয়ে মন দেওয়া ভাল নয়। আম খেতে এসেছিস, আম খেয়েই যা।

বঙ্কিম। আম পাই কই ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁকে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা কর। আন্তরিক হ'লে তিনি শুনবেনই শুনবেন। হয় ত এমন কোনও সৎসঙ্গ জুটিয়ে দিলেন, যাতে সুবিধা হয়ে গেল। কেউ হয় ত ব'লে দেয়, এম্‌নি এম্‌নি কর, তা হ'লে ঈশ্বরকে পাবে।

বঙ্কিম। কে ? গুরু! তিনি আপনি ভাল আম খেয়ে, আমায় খারাপ আম দেন! (হাস্য)

শ্রীরামকৃষ্ণ। কেন গো! যার যা পেটে সয়। সকলেই কি পলুয়া-কালিয়া খেলে হজম করতে পারে? বাড়ীতে মাছ এলে মা সব ছেলেকে পলুয়া-কালিয়া দেয় না। যে দুর্ব্বল, যার পেটের অসুখ, তাকে মাছের ঝোল দেন; তা ব'লে কি মা সে ছেলেকে কম ভালবাসেন ?

[ঈশ্বরলাভের উপায়,—ব্যাকুলতা, বালকের বিশ্বাস]

"গুরুবাক্যে বিশ্বাস করতে হয়। গুরুই সচ্চিদানন্দ, সচ্চিদানন্দই গুরু; তাঁর কথা বিশ্বাস করলে,—বালকের মত বিশ্বাস করলে,—ঈশ্বরলাভ হয়। বালকের কি বিশ্বাস! মা বলেছে, 'ও তোর দাদা হয়', অমনি জেনেছে, 'ও আমার দাদা।' একবারে পাঁচ সিকা পাঁচ আনা বিশ্বাস। তা সে ছেলে হয় ত বামুনের ছেলে, আর দাদা হয় ত ছুতোর কামারের ছেলে। মা বলেছে, ও ঘরে জুজু। তো পাকা জেনে আছে, ও ঘরে জুজু। এই বালকের বিশ্বাস, গুরুবাক্যে এমন বিশ্বাস চাই। স্যায়না বুদ্ধি, পাটোয়ারা বুদ্ধি, বিচারবুদ্ধি করলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। বিশ্বাস আর সরল হওয়া; কপট হ'লে হবে না। সরলের কাছে তিনি খুব সহজ। কপট থেকে তিনি অনেক দূর।

"কিন্তু বালক যেমন মাকে না দেখলে দিশেহারা হয়, সন্দেশ মিঠাই হাতে দিয়ে ভোলাতে যাও কিছুই চায় না, কিছুতেই ভোলে না, বলে, না, আমি মা'র কাছে যাব; সেই রকম ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতা চাই। আহা! কি অবস্থা! বালক যেমন মা মা ক'রে পাগল হয়। কিছুতেই ভোলে না। যার সংসারে এ সব 'সুখ' ভোগ আলুনি লাগে, যার আর কিছু ভাল লাগে না—টাকা, মান, দেহের সুখ, ইন্দ্রিয়ের সুখ যার কিছুই ভাল লাগে না, সেই আন্তরিক মা মা ক'রে কাতর হয়। তারই জন্যে মা'র আবার সব কায ফেলে দৌড়ে আসতে হয়।

"এই ব্যাকুলতা। যে পথেই যাও, হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, শাক্ত, ব্রহ্মজ্ঞানী—যে পথেই যাও, ঐ ব্যাকুলতা নিয়েই কথা। তিনি তো অন্তর্য্যামী, ভুল পথে গিয়ে পড়লেও দোষ নাই—যদি ব্যাকুলতা থাকে। তিনিই আবার ভাল পথে তুলে লন।

"আর সব পথেই ভুল আছে,—সব্বাই মনে করে, আমার ঘড়ি ঠিক্ যাচ্ছে, কিন্তু কারোও ঘড়ি ঠিক্ যায় না। তা' ব'লে কারু কায আটকায় না। ব্যাকুলতা থাকলে সাধুসঙ্গ জুটে যায়, সাধুসঙ্গে নিজের ঘড়ি অনেকটা ঠিক ক'রে লওয়া যায়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

[শ্রীরামকৃষ্ণ কীর্ত্তনানন্দে]

ব্রাহ্মসমাজের শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য গান করিতেছেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কীর্ত্তন একটু শুনিতে শুনিতে হঠাৎ দণ্ডায়মান ও ঈশ্বরাবেশে বাহ্যশূন্য হইলেন। একবারে অন্তর্মুখ সমাধিস্থ। দাঁড়াইয়া সমাধিস্থ। সকলেই বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইলেন। বঙ্কিম ব্যস্ত হইয়া ভিড় ঠেলিয়া ঠাকুরের কাছে গিয়া একদৃষ্টে দেখিতেছেন। তিনি সমাধি কখনও দেখেন নাই। কিয়ৎক্ষণ পরে একটু বাহ্য হইবার পর ঠাকুর প্রেমে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন, যেন শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীবাসমন্দিরে ভক্ত সঙ্গে নাচিতেছেন। সে অদ্ভুত নৃত্য! বঙ্কিমাদি ইংরাজী-পড়া লোকেরা দেখিয়া অবাক্! কি আশ্চর্য্য! এরই নাম কি প্রেমানন্দ? ঈশ্বরকে ভালবেসে মানুষ কি এত মাতোয়ারা হয়? এইরূপ কাণ্ডই কি নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গ করেছিলেন? এই রকম করেই কি তিনি নবদ্বীপে আর শ্রীক্ষেত্রে প্রেমের হাট বসিয়েছিলেন? এর ভিতর ঢং হ'তে পারে না। ইনি সর্ব্বত্যাগী, এঁর টাকা, মান,

উদ্দেশ্য? কোনো দিকে মন না দিয়ে ঈশ্বরকে ভালবাসাই কি জীবনের উদ্দেশ্য? এখন উপায় কি? ইনি বল্লেন, মা'র জন্য দিশেহারা হয়ে ব্যাকুল হওয়া। ব্যাকুলতা, ভালবাসাই উপায়, ভালবাসাই উদ্দেশ্য। ঠিক ভালবাসা এলেই দর্শন হয়।

ভক্তরা এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন ও সেই অদ্ভুত দেবদুর্লভ নৃত্য ও কীর্ত্তনানন্দ দেখিতে লাগিলেন। সকলেই দণ্ডায়মান—ঠাকুর রামকৃষ্ণের চারিদিকে। আর একদৃষ্টে তাঁকে দেখিতেছেন।

কীর্ত্তনান্তে ঠাকুর ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতেছেন। 'ভাগবত ভক্ত ভগবান' এই কথা উচ্চারণ করিয়া বলিতেছেন, জ্ঞানী, যোগী, ভক্ত সকলের চরণে প্রণাম।

আবার সকলে তাঁহাকে ঘেরিয়া আসন গ্রহণ করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

[শ্রীযুক্ত বঙ্কিম ও ভক্তিযোগ। ঈশ্বরপ্রেম]

বঙ্কিম (ঠাকুরের প্রতি)। মহাশয়, ভক্তি কেমন ক'রে হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ। ব্যাকুলতা। ছেলে যেমন মা'র জন্য, মাকে না দেখতে পেয়ে দিশেহারা হয়ে কাঁদে, সেই রকম ব্যাকুল হয়ে ঈশ্বরের জন্য কাঁদলে ঈশ্বরকে লাভ করা পর্য্যন্ত যায়।

"অরুণোদয় হ'লে পূর্ব্বদিক লাল হয়, তখন বোঝা যায় যে, সূর্য্যোদয়ের আর দেরী নাই। সেইরূপ যদি কারও ঈশ্বরের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়েছে দেখা যায়, তখন বেশ বুঝতে পারা যায় যে, এ ব্যক্তির ঈশ্বরলাভের আর বেশী দেরী নাই।

"এক জন গুরুকে জিজ্ঞাসা করেছিল, মহাশয়, ব'লে দিন, ঈশ্বরকে কেমন ক'রে পাবো। গুরু বল্লে, এসো, আমি তোমায় দেখিয়ে দিচ্ছি। এই ব'লে তাকে সঙ্গে ক'রে একটি পুকুরের কাছে নিয়ে গেল। দুই জনেই জলে নাম্‌লো, এমন সময় হঠাৎ গুরু শিষ্যকে ধ'রে জলে চুবিয়ে ধরলে। খানিক পরে ছেড়ে দিবার পর, শিষ্য মাথা তুলে দাঁড়ালো। গুরু জিজ্ঞাসা করলে, তোমার কি রকম বোধ হচ্ছিলো? শিষ্য বল্লে, প্রাণ যায় যায় বোধ হচ্ছিল, প্রাণ আটু-পাটু করছিল। তখন গুরু বললে, ঈশ্বরের জন্য যখন প্রাণ ঐরূপ আটু-পাটু করবে, তখন জানবে যে, তাঁর সাক্ষাৎকারের দেরী নাই।

"তোমায় বলি, উপরে ভাসলে কি হবে? একটু ডুব দাও। গভীর জলের নীচে রত্ন রয়েছে, জলের উপর হাত-পা ছুড়লে কি হবে? ঠিক মাণিক ভারি হয়, জলে ভাসে না; তলিয়ে গিয়ে জলের নীচে থাকে। ঠিক মাণিক লাভ করতে হ'লে জলের ভিতর ডুব দিতে হয়।

বঙ্কিম। মহাশয়, কি করি, পেছনে শোলা বাঁধা আছে (সকলের হাস্য)। ডুবতে দেয় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁকে স্মরণ করলে সব পাপ কেটে যায়। তাঁর নামেতে কালপাশ কাটে। ডুব দিতে হবে, তা না হ'লে রত্ন পাওয়া যাবে না। একটা গান শুন,—

(গান)

ডুব্ ডুব্ ডুব্ রূপ-সাগরে আমার মন।
তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবি রে প্রেমরত্নধন॥
খুঁজ খুঁজ খুঁজ খুঁজলে পাবি হৃদয়মাঝে বৃন্দাবন।
দীপ্ দীপ্ দীপ্ জ্ঞানের বাতি জ্বলবে সদা অনুক্ষণ॥
ড্যাং ড্যাং ড্যাঙ্গায় ডিঙ্গে চালায় আবার সে কোন্ জন।
কুবীর বলে শোন্ শোন্ শোন্ ভাব গুরুর শ্রীচরণ॥

ঠাকুর তাঁহার সেই দেবদুর্লভ মধুর কণ্ঠে এই গানটি গাইলেন। সভাশুদ্ধ লোক আকৃষ্ট হইয়া একমনে এই গান শুনিতে লাগিলেন। গান সমাপ্ত হইলে আবার কথা আরম্ভ হইল।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বঙ্কিমের প্রতি)। কেউ কেউ ডুব দিতে চায় না। তারা বলে, ঈশ্বর ঈশ্বর ক'রে বাড়াবাড়ি ক'রে শেষকালে কি পাগল হয়ে যাবো? যারা ঈশ্বরের প্রেমে মত্ত, তাদের তারা বলে, বেহেড হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এই সব লোক এটি বোঝে না যে, সচ্চিদানন্দ অমৃতের সাগর।

"আমি নরেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, মনে কর যে, এক খুলি রস আছে, আর তুই মাছি হয়েছিস্; তুই কোন্ খানে ব'সে রস খাবি? নরেন্দ্র বল্লে, আড়ায় (কিনারায়) ব'সে মুখ বাড়িয়ে খাব। আমি বললুম, কেন? মাঝখানে গিয়ে ডুবে খেলে কি দোষ? নরেন্দ্র বল্লে, তা হ'লে যে রসে

জড়িয়ে ম'রে যাব। তখন আমি বল্লুম, বাবা, সচ্চিদানন্দ-রস তা নয়, এ রস অমৃতরস, এতে ডুবলে মানুষ মরে না, অমর হয়।

"তাই বলছি ডুব দেও। কিছু ভয় নাই,ডুবলে অমর হয়।

এইবার বঙ্কিম ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন—বিদায় গ্রহণ করিবেন।

বঙ্কিম। মহাশয়, যত আহাম্মক আমাকে ঠাওরেছেন, তত নয়। একটি প্রার্থনা আছে—অনুগ্রহ ক'রে কুটীরে একবার পায়ের ধূলা—

শ্রীরামকৃষ্ণ। তা বেশ তো, ঈশ্বরের ইচ্ছা।

বঙ্কিম। সেখানেও দেখবেন, ভক্ত আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। কি গো! কি রকম সব ভক্ত সেখানে? যারা গোপাল গোপাল, কেশব কেশব বলেছিলো, তাদের মত কি? (সকলের হাস্য)

এক জন ভক্ত। মহাশয়, গোপাল, গোপাল, ও গল্পটি কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে)। তবে গল্পটি বলি শোন। এক যায়গায় একটি স্যাক্‌রার দোকান আছে। তারা পরম বৈষ্ণব, গলায় মালা, তিলক সেবা, প্রায় হাতে হরিনামের ঝুলি আর মুখে সর্ব্বদাই হরিনাম। সাধু বল্লেই হয়, তবে পেটের জন্য স্যাক্‌রার কর্ম্ম করা। মাগ-ছেলেদের তো খাওয়াতে হবে। তারা পরম বৈষ্ণব, এই কথা শুনে অনেক খরিদ্দার তাহাদেরই দোকানে আসে, কেন না, তারা জানে যে, এদের কাছে সোনা-রূপা গোলমাল হবে না। খরিদ্দার দোকানে গিয়ে দেখে যে, মুখে হরিনাম করছে, আর ব'সে ব'সে কাষকর্ম্ম করছে। খরিদ্দার যাই গিয়ে বসলো, একজন ব'লে উঠলো, "কেশব কেশব কেশব।" খানিকক্ষণ পরে আর এক জন ব'লে উঠলো, "গোপাল গোপাল গোপাল।" আবার একটু কথাবার্ত্তা হ'তে না হতেই আর এক জন ব'লে উঠলো—"হরি হরি হরি হরি।" গয়না গড়াবার কথা যখন এক রকম ফুরিয়ে এলো, তখন আর এক জন ব'লে উঠলো—"হর হর হর হর।" কাযে কাযেই এত ভক্তি প্রেম দেখে স্যাকরাদের কাছে টাকাকড়ি দিয়ে নিশ্চিন্ত হলো; জানে যে, এরা কখনও ঠকাবে না।

"কিন্তু কথাটা কি জান? খরিদ্দার আসবার পর যে বলেছিলো "কেশব কেশব", তার মানে এই, এরা সব কে? অর্থাৎ যে খরিদ্দারেরা আসলো, এরা সব কে? যে বল্লে, "গোপাল গোপাল", তার মানে এই, এরা দেখছি গোরুর পাল, গোরুর পাল। যে বল্লে "হরি হরি", তার মানে এই, যেকালে দেখছি গরুর পাল, সে স্থলে তবে 'হরি' অর্থাৎ হরণ করি। আর যে বল্লে "হর হর", তার মানে এই, যেকালে গরুর পাল দেখছো, সেকালে সর্ব্বস্ব হরণ কর। এই তারা পরমভক্ত সাধু। (সকলের হাস্য)।

বঙ্কিম বিদায় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু একাগ্র হয়ে কি ভাবিতেছিলেন। ঘরের দরজার কাছে আসিয়া দেখেন, চাদর ফেলিয়া আসিয়াছেন। হরিবোল হরি! গায়ে শুধু জামা। একটি বাবু চাদরখানি কুড়াইয়া লইয়া ছুটিয়া আসিয়া চাদর তাঁহার হস্তে দিলেন। বঙ্কিম কি ভাবিতে ছিলেন?

রাখাল আসিয়াছেন। তিনি শ্রীবৃন্দাবনধামে বলরামের সঙ্গে গিয়াছিলেন। সেখান হইতে কিছু দিন ফিরিয়াছেন। ঠাকুর, তাঁহার কথা শরৎ ও দেবেন্দ্রের কাছে বলিয়াছিলেন ও তাঁহার সহিত আলাপ করিতে তাঁহাদের বলিয়াছিলেন। তাই তাঁহারা রাখালের সঙ্গে আলাপ করিতে উৎসুক হইয়া আসিয়াছিলেন। শুনিলেন, এঁরই নাম রাখাল।

শরৎ ও সান্ন্যাল এঁরা ব্রাহ্মণ, অধর স্বুবর্ণ-বণিক। পাছে গৃহস্বামী খাইতে ডাকেন, তাই তাড়াতাড়ি পলাইয়া গেলেন। তাঁহারা নূতন আসিতেছেন; এখনও জানেন না, ঠাকুর অধরকে কত ভালবাসেন। ঠাকুর বলেন, ভক্ত একটি পৃথক জাতি।

অধর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে ও সমবেত ভক্তদের অতি যত্নপূর্ব্বক আহ্বান করিয়া পরিতোষ করিয়া খাওয়াইলেন, ভোজনান্তে ভক্তগণ ঠাকুর রামকৃষ্ণের মধুর কথাগুলি স্মরণ করিতে করিতে তাঁহার অদ্ভুত প্রেমের ছবি হৃদয়ে গ্রহণ পূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।*

শ্রীম।

---

* কিছুদিন পরে ২৭এ ডিসেম্বর, শনিবার, শ্রীরামকৃষ্ণ পঞ্চবটীমূলে দক্ষিণেশ্বরে ভক্তসঙ্গে বঙ্কিমবাবুর দেবী চৌধুরাণী পাঠ শুনিয়াছিলেন ও গীতোক্ত নিষ্কাম কর্ম্মের বিষয় অনেক কথা বলিয়াছিলেন।

অধরের বাটীতে শুভাগমনের দিনে শ্রীযুক্ত বঙ্কিম ঠাকুরকে তাঁহার বাটীতে যাইবার জন্য অনুরোধ করাতে ঠাকুর কিছুদিন পরে শ্রীযুক্ত গিরীশ ও মাষ্টারকে তাঁহার সানকীভাঙ্গার বাসায় পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহাদের সহিত ঠাকুরের সম্বন্ধে অনেক কথা হয়। বঙ্কিমবাবু ঠাকুরকে আবার দর্শন করিতে আসিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, কিন্তু কার্য্যগতিকে আর আসা হয় নাই।

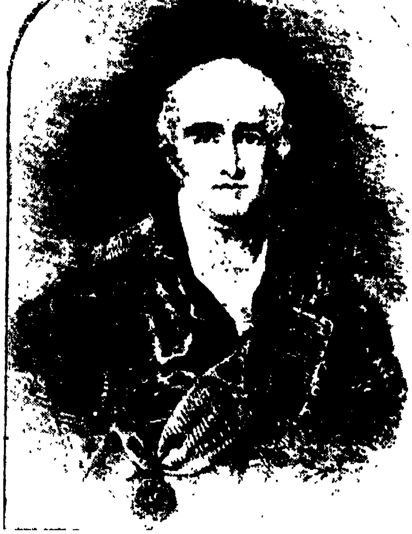
সাতারার ছত্রপতি প্রতাপ সিংহ

মারাঠা সাম্রাজ্যের গাঁথুনী ছিল বড়ই আল্‌গা, তাই ইংরেজরা দুইটা যুদ্ধেই অমন বিরাট রাজ্যটা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারিয়াছিলেন। সাম্রাজ্যের আসল কর্ত্তা পেশবা পুনার প্রাসাদ হইতে হুকুম চালাইতেন; যাঁহার নামে হুকুম চলিত, সেই ছত্রপতি মহারাজ সাতারার কেল্লায় এক রকম বন্দী ছিলেন। রাজ্যটা নামে ছিল তাঁহার, তিনিই পেশবার মনিব, তাঁহার সৈন্যসামন্তদের মনিব, জায়গীরদার ও সাধারণ প্রজার দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা। তাঁহার রাজ্যাভিষেকের সময় খুব ধুমধাম হইত, তাঁহার বিবাহে অনেক টাকা ব্যয় হইত, তাঁহার উত্তরাধিকারী জন্মিলে কেল্লার কামান সহস্র গর্জ্জনে সেই শুভসংবাদ জ্ঞাপন করিত, সাতারার সান্নিধ্যে আসিলে পেশবার নাগারাও স্তব্ধ হইত, বাহিরে ছত্রপতির সম্মান ছিল এতখানি। হাজার হউক, তিনি ত শিবাজী মহারাজের বংশধর। আসলে কিন্তু তিনি ছিলেন—পেশবার হাতের একটি পুতুল। সাতারা ছাড়িয়া এক পা চলিবার স্বাধীনতা তাঁহার ছিল না। তাঁহার চাকরবাকর পর্য্যন্ত পুনা হইতে আসিত। তাহাদের বেতন বৃদ্ধি করিতে হইলে পেশবার মুখের দিকে চাহিতে হইত। প্রাসাদের জলের নলটা মেরামত করিতে হইলে পেশবার দরবারে আরজি পাঠাইতে হইত। সে আরজি যে সর্ব্বদাই মঞ্জুর হইত, তাহাও নহে। তথাপি রাষ্ট্রবিপ্লবের দিনে তাঁহার কদর বাড়িয়া যাইত। চতুর রাজনীতিবিদ্ বালাজী জনার্দ্দন ওরফে নানা ফড়নবীশ ছত্রপতির ক্ষমতা পুনরুজ্জীবিত করিয়া পেশবাকে জব্দ করিবার মতলব করিয়াছিলেন। আর তৃতীয় মারাঠা যুদ্ধে যখন বার বার পরাজিত হইলেও দক্ষিণ মহারাষ্ট্রের সামন্তবর্গ দ্বিতীয় বাজীরাওকে ত্যাগ করিলেন না, তখন ইংরাজ নিজের সুবিধার জন্যই ছত্রপতি প্রতাপ সিংহের "নামের দোহাই ফিরাইলেন।"



নানা ফড়নবীশ

মারাঠা জাতীয় চরিত্রের একটা বিশেষ দৌর্ব্বল্য এই যে, সমৃদ্ধির দিনে তাহারা জাতীয় একতার কথা একেবারেই ভুলিয়া যায়। আত্মকলহপরায়ণ মারাঠা সর্দ্দারেরা পরস্পরের গলায় ছুরি চালাইয়া দিতে একটুও ইতস্ততঃ করেন না। এইরূপ কলহের দৃষ্টান্ত মারাঠা ইতিহাসে অনেক আছে। দ্বিতীয় মাধবরাওয়ের অপমৃত্যুর পর প্রধানতঃ উত্তরাধিকার লইয়া এই গৃহকলহ অত্যন্ত বাড়িয়া উঠে। গদীর প্রকৃত উত্তরাধিকারী ছিলেন রঘুনাথপুত্র বাজী। কিন্তু মন্ত্রী নানা ফড়নবীশের ইচ্ছা ছিল না যে, বাজীরাও পুনার মসনদে বসেন। অনেক ষড়যন্ত্র, অনেক চক্রান্তের পর বাজীরাওই পেশবা হইলেন প্রধানতঃ দৌলতরাও সিন্ধিয়া ও নানা ফড়নবীশের সাহায্যে। দৌলতরাও একটা বিশাল সেনাদলের নায়ক, ফরাসী সেনাপতি ডিবয়েনের সুশিক্ষিত সৈন্যদল তাঁহার ইঙ্গিতে চলিত; আর বুদ্ধিবলে সেকালে নানার সমকক্ষ কেহই ছিল না। বাজীরাও স্থির করিলেন, কণ্টকের দ্বারা কণ্টক উদ্ধার করিবেন। সিন্ধিয়ার সাহায্যে নানার সর্ব্বনাশসাধন করিতে পারিলে তাহার পর সিন্ধিয়ার বিষদাঁত ভাঙ্গিতে কতক্ষণ? এই কূটনীতির ফলে যে গৃহবিবাদের উৎপত্তি, তাহাতেই মারাঠা সাম্রাজ্যের স্বাধীনতা চিরকালের জন্য লুপ্ত হইয়াছে। সিন্ধিয়ার ক্ষমতা লুপ্ত হওয়া দূরে থাকুক, নানার পতনের পর সিন্ধিয়াই কার্য্যতঃ পেশবার প্রভু হইয়া দাঁড়াইলেন। দৌলত রাওয়ের স্বার্থসাধনে সহায়তা করায় যশোবন্তরাও হোলকার পেশবা ও সিন্ধিয়া উভয়েরই শত্রু হইলেন। মধ্যভারতে সিন্ধিয়ার রাজ্য ছিন্নভিন্ন করিয়া



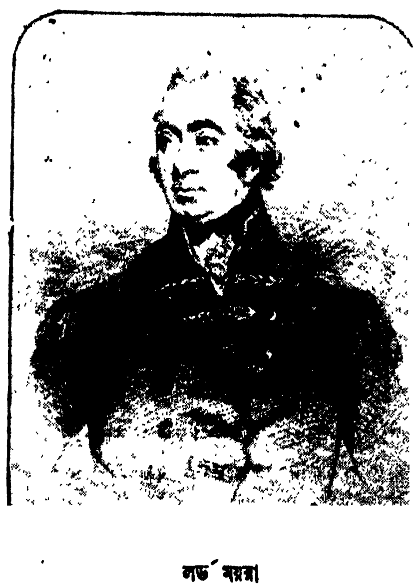
লর্ড ওয়েলেসলী

বৈরনির্যাতনে বদ্ধপরিকর যশোবন্ত তাঁহার বিজয়ী সেনা লইয়া পুনা নগরের নিকটে যখন উপস্থিত হইলেন, তখন সিন্ধিয়া ভয় না পাইলেও পেশবা প্রমাদ গণিলেন। পেশবা ও সিন্ধিয়ার সম্মিলিত বাহিনী পরাজিত করিয়া যশোবন্তরাও হোলকার পুনায় প্রবেশ করিলেন আর বাজীরাও ইংরাজের আশ্রয় লইতে সমুদ্রের উপকূলে পলাইয়া গেলেন। পেশবার শূন্য গদীতে বিজয়ী হোলকার বাজীরাওয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র বিনায়কৱাওকে বসাইয়া দিলেন।

তখন ভাবী ইংরাজ রাজ্যের বড়লাট সুপ্রসিদ্ধ লর্ড ওয়েলেসলী। ওয়েলেসলী এ দেশে আসিয়াই দেশী রাজ্যগুলাকে পদানত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। দুর্ব্বল নিজাম তাঁহার প্রস্তাব সাগ্রহে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাই তাঁহার রাজ্য আজও টিকিয়া আছে। মহীশূরের শার্দ্দূল টিপু সুলতান ইংরাজের চরণে আপনার স্বাধীনতা ও সম্মান বিকাইয়া দিয়া শ্রীরঙ্গপত্তনের প্রাসাদে বিলাসীর জীবন যাপন করিতে সম্মত হইলেন না। চক্ষুর নিমিষে তাঁহার রাজ্য লাল হইয়া গেল। ইংরাজ দূত পেশবা ও সিন্ধিয়ার দরবারেও ওয়েলেসলীর প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন—অতঃপর ইংরাজ সেনাই পেশবার রাজ্য রক্ষা করিবে, পেশবা কেবল তাহাদের ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া যাবচ্চন্দ্র-দিবাকর সুখে স্বচ্ছন্দে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে বিনা ওজর-আপত্তিতে পুনার মসনদ ভোগদখল করিতে থাকুন। বাজীরাও স্বার্থপর, কুটিল ও কাপুরুষ; কিন্তু নির্ব্বোধ নহেন। তিনি ইংরাজের প্রস্তাবে কর্ণপাত করিলেন না। পুনা ছাড়িয়া তিনি যখন বেসিনে পলায়ন করিলেন, তখন বড়লাট ওয়েলেসলী সুযোগ বুঝিয়া আবার সেই প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। বেসিনের সন্ধিতে স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিয়া দ্বিতীয় বাজীরাও স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিলেন। ইংরাজ সেনাপতি ওয়েলিংটন (তখন অর্থার ওয়েলেসলী) তাঁহাকে পুনায় নিরাপদে পৌঁছাইয়া দিলেন।

মারাঠা চরিত্রের আর একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, বিপদের দিনে তাহারা জাতীয় ঐক্যের কথাই বিশেষভাবে স্মরণ করে। বাজীরাও বেসিনে ইংরাজের পদে স্বাধীনতা বিকাইয়া আসিয়াছেন, এই কথাটা প্রচার হইবামাত্রই সিন্ধিয়া ও হোলকার পূর্ব্ব-বৈর বিস্মৃত হইলেন। নাগপুরের অলস রাজা রঘুজী ভোঁসলা তাঁহাদের সহিত মিলিত হইলেন। পেশবাও গুপ্তভাবে তাঁহাদিগকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় মারাঠা যুদ্ধে ইংরাজের জয় হইল; সিন্ধিয়া, ভোঁসলা, হোলকার একে একে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়া ইংরাজের প্রাধান্য স্বীকার করিলেন।

পরাজিত মারাঠা সেনানায়করা কিন্তু তখনও পরাধীনতায় অভ্যস্ত হইতে পারেন নাই। তাই যখন লর্ড ময়রা পিণ্ডারী



লর্ড ময়রা

যুদ্ধে লিপ্ত, সেই সময় আবার আগুন জলিয়া উঠিল। এই যুদ্ধের ইতিহাস লইয়া ইংরাজ লেখকে ও এ দেশী পাঠকে মতভেদ অবশ্যম্ভাবী। ইংরাজ ইতিহাসলেখক বুঝিতে পারেন না, রাষ্টিয়া, ভিঞ্চুরকর, পটবর্দ্ধন প্রভৃতি যে সকল সর্দার অল্পকাল পূর্ব্বে পেশবা কর্ত্তৃক নিগৃহীত ও নির্য্যাতিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা কেন পেশবার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলেন; ইংরাজের নিকট ইহা দুর্ব্বোধ্য খেয়াল বা নির্ব্বুদ্ধিতার লক্ষণ; কিন্তু ইহা অপেক্ষা স্বদেশপ্রাণতার আর বড় প্রমাণ কি আছে? পেশবার অন্যতম মন্ত্রী মোরো দিক্ষীত এক জন ইংরাজ সেনাপতিকে বলিয়াছিলেন—"জানি, এ যুদ্ধে আমাদের পরাজয় হইবে, তাই আমি পেশবাকে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু যুদ্ধ বাধিলে আমি নিষ্ক্রিয় থাকিব না।" মোরো দিক্ষীত যুদ্ধে প্রাণ দিয়াছিলেন, কিন্তু পরাজয় অনিবার্য্য জানিয়াও বিপন্ন প্রভুকে ত্যাগ করেন নাই। পেশবা যুদ্ধঘোষণা করিবামাত্র নাগপুরে ইংরাজের বন্ধু আপ্পা সাহেবও যুদ্ধের আয়োজন করিতে আরম্ভ করিলেন, হোলকারের সেনাদল চঞ্চল হইয়া উঠিল, সিন্ধিয়াও একেবারে স্থির ছিলেন না। কিন্তু তৃতীয় মারাঠা যুদ্ধেও মারাঠা জাতির অদৃষ্ট ফিরিল না। খরকী, সীতাবলদী ও মেহিদপুরে পেশবা, ভোঁসলা ও হোলকারের সেনাদল পরাজিত হইল। এ যুদ্ধ চলিয়াছিল অনেক দিন। স্বাধীনতার জন্য মারাঠাদিগের ইহাই শেষ যুদ্ধ বলিলেই চলে। অনেক সেনানীই প্রথম পরাজয়ে হতোদ্যম হয়েন নাই। ইংরাজ ঐতিহাসিক তাঁহাদিগকে গোঁয়ার বলেন, বোকা বলেন। আমরা এ দেশবাসীরা কেমন করিয়া তাহাতে সায় দিব?

পরাজিত পেশবা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে পলাইয়া পলাইয়া ফিরিতে লাগিলেন। যত দিন সেনাপতি বাপু গোখলে জীবিত ছিলেন, যত দিন পর্ত্তুগীজ সেনানী মেজর ডি পিণ্টো জীবিত ছিলেন, তত দিন পেশবার বাহিনী একেবারে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে নাই। তাই ইংরাজ সেনানীদিগকে বড় সাবধানে চলিতে হইয়াছিল। তাঁহাদের চেষ্টা হইল, কেমন করিয়া পেশবার সামন্তবর্গকে নিজেদের দলে টানিয়া আনিবেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ব্যক্তিগতভাবে এই সর্দারদিগের পেশবার প্রতি অনুরাগের কোন কারণ ছিল না। কেবল জাতীয় গৌরব রক্ষার জন্যই তাঁহারা পেশবার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। তখন পেশবাই তাঁহাদের জাতীয় স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্যের প্রতীক। তাই সার টমাস মনরো যখন সসৈন্যে দক্ষিণ মহারাষ্ট্রে প্রবেশ করিলেন, তখন তাঁহাকে বলিয়া দেওয়া হইল, তিনি যেন গোখলে ব্যতীত অপর সর্দারদিগের জমীদারীতে কোন উৎপাত না করেন। তাঁহাদিগের সহিত যেন বন্ধুবৎ ব্যবহার করা হয়। (Treat the country immediately under the Peshwa and the Jagheer of Gokla as hostile, and that of all the other Jagheerdars as friendly) কিন্তু ইহাতেও কি তাঁহারা দক্ষিণের জায়গীরদারগণের মন পাইয়াছিলেন? পেশবার পতনের পরও পটবর্দ্ধনবংশীয় চিন্তামন রাও আপ্পা ইংরাজের চাকরী করিতে সহজে সম্মত হয়েন নাই। ইংরাজ লেখকরা এই অসম্মতি চিন্তামন রাওয়ের—Characteristic petulance and irritability of his disposition বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা কি কেবলমাত্র petulance, কেবলমাত্র রুক্ষ স্বভাবের নিদর্শন?

চিন্তামন রাও ইংরাজ সেনানীদিগের পত্রের অভদ্র উত্তর দিয়া পরে অসুস্থতার জন্য বাজীরাওয়ের সেনাদল পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কেবল কি ইংরাজ সেনানীর বন্ধুব্যবহারে মুগ্ধ হইয়াই তিনি বাজীরাওয়ের পক্ষ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন? বোধ হয় না। ইতোমধ্যে চতুর ইংরাজ লাট আর এক চাল চালিয়াছিলেন।

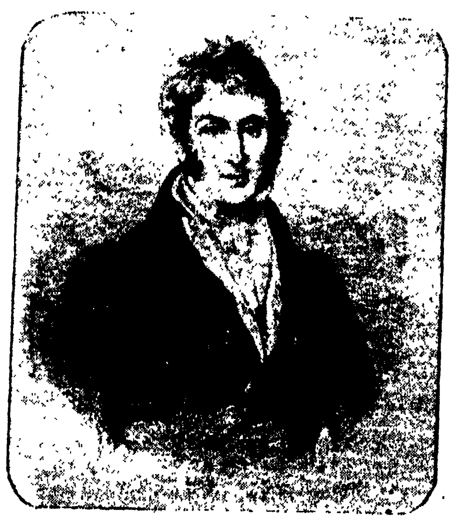
রাজ্যের প্রকৃত মালিক সাতারার ছত্রপতি। পেশবা তাঁহার ভৃত্য মাত্র। রাজা ঠিক থাকিলে মন্ত্রী বদলে রাজ্যের আর কি ক্ষতি? তাই ইংরাজ সরকার ঠিক করিয়াছিলেন, ছত্রপতির নামে ঘোষণাপত্র জাহির করিলে মারাঠারা অবশ্যই পেশবার পক্ষ ছাড়িয়া আসিবে। পেশবাও ইহা জানিতেন। তাই পলায়নকালে তিনি ছত্রপতি মহারাজকে সঙ্গে লইয়াছিলেন। আষ্টির যুদ্ধে বাজীরাও কেবল যে অনুগত সেনাপতি গোখলেকে হারাইয়াছিলেন, তাহা নহে; পরন্তু এই যুদ্ধের পরেই ছত্রপতি মহারাজ ইংরাজের হস্তে নিপতিত হয়েন। কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই ইংরাজ সরকার স্থির করিয়াছিলেন, ছত্রপতি মহারাজকে সাতারার সিংহাসন দেওয়া হইবে। আপনাদের স্বার্থরক্ষার জন্যই তাঁহারা এই নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন—ছত্রপতির উপকারের



দ্বিতীয় বাজীরাও

জন্ম নহে। কোন কোন ইংরাজ লেখক এই কথাটা বেশ স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন।

এইচ, টি, প্রিন্সেপ সে কালের বঙ্গদেশীয় সিভিলিয়ন। তিনি এই যুদ্ধের সময় বড় লাটের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের বহু স্থানে ঘুরিয়াছিলেন। বড় লাটের খাস দপ্তরের কর্ম্মচারী হিসাবে অনেক খবর জানিবার সুবিধাও তাঁহার ছিল। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে তিনি Narrative of the Political and Military Transactions in India নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। সে কালে বিলাতে এই গ্রন্থের খুব আদর হইয়াছিল। তাই বিলাতে ফিরিয়া প্রিন্সেপ আবার ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে History of the Political and Military Transactions in India নাম দিয়া দুই খণ্ডে এই বহির দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির করেন। প্রথম সংস্করণের বহিখানি পড়িবার সুবিধা আমার হয় নাই। সুতরাং সাতারার রাজার সম্বন্ধে তিনি প্রথম সংস্করণে কি বলিয়াছিলেন, জানি না. কিন্তু দ্বিতীয় সংস্করণের বহি একখানি আমার নিকট আছে। এই বহিতে প্রিন্সেপ ইংরাজ সরকারের মনোভাব একেবারে খুলিয়া বলিয়াছেন।—The Raja of Sutara was to be established in a territorial possession, to be held either as a dependent Jageer, or as a distinct sovereignty, under stipulations securing the supremacy of the British Government. The declared object of this part of the plan was to conciliate the Mahrattas to the new order of things, and establish a counterpoise to the remaining influence of the Peshwa's Brahminical administration. The mode, and form, and amount of the provision, were left to Mr. Elphinstone's discretion, so that the object might be most securely attained. The above, with a territorial reservation for the settlement of a Jageer upon Chimna Appa, formed the outline of the plan devised by the Marquess of Hastings; in prosecution of which immediately upon the Capture of Sutara, the Mahratta flag was again hoisted on its walls, in the manner above mentioned, and a proclamation issued, inviting the Mahrattas to rally round their rightful hereditary sovereign, for whom it was declared that Sutara and adjacent territories would be reserved as an independent dominion under British protection. In this form Mr. Elphinstone thought the establishment of the Sutara Raja would be effected with most advantage under existing circumstances; and the early submission



এলফিনষ্টোন

of several Jageerdars, who were eager to establish a prior claim to the honours and advantages of the restored dynasty, attested the policy of the measure." সোজা কথা এই যে, সাতারার রাজার দোহাই দিয়া পেশবার দলস্থ সর্দ্দারদিগকে ফিরাইয়া আনাই ছিল ইংরাজ সরকারের একমাত্র উদ্দেশ্য; সেই জন্যই তাঁহারা সাতারার দুর্গপ্রাকারে বৃটিশ পতাকা না উড়াইয়া শিবাজীর নিশান চড়াইয়াছিলেন, তাই তাঁহারা নাবালক ছত্রপতিকে ছোট একটা স্বাধীন রাজ্যের তক্তে বসাইয়াছিলেন, তাই বাই নগরে যাইয়া এলফিনষ্টোন দক্ষিণের শিষ্ট ব্রাহ্মণদিগকে অভয় দিয়াছিলেন—ভয় নাই, ইংরাজ সরকার তোমাদের বৃত্তিলোপ করিবে না, তোমরা যে নিষ্কর জমী সম্ভোগ করিতেছ, তাহা নির্ব্বিঘ্নে ভোগ করিবে, পবিত্র পণ্ঢরপুর তীর্থে বিষ্ণু-মন্দিরের নিকটে ব্রাহ্মণ গঙ্গাধর শাস্ত্রীকে পেশবা বাজীরাও গুপ্ত ঘাতুকের দ্বারা হত্যা করাইয়াছে, আমরা কেবল সেই ব্রাহ্মণ-হত্যার প্রতিবিধান করিতে চাহি। ছত্রপতির স্বার্থরক্ষার জন্য ইংরাজের ব্যাকুল হইবার কারণ ছিল না।

কিন্তু ছত্রপতি এত কাল নামে অন্ততঃ মারাঠা সাম্রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। তিনি না মনে করেন যে, ইংরাজ আবার তাঁহার সমস্ত লুপ্ত অধিকার পুনরুদ্ধার করিয়া দিবে। মুর্শিদাবাদের এক জন নবাব না কি তাঁহার জমাখরচের হিসাবে সুবে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার খাজানা জমা দিয়া, তাহা হইতে ইংরাজ কোম্পানীর বেতন খরচ লিখিয়া, বাকীটা নিজের আয়ের ঘরে লিখিতেন। ছত্রপতিরও সেইরূপ করিবার সম্ভাবনা ছিল। এই জন্যই ইংরাজ সরকার নানারূপে তাঁহার ক্ষমতা হ্রাস করিয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার ক্ষমতার সীমা কোথায়। তাঁহার সহিত যখন পাকাপাকি বন্দোবস্ত হয়, তখন আর ইংরাজের তত্টা উদ্বেগের কারণ নাই। গ্রিণ্ডেপ লিখিয়াছেন—"On the 25th of September 1819, the engagement, fixing the relations of the Raja with the British Government was settled by the same officer. Under its stipulations the territory is to be held 'in subordinate Co-operation with the British Government,' and the provisions fixing the Raja's future dependence are more than usually precise. It was particularly agreed, that, for sometime to come, the tract should remain under the management of British officers;—that the Jageers should always be under the management of British officers, that the Jageers should always be under our guarantee, and in the event of a transfer, that the Raja should conform to the British system, in in the management of his customs, besides surrendering criminals. With so many occassions, for interference the Rajah's authority can never be looked opon as independent."

পরবর্ত্তী কালে ছত্রপতি প্রতাপ সিংহ ও তাঁহার উকীলরা তর্ক তুলিয়াছিলেন যে, নাগপুরের ভোঁসলা রাজা প্রভৃতি অন্যান্য মারাঠা নরপতিগণ সাতারার সামন্ত বলিয়া পরিগণিত হইবেন। কেন না, ছত্রপতি মহারাজ ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন নাই, তাঁহার অবাধ্য ভৃত্য পেশবার আচরণের জন্য তিনি দায়ী হইতে পারেন না। আইনের তর্কে হয় ত এ যুক্তি অগ্রাহ্য না হইতে পারে। কিন্তু সহজ বুদ্ধিতে এ যুক্তি গ্রহণ করা দুষ্কর। ছত্রপতি ত নামে মাত্র পেশবার মনিব ছিলেন। এরূপ যুক্তি গ্রহণ করিলে ছত্রপতির দাবীও নাকচ হয়, কেন না, যদি যুধিষ্ঠিরের বংশধর কোথাও থাকে, তবে ছত্রপতির দাবী অপেক্ষা তাহার দাবী প্রবল হইবে। এই প্রণালী অনুসরণ করিলে বোধ হয়, দিল্লীর সিংহাসনের প্রকৃত অধিকারী খুঁজিতে যাইতে হইবে কোন ভীল নাগা কুকি সাঁওতাল মুণ্ডাদিগের মধ্যে।

যাহা হউক, ইংরাজের অনুগ্রহে নাবালক প্রতাপ সিংহ সাতারার সিংহাসনে বসিলেন। তাঁহার অভিভাবক হইলেন—কাপ্তেন জেম্‌স্ গ্রাণ্ট। গ্রাণ্ট ডফ নামে ইনি ভারতের সর্ব্বত্র পরিচিত। মারাঠাদিগের ইতিহাস লিখিয়া ইনি চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। গ্রাণ্ট ও এলফিনষ্টোন ছত্রপতি প্রতাপ সিংহের বুদ্ধিমত্তা ও শাসনদক্ষতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। ছত্রপতি প্রতাপ সিংহ প্রাচীন রীতি-নীতির আলোচনা করিয়া দেশের আইন লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

তিনি টেবল-চেয়ারে বসিয়া সেকালের সিবিলিয়ানদিগের মত বিনা আড়ম্বরে নিজের কায করিয়া যাইতেন। তিনি ছিলেন সাধারণ মানুষ, মহাত্মাও নহেন, দুরাত্মাও নহেন। সাধারণ মানুষের মত তাঁহারও অনেক গুণ ছিল, আবার রাজবংশের লোকদিগের সাধারণতঃ যে সকল দোষ থাকে, তাহা হইতেও তিনি একেবারে মুক্ত ছিলেন না। গ্রাণ্ট ডফ তাঁহাকে ভালবাসিতেন—বিলাতে যাইবার পর তিনি ছত্রপতির জন্য অনেক বেলোয়ারী জিনিষ কিনিয়াছিলেন, অবশ্য ছত্রপতিরই প্রদত্ত অর্থে।

যাহা হউক,প্রতাপ সিংহের সমৃদ্ধি ও সুখের দিন চিরস্থায়ী হয় নাই। তাঁহার প্রধান শত্রু ছিলেন বালাজী পন্ত নাতু। বালাজী পন্ত নাতুকে ধিক্কার না দেয়, এমন লোক মহারাষ্ট্রে নাই বলিলেও চলে। নাতু সাতারার দেওয়ানের পদ চাহিয়াছিলেন; প্রতাপ সিংহ তাঁহার প্রার্থনা মঞ্জুর করেন নাই। পেশবার রাজ্য না কি নাতুর চক্রান্তেই নষ্ট হইয়াছিল; সুতরাং ছত্রপতি নিজ রাজ্যের ভার তাঁহার হাতে দিতে পারিলেন না। নাতু ইহার প্রতিশোধ লইয়াছিলেন—প্রতাপ সিংহকে সাতারা হইতে তাড়াইয়া। কথিত আছে যে, বাজীরাওয়ের একখানি সাধারণ পত্রের কদর্থ করিয়া নাতু ইংরাজ এজেণ্ট কর্ণেল ওভান্সের মন কলুষিত করিয়াছিল। প্রতাপ সিংহের দ্বিতীয় শত্রু তাঁহার নিজের সহোদর। কনিষ্ঠ আপ্পা সাহেব সিংহাসনের লোভে জ্যেষ্ঠের শত্রুদলে যোগ দিয়াছিলেন।

১৮১৯ খৃষ্টাব্দে প্রতাপ সিংহ সাতারার সিংহাসনারোহণ করেন, ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ হয়। তিনি না কি কোম্পানীর দেশীয় সৈন্যদিগকে ইংরাজের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবার প্রয়াস করিয়াছিলেন। এই অভিযোগের ফলে তিনি রাজ্যচ্যুত ও নির্ব্বাসিত হয়েন। সংক্ষেপে ইহাই হইল, ছত্রপতি প্রতাপ সিংহের স্বল্পকালস্থায়ী রাজত্বের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। তাঁহার ভ্রাতা আপ্পা সাহেব অপুত্রক ছিলেন, তাই কালক্রমে সাতারা রাজ্য ইংরাজের অধিকারে আইসে।

এখানে একটা কথা ভাবিবার আছে। রণজিতের রাজ্য গিয়াছে; কিন্তু তাঁহার ভৃত্য গোলাব সিংহের বংশধর আজিও কাশ্মীরের গদীতে সুপ্রতিষ্ঠিত। নিজামের বংশধর আজ বেরার পাইবার জন্য আবেদন ও আন্দোলন করিতেছেন, কিন্তু ঔরংজীবের বংশধররা আজ কোথায়? শুনিয়াছি, দিল্লীর বাদশাহের এক জন বংশধর দিল্লী সহরের এক অংশে দপ্তরীর কায করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছেন। টিপুর বংশধরগণের স্থান মহীশূরে হয় নাই। সিন্ধিয়া আছেন, হোলকার আছেন, কিন্তু পেশবা কোথায়? কোলহাপুরে শিবাজীর বংশধর ইংরাজের ছত্রচ্ছায়ায় রাজত্ব করিতেছেন; কিন্তু সাতারার শাহুর দরবারে এখন ইংরাজ জজের আফিস বসিয়াছে। ইহার কারণ অনুধাবন করিয়া দেখা দরকার।

আত্মরক্ষার অধিকার সকলেরই আছে। আত্মরক্ষা-সাম্রাজ্যরক্ষার জন্যই ইংরাজ দিল্লীর বাদশাহী, রণজিতের রাজত্ব, পেশবার প্রভুত্ব লুপ্ত করাইয়া দিয়াছে। সেই কারণেই ছত্রপতির ছত্র কাড়িয়া লওয়ার প্রয়োজনও ইংরাজের হইয়াছিল। এ কথা বেশ সহজেই বুঝা যায় যে, ঔরংজীব, রণজিত, বাজীরাও ও শিবাজীর বংশধরকে কেন্দ্র করিয়াই এ দেশে বিপ্লবের বহ্নি জ্বলিয়া উঠিতে পারিত। তাই ইংরাজ পূর্ব্বাহ্লেই ইঁহাদের শক্তির মূল উৎপাটন করিয়া ফেলিয়াছেন। প্রয়োজনের জন্য তাঁহাকে ইহা করিতে হইয়াছে; সাধারণ আইনের ন্যায়ান্যায় বিচার করিয়া চলিলে রাজ্য রক্ষা পাইত না।

অল্পদিন হইল, এলাহাবাদপ্রবাসী বিখ্যাত বাঙ্গালী ডাক্তার মেজর বামনদাস বসু পরিণত বয়সে প্রতাপ সিংহের রাজ্যচ্যুতি সম্বন্ধে একখানি বিরাট ইংরাজী গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। গ্রন্থকার বহুদিন পূর্ব্বে সাতারার সিভিল সার্জ্জন ছিলেন, মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থানে তাঁহার জীবনের অধিকাংশ কাল অতিবাহিত হইয়াছে, মারাঠা জাতির ইতিহাস তিনি সহানুভূতি সহকারে অধ্যয়ন করিয়াছেন, সুতরাং ছত্রপতি প্রতাপ সিংহের রাজ্যচ্যুতির করুণ ইতিহাস লিখিবার যোগ্যতা ও অধিকার তাঁহার আছে। কিন্তু তিনি মহারাষ্ট্র ত্যাগ করিবার পরেও মারাঠা জাতির ইতিহাসসম্বন্ধে ইংরাজী ও মারাঠী ভাষায় বহু আলোচনা হইয়াছে। এলাহাবাদে থাকিয়া তিনি হয় ত বিগত কয়েক বৎসরের ঐতিহাসিক গবেষণার সম্যক্ সংবাদ রাখিতে পারেন নাই; এই জন্যই হউক অথবা যে কারণেই হউক, গ্রন্থখানি তিনি অপর কাহারও দ্বারা দেখাইয়া লওয়া প্রয়োজন মনে করিয়াছেন। য়ুরোপে হইলে এরূপ কাযের

ভার স্বভাবতঃই কোন ব্যবসায়ী ঐতিহাসিকের উপর পড়িত। সে সব দেশে, great amateurদিগের যুগ অতীত হইয়াছে। এ দেশে আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে এখনও amateur-এর যুগই চলিতেছে। ঐতিহাসিক মালমসলা, দলীলদস্তাবুদ যোগ্যতাসহকারে ব্যবহার করিতে পারেন, এমন লোক এ দেশে দুর্লভ। সুতরাং মেজর বসু যে গ্রন্থখানি সম্পাদনের ভার এক জন amateur-এর হস্তে ন্যস্ত করিয়াছেন, ইহাতে আমরা বিস্মিত হই নাই। বিশেষতঃ সে দলের মধ্যে শ্রীযুত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের অপেক্ষা যোগ্য ব্যক্তি পাওয়া যাইত কি না সন্দেহ।

রামানন্দ বাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। ইংরাজীতে সুলেখক বলিয়া তাঁহার খ্যাতি আছে। শুনিয়াছি, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার জন্য তিনি সংস্কৃত ও লাটিন ভাষাও অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। 'মডার্ণ রিভিউর' সম্পাদকীয় স্তম্ভে তিনি গোয়ানিবাসী অধ্যাপক পাণ্ডুরঙ্গ পিস্সুর লেঁস্করের ফরাসী ও পর্টুগীজ ভাষায় লিখিত দুইখানি গ্রন্থের পাণ্ডিত্যপূর্ণ সমালোচনা করিয়াছেন। গ্রন্থ দুইখানির আলোচ্য বিষয় প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ও ধর্ম্মমত। সুতরাং রামানন্দ বাবু কেবল যে ফরাসী ও পর্টুগীজ ভাষায় পণ্ডিত, তাহা নহে; তিনি প্রাচীন ভারতের ইতিহাসেও বিশেষ ব্যুৎপন্ন। শ্রীযুত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে তিনি 'বাঙ্গালার ইতিহাস' লিখিতে সাহায্য করিয়াছেন। 'মডার্ণ রিভিউর' সম্পাদকীয় স্তম্ভে তিনি পরলোকগত উইলিয়ম আর্ভিন বিরচিত Later Moghuls নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থের যে পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার মারাঠী ভাষাজ্ঞানের প্রমাণ পাওয়া যায়। কেন না, ঐ প্রসঙ্গে তিনি শ্রীযুক্ত গোবিন্দ সখারাম সরদেসাই মহাশয়ের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। সরদেসাই মহাশয়ের উক্ত মত মারাঠী রিয়াসত দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার ঐ গ্রন্থের ইংরাজী, বাঙ্গালা বা হিন্দী ভাষান্তর অদ্যাপিও হয় নাই; সুতরাং রামানন্দ বাবু মারাঠীও জানেন। 'মডার্ণ রিভিউতে' তিনিই R. C. নামে অধ্যাপক কাননগো প্রণীত 'শের সাহের' সমালোচনা করিয়াছিলেন, এরূপ মনে করিবার কারণ আছে। এ প্রকার পাণ্ডিত্য এ কালে ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ব্যতীত অপর কোন বাঙ্গালীর আছে কি না সন্দেহ। তাঁহার সূক্ষ্ম বিচারশক্তি ও রাশি রাশি প্রমাণের সদ্ব্যবহার করিবার শক্তি সুবিদিত। বিশেষতঃ তিনি সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার মহাশয়ের অন্তরঙ্গ বন্ধু, এবং যাঁহারা রামানন্দ বাবুকে জানেন, তাঁহারা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, তাঁহার যোগ্যতা সম্বন্ধে নিজের মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকিলেও তিনি এ কাযের ভার যশের অথবা অর্থের লোভে কিছুতেই গ্রহণ করিতেন না। মেজর বসু সম্পাদক নির্ব্বাচনে ভুল করেন নাই। সুতরাং এই গ্রন্থে মণি-কাঞ্চনযোগ হইয়াছে বলিতে হইবে।

সে কালে এই সাতারার ব্যাপার লইয়া এ দেশে ও বিলাতে যথেষ্ট আন্দোলন হইয়াছিল। সাতারার রাজ্যচ্যুত মহারাজ বিলাতে উকীল পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিনিধিদিগকে পদে পদে বাধা পাইতে হইয়াছে। কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা জানিতেন যে, সাতারার মহারাজের বিরুদ্ধে কোন বলবান্ প্রমাণ নাই; তাই তাঁহারা বারংবার তাঁহার মুখ বন্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। যাহা হউক, এই ব্যাপারের আন্দোলন যখন বিলাতে পর্য্যন্ত পৌঁছে, তখন কোম্পানীর তরফ হইতে সাতারা সম্বন্ধীয় কাগজ-পত্র ছাপা হইয়াছিল। পার্লামেণ্টের সদস্যদিগের জন্যই তিন খণ্ডে সাতারা সম্বন্ধীয় চিঠি-পত্র, রিপোর্ট প্রভৃতি ছাপা হয়। তাঁহারা সে সকল কাগজপত্র পড়িয়াছিলেন কি না, জানি না; কিন্তু এখন এ বহিগুলি দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। ও দিকে সাতারার মহারাজের বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী রঙ্গো বাপুজীও কয়েকখানি পুস্তিকায় তাঁহার প্রভুর নালিশ বিলাতের জনসাধারণের নিকট বিবৃত করিয়াছিলেন। এই সকল গ্রন্থ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তকালয়ে (Library) আছে। যত দূর মনে পড়ে, 'মডার্ণ রিভিউতে' ঘোষণা করা হইয়াছিল, বহু দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ অবলম্বনে, অনেক extract সহ 'মডার্ণ রিভিউ' আফিস হইতে সাতারার ঘটনাসংক্রান্ত একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইবে। সুতরাং আগ্রহের সহিত গ্রন্থখানির প্রতীক্ষা করিয়াছিলাম।

গ্রন্থের বিরাট আকার ও মুদ্রণ-পারিপাট্য দেখিয়া আশা বাড়িয়াছিল। কিন্তু পাঠ করিয়া নিরাশ হইয়াছি। পুনরুক্তি, অতিশয়োক্তি প্রভৃতি যে সকল দোষ ঐতিহাসিকের একান্ত বর্জ্জনীয়, তাহা গ্রন্থের প্রতি পত্রে বিদ্যমান। গ্রন্থকার বিশেষ বিবেচনা করিয়াই পুস্তকের নাম রাখিয়াছেন Story

of Satara; কাহিনী ইতিহাস নহে। Story ও Historyতে আকাশপাতাল ব্যবধান।

ঐতিহাসিকের কাহারও পক্ষ অবলম্বন করা উচিত নহে, বিশেষতঃ সাতারার ব্যাপারে কাহারও গুণ-দোষ অতিরঞ্জন করিবার প্রয়োজন মোটেই নাই। সাতারার প্রতাপ সিংহের নির্দোষিতা এত স্পষ্ট যে, তাঁহার গুণাবলী অযথা অতিরঞ্জিত করিলে ও তাঁহার প্রতিপক্ষদিগের দোষ বেশী বাড়াইয়া বলিলে পাঠকের মনে স্বভাবতঃই সন্দেহের উদয় হইতে পারে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর তরফ হইতে চিঠিপত্র সংগ্রহ করিয়া যে কেতাব ছাপা হইয়াছিল, তাহার একখানি কিছু দিন পূর্ব্বে দেখিয়াছিলাম। এই কেতাবের মালিক পূর্ব্বে ছিলেন, কলফিল্ড নামক এক জন ইংরাজ। মাঝে মাঝে তিনি পেন্সিলে নানারূপ মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহা হইতে বেশ বুঝা যায়, প্রতাপ সিংহের পক্ষসমর্থনের জন্য সমগ্র স্কচ জাতিটাকে গালাগালি দিবার কোনই প্রয়োজন নাই।

গ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠাতেই সাতারার প্রতাপ সিংহের সহিত মিবারের রাণা প্রতাপের তুলনা করা হইয়াছে। গ্রন্থমধ্যে এক স্থলে ছত্রপতি শিবাজীর সহিত ছত্রপতি প্রতাপ সিংহের তুলনা করিতেও গ্রন্থকার ও সম্পাদক ইতস্ততঃ করেন নাই। তাঁহাদের মতে প্রতাপ সিংহের নির্ব্বাসন নেপোলিয়নের নির্ব্বাসনের সহিত তুলনীয়। রাণা প্রতাপ নিজের সর্ব্বস্ব পণ করিয়া স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিয়াছিলেন, দিনেকের জন্যও তিনি মোগলের অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন নাই। আর ছত্রপতি প্রতাপ সিংহ ইংরাজের দয়াদত্ত সিংহাসনে বসিয়া ইংরাজ পলিটিকাল এজেন্টের উপদেশ অনুসারে রাজ্যশাসন করিতেন। বিলাস-ব্যসন তিনি কখনই পরিহার করেন নাই। শিবাজী নিজ বাহুবলে এক বিরাট রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন,আর প্রতাপ সিংহ নিজের ক্ষুদ্র রাজ্যখণ্ডও রক্ষা করিতে পারেন নাই। নেপোলিয়নকে বন্দী করিতে য়ুরোপের সমগ্র শক্তি নিয়োজিত হইয়াছিল, আর প্রতাপ সিংহকে ইংরাজ পলিটিক্যাল এজেন্ট তাঁহারই রাজধানীতে তাঁহারই প্রাসাদকক্ষে গ্রেপ্তার করিয়া কাশীধামে সামান্য অপরাধীর ন্যায় নির্ব্বাসনে পাঠাইয়াছিলেন। আবেদন ও নিবেদন ব্যতীত প্রতাপ সিংহ তাঁহার রাজ্য উদ্ধারের আর কোন চেষ্টাই করেন নাই। দ্বিতীয় বাজীরাও কুটিল হইতে পারেন, ষড়যন্ত্রকারী হইতে পারেন, কিন্তু তিনি একবার যুদ্ধ করিয়া দেখিয়াছেন। আর প্রতাপ সিংহ বিনা যুদ্ধে পূর্ব্বপুরুষের রাজধানী ত্যাগ করিয়া নির্ব্বাসনে চলিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার আর যাহা গুণ থাকুক, রাণা প্রতাপ, শিবাজী ও নেপোলিয়নের সহিত তাঁহার তুলনা চলে না।

ওভান্স, গ্রাণ্ট প্রভৃতি যে সকল ইংরাজ কর্ম্মচারী প্রতাপ সিংহের রাজ্যচ্যুতি ব্যাপারে অগ্রণী হইয়াছিলেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই স্কটলণ্ডবাসী। এই জন্য এই গ্রন্থে সর্ব্বত্র স্কচজাতিটাকেই গালাগালি দেওয়া হইয়াছে। স্কচজাতিটা নাকি unimaginative। আমি এ কালের ছাত্র, আমার বিদ্যাবুদ্ধি বড়ই কম, ইংরাজী সাহিত্যের সহিত আমার পরিচয় নাই বলিলেও চলে। কিন্তু রামানন্দ বাবু সে কালের এক জন বড় পণ্ডিত; তাঁহার সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের "অধঃপতন" হয় নাই। তিনি বহু দিন ধরিয়া ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপনা করিয়াছেন। শুনিতে পাই, সার ওয়ালটার স্কট নামে এক জন বিখ্যাত ঔপন্যাসিক, রবার্ট বার্ণস নামক এক জন বিখ্যাত কবি, এডাম স্মিথ নামক এক জন বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ্, ডেভিড হিউম নামক এক জন বিখ্যাত দার্শনিক, ষ্টিভেন্সন নামক এক জন বিখ্যাত লেখক ঐ স্কটলণ্ডেরই লোক। সুতরাং ওভান্স ও গ্রাণ্টের দোষে কি সমস্ত জাতিটাকে গালি দেওয়া সঙ্গত? গ্রন্থমধ্যে ওভান্সের নামে যে সব ছড়া লেখা হইয়াছিল, তাহাও উদ্ধৃত করা হইয়াছে, টমসনের একই বক্তৃতা অন্ততঃ চারিবার উদ্ধৃত করা হইয়াছে, এমন কি, ১২২ পৃষ্ঠার পাদটীকায় এমন কথাও বলা হইয়াছে যে, সার রবার্ট গ্রাণ্ট তাঁহার অপকার্য্যের জন্য ভূত হইয়া দাপুরী নামক স্থানে বেড়াইতেছেন। (If it is anybody's ghost, it must be that of Sir Robert Grant, the treacherous Governor of Bombay who encompassed the ruin of the innocent and virtuous Raja Pratap Singh of Satara. Those who believe in ghosts are of opinion that it is the spirit of evil persons that haunt the place of their death as ghosts.) ঐতিহাসিক আলোচনার সময় সর্ব্বপ্রকার বিদ্বেষ ও পক্ষপাতিত্ব একেবারেই বর্জ্জনীয়; কিন্তু উপরে উদ্ধৃত দুইটি প্রসঙ্গ হইতেই বেশ বুঝা যাইবে যে,এই গ্রন্থখানি

আদ্যোপান্ত এই দুইটি দোষে দুষ্ট। উদাহরণ বৃদ্ধি করা অনাবশ্যক। কিন্তু এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন। স্কচজাতীয় লোকরা আর যে অপরাধই করুক না কেন, ভারতবর্ষের ইতিহাসে তাহাদের নাম সুবর্ণ অক্ষরে লিখিত থাকিবে; কেন না, এলফিনষ্টোন, আরস্কিন ম্যালকলম, গ্রাণ্ট ডফ, কানিংহাম প্রভৃতি যে সকল মহাত্মা ভারতবর্ষের লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধার করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই স্কচ। জীবিত ইতিহাসলেখকদিগের মধ্যেও মহামতি বেভারিজ স্কটলণ্ডবাসী।

ছত্রপতি প্রতাপ সিংহকে মহাত্মা বলা যায় কি না, জানি না, কিন্তু তাঁহার উকীল রঙ্গোবাপুজী যথার্থই মহাত্মা ছিলেন। তিনি প্রভুর কার্য্যে বহু বাধা অতিক্রম করিয়া বিলাতে গিয়াছিলেন, বহু ক্লেশভোগ করিয়া বহু দিন সেই দূর বিদেশে বাস করিয়াছিলেন। পরে বিদ্রোহের সন্দেহে তাঁহার পুত্রকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হয়, আর রঙ্গোবাপুজী অজ্ঞাতবাসে পলায়ন করেন। এই মহাপুরুষ এক সুবিখ্যাত বংশের সন্তান। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ রোহিড়খোরের দেশপাণ্ডে শিবাজীর এক জন ভক্ত সহকারী ছিলেন। কিন্তু Story of Satara র মতে তিনি শিবাজীর চিটনবীসের বংশধর। রঙ্গোবাপুজীর বংশতালিকা সরদেসাইকৃত মারাঠী রিয়াসতের প্রথম খণ্ডে দেওয়া আছে। এই সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের সহিত কি রামানন্দ বাবুর পরিচয় নাই? বোধ হয়, অবসরের অভাবেই তিনি রিয়াসতের পাতা উল্টাইয়া দেখেন নাই, তাই গ্রন্থমধ্যে এত বড় একটা ভুল রহিয়া গিয়াছে।

গ্রন্থের পরিশিষ্ট ভাগ প্রায় ২ শত পৃষ্ঠা। গ্রন্থকার চিকিৎসক, সম্পাদকও ঐতিহাসিক নহেন। তাই এই ২ শত পৃষ্ঠার অধিকাংশ সাপ্তাহিক, মাসিক ও দৈনিক কাগজের প্রবন্ধ এবং টমসনের বক্তৃতা দ্বারা পূর্ণ করিয়াছেন। সমসাময়িক চিঠি-পত্র ও দলীল-দস্তাবেজের ন্যায় ঐতিহাসিক হিসাবে সংবাদপত্রের প্রবন্ধ ও বেতনভোগী উকীলের বক্তৃতা মূল্যবান্ নহে। এমন কি, ভোলানাথ চন্দ্র 'কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ম্যাগাজিনে' টমসনের সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহাও এই পরিশিষ্টে স্থান পাইয়াছে, স্থান পায় নাই কেবল যে সকল চিঠি-পত্র ঐতিহাসিকের কাযে আসিতে পারে।

এই পরিশিষ্ট ভাগে সম্পাদক মহাশয় কয়েকটি শীলমোহরের পাঠোদ্ধার করিতে যাইয়া যে ভ্রমপ্রমাদে পতিত হইয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই অমার্জ্জনীয়। ডাঃ কডরিংটন সাতারার রাজাদিগের শীলমোহর সম্বন্ধে বহু দিন পূর্ব্বে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। সেই প্রবন্ধটি আদ্যোপান্ত অসংশোধিতভাবে মুদ্রিত কেন করা হইল, জানি না। কডরিংটন বিদেশী; তাঁহার ভুল মার্জ্জনীয়, কিন্তু ব্রাহ্মণপণ্ডিতের বংশধর, বহুভাষাবিদ্ রামানন্দ বাবু যদি সংস্কৃত বাক্যের ভুল অনুবাদ করেন বা ছাপেন, তাহা লজ্জার বিষয় নহে কি? একটি শীলমোহরের সংস্কৃত বাক্য—

শ্রীশম্ভোপাদকমল সেভাবিরুদয়া বহা,
মুদ্রৈষা শাহুরাজস্য রামস্যনোর্বিরাজতে॥

ইহার অনুবাদ করা হইয়াছে—Here shines forth the seal of king Ram, the son of Shahu, the seal full of prosperity on account of the services rendered to the feet of the glorious Shiva.

আমার সংস্কৃতজ্ঞান অধিক নহে, কিন্তু পাঠকরাই বিচার করুন, 'রামস্যনু শাহু'র অনুবাদ 'শাহুপুত্র রাম' নির্ভুল কি না?

মারাঠী চিঠির শেষে লেখনসীমা, মর্য্যাদেয়ং বিরাজতে প্রভৃতি বাক্য লিখিত শীল থাকে। কডরিংটন এ সকল বাক্যের অনুবাদ যথাযথই করিয়াছেন। তিনি মর্য্যাদেয়ং বিরাজতের অনুবাদ করিয়াছেন—Here shines forth the limit (৫০৭ পৃঃ) রামানন্দ বাবু কিন্তু এই অনুবাদ অগ্রাহ্য করিয়া লিখিয়াছেন—"Sri Marajadeyam Virajate" means Let all be done according to these orders. যাঁহারা সংস্কৃত ও ইংরাজী উভয় ভাষায় ব্যুৎপন্ন, তাঁহারাই বলিতে পারেন, এই অনুবাদ নির্ভুল কি না।

শিবাজীর শীলমোহরযুক্ত দুই একখানি চিঠি—দেখিবার সৌভাগ্য বর্ত্তমান লেখকের হইয়াছে। গ্রন্থমধ্যে শীলমোহরের যে চিত্র দেওয়া হইয়াছে, তাহা নিশ্চয়ই eye copy অর্থাৎ চক্ষুতে দেখিয়া অঙ্কিত, যথার্থ প্রতিলিপি নহে। শিবাজীর মোহরের সংস্কৃত শ্লোকের পাঠোদ্ধার বহু দিন পূর্ব্বে হইয়া গিয়াছে। ঐ পাঠ সম্বন্ধে যে কোন সন্দেহ আছে, তাহা আমার জানা ছিল না। রাজবাড়ের গ্রন্থে শ্লোকটি এইরূপ পড়িয়াছি—

প্রতিপচ্চন্দ্রলেখেব বৰ্দ্ধিষ্ণু বিশ্ববন্দিতা।
শাহাসূনো শিবস্যৈষা মুদ্রা ভদ্রায় রাজতে॥

এই শ্লোকের অর্থ এক প্রকার বুঝিতে পারি। ভদ্রায় রাজতে, মঙ্গলের নিমিত্ত শোভমান, এইরূপ অনুমান করিয়াছি. কেন না, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সংস্কৃত ভাষায় আমার তাদৃশ জ্ঞান নাই। রামানন্দ বাবু ইহার পাঠোদ্ধার করিয়াছেন অন্যরূপ তাঁহার মতে প্রকৃত পাঠ—

প্রতিপদ চন্দ্রলেখেব বৰ্দ্ধিষ্ণু বিশ্ববদিতা
শাহাসুনো শিব রসৌসা মুদ্রা ভদ্রায় রাজতে।

তাঁহার মতে ইহার অর্থ it means—Like the increase of th new moon from the first day, so all the world obey and worship the seal of Sivaji Raja the son of Shahaji Raja.

আর একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াই প্রবন্ধ শেষ করিব। ভারতীয় শব্দসমূহ ইংরাজী অক্ষরে লিখিবার কয়েকটি প্রণালী আছে। রামানন্দ বাবু এই গ্রন্থে কোন্ প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন? কোন প্রণালী অনুসারে একই শিবাজী শব্দ একই পৃষ্ঠায় Sivaji ও Sevajee অনুলিখিত হয়? কোন্ প্রণালী অনুসারে রঙ্গোবাপূজী Rungo Bapojee-তে পরিণত হয়? কোন্ প্রণালীতে একই পৃষ্ঠায় মারাঠা Maratha ও Mahratta, রাজা Raja ও Rajah, রাণী Rani ও Ranee এই দ্বিবিধ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে? অন্যের গ্রন্থসমালোচনাকালে ত রামানন্দ বাবু জেনেভা প্রণালীকে প্রাধান্য দিয়া থাকেন, এই বানানগুলি কি জেনেভা প্রণালীর অনুমোদিত?

উপসংহারে বক্তব্য যে, এই ভুলগুলি রামানন্দ বাবুর অজ্ঞতার পরিচায়ক, এ কথা বলিবার বা মনে করিবার দুঃসাহস আমার নাই। তিনি প্রবীণ পণ্ডিত। কিন্তু তাঁহার পাণ্ডিত্যের ন্যায় তাঁহার অবসর প্রচুর নহে। ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রধান মাসিক (The leading monthly in India) সম্পাদনের গুরুভার তাঁহার স্কন্ধে। তদুপরি আবার বঙ্গদেশীয় একখানি শ্রেষ্ঠ মাসিকেরও তিনিই সম্পাদক। এই সকল কায করিয়া তাঁহার অবসর, বোধ হয়, অল্পই থাকে। বিরলপ্রাপ্ত অবসরে বিশেষ ব্যস্ততার সহিত, বোধ হয়, তাঁহাকে Story of Satara সম্পাদন করিতে হইয়াছে। তাই তাহাতে এই সকল দোষ ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে। তিনি যদি গ্রন্থসম্পাদনকালে তাঁহার বন্ধু অধ্যাপক যদুনাথ সরকারের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন, যদি গ্রন্থখানি খ্যাতনামা প্রত্নতত্ত্ববিদ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে দেখাইয়া লইতেন, তাহা হইলে এই সকল ত্রুটি নিশ্চয়ই থাকিত না। গ্রন্থকারকে আমরা শ্রদ্ধা করি, তাঁহার বার্দ্ধক্যের এই উদ্যম প্রশংসনীয়, তিনি যখন গ্রন্থসম্পাদনের ভার অন্য লোকের হস্তে দিয়াছেন, তখনই তিনি সর্ব্বপ্রকারে দোষমুক্ত হইয়াছেন। প্রবাসী বাঙ্গালী গ্রন্থকার যে 'প্রবাসী' সম্পাদকের হাতেই এই ভার দিয়াছেন, ইহা স্বাভাবিক।

যে কারণেই হউক, বহু বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালীর মনে এই ধারণা জন্মিয়াছে যে, এ কালের বাঙ্গালীরা বিদ্যাবুদ্ধিতে সে কালের বাঙ্গালীদের গৌরব রক্ষা করিতে অসমর্থ। রামানন্দ বাবু এ কালের ছাত্র নহেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরবময় সুবর্ণযুগে তিনি প্রতিভাবান্ ছাত্র বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, তৎসম্পাদিত দশ টাকা মূল্যের গ্রন্থ কিনিয়া কোন অবাঙ্গালী পাঠক নিরাশ হইলে, সে কালের বাঙ্গালীর প্রতিও তাঁহারা আস্থা হারাইবেন; বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালীর কষ্টার্জ্জিত গৌরব আর অক্ষুণ্ণ থাকিবে না। এই জন্যই গ্রন্থখানির দোষ-ত্রুটি দেখাইতে সাহসী হইয়াছি, নতুবা জনসমাজে প্রতিষ্ঠাবান্ সম্পাদককে হেয় করিবার অসদিচ্ছা আমার নাই; কারণ, তাহাতে আমাদের উভয়ের বিশ্ববিদ্যালয়েরই অপ্রতিষ্ঠা হইবে।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন।

হাসি-কান্না

হাসিস্ যখন নিজের দুঃখে
সেই হাসি তোর ধন্য;
সেই কান্নাই সার্থক,—যা
কাঁদিস্ পরের জন্য।

শ্রীহিরন্ময় মুন্সী

বাঙ্গালার গীতিকাব্য—বৈষ্ণবকাব্য

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসে তুলনা

এইখানে এই দুই কবিশিরোমণির প্রসঙ্গ করা যাইতে পারে। কিন্তু আর একটি কথার উল্লেখ না করিলে আলোচনা অসমাপ্ত থাকিয়া যায়। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস ইঁহাদের দুই জনের মধ্যে কে বড়, মাঝে মাঝে তাহার বিচার হয়।

বাঙ্গালা সাহিত্যে এক শ্রেণীর সমালোচনার ঢং মোটেই ভাল নয়। পূর্ব্বে রসগ্রাহক হইত সমালোচকের অভ্যুদয় হয় নাই। টীকাকারেরা অত্যন্ত পরিশ্রম করিয়া মহাকবিদের কাব্যের টীকা করিতেন, ব্যাখ্যা করিতেন, পাঠকের অনেক সৌকর্য্য করিতেন। সংস্কৃতের কোন টীকাকার বা ব্যাখ্যাকার দুই জন কবির তুলনায় সমালোচনা করিতেন না। প্রথমে ত সমালোচনা করিতে শিখিয়া কোন বাঙ্গালী লেখককে কোন ইংরাজী লেখকের সমকক্ষ বলিতে পারিলেই আমরা চরিতার্থ হইতাম, যেন ইংরাজী সাহিত্যের তুল্য অথবা তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাহিত্য এই প্রাচীন পুণ্যভূমিতে কেহ কখন দেখে নাই। ইনি বাঙ্গালার সার ওয়াল্টার স্কট, উনি বাঙ্গালার মিল্টন, অমুক বাঙ্গালার বায়রণ, আর এক জন বাঙ্গালার সেকস্পীয়র, এই কথা বলিতে পারিলেই আমাদের আনন্দের ও শ্লাঘার সীমা থাকিত না। সেই এক অগৌরবের কাল গিয়াছে। বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস যে সেকস্পীয়র-মিল্টনের অপেক্ষা প্রাচীন, এ কথা কে তখন মনে করিত? অনুকরণে আর তুলনায় কি সাহিত্যের সৃষ্টি হয়? মাপের কাঠি হাতে করিয়া সমালোচনা করায় সমালোচকের আত্মতৃপ্তি হইতে পারে; কিন্তু আর কি হয়? বিশেষ পাঁচ ছয় শত বৎসর পূর্ব্বের কবিদের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এখন যে কোন সমালোচক ধুরন্ধর তাহার কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন, তাহার কোন সম্ভাবনা নাই

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি প্রাচীন কবি, দুই জনই রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন। ইঁহাদের দুই জনের সাদৃশ্য এই পর্য্যন্ত, আর কোন সাদৃশ্য নাই। দুই জনের আদর্শ স্বতন্ত্র, ভাব স্বতন্ত্র, ভাষা স্বতন্ত্র। এক জন বঙ্গবাসী, আর এক জন মিথিলাবাসী। এক জন বাঙ্গালা ভাষায় লিখিতেন, আর এক জন মিথিলা ভাষায় লিখিতেন। চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির ভাষা ও ভাব স্থানে স্থানে গ্রহণ করিয়াছেন, বিদ্যাপতি কুত্রাপি চণ্ডীদাসের কিছু গ্রহণ করেন নাই। চণ্ডীদাস প্রাচীন সংস্কৃত কবিদিগের পথ অনুসরণ করেন নাই, বিদ্যাপতি সর্ব্বত্র তাহা করিয়াছেন। এই দুই কবির তুলনায় সমালোচনা করিলে কাহারও যথার্থ সম্মান হয় না। কিন্তু চণ্ডীদাসকে বিদ্যাপতির অপেক্ষা বড় কবি প্রতিপাদন করাতে একটু নূতনত্ব আছে। বৈষ্ণব কবিগণ এই দুই কবির মধ্যে তুলনা করিতেন না, কিন্তু বন্দনাতে বিদ্যাপতিকেই শ্রেষ্ঠ করিতেন। বিদ্যাপতির বর্ণনায় পরবর্ত্তী কবি লিখিয়াছেন—

ভুবনে অছয় জত ভারতী বানী।
তাক্কর সার সার পদ সঞ্চই
বাঁধল গীত কতহুঁ পরমাণি॥

* * * *

আনন্দে নারদ ন ধরয় থেহা।
সে আনন্দ রস জগ ভরি বরিখল
বিদ্যাপতি রস সেহা॥

চণ্ডীদাস কিংবা অপর কোন কবির বন্দনায় এমন প্রশংসা নাই। বিদ্যাপতির অনুকরণে প্রাচীন ও আধুনিক অনেক কবি গীত রচনা করিয়াছেন। ইহাও এক প্রকারের বন্দনা। যাঁহারা চণ্ডীদাসকে বিদ্যাপতির অপেক্ষা উচ্চতর আসন দিতে চাহেন, তাঁহারা নূতন পথ অবলম্বন করিয়াছেন। মুরারেস্তৃতীয়ঃ পন্থাঃ! এই মত যখন প্রচারিত হয়, সে সময় এ দেশের লোক বিদ্যাপতির ভাষা ভুলিয়া গিয়াছে, বিদ্যাপতির অনেক পদও এক প্রকার লুপ্ত হইয়াছে।

ভাষা-বিস্মৃতির দৃষ্টান্ত

ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। যে কালে বিদ্যাপতির কবিতা এ দেশে আনীত হয়, সে সময় মিথিলায় ও বাঙ্গালায় খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। সম্বন্ধ গুরু ও শিষ্যের। নবদ্বীপ হইতে অনেক সদ্‌ব্রাহ্মণসন্তান মিথিলায় অধ্যয়ন করিতে যাইতেন। কুমারহট্ট, নরহট্ট (হালিসহর ও কাঁচড়াপাড়া),

ভট্টপল্লী ও অপরাপর বড় বড় গ্রাম হইতেও যাইতেন। তাঁহারা সেখানে অল্পদিনেই মিথিলা ভাষা শিখিতেন। বিদ্যাপতির পদাবলী এবং আর এক জন মৈথিল কবির পদাবলী তাঁহারাই লইয়া আসেন। কিন্তু এই সকল পদ বৈষ্ণবদের ঘরেই থাকিত, সর্ব্বসাধারণে পড়িত না। চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে মুদী, পসারী, মণি- হারী সকলে নিজের নিজের দোকানে বসিয়া সুর করিয়া কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারত পড়িত; কিন্তু কীর্ত্তন ব্যতীত বিদ্যাপতির ও চণ্ডীদাসের পদ কোথাও শুনিতে পাওয়া যাইত না। চৈতন্যদেবের পূর্ব্বে, তাঁহার অধ্যাপক বাসুদেব সার্ব্বভৌমের সময় হইতে মিথিলার সহিত বাঙ্গালার সম্বন্ধ একেবারে ঘুচিয়া গেল, তাহার পর সংকীর্ত্তনের ক্ষেত্র সংকীর্ণ হইতে লাগিল, মিথিলা ভাষা ও বিদ্যাপতির পদাবলীতে অজ্ঞতায় লিপিকরপ্রমাদ বাড়িতে লাগিল, বহুসংখ্যক পদের অর্থ বিকৃত, পাঠ অশুদ্ধ বা একেবারে অর্থশূন্য হইয়া উঠিল, বিদ্যাপতির বিরচিত শত শত পদের অস্তিত্বই লোক ভুলিয়া গেল। যাঁহারা বিদ্যা- পতিকে বাঙ্গালার আদি কবি বলিয়া বরণ করিয়া চণ্ডী- দাসের সহিত একাসনে স্থান দিয়াছেন, তাঁহারা ভাষাকে বিশেষ সৌষ্ঠবশালিনী করিয়াছেন, কিন্তু বিদ্যাপতির ভাষা বুঝিতে হইলে তাহা আবার নূতন করিয়া শিখিতে হইবে।

বিদ্যাপতির ভাষা বঙ্গদেশে প্রচলিত হওয়া অনেক কালের কথা, কিন্তু তাহার পরেও আমরা অপর ভাষা শিখিয়াছি ও বিস্মৃত হইয়াছি। ইহাতেও আমাদের অপ- রাধ নাই। কালের গতিতে আমাদের দেশে ভিন্ন ভিন্ন জাতি রাজত্ব করিয়াছে। যখন যে জাতি রাজা, তখন সেই জাতির ভাষা রাজভাষা, এবং সেই জাতির অধীন অপর জাতিকে রাজভাষা বাধ্য হইয়া শিখিতে হয়। কোন হৃষ্টপুষ্ট জীবকে কোনও সময় প্রশ্ন করা হয়, তুমি কার? উত্তর, আমি যখন যার, তখন তার। যখন আমরা মোগল পাঠানের, তখন মাথায় মোড়াসা দিতাম, অঙ্গে আবা কাবা কোব্বা ঝাব্বা ঝুলাইতাম, তাকিয়া ঠেসান দিয়া আলবো- লার সটকায় থামিয়া তামাকু টানিতাম। এখন আমরা ইংরাজ য়ুরোপীয়নের, এখন মাথায় হ্যাট পরি, অঙ্গে কাটা পোষাক আঁটি, পা ফাঁক করিয়া দাঁড়াইয়া চুরুট টানি। এখন যেমন হিজিবিজি করিয়া ইংরাজী লিখি, আমাদের পূর্ব্বপুরুষরা কিছুকাল পূর্ব্বে সেইরূপ করিয়া উর্দ্দু শিকস্তা * লিখিতেন। এখন কলমে কণ্ঠে আমরা অনর্গল ইংরাজী নিঃসারণ করি, আমাদের পিতামহ প্রপিতামহ সেইরূপ অবাধে উর্দ্দু লিখিতেন বলিতেন। এখন আমরা সেকস্- পীয়র, শেলি, বায়রণ টেনিসন আবৃত্তি করি, ইহার পূর্ব্বে আমাদের পূর্ব্বপুরুষরা শেখ সাদি, দিওয়ান হাফিজ, ফর্দ্দুসী, জলালুদ্দীন রুমী কণ্ঠস্থ করিতেন। এখন এ দেশে উর্দ্দু ভাল বলিতে বা লিখিতে কয় জন পারে? সে কালে বাঙ্গালী উর্দ্দু ভাষা কিরূপ আয়ত্ত করিতে পারিত, তাহার একটি দৃষ্টান্ত দেখাই। রামেশ্বরী সত্যনারায়ণ অথবা "শিবায়ন" গ্রন্থপ্রণেতা রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য বিরচিত সত্য- নারায়ণের পালা বিদ্যাপতির পদাবলীর তুলনায় নিতান্ত আধুনিক গ্রন্থ। সত্যনারায়ণের পালা অনুমান দুই শত বৎসর পূর্ব্বের রচনা। অক্ষয়চন্দ্র সরকার তাঁহার প্রাচীন কাব্যসংগ্রহে যে পুঁথি হইতে ঐ গ্রন্থ মুদ্রিত করেন, উহা সন ১১৬২ সালের লেখা। শুধু ভাষার কৌশলের জন্য এই গ্রন্থের উল্লেখ করিতেছি, কাব্য আলোচনা করিবার জন্য নহে। ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ কবি কেমন কৌশলের সহিত বাঙ্গালা ও উর্দ্দু মিশাইয়াছেন, দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়।—

কপটে করুণাময় দ্বিজে কয় বাওয়া।
মৈঁ খুব ফকীর হুঁ লেগা মেরা দোওয়া॥
তেঁ বাওয়া বখ্‌তাওয়র ধরম-আত্মা দেখা তুঝে।
মৈঁ ভুখা ফকীর হুঁ খিলাও কুছ মুঝে॥
তমাম দুনিঞা দেখা সবহি ইমান ছুটা।
কঁহা কোই খয়রাত ন করে এক মুঠা॥

অর্থ—করুণাময় দ্বিজ কপট করিয়া কহিলেন, বাপ, আমি ফকীর, আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর। তোমাকে ভাগ্যবান্ দাতা ধর্ম্মাত্মা দেখিতেছি, আমি ক্ষুধিত ফকীর, আমাকে কিছু খাওয়াও। সমস্ত পৃথিবী দেখিলাম, কাহারও ধর্ম্মজ্ঞান নাই, কোথাও কেহ এক মুষ্টি দান করে না।

ইহা বিশুদ্ধ উর্দ্দু ভাষা, কিন্তু এখন বঙ্গদেশে কয় জন এমন লিখিতে বা বলিতে পারে? অত্যন্ত সহজ ভাষা বলিয়া হয় ত অনেকে বুঝিতে পারে, কিন্তু তাহাও স্থানে স্থানে অসম্ভব। বখ্‌তাওয়র অর্থে ভাগ্যবান্ দাতা।

* শিকস্তা, টাকা হাতে লেখা উর্দ্দু, পাঠ করা কঠিন।

এক স্থানে আছে,—

ব্রাহ্মণীরে ইরশাদ রাখিয়া গেল ঘরে।
সদয় হইলা পীর সাধুর উদ্ধারে॥

ইরশাদ শব্দের অর্থ টীকাকার করিয়াছেন সাক্ষী। ছাপিবার কালে শব্দ হইয়াছে ইসাদ্। ইরশাদ শব্দের অর্থ আদেশ।

স্থানান্তরে,—

নহি ঠৌর মারুঙ্গা রখ্‌খেগা কওন চচ্চা।
উয়ো লোগ ভি চোর আওর তু লোগ ভি সচ্চা॥

এখানে ঠৌর শব্দের অর্থ টীকাকার করিয়াছেন ঠাওর—তোর ঠাওর নাই, অর্থাৎ কিসে কি হইল, দেখিস না। এই অর্থ সম্পূর্ণ ভুল। ঠৌর অর্থে ঠাঁই, স্থান। শ্লোকের অর্থ, নহিলে তোকে এইখানেই মারিয়া ফেলিব, কোন্ চাচা তোকে রাখিবে? ওরা সব চোর, তোরা সব সত্যবাদী সাধু?

উর্দ্দু না জানিয়া উর্দ্দু অথবা পারসী শব্দের, মিথিলা ভাষা না জানিয়া মৈথিল শব্দের অর্থ করিলে এই রকম বিড়ম্বনা হয়।

রামেশ্বর ভট্টাচার্য্যের মার্জ্জিত উর্দ্দু ভাষার আর একটু নমুনা দেখুন,—

ফকীর শরীর হয়ে সাধুর নিকট গিয়ে
জিজ্ঞাসেন কেয়া লে যাঁও বাওয়া।
আধা চিজ্ দেও মুঝে পীরকা দোহাই তুঝে
করুঙ্গা বহুত কুছ দোওয়া॥
পীরের বচন শুনে পরিহাসে কয় বেনে
কেত্তা দিন ভয়ো হো ফকীর।
কমাঞ্চি তো খুব দেখা ওয়কুফ কি নহি লেখা
করামৎ কেয়া কিও জাহীর॥
এক কৌড়ি লে যা চলা পীর কহে পায়া ভলা
ক্যা চিজ লে যাও কহো মুঝে।
শুন রঁহু কেত্তা মত্তা সাধু কহে লত্তা পত্তা
কেত্তা নাম বাতাউঙ্গা তুঝে॥
কহে সাধুর জামাই থাক লে যাতা হুঁ মৈঁ
তল্লাশ মে তেরা কওন কাম।
শুনি পীর মৌন রয় তৎক্ষণে তদ্রূপ হয়
দোঁহে যে যাহার নিল নাম॥

অর্থ,—পীর ফকীরের বেশ ধারণ করিয়া বণিকের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বাপ, কি নিয়ে যাচ্চ? অর্দ্ধেক জিনিষ আমাকে দাও, তোকে পীরের দোহাই, অনেক আশীর্ব্বাদ করব। পীরের কথা শুনিয়া বণিক পরিহাস করিয়া কহিল, ফকীর হয়েছ কত দিন? রোজগার ত খুব দেখা গেল, অভিজ্ঞতার ত সীমা নাই, কেরামত কি জাহির করেছ? একটা কড়ি নিয়ে চ'লে যা! পীর বলিল, ভাল, পেয়েছি, কি নিয়ে যাচ্ছ, আমাকে বল, কত কি শুনেই রাখি। বণিক কহিল, ন্যাকড়া কানি, কত নাম তোকে বলব? সাধুর জামাই কহিল, আমি ছাই নিয়ে যাচ্ছি, তোর সে খোঁজে কি কায? শুনিয়া পীর মৌন রহিল, কিন্তু দুই জনে যাহার নাম লইয়াছিল, তৎক্ষণাৎ তদ্রূপ হইল, অর্থাৎ নৌকার মাল কতক ন্যাকড়া কানি, বাকি ছাই হইয়া গেল।

বাঙ্গালায় আর মুসলমান রাজা নাই, বাঙ্গালীও উর্দ্দু ভুলিয়া গিয়াছে। [ক্রমশঃ।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

বাজী

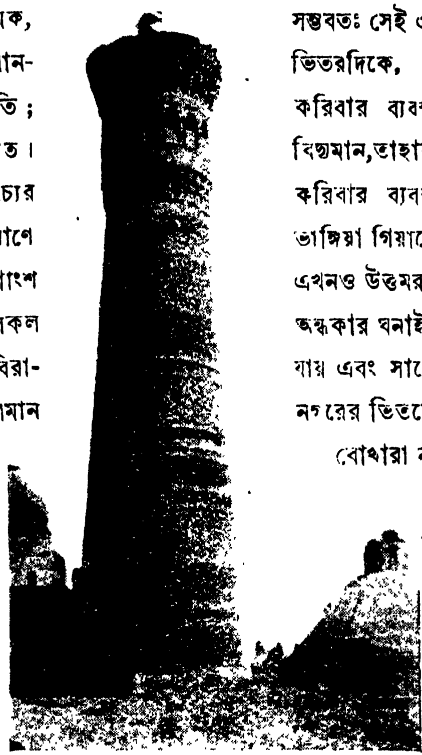
(কবীর)

প্রিয়ের সহিত খেলিতে বসেছি,
রেখেছি তাহাতে বাজী,
তনু-মন-ধন—করিয়াছি পণ
কে জেতে কে হারে আজি।

আমি হেরে গেলে হয়ে যাব তার,
সে হারিলে হ'বে মোর,
হারজিৎ দুই-ই তাহার সঙ্গে,
আমার মিলনডোর।

তুর্কীস্থানে সাধারণতন্ত্র

রুস-রাজ্যের অভ্যন্তরভাগ পরিদর্শন করিলে স্বতঃই মনে হইবে, য়ুরোপের প্রভাব অপেক্ষা তথায় এসিয়ার প্রভাব অধিক মাত্রায় বিদ্যমান। রুসিয়ার পশ্চিম তোরণ পেট্রোগ্রাড—এখানে য়ুরোপের প্রভাব প্রচুর। রাজপথ, অট্টালিকা য়ুরোপীয় স্থাপত্যশিল্পের পরিচায়ক, কিন্তু মস্কো ঠিক তাহার বিপরীত। এখানকার রাজপথ অনতিপ্রশস্ত, বক্রগতি; বাজার খোলা মাঠের উপর অবস্থিত। নগরের চারিদিকে প্রাচীর। প্রাচ্যের প্রভাব মস্কো নগরে প্রভূত পরিমাণে বিদ্যমান। রুস-রাজ্যের পূর্ব্ব ও দক্ষিণাংশ পর্য্যটন করিলেই বুঝা যায়, এই সকল স্থানে তাতার-প্রভাব অধিক মাত্রায় বিরাজিত। কাজানের একাংশে মুসলমান মসজেদসমূহ দণ্ডায়মান, অপর দিকে রুসীয় ধর্ম্মমন্দিরের হেমাভ চূড়াসমূহ আকাশপথে উত্থিত রহিয়াছে। ভলগা-নদের উভয় তীরবর্ত্তী প্রদেশে রুস-কৃষকের পার্শ্বে মঙ্গোলীয় ও তাতার-কৃষকগণের বাস।



মৃত্যুপ্রাসাদ—উচ্চ চূড়া হইতে অপরাধীকে নিম্নে নিক্ষিপ্ত করা হইত

ককেশস পর্ব্বতের সীমা অতিক্রম করিলেই এসিয়ার প্রভাবযুক্ত গ্রাম ও নগরগুলি দৃষ্টিপথে পতিত হইবে। কাস্পিয়ান হ্রদ উত্তীর্ণ হইয়া আসকাবাদ, মার্ভ প্রভৃতির মধ্য দিয়া ট্রেণ যখন ধাবিত হয়, তখন বহু প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ-নগর নয়নপথে পতিত হয়। সে সকল ধ্বংসস্তূপ অতীত কালের প্রাচীন সভ্যতার কত নিদর্শনই না বক্ষে লইয়া পড়িয়া রহিয়াছে! কারাকোরমের প্রচণ্ড মরুপ্রান্তর পার হইতে পারিলেই বোখারা নগরে উপস্থিত হওয়া যায়। পূর্ব্বে এই নগর কোনও মুসলমান আমীরের শাসনাধীন ছিল। অধুনা তথায় সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র শাসন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

প্রধান রেলপথ হইতে বোখারা ৯ মাইল দূরে অবস্থিত। অন্যান্য প্রাচ্য নগরের ন্যায় বোখারার চারিদিকে উচ্চ প্রাচীর বিদ্যমান। এই প্রাচীর বহুদিনের পুরাতন। চেঙ্গিজ খাঁ খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইহা অবরোধ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ সেই প্রাচীর এখনও বর্ত্তমান আছে। নগরের ভিতরদিকে, প্রাচীরের শীর্ষদেশে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিবার ব্যবস্থা আছে। প্রাচীরগাত্রে ছিদ্রসমূহ বিদ্যমান, তাহার মধ্যে বন্দুকের মুখ রাখিয়া গুলী বর্ষণ করিবার ব্যবস্থা আছে। প্রাচীর স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তথাপি উক্ত প্রাচীরের সাহায্যে এখনও উত্তমরূপে নগর রক্ষা করা চলে। রাত্রির অন্ধকার ঘনাইয়া আসিলেই প্রাচীর-তোরণ রুদ্ধ হইয়া যায় এবং সাঙ্কেতিক শব্দ করিতে না পারিলে কেহ নগরের ভিতরে অথবা বাহিরে যাইতে পায় না।

বোখারা নগরের জীবনপ্রবাহ তত্রত্য বাজারেই দেখিতে পাওয়া যাইবে। কয়েকটি রাজপথের ধারেই বিপণিসমূহ বিদ্যমান। বহুসংখ্যক দোকান 'খালাৎ'-পূর্ণ। এই সকল 'খালাৎ' বা পরিচ্ছদ বহু বর্ণের এবং নানা প্রকার কারুকার্য্যপূর্ণ। এই বৈচিত্র্যবহুল পরিচ্ছদ পরিতে নগরের অধিবাসীরা ভালবাসে। অধিকাংশ নরনারীই এই প্রকার পরিচ্ছদে আবৃত থাকে। যে সকল দোকানে খালাৎ পাওয়া যায়, তথায় পারস্যদেশীয় ও বোখারার প্রস্তুত কম্বলও কিনিতে পাওয়া যায়।

বাজারের এক প্রান্তে পোদ্দারের দোকান। এখানে টাকা, মোহর প্রভৃতি ভাঙ্গান হইয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন দেশের প্রচলিত মুদ্রার বিনিময়ে এখানে টাকা পাওয়া যায়। প্রতিদিনের বাজার দর অনুসারে এই বিনিময় চলিয়া থাকে। হাতে বোনা জুতা, জামা প্রভৃতি বোখারার বাজারে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। খাদ্যদ্রব্যাদিও



বোখারা-দুর্গ, ইহার অভ্যন্তরে আমীরের প্রতিষ্ঠিত কারাগৃহ বিদ্যমান

দোকানে দোকানে পাওয়া যাইবে। অসম্ভব দ্রুতগতিতে এখানকার ব্যবসা-বাণিজ্য চলে না। দৌড়ঝাঁপ, রুদ্ধ-নিশ্বাসে ইতস্ততঃ ধাবন বোখারার ব্যবসায়ি-মহলে দেখিতে পাওয়া যাইবে না। দস্তুরমাফিক ধীরতার সহিত সকল কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। স্থূলোদর, বিপুলকায় বণিকের দল পায়ের উপর পা রাখিয়া গদীতে উপবিষ্ট, বড় বড় আলবোলায় ধূমপান চলিতেছে, অথবা সুগন্ধী সবুজ চা মাঝে মাঝে পান করিয়া বণিকগণ গল্পগুজবে রত। অতিরিক্ত ব্যস্ততা কোথাও নাই। রীতিমত দরদস্তুর করার পর তবে ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হয়। প্রাচ্যের এই বিশেষত্ব বোখারায় বিদ্যমান। ক্রেতা ও বিক্রেতা যখন দর কসাকসির পর একটা মীমাংসায় উপনীত হয়, তখন পরস্পর করমর্দ্দন করিয়া থাকে। বোখারাজাত দ্রব্যাদি অত্যন্ত সুলভ। নানাবিধ ফল ও রেশম বোখারায় প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। কিন্তু কল-কারখানায় উৎপন্ন দ্রব্য এ দেশে দুর্লভ বলিলেই হয়।

উইলিয়ম্ হেন্‌রী চেম্বারলেন নামক জনৈক মার্কিণ পরিব্রাজক বোখারা সম্বন্ধে কোনও প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে, এই দেশে আসিলেই দুইটি বিষয়ে নবাগতের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে। এখানকার জলসরবরাহ ব্যাপার এবং মৃতদেহ সমাহিত করিবার প্রণালী অদ্ভুত। বোখারাবাসীরা ভূমির উপরেই মৃতদেহ রাখিয়া কর্দ্দমের দ্বারা তাহা আবৃত করিয়া দেয়। এক মৃতদেহের উপর আর একটি মৃতদেহ রক্ষিত হয়, এইরূপে একই স্থানে ৫।৬টি শব সমাহিত করা হয়। বোখারার বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট এই প্রথা রহিত করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন। এরূপ ভাবে শবদেহ সমাহিত হইলে জনসাধারণের স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হইবার সম্ভাবনা, তাই আইন করিয়া এই ব্যবস্থা বন্ধ করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। কিন্তু যাহারা প্রাচীন ব্যবস্থার পক্ষপাতী, তাহারা এইরূপ সংস্কারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

বোখারার জলসরবরাহের ব্যবস্থা চমৎকার। নগরটি মরুভূমির মধ্যস্থলে অবস্থিত। সেচের খাল কাটিয়া নগরটিকে বসবাসোপযোগী করা হইয়াছে। সমরকন্দ হইতে খাল কাটিয়া বোখারায় জল আনয়ন করা হইয়াছে। সমরকন্দ হইতে বোখারা কয়েক শত মাইল দূরে অবস্থিত। নগরের চতুর্দ্দিকে খাল, জল তাহাতে জমিয়া আছে, প্রবাহ নাই। বদ্ধ জল সময়ে সময়ে সবুজবর্ণ ধারণ করিয়া থাকে। ভিস্তীরা মশকে জল ভরিয়া বাড়ী বাড়ী সরবরাহ করে। বদ্ধ জলে ম্যালেরিয়াবাহী মশকবংশের বৃদ্ধি অতিমাত্রায় ঘটে। শুধু তাহাই নহে, অন্যান্য ভীষণ প্রকার কীটাণুও



প্রাচীরগাত্রে সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের ঘোষণালিপি আঁটিয়া দেওয়া হইতেছে, বোখারার আমীর ইহার পরেই আফগানিস্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেন

এই জলে পরিপুষ্ট হয়। জল গরম করিয়া পান না করিলে এই সকল জীবাণু মানবের শরীরে প্রবেশ করে। রুষ-গবর্ণমেণ্ট বিগত বর্ষে কতিপয় বৈজ্ঞানিককে বোখারায় পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহারা চারিদিক পরীক্ষা করিয়া যে সকল স্থানে মশক দেখিতে পাইয়াছিলেন, তথায় তৈল ঢালিয়া দিয়াছিলেন এবং জনসাধারণকে সতর্ক করিয়া দেন, যেন কেহ জল গরম না করিয়া পান না করে। কিন্তু রুস ও শিক্ষিত বোখারাবাসী ছাড়া জনসাধারণ এই সতর্কবাণীতে আদৌ কর্ণপাত করে নাই।



সমরকন্দ রাজপথের একটি দৃশ্য। তুর্কীস্থান সাধারণ-তন্ত্রের অন্তর্গত হইলেও সমরকন্দের রাজপথ ও অট্টালিকাসমূহ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর যুগকে অতিক্রম করিতে পারে নাই

নগরের মধ্যস্থলে গগনচুম্বী 'মৃত্যুপ্রাসাদ' বিদ্যমান। এই অত্যুচ্চ প্রাসাদের শিখরদেশ হইতে পূর্ব্বে অপরাধীকে নিম্নে নিক্ষিপ্ত করা হইত। এখন উহাকে তারহীন বার্ত্তার ষ্টেশনে পরিণত করা হইয়াছে। এই প্রাসাদশীর্ষে লোহিত নিশান উড্ডীয়মান। উল্লিখিত 'মৃত্যুপ্রাসাদের' সন্নিকটে ভূতপূর্ব্ব আমীরের প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে কামানের গোলার আঘাতে আমীরের প্রাসাদ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ভগ্নস্তূপের মধ্য হইতে অতি সূক্ষ্ম কারুকার্য্যসমন্বিত চমৎকার তৈজসপত্রাদির ভগ্নাংশ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দের রুসীয় বিপ্লবের পূর্ব্বে বোখারা করদ



রাষ্ট্র-বিপ্লবের পরবর্ত্তী কালের বোখারাবাসীদিগের সম্মিলন দৃশ্য

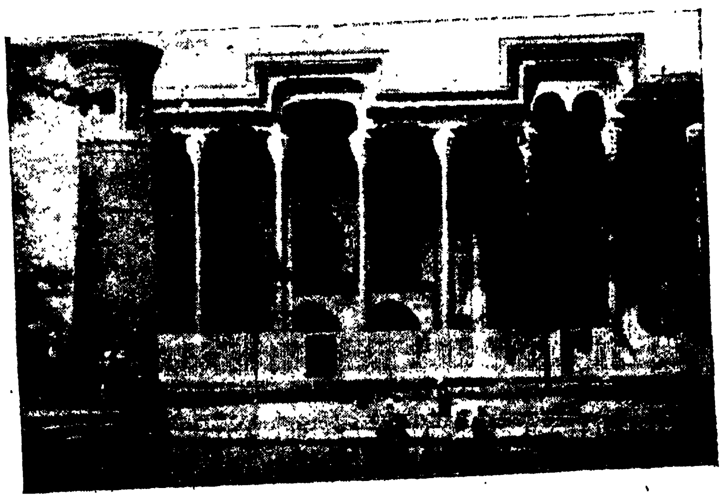


তুর্কীস্থানের বাজারের একটি দৃশ্য। সমবেত ব্যক্তিবৃন্দের মধ্যে উজবেক, কিরগিজ, মঙ্গোলীয়, ভারতীয় প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোক বিদ্যমান

ধারণা পোষণ করিত, আমীর তাহাদিগকে নির্দ্দয়ভাবে উৎপীড়ন করিয়াছিলেন। বোখারার এক স্থানে একখানি পাতর পড়িয়া আছে, মিঃ হেন্‌রী চেম্বারলেন বলেন যে, উল্লিখিত শিলার উপর ৩ হাজার বোখারাবাসীকে আমীর সন্দেহক্রমে হত্যা করিয়াছিলেন। আমীরের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া কতিপয় বোখারাবাসী নগর ত্যাগ করেন। দীর্ঘপথ পদব্রজে অতিক্রম করিয়া তাঁহারা অন্যত্র গমন করেন এবং আমীরের নিষ্ঠুর ও পৈশাচিক অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন উপস্থিত করেন। দেশের অবস্থার পরিবর্ত্তন কামনায় যে অল্পসংখ্যক বোখারাবাসী সংস্কার আন্দোলন চালাইতেছিলেন, তাঁহাদের সে আন্দোলন ব্যর্থ হয় নাই। আমীর ধর্ম্মসংক্রান্ত বিদ্যালয়কে কিছু বলিতেন না। কারণ, তথায় কোরাণ ও অন্যান্য মুসলমান

রাজ্য ছিল। ভারতবর্ষে করদ রাজ্যগুলির যেরূপ অবস্থা, বোখারাও ঠিক তদ্রূপ ছিল। পশ্চিম তুর্কীস্থানের অন্যান্য প্রদেশের বৈদেশিক সম্বন্ধ যেমন, বোখারার বৈদেশিক সম্বন্ধও ঠিক তেমনই ছিল। রুসিয়াকে না জানাইয়া অথবা রুস গবর্ণমেণ্টের অনুমোদন ব্যতীত বৈদেশিক শক্তির সহিত বোখারা গবর্ণমেণ্টের কোন প্রকার আলোচনা করিবার অধিকার ছিল না। কিন্তু আভ্যন্তরীণ শাসন-ব্যাপারে আমীরের অনেক বিষয়ে অবাধ অধিকার ছিল। তিনি যাহা করিতেন, তাহাই চরম হইত।

রাষ্ট্র-বিপ্লবের পর রুসিয়া কিছু দিনের জন্য বোখারার সহিত কোনও সম্বন্ধ রাখে নাই। এই অবকাশে তদানীন্তন আমীর আপনাকে স্বাধীন নরপতি বলিয়া প্রচার করিবার চেষ্টা করেন। বহির্জ্জগতের সহিত সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিবার অভিপ্রায়ে আমীর রেলপথের কিয়দংশ সমূলে ধ্বংস করিয়া ফেলেন। যাহারা তাঁহার কার্য্যপদ্ধতিতে প্রতিবাদ করিয়াছিল অথবা তাঁহার সম্বন্ধে প্রতিকূল



বোখারাস্থিত একটি মাদ্রাসার দৃশ্য



বোখারা বণিকসমিতির সম্মিলন দৃশ্য

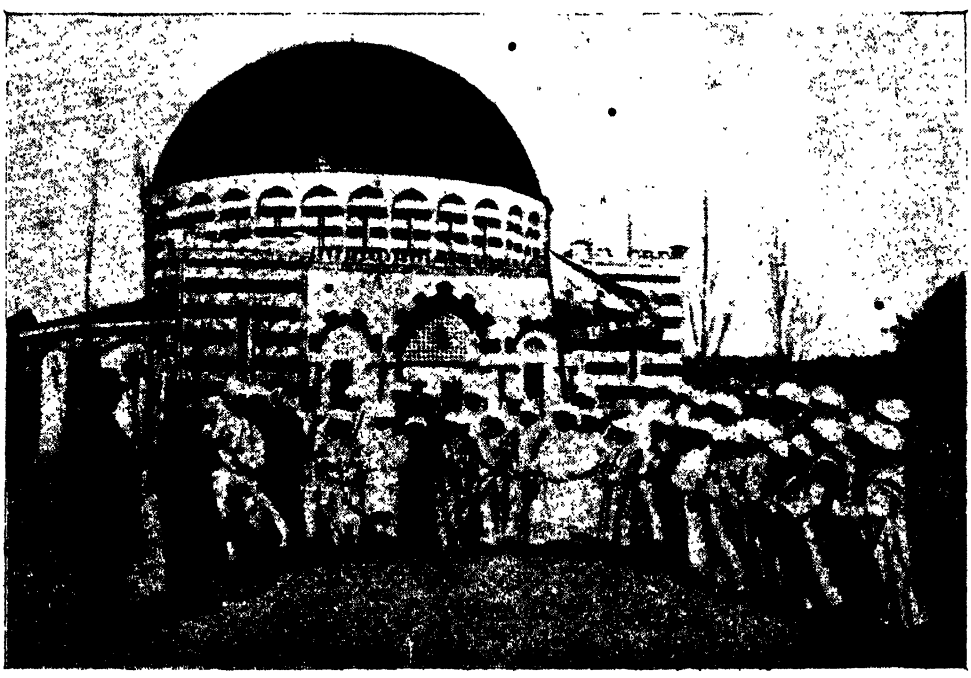
আইনসংক্রান্ত পবিত্র গ্রন্থ মাত্র পঠিত হইত। বোখারার উন্নতিকামী সংস্কারকের দল শুধু এইরূপ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সন্তুষ্ট ছিলেন না। সাধারণ শিক্ষা প্রবর্তিত করিবার জন্য তাঁহারা বিদ্যালয়সমূহের প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতেছিলেন। সংস্কারপন্থীদিগের অনেকগুলি কর্ম্মীকে আমীর ধৃত করিয়া প্রাণ বধ করেন। কতিপয় কর্ম্মী রুসরাজ্যে পলাইয়া গিয়া আত্মরক্ষা করেন। তুর্কীস্থানের সোভিয়েট কর্ত্তৃপক্ষের সেনাদল ও আগ্নেয়াস্ত্রের সাহায্যে উল্লিখিত পলাতক বোখারাবাসীরা বোখারায় বিদ্রোহবহ্নি প্রজ্বালিত করিয়া তুলেন। বোখারায় তখন বিপ্লবের ধূমায়িত বহ্নি জ্বলিয়া উঠিল এবং আমীরকে ১৯২০ খৃষ্টাব্দে বোখারার সিংহাসন হইতে বিতাড়িত হইতে হয়। সিংহাসনভ্রষ্ট আমীর উপায়ান্তর না দেখিয়া অবশেষে প্রতিবেশী মুসলমান-রাজ্য আফগানিস্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বোখারায় ইদানীং সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত আছে।

এই নব-প্রবর্ত্তিত শাসনপ্রণালীর গতি বাধাবন্ধহীন নহে। নূতন বিধানের প্রবর্ত্তনে গোঁড়া রক্ষণশীল দলের ধর্ম্মমতে প্রচণ্ড আঘাত লাগিয়াছিল। বিশেষতঃ মোল্লাগণ এত দিন যে সুবিধা ও স্বাতন্ত্র্য ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন, নব-প্রবর্ত্তিত বিধানে তাহা অনেকাংশে তিরোহিত হওয়ায় তাঁহারাই বিশেষরূপ ক্ষতিগ্রস্ত বোধ করিতেছেন। ইহা ছাড়া অর্থনীতিক সমস্যাও বোখারায় জটিল হইয়া উঠিয়াছে। সেচের খাল অনেক স্থানে জলহীন হওয়ায় বহু জিলাতে জলকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। বোখারায় প্রচুর তুলা উৎপন্ন হয়, কৃষকদিগের উহাতে বেশ উপার্জ্জনও ঘটিয়া থাকে। রুসিয়ার সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় বোখারায় তুলার বাজার অত্যন্ত মন্দা। 'বাস্‌মাচ' আন্দোলন উপলক্ষে দেশমধ্যে ঘোরতর অসন্তোষের উদ্ভব হইয়াছে। ভূতপূর্ব্ব আমীরের সভাসদ্ ও ধর্ম্মান্ধ মোল্লাগণের প্ররোচনায় এই আন্দোলন ১৯২১ ও ১৯২২ খৃষ্টাব্দে প্রচণ্ড হইয়া উঠিয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ তুর্কনেতা এন্‌ভার পাশাকে রুস গবর্ণমেণ্ট এই আন্দোলন দমন করিবার জন্য বোখারায় পাঠাইয়া দেন। রুস গবর্ণমেণ্ট ভাবিয়াছিলেন যে, এন্‌ভার পাশার প্রভাবে আন্দোলনকারিগণ শান্তভাব অবলম্বন করিবে। কিন্তু এন্‌ভার পাশার উচ্চাশা ছিল। তাঁহার সম্মান উপলক্ষে বোখারায় মৃগয়ার ব্যবস্থা ঘটে। সেই সুযোগে তিনি অতর্কিতভাবে বাস্‌মাচিদলে যোগদান করেন। তাঁহার সামরিক নেতৃত্বগুণে উল্লিখিত দলের কার্য্য দক্ষতার সহিত পরিচালিত হইতে থাকে। বোখারার পূর্ব্বভাগ শৈলমালা-বেষ্টিত, সেই দিকেই দলের কার্য্য সার্থক হইয়া উঠিতে লাগিল।

অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া রুস গবর্ণমেণ্ট আর

নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। তাঁহারা দৃঢ়তার সহিত এই অবস্থার অবসানের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সহস্র সহস্র সৈনিক বোখারায় প্রেরিত হইল। ১৯২২ খৃষ্টাব্দের নিদাঘশেষে এন্‌ভার পাশা যুদ্ধে পরাজিত হইয়া মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়েন। তদবধি বাস্‌মাচ্‌ আন্দোলন বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে।

১৯২২ খৃষ্টাব্দের বসন্তকালে এই আন্দোলন অত্যন্ত প্রচণ্ড হইয়া উঠিয়াছিল। সেই সময় আফগানিস্থানের আমীরের স্বাক্ষরিত একখানি ঘোষণালিপি মধ্য-এসিয়ার রুসরাজ্যে দেশীয়গণের মধ্যে প্রচারিত হইয়াছিল বলিয়া মিঃ চেম্বারলেন লিখিয়াছেন। তিনি বলেন, "উল্লিখিত আন্দোলনে আফগান সৈন্য প্রকাশ্যভাবে এন্‌ভার পাশার নেতৃত্বাধীনে যোগদান করিয়াছিল। বোখারা ও রুসিয়ার মনোমালিন্য এবং শত্রুতার সুযোগে আফগান সরকার সাম্রাজ্যসীমা-বৃদ্ধির আশা করিতেছিলেন। এন্‌ভারের পরাজয়ের পর আফগান সরকার এ বিষয়ে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছেন, প্রকাশ্যভাবে কোন চেষ্টা আর করিতেছেন না। কিন্তু আফগান রাজ্যের মধ্য দিয়া এখনও অস্ত্রশস্ত্র ভারে ভারে বোখারার পার্ব্বত্য প্রদেশে প্রেরিত হইতেছে, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। বাস্‌মাচিরা তথায় এখনও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। বাস্‌মাচিতে যে সকল আগ্নেয়াস্ত্র বোখারা গবর্ণমেণ্ট আটক করিয়াছেন, পরীক্ষায় প্রমাণিত হইয়াছে, ইংরাজের কারখানায় সেগুলি প্রস্তুত হইয়াছে। রুশীয় এবং বোখারার সরকার স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের সীমান্তপ্রদেশে যে সকল ইংরাজ কর্ম্মচারী আছেন, তাঁহারা এ ব্যাপারে যে সংস্রবশূন্য, এমন মনে করিবার কোনও কারণ নাই। বোখারা ও আফগানিস্থানের রাজনীতিক সম্বন্ধ এখন বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। কারণ, পূর্ব্ববর্ত্তী আফগান দূতনিবাসের সংশ্লিষ্ট কোনও ব্যক্তি বোখারার প্রেসিডেণ্টকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন বলিয়া ধরা পড়েন। দ্বিতীয়বার যখন আফগান-দূত সসৈন্যে বোখারার সীমান্তে উপনীত হয়েন, তখন বোখারা সরকার তাঁহাদিগকে রাজ্যমধ্যে প্রবেশ করিতে দেন নাই। বোখারার সোভিয়েট কর্ত্তৃপক্ষ মনে করেন যে, আফগানগণ দেশমধ্যে থাকিলে সমস্ত ব্যাপারটিকে পণ্ড করিয়া দিতে পারেন।"

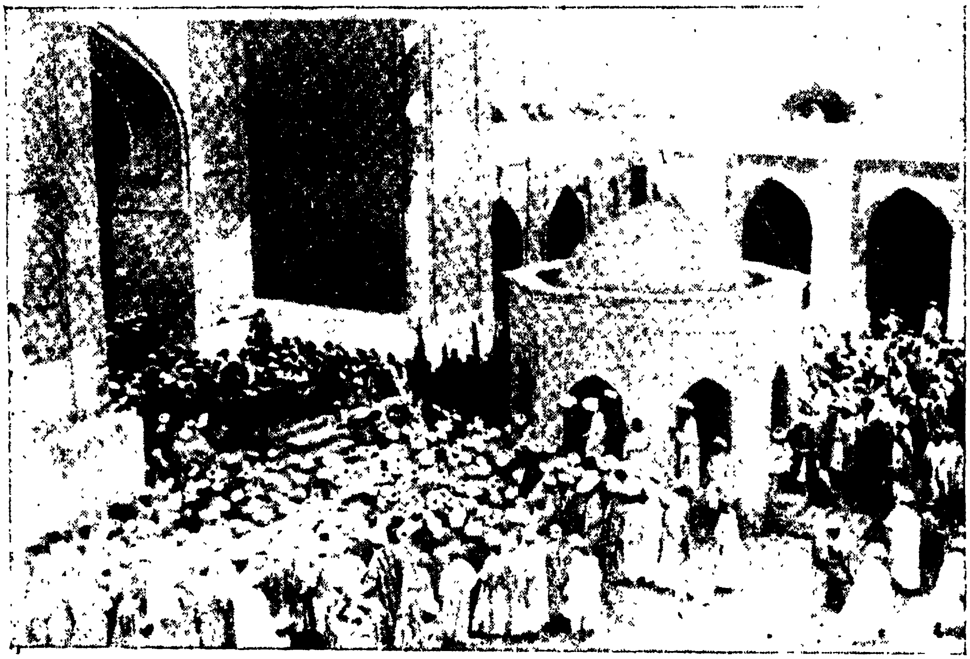


স্বদেশে নবযুগ আনিবার জন্য বোখারাবাসী ছাত্র দলে দলে জার্ম্মাণীতে অধ্যয়ন করিতে যাইতে আরম্ভ করিয়াছে। বার্লিনে তাহাদের জন্য একটি মসজেদ নির্ম্মিত হইয়াছে। সেই মসজেদের সম্মুখে বার্লিনস্থিত বোখারা ছাত্রসম্প্রদায় দণ্ডায়মান।

সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট বোখারায় প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে রাজপ্রাসাদে জীবনযাত্রার প্রণালী যেরূপ ছিল, অধুনা তাহা সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়াছে। সে সময়ের যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাহাতে বুঝা যায়, সে সময় উচ্চাদর্শের শিল্প বিদ্যমান ছিল। আমীর যে সকল প্রাসাদ ব্যবহার করিতেন,তাহার অধিকাংশই এখন পরিত্যক্ত অথবা ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। কিন্তু তথাপি তাহা দেখিলেই বুঝা যায়, প্রাচীন এসিয়ার স্থাপত্যশিল্প কিরূপ অতুলনীয় ছিল। তোরণের খিলানের বর্ণচিত্র দেখিলেই মুগ্ধ হইতে হইবে। ব্যবস্থা হইয়াছিল। আমীরও গুণমুগ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার সময়ে বোখারায় চিত্রশিল্পের উন্নতি হইয়াছিল।

বোখারার উদ্যানে অপর্য্যাপ্ত ফল উৎপন্ন হয়। রসপূর্ণ বড় বড় দ্রাক্ষা, পিচ্ ফল প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যাইবে। আমীরের দরবারের অনেকগুলি দ্রব্য বোখারার যাদুঘরে সংরক্ষিত হইয়াছে। আমীর কখন্ কি প্রকার উষ্ণীষ পরিয়া দরবার করিতেন, কি প্রকার ছোরা ও অস্ত্র ব্যবহার করিতেন, সমস্তই যাদুঘরে দেখিতে পাওয়া যাইবে।

বোখারা এখন সোভিয়েট সাধারণতন্ত্রের দ্বারা পরিচালিত



আমীরের সিংহাসনচ্যুতির পর বোখারাবাসীদিগের তৃতীয় বার্ষিক উৎসবনৃত্য

প্রাসাদগুলি কোথাও একতল বা কোথাও দ্বিতল। প্রাচীর-গাত্রে লতাপুষ্পচিত্রিত আলেখ্যগুলি যেমন মনোরম, তেমনই শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচায়ক। বোখারার শিল্পীরা প্রায়ই জড়পদার্থগুলিকেই বর্ণ ও তুলিকার সাহায্যে ফুটাইয়া তুলিতে ভালবাসিতেন। মুসলমানের আইনে জীবের চিত্র অঙ্কিত করা নিষিদ্ধ। সেই জন্যই বোখারার শিল্পীরা কোনও প্রাণীর চিত্র অঙ্কিত করেন নাই। বোখারার একটি প্রাসাদের একটি কক্ষ কাচমণ্ডিত। বাহিরের উদ্যানের প্রতিবিম্ব প্রাচীরে দেখিতে পাওয়া যাইবে বলিয়াই এই হইলেও রুস গবর্ণমেণ্ট তাহার কার্য্যপ্রণালীর প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছেন। স্বাধীন ও স্বাবলম্বী হইলেও বিপৎ-কালে বোখারাকে রুসিয়ার নিকট সামরিক সাহায্য গ্রহণ করিতেই হইবে। রাজস্বব্যাপারেও বোখারা রুসিয়ার সহায়তা না লইয়া পারিবে না। বোখারার প্রতি খরদৃষ্টি রাখিলেও রুসিয়া বোখারার শাসনপ্রণালী ও স্বাধীনতার মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলেন।

বোখারার পল্লীগ্রাম দেখিলেই বুঝা যায়, এখানে পরি-বর্ত্তন ঘটিতে পারে না—প্রাচ্যের আদর্শ ও ভাব পর্

অস্থিমজ্জায় যেন সঞ্চারিত হইয়া আছে। কূপের ধারে ছায়ার দলবদ্ধভাবে বৃদ্ধ ও মোল্লাগণ বসিয়া থাকে, অপেক্ষাকৃত তরুণগণ ক্ষেত্রে কৃষিকার্য্যে রত। তাহারা অতি প্রাচীন যুগের লাঙ্গলে বলদ জুড়িয়া প্রাচ্য আদর্শের অনুযায়ী ক্ষেত্রকর্ষণ করিতেছে। নারীরা অন্তঃপুরের অন্ধকারে আবদ্ধ। বোখারায় মুসলমানধর্ম্মের প্রভাব অত্যন্ত বেশী। সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট বোখারায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও ইস্‌লামের প্রভাব তথায় বিন্দুমাত্র খর্ব্ব হয় নাই। কমিউনিষ্ট সম্প্রদায়ের রুসগণ সকল প্রকার ধর্ম্মবিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে পারে; কিন্তু বোখারাবাসী কমিউনিষ্ট সম্প্রদায়ের কোনও ব্যক্তি কখনই ধর্ম্মবিশ্বাস পরিত্যাগ করিবে না। মিঃ উইলিয়ম চেম্বারলেন্ বোখারাবাসীদিগের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, তাহাদিগের মধ্যে ইস্‌লামের প্রভাব এমনই প্রবল যে, ধর্ম্মবিশ্বাস ত্যাগ করা তাহাদের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব।

এসিয়াজয়ী মহাবীর টাইমুর সমরকন্দবাসী ছিলেন। এইখানেই তাঁহার রাজধানী ছিল। তুর্কীস্থানের গৌরবময় যুগে সমরকন্দেই যাবতীয় স্মৃতিসৌধ নির্ম্মিত হইয়াছিল। মধ্য-এসিয়ার মুসলমান স্থপতিশিল্পের বহু নিদর্শন এখানে দেখিতে পাওয়া যাইবে। টাইমুর ও তাঁহার পরবর্ত্তী নরপতির সময়েই এইগুলি নির্ম্মিত হয়। 'সমরকন্দ বিগিস্থান' বা বাজার খুব চিত্তাকর্ষক না হইলেও এখানে তিনটি মসজেদ আছে। এই মসজেদত্রয়ে ধর্ম্মসংক্রান্ত আলোচনা হইত, এখনও ধর্ম্মপিপাসুরা এখানে ভগবদারাধনা করিয়া থাকে।

উলুগবেগ, সির-দার এবং ডিল্লাকরী নামক মসজেদত্রয় ভিন্ন ভিন্ন সময়ে নির্ম্মিত হইলেও সাধারণতঃ ইহাদের নির্ম্মাণপ্রণালীতে কোন পার্থক্য অনুভব করা যায় না।

'রত্নহারা' সমরকন্দ টাইমুরের স্মৃতিকে বক্ষে ধারণ করিয়া আছে। তাঁহারই সময়ে এসিয়া হইতে লুণ্ঠিত ধনসম্ভারে সমরকন্দ সমৃদ্ধ ও প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। টাইমুরের নাম বর্ত্তমান যুগের সাধারণ শকটচালক পর্য্যন্ত সম্ভ্রমভয়ে স্মরণ করিয়া থাকে।

সমরকন্দ নগরের প্রান্তদেশে একটি মানমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। টাইমুরের পৌত্র উলুগবেগ উহার প্রতিষ্ঠাতা। পিতামহ যে প্রকৃতির লোক ছিলেন, উলুগবেগ ঠিক তাহার বিপরীত ছিলেন। তাঁহার সময়ে ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে গণিতবিদ্ ও বৈজ্ঞানিকগণ সমরকন্দে সমবেত হইয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং বিজ্ঞানপ্রিয় ছিলেন। অধিকাংশ সময়ে তিনি গ্রহনক্ষত্রের আলোচনায় সময়ক্ষেপ করিতেন; পাঠে তাঁহার অত্যন্ত আগ্রহ ছিল। যুদ্ধবিদ্যায় চর্চ্চা করা তিনি এক প্রকার পরিত্যাগই করিয়াছিলেন। এ জন্য তাঁহার অধীন সামরিক কর্ম্মচারিগণ তাঁহার প্রতি বিরূপ হইয়া পড়েন। তিনি কতিপয় বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়ার ফল সাধারণ্যে প্রচার করেন। কোরাণের অনুবর্ত্তী নহে বলিয়া এই ব্যাপারে মোল্লাগণ তাঁহার উপর অত্যন্ত বিরূপ হইয়া পড়েন। প্রাচ্যদেশে যে রাজা ধর্ম্মগুরু এবং সেনাদলের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস হারাইয়া ফেলেন, তাঁহার পরিণাম মৃত্যু। উলুগ্‌বেগকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র হইল। তিনি নগর হইতে গোপনে পলায়ন করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহা সার্থক হইল না। আততায়ীর অস্ত্রে তাঁহার প্রাণনাশ ঘটিল। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মানমন্দির এখন ধ্বংসাবস্থায় বিদ্যমান।

তুর্কীস্থানের সোভিয়েট সাধারণতন্ত্রকে অনেক বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া রাজ্যশাসন করিতে হইতেছে। চারিদিকেই শত্রু, নগরের মধ্যে সাধারণতন্ত্রকে উচ্ছেদ করিবার জন্য নানাবিধ চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু সকল বিপদ ও বাধা অতিক্রম করিয়া অধুনা তুর্কীস্থানে সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মার্কিণ লেখক স্বয়ং সমস্ত অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া লিখিতেছেন,—"বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট বাকু ত্যাগ করিয়াছেন, বোখারা ও খিবার শাসকগণ সাধারণতন্ত্রকে পিষিয়া ফেলিবার জন্য যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, রুসীয় প্রতিনিধিদিগের সহায়তায় তাহাও ব্যর্থ হইয়াছে। বাস্‌মাচ্-অভিযানকারীদিগের দল যদিও এখনও মধ্যে মধ্যে অতর্কিতভাবে সাধারণতন্ত্রকে আক্রমণ করিতেছে, তথাপি তাহারা দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে।"



শনির দশা

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বিবাহ

নির্দ্দিষ্ট লগ্নে সন্তোষকুমারের সহিত বাসন্তীর বিবাহ হইয়া গেল। শুভদৃষ্টির সময়ে একটু গোলযোগ বাধিয়াছিল, লোকের পুনঃ পুনঃ অনুরোধেও কেহ কাহারও দিকে চাহিয়া দেখিল না। ক্রমে ক্রমে বিবাহের সমস্ত অনুষ্ঠানগুলি একে একে সম্পন্ন হইয়া গেল, পরদিন প্রভাতে অসংখ্য হুলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনির মধ্যে বাসন্তী মাতুলালয় হইতে বিদায় গ্রহণ করিল। হরিনাথ বাবু যখন তাহার হস্ত ধারণ করিয়া গাড়ীতে তুলিয়া দিলেন, সে তখন গাড়ীর বাজুতে মুখ লুকাইয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

ফুলশয্যার দিনে জ্যেঠাইমার আহ্বানসত্ত্বেও সন্তোষ যখন ভিতরে আসিতে চাহিল না, তখন তিনি নিরুপায় হইয়া সন্তোষের পিসীকে সমস্ত কথা জানাইলেন। সন্তোষের পিসী ইতিপূর্ব্বে ভ্রাতার নিকট সমস্তই শুনিয়াছিলেন, তিনি ভাইবৌয়ের মুখে সন্তোষের বিসদৃশ আচরণের কথা শুনিয়া মনে মনে তাহার উপর অত্যন্ত চটিয়া গেলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে আত্মীয় কুটুম্বের দলকে ভোজনাদি করাইয়া, সন্তোষ যেখানে শয়ন করিয়াছিল, সেই ঘরে তিনি প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, একখানি সোফার উপর যুগ্ম হস্ত বক্ষে দিয়া সন্তোষ একাগ্রচিত্তে কি ভাবিতেছিল। পিসীমা যে তাহার কক্ষে প্রবেশ করিয়াছেন, সে তাহা অনুভব করিতেই পারিল না। পিসীমা ধীরে ধীরে তাহার নিকটস্থ হইয়া হস্ত দ্বারা ললাট স্পর্শ করিতেই সে চমকিয়া উঠিল এবং একটুখানি ম্লান হাসি হাসিয়া কহিল, "পিসীমা, আপনি এখনও শোননি?"

পিসীমা একটু মৃদু নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, "আজকের এই শুভদিনে তুই বাইরে শুয়ে রইলি, আর আমরা কি নিশ্চিন্ত হয়ে শুতে পারি? চল, সে ছেলেমানুষ, একলাটি শুয়ে রয়েছে।"

সন্তোষ পিসীমার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "আজ আমার শরীরটা ভাল নেই পিসীমা, আপনারা কেউ গিয়ে শুয়ে থাকুন।"

পিসীমা একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, "তোর মত পাগল ত কোথাও দেখিনি, আজ কি আমাদের শুতে আছে, নে, এখন ওঠ, ও সব কথা রাখ, তুই ওঠ দেখি।"

সন্তোষ অনেকখানি অনুনয়ের স্বরে বলিল, "আপনার কথা আমি ঠেলতে পারব না পিসীমা, আপনি আমায় আর যেতে বল্‌বেন না।"

পিসীমা সন্তোষের কথা শুনিয়া স্থিরগম্ভীরকণ্ঠে কহিলেন, "সন্তু, লেখাপড়া শিখে যে তুই এমন বাঁদর হয়ে যাবি, তা কখনও আমরা আশা করিনি। ছি ছি, লোকের কাছে তুই আমাদের মুখ একেবারে পুড়িয়ে দিলি? যা হয়ে গেছে, তা ত আর ফিরবে না, তবে তুই কেন এমন ক'রে রয়েছিস্? চারিদিকে জ্ঞাতিগোত্র কত হাসছে বল্ দেখি? তুই এর পর যা ইচ্ছে তাই করিস্, আমি যে কদিন থাক্‌বো, সে কদিন তোকে আমার কথাগুলো শুন্‌তেই হবে।" এই বলিয়া তিনি তাহাকে উঠিতে আজ্ঞা করিলেন।

পিসীমার এ বাড়ীতে অখণ্ড প্রতাপ। ছয় সাত বৎসর অন্তর তিনি এক একবার পিতৃগৃহে আসিতেন। শিশুকাল হইতে তিনি অত্যন্ত অভিমানিনী ও আদরিণী ছিলেন; তাঁহার কথা কেউ না শুনিলে বা তাঁহাকে কেহ অবজ্ঞা করিলে তিনি তাহা সহ্য করিতে পারিতেন না। তিনি মুখে কাহাকেও কিছু বলিতেন না বটে, কিন্তু কেহ কিছু বলিলেই তিনি অত্যন্ত রোদন করিতেন। সেই জন্য যখন তিনি পিতৃগৃহে আসিতেন, সকলে তাঁহাকে সম্ভ্রম করিয়া চলিত, বড় মহাশয় অবধি তাঁহার ভয়ে অস্থির হইতেন।

সন্তোষকুমারও তাহার পিসীমাকে ভাল করিয়া চিনিত, সুতরাং পিসীমার বাক্য অবহেলা করিলে পিসীমার মনে যে বিষম ব্যথা লাগিবে, তাহা সে বুঝিতে পারিল; তথাপি তাহার অবাধ্য কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হইল, "পিসীমা, আজ আমি আপনার কথা ঠেল্‌তে পারব না, কিন্তু কা'ল থেকে আপনি আর ও বিষয়ে আমাকে কোন দিন বল্‌বেন না। আপনি আমায় ছুঁয়ে বলুন।"

"দূর পাগল, ছুঁয়ে কি কোন কথা বল্‌তে আছে, আচ্ছা, আমি আর কোন দিন তোকে কিছু বল্‌ব না।" পিসীমা মনে মনে বলিলেন, "আজ ত তুমি চল, কা'ল আর বল্‌তে হবে না। বৌমার অমন সুন্দর মুখ দেখলে কা'ল আবার ভোল বদ্‌লে যাবে। দু'পাতা ইংরাজী প'ড়ে ছোঁড়াগুলো একেবারে গোল্লায় যায়। ঐ জন্তেই বয়সের ছেলেকে একলা রাখতে নেই, এখন সব নাটক-নভেল প'ড়ে নিজেরাও নভেলের নায়ক-নায়িকা হ'তে চায়।"

সন্তোষকে লইয়া পিসীমা অন্দরে আসিতেই মেয়েরা ফুলশয্যার অনুষ্ঠানগুলি যত সম্ভব শীঘ্র সারিয়া লইল। পিসীমা সন্তোষকে শুইতে বলিয়া নিজে দরজা ভেজাইয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। তিনি চলিয়া যাইবার পর সন্তোষ একখানি শীতলপাটি মাটীতে বিছাইয়া নিজে তাহাতে শুইয়া পড়িল। বাসন্তী তখন একা খাটে শয়ন করিয়াছিল। ক্ষণপরে সে পাশ ফিরিয়া দেখিল, মাটীতে সন্তোষ শুইয়া রহিয়াছে। সে তখন ভাবিতেছিল, এ আবার কি হইল, উনি মাটীতে শুইলেন কেন? উঁহাদের বাড়ী, উঁহাদের ঘর, উনি তবে এমন করিয়া শুলেন কেন? এই ভাবিয়া সে উঠিয়া বসিল, কিন্তু ফিরিয়া দেখিল, সন্তোষ তাহার দিকে পিছন ফিরিয়া একখানি চাদর ঢাকা দিয়া শুইয়া রহিয়াছে। তখন বাসন্তী পুনরায় শুইয়া পড়িল।

পিতৃমাতৃহীনা, সংসারের অনাদৃতা, জন্মদুঃখিনী বাসন্তী যে দিন জমীদারের পুত্রবধূ হইয়া রাজপ্রাসাদতুল্য অট্টালিকায় প্রথম প্রবেশ করিয়াছিল, তখন নিজেকে সে অত্যন্ত সৌভাগ্যবতী মনে করিয়াছিল। কিন্তু ভগবান্ যাহার উপর বিরূপ হন, তাহার সুখ কোথায়? সে আশাতীতভাবে সমস্ত পাইলেও তাহাকে বঞ্চিতা হইতেই হইবে।

উৎসবের দিনগুলা খুব ভাল করিয়াই কাটিল। ক্রমে ক্রমে কুটুম্ব-কুটুম্বিনীর দল একে একে চলিয়া গেল। পিসীমারও এলাহাবাদে ফিরিবার সময় হইল। তিনি কিন্তু ভ্রাতুষ্পুত্রের ভাবগতিক দেখিয়া ভীত হইলেন। পরের মেয়েকে আপন করিতে হইলে যে কতখানি সহিষ্ণুতার প্রয়োজন হয়, তাহা হয় ত অনেকেই জানেন না। সে যখন আজন্মের পরিচিত আবাস, আত্মীয়স্বজন, পিতামাতা ইত্যাদি সকলকে পরিত্যাগ করিয়া অচেনা অজানা গৃহে আশ্রয়গ্রহণ করে, তখন কতখানি বেদনায় তাহার অন্তর ব্যথিত হইয়া উঠে, তাহা কি কেহ কখনও ভাবিয়া দেখেন? এইরূপ অবস্থায় সে যখন শ্বশুরগৃহে বাস করিতে আইসে, তখন এক জনের অকৃত্রিম স্নেহ-ভালবাসায় সে পিতৃগৃহের স্মৃতি কিছু কিছু ভুলিতে চেষ্টা করে, ভুলিয়াও যায়। কিন্তু যে দুর্ভাগিনী সেই স্নেহ-ভালবাসা হইতে বঞ্চিতা হয়, তাহাকে যে কেহ যত রকমেই সুখী করিতে চেষ্টা করুক না কেন, সুখী ত সে হয়ই না, উপরন্তু তাহার দুর্ভাগ্যের আর সীমা থাকে না। নিজের এই অনাদৃতা অবস্থা যখন তাহার স্মরণপথে উদয় হয়, তখন সেই চিন্তা কতখানি বেদনাদায়ক হইয়া উঠে,তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অপর কেহ বুঝিতে পারে না।

বাসন্তীর যদিও এই অবস্থা ঘটিয়াছিল, তথাপি তাহা অনুভব করিবার শক্তি তাহার তখনও হয় নাই। কিন্তু ভ্রাতুষ্পুত্রের অসাধারণ গাম্ভীর্য্য দেখিয়া পিসীমা মনে মনে একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় শিহরিয়া উঠিতেছিলেন। বিধাতা যদি বাসন্তীর অদৃষ্টে এমন স্বামীই লিখিয়াছিলেন, তবে তাহাকে এমনভাবে বঞ্চিতা করিলেন কেন? অদৃষ্টের এ কি নিষ্ঠুর পরিহাস! ইহার পরিণাম যে কি হইবে, তাহা কে বলিতে পারে? বাসন্তীর জীবনের যে এখন সমস্তটাই বাকী রহিল, তবে আজীবনই কি সে এইরূপভাবে কাটাইবে? এ যে মনে করিতেও পারি না।

ফুলশয্যার পরদিন হইতে সন্তোষ সেই যে নিজের পড়িবার ঘরে আশ্রয় লইয়াছে, সেখান হইতে সে আর বড় একটা বাহির হয় না; কাহারও সহিত ইচ্ছা করিয়া বড় একটা কথাও বলে না, গৃহকোণে বসিয়া সে একই ভাবে দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি কাটাইয়া দিতেছে। কেহ যদি কখনও তাহার নিকটে গিয়া বসিত, তাহাতে তাহার মুখে বিরক্তির ভাব ফুটিয়া উঠিত, ক্রমশঃ তাহার বিরক্তি উৎপাদনের ভয়ে কেহই আর তাহার নিকটে যাইতে চাহিত না। ফুলশয্যার পরদিনই সে কলিকাতায় ফিরিয়া যাইতে

চাহিয়াছিল, কেবল পিসীমার একান্ত আগ্রহে সে যাইতে পারে নাই, তিনি সন্তোষের হাত ধরিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি যে দিন যাব, তুইও সে দিন যাস্।" সেই জন্য সে আর কলিকাতায় যায় নাই।

ঘনায়মান সন্ধ্যার অন্ধকারে একটি কক্ষমধ্যে পাদচারণা করিতে করিতে সন্তোষ ভাবিতেছিল, কি করিয়া সে আবার সুষমাদের নিকট মুখ দেখাইবে? এই যে সে দিন সে দেব, দ্বিজ, অগ্নি সাক্ষী করিয়া একটি বালিকাকে গ্রহণ করিয়াছে, তাহার সুখদুঃখের অংশভাগী হইয়াছে, এখন তাহার ভবিষ্যতের জন্য দায়ী কে? পিতা না সে? সে ত তাঁহাকে আগেই বলিয়া দিয়াছিল, তিনি যখন তাহা শুনিলেন না, তখন অবশ্য তিনিই দায়ী। সুষমাই সন্তোষের জীবনের একমাত্র অধিষ্ঠাত্রী দেবী, সুষমা ছাড়া আর কেহ কখনও তাহার হৃদয়ে স্থান পাইবে না। সে পিতার এই অবিচার কখনই সহ্য করিবে না। তবে মুখে তাঁহার প্রতি সে কখনই অবজ্ঞা প্রকাশ করিতে পারিবে না। কিন্তু তিনি ইহার পরিণাম শীঘ্রই দেখিতে পাইবেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বন্ধু-সংবাদ

সন্তোষ প্রায় এক মাস কাল কলিকাতায় আসিয়াছে। কিন্তু এই এক মাস সে কলেজেও যায় নাই, বেড়াইতেও বাহির হয় নাই। সে সর্ব্বদাই ঘরের ভিতর বসিয়া থাকে, কেহ আসিলে বড় একটা কাহারও সহিত মেশে না, কথাও বলে না। তাহার ঐ রকম আচরণ দেখিয়া ক্রমে বন্ধুবান্ধব সকলেইতাহার উপর চটিয়া গিয়াছে, কেহ বড় একটা আইসে না। সে অবশ্য ইহাতে সুখী হইয়াছে, নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ বিবেচনা করিয়াছে। জনকোলাহল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া এই নির্জ্জন কারাগারের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ করিয়া সে যেন অনেকটা শান্তি পাইয়াছে।

ক্রমশঃ এই অলস দিনরাত্রিগুলা সন্তোষের যেন আর কাটিতে চাহিত না। সে দেখিল, এই ভাবে কিছু দিন বাস করিলে সে শীঘ্রই পাগল হইয়া যাইবে, কিন্তু সে কি করিবে? তাহার মন যেন তাহাকে এইখানেই আবদ্ধ থাকিতে বলে, বাহিরের কোলাহল তাহার অসহ্য বোধ হয়। কি একটা অস্বস্তি, কি একটা অতৃপ্তি, কিসের একটা বেদনা যেন সর্ব্বদাই তাহার হৃদয় দগ্ধ করিত; মনে একটা অবসাদ আনিয়া দিত। হৃদয় যেন বেদনায় অবসন্ন হইয়া পড়িত, তাহার আর কিছুই ভাল লাগিত না, কিছুতেই শান্তি পাইত না। যদি কখনও সুষমাদের সঙ্গে তাহার দেখা হয়, তখন সে কি বলিবে? সে যে নিতান্ত অনিচ্ছাতেই বিবাহ করিয়াছে, এ কথা কি তাঁহারা বিশ্বাস করিবেন? আর এ কৈফিয়তেই বা তাঁহাদের প্রয়োজন কি? সুষমা তাহাকে ভালবাসে কি না, তাহাই বা কে জানে, হয় ত সে ভুল করিয়াছে।

সন্ধ্যার অন্ধকার তখন ধীরে ধীরে কলিকাতা মহানগরীকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছিল। চতুর্দ্দিকে অসংখ্য দীপাবলী জ্বলিয়া উঠিল। সন্তোষ তখন চিন্তার হস্ত হইতে নিজেকে মুক্ত করিবার প্রয়াসে সন্ধ্যার অন্ধকারে বেড়াইতে বাহির হইল।

কিয়ৎক্ষণ এ ধার ও ধার ঘুরিয়া ফিরিয়া সন্তোষ হেদোর ধারে আসিয়া অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ করিল। সে একটুখানি বিশ্রামের জন্য সেইখানে বসিল। সেইখানে বসিবার পর অতীতের কত মধুময় স্মৃতি আসিয়া তাহার হৃদয় আলোড়িত করিতে লাগিল। চারি মাস পূর্ব্বে সে প্রায়ই সুষমাকে লইয়া তাহার ভ্রাতার সহিত বেড়াইতে আসিত, তখন কি পূর্ণানন্দেই তাহার দিনগুলি অতিবাহিত হইয়াছে! হায়! সেই দিন আর আজিকার এই দুর্দ্দিন, কত প্রভেদ, এখন যদি তাহা ফিরাইয়া আনিতে পারিত! চারিদিক হইতে অতীতের স্মৃতিগুলি যেন তাহাকে ঘিরিয়া ধরিল, নিদারুণ যন্ত্রণায় তাহার শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল, এমন সময়ে পিছন হইতে পরিচিত স্বরে কে বলিয়া উঠিল, "এ কি! সন্তোষ যে, কবে এলি?"

সন্তোষ মুখ তুলিবামাত্র অনিলকে দেখিয়া বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেল। দারুণ যন্ত্রণায় তাহার কণ্ঠ হইতে স্বর নির্গত হইতেছিল না।

অনিল সন্তোষের স্কন্ধে একখানি হাত দিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "সন্তোষ, কথা বলছিস্ না কেন ভাই? কবে দেশ থেকে এলি?"

সন্তোষ কতক্ষণ পরে কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "প্রায় তিন মাস হলো এসেছি।"

অনিল তাহার কথা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিতভাবে বলিল,

"এত দিন এসেছিস, তা ত টের পাইনি, আমাদের ওখানে যাস্‌নি কেন ভাই ?"

তখন সন্তোষ ভাবিতেছিল, কেন যাইনি, তার উত্তর সে কি দেবে ? সে কি করিয়া বলিবে যে, তোমাদের সঙ্গে তাহার সমস্ত সম্বন্ধই শেষ হইয়া গিয়াছে, সেখানে যাইবার পথ সে নিজেই রুদ্ধ করিয়া আসিয়াছে, কোন্ মুখে সে আবার ফিরিয়া যাইবে ?

সন্তোষকে নিরুত্তর দেখিয়া অনিল ব্যথিতকণ্ঠে কহিল, "এমন হয়ে গেছিস্ কেন ভাই ? তোর বিয়ে হচ্ছে শুনে কত সন্তুষ্ট হয়েছিলুম, ভেবেছিলুম, তোর একখানা চিঠি নিশ্চয়ই পাব, তাও ত তুই ভাই একটা খবরও দিলি না। কেন ভাই, তুই কি আমাদের উপর রাগ করেছিস্ ?"

দৃঢ়কণ্ঠে সন্তোষ কহিল, "তাকে কি বিয়ের মত বিয়ে বলে যে, সকলকে খবর দেব ? বাবার হুকুম ঠেল্‌তে পারিনি, তাই বিয়ে করেছি, এ ত আর যথার্থ বিয়ে নয়।"

অনিল সংশয়পূর্ণস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "সে কি ! এ কি কথা বলছিস্ ভাই ? এ কথা কি তোর মুখে শোভা পায় ? বিয়ে কখনও মিথ্যা হ'তে পারে ?"

"সকলের বিষয় ঠিক না হ'তে পারে, কিন্তু আমার বিয়ে ঠিক।"

"তুই কি পাগলামী কচ্ছিস্ সন্তোষ ?"

অসহিষ্ণুভাবে সন্তোষ কহিল, "অনিল, এ পাগলামী নয়, ইহাই ধ্রুব।"

বহুক্ষণ নীরব থাকিয়া অনিল কহিল, "সন্তোষ, কি হয়েছে, বল্ না, ওরকমভাবে কথা বল্‌ছিস্ কেন ?"

সন্তোষ একটুখানি ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "কি ভাবে কথা বলছি, তুমি কি ভাবছো, এখনও আমি মিথ্যা বল্‌ছি ?"

অনিল ক্ষুণ্ণকণ্ঠে কহিল,"আমি কি তাই বলছি ? কিন্তু বিয়েই যদি কল্লি, তবে এখন আবার এমন ধারা করছিস্ কেন ?"

সন্তোষ রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "ভুল—ভুল অনিল, এখন যা করেছি, সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত যাতে হয়, তারই চেষ্টা করছি।"

অনিল তখন ভাবিতেছিল, সন্তোষ কি যথার্থই নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহ করিয়াছে ? না মিথ্যা কথায় আমাকে ভুলাইতেছে ? আমাকে ভুলাইবারই বা তাহার প্রয়োজন কি ? ইহাতে ত এমন কোন ফল নাই। সে যাহা করিয়াছে, তাহা ত আর ফিরিবে না, তবে সে কি করিবে ? নিরপরাধা বালিকার এখন কি উপায় হইবে ? উচ্চশিক্ষিত হইয়া সন্তোষ এ কি মূর্খের মত ঘৃণিত আচরণ করিতেছে, ইহার পরিণাম কি ? তাহাকে বুঝাইলে কি সে শুনিবে ? তাহার আচার-ব্যবহারে ত তাহা বোধ হয় না, তবে এখন সে কি করিয়া তাহার সঙ্কল্প হইতে তাহাকে বিরত করিবে ? সে কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছিল না।

শীতল সান্ধ্য সমীরণ আসিয়া উভয়ের গাত্রে ব্যজন করিতেছিল। সন্তোষ ভাবিতেছিল, আহা, আমার দেহের ভিতরটাও যদি এমনই করিয়া জুড়াইয়া দিতে পারিত ! কিন্তু এ জ্বালা বুঝি জুড়াইবার নহে, সে যে নিজের হাতেই কালকূট ভক্ষণ করিয়াছে। চিরদিন তাহাকে সেই বিষের জ্বালায় জর্জ্জরিত হইতে হইবে, ইহা হইতে তাহার অব্যাহতি নাই। সহানুভূতিবিহীন জগৎ তাহার দুঃখ বুঝিবে না। বলিলেও লোকের নিকট সে ঘৃণা ভিন্ন দয়া পাইবে না। সে যে এক দিন মনের কাছে বড় দর্প করিয়া বলিয়াছিল যে, সুষমার জন্য প্রয়োজন হইলে সে পিতার ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিতেও পশ্চাৎপদ হইবে না, আজ তাহার সেই দর্প কোথায় ? দর্পহারী যে এমন ভাবে তাহার দর্প চূর্ণ করিবেন, সে দিন কি সে তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল ?

উভয়ের নীরবতা কাটাইয়া সন্তোষ কহিল, "অনিল, রাত হয়ে গেল, চল, এবার বাড়ী যাই ?"

অনিল গ্যাসের উজ্জ্বল আলোকে সন্তোষের ম্লান শুষ্ক মুখখানির দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া বলিল,"সন্তু, ভাই, বলতে যদি তোর বাধা না থাকে, তবে বল্ না ভাই, তোর কি কষ্ট ?"

অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে সন্তোষ কহিল, "অনিল, কি ক'রে বোঝাব—আমার বড় কষ্ট।"

অনিল তাহার গলদেশ বেষ্টন করিয়া গাঢ়স্বরে কহিল, "তুমি উচ্চশিক্ষিত, পুরুষমানুষ, তোমার এত অল্পে অধীর হওয়া কি উচিত হচ্ছে ভাই ?"

সন্তোষ অনিলের স্কন্ধের উপর মস্তক রক্ষা করিয়া রোদন-রুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, "অল্প নয় অনিল, এর বুঝি তুলনা—"

অনিল একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল, "ছিঃ ভাই, অমন ধারা কত্তে না। শেষে কি একটা কেলেঙ্কারী করবি ? তোর হয়েছে কি, আমায় বল্ দেখি ?"

সন্তোষ কম্পিত কণ্ঠে কহিল, "অনিল, তোমাকে যে দিন থেকে দেখছি, সে দিন থেকে বড় ভাইয়ের মতই দেখে

আসছি, কপটতা করব না। আমার কথা শুনে রাগ করো না, ছোট ভাই ব'লে ক্ষমা করো। তবে শোন অনিল, তোমার ভগিনী ব্যতীত আমার আর দ্বিতীয় স্ত্রী নেই, আমার হৃদয়ে সুষমা ভিন্ন আর কাহারও যায়গা নেই। শুন অনিল, নিজেকে অপরাধী জেনে মনের সঙ্গে অনেক যুদ্ধ করেছি, কিন্তু বশীভূত করতে পারি নি,"—সে আর বলিতে পারিল না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

পিসীমার চিঠি

রাধামাধব বাবুর দিন যেমন চলিতেছিল, তেমন ভাবেই চলিতে লাগিল। হঠাৎ কেহ তাঁহাকে দেখিলে তাঁহার মনে যে কোন অশান্তি হইয়াছে বা কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা ধরিতে পারিত না। তিনি প্রত্যহ সন্ধ্যাহ্নিক করিয়া কর্ত্তব্য কার্য্য সমস্তই সম্পন্ন করিতেন। মধ্যাহ্নে অন্তঃপুরে ভোজন করিতে বসিতেন। বাসন্তীকে তিনি নিজের নিকট বসাইয়া আহার করাইতেন। এক দিন বাসন্তী ইহাতে আপত্তি করিলে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন, তদবধি বাসন্তীর আহারের স্থান রাধামাধব বাবুর পার্শ্বেই হইত।

বসু মহাশয় সমস্তই নীরবে সহ্য করিতেন। কেবল দীনা, মলিনা, বেদনাক্লিষ্টা বাসন্তী যখন তাঁহার দৃষ্টিপথে আসিয়া দাঁড়াইত, তখন ভাষাতীত মানসিক যন্ত্রণায় তাঁহার অন্তর দগ্ধ হইয়া যাইত। বাসন্তীর সুখ-দুঃখের তিনিই যে একমাত্র কারণ, তাহা তিনি খুবই বুঝিতেন। অবাধ্য উচ্ছৃঙ্খল পুত্রকে শাসন করিতে গিয়া তিনি এ কি করিলেন! তিনি দেখিতেন, বাসন্তীর মুখখানিতে সর্ব্বদাই বিষাদের ছায়া মাখা; নীলেন্দীবর তুল্য নয়নযুগলে সুস্পষ্ট কালীর রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি তাহার ম্লান শুষ্ক মুখখানির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ভাবিতেন, মামীমার কঠোর শাসনে নিষ্পীড়িত হইয়াও সে দিন প্রদীপের ক্ষীণ আলোকে বাসন্তীর মুখখানি এত ম্লান ত দেখায় নাই। অনুশোচনায় তাঁহার হৃদয় ভরিয়া উঠিত। সেই মুহূর্ত্তেই তিনি হৃদয়ঙ্গম করিতেন যে, না বুঝিয়া ক্রোধের তাড়নায় জ্ঞানহারা হইয়া পুত্রবধুর কি সর্ব্বনাশই করিয়াছেন, তাহার প্রতীকার করিবার আর বুঝি কোন উপায়ই নাই।

বাসন্তী যথাসম্ভব শ্বশুরের নিকট নিজের মানসিক অবস্থা গোপন রাখিতে চেষ্টা করিত। কারণ, সে বিবাহের সময়ে নিতান্ত বালিকা ছিল না, ক্রমে দিনের পর দিন বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার জ্ঞানেরও বৃদ্ধি হইতেছিল, সুতরাং নিজের এই অবস্থা বুঝিতে তাহার আর বাকী ছিল না। পাছে শ্বশুরের মনে আঘাত লাগে; সেই জন্য সে কোন রকমে তাঁহাকে তাহার মনের ভাব জানিতে দিত না। তাহার স্বামীর ব্যবহার যে তাঁহার বক্ষে শেলের ন্যায় বিদ্ধ হইয়াছে, তাহা বুদ্ধিমতী বাসন্তী ভালরূপেই বুঝিয়াছিল।

সন্তোষ বিবাহের পর পিসীমার সঙ্গে সেই যে কলিকাতায় গিয়াছে, আর ফিরিয়া আইসে নাই। পুত্রের এই বিসদৃশ আচরণে বসু মহাশয় অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়াছেন। তিনি অত্যন্ত ধৈর্য্যশালী পুরুষ বলিয়া বাহিরের অপর কেহ এখনও তাঁহার অশান্তির বিষয় ঘুণাক্ষরেও বুঝিতে পারে নাই। বাহিরের লোকে যে তাঁহার বংশের কথা লইয়া যথাতথা আলোচনা করিবে, ইহা তিনি সহ্য করিতে পারিবেন না। কিন্তু পুত্রের এই আচরণ যে ক্রমে জ্ঞাতি-গোত্র বুঝিতে পারিবে, সেই ভাবিয়া তিনি অত্যন্ত কষ্ট পাইতেন। সুন্দরী বাসন্তী যে কি কারণ পুত্রের অমনোনীত হইল, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। অনাদি বাবুর কন্যা কি বাসন্তী অপেক্ষা সুন্দরী? সে অবশ্য গুণশালিনী হইতে পারে, কিন্তু বাসন্তীকে যে কেহ ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারে, ইহা তাঁহার ধারণার অতীত। বাসন্তীর অনাড়ম্বর মলিন সাজসজ্জা আর ম্লানতর মুখখানি দেখিলেই তিনি বুঝিতে পারিতেন যে, অতুল ঐশ্বর্য্যের মধ্যে আসিয়াও বাসন্তী সুখী হইতে পারে নাই। নিজের অমার্জ্জনীয় নির্ব্বুদ্ধিতাকে সহস্রবার ধিক্কার দিয়া মর্ম্মন্তুদ যন্ত্রণায় বৃদ্ধ অস্থির হইয়া উঠিতেন। তখন তিনি ভাবিতেন, কেন বাসন্তী তাঁহার নয়নপথে আসিয়াছিল, তাহা না হইলে হয় ত বাসন্তীর ভাগ্য ভিন্নপথে প্রবাহিত হইত। হয় ত সে সুখী হইতে পারিত।

সে দিন প্রাতঃকালে বসু মহাশয় বসিয়া ধূমপান করিতেছিলেন। পার্শ্বে দেওয়ান সদাশিব বসিয়া তাঁহার সহিত কথা বলিতেছিলেন। একটা পদ্মার চর লইয়া চৌধুরীদের সঙ্গে বসু মহাশয়ের বিবাদ চলিতেছিল; তাহারই জন্য কোথায় কি করিতে হইবে, তাহারই পরামর্শ হইতেছিল।

বসু মহাশয় কহিলেন, "দেখ সদাশিব, আমিই বিষয় ক'রে গেলাম, ছেলের যে রকম মতিবুদ্ধি, সে যে রাখতে পারে, এমন বোধ হয় না। তোমার এতে কি বোধ হয়?"

দেওয়ান কহিলেন, "তাকে ছোট থেকে মানুষ করেছি, আপনার এখন তার উপর রাগ হয়েছে, আপনি তাই এ রকম বল্‌ছেন। সন্তু আমাদের সে রকম ছেলে নয়, এর পর দেখবেন।"

বসু মহাশয় একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, "তা কি বলা যায়, সদাশিব, তার ব্যাভার দেখে ত কোন ভরসাই হয় না।"

"সে কি এতে সুখী হয়েছে মনে করেন? সে এখন না বুঝলেও পরে বুঝবে। তখন হয় ত অনুতাপে আপনার নিকট ক্ষমা চাইতে আস্‌বে।"

"আমি যদি তখন না বাঁচি?"

"সে অবশ্য আলাদা কথা।"

এমন সময়ে দরোয়ান চিঠিপত্র লইয়া, বাবুর নিকট রাখিয়া চলিয়া গেল। দেওয়ান সদাশিব কহিলেন, "আমি তা হ'লে ও দিকটা একবার ঘুরে আসি। দীনু মোড়ল আজ পাঁচ বছর খাজনা বাকী রেখেছে, আজ তার দেবার কথা ছিল। একবার কাশীনাথকে পাঠিয়ে দিয়ে আসি।"

বসু মহাশয় কহিলেন, "সে বেটার নামে নালিশ ক'রে দাও না। সে যদি অপারগ হ'ত, তা হ'লে আমি ছেড়ে দিতাম, তা ত নয়, বেটা মদ খেয়ে বড়মানুষী ক'রে বেড়াচ্ছে, আর খাজনা দেবার সময়ই তার টাকা থাকে না।"

"সে ত আজ কবচ্ছরই এই রকম কচ্ছে।" এই বলিয়া দেওয়ান বাহির হইয়া গেলেন।

বসু মহাশয় চিঠিগুলি একে একে পড়িতে লাগিলেন; শেষের একখানি চিঠি খুলিয়া পড়িতে পড়িতে তাঁহার মুখ লাল হইয়া উঠিল, তিনি পত্রখানি হাতে করিয়া কিছুক্ষণের জন্য অন্যমনস্ক হইয়া রহিলেন। চিঠিখানি এলাহাবাদ হইতে সন্তোষের পিসীমা লিখিয়াছেন।

"শ্রীচরণকমলেষু,

দাদা, আমি বিশেষ কারণে আপনাকে পত্র লিখিতেছি। আশা করি, আমি যাহা লিখিব, আপনি তাহাতে দুঃখিত হইবেন না। আমি সেখান হইতে আসিয়া কলিকাতায় আমার একটি আত্মীয়ের নিকট হইতে সম্প্রতি সন্তোষের বিষয়ে একখানি পত্র পাইয়া অত্যন্ত চিন্তিত হইয়াছি। আমি সেখানে থাকাকালীন উহার মতিগতি যে ভাল নয়, তাহা বুঝিয়াছিলাম। ফুলশয্যার দিন অনেক অনুনয়-বিনয়ের পর শেষে আমি রাগান্বিত হওয়ায় সে গৃহে শয়ন করিয়াছিল এবং সেই রাত্রে আমায় প্রতিজ্ঞা করাইয়াছিল যে, আর কোন দিন তাহাকে বধূমাতার নিকট শয়ন করিতে না বলা হয়।

"আমার যতদূর বিশ্বাস, উহাকে কলিকাতা হইতে না সরাইলে বধূমাতার ভবিষ্যৎ বড়ই খারাপ। কিন্তু সন্তুর উপর শাসন করিলে ফল আরও খারাপ হইবে। আপনি জ্ঞানী, আপনাকে উপদেশ দেওয়া আমার ধৃষ্টতা। সন্তুকে নিকটে আনাইয়া তাহাকে ভাল কথায় বুঝাইয়া দিন যে, ব্রাহ্ম এবং বিলাত-প্রত্যাগতের কন্যার সহিত বিবাহ করা আমাদের হিন্দুধর্ম্মে অসঙ্গত। আমার আত্মীয় লিখিয়াছেন, সে আজকাল কলেজে ত যায়ই না, উপরন্তু গৃহ হইতেও বাহির হয় না। যাহাতে তাহার সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল হয়, তাহাই করিবেন। সন্তোষকে এখন যাহাতে উহাদের সম্পর্ক ত্যাগ করাইতে পারেন, সে বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা একান্ত প্রয়োজন। সে এখনও বালক, নিজের ভবিষ্যৎবিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। শেষে কি সে পুনরায় বিবাহ করিয়া সমাজের নিকট আপনার উঁচু মাথা হেঁট করাইবে? অধিক আর কি লিখিব। আপনি, বৌদিদি আমার প্রণাম জানিবেন; বধূমাতাকে আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ দিবেন। সন্তোষের বিষয় কি হয়, আমায় পরে জানাইবেন। আমি তাহার জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত রহিলাম, এ বিষয় অধিক লেখা বাহুল্যমাত্র। বধূমাতাকে বলিবেন, তাহার চিঠির উত্তর শীঘ্র দিব। ইতি—

আপনার স্নেহের মহামায়া।"

বসু মহাশয় ভগিনীর পত্রখানি পাঠ করিয়া যে কি করিবেন, কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না। কিয়ৎক্ষণ মুহ্যমান অবস্থায় থাকিয়া তিনি ভাবিয়া দেখিলেন, সন্তোষকে টেলিগ্রাম করিয়া আনাইয়া বুঝাইয়া দেখা যাউক, সে কি বলে। তিনি খানসামাকে একখানি টেলিগ্রামের ফরম্ আনিতে আদেশ করিলেন। ফরম্ আসিলে তিনি সন্তোষকে দেশে আসিতে তার করিয়া দিলেন। [ক্রমশঃ।

শ্রীমতী কাঞ্চনমালা দেবী।

গৃহস্থ-দর্শন

২

(আভাসে—প্রশ্নোত্তর)

গৃহস্থ-দর্শনের আভাস বারান্তরে প্রদত্ত হইয়াছে। সেই আভাসে কতিপয় প্রশ্ন উপস্থিত, এবারে সেই সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদত্ত হইতেছে।

প্রশ্ন

১। "ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ-এই চতুর্ব্বর্গ।" প্রথমে ধর্ম্মের নির্দ্দেশ, অন্তে মোক্ষের নির্দ্দেশ, এরূপ হইবার কারণ কি? অর্থ, কাম, ধর্ম্ম, মোক্ষ এইরূপ নির্দ্দেশই ত সঙ্গত, ধর্ম্মের সহিত মোক্ষের অনেকটা সম্বন্ধ আছে, অর্থ কাম ত ঠিক বিপরীত, বিপরীত দুটিকে ধর্ম্মের উপরে ও মোক্ষের ঘা ঘেঁসিয়া বসাইয়া দেওয়া বিসদৃশ নহে কি?

২। ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী এই চতুরাশ্রমীরই 'মোক্ষ' গৃহস্থ-দর্শনে কথিত হইয়াছে, কিন্তু সন্ন্যাসেই মোক্ষ হয়, ইহা বেদান্ত-প্রসিদ্ধ, সুতরাং আশ্রমী মাত্রেরই যে মোক্ষ হয়, তাহার প্রমাণ কি? সন্ন্যাসে মোক্ষ, এই বেদান্তমতের অভিপ্রায় কি?

৩। 'সে ধর্ম্ম কি,—সত্যই সেই ধর্ম্ম' ন্যায়শাস্ত্র সত্য দেখাইয়াছেন, ইহার প্রমাণ কি?

৪। 'পাতঞ্জল ব্রহ্মচর্য্য, কপিলমত বানপ্রস্থ ও ব্যাসমতের শাঙ্করশাখা সন্ন্যাস'—এই উক্তির বিস্তৃত ব্যাখ্যা কি হয় না?

এই চারিটি প্রশ্নের উত্তর যথাক্রমে প্রদত্ত হইতেছে—

১। ধর্ম্মই মনুষ্যকে অন্য প্রাণী হইতে পৃথক্ শ্রেণীতে উন্নীত করিয়াছে, অর্থ ও কাম পশুপক্ষীরও আছে, পশুর অরণ্য, গিরিগুহা; পক্ষীর নীড়। পশুর আহার্য্য তৃণশস্য, জীব-জন্তু। পক্ষীর আহার্য্য—শস্যকণ, কীটপতঙ্গ এ সমস্তই অর্থ, মনুষ্যের যেমন সৌধ-হর্ম্ম্য অর্থ, মনুষ্যের যেমন দুগ্ধপ্রদা ধেনু, শস্যপ্রসবিনী ভূমি অর্থ, পশুপক্ষীর বাসস্থান এবং আহারোপযোগী বস্তুও সেইরূপ অর্থ। যে কামরাগে মানুষ উন্মত্ত, যাহা উৎকৃষ্ট সুখসাধন বলিয়া বহু মানব বিবেচনা করে, সে কামরাগ পশুপক্ষীরও আছে, সেই পুরুষার্থসিদ্ধির উৎকট আবেশে মনুষ্য যেমন কৃত্রিম বেশভূষায় পারিপাট্য সৃষ্টি করিয়াছে, পশুপক্ষীও প্রকৃতির সাহায্যে সহজাত সৌন্দর্য্যের অধিকারী হয়। ইহা আর 'টুলো' পণ্ডিতের কথা নহে, ইহা এখন প্রাণিতত্ত্ববিৎ প্রতীচ্য মনীষিগণের সিদ্ধান্ত; অতএব অর্থকাম যে সর্ব্বজীবের পুরুষার্থ, এ কথা নির্ব্বিবাদে বলা যায়। অদৃশ্য ক্ষুদ্রতম কীটেরও আহার আছে, বংশবৃদ্ধি আছে, স্বাস্থ্য আছে, রোগ আছে; সুতরাং অর্থকামের অধিকার হইতে তাহারাও বঞ্চিত নহে। এরূপ অর্থকাম সাধারণ মনুষ্যেও আছে। এই অর্থকামের তাড়নাই প্রতীচ্য মানবকে কর্ম্মনিমগ্ন করিয়াছে, এই অর্থকামের উত্তেজনাই প্রতীচ্য মানবের সভ্যতা, শিল্প, বিজ্ঞান ও অভ্যুদয়ের হেতু। আমাদিগের দেশজাত উন্নত মানবের বংশধরগণ আপনাদিগের চিরন্তন শ্রেষ্ঠভাব হইতে অধোদিকে ধাবিত—প্রতীচ্য মানবের অপূর্ব্ব শিক্ষাপ্রবাহ মানবত্বের উচ্চ সোপান হইতে নিম্নে নিক্ষিপ্ত। উন্নত মানব অর্থকামকে প্রথম গ্রাহ্য বলিয়া মনে করিবেন না, ধর্ম্মের আলোক হস্তে লইয়া অর্থকাম দর্শন ও গ্রহণ করিবেন, এই জন্যই ধর্ম্মের নির্দ্দেশ প্রথমে, এই উভয়ের সূচনা ('আভাস') প্রবন্ধেই আছে। অর্থকামের সেবা সাধারণতঃ ধ্বংসের কারণ, কিন্তু যেরূপ অর্থকামসেবা ধ্বংসের হেতু না হইয়া অভ্যুদয়ের হেতু হয়—ধর্ম্মও তাহা শিক্ষা দিয়া থাকেন। সর্ব্বজীবজন্তুর মধ্যে অহরহঃ সংগ্রাম চলিয়াছে, অহরহঃ সংহারলীলা অভিনীত হইতেছে, এ পৃথিবী হইতে কত প্রাণী চিরতরে বিলুপ্ত হইয়াছে, কত মানবজাতি একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে, অর্থকামের অবিবেচনা বা অসংযমই তাহার সর্ব্বপ্রধান কারণ। শান্তিময় ধর্ম্মই সেই অর্থকামের নিয়ন্তা। যে মানব সেই ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া অর্থকাম সেবা করিবেন, তিনি উন্নত, তাঁহার জাতি অমর—সনাতন আমরা সৌভাগ্যক্রমে সেই সনাতন জাতির ক্রোড়ে স্থান পাইয়াছি, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা ধর্ম্মশিক্ষা ভুলিতেছি। অগ্রে জীবন, পরে ধর্ম্ম নহে, অগ্রে ধর্ম্ম, পরে জীবন। পিতার ধর্ম্মভাব উন্নত না হইলে পুত্রে তাহার স্ফুরণ হয় না। পিতার ধর্ম্মভাব উন্নত না হইলে পুত্রের

জীবনও নৈরাশ্যসঙ্কুল হয়, অর্থ-কামের সমস্তাতে অনিয়ন্ত্রিত ও বিশৃঙ্খল হয়। সেই জন্যই ধর্ম্মের স্থান প্রথম। কিন্তু প্রকৃতির একটা স্বাভাবিক গতি আছে, প্রাকৃত জীব যাহার অধীন না হইয়া থাকিতে পারে না; অর্থকাম সেই স্বাভাবিক গতির একটা বিকাশ—তাহাকে একেবারে পরিহার করা যায় না; কিন্তু নিয়ন্ত্রিত করা যায়। গভীর খাতে জল প্রবাহিত হইলে তাহা নদীর আকার ধারণ করে, নদীর তীর মনুষ্যবাসের বিশেষ উপযোগী, কিন্তু জলস্রোত যদি খাতগামী না হয়, যদি সমতল ভূমিতে প্রবাহিত হয়, তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ; গৃহদ্বার, ক্ষেত্র, উদ্যান, সমস্তই জলস্রোতে নিমগ্ন, ধন-ধান্য গো-বৎসাদিসহ মানবগণ সেই স্রোতে ধ্বংসপুরে নীত হয়। এক দিকে ধর্ম্মের পাষাণ-প্রাকার, অন্য দিকে মোক্ষের উত্তুঙ্গ শৈলমালা, কাযেই অর্থ-কামের উচ্ছলিত প্রবাহ সেই খাতবৎ নিজ সীমা-মধ্যকে আর অতিক্রম করিতে পারে না। সুতরাং অর্থ-কামের প্রবাহ-সংপ্লব নিয়ন্ত্রিত পথে ধাবিত, তাহার উদ্দাম-গতি সমীপস্থের সর্ব্বনাশসাধনে ত সমর্থ নহেই, বরং নদী যেমন তীরবাসীর কল্যাণকারিণী, এই নিয়ন্ত্রিত-গতি অর্থ-কাম দ্বারাও সেইরূপ কল্যাণকারিণী হইয়া থাকে। অর্থ-কামের পরিচয়ে তাহার স্বরূপজ্ঞান হইলে ধর্ম্মবিশুদ্ধ অন্তঃকরণে অর্থের নশ্বরতা, কামভোগের ক্ষণিকত্ব, তৎসাধনে দুঃখ এই সকল দোষ অবিলম্বে পরিস্ফুরিত হয়, এই দোষ-দর্শন বৈরাগ্যের হেতু, এই বৈরাগ্যেই মোক্ষের বীজ নিহিত।

ধর্ম্ম-নিয়ন্ত্রিত অর্থ-কাম মোক্ষের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ-যুক্ত। এক ব্রহ্মচারী ব্যতীত আর সকল আশ্রমীই—ক্রম-সন্ন্যাস ব্যবস্থায় অর্থ-কামের সহায়তায় মোক্ষে উপনীত হন, অর্থ-কামে দোষদর্শন ও ভোগতৃষ্ণার উপশম না হইলে মোক্ষ দুর্ঘট, সেই জন্য অর্থ-কামকে মোক্ষের নিকটেই স্থান দেওয়া হইয়াছে। যাহা বাস্তব সত্য—তাহাই এই বিন্যাসচিত্রে প্রদর্শিত। যে অর্থ ও যে কামের মূলে ধর্ম্ম নাই, তাহার সহিত মোক্ষের কোন সম্বন্ধ নাই, তাহা নরকের পন্থা—নরকের নিগড়-বন্ধনের অস্ত্ররজ; ইহা হৃদয়-ঙ্গম করাইবার পক্ষে প্রথমে ধর্ম্মের নির্দ্দেশ প্রকৃতই সুসঙ্গত; এই ধর্ম্মের স্নিগ্ধ সলিলসেক অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই তিনের মূলেই হইয়া থাকে। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই ক্রম-বিন্যাসের ইহাই নিগূঢ় তাৎপর্য্য।

২। প্রথম তিন আশ্রমে যাঁহার সিদ্ধিলাভ না হয়, চতুর্থ আশ্রম বা সন্ন্যাসের অপেক্ষা তাঁহাদিগকে করিতে হয়, তাঁহাদের প্রথম তিন আশ্রমে সাধনাভ্যাস, সন্ন্যাসে সিদ্ধি। মোক্ষের জন্য সন্ন্যাসের অপেক্ষার ইহাই হেতু। কিন্তু সন্ন্যাসেও সিদ্ধি সকলের ভাগ্যে ঘটে না। সিদ্ধি ত পরের কথা, সন্ন্যাসীর অধঃপতনও বেদান্তসূত্রে স্বীকৃত। পক্ষান্তরে, সকল আশ্রমেই যে মোক্ষ হইতে পারে—তাহার একটি প্রমাণ—

"বেদশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞো যত্র তত্রাশ্রমে বসন্।
ইহৈব লোকে তিষ্ঠন্ স ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥"

(মনু ১২শ অঃ ১০২)

বেদশাস্ত্রের অর্থে যথার্থভাবে যিনি অভিজ্ঞ, তিনি যে আশ্রমেই অবস্থিত হউন না, তিনি ইহলোকেই ব্রহ্মভাব-প্রাপ্ত—অর্থাৎ জীবন্মুক্ত। কেবল এই একটি প্রমাণ নহে—আরও আছে; ব্রহ্মচর্য্যের উপসংহার শ্লোকে এই—

"এবং চরতি যো বিপ্রো ব্রহ্মচর্য্যমবিপ্লুতঃ।
স গচ্ছত্যুত্তমং স্থানং ন চেহ জায়তে পুনঃ॥"

(মনু ২ অঃ ২৪)

যে ব্রাহ্মণ যথোপদিষ্ট ব্রহ্মচর্য্য অস্খলিত অবস্থায় পালন করেন, তাঁহার উত্তম গতি হয় ও পুনর্জ্জন্ম হয় না। এই যে অপুনর্জ্জন্ম, ইহাই মোক্ষ। মোক্ষ ব্যতীত আর যে কোনই গতি হউক, তাহাতে পুনর্জ্জন্ম হয়।

গৃহস্থ-ধর্ম্মোপদেশের শেষে শ্লোক এই—

"অনেন বিপ্রো বৃত্তেন বর্ত্তয়ন্ বেদশাস্ত্রবিৎ।
ব্যপেতকল্মষো নিত্যং ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥"

(মনু ৪ অঃ ৪)

বেদশাস্ত্রবিৎ ব্রাহ্মণ যথোপদিষ্ট আচারাদি পালন করিলে নিষ্পাপ হইয়া ব্রহ্মলোকে যে উৎকর্ষ প্রাপ্ত হন, তাহা নিত্য অর্থাৎ অক্ষয়। কুল্লূকভট্ট 'ব্রহ্মলোক' শব্দের অর্থ করিয়াছেন—"ব্রহ্মৈব লোকঃ" ব্রহ্মই লোক অর্থাৎ আশ্রয়স্বরূপ, ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বাপেক্ষা উৎকর্ষ লাভ করেন, ইহাই কুল্লূক-টীকার তাৎপর্য্য। আমি যে উপরে বাঙ্গালা অর্থ দিয়াছি, তাহাতে 'ব্রহ্মলোকে' এ কথাটি অবিকল রাখিয়াছি। 'ব্রহ্মলোক' শব্দে যদি ব্রহ্মার লোক এই অর্থ কেহ মনে করেন, তাহাতেও ক্ষতি নাই। ব্রহ্মলোকে যে উৎকর্ষ নিত্য অর্থাৎ অক্ষয়, তাহা মোক্ষাবস্থা ব্যতীত

আর কিছু নহে—অন্য কোন উৎকর্ষ 'নিত্য' হয় না; তাহা অনিত্য—নশ্বর। এই জন্য অন্যত্র আছে 'গৃহস্থোঽপি হি মুচ্যতে।' বানপ্রস্থের উপসংহারে আছে—

"আসাং মহর্ষিচর্য্যাণাং ত্যক্ত্বান্যতময়া তনুম্।
বীতশোকভয়ো বিপ্রো ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥"

(মনু ৬ অঃ ৩২)

যথোক্ত মহর্ষিচর্য্যাগুলির যে কোন একটি অবলম্বন করিয়া দেহত্যাগ করিতে পারিলে ব্রাহ্মণ শোকশূন্য ও অভয় প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে উৎকর্ষ প্রাপ্ত হন।

ব্রহ্মলোক—কুল্লুকভট্টমতে ব্রহ্মস্বরূপ, এই স্বরূপলাভই মোক্ষ। আর যদি ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি হয়, তাহা ত মোক্ষের পূর্ব্বাবস্থা—সেই স্থান হইতেই তাহার মোক্ষ, এইজন্যই মূলে আছে 'বীতশোকভয়ঃ', এই অশোক ও অভয়প্রাপ্তিই মোক্ষ—'অভয়ং বৈ জনক প্রাপ্তোঽসি' (বৃহদারণ্যক) এই অশোক হইবার জন্যই দেবর্ষি নারদ ব্রহ্মর্ষি সনৎকুমারের কৃপাপ্রার্থী হইয়াছিলেন।

সন্ন্যাসের উপসংহারে আছে—

"অনেন ক্রমযোগেন পরিব্রজতি যো দ্বিজঃ।
স বিধূয়েহ পাপ্মানং পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি॥"

(মনু ৬ অঃ ৮৫)

যে দ্বিজ যথোক্তক্রমে প্রব্রজিত হন, তিনি ইহলোকে পাপনির্মুক্ত হইয়া পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হন।

মনুসংহিতায় দ্বাদশাধ্যায়কথিত পূর্ব্বদর্শিত প্রমাণ ও প্রত্যেক আশ্রমের উপসংহারশ্লোকগুলি একত্র করিয়া তাৎপর্য্য গ্রহণ করিলে বুঝা যায়—সকল আশ্রমেই মোক্ষলাভ হয়, তবে সেই সেই আশ্রমের যাহা ধর্ম্ম, যাহা সেব্য, তাহার সেবা এবং যাহা নিষিদ্ধ, তাহার বর্জ্জন ইহা করিতে হয়। সেই বিধিনিষেধপালনে যিনি সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন,—মনের সাত্ত্বিক উন্নতি পূর্ণভাবে লাভ করিতে পারেন, তাঁহার চিত্ত সর্ব্বত্র বৈরাগ্যযুক্ত হয় এবং বীতরাগ হইলেই তিনি প্রথমে জীবন্মুক্ত, দেহান্তে কৈবল্য মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। গৌতম সূত্রের ১ম অঃ ১ম আহ্নিকে "দুঃখজন্মপ্রবৃত্তিদোষমিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গঃ"—এই দ্বিতীয় সূত্রে দোষাপায়মধ্যে রাগনিবৃত্তি মোক্ষ হেতু বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে। রাগ শব্দের অর্থ বিষয়তৃষ্ণা। তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকে 'বীতরাগজন্মাদর্শনাৎ' এই পঞ্চবিংশ সূত্রেও পুনর্জ্জন্ম যে রাগমূলক, তাহাই সমর্থিত হইয়াছে। রাগ দূর করিতে হইলে শাস্ত্রীয় উপায় অবলম্বন করিতে হয়। সকল আশ্রমেই শাস্ত্রীয় সাধনাভ্যাসে চিত্তবিশুদ্ধি হয় অর্থাৎ মনের উন্নতি ও প্রকৃষ্ট সাত্ত্বিক অবস্থা লাভ হয়। তাহা হইতেই ক্রমে বৈরাগ্যসিদ্ধি হয়। ইহা মোক্ষের প্রকৃষ্ট পন্থা। সকল আশ্রমেই এ পন্থায় প্রবেশ করা যায়। তবে সন্ন্যাসে বৈরাগ্যের সাধনাভ্যাসের পরিপক্কতালাভে সুযোগ অধিক, এই জন্য সন্ন্যাসের আদর বেদান্তে আছে, কিন্তু অন্যাশ্রমে কেহ কখন মুক্ত হয় না, এ ভাব বেদান্তের নহে।

৩। যাহা মিথ্যা, তাহা অধর্ম্ম। ধর্ম্ম যে সত্যস্বরূপ, তাহা বেদের সত্যতা ও বেদকর্ত্তার আপ্তত্ব হইতে প্রমাণিত। নাস্তিকাদি দর্শনে যে বেদনিন্দা আছে, গৌতম সূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকে ৫৭ সূত্র হইতে তাহার খণ্ডন আছে, নব্যন্যায়শাস্ত্রে শব্দখণ্ডে তাহার বিস্তৃত বিচার আছে, যদি সময় পাই, তাহার বিস্তৃত আলোচনা তখন করিব। এখন এইমাত্র বলিয়া রাখি যে, গৌতম সূত্রের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়া পরবর্ত্তী মুনি ও আর্য্যগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বেদ ঈশ্বরবাক্য। ঈশ্বর আপ্ত। তিনি যে বাক্য উচ্চারণ করিয়াছেন, তাহার অর্থ তাঁহার পরিজ্ঞাত, তিনি প্রতারক নহেন, তাঁহার ভ্রমপ্রমাদ নাই, এই জন্য তিনি আপ্ত। আপ্তপুরুষের বাক্য সত্য, সে বাক্যের যে অর্থ, সে বাক্যের যাহা প্রতিপাদ্য, তাহা মিথ্যা নহে,—স্বরূপতঃ, ফলতঃ, মূলতঃ এবং ব্যবহারতঃ তাহা মিথ্যা নহে, সুতরাং সত্য; মরীচিকার ভ্রমবলে যে জলসৃষ্টি করা হয়, তাহা স্বরূপতঃ মিথ্যা—যাহা জল নহে, তাহাই জল-আকারে দৃষ্ট, সেই জন্য স্বরূপতঃ মিথ্যা। ধর্ম্ম তাহা নহে—ধর্ম্ম আত্মার একটি গুণ—জ্ঞান, সুখ যেমন গুণ, তেমনই গুণ, তবে জ্ঞানসুখ যেমন প্রত্যক্ষ হয়—আমি জ্ঞানযুক্ত কি না, আমি সুখী কি না, তাহা আমি নিজে বুঝিতে পারি। সেই সময়ে জ্ঞান ও সুখের স্বরূপ আমার মনে ফুটিয়া উঠে, ধর্ম্ম সেরূপ হয় না বটে, কিন্তু সংস্কারের ন্যায় ফল দ্বারা, আত্মপ্রসাদ দ্বারা বা অন্যবিধ সুখ দ্বারা সেই ধর্ম্ম অনুভবনীয়। মনে কর, কত দিন পূর্ব্বে তুমি ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়াছ, তাহাতে যে তোমার সংস্কার আছে, তাহা সর্ব্বদা তুমি উপলব্ধি করিতে পার না, কিন্তু যখন কোন প্রয়োগ তোমার

সম্মুখে উপস্থিত হয়, তখন তোমার ব্যাকরণের সূত্র স্মরণ হয়। সংস্কার কারণ, তাহা অতীন্দ্রিয়, ফলস্মরণ তাহা প্রত্যক্ষ, সেই স্মৃতি দ্বারা সংস্কারের অনুভূতি হয়। কবে একটি মধুর সঙ্গীত শুনিয়াছ; এখন তাহার অনুভূতি নাই, একটা সংস্কার বা একটা তাহার অব্যক্ত রেখা তোমার ভিতরে আছে, যদি সেই ব্যক্তির কণ্ঠনিঃসৃত স্বরলহরী তোমার কর্ণে প্রবিষ্ট হয়, তখনই সেই সংস্কার বা অব্যক্ত রেখা পরিস্ফুট আকার ধারণ করে—অর্থাৎ তখন সেই ইন্দ্রিয়সম্বন্ধ ও সংস্কার উভয়-যোগে যে 'প্রত্যভিজ্ঞা' নামক জ্ঞান "এ যে সেই স্বর" এইরূপ যে জ্ঞান উপস্থিত হয়, তাহাতেই সেই সংস্কারের অনুভূতি হয়। ধর্ম্মের অনুভূতিও এইরূপে—ধার্ম্মিকের চিত্ত শাস্ত্রবিশ্বাসপূর্ণ, সদা প্রসন্ন ও সদা প্রফুল্ল; আগন্তুক কারণে হৃদয় আবৃত হইলেও স্বাভাবিক প্রসন্নতা. স্বাভাবিক সুখ অচিরেই সেই আবরণ ভেদ করিয়া ফুটিয়া ব্যক্ত হইয়া উঠে, এই এক প্রকারে ধর্ম্মের অনুভূতি। সৎপ্রবৃত্তি, সন্তোষ, মৈত্রী, সরলতা প্রভৃতি দ্বারাও ধর্ম্মের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে, ঐ সকল কার্য্য দ্বারা ধর্ম্মের অনুভূতি বা অনুমান হয়। সুতরাং ধর্ম্ম স্বরূপতঃ মিথ্যা নহে। আত্মপ্রসাদ, সুখ. সৎপ্রবৃত্তি প্রভৃতি যে সব কার্য্য ধর্ম্মের স্বরূপ বুঝাইয়া দিয়া থাকে, তাহা ধর্ম্মের ঐহিক ফল,—তাহা ত প্রত্যক্ষসিদ্ধ —মিথ্যা নহে। সুতরাং ধর্ম্ম ফলতঃ মিথ্যা নহে। ধর্ম্মের মূল শাস্ত্র, শাস্ত্রের মূল ঈশ্বর,—প্রাচীন ও নব্য ন্যায়দর্শনে শাস্ত্রের সত্যতা ও ঈশ্বরের সত্যতা বিচারিত ও প্রমাণিত; অতএব ধর্ম্ম যে মূলতঃ মিথ্যা নহে, তাহাও এই ন্যায়শাস্ত্রে প্রতিপাদিত। ব্যবহারতঃ অর্থাৎ অনুষ্ঠানেও যে ধর্ম্ম মিথ্যা নহে, তাহাও ন্যায়শাস্ত্রে সংস্থাপিত। ব্যবহারতঃ ধর্ম্ম মিথ্যা, ইহা নাস্তিকের এক আপত্তি, পরস্পর-বিরুদ্ধ ব্যবহার বা অনুষ্ঠান যদি শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহা অসত্য; যেমন উদিত হোম ও অনুদিত হোম; উদয়কালে হোমের বিধান আছে, উদয়ের পূর্ব্বেও হোমের বিধান আছে, আবার উদিত হোমের নিন্দা আছে, অনুদিত হোমেরও নিন্দা আছে। এইরূপ স্থলেই ব্যবহারতঃ অসত্যের সম্বন্ধ আসিয়া পড়ে। উদিত হোম করিলে, শাস্ত্রীয় নিন্দা লঙ্ঘন, অনুদিত হোমেও শাস্ত্রীয় নিন্দা লঙ্ঘন, একেবারে না করিলে বিধি লঙ্ঘন; অতএব যে ব্যবহারই কর না কেন, শাস্ত্রের আদেশ অমান্য করিতেই হয়। এরূপ আদেশ যাহা পরস্পরবিরুদ্ধ, তদনুসারে ব্যবহার অসত্যের আচ্ছাদনে যে আবৃত, তাহা বলা বাহুল্য। এই যে ব্যবহারতঃ অসত্য—যাহা মূলতঃ অসত্যের একটা শাখা, তাহা ন্যায়শাস্ত্রে পরিমার্জ্জিত হইয়াছে। গৌতমসূত্র ২য় অধ্যায় ১ম আহ্নিকে ৫ সূত্র—

'অপ্যুপেত্য কালভেদে দোষবচনাৎ।'

যদি কোন ব্যক্তি উদিত হোম সঙ্কল্প করিয়া আরম্ভ করে, তাহার পক্ষে অনুদিত হোমানুষ্ঠান অকর্ত্তব্য। পক্ষান্তরে, অনুদিত হোম সঙ্কল্পিত হইলে, তাহা ত্যাগ করিয়া উদিত হোম অকর্ত্তব্য অতএব উদিত হোম ও অনুদিত হোমের মধ্যে একতর পক্ষ সামবেদীর আচরণীয়। এই ভাবে ব্যবহারতঃ অসত্যতার সম্বন্ধও যে ধর্ম্মে নাই, ইহা ন্যায়সূত্রকার প্রদর্শন করিয়াছেন। কেবল ইহাই নহে—মানুষের প্রত্যেক চিন্তা, প্রত্যেক কার্য্য ও প্রত্যেক বাক্য যাহাতে সত্যপ্রতিষ্ঠ হয়, তাহার উপায়স্বরূপে যোগাবলম্বনের উপদেশ ন্যায়সূত্রে আছে। আর লৌকিক প্রমাণ প্রত্যক্ষাদির পরিশুদ্ধি বিষয়ে ন্যায়শাস্ত্রের যে প্রযত্ন, তাহা সুবিস্তৃত আলোচনা ব্যতীত অনুভবনীয় নহে। প্রমাণ পরিচ্ছেদের কথা পূর্ব্ববারেই একটু বলিয়াছি।

৪। বিস্তৃত কেন, সুবিস্তৃত ব্যাখ্যা হইতে পারে, কিন্তু ভাল লাগিবে কি? আদিরসনিস্যন্দী কাব্যকলালাপের কমনীয় তরঙ্গে তর্কের এই কর্কশ নির্ঘোষ তাড়না—কোকিল-কূজনে মধুর বসন্ত-চুম্বিত অশোককুঞ্জে বায়স-রবের ন্যায় শ্রবণপীড়া প্রদান করিবে না কি? তাই ভারতীয় দু' একটা কথার ইঙ্গিতমাত্র করিয়া ও ভবিষ্যৎ আলোচনার সঙ্কেত করিয়া মানে মানে বিদায় গ্রহণ করি প্রশ্নে বিস্তৃত ব্যাখ্যার আকাঙ্ক্ষা আছে বলিয়াই সাহস করিয়া মনের কথা প্রকাশ করিলাম। তথাপি প্রশ্ন যখন উঠিয়াছে, তখন ব্যাখ্যা একটু করিতেছি। যোগ, ব্রহ্মচর্য্য, ব্রহ্মচর্য্যে ধর্ম্ম ত আছেই, ধর্ম্মের ভিত্তি ব্রহ্মচর্য্যে প্রতিষ্ঠিত, ধর্ম্ম কর্ম্মের অধীন, ব্রহ্মচারীর জীবন কর্ম্মময়, ব্রহ্মচারী গুরুরই অধীন. ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম ও ব্রহ্মচারীর এই সকল লক্ষণ যোগে বর্ত্তমান। ধর্ম্মভিত্তি যোগে—চিত্তের একাগ্রতায় প্রতিষ্ঠিত, যোগ কর্ম্মময়, হঠযোগে শারীরিক কর্ম্ম ত প্রধান, অন্য যোগেও আসন আছে, প্রাণায়াম আছে, এ সকলেই শরীর ও বায়ু কর্ম্মে নিযুক্ত থাকে, তাহার পর মানসিক ও বাচিক কর্ম্ম ত আছেই—মানসিক কর্ম্ম ধ্যান, বাচিক কর্ম্ম স্বাধ্যায়,

এ সবই যোগাঙ্গ। যোগ কেবল পুস্তকপাঠে শিক্ষণীয় নহে; 'কর্ম্মসু কৌশলং' যে যোগ, তাহা গুরুর প্রদর্শিত পথ অনুসরণে সম্পন্ন করিতে হয়, সুতরাং যোগ বিশেষভাবে গুরুসাপেক্ষ। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের অভ্যস্ত ব্রহ্মচর্য্য যেমন গৃহস্থজীবনের ঘনিষ্ঠ, গুরুকৃপায় অভ্যস্ত যোগও ন্যায়দর্শনের সেইরূপ ঘনিষ্ঠ; গৌতম সূত্রের ৪র্থ অধ্যায় ২য় আহ্নিকে ৩৮ সূত্র হইতে তত্ত্বজ্ঞানবিবৃদ্ধি বা যোগপ্রকরণ, সেই প্রকরণের আদি সূত্র "সমাধিবিশেষাভ্যাসাৎ" —আর একটি সূত্র "তদর্থং যমনিয়মাভ্যামাত্মসংস্কারো যোগাচ্চাধ্যাত্মবিধ্যুপায়ৈঃ।" সমাধিবিশেষের অভ্যাসেই তত্ত্বজ্ঞান দৃঢ় হয়, মোক্ষের জন্য যম-নিয়ম দ্বারা আত্মসংস্কার হয়। কেবল যম-নিয়ম দ্বারাই নহে, আত্মজ্ঞানবিধির যে যে উপায় আছে, তৎসমুদয়ই আশ্রয়ণীয়। তাহার ফলে যোগসিদ্ধি হইয়া থাকে, সেই যোগ আত্মসংস্কারের প্রধান হেতু। যোগ শব্দার্থ সমাধি। ব্রহ্মচর্য্য যেমন ধর্ম্মসঙ্গত গার্হস্থ্যের আশ্রয়, সেইরূপ যোগ ন্যায়সিদ্ধান্তের আশ্রয়। এ যোগ—যোগগ্রন্থ নহে, যোগকার্য্য। দর্শনগ্রন্থমাত্রই ন্যায়শাস্ত্রের আশ্রিত, তাহা পূর্ব্ববারে বলিয়াছি। গার্হস্থ্য ব্রহ্মচর্য্যের আশ্রিত হইলেও ব্রহ্মচারী যেমন গৃহস্থের মুখাপেক্ষী, গৃহস্থই যেমন ব্রহ্মচারীর উৎপাদক, পোষক ও জ্ঞানদাতা—সেইরূপ যোগশাস্ত্র ন্যায়শাস্ত্রের মুখাপেক্ষী, ন্যায়শাস্ত্রই যোগের উৎপাদক, পোষক ও জ্ঞানদাতা। মনন না হইলে যোগ হয় না, মননের শাস্ত্র ন্যায়দর্শন; যোগদর্শনের বিচারপ্রণালী ন্যায়ের অনুসরণেই স্থাপিত, বিচারফল যে সিদ্ধান্ত-নির্ণয়, তাহাও ন্যায়শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট পথেরই আয়ত্ত। কিন্তু ব্রহ্মচর্য্য ব্যতীত যেমন সদ্‌গৃহস্থ হওয়া যায় না, যোগজ্ঞান ব্যতীত সেইরূপ ন্যায়দর্শনজ্ঞান সম্যক্ সিদ্ধ হয় না। ইহার জন্যই যোগের সহিত ব্রহ্মচর্য্য তুলনীয়। কপিলমতে প্রবৃত্তি-ধর্ম্মের স্থান নিম্নে, নিবৃত্তিধর্ম্ম কপিলের অভিমত। এ সকল লক্ষণ বানপ্রস্থে বিদ্যমান, বানপ্রস্থাশ্রমী গ্রামের কোলাহল হইতে দূরে অরণ্যবাসী, যত কিছু সুখাভ্যাস গৃহস্থাবস্থায় ঘটিয়াছে, তাহার ত্যাগই তাঁহার ধর্ম্ম। মুনিত্ব বা মননশীলতা তাঁহার আবশ্যক। স্বরূপচিন্তায় যে মনন, নিবৃত্তি অভ্যাসার্থ যে আত্মচিন্তা, তাহা কপিলের উপদেশ। অতএব বানপ্রস্থের যে ভাব, তাহা কপিলমতে দেদীপ্যমান। বানপ্রস্থ—"অগ্নীনাত্মনি বৈতানান্ সমারোপ্য যথাবিধি। অনগ্নিরনিকেতঃ স্যান্মুনির্মূলফলাশনঃ" (মনু ৬ অঃ ২৫) ইহা কপিলমতের অনুরূপ। কপিলমতস্থ ব্যক্তিরও অগ্নিসাধ্য যাগযজ্ঞাদি অত্যন্ত পুরুষার্থের হেতু নহে, মুনিত্বই তাহার হেতু। কপিলমত অরণ্যবাসী, অসঙ্গে প্রতিষ্ঠিত, সেই জন্য উহা 'বানপ্রস্থ' সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছে।

ব্যাসমতের শাঙ্কর শাখা যে জগতের মিথ্যাত্ব ঘোষণায় নিযুক্ত, তাহাতেই তাঁহার সন্ন্যাস আখ্যা উপযুক্ত। সন্ন্যাসীর কিছুই নাই, বাহ্য অকিঞ্চনতাই সন্ন্যাসীর লক্ষণ, শাঙ্কর মতে সেই অকিঞ্চনতা আছে, সন্ন্যাসীর যে পূর্ণতা, তাহা জ্ঞানে; ধনে নহে, মানে নহে, সেই পূর্ণজ্ঞান ব্রহ্মই শাঙ্কর মতের সত্য বস্তু। এই ভাবে সন্ন্যাসের ও সন্ন্যাসীর সহিত শাঙ্কর মতের যে তুল্যতা, তাহাতেই শাঙ্কর মতের "সন্ন্যাস" আখ্যা দিয়াছি। যেমন প্রত্যেক আশ্রমে বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম আছে এবং সেই বিশেষ ধর্ম্মসিদ্ধের মোক্ষ হইয়া থাকে, সেইরূপ যোগ কাপিল মত ও শাঙ্কর মত ও স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম তৎসিদ্ধিসম্ভূত মোক্ষ সমর্পণে সমর্থ; ন্যায়দর্শন গৃহস্থবৎ ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ প্রদানে সমর্থ, এই চতুর্ব্বর্গের সহিত অবিরোধ সম্বন্ধ স্থাপন ন্যায়দর্শন করিয়াছেন। এ বিষয়ে যথাসম্ভব বিস্তৃত আলোচনা মূলপ্রবন্ধে যথাসময়ে হইবে, প্রশ্নকর্ত্তার অপেক্ষা বাঞ্ছনীয়।

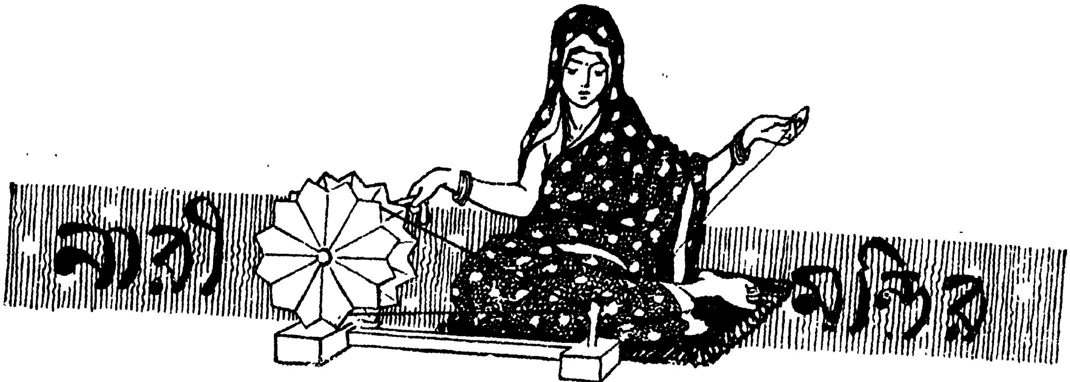
শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন।

অক্ষম

মুখর হ'তে যতই চাহি আমি
ততই শুধু হই গো নীরব মূক,
ভাবুকতায় মজতে চাহি যত,
ভাবহারা হয় ততই আমার বুক!

কণ্ঠ সদাই বাজ্‌তে চাহে গানে,
সুর ফোটে না,—তাল যে বেতাল বলে,
নৃত্যে যতই অধীর হ'তে সাধ,
চরণ ততই অবশ হয়ে টলে!

শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক



সমাজে নারীর স্থান

৪

কোনও বিদুষী ইংরাজ মহিলা (মিসেস হ্যালোজ) লিখিয়াছেন,—Tied and bound by tradition there are very many women who are unable to sympathise in any movement which is in any sense new They have a passion for precedent. অর্থাৎ এক শ্রেণীর মহিলা আছেন, যাঁহারা সনাতন প্রথাকে আঁকড়িয়া ধরিয়া থাকিতে চাহেন, সনাতন আচার-ব্যবহার যেন তাঁহাদিগকে হস্তপদবদ্ধ অবস্থায় রাখিয়া দেয়,—সেই নাগপাশের বন্ধনমুক্ত হইয়া কোনও নূতন আন্দোলনেই তাঁহারা সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে পারেন না। তাঁহারা 'নজীরের' দোহাই দিতে পারিলেই যেন জীবনটাকে সার্থক মনে করেন।



পারসীক মহিলা

এই শ্রেণীর নারীর প্রধান ভয়,—"মিসেস গ্রাণ্ডি" কি বলিবেন! অর্থাৎ সমাজের রামীর মা, কনে ঠানদি, নেকা ঝিমা কি বলিবে,—এই ভাবিয়া সকল কাযেই ইঁহারা সমাজের মন যোগাইয়া চলিতে ব্যস্ত। এই শ্রেণীর মহিলার সকল আচরণে, সকল কার্য্যে অতীতের ছাপ অঙ্কিত থাকে — অতীতকে জড়াইয়া তাহারা বর্ত্তমানে চলিতে চাহে; ফলে পদে পদে বাধা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে কার্য্যে অতীতের



য়ুরোপীয় স্বাধীন মহিলা

সম্ভ্রমের ছাপ না থাকে, তাহা এই শ্রেণীর নারীর নিকট বিষবৎ পরিত্যজ্য হয়। ইঁহারা কোনও রূপ পরিবর্ত্তন কামনা করেন না—কাল যে তদ্রূপ যোগী পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া দিবেই, তাহা তাঁহারা চক্ষু মেলিয়া দেখিতে চাহেন না। তাঁহারা good old times বা 'হায় রে সেকাল' বলিয়া সদাই হা-হুতাশ করেন।

এই শ্রেণীর মহিলা জগতের সকল সমাজে সকল অবস্থাতেই বর্ত্তমান। মিসেস হ্যালোজ তাঁহার নিজ প্রতীচ্য সমাজের মহিলাদের মধ্যেও এই শ্রেণীর নারীর অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন। সুতরাং বুঝিতে হইবে, স্বাধীনা প্রতীচ্য নারীর মধ্যে শিক্ষা, সভ্যতা, অবাধ মিলামিশা এবং নারীর ভোটাধিকার সত্ত্বেও প্রাচীনতার প্রতি আকর্ষণ একবারে বিলুপ্ত হয় নাই। সনাতন প্রথার মুখ চাহিয়া পর্দ্দানশীন পারসীক মহিলার জীবনযাত্রা যেমন নির্ব্বাহিত হয়, প্রতীচ্যের উচ্চশিক্ষিতা স্বাধীনা জেনানাদের মধ্যেও তেমন এমন অনেক নারী আছেন, যাঁহারা আজিও নারীর জীবন সংসারের ঘরকন্নার মধ্যে সীমাবদ্ধ বলিয়া বিবেচনা করেন। সে দিন কলিকাতার অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পত্র 'ইংলিশম্যানে'র এক প্রবন্ধে ঠিক এই ভাবেরই একটা সমস্যার কথা আলোচিত হইয়াছে :—"অবিবাহিতা নারী পুরুষের মত চাকুরী, ব্যবসায় বা ডাক্তারী ওকালতীতে জীবিকা অর্জ্জন করিলে বিশেষ ক্ষতি নাই। কিন্তু যদি বিবাহিতা নারীরাও পুরুষের মত জীবিকার্জ্জনের চেষ্টায় সংসারের ঘরকন্না হইতে সারা দিন দূরে থাকে, তবে আফিসে বড় সাহেবদের টিফিনের যোগাড় করিয়া কে দিবে, নার্সারির বালকবালিকার শিক্ষাদীক্ষা মেমসাহেব না হইলে ভাড়াটিয়া নার্স গভার্ণেস কি দেখিবে?" সুতরাং সংসারের ঘরকন্নার ভার যে নারীজাতির উপর ন্যস্ত হইয়াছে, সন্তান-জননী হওয়াতেই তাঁহার সেই দায়িত্ব প্রকৃতি পূর্ণরূপে প্রমাণ করিয়া দিতেছেন। নারী শিক্ষিতা হউন, নারী পুরুষের ন্যায় নানা অধিকারে অধিকারিণী হউন, নারী পুরুষের জীবনসঙ্গিনী অর্দ্ধাঙ্গিনী হউন, নারী যাহাই হউন,—তাঁহার এ গুরু দায়িত্ব এড়াইবার উপায় নাই। তাই মনে হয়, নারীজীবনের সার্থকতা এইখানেই।

মাতৃত্ব

মাতৃত্বের মত গুরু দায়িত্ব জগতে আছে কি না জানি না। যশোদাক্রোড়ে নন্দদুলাল অথবা ম্যাডোনা-বক্ষে শিশু যীশুর মত চিত্তানন্দদায়ক চিত্র জগতে আবিষ্কৃত হইয়াছে কি না সন্দেহ।

প্রতীচ্যের মনস্তত্ত্ববিদ পণ্ডিতই বলিয়াছেন, Woman is not only the help-mate of man, she is his mother, নারী কেবল পুরুষের জীবনসঙ্গিনী নহেন, তিনি তাহার জননী। পুরুষ জননীর রক্তমাংস ও অস্থিতে পুষ্ট হইয়া জগতে জন্মগ্রহণ করে। দশ মাস দশ দিন জননী তাহাকে গোপনে জঠরে ধারণ করেন, বহন করেন, পোষণ করেন,—তাহার পর প্রায় আত্মপ্রাণ বলি দিয়া তাহাকে জন্মদান করেন—এ হিসাবে নারী পুরুষের কত উচ্চে অবস্থিত!



সিংহলী মহিলা

পুরুষের জননীরা জাতির জীবন রক্ষার জন্য

কত কষ্ট সহ্য করিয়া থাকেন, কত স্বার্থ ত্যাগ করিয়া থাকেন। তাঁহারা অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে যোগাযোগ ঘটাইয়া থাকেন। কত রাজ্যের উত্থানপতন হয়, কত কৃচির উদ্ভব ও বিনাশ ঘটে,—কিন্তু মায়ের ভালবাসা ও মায়ের যন্ত্রণার কখনও বিনাশ হয় নাই। যত দিন জগৎ, তত দিন ইহার অস্তিত্ব থাকিবে।

সন্তানকে জগতে আনয়ন করিতেই যে জননী কষ্ট সহ্য করেন. তাহা নহে, তাহার শৈশবে ও বাল্যকালে জননী ভিন্ন কে অসংখ্য কষ্ট সহ্য করিয়া, ক্রমাগত স্বার্থত্যাগ করিয়া তাহাকে গড়িয়া তুলিতে পারে? সন্তানপালনের জন্য জননী আপনার শরীরের কষ্টকে কষ্ট বলিয়া গ্রাহ্য করেন না, সুখদুঃখ অনুভব করেন না; নিদ্রা, আরাম, সুখ, স্বাস্থ্য সকলই তিনি সন্তানের জন্য অবাধে বিসর্জ্জন করেন। তিনি যে কেবল সন্তানের প্রসবিত্রী, তাহা নহে, তিনি তাহার পালয়িত্রী। তাই আমাদের শাস্ত্রে জননীকে স্বর্গাদপি গরীয়সী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।



শ্যামদেশীয় মহিলা

জননী কেবল সন্তানের দৈহিক জীবনীশক্তির উৎস নহেন, তিনি তাহার আত্মিক বলেরও গোমুখীধারা। তাঁহা হইতেই শিশুর প্রথম চৈতন্যের উদ্রেক হয়, তাঁহা হইতেই তাহার প্রথম বাক্-স্ফূর্ত্তি হয়, তাঁহা হইতেই তাহার প্রথম চিন্তাস্রোত উদ্গত হয়। শিশু যত বড় হইতে থাকে, জননী ততই তাহার চরিত্রগঠনের ও শিক্ষাবিধানের দিকে আত্ম-নিয়োগ করিতে থাকেন। মায়ের নিকট যাহার প্রথম শিক্ষা সমাপ্ত হয় নাই, সে নিতান্তই অভাগা!

লোক কথায় বলে, স্ত্রীপুরুষ পরস্পরকে বুঝিতে পারে না। পুরুষের পক্ষে এ কথা সত্য হইলেও নারীর পক্ষে নহে। কেন না, যে নারী জননীরূপে পুরুষের শৈশব হইতে বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত দেহ ও মন গড়িয়া তুলেন, তিনি যদি পুরুষকে না বুঝিতে পারেন, তবে কে বুঝিবে? সন্তান যাঁ করিলে তিনি বুঝিতে পারেন, তাহার কোন্‌খানে ব্যথা। মাতার সন্তানস্নেহ পিতার পুত্রস্নেহ অপেক্ষা অনেকগুণ শ্রেষ্ঠ। বস্তুতঃ জগতে জননীর পুত্রস্নেহের মত নিঃস্বার্থ স্নেহ আর কিছু আছে কি না সন্দেহ। জননী দারিদ্র্যের করাল কবলে পড়িয়া নিজে উপবাসী থাকিয়া পুত্রকে আহার করাইয়াছেন, এমন দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

নারী কিসে ছোট ?

তবে নারীর সমাজে স্থান কিরূপে নিম্নে হইতে পারে? স্বাধীনা জেনানার দেশেই হউক বা পর্দ্দা-নশীনা পারসীক মহিলার দেশেই হউক, শিক্ষিতা অধিকারপ্রাপ্তা যুনানী মহিলাই হউক, আর অশি-ক্ষিতা অমার্জ্জিতা শ্যাম-মহিলাই হউক,—সর্ব্বত্রই মাতৃত্বের দাবীতে নারী পুরুষ অপেক্ষা বহু উচ্চে অব-স্থিত। নারী জাতির জননী—জাতি গঠনে, নূতন দেশ নূতন রাজ্য বিস্তারে নারী পুরুষ অপেক্ষা কম কার্য্য করে নাই। দৈহিক বলে নারী পুরুষের সমকক্ষ নহে, এই ওজুহতে নারীকে সমাজে নিম্নস্থান দেওয়া হয়। কিন্তু প্রাচীন কালে প্রমীলার দানবী মহিলাচমূ অথবা গ্রীক যবনদিগের অ্যামেজন মহিলা-সেনা এবং আধুনিক কালের রুসিয়ার বা পোলাণ্ডের নারী-সেনার কথা ছাড়িয়া দিলেও প্রতীচ্যের নারী গত মহাযুদ্ধকালে পুরুষের সকল কার্য্য যে ভাবে সুসম্পন্ন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদিগকে কোন মতেই সমাজে নিকৃষ্ট স্থান দেওয়া যাইতে পারে না। সেবা-ধর্ম্মে ও দেশরক্ষা কার্য্যে তাঁহারা নার্স ও গার্ল গাইডরূপে যাহা করিয়াছেন, তাহা হইতে রণক্ষেত্রে পুরুষের শৌর্য্যবীর্য্য যে অধিক ফলপ্রদ হইয়াছিল, তাহা বলা যায় না। তাহার উপর ব্যবসায়ক্ষেত্রে, কৃষিক্ষেত্রে, রেলে, ট্রামে, ডাকে, তারে, আফিসের কাযে তাঁহারা প্রায় সর্ব্বত্রই পুরুষের

কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়াছেন, পরন্তু সংসারের ঘরকন্নাও দেখিয়াছেন।

পুরুষের সমকক্ষতা

য়ুরোপের ইতিহাসে একটা কথার প্রায়ই উল্লেখ করা হয়—Pilgrim Fathers. পাঠক বোধ হয় অবগত আছেন যে, এক সময়ে ধর্ম্মের জন্য ইংলণ্ডে অনেকের উপর অত্যাচার আচরিত হইত। সেই অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া বহু ইংলণ্ডবাসী স্বদেশ ছাড়িয়া আমেরিকায় চলিয়া গিয়াছিলেন এবং সেখানে বনজঙ্গল কাটিয়া আদিমনিবাসীদের সহিত যুদ্ধ করিয়া এবং নানা কষ্টবিপদ সহ্য করিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহারাই 'পিলগ্রিম ফাদার্স' নামে অভিহিত। তাঁহাদের ন্যায় কষ্টসহিষ্ণু ধর্ম্মভীরু লোক জগতে খুঁজিয়া পাওয়া



তামিল মহিলা

দুর্ল্লভ। তাঁহারাই বর্ত্তমান মার্কিণ জাতির পূর্ব্বপুরুষ।

সকল ইংরাজী ইতিহাসেই তাঁহাদের অশেষ শৌর্য্য, বীর্য্য, ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু মজা এইটুকু যে, তাঁহাদের জীবনসঙ্গিনী হইয়া যাঁহারা প্রথম মার্কিণদেশে গমন করিয়াছিলেন, সেই Pilgrim mothersদের কথা ত শুনা যায় না। পুরুষ পিলগ্রিমদের অপেক্ষা তাঁহারা যে অল্প বিপদ-কষ্ট সহ্য করিয়াছিলেন, এমন নহে। অধিকন্তু সেই বিপদের মধ্যে তাঁহাদিগকে সেই বনে জঙ্গলে সংসার পাতাইতে হইত, বহুদিন যাবৎ হিংস্র জন্তু ও হিংস্র মানবের অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইত। সুতরাং তাঁহাদের নামও কেন যে ইংরাজের ইতিগাসে বিশেষভাবে উল্লিখিত হয় নাই, তাহা বলিতে পারি না। বোধ হয়, এখানেও Lion painted by the man সিংহ মানুষের দ্বারা চিত্রিত হইয়াছে, অর্থাৎ মানুষ যদৃচ্ছাক্রমে সিংহকে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় চিত্রিত করিয়াছে, সিংহের উপর সে তার



শ্যামদেশীয় মহিলার দাসী



সুসজ্জিতা শ্যামমহিলা

থাকিলে ব্যবস্থা নিশ্চিতই ভিন্নরূপ হইত।

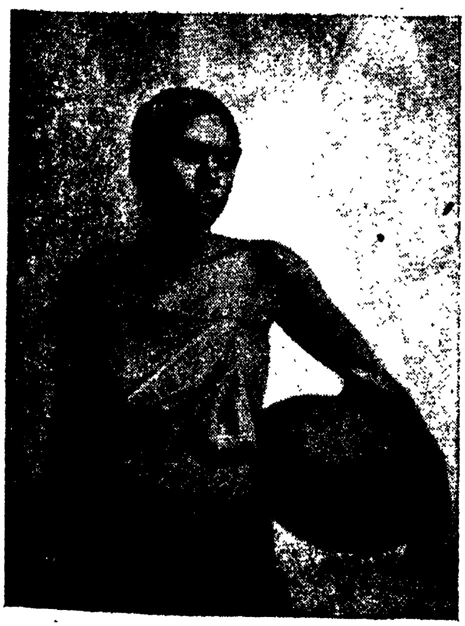
উপনিবেশে বাঙ্গালী ও তামিল নারী

আমাদের এই বাঙ্গালী জাতিও এক দিন দেশবিদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। অবশ্য এখনকার ভেতো বাঙ্গালীকে দেখিয়া সে ধারণা অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। কিন্তু বস্তুতঃ অতীতে এক দিন এই বাঙ্গালীর পূর্ব্বপুরুষরাই আপনাদের অর্ণবপোতে চড়িয়া সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ প্রভৃতি দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। শ্যামদেশের ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে এবং



শ্যামদেশের প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা ও তাঁহার পত্নী

তথাকার লোকের বেশভূষা ও চালচলন দেখিলেই এ কথার যথার্থতা সপ্রমাণ হইবে। শ্যামদেশের নামই বাঙ্গালী ধরণের। শ্যামের ভূতপূর্ব্ব রাজার নাম ছিল চূড়ালঙ্করণ। শ্যামদেশের সম্ভ্রান্ত জমীদারের দাসীরা ঠিক বাঙ্গালীরই মত কাছাকোচা করিয়া কাপড় পরে, তাহা চিত্রেই দেখিতে পাইতেছেন। প্রভেদের মধ্যে এই যে, উহারা নারীর প্রধান সৌন্দর্য্য কেশরাশি কাটিয়া ফেলে। অবশ্য সুকেশা সুবেশা সুদতী শ্যামনারীও যে নাই, তাহা নহে, চিত্রে তাহাও দেখিতে পাইবেন। আর একখানি চিত্রে শ্যাম



সিংহলী গ্রাম্য বালিকা



তামিল কুলী রমণী

দেশের এক প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা ও তাঁহার পত্নীর প্রতিকৃতি দেখুন। এই সমস্ত চিত্রে শ্যামবাসীকে বাঙ্গালীর মত পোষাক পরা দেখাইতেছে না কি? অবশ্য দেশকালভেদে আচারব্যবহারের অনেক পার্থক্য ঘটিয়াছে, সন্দেহ নাই, কিন্তু শ্যামবাসীরা যে বাঙ্গালী ঔপনিবেশিকদিগের বংশধর, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। এই বাঙ্গালীরা যখন শ্যামে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল, এই বাঙ্গালী Pilgrim Fatherরা বাঙ্গালার ধর্ম্ম, বাঙ্গালার সভ্যতা, বাঙ্গালার শিক্ষাদীক্ষা, বাঙ্গালার আচারব্যবহার যখন শ্যামদেশে লইয়া গিয়াছিল, তখন বাঙ্গালী pilgrim motherদিগকেও যে সঙ্গে লইয়া যান নাই, এমন কথা কেহ জোর করিয়া বলিতে পারেন না। বাঙ্গালী নারীরাও রণে, বনে, বিদেশে, প্রবাসে ছায়ার ন্যায় পুরুষের অনুগামিনী হইয়াছিলেন, বাঙ্গালার বাহিরে নূতন দেশ, নূতন রাজ্য, নূতন জাতি গঠনে সহায়তা করিয়াছিলেন। এই মহীয়সী নারী ধন্যা বরেণ্যা, তাঁহাদের স্থান সমাজে কত উচ্চে, তাহা সহজেই অনুমেয়।

আর এক মহীয়সী নারী দ্রাবিড়ের তামিল মহিলা। এই মহিলারা পর্দ্দানশীন নহেন, স্বাধীনা। উচ্চশিক্ষিতা না হইলেও শিক্ষিতা ও মার্জ্জিত-রুচি; বিশেষতঃ তাঁহারা পুরুষের জীবনসঙ্গিনীরূপে দেশবিদেশে পুরুষের অনুগামিনী হইয়া নূতন দেশ, নূতন জাতি গঠনে সহায়তা করিয়া থাকেন। আফরিকায় ও সিংহলে তাঁহাদিগের উপনিবেশ এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। আজ তাঁহাদের সংস্পর্শে সিংহলে সিংহলী গ্রাম্য বালিকাও অর্দ্ধনগ্নবাস পরিহার করিয়া ভারতীয় নারীর মত আবৃতদেহা হইয়াছে। সিংহলের চা বাগানে সামান্য তামিল কুলী রমণীও সিংহলীকে সভ্যতার অনুযায়ী বসন-ভূষণে দেহ আবৃত করিতে শিক্ষাদান করিতেছে। সম্ভ্রান্ত তামিল মহিলার আদর্শে কাণ্ডিয়ার সিংহলী মহিলাও সুন্দর বেশভূষায় সজ্জিত হইতেছেন। জাতির জননী নারী, নূতন জাতি ও নূতন দেশের সৃষ্টিকর্ত্রী নারী,—তাঁহার সমাজে স্থান কোথায়, তাহা কি কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে? পূর্ব্বেই বলিয়াছি, স্বাধীনতা নারীজীবনের সার্থকতা নহে, পুরুষের ন্যায় অধিকারলাভেও তাঁহাদের সার্থকতা নাই। নারীজীবনের সার্থকতা মাতৃত্বে, নূতন জাতিগঠনে।

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু।



রুসিয়ার বালক পল্টন। বালকগণই সৈনিক ও সৈন্যাধ্যক্ষের কার্য্যে নিযুক্ত

ক্ষমা

Non-violence.

২

বৈষ্ণব সাহিত্যে ক্ষমা

"তরুসম সহিষ্ণুতা বৈষ্ণব করিব।
তাড়ন ভর্ৎসনে কারে কিছু না বলিব॥
কাটিলেহ তরু যেন কিছু না বলয়।
শুকাইয়া মরে তবু জল না মাগয়॥"

শ্রীশ্রীচরিতামৃত।

(১) হরিদাসের দৃষ্টান্ত

ভক্ত হরিদাস নিজে যবন হইলেও কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা ছিলেন। তাঁহার—"কৃষ্ণনামে পরিপূর্ণ শ্রীবদন ধন্য।" তাঁহার এই ব্যবহারে যবনগণ বিষম ক্রুদ্ধ হইয়াছিল। তাহারা বলিল, "তুমি যবন হইয়া কেন হিন্দুর আচারে আসক্ত হইয়াছ?" ইহার উত্তরে পরম প্রাজ্ঞ হরিদাস অতি মধুরভাবে কহিলেন—

"শুন বাপ! সবারই একই ঈশ্বর।
* * * *
নাম মাত্র ভেদ করে হিন্দু ও যবনে।
পরমার্থে এক কহে কোরাণে পুরাণে॥
এক শুদ্ধ নিত্যবস্তু অখণ্ড অব্যয়।
পরিপূর্ণ হই বৈসে সবার হৃদয়॥"

কিন্তু এই উদার বাক্য সংকীর্ণচিত্ত যবনগণের ও কাজীর হৃদয়ে স্থান পাইল না। যবনরাজকে বলিয়া শ্রীমান্ কাজী হরিদাসের ভীষণ শাস্তির ব্যবস্থা করিল। হরিদাস বলিলেন—

"খণ্ড খণ্ড হই দেহ যদি যায় প্রাণ।
তভো আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম॥"

কাজী ভীষণ দণ্ডের আজ্ঞা দিল। এক এক করিয়া বাইশটি বাজারে হরিদাসকে লইয়া গিয়া বিষম প্রহারের হুকুম দিল।

—"বাইশ বাজারে নিঞা মারি।
প্রাণ লহ.—আর কিছু বিচার না করি॥"

পাইকগণকে ডাকিয়া তর্জ্জনপূর্ব্বক কাজী কহিল—

"এমত মারিবি যেন প্রাণ নাহি রহে।"

পাষণ্ড পাইকগণ তাঁহাকে বাজারে বাজারে লইয়া গিয়া নির্দ্দয়-ভাবে বিষম প্রহার করিতে লাগিল,—কিন্তু হরিদাস নির্ব্বিকার,—

"বাজারে বাজারে মারে মহাক্রোধ মনে।
* * * *
কৃষ্ণের প্রসাদে হরিদাসের শরীরে।
অল্প দুঃখ নাহি জন্মে এতেক প্রহারে॥
অসুর-প্রহারে যেন প্রহ্লাদ-বিগ্রহে।
কোনও দুঃখ না জন্মিল সর্ব্বশাস্ত্র কহে॥"

ঐরূপ প্রহৃত হইয়াও তিনি নিজের জন্য অণুমাত্র দুঃখিত না হইলেও, দুষ্ট পাষণ্ডগণ—যাহারা তাঁহাকে নৃশংসভাবে প্রহার করিতেছিল—তাহাদের পাপের কথা ভাবিয়া বড়ই কাতর হইয়াছিলেন এবং তাহাদের প্রতি ভগবানের প্রসাদ প্রার্থনা করিয়াছিলেন—

"সবে যে সকল পাপিগণ তাঁরে মারে।
তার লাগি দুঃখমাত্র ভাবেন অন্তরে॥
—'এ সব জীবেরে কৃষ্ণ! করহ প্রসাদ,
মোর দ্রোহে নহু এ সবার অপরাধ'।"

মহাত্মা যেশাসও ক্রুশে বিদ্ধ হইবার সময়—হত্যাকারিগণের জন্য এইরূপই শ্রীভগবানের নিকট হইতে ক্ষমা ভিক্ষা করিয়াছিলেন। মহাত্মগণের চরিত্র সর্ব্বদেশেই সর্ব্বকালেই সমান দৃষ্ট হয়।

ইহার পর বিষম প্রহারে হরিদাসকে সংজ্ঞাশূন্য করিয়া তাঁহাকে যবনগণ গঙ্গার স্রোতে নিক্ষেপ করিয়াছিল; কিন্তু গঙ্গাজলে ভাসিতে ভাসিতে ভক্ত হরিদাসের চৈতন্যোদয় হয় এবং ফুলিয়া গ্রামে আসিয়া উঠেন। ইহা দেখিয়া যবনগণ বিস্মিত হইয়াছিল—

"দেখিয়া অদ্ভুত শক্তি সকল যবন।
সবার খণ্ডিত হিংসা, ভাল হৈল মন॥
পীর জ্ঞান করি সবে কৈল নমস্কার॥"

ক্ষমা-ধর্ম্মের এইখানেই জয়। হরিদাস অলৌকিক ভক্তি ও ক্ষমাগুণে বৈষ্ণবসমাজে অক্ষয় নাম রাখিয়া গিয়াছেন।

(২) নিত্যানন্দ প্রভুর ক্ষমা

"শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর মহিমা অপার।
পতিতের ত্রাণ লাগি যাঁর অবতার॥"

আমরা পূর্ব্বে ইঙ্গিতে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর ক্ষমার পরিচয় দিয়াছি। এক্ষণে শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে ইহার বিস্তৃত আলোচনা করিব।

নদীয়ায় জগাই মাধাই নামে দুই পাষণ্ড ছিল, তাহারা সদ্বংশজাত হইলেও, তাহাদের পাপের অন্ত ছিল না—

"সুব্রাহ্মণ পুত্র দুই জন্ম এক ঠাঁই।
* * * *
সঙ্গদোষে সে দোঁহার হৈল হেন মতি।
আজন্ম মদিরা বই আন নাহি গতি॥
সে দুইর ভয়ে নদীয়ার লোক ডরে।
হেন নাই যার ঘরে চুরি নাহি করে॥
সে দুইর পাতক কহিতে নাহি ঠাঁঞি।"

এহেন দুই পাষণ্ডের নিকট উপস্থিত হইয়া পতিতত্রাণ উদ্দেশে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ও হরিদাসপ্রভু গাহিতে লাগিলেন—

"বোল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, লহ কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ ধন প্রাণ॥
তোমা সবা লাগিয়া কৃষ্ণের অবতার।
হেন কৃষ্ণ ভজ, সব ছাড় অনাচার॥"

আর কি রক্ষা আছে। সেই দুই পাষণ্ড—এই নামগান শ্রবণ করিবামাত্র মাথা তুলিয়া মহাক্রোধে আরক্তলোচনে তাঁহাদিগকে ধরিবার জন্য পশ্চাদ্ধাবিত হইল। সেদিনকার মত নিত্যানন্দ ও হরিদাস—মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের কৃপায় ঐ দুই পাষণ্ডের হাত হইতে উদ্ধার পাইলেন। কিন্তু এইরূপ নির্যাতিত হইলেও তাঁহারা পাতকিদ্বয়ের উদ্ধারের চেষ্টা হইতে বিরত হইলেন না।

আর এক দিন নিত্যানন্দ নগরে নামপ্রচার করিয়া ফিরিয়া আসিতেছেন, এমন সময়ে উক্ত পাষণ্ডদ্বয় আসিয়া তাঁহাকে ধরিল এবং পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। তাঁহার উত্তর শ্রবণে মাধাই অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া—

"মারিল প্রভুর শিরে মুটুকী তুলিয়া।
ফুটল মুটুকী শিরে রক্ত পড়ে ধারে॥"

[মুটুকী = মটকী = কলসী]

দরবিগলিতধারে নিত্যানন্দের শ্রীঅঙ্গ হইতে রক্তস্রোত বহিল,—তথাপি তিনি নির্ব্বিকার,—

"নিত্যানন্দ-অঙ্গে সব রক্ত পড়ে ধারে।
হাসে নিত্যানন্দ সেই দুইর ভিতরে॥"

ভক্ত নিত্যানন্দের গায়ে রক্তধারা দেখিয়া মহাপ্রভু ক্রোধে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পাষণ্ডদ্বয়ের সংহারার্থ উদ্যত হইলে,—ক্ষমাশীল নিত্যানন্দ—মহাপ্রভুর নিকট প্রার্থনা করিলেন—

"মোরে ভিক্ষা দেহ প্রভু! এ দুই শরীর।
কিছু দুঃখ নাহি মোর, তুমি হও স্থির॥"

[এ দুই শরীর—জগাই মাধাইর শরীর। অর্থাৎ এ দুজনকে মারিও না, যদিও তাহারা আমাকে কলসীর কাণা দিয়া মারিয়াছে]

নিগৃহীতের অলৌকিক ক্ষমাগুণ দর্শনে পাপিদ্বয়ের চৈতন্যসঞ্চার হইল; নিজেদের অপরাধ বুঝিল। পা জড়াইয়া ধরিয়া,—কাতরভাবে ক্ষমা ভিক্ষা চাহিল। মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে ক্ষমা করিতে কহিলে,—নিত্যানন্দ তখনি বলিলেন—

"কোনও জন্মে থাকে যদি আমার সুকৃত।
সব দিনু মাধাইরে শুনহ নিশ্চিত॥
মোর যত অপরাধ—কিছু দায় নাই।
মায়া ছাড়, কৃপা কর,—তোমার মাধাই॥"

মহাপ্রভু তখন মাধাইকে কোল দিতে নিত্যানন্দকে আদেশ করিলেন—নিত্যানন্দও

"প্রভুর আজ্ঞায় কৈল দৃঢ় আলিঙ্গন।
মাধাইর হৈল সর্ব্ববন্ধবিমোচন॥"

তখন মাধাই তাঁহার চরণে লুটাইয়া পড়িলে, প্রভু নিত্যানন্দ কহিলেন—

"উঠ উঠ মাধাই! আমার তুমি দাস।
তোমার শরীরে হৈল আমার প্রকাশ॥
শিশুপুত্র মারিলে কি বাপে দুঃখ পায়।
সেই মত তোমার প্রহার মোর গায়॥"

ক্ষমা-ধর্ম্মের ইহা চূড়ান্ত-দৃষ্টান্ত। এই গুণেই বৈষ্ণব সাধুসমাজে প্রভু নিত্যানন্দের নাম চিরদিন অক্ষয় হইয়া থাকিবে।

ক্ষমার পৌরাণিক দৃষ্টান্ত

(১) প্রহ্লাদের ক্ষমা

(বিষ্ণুপুরাণ হইতে)

"সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু।
সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে॥"

শ্রীশ্রীগীতা ৬।৯

পুরাণ-প্রথিত প্রহ্লাদ—হরিবিদ্বেষী দৈত্য হিরণ্যকশিপুর পুত্র হইয়াও সতত হরিনামে মত্ত ছিলেন,—পিতার নিবারণ সত্ত্বেও উহা জীবনের সার ধন করিয়া ধরিয়া রাখিয়াছিলেন। পিতা কর্তৃক নিগ্রহ—এমন কি, প্রাণহননের উদ্যমও তিনি অবিচলিতভাবে সহাস্য বদনে সহ্য করিয়াছিলেন। শ্রীভগবানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করিতেন যে,—পশুবল কখনই সাফল্যলাভ করিতে পারে না। যাহা সত্য, যাহা ধর্ম্মমূলক, যাহা ন্যায়ানুমোদিত—তাহাই অক্ষয় এবং তাহাই জয়ী হইয়া থাকে। শ্রীভগবানের উপর অচলা ভক্তি ও তাঁহার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস বশতঃ ধৈর্য্য ও ক্ষমাগুণে তিনি আসন্ন মৃত্যুর হস্ত হইতে কতবার শ্রীভগবৎকৃপার উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন—পুরাণপাঠকের ইহা অবিদিত নাই। ভগবৎশক্তির উপর একনিষ্ঠ বিশ্বাস বা প্রত্যয় থাকিলে যে শ্রীভগবানের অসামান্য কৃপার অধিকারী হওয়া যায় এবং শত্রুর বিবিধ চেষ্টা সত্ত্বেও কোন বিপদই ঐ ব্যক্তির কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে পারে না—পরন্তু তিনি মৃত্যুঞ্জয়ী হইয়া পরমপদ লাভ করিতে সমর্থ হয়েন,—প্রহ্লাদচরিত্রে এই তথ্যই অধিগত হওয়া যায়। প্রবীণ কংগ্রেসকর্ম্মী শ্রীযুক্ত হরদয়াল নাগ তাঁহার "More suffering for Prahlad" প্রবন্ধে ঠিকই বলিয়াছেন—"Prahlad suffered more and more, simply because he was non-violent. He went through the suffering with fortitude and bravery, because he had strong faith in divine Justice. He believed that brute force could not be endless. The result was that Justice triumphed in the long run."

'ইয়ং ইণ্ডিয়ার' পাঠকমাত্রেই—প্রহ্লাদের বাক্যের সহিত শ্রীমহাত্মাজীর বাক্যাবলীর তুলনা করিলে চমৎকৃত হইবেন। প্রহ্লাদ বলিতেছেন—

"বদ্ধবৈরাণি ভূতানি দ্বেষং কুর্ব্বন্তি চেৎ ততঃ।
শোচ্যান্যহোঽতিমোহেন ব্যাপ্তানীতি মনীষিণা॥"

যদি অপর প্রাণিগণ বদ্ধবৈর হইয়া দ্বেষ করে, তাহা হইলে,—"অহো! ইহারা অতিশয় মোহ দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়াছে"—বিবেচনা করিয়া মনীষিগণ উহাদের নিমিত্ত শোক করিয়া থাকেন।

পিতা দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর আদেশে রাজপুরোহিতগণ অভিচারমন্ত্রপ্রভাবে প্রহ্লাদের বিনাশার্থ ভীষণাকৃতি কৃত্যা (রাক্ষস বিং) সৃজন করিলেন—এবং ঐ কৃত্যা উদ্ভূত হইয়াই ভীষণ শূল দ্বারা প্রহ্লাদের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিল,—কিন্তু প্রহ্লাদের যে হৃদয়ে অনপায়ী ভগবান্ শ্রীহরি বিরাজমান ছিলেন, সেখানে বজ্রও ভগ্ন হইয়া থাকে, শূলের কথা কি?—

"যত্রানপায়ী ভগবান্ হৃদ্যাস্তে হরিরীশ্বরঃ।
ভঙ্গো ভবতি বজ্রস্য তত্র শূলস্য কা কথা?"

প্রহ্লাদের প্রতি আক্রমণ বিফল হইল,—শূল ভগ্ন হইল দেখিয়া কৃত্যা ক্রুদ্ধ হইয়া যাজকদিগকেই সংহার করিল। ইহা দেখিয়া মহামতি প্রহ্লাদ—"ত্রাহি কৃষ্ণেত্যনন্তেতি বদন্নভ্যবপদ্যত"—"হে কৃষ্ণ, হে অনন্ত,—ত্রাহি ত্রাহি" বলিতে বলিতে প্রহ্লাদ দহ্যমান পুরোহিতগণের রক্ষার্থ তদভিমুখে ধাবিত হইলেন। তিনি কাতর প্রার্থনা পূর্ব্বক শ্রীভগবানের উদ্দেশে কহিলেন—"হে সর্ব্বব্যাপিন্! বিপ্রগণকে রক্ষা করুন—পুরোহিতগণ আমার শত্রু হইলেও এবং জীবননাশে উদ্যত হইলেও—তাঁহারা জীবিত হউন। কেবল এই পুরোহিতগণ নহেন—পরন্তু

"যে হন্তুমাগতা দত্তং যৈর্বিষং যৈর্হুতাশনঃ।
যৈর্দিগ্‌গজৈরহং ক্ষুণ্ণো দষ্টঃ সর্পৈশ্চ যৈরপি॥
তেষ্বহং মিত্রভাবেন সমঃ পাপোঽস্মি ন ক্বচিৎ॥"

"যাহারা আমাকে বধ করিতে আসিয়াছিল,—যাহারা বিষ দিয়াছিল, যাহারা অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়াছিল, যাহারা হস্তী দ্বারা দলিত এবং সর্প দ্বারা দংশন করাইয়াছিল—সে সকলেরই প্রতি আমি সমমিত্রভাবাপন্ন—কখনও কাহারও অনিষ্ট চিন্তা মনে মনেও করি নাই।"

শ্রীভগবানের নিকট ভক্ত প্রহ্লাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা বিফল হইল না। পুরোহিতগণ পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিলেন। যাঁহারা ইতঃপূর্ব্বেই শত্রুরূপে তাঁহার সংহারার্থ উদ্যত হইয়াছিলেন—এক্ষণে তাঁহারাই—

দীর্ঘায়ুরপ্রতিহতবলবীর্য্যসমন্বিতঃ।
পুত্রপৌত্রধনৈশ্বর্য্যযুক্তো বৎস! ভবোত্তম॥—

বলিয়া শুভাশীর্ব্বাদ দ্বারা তাঁহাকে সংবর্দ্ধিত করিলেন। ক্ষমা বা Nonviolenceএর ইহাই সফলতা।

প্রহ্লাদ বারংবার তাঁহার পিতা হিরণ্যকশিপুর প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন—আপনি যে সাম, দান, ভেদ, দণ্ড ইত্যাদি কূটরাজনীতির কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন—ইহা সকলই গুরুর নিকট হইতে উপদিষ্ট হইয়া সম্যক্ অবগত আছি, কিন্তু ঐ সকল আমার মোটেই ভাল লাগে না—("মযোপদিষ্টং সকলং গুরুণা নাত্র সংশয়ঃ। গৃহীতন্তু ময়া কিন্তু ন সদেতন্মতং মম।")—প্রহ্লাদ আরও বলিতেছেন—রাজনীতি দ্বারা অভ্যুদয়লাভ অভিপ্রেত নহে,—পরন্তু শ্রী ও মঙ্গলকামী ব্যক্তির পক্ষে সর্ব্বভূতে সমজ্ঞান লাভের জন্য চেষ্টা করা উচিত। ("য ইচ্ছেৎ মহতীং শ্রিয়ং যতিতব্যং সমত্বে চ")। আরও—

"অন্যেষাং যো ন পাপানি চিন্তয়ত্যাত্মনো যথা।
তস্য পাপাগমস্তাত হেত্বভাবান্ন বিদ্যতে॥
কর্ম্মণা মনসা বাচা পরপীড়াং করোতি যঃ।
তদ্বীজজন্ম ফলতি প্রভূতন্তস্য চাশুভম্॥
সোঽহং ন পাপমিচ্ছামি ন করোমি বদামি বা।
চিন্তয়ন্ সর্ব্বভূতস্থম্ আত্মন্যপি চ কেশবম্॥
শারীরং মানসং দুঃখং দৈবং ভূতভবং তথা।
সর্ব্বত্র শুভচিত্তস্য তস্য মে জায়তে কুতঃ॥
এবং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভক্তিরব্যভিচারিণী।
কর্ত্তব্যা পণ্ডিতৈর্জ্ঞাত্বা সর্ব্বভূতময়ং হরিম্॥"

যে ব্যক্তি নিজের মত ভাবিয়া অন্যের অনিষ্ট চিন্তা করে না, হে পিতঃ! তাহার পাপ ও দুঃখ থাকে না। যে ব্যক্তি কর্ম্ম, মন ও বাক্য দ্বারা পরপীড়া করে,—তাহার ঐ পরপীড়ারূপ বীজজাত প্রভূত বিষময় ফল ফলিয়া থাকে। আমি কেশবকে সর্ব্বভূতস্থিত বলিয়া সতত চিন্তা করি। কাহারও অনিষ্ট ইচ্ছা করি না,—কার্য্যে ত করিই না, কথায়ও বলি না। যখন আমি সর্ব্বত্র শুভচিত্ত—ভুলেও কাহারও অনিষ্ট চিন্তা করি না—তখন শারীরিক বা মানসিক,—আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক দুঃখ কোথা হইতে জন্মিবে? শ্রীভগবান্‌কে সর্ব্বভূতময় জানিয়া সর্ব্বভূতের প্রতিই অব্যভিচারিণী ভক্তি করা পণ্ডিতদিগের কর্ত্তব্য।

শ্রীমদ্ গান্ধীতে পূর্ব্বোক্ত বাক্যাবলী বর্ণে বর্ণে প্রযোজ্য হইলেও, তাঁহার অনুবর্ত্তিগণের মধ্যে এখনও এই মহান্ ভাবের উদয় সম্পূর্ণ দেখা যাইতেছে না। তাঁহাদের ভিতর ও বাহিরের একটা সামঞ্জস্য বা সঙ্গতি পরিদৃষ্ট হইতেছে না বলিয়া—মহাত্মা নিজেই পরিতাপ প্রকাশ করিয়াছেন।

প্রহ্লাদের দৃষ্টান্তে মহাত্মার শিষ্যগণের মনে রাখা উচিত যে, যে হিরণ্যকশিপু তাঁহার বিনাশার্থ নানারূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন—তিনিই প্রহ্লাদের লোকোত্তর সদ্গুণাবলীতে আকৃষ্ট হইয়া—তাঁহার নিজ নিষ্ঠুর ব্যবহারে অনুতপ্ত ও অতিশয় প্রীতিমান্ হইয়া—মস্তক আঘ্রাণ ও স্নেহালিঙ্গনাদি দ্বারা সংবর্দ্ধিত করিয়াছিলেন—

তং পিতা মূর্দ্ধ্ন্যুপাঘ্রায় পরিষ্বজ্য চ পীড়িতম্।
জীবসীত্যাহ বৎসেতি বাষ্পার্দ্রনয়নো দ্বিজ॥
শ্রীতিমাংশ্চাভবৎ তস্মিন্ননুতাপী মহাসুরঃ॥

প্রহ্লাদের মত একনিষ্ঠভাবে ক্ষমাগুণের আন্তরিক অনুষ্ঠানে যে শত্রুর হৃদয়ও আকর্ষণ করিতে সমর্থ হওয়া যায়—ইহা দেশবাসিমাত্রেরই অহরহ স্মরণ রাখা উচিত।

শ্রীভববিভূতি বিদ্যাভূষণ।

উদ্ভট-সাগর

কোন এক বিরহিণী নায়িকা, নায়কের নিকটে স্বীয় দূতীকে দৌত্যকর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। দূতী ফিরিয়া আসিলে নায়িকা তাহার অবস্থান্তর দেখিয়া তাহাকে প্রশ্ন করিতেছেন, এবং দূতীও তাহার উত্তর দিতেছে। রাক্ষসী-রূপিণী নষ্ট-চরিত্রা রমণীর বুদ্ধি কিরূপ তীক্ষ্ণ, তাহাই এই শ্লোকে প্রদর্শিত হইয়াছে:—

খিন্নং কেন মুখং দিবাকরকরৈস্তে রাগিণী লোচনে
রোষাৎ তদ্বচনোত্থিতাদ্ বিলুলিতা নীলালকা বায়ুনা।
ভ্রষ্টং কুঙ্কুমমুত্তরীয়কষণাৎ ক্লান্তাঽসি গত্যাগতৈ-
র্যুক্তং তৎ সকলং ক্ষতং কিমধরে দুষ্টৈর্মশৈর্দংশনাৎ॥

(বিকটনিতম্বায়াঃ)

নায়িকা—ঝরিছে তোমার কেন ঘর্ম্মবিন্দু এত?
দূতী—প্রচণ্ড সূর্য্যের তাপে হয়েছি তাপিত।
নায়িকা—চক্ষুঃ দুটি লালবর্ণ কেন দেখা যায়?
দূতী—রাগ হ'য়েছিল বড় তাহারি কথায়।
নায়িকা—আলুলিত কেন চূর্ণ কুন্তল তোমার?
দূতী—বায়ু ভরে এইরূপ অবস্থা আমার।
নায়িকা—নষ্ট হ'লো কিরূপে বা কুঙ্কুম-লেপন?
দূতী—ইহার কারণ গাত্র-বস্ত্রের ঘর্ষণ।
নায়িকা—ক্লান্ত হ'য়ে পড়িয়াছ কিসের কারণ?
দূতী—যাতায়াতে হইয়াছে কষ্ট বিলক্ষণ।
নায়িকা—সকলি বুঝিনু, ক্ষত কেন বা অধর?
দূতী—মশার কামড় সখি! বড় ভয়ঙ্কর!

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে, উদ্ভট-সাগর।



নেবুর ব্যবসায়

ভারতবর্ষের নানা স্থানে কাগজী, পাতি, গোঁড়া প্রভৃতি নানা জাতীয় নেবু অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। নেবুর ব্যবহারও দেশের মধ্যে যথেষ্ট; কিন্তু ব্যবসা হিসাবে নেবুর যে বিশেষ একটা স্থান আছে, তাহার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। জার্ম্মাণী হইতে নবপ্রচারিত 'কমারসিয়াল রিভিউ' নামক পত্রে ভারতীয় নেবুর ব্যবসা সম্বন্ধে নানা কথা লিখিত হইয়াছে। প্রবন্ধলেখক তাহাতে আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে প্রচুর নেবু উৎপন্ন হয় সত্য, ইহার ব্যবহারও যথেষ্ট; কিন্তু নেবুকে এ পর্য্যন্ত কেহ দেশান্তরে—প্রতীচ্যদেশে রপ্তানী করিবার চেষ্টা করেন নাই।

বাস্তবিক এ দেশে যে পরিমাণ নেবু জন্মায়, দেশের লোকের ব্যবহারের তুলনায় তাহা অপর্য্যাপ্ত। মানুষের আহার্য্য হিসাবে নেবু ব্যবহৃত হইবার পর অবশিষ্ট যাহা থাকে, তাহা হইতে 'আচার' তৈয়ার হয় বটে; কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে জানা যাইবে যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে নেবু নষ্ট হইয়া যায়।

ইহার কারণ কি? অনুসন্ধানফলে দেখা যাইবে যে, নেবু অন্যত্র রপ্তানী করিবার সুবিধা হয় না বলিয়াই নষ্ট হইয়া যায়। গ্রাম, পল্লী হইতে রেলযোগে নেবু চালান দিবার সুবিধা সর্ব্বত্র নাই। যদি বা রেলযোগে কোন কোন স্থান হইতে নেবু বন্দরে নীত হইতে পারে; কিন্তু বিদেশে উহা চালান দিবার এমন অসুবিধা ঘটে যে, তাহাতে ব্যবসা করা চলে না। বিশেষতঃ যে সকল দেশে উহা রপ্তানী করা চলে, তথায় পর্য্যাপ্ত নেবু উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া ভারতীয় কৃষকগণ নেবু কিরূপে প্যাক করিয়া প্রতীচ্য দেশে পাঠাইতে হয়, তাহাও অবগত নহে। নেবু বেশী দিন কোনও পাত্রে আবদ্ধ করিয়া রাখিলে শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যায়, কাজেই ভারতবর্ষ হইতে অন্যত্র কাঁচা নেবু রপ্তানী করিবার কোনও উপায় নাই।

ভারতবর্ষ হইতে য়ুরোপ এত দূরে অবস্থিত এবং মালের মাশুল এত অধিক যে, কাঁচা নেবু তথায় রপ্তানী করিয়া লাভ নাই। এতদ্ব্যতীত ইটালী, দক্ষিণ-ফ্রান্স (ফরাসী উপনিবেশ আল্‌জিরিয়াস্‌, টিউনিস্‌ এবং মরক্কো), স্পেন, এবং পর্ত্তুগালের কোন কোন স্থানে নেবু উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই সকল স্থান হইতে য়ুরোপের বাজারে টাটকা নেবু রপ্তানী হয়। তাজা নেবুর চাহিদা য়ুরোপের সর্ব্বত্রই খুব বেশী। শীতকালে রুসিয়ায় চায়ের সহিত নেবুর রস সেবন করিবার প্রথা প্রবল। দক্ষিণ-য়ুরোপ রুসিয়াকে নেবু সরবরাহ করিয়া থাকে। ফিন্‌ল্যাণ্ডের মত স্থানেও এমন গ্রীষ্মাধিক্য ঘটে যে, তখন নেবুর রস ছাড়া কোনও পানীয় সেবন করা চলে না। ফিন্‌ল্যাণ্ডের বিধানানুসারে তথায় তরল মাদক দ্রব্য সেবন নিষিদ্ধ, কাজেই শীতল পানীয়ে নেবুর রস ও অন্যান্য ফলের রস মিশাইয়া তত্রত্য অধিবাসীরা সেবন করিয়া থাকে।

দীর্ঘকাল ধরিয়া ইটালী উত্তর-য়ুরোপের এই অভাব পূর্ণ করিয়া আসিতেছে। য়ুরোপে রেলপথের যেরূপ সুব্যবস্থা এবং মাল আমদানী-রপ্তানীর যে প্রকার সুবন্দোবস্ত বিদ্যমান, তাহাতে উৎপন্ন দ্রব্য দেশান্তরে চালান দেওয়া খুবই সহজ, কিন্তু তৎসত্ত্বেও এ পর্য্যন্ত ইটালী তাহার উৎপন্ন নেবুর অতিরিক্ত অংশ সম্পূর্ণরূপে রপ্তানী করিতে সমর্থ হয় নাই।

উল্লিখিত অসুবিধা দূরীভূত করিবার অভিপ্রায়ে ইটালী কয়েক বৎসর ধরিয়া নেবু হইতে 'সাইট্রিক এসিড' বাহির করিতে আরম্ভ করিয়াছে। উক্ত এসিডকে তরল অবস্থা হইতে কঠিন (Solid) অবস্থায় লইয়া গেলে রপ্তানীর বিশেষ সুবিধা। ইটালীর পল্লীবাসীরা অবশ্য এ জন্য বিরাট কলকারখানার সাহায্য লয় নাই। কুটীরশিল্পের হিসাবে গৃহস্থগণ নেবু হইতে 'সাইট্রিক এসিড' বাহির করিয়া থাকে। ইহাতে বেশী মূলধন, যন্ত্রপাতি অথবা বিশিষ্ট জ্ঞানেরও প্রয়োজন নাই। প্রণালী খুবই সহজ।

প্রথমতঃ নেবুর খোসা ছাড়াইয়া লওয়া হয়। তাহার পর

কাঠের বড় বড় পাত্রে অথবা সিমেন্টকরা গর্ত্তে নেবুগুলি নিক্ষিপ্ত করিয়া মর্দ্দন করিতে হয়। এই সময় মাঝে মাঝে গুঁড়া চুণ ছড়াইয়া দেওয়া প্রয়োজন। গুঁড়া চুণের মধ্যে ক্যাল্‌সিয়ম্ কার্ব্বোনেট আছে। ইটালীয় মর্ম্মর প্রস্তরের চূর্ণাংশ হইতে উল্লিখিত চুণ পাওয়া যায়। ইহার মূল্য অত্যন্ত কম এবং ইহা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। মর্ম্মর প্রস্তর কোন্ উপাদানে প্রস্তুত, তাহা বৈজ্ঞানিকগণ ভালই জানেন। খাঁটি চুণ দানা বাঁধিয়া (জমাট) গেলেই মর্ম্মর প্রস্তরে পরিণত হয়। সাইট্রিক এসিডের শক্তি খুবই বেশী। উত্তপ্ত না করিলেও অর্থাৎ শীতল অবস্থাতেই সাইট্রিক এসিড চুণ হইতে কার্ব্বলিক এসিড বাহির করিয়া দেয় এবং অল্পক্ষণমধ্যেই 'ক্যালসিয়ম্ সাইট্রেট' নামক জলীয় পদার্থে রূপান্তরিত হইয়া যায়। এই জলীয় পদার্থ কাঠের পিপায় ভরিয়া রাখিতে হয়। পিপার মুখ বিস্তৃত হওয়া প্রয়োজন। সূর্য্যের উত্তাপে পূর্ণ পিপাগুলি রাখিয়া দিলে ক্রমে জলীয় অংশ অন্তর্হিত হইবে। তখন ক্যালসিয়ম্ সাইট্রেটের জমাট দানাগুলি দেখিতে পাওয়া যাইবে। ভালরূপে রৌদ্রে শুকাইয়া উক্ত পদার্থগুলি বাক্স অথবা থলিতে ভরিয়া ফেলিতে পারিলে অনায়াসে দেশদেশান্তরে রপ্তানী করা চলিবে। প্রণালী আদৌ কঠিন নহে। ভারতীয় কৃষকগণ অনায়াসেই এই উপায় অবলম্বন করিয়া নেবুর ব্যবসায় চালাইতে পারে।

ইটালীতে উৎপাদিত ক্যালসিয়ম্ সাইট্রেট সাধারণতঃ জার্ম্মাণীতে প্রেরিত হইয়া থাকে। জার্ম্মাণ বৈজ্ঞানিক উহা হইতে বিশুদ্ধ সাইট্রিক এসিড প্রস্তুত করিয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র চালান দিয়া থাকে। ইটালীতে রাসায়নিক বিজ্ঞান পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পুষ্টিলাভ করে নাই বলিয়া তাহাকে এ বিষয়ে জার্ম্মাণীর সহায়তা গ্রহণ করিতে হইতেছে।

ইটালী যে উপায়ে এই রাসায়নিক পদার্থ প্রস্তুত করিয়া থাকে, ভারতবর্ষ তাহা পারিবে না কেন? সাধারণভাবে বুঝাইয়া দিলেই ভারতীয় কৃষকগণ অনায়াসে উল্লিখিত প্রণালীতে নেবু হইতে সাইট্রিক এসিড নিষ্কাশন করিতে পারিবে। নেবু হইতে এমন লাভজনক পদার্থ নির্ম্মিত হয় জানিলে কৃষকের দল নেবুর চাষের দিকেও অবহিত হইবে, যাহাতে উৎকৃষ্ট ও প্রচুর নেবু উৎপন্ন হয়, সে দিকেও দেশের লোকের মনোযোগ আকৃষ্ট হইবে। ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ বঙ্গদেশে প্রচুর স্থান অকর্ষিত অবস্থায় পড়িয়া আছে, এ বিষয়ে দেশের কল্যাণকামী মাত্রেরই দৃষ্টিপাত করা অত্যাবশ্যক।

নেবুর অব্যবহার্য্য অংশগুলি সার হিসাবে ব্যবহার করা যায়। বাগানের সারের কার্য্যে উহা বিশেষ উপযোগী। নেবুর বীচিগুলি বাছিয়া রাখিলে নূতন চারা উৎপাদন করার সুবিধাও ঘটে।

কতিপয় গ্রাম সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া সমবায় প্রণালীতে কায করিলে আরও ভাল হয়। ভারতবর্ষের যে সকল স্থানে সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার কর্ত্তৃপক্ষগণ এ বিষয়ে অবহিত হইলে অতি সহজেই নেবু হইতে প্রচুর পরিমাণে নির্য্যাস বাহির করিয়া ব্যবসা চালাইতে পারিবেন। এ সকল কার্য্য তাঁহাদিগের পক্ষেই সম্ভব ও সহজসাধ্য। বঙ্গদেশের কৃষকগণ পাট ও ধান চাষের পর অনেক সময় বৃথা যাপন করিয়া থাকে। নেবুর চাষ ও তাহা হইতে নির্য্যাস বাহির করিলে অর্থাগমের সুবিধা হইবে বুঝাইয়া দিলেই তাহারা এ সকল কার্য্যে যোগদান করিতে পারে। অবশ্য সমবায় সমিতি তাহাদিগকে চালনা করিবেন।

নেবুর খোসা হইতে নেবুর তৈল প্রস্তুত হইয়া থাকে। খোসার উপরের পীতভাগেই তৈল বিদ্যমান। ভিতরের শাদা আবরণ ভাগে নানা প্রকার তিক্ত রসের সমাবেশ আছে, সকলেই তাহা অল্পবিস্তর অবগত আছেন। বিজ্ঞানের উন্নতি ঘটায় যন্ত্রযোগে অধুনা নেবুর খোসা ছাড়ান হইয়া থাকে। ঐ খোসা মাড়িয়া তৈল নির্গত করা হয়। গ্রামে গ্রামে এই তৈল-নিষ্কাশনপ্রণালীও অবলম্বিত হইতে পারে। অবশ্য বিশুদ্ধ পদার্থ পল্লী-গৃহস্থ প্রস্তুত করিতে পারিবে না। কিন্তু তাহা না হইলেও অবিশুদ্ধ তৈল নির্গত হইলে পরে কারখানায় যন্ত্র সাহায্যে তাহাকে বিশুদ্ধ করিয়া লওয়া চলিতে পারে।

আর একটা কথা আছে। যদি ভারতীয় কৃষকগণ খোসা হইতে তৈল নির্গত করার প্রয়োজন অনুভব না করে, তবে, খোসা শুকাইয়া জার্ম্মাণীতে প্রেরণ করিলে তথায় তৈল উৎপাদিত হইবে। ইহাতেও দেশের লোকের একটা ব্যবসায় চলিতে পারে। খোসাগুলি নষ্ট না করিয়া তদ্দ্বারা লাভের পথ নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। ইদানীং নেবুর তেলের দাম খুবই বেশী। বড় বড় হোটেল, রেস্তোঁরা প্রভৃতিতে রাসায়নিক প্রণালীতে নেবুর স্মারক প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত

হয়। শীতপ্রধান দেশের লোক শীতকালে জমান জিনিষ ছাড়া কিছুই ব্যবহার করিতে পায় না। জার্ম্মাণীতে অন্য দেশের তাজা ফল কিছুই পাইবার উপায় নাই। কাযেই সেখানকার জনসাধারণ রাসায়নিক পদার্থ অথবা জমান জিনিষের উপরই প্রধানতঃ নির্ভর করিয়া থাকে।

এই সকল বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেশের নেতৃবর্গ অথবা মনীষীরা যদি কৃষককুলকে এ বিষয়ে উদ্‌বুদ্ধ করিয়া তুলেন, তবে প্রকৃতই তাহাদের, তথা দেশের ধনসম্পদ বৃদ্ধির উপায় করিতে পারিবেন। এখনই উপযুক্ত অবসর। য়ুরোপের উত্তরাংশে অবস্থিত সকল স্থানেই ভারতীয় নেবু-জাত রাসায়নিক পদার্থের পর্য্যাপ্ত বিক্রয় ঘটিবার বিশেষ সম্ভাবনা।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

আমের সদ্ব্যবহার

আবার আমের সময় উপস্থিত। এবার কলিকাতার নিকট-বর্ত্তী স্থানসমূহে আমের ফসল তেমন হয় নাই বলিয়া শুনা যাইতেছে। সে যাহাই হউক এবং বাঙ্গালা ও অন্যান্য প্রদেশে আম যতই কম থাকুক না কেন, তবুও সুদূর গণ্ডগ্রামের হাটবাজারে যথাসময়ে আম দেখা দিবে এবং ধনী ও দরিদ্র, বৃদ্ধ ও শিশু সকলেরই অল্পবিস্তর মাত্রায় এই উপাদেয় ফল দ্বারা রসনা পরিতৃপ্ত করিবার সুবিধা হইবে। ভারতের সমতল দেশ হইতে আরম্ভ করিয়া হিমালয়ের ৩ হাজার ফুট উচ্চস্থান পর্য্যন্ত আম্রবৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। ঠিক কোন্ দেশে আমের উৎপত্তি হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও অনেকেই ইহা স্বীকার করেন যে, দক্ষিণ এসিয়া-খণ্ডই আমের জন্মভূমি। অতি পুরাতন সংস্কৃত সাহিত্যেও আমের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় এবং কদলী, নারিকেল প্রভৃতি মূল্যবান্ ব্যবহারিক ফলসমূহের ন্যায় আমও (পল্লব) হিন্দুগণের কতকগুলি ক্রিয়াকলাপে ব্যবহারের ব্যবস্থা করিয়া শাস্ত্রকারগণ আম্রবৃক্ষপ্রসারের পথ সুগম করিয়া গিয়াছেন। বহু পুরাকালেও ভারতীয় নাবিক-গণ আমচুর ও আম-আচার দূরদেশে যাইবার সময় সঙ্গে লইয়া যাইতেন। আজকালের Vitamineএর খবর সে কালের লোকজন না জানিলেও তাহারা কার্য্যতঃ বুঝিয়াছিল যে, সংরক্ষিত আম্র নাবিকদিগের দেহরক্ষার পক্ষে বিশেষ আবশ্যকীয়। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, স্কার্ভি-নাশক (antiscorbutic) হিসাবে নেবুর রস অপেক্ষা আমচুর দ্বিগুণ ফলপ্রদ এবং অধিক দিন অবিকৃত অবস্থায় থাকে। আমের প্রায় ৩০টি জাতি (species) আছে; তন্মধ্যে অধিকাংশই মলয় দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসী। ভারতে জাতির সংখ্যা কম হইলেও বহু শতাব্দী ধরিয়া চাষ হওয়ায় 'প্রকারে'র (variety) পরিমাণ অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। সম্পূর্ণভাবে স্বতন্ত্র লক্ষণযুক্ত প্রকারের সংখ্যা ন্যূনাধিক ৫ শত হইবে। এতদ্ভিন্ন উপ-প্রকার (sub-variety) যে কত আছে, তাহা স্থির করা কঠিন।

উৎপাদন-কেন্দ্র

শ্রীহট্টের জঙ্গলে যে 'লক্ষ্মী' আম পাওয়া যায়, তাহা প্রায় আমড়ারই সমতুল্য। খোসা ও আঁটি বাদ দিলে শাঁসের ভাগ সামান্যই থাকে এবং তাহা কটু ও অম্ল স্বাদযুক্ত। হিমালয়ের সিকিম, ভুটান প্রভৃতি পার্ব্বত্য অঞ্চলে, খাসিয়া পর্ব্বত ও মধ্যপ্রদেশের সাতপুরা পর্ব্বতশ্রেণীতে স্থানে স্থানে এই প্রকার বন্য আম দেখিতে পাওয়া যায়। এই বন্য আমই বর্ত্তমান কর্ষিত আমের পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া অনুমান করা যায়। কিন্তু আমড়ার ন্যায় আকার ও স্বাদবিশিষ্ট বন্য আমের সহিত ল্যাংড়া, বোম্বাই, আলফন্সো প্রভৃতি উৎকৃষ্ট আমের সর্ব্বপ্রকার পার্থক্য এত অধিক যে, সাধারণ লোক তাহা সহজে উপলব্ধি করিতে পারে না। এই দুইটি প্রান্ত অবস্থার মধ্যবর্ত্তী যে শত শত প্রকারের আম আছে, কেবল তাহাদের লক্ষণাদির অনুশীলন করিলেই যে সকল স্তর দিয়া বর্ত্তমান অত্যুন্নত আম উদ্ভূত হইয়াছে, তাহার আভাস পাওয়া যায়। রাজপুতানা, পশ্চিম পঞ্চনদ প্রভৃতি প্রায় বারিবিহীন অঞ্চল ব্যতীত ভারতের প্রত্যেক প্রদেশেই অল্পবিস্তর আম উৎপন্ন হয়। বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যা, যুক্তপ্রদেশ ও পূর্ব্ব-দক্ষিণ পঞ্চনদের অনেক স্থান বিশেষ বিশেষ প্রকার আমের জন্য প্রসিদ্ধ। বোম্বাই, মাদ্রাজ, মহীশূর ও গোয়ালিয়র রাজ্য ও পর্ত্তুগীজ গোয়া সম্বন্ধেও তাহাই বলিতে পারা যায়। কলিকাতার বাজারে বহু দূরদেশ হইতে আম

চালান আইসে এবং বৎসরের সব সময়েই আম পাওয়া যায়।

আমের উপকারিতা

খাদ্যের হিসাবে আমের কথা ছাড়িয়া দিলেও অন্য প্রকারে আম কম কাযে আইসে না। মধ্যপ্রদেশে বন্য জাতিগণ আমের বীজ-দলগুলি ফেলিয়া দেয় না; উত্তমরূপে শুষ্ক ও চূর্ণ করিয়া গরম জল দিয়া ধুইয়া লয়। তাহাতে কস বাহির হইয়া গিয়া যে আটা প্রস্তুত হয়, তাহা খাইতে কতকটা জোয়ারের আটার মত। বস্তুতঃ জোয়ারের আটা মিশ্রিত করিয়া উহার রুটী তৈয়ারী হয়। আমের কাঠও যে মূল্যবান্, তাহা অনেকেই জানেন। আমাদের দেশে আমগাছ তত উচ্চ হয় না; বরং প্রস্থে অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। দাক্ষিণাত্যে মালাবার, কানাড়া প্রভৃতি স্থানের জঙ্গলে কিন্তু যে সকল গাছ দেখা যায়, সেগুলি ৪০ হাতেরও অধিক উচ্চ, ৩০ হাতের উপরেও প্রথম শাখা বাহির হয় এবং বেড়ও প্রায় ৬।৭ হাত। এরূপ গাছের সংখ্যা কিন্তু কমিয়া আসিতেছে; কারণ, ডোঙ্গা, কৃষিকার্য্যের যন্ত্রাদি, গাড়ীর চাকা, প্যাকিং বাক্স প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে ও গৃহনির্ম্মাণে ক্রমশঃ অধিক পরিমাণ আম্রকাঠ ব্যবহৃত হইতেছে। ঔষধ হিসাবে পক্ক আম্র পুষ্টিকর, বলবর্দ্ধক ও ঈষৎ রেচক। আয়ুর্ব্বেদে আম্রমুকুল, ত্বক্ ও বীজদল সঙ্কোচক বলিয়া বিবেচিত ও উদরাময় প্রভৃতি রোগে ব্যবহৃত হয়। এলোপ্যাথিক ডাক্তারগণও আমের বীজদল চূর্ণ প্রয়োগে কৃমি, অর্শ ও রক্তঃকৃচ্ছ্রতায় বিশেষ উপকার পাইয়াছেন। আমের ছাল অথবা ফলত্বকের তরল সার (Liquid Extract) জরায়ু, ফুস্ফুস্ অথবা পাকস্থলী হইতে রক্তস্রাব বন্ধ করিতে বিশেষ ফলপ্রদ।

ফলের উপাদান

পূর্ণ পরিপুষ্ট, কিন্তু অপক্ক আম্র বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ইহাতে জলে দ্রবণীয় অংশের মাত্রা শতকরা ৬১ ভাগেরও অধিক। ম্যালিক্, টার্টারিক ও সাইট্রিক—এই ৩ প্রকার অম্লই আমে পাওয়া যায়, কিন্তু শেষোক্তের মাত্রা অত্যন্ত কম। আম পাকিতে আরম্ভ হইলে, ফলে অনেক রাসায়নিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। তাহার মধ্যে পত্র-হরিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া, রক্তাভ পীত-বর্ণ ধারণ করাই অন্যতম। এই সময়ে শ্বেতসারশ্রেণীর পদার্থগুলিও শর্করায় পরিণত হয়। অপক্ক আমে মোট অম্লের পরিমাণ শতকরা ২৪ ভাগেরও অধিক থাকে। পক্ক আম্রের স্বাদ ও পুষ্টিকর পদার্থের পরিমাণ যেমন বীজ অথবা কলমের উপর নির্ভর করে, তেমনই জলবায়ু ও মৃত্তিকার প্রভাবও ফলের উপর বিশেষরূপে বিকাশ পায়। স্থানভেদে বোম্বাই অথবা ল্যাংড়া আমের পার্থক্য ইহার একটি বিশেষ উদাহরণ। ফলতঃ আম শুধুই মুখ-রোচক ফল নহে, ইহাতে পুষ্টিকর পদার্থও যথেষ্ট পরিমাণে আছে। আমের খোসাও উৎকৃষ্ট পশুখাদ্য। আমের সময় বিহার, যুক্তপ্রদেশ, পঞ্চনদ ও মধ্যপ্রদেশের সাধারণ লোকদিগকে অনেক সময় এক বেলা আম খাইয়া কাটাইয়া দিতে দেখা যায়। ইহার দ্বারা শরীরপুষ্টির যথেষ্ট সহায়তা হয় বলিয়া তাহাদের ধারণা। ধারণাটা অমূলক নহে, কিন্তু সেরূপ অগ্নির তেজ থাকা দরকার।

আমের ব্যবহার

উৎপাদনের হিসাবে সমস্ত আম্র ফলের যে সদ্ব্যবহার হয় না, তাহা অস্বীকার করা যায় না। যে সকল স্থানের সহিত রেল, নৌকাপথ অথবা উত্তম রাস্তা দ্বারা বড় বড় বাজারের সংযোগ আছে, সেরূপ স্থানের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু এখনও এমন অনেক উৎপাদন-কেন্দ্র আছে, যেখান হইতে অবিক্রীত অবস্থায় বড় বড় বিক্রয়ের স্থানে আম চালান দিয়া খরচে পোষায় না। যে বৎসর পুরা ফলন হয় অথবা যে সব অঞ্চ-লের সমস্ত আম্র ফসল প্রায় এক সময়ে পাকিয়া উঠে, যেমন পঞ্চনদে, সে সব সময়ে ও স্থানে কয়েক দিন আম খুব সস্তা হয় বটে, কিন্তু অপচয়ও অনেক হয়। এই সমস্ত কারণেই আম্র সংরক্ষণের কয়েকটি প্রথা বহুকাল হইতে এ দেশে চলিয়া আসিতেছে; তন্মধ্যে ৩টি প্রথা বিশেষরূপে উল্লেখ-যোগ্য:—আমচুর, আমসত্ত ও আচার। এগুলির প্রস্তুত-প্রণালী বর্ণনা করা নিষ্প্রয়োজন; তাহা প্রায় সকল গৃহস্থই জানেন। দুঃখের বিষয় যে, আজকাল বাঙ্গালার অন্যান্য প্রকার গৃহ-শিল্প ও রন্ধন কার্য্যের অবনতির সহিত আমের

যে নানাপ্রকার উপাদেয় চাটনি হইত, তাহা প্রায় উঠিয়া আসিতেছে।

আধুনিক সংরক্ষণ-প্রণালী

ফল-সংরক্ষণের যাবতীয় প্রণালীকে মূলতঃ দুইটি ভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়:—শুষ্ক ও আর্দ্র। শুষ্ক প্রথায় কৃত্রিম অথবা সূর্য্যোত্তাপ দ্বারা ফলের জলীয়াংশ বাহির করিয়া লওয়া হয়। পঞ্চনদের কুলু অঞ্চলে য়ুরোপীয়-দিগের যে সকল ফল-বাগিচা আছে, তৎসমুদয়ে কৃত্রিম তাপে শুষ্কীকৃত মেওয়া, নাসপাতি, আঞ্জীর প্রভৃতি কলিকাতার প্রসিদ্ধ হগ্ বাজারে বিক্রয় হয়। সচরাচর বাজারে প্রাপ্ত আঙ্গুর (কিসমিস্), খোবানি ইত্যাদি রৌদ্রে শুকান। কৃত্রিম তাপপ্রয়োগে ফল শুষ্ক করিবার জন্য বিশেষ প্রকারের কলকব্জা উদ্ভাবিত হইয়াছে। কলের একটি কামরায় উত্তমরূপে পরিষ্কৃত ফল তারের দেরাজে (tray) রাখিয়া, অনেকগুলি দেরাজ উপর্য্যুপরি অসংলগ্নভাবে সাজাইয়া, কামরার ভিতর দিয়া ঈষৎ বায়ুপ্রবাহ চালিত করিয়া অল্পসময়ের মধ্যে বহুসংখ্যক ফল শুকাইয়া ফেলাই এই সমুদয় কলের উদ্দেশ্য। এইরূপ ভাবে শুষ্কীকৃত ফলের চেহারা স্বাভাবিক ফল হইতে অনেক বিভিন্ন হইয়া যায় বটে, কিন্তু ব্যবহারের পূর্ব্বে উষ্ণ জলে কিছুক্ষণের জন্য রাখিলে ফলগুলি আবার অনেকটা স্বাভাবিক অবয়ব প্রাপ্ত হয়। এই প্রকারের কল চালাইতে অধিক মূলধন প্রয়োজন এবং কারখানাও উৎপাদন-কেন্দ্রের নিকটস্থ হওয়া দরকার; তাহা না হইলে কারখানার জন্য অবিকৃত অবস্থায় যথেষ্ট পরিমাণ ফল পাওয়া অসম্ভব।

আর্দ্র প্রথা দ্বারা ইচ্ছামত গোটা ফল অথবা উহার অংশ সংরক্ষিত করিতে পারা যায়। চিনির রস, তৈল, মধু, সির্কা অথবা বিশেষ উপাদানে প্রস্তুত তরল পদার্থাদির মধ্যে আর্দ্র উপায়ে ফল সংরক্ষণ করা হয়। আমরা পূর্ব্বে যে আমচুর, আমসত্ত্ব ও আচারের বিষয় উল্লেখ করিয়াছি, তাহার মধ্যে প্রথম দুইটি শুষ্ক ও শেষোক্তটি আর্দ্র প্রথায় প্রস্তুত। আম উভয় প্রকার প্রণালীতে সংরক্ষণের উপযোগী। কিন্তু অধিক কলকব্জার আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া প্রচলিত প্রথার উন্নতিসাধন দ্বারা যে সহজ বৈজ্ঞানিক প্রথা উদ্ভাবিত হইতে পারে, তাহারই দেশমধ্যে প্রচলন হওয়া সম্ভবপর। বিগত মহাসমরের সময় এই দেশ হইতে সূর্য্যোত্তাপে সংরক্ষিত ফল ও সব্জী মেসোপোটেমিয়ায় পাঠাইবার বন্দোবস্ত সরকার করিয়াছিলেন। তাহাতে দেখা গিয়াছে যে, এইরূপ প্রথায় শুষ্ক করিয়া ফল ও সব্জী অনেক দিন ভাল অবস্থায় রাখিতে পারা যায়। এ স্থলে বলা প্রয়োজন যে, একেবারে পাকা ফল সংরক্ষণ করা কঠিন। সবে মাত্র পাকিবার লক্ষণ দেখা দিয়াছে, সংরক্ষণের জন্য এইরূপ ফল নির্ব্বাচন করাই প্রশস্ত। কিন্তু এরূপ ফলের পক্ষেও শুষ্ক অপেক্ষা আর্দ্র প্রথা অধিকতর উপযোগী। গ্রীষ্মমণ্ডলে সূর্য্যোত্তাপ ভিন্ন আর কোন শুষ্কীকরণের প্রথা সুলভ হইতে পারে না। মিশর ও ক্যালিফর্ণিয়ায় সূর্য্যোত্তাপ সদ্ব্যবহারের জন্য কয়েক প্রকার কল হইয়াছে। তাহাতে উপযুক্তরূপ আয়না দ্বারা সূর্য্য-কিরণ নির্দ্দিষ্ট স্থানে কেন্দ্রীভূত করা হয় এবং সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে কোন দ্রব্য শুকান চলে অথবা জল হইতে বাষ্প প্রস্তুত করিয়া তাহার সাহায্যে কল চালান যায়। শুনিতে পাওয়া যাইতেছে যে, জর্ম্মণীর সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক এডলফ মার্কুস্ এই প্রকারের একটি বিশেষ কার্য্যকর কল প্রস্তুত করিয়াছেন। আমাদের দেশে এ সম্বন্ধে ধারাবাহিক অনুসন্ধান হওয়া অতীব প্রয়োজনীয় হইয়াছে।

চলিত প্রথার উন্নতি

এতদ্দেশে উপযুক্ত কল উদ্ভাবিত না হওয়া পর্য্যন্ত সাধারণ কয়েকটি বৈজ্ঞানিক প্রথা অবলম্বন করিয়া সংরক্ষিত ফল-শিল্পের পরিসর অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি করিতে পারা যায়। অপক্ব আম্র উত্তমরূপে সংরক্ষণ করিতে হইলে প্রথমে সুপুষ্ট ও ক্ষতাদিবিহীন ফল নির্ব্বাচন করা দরকার। পরে সেগুলিকে ধুইয়া মুছিয়া একটু পুরু করিয়া ছাল ছাড়াইয়া ও ইচ্ছানুরূপ খণ্ড করিয়া পরিষ্কৃত জলে কিছুক্ষণ রাখিতে হয়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত কসযুক্ত জল বাহির হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত বারংবার জল পরিবর্ত্তন করিয়া ধোয়া প্রয়োজন। পরে উপর হইতে ঝোলান বাখারির টুকরির মধ্যে খণ্ডগুলি রাখিয়া, জল ঝরাইয়া লইতে হয়। তাহার পর মাটী হইতে ২ হাত উচ্চে নলের টাটি, কিংবা তার অথবা সূতার জাল খাটাইয়া রৌদ্রে শুকান দরকার, উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দিলে ৪।৫ দিনের প্রখর রৌদ্রেই আম্রখণ্ডগুলি শুকাইয়া যায়।

পূর্ণ শুষ্ক হওয়ার কিছু পূর্ব্বে খণ্ডগুলিকে ছায়ায় সরাইয়া লইয়া শুকাইবার কায সমাধা করিতে হয়; তাহা না হইলে বর্ণ প্রায়ই অত্যন্ত মলিন হইয়া যায়। এই প্রকারে প্রস্তুত আমচুর কাগজমণ্ডিত টিনের বাক্সে প্যাক করিলে অনেক দিন অবিকৃত অবস্থায় থাকে। আমসত্ত্ব উত্তমরূপে প্রস্তুত করিতে পারিলে বিদেশে ইহার যথেষ্ট কাটতি হইতে পারে। কিন্তু সাধারণতঃ ব্যবসায়িগণ যেরূপ ভাবে ইহা প্রস্তুত করে, তাহা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। প্রথমতঃ আমের রস বাহির করিবার সময় হস্ত ও পাত্রাদি যত পরিষ্কার রাখা যায়, ততই ভাল। দ্বিতীয়তঃ রস বাহির করা হইলে উহা ২।৩ বার পাটের অথবা চুলের ছাঁকনির ভিতর দিয়া পরিষ্কার করিয়া লইলে সমস্ত আঁশ বাহির হইয়া যায়। আমের রসে আটাবৎ যে পদার্থ আছে, তাহাও পৃথক হয়। তখন চেপ্‌টা মসৃণ পাত্রে পাতলা করিয়া রস ঢালিয়া শুকাইবার সুবিধা হয়। বাষ্পোত্তাপে ঘনীভূত রস ছাঁচে ঢালিয়া পরে চাপ ও তাপ সংযোগে যে আমসত্ত্ব প্রস্তুত হয়, তাহা নির্দ্দিষ্ট ওজনের ও গুণের। য়ুরোপ এবং আমেরিকায় চাটনি ও যৌগিক খাদ্য-প্রস্তুতকারকগণ এরূপ আমসত্ত্ব আগ্রহের সহিত ক্রয় করিয়া থাকেন।

আম্র ও আম্রজাত দ্রব্যাদির কাটতি

আচার, মোরব্বা প্রভৃতি আম্রজাত দ্রব্যাদির বিশেষ আলোচনা এ স্থলে অনাবশ্যক। কারণ, তৎসমুদায় প্রস্তুতের নানাবিধ প্রণালী আছে এবং আম ব্যতীত অন্যান্য মসলাও ঐ সকল প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়। উপাদানের পার্থক্যে এবং তৈয়ারীর ধরণের হিসাবে এক বা অন্য প্রণালী অবলম্বিত হয়। এরূপভাবে প্রস্তুত দ্রব্যাদির দেশে ও বিদেশে যথেষ্ট কাটতি আছে। ফল হিসাবে আমের কাটতি প্রায় দেশমধ্যেই আবদ্ধ। ভারত হইতে ২ লক্ষ টাকার উপর ফল বিদেশে যায়; তন্মধ্যে আমও কতক পরিমাণে আছে। কিন্তু প্রতি বৎসর যে ১০ লক্ষ টাকার উপরেও (১৯২২-২৩ খৃষ্টাব্দে ১২ লক্ষ ১৭ হাজার ৩ শত ৯৩৲) চাটনি প্রভৃতির রপ্তানী হয়, তাহার অধিকাংশই যে আম্রজাত দ্রব্য, তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়। ভারতের এই বিশিষ্ট ফলের বহির্ব্বাণিজ্য যে এখনও নিতান্ত শৈশবাবস্থায়, তাহা সর্ব্বজনবিদিত। যে প্রণালীতে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ হইতে কোটি কোটি টাকার ফল বিদেশে প্রেরিত হইতেছে, সে প্রণালীতে আমও রপ্তানী করা যাইতে পারে। কিন্তু সেরূপ উদ্যমশীল ধনী দেশে কোথায়? প্রসিদ্ধ টাটা কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা জেম্‌সেটজী নসরবানজী টাটা এক সময়ে ফল চালানের বিশেষ ব্যবস্থাযুক্ত (refrigerating chambers) জাহাজে বিদেশে আম পাঠাইবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন। কিন্তু বহুবিধ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় তাঁহার সে সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হয় নাই। বর্ত্তমান সময়েও এক য়ুরোপীয় কোম্পানী উপযুক্ত কেন্দ্রসমূহে ঠাণ্ডা গুদাম (cold storage) রাখিয়া ভারতের বড় বড় বাজারে মৎস্য, মাংস, ফল প্রভৃতি সরবরাহ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ইঁহারা সময়ে রপ্তানীর কাযেও হাত দিতে পারেন। কিন্তু সেরূপভাবের কারবারে ভারতবাসীর স্বার্থ যে বজায় থাকিবে, তাহা বোধ হয় না।

ব্যবসায়ের পরিসরবৃদ্ধি

রাস্তাঘাটের উন্নতি ও রেলপথের বিস্তৃতির সহিত ফলের হিসাবে আমের কাটতি যে অধিক হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। আকার ও স্বাদ হিসাবে ফল পৃথক্‌করণ (grading), উত্তম প্যাকিং ও সম্ভবমত মূল্য—এই ৩টি বিষয়ের উপর দৃষ্টি রাখিলেই আমের ব্যবসায়ে যথেষ্ট লাভ হইতে পারে। সত্য বটে, এখনও পর্য্যন্ত আমাদের দেশে ভাল ফলের তেমন আদর নাই। কিন্তু সেটা কতকটা আর্থিক অবস্থা ও কতকটা অজ্ঞানতাজনিত। ডাল, ভাত, মাছ প্রভৃতির ন্যায় ফলও যে পুষ্টিকর খাদ্য এবং শরীরের কোন কোন অবস্থায় সাধারণ খাদ্য অপেক্ষাও ইহা যে অধিক উপকারী, এখনও সকলে তাহা বুঝে না। আমরা ইতঃপূর্ব্বে কয়েকটি ইংরাজী পত্রে শিক্ষিত ভদ্রমণ্ডলীর এই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা সর্ব্বসাধারণকে ইহা বিশেষ করিয়া বলিতে চাই যে, আম্র ফসলের অপচয়ে আমাদের বিশেষ ক্ষতি আছে। আজকাল যেরূপ পুষ্টিকর খাদ্যের ক্রমশঃ অভাব হইয়া পড়িতেছে, তাহাতে আমের ন্যায় ফল যত অধিক পরিমাণে সংরক্ষিত করিতে পারা যায়, ততই ভাল। বর্ত্তমান সময়ে এমন অনেক প্রকার কল হইয়াছে, যদ্দারা মধ্যবিত্ত গৃহস্থগণ নিজের প্রয়োজনমত অথবা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের জন্য ফল সংরক্ষণ করিতে পারেন। সেইরূপ কল অথবা সেই আদর্শে দেশে

প্রস্তুত সুলভ মূল্যের কলের প্রভূত প্রচার হওয়া প্রয়োজন। এই প্রকার কলে আমের মোরব্বা, আচার, Jam, Jelly অথবা গোটা ফল সংরক্ষিত হইতে পারে। আম ছাড়া লিচু, কদলী, পেয়ারা, আনারস প্রভৃতি নানাপ্রকার ফলের পক্ষেও এই শ্রেণীর কল উপযোগী। এখন উদ্বৃত্ত ফল পচিয়াই লোকসান হয়। বস্তুতঃ এ সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যথেষ্ট চর্চ্চা হয় নাই। কিন্তু যেরূপ সময় আসিয়াছে ও আসিতেছে, তাহাতে ভারতের ন্যায় দেশের ফলসমূহের, বিশেষতঃ ফলের রাজা আম্রের সদ্ব্যবহার সম্বন্ধে উদাসীন থাকা যায় না। ফলসংরক্ষণপ্রণালী সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান অচিরেই অনুষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। ভারতের ন্যায় পৃথিবীর আর কোন স্থানেই এত বিপুল আম্র ফসল হয় না। অথচ ২।৪ দিন রসনাতৃপ্তি ভিন্ন আম হইতে আমরা আর কোন লাভই পাই না। পক্ষান্তরে, ভারত হইতেই আম লইয়া গিয়া চাষ করিয়া আজকাল ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ও ক্যালিফর্ণিয়া তাহার এমন সদ্ব্যবহার করিতেছে যে, দেশে প্রয়োজনমত ব্যবহার করিয়াও উক্ত দেশসমূহ বিদেশে টাটকা ও সংরক্ষিত আম চালান দিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই দৃষ্টান্তেই আমাদের চৈতন্য হওয়া উচিত।

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত।

সঙ্গীতাচার্য্য স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়



বাজিল পুলকে দ্যুলোকে শঙ্খ যাহার ধমনী স্পর্শে
হাসি' মাতা বাণী লইয়া অঙ্কে যাহারে পরম হর্ষে,
আশিষি' দানিলা সে কলাবিদ্যা পরম নিধি অমূল্য,
প্রচারিলা সেই সঙ্গীত যেই করি আয়াস অতুল্য ;
মিলেছি আমরা হেথা আজি সবে
তাঁর গুণ-গান জন্য—
ধন্য ধন্য কালীপ্রসন্ন, এ জগতে তুমি ধন্য !

যাহার প্রসাদে পুনর্জ্জীবিত মৃত সঙ্গীত বঙ্গে
যৌবন লভি' সেই সঙ্গীত খেলিছে বঙ্গে রঙ্গে,
যাহার প্রসাদে সহস্র প্রাণ জাগিয়া নব আনন্দে
প্রভাতী সান্ধ্য স্তোত্রে বঙ্গে বিভুর শ্রীপদ বন্দে ;
মিলেছি আমরা হেথা আজি সবে
তাঁর গুণ-গান জন্য—
ধন্য ধন্য কালীপ্রসন্ন, এ জগতে তুমি ধন্য !

সে নাদ-ব্রহ্ম প্রমাণ করিতে এ মহা শাস্ত্র উক্তি—
শক্তির সনে ভক্তি মিলিয়া ভারতে আনিল মুক্তি।
সাধক-শ্রেষ্ঠ কালীপ্রসন্ন হয়ে প্রবল প্রচেষ্ট,
দেখাল আর্য্য-পূত-সঙ্গীত জগৎ-মধ্যে শ্রেষ্ঠ।
মিলেছি আমরা হেথা আজি সবে
তাঁর গুণ গান জন্য—
ধন্য ধন্য কালীপ্রসন্ন, এ জগতে তুমি ধন্য !

যেই সঙ্গীতে উথলে গঙ্গা বিষ্ণুর পাদপদ্মে,
যেই সঙ্গীত হ'ত মুখরিত ভারতের প্রতিসদ্মে,
সাধনার ফলে লভিয়া সিদ্ধি প্রচারি' যাহার তত্ত্ব—
রাখিলা কীর্ত্তি ভগীরথ সম পাইলা যে অমরত্ব ;
মিলেছি আমরা হেথা আজি সবে
তাঁর গুণ-গান জন্য—
ধন্য ধন্য কালীপ্রসন্ন, এ জগতে তুমি ধন্য !

শ্রীদেবকণ্ঠ সরস্বতী।

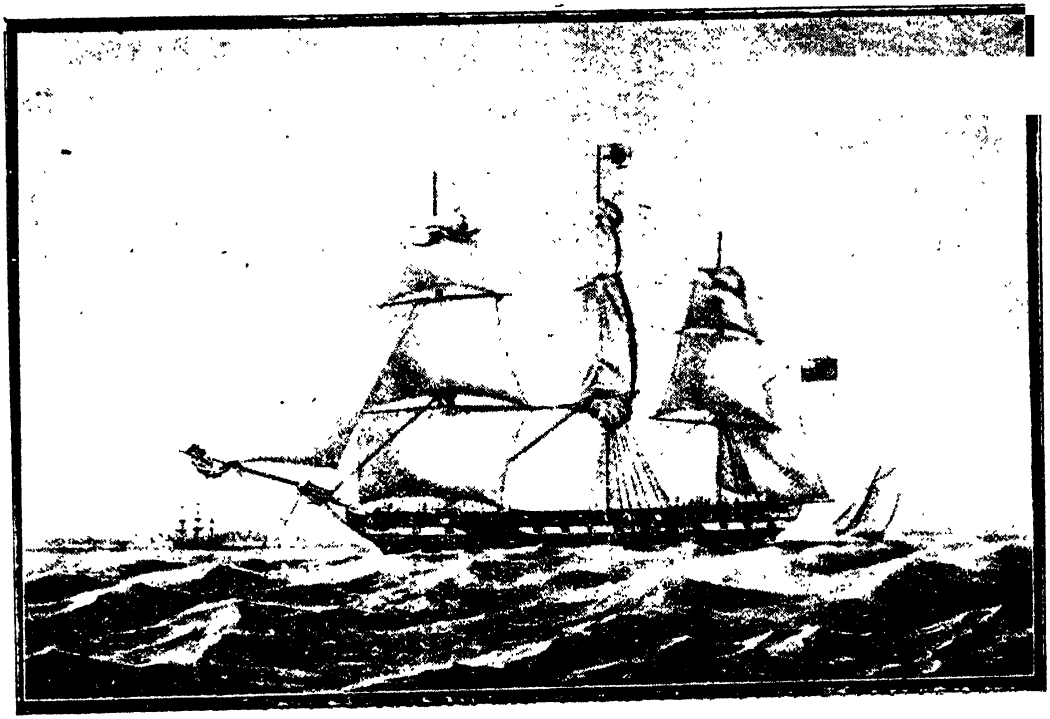
ভারতে নৌ-শিল্প

জামসেদজী বোমানজীর অসাধারণ প্রতিভাহেতু তাঁহার সময় বোম্বাই ডক বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। সেই সময় আর একটি ব্যাপার হয়। ১৮০০ খৃষ্টাব্দ হইতে বোম্বাই ডকে বৃহদাকার "ফ্রিগেট" জাহাজ নির্ম্মিত হইতে থাকে। এই জাতীয় তরণীর মধ্যে "কর্ণওয়ালিস" সর্ব্বপ্রথম—১৮০০ খৃষ্টাব্দে তাহা নির্ম্মিত হয়। ইহাতে ৫০টি কামান ছিল। বিলাতে জাহাজ সাধারণতঃ ওক কাষ্ঠে গঠিত হইত। কিন্তু আন্তর্দ্দেশিক যুদ্ধের সময় অনেক ওকবন কাটা হয়। প্রয়োজন বাড়িয়া যাওয়ায় ওকের তক্তা পাওয়া দুষ্কর হয় এবং সেই জন্যই বোম্বাইয়ে তরী নির্ম্মাণে বিলাতের কর্ত্তাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। বিলাতে ওক কাঠের পরিমাণ ও সরবরাহ বিচার করিবার জন্য পার্লামেণ্ট ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে এক সমিতি নিযুক্ত করেন এবং সে সমিতি অনুসন্ধানফলে বুঝিতে পারেন, ওক কাঠ আর যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যাইতেছে না। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে নিকোলাস নামক নৌবহরের কর্ম্মচারীও এই মত



জামসেদজী বোমানজী

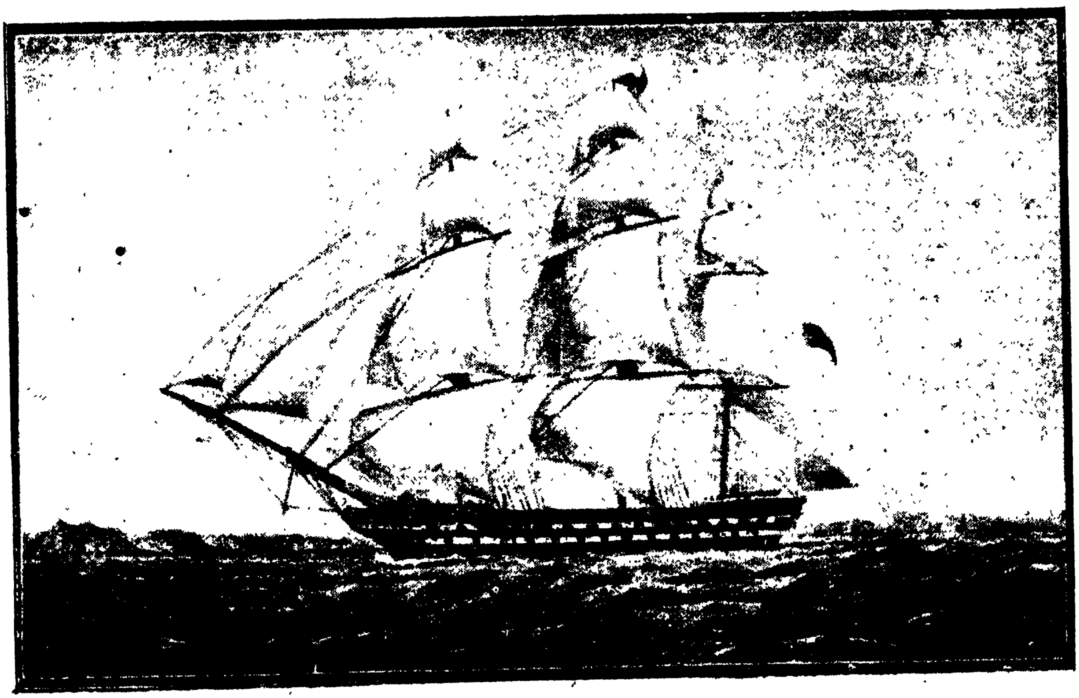
প্রকাশ করেন। তখন ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাঁহাদের ব্যবহার জন্য বোম্বাই ডকে সেগুন কাঠের জাহাজ গঠনে মন দেন। কিন্তু ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দ হইতেই বিলাতে ভারতে নৌগঠনের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরব্ধ হয়। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, লর্ড ওয়েলেসলীর শাসনকালে বিলাতের সহিত ভারতের বাণিজ্যে ভারতে নির্ম্মিত জাহাজ ব্যবহারের বিরুদ্ধে বিলাতে আন্দোলন হয়। ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দেও সেই আন্দোলনের প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল। তখনই বলা হইয়াছিল, ভারতে গঠিত জাহাজগুলি যেন বিলাতে গঠিত জাহাজের সমান সুবিধা না পায়। ১৮১১ খৃষ্টাব্দে উইলিয়ম টেলার মণী ভারতে নৌ-নির্ম্মাণের আপত্তি খণ্ডন করিয়া এক পুস্তিকা প্রচার করেন এবং দেখান যে, সেগুন কাঠের জাহাজ ওক কাঠে গঠিত জাহাজ অপেক্ষা কোনরূপে হীন নহে। সে কথা কত সত্য, বোম্বাইয়ে নির্ম্মিত "শ্রীরঙ্গপট্টম" (Seringapatam) প্রভৃতি জাহাজ তাহা

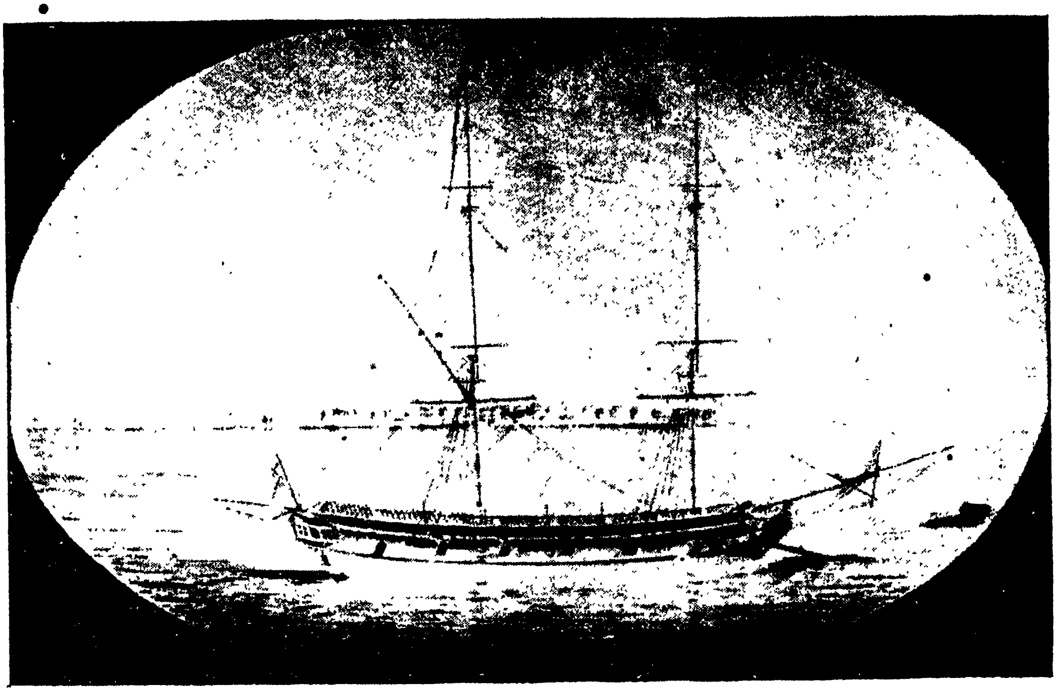


"শ্রীরঙ্গপট্টম"—জাহাজ

প্রমাণ করিয়াছে। এই জাহাজখানি ১ হাজার টন বোঝাই লইতে পারিত।

"শ্রীরঙ্গপট্টম" জাহাজের সঙ্গে সঙ্গে আমরা "প্যান্থার" নামক ক্রুজারেরও নাম করিতে পারি। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দের





"প্যান্থার"—জাহাজ

১৫ই আগষ্ট তারিখে "প্যান্থার" যখন সুয়েজ বন্দরে অবস্থান করিতেছিল, তখন তাহার একখানি চিত্র অঙ্কিত করা হয়। সেই জাহাজের উইলিয়ম হেনরী নামক এক জন কর্ম্মচারীর পুস্তকে সেই চিত্রের প্রতিলিপি প্রদত্ত হইয়াছিল। *

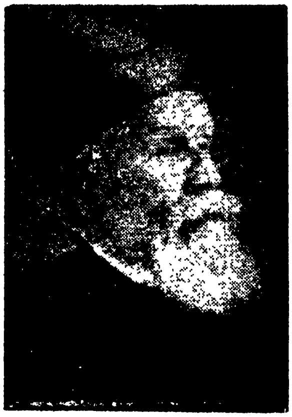
জামসেদজী বোমানজীর সময় বোম্বাই ডকে যে বহু জাহাজ গঠিত হয়, সে সকলের মধ্যে 'আর্ল ব্যালকারাস' (Earl Balcarres) উল্লেখযোগ্য। সে জাহাজ ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়। তাহাতে ১ শত ৩০ জন লোক থাকিতে পারিত এবং তাহাতে ২৬টি কামান থাকিত।

এক সময় কোম্পানীর কোর্ট অব ডিরেক্টারস মনে করিয়াছিলেন, বোম্বাই ডকে জাহাজ নির্ম্মাণ কার্য্য নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য এক জন য়ুরোপীয় কারিগর পাঠাইবেন। তাহা হইলে কিন্তু ভারতীয় শিল্পীদিগের উৎসাহ ক্ষুণ্ণ করা হইত। সৌভাগ্যের বিষয়, কতিপয় ইংরাজেরই আপত্তিতে সে সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হয় নাই। তাঁহাদের মধ্যে সার টমাস ট্রোব্রিজ ও পিটার রেণিয়ারের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা বলেন, জামসেদজী বোমানজী যেরূপ যোগ্য শিল্পী, তাহাতে তাঁহার কার্য্য পরিদর্শন জন্য য়ুরোপ হইতে কারিগর পাঠাইবার কোনই প্রয়োজন নাই। সার টমাস এক পত্রে জামসেদজীকে লিখিয়াছিলেন—"আমি প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছি যে, আপনি আমাদিগের জন্য এমন একখানি ৭৪টি কামানের জাহাজ ও একখানি ফ্রিগেট গঠিত করিয়া দিবেন যে, সেগুলি ইংরাজ নৌ-নির্ম্মাতাদিগের পক্ষে আদর্শ হইয়া থাকিবে। আমার বিশ্বাস, আপনার সম্বন্ধে আমার এই উক্তি ব্যর্থ হইবে না।" ভারতে নৌ-নির্ম্মাণের বিরুদ্ধে বিলাতে যে আন্দোলন হইয়াছিল এবং তাঁহার ক্ষমতায় যে অবিশ্বাস ব্যক্ত হইয়াছিল, তাহাতে জামসেদজী ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। তাই 'কর্ণওয়ালিস' জাহাজ নির্ম্মিত করিয়া তিনি তাহাতে উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন—

"এই জাহাজ একটা ঘৃণ্য কৃষ্ণাঙ্গ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত—১৮০০ খৃষ্টাব্দ।

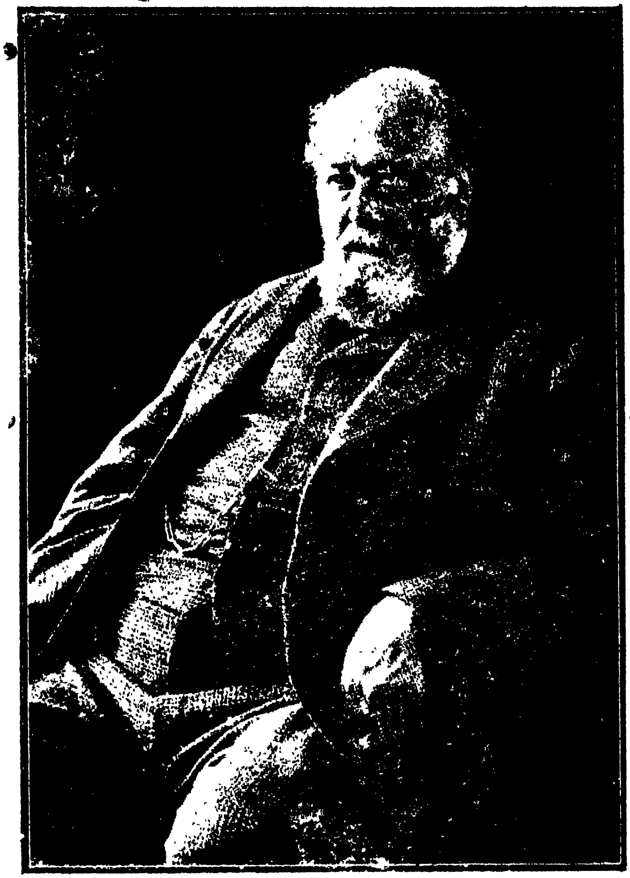
This ship is built by a D... black fellow

* জাহাজগুলির চিত্র চ্যাটারটন প্রণীত 'The Old East Indiamen' পুস্তক হইতে গৃহীত হইল।



দাদাভাই নৌরোজী

আমাদের প্রতি ইংরাজের—বিজিতের প্রতি বিজেতার এই ঘৃণার পরিচয় শত বর্ষ পরেও সমভাবেই পাওয়া গিয়াছে। তাই বিলাতের প্রধান মন্ত্রী লর্ড সলস্‌বেরী পার্লামেণ্টের সদস্য-পদপ্রার্থী দাদাভাই নৌরোজীকে "কালা আদমী" বলিয়া ঘৃণা প্রকাশ করিয়াছিলেন. আর আজও এ দেশে শ্বেতাঙ্গ রাজকর্ম্মচারীরা ভারতীয় চিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসিত হইতে লজ্জানুভব করেন। বৃটিশ উপনিবেশসমূহে ভারতবাসীর লাঞ্ছনায় এই ভাবই ফুটিয়া উঠিয়াছে। আর এ দেশে শ্বেতাঙ্গরা কৃষ্ণাঙ্গের সহিত এক গাড়ীতে যাইতেও ঘৃণা বোধ করে।



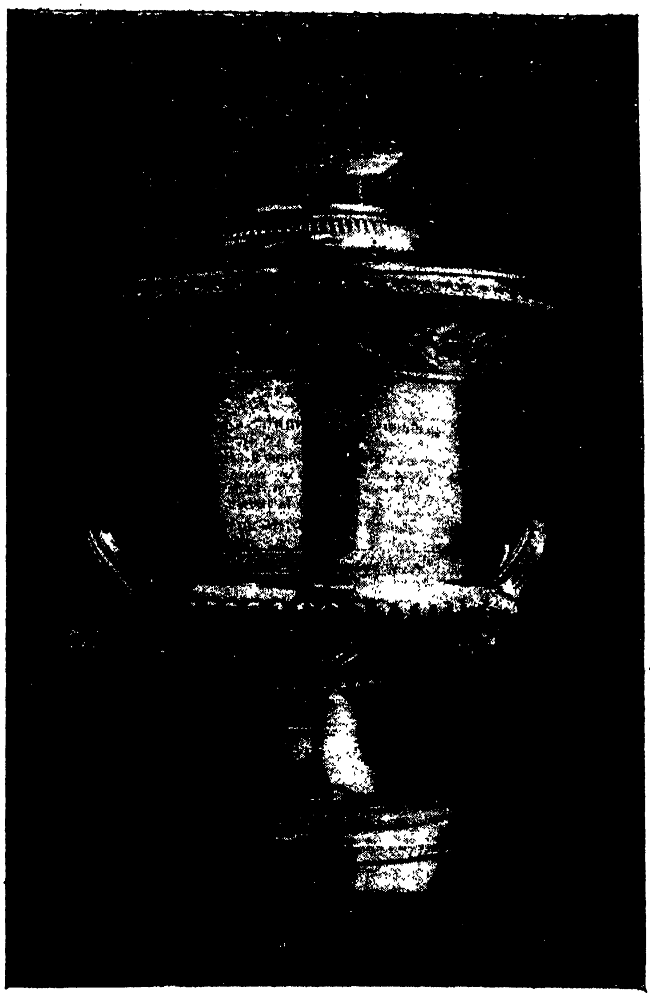
লর্ড সলস্‌বেরী

"কর্ণওয়ালিস" জাহাজ বিলাতে পৌছিলে নৌ-বিভাগের সকলেই তাহার বিশেষ প্রশংসা করেন। জাহাজখানি সরকারী নৌ-বহরের জন্য ক্রয় করা হইলে তাহার নূতন নামকরণ হয়—'আকবর'। এই জাহাজ দেখিয়া নৌ-বহরের কর্ত্তারা বোম্বাইয়ে জাহাজ গঠিত করাইবার আয়োজন করেন এবং তথায় ২খানি ফ্রিগেট ও ৩খানি ৭৪ কামানের জাহাজ গঠন করিতে দেওয়া হয়। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কোর্ট অব ডিরেক্টারস ভারতীয় নৌ-শিল্পীদিগের কাযের প্রশংসা করিয়া রৌপ্য-নির্ম্মিত রুল উপহার দেন।

সরকারী নৌ-বহরের জন্য প্রথম ফ্রিগেট "পিট" ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়। ইহার ২ বৎসর পরে "সালসেটী"র নির্ম্মাণ শেষ হয়। প্রথমোক্ত জাহাজে ৩৩টি কামান বসাইবার ব্যবস্থা ছিল। ইহার পর ৭৪ কামানের জাহাজ গঠনের সময় দেখা গেল, ডকে তত বড় তরণী নির্ম্মাণের স্থান হয় না। কাযেই নূতন ডক নির্ম্মাণের প্রয়োজন দেখিয়া স্থান নির্ণয় করিতে হয়। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে নূতন ডক নির্ম্মিত হইলে বড় জাহাজখানির নির্ম্মাণ-কার্য্য আরব্ধ হয় এবং ১৮১০ খৃষ্টাব্দে তাহা সাগরসলিলে তরঙ্গমালা উপেক্ষা করিয়া শিল্পীর শিল্প-কৌশলের সাক্ষ্য প্রদান করে। ইহার নাম "মিণ্ডেন"। ইহার পূর্ব্বে বিলাত ব্যতীত আর কোথাও এরূপ জাহাজ নির্ম্মিত হয় নাই। "মিণ্ডেন" বিলাতে পৌছিলে তথায় জামসেদজীর শিল্প-কৌশল সম্বন্ধে আর কাহারও সন্দেহের অবকাশ রহিল না। এমন কি, অনেকেই স্বীকার করিলেন, তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী ৫০ বৎসরের মধ্যে বিলাতের নৌ-বহরে কখন সেরূপ সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর জাহাজ নির্ম্মিত হয় নাই।

বিলাতের নৌ-বহরের কর্ত্তারা "মিণ্ডেন" দেখিয়া এতই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, শিল্পীকে একটি রৌপ্যাধার উপহার দেন। এই উপহার পাইয়া জামসেদজী বিশেষ আনন্দিত হইয়াছিলেন এবং তাহার প্রাপ্তিস্বীকার প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন—"বৃটেনের নৃপতির জন্য পৃথিবীর এই অংশে প্রথম

যে জাহাজ নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা যে আমিই গঠিত করিয়াছি, ইহাতেই আমি বিশেষ আনন্দানুভব করিয়াছি; কিন্তু তাহা যে বৃটিশ নৌ-বহরের সর্ব্বোচ্চ কর্ম্মচারীর প্রশংসা অর্জ্জিত করিয়াছে, এ কথা আমি যাবজ্জীবন মনে রাখিব এবং আমার পরবর্ত্তীরাও তাহা কখন বিস্মৃত হইবে না।" এই রৌপ্যাধারটির ওজন ১ হাজার ১ শত তোলা। তাহার ঢাকার উপর "মিণ্ডেন" জাহাজের একটি প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইয়াছিল। ওয়াদিয়ারা নৌ-শিল্পিরূপে যে সকল উপহার পুরস্কাররূপে পাইয়াছিলেন, সে সকল এখন সেই বংশের নানা জনের কাছে আছে। এই আধারটি এক্ষণে বোম্বাই ডকের ইতিহাসলেখক পেষ্টনজী আর্দ্দেশীর ওয়াদিয়া মহাশয়ের জননীর অধিকৃত।



রৌপ্যাধার

ইহার পর হইতে বিলাতের নৌবহরের জন্য বোম্বাইয়ে জাহাজ গঠিত করিতে দেওয়া চলিতে থাকে। ১৮১০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮২১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে মোট ১৩ খানি জাহাজ নির্ম্মিত হয়। সেগুলির মধ্যে ৫খানি জাহাজে ৭৪টি করিয়া কামান রাখিবার ব্যবস্থা ছিল। পূর্ব্বে যে "শ্রীরঙ্গপট্টম" জাহাজের উল্লেখ করিয়াছি, তাহা এই সময়ে নির্ম্মিত হয়। তদ্ভিন্ন "মালাবার", "হেষ্টিংস" প্রভৃতি জাহাজও উল্লেখযোগ্য। কিন্তু "গ্যাঞ্জেস" জাহাজই সর্ব্বাপেক্ষা বড়। অল্পকাল পূর্ব্বে লর্ড জেলিকো বলিয়াছিলেন, সেই জাহাজখানি অদ্যাপি বিলাতের নৌ-বহরে চলিতেছে। শত বৎসর পরে জাহাজ গঠনে বহু পরিবর্ত্তনের পরও যে জাহাজ বিলাতের নৌ-বহরে চলিতেছে, তাহা কিরূপ সুগঠিত, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

বোম্বাইয়ে নির্ম্মিত জাহাজগুলি কিরূপ দৃঢ় হইত, তাহার প্রমাণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, ১৮০৮-০৯ খৃষ্টাব্দের শীতকালে যে ৬খানি যুদ্ধের জাহাজ ও ১২ খানি বাণিজ্যতরী বাল্টিক সাগরে বরফের মধ্যে পড়ে, সেগুলির মধ্যে কেবল "সামসেটী" জাহাজই বিনষ্ট হয় নাই। ১০ বৎসর পরে সে জাহাজের কর্ম্মচারী কাপ্তেন হেণ্ডারসন বোম্বাইয়ে আসিয়া শিল্পীকে ১টি ঘড়ী উপহার দেন। তিনি বলেন, যখন জীবননাশ অবশ্যম্ভাবী বলিয়া মনে হইয়াছিল, তখন তাঁহার নির্ম্মিত জাহাজে জীবন রক্ষা হওয়ায় তিনি কৃতজ্ঞতার নিদর্শনরূপে ঘড়ীটি উপহার দিলেন। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই ডকে "বাকিংহামশায়ার" নামক যে জাহাজ নির্ম্মিত হয়, সেখানি একবার প্রবল ঝড়ে পড়ে। তাহার কোন কোন অংশ বায়ুর বেগে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় এবং পাটাতনের উপর বহু মৃত পক্ষী নিপতিত হয়। সেই প্রবল ঝড়েও জাহাজখানি নষ্ট হয় নাই।

ইহাতেই বোম্বাইয়ের নৌ-শিল্পীদিগের গঠনবৈপুণ্যের প্রমাণ পাওয়া যায়।

বোম্বাইয়ে সেগুন কাঠের তরীর উৎকর্ষ সম্বন্ধে লেফটেনান্ট কর্ণেল ওয়াকার নিম্নলিখিতরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন :—

"হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, বিলাতের নৌ-বহরের প্রত্যেক জাহাজ ১২ বৎসর অন্তর সংস্কারে নূতন করিতে হয়। সেগুন কাঠের জাহাজ ৫০ বৎসরেরও অধিক কাল স্থায়ী হয়। বোম্বাইয়ে নির্ম্মিত অনেক জাহাজ ১৪।১৫ বৎসর ব্যবহৃত হইবার পর নৌ-বহরে ক্রীত হইয়াছে এবং তখনও পূর্ব্ববৎ দৃঢ় দেখা গিয়াছে। 'সার এডওয়ার্ড হিউম' জাহাজখানি বাণিজ্যপোতরূপে ৮বার গতায়াত করিবার পর নৌ-বহরের জন্য ক্রীত হয়। য়ুরোপে নির্ম্মিত কোন ভারতগামী জাহাজ নিরাপদে ৬বারের অধিক গতায়াত করিতে পারে না।"

আবার বোম্বাইয়ে জাহাজ-নির্ম্মাণের খরচ বিলাতের খরচ অপেক্ষা সিকি কম। ১২ বৎসর অন্তর সংস্কারের খরচ খতাইয়া দেখিলে বিলাতী জাহাজের মূল্য চতুর্গুণ হয়।

জামসেদজী ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ও বিলাতের নৌ-বিভাগের জন্য যে প্রশংসনীয় কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহার জন্য এডমিরাল রেইনিয়ার ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে পুরস্কৃত করিতে বলেন। বোম্বাই সরকার সে বিষয়ে অবহিত না হওয়ায় তিনি সে কথা বড় লাট লর্ড ওয়েলেসলীর গোচর করেন। তখন বোম্বাই সরকার—তিনি কি পুরস্কার লইতে ইচ্ছা করেন, জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু এ বিষয়ে কিছু স্থির হইবার পূর্ব্বেই বড়লাট পদত্যাগ করেন। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে জামসেদজী পদত্যাগ করিবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু তিনি মাসিক ২ শত টাকা পেন্সন ও কিছু পতিত জমী লইতে অস্বীকার করিয়া বিলাতে কোর্ট অব ডিরেক্টারসএর নিকট কর্ষিত জমী প্রার্থনা করিয়া দরখাস্ত করেন। বোম্বাই সরকারের ২ জন সদস্য সে দরখাস্তের সমর্থন করেন এবং বোম্বাই সরকার লিখেন—তাঁহারা সকলেই উক্ত ২ জন সদস্যের মতের সমর্থন করেন এবং কোর্ট যদি জামসেদজীর কৃতিত্বপরিচয় না পাইয়া থাকিতেন, তবে সে বিষয়ে বিশেষ সাক্ষ্য দিতেন।

১৮২১ খৃষ্টাব্দে জামসেদজী রোগাক্রান্ত হয়েন। শেষ দশায় তিনি তাঁহার দরখাস্তের উত্তরের জন্য কিছু ব্যাকুল হইয়াছিলেন। যাহা হউক, তাঁহার মৃত্যুর কয় ঘণ্টা পূর্ব্বে তিনি জানিতে পারেন, তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ হইয়াছে। মৃত্যু-শয্যা হইতে তিনি বোম্বাই সরকারকে ধন্যবাদ দিয়া পত্র লিখিতে বলেন। সে পত্রে তিনি বলিয়াছিলেন, এই সংবাদে তাঁহার মৃত্যুকাল শান্তিময় হইয়াছে। কোর্ট অব ডিরেক্টারসের নির্দ্দেশানুসারে বোম্বাই সরকার জামসেদজীর বংশধরদিগকে ভিল্লে পার্লে ও জু নামক ২খানি গ্রাম প্রদান করেন। তাঁহার বংশধররা অদ্যাপি সেই ২খানি গ্রাম অধিকার করিতেছেন।

প্রায় ৫০ বৎসরকাল অসাধারণ কৃতিত্ব সহকারে বোম্বাইয়ে নৌ-শিল্পীর কার্য্য করিয়া ১৮২১ খৃষ্টাব্দের ৩১শে আগষ্ট তারিখে জামসেদজী দেহ রক্ষা করেন। তাঁহার সময়ে বোম্বাইয়ে নৌ-শিল্পের খ্যাতি সমগ্র সভ্যজগতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে এবং তিনি সর্ব্বত্র সমাদৃত হয়েন।

জামসেদজীর পুত্র নৌরোজী জামসেদজী পিতার স্থান অধিকার করেন। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে তিনি যখন ষোড়শ বৎসরবয়স্ক যুবক, তখনই ডকের কাযে প্রবেশ করেন এবং ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে সহকারী শিল্পী (Builder) হয়েন। তাঁহার সময়েও বোম্বাই ডকে বিলাতের নৌবিভাগের জন্য জাহাজ নির্ম্মিত হয়। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে তিনি "ম্যাডাগাসকার" নামক ফ্রিগেট নির্ম্মাণ করেন। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দের ২৭শে অক্টোবর তারিখে ইংলণ্ডের, ফ্রান্সের ও রুসিয়ার সমবেত নৌবহর-নাভারিণোর যে যুদ্ধে তুর্ক ও মিশরীদিগকে পরাভূত করিয়া গ্রীসের স্বাধীনতার পথ মুক্ত করে, সেই যুদ্ধে এই জাহাজ এডমিরাল সার এডওয়ার্ড কডরিংটনের "ফ্ল্যাগ সিপ"রূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল। ইহার পর বোম্বাই ডকে "বোম্বাই" ও "কলিকাতা" নামক ২খানি ঐ শ্রেণীর জাহাজ নির্ম্মিত হইবার পর ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে স্থির হয়, এ দেশে আর বিলাতের নৌ-বহরের জন্য জাহাজ নির্ম্মিত হইবে না। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ১৪ই মার্চ্চ তারিখে "কলিকাতা" জাহাজ ভাসান হয়। সার চার্লস ম্যালকম শিল্পীকে ও তাঁহার সহকারীদিগকে মূল্যবান্ শাল উপহার প্রদান করেন ও "কলিকাতা" নির্ম্মাণে আনন্দ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বলেন, তাঁহারা যে আর এরূপ জাহাজ নির্ম্মাণ করিতে পাইবেন



জামসেদজী ধঞ্জীভাই

তাহাতে ২টি এঞ্জিন ছিল। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ১৪ই অক্টোবর তাহা ভাসান হয়। জাহাজখানি ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের ২০শে মার্চ্চ যাত্রা করিয়া ৩১শে তারিখে এডেন বন্দরে ও ২৬শে এপ্রিল সুয়েজে পৌছে। ২৯শে মে জাহাজ বোম্বাইয়ে ফিরিয়া আসিয়াছিল। জাহাজখানি ২১ দিন ৮ ঘণ্টায় সুয়েজে পৌছে ও ১৯ দিন ১৪ ঘণ্টায় ফিরিয়া আইসে। নৌরোজীর নির্ম্মিত "ইউফ্রেটিস" জাহাজ ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে কর্গোর নিকটে প্রবালস্তরে আটকাইয়া যায় এবং ৪।৫ দিন তাহাতে আঘাত করিয়া পথ কাটিয়া বাহির হয়। ইহাতেই বুঝিতে পারা যায়, জাহাজখানি কিরূপ দৃঢ় ছিল।

তৎকালে বিলাতে যে সকল জাহাজ নির্ম্মিত হইত, সেগুলি বোম্বাইয়ের জাহাজের মত সুগঠিত ও দৃঢ় হইত না।

১৮৪০ খৃষ্টাব্দে বোম্বাইয়ে লৌহের তরণীও নির্ম্মিত হয়।

নৌরোজী জামসেদজীতেই "মাষ্টার বিল্ডারদিগের" শেষ হয়, বলা যাইতে পারে। তিনিও সে পদের অধিকারাদি সম্পূর্ণরূপে সম্ভোগ করেন। তিনি অবসর গ্রহণ করিবার পর হইতেই সে পদের গৌরব কমিয়া যায়। বিলাতে নৌ-শিল্পের বিশেষ উন্নতি সাধিত না, ইহাতে তিনি দুঃখিত। তিনি বোম্বাই-ডকে নির্ম্মিত জাহাজগুলির অশেষ প্রশংসা করেন। তিনি এ বিষয়ে তাঁহার ভ্রাতা সার পুলটানী ম্যালকমের সাক্ষ্যেরও উল্লেখ করেন—"Tell my old friend Nowroji what a glorious part the 'Asia' sustained in the battle of Navarino and how proud I am of his success as a builder'. ইহার পর ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে বিলাতের জন্য বোম্বাইয়ে একখানি মাত্র জাহাজ নির্ম্মিত হইয়াছিল।

এ দিকে বাষ্পের ব্যবহারে নৌ-শিল্পে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছিল। নৌরোজীর কর্তৃত্বাধীনে বোম্বাই ডকে প্রথম বাষ্পীয় পোত নির্ম্মিত হয়। তাহার নাম "হিউ লিণ্ডসে"।

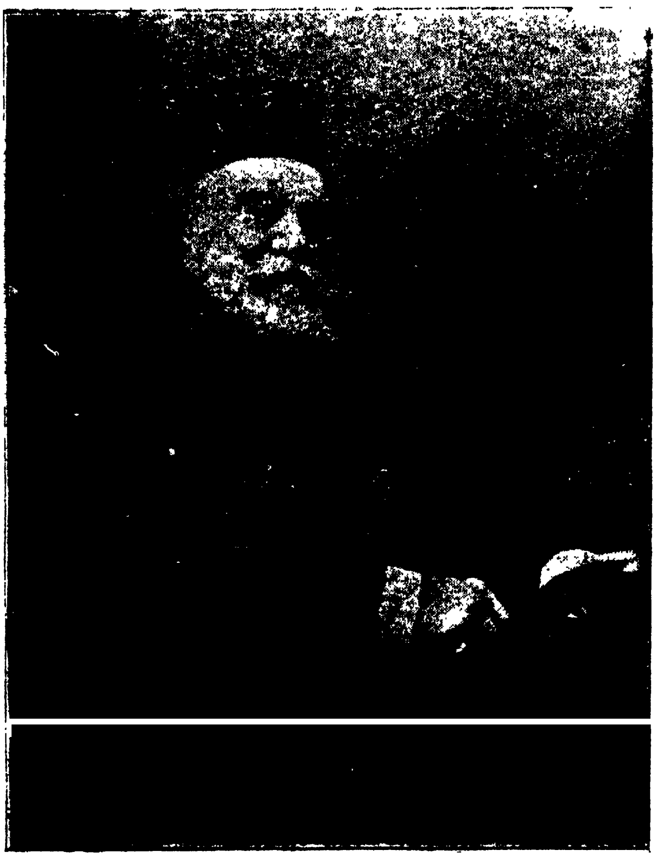
হওয়ায় তিনি তথায় যাইয়া সেই সব উন্নতি অধ্যয়ন করিবার প্রয়োজনীয়তা প্রথম উপলব্ধি করেন।" কিন্তু তখন বিলাতে যাওয়ায় কেবল যে আর্থিক অসুবিধা ছিল, তাহাই নহে, পরন্তু তাহা ধর্ম্মবিরুদ্ধ বলিয়াও বিবেচিত হইত। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সেই সময় ফর্ব্বস কোম্পানীর কর্ত্তা সার চার্লস-ফর্ব্বস বোম্বাইয়ে আগমন করেন। তিনি যে ২১ বৎসর কাল বোম্বাইয়ে ছিলেন, এ দেশের লোকের সহিত বিশেষ বন্ধুবৎ ব্যবহার করিতেন। ১৮১১ খৃষ্টাব্দে তিনি যখন বিলাতে প্রত্যাগমন করেন, তখন বোম্বাইয়ের হরমাসজী বোমানজী ওয়াদিয়া তাঁহাকে এক অভিনন্দন প্রদান করেন। বিলাতে যাইয়াও তিনি এ দেশের লোকের কল্যাণচিন্তা করিতেন এবং সর্ব্বদাই তাহাদিগকে সদুপদেশ দিতেন। এই সকল

কারণে বোম্বাইবাসীরা তাঁহার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। নৌরোজীর পুত্র জাহাঙ্গীর ও আত্মীয় হিরজীভাই মাণিকজী উভয়েই ডকে কায করিতেছিলেন। নৌরোজী তাঁহাদিগকে সার চার্লসের তত্ত্বাবধানে বিলাতে ব্যাথাম ডকে কায শিখিবার জন্য প্রেরণ করেন। যুবকদ্বয় বিলাতে নূতন শিক্ষা লাভ করিতে গমন করেন।

নৌরোজী তাঁহার কাযে যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহার জন্য তাঁহার উপরিস্থিত ব্যক্তিদিগের নানা প্রশংসাপত্র ব্যতীত কোর্ট অব ডিরেক্টার্স ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে একটি রৌপ্যের কুল উপহার দেন। ৫৪ বৎসরেরও অধিক কাল ডকে কায করিয়া ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। বোম্বাই গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সাধারণ পেন্সন ব্যতীত মাসিক অতিরিক্ত ১ শত ৫০ টাকা পেন্সন হিসাবে দেন এবং এককালীন ৫ হাজার টাকাও দেন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর তাঁহার মৃত্যু হইলে বন্দরে সব জাহাজের মাস্তুলে পতাকা অর্দ্ধনমিত করিয়া প্রথানুসারে সম্মান দেখান হয়।

১৮৪৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কারসেটজী রাষ্টমজী প্রধান শিল্পীর কায করেন। তাঁহার কার্য্যকালে ১০ খানি সামরিক তরণী ও ৩৭ খানি অনুরূপ জাহাজ বোম্বাই ডকে নির্ম্মিত হয়। এই সকলের মধ্যে পার্শী নৌশিল্পী কর্ত্তৃক বিলাতের সরকারের জন্য নির্ম্মিত শেষ জাহাজ "মিয়ানী" ও বাষ্পীয় ফ্রিগেট "ফিরোজ," "আসাই" ও "পঞ্জাবে" উল্লেখযোগ্য।

কলিকাতার তলবাহী গঙ্গার মোহানায় যে চোরাবালু (James and Mary Sands) আছে, তাহার মত ভয়ঙ্কর চোরাবালু বোধ হয় আর কোন নদীতে নাই। ৬ দিন ও ৫ রাত্রি সেই বালুতে আটকাইয়া থাকিবার পর বানে "ফিরোজ" ভাসিয়া যায়। আর কোন জাহাজ এই বালুতে এক দিন আটকাইয়া থাকিলে নিষ্কৃতি পায় না। ইহা জাহাজখানির নির্ম্মাণকৌশলেরই পরিচায়ক। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কারসেটজী অবসর গ্রহণ করেন এবং মাসিক ২ শত টাকা অতিরিক্ত পেন্সন লাভ করেন।



আর্দেশীর কারসেটজী ওয়াদিয়া

তাঁহার পর প্রধান শিল্পী নিয়োগ লইয়া গোল হয়। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, জাহাঙ্গীর নৌরোজী ডকের কার্য্যে শিক্ষা লাভ করিতে ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে বিলাতে গমন করেন। তিনি ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং কারসেটজীর অধীনে কায করিতেছিলেন। তথাপি ভারতে সরকারের নৌ-বহরের কর্ত্তা তাঁহাকে প্রধান শিল্পীর পদ না দিয়া বিলাত হইতে শিল্পী আনিবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু কোর্ট অব ডিরেক্টারস সে প্রস্তাবে অসম্মত হইয়া ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ১১ই আগষ্ট তারিখে লিখেন—পার্শি নৌ শিল্পী আশৈশব নৌ-নির্ম্মাণে অভ্যস্ত এবং বোম্বাই ডকে জাহাজ নির্ম্মাণে যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, তাহাতে বিশেষ কারণ ব্যতীত তাঁহাদিগের স্থানে ইংরাজ শিল্পী নিযুক্ত করা হইবে না। তাঁহারা বোম্বাই সরকারকে আদেশ করেন—জাহাঙ্গীরকেই ১ বৎসরের জন্য প্রধান শিল্পী নিযুক্ত করা হউক এবং কাল পূর্ণ

হইলে তাঁহার সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিতে হইবে। যিনি প্রথমে জাহাঙ্গীরের স্থানে ইংরাজ শিল্পী নিয়োগের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, ১ বৎসর পরে তিনিই জাহাঙ্গীরের কাযে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সেই পদে স্থায়ী করিতে বলেন। জাহাঙ্গীর যখন সেই পদে স্থায়ী হয়েন, তখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী উঠিয়া গিয়াছে—আর তত অধিক জাহাজও নির্ম্মিত হয় না। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় নৌ-বহরের পরিসর হ্রাস করা হয়। শেষে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে প্রায় ২ শত ৫০ বৎসর থাকিবার পর ভারতীয় নৌ-বহর (Navy) উচ্ছিন্ন করা হয় এবং বিলাতের নৌ-বহর তাহার স্থান অধিকার করে।

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে জাহাঙ্গীরের মৃত্যু হয়। তিনি ৮ বৎসরে ১৯ খানি জাহাজ নির্ম্মিত করেন।

জামসেদজী ধঞ্জীভাই ওয়াদিয়া পরিবারে শেষ প্রধান নৌশিল্পী। তখন বোম্বাই ডকে আর বড় বড় জাহাজ নির্ম্মিত হয় না। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে তিনি যখন কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন, তখন সরকার তাঁহাকে বোম্বাইয়ে কিছু জমী পুরস্কার দেন। তাঁহার অবসর গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে "মাষ্টার বিল্ডারের" পদ লুপ্ত করা হয়।

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই ডকে প্রথম ইংরাজ শিল্পী নিযুক্ত করা হয়। তাঁহাকে "কনসট্রাক্টার" বলা হইত। জামসেদজীর অবসর গ্রহণের ২৫ বৎসর পরে ১৯১০ খৃষ্টাব্দে বোমানজী সোরাবজী ওয়াদিয়া সহকারী "কনসট্রাক্টার" হয়েন। ৩৫ বৎসর ডকে কায করিবার পর ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে তিনি যখন অবসর গ্রহণ করেন, তখন ১ শত ৭৮ বৎসর পরে ডকের সঙ্গে লাওজী ওয়াদিয়াবংশের সম্বন্ধ লুপ্ত হয়।

এই স্থলে আমরা ওয়াদিয়া বংশে আর ২ জন নৌ-শিল্পীর কথা বলিব। প্রথম জনের নাম—ধঞ্জীভাই রাষ্টমজী ওয়াদিয়া। ইনি কলিকাতায় খিদিরপুর ডকে প্রধান শিল্পী ছিলেন। তিনি দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ১৮১২ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই ডকে কার্য্যে প্রবিষ্ট হইয়া ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে খিদিরপুরে আসিয়াছিলেন। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে চীন



ভারতীয় নৌবহর সমিতির সভ্যগণ

ভিযানের সময় তিনি সরকারের বিশেষ সাহায্য করেন। ৮৪২ খৃষ্টাব্দে বোম্বাইয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি আগা হম্মদ সিরাজীর ডকের তত্ত্বাবধায়ক হয়েন এবং ৫ বৎসর রে পি এণ্ড ও কোম্পানী সে ডক লইলে সেই পদেই প্রতিষ্ঠিত থাকেন। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

দ্বিতীয় ব্যক্তির নাম—আদের্শীর কারসেটজী ওয়াদিয়া। নি ১৮৪১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বোম্বাই ডকে প্রধান এঞ্জিনিয়ার ও কলকব্জার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। তিনি ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে এঞ্জিন ও বয়লারযুক্ত "ইণ্ডাস" ষ্টীমার নির্ম্মাণ করেন। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে শিক্ষার্থ বিলাতে যাইয়া তিনি পরবৎসর পূর্ব্বোক্ত পদের জন্য প্রার্থী হইয়া তাহা লাভ করেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করিয়া ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে তিনি ভারত-সচিব কর্ত্তৃক করাচীতে Indus Flotillaর তত্ত্বাবধায়ক এঞ্জিনিয়ারের পদে নিযুক্ত হয়েন।

১ শত ৫০ বৎসর কাল প্রধান শিল্পী থাকিয়া লাওজী পরিবারের ব্যক্তিরা মোট ৩ শত ৪৫খানি উৎকৃষ্ট জাহাজ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের নির্ম্মিত জাহাজ সর্ব্বত্র বিশেষ প্রশংসিতও হইয়াছিল। *

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

* এই প্রবন্ধের বহু উপকরণের জন্য আমি বোম্বাইয়ের শ্রীযুক্ত পেষ্টনজী আর্দ্দেশীর ওয়াদিয়া মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞ। তিনি কেবল প্রবন্ধের উপকরণ দিয়াই আমার কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করেন নাই; পরন্তু ওয়াদিয়া পরিবারের শিল্পীদিগের প্রতিকৃতি প্রভৃতিও সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। লেখক।

গঙ্গা

মিশ্র-ভৈরবী—তাল ঠেকা।

মনসিজ-মন্থন-মৌলি-মকুটমালা গঙ্গে।
উদার-দিনকর মধুর বিধুবর রমিত তরঙ্গে॥

হরিপদ-পঙ্কজ-পরিমল-গলিতা,
ব্রহ্মাকমণ্ডলু-কোটর-কলিতা,
মঞ্জু-মুকুট-মণি মঞ্জীর-ললিতা
রঙ্গিণী-রঞ্জিনী মর্দ্দিনী মোহিনী,
সিতহুকূলা সুধাসঙ্গে।

দেববধূজন বন্দন পূজন,
ধৃত নব কুসুম পঙ্কজ চন্দন,
মধুকরগুঞ্জর-ঝঙ্কারী কঙ্কণ
হ্লাদিনী-মাদিনী নন্দিনী-নাদিনী
মরাল-মোদিতা কলদঙ্গে।

গিরিবর-কন্দর-কারা-বিদারিণি,
সুন্দর সুশীতল ধারা-উৎসারিণি,
কুলু কুলু কল্লোল-লীলা উল্লাসিনি
গম্ভীর গদ্গদ-নাদ উদ্গারিণি
মন্থিনী মত্ত মাতঙ্গে।

ক্ষিতিভারহারিণি, পতিতোদ্ধারিণি,—
শঙ্করী-শঙ্কিত-শোক-নিবারিণি,
দ্রুমদল-বলম্বিত-তটতলচারিণি,
প্রমথপতিপূতপুর-প্রক্ষালিনী
ধৃত ধবলধারা রঙ্গে!

দেবমানবঋষি-বন্দিত-চরণা,
পতগ-বিহগ-মৃগ-পন্নগ-শরণা,
গৌরী গিরিবালা হিমকরবরণা
ত্রিভুবনমঙ্গলহার-হিল্লোলিনী—
ভয়ভঙ্গে!

শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ।



বসুমতী প্রেস [ফটো আর্টিষ্টদের সৌজন্যে]

এসরাজ-ঝঙ্কার



গরীবের মেয়ে



বিংশ পরিচ্ছেদ

ঘরের ছেলে যখন ঘরের বাহিরে গিয়া পরের মধ্যে পরিণত হয়, তখন সে যেমন অনায়াসে ও অতিমাত্রায় পর হইয়া যায়, সত্যকার পরও ঠিক ততখানি পর হইতে কুণ্ঠা বোধ করে, তাই এই দারিদ্র্যপূর্ণ এবং কার্পণ্যে কঠোর গৃহস্থালীর সহস্র অভাবের অভিযোগে ঘরের ছেলে শুভেন্দুর সুগঠিত নাসা যতই অধিক ঊর্দ্ধে উঠিয়া থাকিল, পরের ছেলে সুশীলের লজ্জাবিপন্নতা ততই অধিক বর্দ্ধিত করিয়া তাহার মনকে একেবারে যেন এই নির্বান্ধব ও অসহায় সংসারের মধ্যবর্ত্তী করিয়া টানিয়া লইতে লাগিল। বন্ধুর ত্রুটী সে যে কোথা দিয়া এবং কেমন করিয়া শোধরাইয়া লইবে, কি করিয়া কোন্ কথা বলিয়া এই দুটি নিরুপায়া নারীর একান্ত অসহায় অবস্থার অপরিসীম লজ্জা-বেদনা প্রশমিত করিয়া দিবে, ইহা যেন সে দিশাহারা হইয়া খুঁজিয়া বেড়াইল এবং ইহার জন্য তাহার স্বভাবতঃ স্বল্পভাষী সংযত স্বভাবেরও সময় সময় ব্যতিক্রম করিয়া নিজেকে সে নির্দ্দয়ভাবেই মুখর ও চঞ্চল করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

শুভেন্দু যখনই বিলাসবস্তুর অভাবে একান্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া মাতাকে অনুযোগ ও পিতার উদ্দেশ্যে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিতে থাকে, সুশীলকেও সেই সঙ্গে সঙ্গে এতদুভয়কেই যথাসাধ্য সমর্থন করিয়া জানাইয়া দিতে হয় যে, শুভেন্দুর মাতার অনুপায়তায় এবং পিতার অক্ষমতা বা কৃপণতায় তাহার পক্ষে কিছুমাত্রই অসুবিধা ঘটিতে পারে নাই।

শুভেন্দুর পিতা যথাকালে বাটী ফিরিয়া এই শুভদর্শন তরুণ দুইটিকে দেখিয়াই অকস্মাৎ বাতাহত কদলীকাণ্ডের মতই পতনোন্মুখ হইলেন, প্রায় সন্ধ্যার স্বল্পালোকে অস্পষ্টভাবে দেখিয়া উচ্চকণ্ঠে হাঁকিয়া উঠিলেন, "কে গা তোমরা? আমার বাড়ীতে কিসের মতলবে এসে ঢুকেছ? এটা যে অতিথশালা নয়, তা বোধ করি তোমরা টের পাও নি? আচ্ছা, এখন নিজের নিজের পথ দেখে নাও দেখি।"

নীলিমা সেইমাত্র মাতাপুত্রীর সমবেত চেষ্টা-যত্নে সংগ্রহ করা দু'বাটি গরম চায়ের সঙ্গে সামান্য একটু আটার মোহনভোগ দুখানি কাঁসার রেকাবে বসাইয়া অতিথিদ্বয়কে দিতে আসিতেছিল, বাপের গলার আওয়াজে তাহার হাত কাঁপিয়া একটা বাটির গরম চা খানিকটা চল্‌কিয়া তাহার পায়ের উপর পড়িয়া গেল, সে সেইখানে একটু আড়ষ্ট ও গতিহারা হইয়া থাকিয়া তাহার পর সাহস সংগ্রহপূর্ব্বক একটু উত্তেজিত দ্রুতপদে অগ্রসর হইতে গিয়াই শুনিতে পাইল, তাহার দাদা বিরক্তকণ্ঠে বলিতেছে, "আমি শুভেন্দু। কাকাবাবু আমায় একবার এখানে দেখা ক'রে যেতে নামিয়ে দিয়ে গেলেন, কালই খুব সম্ভব আমরা ফিরে যাব, এটি কাকাবাবুর ছেলে।"

নীলিমা নিজের গতি স্থির করিয়া দেখিল, সুশীল অগ্রসর হইয়া আসিয়া তাহার বাপের সেই ছেঁড়া চটিপরা ধূলি-ধূসরিত ফাটাপায়ের ধূলা সযত্নে হাত দিয়া তুলিয়া লইল এবং সবিনয় মিষ্টস্বরে কহিয়া উঠিল, "জ্যেঠামশাই! আমার নাম সুশীল। বাবা আমাদের আপনার কাছে ক'দিনের জন্য পাঠিয়ে দিলেন।"

"হাঃ, তাই বলো, তোমরা ভুবনের কাছ থেকে আসছো! বহোৎ আচ্ছা! ভুবন নিশ্চয় ভাল আছে, যাহার এত ধন-দৌলৎ, সে ভাল না থেকে করবে কি! তাহার পর, তোমরা বড়মানুষের ছেলেরা, তোমরা এই গরীবের গরীবখানায় রাত কাটাবে কেমন ক'রে? পারবে ত? আর না পেরেই বা আজকের রাতে যাবে কোথায়? কোন গতিকে চোখ-কান বুজে একটা রাত্তির বই তো নয়, চালিয়ে নিতেই হবে, কি বল হে—সুনীল না সুশীল বুঝি? কি নাম তোমার বল্লে?"

এই অপ্রচ্ছন্ন সত্য স্বীকারের পরিবর্ত্তে সুশীল নিতান্ত লজ্জাবিজড়িত স্মিতমুখে উত্তর করিল, "আজ্ঞে, আমার নাম সুশীল!"

স্বভাবসিদ্ধ ঔদাস্যব্যঞ্জক নীরসস্বরে অনুকূলচন্দ্র কহিলেন,

"তা সুনীলই হোক, আর সুশীলই হোক, ও একই কথা, আজকালকার দিনের ছেলে যত 'সু' হয়, সে আমার খুব জানাই আছে, তবে 'নীল' আর 'শীল' নিয়ে যতটুকু তফাৎ। তা হ্যাঁ, বলছিলুম কি, একটা রাত্তির তোমাদের এইখানেই তা হ'লে চোখ-কান বুজে কাটাতেই হচ্ছে, তা হোক্, কালকের ভোরের প্যাসেঞ্জারটায় তোমরা বেরুলে পরশু বেলা সাড়ে তিনটেয় তোমাদিগকে হাবড়ার ইষ্টেসনে নামিয়ে দেবে, কোন অসুবিধা হবে না, সেইটেতেই তোমরা যেও, আমি যদি কখন বাড়ী যাই তো ওইটেতেই যাই, ভাড়াও কতকটা সস্তা হয়।"—এই কথা বলিয়া যেন একটা খুব মস্ত বড় অর্থনৈতিক সমস্যার সহিত বিশেষ কোন জটিলতর সমস্যার সমাধান করিয়া দিয়াছেন, এমনই প্রসন্ন হইয়া উঠিয়া তিনি সজোরে হাসিয়া উঠিলেন, হাসিতে হাসিতে পুনশ্চ বলিলেন, "কিন্তু কল্‌কেতার ছেলেদের শুনেছি বেলা ৮ টার আগে ঘুম ভাঙ্গে না, সেইটে হলেই তো সব মাটী করবে! তা আমি আর আমার গিন্নী আমরা খুব ভোরে উঠি, আমরা তোমাদের ঘুম ভাঙ্গিয়ে দেবো'খন, অত সকালে তো আর মুখে কিছু দিতে মন সরবে না, চট্ ক'রে বেরিয়ে পড়লে, অ'না'সে সাড়ে পাঁচটার প্যাসেঞ্জারটা ধ'রে ফেলতে পারবে। হাঃ, তাহার পর সুশীল! তোমাদের বাবার ব্যবসা বোধ করি খুব ভালই চল্‌ছে? কতটি টাকা ক'রে মাস মাস জমাতে পারছেন বল তো? কি গো, কুমারী নাইটিঙ্গেল কি নিয়ে এলেন? অ্যাঁ! কি ও বাটিতে? দুবাটি ও কি আনা হলো? আবার রেকাবে অতখানি ক'রে হালুয়া এনেছিস কেন? ধাঃ! তোর গুষ্টীর পিণ্ডি! কল্‌কেতার ছেলে ওরা, ওরা নাকি ওই হালুয়ার তাল দুটো গিল্‌তে পারবে! তোর মতন কি ওদের রাক্ষুসে ক্ষিধে! ওরা হাওয়া খেয়ে থাকে, ইলেক্‌ট্রিকের পাখার হাওয়া খায়!"

ইলেক্‌ট্রিকের পাখার হাওয়া খাইয়া ক্ষুধামান্দ্য করে কি না, বলা যায় না, তবে এ বাড়ীতে নাকি উহার কোন পাটই ছিল না বলিয়াই না কি, ক্ষুধা এ দুই জন তরুণ পুরুষেরই অল্পবিস্তর পাইয়াছিল, কিন্তু গৃহস্বামীর মুখে নিজেদের ঐ প্রকার অনৈসর্গিক আহার্য্যের ব্যবস্থা শুনিয়া শুভেন্দু ক্রুদ্ধ ও অপমানিত হইয়া নীলিমার দত্ত চায়ের বাটিটা মাত্র তুলিয়া লইয়া হাতের ঠেলা দিয়া রেকাবখানা ঠেলিয়া গম্ভীর চাপাসুরে বলিল, "নিয়ে যা—"

সুশীলও তখন হইতেই ঠিক উহার অনুকরণ করিতে মনে মনে ইচ্ছুক হইয়া রহিল ও উৎসুক হইয়া উঠিল; কিন্তু কার্য্যকালে ঠিক ওই রকমটাই তাহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিল না।

নীলিমা অনেকক্ষণ প্রতীক্ষা করিয়াও যখন দেখিল, তাহার পিতৃকবল হইতে ইহাদের উদ্ধারের আশা সুদূরপরাহত, তখন সেই বহুলায়াসে সংগৃহীত চায়ের দুর্দ্দশা ফেনের সহিত একীভূত হয় দেখিয়া অগত্যাই সে তাহার পিতৃসান্নিধ্যকে আর সম্মান দিতে সাহস করিল না। ফলে সে গৃহের কদন্নের দায়ে প্রায় অর্দ্ধভুক্ত শুভেন্দুকে এবারও অভুক্ত থাকিতে হইল দেখিয়া তাহার সোদরা-স্নেহ আহত ও বিপর্য্যস্ত হইয়া উঠিয়া তাহাকে পীড়াদান করিল এবং কেন অধিকতর চেষ্টা দ্বারা এই সামান্য সংগ্রহটুকু একটু পূর্ব্বে করিয়া তুলিতে পারে নাই, ইহার জন্য সে নিজেকে মনে মনে বারংবার ধিকার দিয়া অপর জনের দিকে সমধিক সঙ্কুচিতপদে ও উদ্বেলিতবক্ষে অগ্রসর হইতে লাগিল। দিবসান্তের সেই শেষ ধূসররশ্মিরেখায় সে মুখের পীড়িত, তৃষিত, ব্যথিত দৃষ্টি সুশীলের সুপ্রচুর সহানুভূতিতে ভরা পরিপূর্ণ চিত্তকে অতি আগ্রহে আলোড়িত ও অভিভূত করিয়া তুলিল, সে কিছুক্ষণ সহানুভূতিপূর্ণ বিষণ্ণনেত্রে সেই বিব্রত বিপন্ন মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া হাত বাড়াইয়া রেকাবশুদ্ধ চায়ের আমন্ত্রণ গ্রহণ করিল এবং অনুকূলচন্দ্রের বিরক্তি-অপ্রচ্ছন্ন হিংসাকুটিল মুখের দিকে উৎফুল্ল চোখ তুলিয়া স্মিতহাস্যে কহিয়া উঠিল, "আচ্ছা, আপনি ব'সে দেখুন জ্যেঠামশাই, কল্‌কেতার ছেলেরা শুধু ইলেক্‌ট্রিক পাখার হাওয়াই খায় না, তাল তাল মোহনভোগও অনায়াসে খেয়ে ফেলতে পারে। শুভুদা, তুমি যদি আর না উল্টে দাবী আনো, তা হ'লে হুকুম ক'রে দাও, তোমার ভাগটাও এই সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে কল্‌কেতার ছেলেদের কলঙ্ক মোচন ক'রে জ্যেঠামশাইএর কাছে প্রাইজ পেয়ে যাই।" এই বলিয়া সুশীল হাসিয়া উঠিল এবং হাস্যোৎফুল্ল মুখ অকুণ্ঠিতভাবে তুলিয়া নীলিমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—"যদি আপত্তি না থাকে তো ও রেকাবখানাও আমায় নামিয়ে দিন, জ্যেঠামশাইএর এ রকম ভুল রেখে দিয়ে যাওয়া তো কোনমতেই চলবে না?"

নীলিমার সমস্ত মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল, উহা আনন্দে কি সঙ্কোচে, তাহা সে ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলেও তাহার মনে হইল, এত দিন পরে যেন তাহার জীবন এতটুকু একটু সার্থক হইতে পারিল, এক দিনের মতনও একটুখানি যেন কাযে লাগিল। এমন সুরে, এমন শ্রদ্ধায়, এমনভাবে আর কেহ আর কখন আর কোন কাযের জন্যই যেন তাহাকে আহ্বান করে নাই। সে লজ্জিত, জড়িত ও আনন্দোচ্ছ্বসিত হইয়া তাড়াতাড়ি সবটুকু খাবার তাহার পাতের উপর ফেলিয়া দিল, ঠিক সাম্‌না-সাম্‌নি পিতার ভ্রূকুটিকুটিল মুখের ছবি তীব্র ইঙ্গিতে কিছু বাঁচাইয়া দিবার কঠিন সঙ্কেত জানাইতেছিল, সে দিকে সে বারেকমাত্র চাহিয়াও দেখিল না।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

যন্ত্রের মধ্যে সুর ভরা থাকিলেও যন্ত্রীর হাতের স্পর্শ ব্যতীত সে যেমন নিজেকে প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না, আবার উপযুক্ত যন্ত্রীর হাতের এতটুকু একটুখানি পরশ-লাভে তার সেই নীরস কাঠের কঠোরতা এক নিমেষেই যেমন ঠেলিয়া দিয়া রসের স্রোতে সুরের ফোয়ারা উথলিয়া উঠিতে থাকে, তেমনই সে দিন সুশীলের সেই এতটুকু একটু মিষ্টহাসি, একটুখানি স্নিগ্ধ দৃষ্টি ও ওই কয়েকটি স্নিগ্ধ বাণীর অচিন্ স্পর্শেই নীলিমার হৃৎকোনিলীন সুপ্তিশান্ত সুরের ধারা উথলিয়া উঠিল। তাহার প্রাণের তারে ওই স্পর্শটুকু যেন ঝঙ্কার দিয়া তারে তারে সুরবাহারের অসংখ্য সুর বাজাইয়া তুলিল। তাহার বুকের মরাগাঙ্গে জোয়ারের স্রোতে বন্যার বেগ বহাইয়া তুলিল। তাহার চির-অনাদৃত ভিখারিণীর সঙ্কোচ-শঙ্কিত মুদিত অন্তরে রাজরাণীর ঐশ্বর্য্যভাণ্ডারের সমাবেশ করিয়া দিল। তাহার সহসা সে দিনই প্রথম মনে পড়িল যে, তাহার বয়স এখন আর বালিকার বয়স নাই; তাহার এই অর্দ্ধপরিণত নবযৌবনোদ্ভাসিত তনু দেহ আজ এই অর্দ্ধাবরণের ফাঁকে ফাঁকে তাহার চিত্তকে নিরতিশয় লজ্জাবিপন্নতায় বিব্রত করিয়া তুলিল, নিজের পরিধানের মলিন ও পুরাতন বস্ত্র আজ তাহার অন্তরকে দ্বিধাধিকারে ভরাইয়া তুলিল। নিজেদের চিরদিনের দৈন্যে ততোধিক কার্পণ্যে বিরস নীরস গৃহস্থালী তাহাকে আজ একান্ত পরিতপ্ত, আহত ও অসহিষ্ণু করিয়া ফেলিল। এই অপূর্ব্বদর্শন সুখসেবিত তরুণ-যুগলকে তাহাদের এই একান্ত কুশ্রীতায় ভরা, দুঃখদারিদ্র এবং হৃদয়হীন গৃহস্থালীর মধ্যে কোথায় রাখিয়া কেমন করিয়া যে সেবাপূজা করিয়া উঠিবে, সে কথা মনে করিয়া এই অসহায়া তরুণীটির বুকের মধ্যে যেন লজ্জামথিত রক্তের স্রোত কলকল্লোলে ছুটিয়া চলিতে লাগিল। উঃ, গরীবের মেয়ে হওয়ার এত বিড়ম্বনা! তাহার উপর সে গরীব যদি আবার কৃপণ, দুর্ম্মম এবং হৃদয়হারা হয়।

স্বর্ণলতার মনের বেলায় যে এ বিপ্লবাঘাতের ঢেউ আঘাত করিয়া যায় নাই, তা নয়; কিন্তু ওই চির-অসহায়া নারীর পাতর-জমাট বুকের মধ্যে সকল আশাই যেন চির-সমাহিত হইয়া গিয়াছিল, সেখানে যে আঘাত পড়ে, তাহাতে আহতকে তো প্রত্যাঘাত করায় না, মাত্র অবরুদ্ধ বেদনার গুরুভারে অবসন্ন মনটাকে মূর্চ্ছাতুর করিয়া ফেলে। তাই মনের মধ্যে সকল বাসনা-কামনাকেই সমাহিত করিয়া ফেলিয়া তিনি তাঁহার চিরপ্রথামতই সেই মোটা আটার রুটি, মসুরির দাল এবং বিলাতী কুঁমড়ার ছক্কা রাঁধিতে রাঁধিতে এই খাদ্য পরিবেশন করিবার সময়কার নিজের ব্যথা ও ছেলের মুখের অপ্রসন্ন মন্তব্য মনে করিয়া লজ্জাপীড়িত হইতেছিলেন, আবার সঙ্গে সঙ্গে শুভেন্দুর সুখসেবিত সুন্দর মূর্ত্তি মনে পড়িয়া তাঁহার সকল দুঃখের উপর পরম সুখের সুশীতল শীতল প্রলেপ মাখাইয়া দিতেছিল। চিরদুঃখের এত বড় সান্ত্বনা—আজ যাঁহার দানে—তাঁহার পায়ের তলায় মাথা সহস্রবারই লুটাইয়া পড়িতে চাহিতেছিল।

রান্নাঘরে আসিয়া ঢুকিল নীলিমা। অমনই স্বর্ণলতার কণ্ঠ ভেদ করিয়া একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস উত্থিত হইল। আজ তাঁহার পুত্রৈশ্বর্য্যের পাশাপাশি এই মেয়ের দুর্দ্দশাটা তাঁহার কাছেও যেন অত্যন্তই সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। তাহার উপর শুভেন্দুর ক্রমভিব্যাহারী সুশীলের স্নিগ্ধ সৌম্য শান্ত শ্রীটুকু তাঁহার মুগ্ধ মনের উপর কি মায়াজালই যে বিস্তৃত করিয়াছে, সে শুধু সেই জানে, যে অভাগা বাতুল গগনবিহারী জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর মর্ত্ত্য মানবের সহিত সংস্পর্শ প্রতীক্ষা করিয়া থাকে! স্বর্ণলতার বিমোহিত চিত্ত অন্তরের অত্যন্ত গোপন গুহায় সন্তর্পণে এমন একটা অসম্ভব ও অসঙ্গত বাসনাও উচ্চকিত হইয়া উঠিতেছিল যে, তাহার

একটুখানি বহিঃপ্রকাশে সমস্ত মানবজগতে এমন একটা হাস্যতরঙ্গ প্রবাহিত হইয়া যাইবে, যাহার পর ওই চির-বিড়ম্বিত দুঃখসহিষ্ণু নারীর সকল সহ্য সীমা ছাড়াইয়া কোথায় যে ছুটিয়া যাইবে, তার কোন হিসাব থাকিবে না। এবারও নীলিমার গৃহপ্রবেশে সেই পূর্ব্বতন দুরাকাঙ্ক্ষার চকিতোদয়ে তাই স্বর্ণলতার নিস্তেজ বক্ষ হইতে অত বড় একটা দীর্ঘশ্বাস বহির্গত হইয়া আসিল। আহা, সুশীলের হাতে যদি নীলিমাকে দেওয়া চলিত!

নীলিমা আসিয়া কাঠের 'কেঠো'য় কোটা কুটনাগুলার উপর বারেক অবজ্ঞাদৃষ্টি নিক্ষেপ করিল; উনানের উপর চাপানো ফুটন্ত দালের হাঁড়িটার দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল, তাহার পর মায়ের হাতে মাখামাখি জলঢালা আটা-গুলার উপর চোখ পড়িতেই জ্বলিয়া উঠিয়া বিরক্তিকঠোর তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কহিয়া উঠিল, "মা, আজও ঠিক তোমার সেই সত্যকেলে বন্দোবস্ত! দাদাকে তা হ'লে নির্ঘাতই উপোস করিয়ে মারবে ঠিক দিয়ে রেখেছ! ও তো তোমার ওই পেটেণ্ট লেদারের তৈরি রুটি দাঁতে কাটতে পেরে উঠবে না!" বলিতে বলিতে এতক্ষণকার সকল অভিযোগের বেদনা এই উপায়হীনা জননীর উপরেই উদ্যত হইয়া উঠিয়া তাঁহাকে একেবারে উত্তেজনায় অসহিষ্ণু করিয়া তুলিল, বাপের কানে পৌঁছিতে পারার সকল সম্ভাবনার ভীতি তাহার মন হইতে মুছিয়া গিয়া তাহার কণ্ঠকে প্রায় সপ্তমে চড়াইয়া তুলিল। সে বলিতে লাগিল—

"অদ্ভুত মানুষ তোমরা! এত দিন পরে ছেলে ঘরে ফিরলো, কোথায় তাকে যত্নে আদরে ভরিয়ে দেবে, দুদিন ঘরে রাখবার জন্য চেষ্টা করবে, তা না, না খেতে দিয়ে, দুঃখ দিয়ে দূর দূর ক'রে এক রকম তাড়িয়ে দিচ্ছো? ধন্য তোমরা! কিন্তু তা না ক'রে ওকে যদি হাতে রাখতে, ভবিষ্যতে তোমাদেরই ভাল হতো! ও তো মানুষ হয়ে উঠেছে। দেখছো না কি, তোমাদের হতশ্রদ্ধায় কুকুরের মতন দোরদোর ঘুরে বেড়ান সে দাদা আর নেই।"

অসহায়া জননীর আর্ত্ত করুণ দুটি চোখের উপর চোখ পড়িতেই অতি সহসা সে নিজেকে সামলাইয়া লইল। আনায়বদ্ধ নিরুপায় জীব-জননীর ব্যথাকাতর মূক দৃষ্টির মতই তাহাতেও সেই একই আশাহীনতা সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। নীলিমাকে সেই অভিযোগহীন বেদনা যেন কশা হইয়া বজ্রবলে আঘাত করিল। নিজের ধৈর্য্যচ্যুতির মূলে যত বড় অবিবেচনাই থাক, তাহার নিজের পক্ষ হইতেও মায়ের সম্বন্ধে যে তাহার চাইতে কম কিছু করা হয় নাই, তাহা মনে পড়িতে মন সমধিক আহত হইয়া মুখ চাপিয়া ধরিল। মাকে এ সব কথা বলা যে একেবারেই মিথ্যা এবং মা'র পক্ষ হইতে এ অবিবেচনার প্রতীকার হওয়া স্বর্গের সিঁড়ি হওয়ার মতই অসম্ভব, এ তো জলের মতই সহজসিদ্ধ জানা কথা। ক্ষণকাল অন্তর্গূঢ় অশক্ত কোপে স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া নীলিমা সহসা কি ভাবিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।

স্বপ্নে

স্বপনের ঘোরে এসেছিলে তুমি
স্বপনে গিয়াছ চলিয়া;
গভীর নিশায় স্বপনের মাঝে
কি যেন কি গেলে বলিয়া।

কথা নয়—সে যে সুললিত গান,
মোহন বেণুর সুললিত তান,
আবেশে অবশ হইল পরাণ,
চরণে পড়িনু ঢলিয়া।

কিবা মনোহর মুরতি তোমার,
কিবা শোভে গলে বন-ফুল-হার,
স্বপনের মোহে মোহিত করিয়া
পিয়া'লে পীযূষ অমিয়া।

সফল আমার মধুর স্বপন,
রহে কি এ কথা হৃদয়ে গোপন?
ও চরণতলে আমার জীবন
দিয়াছি স্বপনে সঁপিয়া।

শ্রীসতীশচন্দ্র শীল।

স্বরাজী নীতি

১

স্বরাজী দলের ক্রিয়াকলাপ সাধারণ লোক বুঝিয়া উঠিতে পারে না। তাঁহারা স্বরাজ চাহেন। তিন বৎসর পূর্ব্বে এই স্বরাজের সংজ্ঞা দিতে তাঁহারা নারাজ ছিলেন। বরিশালে শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় ঝোঁকের মুখে বলিয়াছিলেন, স্বরাজের আবার সংজ্ঞা কি? স্বরাজ স্বরাজ। স্বরাজ কোনও শাসনতন্ত্র নহে। অন্যত্র মহম্মদ আলী সাহেব কহিয়াছিলেন যে, স্বরাজের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে গেলেই কংগ্রেসে গোল বাধিবে। কারণ, এখন ভিন্ন ভিন্ন লোক স্বরাজের এক একটা নিজেদের পছন্দমত অর্থ করিয়া লইতে পারিতেছে। সুতরাং সকল দলের লোকই এই অনির্দ্দিষ্ট-লক্ষণ স্বরাজের পতাকাতলে আসিয়া দাঁড়াইতে পারিয়াছেন। স্বরাজের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে গেলেই ইঁহাদের মধ্যে বাগবিতণ্ডা এবং ঘোর কলহ-কোলাহল বাধিয়া উঠিবে। কিন্তু দাশ মহাশয় পর্য্যন্ত বেশী দিন কথাটাকে ধামাচাপা দিয়া রাখিতে পারেন নাই। গয়ার কংগ্রেসে বাধ্য হইয়া তাঁহাকেই স্বরাজের একটা সংজ্ঞা দিতে হইয়াছিল। তাহার পরে বরিশালে তিনি যে গণতন্ত্র স্বরাজের বা ইংরাজীতে democratic Swarajএর আদর্শকে তুড়ি দিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন, ক্রমে একরূপ তাহারই প্রচার করেন। Government by the masses – দাশ মহাশয়ই সর্ব্বপ্রথমে এই অদ্ভুত আদর্শ প্রচার করেন। আমরা পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম যে, গণতন্ত্র শাসনের কিংবা democratic self-governmentএর অর্থ government of the people, by the people, for the people. দাশ মহাশয় বোধ হয় এই কথাটারই তর্জ্জমা করিয়া government by the masses বলিয়া তাঁহার স্বরাজের আদর্শের প্রতিষ্ঠা করেন। আমার বোধ হয়, কথার মারপেঁচ যাহাই থাকুক না কেন, মূল আদর্শ সম্বন্ধে কোনও সত্য প্রভেদ নাই। আমরা স্বরাজ বলিতে দেশের সমগ্র জনমণ্ডলীর রাজই চিরদিন বুঝিয়া আসিয়াছি। ইংরাজরাজের তিরোধান হইলেই যে ভারতে এই গণতন্ত্র স্বরাজের প্রতিষ্ঠা হইবে, এরূপ কল্পনা করা যায় না। এমন যদি হয় যে, য়ুরোপে আবার একটা সমরানল জ্বলিয়া উঠে এবং আপনার দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য যে যেখানে প্রবাসী ইংরাজ আছে, তাহাদের সকলকে দেশে ফিরিয়া যাইতে হয় এবং এই কারণে যদি ভারতবর্ষ হইতে সাকুল্য গোরা পল্টন এবং সঙ্গে সঙ্গে সমুদায় ইংরাজ রাজপুরুষকে চলিয়া যাইতে হয়, তাহা হইলে হয় ত বা ভারতে ইংরাজশাসনের শেষ হইতে পারে। কিন্তু সে অবস্থায় আমাদের স্বারাজ্য প্রতিষ্ঠা হইবে কি না কে জানে? হয় ত তখন দেশী পল্টনরা দিল্লীর শূন্য তক্তকে দখল করিয়া বসিবে, এবং এই সকল দেশীয় সিপাহীর সেনাপতি ভারতের সাম্রাজ্যলক্ষ্মীকে অধিকার করিয়া বসিবেন। তাহাতে ইংরাজরাজেরই তিরোধান হইবে মাত্র, কিন্তু আমরা যে স্বরাজ চাহি, তাহা আসিবে না।

২

অন্য অবস্থাধীনেও ইংরাজরাজের তিরোধান হইতে পারে; অথচ আমাদের স্বারাজ্যলাভ না-ও হইতে পারে। ভারতব্যাপী বিদ্রোহের ফলে বর্ত্তমান বৃটিশ প্রভুশক্তি নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু তাহাতেই ভারতে আমরা যে গণতন্ত্র স্বরাজের প্রতিষ্ঠা দেখিতে চাহি, সে স্বরাজ আসিবে কি? সশস্ত্র বিদ্রোহের ফলে ইংরাজের পরাভব হইলে বিদ্রোহী দলের সেনা-নায়কই ভারতের শাসনযন্ত্রকে অধিকার করিয়া বসিবেন। সে অবস্থায় বৃটিশ আমলাতন্ত্রের স্থলে ভারতে একটা স্বদেশী আমলাতন্ত্র বা সেনাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইবে, গণতন্ত্র স্বরাজের প্রতিষ্ঠা হইবে না। এইটি বুঝিয়াই ভারতের স্বারাজ্য-লিপ্সু সম্যগ্‌দর্শী নীতিজ্ঞরা তাঁহাদের স্বদেশবাসীদিগকে বিগ্রহ বা বিদ্রোহের পথে লইয়া যাইতে চাহেন না। মহাত্মা গন্ধীর সঙ্গে অন্য বিষয়ে যতই কেন মতবিরোধ থাকুক না, সশস্ত্র বিদ্রোহের পথে যে আমাদের ঈপ্সিতলাভ হইবে না, এ সম্বন্ধে কোনই মতবিরোধ নাই। তিনি যে নিরুপদ্রবে এবং বৈধ উপায়ে স্বরাজ-লাভ করিতে চাহেন, তাহাতে

নিষ্ঠাসহকারে এই জন্যই সেই পথেরই অনুবর্ত্তন করিতে চাহি। এই কারণেই আমিও বর্ত্তমান কংগ্রেসের মূল লক্ষ্য ও উপায় উভয়েরই সম্পূর্ণ সমর্থন করিয়া আসিয়াছি।

৩

কংগ্রেসের সাধ্য স্বরাজ্য স্বরাজ, সাধনা—peaceful and legitimate means Peaceful মানে নির্ব্বিবাদে,কোনও প্রকারের সশস্ত্র সমরে প্রবৃত্ত না হইয়া; legitimate মানে আইনের পথে। সশস্ত্র বিদ্রোহের পথ পরিহার করিয়া নির্ব্বিবাদে স্বরাজ পাইতে হইলে বর্ত্তমান ইংরাজ-রাজের সঙ্গে একটা রফা করিয়া লইতে হইবে। ইহা ছাড়া অন্য কোনও peaceful উপায় নাই—যাহাতে স্বরাজ পাওয়া যাইতে পারে। Legitimate উপায়ে স্বরাজ পাইতে গেলে অথবা আইনের পথে স্বারাজ্যে পৌঁছিতে হইলে বর্ত্তমান ভারতশাসন-সম্বন্ধীয় আইনখানিকে বদলাইয়া লইতে হইবে। আইনের পথে স্বরাজ পাওয়ার অন্য কোনও অর্থ হয় না। Legitimate অর্থ যদি ধর্ম্মসঙ্গত হয়, (এ অর্থ যে হয় না, এমন কথা বলা যায় না), তাহা হইলে ধর্ম্মযুদ্ধও আমাদের স্বারাজ্য-লাভের সাধনার বহির্ভূত হয় না। বিশেষতঃ আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে, যে দেশের সনাতন সাধনা কহে—

"ধর্ম্মযুদ্ধে মৃতো বাপি তেন লোকত্রয়ং জিতম্"

অর্থাৎ ধর্ম্মযুদ্ধে যে মৃত্যুকে বরণ করিয়া লয়, সে মরিয়াও তিন লোক জয় করিয়া থাকে—সে দেশে ধর্ম্মসঙ্গত উপায় বলিতে নিরুপদ্রব বা নিরস্ত্র প্রতিরোধ কিংবা অসহযোগ বুঝায় না। Legitimate অর্থ ধর্ম্মসঙ্গত করিলে তাহাকে যে সর্ব্বদাই নিরুপদ্রব বা peaceful হইতেই হইবে, এমন বলা যায় না। মহাত্মা গন্ধীও বোধ হয় ইহা বেশ বুঝিয়াছেন। তাহারই জন্য তিনি কোন্ পথে কংগ্রেস স্বারাজ্যের সাধনা করিবে, ইহা নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া peaceful and legitimate নিরুপদ্রবে এবং আইনের পথে এই দুইটি কথা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। নিরুপদ্রব স্বরাজ পাইতে গেলেই ইংরাজের সঙ্গে একটা সুলেনামা করিয়া লইতে হইবে। আইনের পথে স্বরাজ পাইতে গেলে বর্ত্তমান ভারতশাসনসম্বন্ধীয় আইনখানির সংশোধন এবং পরিবর্ত্তন করিয়া লইতে হইবেই হইবে। ইহাই কংগ্রেসপ্রতিষ্ঠিত স্বারাজ্য নীতি। স্বরাজ্য দলের নীতিকে এই কষ্টি পাতরেই কষিয়া লইতে হইবে।

৪

নিরুপদ্রবে স্বরাজ পাইতে হইবে বলিয়া দেশের লোককে নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিলে চলিবে না। ইংরাজরাজের সঙ্গে একটা রফা করিয়া স্বরাজ পাইতে হইলে দেশের প্রজাশক্তিকে সংহত করিয়া বৃটিশ প্রভুশক্তির প্রতিকূলে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। দুর্ব্বলে সবলে রফা হয় না। ভারতের বর্ত্তমান বৃটিশ প্রভুশক্তির সঙ্গে স্বারাজ্যলিপ্সু প্রজাশক্তির রফা করিতে হইলে এই প্রজাশক্তিকে বর্ত্তমান প্রভুশক্তির সমকক্ষ করিয়া তুলিতে হইবে। অর্থাৎ এই প্রজাশক্তিকে এতটা সংহত এবং দৃঢ়ব্রত করিয়া তুলিতে হইবে, যাহা দেখিয়া ইংরাজ বুঝিবে যে, ইহার সঙ্গে একটা রফা না করিলে ভারতবর্ষের সঙ্গে তাহার কোনও প্রকারের রাষ্ট্রীয় যোগ রক্ষা করা অসাধ্য হইয়া উঠিবে। ইংরাজ এখন এ দেশের রাজা। ভারতের স্বারাজ্যলাভে ইংরাজের সঙ্গে ভারতবাসীর রাজা-প্রজা সম্বন্ধ থাকিবে না, ইহা ঠিক। কিন্তু বর্ত্তমান রাজা-প্রজা সম্বন্ধ ঘুচিয়াও ইংরাজের সঙ্গে কিংবা বৃটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে ভারতবর্ষের একটা রাষ্ট্রীয় যোগ থাকিতে পারে। অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা কিংবা দক্ষিণ-আফ্রিকার সঙ্গে বৃটিশ রাষ্ট্রের রাজা-প্রজা সম্বন্ধ নাই। অষ্ট্রেলিয়ায়, কানাডায় বা দক্ষিণ-আফ্রিকায় সম্পূর্ণ স্বারাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এ সকল দেশের লোকরা ইংরাজরাজের প্রজা নহে। অথচ ইহারা বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। ইহাদের পক্ষে বৃটিশ সাম্রাজ্য একটা যৌথ কারবারের মত। ইংরাজ যেমন এই যৌথ কারবারের অংশীদার,অষ্ট্রেলিয়া,কানাডা বা দক্ষিণ আফ্রিকার প্রজাসাধারণও সেইরূপ এই যৌথ কারবারের অংশীদার। অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা বা দক্ষিণ-আফ্রিকার লোকরা স্বাধীনভাবে নিজেদের শাসন-সংরক্ষণ পরিচালন করিতেছে। অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা বা দক্ষিণ-আফ্রিকার পার্লামেণ্ট যে সকল আইন পাশ করেন, তাহার উপরে বৃটিশ পার্লামেণ্টের কোনও কথা কহিবার অধিকার নাই। তাঁহারা তাঁহাদের নিজেদের রাজস্ব নিজেরা ঠিক করেন। রাজকার্য্যের জন্য কোথায় কি খরচ হইবে, তাঁহাদিগের নিজ নিজ ব্যবস্থাপক সভার প্রজাপ্রতিনিধিগণ তাহা ঠিক করিয়া দেন। এ সকল বিষয়ে বৃটিশ পার্লামেণ্টের বা মন্ত্রিসমাজের

বা ঔপনিবেশিক সচিবের অর্থাৎ Colonial Secretaryর হস্তক্ষেপ করিবার কেশাগ্র পরিমাণ অধিকার নাই। অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা বা দক্ষিণ-আফ্রিকার সৈন্যসামন্তরা নিজ নিজ দেশের পার্লামেণ্টের সম্পূর্ণ কর্তৃত্বাধীন। এ সকল দেশের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বৃটিশ পার্লামেণ্ট দায়ী নহেন। কতটা সৈন্যসামন্ত ইঁহারা রাখিবেন বা না রাখিবেন, সে সম্বন্ধে ইংরাজ কোনও কথা কহিতে পারেন না। ইংরাজের নিজের দেশের ভিতরকার শাসন-সংরক্ষণের ব্যবস্থা সম্বন্ধে অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা বা দক্ষিণ-আফ্রিকা বা নিউজিলাণ্ড যেমন কোনও কথা কহিতে পারে না, সেইরূপ এই সকল রাষ্ট্রের ভিতরকার শাসনসংরক্ষণ সম্বন্ধে ইংরাজও কোনও কথা কহিতে পারেন না। নিজ নিজ দেশের শাসনসংরক্ষণ সম্বন্ধে ইংলণ্ডের মত অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতিও সম্পূর্ণ স্বাধীন। এই জন্যই অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতিতে সম্পূর্ণ স্বারাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এই কথা বলা যায়। অথচ অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি বর্ত্তমান বৃটিশ সাম্রাজ্যেরই অন্তর্ভুক্ত। ভারতে যখন স্বারাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইবে, তখনও অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতির মত নিজেদের ভিতরকার শাসন-সংরক্ষণ বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ স্বাধীন হইয়াও বৃটিশ-সাম্রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত থাকিতে পারি। যুক্ত থাকিলে আমাদের শক্তির দ্বারা বৃটিশ-সাম্রাজ্য শক্তিমান, আমাদের সম্পদ্ ঐশ্বর্য্যের দ্বারা বৃটিশ সাম্রাজ্য সম্পন্ন এবং ঐশ্বর্য্যশালী হইতে পারিবে। আমরাও ইংলণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, দক্ষিণ-আফ্রিকা প্রভৃতির সাহায্যে ও সাহচর্য্যে শক্তিশালী এবং অভ্যুদয়সম্পন্ন হইতে পারিব। বৃটিশ সাম্রাজ্য হইতে বিযুক্ত হইলে ভারতবর্ষ এবং ইংলণ্ড উভয়েই অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে। সুতরাং ভারতে ইংরাজরাজের তিরোধান হইলেও বৃটিশ সাম্রাজ্য-নীতি ভারতবর্ষকে অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা প্রভৃতির মত এই সাম্রাজ্যের ভিতরে রাখিতে চাহিবে। আর এই জন্যই ইংরাজ যখন দেখিবে যে, ভারতের প্রজাশক্তির সঙ্গে রফা না করিলে ভারতবর্ষে তাহার প্রভুশক্তিই যে কেবল নষ্ট হইবে, তাহা নহে, আমাদিগকে অষ্ট্রেলিয়া, কানাডার মত তাহার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত রাখাও অসম্ভব হইবে, তখনই কেবল বৃটিশ সাম্রাজ্যনীতি ভারতের স্বারাজ্য-নীতির সঙ্গে একটা সন্ধি ও সুলেনামা করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিবে। আর এই ভাবেই বিগ্রহ-বিদ্রোহ ব্যতীত আমাদের স্বারাজ্যলাভ সম্ভব হইতে পারে।

৫

বিনা বিগ্রহ-বিদ্রোহে আমাদিগকে স্বারাজ্যলাভ করিতে হইলে বর্ত্তমান ভারতশাসনসম্বন্ধীয় আইনখানিকে বদলাইয়া লইতে হইবে। এই আইন অনুসারে বৃটিশ পার্লামেণ্ট বা ইংরাজদের আইন সভাই ভারতের শাসন-সংরক্ষণের জন্য দায়ী, ভারতবর্ষের প্রজানির্ব্বাচিত আইন সভার এই দায়িত্ব ও অধিকার নাই। অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিলাণ্ড, কানাডা, দক্ষিণ-আফ্রিকা প্রভৃতির আইন সভাগুলি সেই সকল দেশের শাসন-সংরক্ষণের বাহিরের শত্রুর হাত হইতে এবং ভিতরের অশান্তি, উপদ্রব এবং সম্ভাবিত অরাজকতা হইতে দেশকে রক্ষা করিবার জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী। বৃটিশ পার্লামেণ্টের উপরে এই দায় নাই। অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতির শাসনব্যবস্থার মূল সূত্রই এই যে, এই সকল দেশের প্রজা-প্রতিনিধিসভা বা পার্লামেণ্টই নিজ নিজ রাষ্ট্রের ভিতরে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার জন্য দায়ী—responsible for the preservation of peace and order within their respective territories. কিন্তু ভারতবর্ষের প্রজা-প্রতিনিধি-সভার এ দায়িত্ব নাই। দিল্লীর আইন সভা নহে, কিন্তু বিলাতের পার্লামেণ্টের নিয়োজিত গভর্ণর জেনারল এবং তাঁহার মন্ত্রি-সভাই ভারতবর্ষে শান্তি ও সুশৃঙ্খলা রক্ষা করিবার জন্য দায়ী। আমাদের বর্ত্তমান ভারত-শাসন-সম্বন্ধীয় আইন অনুসারে সপার্ষদ গভর্ণর জেনারেল বাহাদুর বা Governor General in Councilই বৃটিশ শাসনাধীন ভারতে শান্তি ও সুশৃঙ্খলা রক্ষা করিবার ভার পাইয়াছেন। "The Governor General in Council is solely responsible for the preservation of law and order in British India." ইহাই বর্ত্তমান ভারত-শাসনবিধির মূল সূত্র। এই অজুহতেই গভর্ণর জেনারল বাহাদুর দিল্লীর আইন সভার মতামত অগ্রাহ্য করিয়া নিজেদের খুসীমত আইন জারি করিতে পারেন; এবং আইন সভা যে সকল খরচ নামঞ্জুর করেন, সেই সকল খরচ নিজের হুকুমে বৈধ করিয়া লইতে পারেন। "এই আইন জারী না হইলে কিংবা এই খরচ মঞ্জুর না করিলে, আমার

পক্ষে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা অসাধ্য হইবে।"—এই পাঁতি দিয়া বড়লাট বাহাদুর ভারত সরকারের ব্যবস্থাপক সভার যে কোন নির্দ্ধারণ, যখন ইচ্ছা নাকচ করিয়া দিতে পারেন। অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা প্রভৃতিতেও এক এক জন গভর্ণর জেনারল বা বৃটিশ রাজপ্রতিনিধি আছেন। ইংলণ্ডে বৃটিশরাজের পার্লামেণ্ট যে আইন করেন, তাহা নামঞ্জুর করিবার অধিকার আছে। অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা প্রভৃতিতেও ইংরাজ রাজপ্রতিনিধির সেই অধিকার আছে। কাগজে-কলমে থাকিলেও সে অধিকার নাই বলিলেও চলে। কি ইংলণ্ডে, কি অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা প্রভৃতিতে কোথাও এখন আর সে সকল দেশের প্রজাপ্রতিনিধি-সভা যে আইন-কানুন পাশ করেন, রাজা বা রাজপ্রতিনিধি তাহা নামঞ্জুর করেন না বা করিতে সাহস পায়েন না। করিলে রাজার বা রাজপ্রতিনিধির এ অধিকার থাকিবে না। আর আইন-কানুন মঞ্জুর করিবার অধিকারমাত্রই রাজার বা রাজপ্রতিনিধিদের আছে, দেশের রাজস্বের উপরে হাত দিবার অধিকার নাই। বৃটিশ সম্রাট্ নিজের হুকুমে বৃটিশ যুক্তরাজ্যে এক কপর্দ্দক ট্যাক্স বসাইতে পারেন না; রাজস্বের এক কপর্দ্দক পার্লামেণ্টের মতের বিরুদ্ধে খরচ করিবার হুকুমও দিতে পারেন না। অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতিতেও বৃটিশ রাজপ্রতিনিধির এ অধিকার নাই। দেশের প্রজানির্ব্বাচিত আইন সভাগুলিরই কেবল এ অধিকার আছে। অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতিতে বৃটিশ রাজপ্রতিনিধির এ অধিকার নাই, এই জন্ত সেই সকল দেশের প্রজানির্ব্বাচিত আইন সভাগুলি দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্ত দায়ী, বৃটিশ রাজপ্রতিনিধির এ দায়িত্ব নাই। ইংলণ্ডে যেমন পার্লামেণ্টের উপরেই দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার ভার একান্তভাবেই অর্পিত রহিয়াছে, অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা প্রভৃতির পার্লামেণ্টের উপরেও সেইরূপই দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার ভার একান্তভাবে অর্পিত আছে। এই জন্তই ইংলণ্ডের মত অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা প্রভৃতিতেও স্বারাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের প্রজানির্ব্বাচিত আইন সভার এ সকল অধিকার নাই। আমাদের Legislative Assembly বা দিল্লীর আইন সভার এ অধিকার নাই। ভারতের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্ত দায়ী Assembly নহে, কিন্তু সপার্ষদ বড়লাট বাহাদুর। বর্ত্তমান ভারত-শাসনসম্বন্ধীয় আইনখানির এই দফাকে একেবারে জড়ে মূলে উপড়াইয়া ফেলিয়া না দিলে "নিরুপদ্রবে এবং বৈধ উপায়ে" কোনও দিন ভারতবর্ষে সত্য স্বারাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে না। বিগ্রহ-বিদ্রোহের পথে স্বারাজ্য লাভ করিতে গেলে বর্ত্তমান ভারত-শাসন আইনের কোনও অদল-বদল প্রয়োজন হইবে না; বিদ্রোহী সেনার দাপটে ইংরাজের সকল আইন-কানুন চুরমার হইয়া যাইবে। বিজয়ী বিদ্রোহী শক্তিকে নিজের আইন-কানুন রচনা করিতে হইবে। বিজয়ী বিদ্রোহী শক্তিকে তখন আর দেশের শাসনসংরক্ষণের ব্যবস্থা করিবার জন্য বৃটিশ পার্লামেণ্টের বা ইংরাজ রাজশক্তির মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইবে না। কিন্তু শান্তিতে ও বৈধ উপায়ে—by peaceful and legitimate means—স্বরাজ পাইতে হইলে ভারতীয় শাসন-সংস্কার আইনখানিকে বদলাইয়া লইতে হইবে। এই আইন বদলাইবার অধিকার আমাদের হাতে নাই। ইংরাজ পার্লামেণ্ট এই আইন করিয়াছেন; পার্লামেণ্টই ইহার সংশোধন বা পরিবর্ত্তন করিতে পারেন। অর্থাৎ সোজা কথায় বলিতে গেলে শান্তিতে ও বৈধ উপায়ে স্বরাজ পাইতে হইলে আমাদিগকে পার্লামেণ্টের উপরে আমাদের ইষ্টসিদ্ধির জন্ত নির্ভর করিতে হইবেই হইবে।

সুতরাং স্বরাজী দল যে পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার দ্বারা পার্লামেণ্টের মতিগতি কতটা কি পরিমাণে বদলাইবার সম্ভাবনা, ইহারই বিচার করিতে হয়। এই কষ্টিপাতর দিয়াই স্বরাজী দলের বর্ত্তমান নীতির মূল্য কষিতে হইবে। তাঁহারা যাহা করিতেছেন, তাহার ফলে পার্লামেণ্ট বর্ত্তমান ভারতশাসনসম্বন্ধীয় আইনখানিকে আমরা যে ভাবে বদলাইতে চাহি, সে ভাবে বদলাইবেন কি না, ইহাই মূল প্রশ্ন। এই প্রশ্নের দ্বারাই স্বরাজী দলের নীতির বিচার করিতে হইবে। দেশের লোককে এই কষ্টিপাতরেই স্বরাজী দলের নীতিকে কষিয়া লইতে অনুরোধ করিতেছি।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

ওগো জাগ রাধানগরী!

সাড়া দে গো, সাড়া দে গো, গা নাড়া দে ওঠ্।
রামমোহনের মা বোলে তোর হচ্ছে নামের খোঁট ॥
পাড়াগেঁয়ে হেয়ে বোলে সহরঘেঁষা লোক।
তোমার পানে এদ্দিন ধোরে চায়নি মেলে চোখ ॥
তোমার ধানের মরাই দুধোলো গাই পুকুরভরা মাছ।
তাল তেঁতুল কুল পেয়ারা আম কাঁঠালের গাছ ॥
আর দূর্ব্বাগুচ্ছ তুচ্ছ কোরে পল্লীবাসী জন।
পাথরপাতা কলকেতাতে পেতেছে আসন ॥
সেথা গ্যাসের আলো বিজলী-বাতি
কলের পাখার হাওয়া।
বালাম খেতে গোলামগিরি আর ভাগাড়-ভরা গাওয়া ॥
মজিয়ে মন ঝাঁঝিয়ে ওজন চড়ায় মোটার ট্রাম।
নব্যমনে সভ্যভব্য লাগে না আর গ্রাম ॥
তাই, সুখের সাগর রাধানগর রামমোহনের আঁতুড়।
গয়নাগাটী খুলে আজ গা কোরেছে আদুড় ॥
এখন চালার তলায় জ্বরের জ্বালায় ছটফটায় যে চাষী।
খাওয়ায় খাবী ওলাবিবি যমরাজার সে মাসী ॥
গোষ্ঠহারা গরু এখন কষ্টে টানে হল।
চেষ্টা কোরে মেলে না গাঁয় তেষ্টা-ভাঙা জল ॥
খুদ খেতে পায় না বুঝি দুধ দেবে সে কিসে।
খাবলে খায় কাবলে-ওলা সুদে পিষে পিষে ॥
তবু, তোমার ধূলোর কোলে শুয়ে
আর দড়ির দোলায় দুলে।
কত কবি সাজিয়ে গেছেন বঙ্গ-অঙ্গ ফুলে ॥
তুমি, রাম বোলে রায়েদের ছেলে পেয়েছিলে কোলে।
ওগো, আজও তাই গরব তোমার রাধানগর বোলে ॥
আপনি এসে কণ্ঠে রাজার বসলেন বীণাপাণি।
এই ধর্ম্মভ্রষ্ট বঙ্গে দিতে শ্রেষ্ঠ আশার বাণী ॥
বেদহীন দীন দ্বিজ গেছল হোয়ে বঙ্গে।
হ'ল তন্ত্র শুধু মন্ত্রগত পঞ্চ'ম'কার রঙ্গে ॥
আবার, ভাড়াকরা পাদরীপাড়া কোল্লে দাড়ীনাড়া সুরু।
হলেন ইংলিসে সাঁত্লান ছেলের তাঁরাই ধর্ম্মগুরু ॥
কেষ্ট নষ্ট কালী মাতাল চোল্লো গালাগালির পালা।
হিঁদুর সিঁতের সিঁদুর কুসংস্কার মায়ের নোয়ার বালা ॥
তাই চাঁদের মতন ছেলে কত ছেড়ে মায়ের কোল।
খৃষ্ট ভ'জে মোজলো খেতে মিষ্ট ফাউল-ঝোল ॥
মেরী-শিশু মুখে নাম সুখে শেরী পান।
শ্রদ্ধার আদ্যশ্রাদ্ধ খাদ্যে শুচি বলিদান ॥
আর্কফলা তর্কজাল পুরোহিতের পুঁজি।
ছুৎমার্গে যাবে স্বর্গে তাই নে যোঝাযুঝি ॥
এই অসময় রামমোহন রায় না এলে হায় বঙ্গে।
সারা দেশটা শেষে যেত ভেসে খৃষ্টানি-তরঙ্গে ॥
বুঝে আর্য্যধর্ম্ম বেদমর্ম্ম কোরে ব্রহ্ম-বোধ সার।
'একমেব অদ্বিতীয়ম্' শুদ্ধ মন্ত্র রাজা করে সুপ্রচার ॥
এই নতুন শিক্ষা নতুন দীক্ষা নয় পরের ভিক্ষা করা ধন।
শুধু পরের আলো জ্বল্লো ভাল রামমোহনের
একা আয়োজন ॥
এই যে অন্ধ বাংলা গদ্য-পদ্য-পদ্ম-মধুকর।
করেন সভার শোভায় মনোলোভা এ রাধানগর ॥
সেই রামমোহন-ই মোহন বেণু ধোরে আপন অধরে।
গাইল তত্ত্বগীতি ধর্ম্মনীতি মাতিয়ে ক্ষিতি সুস্বরে ॥
না পোহাতে রাতি, দিব্য মালা গাঁথি,
জ্বালি পূতবাতি রাজা মহামতি।
পদ্মনরোধারে গদ্য-উপচারে
সরস্বতী মা'রে করেন আরতি ॥
তাই, বাণীপুত্র সব করিতে উৎসব
জয় জয় রব এসেছে তোমার ধামে।
করেছিলে পুণ্য, ছেলে ছিল ধন্য, তাই কত গণ্যমান্য
এসেছে অরণ্যে পূজিতে সে রামে ॥
আজ দুঃখ ভুলে যা, রামমোহনের মা
পূজতে তোমার পা দাঁড়িয়ে দেশের ছেলে।
মেরে গুঁড়ি গুঁড়ি উঠে এসে বুড়ী,
দেখ কুঁড়েয় কুঁড়েয় ঢুঁড়ে, কে খেলে কি না খেলে ॥
তোর শেষ বয়সের আশা দেশের ভালবাসা
ভূপেন বোসের আসা হয়নি-দেহের দায়।
তাই, ভাইপো দেছে পাঠিয়ে কুঁয়ো ফুঁয়ো কাটিয়ে
সবার সাধ মিটিয়ে পূজতে ঠাকুরমায় ॥

ভোজনসাধন

তৃতীয় বা শেষ পর্ব্ব

'Fought all his battles o'er again,
And thrice he slew the slain.'

DRYDEN : *Alexander's Feast.*

প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব্বে ছাত্রজীবনের, অর্থাৎ জীবনের প্রথম কুড়ি বৎসরের ভোজনসাধন-প্রণালীর পরিচয় দিয়াছি। এইবার পঞ্চত্রিংশদ্-বর্ষব্যাপী দীর্ঘ কর্ম্মজীবনের ভোজনসাধন-প্রণালীর পরিচয় দিব।

১

বাল্যেই বিদ্যাশিক্ষার জন্য প্রবাসে গিয়াছিলাম; কিন্তু সে বাসগ্রামের নিকটেই এবং সেখানে পরগৃহে নিজগৃহের মত আশ্রয় পাইয়াছিলাম। পঠদ্দশার শেষ কয় বৎসর কলিকাতা-বাসী হইয়াছিলাম, কিন্তু বিদেশ হইলেও কিছুদিন বাসের পর কলিকাতা আর প্রবাসভূমি বলিয়া বোধ হইত না, সুহৃৎ-সতীর্থ-সমাজের সহবাসে সুখে কাল কাটাইতাম।

কিন্তু এইবার প্রকৃতই প্রবাসী হইতে হইল—একেবারে তিনটা জেলা পার হইয়া পূর্ব্ববঙ্গের বরিশাল সহরে প্রথম চাকরি যুটিল। তবে ভগবানের কৃপায় সেই 'সুর্য্যি-মামার দেশে'ও আমাদের অঞ্চলের দুই জন ভদ্রলোককে পাইয়াছিলাম; এক জন তথাকার বড় উকীল, অপর জন স্কুলে সহপাঠী ছিলেন। (উভয়েই এক্ষণে পরলোকে।) গ্রহের ফেরে এক বৎসর তথায় স্থিতিকাল—এই এক বৎসরকে 'অজ্ঞাত-বাস' বলা যাইতে পারে। কেনন', বালাম চা'ল,মসুর ডা'ল, 'মিঠা কুমার', (বিলাতী কুমড়া) ও 'পানিকচু' (জলজাত কচু) এই চারি পদ, এবং 'কাঠুয়া'র মাংস (এক প্রকার কচ্ছপ-জাতীয় জীব—আমাদের অঞ্চলের 'কেঠো'?) ছাড়া খাদ্য-বৈচিত্র্য তথায় ছিল না। এই চতুষ্পদ-সুদ্ধ ধরিলে অষ্টপদ—বরিশালের উচ্চারণে 'আষ্ট' পদ—(অষ্টাপদ মৃগ-বিশেষঃ!)। তাহার উপর ব্যঞ্জন-রন্ধনের সুব্যবস্থাও ছিল না। 'খাবার'ও সুবিধামত মিলিত না, নিমন্ত্রণও প্রায় পাওয়া যাইত না (সংবৎসরে দুইটি মাত্র যুটিয়াছিল), পূর্ব্ববঙ্গের 'বড় দুখ রহল পরাণে।' ফলতঃ একরকম 'ম'রে আছি' অবস্থায় থাকিতে হইয়াছিল। কেবল বিলাতী কুমড়াই চির-প্রিয় ও চিরপরিচিত স্বজনের মত প্রবাসক্লেশের প্রশমন (কিঞ্চিৎ পরিমাণে) করিয়াছিল।

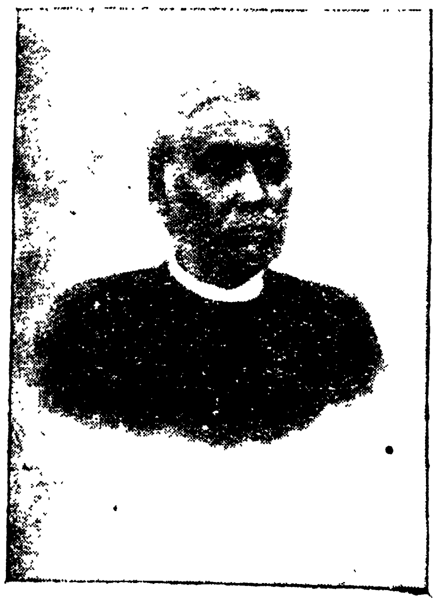
বাল্যলীলার বিবরণে (ফাল্গুনসংখ্যায়) বলিয়াছি, প্রথম-জীবনে ভাজা কলাই ও ভাজা অরহর ডা'লের ভক্ত ছিলাম; পরে অবশ্য সোণামুগের পক্ষপাতী হইয়াছিলাম; বহুদিন পরে ৺কাশী গিয়া ছোলা, মটর, তথা কাঁচা অরহরের স্বাদ বুঝিয়াছি (এ ডা'ল তিনটি—বিশেষতঃ শেষেরটি সেখানে বেশ সুস্বাদ, ঘৃতসংযুক্ত হইলে তো সোণায় সোহাগা); আর বরিশালে গিয়া মসুর ডা'লের মর্ম্ম-গ্রহণ করিতে শিখিয়াছি, নতুবা 'মধুসূদন'-নামে পূর্ব্বে বিপত্তিভঞ্জন না হইয়া বিপত্তিবোধ হইত, ডাঃ যদুনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'শরীর-পালনে' ইহার ভূয়সী প্রশংসা থাকিলেও কোন ক্রমে ইহার অনুরাগী হইতে পারি নাই; কিন্তু বরিশালের মসুর ডা'ল মুগের ডা'লের সহিত প্রায় সমান খুঁটের, বলিয়া না দিলে মুগ বলিয়া ভ্রম হওয়া অসম্ভব নহে, মুগের অভাবে তাহার স্থান পূরণ বেশ করিতে পারে। (আশ্চর্য্যের বিষয়, বরিশালের মসুর ডা'ল 'দেশে' ও কলিকাতায় রাঁধাইয়া দেখিয়াছি, তেমন তারটুকু পাই নাই। ইহাকেই বলে স্থানমাহাত্ম্য!)

আমিষ আহার্য্যটিতে কিন্তু একেবারেই নারাজ ছিলাম। 'দেশে' থাকিতে ২।১ বার 'উবি'র মাংস পাতে পড়িয়াছিল, কিন্তু আঁষ্‌টে গন্ধে গলাধঃকরণ করিতে পারি নাই। (উবির মাংসের গোঁড়ারা বলেন, সেটা রন্ধনের দোষ।) বরিশাল-বাসী শীতকালে উক্ত উভচরের মাংস উপাদেয়-বোধে নিত্য উপভোগ করেন, প্রত্যেক বাড়ীর পিছনে কাঠুয়ার খোলার স্তূপাকার পাহাড় দিন দিন উচ্চ হইতে উচ্চতর হয়, এবং 'যাহারা ঋজুপাঠ দু'ট লয়েছেন লুঠি', তাঁহাদিগকে বক-কুলীরক-কথার 'অস্থি-পর্ব্বতম্' স্মরণ করাইয়া দেয়। যাক্, 'ও রস-বঞ্চিত' আমি আহারের কষ্টে এই 'লক্ষ্মীমন্ত'

অধিককাল টিকিতে পারি নাই, গ্রীষ্মের ছুটিতে 'দেশে' ফিরিয়া আর 'সেমুখো' হই নাই।

২

গ্রীষ্মের ছুটির পর মাসখানেক বেকার বসিয়া থাকিয়া ('সো বি আচ্ছা') আবার প্রবাসযাত্রা করিলাম—এবার পূর্ব্বে না গিয়া 'পশ্চিমে'—ভাগলপুরে। তবে বেহারে গিয়াও বেঘোরে পড়ি নাই; মাতুল মহাশয় তথাকার কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। (১০ ১১ বৎসর হইল তাঁহার ৺কাশীপ্রাপ্তি হইয়াছে)। তাঁহার শ্রীচরণ-সান্নিধ্যলাভের সৌভাগ্য ঘটিল; আবার কৃষ্ণনগরে অধ্যয়নের প্রথম বৎসরে যিনি অভিভাবকস্থানীয় ছিলেন (২য় পর্ব্বে উল্লিখিত), তাঁহাকে এখানে কর্ম্মসহচর-রূপে পাইলাম। (মাতুল মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ জামাতা, তত্রত্য কলেজ-সংলগ্ন স্কুলের অন্যতম শিক্ষক। এক্ষণে পরলোকগত।)



লেখকের মাতুল ৺হরিপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্

এমন সুখের মিলনেও সেখানে কিন্তু কার্য্যগতিকে দুই মাসের বেশী তিষ্ঠিতে পারিলাম না। বোধ হয়, সব দিক্ দেখিলে সেটা শুভাদৃষ্টই বলিতে হইবে। কেননা, একে যৌবনের জঠরাগ্নি, তাহাতে 'পশ্চিমে'র স্বাস্থ্যকর জলবায়ু—অর্থাৎ অগ্নির সহায় বায়ু; প্রত্যহ কলেজের ফেরতা বৈকালে দুইটা করিয়া ভুট্টা পোড়াইয়া খাওয়ার পর রাত্রে হিন্দুস্থানী 'মহারাজে'র হাতে গড়া যাঁতার আটার রুটি কুড়িখানা, ঢেঁড়স-চর্চ্চরী * ও অরহর ডা'ল দিয়া, সাবাড় করিয়া তাহার উপর দুধে দুই হাতা ভাত লইতে হইত। ফলতঃ, দুই মাসেই আহারের বহর যে রকম বাড়িয়া গেল, তাহাতে অনুমান হয়, 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' করিলে তো 'মুণ্‌কে রঘু' হইয়া দাঁড়াইতাম।

যাহা হউক, এক বৎসর পূর্ব্বে চাকরিতে প্রবৃত্ত হইবার সময় যে দুই সুট পোষাক তৈয়ার করাইয়াছিলাম, সেগুলি না ছিঁড়িতেই ভাগলপুরের বাফ্‌তার দুই সুট পোষাক বড় মাপে তৈয়ার করাইয়া পূর্ব্বপশ্চিম দিগ্বিজয় করিয়া আবার বাঙ্গালা মুল্লুকে ফিরিলাম।

৩

শুধু বাঙ্গালা মুল্লুকে কেন, (বহরমপুরে) একরকম নিজের 'দেশে'ই ফিরিলাম—কেননা, নদীয়া মুর্শিদাবাদ পাশাপাশি জেলা এবং কৃষ্ণনগর হইতে মুর্শিদাবাদ পর্য্যন্ত একটি বাঁধাসড়ক আছে। * তাহা ছাড়া আমাদের অঞ্চলের কয়েক ঘর ভদ্রলোক চাকরি বা ব্যবসায়-সূত্রে এখানে উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পাড়ায় বাসা বাঁধাতে যেন নিজের 'দেশে' আছি, এইরূপ স্বচ্ছন্দতা অনুভব করিতাম। তাঁহারাও আমাকে চির-পরিচিতের ন্যায়, পরমাত্মীয়ের ন্যায়, (অথচ পূর্ব্বে কখনও আলাপ-পরিচয় ছিল না,) গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং আপদে-বিপদে বুক দিয়া পড়িতেন। (আজ তাঁহারা প্রায় সকলেই পরলোকগত।) † আবার এখানে একটি পুরাতন সতীর্থ ও সুহৃদ্‌কে পাইয়াছিলাম এবং তাঁহার মারফত আরও কয়েকটি বন্ধু লাভ করিয়াছিলাম।

এখানে তিন বৎসর টিকিয়া ছিলাম। এক

* বর্ষাকালে মৎস্য দুর্ল্লভ ও মহার্ঘ, সুতরাং দুইবেলা কুলাইত না। রাত্রে ঢেঁড়স আমিষের স্থলাভিষিক্ত হইত; ইহার ইংরেজী নাম যখন Lady's finger, তখন আমিষ বলিব বৈ কি? (এমন বদখত আনাজের কি মোলায়েম নাম! ইহাই তো প্রকৃত কবিত্ব

* ছুটিতে ছুটিতে এই বাঁধা সড়ক দিয়া বহুবার গোযানে যাতায়াত করিয়াছি। তাহার স্মৃতি (ফোয়ারায়) 'গরুর গাড়ী'তে রক্ষিত হইয়াছে। (সে সময়ে রাণাঘাট-মুর্শিদাবাদ রেলওয়ে খোলে নাই।) একবার পূজার সময় গঙ্গায়-গঙ্গায় নৌকাযোগে সপরিবারে দেশে গিয়াছিলাম। সে বড় আনন্দের জলযাত্রা।

† বিশেষভাবে বিচক্ষণ ডাক্তার ৺আনন্দলাল গাঙ্গুলীর নিকট বহু উপকার পাইয়াছি। পিতার উপযুক্ত পুত্র শ্রীমান্ অতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী এক্ষণে কলিকাতাবাসী, পিতার ব্যবসায় ও সুনাম বজায় রাখিয়াছেন। আশীর্ব্বাদ করি, শ্রীমান্ দীর্ঘজীবী হইয়া সমাজের সেবা করুন।

কলিকাতায় ভিন্ন আর কোথাও এত দিন থাকা ঘটে নাই। এই তিনটি বৎসর আমার চাকরির জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা সুখের দিন ছিল। এইখানে চাকরি-জীবনে প্রথম মাতৃসমা ঠাকুরমাতা ও সংসার-সঙ্গিনীকে আনিয়া ('নাস্তি ভার্য্যা-সমো বন্ধুঃ') প্রবাসকে সুখাবাসে পরিণত করিয়াছিলাম। তখনও সন্তানাদি না হওয়াতে নির্ঝঞ্ঝাট ও সন্তানহানি না হওয়াতে শোকরহিত ছিলাম। এখানে সকল প্রকার খাদ্যই পাওয়া যাইত, অসম্ভব-রকম সস্তাও ছিল (এখন রেলের কল্যাণে সে দিন আর নাই শুনি)। নিজে তো সাগ্রহে ও সানন্দে এই সব আহার্য্যের প্রচুর সদ্ব্যবহার করিতামই, অধিকন্তু নূতন গৃহস্থালী-স্থাপনের উল্লাসে বন্ধুগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া পিতামহী দেবীর হাতের পাক নিরামিষ ব্যঞ্জন ও পরমান্ন এবং তাঁহার উপযুক্ত নাতবৌএর হাতের পাক মৎস্য মাংস পোলাও কালিয়া পরিতোষপূর্ব্বক খাওয়াইতাম। মাসে একবার করিয়া এই আনন্দের হাট বসিত। আজ সে সব বন্ধুর অনেকেই এ জগতে নাই; বাকী যে ২।১ জন আছেন, তাঁহারাও নানাস্থানী হইয়া পড়িয়াছেন, * নিত্যসাক্ষাতের পরিবর্ত্তে বারো মাসে একবার, এমন কি, বারো বৎসরের এক যুগেও একবার দেখা হয় না। পত্রব্যবহার পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়াছে। থাক্, এ সব বিষাদ-কাহিনী। প্রকৃত অনুসরণ করি।

এই প্রসঙ্গে বহরমপুরের ডাকসাইটে ছানাবড়া ও খাগড়াই মুড়কীর, তথা অদূরবর্ত্তী আজিমগঞ্জের ক্ষীরের বরফীর উল্লেখ না করিলে, নিতান্ত অরসিকের ও অকৃতজ্ঞের কায হইবে। ক্রিয়াকর্ম্মে নিমন্ত্রণে ব্রাহ্মণত্বের পরিচয় দিতে কসুর করি নাই। রাধাবল্লভী লুচি ও হিঙ-দেওয়া তরকারী এখানকার 'বিশেষত্ব'।

৪

'অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যম্'—ইহা হইল সংসারবিরাগী আজীবন সন্ন্যাসীর উপদেশবাক্য; সংসারী বাল্যবিবাহিত লেখক কি সেই উপদেশ-বাক্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারেন? একবার কিঞ্চিৎ আর্থিক উন্নতির লোভে, দেবোপম মাতুল মহাশয়ের সামীপ্য ছাড়িয়া অন্যত্র গিয়াছিলাম, আবার আরও কিঞ্চিৎ লাভের লোভে 'কনকমৃগতৃষ্ণান্বিতধী' হইয়া, বহরমপুরের পাতান সংসার উঠাইয়া, সাজান বাগান ভাঙ্গিয়া, নিজের অঞ্চল হইতে বহুদূরে 'উত্তরস্যাং দিশি' কুচবিহারে একাকী ট্রেণমারুহ্য উধাও হইলাম—'পূর্ব্বাপরৌ' অর্থাৎ পূর্ব্ব-পশ্চিম দিগ্বিজয় হইয়াছিল, এইবার উত্তরদিকে উত্তরণ। অথবা মল্লিনাথের ভাষায় 'তদ্ব্যস্তরেণাং', অঙ্গ-বঙ্গ জয় করিয়া, এবার কলিঙ্গজয়ে না গিয়া, কামরূপ-অভিযান করিলাম। প্রথম নম্বর, রেলপথে ২৩ বার উঠানামা (কামিনী-প্রেমের নহে, কাঞ্চন-প্রেমের তুফানে); তখন রঙ্গপুরের এলাকা পর্য্যন্ত রেলওয়ের সীমামুড়া ছিল; তাহার পর নৌকায় দুই দুইটা নদী পার হইয়া (একা নদী বিশ ক্রোশ) ডাঙ্গাপথ কতক টঙ্গায় খাড়া বসিয়া, কতক গরুর গাড়ীতে শয্যাশায়ী হইয়া, অর্দ্ধমৃত অবস্থায় ঠিকানায় পৌছিলাম। বরিশালে যাইতে এক রাত্রি ট্রেণে ও দিনমান ষ্টীমারে কাটাইয়াও এমন 'কাহিল' হই নাই। বেলে যাইতে পথে 'অসারে খলু সংসারে সারং শ্বশুরমন্দিরম্' এই ঋষিবাক্য শিরোধার্য্য করিয়া যথাস্থানে যাত্রাভঙ্গ করিয়াছিলাম, সুতরাং বাকী পথটা আরও নীরস, দীর্ঘ ও দুঃখময় লাগিয়াছিল।

যাহা হউক, এ কোণঠেসা অবস্থায় বেশী দিন থাকিতে পারিলাম না। প্রাণটা যেন হাঁফাইয়া উঠিল,—যদিও সেখানকার কলেজে, কলিকাতায় অধ্যয়ন-কালের এক জন সতীর্থ ও বহরমপুর-বাসের সময়কার তথাকার কলেজে এক জন নবলব্ধ বন্ধু (এক্ষণে পরলোকগত) এবং এই দুইজনের সহিত যোগসূত্রে আরও ২।১ জন বন্ধু মিলিয়াছিল। কলেজের বাহিরেও কৃষ্ণনগরের আমলের ২।৩ জন পুরাতন সহপাঠীর পুনর্দর্শন পাইয়াছিলাম। আবার সেখানে অল্প-দিন থাকার পর আমাদের অঞ্চলের দুই মূর্ত্তি তথায় চাকরিসূত্রে গিয়া হাজির হইলেন। বেশ গুলজার হইয়া উঠিল। (সুখের বিষয়, ইঁহারা সকলেই বাঁচিয়া আছেন, যদিও কেহ কেহ কুচবিহার ছাড়িয়াছেন।) এততেও কিন্তু মন বসিল না। কেননা, গৃহিণী সে সময়ে নিকটবর্ত্তী স্থানে থাকিলেও আমার সহিত মিলিত হইবার সম্ভাবনা ছিল না। এ অবস্থায় শুধু অর্থোন্নতিতে, তথা শেষ বয়সে

* কপালে থাকিলে দূরের গঙ্গাও কাছে আসে। এই প্রবন্ধ মুদ্রণ হইবার কিছুদিন পূর্ব্বেই উল্লিখিত পুরাতন সতীর্থ সুদূর 'পশ্চিম' মুলুক বাঁশবেরিলি হইতে কয়েকদিনের জন্য দেশে আসিয়াছিলেন এবং এই অভাগাকে দর্শন দিয়াছিলেন। তাঁহার আগমন 'Like angel-visits few and far between' কালে-ভদ্রে ঘটে।

রাজসরকার হইতে পেন্‌শানের আশায়ও মন বাঁধিতে পারিলাম না, প্রাণটা কেবলই উড়ু উড়ু করিত।

আসল কথা, খাদ্যসুখ সেখানে সুবিধামত ছিল না—বরিশালেরই গোত্র—তরকারীর মধ্যে গোল আলু ও কাঁকরোল! তোড়সা নদীর টাট্‌কা ইলিশ মাছ একমাত্র উল্লেখযোগ্য বস্তু ছিল, কিন্তু তাহাও কলিকাতার গঙ্গার, এমন কি, আমাদের নদীয়া-মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের গঙ্গার ইলিশের কাছে লাগে না। অথচ দরে কলিকাতারও উপর এক কাঠী। মিথ্যা কথা বলিব না, দুধ, ঘী ও আতপ চাউল সেখানে উৎকৃষ্ট ছিল। কিন্তু হইলে কি হয়? অমন যে সুস্বাদ ও সুগন্ধ আতপান্ন সে সময় গলা দিয়া গলিত না। তাই পত্নীর পিতৃ-ভবনে—রঙ্গপুরে গেলে, অল্পই আহার করিতে পারিতাম, লোকে বুঝিত, জামাইএর লজ্জা বেশী! তখন শ্বশুরালয়ে বেখরচায় পাইয়া আতপান্নের অবজ্ঞা করিয়াছি, আর এখন মূল্য ও রেল-খরচা দিয়া তথা হইতে বৎসর বৎসর আনাইয়া লইতে হয়। বাজারে কৃষ্ণনগরের এক ঘর ময়রা ছিল বটে, কিন্তু খাবার আনাইয়া লইবার সুবিধা হইত না। পশ্চিমা বামুনের রান্নাতেও আহারের বিড়ম্বনা ঘটিত।* অগত্যা বৎসর ঘুরিতেই কলিকাতায় চাকরি স্বীকার করিয়া ইংরেজী কেতায় চরণযুগল হইতে কুচবিহারের ধূলা ঝাড়িয়া ফেলিলাম। পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর তিন দিক্ জয় করিয়া, বাকী দিক্‌টাও জয় করিতে দক্ষিণে যাত্রা করিলাম। (যমদ্বারে নহে!) †

এতদিনে ঘূরণচক্রের শেষ হইল; পাঁচ বৎসরে পাঁচ জায়গায় না হইলেও চারি ঘাটের জল খাইয়া কলিকাতার কলেজের ছাত্র কলিকাতার কলেজেই ফিরিয়া আসিল। (ইহাকে কি 'ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিল' বলিব?) সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক উন্নতিও হইল; পুরাতন সতীর্থ ও সুহৃৎ ৺পূর্ণচন্দ্র গোস্বামী ও ৺লালগোপাল চক্রবর্ত্তীর সহিত ছাত্রজীবনের পর আবার কর্ম্মজীবনে একই কর্ম্মক্ষেত্রে পুনর্ম্মিলিত হইলাম (তাঁহাদের কথা চৈত্রের কিস্তিতে বলিয়াছি) এবং তাঁহাদিগের প্রসাদে সুপণ্ডিত সুচরিত ত্রিবেদী মহাশয়কে বন্ধুশ্রেণীতে পরিগণিত করিবার সৌভাগ্য-গৌরব লাভ করিলাম। ইহাই যে এই মর-জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্। প্রতীচীর সুলেখক ষ্টিভ্‌ন্‌সন বড় কথাটাই বলিয়াছেন—"We are all travellers in the wilderness of this world; and the best that we find in our travels is an honest friend. He is a fortunate voyager who finds many. We travel, indeed, to find them. They are the end and the reward of life They keep us worthy of ourselves; and when we are alone, we are only nearer to the absent.......Of what shall a man be proud, if he is not proud of his friends?" (Travels with a Donkey, Dedication to Sidney Colvin.) এক্ষণে ইঁহারা তিন জনেই পরলোকে, আর আমি এই সংসার-দণ্ডকারণ্যে বন্ধুহীন হইয়া মৃতবৎ বাস করিতেছি। 'যজ্জীবতি তন্মরণং



৺লালগোপাল চক্রবর্ত্তী এম্ এ

* এখানে থাকিতে ২।১টা নিমন্ত্রণ পাইয়াছিলাম। তন্মধ্যে কলেজের এক জন সহযোগীর বাটীতে (ইনিও এক্ষণে পরলোকগত) পৌষ-সংক্রান্তিতে তাঁহার পত্নীর তত্ত্বাবধানে পাচকের প্রস্তুত রকম রকম মুখরোচক পিঠেপুলি খাইয়া বরিশাল-বাসকালে যে আপশোষ ছিল, তাহার কতকটা দূর হইয়াছিল।

† আমাদের অঞ্চলের ঘরামীরা বেশী রোজগারের জন্য 'দখিণে' অর্থাৎ রাণাঘাট চাকদহ প্রভৃতি স্থানে ঘরামিগিরি করিতে আসে। আমারও সেই ভাবে আরও দক্ষিণে আগমন।



৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—যৌবনে

যন্মরণং সোঽস্য বিশ্রামঃ।' যাক্, বারে বারে শোকতাপের প্রসঙ্গ তুলিয়া আর রসভঙ্গ করিব না।

কলিকাতায় আসিয়া শুধু যে সুহৃৎ-সমাগমে সুখী হইলাম, তাহা নহে, অবিলম্বে পিতামহী দেবী ও গৃহিণীকে আনিয়া গৃহী হইলাম ('ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে'); আবার বহরমপুরের ন্যায় কলিকাতায় ঘরকরনা পাতিলাম। এবার আর তিন বৎসর নহে, ত্রিশ বৎসরের ধাক্কা। এইখানেই আমরণ স্থিতি। আর যদি ৺বিশ্বেশ্বর কৃপা করেন, তবে আর একবার ৺কাশীধামে শেষ খেলাঘর বাঁধিয়া ভবের খেলা সাঙ্গ করিব। হায় রে আশা!

কলিকাতায় ফিরিয়া, গৃহস্থালী পাতাইয়া, পূর্ণ উৎসাহে আহার-চর্চ্চায় মনোনিবেশ করিলাম। এবার আর রন্ধনের জন্য বামুন বা বামনীর উপর নির্ভর করিতে হইল না, স্বয়ং ব্রাহ্মণী আসিয়া হাঁড়ীবেড়ী ধরিলেন; 'যা'র কর্ম্ম তা'রে সাজে।' কিছুদিন পরে, 'কলিকাতার রেওয়াজমত' এক জন পাচকও নিযুক্ত হইয়াছিল, কিন্তু ভালমন্দ সবই রান্না গৃহিণীর জিম্মা, 'ঠাকুর' কেবল ডা'লভাত সিদ্ধ করিয়া দিয়া খালাস, অবশিষ্ট সময় ছেলে লইয়া বেড়াইত। আহারটি তৃপ্তিপূর্ব্বকই হইতে লাগিল। সহরের বাতাসে শুধু পূর্ব্বাভ্যস্ত পাঁচ ব্যঞ্জনে সন্তুষ্ট হই নাই, আমিষের ক্ষেত্রে বর্ষায় তপ্সী ও গঙ্গার ইলিশ বৌবাজার হইতে (কখনও কখনও আহীরিটোলা হইতে), হেমন্তে গল্দা চিংড়ি, শীতকালে ভেট্‌কি (ভেট্‌কির শিরদাঁড়া, বাঁধাকপির সহিত), স্বহস্তে সবহুমানে বহিয়া আনিয়াছি। রুই কাতলা মিরগেল খরশুলা শৌলের তো কথাই নাই। আবার তখনকার পূর্ণযৌবনে সহরে আহার চপ্ কট্‌লেট্ কালিয়া কাবাবেও বিলক্ষণ টান হইয়াছিল; অবশ্য সবই গৃহজাত, 'আশ্রম' হইতে আনীত নহে; দৌড় অবশ্য ছাগমাংস পর্য্যন্ত; 'মৃগমাংস পক্ষিমাংস যেবা ইচ্ছা হয়' তো নহেই, মটন্ পর্য্যন্তও প্রোমোশন্ পাই নাই; তবে মাংসটা 'কসাই-কালী'র প্রসাদ; কচিৎ কালীঘাটের মহাপ্রসাদ মিলিত। প্রথম পর্ব্বে (ফাল্গুনে) বলিয়াছি, ইদানীং কয়েক বৎসর হইতে দাঁতের জ্বালায় ও সব দিকে আর ঘেঁসি না, ঘি-গরম-মশলা দিয়া রান্না চতুষ্পদের দেহ পরিপাক করিবার মত অগ্নিও এক্ষণে এই নির্জ্জীব দেহে নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছে। মাংসের অনুপান ছিল লুচি বা টোষ্ট-করা পাঁউরুটি, অথবা রকমারি হিসাবে ঢাকার পরোটা। শেষ জিনিশটা ঘরে ওস্তাদ হিন্দুস্থানী রাঁধুনী ব্রাহ্মণের বানান; পাঁউরুটিটাও ঐরূপ সদ্‌ব্রাহ্মণের বানান কি না, সে কথা আর নাই লিখিলাম। কথায় বলে, 'শতং বদ মা লিখ'—আর 'লিখ তো লিখ, মা ছাপ!'

ইহা ছাড়া বাজারের খাবার—বৌবাজারের ভীম নাগের আমসন্দেশ তালশাঁস, বাগবাজারের নবীন ময়রার রসগোল্লা, বড়বাজারের ক্ষীরের মিঠাই বরফী ইত্যাদি ও আফিসের চৌরাস্তার রাবড়ী, (রসগর্ভনির্ভর রসগোল্লা

রাব্‌ড়ী একত্র মাখিয়া—অনুপ্রাসের অনুরোধে নহে, মধুর-রসের উপরোধে), বৌবাজারের খাস্তা গজা তথা হালের এম্‌প্রেস্ গজা, খিলি গজা, লবঙ্গলতিকা, নোন্‌তার রাজ্যে কচুরি নিমকি শিঙ্গাড়া পাঁপরভাজা ঝুরিভাজা (বড়-বাজারের) এবং ভোজে-কাযে ঘরে তৈয়ারি জেলাপি বঁদে খাস্তাগজা পানতোয়া ও হালফ্যাশন দরবেশ রাজবেশ, কিছুই বাকী নাই। কেবল কলিকাতার ক্ষীরটা কখনও প্রবৃত্তির সহিত পান করিতে পারি নাই, নিমন্ত্রয়িতার মন বা মান-রক্ষার জন্য কষ্টে-সৃষ্টে খুরীতে চুমুক দিয়াছি—'রোগী যথা নিম খায় মুদিয়া নয়ন।' তবে বন্ধুবর পূর্ণচন্দ্র গোস্বামী যখন 'দেশ' হইতে ভাঁড় ভাঁড় ক্ষীরের ভার আনাইতেন, তখন সেই ক্ষীর দিয়া লুচি মাখিয়া মহা-আনন্দে 'দেশের' নিয়মে 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' করিতাম। ইদানীং 'ঢাকার ক্ষীর'ওয়ালার ডাক খুবই শুনি, নামডাকও খুব আছে, কিন্তু ভেজালের ভয়ে ও বয়সের গতিকে পরখ করিবার সাহস হয় নাই। (বহুকাল পূর্ব্বে ঢাকার লোক, পঠদ্দশার প্রিয়বন্ধু, শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়ের আনীত 'পাত-ক্ষীর' খাইয়া তৃপ্তি লাভ করিয়াছিলাম। ইঁহার কথা ২য় পর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি।)

ক্ষীর লুচির প্রসঙ্গে একটা কথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। আমাদের অঞ্চলের পুরাতন প্রথা, ক্ষীর-গোল্লা দিয়া লুচি (লুচি-চিনি আরও পুরাতন) মাখিয়া খাওয়া—লোকলজ্জার খাতিরে রাজধানীর প্রকাশ্য ভোজনগোষ্ঠীতে ছাড়িতে হইয়াছে, ডাল ডালনা ছকা কালিয়া দিয়া লুচি চালাইতে শিখিতে হইয়াছে। ঘরে 'আপ্‌রুচি খানা' চলে বটে, কিন্তু ক্রিয়াকর্ম্মে ভিন্ন 'অচাল' সন্দেশ পাইব কোথায়? তবে ঘরে পায়স প্রস্তুত হইলে লুচি-পরমান্ন-রূপ মণিকাঞ্চন-যোগ ঘটে।

ঘরে ও বাজারে যে সব লোভনীয় খাদ্য মিলিত, তাহা-তেও মন উঠিত না। সুযোগমত কৃষ্ণনগরের সরপুরিয়া-সরভাজা, শান্তিপুরের খাসমোয়া ও নিখুঁতি, খাগড়ার মুড়কি ও ছানাবড়া, জনাইএর মনোহরা, নাটোরের গোল্লা ও রাঘবসাই, দক্ষিণের 'পয়রাগুড়', মোল্লারচকের দৈ ও ক্ষীর, এ সবও আনাইতাম। এখনও এ অভ্যাস একেবারে যায় নাই—বিশেষতঃ মাতুলালয় শান্তিপুর হইতে ওটা তো বার্ষিক হইয়া পড়িয়াছে।

এতক্ষণ ধরিয়া যে সকল সুখাদ্যের কথা লিখিলাম, সেগুলি সম্বন্ধে এইটুকু বক্তব্য যে, ছাত্রজীবনের মত অবশ্য নিত্য উৎসব চলে নাই; তখন পরের পয়সা—গৌরী সেনের টাকা—খরচ করিতে বাধিত না; আর এখন চাকরির জীবনে কষ্টার্জ্জিত পয়সা, তাহাতে আবার ছা-পোষা মানুষ; ইহা ছাড়া তখনকার মেসের রান্নায় অনেক সময়ে কান্না পাইত, অগত্যা বাজারের জলখাবারের উপর ঝোঁক দেওয়া ছাড়া উপায়ান্তর ছিল না।

কলিকাতা রাজধানী জায়গা—কাযে-কাযেই নিমন্ত্রণ-বাহুল্যও ঘটিয়াছে। ইহার মধ্যে ত্রিবেদী মহাশয়ের গৃহে প্রীতিভোজন এখন বেদনার স্মৃতিমাত্রেই পর্য্যবসিত। ("A Sorrow's crown of sorrow is remembering happier things" কবিবাক্য রহিয়া রহিয়া মনে পড়ে।) নিমন্ত্রণে যাইবার পরদিন উপবাস—ইহা তো আমার প্রবীণ বয়সের নিয়ম; আমি ল্যাম্বের ভক্ত (দোহাই পাঠক মহাশয়, মটন্ বুঝিয়া বসিবেন না)—সুতরাং "If nothing else could be said for a feast, this is sufficient —that from the superflux there is usually something left for the next day" অর্থাৎ ভোজের পরদিন তাহার গদ্ থাকে—ল্যাম্বের এই মহাবাক্যটি শিরোধার্য্য—উঁহু—উদরধার্য্য করিয়াছি। কিন্তু ত্রিবেদী মহাশয়ের গৃহে ভূরিভোজনের পরে এক দিনেও জের মিটিত না। শুনিয়াছি, হিন্দুস্থানীরা নিমন্ত্রণ পাইলে পূর্ব্বদিন জোলাপ লয়—যাহাতে উদর পরিষ্কার হইয়া থাকে, নিমন্ত্রণ খাইবার সময় যত ইচ্ছা বোঝাই লওয়া যায়। ত্রিবেদী মহাশয়ের পূর্ব্বপুরুষগণ হিন্দুস্থানী ছিলেন—বোধ হয়, সেই জন্য তাঁহার গৃহে নিমন্ত্রণে উক্ত নিয়ম প্রতিপালিত হওয়া উচিত ছিল। (কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণদিগের বংশধরগণও বাদ যান না।)

৬

চাকরি-জীবনে মফস্বল সহরে প্রবাসকালে ও কলিকাতায় বাসের প্রথম আমলে গ্রীষ্মের লম্বা ছুটিতে ও পূজার ছুটিতেও 'দেশে' যাওয়ার অভ্যাস ছিল। ক্রমে কলিকাতায় 'কায়েম মোকাম' করিলে (যদিও ভাড়ার বাড়ীতে) অভ্যাসটি লোপ পাইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, যখন তিন জায়গায় নামিয়া তিন রকম যানে চড়িয়া গরুর গাড়ীতে শেষরক্ষা

করিতে হইত, তখন ঘন ঘন বাড়ী যাওয়া ঘটিত। আর যেই রেল খুলিল (রাণাঘাট-মুর্শিদাবাদ লাইন্), পথ সুগম হইল, আর বাড়ী যাওয়ার পাটও উঠিল। ইহাকেই বলে 'উন্টা বুঝ্‌লি রাম!' প্রথম লোপ পাইল পূজার ছুটিতে যাওয়া—ম্যালেরিয়া-মাহাত্ম্যে। বেশ মনে আছে, উপরি উপরি ২।৩ বৎসর কোজাগরী পূর্ণিমার দিন স্বহস্তে ধর্ম্মদায় বাজার হইতে আমাদের অঞ্চলের সুবৃহৎ গল্দা চিংড়ি আনিয়া রাত্রির আহারে লুচির সহিত বিলাতী কুমড়ার ঘাঁটের উপর কালিয়ার ব্যবস্থা করিলাম, আর দুপুরে আহারান্তে বা আহারে বসিয়া কম্প দিয়া জ্বর আসিল,আশার জিনিশ গল্দা চিংড়ির কালিয়া মাঠে মারা গেল। শৈশবে পুত্রকন্যাগণও তথায় গেলেই ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইত। (যাক্, এ প্রসঙ্গ এইখানেই চাপা থাকুক, নতুবা শোকের স্মৃতি পুনরুজ্জীবিত হইবে।) গ্রীষ্মের ছুটিতে আম-কাঁঠাল তো ছিলই, তাহার উপর তখনকার দিনে গৃহপ্রাঙ্গণস্থ বৃক্ষের সুপক্ক শ্রীফলের পক্ষপাতী ছিলাম—কারণ অবশ্য অনুমেয়। অনুমেয় কারণের কার্য্য তো হইতই, তাহা ছাড়া জঠরাগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়িত, ফলে দারুণ অগ্নিবৃদ্ধি হইত। আর এখন—পাকা বেল,বেলের সরবৎ, বেলপোড়া, বেলের মোরব্বা, যাহাই কেন খাই না, বেজায় পেট ভার হয়, চোঁয়া ঢেকুর উঠে, ইত্যাদি ইত্যাদি। শিবের প্রিয় ফলে এরূপ অশিবের উৎপত্তি, কলির প্রকোপে ভিন্ন আর কিসে হইতে পারে?

৭

তাহার পর, প্রায় ১০ বৎসর হইতে ছুটিতে ৺কাশীযাত্রার নিয়ম হইয়াছে। (অবশ্য সকল ছুটিতে ৺বিশ্বেশ্বর-অন্নপূর্ণার কৃপা হয় না, মা-লক্ষ্মীরও অনুগ্রহ হয় না।) যখন প্রথম কাশীদর্শন-সৌভাগ্য ঘটিল, তখন একটা অভিনব খাদ্যজগৎ চক্ষুর সমক্ষে, বায়োস্কোপের ছবির মত, খুলিয়া গেল, ইংরেজ কবির ভাষায়—"Then felt I like some watcher of the skies. When a new planet swims into his ken" বলিতে ইচ্ছা করে। বাস্তবিক, কাশীর দধিমাখন, মালাই-রাবড়ী, কালাকাঁদ-চম্‌চম্, তিথুরের জেলাপী, ছানার পোলাও, কচুরীগলির খাস্তা কচুরী, বঁদে, অমৃতী, খাজুরা, ঘিওর, তথা বাঙ্গালীটোলার শশী ও তস্য জামাতার দোকানের 'খাবার', (বেগুনী আলুর চপ তেলেভাজাও ফাঁক যায় নাই), এবং লেংড়া আম কালোজাম তরমুজ খরমুজা পেঁপে পেয়ারা কুল রামনগরের বেগুন মূলা কপি খাইলে বিশ্বেশ্বরের পুরী যে এই পৃথিবীর নহে, প্রকৃতই 'স্বর্গভূমি,' তাহা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হয়। অন্নপূর্ণার প্রসাদ পাইলে জন্ম জন্ম দারিদ্র্য হয় না, এই প্রবাদ শ্রুতিগোচর হওয়াতে এক রজতমুদ্রা প্রণামী দিয়া মায়ের প্রসাদ পরমান্ন পরম ভক্তির সহিত আকণ্ঠ ভোজন করিয়াছি, তাহার তীব্র মাধুর্য্য যাহাতে 'সহ্যাতীত' না হয়, সে জন্য তৎসঙ্গে রুটির ব্যবস্থা করাইয়াছিলাম; ভাত-তরকারীর লেঠায় যাই নাই। হরিদ্বার প্রভৃতি অন্যান্য তীর্থেও যে খাদ্যসুখ উপভোগ করিয়াছি, তাহার পরিচয় ('পাগলা ঝোরা'য়) 'ধর্ম্মে মতি'তে পাঠক পাইবেন, আর চর্ব্বিত-চর্ব্বণ করিব না।

৮

এই তো গেল সুস্থশরীরে খোসমেজাজে বাহালতবিয়তে ভোজন সাধনের বিচিত্র বিবরণ। তাহার পর যখন তবিয়ত খারাপ হইল, বৎসরাধিক কাল (ডিস্‌পেপ্‌সিয়া) অজীর্ণ, giddiness (ঘুরুণি), nausea (গা-বমি) উদরাময়,রক্ত-আমাশয়, কোষ্ঠবদ্ধতা, বায়ুক্রুরতা, জ্বর, ফোড়া প্রভৃতি রকমারি রোগ আমার উপর উঠিয়া পড়িয়া লাগিল, তখন ডাক্তার-বৈদ্যের ভ্রূকুটিতে আহারের স্বাধীনতা লোপ পাইল, বাঁধা-ধরা তরী-তরকারীতে তুষ্ট থাকিতে হইল। এই দীর্ঘকাল অসুস্থ অবস্থায় চিকিৎসকের ব্যবস্থায় ধৈর্য্য ধারণ করিয়া বিশেষজ্ঞের আদেশ-উপদেশ অবনতমস্তকে পালন করিয়াছি, কবিরাজের কথামত, কৈ-শিঙ্গি-মাগুর প্রভৃতি 'জীয়ন্ত মৎস্য' (ছোট একখানি ঝাড়নে বাঁধিয়া) এবং কাঁচা ও পাকা বেল, কাঁচা ও পাকা পেঁপে, সাঁতরাগাছির ওল ও বারাসতের জয়নগরের বা যশোরের মানকচু, দেশী কুমড়া বা লাউ, ইঁচড় ও মোচা, করোলা ও উচ্ছে, পল্‌তা ও পটোল, কাটোয়ার ডাঁটা ও সজিনাখাড়া, স্বহস্তে বাজার হইতে বহন করিয়া আনিয়া চিকিৎসকের আজ্ঞানুবর্ত্তিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছি। কোনও নিষিদ্ধ বস্তু ভোজন করিয়া স্বৈরাচার করি নাই; যখন বর্ষাকালে গঙ্গার ইলিশমাছ-ভাজার গন্ধে গৃহ আমোদিত হইয়াছে, তখন ঘ্রাণে অর্দ্ধভোজনেই তৃপ্ত হইয়াছি, আর শীতকালে পাকশালায় ভেট্‌কি-বাঁধাকপি, গল্দাচিংড়ি-ফুলকপি প্রভৃতির সংযোগ-দর্শন-সুখেই সুখী হইয়াছি,

স্পর্শনসুখ বা আস্বাদনসুখভোগের জন্য চঞ্চল হই নাই—বুকে হাত দিয়া এই সাফাই দিতে পারি। তবে বিধিবদ্ধ ব্যঞ্জনের বেলায় যদি 'জিহ্বালৌল্যাৎ' মাত্রা অতিক্রম করিয়া থাকি, সে অবশ্য আলাদা কথা। সে ক্ষেত্রেও এইটুকু বলিতে পারি যে, একটি চলিত গল্পের নায়ক বেগুনপোড়া দিয়া পথ্য করিতে অনুমতি পাইয়া যেমন এক কুড়ি বেগুন পোড়াইয়া দগ্ধোদরে দিয়াছিল, আমি কোন দিন সেরূপ বাড়াবাড়ি করি নাই।

হাতে বহিতে অনেক সময় ভার বোধ কয়াতে ভদ্র-মুটে সাজিবার জন্য ফরমায়েশ দিয়া জামার পকেট্ তৈয়ার করাইয়া লইয়াছি। অর্জ্জুন যেমন অনেকবাহূদরবক্ত্র বিশ্বরূপের বহুমুখে জীবকুলকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সন্ত্রস্ত হইয়াছিলেন, তেমনই ব্যাপারীরাও সেই সারি সারি পকেটে শুধু পলতা পটোল উচ্ছে করোলা কেন, পেঁপে বেল ওল মানকচু কাঁচকলা ইঁচড় প্রবেশ করিতে দেখিয়া সন্ত্রস্ত হইত। (লাউ কুমড়া ডাঁটা মোচার বেলায় অবশ্য থলির ভিতর হাতী পোরার চেষ্টা করি নাই।) * একবার বৌবাজারে বৈকালে মেছোপটিতে ভিড়ের মধ্যে পাশ-পকেট্ হইতে চশমাযোড়াটি চুরি গিয়াছে, (ভাগ্যে রোল্ড্ গোল্ড্, নতুবা সোণা হারাণর প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত), নূতন চশমা কিনিয়া হৃদয়ের নিধির মত (তা' চাল্‌শেধরা প্রৌঢ়ের উহাই যে প্রকৃত চক্ষুরত্ন), মহাবীরজির বক্ষোবিহারী রামনামের মত, বুকপকেটে রাখিয়া নব-উদ্যমে আবার বাজার করিতে গিয়াছি, 'বিঘ্নভয়ে' বাজার যাওয়া বন্ধ করি নাই। কবি যথার্থই বলিয়াছেন—

> 'বিঘ্নৈঃ পুনঃ পুনরপি প্রতিহন্যমানাঃ।
> প্রারব্ধমুত্তমগুণা ন পরিত্যজন্তি॥'

কাশীতে আড়াইমাস কাল শয্যাগত থাকিয়া প্রথমে দেওয়াল ধরিয়া 'হাঁটি হাঁটি পা পা' করিয়া নূতন করিয়া হাঁটিতে শেখার পর যখন লাঠি ধরিয়া পথে বাহির হইতে পারিলাম ('শনৈঃ পন্থাঃ'), তখনই পুত্রের প্রাত্যহিক বাঁধা বরাদ্দর বাজার করায় সন্তুষ্ট না হইয়া নিকটস্থ পাতালেশ্বরের বাজার হইতে শাক-ডাঁটা, কচু কাঁকরোল, নিমুয়া-ঢেঁড়স আনিতে আরম্ভ করিলাম; ক্রমে দশাশ্বমেধের বাজার পর্য্যন্ত যাইতে সমর্থ হইলে শিঙ্গি-মাগুর (কৈ কৈ পাইতাম?) খদ্দরের রুমালে বাঁধিয়া বাসায় ফিরিতে লাগিলাম।

গত বর্ষে (১৩২৯) যখন নিষেধের বেড়া ক্রমে ক্রমে উঠিয়া যাইতে লাগিল, তখন সারা শীতকাল ফুলকপি না খাইয়া, উপবাসান্তে পারণের জন্য ব্যস্ত ব্রাহ্মণের ন্যায়, শীতের অন্তে বৈকালিক ভ্রমণে বাহির হইয়া বৌবাজারে উক্ত সবজী লুপ্ত হওয়াতে লুপ্তরত্নোদ্ধারের জন্য হগ সাহেবের বাজার হইতে চড়া দরে ক্রয় করিয়া আনিয়াছি। (এই বাজারে নাকি সব সময়েই সব জিনিশ মিলে,এমন কি,গরু হারাইলেও পাওয়া যায়।) পাছে কাবারস নষ্ট হইয়া যায় বলিয়া এক পয়সাও ট্রামভাড়া দিই নাই, দুর্ব্বল-দেহ-সত্ত্বেও যাতায়াতের সারা পথটা চরণতরীর সাহায্যেই পাড়ী দিয়াছি। আক্ষেপের বিষয়, এত আগ্রহে সংগ্রহ করিয়াও সদ্যঃ সদ্যঃ সেই সাধের সওদার স্বাদ লইতে সমর্থ হইলাম না। সেই রাত্রেই জ্বরে পড়াতে তিন দিন পরে পথ্য করিলাম। পথ্যের পাতে মাছের ঝোলে ফুলকপির ২।৪ টা পাঁপড়ি সাধ মিটানর জন্য গৃহিণী দেওয়াইয়াছিলেন বটে, কিন্তু একে অসময়ের কপি, তাহাতে আবার ঘরে পড়িয়া পড়িয়া তিন দিন তিন রাত্রি শুকাইয়াছে, সুতরাং সে স্বাদ লওয়ায় শুধু 'নিয়মভঙ্গ'ই হইল, আর পথ হাঁটাই (ভাগ্যে কাদা ঘাঁটা নহে) সার হইল। 'শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি।' যাক্, এ বৎসর (১৩৩০) শীতকাল পড়িতেই তাহার শোধ ভাল করিয়াই তুলিতেছি। ফুলকপি ভাতে, ভাজা, বেসমের বড়া, ডালনা (রুই কাতলা বা গলদা চিংড়ি ও নূতন আলুর সহিত) এবং শেষ বেশ শিঙ্গারা, কিছুই বাদ যাইতেছে না। কথায় বলে, 'এক মাঘে শীত পালায় না।' আর গৃহিণীও গত বৎসর বলিয়াছিলেন, 'সবুরে মেওয়া ফলে।' *

* পাঁচ আনার পকেটে পোরার প্রসঙ্গে পাদটীকায় বিদেশী বিদ্যার একটু পরিচয় দেওয়ার ঝোঁক সামলাইতে পারিলাম না। একখানি ইংরেজী নভেলে (THOMAS HARDY: Under the Greenwood Tree Chapter II.) পড়িয়াছি, এক জন পাদুকানির্ম্মাতা পকেট্ হইতে নিজের হাতের কাযের নমুনাস্বরূপ মেয়ের পায়ের এক পাটি বুট্ বাহির করিল, আর এক জন রাজমিস্ত্রী ইমারতের কার্য্যে ব্যাপৃত থাকার সময় ২।৩ বেলার খোরাক পকেটে সঞ্চিত রাখিত এবং সেইজন্য পকেটকে 'ভাণ্ডার' (larder) বলিত। এ সব পোরামিস্ত্রীর তুলনায় বর্ত্তমান লেখকের কার্য্যটি 'তাজ্জব ব্যাপার' নহে। তবে সে নিছক কল্পনা, আর এ বাস্তব সত্য।

* শীতকালে যেমন খাদ্যসুখ, তেমনই রোগমুক্ত অবস্থার প্রবল অগ্নিতে বহু ভোজ্যই আহুতি দিয়াছি। কিন্তু এখন (চৈত্র ১৩৩০) নিদারুণ গ্রীষ্ম পড়াতে আহারে বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে। বন্ধুরা বলেন,

মেওয়া ফলের কথাও এই প্রসঙ্গে সংক্ষেপে বলিয়া ফেলি। রোগের অবস্থায় বেদানা আঙুর বিধিমত আহার করা গিয়াছে। (তারিফ এই যে, এত বেদানা-আঙুরেও ভোক্তার পাকা রং একটুও চটে নাই। 'Tis in grain sir ! 'twill endure wind and water !) সৌভাগ্যক্রমে গতবর্ষে বেদানা ও এই বর্ষে আঙুর অসম্ভব সস্তা ছিল। কমলা লেবু (যদিও মেওয়ার মধ্যে নহে) চারি পয়সা হইতে চারি আনা যোড়াতেও কিনিতে হইয়াছে। বানারসে বসিয়া আনারসও চড়া দরে লইতে হইয়াছে। পাকা পেঁপের তো কথাই নাই। ডাক্তারের আদেশে কিছুদিন কিসমিস মনাক্কা চালাইয়াছিলাম, সম্প্রতি বাদাম ও আখরোট অল্প-পরিমাণে চলিতেছে। 'অধিকন্তু ন দোষায়' বলিয়া পেস্তাটাও ঐ সঙ্গে চালাইতেছি। তবে 'তেরোস্পর্শ' ঘটিয়া বিভ্রাট্ না বাধায়।

রোগভোগের ও সস্তোরোগমুক্তির সময়ে সন্দেশ-মিষ্টান্ন-ভোজনে সংযমের কথা বলিয়াই এই সুদীর্ঘ বিবরণ শেষ করি। কবিরাজ মহাশয়ের ও পরে সদাশয় ডাক্তার বাবুর নির্দ্দিষ্ট দুইটি গোল্লার গণ্ডী (যত দিন মিয়াদ ছিল তত দিন) লঙ্ঘন করি নাই; মিষ্টান্নভক্ত হইয়াও কলিকাতায় দরবেশ ছানার জেলাপী পানতোয়া লেডিকেনি রসগোল্লা রাজভোগ-উপভোগে বিরত থাকিয়া, এবং চারিমাস কাশীবাস ঘটিলেও তথাকার মালাই রাব্‌ড়ী কালাকাঁদ * প্রভৃতি লোভনীয় পদার্থ-বিষয়ে আত্মাকে (?) বঞ্চিত করিয়া, এই কলিকালে কঠোর সংযমের পরিচয় দিয়াছি। (বিষ্ণুর অষ্টোত্তর-শত নামের ন্যায় মুখপ্রিয় খাদ্যের নামকীর্ত্তনেও ভোজন-সাধকের আনন্দ।) যদিও জনৈক দূরদেশস্থিত পুরাতন বন্ধু হাত গণিয়া (?) বলিয়াছিলেন যে, এ পক্ষ বাড়ীর লোকের অজ্ঞাতসারে দোকানে বসিয়া বা রাস্তায় দাঁড়াইয়া নিষিদ্ধ সুখাদ্য ভোজন করিয়াছেন, তাহাতেই পুনঃ পুনঃ রোগে পড়িয়াছেন। * (বন্ধুবর লেখকের ধাতটি ঠিক চিনিয়া লইয়াছেন!)

যাক্, আর মিত্রদ্রোহিতা করিব না। একেই তো বন্ধুবর্গ একে একে ফাঁকি দিয়া চলিয়া গিয়াছেন ও যাইতে-ছেন—'একে একে নিভিছে দেউটি।' যে দুই-চারি জন আজও জীবিত আছেন, তাঁহারা নিরাময় ও দীর্ঘজীবী হইয়া সুখে-স্বচ্ছন্দে কালযাপন করুন, এবং দুর্লভ নরত্ব ও সুদুর্লভা বিদ্যার অনুশীলন করিয়া নিজে নির্বৃতি লাভ করুন ও অপর সাধারণকে নির্বৃতি প্রদান করুন—এই হতভাগ্যের মত 'জরারোগযুক্তো মহাক্ষীণদীনঃ' হইয়া জীবন্মৃতবৎ বসুমতীর ভারভূত হইয়া না থাকেন—৺ বিশ্বনাথের নিকট প্রার্থনা করি।

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

'ব্রহ্মার মন্দাগ্নি' হইয়াছে। এ সময়ে রন্ধনের দ্রব্যের প্রাচুর্য্যও নাই, বৈচিত্র্যেরও অভাব। এখন সম্বল কেবল বিউলির ডাল, কাঁচা আমের কটিরুঝোল, ঘোল ও তরমুজের সরবত।

* 'কি মহিমা অন্নপূর্ণার!' যে দিন প্রবন্ধের এই অংশটির খসড়া হইতে পরিষ্কার প্রতিলিপি (Fair Copy) প্রস্তুত করিলাম, সেই দিনই কাশী হইতে প্রত্যাগত প্রতিবেশী অন্যান্য খাদ্যের সহিত কয়েকখানি কালাকাঁদও 'প্রসাদ' বলিয়া পাঠাইয়াছেন। 'ভাবনা যাদৃশী যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।'

* কৃষ্ণনগরে ছাত্রজীবনে একটি বন্ধু সত্য সত্যই এইরূপ অত্যাচার করিয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন। তবে সে অবশ্য যৌবনের অসংযম।

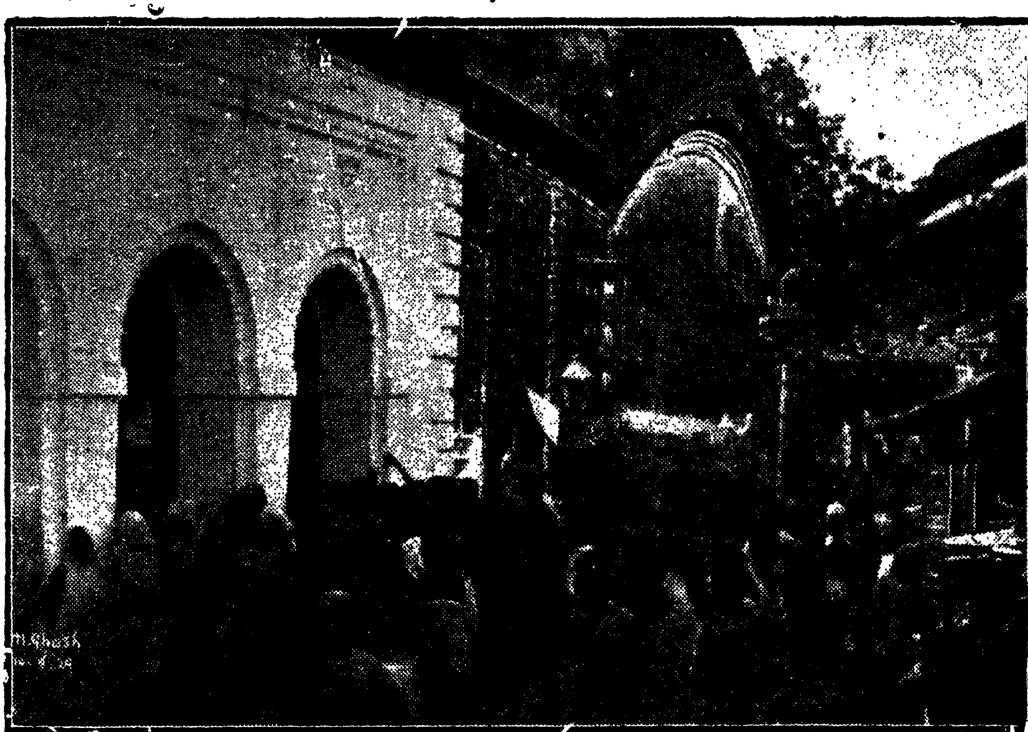
ভূস্বর্গ

হিমালয়ের হিম বুকেতে হৈমবতী পরীর স্থান।
নিটোল সরস আঙুর রসে ভরিয়ে রাখা গোলাপদান।
গিরিরাজের বুকের মাঝে লুকিয়ে রাখা গৌরী তার;
স্বপ্নভরা জোছ্‌না রাতি! তুলা নাই! চমৎকার!
আঙুর সে যে গুচ্ছভরা লুটিয়ে পড়ে ঐ শিলায়;
সুলভ হেথা সরস আপেল স্রোতস্বতীর উপল প্রায়।

ঝিলম্ নদী চল্‌ছে হেথায় ঝল্‌মলিয়ে আঁচল তার,
শিলার পরে নূপুর বাজে সেতার বাজে, ছন্দে তার।
জাফ্‌রাণেতে ক্ষেতের মাঝে রংপরীদের চপল নাচ।
রূপসীদের রূপের কাছে দেববালারাও পায় গো লাজ।
বাতাসভরা গন্ধে-গানে, রূপে রাঙা সকল স্থান।
স্বর্গ হেন গর্ব্ব যাহার, ভূস্বর্গ হোক তার সে নাম।

শ্রীলীলা মিত্র।

তারকেশ্বর

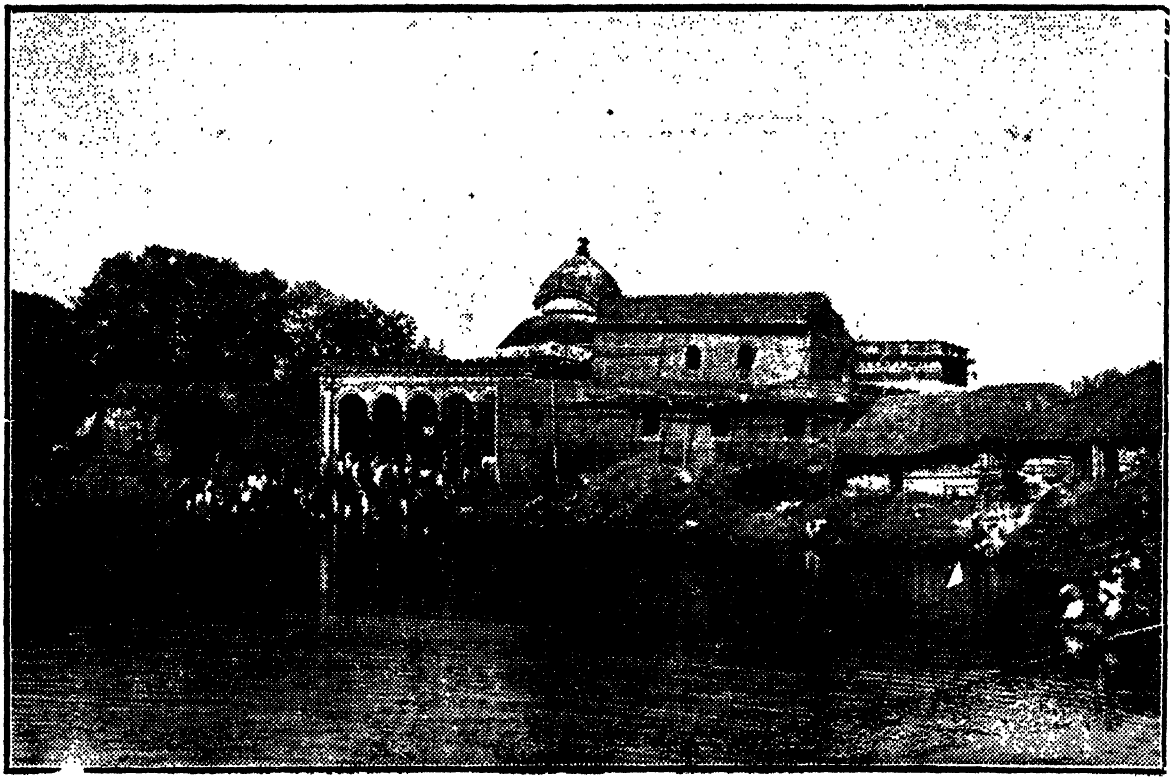


"বন্দে মাতরম্" মন্ত্রের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন,—হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে কে রাখিবে? কথাটা হিন্দুর পক্ষে ভাবিয়া দেখিবার বটে। মুসলমানের জেহাদ আছে, খৃষ্টানের ক্রুসেড আছে—ধর্ম্মোন্মাদ জগতে আর সকল ধর্ম্মীরই আছে। কিন্তু ধর্ম্মের জন্য হিন্দু সঙ্ঘবদ্ধভাবে সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছে, এমন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় কি? হিন্দুকে হিন্দু রাখে না বলিয়াই হিন্দুর এত অধোগতি। সজীব জাতির ধর্ম্মও সজীব, জড় ও ক্লীবের ধর্ম্ম জড়, প্রাণহীন।

হিন্দুকে হিন্দু রাখে না বলিয়াই হিন্দুর দেবস্থান আজ কলঙ্কিত, অনাচারে জর্জ্জরিত—হিন্দুর তীর্থ ও দেবস্থানে যাইবার কথা মনে হইলে হিন্দু গৃহস্থের মনে লুণ্ঠনের ভয় স্বতঃই জাগিয়া উঠে, হিন্দু সতী নারীর মনে ধর্ম্মনাশের আশঙ্কা উদিত হয়—এ অবস্থা কেন হইল?

তারকেশ্বর বাঙ্গালার পবিত্র তীর্থ, মহা পীঠস্থান। শত সহস্র ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু এই তীর্থে নিত্য দেবদর্শনার্থ সমবেত হয়। এমন পবিত্র তীর্থে যাইবার কথা হইলে উল্লাসে প্রাণ নাচিয়া উঠিবে। কিন্তু আজ বাঙ্গালী হিন্দু যাত্রী তারকেশ্বরের নাম হইলে ক্ষোভে, রোষে, ঘৃণায় উত্তেজিত হইয়া উঠে কেন?

কেবল তারকেশ্বর নহে, হিন্দুর বহু তীর্থ ও দেবস্থান আজ এইরূপে কলঙ্কিত। আমি ভারতের বহু তীর্থে ভ্রমণ করিবার সৌভাগ্য অর্জ্জন করিয়াছি। ভূয়োদর্শনে জানিয়াছি, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাসের ন্যায় দুই একটি তীর্থ ও দেবস্থান ব্যতীত সর্ব্বত্রই ঘোর অনাচার অত্যাচার নিরীহ ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু-যাত্রীকে গ্রাস করিবার জন্য রাক্ষসের ন্যায় মুখব্যাদান করিয়া আছে। দুই একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। বিন্ধ্যাচলে বিন্ধ্যবাসিনীর কোনও এক পাণ্ডা টাকার লোভ



তারকেশ্বর—দুধপুকুর

আমার এক পরম আত্মীয়ের পরিবারস্থ যাত্রিবর্গকে আটক করিয়াছিল—তাঁহাদের মধ্যে নারী-যাত্রীই অধিক ছিলেন। বহু কষ্টে পুলিসের সাহায্য গ্রহণ করিয়া তাঁহারা সে যাত্রা রক্ষা পান। গয়ায় আমি স্বয়ং এক গয়ালীর দপ্তরে দেখিয়াছি, গয়ালী প্রভু পূর্ব্ববঙ্গীয় কয়েক জন নরনারী যাত্রীকে পাদপূজার জন্য পীড়ন করিতেছে—প্রত্যেকের নিকট অন্ততঃ ২৫৲ টাকা চাহিতেছে, না দিলে মালপত্র আটক করিবে বলিয়া ভয়প্রদর্শন করিতেছে। যাত্রীরা আভূমি মস্তক লুণ্ঠন করিয়া কাতরস্বরে দয়া ভিক্ষা করিতেছে—তীর্থে বহু অর্থ ব্যয় হইয়া গিয়াছে বলিয়া সামর্থ্য-হীনতার কথা নিবেদন করিতেছে, তাহাদের নয়নাশ্রু কক্ষতল অভিষিক্ত করিতেছে। শেষে দেখিয়াছি, তাহাদের নামে কর্জ্জ লিখাইয়া গয়ালী তাহার 'প্রাপ্য' আদায় করিয়াছে। হরিদ্বারে, দ্বারকায়, প্রায় সর্ব্বত্র এইরূপ অত্যাচার।

কালাপাহাড় যখন কালাপাহাড় ছিল না, যখন সে ব্রাহ্মণসন্তান ছিল, তখন এক দিন বিষম বিপন্ন ও ধর্ম্মচ্যুত হইবার আশঙ্কায় শঙ্কিত হইয়া কাতরস্বরে দেবতার দয়া ভিক্ষা করিয়াছিল। প্রার্থনা পূর্ণ হইল না। তখন কালাপাহাড় ক্ষোভে, রোষে, অভিমানে বলিয়াছিল,—"দেবতা! তুমি কি সত্য সত্যই পাষাণ?" আর এক দিন সোমনাথের দশ সহস্র পুরোহিত সমস্বরে ক্ষোভ ও রোষ-ভরে বলিয়াছিল,—"সোমনাথ! তুমি কি পাষাণ?" সুলতান মামুদ ব্রাহ্মণ-পুরোহিতের উৎকোচে ভুলেন নাই, তিনি জলদগম্ভীরনাদে বলিয়াছিলেন, "আমি প্রতিমা-ভঙ্গকারী, আমি প্রতিমা-বিক্রেতা নহি।" পাষাণ ধর্ম্মের পাষাণ দেবতা সুলতানের অমোঘ দণ্ড হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারেন নাই।

কেন পারেন নাই? বিলাস ও লালসার স্রোতে সোমনাথ ভাসিয়া যাইতেছিল। ভারতের দিগ্‌দিগন্ত হইতে আনীত যাত্রিপ্রদত্ত যুগযুগান্তসঞ্চিত মণি-মাণিক্য ও ধনদৌলতে গঠিত সোমনাথের ঐশ্বর্য্য বিশ্ববিশ্রুত হইয়াছিল। সোমনাথের নাট্যশালা, হয়শালা, গজশালা,

যানবাহনশালা; সোমনাথের দশ সহস্র নর্ত্তকী, সোমনাথের দেবদাসী; সোমনাথের স্বর্ণশৃঙ্খলে সংলগ্ন সহস্র স্বর্ণ-ঘণ্টা; সোমনাথের রত্নাগার, সোমনাথের আসবাব ও সাজসরঞ্জাম;—সে সমস্ত যেন স্বপ্নকথার মতই প্রতীয়মান হয়। সোমনাথের মোহান্ত মহারাজ এই ভোগ ও বিলাসের পাপ-পঙ্কিল অপবিত্র সাগরে আকণ্ঠ নিমগ্ন হইয়া ধর্ম্মের অপমান করিয়াছিলেন, দেবতার অপমান করিয়াছিলেন, দেবতা পাষাণ হইবেন না কেন? গজনীর মামুদ সোমনাথ ধ্বংস করেন নাই, হিন্দু নিজের পাপেই সোমনাথ ধ্বংস করিয়াছিল! এই সোমনাথে কত তীর্থযাত্রীর সর্ব্বস্বাপহৃত হইয়াছিল, কত সতীর সতীত্ব নষ্ট হইয়াছিল, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? রোমক সভ্যতার ধ্বংসের দিনে বিলাস ও পাপের প্রভাবে অত বড় বিরাট্ রোম-সাম্রাজ্য কিরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা গিবন তাঁহার অমর ইতিহাসে বর্ণে বর্ণে চিত্রিত করিয়া গিয়াছেন, পোল ঔপন্যাসিক হেনরী সায়েনকিউইজ তাঁহার অমর গ্রন্থ "কো ভেডিসে" তাহার জীবন্ত চিত্র ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। বিলাস ও পাপেই ধ্বংসের বীজ নিহিত থাকে। বিলাস ও পাপ হইতেই সোমনাথের ধ্বংস হইয়াছিল।

দেব-সেবক মোহান্ত—সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী হইবেন, ইহাই হিন্দু শাস্ত্রের বিধান। তিনি ধনী বিলাসী হইবেন কেন? শাস্ত্রে আছে:—

"শৌচন্তু দ্বিবিধং প্রোক্তং বাহ্যমাভ্যন্তরস্তথা।
মৃজ্জলাভ্যাং স্মৃতং বাহ্যং ভাবশুদ্ধিস্তথান্তরম্।
গঙ্গাতোয়েন কৃৎস্নেন মৃদ্ভারৈশ্চ নগোপমৈঃ।
আমৃত্যোঃ স্নাতকশ্চৈব ভাবদুষ্টো ন শুধ্যতি॥"

শৌচ বা শুচি দ্বিবিধ;—বাহ্য ও আভ্যন্তর। মৃত্তিকা ও জল দ্বারা বাহ্য শুদ্ধি হইয়া থাকে এবং ভাব-শুদ্ধিই আন্তর শুদ্ধি। ভাবদুষ্ট বা আন্তর-শুদ্ধিহীন ব্যক্তি আজীবন কেবল গঙ্গাজল এবং পর্ব্বতপ্রমাণ মৃত্তিকাভার দ্বারা স্নান করিলেও শুচি হয় না। শুচি না হইলেও বিগ্রহপ্রতিষ্ঠায় বা বিগ্রহপূজায় অধিকারী হওয়া যায় না—শুচিস্তৎকালজীবী



মোহান্তের প্রাসাদ

কর্ম্ম কুর্য্যাৎ। অর্থোপার্জ্জনার্থ জনগণকে বঞ্চনা করিবার অভিপ্রায়ে কোন ব্যক্তি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিলে, ঐ বিগ্রহ উপাস্য হইতে পারে না। কেন না, শুচি ব্যক্তিরই প্রতিষ্ঠাদি-কার্য্যে অধিকার শাস্ত্রানুমোদিত। যথা,—"অর্থার্জ্জনায় জনান্ বঞ্চয়িতুকামেন প্রতিষ্ঠিতোঽপি শ্রীবিগ্রহঃ শ্রীবিষ্ণোরসান্নিধ্যেন নোপাস্যো ভবিতুমর্হতি।"

প্রাচীনকালে সোমনাথের মোহান্ত ও পুরোহিতগণ ধর্ম্মশাস্ত্রবিগর্হিত কার্য্য করিয়াছিল বলিয়া সোমনাথ ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল। এ কালেও বাঙ্গালার বহু শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণপণ্ডিত এক ব্যবস্থাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া বিধান দিয়াছেন যে :—

১। কোনও বৈষ্ণব সন্ন্যাসী অথবা শঙ্করমতাবলম্বী মায়াবাদী সন্ন্যাসী যদি কোন মঠের মোহান্তের গদী গ্রহণ করিয়া পরদারাদি কোন প্রকার নিষিদ্ধ কদাচারে নিযুক্ত হয়েন, তবে শাস্ত্রানুসারে তিনি বিগ্রহের সেবক হইতে পারেন না।

২। ভাবাশুদ্ধ ব্যক্তি স্বয়ং অশুচি; সুতরাং তৎপ্রদত্ত পূজাদি কিছুই দেবতার গ্রাহ্য হয় না। উঁহার দ্বারা নিবেদিত অন্নাদি ভোজনে বর্ণবিশেষের স্পর্শাদি দোষ বিচার না করা উচিত নহে।

৩। সন্ন্যাসিগণের স্ত্রীসংসর্গ দ্বারা পাতিত্য হওয়ায়, তাহাদের স্বপদ হইতে বিচ্যুতি ঘটিয়া থাকে।

বর্ত্তমানে ভারতের নানা দেবস্থানে "অর্থোপার্জ্জনার্থ জনগণকে বঞ্চনা করিবার অভিপ্রায়ে" বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং "অর্থোপার্জ্জনার্থ" দেবসেবক মোহান্ত ও পুরোহিত-পাণ্ডাগণ দেব-বিগ্রহাদির সেবায় নিযুক্ত আছে। তবে কিরূপে ঐ শ্রেণীর বিগ্রহ হিন্দুর উপাস্য হইতে পারে? এ সমস্যার মীমাংসা করিয়া দিবে কে? আজ যদি হিন্দু-সমাজ মুসলমান ও খৃষ্টানের মত সজীব থাকিত, আজ যদি হিন্দুরও মুসলমানের মত জেহাদ ও খৃষ্টানের মত ক্রুসেড থাকিত, তাহা হইলে সহজে এ কথার মীমাংসা হইয়া যাইত। কিন্তু হিন্দুকে হিন্দু রাখে না, হিন্দু সঙ্ঘবদ্ধ হইতে জানে না—নতুবা হিন্দুর এত দুর্গতি কেন?

বাঙ্গালার অন্যতম প্রধান তীর্থ তারকেশ্বরের দেব-সেবক মোহান্ত মহারাজ হিন্দুর শ্রদ্ধা ও প্রীতির পাত্র হইবেন, এই আশা হিন্দু অবশ্যই করিতে পারে। তিনি সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী, দেব-সেবায় ও লোক সেবায় আত্ম-নিয়োগ করিয়া পবিত্র সন্ন্যাসধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করিবেন, ইহাই স্বাভাবিক। কিন্তু হিন্দুর দুর্ভাগ্য, আজ বাঙ্গালা জুড়িয়া তারকেশ্বরের বিরুদ্ধে অনাচারের অভিযোগ উত্থিত হইয়াছে, এই অনাচারনিবারণে হিন্দু মহাবীরদল সত্যাগ্রহ করিবে বলিয়া সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে।

যে দিন পবিত্র সন্ন্যাসধর্ম্মের মস্তকে পদাঘাত করিয়া মোহান্ত মাধবগিরি কামান্ধ কুক্কুরের মত সতী হিন্দু-নারীর সতীত্বনাশ করিয়াছিল, সেই দিন বাঙ্গালার হিন্দু জানিয়াছিল, ধর্ম্মের আবরণে কি অধর্ম্মের খেলা তাহার পবিত্র দেবস্থানে অভিনীত হইতেছে! সে দিন বাঙ্গালার হাটে-মাঠে ঘাটে-বাটে মোহান্তের ঘানির কথা, মোহান্তের তৈলের কথা, এলোকেশী পাড়ের কথা, এলোকেশী চুড়ির কথা, এলোকেশী টিপের কথা ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। মোহান্ত নাটক, মোহান্তমুদ্গর কাব্য, নবীন-বিষাদ উপন্যাস প্রভৃতি পুস্তকপুস্তিকা প্রচারিত হইয়াছিল। তখন ছড়ার গানে বাঙ্গালার লোক গাহিত :—

"মোহান্তের তেল নিবি যদি আয়।
এ তেল তৈয়ার হচ্ছে হুগলীর জেলখানায়॥
(ওহে) যার পতি বিদেশে
(সে) তেল নিলে এক শিশে
তেলের গুণে, মনের টানে,
তার পতি ঘরে আসে॥"

এইরূপে বাঙ্গালী নিজের সেই ধর্ম্মের কলঙ্কের কালিমা দুই হস্তে নিজের মুখে মাখাইয়া দিয়াছিল। তথাপি বাঙ্গালী হিন্দু সঙ্ঘবদ্ধভাবে এ কলঙ্কনিবারণে কোন চেষ্টা করে নাই। যে কাপুরুষ ক্লীবজাতি 'পূর্ব্ববঙ্গে নারীনিগ্রহের' কথা শুনিয়া আপন জননী, ভগিনী ও পত্নীর নির্য্যাতনের সংবাদ অবগত হইয়া ঘরে বসিয়া হা-হুতাশ করে, সে জাতির নিকট ইহার অধিক কি প্রত্যাশা করা যাইতে পারে! ইংরাজ-দুহিতা কুমারী এলিসকে দুর্দান্ত পাঠান দস্যুরা ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল—একটি ইংরাজ-দুহিতার এই অপমানে সমগ্র ইংরাজজাতি বায়ুতাড়িত উদ্বেল সিন্ধুর মত ক্রোধে গর্জ্জিয়া উঠিয়াছিল—যেখানে বৃটিশজাতির যুনিয়ান জ্যাক পতাকা উড্ডীন হয়, সেখানেই ইংরাজ সেই অপমানকে আপনার বলিয়া মনে করিয়াছিল, আর বাঙ্গালী

ফলে বিলাতের মন্ত্রিসভার আসন থরহরি কম্পমান হইয়াছিল, ভারতের রাজপ্রতিনিধির চাকুরী লইয়া টানাটানি হইয়াছিল,—এমন কি, বন্ধু আফগান আমীরের সহিত যুদ্ধ বিঘোষিত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। ইহাই জীবন্ত জাতির লক্ষণ। যাহার কণামাত্র মনুষ্যত্ব আছে, সে স্বজাতীয় নারীর অপমান প্রাণ থাকিতে সহ্য করে না। কিন্তু এই বাঙ্গালী হিন্দুর দেশে সকলই বিপরীত, সকলই অস্বাভাবিক, না হইলে তীর্থে কুলবধুর সতীত্বনাশের পরেও সে তীর্থের দেবসেবক লম্পট মোহান্ত জেল হইতে ফিরিয়া, পুনরায় গদী পাইতে সাহসী হয় কেন,—পাইলে হিন্দু সে তীর্থে পুনরায় পদার্পণ করে কেন?

মোহান্ত মাধবগিরি নাই—তাহার স্থানে অন্য মোহান্ত বিরাজ করিতেছে। মোহান্ত সতীশগিরির গদী আরোহণের পর তারকেশ্বরের অনাচারের কথা যে শুনিতে পাওয়া যায় নাই—এমন নহে। যত দিন বাঙ্গালীর লোকমত জাগ্রত হয় নাই, তত দিন অনাচারের কথা লোকমুখে রটিত হইয়াই আকাশে বিলীন হইয়া যাইত; জনরব শতমুখ হইয়া রটাইল, (১) হাওড়ার উকীলের পুত্রবধুর কথা, (২) বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল রেলের লোকো ফোরম্যান মিঃ—দ্বারা গৃহস্থ-বধুর রক্ষার কথা। কলিকাতার দৈনিকপত্রসমূহে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে লাগিল, (১) মোহান্ত-প্রাসাদের অন্তঃপুর কাহার জন্য, তথায় কাহারা থাকে, (২) ত্রিলোচনী কে, হরিমতি কে, শেওড়াফুলীর কম্পাউণ্ডারের আত্মীয়া কোথায় থাকে? (৩) জঙ্গীপুরের অধিবাসীরা কেমন ব্যবহার পায়? (৪) খোযানচালকদিগকে বেগার ধরা হয় কি না,—ইত্যাদি। অবশ্য এ সমস্তই জনরব, ইহার উপর ভিত্তি করিয়া কাহাকেও অপরাধী করা যায় না। তবে একটা কথা, এমন জনরব উঠে কেন? আরও ত বহু দেবসেবক বাঙ্গালায় আছেন, তাঁহাদের নামে এ ভাবের জনরব রটিত হয় না কেন?



স্বামী বিশ্বানন্দ

স্বামী বিশ্বানন্দ

কিন্তু লোকমত জাগ্রত হওয়ায় জনরবের ফলে জনসঙ্ঘ উত্তেজিত হইয়া উঠিল। গত শিবরাত্রি পর্ব্ব উপলক্ষে এই উত্তেজনা প্রবল আকার ধারণ করিল। সর্ব্বত্র সংবাদ রটিত হইল যে, তারকেশ্বরে যাত্রী ও স্বেচ্ছাসেবকদিগের প্রতি অনাচার আচরিত হইয়াছে।

ইতঃপূর্ব্বে স্বামী বিশ্বানন্দ বাঙ্গালার নানা গ্রাম পরিদর্শন করিয়া বেড়াইতেছিলেন। তিনি বিহার হইতে পদব্রজে বাঙ্গালার বহু গ্রাম নগর ভ্রমণ করিয়াছিলেন। এতদুপলক্ষে তাঁহার বহু দেবস্থানের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করা হইয়াছিল। তিনি সন্ন্যাসী, বাঙ্গালী গৃহস্থমাত্রেরই আলয়ে অবারিতদ্বার, সুতরাং তিনি অতিথিরূপে এক এক স্থানে কয়েক দিন অতিবাহিত করিয়া, সেই স্থানের তীর্থ বা মন্দিরের সমস্ত ইতিহাস সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। তারকেশ্বরেও তিনি এইভাবে কিছু দিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে তিনি মন্দিরে, বাজারে, ষ্টেশনে, গঞ্জে, হাটে, মেলায় ও পুলিসে গিয়া সকল শ্রেণীর লোকের সহিত মিলামিশা করিয়া মন্দির ও মোহান্ত সম্বন্ধে নানা তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনি তাহাতে স্থির-সিদ্ধান্ত হইয়াছিলেন যে, তারকেশ্বর তীর্থে অনাচার আচরিত

হয় এবং সে অনাচারের প্রতীকারকল্পে স্থানীয় লোকগণের কোনও চেষ্টা করিবার সাহস বা ক্ষমতা নাই। পরন্তু এই অনাচার বহুদিন হইতে সংঘটিত হইয়া আসিতেছে।

মোহান্ত মহারাজই যেন তারকেশ্বরের জমীদার, জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিস, ফৌজ, যাহা বল তাই—তাঁহার বিপক্ষে নালিশ নাই, আপীল নাই।

সন্ন্যাসী স্বামী বিশ্বানন্দ এই সংবাদ সংগ্রহ করিয়া আনিবার পর প্রচার করিলেন যে, শিবরাত্রির সময়ে তিনি সদলবলে উপস্থিত থাকিয়া যাত্রিবর্গের প্রতি অনাচারে বাধা প্রদান করিবেন। শিবরাত্রির সময় হইতেই প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালার জাগ্রত লোকমতের সহিত মোহান্তপক্ষের স্বৈরাচারের সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। বলিতে দুঃখ ও ক্ষোভ হয় যে, বাঙ্গালী এ বিষয়ে অগ্রণী হইতে পারে নাই। অবশ্য ইহার বহুপূর্ব্বে মোহান্ত মাধবগিরির আমলে বাঙ্গালী তারকেশ্বরের অনাচার নিবারণে চেষ্টা করিয়াছিল। উত্তরপাড়ার জমীদারপক্ষ অগ্রণী হইয়া মোহান্তের গদী লইয়া তর্ক তুলিয়াছিলেন—সে বিষয়ে মামলাও চলিতেছে। কিন্তু এ যাবৎ স্বামী বিশ্বানন্দ ও সচ্চিদানন্দের মত এমন সঙ্ঘবদ্ধভাবে অনাচারনিবারণে কেহ অগ্রসর হয় নাই, এ কথা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়।

শিবরাত্রির সময়ে স্বেচ্ছাসেবকদিগের সহিত মোহান্তপক্ষে সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। স্বামী সচ্চিদানন্দ লাঞ্ছিত হইয়াছেন বলিয়া সংবাদ রটিল। তখন স্বামী বিশ্বানন্দ ও সচ্চিদানন্দ তারকেশ্বরে মহাবীরদল লইয়া সত্যাগ্রহ করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কথা হইল, চৈত্র-সংক্রান্তির চড়কপূজার সময়ে মহাবীরদল তারকেশ্বরে অনেকগুলি আস্তানা পাতিবেন, সত্যাগ্রহ দ্বারা যাত্রী, দোকানদার ও জনসাধারণের প্রতি অনাচার নিবারণ করিবেন এবং মন্দিরের যাবতীয় জোরজুলুমের আদায় বন্ধ করিয়া দিবেন। এ দিকে মোহান্তপক্ষ হইতেও ছাপান হ্যাণ্ডবিল বিতরিত হইতে লাগিল যে, মোহান্ত মহারাজ মহাবীরদলের বিপক্ষে বীরভদ্রদল ছাড়িয়া দিবেন। হ্যাণ্ডবিলে আরও বলা হইল যে, তারকেশ্বর মোহান্তের নিজস্ব সম্পত্তি, সেখানে কাহারও সত্যাগ্রহ চলিবে না, ইত্যাদি।

এইরূপে চৈত্র-সংক্রান্তির পূর্ব্বে তারকেশ্বর-সম্পর্কে সমগ্র বাঙ্গালায় একটা বিরাট আন্দোলন উপস্থিত হইল। বহু যাত্রী দাঙ্গা-হাঙ্গামার ভয়ে চৈত্র-সংক্রান্তির সময়ে তারকেশ্বরে তীর্থ করিতে যাইতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। ফলে, চৈত্রসংক্রান্তির সময়ে অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা তারকেশ্বরে যে যাত্রী কম হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

সংঘর্ষ আরম্ভ

যে রবিবারে চৈত্র-সংক্রান্তি, উহার পূর্ব্ববর্ত্তী সোমবারে তারকেশ্বরে এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটিল। ঐ সময় হইতে সংক্রান্তির মেলা বসিয়াছিল। স্বামী বিশ্বানন্দের মহাবীরদল মেলায় ও বাজারে শান্তি রক্ষা করিতেছিল। তন্মধ্যে সীতারাম প্রমুখ তিন জন স্বেচ্ছাসেবক মন্দিরসান্নিধ্যে একখানা হ্যাণ্ডবিল বিলাইতেছিল। প্রকাশ, ঐ হ্যাণ্ডবিলে মোহান্তকে লক্ষ্য করিয়া তীব্র মন্তব্য প্রকটিত হইয়াছিল। মোহান্তের লোকজন স্বেচ্ছাসেবকগণের হস্ত হইতে হ্যাণ্ডবিল কাড়িয়া লইয়া ছিঁড়িয়া দেয় ও স্বেচ্ছাসেবকগণকে মন্দিরসান্নিধ্য ছাড়িয়া যাইতে বলে। উহারা যাইতে অসম্মত হয় এবং বাগ্‌বিতণ্ডার ফলে উভয়দলে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। সীতারাম বলে, মোহান্তের লোক তাহাদিগকে চড়-চাপড় মারিয়াছিল, ধাক্কা দিয়াছিল এবং এক জন সীতারামের কপালে লোটার দ্বারা আঘাত করিয়াছিল, ফলে সীতারামের কপাল কাটিয়া যায় ও উহা হইতে রক্তস্রোত প্রবাহিত হয়।

কলিকাতায় এই সংবাদ উপস্থিত হইবার পর খুবই চাঞ্চল্য দেখা দেয়। কিন্তু ইহার পর আরও ভয়াবহ সংবাদ আইসে। মোহান্তের ৭।৮ জন লোক নাকি লাঙ্গা তরবারি আস্ফালন করিয়া বাজারে ছুটিয়া বেড়াইয়াছে ও বলিয়াছে যে, 'স্বামী বিশ্বানন্দের শির চাই।' ইহা ছাড়া বিস্তর লাঠিয়ালও নাকি বাজারে হল্লা করিয়াছে।

কলিকাতা হইতে তদন্তব্যবস্থা

এই সংবাদ রটিবার পর কলিকাতাবাসী অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠে। ইহা সোমবারের ঘটনা। তৎপরদিন মঙ্গলবার দেশনায়ক শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ, সুভাষচন্দ্র প্রমুখ কয়েকজন কংগ্রেসকর্ম্মীকে সঙ্গে লইয়া তারকেশ্বরযাত্রা করেন। তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া মোহান্ত মহারাজকে ও সন্ন্যাসিদলকে ডাকিয়া পাঠান। তিনি ডাকবাংলায় ছিলেন। মহাবীরদল

তাঁহার ডাকে সাড়া দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু মোহান্ত মহারাজ দেন নাই, 'ফরোয়ার্ড' পত্রে ইহা প্রকাশ পাইয়াছিল। তাহার পর বাজারের দোকানদার প্রভৃতি কয়েক জন লোক অনাচার সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জনের সম্মুখে সাক্ষ্যপ্রদান করিয়াছিল। সে সকল বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।

চিত্তরঞ্জন যে মঙ্গলবারে তদন্ত করিয়া চলিয়া আইসেন, সেই মঙ্গলবারে আবার সংবাদ আসিল, স্বামী সচ্চিদানন্দ আবার মন্দিরের বাজারে লাঞ্ছিত হইয়াছেন, তাঁহার দাড়ী ধরিয়া ধাক্কা দেওয়া হইয়াছিল, এইরূপ প্রকাশ পাইল।

ইহার পর আমি 'বসুমতীর' প্রতিনিধিরূপে সোদরপ্রতিম সহকর্ম্মী শ্রীমান্ ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও ফটোগ্রাফার শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ ঘোষকে সঙ্গে লইয়া বৃহস্পতিবার তারকেশ্বর যাত্রা করি। সেখানে উপস্থিত হইয়া আমরা মেলায়, বাজারে, গঞ্জে, থানায়, মন্দিরে ও প্রাসাদে যে সকল তথ্য সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম, তাহা সংক্ষেপে বলিয়া যাইতেছি ;—

(১) স্বামী বিশ্বানন্দের কথা

গত সোমবারে মহাবীরদলের ৩৪ জন স্বেচ্ছাসেবক যখন তারকেশ্বরের পথে মোহান্তের বিরুদ্ধে কাগজ বিলি করিতেছিল, তখন মোহান্তের এক জন দরোয়ান তাহাদিগকে প্রহার করে। ২০ জন লোক লাঠি ও ৬ জন লোক তরবারি লইয়া পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল ও স্বামী বিশ্বানন্দের মাথা কাটিয়া লইবে বলিয়া আস্ফালন করিতেছিল। কিন্তু মোহান্তের চেলা উহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করায় ও পুলিস আসিয়া পড়ায় লাঠিয়ালরা মোহান্তের বাড়ী ফিরিয়া গিয়াছিল।

(২) মোহান্তের তার

রটিয়াছিল, মোহান্ত নাকি হুগলীর ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট এই মর্ম্মে তার করিয়াছিলেন,—"বিশ্বানন্দের লোক বাজার লুঠ করিয়াছে।" আরও রটিয়াছিল, তারকেশ্বরের পুলিস নাকি হুগলী ও শ্রীরামপুরে এই মর্ম্মে তার করিয়াছিল,—"বিশ্বানন্দের লোক গোলযোগ ঘটাইতেছে, অতি কষ্টে শান্তিরক্ষা করিতেছি, শীঘ্র ফৌজ পাঠান হউক্।"

(৩) স্বেচ্ছাসেবক সীতারাম প্রহৃত,—

আমরা প্রত্যক্ষ করিলাম, মহাবীরদলের স্বেচ্ছাসেবক সীতারামের কপালে আঘাতের চিহ্ন রহিয়াছে। সীতারাম আমাদের নিকট বলিল যে, সে যখন বাজারে মোহান্তের বিরুদ্ধে কাগজ বিলি করিতেছিল, তখন মোহান্তের লোক কাগজ ছিঁড়িয়া দেয়। আপত্তি করিলে তাহারা চড় মারে ও লোটা দিয়া তাহার কপালে প্রহার করে।

(৪) বাজার লুঠের কথা

মোহান্ত যে বাজার লুঠের তার করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে আমরা সন্ধান করিয়া জানিতে পারি যে, লুঠের কথা সত্য নহে। শুনিলাম, যাহার দোকান লুঠ হইয়াছিল বলিয়া তার হইয়াছিল, সে পুলিসের নিকট নিম্নলিখিতরূপ এজাহার দিয়াছিল। (উক্ত দোকানদার ও অপর এক জন মিঠাই-ওয়ালা আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়া এই ভাবেই কথা বলিয়াছিল) ;—

"আমার নাম—আমার পিতার নাম—আমার বাড়ী—। তারকেশ্বরের বাজারে আমার মিঠাইয়ের দোকান আছে। মোহান্তের দরোয়ান আসিয়া দোকানের রসগোল্লা পথে ছড়াইয়া দিয়া আমাকে বলে যে, মোহান্তের আদেশ, তোমাকে বলিতে হইবে যে, মহাবীরদলের লোক তোমার দোকান লুঠ করিয়াছে।

"আমি ৪ জন লোককে তরবারি ও ২৫ জন লোককে লাঠি লইয়া বাজারে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিয়াছি, তাহারা তাড়াতাড়ি মন্দিরের দিকে যাইতেছিল। যাহারা তরবারি হাতে করিয়া যাইতেছিল, তাহাদের ১ জনকে আমি চিনি।

"মোহান্তের বাটীর ১ জন লোক এক স্বেচ্ছাসেবককে প্রহার করিয়াছে, আমি তাহাকে চিনাইয়া দিতে পারি।"

(৫) নারীযাত্রীর কথা

একটি নারী বলেন;—"বেলা প্রায় ১২টার সময় যখন আমি মন্দিরের নিকট দিয়া আসিতেছিলাম, তখন স্বামী বিশ্বানন্দজীকে বলিতে শুনিয়াছি,—'আপনারা প্রথমে আমাকে মারিয়া ফেলুন, পরে স্বেচ্ছাসেবকদিগকে মারিবেন।' যখন

এই কথা হইতেছিল, তখন আমি ঐ দিক্ দিয়া চলিয়া আসিতেছিলাম এবং মোহান্তের অনেক লোকের হাতে তলোয়ার ও বড় বড় লাঠি দেখিয়াছিলাম।"

দ্বিতীয় নারী বলেন,—"মন্দিরের নিকটস্থ আমার বাসায় বসিয়া আছি, এমন সময়ে দেখিলাম, কয়েক জন পীতবর্ণের কাপড় মাথায় বাঁধা (মহাবীরদলের স্বেচ্ছাসেবক) কতকগুলি কাগজ বিলি করিতেছে, অল্পক্ষণ পরেই কতকগুলি দরোয়ান আসিয়া এই কাগজ কাড়িয়া লইতে আরম্ভ করিল। পরে ২ জন স্বেচ্ছাসেবককে তাহারা মারিতে মারিতে লইয়া যাইতে লাগিল। উহাদের মধ্যে এক জনের উপর অত্যাচার অধিক হইয়াছিল। সে পরে আমাদের ঘরে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে এবং আমরা উহাকে পরিচর্য্যা করিয়া কতকটা সুস্থ করি। এই গণ্ডগোলের সময়ে মোহান্তের কতকগুলি লোককে উন্মুক্ত তরবারি ও লাঠি হস্তে বাহির হইতে দেখিয়াছিলাম।"

(৬) এতদ্ব্যতীত মন্দিরদ্বারের দর্শনী, চরণামৃত বিক্রয়, জল দেওয়া, বিগ্রহের মাথা জমা, নানাবিধ ইজারা, বাজারের 'দান' গ্রহণ করা ইত্যাদি ব্যাপারে আমরা অনেক অভিযোগের কথা শুনিয়াছি।

(৭) আমরা মোহান্ত মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন,—"আমি হাঙ্গামার সময়ে প্রাসাদের ভিতরে ছিলাম। আমি যাহা জানি, তাহা লোকের নিকট শুনিয়াছি মাত্র। বাজারে অথবা মহাবীরদলের নিকট আপনারা যাহা শুনিয়াছেন, তাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা। মহাবীরদলের লোকরাই অগ্রে হাঙ্গামা ঘটাইয়াছে, মারপিট করিয়াছে। উহারা বাবার মন্দিরের কাছে আমার নিন্দায় ভরা হাণ্ডবিল বিলাইতেছিল —আমি পাজী, আমি ..., আমি লম্পট ইত্যাদি গালি ঐ হ্যাণ্ডবিলে ছিল। কাযেই আমার লোকরা উহা সহ্য করে নাই, কাগজ ছিঁড়িয়া দিতে গিয়াছিল। ইহাতেই হাঙ্গামা ঘটে। মহাবীরদল প্রথমে মারে। ইহাতে আমার লোকজনও উত্তেজিত হয়। তবে ৭খানা তলোয়ার ও ২০টা লাঠির কথা মিথ্যা। আমি পূর্ব্বেই সমস্ত অস্ত্র তালাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলাম। কেবল দ্বাররক্ষকের কাছে একখানা তরবারি ছিল। সে তাহা লইয়া বাজারে দৌড়াইয়া যাইতেছিল বটে, কিন্তু প্রাসাদের উপর হইতে প্রভাত উহাকে নিষেধ করায় যায় নাই। আমার ভলান্টিয়াররা বাজারে ও মন্দিরে শান্তিরক্ষা করিতেছে, যাত্রীদের কোন অসুবিধা নাই। বাহিরের লোক আসিয়া যত হাঙ্গামা ঘটাইয়াছে। ইত্যাদি।"

ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে, মোহান্ত নিজে কিছু প্রত্যক্ষ করেন নাই, লোকমুখে ঘটনার কথা শুনিয়াছেন মাত্র। কিন্তু বাজারের দোকানদার ও যাত্রীরা প্রত্যক্ষদর্শী। তাহা হইলে কাহার কথা বিশ্বাসযোগ্য, তাহা সাধারণে বিচার করিবেন।

এখন কর্ত্তব্য কি?

মোহান্তের নামে নারীঘটিত যে সব জনরব রটিয়াছে, তাহার আলোচনার প্রয়োজন নাই। কেবল অন্যান্য ব্যাপারে যে সব অনাচারের কথা শুনা যাইতেছে, তাহার নিবারণের উপায় কি? এ সম্বন্ধে সমগ্র হিন্দুসমাজ অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছেন। আন্দোলনের ফলে অনাচার কতক পরিমাণে উপশমিত হইয়াছে। কিন্তু এখনও অনেক বাকী। কলিকাতার সম্পাদকসঙ্ঘের সভা এ বিষয়ে মনোযোগ দান করিয়াছেন। শুনা যাইতেছে, নানা শ্রেণীর লোক লইয়া কমিটী গঠিত হইতেছে,—ঐ কমিটী মহাবীরদলের সহিত একযোগে অনাচারনিবারণের ব্যবস্থা করিবেন। আবার এমনও শুনা যাইতেছে, সরকারও নাকি মোহান্তের লোক, জনসাধারণের প্রতিনিধি এবং সরকারী কর্ম্মচারী লইয়া এক কমিটী গঠন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। ঐ কমিটী নাকি তারকেশ্বরের managementএর ভার গ্রহণ করিবেন। আবার এমনও শুনা যাইতেছে যে, সরকার এক জন ব্রাহ্মণ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটকে তারকেশ্বরে নিযুক্ত করিবেন। ব্রাহ্মণসভার ২ জন প্রতিনিধিও তারকেশ্বরে আহূত হইবেন। আর মোহান্তের পক্ষের প্রতিনিধিও থাকিবেন। এই প্রতিনিধিমণ্ডলী তারকেশ্বরের আয়ব্যয়ের হিসাব রাখিবেন এবং পূজাভোগাদির ব্যবস্থা করিবেন। ইহাতে হিন্দু-সমাজের পক্ষ হইতে আপত্তি উঠিতে পারে। সুতরাং কি হইবে, এখনও কিছু জানা যাইতেছে না। তবে ইহা নিশ্চিত যে, জাগ্রত হিন্দু-সমাজ দেবস্থানের এই অবস্থা আর নীরবে সহ্য করিয়া যাইবে না।

তারকেশ্বর কি দেবোত্তর সম্পত্তি?

এ কথার মীমাংসা মুখের কথায় হইবে না, আদালতে হইতে

পারে, কেন না, মোহান্ত এই সম্পত্তি নিজস্ব বলিয়া দাবী করিতেছেন। তারকেশ্বরের সম্পত্তি মোহান্তের নিজস্ব কি হিন্দু জনসাধারণের, তাহা লইয়া তর্ক উঠিয়াছে। তারকেশ্বরের সম্পত্তি লইয়া মামলাও চলিতেছে। উহার ফলাফল হিন্দুসমাজ প্রতীক্ষা করিয়া আছে।

তবে এই সম্পত্তির কোথা হইতে উদ্ভব হইল, তাহার আলোচনা করিলে প্রকৃত তথ্য অবগত হইবার পক্ষে সহায়ক হইতে পারে।

তারকেশ্বরের ইতিহাস

বাঙ্গালা দেশের সরকারী হুগলী গেজেটিয়ার পাঠে জানা যায়,—১৭৭৯—৮১ খৃষ্টাব্দে রেণেলের যে বাঙ্গালার মানচিত্র পাওয়া যায়, উহাতে তারকেশ্বরের অস্তিত্ব নাই। তবে ১৮৩০-৪৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বাঙ্গালা সরকার বাঙ্গালার যে জরীপ করাইয়াছিলেন, উহাতে তারেশ্বরী নামে স্থান পাওয়া যায়।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে অযোধ্যাপ্রদেশে মোহাবা-গরকা-লিঙ্গ নামক স্থানে রাজা বিষ্ণুদাস নামে ক্ষত্রিয় ভূস্বামী ছিলেন। তিনি প্রায় ৫ শত অনুচর ও কান্যকুব্জ হইতে ১ শত ব্রাহ্মণ সঙ্গে লইয়া হরিপালের নিকট রামনগর গ্রামে উঠিয়া আসিয়া বসবাস করেন। তাঁহার বিস্তর লোকজন ও অস্ত্রশস্ত্র দেখিয়া স্থানীয় লোকরা দস্যু মনে করিয়া ভয় পায় এবং মুর্শিদাবাদের নবাব সরকারে তাঁহার বিপক্ষে অভিযোগ করে। তখনকার প্রথামত বিষ্ণুদাস হস্তে জলন্ত লৌহসাবল ধারণ করিয়া অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে নবাব সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর্ত্তমান তারকেশ্বরের ৪ ক্রোশ দূরে ৫ শত বিঘা (বর্ত্তমান ১৫০০ বিঘা) জমী দান করেন।

বিষ্ণুদাসের ভ্রাতা ভারামল্ল সিং সংসারত্যাগী সাধুর ন্যায় জঙ্গলে যোগসাধনা করিতেন—সেই জঙ্গলের নাম জোত সভারাম। জঙ্গলে বাসকালে ভারামল্ল প্রত্যহ দেখিতে পান যে, কয়েকটি গাভী বাঁটে দুধ লইয়া গভীর অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করে এবং বাঁট দুগ্ধশূন্য করিয়া ফিরিয়া আইসে। কোথায় এই দুগ্ধ যায়, দেখিবার জন্য তিনি এক দিন গাভীদের পশ্চাদনুসরণ করেন। গভীর অরণ্যে দেখেন, গাভীরা এক শিলার মস্তকে আপনার বাঁটের দুধ ঢালিয়া দিতেছে। সেই শিলা শূন্যগর্ভ। ভারামল্ল অতঃপর ঐ শিলা উত্তোলন করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু এক দিন ক্রমাগত খনন করিয়াও উহার মূল প্রাপ্ত হইলেন না। রাত্রিতে স্বপ্ন হইল, যেন বাবা তারকনাথ আসিয়া ভারামল্লকে বলিতেছেন,—"ভারামল্ল! খুঁড়িয়া আমায় তুলিও না। বরং আমার উপরে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দাও এবং তুমি মোহান্ত হইয়া আমার পূজার ব্যবস্থা কর।"

অতঃপর উভয় ভ্রাতা তারকেশ্বরের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন এবং ভারামল্ল তাহার প্রথম মোহান্ত নিযুক্ত হয়েন। সেই মন্দির ভগ্ন হইয়াছে, বর্দ্ধমানের কোন রাজা উহা পুনর্নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। হাওড়ার চিন্তামণি দে মন্দিরের সম্মুখস্থ নাটমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন।

মন্দিরের কার্য্যপরিচালনা মোহান্তরা করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে এই দেব-সম্পত্তির বাৎসরিক আয় ১৬ হাজার টাকা এবং যাত্রিদত্ত বাৎসরিক পূজাপ্রণামী আদির আয় ১ লক্ষ টাকা ছিল। তাহার পর ক্রমশঃ বাড়িয়াছে। মোহান্ত জীবদ্দশায় ঐ আয় উপভোগ করিয়া থাকেন। মোহান্ত আজীবন সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী—তিনি দশনামী সাধু সম্প্রদায়ভুক্ত।

ইহা গেজেটিয়ারের ইতিহাস। তবেই বুঝিতে হইবে, এই মন্দির বা সম্পত্তি এক ক্ষত্রিয় রাজার ও তাঁহার সাধু ভ্রাতার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। ক্ষত্রিয় রাজভ্রাতা ইহার প্রথম মোহান্ত। তিনি তাঁহাদের দ্বারা কান্যকুব্জ হইতে আনীত ব্রাহ্মণদের মধ্যে বাছিয়া আজীবন ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসীকে দেবসেবক নিযুক্ত করিয়া যান। সুতরাং এই সম্পত্তি মোহান্তের নিজস্ব কিরূপে হইতে পারে, বুঝিতে পারা যায় না।

নানা মামলার কথা—

(১) মোহান্ত মাধবগিরি যখন এলোকেশীর সতীত্ব-নাশের অপরাধে জেলে যান, তখন শ্যামগিরি তাঁহার স্থানে গদীতে বসিয়াছিলেন। মাধবগিরি জেলমুক্ত হইবার পর উভয়ে গদী লইয়া মামলা হয়। শুনা যায়, মাধবগিরি পক্ষসমর্থনকালে আদালতে বলেন,—'যেহেতু আমি দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ভুক্ত, সেই হেতু আমার পরমারাধ্য

গমনে বাধা নাই। আমি ফৌজদারী জেল খাটিয়া আসিয়াছি, এজন্য আমার মোহান্ত পদে পুনরায় বসিতে কোন বাধা নাই।' হুগলীর জিলা-জজ মিঃ ব্রেড সেই সময়ে রায়ে বলিয়াছিলেন,—"সম্পত্তি দেবতার, মোহান্তের নিজস্ব নহে,"—এইরূপই প্রকাশ।

(২) প্রায় ৭০।৮০ বৎসর পূর্ব্বে সরকার একবার তারকেশ্বরের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সে সময়ে মোহনগিরিই বোধ হয় মোহান্ত ছিলেন। মোহনগিরি সম্পত্তিরক্ষার্থ সেই সময়ে বলিয়াছিলেন,—"সম্পত্তি ভারামল্লের সময় হইতে দেবতার, মোহান্তরা উহার রক্ষক ও সেবক হইয়া তত্ত্বাবধান করিয়া আসিতেছেন, সুতরাং প্রাইভেট সম্পত্তি বলিয়া সরকার কোনও অছিলায় উহা বাজেয়াপ্ত করিতে পারেন না।"

(৩) মোহান্ত মাধবগিরি তারকেশ্বরে একটি দাতব্য ঔষধালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। মাধবগিরির আমলে উহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই, মোহান্ত সতীশগিরির আমলে হইয়াছে। ঐ ঔষধালয়ের উদ্বোধনের দিনে হুগলীর বিস্তর গণ্যমান্য লোক উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধন বক্তৃতায় বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনার, মোহান্ত সতীশগিরি ও সমস্ত জনগণের সমক্ষে বলেন,—ভারামল্ল এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা, ভারামল্ল তাঁহার পর সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীকে ইহার ও দেবতার এই বিস্তীর্ণ সম্পত্তির সেবক ও রক্ষক নিযুক্ত করিয়া গিয়াছিলেন।

(৪) লাট কৃষ্ণপুর, থানা হরিপাল, সম্পত্তি যোত উচ্ছেদের মামলায় মোহান্ত সতীশগিরির বিপক্ষে জ্ঞানেন্দ্রনাথ সিংহ রায়দিগর জবাব দেয় যে, "মোহান্ত ঐ সম্পত্তি নিজস্ব বলিয়া দাবী করিতে পারে না, কেন না, আমরা বাবা তারকনাথের প্রজা, মোহাণ্ড বা অন্য কাহারও নহি।" হুগলীর তৃতীয় সবজজ রায়ে বলেন,—"এই সম্পত্তি তারকনাথের। মোহান্ত নিজে এই সম্পত্তির মালিকরূপে নালিশ করিতে পারেন না।" জজ মোহান্তের বিপক্ষে মায় খরচা মামলা ডিসমিস করিয়া দেন।

(৫) শ্রীশগিরি যখন মোহান্ত সতীশগিরির পক্ষে উইল কৃত্রিম বলিয়া মামলা দায়ের করে, তখন সেই মামলা হাইকোর্ট হইয়া প্রিভি কাউন্সিলে যায়। সেখানে মামলা চলিবার কালে মোহান্ত সতীশগিরি ৩২ হাজার টাকা নগদ ও মাসিক ১ শত টাকা শ্রীশগিরিকে দিবার প্রতিশ্রুতিতে মামলা রফা করিয়া লয়েন। আরজীতে বলা হইয়াছিল,—"বাবা তারকনাথের এষ্টেটের বিস্তর খরচ হইয়া যায় ও ক্ষতি হয় দেখিয়া আমি রফা করিলাম।" ইহা অবশ্য প্রবাদকথা।

উপরি-উক্ত ঘটনাগুলির সত্যাসত্য সাধারণে নির্দ্ধারণ করিতে পারেন। উহার উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া কঠিন নহে। যখন তাঁহারা নিঃসন্দেহ হইবেন, তখন বুঝিবেন, এই সম্পত্তি কাহার।

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু।

চম্পক-চতুর্দ্দশী

চম্পকের মদগন্ধে চঞ্চল পবন,
নাগচম্পকের রাশি মুচুকুন্দ ফুল,
কোমল মধুর স্পর্শে সুখতন্দ্রাকুল,
ঘন-ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন ভুবন।

শ্মশানে দুলিছে শিখা রক্তভুজঙ্গিনী,
ফনায় ফনায় দোল মুক্তাবিন্দু ঝরে,
কুলুকুলু-কলগীতি গঙ্গার অধরে,
উন্মাদন কামমন্ত্র পড়ে তমস্বিনী।

তারা-চম্পকের দাম দুলিছে আকাশে,
ছেয়ে গেছে ব্যোমপ্রান্ত চম্পকে চম্পকে,
ক্ষ্যাপা কোথা হ'তে আসি চক্ষের পলকে,
শিবের চম্পকমালা পরিল উল্লাসে।

দেউল শিখরে ছুঁয়ে সুদীর্ঘ ত্রিশূল,
শ্মশানে বসিয়া হাসে প্রেমস্বপ্নাকুল।

শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ।

হারাধন

(গল্প)

৩

রামলোচনের সুনজরে পড়িয়া গিয়া, হারাধন পরম আরামে তথায় অধিষ্ঠান করিল। প্রাতে উঠিয়াই বাবুর সঙ্গে নদীতে স্নান করিতে যায়; স্নানান্তে কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া, বাবুর সহিত আড়তে গিয়া বসে। রামলোচন দেখিলেন, হিসাবপত্র লিখিতে সে সুদক্ষ; গত বৎসরের সালতামামি হিসাব এখনও করা হয় নাই;—সেই হিসাব প্রস্তুত করিবার ভার তিনি হারাধনের প্রতি অর্পণ করিয়া, নিজে হুঁকা হাতে করিয়া মনের সুখে ধূমপান করিতে লাগিলেন।

এইরূপে ১০।১২ দিন কাটিলে, রামলোচনের স্ত্রী তারাসুন্দরী একটি পুত্র প্রসব করিলেন। পূর্ব্বে তাঁহার দুইটি সন্তান জন্মিয়াছিল; সূতিকাগৃহ হইতেই নানা রোগে ভুগিয়া তাহারা জননীর কোল শূন্য করিয়া চলিয়া যায়। তাই রামলোচন এবার বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছেন। স্থানীয় হাঁসপাতালের ডাক্তার বাবু ও পাশকরা ধাত্রী প্রতিদিন আসিয়া সকল বিষয় তদারক করিয়া উপদেশ ও ঔষধের ব্যবস্থা প্রদান করিতেছেন। এই গোলমালের মধ্যে পড়িয়া, রামলোচন আর নিয়মিতভাবে দোকানে যাইতে পারেন না। মাঝে মাঝে দুই এক ঘণ্টা গিয়া গদীতে বসেন; তার পর, হারাধনের প্রতি দোকানের ভার দিয়া বাসায় চলিয়া আসেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বে গিয়া, ক্রয়-বিক্রয়ের হিসাব পরীক্ষা করেন, তহবিল বুঝিয়া লন; গোপনে কর্ম্মচারীদের জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াও দেখিয়াছেন, হারাধনের হিসাবে কোথাও একটি পয়সার গরমিল পান নাই।

হারাধনের প্রতি বাবুর এই নির্ভর ও বিশ্বাস দেখিয়া, কর্ম্মচারীরা কিন্তু মনে মনে চটিতে লাগিল। চাল নাই, চুলা নাই, কোথাকার কে তার ঠিকানা নাই, তাহার প্রতি এতটা বিশ্বাসস্থাপন করা যে বাবুর পক্ষে নিতান্তই মূঢ়তা হইতেছে, ইহাই তাহারা অন্তরালে বলাবলি করিতে লাগিল। দোকানের গোমস্তা নরহরি সাহা এক দিন তাহার মনের এই সন্দেহের কথা বাবুকে বলিয়াছিল, কিন্তু বাবু তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন। নরহরি ইহাতে ক্ষুণ্ণ হইয়া, সরকার ও ওজনদারের নিকট বলিয়াছিল, "ভালোর তরেই বলেছিলাম, কিন্তু বাবু শুন্‌লেন না। শুন্‌বেন কেন, কাঙালের কথা বাসি না হ'লে ত মিষ্টি লাগে না।"

অশৌচান্তে তারাসুন্দরী আঁতুড়ঘর হইতে বাহির হইয়া, নাইয়া-ধুইয়া ঘরে উঠিলেন। এক দিন তিনি স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাগা, তোমার গেল বছরের সালতামামি হিসেবটা হয়ে গেছে কি?"

"কেন?"

"ছোট বউ বল্‌ছিল, দিদি, বট্‌ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করো, এ ক'বছরে কত টাকা মুনফা হয়েছে; আমার ভাগের অর্দ্ধেক টাকাটা যদি বট্‌ঠাকুর দেন ত তীর্থধর্ম্ম ক'রে আসি।"

শুনিয়া রামলোচন গুম্ হইয়া রহিলেন।

স্বামীকে নীরব দেখিয়া তারাসুন্দরী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাবছ কি?"

রামলোচন বলিলেন, "আমি ভাবছি কি শুন্‌বে? পদ্মলোচন ত আজ পাঁচ বৎসর হ'ল গিয়েছে। কৈ, এত কাল ত ছোট বউমা এ কথা কোনও দিন উত্থাপন করেন নি! আজ হঠাৎ এ কথা কেন?"

বড় বউ বলিলেন, "কেউ বোধ হয় সলাপরামর্শ দিয়েছে যে, আড়তের অর্দ্ধেক মালিক ত তুই, তোর ভাসুরই বা সব একলা খায় কেন?"

"কে ওঁকে এ বুদ্ধি দিলে, সন্ধান নিতে পার?"

"দেখ্‌ব চেষ্টা ক'রে। আপাততঃ ওকে কি বলি, তা আমায় ব'লে দাও।"

"বোলো যে, হিসেবপত্র এখনও তৈরী হয় নি—আর, হিসেবের জন্যে আটকাচ্ছেই বা কি? দুই একশো টাকা যদি ওঁর দরকার হয় ত চেয়ে নেন নেন।"

ছোট বউ কিন্তু দুই একশত টাকার কথা কানে তুলিলেন না। বলিলেন, "না দিদি, দুই একশো টাকায় আমার কিছু হবে না। পাঁচ বছরে লাভে-লোকসানে মিলিয়ে কিছু না হয়ে থাকে, তবে অন্ততঃ পাঁচ হাজার টাকাও ত লাভ হয়েছে—আমায় এখন আড়াই হাজার টাকা বট্‌ঠাকুর দিন, পরে হিসেবপত্র হ'লে, আমার পাওনার বাকী টাকা দিলেই চলবে।"

সংসারে এই লইয়া বড়ই একটা অশান্তির সৃষ্টি হইল। পূর্ব্বে উভয় যা'য়ে বেশ সম্প্রীতি ছিল, তাহারা পরস্পরের প্রতি প্রিয়সখীর ন্যায় ব্যবহার করিত, এখন উভয়ের মধ্যে কথাবার্ত্তা একরূপ বন্ধ হইয়াছে বলিলেই হয়। ইতোমধ্যে রামলোচন এক জন বিশ্বস্ত লোকের কাছে খবর পাইলেন, হারাধন এক দিন স্থানীয় কোনও প্রসিদ্ধ উকীলের বাড়ীতে গিয়া বসিয়া ছিল।

৬

সে দিন সন্ধ্যায় বাসায় আসিয়া রামলোচন স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছোট বউমার সম্বন্ধে তোমার কোনও সন্দেহ হয় কি?"

তারাসুন্দরী বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?"

"হারাধন উকীল-বাড়ী যায় কেন?"

তারাসুন্দরী, স্বামীর প্রশ্নের ইঙ্গিত বুঝিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "সে কি কথা! ছি ছি—এমন কি কখনও হ'তে পারে?"

রামলোচন বলিলেন, "হারাধনের কি এমন তালুক-মুলুক জ্যোৎ জমা আছে, যার জন্যে ওকে উকীল-বাড়ী যেতে হয়? আরও দেখ, এত দিন না তত দিন, হারাধন আসার পর থেকেই ছোট বউমা এই গণ্ডগোল সুরু করেছে। আর একটা কথা, আমার যেমন মতিচ্ছন্ন, গেল বছরের সাল-তামামি হিসেবটা আমি ঐ হেরোকেই তৈরী করার ভার দিয়েছিলাম।"

"গেল বছর লাভ কি হয়েছে?"

"প্রায় হাজার টাকা। সেই ধরেই ছোট বউমা বোধ হয় হিসেব করছে, পাঁচ বছরে পাঁচ হাজার টাকা। দেখ, আমি নিশ্চয় বলছি, হেরোর সঙ্গে ছোট বউমার কোনও যোগাযোগ আছে। বাড়ী থেকে হতভাগাকে তাড়িয়ে দিই, কি বল?"

"তা দাও। কিন্তু, আমার ত ও কথা বিশ্বাসই হয় না। ছি ছি, এ কি কখনও হ'তে পারে? চব্বিশ ঘণ্টা ত দুজনে একসঙ্গে রয়েছি, তার কথায় বার্ত্তায় চালচলনে কৈ, কোনও দিন মনে ত কিছু সন্দেহ হয় নি।"

এ কথা শুনিয়া রামলোচন কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। পরে বলিলেন, "তুমি যাই বল না কেন বড় বউ, ভিতরে কোনও গোলযোগ আছেই আছে। ছোট বউই বা লাভের অংশ দাবী করে কেন, আর হেরোই বা উকীলবাড়ী যায় কেন? ভারী ত আমাদের মাসীমার কুটুম, পরমুণ্ডে দুবেলা খাচ্চেন-দাচ্চেন, দিই ওকে তাড়িয়ে, কি বল?"

তারাসুন্দরী নীরবে কিছুক্ষণ ভাবিলেন। তার পর বলিলেন, "এখন হঠাৎ কিছু না ক'রে দিন কতক চোখ-কান খুলে থাকা যাক এস। যদি সে রকম কোনও বেচাল দেখ্‌তে পাই, তখন ছুটোকেই ঝাঁটা মেরে বাড়ী থেকে দূর ক'রে দিলেই হবে।"

রামলোচন, পত্নীর এ যুক্তিই উপস্থিতক্ষেত্রে সর্ব্বোত্তম বলিয়া বিবেচনা করিলেন।

৭

ছোট বউ ও হারাধন সম্বন্ধে তাঁহাদের মনে যে কোনও প্রকার সন্দেহের উদয় হইয়াছে, ইহা কর্ত্তা বা গিন্নী নিজ নিজ কথায় বা ব্যবহারে কিছুমাত্র প্রকাশ না করিয়া দিন কাটাইতে লাগিলেন।

এক দিন বেলা দশটার সময়, রান্নাঘরের বারান্দায় বড় বউ ছেলে কোলে করিয়া বসিয়া আছেন, ছোট বউ কুটনা কুটিতেছেন, এমন সময় "কি গো বড়গিন্নি, কেমন আছ গো?"—বলিয়া এক জন বয়স্কা বিধবা উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল।

এই স্ত্রীলোক, দেশে ইঁহাদের বাড়ীর কাছেই বাস করে, ইঁহাদেরই প্রজা। তারাসুন্দরী বলিলেন, "দুলে বউ যে! ভাল আছিস্ ত দুলে বউ?"

"হ্যাঁ মা, তোমাদের ছিচরণ আশীর্ব্বাদে ভালই আছি।" বলিয়া, নিম্নে দাঁড়াইয়া, বারান্দার প্রান্তে মাথা ঠেকাইয়া সে উভয় বধূকে প্রণাম করিয়া বলিল, "এই খোকাটি বুঝি এবার হয়েছেন? তোমার খোকা হয়েছে, তা আমি দেশে থাকৃতেই শুনেছিলাম। আহা, তা বেশ হয়েছে, বেঁচে থাকুক!"

বড় বউ বলিলেন, "বস্ দুলে বউ, বস্। এখানে কোথায় এসেছিলি? কবে এলি?"

"এই পর্শু দিন এসেছি মা। আমার জামাই এখন এইখানেই চাকরি করে কি না, সে এখন আদালতের পেয়াদা হয়েছে। তোমাদের আশীর্ব্বাদে বেশ দু'পয়সা ওজগারও কর্‌ছে। আমার মেয়েকে নিয়ে এসেছে, এই-খানেই বাসা ভাড়া নিয়ে আছে। মেয়েকে অনেক দিন দেখিনি, তাও বটে, তোমার খোকাটি হয়েছে শুনেছিলাম, তাও বটে, তাই মনে কর্‌লাম, যাই একবার দেখা-শুনো ক'রে আসি।"

"তা বেশ করেছিস্। তোর মেয়ে-জামাই ভাল আছে ত?"

"হ্যাঁ মা, তারা ভাল আছে।"

দুলে বউ বসিয়া বসিয়া গ্রামের নানা সংবাদ বলিতে লাগিল। ঘণ্টাখানেক পরে বলিল, "আচ্ছা, তা হ'লে এখন উঠি মা, বেলা হয়ে গেল। কা'ল সকালেই দেশে যাব মনে কর্‌ছি।"

তারাসুন্দরী বলিলেন, "উঠবি কেন দুলে বউ। এত দিন পরে এলি, এইখানে দুটি খেয়ে যা। নাওয়া হয়েছে?"

"না মা, নাওয়া এখনও হয় নি। তা বেশ, দুটি পেসাদ দিও, খেয়েই যাব। তোমাদের খেয়েই ত মানুষ মা; আজ ব'লে নয়, সাতপুরুষ। তা, একটু তেল দাও, নদীতে যাই।"

দুলে বউ নদী হইতে স্নান করিয়া যখন ফিরিল, তখন প্রতিদিনের প্রথামত রামলোচন হারাধনকে লইয়া ভোজনে বসিয়াছেন। দুলে বউ গোয়ালঘরের ছায়ায় নারিকেল-গাছের আড়ালে বসিয়া, হারাধনের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

পুরুষদের আহার শেষ হইলে, দুলে বউকে ভাত দিয়া, বড় বউ ও ছোট বউ খাইতে বসিলেন। আহারান্তে ছোট বউ নিজ ঘরে চলিয়া গেলেন। দুলে বউ পুকুরঘাটে গিয়া আঁচাইয়া আসিয়া, নিজ আহারস্থান পরিষ্কার করিল। হাত ধুইয়া আসিয়া, আলগোছে গিন্নীর হাত হইতে একটি পাণ লইয়া মৃদুস্বরে বলিল, "গিন্নীমা, একটা কথা আছে, কিছু যদি মনে না কর ত বলি।"

তারাসুন্দরী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি কথা দুলেবৌ?"

"ঐ যে মিন্সেটা বাবুর সঙ্গে ব'সে খেলে, ও কে? তোমাদের কেউ হয়?"

"না, আমাদের কেউ হয় না, দোকানের মুহুরী।"

"কত দিন এসেছে?"

"এই মাসখানেক হবে। কেন দুলেবৌ, এ কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ছিস কেন?"

দুলে বউ এদিক ওদিক চাহিয়া নিম্নস্বরে কহিল, "ও নোক ভাল নয় মা, ওকে তাড়িয়ে দাও। ছোট-গিন্নী এখানে আস্‌বার মাসখানেক আগে, ও মিন্সে আমা-দের গাঁয়ে গিয়েছিল। ও কে, কি বিত্তান্ত, কেউ জানে না। যদি মিথ্যে বলি ত আমার জিভ্ যেন খসে যায় মা—তোমাদের বাড়ীর বাগানের ধারে, পুকুরঘাটের পথে, এই রকম সব যায়গায়, দু' তিন দিন ছোট বউয়ের সঙ্গে ফুসুর-ফুসুর ক'রে কথা কইতে ওকে আমি স্বচক্ষে দেখেছি। শুধু আমি কেন, আরও কত নোক দেখেছে। এ নিয়ে গাঁয়ে একটু কানাকানিও সুরু হয়েছিল। তার পর মিন্সে কোথায় চ'লে গেল, আর দেখতে পাই নি। আবার এখানে এসেও জুটেছে দেখছি! কার মনে কি আছে, তা নারায়ণই জানেন, কিন্তু এ সব কি ভাল মা? তোমরা ভদ্দরনোক, গাঁয়ের মাথা, ছি ছি, এ কি কাণ্ড!"—বলিয়া দুলেবৌ প্রণাম করিয়া বিদায়গ্রহণ করিল।

তারাসুন্দরী কাঠের পুতুলের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাঁহার মুখ দিয়া একটি কথাও বাহির হইল না। তিনি কেবলই ভাবিতে লাগিলেন, তবে ত স্বামী যাহা সন্দেহ করিয়াছেন, তাহাই ঠিক, আমার বিশ্বাসই ত ভুল!

৮

অপরাহ্ণকালে ছোট বউ বলিলেন, "দিদি, এখন তুমি অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছ, বট্‌ঠাকুর আমার টাকাগুলির ব্যবস্থা ক'রে দিলেই আমি দেশে চ'লে যেতে পারি। আড়াই হাজার টাকা যদি এখন নাও হয়ে ওঠে, আপাততঃ দু'হাজার পেলেও আমার চল্‌বে—পরে তখন হিসেবপত্র দেখে যা হয় তা দেবেন। আজকে বট্‌ঠাকুরকে তুমি বোলো মনে ক'রে দিদি।"

বড় বউ গম্ভীরভাবে বলিলেন, "আচ্ছা, তা বল্‌বো। মনে মনে বলিলেন, "তোমায় হাতেনাতে একবার ধরি

দাঁড়াও, ধ'রে আচ্ছা ক'রে ঝাঁটাপেটা করি ; তার পর বোধ হয়, তুমি দেশে না গিয়ে কাশী কি বৃন্দাবন যেতেই চাইবে।"

রাত্রে আহারাদির পর নিজ কক্ষে শয়ন করিয়া তারাসুন্দরী স্বামীকে বলিলেন, "ওগো, তুমি যা সন্দেহ করেছিলে, তাই ঠিক, আমারই ভুল হয়েছিল।"—বলিয়া ছুলে বউ কর্ত্তৃক প্রদত্ত সংবাদটি তিনি স্বামীর গোচর করিলেন। টাকার জন্য আজ আবার ছোট বউয়ের তাগাদার কথাও বলিলেন। অবশেষে বলিলেন, "টাকাটা ফেলেই দাও। দিয়ে পাপ বিদেয় কর। নইলে এখানে বাসায় আমাদের চোখের সামনে কি কাণ্ড হ'তে কি কাণ্ড হবে, তা ভাবতেও আমার বুক শুকিয়ে যাচ্ছে।"

রামলোচন নীরবে ধূমপান করিতে লাগিলেন। কোনও মতামত ব্যক্ত না করিয়া, অবশেষে শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইবার চেষ্টা করিলেন।

কিন্তু নিদ্রা তাঁহার চক্ষুতে আসিল না। ঘণ্টাখানেক এ পাশ ও পাশ করিয়া তিনি উঠিলেন। নগ্নপদে বাহিরে গেলেন। উঠানে নামিয়া, দ্বার খুলিয়া আস্তে আস্তে বৈঠকখানাঘরের বারান্দার নিম্নে গিয়া দাঁড়াইলেন। এ কয়দিন গভীর রাত্রে প্রায়ই তিনি এইরূপ "রোঁদে" বাহির হইয়া থাকেন, দেখিতে আসেন, হারাধন নিজ স্থানে শয়ন করিয়া আছে কি না। অন্যান্য দিন বৈঠকখানা-ঘর ভিতর হইতে বন্ধ দেখিতে পান ; আজ দেখিলেন, বাহিরে শিকল চড়ানো।

দেখিয়া, তাঁহার সন্দেহ দৃঢ় হইয়া উঠিল। বৈঠকখানার পাশ দিয়া, তিনি বাগানে প্রবেশ করিয়া, নিজ শয়নকক্ষের পশ্চাতে গিয়া পৌঁছিতেই দেখিতে পাইলেন, ছোট বউয়ের ঘরের পশ্চাতের জানালার কাছে এক ব্যক্তি ভিতরের মানুষের সঙ্গে চুপি চুপি কি কথাবার্ত্তা কহিতেছে।

সাবধানে আর একটু অগ্রসর হইতেই দেখিয়া চিনিলেন, ও ব্যক্তি হারাধনই বটে। রাগে তাঁহার ব্রহ্মাণ্ড জ্বলিয়া উঠিল। তিনি যেন পাগলের মত হইয়া পড়িলেন। তৎক্ষণাৎ বাঘের মত লম্ফ দিয়া গিয়া, সজোরে লোকটার টুঁটি চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, "পাজি নচ্ছার হারামজাদ! এই তোর কায? আয় শালা, তোকে আজ খুন ক'রে এইখানেই পুঁতি।"—বলিয়া হারাধনকে পাড়িয়া ফেলিলেন। উভয়ে মহা ঝটাপটি আরম্ভ হইল।

ব্যাপার দেখিয়া ছোট বউ মহাপ্রবেগে নিজ কক্ষ হইতে বাহির হইয়া, তারাসুন্দরীর শয্যাপার্শ্বে আসিয়া তাঁহাকে ধাক্কা দিয়া বলিতে লাগিল—"দিদি, দিদি, ওঠ। সর্ব্বনাশ হ'ল, বট্‌ঠাকুর খুন করছেন।"

"কি কি" বলিয়া তারাসুন্দরী ধড়মড় করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। ছোট বউ বলিল, "দিদি, বারণ কর, বারণ কর। ও অন্য কেউ নয়—ও আমার দাদা—আমার সহোদর ভাই। আমি টাকা চাইনে দিদি—তোমার পায়ে পড়ি, আমার দাদাকে বাঁচাও।"

তারাসুন্দরী কম্পিতপদে খোলা জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন। জানালার প্রায় নীচে বাগানে একটা প্রবল মারামারির শব্দ এবং স্বামীর কণ্ঠস্বরে "খুন কর্‌বো তোকে" এই কথা কয়েকটি শুনিলেন। ভয়ে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল, তিনি ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে অ্যাঁ—অ্যাঁ করিয়া সেইখানেই বসিয়া পড়িলেন।

বড় বধূর অবস্থা দেখিয়া ছোট বউ নিজেই চীৎকার করিয়া উঠিল—"দাদা, দাদা, পরিচয় দাও।"—কিন্তু এই সময় হারাধন উঠিয়া চোঁচা দৌড় দিল, এবং রামলোচন তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন ; সুতরাং ছোট বউয়ের কথাগুলি উভয়ের মধ্যে কাহারও কর্ণগোচর হইল না।

৯

হারাধনকে ধরিতে না পারিয়া কিয়ৎক্ষণ পরে রামলোচন যখন ক্ষতবিক্ষতপদে নিজ শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন, তখন দেখিলেন, উভয় বধূই একত্র মেঝের উপর বসিয়া আছেন, তিনি প্রবেশমাত্র ছোট বউ উঠিয়া অপর দ্বার দিয়া প্রস্থান করিলেন।

রামলোচন বলিয়া উঠিলেন, "হেরো শালাকে ত ধরতে পারলাম না, পালিয়ে গেল ; এখন ডাক ঐ হারামজাদীকে, নাক-কান কেটে ঝাঁটা মেরে ওকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দাও।"

বড় বউ নিম্নস্বরে বলিলেন, "চুপ চুপ। অমন কথা মুখে এন না।"

রামলোচন স্ত্রীর কথায় অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "কেন? ও কথা বলছ কেন?"

বড় বউ বলিলেন, "ওগো, মস্ত একটা ভুল হয়ে গেছে। ঐ হারাধন আর কেউ নয়, ছোট বউয়ের দাদা।"



শিল্পী—শ্রীজয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এ

"মধুর মূরতি, মধুর কীরতি, মধুর মধুর হাস।"

— ৺অশ্বিনীকুমার দত্ত

বসুমতী প্রেস]

রামলোচন বলিয়া উঠিলেন, "সে কি ?"

"ওর এক দাদা ছিল, সে পাবনার বাজারে এক রাত্রে একটা খারাপ স্ত্রীলোককে খুন ক'রে ফেরার হয়েছিল, শোন নি? ঐ সেই দাদা। হারাধন ত নয়, ওর আসল নাম হীরালাল।"

রামলোচন বলিলেন, "বল কি? ও ছোট বউয়ের ভাই? তা, সে হ'ল ফেরারী আসামী, এখানে কি করতে এসেছিল শুনি?"

"বোনের কাছ থেকে কিছু টাকা সংগ্রহ করতে।"

রামলোচন মেঝের উপর বসিয়া পড়িয়া, খাটের পায়ায় ঠেস দিয়া বলিলেন, "জল দাও।"

তারাসুন্দরী উঠিয়া এক গেলাস জল আনিয়া দিলেন। সমস্ত জলটুকু ঢক্ ঢক্ করিয়া পান করিয়া ফেলিয়া গেলাস নামাইয়া রাখিয়া রামলোচন বলিলেন,—"কিন্তু—কিন্তু—কথাটা কি সত্যি? না, নষ্ট স্ত্রীলোকের উপস্থিতবুদ্ধি?"

ইঁহারা জানিতেন না, ছোট বউ দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া ইঁহাদের কথোপকথন শুনিতেছিল। সে তখনই দুম দুম করিয়া পা ফেলিয়া, নিজ কক্ষে গিয়া বাক্স খুলিয়া তাহা হইতে কতকগুলা কাগজ বাহির করিয়া লইল। বড় বউয়ের ঘরে প্রবেশ করিয়া, তাঁহার কোলের উপর কাগজগুলা ফেলিয়া দিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "বট্‌ঠাকুরকে এগুলি প'ড়ে দেখতে বল দিদি।"

লণ্ঠনের আলো বাড়াইয়া দিয়া রামলোচন কাগজগুলি পড়িতে লাগিলেন। এগুলি এই বাসাতে থাকাকালীন "হারাধন" লিখিয়াছে। ভগিনীর নিকট টাকার তাগাদা, ভাসুরের নিকট পাঁচ বৎসরের মুনাফার অংশে হিসাবে অন্ততঃ ২৫০০৲ টাকা দাবী করার জন্য উপদেশ; উকীলের সহিত পরামর্শের কথা; অবশেষে একখানি পত্রে, অন্ততঃ পক্ষে আপাততঃ ২০০০৲ টাকার জন্য পীড়াপীড়ি। স্পষ্টই বুঝা গেল, "হারাধন" এই পত্রগুলি রাত্রে পশ্চাতের জানালা দিয়াই হউক, অথবা অপর কোনও সুযোগেই হউক, তাহার ভগিনীর হাতে দিয়াছিল।

পত্রগুলি পড়িয়া রামলোচন বলিয়া উঠিলেন—"জয় ভগবান্! জাত-কুল রক্ষে করলে বাবা!"—বলিয়া পত্রগুলির মর্ম্ম স্ত্রীকে জানাইলেন।

অতঃপর রামলোচন, বিধবা ভ্রাতৃজায়াকে ব্যবসায়ে তাহার লাভের অংশস্বরূপ ৩০৲ মাসহারা বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া তাহাকে দেশে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

অচেনা

(১)

সাঁজের আলো ঘনিয়ে এলো যখন ধরা ছেয়ে,
শয়ন পেতে ছিলেম তখন অলস-চোখে চেয়ে;
তেপান্তরের ফাঁকা মাঠে—
সানবাঁধা এক পুকুরঘাটে,
ঘুম-ঘোরে গণতে ছিলুম আর কত দিন বাকি—
প্রিয়ার সনে দেখা হ'বার দিন এলো ঐ নাকি!

(২)

মৃদু মলয় ঝুরঝুরিয়ে জানিয়ে দিল মোরে—
আর কত কাল এমন ক'রে রবে ঘুমের ঘোরে;
দিন ফুরায়ে সন্ধ্যা হ'ল,
এখনো কি ভাবচো বল,
আঁধার ঐ যে ঘনিয়ে এলো সারা বিশ্ব জুড়ে—
উঠ, ওগো—যেতে হবে তোমায় অনেক দূরে।

(৩)

চোখটি আমার খুলে গেল মৃদু মধুর ডাকে,
চমকে আমি পড়লাম আজি কেমন যেন ফাঁকে;
চিন্তা এলো বড়ই মনে,
অশ্রু এলো নয়ন-কোণে,
কেমন ক'রে ঘোর আঁধারে যাব এত দূরে,
পথ দেখাও হে পথের বন্ধু, তোমার আলোক-পুরে!

মহাম্মদ সুনাওর আলী।

পুরাতন পঞ্জিকা

৫

সিংহ মহোদয় নিজে বড়মানুষের ছেলে ছিলেন, এবং সমসাময়িক প্রায় সকল বড়লোকই এক দিকে যেমন তাঁহাকে স্নেহ ও আদর করতেন, অন্য দিকে তেমন-ই একটু ভয়-ও করতেন। শান্তিরাম সিংহের বংশে তিনি জন্মেছিলেন শান্তিরাম সিংহ। তাঁর স্পষ্টবাদিত্ব কিছু মারাত্মক রকম ই ছিল। সিংহীর বাচ্ছা যেমন প্রকাণ্ড দুরন্ত হাতীর মাথার উপর-ও লাফিয়ে পড়ে, কালীপ্রসন্ন সিংহ-ও সেইরূপ যত বড় নামজাদা মহারাজা রাজা কি দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ ধনী-ই হোন, সবার-ই সম্মুখে তাঁদের ভণ্ডামীর বা ন্যাকামীর ব্যাখ্যানা করতেন, প্রায় তখনকার সকল বড়মানুষ-ই সিংহ-দত্ত এক একটি ব্যঙ্গাত্মক ডাকনাম পেয়েছিলেন। এখন ধনবান্ অনেক আছেন, কিন্তু তাঁদের মধ্যে-বড়মানুষ বেশী দেখা যায় না; তখনকার ধনীদের মেজাজ প্রায়-ই বড় হ'ত, তাই বড়মানুষ বলে-ই সঙ্গে সঙ্গে ধনী বোঝাত। যার নিজের ঘরে নোয়ার সিন্দুকের ওপর নোয়ার সিন্দুক বোঝাই টাকা আছে, সে মোলো কি বাঁচলো, তাতে লোকের বড় এসে যেতো না, কিন্তু মধ্যবিত্ত গরীব ও গেরস্তরা বড়-মানুষকে ভয় করত, ভালবাস্তো, তাঁদের সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী হ'তো। তখন টাকা শুধু জমাতে জানলে-ই সুখ্যাতি হোতো না, সঙ্গে সঙ্গে টাকা ছড়াতে পারলে-ই তবে নাম বেরুতো। এখন অনেক বড়মানুষকে দুঃখ করতে শুনেছি যে, তাঁরা বলেন, তাঁদের আর লোকে বড় গ্রাহ্য করে না। কেন করবে বাপু? তোমার টাকায় তোমার নিজের ছাড়া কার কি উপকার হয়? তুমি বিশ হাজার টাকা দিয়ে প্রকাণ্ড মোটার কিন্‌লে, আমার ধোবা দয়া কোরে আড়াই মাস পরে এসেছেন, সবে ধোপদস্ত কাপড়-খানি পোরে বেরিয়েছি আর শোফার দিয়ে গেলেন জামার উপর কতকটা কাদা ছিটিয়ে, এতে আমার প্রাণ তোমার জন্য প্রেমে ডগমগ হয়ে উঠবে কি কোরে? কাগজে দেখতে পাই, তুমি মাঝে মাঝে দান কর বটে; কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব ব'লে গেছেন, 'নামে রুচি জীবে দয়া' আর এখন হয়েছে 'নামে দয়া জীবে রুচি'; বাবুদের ভোজ্য-পাত্রে বহু জীবের অধিষ্ঠান ও কাগজে নাম বেরুবে বোলে দান। কালী সিঙ্গী একটা সত্যি বড়মানুষ ছিলেন; বড়মানুষী দান, বড়-মানুষী শাসন, বড়মানুষী শিষ্টাচার, বড়মানুষী দুষ্টুমী, বড়-মানুষী মহাভারত, বড়মানুষী হুতোম প্যাঁচা।

টেঁকচাঁদ ঠাকুরের 'আলালের ঘরের দুলাল' আর 'হুতোমপ্যাঁচার নক্সা' এই দু'খানি সরস গদ্য গ্রন্থ সেই সময় অনেক বাঙ্গালী অ-পাঠককে ও পাঠক ক'রে ছাড়িয়েছিল। টেঁকচাঁদ ঠাকুর হচ্ছেন প্যারীচাঁদ মিত্র আর হুতোমপ্যাঁচা কালীপ্রসন্ন সিংহ। অধুনা বিস্তৃত বাঙ্গালার সহজ সাহিত্য-রাজ্যের রোমুলাস্ রিমাস্ ছিলেন ঐ দুই মহাপুরুষ। আজ বাঙ্গালী ঔপন্যাসিক হিউগো, টলষ্টয়, আনাটোল ফ্রান্স, ভল্টেয়র, অস্কার ওয়াইল্ড, মারী করালি, আর-ও কত কি বলছেন, তা' ছাড়া মোপাসা ত ঘরে ঘরে। কিন্তু প্যারী-চরণ মিত্র কি কালী সিঙ্গীর নাম কোরে একবার মাথা নুইয়ে শ্রীদুর্গা কাঁদতে তো কাকে-ও বড় দেখি না। কিন্তু এই দেশে-ই আজ-ও পিতৃশ্রাদ্ধে বসতে হ'লে ব্যাসদেব ও অষ্টাদশ পুরাণকে আগে প্রণাম ক'রে তবে ক্রিয়া আরম্ভ করতে হয়। যখন বাঙ্গালীর সংসারে ও সমাজে দেবতার প্রতি ভক্তির আধিপত্য ছিল, তখন গ্রন্থারম্ভে গণেশ-বন্দনা, সরস্বতী-বন্দনা, গুরু-বন্দনাদি লিখিত হোত; আর এখন সেই বাঙ্গালীর সংসারে সমাজে অর্থশক্তির-ই একাধিপত্য, তাই ইন্‌সপেক্টার-স্তোত্র লিখে স্কুল-পাঠ্য পুস্তকের মঙ্গলাচরণ করতে হয়।

টেঁকচাঁদ ঠাকুর ও সিংহ-মহাশয় সম্বন্ধে অন্যত্র একটা বিস্তৃত আলোচনা করবার ইচ্ছা আছে, ফল কত দূর হয় বলতে পারি না।

কিন্তু এ ক্ষেত্রে সিংহ-মহোদয় বিদ্রূপ-ই করুন বা কৃতিত্ব-ই দেখান, স'বাজারের রাজবাড়ীর পূজা এক সময়ে কলিকাতায় একটা সর্ব্বসাধারণের উৎসব ব'লে গণ্য হ'তো। তিন দিন ধ'রে রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীটে যে বিপুল

জনতা হ'তো, তাতে কলিকাতাবাসীর সঙ্গে অনেক দেশান্তরাগত লোক-ও যোগ দিত। উৎকৃষ্ট বাইনাচ ছাড়া কলিকাতায় সে সময়ে দেশী বা বিলাতী কোন রকম নতুন আমোদের আমদানী হ'লে রাজারা সর্ব্বসাধারণের উপভোগের জন্য উহা আপনাদের উৎসবপ্রাঙ্গণে প্রদর্শন করাতেন।

৬

কলিকাতায় বাঙ্গালীর মধ্যে যে জিমন্যাষ্টিকের প্রথম প্রবর্ত্তন হয়, তার সঙ্গে রাজবাড়ীর দুর্গোৎসবের নিকট-সম্বন্ধ আছে; ঘটনাটা একটু পরের হ'লে-ও খবরটা এইখানে ই দিয়ে রাখি।

শুনতেম যে, প্রাচীন হিন্দু-কলেজে নাকি একবার জিমন্যাষ্টিক শেখাবার বন্দোবস্ত হয়েছিল, কিন্তু কাগজে-কলমে তার বিবরণ আমার চোখে কখন-ও পড়েনি বা সেখানে শিক্ষিত কোন ব্যায়াম-বিদের নাম-ও কখন-ও শুনিনি।

১৮৬৭ কি ৬৮ ঠিক স্মরণ হচ্ছে না, ঐ সময় সভাবাজারের রাজাদিগের দক্ষিণদিকের বাড়ীর পূজাপ্রাঙ্গণে আমরা প্রথম বিলাতী জিমন্যাষ্টিক দেখি। পিটার নামক এক জন ফিরিঙ্গী ছিলেন সেই দলের অধিকারী ও নায়ক। ডবল ট্রাপেজ, রিং, হরাইজণ্টালবার ও গ্রাউণ্ড এক্সারসাইজ দ্বারা পিটারের দল কেবলমাত্র আমাদের চমকিত ও বিস্মিত ক'রে বিবিধ কৌশলপ্রদর্শন করেনি, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মত অনেক কিশোর ও যুবা দর্শকের চিত্ত ঐ সকল ব্যায়ামক্রীড়া শিক্ষা করবার জন্য উৎসাহ ও আগ্রহে পূর্ণ করেছিল। স্বর্গীয় নবগোপাল মিত্র ছিলেন দর্শকের মধ্যে এক জন, তাঁর তখন পরিপুষ্ট যৌবন, বয়সে আমাদের চেয়ে দশ বারো বৎসরের বড়। এখনকার স্বদেশহিতৈষীরা পেট্রিয়টিক হাইকোর্টের এডভোকেট জেনারল, ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সিল, কিন্তু নবগোপাল মিত্র ছিলেন এক জন মোক্তার, সেই জন্য এখন অনেকে তাঁর নাম পর্য্যন্ত ভুলে গেছেন। কিন্তু তিনি-ই প্রথমে এ দেশে "ন্যাশনাল" কথাটি প্রচার করেন। ঐ চতুরক্ষর বীজমন্ত্র তিনি প্রথম বাঙ্গালীকে দেন ব'লে লোক তাঁকে 'ন্যাশনাল নবগোপাল' বোলতো; তাঁর একখানি সাপ্তাহিক কাগজ ছিল, যার নাম 'ন্যাশনাল পেপার'; আইনের প্রতাপে চড়কের পার্ব্বণ মন্দা পড়ায় ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে বেলগেছের ডন্‌কিন্ সাহেবের বাগানে তিনি একটি 'চৈত্র-মেলা' প্রতিষ্ঠা করেন, যার নাম হয় ন্যাশনাল মেলা; তাঁর দেশহিতকর সকল কার্য্যের প্রধান সহায় ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁহার মানব-মুখোজ্জ্বল ভ্রাতৃ-ভ্রাতুষ্পুত্রগণ; রবিবাবু তখন অতি শিশু। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে যখন আমরা প্রথম সাধারণ নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ করি, তখন ঐ নবগোপালবাবুর উপদেশে-ই আমরা উহার নাম দিই ন্যাশনাল থিয়েটার।

রাজার বাড়ীর জিমন্যাষ্টিক দেখেই নবগোপালবাবুর মনে বাঙ্গালীর ছেলেদের জিমন্যাষ্টিক শেখাবার বন্দোবস্ত কর্‌বার প্রবল ইচ্ছা জাগরিত হ'ল; চোরবাগানের একটা ছোটখাট স্কুলবাড়ীর উঠানে তিনি সরঞ্জমাদি যোগাড় ক'রে একটি ফ্রি জিমন্যাষ্টিক স্কুল খুললেন; সপ্তাহে তিন দিন এসে শেখাবার জন্য চল্লিশ টাকা মাস-মাহিনায় পিটার শিক্ষক নিযুক্ত হ'ল; ঐ বিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রদের মধ্যে আমি-ও এক জন ছিলাম। সেকালের বিখ্যাত জিমন্যাষ্ট আহিরীটোলার অখিলচন্দ্র ও ঐ বিদ্যালয়ের ছাত্র, এই অখিলবাবুর নাম আমি পূর্ব্বে এক যায়গায় উল্লেখ ক'রে গেছি।

আমাদের ত গোড়ায় পিটারকে আনতে হয়েছিল, কিন্তু তার চেয়ে বেশী কৃতিত্ব দেখিয়েছিল বাগবাজারের শ্যাম ঘোষ; শ্যামাচরণ আমার শৈশবের সহপাঠী ও বন্ধু, শ্যাম ও আমার অপর বাল্যবন্ধু রাধাগোবিন্দ কর রাজার বাড়ী জিমন্যাষ্টিক দেখবার পরেই ডাক্তার আর, জি, করের পিতৃভবনে ডাক্তার দুর্গাদাস করের বাটীতে জিমন্যাষ্টিকের আখড়া খোলেন। ও আখড়ায় আমি-ও গেতেম। দুর্গাদাসবাবু তখন জীবিত ছিলেন, তিনি স্বর্গীয় ইঞ্জিনিয়ার নীলমণি মিত্র ও স্বর্গীয় বাবু গোপাললাল মিত্র আমাদের পল্লী-বালকগণকে পুত্রবৎ স্নেহ কর্‌তেন, তাঁরা নিজে দাঁড়িয়ে ব্যায়ামশিক্ষায় উৎসাহ প্রদান কর্‌তেন। এখনকার বাপের পক্ষে এ কথাটা কিছু-ই নয়, কিন্তু তখনকার বাবা আর এখনকার বাবা—ও বাবাঃ! •

লেফটেনাণ্ট গবর্ণর সার জন ক্যাম্বেলের মাথায় ঢুকলো যে, শিক্ষিত বাঙ্গালীর জন্য এমন একটা সার্ভিস তৈরী কর্‌তে হবে, যাতে এক এক জন এক একটা

বিদ্যাকল্পদ্রুম হ'তে পারে। সাধারণ কেতাবি বিদ্যে ত থাকবে-ই, তার ওপর একটু কেমিষ্ট্রী, একটু বোটানি, সার্ভেয়িং, জিমন্যাষ্টিক, সাঁতার ইত্যাদি ইত্যাদি। সুরসিক শিশিরবাবু ক্যাম্বেলি সঙ্কল্পকে রহস্য কোরে তাঁর অমৃত-বাজারে একটি কার্টুন ছাপান, জিমন্যাষ্টিকের পোষাক-পরা, কোমরে একটি পেছন দিকে ঝোলান শিকলি আর কানে একটি চিমটে (চিমটেটা হচ্ছে কম্পাস) নীচের লেখা ছিল ;—

'কানে চিমটে কোমরে শিকলি—
হুজুরের মনোমত ডেপুটি।'

প্রথম ছত্রের শেষটুকু ভুলে গিয়েছি।

ঐ কার্টুন দেখে-ই ও শিশিরবাবুর ইঙ্গিতে আমি এক নক্সা লিখি, জোড়াসাঁকোর সান্ন্যাল-বাড়ীতে তার অভিনয় হয় ; শ্মশ্রুবিহীন ছোকরা আমি, তা'তে প্রফেসর আর বড় বড় দাড়ীগোঁফপরা হিঁদু-মুসলমান ছাত্র, পরিচ্ছদ শিশিরবাবুর কার্টুনের অনুরূপে কানে চিম্‌টে কোমরে শিকলি, খালি প্রফেসরের পেণ্ট্‌লেন চাপকান। কচুপাতা কেটে খণ্ড খণ্ড ক'রে বুঝিয়ে দিতুম, যত-ই খণ্ড খণ্ড করিয়াছি, তত-ই কচুপাতা হচ্ছে,একখানা-ও কলাপাতা হচ্ছে না, দেখ বোটানির কি আশ্চর্য্য মহিমা! দেশলাই জ্বেলে কেমিষ্ট্রির আশ্চর্য্য শক্তি দেখিয়ে বল্‌তুম যে, দেখ, দেশী আগুনের চেয়ে বিলিতী আগুনের ভিতর কি গুপ্ত তেজ, তোমরা হাকিম হয়ে মফঃস্বলে গিয়ে সবাইকে বুঝিয়ে দেবে, যেন সকলে বিলিতী আগুন ঘরে ঘরে রাখে ; জমীতেই সাঁতার শেখবার কসরত হ'ত, আর আমি নানা-রকম সেলামের উপর এক লম্বা লেক্‌চার ঝাড়তুম। ঐ মডেল স্কুলে "নক্সাই" বোধ হয় আমার ষ্টেজে লেখার প্রথম হাতে খড়ি ; আর-ও নানা বিষয়ে ও রকম ৮।১০ খানা নক্সা নিজে একা বা গিরিশবাবুর সাহায্যে সে সময়ে বা তার কিছু পরে লেখা হয়েছিল ; ২।১ খানা বোধ হয় গিরিশ-গ্রন্থাবলীতে স্থান পেয়েছে, আর সব কোথায় গিয়েছে। গিরিশবাবু-ও জানতেন না,আমি-ও জানতুম না বা কেউ-ই জানত না যে, থিয়েটার কালে একটা প্রকাণ্ড উৎপাত হয়ে দাঁড়াবে, আর আমরা আবার নাট্যকার হব, সুতরাং দলিলপত্র সব যত্ন ক'রে রাখা উচিত। অবিনাশ বেচারা ছিল, তাই কুড়িয়ে বাড়িয়ে খুঁজে পেতে গিরিশ বাবুর কত অমূল্য ধন আজ সাধারণের আনন্দবিধানের জন্য দিতে পেরেছে।

ন্যাশানাল বা চৈত্র-মেলাতেই প্রথমে "মিলে সবে ভারত-সন্তান" প্রভৃতি উদ্দীপনাপূর্ণ কবিতা পঠিত হয়, ঐ মেলাতে-ই প্রথম নারী-শিল্প প্রদর্শিত হয়, কৃষি-প্রদর্শনী-ও ছিল। ঐ মেলাতে-ই বাঙ্গালী বালকের বিলাতী জিমন্যাষ্টিক, আর ঐ মেলাতে-ই বর্দ্ধমানের রায়বেঁশেদের অদ্ভুত ব্যায়াম দেখা গিয়েছে। আহা, সেই জিনিষ আমি-ও আর দেখব না ; বাঙ্গালী ছোকরারা তোম-রা ও কখন দেখতে পেলে না! Give a dog a bad name and hang it, ডাকাত নাম দিয়ে বাঙ্গালা তাদের চিরবিদায় দিয়েছে! কিন্তু সত্য কথা বল্‌তে হবে, আমি স্বচক্ষে দেখেছি, সার জর্জ্জ ক্যাম্বেল স্বয়ং সেই মেলাতে ব'সে সেই খেলোয়াড়দের শুধু যে তারিফ করেছেন—তা নয়, তাদের আদরে আপ্যায়িত ও পুরস্কৃত-ও করেছেন। বাঙ্গালী যে শক্তিমান্ হয়, সাহসী হয়, সাধারণতঃ সাহেবের এ ইচ্ছা নয়, সেটা আমি লাঠী খেলা বন্ধ, বাণ ফোঁড়া বন্ধ, একজামিনের পড়া মুখস্থ, এই রকম নানা নিদর্শন দেখে বুঝেছি ; সেই জন্য-ই ক্রিকেট খেলা ফুটবল খেলা হকি খেলা ঐ সব সরঞ্জাম বিক্রেতাদের পক্ষে যতটা হিতকর, আমাদের যুবকদের পক্ষে ততটা হিতকর কি না, আমার বরাবর সন্দেহ আছে ; ওঁরা আমাদের ইঙ্গিতে শেখান মল্ল-বিদ্যাধমাধম, আর নিজেরা প্রয়োগে দেখান মল্ল-বিদ্যা দমাদ্দম্! কিন্তু সার জর্জ্জের ঘাড়ে কি দুষ্ট সরস্বতী চেপেছিল যে, সাধারণতঃ বিশেষ হিতৈষী না হ'লে-ও বাঙ্গালী পীলে রোগাটা থাকে, সেটা তাঁর ইচ্ছা ছিল না। তিনি-ই প্রথমে শ্যাম ঘোষকে চুঁচুড়া কলেজে জিমন্যাষ্টিক টিচার নিযুক্ত করেন ; পরে তাঁর-ই আদেশে কলিকাতা ও মফঃস্বলে বহু জিমন্যাষ্টিক টিচার নিযুক্ত হয়েন। ঐ শ্যাম ঘোষের-ই পুত্র এন, ঘোষ বিলেত গিয়ে সার্টিফিকেট পেয়ে এখন-বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের শিক্ষাবিভাগে ফিজিকেল ট্রেণিংএর এক জন প্রধান কর্ম্মচারী।

একে পুরাতন পঞ্জিকা, তায় বোধ হয়, "বসুমতী আফিসের" দপ্তরী সাহেবের নানা মিয়ার হাতের বাঁধাই, সুতরাং কোথাকার পাতা কোথায় যে গেছে, তার ঠিক নেই ; সুতরাং পূজো থেকে আশ্বিনে ঝড়, ঝড় থেকে

শেলারের উৎপাত, কোথায় কালী সিঙ্গীর কথা, কোথায় টেঁকচাঁদ ঠাকুরের কথা, কোথায় বাইনাচ, কোথায় জিম্‌ন্যাষ্টিক, কোথায় নৈবিদ্যি, কোথায় মেঠাই মতিচুর, কোথায় চৈত্র-মেলা, কোথায় ন্যাশানাল থিয়েটার কি যে গোলমাল হচ্ছে, কিছুর-ই ঠিক নেই; তবে নদেরচাঁদের কথায় বলি, আসলে কম না পড়লেই হ'ল।

৭

স'বাজারের রাজারা হচ্ছেন স্থতোমুটীর জমীদার; বাগবাজার থেকে মেছোবাজার সিঁদুরেপটী পর্য্যন্ত অনেকটা স্থান-ই স্থতোমুটীভুক্ত; তবে এক সময়ে এঁরা অনেক ভাল ভাল লোককে এনে এখানে জমী দিয়ে বাস করিয়েছিলেন, সেই জন্য আর অতুল ঐশ্বর্য্যের সময় সালিয়ানা ১॥০, ১৸০ খাজনা গ্রাহ্যের মধ্যে-ই আসত না, তাই আদায়-ও হ'ত না, সেই তামাদিতে স্থতোমুটীর সীমানার মধ্যে অনেক পাকাবাটী লাখরাজ; তবু এখন-ও এমন বড়-মানুষ বা গৃহস্থ আছেন, যাঁদের রাজাদের কিছু কিছু খাজনা দিতে হয়। এই জমীদারী প্রিভিলেজ রক্ষার জন্য রাজ-বাড়ী সন্ধিপূজা আরম্ভ হ'লে একটা তোপ হ'ত, তবে এ অঞ্চলের অন্যান্য বাড়ীতে সন্ধিপূজা আরম্ভ হ'ত। ওঁদের বিজয়ার আগে কারুর প্রতিমা বার করবার যো নাই, সেই জন্য-ই অপরাহ্ণ ৭টা বাজতে-ই রাজাদের ঠাকুর বিজয়ার দিন রাস্তায় বার করা হয়; অবশ্য ব্রাহ্মণ-বাড়ীর প্রতিমা প্রায়-ই সকালে নিরঞ্জন করা হয়, যখন চক্র ছিল, তখন-ও সে জন্য ফোঁস্-ফাঁস্ শুনতে পাওয়া যেত না। বিজয়ার দিন বেলা ৩টা থেকে-ই রাস্তায় ভিড় আরম্ভ হ'ত। কোর মাথান ধুতি, গায়ে ছিটের পিরাণ, মাথায় জরির তাজ, কার-ও বা রং করা রেশমের পায়জামা, গোটা লাগান ফুলকাটা রেশমী চাপকান, মাথায় যাত্রার দলের ছেলেদের মত সামনেটা একটু জরির কায করা মুকুটের মত উঁচু করা টুপি ছেলের দল সঙ্গে, নীলাম্বরী শাড়ী, শালুর পাড় বসান শাড়ী, সেপাই পেড়ে শাড়ী, কলমার শাড়ী, জন্ম-এয়োস্ত্রী ডুরে পরা, রূপোর বালা, রূপোর পঁইচে, রূপোর তাবিজ, সোনার হার, সোনার মাকড়ীপরা মেয়েরা সব বিসর্জ্জন দেখতে বেরিয়েছে; নিম্নস্তরের মধ্য-বিত্ত শ্রেণীর পুরুষদের বাবুয়ানা পোষাকে তখন-ও চওড়া-পেড়ে কোঁচানো ধুতির উপর জামদানের হাফ চাপকান, জরিপাড় চাদর লম্বা কুঁচিয়ে বুকের উপর ঢেরাকেটে ঝোলান, মাথায় সোজা সীঁথে, বাবরী চুল, দাঁতে মিসি দেখা যেত, লোক চলেছে সব বিসর্জ্জন দেখতে, চিৎপুর রোডের উপর ভিড়, বাজারের ছাতে, চকের ছাতে, রকে বারান্দায় যেখানে যত লোক ধরে, মেয়ে-মদ্দ সব দাঁড়িয়ে গেছে। 'চানাচুর' 'সখের জলপান' 'সাড়ে আঠার ভাজা' 'নান খাত্তাই' 'চীনের বাদাম' 'গোলাপী খিলি' দেদার বিক্রী হচ্ছে; রঙিন কাগজের ফুল, পাটের রোঁয়া তুড়ুক লাগান বাঁদর, বাঁশের বাঁশী, সোলার পাখী, টিনের ঘূরণ চাকা, মাটীর টেম্‌টেমী, বাঁশের বেহালা প্রভৃতি খেলনা পেয়ে ছেলেমেয়েরা আহ্লাদে আটখানা।

বাড়ীর এক জন প্রবীণ আত্মীয়ের সঙ্গে বিসর্জ্জন দেখতে গিয়ে আমরা পায় পায় প্রায় বটতলার কাছাকাছি অবধি গিয়েছি, এমন সময় এক জন পটওয়ালা দেখে আমার একখানা নব-নারীকুঞ্জরের পট কেনবার সাধ হ'ল। সঙ্গের অভিভাবককে বলাতে তিনি পটওয়ালাকে হাত নেড়ে ডাকলেন, সে সামনে আসতেই আমাদের অভি-ভাবক বললেন,—"এ কি, গুরুচরণ যে, তুমি পট-ও বেচ না কি?" আমাদের সেই পূর্ব্ব পরিচিত ঘটিতোলা গুরুচরণ একটু হেসে উত্তর দিলে,—"কলকাতায় বাসা ক'রে থাকতে হবে, দেশেও মাঝে মাঝে কিছু খরচ পাঠাতে হয়, তা কেবল সকালের মেহনতে চলবে কেন বোসজা মশাই; তাই দুপুরবেলা গোটাকতক বালাণ্ডা মাদুর মাথায় ক'রে ঘুরে বেড়াই, বিকেলে এই পট ফেরি করি, আর সন্ধ্যার পর গ্রীষ্মকালে কুলপি বরফটা আসটা বিক্রী করি; যখন যাতে যা হয়।" আমাদের অভিভাবক বললেন,—"বেশ বেশ, এই রকম মেহনত-ই ত চাই।" ইচ্ছা ছিল দু' পয়সায় একখানা পট কেনবার, গুরুচরণকে পেট্রনাইজ করবার জন্য চার পয়সা দিয়ে দু' দু'খানা পট কিনে ফেললুম। তখন রাম-রাবণের যুদ্ধ, অশোকবনে সীতা, কালীয় দমন, নবনারীকুঞ্জর, কদমতলায় রাধাকৃষ্ণ এই রকম নানা পৌরাণিক ছবি বটতলায় লিথোগ্রাফে ছাপা হ'ত। কতক কতক ছবিতে আবার রং দেওয়া-ও হ'ত; গরীব লোকরা সেই সব ছবি কিনে আপনাদের ঘরের দেয়ালে আটা দিয়ে লাগিয়ে রাখত, কেউ কেউ বা বাঁধিয়ে-ও রাখত; গৃহস্থ-বাড়ীতে-ও সে সব ছবি রাখা

নিন্দার কথা ছিল না। অনেক গরীব গৃহস্থের মেয়েরা সেই ছবিতে ঘরে ব'সে রং দিতেন ও দ'দরে কিছু কিছু পেতেন। এই কলকাতার তখন অনেক গরীব গৃহস্থ ঘরের বিধবা এবং সধবাও ঐ রকম ছবিতে রং দিয়ে,ঠাকুরের সাজের জন্য কাঠের মালায় বাদলা জরি জড়িয়ে, ডাল বেছে দিয়ে, কচুরীর জন্য ডাল বেটে দিয়ে, চরকা কেটে, ফুলশয্যাদির তত্ত্বের জন্য বাহারে সুপারি কেটে, খয়েরের গহনা, খয়েরের ফুল, খয়েরের বাগান গ'ড়ে, চন্দ্রপুলি, ক্ষীরের ছাঁচ, ক্ষীরের নিচু, জামরুল, জাম এই সব তয়ের ক'রে দিয়ে আপনাদের সংসারের সুসার করতেন।

আয়েষার রূপবর্ণনাচ্ছলে বটতলার সরস্বতীকে আহ্বান ক'রে বঙ্কিমবাবু একটু বিদ্রূপ করার পর থেকে অনেক সাহিত্য-ঘোড়সোয়ার বটতলার নামে নাক সিটকে থাকেন। বলি, ও ঠাকুর! কোথায় থাকত তোমার বাঙ্গালা বিদ্যা, বাঙ্গালা সাহিত্য, বাঙ্গালা ভাষা, বাঙ্গালা ধর্ম্ম, বাঙ্গালা পুণ্য, বাঙ্গালা গদ্য-পদ্য যদি না চোদ্দ আনায় বিকুতো বটতলার বাঙ্গালা মহাভারত বাঙ্গালা রামায়ণ! আর বটতলা কি মরেছে? বটতলা-ও মরেনি,বটতলার কবি-ও মরেনি! এখন একটু দামী কাগজে চক্‌চকে বাঁধাইয়ে আর "নিঝুম নিঝুম রেতে চাঁদিনী মেখে" "স্ফুরিত অধরে চুম্বন মুদ্রিত ক'রে" "চায়ের সরঞ্জাম হাতে" "ঝড়ের মত বেগে" বটতলা বাগবাজার থেকে আরম্ভ ক'রে বৌবাজার পর্য্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে, এই পর্য্যন্ত।

রামায়ণ, মহাভারত, কবিকঙ্কণ চণ্ডী, ভারতচন্দ্র, মনসার ভাসান, মৎস্যপুরাণ, বরাহপুরাণ এই রকম আর-ও কত পুরাণ, বৈষ্ণবগ্রন্থ, বাঙ্গালা আইনের বই এ সমস্ত বটতলায় ছাপা হত-ই, তার পর আমি যে সময়ের কথা বলতে আরম্ভ করেছি, সেই সময় একটা নতুন 'বটতলা-সাহিত্য' দেখা দেয়। যদি এক পয়সা দিয়ে এক সরা সখের জলপান কিনে "ছি ছি, এ ঠাকুরদের দেওয়া চলবে না" কি "পিঠের মতন পোষ্টাই নয়" বা "পেস্তার মত সুস্বাদু নয়" ব'লে ছুড়ে ফেলে দেওয়া যুক্তিসঙ্গত মনে করেন, তবে সে বটতলা-সাহিত্য সত্য সত্যই আঁস্তাকুড়ে ফেলবার উপযুক্ত। কিন্তু সেই যে গদ্যে পদ্যে মিশ্রিত বা শুধু পদ্যে "কি মজার শনিবার" "কি মজার রবিবার" "কি দুঃখের সোমবার" "ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ" "অপমান সইতে নারি" প্রভৃতি চটি বই যা ১ পয়সা বা ২ পয়সা ক'রে বিক্রী হ'ত, তার একখানি পাবার জন্য আমি আজ ৩০ বচ্ছর ধ'রে হয়রাণ হয়েছি; আমি গরীব, তবু সেই "কি মজার শনিবার" টনিবার পেলে এক একখানা বইয়ে ১ টাকা বা ২ টাকা দিতে রাজি আছি। সে বায়রণ নয়, ব্রাউনি নয়, সেলি নয়, সুইফট নয়, হেম নবীন রবীন্দ্র সত্যেন্দ্র নয়, কিন্তু সেই সব বইয়ে একটা ভাষা ভাব ছন্দঃ রস ছিল যা তার নিজস্ব; যেমন এই একটু আগে বললুম, পেস্তার মিষ্টতা সখের জলপানে নাই বটে, কিন্তু বর্ষার বৈকালে বাদাম পেস্তা ও গরম গরম সখের জলপানের মত মুখরোচক হয় না। আমার কতকটা জানা আছে যে, তখনকার অনেক উচ্চশিক্ষিত ভদ্রলোক-ও নাম গোপন রেখে সখ ক'রে ঐ রকম এক একখান বই বটতলার পাবলিসারদের লিখে দিতেন। তবে এখন ও যেমন হচ্ছে,তখন-ও তেমনই, অক্ষম অনুকরণকারীরা জিরেন কাঠের খেজুর-রসে ধুতুরার বীচি মিশিয়ে তাড়ি ক'রে ফেলে,সেইরূপ গ্রাম্য রসিকতার ভিতর কুৎসিত উলঙ্গ অশ্লীলতার অবতারণা ক'রে একটা বেশ মুখরোচক জিনিষ একেবারে নষ্ট ক'রে দিলে। আজ বছর ৩০।৩৫ আগে কলকাতার একটা ফিরিওয়ালা সাড়ে আঠার ভাজার উপর সুর চড়াতে গিয়ে সাড়ে বত্রিশ ভাজা ব'লে হেঁকে বেরুতে আরম্ভ করলে। দেখাদেখি আরও দু'চার জন বেরুল:— আঃ রাম রাম! সে একেবারে হাটখোলার ধুলো ঝাঁট দেওয়া হাঁটকা, মুখে বালি কাঁকর যা ইচ্ছে তাই ঢুকে গেল, শেষ অত কালের সখের 'সখের জলপানটা' একেবারে উঠে গিয়ে এলেন কি না পাঁটার (কি না কুকুরের নাড়ী সিদ্ধর) ঘুঘনিদানা আর অবাক্ জলপান।

* * * *

বিজয়া দশমীর দিন রাত ১০টা পর্য্যন্ত কলকাতা বেশ সজাগ ছিল, কিন্তু তার পর সহরটা যেন নিবে গেল। সন্ধ্যার পর থেকে রাত প্রায় ১০টা পর্য্যন্ত খুড়তুতো ভাই মামাতো ভাই পিস্‌তুতো ভাই বাড়ীর জামাই ভাগনে অন্য আত্মীয়কুটুম্ব স্বজন প্রতিবেশী ক্রমাগত আসা-যাওয়া নমস্কার কোলাকুলি মিষ্টিমুখকরা চললো, তার পর বাড়ীর লোকের কাছে নিজের নিজের বাড়ী যেন অন্ধকার আর পুজোবাড়ীর দালান পানে চাইলে মনে হয় যেন খেতে আসছে। বড় রাস্তার গ্যাস সে দিন মিটি মিটি ক'রে জলছে, গলির রাস্তার

তেলের আলো দেশলাই ধরিয়ে দেখতে হয় জলছে কি না। কিন্তু এই বিজয়ায়, আজকের-ও এই বিজয়ায় সকল বয়সের সকল অবস্থার বাঙ্গালীর মনে কি এক জগতের সমস্ত জীবের প্রতি সহানুভূতির পবিত্র ভাব উদয় হয়; যারা বিদ্বেষের বশে এক বৎসর ধ'রে মুখ দেখাদেখি করেনি, তারা-ও পরস্পরে নমস্কার-আশীর্ব্বাদের পর কোলাকুলি ক'রে চোখের জল ফেলে। কিন্তু আশঙ্কা হয়, বুঝি এই বিদ্বেষ-বিজয়কারিণী মধুর-মিলনের জয়ভেরীনাদিনী বিজয়ার-ও বিজয়া হয়।

৮

ভাবতেম, বুঝি রেলের কনসেসনের প্রলোভনেই পঞ্চমীর প্রভাতে বাড়ীছাড়া ক'রে প্রবাসের প্রমোদের পানে টেনে নিয়ে যায়; ভাবতেম, বুঝি টেলিগ্রাফের তার-ই ওয়াল্‌টেয়ার থেকে কলকেতায় মায়ের পায়ে বিজয়ার প্রণাম পাঠাবার সুবিধা ক'রে দিয়েছে;—কিন্তু এখন দেখছি, তা নয়।

আসল কথা, ভদ্রাসন থেকে ভদ্রলোকের সমাগম উঠে গেছে, বৈঠখানার দরজার চাবি খুলে এখন ডাক্তার এলে এক আধবার তাঁকে বসান হয় মাত্র। সর্ব্বজগতের এক প্রান্ত হ'তে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত "স্ত্রী-স্বাধীনতা" "স্ত্রী-স্বাধীনতা" ধ্বনি ধ্বনিত হচ্ছে, নারীর অধিকার-বিস্তারের ব্যবস্থা নিয়ে নিত্য নূতন লেখা ও বাক্যের সৃষ্টি হচ্ছে, কিন্তু পুরুষ, দেখতে পাচ্ছ কি, তোমার আপনার স্বাধীনতা ক্রমে রাহুগ্রস্ত?

[ক্রমশঃ।

শ্রীঅমৃতলাল বসু।

সামঞ্জস্য



বৃদ্ধস্বামী (তৃতীয় পক্ষের গৃহিণীর প্রতি)—

বলি, ওগো—ঘরে বড় গরম, চল একটু বারান্দায় ব'সে প্রেমালাপ করি।

গৃহিণী—তোমার কি বুদ্ধি-সুদ্ধি সব গেছে? এই একাদশীর দিন বিধবা মেয়েটা নিরম্বু উপোস ক'রে আগুনতাতে গেল দেখে আমার বুকটা ফেটে যাচ্ছে।

স্বামী—ওঃ, তাই। সে জন্যে ভেব না। ও ওর অদেষ্ট। তোমার আমার ত অমন হয় নি।

সিংহের ল্যাজ

১

বন্ধুরা তাহার নাম দিয়াছিল—সিংহের ল্যাজ। পশুরাজের লাঙ্গুলের সহিত দীনবন্ধুর কোন সাদৃশ্য ছিল কি না, ইতিহাসে তাহার উল্লেখ নাই; তবে বন্ধুগণ তাহার অগোচরে এই উপাধির উল্লেখ করিয়া যে পরমানন্দ লাভ করিত, তাহাতে সন্দেহ নাই।

মাইনর পরীক্ষায় কোনরূপে উত্তীর্ণ হইবার পর দীনবন্ধু সেকালের প্রবেশিকা পর্য্যন্ত পড়িয়াছিল। কিন্তু গণিত শাস্ত্রের সহিত চির অপ্রণয়হেতু দীনবন্ধু প্রবেশিকার দ্বারদেশে হোঁচট খাইয়া পড়িয়া গিয়াছিল। ইহাতে উদ্যমহীন না হইয়া সে সংস্কৃত সাহিত্যের মন্দিরে অর্ঘ্য লইয়া উপস্থিত হইয়াছিল। কালিদাস ও ভবভূতির নাটক ও কাব্যের কোন কোন অংশ অনেক সময় আবৃত্তি করিয়া সে বন্ধুবর্গকে শুনাইত। বিশেষতঃ বাঁধান উত্তররামচরিতখানা প্রায়ই তাহার হাতে দেখা যাইত। উহার পৃষ্ঠদেশে সোনার জলে ছাপান "ভবভূতিবিভূতিবিভোর দীনবন্ধু" এই অংশটুকু পাঠ করিলে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি তাহার অনুরাগের পরিচয় সম্বন্ধে কোনও সন্দেহেরই অবকাশ থাকিতে পারে না।

সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালা কাব্য-সাহিত্যেরও সে অনুরক্ত ভক্ত ছিল। স্বয়ং গদ্য অথবা পদ্য রচনায় কৃতিত্ব দেখাইতে না পারিলেও তাহার রসজ্ঞতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। সে যে সমজদার পাঠক ও কঠোর সমালোচক, সাহিত্যযশঃপ্রার্থী তরুণ বন্ধুবর্গের অনেকেরই মনে এ বিশ্বাস দৃঢ় হইয়াছিল। এজন্য বন্ধু ও সতীর্থ মহলে প্রকৃতই সে বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিল। বাঙ্গালা সাহিত্যের ভক্ত হইলেও সে সাহিত্যসেবী মাত্রকেই শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করিত না। এ জন্যও নবীন সাহিত্যসেবী বন্ধুরা তাহাকে সমধিক শ্রদ্ধা করিত। কেহ কিছু রচনা করিলে দীনবন্ধুকে না শুনাইয়া কোনও সাহিত্যিক বন্ধু তাহা প্রকাশের চেষ্টা করিত না। দীনবন্ধুর নিকট কোনও রচনা সমাদৃত হইলে তাহারা মনে করিত, প্রকৃতই তাহাতে সারভাগ পাওয়া যাইবে।

দীনবন্ধুর আরও একটা বৈশিষ্ট্য ছিল, সে ছোটকে যেমন নগণ্যজ্ঞানে উপেক্ষা করিতে পারিত, বড়র গুণগানে তেমনই পঞ্চমুখ ছিল। বাঙ্গালা সাহিত্যের বাজারে যাহারা সস্তায় কবি বা ঔপন্যাসিক নাম কিনিবার চেষ্টা করিতেছিল, তাহাদের অনেকের রচনায় পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকের রচনার সাদৃশ্য উদ্ধৃত করিয়া সে বন্ধুবর্গকে চমৎকৃত করিয়া দিত। এ জন্য প্রকৃতই বন্ধুগণ তাহার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিত না।

কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার সমালোচনাশক্তি যেমন বাড়িয়া যাইতেছিল, সতীর্থ ও বন্ধুবর্গের সহিত তাহার সংস্রবও তেমনই বিরল হইয়া পড়িতেছিল। দীনবন্ধুর লক্ষ্য সর্ব্বদাই ঊর্দ্ধদেশে ছিল। স্থান অথবা পাত্রপাত্রীবিশেষে সে আশে পাশে অথবা নিম্নে চাহিলেও বন্ধুরা প্রায়ই অভিযোগ করিত, দিন দিন তাহার দৃষ্টি ঊর্দ্ধগামিনী হইতেছে। সম্ভবতঃ সাহিত্যে আভিজাত্যই তাহার আদর্শ ছিল।

কোনও সতীর্থ ও বাল্যবন্ধুর গৃহে সে দীর্ঘকাল যাপন করিয়া বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিল। এই নিখিল বিশ্বে তাহার আপনার জন কেহ ছিল না। ধনী পিতার একমাত্র বংশধর এই বন্ধুটি দীনবন্ধুর যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিত। এ জন্য দীনবন্ধু হরেন্দ্রনাথের অনুগত হইবারই সম্ভাবনা।

উল্লিখিত বন্ধু সাহিত্যক্ষেত্রে কিছু পরিচিত হওয়ায় তাহার সাহায্যে সাহিত্যরসপিপাসু দীনবন্ধু বঙ্গের খ্যাতনামা বহু নবীন ও প্রবীণ সাহিত্যরথীর সহিত পরিচিতও হইয়াছিল। সাংসারিক অন্যান্য বিষয়ে বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে না পারিলেও দীনবন্ধু অল্পদিনের মধ্যে কোনও প্রসিদ্ধ বাগ্মী ও সাহিত্যরথীর বিশেষ ভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। অবসরসময়ে সে বহুক্ষণ তাঁহার বাড়ী কাটাইত, সভাসমিতি—যেখানেই হউক না কেন, বাগ্মিবর যেখানেই যাইতেন, ছায়ার ন্যায় দীনবন্ধু তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিত।

একটা নূতন চাকরী বন্ধুদিগের সাহায্যে যোগাড় হইবার পর সে পূর্ব্ববন্ধুর গৃহ ত্যাগ করিয়া মেসে চলিয়া গিয়াছিল। কারণ, সাহিত্য-মহারথের সহিত সর্ব্বদা মিলা-মিশা করিবার সুযোগ তাহাতে বেশী হইত। বন্ধুবর্গের সমালোচনার হাঙ্গামাও বড় একটা পোহাইতে হইত না।

এই সময় হইতে দীনবন্ধুর ঊর্দ্ধগামিনী দৃষ্টি ক্রমেই স্থিরতা লাভ করিল—কদাচিৎ আশেপাশে নিক্ষিপ্ত হইত।

তাহার ব্যবহারের পার্থক্য এবং তাহার মুখে বাগ্মিবর সাহিত্যিক বন্ধুর উক্তি ও মতের ঘন ঘন প্রতিধ্বনি শুনিয়া কোনও স্পষ্টভাষী দুর্ম্মুখ বন্ধু দীনবন্ধুর নামের শেষে 'সিংহের ল্যাজ' জুড়িয়া দিয়াছিল। এই নূতন উপাধি আবিষ্কারের পর বন্ধুরা দীনবন্ধুর প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে ঐ নামেই তাহাকে অভিহিত করিত। দীনবন্ধু তাহার এই নূতন উপাধি-লাভের সংবাদ জানিত কি না, তাহা প্রকাশ নাই; তবে উপযাচক হইয়া কেহ যে তাহাকে এই সংবাদ জ্ঞাপন করে নাই, তাহা যথার্থ।

দীনবন্ধুর নূতন নাম বা উপাধির ইহাই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

২

আকাশে গাঢ় মেঘের মসিপ্রলেপে অপরাহ্ণের আলোক ম্লান হইয়া গিয়াছিল। ঝটিকা ও বৃষ্টির আসন্ন সম্ভাবনা দেখিয়া পল্লীর গৃহস্থ বধূ ও কন্যারা সম্মুখের পুষ্করিণী হইতে বাসন মাজা, কাপড় কাচা প্রভৃতি কায তাড়াতাড়ি সারিয়া লইতেছিল।

বাল্যবন্ধুর বৈঠকখানাঘরে বহুদিন পরে দীনবন্ধু উপবিষ্ট। তাহার ঊর্দ্ধগামিনী দৃষ্টি আজ কোনমতেই মেঘনম্র আকাশে স্থির থাকিতে পারিতেছিল না। এই ঘরে সে দীর্ঘকাল কাটাইয়াছে। ঐ পুষ্করিণী, তীরবর্ত্তী পল্লীগৃহগুলি তাহার সুপরিচিত। যাহারা ছোট ছিল, আজ তাহাদের দেহ সময়ের রেখাপাতে পুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, সেই কথাই কি তাহার বার বার মনে পড়িতেছিল? অথবা মেঘমেদুর আকাশ দেখিয়া প্রবাসী যক্ষের "আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে" স্মরণ করিয়া তাহার চিত্ত ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল, কিংবা রবীন্দ্রনাথের "তরুণী পথিকললনারা" তাহার চিত্তমাঝে নীপশাখা রচনা করিয়া দোল খাইবার যোগাড় করিতেছিল? যাহাই হউক, আকাশমার্গ ত্যাগ করিয়া পুষ্করিণীর ঘাটে কর্ম্মরতা তরুণীর আন্দোলিত দেহলতিকার প্রতি নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া দীনবন্ধু যে সৌন্দর্য্যের ধ্যানে মগ্ন হইয়া গিয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই।

বাতাসের বেগ প্রবল হইয়া উঠিল। পুষ্করিণীর দক্ষিণ-তীরের পার্শ্বে রাজপথে ধূলির ধ্বজা তুলিয়া বাতাস ছুটিতে আরম্ভ করিল। বারিধারা নামিয়া আসিবার বিলম্ব নাই। এমন সময় রমেশ ও রবীন্দ্র দ্রুতপদে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল।

দীনবন্ধুর মুগ্ধ, অপলক দৃষ্টি তখনও বাতায়নের বাহিরে—পুষ্করিণীর ঘাটে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া ছিল। বহুদিন পরে দীনবন্ধুকে কাছে পাওয়ায় উৎসাহের আতিশয্যে হয় ত বন্ধুযুগল তাহা লক্ষ্য করিতেও পারে নাই।

রমেশ সোৎসাহে বলিয়া উঠিল, "এই যে দীনদা, তুমি এখানে? আমরা তোমাকে খুঁজে খুঁজে হয়রাণ হয়ে গেছি শেষে শুনলাম, দুপুরবেলাই তুমি বেরিয়ে গেছ। হরেন বাড়ী আছে ত?"

দ্বিতীয় বন্ধু রবীন্দ্র বলিল, "তোমাকে এখানে পেয়ে ভালই হ'ল। একটা জরুরী কথা আছে, দীনদা।"

বয়স হিসাবে সে সতীর্থগণের সকলেরই বড় ছিল।

আকাশ কাঁপাইয়া মেঘ কয়েকবার ভীষণরবে ডাকিয়া উঠিল। জোরে বৃষ্টিধারা নামিয়া আসিল। স্রস্ত অঞ্চল গুটাইয়া রমণীরা দ্রুত স্ব স্ব ভবনে আশ্রয় লইতে ছুটিল।

সৌন্দর্য্যের একনিষ্ঠ ভক্ত দীনবন্ধু ঊর্দ্ধপানে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, "ভারী চমৎকার!"

বন্ধুযুগল একবার পরস্পর দৃষ্টিবিনিময় করিয়া লইল। তাহাদের অধরপ্রান্তে মৃদু হাস্যরেখা ক্রীড়া করিয়া গেল।

রমেশ বলিল "কোন্‌টা চমৎকার, দীনদা? প্রকৃতির এই লীলা, না তরুণীর পলায়ন?"

সক্রোধে বন্ধুর প্রতি চাহিয়া দীনবন্ধু বলিল, "ভারী ফাজিল হয়েছিস্ তোরা। কি যে বলিস!"

রবীন্দ্র বলিল, "ওর যেমন কথা, দীনদা। তা তুমি একা ব'সে কেন? হরেন বাড়ী নেই?"

গম্ভীরভাবে দীনবন্ধু বলিল, "আছে বৈ কি, কিন্তু তার আক্কেলটা দেখ। আকাশে মেঘ দেখেই সেই যে সে বাড়ীর ভেতর গেছে, আধঘণ্টার মধ্যে আস্‌বার আর নামটি নেই।"

দীনবন্ধুর প্রকৃতির আর একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, সে কোনও বিষয়ে সহসা কৌতূহল বা আগ্রহ প্রকাশ করিতে চাহিত না। বন্ধুরা কেন আজ তাহাকে এমন ভাবে খুঁজিতেছে, তাহা জানিবার আগ্রহ থাকিলেও, কৌতূহল প্রকাশ করিয়া সে আপনাকে অন্যের কাছে খর্ব্ব করিতে রাজি ছিল না।

দীনবন্ধুর মন্তব্য শেষ হইতে না হইতেই একখানা বড় থালা লইয়া হরেন্দ্র ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। অমনই সকল আলোচনা যেন মন্ত্রবলে থামিয়া গেল। লুব্ধ নেত্র-গুলি অকস্মাৎ একযোগে সেই দিকে ধাবিত হইল। সমগ্র থালা জুড়িয়া ঘৃতভর্জ্জিত চিঁড়ার মোহন শোভা! এ দৃশ্যে বাদলের দিনে কোন্ রসিকের রসনা শুষ্ক থাকিতে পারে?

টেব্‌লের উপর থালাখানা রাখিয়া হরেন্দ্র মৃদুহাস্যে বলিল,"বাদ্‌লার দিনে লাগবে ভাল হে, তাই তোমাকে বসিয়ে রেখে গিন্নীকে দিয়েই ভাজিয়ে আন্‌লুম। কিছু মনে করো না, দীনদা।"

মনে করিবার মত কিছু ছিল না। বন্ধুদিগের তৃপ্তির জন্য ধনীর সুখলালিতা পত্নীকে দিয়া চিঁড়া ভাজাইয়া আনার মধ্যে যে আন্তরিকতা ছিল, তাহা বন্ধুদিগের অগোচর রহিল না। এমন অনেকবারই হইয়াছে। বৃথা বাক্য-ব্যয়ের প্রয়োজন তখন আর কেহ অনুভব করিল না। সাকারের অভাব না ঘটিলে লোক নিরাকারের ভজনা করিতে চাহে না, ইহাই বোধ হয় সাধারণ নিয়ম। যখন কোন আকারবিশিষ্ট বাস্তব পদার্থের রসের সহিত কাহারও রসনার সংযোগ ঘটে, তখন কি সে অবাস্তব, শুষ্ক শব্দের বোঝা বহিয়া আপনাকে ক্লান্ত করিতে চাহে?

চারি বন্ধুর উৎসাহে ভাজা চিঁড়াগুলি অল্প সময়ের মধ্যেই স্থানপরিবর্ত্তন করিল। ভিতর হইতে উৎকলবাসী টিকীধারী ভদ্রলোকবাহিত লুচির থালা ও চা আসিয়া উপস্থিত হইল। বন্ধুবর্গের সরস রসনায় তখন নানা বিষয়ের আলোচনা একে একে আবির্ভূত হইতে লাগিল।

দীনবন্ধু অবকাশ পাইলেই গুরুজীর সম্বন্ধে আলোচনা করিবার উৎসাহ ছাড়িতে পারিত না। বন্ধুগণ, বাগ্মিবরের সাহিত্যিক প্রতিভার সমাদর করিলেও তাঁহার সকল মতকে দীনবন্ধুর ন্যায় মাথায় তুলিয়া ধরিতে সম্মত ছিল না। কিন্তু দীনবন্ধুর প্রতিজ্ঞা, সে সকলকে তাহার মতানুবর্ত্তী করিয়া লইবে-ই।

হরেন্দ্র বলিল, "তা যাই বল, দীনদা, তোমার গুরুজী রাজনীতি ছেড়ে দিয়ে একেবারে গল্প-সাহিত্যে পাড়ি জমিয়ে ভাল কায করেন নি। তাঁর উদ্ভট মত কেউ বরদাস্ত করতে পাবে না। সে দিন ফাল্গুনের সংখ্যায় গল্প সম্বন্ধে তিনি আমার মত জানতে চেয়েছিলেন। লেখকের নাম ছিল না, কাযেই জানতাম না যে ছদ্ম নামে ও গল্পটা তাঁরই লেখা। আমি বলেছিলুম, ওটা গল্পই নয়। বিবাহিতা স্ত্রী স্বামীর ঘর ছেড়ে দিয়ে, এক বৎসর একা স্বামীর গুরুর কাছে রইলেন, তার পর স্বামী তাঁকে নির্ব্বিচারে গ্রহণ করলেন, এর গল্পত্ব এবং আদর্শ একেবারেই বস্তুতন্ত্রহীন।"

দীনবন্ধু তীব্র দৃষ্টিতে বন্ধুর দিকে চাহিয়া বলিল,"এ কথা তুমি তাঁর মুখের উপর বল্‌লে কি ক'রে?"

হরেন্দ্র বলিল, "তখন ত জানতাম না, 'হেমপ্রভা'র গল্প-লেখক তোমারই গুরুজী; পরে জান্‌তে পেরেছি। যদি তখন জান্‌তেম, তিনিই সে গল্পের লেখক, তা হ'লে ব'লে আস্‌তাম, তিনি অনধিকারচর্চ্চা ক'রে ভাল করেন নি। পরিণতবয়সে, বার্দ্ধক্যের সূচনায় ঔপন্যাসিক না হলেও মহাভারত অশুদ্ধ হ'ত না।"

গুরুজীর নিন্দাবাদে দীনবন্ধু জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু হরেন্দ্রকে সে অন্যের তুলনায় ভয় ও শ্রদ্ধা করিত—বোধ হয়, একটু ভালও বাসিত। কারণ, অসময়ে সেই তাহার একমাত্র আশ্রয় ছিল। সাহিত্যক্ষেত্রে যশস্বী লেখক বলিয়াও হরেন্দ্রর প্রতিপত্তি আছে। কিন্তু আজ সে আর সহ্য করিতে পারিল না। সে বলিয়া উঠিল, "দেখ হরেন, ও সব তোমাদের বুঝবার বিলম্ব আছে। বৈষ্ণব সাহিত্য ভাল রকম না বুঝতে পারলে, তিনি যে রসের চিত্র এঁকেছেন, তা ধরতে পারবে না। বৈষ্ণব-সাহিত্যে তাঁর মত অধিকার আর কার আছে বল ত? পরকীয়া তত্ত্ব—"

সহসা বাধা দিয়া রমেশ বলিল, "দীনদা, পরকীয়া ছেড়ে এখন স্বকীয়ার দিকে একটু অবহিত হও। ও সব তত্ত্ব ত আমরা বুঝব না। ছায়া, মায়া, হেঁয়ালী রেখে আসল বস্তুতন্ত্র হওয়া যাক। যে কাযে আজ এসেছি, তাই শোন।"

রবীন্দ্র বলিল, "হাঁ, সেটা যেমন জরুরী, তেমনই দরকারী।"

হরেন্দ্র জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে বন্ধুদিগের প্রতি চাহিল। দীনবন্ধু সহসা দৃষ্টিকে পুনরায় ঊর্দ্ধদিকে প্রেরণ করিল। আকাশে তখন মেঘ ও বিজলীর লীলা চলিতেছিল।

রমেশ বলিল, "আমাদের পাড়ার মহেন্দ্রবাবুকে তুমি বোধ হয় দেখেছ, হরেন? তিনি—কোম্পানীর বড় বাবু। অনেকগুলি মেয়ে তাঁর আছে। লোকটা দরাজ হাত ব'লে কিছু জমাতে পারেন নি। মেয়েগুলিও অপ্সরা নয়। কাযেই জানত বরের বাজারে তাঁকে বেগ পেতে হচ্ছে। উপস্থিত বড় মেয়েটির বিয়ের জন্য ব্যস্ত হয়েছেন। পয়সা-কড়ি বেশী দিতেও পারবেন না, খরচও করতে পারবেন না। দীনদার কথা তাঁকে বলেছিলাম। বয়স একটু বেশী শুনেও তিনি রাজি আছেন। আমাদেরও বেশী টাকার প্রয়োজন নেই জেনে তিনি যা'তে এ বিবাহ হয়, তার জন্য অনুরোধও করেছেন।"

রবীন্দ্র বলিল, "দীনদার মত জানি, টাকা সামান্য হলেই চ'লে যাবে। আর আমরা ৫ জন না হয় চাঁদা ক'রে কায সেরে ফেলব, কি বল, দীনদা?"

দীনবন্ধু মুখে কিছু বলিল না, শুধু মৃদু ঘাড় নাড়িল।

হরেন্দ্র গম্ভীরভাবে বলিল, "তা দীনদা'র বয়স এমন বেশীই বা কি? আমার চেয়ে দু' বছরের বড়। বোধ হয়, দাদার এই ৩৩ চলছে; কেমন না?"

রমেশ বলিল, "বিশেষতঃ চির-কৌমার্য্যের ফলে দাদার শরীর বেশ আছে। মাথায় একটু টাক পড়েছে বটে, কিন্তু একটা চুলও পাকে নি।"

হরেন্দ্র প্রশ্ন করিল, "মেয়েটি দেখেছ? বয়স কত, দেখতে কেমন?"

রবীন্দ্র চাকরের হাত হইতে আলবোলার নলটা লইয়া বলিল, "দেখতে শ্যামবর্ণ, বয়স বারো চলছে।"

হরেন্দ্র বলিল, "আমার বড় মেয়ে রাণুর বয়সী। তা নেহাৎ অশোভন হবে না।"

রমেশ বলিল, "দাদার এই প্রথম পক্ষ, আমাদের মনুর শাস্ত্রমতে এই বয়সেই বিয়ে হওয়া উচিত।"

বারিধারা ঝর ঝর শব্দে পড়িতেছিল, গুরুগর্জ্জনে নীল অরণ্য শিহরিয়া উঠিবার সম্ভাবনা কলিকাতা সহরে না থাকিলেও মানুষের অন্তর যে চমকিয়া উঠিতেছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। সমগ্র প্রকৃতি আজ যেন সঙ্গীতে ভরিয়া উঠিয়াছে। দীনবন্ধুর প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছিল, বিধাতা তাহাকে সঙ্গীতমুগ্ধ—পিপাসু হৃদয় দিয়াছেন, কিন্তু কণ্ঠ দেন নাই। যদি তাহার কণ্ঠে সুর থাকিত, তবে—তবে সে আজ প্রাণমাতান বাদলগানে সকলকে অভিভূত করিয়া ফেলিত।

বহুকাল পরে বিবাহের প্রস্তাব। দশ বৎসর পূর্ব্বে যখন আসিয়াছিল, তখন হেলায় সে সুযোগ সে হারাইয়াছিল। তখন সঙ্কল্প ছিল, কৃতী না হইয়া বিবাহ করিবে না। কিন্তু সহায়-সম্পদহীন সামান্য বেতনের আত্মীয়-বর্জ্জিত কেরাণীকে তাহার পর সহসা কেহ আর কন্যাদানের প্রস্তাব করে নাই। অভিমানে মুখ ফুটিয়া দীনবন্ধুও এ বিষয়ে চেষ্টা করে নাই। এত দিন পরে আবার যদি সে সুযোগ আপনা হইতে আসিয়া থাকে, সে কি তাহা পরিত্যাগ করিতে পারে? বয়সের অসামঞ্জস্য?—বাঙ্গালীর মেয়ে, বিবাহের জল গায় পড়িলেই দেখিতে দেখিতে সকল অসামঞ্জস্য ঢাকিয়া ফেলিবে।

হরেন্দ্র বলিল, "তা হ'লে ঠিক ক'রে ফেলা যাক্, দীনদা?"

"তা তোমরা যদি ভাল বোঝ, আমার আপত্তি নেই। তবে একটা ভাল চাকরী—"

বাধা দিয়া রমেশ বলিল, "সে সব কথাও হয়েছে। মহেন্দ্রবাবু তাঁর আপিসেই তোমার একটা ভাল চাকরী ক'রে দেবেন বলেছেন।"

হরেন্দ্র বলিল, "তবে আর বাধা কি? শুভস্য শীঘ্রং। আগামী রবিবারে মেয়ে দেখে, পাকা কথা দেওয়া যাবে।"

ভিতর হইতে ঠিক সেই সময় শঙ্খ বাজিয়া উঠিল। ঘরে ঘরে তখন সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিয়াছিল।

৩

সর্ব্বাঙ্গ খদ্দরে ভূষিত দীনবন্ধুকে দেখিয়া আপিসের কেরাণী—সহকর্ম্মীরা সবিস্ময়ে তাহার দিকে চাহিল।

স্বদেশী আন্দোলনের যুগ হইতে এ পর্য্যন্ত দীনবন্ধুর অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধবগণও কোনও দিন তাহাকে স্বদেশী দ্রব্যের প্রতি তেমন অনুরাগ প্রকাশ করিতে দেখে নাই। সে কোনও দিন য়ুরোপীয় ভাব বা আচার-ব্যবহারের ভক্ত

ছিল না—কোনও য়ুরোপীয়কে সমধিক শ্রদ্ধার দৃষ্টিতেও দেখিত না—সে কথাও মিথ্যা নহে; কিন্তু তথাপি যে হেতু স্বদেশজাত, সে হেতু তাহাকে শ্রদ্ধাভরে মাথায় রাখিতে হইবে, এমন দেশভক্তি দীনবন্ধুর কোষ্ঠীতে লেখা ছিল না। দেশের বাতাস, দেশের জল, দেশের ফল, ফুল প্রভৃতির প্রতি তাহার সমধিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল: কবির সঙ্গীত—দেশভক্তির মন্দাকিনীধারা পূত কবিতা, স্তোত্র সবই তাহার ওষ্ঠাগ্রে বিরাজ করিত; দেশের নেতৃগণ ওজস্বিনী ভাষায় স্বদেশপ্রেম সম্বন্ধে যেখানে যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহা দীনবন্ধুর নখদর্পণে ছিল বলিলেই হয়; কিন্তু তাই বলিয়া ছালার চটে দেহ আবৃত করিয়া দেশভক্তির পরিচয় দিতে হইবে,এমনতর স্বদেশপ্রীতি দীনবন্ধুর ছিল না।

দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকাকে গৃহিণী করিবার পর দীনবন্ধু শ্বশুরের চেষ্টায় তাঁহারই আপিসে ৫০৲ টাকা বেতনের চাকরী পাইয়াছিল। দুই বৎসর ধরিয়া সেই চাকরী করার ফলে এবং শ্বশুরের চেষ্টায় সে সহরের উপকণ্ঠস্থিত পল্লীতে শ্বশুরালয়ের নিকটেই শস্তায় একটা ছোট বাড়ীর ব্যবস্থা করিয়া ফেলিয়াছিল। বাড়ী তখনও সম্পূর্ণ হয় নাই বলিয়া তখনও সে শ্বশুরালয়ে সুখে দিন কাটাইতেছিল।

আপিসের কেহ দুই বৎসরের মধ্যে দীনবন্ধুকে খদ্দর দূরের কথা, বঙ্গলক্ষ্মী মিলের কাপড় পর্য্যন্ত পরিতে দেখে নাই। কাযেই আজ তাহার দেহে খদ্দর দেখিয়া সকলেরই বিস্ময় বোধ হইল।

বড়বাবুর জামাতা বলিয়া আপিসের সকলেই প্রথমতঃ তাহাকে একটু খাতির করিয়া চলিত। কিন্তু দীনবন্ধুর সদা উর্দ্ধগামী দৃষ্টি এবং পাণ্ডিত্যাভিমান অনেককেই আঘাত করিত। কোন প্রসঙ্গের আলোচনা হইলে সে এমন বড় বড় কথা এমনভাবে বলিতে আরম্ভ করিত এবং বাঙ্গালা-দেশের প্রথিতযশা সাহিত্যিক, বক্তা ও নেতার সহিত সে যে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত, এই সকল কথা এমনভাবে প্রকাশ করিত যে, অনেকের চিত্ত তাহাতে বিকৃত হইয়া উঠিত। প্রথমতঃ নিঃশব্দে বা বিনা প্রতিবাদে তাহার মতামতকে তাহারা শুনিয়া যাইত বটে, কিন্তু ক্রমে সে ভাব আর রহিল না। অপেক্ষাকৃত যুবক এবং কোন কোন স্পষ্টভাষী প্রৌঢ় মাঝে মাঝে তাহাকে দুই চারিটি অপ্রিয় সত্যকথা শুনাইতেও কুণ্ঠিত হইত না।

জনৈক স্পষ্টভাষী সহকর্ম্মী মৃদু হাস্যে বলিয়া উঠিল, "কি সর্ব্বনাশ! দীনবন্ধুবাবুর সর্ব্বাঙ্গে খদ্দর?"

তখনও আপিসের কায আরম্ভ হয় নাই। কেরাণীরা তখনও একে একে আপিসে আসিতেছিল। কলবাবু—টাইপিষ্টবাবুকে সকলে 'কলবাবু' বলিয়া ডাকিত—গোঁড়া স্বদেশী এবং পরিহাসরসিক বলিয়া আপিসে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ দীনবন্ধুর পূর্ব্ব-ইতিহাস তিনি কিছু কিছু জানিতেন, কারণ, রমেশ ও রবীন্দ্র যে পল্লীতে থাকিত, তাঁহার বাড়ী সেইখানে। অনতিক্রান্তযৌবন কলবাবু পরিপুষ্ট, বৃহৎ গুম্ফে তা দিতে দিতে বলিয়া উঠিলেন, "এতে বিস্ময়ের কারণ কি আছে, ভায়া? দীনবন্ধুবাবু শুধু উপরওলার নকল করেছেন বৈ ত নয়!"

চারিদিক্ হইতে সকলে ধরিয়া বসিল, "সে কি রকম, রায় ম'শায়?"

রায় মহাশয় বলিলেন, "তা জান না বুঝি? উনি বাক্যে স্বদেশভক্তির এত পরিচয় দেন, অথচ বিদেশী জিনিষ ছাড়া কিছুই ত ব্যবহার করেন না কেন? তার হেতু হচ্ছে, ওঁর যিনি আদর্শ বা উনি যাঁকে গুরু ব'লে মানেন, তিনি মস্ত বড় বক্তা ও রাজনীতিবিশারদ ব'লে পরিচিত। দেশের এক জন ভক্তসন্তান বলেও তাঁর নাম আছে। কিন্তু উনপঞ্চাশ নম্বর রেলীর থান ছাড়া এ পর্য্যন্ত কেউ একখানা মিলের কাপড়ও তাঁকে পরতে দেখেছে?"

দীনবন্ধুর আপাদমস্তক ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল, তাহার অধরোষ্ঠ কম্পিত হইতে লাগিল। কিন্তু এই কলবাবুটি স্বদেশী হইয়াও আপিসের "বড় সাহেবের" বড় প্রিয় এবং আপিসের সকলেই তাঁহাকে বিশেষ ভক্তিশ্রদ্ধা করিত। দীনবন্ধু তাহা জানিত। তাই সে অতি কষ্টে আপনাকে সংযত করিল।

কেরাণীরা কৌতুক অনুভব করিয়া বলিল, "তাতে দীনবন্ধুবাবুর কি?"

"আহা! এই সোজা কথাটা বুঝতে পাচ্ছ না? মহাত্মা গান্ধীর প্রভাবে সমগ্র দেশটা মেতে উঠেছে। চারিদিকেই এখন খদ্দরের গান। এই ১৯২১ অব্দটাকে বড় সোজা মনে করো না, ভায়া! চারিদিকের ভাব-গতিক দেখে দীনবন্ধুবাবুর ওস্তাদও মত বদলে ফেলেছেন। অর্থাৎ এত দিন বাক্যে তিনি ঘোর স্বদেশভক্ত ছিলেন—

মনের কথা জানি না—এখন কায়িক ব্যবহারেও তার প্রমাণ দিয়েছেন। সিংহের সর্ব্বাঙ্গে স্পন্দন দেখা দিলে, তাহার ল্যাজটিও কি নিস্পন্দ থাকে ভায়া ?”

এক জন বলিয়া উঠিল, “উপমাটা ঠিক বোঝা গেল না, রায় ম'শায় !”

রায় মহাশয় দীনবন্ধুর দিকে কটাক্ষ করিয়া বলিলেন, “ও আর বুঝে কায নেই। কি বলেন, দীনবাবু ?”

দীনবন্ধু আর আত্মসংবরণ করিতে পারিল না ; অপমানে ও লজ্জায় তাহার কর্ণমূল পর্য্যন্ত রাঙ্গা হইয়া উঠিল। সে সক্রোধে বলিয়া উঠিল, “পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হীরা-ধার। ভদ্র লোকের সম্মান ভদ্র লোকই রাখে। অন্যত্র তা পাবার আশা দুরাশা।”

জনৈক তরুণ কেরাণী লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, “দীনবাবু, রসনাকে সংযত করুন, আপনার পাণ্ডিত্য দেখাতে চান দেখান, কিন্তু ভদ্রতার সীমা লঙ্ঘন করবেন না।”

তখন দীনবন্ধুর মাথায় শোণিতস্রোত প্রবলবেগে ধাবিত হইতেছিল। সে গলার স্বর উন্নত করিয়া অল্পশিক্ষিত বাঙ্গালীর ব্যবহারের তীব্র প্রতিবাদ করিতে লাগিল। সীমা ছাড়াইয়া সে এমন অনেক কথা বলিয়া ফেলিল যে, তাহাতে কেরাণীদিগের কৌতুকপ্রবৃত্তির স্থলে ক্রোধই প্রবল হইয়া উঠিল।

বৃদ্ধ হেড্ একাউণ্টাণ্ট সেই সময় অগ্রসর হইয়া বলিলেন, “দীনবন্ধুবাবু, আপনি বাড়াবাড়ি করছেন। আপনার শ্বশুর বড়বাবু হলেও মনে রাখবেন, এটা আপনার বৈঠকখানাঘর নয়, এটা আপিস। আপনি লেখাপড়া কিছু জান্‌লেও, মনে রাখবেন, অন্যেও মূর্খ নয়। আর যদি পাণ্ডিত্য দেখাতে হয়, আপনার সাহিত্যিক মজলিসে দেখাবেন। এখানে ‘সাহেবের’ মাইনে যেমন নিচ্ছেন, তেমনই তার কায করবেন ! বক্তৃতা বা গল্প করবেন না।”

এই কথার পর দীনবন্ধু সহসা চুপ করিয়া গেল। ক্রোধ তাহার অন্তরকে দগ্ধ করিলেও এই কবুল জবাবের পর আর কথা বলা চলে না। অপর কেরাণীরা দীনবন্ধুর অবস্থা দেখিয়া মৃদু মৃদু হাস্য করিতে লাগিল।

প্রহৃত কুকুরের ন্যায় দীনবন্ধু আপনার আসনে গিয়া বসিল। তাহার শ্বশুর বড়বাবু হইলেও এই বৃদ্ধটিও ‘সাহেবের’ প্রিয় পাত্র এবং আপিসের ছোট বাবু। তাহার শ্বশুরের অপেক্ষাও কোন কোন বিষয়ে ইঁহার প্রভাব বেশী।

দীনবন্ধুর বিনীত ভাব দেখিয়া যুবকের দল কৌতুক অনুভব করিল এবং কাহারও কাহারও ওষ্ঠপ্রান্তে মৃদু হাস্যরেখা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

৪

“দেখুন, আমার আর চাকরী করা পোষাচ্ছে না।”

জামাতার রোষরক্ত গম্ভীর আননে মুহূর্ত্ত দৃষ্টিপাত করিয়া মহেন্দ্রবাবু বলিলেন, “কি হয়েছে ?”

হাত-পা নাড়িয়া দীনবন্ধু বলিল, “আপনি কি কিছু জানেন না ? আপনার প্রশ্রয় পেয়েই ত ওরা আমার পেছনে অমন ক'রে লাগে।”

জামাতার রূঢ় ও অবিনীত বাক্য শুনিয়া মহেন্দ্রবাবু শুধু বিস্মিত হইলেন না, একটু বিরক্তিও বোধ করিলেন। কিন্তু ব্যবহারে বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য প্রকাশ না করিয়া বলিলেন, “কি হয়েছে শুনি ?”

“রোজই আমার একটা না একটা দোষ বার করা ওদের স্বভাব দাঁড়িয়েছে। কেন, আমি কি করেছি ? ও বছর আপিস শুদ্ধ লোক আমাকে এক দিন কি অপমানটাই না কর্‌লে। আপনাকে জানালেম, একটু হেসে আপনি উড়িয়ে দিলেন। এখন ত রোজই, আমার দোষ না থাক্‌লেও—দোষ বার করা চাই। আজ ‘সাহেবের’ কাছে নিয়ে গিয়ে আমায় ছোটবাবু যে রকম অপমান করালেন, তা কি আপনি জানেন না ?”

মহেন্দ্রবাবু গম্ভীরভাবে বলিলেন, “তা আমি কি কর্‌ব, বাপু। দোষ ত তোমার সত্যিই হয়েছিল। আপিসের কায না ক'রে তুমি যদি চণ্ডিদাসের কবিতা বা ‘চৈতন্যচরিতামৃত’ পড়, সেটা কি আমার দোষ ?”

দীনবন্ধুর মন একেই বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, শ্বশুরের মন্তব্য শুনিয়া তাহার চিত্ত তিক্ততায় ভরিয়া গেল।

মহেন্দ্রবাবু বলিয়া চলিলেন, “আমার পৈতৃক সম্পত্তি নয়, কোম্পানীর আপিস। তারা মাইনে দেয়, আমরা কায করি। হিসাবের রিটার্ণ বিলেতে পাঠাতে হবে, সে কায ফেলে রেখে সাহিত্যচর্চ্চা করা তোমার কি শোভন হয়েছিল ? তা ছাড়া সবাই তোমার ব্যবহারে বিরক্ত। আমার জামাই ব'লে তোমাকে ত তারা মাথায় ক'রে রাখতে

পারে না। তবু আমার খাতিরে তারা তোমার অনেক অসঙ্গত ব্যবহার সহ্য ক'রে এসেছে। পাঁচ জনকে নিয়ে আমায় কায করতে হয়। তোমার খাতিরে তাদের সঙ্গে মন্দ ব্যবহার ত করতে পারি না।"

বিদ্রূপ হাস্যে দীনবন্ধু বলিল, "ওঃ, বুঝলাম, আপনিই তবে আমাকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করবার জন্য তাদের উৎসাহিত করেছেন।"

জামাতার ঔদ্ধত্য এবার মহেন্দ্রবাবু আর সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি তীব্র কণ্ঠে বলিলেন, "সকলে যে বলে, সে ঠিক কথা,—তোমার মন অত্যন্ত ইতর। সওদাগরী আপিসে যারা চাকরী করে, তারা কেউ তোমার মত পণ্ডিত নয়। তাদের কাছে তুমি বিদ্যে ফলাতে যাও কেন, বাপু? তুমি কাযের তেমন উপযুক্ত নও, তবু দু'বছরের মধ্যে তোমার ২০ টাকা মাইনে বেড়েছে। কিন্তু তুমি এম্‌নি—"

প্রৌঢ় ভদ্রলোক সহসা আপনার রসনাকে সংযত করিলেন। ঘরের বাহিরে জ্যেষ্ঠা কন্যার উদ্বেগব্যাকুল মুখ দেখিয়া তিনি আর কথা কহিতে পারিলেন না।

দীনবন্ধু বলিয়া উঠিল, "বেশ, আমি ছোটলোক, আপনার সংস্রবে থাকতে চাইনে। কা'ল থেকে আর আপিসেও যাব না। মেয়েকে নিয়ে আপনি থাকুন।"

ঝড়ের বেগে দীনবন্ধু নিজের ঘরের দিকে চলিয়া গেল। শয্যার উপর কয়েক মুহূর্ত্ত সে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

শ্বশুরের অপেক্ষা সে কিসে নিকৃষ্ট? বংশমর্যাদা ও পাণ্ডিত্য কি তাহার বেশী নয়? তাঁহার কালো মেয়েকে সে ত বিনা অর্থেই গ্রহণ করিয়াছিল। চাকরী?—তা সে ত সে নিজের কলমের জোরেই করিতেছিল।

চারি বৎসরে বাড়ী তৈয়ার করা ছাড়া হাজার টাকা ত তাহার ব্যাঙ্কে মজুত। তবে সে কেন শ্বশুরবাড়ী থাকিবে? এত দিন তাঁহারা ছাড়েন নাই বলিয়াই ত সে ঘরজামাই হিসাবে রহিয়াছিল। নূতন বাড়ীতে ভাড়াটিয়া না থাকিলে সেখানেই সে চলিয়া যাইত। যাক্, সে মেসেই থাকিবে।

দীনবন্ধু উঠিয়া নিজের বাক্‌স গুছাইতে লাগিল। না, সে কোনমতেই এখানে থাকিবে না। চাকরী ছাড়িয়া দিবে, ছেলে পড়াইবে। মাসে কুড়িটা টাকা হইবে না? ব্যাঙ্কে জমা টাকাও ত আছে।

ছোটলোকরা বলে কি না 'সিংহের ল্যাজ।' আবার 'সাহেবের' কাছে লইয়া গিয়া তাহাকে নানারূপে কি লাঞ্ছনাই না করিয়াছে! সে সাহিত্যরসিক—গুণের ভক্ত, তাই সকলে তাহাকে এমন করিয়া লাঞ্ছনা করিবে?

ষোড়শী পত্নী কুণ্ঠিতভাবে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। দীনবন্ধু আপন মনে জিনিষ গুছাইতে লাগিল।

স্ত্রীর যৌবনের প্রথম আকর্ষণের বেগ মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছিল। বৈষ্ণব সাহিত্য ঘাঁটিয়া সে একটি সার কথা বাহির করিয়াছিল। পরকীয়া প্রেমতত্ত্বটির সে একনিষ্ঠ ভক্ত ছিল। তাহার গুরুজীর ন্যায় সে বিশ্বাস করিত, প্রকৃত প্রেম পরকীয়া নহিলে হয় না। এ জন্য পত্নীর নিকট একনিষ্ঠ পতিত্বের গৌরব রক্ষায় সে কোনও দিন যত্ন প্রকাশ করে নাই। স্ত্রীকে প্রয়োজনীয় তৈজসপত্রের মতই সে মনে করিত মাত্র।

মৃদুস্বরে পত্নী বলিল, "ও সব কি হচ্ছে? কোথায় যাচ্ছ?"

"তোমার দরকার? যেখানে খুসী আমি যাব। তোমার এক চোখো বাবার বাড়ীতে থাকছি না।"

"তা চল না, আমাকেও নিয়ে চল।"

"ভারী সুখ আর কি! তুমি বাপের বাড়ী থাক, আমার সঙ্গে তোমার কোন সম্পর্ক নেই।"

লাঙ্গুল ঘন ঘন যেন আন্দোলিত হইতে লাগিল।

পত্নী বলিল, "আমাকে এখানে রেখে গেলে লোক কি বলবে? তোমার মুখ উজ্জ্বল হবে কি?"

"থাম, থাম, আর জ্যেঠামীতে কায নেই। যেমন বাপ, তেম্‌নি মেয়ে। বেশী কথা বল যদি—"

মুষ্টি উদ্যত করিয়া দীনবন্ধু বীরের ন্যায় দাঁড়াইল।

অতি দুঃখেও ষোড়শী পত্নীর মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। মৃদুস্বরে সে বলিল, "কিন্তু এটা যদি আপিসের 'সাহেব' বা অন্য কেরাণীর কাছে দেখাতে পারতে, ভাল হ'ত।"

কি ভাবিয়া দীনবন্ধু আত্মসংবরণ করিল; তাহার পর ট্রাঙ্ক ও বিছানার মোটটা একে একে টানিয়া সদর দরজার কাছে লইয়া গেল।

স্ত্রী হাত ধরিয়া তাহাকে ফিরাইবার চেষ্টা করিল। সবেগে হাত ছাড়াইয়া লইয়া সে গাড়ীর সন্ধানে চলিয়া গেল।

অল্পক্ষণ পরে গাড়ী আনিয়া সত্য সত্যই যখন সে জিনিষপত্র লইয়া গাড়ীতে উঠিতে যাইবে, তখন শ্বশুর ও শাশুড়ী তাহাকে বহু অনুনয় বিনয় করিলেন; কিন্তু প্রকৃত বীরের ন্যায় দীনবন্ধু সকলের কাতর বচন ও অশ্রুর বাণ-গুলিকে ব্যর্থ করিয়া দিয়া গাড়ীতে চড়িয়া বসিল।

৫

সুবৃহৎ সভাপ্রাঙ্গণে বহুশত লোক সমবেত হইয়াছিল। মহাত্মা গান্ধীপ্রবর্ত্তিত দেশের গঠনমূলক কার্য্য সম্বন্ধে আলোচনা এবং খদ্দর প্রচারের সুবিধা সম্বন্ধে বহু মনীষী নেতা আজ বক্তৃতা করিবেন। বাঙ্গালার জননায়ক সভায় নেতৃত্ব করিবেন। দলে দলে লোক বক্তৃতা শুনিতে আসিয়াছিল।

দীনবন্ধুও সভায় আসিয়াছিল। তাহার জীবনপথে যিনি আদর্শস্বরূপ, যাঁহাকে অবলম্বন করিয়া সে নানারূপ লাঞ্ছনা ও বিদ্রূপ সহ্য করিয়াছে, দীর্ঘকাল অনুপস্থিতির পর তিনি বাঙ্গালায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। অদ্যকার সভায় তাঁহারও বক্তৃতা করিবার কথা। নানা উপায়ে তিনি এখন কর্ম্মক্ষেত্রের উচ্চতর স্তরে উন্নীত হইয়াছেন। অর্থ ও যশের কামনায় তিনি পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট পথ ছাড়িয়া দিয়া নূতন পন্থার অনুসরণ করিতেছেন। বাঙ্গালা ও বাঙ্গালীকে ছাড়িয়া সেজন্য তাঁহাকে মাঝে মাঝে অন্যত্র থাকিতে হয়। তাই দীর্ঘকাল দীনবন্ধু তাঁহার দর্শন পায় নাই। সংপ্রতি তিনি দেশে ফিরিয়াছেন এবং অদ্যকার সভায় যাঁহারা বক্তৃতা করিবেন, তাঁহাদের নামের তালিকায় দীনবন্ধু তাঁহার নাম দেখিয়াছে।

বেকার দীনবন্ধু কয় মাস মেসে থাকিয়া সঞ্চিত অর্থ ভাঙ্গিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছিল। এরূপ ভাবে বেশী দিন চলিতে পারে না। গুরুজী চেষ্টা করিলে তাহার একটা বিহিত হইবার সম্ভাবনা। আজ বক্তৃতার পর সে তাঁহার সহিত তাঁহার বাড়ীতে যাইবে।

বিদ্যুতের আলোকে সভাক্ষেত্র সমুদ্ভাসিত। প্রসিদ্ধ দেশনায়কগণ একে একে আসিতে লাগিলেন। উৎসুক হৃদয়ে দীনবন্ধু বার বার দ্বারের দিকে চাহিতে লাগিল।

অবশেষে একখানা মোটর আসিয়া দাঁড়াইল। দীনবন্ধু দেখিল, হাঁ, তাহারই গুরুজী, প্রসিদ্ধ বাগ্মী তাহাতে উপবিষ্ট। তাঁহার গমনপথের সম্মুখে সে দাঁড়াইল। যুবকের দল তোরণের কাছে জটলা করিতেছিল; দীনবন্ধুর গুরুজী মোটর হইতে নামিবামাত্র একটা কোলাহল হইল। দীনবন্ধুর সন্দেহ হইল, ইহা কি জয়ধ্বনি?

অন্যান্য দেশনায়কগণ সভাক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার সময় যেরূপ জয়ধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল, ইহা ত ঠিক তেমন নহে!

দীনবন্ধু গুরুজীর সম্মুখে গিয়া নত হইয়া অভিবাদন করিল। কিন্তু এ কি? যে তাঁহার নিত্য-পরিচিত, অন্তরঙ্গ পার্শ্বদ, গুরুজী কি তাহাকে চিনিতেই পারিলেন না? আভূমিনত নমস্কারের বিনিময়ে মামুলী ক্ষুদ্র ও সংক্ষিপ্ত শিরঃসঞ্চালন করিয়াই কি তিনি তাহার প্রতিদান দিলেন?

সন্দেহ-সংক্ষুব্ধ হৃদয়ে দীনবন্ধু দ্রুত তাঁহার অনুসরণ করিল। সে মঞ্চের দিকে অগ্রসর হইতেই এক জন বাধা দিয়া বলিল, "ও দিকে নয়।"

দীনবন্ধু স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। কতবার সে গুরুজীর সহিত কত সভায় গিয়াছে। প্রতিবারই সে তাঁহার নিকটেই বসিবার আসন পাইয়াছে। কিন্তু নিদারুণ বিধি! আজ তাহার অদৃষ্টে এ কি লিখিলে?

পশ্চাৎ হইতে কেহ বলিয়া উঠিল, "সিংহ যথায়, লাঙ্গুলও সেখানে। যেতে দিন না, মশায়!"

চমকিত হইয়া দীনবন্ধু বক্তাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য জনতার দিকে চাহিল। কিন্তু যে বলিয়াছিল, তাহার মূর্ত্তি দেখা গেল না।

নিতান্ত ক্ষুব্ধ ও বিমর্ষভাবে দীনবন্ধু একপার্শ্বে দাঁড়াইল।

সভাক্ষেত্রে বক্তৃতা আরম্ভ হইল। অন্যমনস্ক দীনবন্ধু প্রথমটা সে দিকে মন দিতে পারিল না। দেশের শ্রেষ্ঠ নায়ক সভাপতিত্ব করিতেছিলেন। তিনি বক্তৃতা করিতে উঠিলে জয়ধ্বনিতে গগনমণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সহস্র সহস্র শ্রোতা শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ে তাঁহার বচনসুধা পান করিতে লাগিল।

ক্রমে অন্যান্য বক্তা বিশদভাবে আলোচ্য বিষয় বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। সর্ব্বশেষে দীনবন্ধু দেখিল, তাহার গুরুজী বক্তৃতা দিবার জন্য আসন ত্যাগ করিয়াছেন।

আজিকার ব্যবহারে মনটা নিতান্ত দমিয়া গেলেও সে গুরুজীর বক্তৃতার গৈরিক নিঃস্রাবধারা শ্রবণ করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিল।

বক্তা মঞ্চের উপর দাঁড়াইবামাত্র, ও কি! সহসা চারিদিক ঘনান্ধকারে ডুবিয়া গেল কেন? ইহা আকস্মিক না ইচ্ছাকৃত?

মহাকলরবের মধ্যে কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই আবার আলো জ্বলিয়া উঠিল। সভা আবার নিস্তব্ধ হইল।

বক্তা আবার উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তখন চারিদিক হইতে চীৎকার-শোনা গেল, "শুন্‌বো না, শুন্‌তে চাই না। বস্‌তে বলুন।"

এই বিচিত্র ব্যাপারে দীনবন্ধু অভিভূতের মত দাঁড়াইয়া রহিল।

কোলাহল থামিলে সভাপতি মহাশয় সবিনয়ে সকলকে মাননীয় বক্তার কথা শুনিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কিন্তু প্রচণ্ড কোলাহলে আবার চারিদিক নিনাদিত হইয়া উঠিল।

"না, আমরা ওঁর কথা শুন্‌তে চাই না।"

বক্তার মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিল। যিনি এত দিন জনসাধারণের প্রিয়তম ছিলেন, যাঁহার-কথা শুনিবার জন্য দেশবিদেশ হইতে লোক ছুটিয়া আসিত, আজ তাঁহাদের নিকট তিনি অবজ্ঞাত!

এক জন প্রবীণ বয়স্ক শ্রোতা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "উনি ত এখন আর আমাদের নেই, আমাদের ছেড়ে চ'লে গেছেন। বাঙ্গালা ও বাঙ্গালীর সহিত উঁহার কোন সম্বন্ধ আছে বলেও মনে করা যায় না।"

চারিদিক হইতে তাঁহার মন্তব্য সমর্থিত হইতে লাগিল।

নিরুপায় সভাপতি মহাশয় তখন সভার কার্য্য স্থগিত রাখিলেন।

* * * *

"বাবাজী! এখনও তোমার রাগ যায়নি?"

দীনবন্ধুর মনে আর একটা তীব্র আঘাত লাগিয়াছিল, তাই শ্বশুরের সস্নেহ সম্ভাষণে আজ আর সে রূঢ় উত্তর দিতে পারিল না।

সভামণ্ডপের বাহিরে আসিতেই শ্বশুরের সহিত দেখা হইয়াছিল। মহেন্দ্রবাবু বলিলেন, "প্রায় এক বৎসর তুমি আমাদের ওদিকে যাওনি, আপিসেও যাও না। অন্য লোক হ'লে এত দিন চাকরী থাক্‌ত না। আমি তোমার নাম সই ক'রে এত দিন তুমি পীড়িত আছ ব'লে 'সাহেবের' নিকট দরখাস্ত ক'রে আস্‌ছি। 'সাহেব' খুব ভালবাসে, তাই তোমার যায়গায় স্থায়িভাবে কোন লোক নেয় নি। সংপ্রতি একটা নূতন গুদাম খোলা হচ্ছে। আমি 'সাহেবকে' ব'লে কয়ে তোমাকে ষ্টোরকিপার ক'রে দেব। মাইনে একশ করেই পাবে। কেমন, রাজি?"

দীনবন্ধুর চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। শ্বশুরের প্রতি তাহার শ্রদ্ধা চতুর্গুণ বাড়িয়া গেল। যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া সে এত দিন গর্ব্ব অনুভব করিত, যাঁহার গুণগানে সে সর্ব্বদা পঞ্চমুখ ছিল, আজ তিনি তাহাকে চিনিতেই পারেন নাই। তাহার পর দেশের লোকের কাছে তিনি শ্রদ্ধার আসন হারাইয়া ফেলিয়াছেন। কেহ তাঁহাকে চাহে না। তবে শুধু সে ল্যাজের বোঝা বহিয়া বেড়ায় কেন?

দীনবন্ধু শ্বশুরের পদধূলি লইয়া বলিল, "আপনি আমায় ক্ষমা করুন। 'সাহেব' কি আমায় রাখবেন?"

"সেজন্য তোমার চিন্তা নেই। তবে কথা, একটু হিসাব ক'রে চলো, এই মাত্র।"

পশ্চাৎ হইতে কাহার স্নেহ আলিঙ্গনে পিষ্ট হইয়া দীনবন্ধু চাহিয়া দেখিল, হরেন্দ্র, রমেশ ও রবীন্দ্র তিন বন্ধুই তথায় দাঁড়াইয়া।

হরেন্দ্র বলিল, "বাঁচলাম দীনদা, এত দিন পরে নিজের ভুলটুকু যে বুঝ্‌তে পেরেছ, এই মঙ্গল।"

শ্বশুর-জামাতার আলাপ তাহারা বোধ হয় শুনিতে পাইয়াছিল।

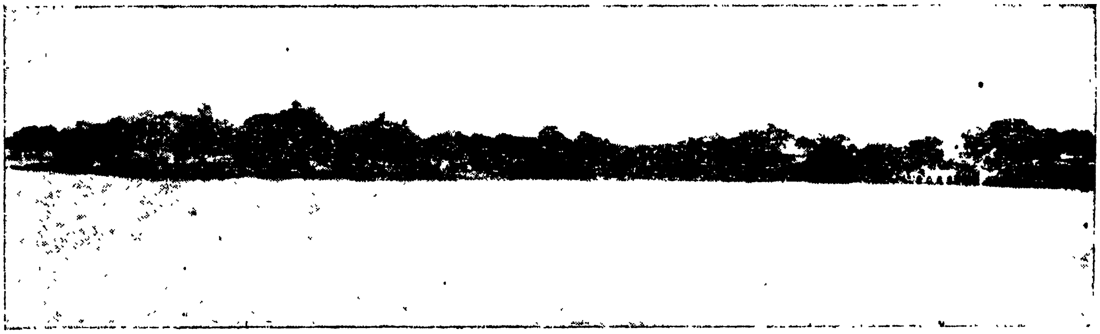
রমেশ বলিল, "এখন আর সিংহলাঙ্গুল শুন্‌লে মার্‌তে উঠ্‌বে না?"

দীনবন্ধু হাসিয়া বলিল, "সিংহ যখন প্রাণহীন, তখন ল্যাজ কি আর বাঁচিয়া থাকে? এখন থেকে তোমাদের দীনদার পুনর্জ্জন্ম হ'ল।"

বন্ধুরা জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। মহেন্দ্রবাবু মুখ ফিরাইয়া একটু মুচকিয়া হাসিলেন মাত্র।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

সক্কর ও আলোর

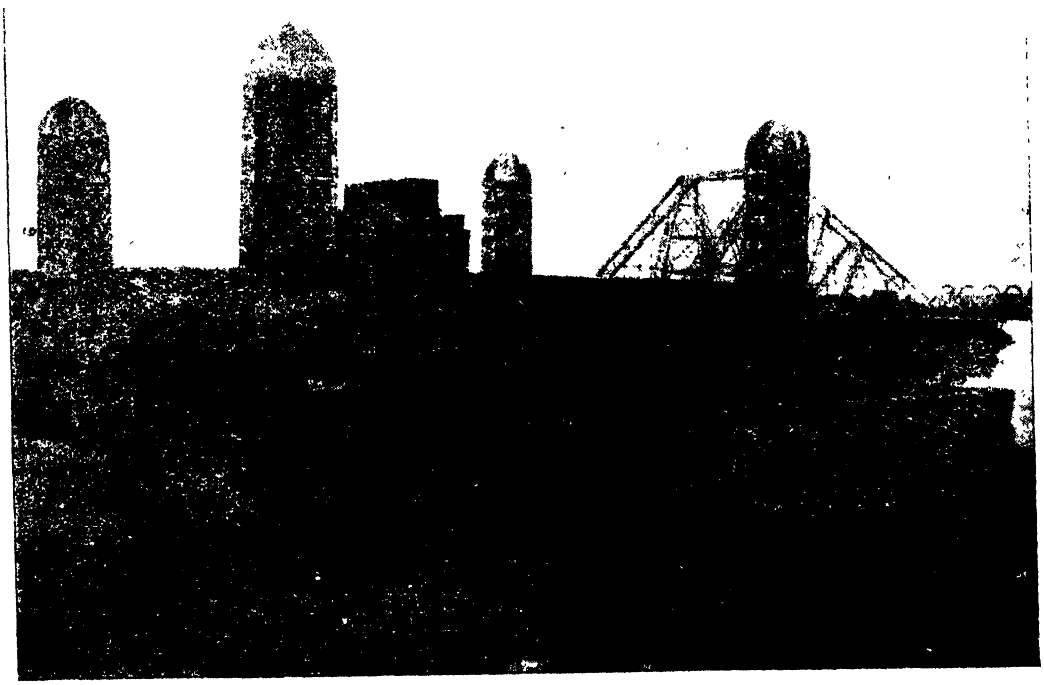


বক্কর দ্বীপ হইতে সক্কর নগর

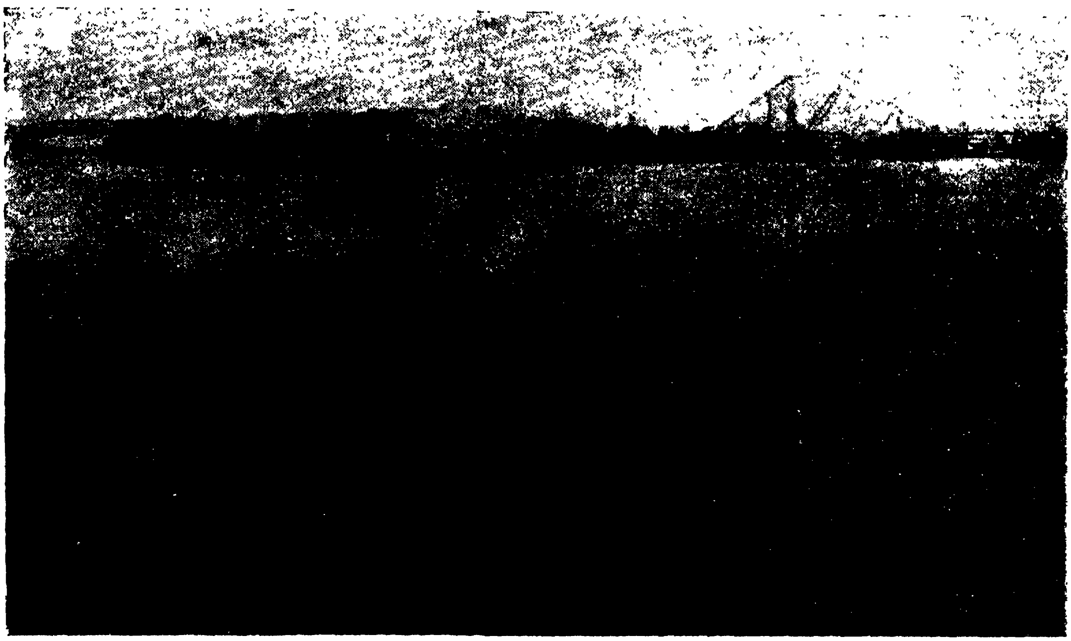
অতি প্রাচীন কাল হইতে সিন্ধুদেশ তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া আসিতেছে। এই তিন বিভাগের নাম যথাক্রমে উত্তর সিন্ধু বা অপর সিন্ধু, মধ্য সিন্ধু এবং দক্ষিণ সিন্ধু বা 'ব'দ্বীপ। উত্তর সিন্ধু জলশূন্য, একমাত্র সিন্ধু নদের জল এই দেশের ভরসা। মধ্য সিন্ধু উর্ব্বর, এই বিভাগে মাঞ্ছর হ্রদ এবং সিন্ধু নদের অনেকগুলি পুরাতন খাদ আছে। বর্ষাকালে এই হ্রদটি এবং পুরাতন খাদগুলি জলে ভরিয়া যায়। এই জন্য মধ্য সিন্ধু অত্যন্ত উর্ব্বর এবং এই বিভাগে প্রচুর পরিমাণে ধান, গম ও তূলা জন্মায়। দক্ষিণ সিন্ধু বা "ব"দ্বীপ জলময়, কিন্তু এই অংশ সমুদ্রের নিকট বলিয়া অনেক দূর জোয়ারের জল আসে এবং সে জল সরিয়া গেলে ক্ষেত্র লবণাক্ত হইয়া যায়, তাহাতে ফসল হয় না। এই জন্য সিন্ধু নদের "ব"দ্বীপ মধ্য সিন্ধুর মত উর্ব্বর নয়। উত্তর সিন্ধুর প্রধান নগরের নাম সক্কর। অতি প্রাচীন কাল হইতে সক্করের কাছে উত্তর সিন্ধুর প্রধান নগর অবস্থিত আছে। মুসলমানরা যখন সিন্ধুদেশ জয় করিয়াছিলেন, তখন সিন্ধুনদ এখন যে খাদে বহে, সে খাদে বহিত না এবং যে খাদে বহিত, তাহা এখন প্রায় শুকাইয়া গিয়াছে। এই শুষ্ক খাদের উপর অবস্থিত আলোর নামক প্রাচীন নগর উত্তর সিন্ধুর প্রাচীন রাজধানী। মুসলমানী আমলে অনেক দিন ধরিয়া আলোর উত্তর সিন্ধুর রাজধানী ছিল। কিন্তু সিন্ধুনদ যখন গতি পরিবর্ত্তন করিল, তখন আলোর নগর ধ্বংস হইয়া গেল; কাযে কাযেই নগর যেখানে উঠিয়া আসিল, উত্তর সিন্ধুর রাজধানীও সেইখানে আসিল, এই নূতন রাজধানীর নাম বক্কর। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে সিন্ধুনদ যে খাদে বহিল, সেই খাদে বর্ত্তমান বক্কর নগরের নিকট ছোট বড় অনেকগুলি দ্বীপ আছে। এই দ্বীপগুলির মধ্যে যেটি সকলের চেয়ে বড়, সেইটির নাম বক্কর। সিন্ধুর এই খাদটি একেবারে নূতন নহে। নদের জল যখন আলোর নগরের তল দিয়া বহিয়া যাইত, তখনও নদের একটি ক্ষুদ্র শাখা এই দিক দিয়া বহিত এবং অল্পদূর গিয়া বর্ত্তমান খাদের পশ্চিমদিক দিয়া বহিয়া গিয়া মাঞ্ছর হ্রদে পড়িত। এই খাদের কতক অংশ দিয়া সিন্ধুনদের জল এখন বহিয়া যায় এবং বাকীটা মরিয়া বিলের মত হইয়া গিয়াছে, তাহার নাম পশ্চিম নরা। সিন্ধুর বর্ত্তমান খাদ আর পশ্চিম নরার মধ্যে অনেকগুলি পুরাতন বিল আছে। আধুনিক ভাষায় বিলের নাম ঢণ্ড। সক্কর নগরের আশেপাশে অর্থাৎ উত্তর ও দক্ষিণে অনেকগুলি এই রকম বিল বা ঢণ্ড আছে। সেগুলির অস্তিত্বের কারণ সক্কর নগরের একটি পর্ব্বত। অনেক কাল ধরিয়া সিন্ধুনদের জল এই পর্ব্বতে বাধা পাইয়া আসিতেছে। নদের জল পর্ব্বতে লাগিয়া এককালে পশ্চিমদিকে চলিয়া যাইত। যীশু খৃষ্টের জন্মের পূর্ব্বে সিন্ধু নদ সক্করের পাহাড়ের পশ্চিমদিক দিয়া বহিত, কিন্তু খৃষ্টের জন্মের পরে

দুই তিন শত বৎসরের মধ্যে নদের জল পর্ব্বতটা ভেদ করিয়া চলিয়াছিল। সেই সময়ে সক্কর, সাধ-বেলো-জিন্দা-পীর প্রভৃতি ছোট বড় দ্বীপের জন্ম হইয়াছিল।

সক্কর নগর প্রকৃত কথা বলিতে গেলে তিন ভাগে বিভক্ত। এক ভাগ সিন্ধু নদের বর্ত্তমান খাদের পশ্চিম-দিকে অবস্থিত এবং ইহারই বর্ত্তমান নাম সক্কর, দ্বিতীয় ভাগ নদের মধ্যস্থলে সক্কর দ্বীপের উপর অবস্থিত এবং তৃতীয় ভাগ নদের পূর্ব্বতীরে অবস্থিত। এই তৃতীয় ভাগের বর্ত্তমান নাম রোহরী। প্রাচীন আলোর নগর রোহরী হইতে ৫ মাইল দূরে অবস্থিত। আলোর, সক্কর, বক্কর ও রোহরী অতি প্রাচীন কাল হইতে সিন্ধুদেশের ইতিহাসে বিখ্যাত। মুসলমানরা দক্ষিণ সিন্ধু জয় করিয়া যখন উত্তর সিন্ধু জয় করিতে আসে, তখন আলোর নগর বৌদ্ধদিগের বিশ্বাসঘাতকতায় অতি সহজে তাহাদিগের হস্তগত হইয়াছিল। ৭১১ খৃষ্টাব্দে রাজপুতজাতীয় হিন্দু-ধর্ম্মাবলম্বী রাজা ডাহির সিন্ধুদেশের অধিপতি ছিলেন; কিন্তু তিনি হিন্দু ছিলেন বলিয়া উত্তর সিন্ধুর বৌদ্ধরা তাঁহাকে মানিতে চাহিত না এবং মুসলমানরা যখন সিন্ধুরাজ্য আক্রমণ করিত, তখন উত্তর ও মধ্যসিন্ধুর বৌদ্ধরা বিপক্ষতা করিবার জন্য মুসলমানদিগের সহিত প্রকাশ্যে যোগ দিয়াছিল। উত্তর সিন্ধুর রাজধানী আলোর নগর এইরূপে বৌদ্ধদিগের সহায়তায় অতি সহজে এবং প্রায় বিনাযুদ্ধে মুসলমানদিগের হস্তগত হইয়াছিল। রাজধানী শত্রুর হস্তগত হইলেও রাজপুত বীরেরা যুদ্ধ পরিত্যাগ করেন নাই। তাঁহারা বক্করদ্বীপের দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া মুসলমান-দিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। বক্করদ্বীপের দুর্গ অতি প্রাচীন কাল হইতে বিখ্যাত, কারণ, ইহার চারিদিকে সিন্ধুনদের গভীর জল। দ্বীপটি সক্কর পর্ব্বতের একটি অংশ এবং ইহার সকল দিকে অতি উচ্চ প্রাচীর ছিল; এই জন্য শত্রুপক্ষ সকলে ইহা জয় করিতে পারিত না। আলোর জয় করিয়া মুসলমানরা ক্রমে ক্রমে সিন্ধু নদের দ্বীপগুলি জয় করিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু বক্করদ্বীপ এবং



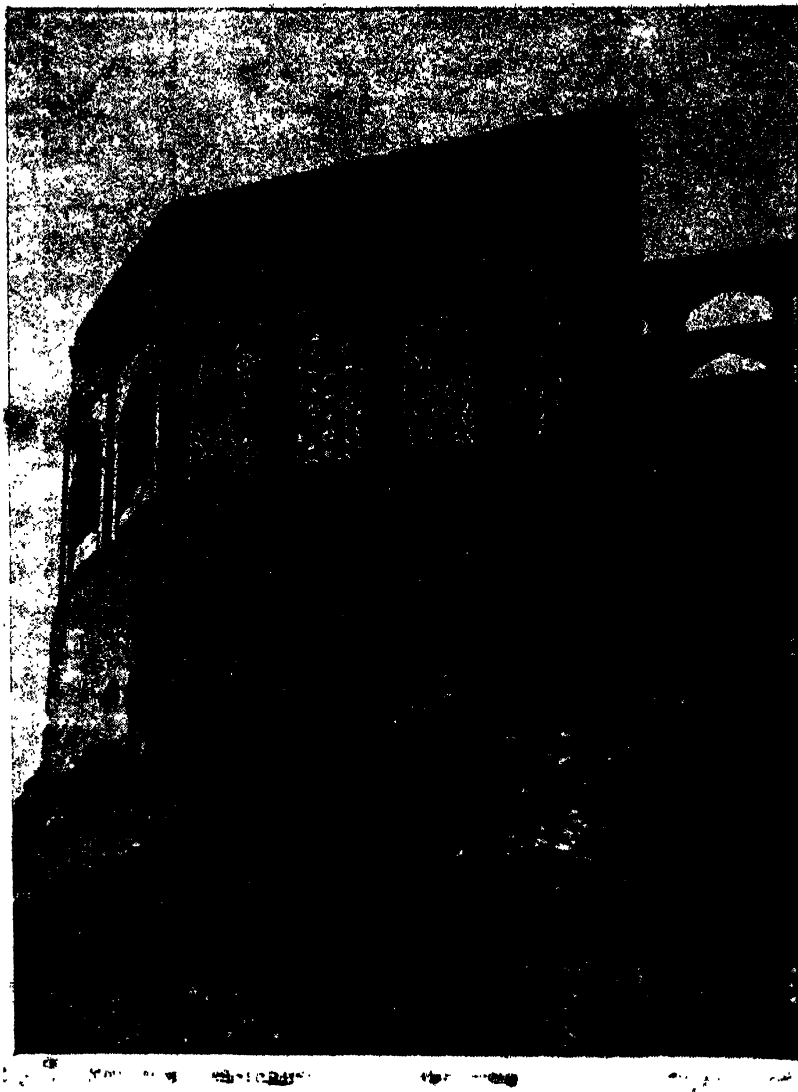
সিন্ধু-নদের উপরে সেতু



সত্যান-জো-ঠানের প্রাচীন মসজিদ

তাহার নিকট আরও দুই একটি ছোট দ্বীপ রাজপুতদের হাতে রহিয়া গেল। তখন প্রায় সমস্ত সিন্ধুদেশ মুসলমানদিগের অধিকারে আসিয়াছে এবং বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী সিন্ধুবাসীরা মুসলমানদিগকে তাহাদের বন্ধু মনে করিয়া শত্রুর সহিত যোগ দিয়াছে। কোন দিক হইতে সাহায্য না পাইয়া রাজপুতরা প্রতিদিনের যুদ্ধে সংখ্যায় কমিতে লাগিল। ক্রমে যখন বক্রদুর্গের খাদ্য ফুরাইয়া আসিল, তখন রাজপুতরা বুঝিল যে, আর অধিক দিন তাহাদিগের পক্ষে দুর্গ রক্ষা করা সহজ নয়—তখন তাহারা জহরব্রত অবলম্বন করিল। সমস্ত রাজপুতনারী নিকটবর্ত্তী একটি ক্ষুদ্র দ্বীপে পাঠাইয়া দিয়া সিন্ধুদেশের শেষ কয়জন রাজপুত মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইল। সেই ক্ষুদ্র দ্বীপে এক বিশাল চিতা প্রজ্জলিত হইল, নানপন্থী ধর্ম্মের চিরপ্রজ্জলিত অগ্নির অংশ লইয়া রক্তবস্ত্রপরিহিতা রক্তচন্দনে সজ্জিতা রাজপুত-সতীরা সাতবার চিতা প্রদক্ষিণ করিয়া চিতার কাষ্ঠরাশিতে অগ্নি সংযোগ করিল এবং তাহার পরে নিজ নিজ পতির নাম গ্রহণ করিয়া ও পরস্পরের নিকট বিদায় লইয়া সকলে চিতানলে লম্ফ প্রদান করিয়া সতীধর্ম্ম রক্ষা করিল। রাজপুত মহিলারা যখন চিতারোহণ করিতেছিলেন, তখন এক শত সশস্ত্র রাজপুত মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া সেই ক্ষুদ্র দ্বীপ রক্ষা করিতেছিল। রাজপুত মহিলাদিগের দেহ ভস্মীভূত হইলে তাঁহাদের দাসীরা যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া চিতারোহণ করিল। তাহাদের চিতানলে প্রবেশ-কালে সহস্র সহস্র অগ্নিকণা বায়ুভরে আকাশে উঠিয়া বক্রদ্বীপের রাজপুতবীরদিগকে জানাইয়া দিল যে, রাজপুত-মহিলা সতীধর্ম্ম বিস্মৃত হয় নাই। তখন সেই মুষ্টিমেয় রাজপুত সেনা রক্তাম্বর পরিধান করিয়া দুর্গদ্বার মুক্ত করিয়া মুসলমান সৈন্য-সমুদ্রে প্রবেশ করিল। তাহাদের মৃতদেহের উপর দিয়া আরবগণ বক্রদুর্গে প্রবেশ করিল।

আজও সিন্ধুদেশে হিন্দু আছে; কিন্তু রাজপুত নাই। সিন্ধুদেশের হিন্দু রাজপুতবীর ও রাজপুতনারীর অসামান্য বীরত্ব ও অলৌকিক আত্মত্যাগ বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু মুসলমান হইয়াও সিন্ধুনারী সতীধর্ম্ম বিস্মৃত হয় নাই। নাথ-ধর্ম্মের অনন্ত জ্যোতিঃ লইয়া রাজপুত-সতী যে বিশাল চিতা প্রজ্জলিত করিয়াছিল, তাহার অগ্নি এখনও নির্ব্বাপিত হয় নাই। এই ক্ষুদ্র দ্বীপ উত্তর সিন্ধুদেশে সতীস্থান নামে পরিচিত। সিন্ধী ভাষায় সতীস্থান -"সত্যান্-জো-ঠান্" আকার ধারণ করিয়াছে। দ্বীপের উপরে পরবর্ত্তী যুগে



বক্কর দুর্গ

অনেকগুলি কবর এবং একটি মসজিদ আছে। দ্বীপটির পূর্ব্ব-দিকে উপরে একটি উঠিবার সিঁড়ি আছে। এই দিকে এক কালে সিন্ধুনদের একটি শাখা ছিল; কিন্তু এখন আর সে শাখা দিয়া জল বহে না. সুতরাং 'সত্যান্-জো-ঠান্' দ্বীপটি এখন রোহরী নগরের শামিল হইয়া গিয়াছে। দ্বীপটি এক কালে একটি ছোট পর্ব্বত ছিল, এই জন্য ইহার উপরে উঠিতে সিঁড়ির প্রয়োজন হয়। দ্বীপের উপরটি সমান করিয়া একটি প্রকাণ্ড চত্বর করা হইয়াছে। দ্বীপের পাশে পাশে এই চত্বরটি দ্বিতল। ইহার নীচের তলে মুসলমান মুজাওর বা সেবায়েতদিগের বাসস্থান এবং সিন্ধু-সতীদিগের চিতাগ্নির মন্দির আছে। দ্বিতল মুক্ত, তাহার উপরে সারি সারি মুসলমান সাধু-দিগের সমাধি। একটি সমাধি সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ এবং হরিদ্রাবর্ণের প্রস্তর-নির্ম্মিত, বাকী সমাধিগুলি নানাবর্ণের মীনা করা ইষ্টকে নির্ম্মিত এবং কতক বা হরিদ্রাবর্ণের প্রস্তরে নির্ম্মিত। এই সমস্ত সমাধিতে যে খোদিত লিপি আছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, কবরগুলি পঞ্চদশ ও ষোড়শ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল। মীনা করা ইষ্টকের কবরগুলি দেখিতে অতি সুন্দর। দ্বীপের উপরে আর একটি মসজিদ আছে, কিন্তু সেটি তেমন পুরাতন নহে। তাহা মীনা করা ইষ্টকের তৈয়ারী।

বহু মুসলমান কবর নির্ম্মিত হইয়াছে; কিন্তু এই সমস্ত কবরের নিম্নে একটি অন্ধকারময় প্রকোষ্ঠে সিন্ধুনারী সতী বীরনারীর চিতাগ্নি এখনও প্রজ্বলিত করিয়া রাখিয়াছে। মুসলমান সিন্ধুনারী সে প্রকোষ্ঠে পুরুষকে প্রবেশ করিতে দেয় না।

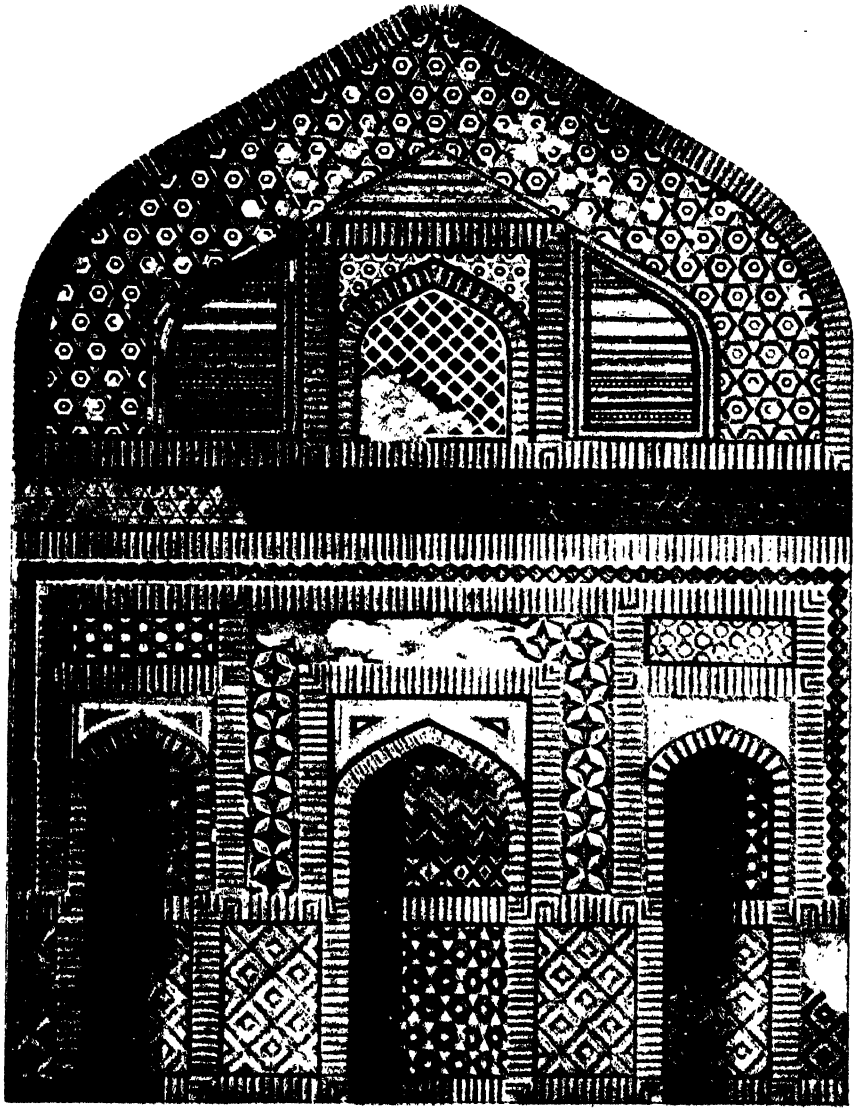
"সত্যান্-জো-ঠান্" দ্বীপের তলদেশে একটি প্রাচীন মসজিদ আছে, প্রবাদানুসারে এই মসজিদটি আরবজাতীয় সিন্ধুবিজেতা মহম্মদ-বিন-কাশিম কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। বক্কর দ্বীপের ন্যায় এই দ্বীপটিও সক্কর পর্ব্বতের একটি অংশ এবং ইহার উপরে খৃষ্টীয় পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর

"সত্যান্-জো-ঠান্" দ্বীপের পশ্চিমদিকে বক্কর দ্বীপ। মুসলমানী আমলে বক্কর দ্বীপের উপরে একটি বড় কিল্লা তৈয়ার করা হইয়াছিল। তাহার প্রাচীর এখন নদীর ধারে ধারে দাঁড়াইয়া আছে। North Western Railway

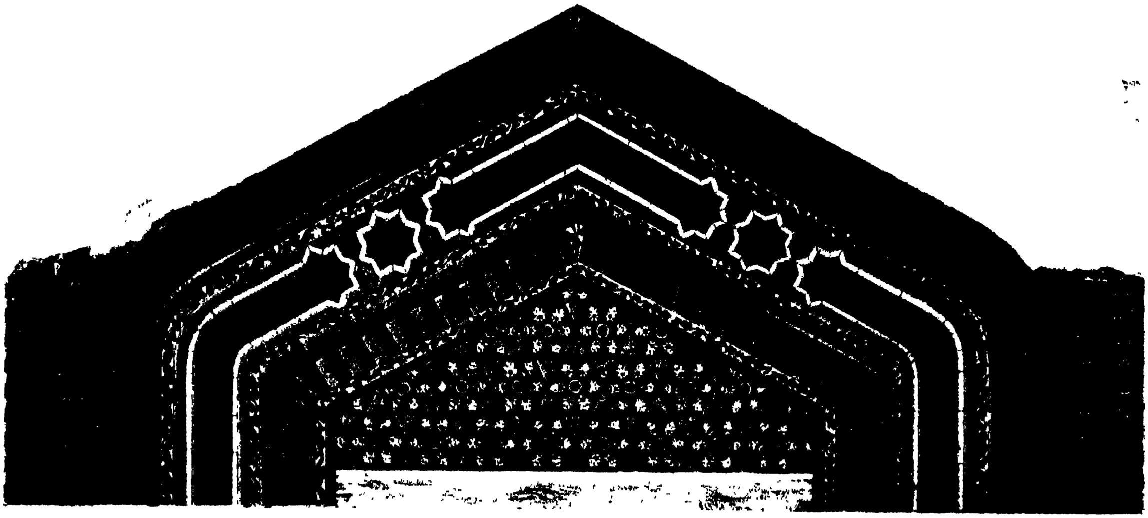
যখন সিন্ধুনদের উপরে প্রথম সেতু নির্ম্মাণ করেন, তখন বক্কর দ্বীপের উপর দিয়া সেতুটি তৈয়ার হইয়াছিল। রোহরী হইতে বক্কর পর্য্যন্ত সেতুটি Cantilever সেতু এবং ইহা ভারতবর্ষের একটি আশ্চর্য্য জিনিষ। এই সেতু নির্ম্মাণকালে বক্কর-দুর্গের ভিতরে যে সমস্ত ঘরবাড়ী ছিল, তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছিল। বক্করের দক্ষিণে আর একটি ছোট দ্বীপ আছে, তাহার নাম "সাধবেলো," সিন্ধী ভাষায় ইহার অর্থ সাধুদের বন। এই দ্বীপের উপরে সনাতনপন্থী শিখদের একটি মঠ আছে, এই মঠে মুসলমানী আমলে বক্কর দুর্গের একটি মানচিত্র আছে। সাধবেলোর অপর দিকে অর্থাৎ বক্কর দ্বীপের উত্তরে আর একটি ছোট দ্বীপের উপরে একটি মুসলমান সাধুর সমাধি আছে, সাধারণ অশিক্ষিত সিন্ধী মুসলমানের নিকটে এই সাধু জিন্দাপীর নামে পরিচিত। সিন্ধুদেশের লোক বলে যে, ইলিসমাছ সমুদ্র হইতে উজান বহিয়া বক্কর পর্য্যন্ত আইসে এবং জিন্দাপীরের দুয়ারে মাথা ঠুকিয়া আবার সমুদ্রে ফিরিয়া যায়। এই প্রবাদের কারণ বুঝা যায় না; কিন্তু বক্করের উত্তরেও ইলিসমাছ পাওয়া যায়। কাশমোর, চাচরাণ প্রভৃতি স্থানেও ইলিসমাছ পাওয়া যায়; কিন্তু তাহারা করাচী বা ঠাঠার ইলিসমাছের মত সুস্বাদু নহে।

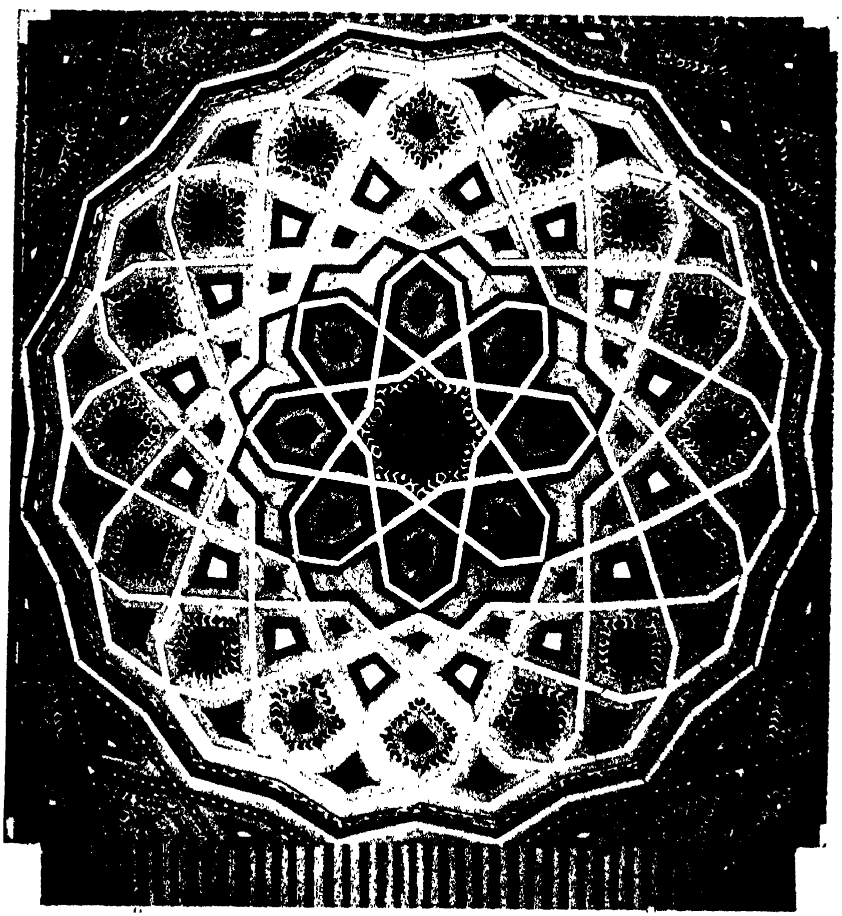
বক্কর দ্বীপের পশ্চিমে সিন্ধুনদের পশ্চিমতীরে সক্কর নগর অবস্থিত। এই নগর এখন সক্কর জেলার প্রধান নগর। জজ্, ম্যাজিষ্ট্রেট্ প্রভৃতি রাজকর্ম্মচারীরা এই স্থানে বাস করেন। North Western Railwayর District Traffic Superintendentএর অফিস এই সক্কর সহরে আছে এবং সেই জন্য দুই এক জন বাঙ্গালী সক্করে দেখিতে পাওয়া যায়। সক্কর নগরে প্রধান দ্রষ্টব্য পদার্থ মীর-মাসুম-জো-মিনার। মীর মাসুম নামক এক জন মুসলমান এই মিনারটি ১০০৩ হিজিরাব্দে নির্ম্মাণ আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পুত্র মীর বুজুর্গ মানওর ১০২৭ হিজিরাব্দে ইহা শেষ করিয়াছিলেন। খৃষ্টাব্দের হিসাবে ইহা ১৫৯৪ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ হইয়া ১৬১৮ খৃষ্টাব্দে শেষ হইয়াছিল। সিন্ধুদেশে এত উচ্চ মিনার আর নাই। আগে ইহার উপরে উঠিয়া লোক আত্মহত্যা করিত বলিয়া ইহার উপরে বারান্দা লোহার শিক দিয়া ঘিরিয়া দেওয়া হইয়াছে। মিনারের চারিদিকে দরিদ্রাবর্ণের অনেকগুলি সমাধিমন্দির আছে। একটি সমাধিমন্দির মাসুমের পিতা মীর সফাইয়ের সমাধি। ৯৯১ হিজিরাব্দে (১৫৮৩ খৃষ্টাব্দে) তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। মিনার-নির্ম্মাতা মাসুম শাহের সমাধি এই স্থানে আছে। ১০১৪ হিজিরাব্দে (১৬০৫ খৃষ্টাব্দে) তাহার মৃত্যু হইয়াছিল। মাসুম শাহের বংশধররা এখন মাসুমী সৈয়দ নামে পরিচিত এবং এই স্থানে তাহাদের অনেকের সমাধি আছে। মিনারের নিকটে কোন মস্‌জিদ্ নাই; সুতরাং মিনারটি কেন নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা বলিতে পারা যায় না।

সক্কর নগরে অনেক পুরাতন মস্‌জিদ ও কবর আছে। এই সমস্ত ইমারতে রঙ্গীন মীনা করা টালীর অতি সুন্দর কায দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে পুরাতন সক্কর সহরে অর্থাৎ রেল-লাইনের উত্তরদিকে সহরের যে অংশ অবস্থিত, তথায় মহম্মদ আবদুল বাকী পুরাণী নামক মুসলমান সাধুর সমাধির নিকটে একটি পুরাতন মস্‌জিদ আছে। এই মস্‌জিদে রঙ্গীন মীনা করা টালী দেওয়া সমস্ত ভিতর ও বাহির এবং ছাদ সাজান হইয়াছিল। মস্‌জিদের প্রধান মিহরাব ও পশ্চাতের দেওয়াল এইরূপ মীনা করা টালীর কাযের জন্য একখানি সুন্দর বহুবর্ণরঞ্জিত গালিচার মত দেখায়। মস্‌জিদের যে অংশ পড়িয়া গিয়াছে, সেই অংশেও এইরূপ মীনা করা টালীর চিত্র আছে। মস্‌জিদের ছাদের অধিকাংশ পুড়িয়া গিয়াছে, কিন্তু যে অংশ বর্ত্তমান আছে, তাহার একটি গুম্বজের নীচে এমন সুন্দর মীনা করা টালীর কায আছে যে, তাহা দেখিলে এখনও তাজ-মহলের Pictra Dura কায বলিয়া বোধ হয়। মীনা করা টালীর উপর এত সূক্ষ্ম কায কেবল এই মস্‌জিদটিতেই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শিল্পের নমুনা। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী হইতে মীনা করা টালীর নক্সা খারাপ হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। সর্ব্বপ্রথমে টালীর রং একবর্ণের হইয়া যায়। তাহার পরে টালীর ফুলের কায এবং সাজাইবার কায়দা বদলাইয়া যায়। ত্রিবর্ণের চতুর্থ চিত্রখানি খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর একটি কবরের। ইহা সক্করের কালেক্টর সাহেবের কাছারীর নিকট অবস্থিত। এই টালীর কাযের সহিত অবশিষ্ট তিনখানি ত্রিবর্ণ চিত্রের টালীর কায মিলাইয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, পঞ্চদশ শতাব্দীর কাযে আর সপ্তদশ শতাব্দীর শিল্প-নিদর্শনে কত তফাৎ। এই সুন্দর









মীনা করা টালী দেওয়া সাজান কবর ও মসজিদগুলি ক্রমশঃ লুপ্ত হইতেছে। ইহার মেরামত হয় না, কারণ, সিন্দুদেশের মুসলমানরা মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ অবলম্বনের অনেক পূর্ব্ব হইতেই ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিদ্বেষী। তাহারা কবর ও মসজিদ খৃষ্টীয়ান রাজার অর্থে সহজে মেরামত করাইতে চায় না, সুতরাং প্রাচীন ভারতের এই শিল্প-নিদর্শনগুলি ক্রমশঃ লুপ্ত হইয়া যাইতেছে। মীনা করা টালী খুলিয়া পড়িলে দর্শকরা লইয়া যায়, অথবা দোকানদাররা লইয়া গিয়া curious বলিয়া সাহেব-মেমেদের নিকট বিক্রয় করে।

সিন্ধুনদের পূর্ব্বতটে অবস্থিত রোহরী নগরের অদূরে সিন্ধুর একটি পুরাতন খাদ আছে। ইংরাজের আমলে এই খাদটি কাটাইয়া ইহাকে খাল করা হইয়াছে, এই খাল দিয়া সিন্ধুনদের জল বহুদূর গিয়া উভয় তীরের মরুভূমিকে উর্ব্বর করিয়া তুলিয়াছে। এই পুরাতন খাদের নাম পূর্ব্বনরা। পূর্ব্বনরার উত্তর ও দক্ষিণে সিন্ধুনদের আরও কতকগুলি পুরাতন খাদ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত খাদ মরিয়া গিয়াছে এবং ইহাদের গর্ভে এখনও চাষ হয়। এইরূপ একটি খাদের তীরে রোহরী নগর হইতে ৫ মাইল দূরে উত্তর সিন্ধুর পুরাতন রাজধানী আলোর নগর অবস্থিত। আলোর এখন একটি ক্ষুদ্র গ্রাম এবং একটি উচ্চ ঢিপির উপর অবস্থিত। লোক বলে যে, এই ঢিপিটি এককালে ডাহির রাজার প্রাসাদ ছিল। আলোর গ্রামের চারিদিকে উচ্চ ইষ্টকের স্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়; তাহার মধ্যে আকবরের পয়সা এবং দুররাণী পাঠানজাতীয় কাবুলের সুলতানদের অনেক টাকা পাওয়া যায়।

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

নববর্ষে

নবীন বরষে আজিকে সকলি পুনর্নব,
পুরাতন কেন র'বে সখি শুধু প্রণয় তব?
তরুর অঙ্গে পাণ্ডু পত্র পড়েছে ঝরি'
নব কিসলয়ে উঠেছে তাদের অঙ্গ ভরি'।
নূতন পালক গজায়ে উঠেছে পাখীর গায়ে,
নূতন হরষ নূতন পরশ মলয় বায়ে,
কপোতকণ্ঠে নব রুচি নব চিক্কণতা,
নব ফল-ফুলে মঞ্জুমুকুলে আনতা লতা,
নূতন বরষে নূতন যে দিকে যত নিরখি,
আমাদের প্রেম র'বে পুরাতন কেন বা সখি?

নূতন বরষে নির্ম্মোকজাল মোচন করে'
গেহ-অরণ্য দেহ-তারুণ্যে উঠেছে ভরে';
নবীন বর্ষে নব বর্ষণ নবীন মেঘে
কৃষক ছুটেছে নূতন আবেগে নূতন বেগে।
সরস ভূমিতে নূতন আঁকুর উঠিছে ফুঁড়ি'
বটের শাখায় রাঙা ফল, দেহে নূতন ঝুরি।
কালবৈশাখী সম্মার্জ্জনী চালায় জুড়ে
যত জীর্ণতা জঞ্জালজাল যেতেছে উড়ে।
আজি বিশ্বের ঘরে ঘরে হের নূতন খাতা,
মোরা কি ঘাঁটিব প্রেমের পুঁথির পুরাণো পাতা?

আজিকে জীর্ণ-সংস্করণ জগৎ ভরে'
মোদের প্রণয়ো ভেঙে গড়ি এস নূতন করে'।
নূতন সোয়াদ তোমার অধরে লভিয়ে প্রিয়া
পরশে নবীন পুলক উঠিছে কণ্টকিয়া।
এস নব শুভদৃষ্টিতে পুন মিলাই আঁখি,
সবই চাই এবে সেবার লাজে যা' পড়িল বাকী,
ঝেড়ে ফেল' অই বাসরঘরের জমাট ধূলি,
আবার আমরা রজনী জাগিব সকল ভুলি',
দূরে যাক আজি যত অতিপরিচয়ের গ্লানি
নূতন করিয়া বরি' তোমা এস হৃদয়রাণী।

শ্রীকালিদাস রায়।

বঙ্গ-সাহিত্যে হিন্দু মুসলমান

১

চৈতন্য-চরিতামৃত যে মোগলযুগের গ্রন্থ, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

বাঙ্গালার শেষ পাঠান বাদশা দাউদ শা করবাণি ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে রাজমহলের যুদ্ধে মোগলসম্রাট আক্‌বর শাহের সেনাপতি তোড়রমল্ল ও খান্ জমানের হস্তে পরাজিত ও নিহত হন। সেই দিন থেকেই বাঙ্গালায় মোগলের আমল সুরু হয়। অপর পক্ষে শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের মতে চৈতন্য-চরিতামৃতের রচনাকাল হচ্ছে ১৯০৬-১৯১৫ খৃষ্টাব্দ।

তবে এ গ্রন্থ যে পাঠানযুগের নয়, এমন কথা বলা কঠিন। বাঙ্গালায় রাজার যে জাত বদলে গিয়েছে, কবিরাজ গোস্বামী মহাশয়ের গ্রন্থে তাহার কোনরূপ ইঙ্গিত নেই। সেকালের বঙ্গ-সাহিত্য প'ড়ে মনে হয় যে, কে কবে দেশের রাজা হলেন, সে বিষয়ে হিন্দুরা সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল। এর একটা কারণ বোধ হয় এই যে, রাজা যে-ই থাকুন না কেন, দেশ ছিল সেকালে অরাজক। জনৈক ইংরাজ ঐতিহাসিক বাঙ্গালার পাঠানযুগ সম্বন্ধে বলেছেন,—

"As we look back on the scenes which have been presented on the stage, what do we see? A long procession of foreign rulers, fierce, cruel, alien in race and faith to the people of the country; long periods of unrest, turmoil and revolution stained with murder and rapine, shorter intervals when the land had rest under a strong ruler, when the war-cloud rolled away to the west and when the arts of peace flourished in a prosperous country under a cultured and luxurious sovereign." (J. A. Bourdillon "Bengal under the Muhammadans"—quoted by Vincent Smith.)

উপরি-উক্ত কথা ক'টি সত্য কি মিথ্যা, তা পাঠক বাঙ্গালার ইতিহাস নিজে প'ড়ে স্থির করবেন।

সেকালে রাজসিংহাসন এত ঘন ঘন হস্তান্তরিত হ'ত যে, কে কবে তক্তে চড়লেন, প্রজার পক্ষে তাহার হিসেব রাখা অসম্ভব ছিল। বক্তিয়ার খিলিজীর বঙ্গে আগমনের তারিখ থেকে দাউদ শার মৃত্যুর তারিখ তক ৩৭৭ বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালায় ৬৩ জন রাজা হয়েছিলেন। অর্থাৎ গড়-পড়তায় এক এক রাজার রাজত্বকাল ছিল ৬ বৎসর। ইহা হইতে অনেকে হয় ত মনে করবেন যে, গৌড়ের বাদশাদের ভগবদ্দত্ত পরমায়ু তেমন বেশী ছিল না। কিন্তু বস্তুগত্যা ঘটনা তা নয়। এই সব পাঠান-বাদশাদের দেহ অতি বলিষ্ঠ ছিল। রোগে তাঁ'দের খুব কম লোকেরই মৃত্যু হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে অধিকাংশেরই অপমৃত্যু ঘটে,—কখনও পুত্রের, কখনও ভ্রাতার, কখনও মন্ত্রীর হাতে। ফলে তাঁ'দের কারও রাজত্বকাল ছিল, দু' তিন মাস, কারও আবার দু' তিন দিন। রাজপাটের এ রকম নিত্য নিয়মিত টলমল অবস্থায় প্রজারা যে রাজবংশ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন হবে, তা'তে আর আশ্চর্য্য কি?

আর এক কথা, কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় চৈতন্যের জীবনচরিত লিখতে বসেছিলেন, সুতরাং তিনি যে সকল ঘটনার উল্লেখ করেছেন—সে সবই ঘটেছিল পাঠানযুগে।

চৈতন্য চরিতামৃতে বাঙ্গালাদেশে হিন্দু-মুসলমানের পরস্পর কি রকম সম্বন্ধ ছিল, তাহার সন্ধান বড় একটা পাওয়া যায় না। তবে এ গ্রন্থের বিশেষত্ব এই যে, কাশী, প্রয়াগ, বৃন্দাবন প্রভৃতির অনেক খবর এতে পাওয়া যায়। চৈতন্য-চরিতামৃতের অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে একটি ঘটনার উল্লেখ আছে—সে বর্ণনা আমি এখানে উদ্ধৃত ক'রে দেবার লোভ সংবরণ করতে পাচ্ছি নে।

এ স্থলে কৈফিয়ৎস্বরূপে একটি কথা বলা প্রয়োজন। ইংরাজীতে এক রকম রচনাকে কাঁচি-লেইয়ের কাষ বলে। অপরের লেখা দেদার উদ্ধার ক'রে যে রচনা খাড়া করা যায়, সে রচনা যে পরের বইয়ের পাতা এখানে ওখানে

কাঁচি দিয়ে কেটে শেষটা সেই সব ছিন্ন পত্রকে আঠা দিয়ে জুড়ে একত্র করা হয়, এই হচ্ছে ইংরাজদের ধারণা। আমার লেখার সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে, তাঁরাই জানেন যে, সাহিত্যে আমি পরের ধনে পোদ্দারি করতে ভালবাসিনে, ফলে আমার লেখা কোটেশান-কণ্টকিত হয়। তবে যে এ সব প্রবন্ধে আমি কাঁচি-লেইয়ের কায করছি, তার প্রধান কারণ, পূর্ব্ব-লেখকদের কথা, আমি তাঁদের জবানীই সকলকে শোনাতে চাই। চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতির পদ্য আমি গদ্যে রূপান্তরিত এই ভয়ে করছিনে, পাছে লোক বলে যে, বৃন্দাবন দাস প্রভৃতির বেনামিতে আমি নিজের মতামত প্রকাশ করছি, নিজের অনুরাগ-বিরাগ ব্যক্ত করছি; বিশেষতঃ যখন এ সকল গ্রন্থের সঙ্গে অধিকাংশ সুশিক্ষিত লোকের মুখ দেখাদেখি নেই।

২

মহাপ্রভু যখন বৃন্দাবন থেকে প্রয়াগযাত্রা করেন, তখন দুটি হিন্দুস্থানী তাঁহার সহযাত্রী হন; কারণ—

"প্রেমী কৃষ্ণদাস আর সেই-ত ব্রাহ্মণ।
গঙ্গাতীর পথে যাইবার ঠিক দুই জন॥"

কৃষ্ণদাস নামে মহাপ্রভুর ভক্তটি ছিলেন জাতে রাজপুত। উপরন্তু তাঁ'র সঙ্গে ছিল বলদেব ভট্টাচার্য্য এবং অপর দু'টি বাঙ্গালী।

পথিমধ্যে:—

"আচম্বিতে এক গোপ বংশী বাজাইল।
শুনিতেই মহাপ্রভুর প্রেমাবেশ হইল॥
অচেতন হঞা প্রভু ভূমিতে পড়িলা।
মুখে ফেন পড়ে নাসায় শ্বাস রুদ্ধ হৈলা॥"

মহাপ্রভু প্রেমাবেশে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়বামাত্র:—

"হেন কালে তাঁহা আসোয়ার দশ আইল।
ম্লেচ্ছ-পাঠান ঘোড়া হইতে উত্তরিল॥
প্রভুকে দেখিয়া ম্লেচ্ছ করয়ে বিচার।
এই যতি-পাশ ছিল সুবর্ণ অপার॥
এই পঞ্চ বাটোয়ার ধুতুরা খাওয়াইয়া।
মারি ডারিয়াছে যতির সব ধন লৈয়া॥"

উক্ত পাঠানদের এ সন্দেহ নিতান্ত অকারণ বলা যায় না। পথিককে ধুতুরা খাইয়ে তার সর্ব্বস্ব অপহরণ করবার প্রথা কিছু দিন পূর্ব্বেও ও দেশে প্রচলিত ছিল। কর্ণেল Sleemanএর গ্রন্থে ইহার দেদার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু উক্ত সন্ন্যাসীর কাছে যে "অপার সুবর্ণ" ছিল, এ অদ্ভুত ধারণা অশ্বারোহী পাঠানদের মনে কি কারণে জন্মাল? হয় ত সেকালে ধনরত্ন নিয়ে দেশান্তরে যেতে হ'লে, লোক সন্ন্যাসী সেজে পথ চলতেন ডাকাতের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য। বুদ্ধদেব তাঁহার পিতাকে সন্ন্যাসের মাহাত্ম্য বোঝাবার জন্য তার আর পাঁচটি গুণের মধ্যে একটি এই গুণ উল্লেখ করেছিলেন যে, লোক কাষায়-বস্ত্র ধারণ ক'রে পথ চললে চোর-ডাকাত তাকে ছোঁয় না। সে যাই হোক্,—

"তবে সেই পাঠান পঞ্চজনেরে বান্ধিলা।
কাটিতে চাহে, গৌড়িয়া সব কাঁপিতা লাগিলা॥"

ইহা হইতে সেকালের বাঙ্গালীর পৌরুষের পরিচয় পাওয়া যায় না, বরং হিন্দুস্থানীদের তুলনায় তাঁরা যে ভীরু ছিলেন, তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এখন শুনুন, চৈতন্যদেবের ভক্ত পরম বৈষ্ণব হিন্দুস্থানীযুগল ও অবস্থায় কি করলেন।

"সেই কৃষ্ণদাস রাজপুত নির্ভয় বড়।
সেই ত মাথুর বিপ্র নির্ভয়, মুখে বড় দড়॥
বিপ্র কহে পাঠান তোমার পাৎসার দোহাই।
চল তুমি আমি সিকদার পাস যাই॥
এই যতি আমার গুরু আমি মাথুর ব্রাহ্মণ।
পাৎসাহার আগে আছে মোর শত জন॥
এই যতি ব্যাধিতে হয়েছে মূর্চ্ছিত।
অবহি চেতন পাবে হইবে সম্বিত॥
ক্ষণেক ইহাঁ বৈস বান্ধি রাখ সবাকারে।
ইঁহাকে পুছিয়া তবে মারিহ সবারে॥"

এ কথার উত্তরে:—

"পাঠান কহে তুমি পশ্চিমা, সাধু দুই জন।
গৌড়িয়া ঠগ এই কাঁপে তিন জন॥"

বাঙ্গালা থেকে তিন জন বাঙ্গালী বৃন্দাবন অঞ্চলে ডাকাতি করতে এসেছে। পাঠানদের মনে এরূপ সন্দেহ হবার একমাত্র কারণ—তাঁ'রা তিন জন ভয়ে কাঁপছিলেন। এই demenour দেখেই পাঠানরা স্থির করলে যে, এই তিন ব্যক্তিই "ঠগি।" এবং সম্ভবতঃ এই তিন জনকেই পাঠানরা বধ করত, যদি না কৃষ্ণদাস তাদের রক্ষা করতেন।

"কৃষ্ণদাস কহে আমার ঘর এই গ্রামে।
দুই শত তুড়কী (তুর্কী) আছে শতেক কামানে॥
এখন আসিবে যদি আমি ত ফুকারী।
ঘোড়া পিড়া লবে সব তোমা সবে মারি॥
গৌড়িয়া বাটপাড় নহে তুমি বাটপাড়।
তীর্থবাসী লুঠ আর চাহ মারিবার॥"

কবিরাজ গোস্বামী যে বলেছেন যে, "কৃষ্ণদাস রাজপুত নির্ভয় বড়, আর "মাথুর বিপ্র নির্ভয় মুখে বড় দড়" তাঁ'র এ কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। অতঃপর মহাপ্রভু চেতন পাইলেন।

তখন—

"ম্লেচ্ছগণ আসি দূরে বন্দিল চরণ।
প্রভু আগে কহে, এই ঠক্ পাঁচ জন॥
এই পঞ্চ মিলি তোমায় ধুতুরা খাওয়াইয়া।
তোমার সব ধন নিল পাগল করিয়া॥"

মহাপ্রভুকে পাগল করা হয়েছে, এ সন্দেহ যে তাঁরা করেছিলেন, তাহার কারণ—চৈতন্যদেব জ্ঞানলাভ করেই,—

"হুঙ্কার করিয়া উঠে বলে হরি হরি,
প্রেমাবেগে নৃত্য করে ঊর্দ্ধবাহু করি।"

অতঃপর মহাপ্রভু পাঠানদের সন্দেহ এই ব'লে দূর করলেন :—

"প্রভু কহেন ঠক নহেন মোর সঙ্গী জন।
ভিক্ষুক সন্ন্যাসী মোর নাহি কিছু ধন॥
মৃগী ব্যাধিতে আমি কভু হই অচেতন।
এই পাঁচ দয়া করি করেন পালন॥"

৩

মহাপ্রভুর সঙ্গে ঘোড়সোয়ার পাঠানদের কথোপকথন এইখানেই শেষ হয় নি। কৃষ্ণদাস যেমন পরম বৈষ্ণব হওয়া সত্ত্বেও সিপাহী ছিলেন, তেমনই এই পাঠানরা সিপাহী হওয়া সত্ত্বেও ধর্ম্মজ্ঞ ছিলেন। ফলে মহাপ্রভুর সঙ্গে তাঁহাদের ধর্ম্মবিচার সুরু হ'ল। সে বিচার ও তাহার ফলাফলের বিষয় নিয়ে বিবৃত করছি—

"সেই ম্লেচ্ছমধ্যে এক পরম গম্ভীর।
কালো বস্ত্র পরে সেই, লোকে কহে পীর॥
চিত্ত আর্দ্র হৈল তার প্রভুরে দেখিয়া।
নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম স্থাপে, স্বশাস্ত্র উঠাইয়া॥
অদ্বয় ব্রহ্ম সেই করিল স্থাপন।
তার শাস্ত্র যুক্ত্যে প্রভু করিল খণ্ডন॥"

মহাপ্রভু যে অদ্বৈতবাদের ঘোর বিরোধী ছিলেন, তাহার পরিচয় আমরা তাঁহার পুরীতে সার্ব্বভৌমের সঙ্গে বিচারে ও কাশীতে প্রকাশানন্দের সঙ্গে বিচারে পাই। সার্ব্বভৌম ও প্রকাশানন্দ উভয়েই বৈদান্তিক ছিলেন, সুতরাং সংস্কৃত শাস্ত্রে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত চৈতন্যদেব যে তাঁহাদিগকে শাস্ত্রবিচারে পরাস্ত করেছিলেন, তা'তে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই। কিন্তু সেকালে মুসলমানদের ভিতরও যে অদ্বৈতবাদী পীর ছিলেন, এটা একটু নূতন কথা। সম্ভবতঃ ঐ "পরম গম্ভীর" ম্লেচ্ছটি জনৈক "সুফি" ছিলেন। কিন্তু তিনি যে তাঁহার মত মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্রের সাহায্যে স্থাপনা করেছিলেন, এইটিই বড় আশ্চর্য্যের বিষয়। আমরা ত চিরকাল শুনে আস্‌ছি যে, মুসলমানধর্ম্ম খৃষ্টানধর্ম্মের মত Personal Godএর বিশ্বাসের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। এর চাইতে আরও আশ্চর্য্য কথা এই যে, মহাপ্রভু মুসলমান-শাস্ত্রের সাহায্যেই তা'র অদ্বৈতমত খণ্ডন করেন।

মহাপ্রভুর যে কোরাণেও অধিকার ছিল, এ কথা কখন স্বপ্নেও ভাবিনি। সে যাই হোক, এখন তাঁ'র কথা শোনা যাক,—

"প্রভু কহে তোমার শাস্ত্র কহে নির্ব্বিশেষ।
তাহা খণ্ডি সবিশেষ স্থাপিয়াছে শেষ॥
তোমার শাস্ত্রে কহে শেষে একই ঈশ্বর।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ তিঁহ শ্যাম কলেবর॥"

কোরাণ, প্রথমে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম স্থাপনা করে, তা'র পরে তা'র খণ্ডন করে, শেষে সবিশেষ একই ঈশ্বর স্থাপনা করেছেন কি না, সে কথা মৌলবীরা বলতে পারেন। কিন্তু মহাপ্রভুর ধারণা যে এরূপ ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কারণ, তিনি পীর সাহেবকে বলেন যে,—

"তোমার পণ্ডিতসবের নাহি শাস্ত্রজ্ঞান।
পূর্ব্বাপর বিধি মধ্যে পর বলবান॥
নিজ শাস্ত্র দেখ তুমি বিচার করিয়া।
কি লিখিয়াছে তাতে, শেষ বিচারিয়া॥"

উত্তরে,—

"ম্লেচ্ছ কহে যেই কহ সেই সত্য হয়।
শাস্ত্রে লিখিয়াছে কেহ লইতে না পারয়॥

নির্ব্বিশেষ গোসাঞি লইয়া করেন ব্যাখ্যান।
সাকার গোসাঞি সেব্য কার নাহি জ্ঞান॥

*   *   *   *

অনেক দেখিনু মুঞি ম্লেচ্ছ শাস্ত্র হৈতে।
সাধ্য সাধন বস্তু নারি নির্দ্ধারিতে॥"

ইহার পর তিনি যে চৈতন্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন, সে কথা বলাই বাহুল্য এবং তাঁ'র দেখাদেখি সকল পাঠানই মহাপ্রভুর মতাবলম্বী হয়ে উঠল। কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় লিপিবদ্ধ করেছেন যে,—

"রামদাস বলি প্রভু তাঁর কৈল নাম
আর এক পাঠান তার নাম বিজুলি খান॥
অল্প বয়স তার রাজার কুমার।
রামদাস আদি পাঠান, চাকর তাহার॥
কৃষ্ণ বলি সেই পড়ে মহাপ্রভুর পায়।
প্রভু শ্রীচরণ দিল তাহার মাথায়॥
তাঁ সবারে কৃপা করি প্রভু ত চলিলা।
সেই ত পাঠান সব বৈরাগী হইলা।
পাঠান বৈষ্ণব বলি হইল তার খ্যাতি।
সর্ব্বত্র যাইয়া বুলে মহাপ্রভুর কীর্ত্তি॥
সেই বিজুলীখান হৈল মহা ভাগবত।
সর্ব্ব তীর্থে কহে তাঁর পরম মহত্ত্ব॥
ঐছে লীলা করে প্রভু শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য।
পশ্চিমে আসিয়া কৈল যবনাদি ধন্য॥"

মহাপ্রভু যে পশ্চিমে গিয়ে বহু যবনকে ধন্য অর্থাৎ convert করেছিলেন, এ কথা বিশ্বাস করা একটু শক্ত। এই সবই কবিরাজ গোস্বামী মহাশয়ের কবি-কল্পনা বলেই মনে হয়। কিন্তু তা হলেও আমরা তাঁ'র কথা মান্‌তে বাধ্য। কেন না, তিনি এই ঘটনার বিবরণ দিয়েই বলেছেন যে,—

"অলৌকিক লীলা প্রভুর, অলৌকিক রীতি।
শুনিলেহ ভাগ্যহীনের না হয় প্রতীতি॥
আদ্যোপান্ত চৈতন্যলীলা অলৌকিক জানো।
শ্রদ্ধা করি শুন ইহা সত্য করি মানো॥
যেই তর্ক করে ইহা সেই মূর্খরাজ।
আপনার মুণ্ডে সে আপনি পাড়ে বাজ॥"

নিজেকে ভাগ্যহীন ব'লে স্বীকার করতে আমার কোনই আপত্তি নেই, কিন্তু নিজেকে মূর্খরাজ ব'লে মানার চাইতে চৈতন্য চরিতামৃতের কথা "সত্য করি মানা" ঢের সহজ, অতএব ধ'রে নেওয়া যাক্ যে, উক্ত গ্রন্থের সমস্ত বিবরণ কাল্পনিক নয়, প্রকৃত।

চৈতন্য চরিতামৃতের এই সব কথা থেকে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যে, সেকালে হিন্দু-মুসলমান পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে ধর্ম্মমতের বিচার করত, এবং উভয় সম্প্রদায়ই পরস্পরের ধর্ম্মমত সম্বন্ধে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিল, এবং এর থেকে অনুমান করা যায় যে, সেকালের শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মনে তাদৃশ ধর্ম্মবিদ্বেষ ছিল না। অজ্ঞতাই যে বিদ্বেষবুদ্ধির একটি মূল কারণ, তা ত সবাই জানেন। সত্যের খাতিরে আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে, আমরা আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের অপেক্ষা মুসলমানধর্ম্ম সম্বন্ধে ঢের বেশী অজ্ঞ। আসল কথা, এ যুগে আমরা ধর্ম্মসম্বন্ধে একান্ত উদাসীন। আমরা আজকাল বেদান্তের এ মত মানি যে, "ব্রহ্ম জ্ঞেয়, ধ্যেয় নন" এবং সঙ্গে সঙ্গে মীমাংসার এ মত মানি যে, "ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" নিরর্থক; এই হচ্ছে আমাদের ধর্ম্মবুদ্ধির শেষ কথা। আর আমরা ধর্ম্মের দোহাই দিই একমাত্র পলিটিকাল কারণে।

৪

চৈতন্য-চরিতামৃত মোগলযুগে লিখিত হলেও, মোগলযুগের কোনও কথা ও গ্রন্থে নেই। এমন কি, মোগল শব্দটি ঐ বিপুল গ্রন্থের কোথাও আছে কি না, সে বিষয়েও আমার সন্দেহ আছে।

বাঙ্গালার সিংহাসন যে পাঠানের হাত থেকে মোগলের হাতে চ'লে গিয়েছে, দেশের লোকের সে জ্ঞান যে হয়েছিল, তা'র পরিচয় প্রথম কবি-কঙ্কণ চণ্ডীতে পাওয়া যায়। মোগল বাদশার সেনাপতি মানসিংহ কর্ত্তৃক বঙ্গজয় ঘটনাটি বাঙ্গালার হিন্দুপ্রজার মনে বোধ হয় একটা মহা আশার সঞ্চার করেছিল। মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী তাঁ'র গ্রন্থে লিখেছেন যে:—

"ধন্য রাজা মানসিংহ বিষ্ণু-পদাম্বুজ-ভৃঙ্গ
গৌড়-বঙ্গ-উৎকল-অধিপ॥"

মানসিংহের আমলে প্রজার অবস্থার অবশ্য বিশেষ কোন উন্নতি ঘটে নি, কিন্তু তা'র জন্য মুকুন্দরাম মানসিংহের

দোষ দেননি—দোষ দিয়েছেন প্রজার কপালের। তাঁ'র নিজের কথা এই,—

"সে মানসিংহের কালে প্রজার পাপের ফলে
ডিহিদার মামুদ সরিফ ॥
উজির হলো রায় জাদা, বেপারিরে দেয় খেদা
ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবের হ'ল অরি।
মাপে কোণে দিয়ে দড়া, পনর কাঠায় কুড়া,
নাহি শুনে প্রজার গোহারি ॥
সরকার হইল কাল, খিল ভূমি লেখে লাল,
বিনা উপকারে খায় ধুতি ॥"

এক কথায় রাজার পরিবর্ত্তন হ'ল, কিন্তু রাজকর্ম্মচারী যেমন ছিল, তেমনই থেকে গেল।

তা'র পর ভারতচন্দ্রের গ্রন্থ ত মানসিংহকে অবলম্বন করেই লেখা। বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী ত ভবানন্দ মজুমদার মানসিংহকেই শুনিয়েছিলেন, এবং সেই গল্পই মেজে-ঘসে ভারতচন্দ্র বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচনা করেন। প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য মানসিংহের আমল থেকেই মোগলযুগের সূত্রপাত, দাউদ করবাণির মৃত্যুর তারিখ থেকে নয়।

[ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

বিষাক্ত বাষ্পের প্রতীকার

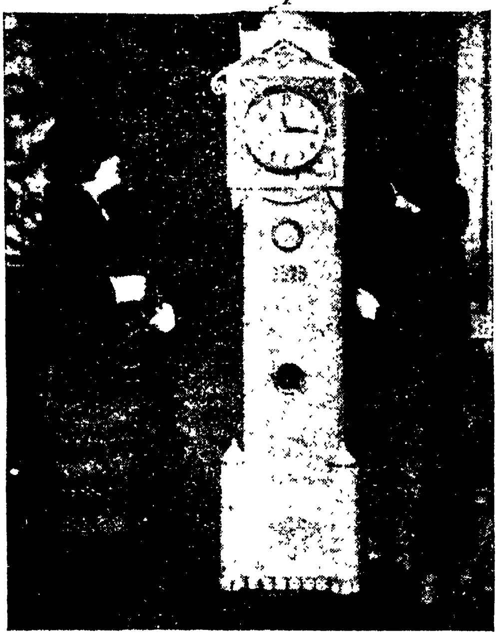


বিগত ইউরোপীয় মহাসমরে জর্ম্মাণগণ যুদ্ধক্ষেত্রে একপ্রকার বিষাক্ত বাষ্পের সৃষ্টি করিয়া বহু মিত্রপক্ষীয় সৈন্যের প্রাণ বিনাশ করিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন শান্তির সময়েও খনিতে বা অন্যান্য স্থানে বিষাক্ত বাষ্পের ক্রিয়ায় বহু মূল্যবান্ জীবন নষ্ট হইয়া থাকে। এই হেতু বৈজ্ঞানিকগণ এই বিষের প্রতীকার জন্য বহু প্রকার যন্ত্রের উদ্ভাবন করিয়াছেন।



বিচিত্র ঘড়ীর আধার

ইংলণ্ডের প্রদর্শনীতে জনৈক শিল্পী উইলো লতার ডাল-পালার দ্বারা বড় ঘড়ীর একটি আধার নির্ম্মাণ করিয়া উপস্থিত করিয়াছেন। ঝুড়ির মত বুনিয়া বুনিয়া এই ৭ ফুট উচ্চ আধারটি নির্ম্মিত হইয়াছে। নক্সাটি খুবই সাধারণ, কিন্তু এমন তুষারশুভ্র, সুদৃশ্য আধার দেখা যায় না। শিল্পীর কৌশল ও চতুরতা ইহাতে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। ৯ মাস পরিশ্রম করিয়া শিল্পী এই বিচিত্র আধারটি নির্ম্মাণ করিয়াছেন।



হাতে বোনা ঘড়ীর আধার

ভ্রমণযষ্টি-সংলগ্ন ঠেলাগাড়ী

ঠেলাগাড়ীতে শিশুকে বসাইয়া ঠেলিতে ঠেলিতে যাওয়া অনেক সময় প্রীতিজনক নহে এবং সুবিধাও হয় না। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য আমেরিকায় এক-ব্যক্তি নূতন উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। ভ্রমণযষ্টিতে শিশুর বসিবার উপযোগী চাকাযুক্ত আসন সংলগ্ন করিয়া দিলে অতি সহজে

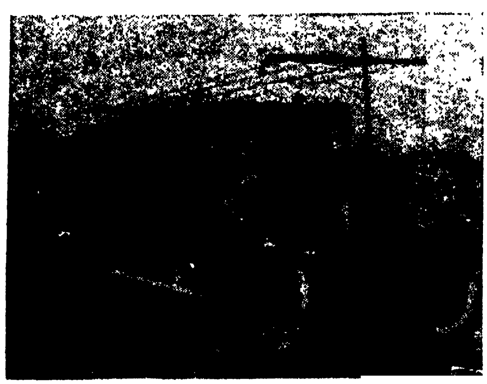


যষ্টিসংলগ্ন শিশুর ঠেলাগাড়ী

শিশুকে বসাইয়া লওয়া চলে। এই অভিনব আসনকে ইচ্ছামত ভাঁজ করিয়া মুড়িয়া রাখা যায়। দুইখানি চাকার উপর আসনটি সংলগ্ন।

চলন্ত মোটরে র‍্যাডিও সঙ্গীত

যুক্তরাষ্ট্রের কালিফর্ণিয়া সহরে বেতার কল-সংযুক্ত যাত্রিবাহী মোটর চলিতেছে। মোটরের উপরিভাগে যে সকল তার



চলন্ত মোটরে র‍্যাডিও সঙ্গীত

দেখা যাইতেছে, তাহাই বেতারের কল। যাত্রিগণ এই মোটরে বসিয়াই গান শুনিতে পান। ওকল্যাণ্ড কিংবা সানফ্রান্সিস্কো হইতে মধুর সঙ্গীত ব্যোমমার্গ বহিয়া আসিয়া মোটরযাত্রিগণকে আপ্যায়িত করিয়া থাকে।

রুটী টোষ্ট করিবার বৈদ্যুতিক যন্ত্র

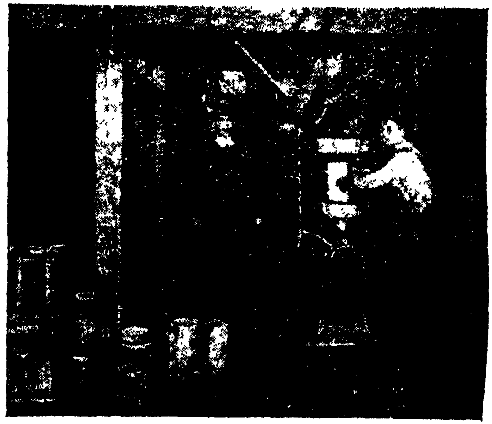
রুটী টোষ্ট করা কাযটা কঠিন না হইলেও বিরক্তিকর। রুটীর কর্ত্তিত অংশগুলি চাপাইয়া সেখানে অপেক্ষা করিতে হয়। কিন্তু সংপ্রতি এক প্রকার বৈদ্যুতিক যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার দ্বারা টোষ্ট প্রস্তুত করাইয়া লইলে কাহাকেও উপস্থিত থাকিতে হয় না; আপনা হইতেই



বৈদ্যুতিক রুটী ভাজা কল

রুটী ভাজা হইয়া যায়; উল্টাইয়া দিবারও প্রয়োজন হয় না। প্রথমতঃ ব্যাপারটা বিশ্বাসজনক বলিয়া মনে হয় না, কিন্তু বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সবই সম্ভব। রুটীর এক দিক ভাজা হইতে কতটুকু সময় লাগে, ইহা পরীক্ষা করিবার পর যন্ত্রটিকে তদনুরূপ নিয়মানুবর্ত্তী করিয়া রাখা হইয়াছে। ভাজা শেষ হইলেই উনানের উপর হইতে পাত্রটি উপরে উঠিয়া যাইবে। তখন বিদ্যুৎপ্রবাহও আর থাকিবে না। এই যন্ত্রের সাহায্যে প্রতি ঘণ্টায় ৩ শত ৬০খানা বড় অথবা ৫ শত ছোট রুটীর টুক্‌রা ভাজা হইয়া থাকে।

কাঠের গুঁড়ার ইষ্টক

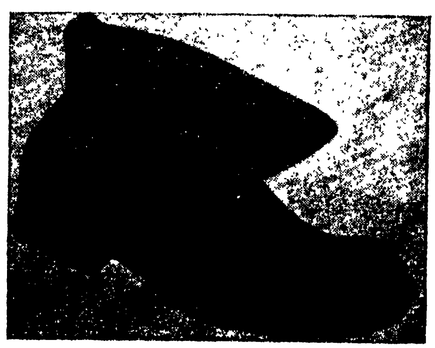


করাতের গুঁড়ায় ইষ্টক প্রস্তুত হইতেছে

করাত দিয়া কাঠ চিরিবার সময় যে গুঁড়া বাহির হয়, রাসায়নিক পদার্থের সহিত তাহা মিশাইয়া ইষ্টক প্রস্তুত করা যাইতে পারে। জনৈক মার্কিণ বৈজ্ঞানিক উক্ত উপায়ে ইষ্টক প্রস্তুত করিতেছেন। কিন্তু কোন্ কোন্ পদার্থের সহিত মিশাইয়া তিনি করাতের গুঁড়ার ইষ্টক নির্ম্মাণ করিতেছেন, তাহা তিনি প্রকাশ করেন নাই। এই জাতীয় ইষ্টক নাকি কখনও অগ্নি দ্বারা দাহ্য নহে। সুতরাং ঐ ইষ্টকের সাহায্যে অট্টালিকা নির্ম্মিত হইলে, তাহাতে অগ্নি লাগিবার সম্ভাবনা অল্প। এই ইষ্টক অগ্নির উত্তাপও নিবারণ করিতে সমর্থ।

নূতন জুতা

বড় বড় কলকারখানায় কায করিবার সময় অনেক ক্ষেত্রে শ্রমিকের জুতা সমেত পা কলে আটকাইয়া যায়।



নূতন জুতা

তাড়াতাড়ি জুতা খুলিতে না পারায় অধিকাংশ সময়েই তাহারা সাংঘাতিকরূপে আহত বা নিহত হইয়া থাকে। ফলে পা পড়িয়া গেলে যদি তাড়াতাড়ি জুতা খুলিয়া ফেলিতে পারা যায়, তাহা হইলে অনেক সময় কোন আঘাত লাগে না। এই সকল বিবেচনা করিয়া বোষ্টন নগরের কোনও ব্যবসায়ী সুদৃশ্য জুতা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই জুতা মুহূর্ত্তমধ্যে খুলিয়া ফেলা যায়। দস্তানায় যেরূপ ভাবের বোতাম দেওয়া থাকে, এই নূতন জুতায় সেই প্রকারের বোতাম সন্নিবিষ্ট। একবার জোরে টানিলেই জুতার বোতাম খুলিয়া যাইবে এবং তখন পা টানিয়া লইলেই বিপদ্ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিবে না।

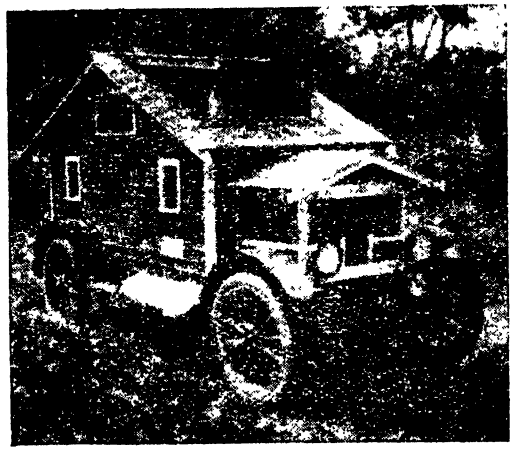
যক্ষ্মারোগের প্রতিষেধক

আমেরিকায় যক্ষ্মারোগ চিকিৎসাসম্বন্ধে অভিনব আবিষ্ক্রিয়া হইয়াছে। যাহাদের শ্বাসযন্ত্রে যক্ষ্মারোগের সূত্রপাত হইয়াছে, এমন রোগীকে ঔষধ ঘ্রাণের দ্বারা আরোগ্য করা হইতেছে। কোনও আধারে 'ক্যাল্সিয়ম' লবণ (Calcium salt) ও দানাবিহীন 'কার্ব্বন' (Amorphous Carbon) অঙ্গারমিশ্রিত ঔষধ রাখিয়া নল ও চওড়া বাটির মত মুখনলের সাহায্যে রোগীকে আঘ্রাণ করান হয়। বাতাসের সাহায্যে উক্ত ঔষধ ফুসফুসে চলিয়া যায়। তাহার ফলে নষ্টপ্রায় সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম তন্ত্রীগুলি নূতন করিয়া উজ্জীবিত হয় এবং রোগের অগ্রগতি রুদ্ধ হইয়া পড়ে। আমেরিকার চিকিৎসকগণ বহু রোগীকে উক্ত প্রণালীতে চিকিৎসা করিয়া সুফল লাভ করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।



যক্ষ্মারোগী যন্ত্রসাহায্যে ঔষধ আঘ্রাণ করিতেছে

মোটর-ভবন



মোটর-ভবন

একখানি মোটর যান এই ভাবে ক্ষুদ্র পরিবারের বাসোপযোগী একটি সুদৃশ্য ভ্রাম্যমাণ মোটর-ভবনে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রের আইওয়া বিভাগের জনৈক কণ্ট্রাক্টর এই মোটর-ভবন নির্ম্মাণ করাইয়া সময় সময় তাহাতে স্ত্রীপুত্রাদির সহিত পারিবারিক সুখ-শান্তি এবং তৎসঙ্গে ভ্রমণসুখ উপভোগ করিয়া থাকেন। ভবনের সর্ব্বত্র বৈদ্যুতিক আলোকের ব্যবস্থা আছে। বৃষ্টি ও রাস্তার ধূলি হইতে ইহা সুরক্ষিত। মোটরের সম্মুখভাগে ও পশ্চাদ্দেশে দুই খণ্ড বৃহদাকার কাচ বসান আছে; সুতরাং কোন দিকেই দৃষ্টি ব্যাহত হয় না। গৃহে বাতায়নের অভাবও নাই। সম্মুখের বারান্দায় চালকের স্থান নির্দ্দিষ্ট। এখান হইতে মোটরচালন এবং বাহ্য জগতের সৌন্দর্য্য উপভোগ উভয়ই সম্ভব। মোটর-ভবনের অভ্যন্তরে গার্হস্থ্য জীবনের আবশ্যকীয় প্রায় প্রত্যেক পদার্থই আছে। শিশুর জন্য দোলনা আছে; মোটর চলিলে তাহা আপনিই দুলিতে থাকে; মোটর স্থির থাকিলে বৈদ্যুতিক প্রবাহে দোলনা সঞ্চালিত হয়।

পশ্চিম এসিয়ায় চামড়ার নৌকা

পশ্চিম এসিয়ায় পাশ্চাত্য সভ্যতাসঙ্গত লৌহ-সেতু কোথায়ও দৃষ্ট হয় না। বাষ্পীয় পোতের চলনও নাই। তথাকার অধিবাসিগণ চামড়ার নৌকা প্রস্তুত করিয়া নদী পার হইয়া থাকে।

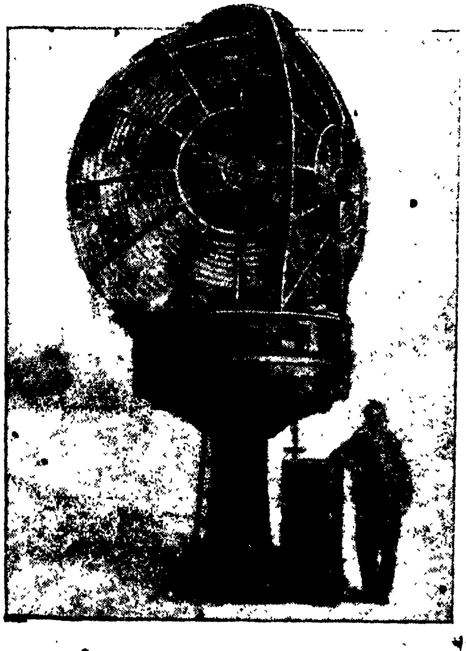


পশ্চিম এসিয়ায় টাইগ্রিস্ ইউফ্রেটিস্ প্রভৃতি নদীতে চামড়ার নৌকা

—

অষ্ট্রেলিয়ার ঘূর্ণায়মান আলোকস্তম্ভ

এই বিপুলদেহ অতি উচ্চ স্তম্ভের শীর্ষভাগে যে প্রকাণ্ড আলোক স্থাপিত হইয়াছে, তাহার জ্যোতি এমন তীব্র যে, ৯০ হইতে ৯৫ মাইল পর্য্যন্ত ইহা বিকীর্ণ হইয়া থাকে। সাধারণ ডিঙ্গ মার্কা লণ্ঠনগুলির আলোকের পরিমাণ ১০ বাতি, আর এই আলোক-স্তম্ভের আলোকের পরিমাণ সেই স্থলে ১১ লক্ষ ৬৭ হাজার বাতি। স্তম্ভের উপরে একটি ধাতুময় আধারে ৩ শত ৮৬ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ৫ মণ পারদ ঢালা আছে; সেই পারদের উপর ৭ হাজার ৭ শত ২০ পাউণ্ড ওজনের এই দীপ ভাসিতেছে এবং কলের সাহায্যে ইচ্ছামত ঘুরিতেছে।

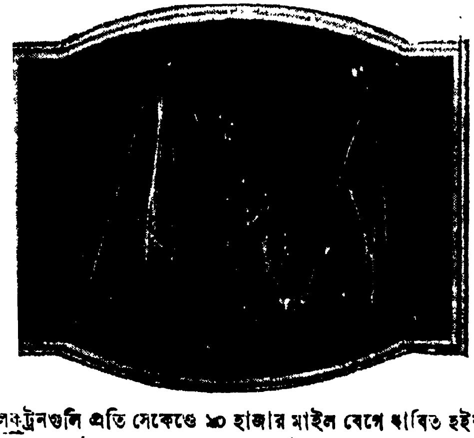


অষ্ট্রেলিয়ার ঘূর্ণায়মান আলোকস্তম্ভ

—

নূতন আলোকরশ্মির আবিষ্কার

পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক ডাঃ আর, ডব্লিউ রেয়ান সম্প্রতি ব্যোম-প্রদেশে একপ্রকার আলোক-রশ্মির আবিষ্কার করিয়াছেন। এই নব আবিষ্কৃত রশ্মির নাম Zeta (জেটা)। বৈজ্ঞানিক ইহার অস্তিত্ব নিরূপণ-মাত্র করেন নাই; তিনি আলোকচিত্র যন্ত্রে ইহাদিগের আকৃতি এবং ব্যোমপথে ইহাদিগের গতিবিধির চিত্র পর্য্যন্ত উঠাইয়াছেন। এই রশ্মিগুলি ব্যোমপথে বেগে ধাবিত হইয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহাদিগকে আলোকরশ্মি না বলিয়া ইলেক্ট্রন বলা উচিত।



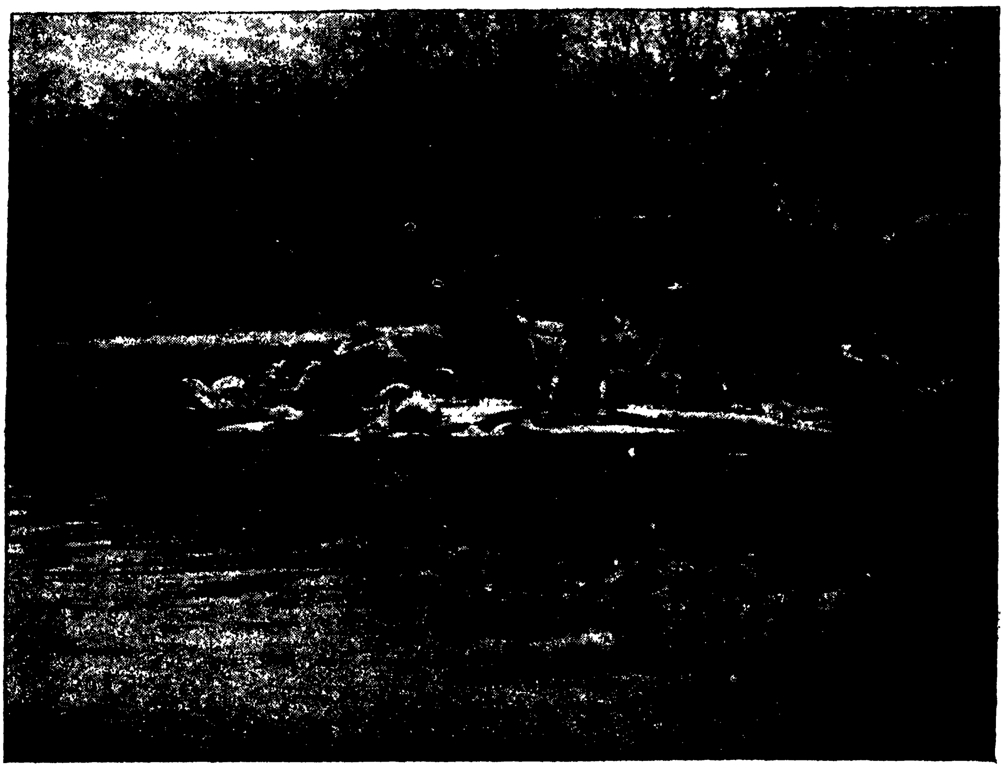
ইলেক্ট্রনগুলি প্রতি সেকেণ্ডে ৯০ হাজার মাইল বেগে ধাবিত হইয়া এই সকল সূক্ষ্ম আলোকমার্গের সৃষ্টি করিয়াছে

যখন এই ইলেকট্রনগুলি কোনও অণু হইতে বিক্ষিপ্ত হয়, তখন ইহাতে ঋণাত্মক তড়িৎ সঞ্চিত থাকে। উত্তপ্ত তার হইতে এবং বিদ্যুৎ আলোক হইতে এই ইলেট্রন অবিশ্রান্ত স্রোতের আকারে নির্গত হইয়া থাকে। যদি কোনও বিদ্যুৎ-আলোকের কাচের আবরণের মধ্যে এক খণ্ড ধাতুময় পাত্র রাখিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে ইহাতে ইলেকট্রন ধারার চিহ্ন অঙ্কিত হইয়া যায়।

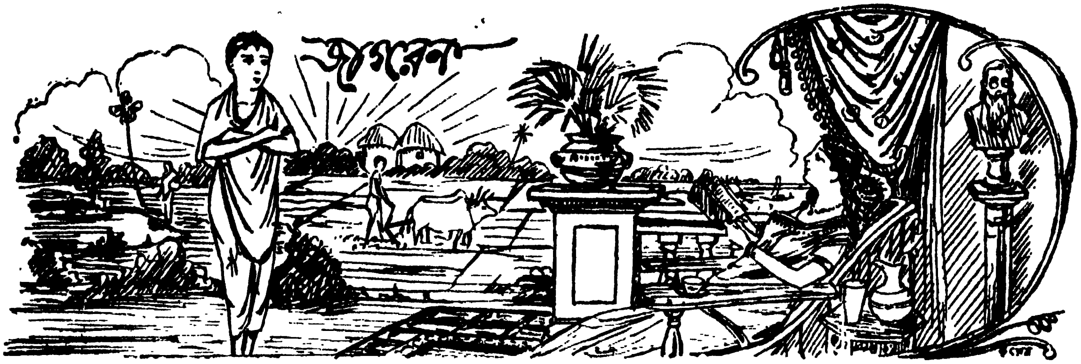
আলোক অণু অতি ক্ষুদ্র। ১ শত কোটি আলোক অণু একই ঋজু রেখায় পর পর বিন্যস্ত হইলে দৈর্ঘ্যে এক ইঞ্চি পরিমিত স্থান অধিকার করিতে পারে মাত্র। তুলনায় ইলেকট্রনগুলি ক্ষুদ্রতর।

বাষ্পধারার সাহায্যে মূর্ত্তি পরিষ্কার

ফ্রান্সের অন্তর্গত ভার্সেল নগর ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থান। এখানে একটি উদ্যান আছে, এই বাগানে ভীষণ ফরাসী বিপ্লবের প্রথম বহ্নিশিখা প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল, এই উদ্যানেই দুই দুইবার য়ুরোপের সমরানল নির্ব্বাপিত হইয়াছিল। ফ্রাঙ্কো-প্রুসিয়ান যুদ্ধের পর সন্ধিপত্র এই উদ্যানেই স্বাক্ষরিত হইয়াছিল; বিগত মহাসমরের অবসানের প্রথম আলোচনাও এই উদ্যানে হইয়াছে। ফরাসী সম্রাট্ ত্রয়োদশ লুইএর রাজত্বকাল হইতে এ যাবৎ ফ্রান্সের দেশভক্ত বীরগণের এবং প্রধান প্রধান ঘটনার ধাতুময় বা মর্ম্মরমূর্ত্তি এই উদ্যানে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। পুরাতন মূর্ত্তিগুলি বহুদিন সংস্কার অভাবে মলিন হইয়া গিয়াছিল। সম্প্রতি অভিনব উপায়ে অর্থাৎ জলীয় বাষ্পের ধারা দ্বারা মূর্ত্তিগুলি পরিষ্কার করা হইয়াছে, এবং বাষ্পধারাধৌত মূর্ত্তিগুলি যেন নবজীবন প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্বকথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে।



ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ভার্সেল উদ্যানে বাষ্পধারার সাহায্যে মূর্ত্তি পরিষ্কার করা হইতেছে



৮

পরদিন বাড়ী ফিরিয়া রে সাহেব নয়ন গাঙ্গুলীর আত্মহত্যার বিবরণ শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। মেয়েকে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া সোজা তাহাদের বাড়ী চলিয়া গেলেন। এতটা আলেখ্য আশা করে নাই। বিকালবেলা যখন ফিরিয়া আসিলেন, তখন মুখ তাঁহার কথঞ্চিৎ প্রসন্ন, তথাপি এ সম্বন্ধে চুপ করিয়াই রহিলেন। সেখানে কি বলিলেন, কি করিলেন, আলেখ্য তাহার কিছুই জানিতে পারিল না। সে দিনটা এই ভাবেই কাটিল। পরদিন সকালে একখানা চিঠি হাতে করিয়া আসিয়া আলেখ্য পিতাকে কহিল, মিষ্টার ঘোষ ইন্দুকে নিয়ে বোধ করি সন্ধ্যার ট্রেণেই এসে পৌঁছবেন।

কে, ঘোষ সাহেব?

আলেখ্য মাথা নাড়িয়া বলিল, না, কমল-কিরণ। ঘোষ সাহেব এবং ইন্দুর মা বোধ হয় পাঁচ ছ' দিন পরে আসবেন।

পিতা কহিলেন, আচ্ছা।

আলেখ্য কহিল, তাঁ'দের অভ্যর্থনার উপযুক্ত কিছুই বন্দোবস্ত ক'রে উঠতে পারিনি।

পারোনি? এই পাঁচ ছ' দিনের মধ্যেও কি হ'তে পারবে না মনে হয়?

আলেখ্য পূর্ব্বের মত মাথা নাড়িয়া কহিল, সম্ভব নয় বাবা। এই বলিয়া সে কিছুক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া কহিল, একটা অত্যন্ত বিশ্রী কাণ্ড হয়ে গেছে বাবা, তুমি বোধ হয় শুনেছ? কি দুঃখের বিষয়!

সাহেব বলিলেন, হাঁ।

তাঁ'দের সম্বন্ধে কি কোন রকম ব্যবস্থা করলে বাবা?

না, বিশেষ কিছুই করা হয়নি। এই বলিয়া সাহেব নীরব হইলেন। মেয়েকে তিনি কোন দিনই তিরস্কার করেন নাই, বিশেষতঃ, সমস্ত মরিয়া-ঝরিয়া গিয়া এই বৃদ্ধবয়সে সংসারের সর্ব্বপ্রকার বন্ধন যখন এই কন্যাটিতেই স্থিরতা লাভ করিয়াছে, তখন হইতে এই মেয়ের কাছেই আপনাকে তিনি ধীরে ধীরে শিশুর মত করিয়া তুলিয়াছেন। সেই তাঁহার সর্ব্ববিষয়ে অভিভাবক। তাহার বিরুদ্ধে বা অমতে কায করার শক্তি তাঁহার স্বভাবতঃই তিরোহিত হইয়াছে।

আলেখ্য কহিল, উপযুক্ত ব্যবস্থা কেন ক'রে এলে না বাবা?

সাহেব বলিলেন, মা, বিষয় তোমার। সমস্ত তোমার হাতে তুলে দিয়ে আমি ছুটী নিয়েছি, এর ভালমন্দর ভার তোমার। যা কর্ত্তব্য, তা' তুমিই করবে।

আলেখ্য করুণকণ্ঠে কহিল, যদি বুঝতে না পেরে কোন অন্যায় করি বাবা, তবুও কি তুমি তার প্রতীকার করবে না?

পিতা বলিলেন, আমিই কি বড় বুদ্ধিমান্? অন্ততঃ, সংসারে সে প্রমাণ ত আজও দিতে পারিনি মা। আর, না বুঝে অন্যায় যদি কিছু করেই থাকো, যিনি বুদ্ধি দেবার মালিক, তিনিই তোমাকে তার নিবারণের পথ ব'লে দেবেন। এই বলিয়া বৃদ্ধের সজল দৃষ্টি এক মুহূর্ত্তে খোলা জানালার বাহিরে গিয়া অকস্মাৎ কোন্ অনির্দ্দেশ্য শূন্যতায় স্থিতিলাভ করিল। পিতার ঠিক এই ভাবটি আলেখ্য পূর্ব্বে কখনও লক্ষ্য করে নাই—সে যেন অবাক্ হইয়া গেল। ছেলেবেলা হইতে তাঁহাকে সে ষোল আনা সাহেব বলিয়াই জানে। ধর্ম্মমত লইয়া তিনি আলোচনা করিতেন না, ঈশ্বরে ভক্তি-বিশ্বাস আছে কি নাই, এ কথাও

কোন দিন প্রকাশ করিতেন না, এবং করিতেন না বলিয়াই লোকের ঘরে-বাহিরে তাঁহাকে অবিশ্বাসী বলিয়া ধারণা ছিল। অথচ, সাবেক দিনের ক্রিয়া-কর্ম্ম, ঠাকুর-দেবতার পূজা-অর্চ্চনা সমস্তই অব্যাহত ছিল। এই জটিল সমস্যার সমাধান করিতে আলেখ্যর জননী ইহাকে ভয় এবং দুর্ব্বলতা বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন, আলেখ্যর নিজেরও তাহাতে সংশয় ছিল না, কিন্তু বৃদ্ধ পিতার আজ এই অদৃষ্টপূর্ব্ব মুখের চেহারা চক্ষের পলকে যেন তাহাকে আর একটা দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল।

আলেখ্য ধীরে ধীরে বলিল, তুমি বেঁচে থাক্‌তে আমাকে এ দায়িত্ব দিয়ো না বাবা।

কেন মা ?

আমি আদেশ তোমার লঙ্ঘন করেছি।

বৃদ্ধ সবিস্ময়ে কন্যার মুখের প্রতি চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি আদেশ আলো ? আমার ত কোন আদেশের কথাই মনে পড়ে না মা ?

আলেখ্য অধোমুখে অঞ্চলের পাড়টা আঙ্গুলে জড়াইতে জড়াইতে চুপ করিয়া রহিল।

পিতা কহিলেন, কই, বল্‌লে না যে ?

আলেখ্য তথাপি কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া অভিমান-রুদ্ধ স্বরে আস্তে আস্তে বলিল, তবে এসে পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে তুমি কথা কও না যে বড় ? আমি ত একশবার স্বীকার কর্‌ছি, বাবা, আমি অত্যন্ত অন্যায় কায করেছি। কিন্তু স্বপ্নেও ভাবিনি, আমাকে তিনি এত বড় শাস্তি দিয়ে যাবেন। আমি তোমার কাছেও মুখ দেখাতে পার্‌ছিনে বাবা, আমি এ দেশে আর থাকবো না। এই বলিয়া সে ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

সাহেব কাছে আসিয়া ধীরে ধীরে মেয়ের মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন,—কিছুই বলিলেন না। এম্‌নি ভাবে কিছুক্ষণ কাটিল, বোধ হয় মিনিট পাঁচ ছয়ের বেশী নয়, কিন্তু এইটুকু সময়ের মধ্যে তাহার দুর্ব্বল-চিত্ত বৃদ্ধ পিতার যে পরিচয় আলেখ্যর ভাগ্যে জুটিল, তাহা যেমন অভাবনীয়, তেম্‌নি মধুর। এই বিশ বৎসর বয়সের মধ্যে ইহার আভাস পর্য্যন্তও কখনও তাহার চোখে পড়ে নাই। আজ মায়ের জন্য তাহার ক্লেশ বোধ হইতে লাগিল, এত বড় মাধুর্য্যের কোন আস্বাদই তিনি জীবনে উপভোগ করিয়া যাইতে পারিলেন না। পিতা সমাজে কখনও যান নাই, উপাসনায় কোন দিন যোগ দেন নাই,—ভগবৎ-বিশ্বাসহীন নাস্তিক বলিয়া মনে মনে জননীর যেমন ক্ষোভ ছিল, স্বামীর চিত্ত-দৌর্ব্বল্যের জন্যও পরিচিত আত্মীয়-বন্ধুজনের সমক্ষেও তাঁহার তেম্‌নি লজ্জার কারণ ছিল। পিতার প্রতি আলেখ্যর স্নেহ ও প্রীতি সংসারে কোন সন্তানের চেয়েই হয় ত কম ছিল না, কিন্তু পুরুষোচিত শক্তি, সামর্থ্য ও দৃঢ়তার অভাব এই রোগজীর্ণ নিরীহ লোকটির বিরুদ্ধে আরোপ করিয়া মায়ের নিকট হইতে একটা করুণ অশ্রদ্ধার ভাবই সে উত্তরাধিকারের মত পাইয়াছিল। সেই পিতাকে অকস্মাৎ আজ সে এক সম্পূর্ণ নূতন দিক হইতে লক্ষ্য করিবার অবকাশ পাইয়া ভক্তি-শ্রদ্ধা ও ভালবাসায় একেবারে বিগলিত হইয়া গেল। এমন করিয়া সে একটা দিনও তাঁহাকে দেখিবার সুযোগ পায় নাই। নানা লোকের নানা উক্তি ও বিভিন্ন মতামত দিয়া এই দিকটাই যেন তাহার চোখের সম্মুখে একেবারে আঁটিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া ছিল। আজ অনুশোচনা ও আত্মধিক্কারে হৃদয় পূর্ণ করিয়া সে পিতার স্নেহস্পর্শের নীচে নিঃশব্দে বসিয়া ভাবিতে লাগিল, হয় ত পিতা নিজের মত দুর্ব্বল ও শক্তিহীন জানিয়াই তাঁহার বহুদিনের আশ্রিত অতি বৃদ্ধ গাঙ্গুলীকে মনে মনে স্নেহ করিতেন, তাহার প্রতি এত বড় কঠিন অবিচার হইয়া গেল, তিনি নিবারণ করিতে পারিলেন না, তাই নীরবে তাহার শোকাচ্ছন্ন কন্যা-দৌহিত্রের কাছে গিয়া তেম্‌নি নীরবে কি যে করিয়া আসিলেন, কাহাকেও জানিতে দিলেন না, অথচ এত বড় অন্যায় যাহার দ্বারা অনুষ্ঠিত হইল, তাহাকে একটি ক্ষুদ্র তিরস্কারেও লাঞ্ছিত করিলেন না, দুই বিভিন্ন দিকের সমস্ত ব্যথাই নির্ব্বাক্ হইয়া নিজের বুক পাতিয়া গ্রহণ করিলেন। অপরাধী কন্যাকে যে ভার, যে দায়িত্ব এক দিন তিনি নিজের হাতে অর্পণ করিয়াছিলেন, তাহার প্রত্যাহার করিয়া আর তাহার লজ্জার পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া দিলেন না। বাহিরের লোকের কাছে হয় ত ইহা দুর্ব্বলতার নামান্তর বলিয়াই প্রতিভাত হইবে, কিন্তু আলেখ্য আজ তাহার নব-লব্ধ দৃষ্টি দিয়া স্পষ্ট দেখিতে পাইল, কত বড় বিশ্বাস ও স্নেহের শক্তি ইহারই মধ্যে সহজে আত্মগোপন করিয়া আছে!

আলেখ্য অঞ্চলে চোখ মুছিয়া লইয়া মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, বাবা! সংসারের ভার আর যদি তুমি ফিরে নিতে না চাও, আমাকে কি তুমি পথ দেখিয়েও দেবে না?

সাহেব হাসিয়া কহিলেন, তুমি ত জানো মা, সংসার-যাত্রায় আমি দ্রুতপদে চল্‌তে পারিনি,—সকলের পিছনেই আমি প'ড়ে গেছি। সেই পিছনের পথটাই আমি কেবল দেখাতে পারি, কিন্তু সে তো সকলের মনোমত হবে না।

আলেখ্য কহিল, আমার হবে বাবা।

সাহেব বলিলেন, যদি হয় নিয়ো। কিন্তু নিতেই হবে, তা' কোন দিন মনে কোরো না।

আলেখ্য ক্ষণকালমাত্র চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, আমরা সবাই মিলে যখন দৌড়ে চলেছিলাম, তখন কেন যে তুমি পেছিয়ে চল্‌তে বাবা, আজ যেন তার আভাস পেয়েছি। এখন থেকে যেন তোমার পায়ের দাগ ধরেই চল্‌তে পারি বাবা, আমাকে তুমি সেই আশীর্ব্বাদ কর।

সাহেব হাসিয়া তাহার মাথায় আর একবার হাত বুলাইয়া দিয়া শুধু কহিলেন, পাগ্‌লি! এই বুড়োর সঙ্গে কি তোরা চল্‌তে পারবি মা! সে ধৈর্য্য কি তোদের থাক্‌বে?

আলেখ্য বলিল, তোমাকে দেখে আজ এই কথাটাই সব চেয়ে বেশী মনে হচ্ছে বাবা, কেবল দৌড়ে বেড়ানোই এগোনো নয়। তাই, তুমি যখন ধীরে ধীরে পা ফেলে চল্‌তে, আমরা সবাই ভাবতুম, তুমি পেছিয়ে পোড়ছ। আজ থেকে তোমার পায়ের চিহ্নই যেন সকল পথে আমার চোখে পড়ে।

সাহেব স্থির হইয়া রহিলেন। কিন্তু যে হাতখানি তাঁহার তখনও আলেখ্যর মাথার পরে ছিল, সেই পাঁচ আঙুলের স্পর্শ দিয়া যেন পিতার অন্তরের আশীর্ব্বাদ কন্যার সর্ব্বাঙ্গে ক্ষরিয়া পড়িতে লাগিল।

খানিকক্ষণ এম্‌নি নিঃশব্দে কাটিবার পরে আলেখ্য কহিল, বাবা, কা'ল তোমার খুড়ো মশাই এসেছিলেন।

খুড়ো মশাই? সাহেব সবিস্ময়ে কন্যার প্রতি চাহিলেন।

কন্যা কহিল, ছেলেবেলায় তাঁকে তুমি এই ব'লে ডাকতে। পণ্ডিত ব্রাহ্মণ। নিমাই ভটচায্যি নাম।

সাহেব অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি বেঁচে আছেন? এত বড় আসল মানুষ সহজে মেলে না মা। তাঁর কোনরূপ অমর্য্যাদা হয়নি ত?

আলেখ্য মাথা নাড়িয়া জানাইল, না। কহিল, তিনি এসেছিলেন আমার পরিচয় নিতে এবং তাঁর ছেলেবেলায় এই ঐশ্বর্য্যময়ী বাঙলা দেশে যে কত ঐশ্বর্য্য ছিল, তার পরিচয় দিতে। সে কি আশ্চর্য্য ছবি বাবা! ফুলে-ফলে, শস্যে-ধান্যে, শোভায়-স্বাস্থ্যে কি সম্পদই না এ দেশের ছিল! আমার ভুলের সীমা নেই; আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত নেই,—এ কথা আমি স্বপ্নেও অস্বীকার করিনে, কিন্তু আমার মত একটা সামান্য মেয়ের অন্যায়ের ফলে যে দেশে এত বড় মর্ম্মান্তিক ঘটনা ঘট্‌তে পারে, তাকে নিবারণ করবার কোন সম্বল যে দেশের হাতে নেই, সর্ব্বরকমে কাঙাল ক'রে যারা এই সোনার দেশকে এত বড় নিঃস্ব-নিরুপায় ক'রে তুলেছে, তাদের অপরাধেরই কি অবধি আছে বাবা?

সাহেব গভীর নিশ্বাস মোচন করিয়া কহিলেন, হুঁ। তখনকার দিনে উপবাসের ভয়ে যে তাঁকে আত্মহত্যা করতে হ'ত না, সে ঠিক। চাকরি গেলেও তাঁরা না খেয়ে মরতেন না। গ্রামের মধ্যে দু-মুঠো অন্ন তাঁদের জুট্‌তো!

আলেখ্য বলিল, অক্ষম অপারগ ব'লে আমার ভুল ত সে থেকে তাঁকে বঞ্চিত করতে পারত না! এবং এত বড় কলঙ্কের ছাপ ত সে দিনে আমার কপালেও ছাপ মেরে যেত না! এই বলিয়া সে ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া পুনশ্চ রুদ্ধকণ্ঠে বলিতে লাগিল, বাবা, তোমরা সবাই বলো, পৃথিবী সম্পদে, সভ্যতায় দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে, এবং এই বাঙলা দেশে আমরাই তাদের অগ্রদূত,—নিমাই ভট্‌চায্যি তাই আজ আমাকে দেখতে এসেছিলেন, কিন্তু এত বড় তামাসা কি আর আছে? গাঙ্গুলী মশায়ের পীড়িত উদ্‌ভ্রান্ত আত্মার কল্যাণ হোক্, কিন্তু যে সভ্যতায় দরিদ্রের মুখের গ্রাস, দুঃখীর জীবন ধনীর মুঠোর মধ্যে এমন ভয়ানক নিরুপায় ক'রে এনে দেয়, তাকে কেউ রক্ষে করতে পারে না, সে কি রকম সভ্যতা? আর তাই যদি হয় বাবা, এ সভ্যতায় আমার কাম নেই। এই নির্দ্দয় প্রহসন থেকে আমি মুক্তি চাই!

পিতা মুখ তুলিয়া চাহিলেন। কন্যার বেদনাতুর হৃদয়ের ক্ষুব্ধ উত্তেজনাকে শান্ত করিতে নিজেও শান্তক

কহিলেন, উপায় কি মা? দুঃখী দরিদ্র চিরদিনই ধনীর হাতের মধ্যে থাকে আলো, এম্‌নিই সংসারের বিধান।

আলেখ্য শান্ত হইতে পারিল না, কহিল, না বাবা, এ বিধান যতই পুরাণো, যতই কেন না চিরদিনের হোক্, কিছুতে ভাল না। জগতে ধনী ও দরিদ্র যদি থাকে ত থাক, কিন্তু এমন একান্তভাবে, এমন উপায়হীন কঠিন বাঁধনে কেউ কারও হাতের মধ্যে থাকা কোন মতেই মঙ্গলের বিধান হ'তে পারে না বাবা। ধনীরও না, দরিদ্রেরও না। এতটুকু মুঠোর চাপে যার মানুষ মারা পড়ে, অন্ততঃ, সে কিছুতেই বল্‌তে পারে না। লোক বলে, তাঁর মাথা ঠিক ছিল না, তবু ত আমি এ কথাটাও জীবনে ভুল্‌তে পারব না যে, তাঁর পাঁচ বৎসরের আয়ু আমার ঐ একটা আয়নার মধ্যেই রয়ে গেছে। আরও কত লোকের মরণ-ইতিহাস যে আমার জুতো জামার পরতে পরতে লেখা আছে, তাই বা কে জানে বাবা?

তাহার কথা শুনিয়া বৃদ্ধ পিতা ভয় পাইলেন, জোর করিয়া একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন, পাগল আর কি! তা' হ'লে ত সংসারে আর বাস করা চলে না আলো!

আলেখ্য জবাব দিল, তোমার কপালে ত বুড়ো মানুষের রক্তর দাগ নেই বাবা।

পিতা কহিলেন, তোমার যত দোষ এঁরা তোমাকে বুঝিয়ে গেছেন মা, তার সবই সত্য নয়।

মেয়ে বলিল, আমি কি এর দাগ মুছতে পারব না বাবা?

বাবা বলিলেন, কেন পারবে না? তোমার কোন কাযেই ত আমি বাধা দিইনে মা।

রূপার রেকাবিতে একখানা হলদে রঙের খাম রাখিয়া বেহারা আসিয়া উপস্থিত হইল। আলেখ্য খুলিয়া দেখিয়া পিতার হাতে দিয়া কহিল, ইন্দুকে নিয়ে কমল-কিরণ আসছেন?

কখন্?

আজই সন্ধ্যার ট্রেণে। এই বলিয়া আলেখ্য অন্যত্র চলিয়া গেল।

সে চলিয়া গেলে ঘোষ সাহেব সেইখানে বসিয়াই নানা কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন। এই অত্যন্ত শোকাবহ ঘটনার সুতীব্র আঘাতে আলেখ্যর মনের মধ্যে যে ঝড় বহিতে সুরু করিয়াছে, তাহার গুরুত্ব কত এবং কতখানি ব্যাপক হইয়া জীবনকে তাহার অধিকার করিবে, এবং সমাজের মধ্যে ইহার ফলাফল কি, তাহাই উদ্বিগ্ন চিত্তে মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিলেন। যে ক্ষুদ্রায়তন সঙ্কীর্ণ সমাজের মাঝে তাঁহার জীবনের দীর্ঘকাল কাটিয়া গেল, তাহার প্রতি তাঁহার মমতা ও প্রীতি ধীরে ধীরে যে কমিয়া আসিতেছিল, এ কথা তিনি মুখ ফুটিয়া ব্যক্ত না করিলেও নেতৃ-স্থানীয়গণের অগোচর ছিল না; কিন্তু তাই বলিয়া মেয়ের সম্বন্ধে এমন কথা কখনও তিনি কল্পনাও করিতেন না যে, যে-সমাজ ও সংস্কারের মধ্যে দিয়া সে বড় হইয়া উঠিয়াছে, তাহাকেই অশ্রদ্ধা করিয়া সে কিছুতেই সুখী হইতে পারে! এ আশ্রয় হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া তাহার কোনমতেই চলিতে পারে না। এ বিশ্বাস তাঁহার দৃঢ় ছিল। ঘোষ সাহেব ও তাঁহার পারিবারিক চাল চলনের প্রতি মনে মনে তাঁহার অতিশয় বিরাগ ছিল, কন্যার প্রতি ইঁহাদের দৃষ্টি আছে, এ কথা মনে করিয়াও মনের মধ্যে তাঁহার জ্বালা করিত; কিন্তু আজ তাহাদের আসার সংবাদে তিনি শুধু খুসী ন'ন, যেন নিশ্চিন্ত হইলেন। ইন্দুমতী আলেখ্যর ছেলেবেলার বন্ধু, এবং কমল-কিরণও যে অবাঞ্ছিত অতিথি নয়, এ ধারণা তাঁহার ছিল। সম্প্রতি যে অঘটন ঘটিয়া গেছে, যাহাকে ফিরাইবার আর পথ নাই, তাহাকেই কেন্দ্র করিয়া সমস্ত গ্রামের মধ্যে যে গ্লানি ও শোকোচ্ছ্বাসের তুফান ছুটিয়াছে, তাহারই ধাক্কা হইতে মেয়েটা যদি কিছু দিনের জন্যও নিষ্কৃতি পায়, ব্যাপারটাকে যদি দুটা দিনও ভুলিয়া থাকিতে পারে, এই মনে করিয়া সাহেব আগে হইতেই তাঁহার অতিথিদের অন্তরের মধ্যে সংবর্দ্ধনা করিলেন। সেই দিন সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্ব্বে ভগিনীকে লইয়া কমল-কিরণ আলেখ্যর পৈতৃক বাসভবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সাহেব নিজে থাকিয়া তাঁহাদের আদর করিয়া গ্রহণ করিলেন। আলেখ্য পাশে দাঁড়াইয়া সভ্যসমাজের সর্ব্বপ্রকারে অনুমোদিত অভ্যর্থনার কোথাও কোন ত্রুটি করিল না, কিন্তু তবুও তাহার মুখের চেহারায় আগন্তুক এই দুটি ভাই-বোনে কি যে সহসা দেখিতে পাইল, তাহাদের মন যেন একেবারে দমিয়া গেল।

বাহিরে তাহার প্রকাশ নাই, রাত্রে ডিনারের আয়োজন

একটু বিশেষ করিয়াই হইল। মুসলমান বাবুর্চ্চির এত দিন প্রায় এক রকম ঘুমাইয়া কাটিতেছিল, সে তাহার যথাসাধ্য করিল। ফুলের সময় নয়, তথাপি টেবিলে তাহার অপ্রতুল হইল না, প্রয়োজনের অনেক বেশী আলো জ্বলিল, সদ্য রঙ করা দেয়ালের গায়ে ও সাহেববাড়ীর দীর্ঘায়তন মুকুরে তাহার সমস্ত রশ্মি প্রতিফলিত হইয়া ঘরটাকে যেন দিনের বেলা করিয়া দিল। রূপার ছুরি-কাঁটা, রূপার চামচ, রৌপ্যের বাতিদান, দুর্ম্মূল্য পাত্রে দুর্ম্মূল্য ভোজ্য ও পেয়, তুষারশুভ্র চাদরের উপরে সে যেন কেবল চোখ মেলিয়া চাহিয়া দেখিবার। সজ্জায় ও শোভায়, পোষাক ও পরিচ্ছদে, হাসি ও গল্পে, বিলাস ও ব্যসনে মনে হইল, যেন একটা দুঃখ ও পীড়নের ভূত সহসা গয়ায় পিণ্ড লাভ করিয়া এই একটা বেলার মধ্যেই বাড়ীটাকে ছাড়িয়া গিয়াছে।

ডিনার অগ্রসর হইয়া চলিল। অজীর্ণ রোগগ্রস্ত রে সাহেবের উৎসাহে, তাঁহার ছুরি ও কাঁটার ক্ষিপ্র পরিচালনে হঠাৎ যেন তাঁহাকে চেনাই যায় না। ঠিক এমনই সময়ে বেহারা আসিয়া তাঁহার হাতে এক টুকরা কাগজ দিল। চশমার অভাবে তিনি হাত বাড়াইয়া কাগজটুকু ইন্দুর হাতে দিয়া বলিলেন, দেখ ত মা, কে?

ইন্দু পড়িয়া কহিল, অমরনাথ।

সাহেব অত্যন্ত কৌতূহলী হইয়া বলিলেন, ফিরেছে সে? আমি কতই না ভাবছিলাম। কমলকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, সে আমাদের বাড়ীর ছেলের মত। ঝড়ু, তাঁকে এইখানেই ডেকে নিয়ে আয়।

আলেখ্য শঙ্কিত হইয়া কহিল, এই ঘরে?

সাহেবের সে দিকে চোখ ছিল না, বলিলেন, হলই বা। কমল, এমন একটি ছেলে কিন্তু বাবা, আর কখনও চোখে দেখনি। আমাদের মধ্যে ত ছেড়েই দাও, হয় ত বিলেতেও কখনও দেখতে পাওনি। যা না ঝড়ু, দাঁড়িয়ে রইলি কেন?

ঝড়ু চলিয়া গেল, এবং অনতিকাল পরেই লোকটিকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া উপস্থিত হইল। তাহার খালি পা, মুখ অতিশয় শুষ্ক ও মলিন, মনে হয় যেন সমস্ত দিন তাহার জলবিন্দুটুকুও জুটে নাই, মাথার এক দিকে ব্যাণ্ডেজ করা—রক্তের দাগ তখনও কালো হইয়া আছে, সাহেব চমকিয়া উঠিলেন, ব্যাপার কি অমরনাথ,—এ কি কাণ্ড?

আগন্তুক চারিদিকে নিঃশব্দে বার বার দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। ভোজনে ক্ষণকালের জন্য তাঁহাদের বাধা পড়িল বটে, কিন্তু দরিদ্র, মূর্খ, ক্ষুধিত, বঞ্চিত এই পল্লীর মাঝখানে এই আহারের আয়োজন তাহার কাছে যেন বিড়ম্বনা একেবারে মূর্তিমান হইয়া দেখা দিল।

[ক্রমশঃ।

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

মহাত্মার প্রতি

এত তেজ, এত শক্তি অই ক্ষীণ দেহে
সম্ভবে কেমনে আমি ভাবি মনে মনে,
এত বড় বস্তুটাকে অত ক্ষুদ্র গেহে
ধরিতে পারিছ তুমি বুঝি না কেমনে।

অশ্রান্ত নির্ঝর সম কায ক'রে যাও—
দেখ না চাহিয়া ফিরে কার কান্না হাসি
কুটিল যতেক বাধা উপাড়িয়া ধাও,
ভ্রূকুটী-কুটিল দিঠি সম ঊষা-হাসি।

সার সত্য একমাত্র তোমার আশ্রয়,
চরণেও মিথ্যাচ্ছায়া নাহি পায় স্থান,
বিপুল এ ভারতের সমগ্র হৃদয়
তিলেকে করেছ জয় তাই মতিমান্।

ইতিহাসে তব নাম অমর, অক্ষয়—
মহাত্মন্, সব কাযে হোক তব জয়।

শ্রীরমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।



১৮ই অগ্রহায়ণ—

ত্রিচিনপল্লীর জেলে ডাঃ বরদারাজলু নাইডুর পীড়ার সংবাদ। পুণা সহরের নিকটে গোরা ওয়াকারের গুলীতে একজন গ্রামবাসী নিহত। এলাহাবাদ মিউনিসিপ্যালিটী কর্ত্তৃক মৌলানা সৌকৎ আলির অভিনন্দন, যুক্তপ্রদেশ কংগ্রেসে সম্পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী। ত্রিপুরা-রাজ্য শাসনে নূতন ব্যবস্থা। ফরাসডাঙ্গার ভূতপূর্ব্ব প্রজাবন্ধুর তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের লোকান্তর।

১৯শে অগ্রহায়ণ—

পণ্ডিত বাজপেয়ী ত্রিচিনপল্লীর জেল হইতে মুক্তি পাওয়ার দুই দিনের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত। বেলুড় ডাকাতির আসামী ননীগোপালের কারাদণ্ড। ঝালকাঠি, শুক্তাগড়ী গ্রামে হিন্দু মন্দির সমস্যায় হিন্দু-মুসলমানে বিরোধের সংবাদ, মন্দির পুলিসের পাহারায়। বিলাতে নির্ব্বাচন ব্যাপারে এক সম্ভ্রান্ত মহিলা আহত।

২০শে অগ্রহায়ণ—

বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুরে লাট অভিনন্দনে আপত্তি। ঝালকাঠি মিউনিসিপ্যালিটিতে মদের দোকান উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব গৃহীত। ব্রহ্মে জমিয়ৎ-উলেমা সভার প্রতিনিধিদের বক্তৃতায় বাধার সংবাদ। পুনায় তিলক মহারাজের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠায় বাধা। উরগাঁর স্বর্ণ খনির কুলী-ধর্ম্মঘটের অবসান। বিলাতে নির্ব্বাচন ক্ষেত্রে গুণ্ডামীর মূলে বলশেভিক অর্থের সন্দেহ।

২১শে অগ্রহায়ণ—

মাদ্রাজে বড় লাট গমনে তামিল নাড়ু কংগ্রেসের বয়কট ব্যবস্থা, যোরসাদ তালুক কনফারেন্সের সংবাদ প্রেরণে বাধার সংবাদ। বোম্বায়ে লাট সংবর্দ্ধনায় আপত্তিতে কর্পোরেশন সদস্যদের প্রতি অপমানজনক ব্যবস্থা। কলিকাতায় পুলিসের সম্মুখে নোট জালের আসামীর আত্মহত্যা। মিঃ কেরী কলিকাতার নূতন সেরিফ নিযুক্ত। চীনে য়ুরোপীয় শক্তি সমূহের সহিত সান ইয়ট সেনের বিরোধ। মেক্সিকোয় বিদ্রোহ।

২২শে অগ্রহায়ণ—

তারা গুরুদ্বারে পুলিস কর্ত্তৃক আকালী গ্রেপ্তার। মাদ্রাজে বড় লাট গমনে হরতাল। নির্ব্বাচনে নাগপুরে স্বরাজ্য দলের জয়। আরব, বেহরিণের সেখের নির্ব্বাসন কাহিনী। বিলাতে নির্ব্বাচন-ফল দেখিয়া প্রধান মন্ত্রীর পদত্যাগ-সঙ্কল্প। হামবর্গে অহিফেন আমদানীতে ৭০ জন ব্যবসায়ী ধৃত।

২৩শে অগ্রহায়ণ—

মাদ্রাজ ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের অধ্যাপক ডাঃ ধরের রসায়নাগারে সন্দেহজনক মৃত্যু। গ্রীসে নূতন ষড়যন্ত্রে গবর্ণমেণ্টকে বিপর্য্যস্ত করিবার চেষ্টা।

২৪শে অগ্রহায়ণ—

বাহবালপুরে চণ্ডনীতির সংবাদ। নাগপুরে হিন্দু-মুসলমান সমস্যায় মুসলমানগণের হিন্দু-বিদ্বেষে খেলাফতের নিন্দা। বোম্বায়ে পাঁচ মহল জেলায় সরকারী কর্ম্মচারীর খামখেয়ালীর সংবাদ। কলিকাতায় কোন জাহাজী কোম্পানীর ১৫ হাজার টাকা ভাঙ্গায় এক অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানের কারাদণ্ড। ফিজী হইতে ৫৯৩ জন শ্রমিকের প্রত্যাবর্ত্তন।

২৫শে অগ্রহায়ণ—

নিউ বর্ম্মার সম্পাদক ও মুদ্রাকর গ্রেপ্তার। বাঙ্গালার গবর্ণর কর্ত্তৃক লাট প্রাসাদে শ্রীযুত দাশের আহ্বান। গুজরাট জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি বিতরণে শ্রীযুক্তা গন্ধীর সভানেত্রীত্ব। আজমীরে হিন্দু-মুসলমানে বিরোধের কথা। মাদ্রাজ কাউন্সিলে সাম্রাজ্য প্রদর্শনী বয়কটের প্রস্তাব গৃহীত। করাচী হাঙ্গামা মামলায় সকল আসামীর মুক্তিলাভ। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের দৌড়ের প্রতিযোগিতায় প্রাণহানির সংবাদ।

২৬শে অগ্রহায়ণ—

হিন্দু সম্পাদক কস্তুরীরঙ্গ আয়েঙ্গার মহাশয়ের লোকান্তর, বাঙ্গালায় স্বরাজ্য দলকে মন্ত্রিত্ব দিবার প্রস্তাবে শ্রীযুক্ত দাশের সর্ত্ত। পাঞ্জাব, শাপুর জেলে আকালীদের প্রতি দুর্ব্ব্যবহারে প্রায়োপবেশনের সংবাদ। বাবর আকালী গ্রেপ্তারে লাহোর অঞ্চলে সৈন্য প্রভৃতির সহিত তাহাদের সংঘর্ষ। বিলাতে নির্ব্বাচনে মানহানির অপরাধে লর্ড ডগলাসের কারাদণ্ড।

২৭শে অগ্রহায়ণ—

মধ্যপ্রদেশের স্বরাজ্যদলে ডাঃ গৌরের যোগদানের সংবাদ। পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের মিঃ বেল লরী চাপা দিয়া এক ভারতীয়কে নিহত করিবার অভিযোগে অভিযুক্ত। তারা গুরুদ্বারে আকালীদের সহিত আপোষ। মিথ্যা কথায় হায়দ্রাবাদে হাইকোর্ট জজের জরিমানা। আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলা দায়রায় সোপরদ্দ।

২৮শে অগ্রহায়ণ—

বারাকপুরে হিন্দু মন্দির ধ্বংসের প্রতিবাদে সত্যাগ্রহের সঙ্কল্প। কলিকাতায় বড় লাটের আগমন। নাভা রাজের স্পেশ্যাল ট্রেণ নীলামের জন্য হাওড়ায় আনয়নের সংবাদ। কলিকাতা প্রদর্শনীর চুরীর সম্পর্কে জনৈক বাঙ্গালী ওভারসিয়ারের কারাদণ্ড। এসেন অঞ্চলে ফরাসী ও বেলজিয়ানদের সামরিক কর্ত্তৃত্ব অবসান প্রায়; রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি প্রস্তাব। খলিফার এডিকং গ্রেপ্তার।

২৯শে অগ্রহায়ণ—

ব্রহ্মে লাটের অতিরিক্ত ক্ষমতাবলে নামঞ্জুর দাবী আবার গ্রাহ্য। যুক্তপ্রদেশে কাউন্সিল নির্ব্বাচনে মডারেট নেতাগণের পরাজয়। ত্রিবাঙ্কুরে

অস্পৃশ্য জাতির জনৈক উকীল আদালত হইতে বহিষ্কৃত। বার্ম্মা স্কুলে বর্ণ-বৈষম্য তিরোধানে সরকারী ব্যবস্থা। কলিকাতায় বার কমিটীর অধিবেশন। প্যালেষ্টাইনের মস্‌জিদ সংস্কারে নিজামের লক্ষ টাকা দান।

৩০শে অগ্রহায়ণ—

ভবানীপুরে দেশবন্ধু দাশের বাটীতে স্বরাজ্যদলের কার্য্যপদ্ধতি সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত; গবর্ণরের মন্ত্রিত্ব গ্রহণের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত, হিন্দু-মুসলমান চুক্তির কথা। স্বাধীনদলের চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাটীতেও পরামর্শ বৈঠক, স্বরাজ্য ও স্বাধীন দলের মিলনের ব্যবস্থা। ঢাকায় নানাস্থানে খানাতল্লাস।

১লা পৌষ—

জব্বলপুর সত্যাগ্রহ আন্দোলনের নেতা শ্রীযুত শিউপ্রসাদজীর কারামুক্তি। বারাকপুরে হিন্দু-মন্দির রক্ষার জন্য বাঙ্গালার হিন্দু মহাসভার অধিবেশন। কলিকাতা বড়বাজারে পিস্তল সহ এক বাঙ্গালী যুবক গ্রেপ্তার। করারী হাঙ্গামা মামলায় ৫ জনের ফাঁসী ও ২৮ জনের দ্বীপান্তর। চৈমানাইর হাঙ্গামার পুলিস প্রহার মামলায় ২ জনের দণ্ড, ১০ জনের মুক্তি। সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের লোকান্তর।

২রা পৌষ—

আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে রাজবন্দীদের অসুবিধার কথা। মাদ্রাজ অঞ্চলের কতিপয় কংগ্রেস-কর্ম্মী পদব্রজে কোকনদে আসিয়া পঁহুছিলেন। কলিকাতায় কেল্লায় সীমান্ত-সমস্যা সম্বন্ধে জন-সাধারণের প্রতিনিধিদের সহিত সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের আলোচনা। অধ্যাপক অম্বিকাচরণ মিত্র মহাশয়ের লোকান্তর। কলিকাতায় বেকার সমস্যার সমাধানকল্পে নেতাদের সভা। বোম্বায়ে আফগানিস্থানের অস্ত্র আটকের সংবাদ। সিংহাসনচ্যুত গ্রীক নৃপতির রুম্যানিয়া-যাত্রা; কাবুল হইতে ইংরাজ মহিলাদিগকে সরাইবার ব্যবস্থা।

৩রা পৌষ—

কংগ্রেসের নিকট লিখিত রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপের পত্র প্রকাশিত। গুজরাটের কয়রা জেলায় বোরসাদে পিউনিটিভ পুলিসের ট্যাক্স বন্ধ করিয়া সত্যাগ্রহ। কলিকাতা হইতে বড় লাটের ব্রহ্ম যাত্রা। লক্ষ্ণৌয়ে চীফ কোর্টের প্রস্তাবে ভারত সচিবের সম্মতি। পলতায় নূতন ট্যাঙ্ক বসাইবার জন্য কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর ১ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা বরাদ্দ। পুনায় নরহত্যার অভিযোগে ওয়াকার নামক সৈন্যের বিচার। বিদ্যাধরীর সংস্কারে কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর প্রস্তাব। ট্যাঞ্জিয়ার সন্ধি স্বাক্ষরিত।

৪ঠা পৌষ—

আকালী আন্দোলনের দুই জন কয়েদীর জেলখানায় নিউমোনিয়ায় মৃত্যুর সংবাদ। চম্পারণে তিতারিয়া কারখানার শ্বেতাঙ্গ কুঠিয়ালের অনাচারের বিবরণ। বাঙ্গালা প্রভৃতি প্রদেশের অসুবিধার জন্য কোকনদ কংগ্রেসের দিন পিছাইয়া দেওয়া হইল। স্বামী বোধানন্দের আমেরিকা হইতে কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের চীন-গমনের সঙ্কল্প। নাগপুরের নির্ব্বাচনে স্বরাজ্য দলেরই অধিকাংশ নির্ব্বাচিত। সিন্ধিয়া ষ্টীম ন্যাভিগেশন কোম্পানীর গত বৎসর প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা ক্ষতির বিবরণ। আকালীদের সাহায্যে বার্ম্মা কংগ্রেসে ৩ হাজার টাকা মঞ্জুর। লণ্ডনে এক বৃটিশ ব্যারণের ইসলাম ধর্ম্মগ্রহণ।

৫ই পৌষ—

মৌলানা মহম্মদ আলীর অভিনন্দনে পুনা মিউনিসিপ্যালিটীর বিরুদ্ধে অভিযোগ। উত্তর-পশ্চিম রেলে ডাকী ষ্টেশনে ট্রেণ-সংঘর্ষে ৩ জন নিহত ও ২৮ জন আহত। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের ব্যবস্থাপক সভা-গমন নিষিদ্ধ করিলেন। চীনে অস্ত্রশস্ত্রের আমদানীতে য়ুরোপীয়দের আশঙ্কা; ক্যাণ্টনে আন্তর্জ্জাতিক নৌ সেনার অবতরণে রামজে ম্যাকডোনাল্ডের নিকট সান ইয়ট-সেনের অভিযোগ।

৬ই পৌষ—

কোকনদে অখিল স্বেচ্ছাসেবক সভার অধিবেশন। গৈলা হাই স্কুলের কতিপয় ছাত্র কর্ত্তৃক জনৈক শিক্ষকের অঙ্গে নাইট্রিক এসিড নিক্ষেপ। মার্কিণ মুলুকে তুলকানে ভূমিকম্পে ১৫০ জনের প্রাণনাশ।

৭ই পৌষ—

বারাকপুরে সত্যাগ্রহের আয়োজন। কলিকাতা প্রদর্শনীতে কতিপয় দোকানদারের সহিত কর্ত্তৃপক্ষের বিরোধে একটি বিভাগে ধর্ম্মঘট। মঃ পঁয়কারে কর্ত্তৃক রূঢ় অধিকার নীতির সমর্থন।

৮ই পৌষ—

বাঙ্গালার স্বরাজ্যদলের হিন্দু-মুসলমান চুক্তিতে পণ্ডিত মালব্যের প্রতিবাদ। মৌলানা মহম্মদ আলী ও সৌকৎ আলীর কোকনদে উপস্থিতিতে সংবর্দ্ধনা। মেবারে চিতোরগড়ে শ্রীযুত পাঠিকের বিচার আরম্ভ, চারি দফা অভিযোগ। গয়ায় জেলা কায়স্থ সভায় বিধবা বিবাহ আদি সামাজিক সংস্কারের প্রস্তাব গৃহীত। ডাকাত সন্দেহে চট্টগ্রামে দুইজন গ্রেপ্তার, অন্য পলাতকদের গুলীতে ৫ জন আহত। আফগানিস্থানের প্রতি সহানুভূতিতে বৃটিশ চর্ম্মপত্রের প্রতিবাদে তিহারাণ বাজারে হরতাল।

৯ই পৌষ—

মজঃফরপুরের কিষাণ সমাচার সম্পাদক স্বামী বিদ্যানন্দ গ্রেপ্তার। কলিকাতায় স্বেচ্ছাসেবক সংঘের অধিবেশন। কোকনদেও পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে স্বেচ্ছাসেবক সংঘের সভা। বারাকপুরের সত্যাগহে শিখ লীগের সাহায্য-দানের প্রস্তাব। কলিকাতায় রাজদ্রোহিক অভিযোগে শ্রীযুত নলিনী গুপ্ত গ্রেপ্তার। কোকনদে আচার্য্য শ্রীযুত প্রফুল্লচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক খদ্দর প্রদর্শনীর উদ্বোধন। আফগান সীমান্তের দস্যুদের দমনে মাদ্দাতাই অঞ্চলে আফগান সৈন্যদের আগমন-সংবাদ।

১০ই পৌষ—

নিখিল ভারত খেলাফৎ কমিটী কর্ত্তৃক আঙ্গোরায় প্রতিনিধি-প্রেরণের সংকল্প। পুনা মিউনিসিপ্যালিটীর নেতৃ-অভিনন্দন সমস্যায় প্রত্যেক সদস্যের নামে সরকারের অভিযোগ। কণ্টাইতে স্বামী বিশ্বানন্দজী আটক। মহাত্মাজীর শরীরের ওজন ১৫ পাউণ্ড কমিয়াছে। কোকনদে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর ও বিষয়-নির্ব্বাচন সমিতির অধিবেশন। বিশেষ সরকারী কার্য্যে বড় লাটের ব্রহ্ম-ভ্রমণে বাধা। ইংলণ্ডে জগতের মধ্যে বড় সাবমেরিণ নির্ম্মাণ শেষ হইল।

১১ই পৌষ—

কোকনদে খেলাফৎ মহাসভার অধিবেশন। বারাকপুরে সত্যাগ্রহের জয়, টাক ক্লাব হিন্দু সমাজের সর্ত্তে সম্মত, স্বামী বিশ্বানন্দজী অণ্ডাল হইতে অব্যাহতি পাইয়া কলিকাতায় ফিরিলেন। শ্রীযুত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা হাইকোর্টের নূতন জজ হইলেন। ঢাকায় শিক্ষয়িত্রী সম্মিলন। এলাহাবাদে বঙ্গভাষা সম্মিলনের অধিবেশন। পুনায় মডারেট সভায় স্বায়ত্ত-শাসনের দাবী। জাপানে মন্ত্রি-সভার পদত্যাগ।

১২ই পৌষ—

কোকনদ মিউনিসিপ্যালিটী, তালুক বোর্ড ও গোদাবরী জেলা রায়ত সভার পক্ষ হইতে মৌলানা মহম্মদ আলী ও শ্রীযুত দাশের অভিনন্দন। মৌলানা মহম্মদ আলী কর্ত্তৃক কোকনদে স্বরাজ

পতাকা উত্তোলন। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সদস্য গয়ার কৃষ্ণপ্রসাদ সেনসিংহের লোকান্তর। জাপানে সমাজতান্ত্রিকদের উপদ্রব। বিখ্যাত ইফেল টাওয়ার নির্ম্মাতা মিঃ ইফেলের মৃত্যু।

১৩ই পৌষ—

কংগ্রেস মহাসভার দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে বাঙ্গালার চুক্তি অগ্রাহ্য; নিখিল ভারত জাতীয় চুক্তি কমিটীর হস্তে অর্পিত। পুনায় বোম্বায়ের প্রাদেশিক অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জন সভার অধিবেশন।

১৪ই পৌষ—

হাবড়া শিলপানার মসজিদে শূকর-মাংস নিক্ষেপ; স্থানীয় হিন্দুদের উপর আক্রমণ; একজন হিন্দু নিহত ও কয় জন জখম ঘটনাস্থলে পুলিস ও সশস্ত্র গুর্খার পাহারা। সেকেন্দ্রাবাদ, রাজকোটে অনুন্নত সমাজের কতিপয় খৃষ্টানের পুনরায় হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ।

১৫ই পৌষ—

কোকনদে উলেমা সভার বিষয় নির্ব্বাচন সমিতিতে আঙ্গোরা-খেলাফৎ সমস্যায় আলোচনা। কংগ্রেসে শ্রীযুত রাজাগোপালচারীর মিটমাট প্রস্তাবে পণ্ডিত শ্যামসুন্দরের সংশোধন অগ্রাহ্য। লালা দুনীচাঁদ ও আমীরচাঁদের কারামুক্তি। জমিয়ৎ-উলেমায় আকালীদের প্রতি সহানুভূতি। লর্ড ইঞ্চকেপ ভাইকাউণ্ট হইলেন। চীনা দস্যুদের হস্তে মার্কিণ পাদরীদের নিগ্রহের সংবাদ।

১৬ই পৌষ—

খেলাফৎ সমিতিতে ভারতীয় ও বঙ্গীয় চুক্তি গৃহীত। কংগ্রেসে আইন অমান্যের প্রস্তাব। কলিকাতা খেলাফৎ কমিটী ও বড়বাজার কংগ্রেস কমিটী কর্ত্তৃক সারদাপীঠের জগদ্‌গুরু শ্রীশঙ্করাচার্য্যজীকে অভিনন্দন-প্রদান। বাঙ্গালোরে নিখিল ভারত খৃষ্টান সম্মিলনী। বরিশালে তারিণীকুমার গুপ্ত মহাশয়ের লোকান্তর। নৌকাডুবীতে বঙ্গোপসাগরে ১৫ দিন যাবৎ ভাসমান চট্টগ্রামের কয়েক ব্যক্তির উদ্ধার। তুরস্কে বহু বিবাহ নিষিদ্ধ; হাঙ্গেরীর সহিত তুরস্কের বাণিজ্য-সন্ধি।

১৭ই পৌষ—

ভাইফেরুতে ৩২ জন আকালী গ্রেপ্তার। পঞ্জাব কাউন্সিলে স্বরাজ্যদলের সদস্যদের একযোগে সভা ত্যাগ। শিলচর নারী শিল্পাশ্রমে পুলিসের খানাতল্লাস। স্বরাজ্যদলের কার্য্যপদ্ধতি তাঁহাদের সাধারণ কাউন্সিলে স্থির হইল। মৌলানা আবদুল বারি তাঁহার নামে প্রচারিত মহাত্মা ও হিন্দুসমাজের প্রতি বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন ফতোয়া তাঁহার নহে বলিয়া জানাইলেন। চন্দননগরের সুশীলা ও অপ্রকাশ বসুর বিবাহ কলিকাতা হাইকোর্টের মতে হিন্দু আইনে সিদ্ধ। তুর্কী বন্দরে কেবল তুর্ক কর্ম্মচারী নিয়োগের ইস্তাহার।

১৮ই পৌষ—

অমৃতসরের নেশন পত্রের প্রচার বন্ধ হইল। মাদারীপুরের নেতা শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র দাসের কারামুক্তি। হুশিয়ারপুর জেলায় বাবর-আকালী গ্রেপ্তারে বোমা ও পিস্তল প্রাপ্তি। হাবড়া শিলপানার হাঙ্গামার সম্পর্কে চার জন গ্রেপ্তার। বরোদায় কজিরাজদের বিরুদ্ধে চণ্ডনীতি প্রত্যাহৃত। অধ্যক্ষ যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের লোকান্তর। কতিপয় কলেজ-ছাত্রের কলিকাতা হইতে পদব্রজে ২৩ দিনে কাশীগমন।

১৯শে পৌষ—

শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় দক্ষিণ মেদিনীপুর অ-মুসলমান কেন্দ্র হইতে নির্ব্বাচিত। বরোদা রাজ্যে স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন ব্যবস্থায় মহারাজার সম্মতি। শাঁখারীটোলার হত্যাকাণ্ডে নিহত পোষ্ট মাষ্টারের পরিবারবর্গের প্রতি সরকারী পেন্সনের ব্যবস্থা। পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে মার্কিণ অধ্যাপকের ভ্রান্ত ধর্ম্ম-তত্ত্ব প্রচারে সনাতনীদের পক্ষ হইতে প্রতিবাদ।

২০শে পৌষ—

কলিকাতায় পালোয়ানগণ কর্ত্তৃক সারদাপীঠের শঙ্করাচার্য্যজীর অভিনন্দন। বোম্বাই সরকারের সর্ত্তে শ্রীযুত সবরকার কারামুক্তি লইতে সম্মত। অশ্লীল পুস্তক প্রকাশে শ্রীযুত শিশিরকুমার মিত্র জামীন-মুচলেকায় আবদ্ধ, তাঁহার পুস্তকগুলি নষ্ট করিয়া দিবার আদেশ।

২১শে পৌষ—

কোকনদ কংগ্রেস হইতে শ্রীযুত দাশের কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন। কলিকাতায় খাদী প্রতিষ্ঠানের খদ্দর প্রচার সভা। উগাণ্ডায় এশিয়াবাসীদের য়ুরোপীয়দের যায়গায় বসবাসের সুবিধা। জাপানে মন্ত্রিসভা গঠন। এম ভেনিজেলস গ্রীসের জাতীয় পরিষদের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন।

২২শে পৌষ—

গুরুদ্বার প্রবন্ধক কমিটীর আবার ৬০ জন নেতা গ্রেপ্তার। বাঁকুড়ায় গবর্ণর-গমনে হরতাল। নিখিল ভারত খদ্দর বোর্ডের সদস্যদের মাদ্রাজ অঞ্চল পরিদর্শন। প্রয়াগে অর্দ্ধকুম্ভ মেলা আরম্ভ। নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয় কোর্টে দুই জন মহিলা সদস্য গৃহীত। আন্তর্জ্জাতিক নোট জালিয়াত দলের এক পাণ্ডা ভিয়েনায় গ্রেপ্তার।

২৩শে পৌষ—

মৌলানা সৌকৎ আলী, ডাঃ কিচলু, বাঈ আম্মা প্রমুখ খেলাফৎ নেতৃবৃন্দের সিংহল গমন। বোরসাদ সত্যাগ্রহের জয়, নূতন বোম্বাই লাট তালুকবাসীদিগকে পিউনিটিভ ট্যাক্স হইতে অব্যাহতি দিলেন। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে আই সি এস পরীক্ষা আরম্ভ। ক্যানিং টাউন থানার দরিয়া গ্রামে এক মুসলমান গৃহস্থ সপরিবারে নিহত। স্মার্ণায় নব্য তুর্কীর প্রতিষ্ঠাতা মুস্তাফা কামাল পাশার প্রতি বোমা নিক্ষেপ, বোমার আঘাতে কামাল-পত্নী অল্প আহত। বিলাতে নূতন পার্লামেণ্টের অধিবেশন।

২৪শে পৌষ—

সিংহলে মৌলানা সৌকত আলীর প্রতি ভুলক্রমে নোটিশ জারী। বিষ্ণুপুরে লাট-গমনে হরতাল। সার ম্যালকম হেলী পঞ্জাবের গবর্ণর-পদে নিযুক্ত। বারাণসীতে হিন্দু মহাসভার কার্য্যকরী সমিতিতে হিন্দু সেবক-দল ও মিশনারী বা প্রচারক সংঘ-গঠনের সঙ্কল্প, সাঁওতালদের ধর্ম্মমন্দির প্রতিষ্ঠায় আশ্বাস। ইংলণ্ডে ভীষণ তুষারপাত। ব্যাভেরিয়ার স্পায়ার নগরে জনৈক স্বাতন্ত্রিক নেতা নিহত।

২৫শে পৌষ—

লক্ষ্ণৌ মিউনিসিপ্যালিটী কর্ত্তৃক শ্রীযুত দাশের সংবর্দ্ধনা। প্রয়াগে অর্দ্ধকুম্ভ মেলায় সঙ্গমস্থলে স্নান নিষিদ্ধ। বারাকপুর সত্যাগ্রহ উপলক্ষে স্থানীয় কংগ্রেসের সম্পাদক জগন্নাথপ্রসাদ সিং ১৪৪ ধারা অমান্য করিয়া গোরাবাজারে আসায় তাঁহার কারাদণ্ড হইল। পাবনায় জোতদারদের সহিত মুসলমান বর্গাদারদের মনোমালিন্যের সংবাদ। বাঙ্গালায় উচ্চ শিক্ষার সাহায্যার্থ সরকারের কমিটী-গঠন।

২৬শে পৌষ—

সালেম মিউনিসিপ্যালিটীর বিদ্যালয়গুলিতে ছেলেদের জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ার ব্যবস্থা। পঞ্জাবে কয়েকস্থানে অতিরিক্ত পুলিস বসিবার সংবাদ। সিংহলের কংগ্রেসকর্ম্মী শ্রীযুত অরুণাচেলামের লোকান্তর। ঢাকায় শ্রীযুত শ্রীশ চট্টোপাধ্যায়ের মামলায় আসামী দুই জনের অব্যাহতি। জার্ম্মাণীতে ৫ লক্ষ চরকা চলার সংবাদ। আরবে রাজা হোসেনকে খলিফা ঘোষণা।

২৭শে পৌষ—

কলিকাতায় চৌরঙ্গী রোডে মিঃ ডে নামক জনৈক শ্বেতাঙ্গ গোপীনাথ সাহার গুলীতে নিহত, পলায়নের সময় যুবককে সাহায্য না করায় আর কয় জন জখম। পূর্ব্ব আফ্রিকার কংগ্রেসেও কাউন্সিল-বর্জ্জননীতি গৃহীত ও সম্প্রদায়মূলক নির্ব্বাচন প্রত্যাখ্যাত। য়ারবেদা জেল হইতে মহাত্মা গন্ধীকে পুনায় সেসুন হাসপাতালে লইয়া যাওয়া ও সেখানে অস্ত্রোপচার। পটুয়াখালীর লোকাল বোর্ডের ব্যবস্থায় মুসলমান-প্রধান আমতলী থানায় মদের দোকান বন্ধ। পাটনায় দেশ ও সার্চ্চ লাইট অফিসে খানাতল্লাস।

২৮শে পৌষ—

চৌরঙ্গীর হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে সরস্বতী লাইব্রেরী, কংগ্রেস অফিস প্রভৃতি কলিকাতার কয় স্থানে ও শ্রীরামপুরে খানাতল্লাস; দুই জন যুবক গ্রেপ্তার। আচার্য্য শ্রীযুত প্রফুল্লচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক তমোলুকে হিতসাধন প্রদর্শনীর উদ্বোধন। মিশরের নির্ব্বাচনে জগলুলের দলের জয়।

২৯শে পৌষ—

মিঃ ডের হত্যাকাণ্ডে কলিকাতায় শ্বেতাঙ্গদের শোক-সভা। মহাত্মার শুশ্রূষায় মহাত্মা-পত্নী অনুমতি পাইলেন। কুম্ভমেলায় সত্যাগ্রহ। বৃটিশ শ্রমিক ডেপুটেশনের বোম্বায়ে আগমন-সংবাদ।

১লা মাঘ—

কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট গোপীনাথের নির্ভীক একরার। দিল্লীতে শুদ্ধি-সংস্কারে বিরোধ। লাহোর কোর্ট বে-সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের হস্তে প্রদত্ত। ভাওয়াল মানহানি মামলায় হাইকোর্টে আসামীর শাস্তি। বেলেঘাটা ডাকাতি মামলায় দণ্ডাদেশে আসামীদের হাস্য। বিলাতে পার্লামেণ্টে রাজ-অভিভাষণ।

২রা মাঘ—

বাঙ্গালা কাউন্সিলে দায়িত্বপূর্ণ গবমেণ্ট-স্থাপনের প্রস্তাব উঠিতে দেওয়া হইবে না বলিয়া স্থির হইল। জাপানে আবার ভূমিকম্পে অনেকে হতাহত।

৩রা মাঘ—

মুন্সীগঞ্জে ডাকাতি সম্পর্কে ৫০ জনের গ্রেপ্তার সংবাদ। মুলসীপেটা সত্যাগ্রহীদের প্রতি দুর্ব্ব্যবহারের কথা। ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য মনোনীত হওয়ার প্রস্তাবে সার সুরেন্দ্রের আপত্তি।

৪ঠা মাঘ—

বরিশালে অহোরাত্র চরকা উৎসব। মহাত্মার রোগমুক্তির প্রার্থনায় কলিকাতায় বিরাট সভা। কংগ্রেস আকালীদের মামলা চালাইতে অস্বীকার করায় সে উদ্দেশ্যে আকালী-সাহায্য কমিটী গঠিত। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার জন্য প্রস্তুত শ্রীযুত বিজয়কৃষ্ণ বসুর সংস্কার আইন সংশোধনের প্রস্তাব অগ্রাহ্য। আদালতে গোপীনাথ সাহার উক্তি—আমি বিপ্লববাদী দলকে চিনি না। চম্পারণে শ্বেতাঙ্গ কুঠিয়ালের অনাচার সংবাদ। পার্লামেণ্ট মহাসভায় রাজ-অভিভাষণের সমালোচনা।

৫ই মাঘ—

ভাইকোমে ৪২৪ জন গ্রেপ্তার। মধ্যপ্রদেশে মন্ত্রীদের উপর অবিশ্বাসের প্রস্তাব গৃহীত। এলাহাবাদে অর্দ্ধ-কুম্ভমেলায় ১৪৪ ধারা জারী। প্রবন্ধক কমিটীর অফিসে খানাতল্লাস, পুলিসের সহিত সংঘর্ষের সংবাদ। কলিকাতা, বড়বাজারে রাহাজানিতে ৬ হাজার টাকা অপহৃত। বেলেঘাটা বড়যন্ত্র মামলায় আসামীদের শাস্তি। কোহাট হাঙ্গামার আক্রমণকারীদের আত্মসমর্পণের সংবাদ। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর মোম্বাসাতে উপস্থিতি।

৬ই মাঘ—

ব্রহ্মে জাতীয় দলের বৈঠকে সংস্কার আইনের সংশোধনের প্রস্তাব। স্বামী বোধানন্দের অভ্যর্থনায় কলিকাতায় ইনষ্টিটিউট হলে সভা। ব্রহ্মে প্রোম সহরে শ্রীযুত মণিলাল কোঠারী প্রভৃতির স্বদেশী-প্রচারে গমন। বিলাতে রেল ধর্ম্মঘট আরম্ভ।

৭ই মাঘ—

হুগলী জেলে শ্রীযুত বলবাহাদুরের সহিত কাউন্সিল-সদস্যের সাক্ষাতেও আপত্তি। গুরুবাগের মোহান্ত আকালীদের বিরুদ্ধে উচ্ছেদের মামলা আনিলেন। কলিকাতায় মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচনে কংগ্রেস হইতে সভাপতি দাশ মহাশয়ের উপর ভারার্পণ। গোপীনাথ সাহা দায়রায় সোপর্দ্দ। মেদিনীপুরে সাঁওতাল হাঙ্গামা মামলায় আসামীদের শাস্তি-বৃদ্ধির জন্য রুল জারী। বিলাতে গবর্মেণ্টের পরাজয়, মিঃ বলডুইনের পদত্যাগ। রুসিয়ার বলশেভিক নায়ক লেনিনের মৃত্যু।

৮ই মাঘ—

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় সদস্যদের শপথ-গ্রহণ। ত্রিচি জেলে রাজনীতিক বন্দীদের প্রতি দুর্ব্ব্যবহারের সংবাদ। মন্ত্রী শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিকের নির্ব্বাচন নাকচ। কলিকাতার এতীমখানার মামলায় কণ্ট্রাক্টারের শাস্তি। ঢাকা, কলিয়াকর থানায় ডাকাতিতে ২০ হাজার টাকা লুণ্ঠনের সংবাদ। বিলাতে শ্রমিক মন্ত্রি-সভা গঠন।

৯ই মাঘ—

বঙ্গীয় কাউন্সিলে গবর্ণরের বক্তৃতা, বাঙ্গালায় বিপ্লববাদ সম্বন্ধে প্রমাণ প্রদর্শন। শ্রীযুত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঢাকা জেলে ৩ আইনে আটক। কলিকাতা কর্পোরেশনে শিব-মন্দিরের ট্যাক্স মকুব।

১০ই মাঘ—

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় রাজবন্দীদের মুক্তির প্রস্তাব। সিংহল হইতে খেলাফৎ নেতাদের মাদ্রাজে প্রত্যাগমন। ময়মনসিংহে ৫০টি পোষ্ট অফিস উঠাইয়া দেওয়ার কথা। শ্রীযুত গোপালদাস দেশাইয়ের নিকট বাবর দেবের পত্র। মাণিকগঞ্জে মুসলমানদের হিন্দু-বিদ্বেষমূলক আন্দোলন।

১১ই মাঘ—

বাঙ্গালা কাউন্সিলে রাজবন্দীদের মুক্তির প্রস্তাব গৃহীত, সরকারের দুইবার পরাজয়। বাঙ্গালোরে মৌলানা সৌকৎ আলীর মুখ বন্ধ। বার্ম্মা হইতে দুই জন সংবাদপত্র-সম্পাদকের নির্ব্বাসন। বোম্বাই হাইকোর্টে কুমারী মিঠন টাটার ব্যারিষ্টারী। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু ওয়েলসে অসুস্থ।

১২ই মাঘ—

কেনিয়া কংগ্রেসে অসহযোগ প্রস্তাব গ্রহণের সংবাদ। বোম্বাইয়ের কলসমূহে ধর্ম্মঘটের বৃদ্ধি।

১৩ই মাঘ—

পুনায় মহাত্মার সন্দর্শনে মৌলানা সৌকৎ আলী, ডাঃ কিচলু, পণ্ডিত নেহরু প্রভৃতি নেতাদের গমন।

১৪ই মাঘ—

বাঙ্গালা কাউন্সিলে আবার সরকারের পরাজয়, দমননীতিমূলক আইন প্রত্যাহারের প্রস্তাব গৃহীত। বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীবিবেকানন্দ স্বামীর সমাধি-মন্দির প্রতিষ্ঠা। সাঁতরাগাছীর পাশবিক অত্যাচারের মামলার পুনর্বিচারে মার্টিনের অব্যাহতি। মস্কো সহরে লেনিনের সমাধি। মিশরের নূতন মন্ত্রি-সভায়, প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তি মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত।

১৫ই মাঘ—

মহাত্মা কর্ত্তৃক শিশুদের জন্য রচিত পুস্তকে সরকারী আপত্তির সংবাদ। নাইনী জেল হইতে শ্রীযুত বিদ্যার্থীর কারামুক্তি। পঞ্জাবে

তোপবন্ধের ব্যবস্থা। ই. বি রেলে চলন্ত ডাকগাড়ীতে ডাকাতি। কলম্বো'র মোটর দুর্ঘটনায় কয়জন সৈনিক হতাহত। ডুমরাও মামলায় মহারাজার পক্ষে সার আশুতোষ। এলাহাবাদে সাধু মহামণ্ডলের অধিবেশন। বিলাতে রেল ধর্ম্মঘটের মিটমাট। মিশর ও সুদানের জন্য জগলুলের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী।

১৬ই মাঘ—

তাঞ্জোরে টেক্স বন্ধে কাউন্সিল-সদস্যের সম্পত্তি ক্রোক। লক্ষ্ণৌয়ে রেলকর্তৃপক্ষ কর্তৃক মন্দির-ধ্বংস ব্যবস্থায় হিন্দুদের হরতাল। অমৃতসরে আকালী নেতাদের ষড়যন্ত্র মামলার বিচার। ভিক্ষাবৃত্তি দমনে মান্দ্রাজ কর্পোরেশনে কমিটী গঠন।

১৭ই মাঘ—

ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে বড়লাট কর্তৃক রাজনীতিক বন্দীদের মুক্তি প্রস্তাবে আপত্তি এবং আটক সমর্থন। দিল্লীতে স্বরাজ্যদলের বৈঠকে দলপতি প্রভৃতি স্থির। যুক্তপ্রদেশে বজেট বিতর্কে স্বরাজ্যদলের অনুপস্থিতি। কানপুর মিউনিসিপ্যালিটী কর্তৃক কারামুক্ত শ্রীযুত বিদ্যার্থীর ও মৌলানা নিসির আহমদের অভ্যর্থনা।

১৮ই মাঘ—

তাঞ্জোরের মিরসদারদের ট্যাক্স বন্ধের আয়োজন। আমেদাবাদ মিউনিসিপ্যালিটীতে কংগ্রেস পক্ষের জয়লাভ। ভারতীয় পরিষদের প্রশ্নোত্তরে প্রকাশ, বাঙ্গালায় রাজবন্দীর সংখ্যা ২২। কলিকাতায় রয়্যাল কমিশনের সাক্ষ্যগ্রহণ। লক্ষ্ণৌয়ে ভগ্ন হিন্দু দেবালয়ের পুনর্নির্ম্মাণে রেল কর্তৃপক্ষের সম্মতি। বৃটেন কর্তৃক রুস সোভিয়েট স্বীকার।

১৯শে মাঘ—

পাবনা জিলায় হিন্দু সংগঠনের সংবাদ। আকালী সাহায্যে নিখিল ভারত কংগ্রেসের ২৫ হাজার টাকা প্রদান। রেঙ্গুনে শ্রীযুত মণিলাল কোঠারীর মুখ বন্ধ। সালেমের ডাঃ বরদারাজলু নাইডুর কারামুক্তি।

২০শে মাঘ—

বোম্বাই ধর্ম্মঘটে ধর্ম্মঘটকারীদের হাঙ্গামা। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট ডাঃ উড্রো উইলসন লোকান্তরিত। মার্কিণে দুইখানি বৈদ্যুতিক ট্রেণের সংঘর্ষে বহু লোক হতাহত।

২১শে মাঘ—

মহাত্মা গন্ধীর কারামুক্তি। লক্ষ্ণৌয়ে ভগ্ন মন্দিরের পুনর্গঠন আরম্ভ। বাঙ্গালার মন্ত্রীদের প্রতি অবিশ্বাসের প্রস্তাব (শ্রীযুত সেনগুপ্ত কর্তৃক প্রস্তাবিত) উত্থাপনে সভাপতির আপত্তি। সহকারী ভারত-সচিব সার অলিভারের ব্যারণ হইলেন। লেনিনের মৃত্যুতে সোভিয়েট মন্ত্রণা সভায় পরিবর্ত্তন।

২২শে মাঘ—

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় মহাত্মার মুক্তি-প্রস্তাব উত্থাপনের আশায় বহু দর্শকের সমাগম; পরিষদে সৈন্য-সংস্কারের প্রস্তাব। রাষ্ট্রীয় পরিষদে নোবেল প্রাইজের জন্য শ্রীযুত আগা খাঁর নাম।

২৩শে মাঘ—

দিল্লীতে স্বরাজ্য ও স্বতন্ত্র দলের মিলন আরম্ভ। ১৪৪ ধারা অমান্যে আলমোড়ার শ্রীযুত ভিক্টর যোশী প্রভৃতি বহু নেতার কারাদণ্ড।

২৪শে মাঘ—

দেশবাসীর প্রতি মহাত্মার বাণী। কাজী নজরুল ইসলাম জেল আইনের মামলা হইতে অব্যাহতি পাইলেন। ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে দক্ষিণ আফ্রিকার কয়লার উপর অপেক্ষাকৃত অধিক শুল্ক গ্রহণের প্রস্তাব ভোটের জোরে গৃহীত। কেনিয়াতে জিজিয়া টেক্স বন্ধের আন্দোলন আরম্ভের সংবাদ। ফরাসী ও মার্কিণে গুপ্তসন্ধির সংবাদ।

২৫শে মাঘ—

সিরাজগঞ্জে সরস্বতী ও কালী প্রতিমা ভঙ্গ। বিলাতে মন্ত্রি-সভায় ভারত শাসনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা; রয়্যাল কমিশনের প্রস্তাব। মিশরে সামরিক বিচারে দণ্ডিত বিদ্রোহীদিগকে ক্ষমা।

২৬শে মাঘ—

জৈঠো অভিমুখে ৫০০ আকালীর যাত্রা, নাভা কর্তৃপক্ষ রাজনীতিক আন্দোলনের আশঙ্কায় কেবল ৫০ জনকে জৈঠো যাইবার অনুমতি দিয়াছেন। বঙ্গীয় খদ্দর সমিতির নূতন ব্যবস্থা। লক্ষ্ণৌয়ে রয়্যাল কমিশন। বৃটিশ কর্তৃক সোভিয়েট স্বীকারের ব্যবস্থায় রুসিয়ার সম্মতি।

২৭শে মাঘ—

মহাত্মার কারামুক্তিতে ভারতব্যাপী আনন্দোৎসব। প্রয়াগে অর্দ্ধ-কুম্ভমেলায় ভৈরবী ও নাগা সম্প্রদায়ে মারামারি, বহু লোক আহত।

২৮শে মাঘ—

ভাইকেরুতে ৭৪৭ জনের গ্রেপ্তার সংবাদ। বর্দ্ধমান খিলাফৎ আন্দোলনে শ্রীযুত দাশের বিরুদ্ধ মন্তব্য। কলিকাতা হাইকোর্টের দায়রায় গোপীনাথ সাহার মামলা আরম্ভ। কালীঘাট অনাচারে কলিকাতায় বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনে সভা। ভারতের জন্য জার্ম্মাণীতে এঞ্জিন ক্রয়ের ব্যবস্থায় বিলাতে আপত্তি।

২৯শে মাঘ—

সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বৃত্তি দান। নির্ব্বাচনে মন্ত্রী শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক ও স্বরাজ্যদলে আপোষ চেষ্টা। কলিকাতায় বিচার বিলম্ব সম্পর্কীয় কমিটীর সাক্ষ্য-গ্রহণ। বিহার ব্যবস্থাপক সভার কার্য্য-বিবরণ দেশীয় ভাষায় প্রকাশের প্রস্তাব সভায় গৃহীত। শ্রমিক গবর্মেণ্টে লর্ড চেমসফোর্ডের যোগদানে কৈফিয়ৎ দিতে হইল। ইটালীর তুলার জাহাজে অগ্নিকাণ্ডে ৭ লক্ষ টাকা ক্ষতি।

১লা ফাল্গুন—

মহাত্মার মুক্তিতে কলিকাতা করপোরেশনের আনন্দ প্রকাশ। ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে শ্রীযুত রঙ্গচারিয়ার শাসন-সংস্কার প্রসারের প্রস্তাব। দিল্লীতে অস্পৃশ্য উদ্ধারে মুসলমানদের আপত্তি, হাঙ্গামায় ২ জন হিন্দু জখম। তারকেশ্বরে প্রজাদের সহিত মোহান্তের সংঘর্ষ। ব্যাভেরিয়ায় স্বাতন্ত্রিকদের সহিত আবার রক্তারক্তি।

২রা ফাল্গুন—

কলিকাতা হাইকোর্টে আসামী গোপীনাথ সাহার একরার। মেদিনীপুর জেলে রাজবন্দীদের প্রতি দুর্ব্যবহারের সংবাদ। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় মহাত্মার মুক্তিতে আনন্দপ্রকাশের প্রস্তাব উত্থাপনে সভাপতির আপত্তি। জব্বলপুর মিউনিসিপ্যালিটীতে বড় লাটের অভ্যর্থনার প্রস্তাব অগ্রাহ্য।

৩রা ফাল্গুন—

কালীঘাট অনাচারের প্রতীকারে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনে জন-সভায় আপোষ। মধ্যপ্রদেশে কাউন্সিল সমস্যায় লাটের দিল্লী গমন।

৪ঠা ফাল্গুন—

চৌরঙ্গী খুনের মামলায় হাইকোর্টের দায়রায় গোপীনাথ সাহার ফাঁসীর হুকুম। আকালী ষড়যন্ত্র মামলায় পণ্ডিত মদনমোহনের

আসামী-পক্ষ সমর্থন। সাহারাণপুর দাঙ্গা মামলায় সাত জনের দ্বীপান্তর।

৫ই ফাল্গুন—

মৌলানা হজরৎ মোহানীর প্রতি কারাগারে দুর্ব্ব্যবহারের সংবাদ। অন্ধ্রে অসহযোগী কংগ্রেস সম্পাদক দণ্ডিত। তুর্কীর রেড ক্রেসেণ্ট সোসাইটির প্রতিনিধিগণের দিল্লী-আগমনে সভাস্থলে অভ্যর্থনা।

৬ই ফাল্গুন—

বঙ্গীয় কাউন্সিলে শ্রীযুত সেনগুপ্তের মন্ত্রি-অবিশ্বাসের প্রস্তাবে আপত্তি। বাঙ্গালার বাজেটে ৩০ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত। গান্ধী পুণ্য মাসের প্রথম দিন উপলক্ষে নানাস্থানে সভা-সমিতি। চট্টগ্রাম শ্মশানের শবব্যবচ্ছেদাগার ভঙ্গ সমস্যায় আপোষ। দক্ষিণ আফ্রিকায় গণ্ডী-নির্দ্দেশক আইনে বিলাতে ভারতীয় প্রতিনিধি সঙ্ঘের প্রতিবাদেও মত ফিরিল না।

৭ই ফাল্গুন—

বোম্বায়ে গবর্ণরের বাগান পার্টী স্বরাজ্যদল কর্ত্তৃক বয়কট। কলিকাতা কুমারটুলীতে পুলিসের হাঙ্গামায় কয় জন জখম। বোম্বাই সহরে চার জন মহিলা জষ্টিস্ অব পীস্ নিযুক্ত হইলেন। লক্ষ্ণৌয়ে আলি পরিবারের পরিদর্শন।

৮ই ফাল্গুন—

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় হস্তান্তরিত বিভাগের সংখ্যা-বৃদ্ধির প্রস্তাবে সরকারের এবং রাজবন্দীদের মুক্তি প্রস্তাবে স্বরাজ্য দলের পরাজয়; মন্ত্রী অবিশ্বাসের প্রস্তাব সম্পর্কেও স্বরাজ্যদলের এক ভোটে পরাজয়। চন্দ্রগ্রহণে কলিকাতায় স্বেচ্ছাসেবকদলের কার্য্য। বৃটিশ প্রধান মন্ত্রীর রেলগাড়ীতে তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণের সংবাদ।

৯ই ফাল্গুন—

নাভায় আকালী জাঠার গমনে গুলী চলিল, অনেকে হতাহত, ডাঃ কিচলু ও গিদবাণীও গ্রেপ্তার। বাঙ্গালোরে কংগ্রেসকর্ম্মীর প্রতি ১৪৪ ধারার নোটিশ। ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় জনতা-দমনে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের পাণ্ডুলিপি এবং ডাঃ গৌরের সহবাস সম্মতি ও হিন্দু-মন্দিরসংক্রান্ত বিল। শ্রীযুত দাশের নির্ব্বাচন মামলার বিচারের জন্য ৩ জন দায়রা জজ নিযুক্ত। বাঙ্গালার শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টার মিঃ ডানের গঙ্গাগর্ভে অপমৃত্যু। বিলাতে ডক ধর্ম্মঘটের অবসান।

১০ই ফাল্গুন—

মেদিনীপুরের সাঁওতাল বিদ্রোহের আসামীদের হাইকোর্টে আপীলে দণ্ড বাড়িল না। দিল্লীতে মিসেস্ বেসান্টের জাতীয় বৈঠক।

১১ই ফাল্গুন—

অতিরিক্ত মানসিক উত্তেজনায় মহাত্মাজীর স্বাস্থ্যহানির সংবাদ। বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভায় দুইটি প্রস্তাবে সরকারের পরাজয়। লাহোরে হিন্দু মহাসভার সভাপতি পণ্ডিত মালব্যের আকালী হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ। আকালীদিগকে অর্থ-সাহায্যে পাঞ্জাব সরকারের আপত্তি। দিল্লীতে তুর্ক রেড ক্রেসেণ্ট মিশনের প্রতিনিধিরা কোন মাদ্রাজী ব্যবসায়ীর নিকট হইতে লক্ষ টাকা পাইলেন। মেদিনীপুর সাহিত্য-সম্মিলনীর অধিবেশন। পাবনার সলপ অঞ্চলে নমঃ-শূদ্রের বাটীতে ব্রাহ্মণভোজন। মোম্বোসায় ট্যাক্স বন্ধের আন্দোলনে বহু নেতা কারারুদ্ধ।

১২ই ফাল্গুন—

বিদেশ হইতে ৫২ জন প্রবাসী ভারতবাসী সরকারী আদেশের জন্য দেশে ফিরিতে পারিতেছেন না। পুণার স্বরাজ্যদল কর্ত্তৃক পণ্ডিত মতিলালের সংবর্দ্ধনা। বগুড়ার শিবগঞ্জ থানায় বৈষ্ণবী হরণ।

১৩ই ফাল্গুন—

কলিকাতা কর্পোরেশনে কর্ম্মচারীদের জন্য খদ্দরের পোষাকের ব্যবস্থা। ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে পণ্ডিত মালব্যের জৈঠোর গুলী-বর্ষণের আলোচনায় আপত্তি। আকালীদের প্রতি মহাত্মার বাণী। পাটনার দেশের সম্পাদক ও প্রকাশকের কারাদণ্ড। বুলগেরিয়ার প্রধান মন্ত্রী প্রভৃতি কমিউনিষ্ট বিদ্রোহীদের হস্তে নিহত।

১৪ই ফাল্গুন—

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় আকালী-ব্যাপারের তদন্তের এবং গুরুদ্বার কমিটীর সভাপতি খড়্গ সিংহ ও হজরৎ মোহানীর মুক্তির প্রস্তাব গৃহীত। তারকেশ্বর সত্যাগ্রহের নীলামে ক্রেতার অভাব। তারকেশ্বর-সংস্কারে স্বামী সচ্চিদানন্দের প্রস্তাব। যুক্তপ্রদেশের বাজেটে ঘাটতী। গোল টেবিলের প্রস্তাবে ভারত সচিবের অসম্মতি।

১৫ই ফাল্গুন—

পণ্ডিত নেহরুজীর সহিত মহাত্মার সাক্ষাৎ। অনওয়ার্ড সম্পাদক বাঙ্গালী সন্ন্যাসী স্বামী ওঙ্কারানন্দ ও পণ্ডিত দুর্গাদাস বৈব ১০৮ ধারায় গ্রেপ্তার। দিল্লীতে নিখিল ভারত কংগ্রেসের ওয়ার্কিং-কমিটীর অধিবেশন। গোপীনাথ সাহার জননীর গবর্ণরের নিকট পুত্রের প্রাণ-ভিক্ষা। কলিকাতা কর্পোরেশনে দরিদ্রাবাস নির্ম্মাণের প্রস্তাব।

১৬ই ফাল্গুন—

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় ডাঃ গৌরের সহবাস-সম্মতি বিল কমিটির হস্তে অর্পিত। বাঙ্গালার বাজেটের আলোচনায় নানা সদস্যের বক্তৃতা। অমৃতসহর হইতে দ্বিতীয় সাহিদী জাঠার যাত্রা। বেলজিয়ামের প্রতিনিধি সভা কর্ত্তৃক ফ্রান্সের চুক্তি অগ্রাহ্য। প্রিটোরিয়ায় শ্রীমতী নাইডু।

১৭ই ফাল্গুন—

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় শ্রীযুত দাশের গঠন-মূলক প্রস্তাব। ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় বাজেট পেশ; প্রায় ৩॥০ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত। পুনা মিউনিসিপ্যালিটী কর্ত্তৃক লালাজীর অভিনন্দন। মহাত্মার নিকট আকালীদের প্রতিনিধি-প্রেরণ। স্বামী সচ্চিদানন্দের স্বেচ্ছাসেবক সহ তারকেশ্বর যাত্রা। কংগ্রেস অনুমতি না দেওয়ায় সত্যাগ্রহ স্থগিত।

১৮ই ফাল্গুন—

গোপীনাথ সাহার ফাঁসী, জেলখানা হইতে অস্থি আনায় বাধা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশ্ন বিভ্রাটে পরীক্ষা স্থগিত। তারকেশ্বরে মোহান্ত কর্ত্তৃক তীর্থ-সংস্কারে পরামর্শ-কমিটী নিয়োগ। ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় নূতন শুল্ক ব্যবস্থার প্রস্তাব।

১৯শে ফাল্গুন—

কুড়িগ্রামে নারীহরণে পুলিসের সহায়তার অভিযোগ। দিল্লীতে জাতীয় দলের সভায় বাধাপ্রদান ব্যবস্থা স্থির। তুরস্ক হইতে খলিফার অস্তিত্বলোপ এঙ্গোরা পরিষদে মুস্তাফা কামালের বক্তৃতা; খলিফার চির-নির্ব্বাসন ব্যবস্থা।

২০শে ফাল্গুন—

শ্রীযুত গিদবাণীর ও ডাঃ কিচলুর সহধর্ম্মিণীর স্বামিসন্দর্শনে বাধা। আলিপুরের দায়রায় বেহালার নোট ষড়যন্ত্রর মামলা আরম্ভ। বোম্বাই ধর্ম্মঘটকারীরা অনেকে গ্রামের দিকে রওনা হইল। নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ান কংগ্রেসের অধিবেশন স্থগিত। তুরস্কে খলিফার বাসভবন পুলিসের তত্ত্বাবধানে, খলিফার কনষ্টান্টিনোপল ত্যাগ।

২১শে ফাল্গুন—

বোম্বায়ে সোস্থালিষ্ট সম্পাদক শ্রীযুত ডাঙ্গে গ্রেপ্তার। মধ্যপ্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় সরকারী প্রস্তাব পুনঃ পুনঃ নামঞ্জুর। মাদ্রাজ বাজেটে ১৯ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত। পুণায় ওয়াকারের গুলীমারা মামলায় জুরীদের সহিত বিচারকের মতভেদ।

২২শে ফাল্গুন—

বিহারে রাজবন্দীর মুক্তির প্রস্তাব গৃহীত। রাষ্ট্রীয় পরিষদে সেচের ব্যবস্থা করিবার প্রস্তাব গৃহীত। বোম্বায়ে তুলার গুদামে আগুনে ৭৫ হাজার টাকা ক্ষতি। লাহোরে নোট জাল করায় ২৭ জন দায়রায় সোপর্দ, অন্যান্যরা দণ্ডিত। বগুড়ায় দেবী-প্রতিমা ভঙ্গে হিন্দু-মুসলমানে মনোমালিন্যের সংবাদ। শাসন-সংস্কার সমস্যায় আবার জয়েন্ট কমিটীর নিয়োগ। মোম্বাসায় টেক্সবন্ধে শ্রীযুত দেশাই অভিযুক্ত।

২৩শে ফাল্গুন—

নাগপুর ব্যবস্থাপক সভায় আবার সরকারের পরাজয়। ভারতীয় পরিষদে বাজেট আলোচনায় বে-সরকারী সদস্যদের তীব্র বক্তৃতা। খাসিয়া পাহাড়ের নরবলি মামলায় এক জনের প্রাণদণ্ড আর এক জনের কঠোর কারাদণ্ড। পারস্যের শাহ সিংহাসনচ্যুত।

২৪শে ফাল্গুন—

বোম্বাই কাউন্সিলে শ্রম-শিল্প বিভাগের বরাদ্দে আপোষ। বোম্বাইয়ে ধর্ম্মঘটে হাঙ্গামা, গুলীবর্ষণে হতাহত। সিরাজগঞ্জ প্রাদেশিক সম্মিলনের দিন পরিবর্ত্তন। তারকেশ্বর সমস্যায় প্রাদেশিক কংগ্রেসের তদন্ত কমিটী গঠন। কলিকাতায় আবার ট্যাক্সি ডাকাতি। হজের রাজা হোসেনকে হজ, মেসোপটেমিয়া প্রভৃতির জন্য খলিফা করা হইল।

২৫শে ফাল্গুন—

মধ্যপ্রদেশে সমগ্র বাজেট পরিত্যক্ত, মন্ত্রী চিটনবীশের প্রস্তাব নাকচ, মন্ত্রীর বেতন বার্ষিক ২ টাকা স্থির। বোম্বায়ে পুলিসের যান-বাহনের খরচের দাবীতে সরকারের পরাজয়। শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র দাস ৩ আইনে ধৃত। বাঙ্গলা কাউন্সিলের রাজবন্দী মুক্তি প্রস্তাব সরকার কর্ত্তৃক নাকচ। বর্দ্ধমান হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত ভ্রমণপ্রতিযোগিতা। সিঙ্গাপুরে রণতরীর আড্ডা নির্ম্মাণের প্রস্তাব স্থগিত। তুর্ক রাজবংশধরদিগের হাঙ্গেরীতে বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট।

২৬শে ফাল্গুন—

কংগ্রেসকর্ম্মী শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী গ্রেপ্তার; রামকৃষ্ণপুরে খানাতল্লাস। আয়রলণ্ডে জাতীয় সৈন্য-পল্টন বরখাস্তে সামরিক কেন্দ্রে গোলযোগ।

২৭শে ফাল্গুন—

মহাত্মা গন্ধীর পুণা হইতে বোম্বাই যাত্রা। আকালী-প্রতিনিধিদের সহিত পরামর্শে মহাত্মার অভিমত প্রকাশ। মধ্যপ্রদেশ কাউন্সিলে সাম্রাজ্যের জিনিষ বয়কট প্রস্তাব গৃহীত। ভারতীয় পরিষদে লবণ ও আফিং সম্পর্কে দাবী অগ্রাহ্য; পরিষদের সদস্য শ্রীযুত ডুরগ্রীর লোকান্তর।

২৮শে ফাল্গুন—

ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে রেলওয়ে বিভাগে ব্যয়-হ্রাসে সরকারের পরাজয়। মধ্যপ্রদেশে কাউন্সিল ভঙ্গের সম্ভাবনা। আলিপুরে পুলিস আদালতে বেহালার অনাথ আশ্রমের মামলা। বোম্বায়ে আবার গুলীবর্ষণ। ভারতের সমস্যায় কমিটী-গঠনের প্রস্তাব লর্ড সভায় গৃহীত। আয়র্লণ্ডে সৈনিক-বিদ্রোহে গবর্ণমেণ্টকে চরমপত্র-প্রেরণ।

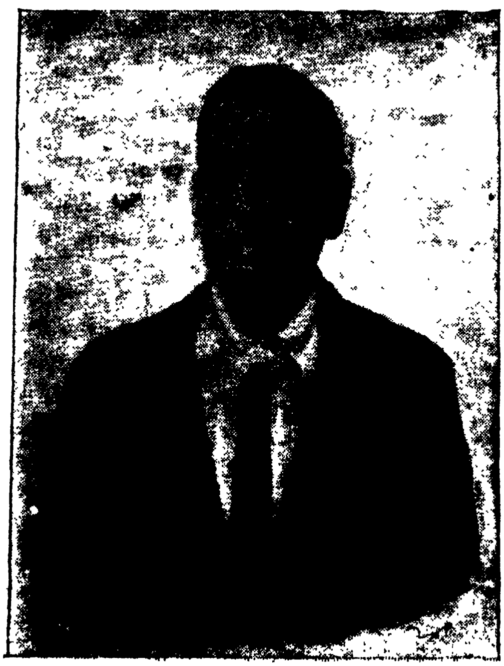
২৯শে ফাল্গুন—

বাঙ্গালা কাউন্সিলে সরকারী চাকরীতে মুসলমানগণের কথা: শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দাসের ৩ আইনে গ্রেপ্তার সম্বন্ধে আলোচনায় আপত্তি। বলশেভিক চর সন্দেহে মাদ্রাজের প্রসিদ্ধ কংগ্রেসকর্ম্মী শ্রীযুক্ত সিঙ্গারা-ভেলু গ্রেপ্তার। ক্যানিং ষ্ট্রীটে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড। পদচ্যুত খলিফাকে বৃটিশের আশ্রয়দান সম্বন্ধে পার্লামেণ্ট মহাসভায় আলোচনা।

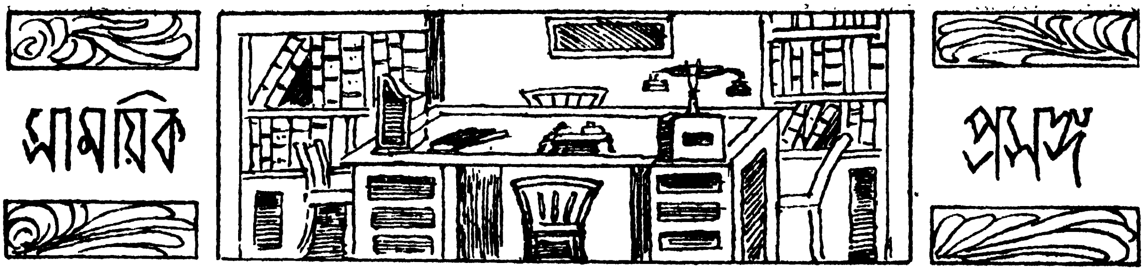
৩০শে ফাল্গুন—

ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে ঠৈঠো ব্যাপারের বিশেষ আলোচনায় আপত্তি। বগুড়ায় লাট-গমনে হরতাল। ভূতপূর্ব্ব খলিফা কোন রাজনৈতিক ব্যাপারে বা ধর্ম্মসংক্রান্ত প্রচারকার্য্যে যোগ দিবেন না, এই সর্ত্তে তাঁহাকে সুইজারল্যাণ্ডে বাস করিতে দেওয়া হইল।

শ্রীযুক্ত ঋষিবর মুখোপাধ্যায়

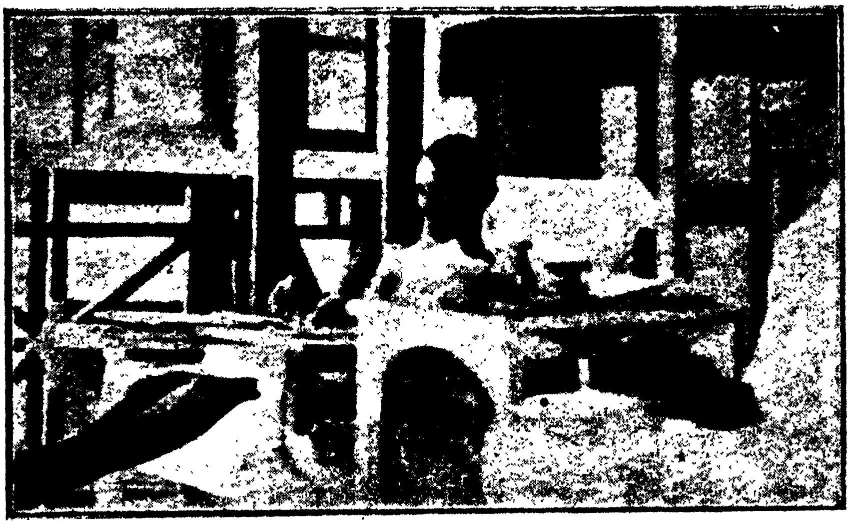


কাশ্মীরের ভূতপূর্ব্ব প্রধান বিচারপতি ও কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর ভূতপূর্ব্ব ভাইস্-চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত ঋষিবর মুখোপাধ্যায় মহাশয় সংপ্রতি বাঙ্গালী যুবকদের চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষার উদ্দেশ্যে বাঁকুড়া সহরস্থিত তাঁহার ৫০ হাজার টাকার সম্পত্তি দান করিয়াছেন। এই বিরাট দানে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মহাপ্রাণতার তথা শিক্ষাব্যাপারে তাঁহার অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। বাঁকুড়া সহরে ৭০ বিঘা জমীর উপর তাঁহার একটি প্রকাণ্ড দ্বিতল বাড়ী ছিল; ঐ বাড়ীটি তিনি কোন নীলকর ইংরেজ কোম্পানীর নিকট হইতে কিনিয়াছিলেন। স্থানীয় মেডিকেল স্কুলের কাষ অনেক দিন হইতে ঐ বাড়ীতে হইতেছিল। স্কুলের উন্নতির উদ্দেশ্যে সংপ্রতি মুখোপাধ্যায় মহাশয় বাড়ীটি স্কুল কর্ত্তৃপক্ষকে রেজেষ্টারী করিয়া দান করিয়াছেন। বাড়ীটির মেরামত খরচের জন্য স্কুল কর্ত্তৃপক্ষ দশ টাকার ওয়ারবণ্ড সরকারের নিকট জমা রাখিয়াছেন। বাড়ীটির দাম প্রায় ৫০ হাজার টাকা হইবে। বাঁকুড়ার লোকোপুর পল্লীতে উহা অবস্থিত।



জুহুতে মহাত্মা

মহাত্মা মোহনদাস করমচাঁদ গন্ধী যে সংবাদপত্রের সম্পাদক রূপে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন, এখন আবার সেই প্রিয় 'ইয়ং ইণ্ডিয়ার' সম্পাদন-ভার তিনি গ্রহণ করিয়াছেন। আবার তাঁহার লেখনী-নিঃসৃত অমর উপদেশাবলী-পাঠের সৌভাগ্য দেশবাসী লাভ করিয়াছে।



মহাত্মা তাঁহার চিঠিপত্রের উত্তর লিখাইতেছেন; একজন শর্টহ্যাণ্ড লেখক তাহা টুকিয়া লইতেছেন

কিন্তু ১৯২২ অব্দের সেই মহাত্মায়, আর এই ১৯২৪ অব্দের মহাত্মায় কত প্রভেদ। কারাক্লেশে ও সর্ব্বোপরি দারুণ ব্যাধিতে মহাত্মা এখন নষ্টস্বাস্থ্য। সে জন্য তিনি বোম্বায়ের সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থান জুহুতে এখনও স্বাস্থ্যোদ্ধারের আশায় অবস্থান করিতে বাধ্য হইতেছেন। পূর্ব্বে মুনি-ঋষিরা কৃচ্ছ্রসাধন তপশ্চর্য্যায় অস্থিকঙ্কালসার হইতেন, কাহারও কাহারও দেহের উপর বল্মীকস্তূপেরও সৃষ্টি হইয়াছিল, শুনা যায়, বর্ত্তমান যুগের লোকহিতব্রতে—ভারতের অসহযোগ যজ্ঞে মহাত্মাও জীর্ণ-দেহ। কবে তিনি আবার তাঁহার পূর্ব্ব-স্বাস্থ্য লাভ করিয়া দেশ-নায়কের কঠোর কর্ম্মক্ষেত্রে পদার্পণ করিবেন—কবে আবার ভারত তাঁহার অধিনায়কতা পুনঃপ্রাপ্ত হইবে, সকলেই সেই দিনের অপেক্ষা করিতেছে।

মহাত্মা দুই বৎসরকাল কঠোর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। কিন্তু কারাগারে শ্রমসাধ্য কোনও কার্য-কর্ম্ম তাঁহাকে করিতে হয় নাই। তাহা হইলেও কারা-জীবনের সহস্র বাঁধনের মধ্যে তাঁহাকে এই সুদীর্ঘ সময় অতিবাহিত করিতে হইয়াছে। মহাত্মা স্বীকার না করুন, তাহাতে যে তাঁহার স্বাস্থ্য-হানি ঘটিয়াছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তাঁহার স্ফোটক হইবার, উদরে অস্ত্রোপচার করিবার পূর্ব্বেও তাঁহার শরীরের ওজন হ্রাস পাইয়াছিল।

মহাত্মার সহিত কারাগারের কর্ত্তৃপক্ষ বরাবর ভাল ব্যবহার করিয়াছিলেন বলিয়াই মহাত্মা বলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার প্রতি ব্যবহারের জন্য দেশবাসীকে ব্যবস্থাপক সভায় প্রশ্ন পর্য্যন্ত করিতে হইয়াছিল।

তাহার পর, কারাগারে তাঁহার সহিত দেখা-সাক্ষাতের কত কড়াকড়ি, তাঁহার কথাবার্তা সংবাদপত্রে প্রকাশে

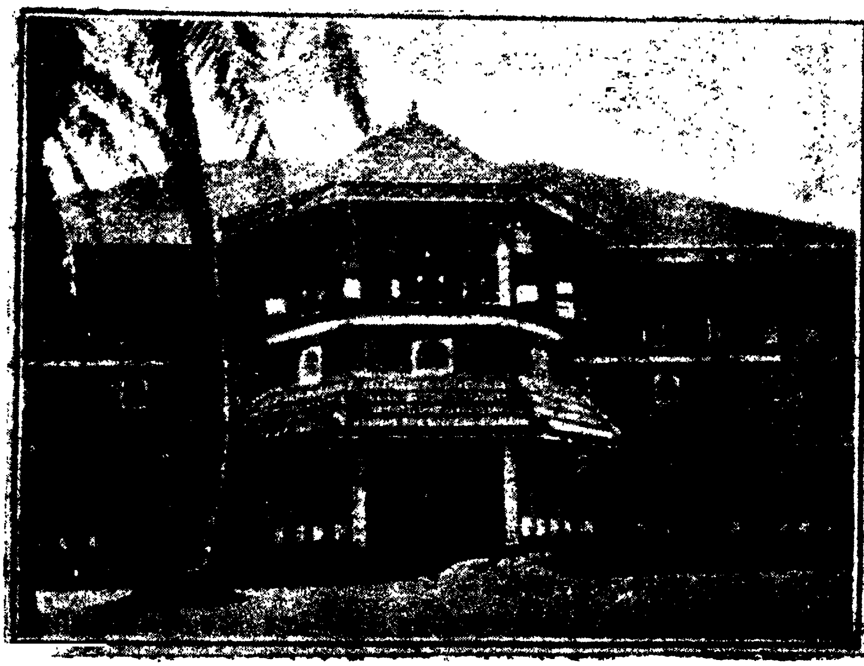


মহাত্মা পুস্তক পাঠ করিতেছেন

অনাচারীর সহিত সংঘর্ষে দুর্ব্বলের পক্ষে অসহযোগই যে সহজ ও ন্যায়-সঙ্গত পন্থা, তিনি সেই অপূর্ব্ব নীতিটি জগদ্বাসীর সমক্ষে উপস্থাপিত করিবার জন্য ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রামকে এই পথে পরিচালিত করিয়াছিলেন। আর, তিনি বৃটিশ ব্যুরোক্রেশীর সহিত অসহযোগের প্রবর্ত্তন করিলেও ব্যক্তিগত ভাবে বৃটিশ জনসাধারণের সহিত অসহযোগ করিতে বলেন নাই। তাই তাঁহার অসহযোগ নীতি ভারতে জাতি-বিদ্বেষের সৃষ্টি করে নাই। তাই কর্ণেল ম্যাডক প্রভৃতি হৃদয়বান্ ইংরাজের প্রশংসাতেও মহাত্মাকে শতমুখ হইতে দেখা যায়। পুনার সেসুন হাসপাতালে

বাধা প্রভৃতির কথা ত ভুলিবার নহে। সে জন্য অবশ্য কারা-কর্ত্তৃপক্ষের, এমন কি, বিদেশী ব্যুরোক্রেশীরও সম্পূর্ণ দোষ দেওয়া যায় না। দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে যাহারা আত্মনিয়োগ করে—যাহারা দেশের মুক্তির জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিয়া থাকে, তাহাদের অদৃষ্টে এরূপই যুগে যুগে, জগতের সকল দেশেই ঘটিয়া থাকে। মহাত্মা ভারতের জন্য—ভারতবাসীর মুক্তি-ক্রয়ের নিমিত্ত নিজের দেহকে ব্যুরোক্রেশীর যূপকাষ্ঠে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। দেশবাসীর সৌভাগ্য যে, তিনি এক্ষণে অল্পে নিষ্কৃতি পাইয়াছেন।

মহাত্মা যুগাবতার; তিনি শুধু ভারতের জন্য এই অসহযোগ নীতির প্রচার করেন নাই। শক্তিমান



"জুহুর এই বাংলাটি বেশ নির্জ্জন স্থানে অবস্থিত; আধ মাইলের মধ্যে লোকের বসতি নাই। বোম্বায়ের ভূতপূর্ব্ব শেরিফ শ্রীযুত নরোত্তম মোরারজী গোকুলদাস মহাত্মাকে ইহা সাদরে ব্যবহার করিতে দিয়াছেন

কর্ণেল ম্যাডক মহাত্মার চিকিৎসা ও শুশ্রূষায় যেরূপ যত্ন লইয়াছিলেন, তাহাতে তিনি সমগ্র দেশবাসীরও কৃতজ্ঞতার পাত্র। সেসুন হাসপাতালে তাঁহার ও অন্যান্য কর্ম্মচারীদের সদ্ব্যবহারে মহাত্মা এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, সরকারী ব্যবস্থায় মুক্তি পাইলেও তিনি কয়েক দিন সেইখানেই থাকিয়া যান। মহাত্মা ১২ই জানুয়ারী য়ারবেদা জেল হইতে সেসুন হাসপাতালে নীত হন। সেখানে অবস্থানকালে ৫ই ফেব্রুয়ারী প্রাতে তিনি তাঁহার মুক্তির সংবাদ পান। তাহার পর, ১০ই মার্চ্চ তিনি পুনা ত্যাগ করিয়া বোম্বাই গমন করেন। 'ইয়ং ইণ্ডিয়ার' ভার গ্রহণ করিলেও এখনও তিনি বোম্বায়েই অবস্থান করিতেছেন। ভবিষ্যৎ কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে সংপ্রতি 'বোম্বে ক্রণিকেলের' কোন প্রতিনিধির নিকট তিনি বলিয়াছেন—"যে কোন রকম বিপদই আসুক না কেন, তাহা দূর করিবার জন্য আমি নিজেকে সকল সময় প্রস্তুত রাখিব। দেশের অবস্থা দেখিয়া আমি কর্ত্তব্য স্থির করিব।" 'ক্রণিকেল'-প্রতিনিধি এ কথাটা প্রচার না করিলেও দেশবাসী মহাত্মার সম্বন্ধে অন্যরূপ ধারণা কোন দিন করিত না।



মহাত্মা ও কর্ণেল ম্যাডক

জৈতোর সত্যাগ্রহে আকালী

মহাত্মা গন্ধীর সত্যাগ্রহ ও অসহযোগ নীতি প্রচারিত হইয়া অবধি দেশবাসী নানা স্থানে নানারূপ সত্যাগ্রহ করিয়া অনাচারের প্রতীকারচেষ্টা করিয়াছে। বোম্বায়ে মুলসীপেটায় বাঁধের জন্য, লাহোরে লরেন্স-মূর্ত্তি সরাইবার নিমিত্ত, নাগপুরে জাতীয় পতাকার সম্মানরক্ষার্থ—ছোট বড় কত রকম সত্যাগ্রহই দেশে হইয়া গিয়াছে, কিন্তু পঞ্জাবে আকালীরা যে সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। গুরু-বাগের গুরুদ্বারের জন্য আকালীরা যে ভাবে আত্মত্যাগ করিতে না পারিলে—ব্যুরোক্রেশীর সকল অনাচার অত্যাচার সহ্য করিয়া ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া চলিতে না



বাংলোর সম্মুখের দৃশ্য ;—তালকুঞ্জের সম্মুখেই সমুদ্র



আকালী স্বেচ্ছাসেবকগণ জৈতোর গুরুদ্বারে যাইবার পথে বাধা প্রাপ্ত ; বাম পার্শ্বে পুলিসের শ্রেণী

পারিলে, আকালীরা কখনই সে ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করিতে পারিতেন না। নাভার জৈতো গুরুদ্বারটির জন্য যে সত্যাগ্রহ আরম্ভ হইয়াছে, গুরুবাগের মত এখানেও সাফল্যলাভ সম্ভব হইবে কি না, কে জানে। কিন্তু গুরুবাগ অপেক্ষাও এখানে আকালীদিগকে যে অধিক আত্মত্যাগ করিতে, অধিক দুঃখ-কষ্ট, অত্যাচার-উৎপীড়ন সহ্য করিতে হইতেছে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

জৈতোর গুরুদ্বারে আকালীদের গমন —স্বাধীনভাবে ধর্ম্মাচরণ নিষিদ্ধ হওয়ার পর হইতে এই সুদীর্ঘ কয় মাস ধরিয়াই আকালীরা তথায় নিয়মিতভাবে স্বেচ্ছাসেবক পাঠাইয়া সে অন্যায় আদেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইতেছেন। কিন্তু চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী— নাভার বর্ত্তমান ব্যুরোক্রেশী শিখরাজ্যে শিখের ধর্ম্মানুষ্ঠানের স্বাধীনতাটুকু কিছুতেই প্রদান করিতেছেন না। প্রথমে তাঁহারা আকালী স্বেচ্ছাসেবকদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া সুদূর বনভূমিতে ছাড়িয়া দিয়া আসিতেন, কাহাকেও কাহাকেও বা জেলখানায় রাখিয়া দিতেন, এখন কেবল জেলখানার ব্যবস্থাই বাহাল আছে।



শ্রীশ্রীগ্রন্থ সাহেবের সম্মুখে আকালী-চিহ্ন-লাঞ্ছিত পতাকা

আকালীরাও নিজেদের পন্থার পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। প্রথমে তাঁহারা দৈনিক ২৫ জন করিয়া স্বেচ্ছাসেবক পাঠাইতেন। এখন ৫০০ করিয়া আকালী এক এক বিরাট্ দল বাঁধিয়া জৈতো যাইতেছে। গত ৯ই ফেব্রুয়ারী প্রথম আকালী জাঠ অর্থাৎ আকালী স্বেচ্ছাসেবকের দল যাত্রা করে। তাহার পর এই তিন মাসে চারিটি আকালী জাঠ পর পর গ্রেপ্তার হইয়াছে ; ১লা মে পঞ্চম জাঠ অমৃতসর হইতে যাত্রা করিয়াছে। এই জাঠ বা আকালীর দলগুলিতে ৫ শত করিয়া লোক থাকে। ইঁহারা পঞ্জাবের নানা স্থান হইতে আসিয়া প্রথমে অমৃতসরে সমবেত হয়েন, তাহার পর সে স্থান হইতে জৈতো



নাভার পুলিস ও উৎসুক জনসাধারণ জাঠের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে



জাঠের জন্য নাভার সৈন্যদলের আয়োজন

গমন করেন। গতায়াত ইঁহারা পদব্রজেই করিয়া থাকেন।

২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখে প্রথম আকালী জাঠ নাভা-রাজ্যের সীমানায় যাইয়া পৌঁছিলে, তাঁহাদের উপর অমানুষিক গুলীবৃষ্টি করা হয়। সরকার তাহা যত প্রকারেই সমর্থন করুন না, দেশের লোক প্রত্যক্ষদর্শীদের—বিশেষতঃ সেই মার্কিণ ভদ্রলোক মিঃ জিম্যাণ্ডের বিবরণ-প্রকাশের পর তাহা চিরকাল ভীতির চক্ষুতেই দেখিবে।

প্রথম আকালী জাঠের প্রতি নির্ম্মমভাবে গুলীবর্ষণের সংবাদ যখন সমগ্র ভারতে ছড়াইয়া পড়িল, তখন ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে এই দ্বিতীয় জাঠ জৈতো যাইবার জন্য অমৃতসরে সমবেত হয়েন। এই দলেও ৫ শত আকালী ছিল। সকলের পরিধানে পীতবর্ণের জামা, মস্তকে কৃষ্ণবর্ণের উষ্ণীষ এবং হাতে কৃপাণ অথবা তরবারি ছিল। সুদীর্ঘ পথে ব্যবহারের জন্য ছোলা-ভাজার থলিয়াও প্রত্যেকে এক একটি লইয়া ছিলেন।

জাঠের সঙ্গে



জাঠের মধ্যে রাষ্ট্রীয় পরিষদের, ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার ও পঞ্জাব কাউন্সিলের সদস্যগণ এবং নাভার সরকারী কর্ম্মচারিবর্গ ও পুলিস



জৈঠোস্থিত নাভার সরকারী কর্ম্মচারীরা, জাঠের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন

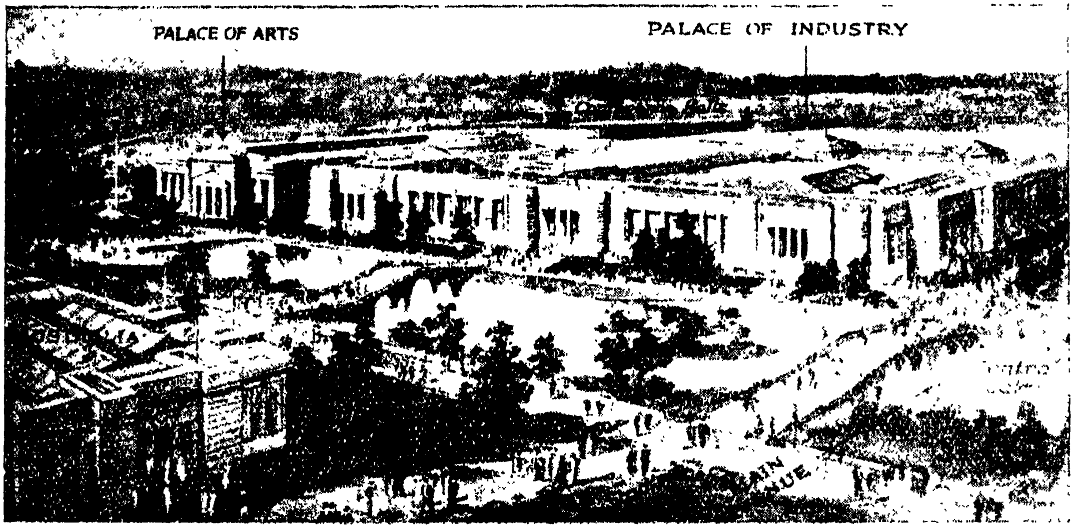
গ্রন্থ সাহেব এবং গ্রন্থ সাহেবের সম্মুখে স্থাপন করিবার জন্য আকালী-চিহ্ন-লাঞ্ছিত পাঁচটি বৃহৎ পতাকাও লওয়া হয়। জৈঠো যাত্রার পূর্ব্বে সকলে আকাল-তক্তে সর্ব্বপ্রকার নিগ্রহভোগেও বিচলিত না হইবার শপথ গ্রহণ করিলে তাঁহাদিগকে পুষ্পমাল্যে সংবর্দ্ধিত করা হয়। তাহার পর তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট ১৪ই মার্চ্চ তারিখে জৈঠোয় পৌছিলে নাভার কর্ত্তৃপক্ষের হস্তে গ্রেপ্তার হয়েন।

কলিকাতায় প্রথম মেয়র

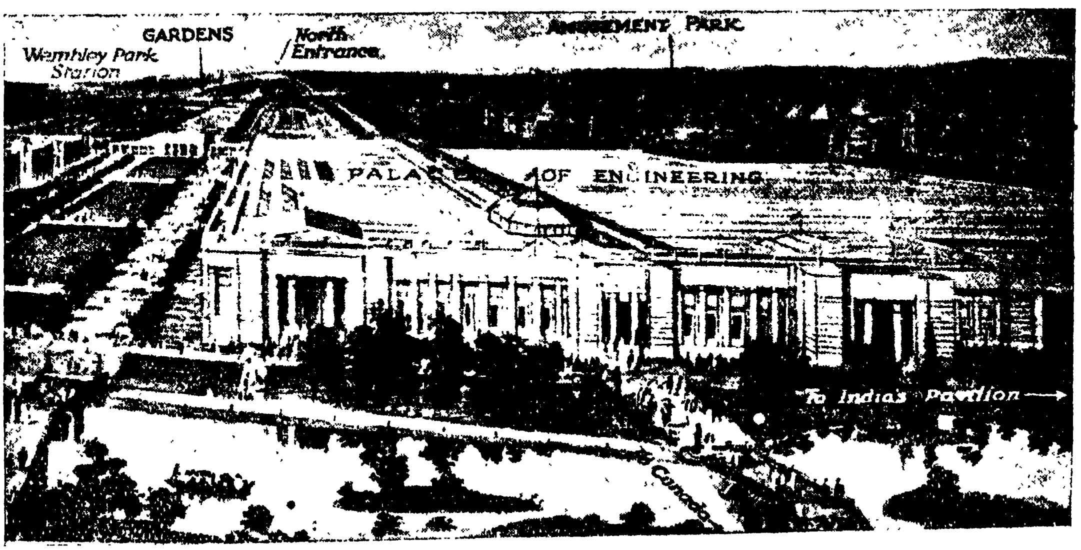
গত ১৬ই এপ্রিল বুধবার কলিকাতা কর্পোরেশনের অধিবেশনে শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় কলিকাতা করপোরেশনের প্রথম মেয়র নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। মেয়রপদপ্রার্থীদের মধ্যে শ্রীযুত প্রিয়নাথ মল্লিক তাঁহার নাম প্রত্যাহার করায় দাশ মহাশয়ের সহিত কেবল মিঃ ডবলিউ এস উইলসন নামে আর এক প্রার্থীর সংঘর্ষ ঘটিয়াছিল। মিঃ উইলসন ১৩টি ভোট পায়েন, দাশ মহাশয় পাইয়াছিলেন ৫৯টি। মেয়র নির্ব্বাচিত হইবার পর শ্রীযুত দাশ মহাশয় করপোরেশনে যে অভিনন্দন প্রাপ্ত হয়েন, তাহার উত্তরে তিনি তাঁহার ভবিষ্যৎ কার্য্যপদ্ধতির আভাস দিয়া একটি বক্তৃতা করেন। দাশ মহাশয় বলিয়াছেন, "ভারতবাসী দরিদ্রদিগকে "দরিদ্র নারায়ণ" বলিয়া সেবা করে। আমি দরিদ্রদিগের দুঃখনিবারণের জন্যই অধিক চেষ্টা করিব। দরিদ্রদিগের গৃহ, প্রাথমিক শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা আমি সর্ব্বাগ্রেই করিব।" দাশ মহাশয়ের এই দরিদ্র পর্য্যায়ের মধ্যে নিত্য নূতন অভাব-গ্রস্ত তথাকথিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ও গৃহীত হইবেন কি না, জানি না; কিন্তু দেশে আজকাল মধ্যবিত্তদের অবস্থাও যে শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে, তাঁহাদেরও সংসারে যে দুগ্ধের অভাব, রোগের সময় চিকিৎসকের অর্থের অভাব, এমন কি, উপযুক্ত বাসস্থানেরও অভাব ঘটিয়া থাকে, তাহা আমরা শপথ করিয়া বলিতে পারি। ভদ্রবেশধারী তথাকথিত অনেক মধ্যবিত্তের গৃহে সময় সময় ছেলেদের স্কুলে পাঠাইবার পয়সারও যে টানাটানি ঘটিয়া থাকে, তাহাও মেয়র মহাশয় একটু ভাল করিয়া খোঁজ করিলে দেখিতে পাইতে পারেন। কাজেই আমাদের মনে হয়, তিনি শুধু "দরিদ্র নারায়ণ" শব্দে মোহিত না হইয়া, যাহারা অভাবগ্রস্ত, তাহাদেরই সাহায্যের ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়। কংগেস কলিকাতা করপোরেশন অধিকার করিতে সমর্থ হওয়াতেই আজ শ্রীযুত দাশ মহাশয় প্রথম মেয়র হইলেন। যাঁহার উদ্যোগে কংগ্রেসের এই সাফল্য, মেয়র নির্ব্বাচিত করিয়া কলিকাতাবাসী প্রথমে তাঁহাকেই সম্মানিত করিয়া যে যোগ্যতার সম্মান রক্ষা করিয়াছেন, সে কথা না বলিলেও চলে। কংগ্রেস করপোরেশন দখল করায় নানা সম্প্রদায়ের মনে নানা আশঙ্কা দেখা দিয়াছিল। দাশ মহাশয় জানাইয়াছেন, সেরূপ আশঙ্কা অমূলক। তাঁহারা সকল সম্প্রদায়েরই স্বার্থরক্ষা করিবেন, সরকারের ও য়ুরোপীয় সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধাচরণ করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য নহে; তবে দেশের তথা ভারতীয়দের মঙ্গল করিতে যাইলে যদি তাঁহাদের বিরুদ্ধাচরণই করিতে হয়, তাহা হইলে নাচার। এরূপ স্পষ্ট উত্তরে অন্য পক্ষ সন্তুষ্ট হইবার বিশেষ কারণ খুঁজিয়া না পাইলেও, আশা করি, একেবারে অসন্তুষ্টও হইবেন না।

সাম্রাজ্য-প্রদর্শনী

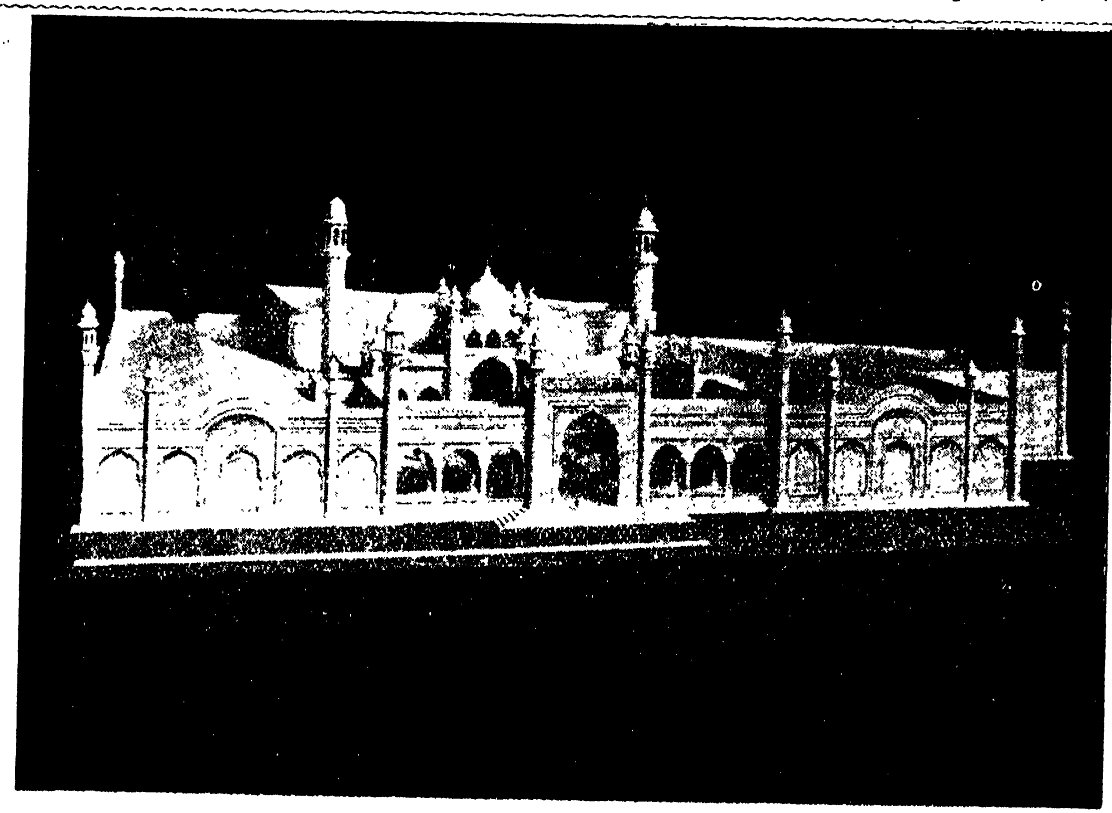
গত ২৩শে এপ্রিল লণ্ডনে ওয়েমব্লি পার্কে মহাসমারোহে বৃটিশ সাম্রাজ্য-প্রদর্শনীর উদ্বোধন হইয়াছে। স্বয়ং সম্রাট এই অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন করিয়াছেন। য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধে বাণিজ্যের অবস্থা বিশৃঙ্খল হইয়া উঠায় তাহার পুনঃ-প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এই প্রদর্শনী বসিয়াছে। কিন্তু বিলাতের অনেক রাজনীতিক এই উপলক্ষে নানা বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিতেছেন। প্রদর্শনীতে সাম্রাজ্যের সকল দেশের শিল্প-সম্ভার প্রদর্শিত হইতেছে; উদ্দেশ্য—সাম্রাজ্যের ভিতর



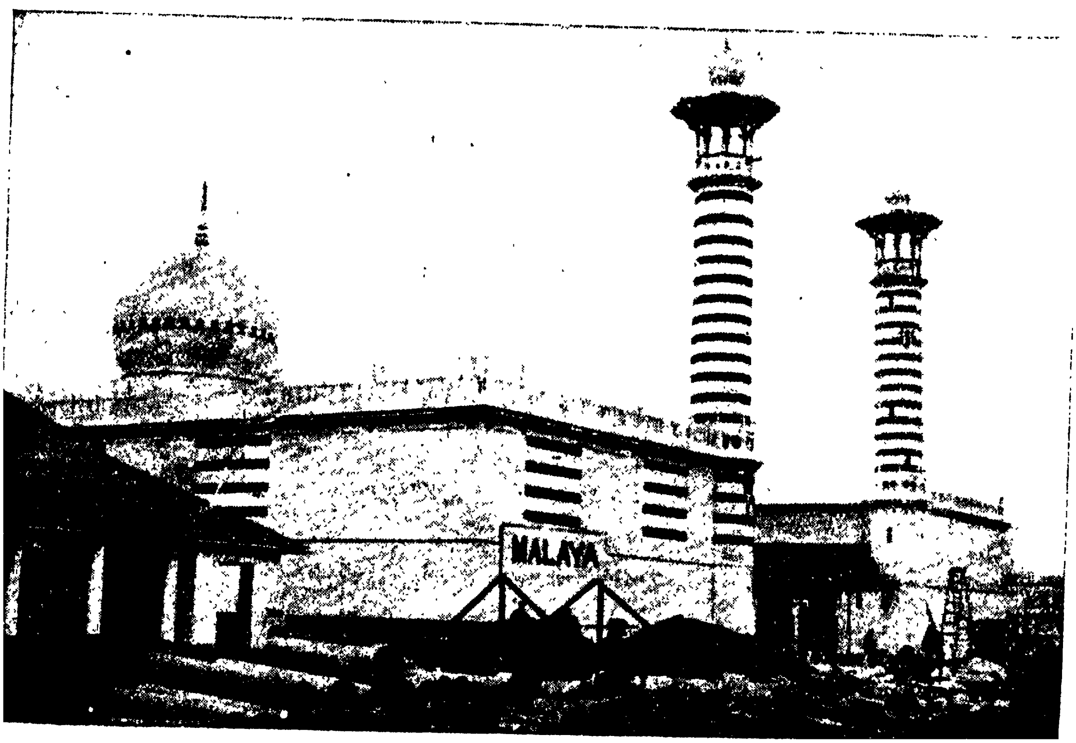
ওয়েমব্লি পার্কের একাংশ;—বিরাট সাম্রাজ্য-প্রদর্শনী এইরূপ নানা বিভাগে বিভক্ত। বাম দিকে উপরে-নীচে নিউজীল্যাণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়ার বিভাগ। নিউজীল্যাণ্ডের পাশে শিল্প-প্রাসাদ; তাহার পর পাশাপাশি কনফারেন্স হল বা সভা-গৃহ ও শ্রমশিল্প-প্রাসাদ; নিম্নে হ্রদ। হ্রদের উপর দিয়া দর্শকদের যাতায়াতের পথ। ষ্টেডিয়ামের পথও পশ্চাতে দেখা যাইতেছে

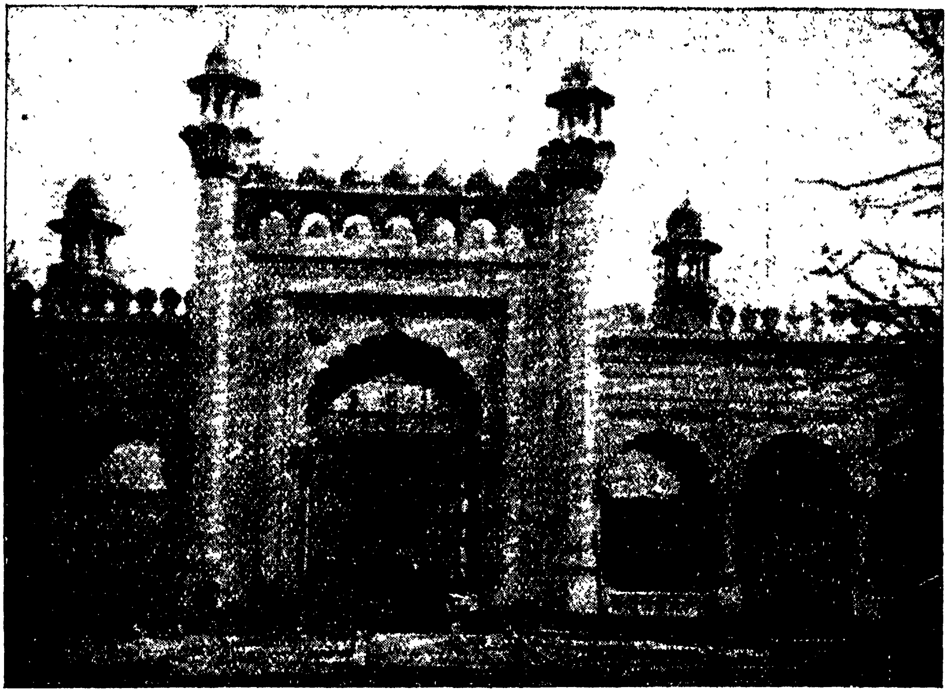


পার্কের অপর অংশ—প্রথম-প্রদর্শিত চিত্রের পার্শ্বেই সাম্রাজ্য-প্রদর্শনীর এই বিভাগগুলি অবস্থিত। ওয়েমব্লি পার্ক রেল-ষ্টেশন, বাগান, উত্তরের প্রধান প্রবেশ-পথ, প্রমোদবাগ—পাশাপাশি দেখা যাইতেছে। মধ্যস্থলে ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রাসাদ। তাহার নিম্নে হ্রদের পাশে ভারতীয় ও ক্যানাডীয় বিভাগের পথ দেখা যাইতেছে



'মডেল'—ইণ্ডিয়ান প্যাভিলিয়নের অর্থাৎ ভারতীয় বিভাগের প্রাসাদপুরী নির্ম্মাণ করিবার জন্ত প্রথম-কল্পিত আদর্শ





ইণ্ডিয়ান প্যাভিলিয়ন—নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ হইবার পূর্ব্বেই এই ফটোটি গৃহীত। প্যাভিলিয়নের আয়তন হাজার বর্গ ফিট ; সম্মুখে প্রবেশ-দ্বার

সাম্রাজ্যের প্রস্তুত জিনিষপত্রের অধিক বিক্রয়ের ব্যবস্থা। কিন্তু এই সম্পর্কে সাম্রাজ্যমধ্যে যে পক্ষপাতী শুল্ক-নীতির কথা আলোচিত হইতেছে, সেই জন্য তাঁহারা বিচলিত হইয়াছেন। তাঁহারা বলিতেছেন, অবাধ বাণিজ্য-নীতি ছাড়িয়া এই পক্ষপাতী শুল্কের ব্যবস্থা করিলে, সমগ্র সভ্য জগতের নিকট বৃটিশ সাম্রাজ্যের সম্মান ক্ষুণ্ণ হইবে। বৃটিশ রাজনীতিকরা বোধ হয় অবাধ বাণিজ্য-নীতির অধিক পক্ষপাতী অথবা বিদেশের জিনিষপত্র ব্যবহারে অনিচ্ছুক। যাহাই হউক, নিজেদের সাম্রাজ্যের জিনিষ-পত্রের—শিল্প সামগ্রীর জন্য পক্ষপাতী শুল্কে এতটা আপত্তি কোন কারণেই যুক্তিযুক্ত বলিয়া



প্যাভিলিয়নের স্থাপত্য-শিল্প

মনে হয় না। এ জন্য উপনিবেশগুলিতেও বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তোষ দেখা দিয়াছে। সাম্রাজ্য-প্রদর্শনীর ফলে সে অসন্তোষ দূর হইবে বলিয়া মনে হয় না।

যে প্রদর্শনীতে বৃটিশ উপনিবেশগুলির বিশেষ সুবিধার আশা নাই, সেখানে ভারতের সুবিধা যে কত দূর হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। ভারতের শিল্প-সামগ্রী প্রদর্শিত হওয়ায় বরং বিদেশী ব্যবসায়ীরা তাহার অনুকরণে সুলভে সেই রকম জিনিষপত্র তৈয়ার করিয়া এ দেশে পাঠাইবার চেষ্টা করিতে পারেন। অবশ্য ভারতের কতকগুলি জিনিষপত্রের ও কাঁচা মালের কাটতী এ প্রদর্শনের ফলে বাড়িতে পারে। তাহার জন্য ভারতকে বিশেষ অর্থব্যয়ও করিতে হইয়াছে। বিভিন্ন প্রদেশ হইতেই সাম্রাজ্য-প্রদর্শনীর জন্য জিনিষপত্র পাঠাইবার সঙ্গে সঙ্গে অর্থ-সাহায্যও করিতে হইয়াছে।

সম্রাট তাঁহার উদ্বোধনী বক্তৃতায় বলিয়াছেন, প্রদর্শনীর জন্য মোট ৩ কোটি পাউণ্ড বা ৪৫ কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে যে সকল সামগ্রী প্রদর্শিত হইবে, তাহার মূল্য মোটে ১ কোটি ২০ লক্ষ পাউণ্ড।

ভারতীয় দ্রব্য-সামগ্রী প্রদর্শনী যে অংশে স্থান পাইয়াছে, তাহার নাম ইণ্ডিয়ান প্যাভিলিয়ন। সে সৌধটি আগরার বিখ্যাত তাজমহলের আকারে নির্ম্মিত। বিভিন্ন দেশের প্রদর্শনস্থানে সেই সেই দেশের স্থাপত্য-শিল্পের বিশেষত্ব বজায় রাখা হইয়াছে।

—

চিত্তরঞ্জন

বাঙ্গালা ও বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্য যে, আজ বাঙ্গালার অবিসংবাদী দেশনায়ক, বাঙ্গালীর চিত্তরঞ্জন, শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ ঋণভারে অবসন্ন—চিন্তাব্যাধিগ্রস্ত হইয়া ক্রমশঃ ভগ্নোৎসাহ ও ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া পড়িতেছেন।

চিত্তরঞ্জনের ৩৷৷০ লক্ষ টাকা দেনা, অথচ তাঁহার রসার বসতবাটী বিক্রয়ের ফলে ২৷৷০ লক্ষেরও অধিক অর্থ সংগৃহীত হইবার সম্ভাবনা নাই। বাঙ্গালি! তোমার দেশনায়ক চিত্তরঞ্জনের সাহায্যকল্পে তুমি কি করিবে মনস্থ করিয়াছ?

চিত্তরঞ্জন বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর কি করিয়াছেন, একবার স্মরণ কর। আজ মতভেদের ফলে সে কথা ভুলিলে অকৃতজ্ঞতার পাপ-পঙ্কিল নরকের দ্বার তোমার সম্মুখে চির-উন্মুক্ত থাকিবে।

যে ভাব ও চিন্তার বন্যাপ্রবাহে শ্রীচৈতন্য চারি শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে বাঙ্গালা ও বাঙ্গালীকে ডুবাইয়া দিয়াছিলেন—যে ভাব ও চিন্তার ধারায় স্নাতপ্লাবিত হইয়া অজয়তটের এক নিভৃত পল্লী হইতে মণিপুরের বন্য সীমান্ত পর্য্যন্ত সমগ্র বঙ্গদেশে মৃদঙ্গ-করতাল-ধ্বনির সহিত হরিনাম গীত হইয়াছিল,—সে ভাব ও চিন্তা বাঙ্গালা ও বাঙ্গালীর নিজস্ব, উহা বাঙ্গালারই বৈশিষ্ট্য। আবার বহুকাল পরে সে ভাবের বন্যায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন সমগ্র বাঙ্গালীজাতিকে ভাসাইয়াছিলেন, উহাও বাঙ্গালা ও বাঙ্গালীর নিজস্ব। যখন বাঙ্গালা ঘোর অমানিশার অন্ধকারে আচ্ছন্ন, তখন বাঙ্গালার এই পুরুষসিংহ বিরাট ত্যাগের জ্বলন্ত বর্ত্তিকালোক লইয়া বাঙ্গালীকে পথ দেখাইয়া চলিয়াছিলেন। আবার যখন প্রয়োজন হইয়াছে, যখন বাঙ্গালী প্রচণ্ড রুদ্রতাণ্ডবে ভীত-চকিত হইয়াছিল, তখন এই চিত্তরঞ্জনই হাসিতে হাসিতে কারাদণ্ড বরণ করিয়া লইয়াছিলেন—প্রিয়তম পত্নী-পুত্রকেও দেশসেবার বিঘ্নকণ্টককঙ্করিত পথে চলিতে সানন্দে অনুমতি দিয়াছিলেন।

আর এক দিনের কথা মনে করুন। আসাম-বেঙ্গলরেলে ও ষ্টীমারে ধর্ম্মঘট,—রেল বন্ধ, ষ্টীমার বন্ধ। এ দিকে চাঁদপুরে দরিদ্র কুলী বিপন্ন—ভীষণ অনাচার, অনশন ও আধিব্যাধি করালবদন ব্যাদান করিয়া অভাগা কুলীকে গ্রাস করিতে উদ্যত। এ ঘোর বিপদের দিনে—দেশবাসী সামান্য দরিদ্র কুলীর ব্যথার দিনে, দেশপ্রেমিক চিত্তরঞ্জন স্থির রহিতে পারিয়াছিলেন কি? ভীষণা পদ্মার উত্তাল-তরঙ্গ ভঙ্গ তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই—দরিদ্রবন্ধুর প্রাণ দরিদ্রের ব্যথায় কাঁদিয়াছিল, তিনি কি স্থির থাকিতে পারেন? তখনই তিনি সেই সাগরোর্ম্মির মত পদ্মা-তরঙ্গে তরণী ভাসাইয়া দিলেন—লক্ষ্য দরিদ্রের দুঃখ-মোচন, ইহাতে জীবনও পণ। এমন না হইলে চিত্তরঞ্জন!

আজ চিত্তরঞ্জনের দুঃখের দিনে দেশ কি এই আহ্বানে সাড়া দিবে না? দেশের জন্য যিনি কুবেরের সম্পদ্ এক-দিন তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছিলেন, দেশ কি তাঁহার বিপদ নিজের বিপদ বলিয়া মাথায় তুলিয়া লইবে না?

সম্পাদক—শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়



শ্রীরামকৃষ্ণ

১১

জন্মভূমির সহিত মানবমনের কি একটা অনির্ব্বচনীয় সম্বন্ধ আছে, মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণে তাহা নিরূপিত হয় না। সাহারার জ্বালাময় মরু কেন যে নিগ্রো জাতির দৃষ্টিতে অশেষ প্রীতির আধার; তীব্র তুষারমণ্ডিত চির-হিমভূমি মেরু-প্রদেশবাসীর পক্ষে কেন যে অক্ষয় সুখের আগার, তাহা কে বলিতে পারিবে? পৃথিবীর সমগ্র সভ্য জাতি স্বদেশের সঙ্গে পার্থিব শ্রেষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া 'পিতৃভূমি' ও 'মাতৃভূমি' নামে অভিহিত করেন। কিন্তু আদি সভ্য আর্য্যগণ 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' বলিয়া জননী জন্মভূমিকে উচ্চতর আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। সর্ব্বপ্রকার পার্থিব সম্বন্ধ ছেদন যে জাতির জীবনতন্ত্রের মূলমন্ত্র, জন্মভূমির প্রীতি দুশ্ছেদ্য বলিয়া সে জাতিও সর্ব্ববন্ধনবিমুক্ত বিরক্ত সন্ন্যাসীর পক্ষে দ্বাদশ বর্ষান্তর স্বদেশদর্শন বিধি দিয়াছে। এ প্রীতি প্রেমময় পরম পুরুষের চরম দান। মানব জীবিতে ইহার বন্ধনমুক্ত হইতে পারে না। পৃথিবীর দূরপ্রান্তে বসিয়া প্রবাসী অনিমেষনেত্রে এই পবিত্র তীর্থক্ষেত্রের দিকে চাহিয়া রহে। যেখানে সে প্রথম শ্বাসগ্রহণ করিয়াছে, সেই ভূস্বর্গে শেষ শ্বাস মিশাইবার জন্য তাহার ব্যাকুল বাসনা দেহকারাগারে বার বার মাথা কুটিতে থাকে। নির্ব্বাসন অপেক্ষা কঠোরতর দণ্ড মানবকল্পনায় আজিও উদ্ভূত হয় নাই।

শ্রীশ্রীজগদম্বার অবাধ অস্তিত্ব ভিন্ন গদাধরের কাছে জগৎসংসার এখন স্বপ্নবৎ বস্তুশূন্য, ছায়ার ন্যায় অসার। কিন্তু তথাপি সুদীর্ঘ সাত বৎসরের পরে শান্তির নিভৃত অন্তঃপুর কামারপুকুর যখন শ্রান্ত পথিকের চক্ষের উপর তাহার শ্যামচ্ছায়ার মধুরমায়া বিস্তার করিল, পুলকিত পবন যখন ছুটিয়া আসিয়া কানে কানে কুশলপ্রশ্ন করিয়া প্রীতিবাঞ্ছিত অতিথির সর্ব্বাঙ্গে শীতল হস্ত বুলাইয়া দিল এবং জন্মভূমির বৃক্ষবল্লী সকল অধীর উল্লাসে বাহু দুলাইয়া যখন দূর হইতে স্নেহসম্ভাষে চিরপ্রিয় অভ্যাগতকে আহ্বান করিতে লাগিল, তখন সর্ব্ববন্ধনবিহীন গদাধরের উদাসী হৃদয়ও আনন্দহিল্লোলে

দুলিয়া উঠিল। স্মৃতি আজ কত কথাই কহিতেছে! ঐ সেই আমোদর নদ, রজত রেখায় আঁকিয়া বাঁকিয়া দূর—সুদূর দিগন্তে মিলাইয়া গিয়াছে! তাহার শ্যাম কোলে বিশাল গোচরভূমি, হরিৎ হিল্লোলে তরঙ্গায়িত; সেখানে কত মেলা, কত খেলা, কি কর্ণভেদী কোলাহল! গদাধরের তরুণ বয়সে যে সকল তরুণ কণ্ঠ তথায় কলরোল তুলিত, যৌবনসমাগমে তাহারা এখন আর এক ভাষা কহিতেছে; কিন্তু প্রান্তরে সে চপল কোলাহলের নিবৃত্তি নাই। আর এক দল তাহাদের স্থলাধিকার করিয়াছে। স্মৃতি আজ কত ছবি আঁকিতেছে! ঐ ঐ সেই শ্যাম প্রান্তর, যেখানে সাত বৎসর বয়সে গদাধরের প্রথম ভাবসমাধি! ঐ সেই লাহা বাবুদিগের পান্থবাস, যেখানে আট বৎসর বয়সে সে সন্ন্যাসিবেশে সজ্জিত হইয়াছিল। ঐ সেই পাঠশালা, যেখানে গদাধরের 'চালকলা বাঁধা' বিদ্যাশিক্ষার সূচনা এবং সমাপ্তি! ঐ সেই নির্ম্মল সরোবর—হালদারপুকুর, যেখানে বয়স্যসঙ্গে সন্তরণরঙ্গে তাহার স্বচ্ছন্দ বিহার, চপল তরঙ্গের হার, আজিও অপূর্ব্ব ভঙ্গে অনুকরণ করিতেছে! তাহার বামপার্শ্বে সূচ্যগ্রপ্রমাণ সেই 'লক্ষ্মীজলা' হেমন্তের সুপ্রচুর শস্যসম্ভারে কি রমণীয় শ্রী ধারণ করিয়াছে! দূরে—দূরে তাহার পশ্চিম ভাগে ঐ সেই ভূতির খাল স্বচ্ছহৃদয়ে নীলাম্বরের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত করিয়া আমোদর নদে আত্মবিসর্জ্জন করিতে চলিয়াছে। তাহার কোলে পল্লীবাসিগণের অন্তিম আশ্রয়স্থান—মহাশ্মশান! তাহার পরপারে সুদূর দিগন্তে নীল মেঘের মত প্রতীয়মান ঐ 'মাণিক রাজার আমবাগান' অভিনয়কুশল গদাধরের যাত্রা গান আজিও পাতায় পাতায় মর্ম্মরিত করিতেছে। স্মৃতির উত্তেজনায় নীরব শবভূমি কথা কয়! গ্রামের অপর প্রান্তস্থিত 'বুধুই মোড়লের শ্মশান' আজ বাঙ্ময় হইয়া উঠিয়াছে! কামারপুকুরের ক্ষুদ্র কুটীর ক্রমে সন্নিকট হইয়া আসিল। যুগীদিগের প্রাচীন শিবমন্দির ঐ মাথা তুলিয়াছে। গদাধর জন্মিবার পূর্ব্বে এই মন্দির হইতে মহেশ্বরের দিব্য জ্যোতিঃ সহসা সপ্রকাশ হইয়া চন্দ্রাদেবীর পবিত্র দেহে প্রবিষ্ট হইয়াছিল।

হর্ষশোক-সম্মিলনে চন্দ্রাদেবীর মনে আজ ক্ষণে ক্ষণে ছায়ালোকের বিচিত্র মাধুরী বিকসিত। আজ তাঁহার মুখে হাসি, চোখে জল। গদাই! গদাই! অন্ধকার বার্দ্ধক্যের নয়নানন্দ চন্দ্রকিরণ, পতিপ্রেমের নিদর্শন, বিধুর জীবনের মধুর অবলম্বন, তাঁহার সকল দুঃখের সান্ত্বনা—গদাই! দূর স্মৃতির সঙ্গে তরঙ্গে তরঙ্গে আজ কত কথা ভাসিয়া আসিতেছে! সে-ও এমনি শরৎ; আনন্দময়ীর আগমনে আকাশ, বাতাস এমনি অমল আলোকময়; জল আলো করিয়া এমনি কমল ভাসিতেছিল; মাঠ আলো করিয়া এমনি কাশফুল হাসিতেছিল। সে আলোকের মাঝখানে চন্দ্রাদেবীর জীবনের আলোক অকস্মাৎ নিবিয়া গেল। স্বামী ভাগিনেয়ের আবাসে দুর্গোৎসব দেখিতে গেলেন, আর ফিরিলেন না। দীর্ঘ দাম্পত্য-জীবনের শেষ বিদায়ও দেওয়া-নেওয়া হইল না। কি অপরিসীম সৌভাগ্যেই না তাঁহার সপত্নী স্বামীর পদপ্রান্তে মাথা রাখিয়া সুখ-দুঃখের অতীত লোকে চলিয়া গিয়াছেন! বৈধব্যের বেদনা, অভাবের লাঞ্ছনা, শমনের বঞ্চনা—সংসারের সকল তাপ যেন নিংড়াইয়া বিধাতা তাঁহার কপালে ঢালিয়া দিয়াছেন। স্বামী গেলেন, অতঃপর জ্যেষ্ঠ বধূমাতা—ঘরণী গৃহিণী, পুত্র প্রসব করিয়া বৃদ্ধার উপর তাহার লালন-পালনের ভার দিয়া অনন্তধামে চলিয়া গেলেন! অনন্তর জ্যেষ্ঠপুত্র রামকুমার বৃদ্ধার হৃদয়ে তীব্র হাহাকার তুলিয়া শ্মশানশায়ী হইলেন! হায়, কিশোরবয়স্ক গদাইকে লইয়া যখন তিনি কলিকাতায় যাত্রা করেন, তখন কে জানিত, সে যাত্রা শেষ যাত্রায় পরিণত হইবে। তার পর শোকের গুরুভারে ধীরপদ-সঞ্চারে একে একে সুদীর্ঘ সাত বৎসর অতীত হইয়াছে। শুদ্ধ শোক দেবীর দীর্ঘ নেত্রপল্লবচ্ছায়ায় নিবিড় ধ্যানমগ্না তপস্বিনীর ন্যায় মৌনাসন পাতিয়াছে। ধৈর্য্য এবং গাম্ভীর্য্যের অটল মহিমায় জননীর মুখমণ্ডল এখন প্রশান্ত। দীর্ঘ সাত বৎসর পরে তাঁহার স্নেহের দুলাল আজ আবার তাঁহার স্নেহের কোল অধিকার করিতে আসিয়াছে। সুদীর্ঘ সাত বৎসরের পর বৃদ্ধার ক্ষুধিত হৃদয় ভরিয়া আজ আবার তাহার সুধাকণ্ঠে মাতৃ সম্ভাষণের মধুবৃষ্টি! মাতৃহৃদয় আজ বাৎসল্য-করুণায় উদ্বেলিত।

কামারপুকুরের দরিদ্র কুটীরও আজ উজ্জ্বল, আনন্দে টলটলায়মান। বহুদিন পরে গৃহদেবতার পর্ণমন্দির আজ আবার 'জয় রঘুবীর' রবে প্রকম্পিত হইয়া উঠিল। গদাধরের পূর্ব্ব-বয়স্যগণ পুলকিত অন্তরে প্রসারিত করে ছুটিয়া আসিল। সাদর সম্ভাষণ করিতে জ্যেষ্ঠগণ সম্মিলিত

হইলেন। পল্লীমহিলাগণ আসিয়া স্নেহ, বাৎসল্য, প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিল। কামারপুকুর যা ছিল, তাই আছে; কিন্তু গদাধর আর সে গদাধর নাই। তাহার মিষ্ট-ভাষ, কলহাস, রঙ্গরস, পরিহাস তেমনি থাকিলেও, সরল পল্লীবাসিগণ সহজেই বুঝিল, এ গদাই সে গদাই নয়। যে কিশোরবয়স্ক বালক সাত বৎসর পূর্ব্বে পল্লীর আবাল-বৃদ্ধ বনিতাকে অশ্রুজলে ভাসাইয়া বিদায় লইয়া গিয়াছিল, তাহাতে আর ইহাতে স্বর্গমর্ত্ত্যের ব্যবধান! ইহার চক্ষু চাহিয়া থাকে, কিন্তু কিছুই যেন দেখে না; চলে বলে, কিন্তু যেন আপনার ইচ্ছায় নয়; অহর্নিশি যেন কি ভাবে বিভোর; যেন কি কুহকের ঘোর ইহাকে নিরন্তর আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে; কখন স্থির, কখন চঞ্চল, কিন্তু সর্ব্বদাই অন্যমন, যেন অনুক্ষণ কি অন্বেষণ করিয়া ফিরিতেছে; চিরদিন স্বেচ্ছাচারী, কিন্তু এখন যেন অতিমাত্রায় অসহিষ্ণু। দুর্ব্বার ঝঞ্ঝা যেমন উগ্রতর বেগে পথের বাধা নির্ম্মূল করিয়া ধাবিত হয়, এ-ও তেমনি গন্তব্য পথের কোন প্রতিবন্ধক মানে না। এ সকলের উপর গদাধরের অবিচ্ছিন্ন উদাস-ভাব, কখন উচ্চহাস, কখন ক্রন্দনের উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করিয়া পল্লীর বিজ্ঞগণ পরস্পর মুখ-চাওয়াচায়ী করিতে করিতে মত প্রকাশ করিলেন—প্রেতাবেশ। চন্দ্রাদেবী ওঝা আনা-ইয়া চণ্ড নামাইবার ব্যবস্থা করিলেন। অবশেষে এক রাত্রিতে চণ্ড আসিল এবং স্পষ্টাক্ষরে বলিল, ইহাকে ভূতেও পায় নাই, ব্যাধিও ধরে নাই। চন্দ্রাদেবী কতকটা নিশ্চিন্ত হইলেন।

কামারপুকুরে আসিয়া এই তৃপ্তিহীন সাধকের সাধনা এক অভিনব পন্থা অবলম্বন করিল। ভূতির খালের মহা-শ্মশানে একটি বহু প্রাচীন অশ্বত্থবৃক্ষ ছিল, তাহার মূলে বসিয়া গদাধর জপধ্যান করিতে আরম্ভ করিল। এক এক দিন একাগ্র সাধনায় রাত্রি অতর্কিতে বাড়িয়া উঠে। আজ কিন্তু প্রত্যাগমনের সময় অতীত হইয়া গিয়াছে। চন্দ্রাদেবী নিরতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন এবং প্রশ্নের পর প্রশ্নে মধ্যম পুত্র রামেশ্বরকেও উৎকণ্ঠিত করিয়া তুলিলেন। একে কনিষ্ঠের অসংযত আচরণে মধ্যমের উদ্বেগের অবধি ছিল না, তার উপর মায়ের এই ব্যাকুলতা! রামেশ্বর জননীকে শান্ত করিয়া সহোদরের অন্বেষণে বাহির হইলেন। আঁধারে অস্পষ্ট-চিত্রিত ঝিল্লী-মুখরিত পল্লী ছম্ ছম্ করিতেছে। মাঝে মাঝে পেচকের ডাকে, শৃগাল-কুক্কুরের কোলাহলে অন্ধকার যেন তারস্বরে চীৎকার করিয়া উঠি-তেছে! প্রতি পদক্ষেপে শুষ্ক পত্ররাশির উপর দিয়া চকিত সরীসৃপের সর সর গতি—রামেশ্বর কিছুই ভ্রূক্ষেপ করি-লেন না। কিন্তু ভূতির খালের নিকট উপস্থিত হইতেই তাঁহার নির্ভীক হৃদয়ও কুঞ্চিত হইয়া গেল। অদূরে নিথর ঘুমে নিমগ্ন ভৈরব শবভূমে—দিক আচ্ছন্ন করিয়া কালো এলোচুলের রাশি ছড়াইয়া দিয়া—ঘোরা নিশীথিনী স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, আর তার বিমানস্পর্শী ললাটের উপর একটা বৃহৎ নক্ষত্র দপ দপ করিয়া জ্বলিতেছে! কোথাও স্পন্দ নাই, শব্দ নাই, কিন্তু তবু সে শূন্য নীরবতা যেন লক্ষ লক্ষ প্রাণীর হতাশ-হাহাকারে পূর্ণ! শ্মশান জনমানবহীন, তবু যেন নিঃশব্দপদে কত লোক আনাগোনা করিতেছে; তাহার মুখ নাই, তথাপি যেন অতৃপ্ত ক্ষুধায় বিশ্ব গ্রাস করি-বার জন্য মুখব্যাদান করিয়া আছে! এই বিকট প্রেতভূমে গদাধর একা! রামেশ্বর চীৎকার করিয়া ডাকিলেন—"গদাই!" অন্ধকার ভেদিয়া উত্তর আসিল, "দাদা, যাই। কিন্তু তুমি এখানে এস না, অনিষ্ট হ'তে পারে!"

দেশে আসিবার কিছুদিন পরে গদাধরের উগ্রভাব ক্রমে শান্ত হইয়া আসিল। কিন্তু মায়ের প্রাণ তাহাতে নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না। যত দিন না পুত্রকে সংসারী করিয়া বাস্তব রাজ্যে পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিতেছেন, যত দিন না তাহার ভাব-প্রবণ মন আতিশয্যের উগ্র উত্তেজনা পরিহার করিয়া সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ হইতেছে, তত দিন চন্দ্রা-দেবীর 'নিশ্চিন্তি' নাই। গদাধর যে সাধারণ নয়, স্বামীর মুখে কতবার সে কথার আভাস তিনি পাইয়াছেন। অন্যান্য সন্তান যে ভাবে লালিত হইয়াছিল, গদাধরকে পিতা সে ভাবে পালন করেন নাই। পুত্রের বাল্যচাপল্য ক্ষুদিরাম কখন শাসন-তাড়নায় সংযত করিবার প্রয়াস পাইতেন না; মিষ্ট ভাষায় তাহাকে শিষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেন। সে দিন চিরদিনের মত চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু বিধবার বিধুর হৃদয়ে যে চিত্র চিরাঙ্কিত রহিয়াছে, তাহা অজস্র অশ্রুপাতেও মুছিবার নয়! পঞ্চমবর্ষীয় শিশু পিতৃকোলে বসিয়া ধীর গম্ভীর পরুষ কণ্ঠের সঙ্গে আধ-আধ ভাঙ্গা কথায় যে স্তবাবৃত্তি করিত, আজিও যেন সে গুঞ্জনধ্বনি ক্ষুদ্র কুটীর মুখরিত করিয়া রাখিয়াছে। সে পরুষকণ্ঠ আজ

চির-নীরব। সে শিশুও বহির্দৃষ্টিতে আজ শ্মশ্রুল যুবক। কিন্তু অন্তরে আজিও সে যে শিশু, সেই শিশু! সে সাধারণ হউক, অসাধারণ হউক, তাঁহার ত পুত্র! স্নেহের বাছনি, নয়নের মণি, আর এই দীন-দরিদ্র সংসারের একমাত্র ভরসা! আজিকালি একটু শান্ত হইয়াছে। এখনও যে তবু তাহার একটু আধটু বিসদৃশ আচরণ দেখা যায়, সংসারের ভার পড়িলে তাহা আর থাকিবে না। গদাধরের বিবাহ দিবার জন্য চন্দ্রাদেবী ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু এক প্রতিবন্ধক, পাত্রের বয়সের উপযোগী দশ বারো বছরের একটি কন্যা বধূরূপে ঘরে আনিতে গেলে, অনেক পণ প্রয়োজন। তত অর্থ, দরিদ্র সংসার স্বপ্নেও কখন একত্র দেখিতে পাইবে না। তথাপি পাত্রীর অনুসন্ধান চলিতে লাগিল। কিন্তু গদাধরের অজ্ঞাতসারে। কি জানি, সে একগুঁয়ে ছেলে, যদি কোন গোল তুলিয়া বসে! সেই উপনয়নের সময় কি গোলটাই বাধাইল! অশূদ্রপ্রতিগ্রাহী বংশে কি না কামারকন্যা ধনী ভিক্ষামাতা! জ্যেষ্ঠ রামকুমার কত মতে বুঝাইলেন, কিন্তু বালকের সেই এক কথা—আমি ধনীর কাছে সত্যে বদ্ধ। নয় বৎসরের বালকের জেদের কাছে পিতার বয়সী জ্যেষ্ঠ সহোদরকে হারি মানিতে হইল। বরং সেতুবন্ধে নদীর বেগ রোধ করা যায়, তবু এ স্বেচ্ছাচারী অবাধ্য বালকের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা দুঃসাধ্য! কি জানি, যদি বিবাহের কথায় বাঁকিয়া বসে! গদাধর কিন্তু কোন আপত্তি তুলিল না। বরং পাত্রী খুঁজিতে খুঁজিতে রামেশ্বর যখন হতাশ হইয়া পড়িলেন, স্বয়ং গদাধরই তখন উদ্ধারের পথ দেখাইয়া দিয়া বলিল, জয়রামবাটীতে পাত্রী কুট-বাঁধা আছে। এই কুট-বাঁধা ব্যাপার একটা পল্লীপ্রথা। নিরক্ষর পল্লীবাসী গাছের ফল দেবতাকে না দিয়া ভোগ করে না; এবং তদুদ্দেশ্যে গাছের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ফলটি মনোনীত করিয়া কুটা বাঁধিয়া রাখে। ইতিপূর্ব্বেই রামেশ্বর সময় সময় সহোদরের অলৌকিক বিভূতির পরিচয় পাইয়াছিলেন। ভ্রাতার নির্দ্দেশে জয়রামবাটী গিয়া দেখিলেন, শ্রীরাম মুখোপাধ্যায়ের একটি কন্যা আছে। মেয়েটি সর্ব্ববিষয়ে মনের মত, কেবল বয়স কম। বেশী বয়সের মেয়ের বেশী পণ, তত দিবার যোগ্যতা কোথায়? অগত্যা যথাসম্ভব পণ ধার্য্য করিয়া রামেশ্বর এই পঞ্চমবর্ষীয়া কন্যার সহিত সহোদরের বিবাহসম্বন্ধ সুস্থির করিয়া আসিলেন।

গদাধরের আসন্ন পরিণয় সংবাদ গ্রামে গ্রামে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। একে ঘটনা-বিরল পল্লীস্থান, তাহাতে একটা বিবাহের উৎসব, তার উপর আবার গ্রামের আবালবৃদ্ধ-বনিতার নয়নপুত্তলি প্রিয়দর্শন গদাধরের বিবাহ। ক্ষুদ্র কামারপুকুর একটা অনাবিল আনন্দহিল্লোলে টলমল করিতে লাগিল। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আনন্দিত হইল সে—যাহার বিবাহ। কোথায় বা নবীন বরের লজ্জা আর কোথায় বা তাহার জড়সড় ভাব! তাহার রঙ্গরস-পরিহাসে উচ্ছ্বসিত হাসির রোল ক্ষুদ্র কুটীর তোলপাড় করিয়া তুলিল।

ক্রমে অবুঢ়ান্ন, গাত্রহরিদ্রা নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া গেল। আজ বিবাহ। গদাইকে বরবেশে দেখিবার জন্য কামারকন্যা ধনী শত অছিলায় তিলেকে শতবার আসিতেছে, যাইতেছে! প্রতিবাসিনীগণ নানা কাযে ব্যস্ত। কেহ চন্দন ঘষিতেছেন, কেহ মালা গাঁথিতেছেন। ক্ষুদ্র কুটীর আজ উৎসববেশে সুসজ্জিত, মাঝে মাঝে হুলুধ্বনি শঙ্খরোল উঠিতেছে। কেবল এক দুঃখ, বিবাহের প্রধান অঙ্গ বাদ্যঘটা নাই। রামেশ্বর-পত্নী দেবরকে পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন। চন্দ্রাদেবী থাকিতেও এ বিবাহে তিনিই সর্ব্বময়ী কর্ত্রী, কেন না, মাঙ্গলিক কার্য্যে বিধবার অনধিকার। পশ্চিম গগন আরক্ত হইয়া উঠিলে ভ্রাতৃজায়া দেবরকে মনোহর বরবেশে সাজাইতে সুরু করিলেন। মুখে অবিরাম হাসির ছটা, কিন্তু তথাপি তাঁহার মন মাঝে মাঝে নিরুৎসাহ হইয়া পড়িতেছে—বাদ্য নাই। অন্য কেহ তাহা না বুঝুক, গদাধর বুঝিল এবং ভ্রাতৃজায়াকে উৎফুল্ল করিবার নিমিত্ত কহিল, "বাজনার জন্য দুঃখ কি? এই শোন, এ বিয়েতে কত বাজনা বাজছে।" বলিয়া পরিপাটী বোল দিয়া মুখে ঢাক-ঢোল বাজাইতে সুরু করিল। এ যেন আর কার বিবাহ-উৎসব, গদাধর আমোদ করিতেছে!

রঘুবীরকে প্রণাম করিয়া শুভক্ষণে রামেশ্বর বর লইয়া যাত্রা করিলেন এবং শুভলগ্নে বিবাহকার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া গেল। বর-বধূ বাসরে বসিল। সে অপরূপ ছবি দেখিয়া কেহ চক্ষু ফিরাইতে পারিল না। বাসর রমণীর রাজ্য। এ রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা পুষ্পশর। যাহা কিছু সুন্দর—আলো, ফুল, হাসি, গান, নারীর কটাক্ষবাণ, যাহা কিছু বিলাসের প্রাণ,—এই স্থান তাহার অফুরন্ত ভাণ্ডার। কিন্তু

লালসার এই লোভনীয় লীলাভূমে আসিয়া রমণীগণের রঙ্গ-রসের মাঝখানে গদাধরের হঠাৎ ভাবান্তর উপস্থিত হইল। দীপালোকের প্রখর দীপ্তি মলিন করিয়া তাহার মুখে অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিল। বর সহসা দণ্ডায়মান হইয়া "মা! মা" বলিতে বলিতে সুমধুর সঙ্গীতে অজস্র সুধাবর্ষণ করিতে লাগিল। মুখরিত উৎসব নিঃশব্দ; রমণীগণের মুখে রঙ্গ-রস নিস্তব্ধ! কি এক দিব্য ভাবাবেশে সকলে বার বার বসনাঞ্চলে চক্ষু মুছিতে লাগিলেন। গদাধর সাশ্রুনয়নে মাতৃ-সম্ভাষণে সকলের পদধূলি লইয়া ইষ্টসিদ্ধির প্রার্থনা করিতে লাগিল। যেন কোন যাদুকরের কুহকে পুষ্পবাসর নিমেষে দেবমন্দিরে পরিণত হইয়া গেল।

পরদিন রামেশ্বর বধূকে কয়েকখানি স্বর্ণাভরণে ভূষিত করিয়া বরকন্যা লইয়া গৃহে ফিরিলেন। পঞ্চমবর্ষীয়া বালিকা-বধূ পাইয়া চন্দ্রাদেবীর শোকশুষ্ক হৃদয় বাৎসল্যের অজস্র ধারায় উথলিয়া উঠিল। এ যেন তাঁহার সেই কনিষ্ঠা কন্যা সর্ব্বমঙ্গলা বালিকারূপে আবার তাঁহার কোলে আসিয়াছে। বিবাহের উৎসবে দরিদ্র-কুটীর আজ দৈন্য ভুলিয়াছে। অন্নদানে চন্দ্রাদেবী আজ অন্নপূর্ণা। তাঁহার কল্পনাও আজ তেমনি কল্পতরু। গদাই সংসারী হইবে, বধূ বড় হইয়া সোনার সংসার পাতিবে, যেন কোথাও কোন দৈন্য নাই। এমনি বিভোর স্বপ্নে দুই চারি দিন কাটিয়া গেল।

কিন্তু অভাব যাহাদিগের স্বাভাবিক ভাব, কল্পনার স্বর্গে কয়দিন তাহাদের বাস করা চলে? নূতন কুটুম্বস্থলে সম্ভ্রম রক্ষার জন্য যে কয়খানি সোনার গহনা দিয়া রামেশ্বর সোনার বধূকে সাজাইয়া আনিয়াছিলেন, তাহা নিজস্ব নহে, লাহা বাবুদের বাটী হইতে চাহিয়া আনা। সে গচ্ছিত ধন প্রত্যর্পণের দিন উপস্থিত হইল। কিন্তু চন্দ্রাদেবী বার বার চেষ্টা করিয়াও বধূর অঙ্গ হইতে অলঙ্কার খুলিয়া লইতে পারিতেছিলেন না। হাত বাড়াইতেই চক্ষু জলে ভরিয়া আসে। এ বিষম সমস্যায় তাঁহাকে উদ্ধার করিল—গদাধর। বধূ এক সময় ঘুমাইলে সে অতি সন্তর্পণে তাহার গা হইতে গহনাগুলি খুলিয়া লইল। কিন্তু বালিকা হইলেও কন্যা বুদ্ধিমতী। নিদ্রাভঙ্গে আধ আধ ভাঙ্গা কথায় শ্বশ্রূকে প্রশ্ন করিল, "মা, আমার গয়না কৈ?" শ্বশ্রূ সাশ্রুনয়নে বধূকে বুকে টানিয়া লইয়া বলিলেন, "মা, গদাই তোমাকে পরে ওর চেয়ে কত ভাল ভাল গয়না দেবে।"

কিন্তু ঐ দিন কন্যার খুল্লতাত আসিয়া ভ্রাতুষ্পুত্রীকে নিরাভরণা দেখিয়া বিষম গোল বাধাইলেন এবং নানা কথা কহিয়া তাঁহাদের কন্যাকে এক প্রকার জোর করিয়া লইয়া গেলেন। চন্দ্রাদেবীর হৃদয়ে বিষম আঘাত লাগিল। গদাধর সান্ত্বনা দিল, "মা, ওরা এখন যা-ই বলুক, যা-ই করুক, বে' ত আর ফিরবে না!"—পাকা হিসাবী কথা।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু।

অর্জ্জুনের তপস্যা

[কিরাতার্জ্জুনীয়—৬ষ্ঠ সর্গ]

ব্যাসের কথায় পার্থ গেলেন ইন্দ্রকীলে
সিদ্ধি লাগি কঠোর তপে দিলেন মতি,
ছুটল হঠাৎ গন্ধ মধুর মন্দানিলে,
শুষ্কশিলা স্পর্শে হলো পুষ্পবতী।

প্রস্রবণের উৎস্রবণে শৈলসানু
ভরল যেন কাহার অমোঘ নিদেশ পেয়ে,
প্রখর কিরণ সংবরিয়া হইল ভানু
স্নিগ্ধ, সুখসেব্য, স্নেহে রইল চেয়ে।

তুঙ্গতরু নোয়াত তার উচ্চ শাখা—
কুসুম চয়ন করতে গেলে পূজার তরে
প্রবালদামে কুসুমাঞ্জলি ভক্তিমাখা
পুষ্পস্তবক সমর্পিত তাঁহার করে।

যথায় যথায় শুতেন তিনি রাত্রিকালে
অঙ্কুরিত তথায় শিলায় শস্পগুলি
বৃষ্টিধারা লভি অকাল জলদজালে
সিক্ত উপশান্ত হ'ত শৈলধূলি।

অলক্ষিতে একটা যেন বৎসলতা
করত পরিচর্য্যা তাঁহার, চুপে চুপে,
পার্থ গেলেন তপের সেবা করতে তথা,
তপই তাঁহার করত সেবা নানান রূপে।

শ্রীকালিদাস রায়।

অলক্ষণা

১

অলক্ষণা মেয়ে অনেক থাকে, কিন্তু গোবিন্দ ঘোষের মেয়ে রাখালীর মত অলক্ষণা মেয়ে কেহ কখনও দেখিয়াছে কি না সন্দেহ। মেয়েটা জন্মিয়াই যখন বাপকে খাইল, তখন তাহার লক্ষণ যে ভাল নয়, ইহা সকলেই বুঝিতে পারিল। তার পরে তিন বছর পার না হইতেই সে মা'কে খাইয়া ফেলিয়া আপনার লক্ষণহীনতা সম্বন্ধে সকলকেই নিঃসন্দিগ্ধ করিয়া দিল। সকলেই বুঝিয়া লইল, মেয়েটা একেবারে অলক্ষণা; এ মেয়ে বাঁচিয়া যাহার ঘরে যাইবে, তাহার পরিণাম যে কিরূপ ভয়াবহ হইবে, ভাবিয়া স্থির করা যায় না। সকলেই সেই মা-বাপ খেকো তিন বছরের মেয়েটাকে আশঙ্কার দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল।

অপর সকলে ভয়ে ভয়ে এই অলক্ষণা মেয়েটার সংস্রব হইতে দূরে থাকিতে চেষ্টিত হইলেও গোবিন্দ ঘোষের বড় ভাই গগন ঘোষ কিন্তু তাহাকে তেমন দূরে রাখিতে পারিলেন না। অলক্ষণাই হউক, সুলক্ষণাই হউক, ভায়ের মেয়ে; সুতরাং ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূর মৃত্যুর পর গগনকে বাধ্য হইয়া রাখালীর প্রতিপালনভার গ্রহণ করিতে হইল। বড় বৌ কাদম্বিনী কিন্তু ইহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না; তিনি আপত্তি জানাইয়া বলিলেন, "ও অলক্ষুণে মেয়েকে আমি ঘরে ঠাঁই দেব না।"

গগন তাঁহাকে শান্ত করিয়া বলিলেন, "তুমি আমি ঠাঁই না দিলে মেয়েটা কোথায় যাবে বল?"

কাদম্বিনী বলিলেন, "কেন, ওর মামামামী আছে, তারা নিয়ে যাক্ না।"

গগন বলিলেন, "তারা নিয়ে গেলে শুধু মেয়েটাকেই তো নিয়ে যাবে না, ওর বাপের যথাসর্ব্বস্ব – জমী-যায়গা, ধান চাল, মায় ঘটী-বাটিটি পর্য্যন্ত নিয়ে যাবে। কিন্তু মেয়েটাকে কোন ভাবে মানুষ কত্তে পারলে এগুলো হাত-ছাড়া হবে না, লোকেও দোষ দিতে পারবে না। তার পর মেয়েছেলে,—আর বছর পাঁচ সাত বাদে বিয়ে দিয়ে পরের ঘরে পাঠিয়ে দিতে পারলেই সব গোল চুকে যাবে।"

স্বামীর সুপরামর্শ কাদম্বিনীর মনোনীত হইলেও রাখালীর লক্ষণহীনতা স্মরণ করিয়া তিনি শঙ্কিতভাবে বলিলেন, "তা রাখ, কিন্তু ওকে রেখে যদি কোন আপদ্-বিপদ্ হয়, তক্ষুণি আমি দূর ক'রে দেব, তা ব'লে রাখছি।"

গগনকে আপাততঃ এই প্রস্তাবেই সম্মতি দিতে হইল।

তা কাদম্বিনীর শুভাদৃষ্টপ্রভাবেই হউক, অথবা রাখালী একেবারে নিরাশ্রয় হইয়া পড়িবে বলিয়াই হউক, বিধাতা অতঃপর আর কোন বিশেষ আপদ্-বিপদ্ ঘটাইলেন না। শুধু বছরখানেক পরে অনেক দিনের পোষা বিড়ালীটা হঠাৎ এক দিন মারা গেল, এবং যে গাভীটা পূর্ব্ববারে আড়াই সের দুধ দিয়াছিল, এবারে সে দুই সেরের বেশী দুধ দিল না। কাদম্বিনী এই দুইটা ব্যাপারের মূলে রাখালীর লক্ষণহীনতা স্মরণ করাইয়া দিয়া স্বামীর সহিত অনেক বচসা করিয়াছিলেন বটে, গগন কিন্তু রাখালীর বাপের জমীতে উৎপন্ন ধানের মরাইটা দেখাইয়া দিয়া সে যাত্রা স্ত্রীকে সহজেই শান্ত করিতে পারিয়াছিলেন।

আপদ্-বিপদ্ না ঘটিলেও রাখালীর সুলক্ষণের অভাব কিন্তু দূর হইল না, তাহার প্রতি কার্য্যেই নিয়ত অলক্ষুণে কাণ্ড প্রকটিত হইয়া কাদম্বিনীকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিতে লাগিল। কাদম্বিনীর মেয়ে ননী রাখালীর প্রায় সমবয়সী, কিন্তু তাহার চেহারার সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে রাখালীকে যেন কায়েতের ঘরের মেয়ে বলিয়াই বোধ হয় না। গা যেন ধুলা-মলায় এক আঙ্গুল পুরু হইয়া রহিয়াছে, মাথার চুলগুলা—তিন দিন অন্তর তেল দিয়া বাঁধিয়া দিলেও বাবুইপাখীর বাসা হইয়া রহিয়াছে। ননীর পরিত্যক্ত পুরাতন কাপড় পড়িতে দিলে দুই এক মাসেই তাহা এমন খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলে যে, কাপড়ের সূতাটুকু পর্য্যন্ত খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। খাওয়া—তা যত দাও, 'না' বলিতেছে না। অলক্ষণা না হইলে কি এমন রাক্ষসের মত খাওয়া হয়?

তা ছাড়া রাখালী যতই বড় হইতে লাগিল, ততই গৃহস্থালীর কাযের ভার একটু একটু করিয়া তাহার উপর

পড়িল, এবং সেই সকল কাযে প্রায়ই তাহার অলক্ষণ প্রকাশ পাইতে থাকিল। ঝাঁট দিলে ধুলা-জঞ্জাল স্থানে স্থানে পড়িয়া থাকে, বাসন মাজিলে বাসনের এঁটো দাগ যায় না, ঘটী-বাটির ঠোকাঠুকি শব্দে গৃহস্থের অকল্যাণ সম্ভাবিত করে। দশ বছরের মেয়ে—গায় যেন এক রত্তি বল নাই, পাতরবাটীগুলোকে ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দিল। যাহার লক্ষণ ভাল নয়, তাহার কোন কিছুই কি ভাল হয় না!

তা কাযে-কর্ম্মে যেমন হয় হউক, এখন উহাকে পার করা যে দায় হইয়া উঠিল। যে মেয়ে দেখিতে আসে, সে-ই অলক্ষণা বলিয়া জবাব দিয়া যায়। মেয়ে এগারো ছাড়িয়া বারোয় পা দিল, বিশ-পঁচিশ যায়গা হইতে বিবাহের সম্বন্ধ আসিল, কিন্তু কোথাও কিছু স্থির হইল না, সকল সম্বন্ধই ভাঙ্গিয়া গেল। কে জানে, এই মেয়ে লইয়া কি হইবে! জাতকুল মানসম্ভ্রম রক্ষা করা যেন দায় হইয়া উঠিয়াছে। রাখালীর বিবাহের কথা লইয়া শুধু গগন বা কাদম্বিনী নহে, পাড়ার লোকও যেন জ্বালাতন হইয়া উঠিল।

বাস্তবিকই অনেক যায়গা হইতে রাখালীর বিবাহের সম্বন্ধ আসিতেছিল, এবং ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল। এরূপে সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া যাইবার মূলে রাখালীর অলক্ষণত্ব বিদ্যমান থাকিলেও অনেক স্থলে অর্থের অপ্রাচুর্য্যই যে ইহার প্রধান কারণ হইয়া উঠিয়াছিল, কাদম্বিনী বা গগন মুখে প্রকাশ না করিলেও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্রেরই ইহা বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই। একে তো মা-বাপ-খেকো মেয়ে, মেয়ের রূপলাবণ্যের গৌরবও তেমন কিছু ছিল না; স্বাভাবিক লাবণ্য যেটুকু ছিল, অযত্নে অনাদরে সেটুকুও ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় চাপা পড়িয়া গিয়াছিল। ইহার উপর অল্প পয়সায় যেমন তেমন পাত্র পাওয়াও সহজসাধ্য হইল না। রাখালীর বাপের যে জমী-যায়গা ছিল, তাহা বিক্রয় করিলে খুব ভাল ঘরেই বিবাহ হইতে পারিত। গগন কিন্তু এক কাঠা জমীও বেচিতে সম্মত হইলেন না; বলিলেন, "জমী বেচে মেয়ের বিয়ে বংশে কেউ কখন দেয় নি। জমী জমা যা কিছু আছে, এর পর রাখালীর ছেলেরা ভোগ করবে।" কিন্তু ভবিষ্যতে ছেলেদের ভোগ করিবার আশায় দুই এক শত টাকায় কেহই রাখালীকে গ্রহণ করিতে সম্মত হইল না। যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই মেয়েটা যে সম্পূর্ণ অলক্ষণা, এ সম্বন্ধে কাদম্বিনীর সহিত আরও পাঁচ জন কৃতনিশ্চয় হইয়া উঠিল।

এইরূপে চেষ্টা দেখিতে দেখিতে মেয়ে তেরো বছরে পা দিল। আর তো মেয়েকে রাখা যায় না। এখন কাণা খোঁড়া যেমন তেমন একটা পাত্র পাওয়া গেলে হয়।

এই রকমই একটি পাত্র মিলিল। কাদম্বিনীর মামাতো ভাই নীরদের এক শ্যালক অনেক দিন যাত্রার দলে ঘুরিয়া ফিরিয়া যখন বর্দ্ধিত প্লীহার ভারে ও হাঁপানী রোগের প্রাবল্যে শীঘ্রই ইহলোক ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে বলিয়া বুঝিতে পারিল, তখন যাত্রার দল ছাড়িয়া, ইহলোক ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে বংশরক্ষা করিয়া পিতৃপিতামহের জলপিণ্ডের আশা পূর্ণ করিতে নিতান্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কাদম্বিনী স্বামীর দ্বারা মামাতো ভাইকে অনেক দোহাইদস্তর দিয়া চিঠি লিখাইয়া তদীয় শ্যালককে রাখালীর পাণিগ্রহণ জন্য অনুরোধ করিল। নীরদ পাত্রী দেখিয়া দিদির অনুরোধ রক্ষা করিবে বলিয়া চিঠির উত্তর দিল। কাদম্বিনী সত্যপীরকে সিন্নী দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া নীরদের আগমন সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

২

"রাখালী, ও রাখালী, ওলো পোড়ারমুখী!"

রাখালী তখন গোয়ালঘর পরিষ্কার করিয়া, এক ঝোড়া গোবর লইয়া ঘুঁটে দিবার উদ্যোগ করিতেছিল, সহসা জ্যেঠাইমার ক্রোধপরুষ আহ্বান শ্রবণে শঙ্কিত হইয়া তাড়াতাড়ি বাড়ীর ভিতর ছুটিয়া আসিল। কিন্তু সেখানে আসিয়া জ্যেঠাইমা'র পরিবর্ত্তে দুই জন ভদ্রবেশধারী অপরিচিত যুবককে দেখিয়া সে লজ্জায় যেন জড়সড় হইয়া পড়িল। লজ্জা হইবারই কথা। সে যে বেশে তথায় উপস্থিত হইয়াছিল, তেমন বেশে কোন পরিচিত ভদ্রলোকেরই সম্মুখীন হওয়া যায় না। তাহার পরণে ময়লা ছেঁড়া কাপড়; তাহার আঁচলটা কোমরে ফের্‌তা দিয়া জড়ান; হাতের কনুই পর্য্যন্ত গোবর মাখা; মাথার সাম্‌নের রুখু চুলগুলা ছাই ও ধুলায় ধূসরবর্ণ ধারণ করিয়াছে, এবং সেই ধূসরবর্ণ চুলগুলা মুখে কপালে ঝাঁপিয়া পড়িয়া মুখখানাকে নিতান্ত বিশ্রী করিয়া তুলিয়াছে।

গায়ে, কাপড়ে গোবরজলের ছিটা লাগিয়া শুকাইয়া রহিয়াছে। এমন অবস্থায় অপরিচিত যুবকদ্বয়ের সম্মুখীন হইয়া রাখালী লজ্জায় যেন মুষড়িয়া পড়িল। সেই অবস্থায় সে সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিবে, অথবা ছুটিয়া পলাইবে, ইহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না। সে শুধু জ্যেঠাইমা'র অনুসন্ধানে ইতস্ততঃ ব্যাকুল দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল।

জ্যেঠাইমার জন্য অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল না, তাহার আসিবার অব্যবহিত পরেই কাদম্বিনী তথায় উপস্থিত হইলেন, এবং রাখালীকে তদবস্থায় যুবকদ্বয়ের সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া বিস্ময়ে লজ্জায় হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন। মুখে আগুন! আবাগীর কি লজ্জা-সরম একটুও নাই? এই বেহায়া—এমন বেশভূষা লইয়া এখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে! কাদম্বিনী ক্রোধে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "মরণ আর কি, এমন পেত্নীর মত চেহারা নিয়ে তোকে এখানে কে আস্‌তে বল্‌লে বল্ তো? দেখছিস্ না, এরা তোকে দেখতে এয়েচে।"

সর্ব্বনাশ! ইহারা দেখিতে আসিয়াছে, আর রাখালী এমন ঘৃণিত বেশ লইয়া ইহাদিগকে দেখা দিল? রাখালীর বুকের ভিতর টিপ্ টিপ্ করিতে লাগিল। সে লজ্জায় ভয়ে মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইল। কাদম্বিনী তখন উপবিষ্ট যুবকদ্বয়ের এক জনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "এই দেখ, নীরু, মেয়ে দেখে পছন্দ কর্। এর পর যে দিদিকে দোষ দিবি, সেটি হবে না।"

নীরু ওরফে নীরদ মৃদু হাসিয়া বলিল, "বর যখন নিজে উপস্থিত, তখন আমাকে পছন্দ কত্তে হবে কেন, দিদি?"

বলিয়া সে পার্শ্ববর্ত্তী যুবককে সম্বোধন করিয়া বলিল, "দেখ হে গোবর্দ্ধন ভায়া, ক'নে পছন্দ ক'রে নাও, এর পর ঘটককে দোষ দিও না।"

বর বলিয়া গোবর্দ্ধন মাথাটা একটু নীচু করিয়াই বসিয়া ছিল; সে নতমস্তকেই রাখালীর দিকে বক্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া ভারী গলায় উত্তর করিল, "পছন্দ আর কি, গেরস্ত ঘরের বৌ, কাণা খোঁড়া না হ'লেই হ'লো।"

সহাস্যে নীরদ বলিল, "কাণা যে নয়, তা তো দেখতেই পাচ্চো, আর খোঁড়া হ'লে এমন ক'রে ছুটে আসতে পারতো না। তবে বোবা কি না, সেটা দেখা দরকার। তোমার নামটি কি গা?"

রাখালী উত্তর দিবে কি, ভয়ে লজ্জায় তাহার গলা তখন শুকাইয়া কাঠ হইয়া গিয়াছিল। বহু কষ্টে দুই একটা ঢোক গিলিয়া মৃদু অস্পষ্ট স্বরে উত্তর দিল, "রাখালদাসী।"

মুখ খিঁচাইয়া কাদম্বিনী বলিলেন, "মুখে আগুন, নাম বল্‌বার রকম দেখ না, যেন কত কাল খেতে পায় না! এ দিকে ঘরে তো গলায় হাঁড়ীচাঁচা ডাকে।"

রাখালীর মাথাটা আরও নীচু হইয়া পড়িল। তাহার এই কাতর অবস্থা দেখিয়া নীরদ বলিল, "যাক্, যেমন করেই বলুক, মেয়ে যে বোবা নয়, তা বোঝা গিয়েছে। কি বল হে গোবর্দ্ধন ভায়া?"

মাথা নাড়িয়া গোবর্দ্ধন উত্তর করিল,—"না না, মেয়ের কিচ্ছু দোষ নাই।"

বর নিজে যখন মেয়ে নির্দ্দোষ বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিল, তখন আর কোন মতামতের অপেক্ষা রহিল না। বাকী শুধু দেনা-পাওনার কথা। সে কথার মীমাংসা গগন না থাকিলে হইতে পারে না। গগন সে দিন সকালে উঠিয়াই কার্য্যানুরোধে গ্রামান্তরে গিয়াছিল। সুতরাং পরে সে কথার মীমাংসা হইবে, এবং মেয়ে যখন পছন্দ হইয়াছে, তখন তুচ্ছ দেনা-পাওনার জন্য আটকাইবে না, আশ্বাস দিয়া বর সমভিব্যাহারে নীরদ বিদায় গ্রহণ করিল। কাদম্বিনী তাহাদিগকে এক বেলা থাকিয়া আহারাদি করিবার জন্য অনুরোধ করিলেও কার্য্যের ব্যস্ততায় তাহারা থাকিতে পারিল না।

তাহারা চলিয়া গেলে কাদম্বিনী রাখালীর উপর পড়িলেন। সে যে জ্যেঠাইমা কোন্ দিক হইতে ডাকিতেছেন, ইহা না বুঝিয়াই বাড়ীর ভিতর ছুটিয়া আসিয়াছে, এ কথা কাদম্বিনী কিছুতেই বুঝিলেন না। সে যে নিজের দৈন্য এবং কাদম্বিনীর অনাদর প্রদর্শন করিবার জন্যই এরূপ কদর্য্য বেশে ভদ্রলোকের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে, এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ পূর্ব্বক তিনি রাখালীকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। পাড়ার মেয়েরা শুনিয়া কেহ রাখালীকে উপহাস করিল, কেহ বা ন্যাকা ঢ্যাটা মেয়ে বলিয়া তিরস্কার করিতে থাকিল। ভাগ্যে উহারা আপনার লোক, নতুবা

আজ ভদ্রলোকের সম্মুখে কি ভয়ানক অপদস্থ না হইতে হইত? ছি ছি, এমন হতভাগা মেয়েও রাখে? জন্মে বাপ-মাকে খেয়ে শুধু পরকে জ্বালাতন করবার জন্যে বেঁচে রয়েছে। জ্বালিয়ে খেলে গো, জ্বালিয়ে খেলে! এখন এ পাপ বিদেয় করতে পারলে বাঁচি।

কাদম্বিনীর আক্ষেপোক্তিতে অনেকেই সমবেদনা প্রকাশ করিয়া হতভাগা মেয়েটার উপর দোষারোপ করিতে লাগিল। রাখালী আপনার অপরাধের গুরুত্ব অনুভব করিয়া ছল ছল চোখে নীরবে কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল; তাহার পর চোখের জল মুছিতে মুছিতে ধীরে ধীরে স্বকার্য্যে প্রস্থান করিল। কাদম্বিনী কিরূপে পাপ বিদায় করিবেন, তাহাই ভাবিতে ভাবিতে স্নান করিতে চলিলেন।

৩

"রাখালীর বিয়ের ঠিক হয়ে গেল, মামীমা?"

পরেশ বোসের ভাগিনেয় রাজুর সাড়া পাইয়া, কাদম্বিনী হাতের কায ফেলিয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিলেন, এবং ব্যস্ততার সহিত উত্তর দিলেন, "কে রে, রাজু? ঠিক আর কৈ হলো, বাছা; আজ শুধু মেয়ে দেখে গেল।"

রাজু জিজ্ঞাসা করিল, "বর নিজে মেয়ে দেখতে এসেছিল, না?"

কাদম্বিনী বলিলেন, "ছেলেটির তেমন আপনার লোক কেউ নাই কি না, তাই নিজেই দেখতে এসেছিল।"

রাজু। দেখে পছন্দ হলো?

কাদ। পছন্দ এক রকম হয়েছে। পোড়ারমুখী দেখতে তো একেবারেই মন্দ নয়, তবে লক্ষণ ভাল নয়, এই যা দোষ। তা পছন্দ হয়েছে, এখন দেনাপাওনাটা চুকে গেলেই হয়।

রাজু। যাক্, মামাবাবু তা হ'লে একটা দায় হ'তে উদ্ধার পেলেন।

কাদ। উদ্ধার পেতে এখনও ঢের দেরী। মেয়ের যে রকম লক্ষণ, তাতে যতক্ষণ না চার হাত এক হয়, ততক্ষণ তো বিশ্বাস নাই।

"তা বটে" বলিয়া রাজু মৃদু হাসিতে হাসিতে অগ্রসর হইয়া দাওয়ার উপর পা ঝুলাইয়া বসিল। কাদম্বিনী তাহাকে একখানা আসন পাতিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কবে কলকাতা থেকে এলে?"

রাজু বলিল, "কবে কি, আজ সকালে ন'টার সময় এসেছি। এসেই আমাদের নলীর মুখে শুনলুম, রাখালীকে তা'র বর নিজে দেখতে এসেছিল।"

দুঃখগম্ভীর কণ্ঠে কাদম্বিনী বলিলেন, "দেখতে তো অনেকেই আসছে, কিন্তু ঠিক তো কোথাও হচ্ছে না। ঠিক হয়ে যেতো এত দিন, কিন্তু তোমার মামা বলেন, মা-বাপ-মরা মেয়ে, যা'র তা'র হাতে তো দিতে পারি না, লোক আমাকে দোষ দেবে। বলবে, দেখেছ, মা-বাপ নাই ব'লে ফলনা ঘোষ ভাইঝিটাকে জলে ফেলে দিলে। পোড়া লোক দোষটাই যে আগে দেখে, বাবা, মেয়ের গুণ তো কেউ বোঝে না।"

ঈষৎ হাসিয়া রাজু বলিল, "তা বৈ কি, মামীমা, সংসারে নিন্দুক লোকের সংখ্যা এত বেশী যে, তা'দের জ্বালায় ভাল কায করেও প্রশংসা পাবার যো নাই। তা এ ছেলেটি কি করে?"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া কাদম্বিনী উত্তর করিলেন, "করে না কিছু, আগে যাত্রা করতো, মোটা মাইনেও পেতো। এখন সে কায ছেড়ে দিয়ে ঘরেই ব'সে আছে। বাপের জমী-যায়গা রয়েছে, তা'রই দেখাশোনা চাষবাস করে। জমীযায়গা যা আছে, তা'তে মোটা ভাত মোটা কাপড়ের অভাব হবে না।"

ছেলের গুণ শুনিয়া রাজুর হাসি আসিল; কিন্তু সে হাসি চাপিয়া মামীমার কথায় সায় দিয়া বলিল, "আমাদের মত গেরস্তর পক্ষে মোটা ভাত মোটা কাপড় যথেষ্ট।"

কাদম্বিনী বলিলেন, "পয়সা নাই যখন, তখন কাযেই যথেষ্ট বলতে হবে। নইলে তোমার মত পাশ-করা ছেলে দেখতে গেলে ভিটে বেচতে হবে যে। ভাল কথা, তোমার না কি সম্বন্ধ ঠিক হয়ে গিয়েছে?"

লজ্জিতভাবে রাজু বলিল, "কি জানি।"

কাদম্বিনী বলিলেন, "কি জানি কেন, তোমার মামীর কাছে শুনলুম, চড়কডাঙ্গার কোন্ উকীলের মেয়ে,—নগদ দু' হাজার, আর দেড় হাজার টাকার গয়না দেবে।"

রাজু নতমুখে নীরব রহিল। কাদম্বিনী গম্ভীরভাবে মস্তক সঞ্চালন করিয়া বলিলেন, "আমাদের এঁর ইচ্ছা ছিল, তোমার মামাও বলেছিলেন, আমার নলীর সঙ্গে রাজুর বিয়ে দেব। কিন্তু এখন তুমি দু'টো পাশ করেছ, দু'চার হাজার পাবে, এখন আর তোমার মামা মত করবেন কেন?

আমরা তো এত টাকা দিতে পার্‌বো না, নগদে গয়নায়-পত্তরে বড় জোর হাজার টাকা পর্য্যন্ত দিতে পারি। কিন্তু কোথায় চার হাজার, আর কোথায় এক হাজার!"

কাদম্বিনী যেন নিতান্ত হতাশভাবে ক্ষুদ্র নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন; রাজু নতমুখে বসিয়া মস্তক কণ্ডূয়ন করিতে লাগিল। কাদম্বিনী একটু থামিয়া যেন ঈষৎ গর্ব্বিত স্বরে বলিলেন, "তা যত টাকাই পাও, বাবা, আমার নলীর মত মেয়ে কিন্তু পা'বে না। তবে আজকাল গুণের তো আদর নাই, টাকারই আদর।"

এই সকল অপ্রয়োজনীয় আলোচনায় রাজু যেন বিরক্ত হইয়া উঠিল; বলিল, "এখন তবে আসি, মামীমা!"

বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। কাদম্বিনী একটু ব্যস্ততার সহিত বলিলেন, "এক্ষুণি চ'লে যাবে? একটু জলটল খাবে না? নলী কোথায় গেল, একটা পান সেজে দিত। রাখালী পোড়ারমুখীই বা গেল কোন্ চুলোয়?"

আপাততঃ পানের কোনই প্রয়োজনীয়তা নাই জানাইয়া রাজু বিদায় গ্রহণ করিল। তাহার প্রয়োজন না থাকিলেও ভদ্রতার মর্য্যাদা রক্ষিত না হওয়ায় কাদম্বিনী পোড়ারমুখী রাখালীর উদ্দেশে তাহার অনুপস্থিতির জন্য সুমিষ্ট ভাষা প্রয়োগ করিতে লাগিলেন।

৪

কাদম্বিনী যখন রাখালীর উদ্দেশে তীব্র বাক্যবাণ প্রয়োগ করিয়া স্বীয় মনঃক্ষোভের নিবৃত্তি করিতেছিলেন, রাখালী তখন গাভীটাকে লইয়া নিতান্ত বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। গাভীটা পুকুরের পাড়ে বাধা ছিল; রাখালী স্নান করিতে যাইবার পূর্ব্বে তাহাকে ঘরে আনিবার জন্য খোঁটাটা উপড়াইতেই গাইটা গৃহাভিমুখে না আসিয়া পার্শ্ববর্ত্তী ফসলের ক্ষেতের দিকে ছুটিল। রাখালী প্রাণপণে দড়ি টানিয়াও তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না, সে ঘাড় নীচু করিয়া অদম্য মহিষের ন্যায় ক্ষেতের দিকে ধাবিত হইল। তাহার পশ্চাৎ ছুটিতে ছুটিতে হোঁচট খাইয়া রাখালী পড়িয়া গেল। তাহার পায়ের বুড়া আঙ্গুলটা ছিঁড়িয়া দর্‌দর্ ধারায় রক্ত পড়িতে লাগিল, হাতের কনুই ছিঁড়িয়া গেল, হাঁটুতে আঘাত লাগিল। যন্ত্রণায় রাখালী কাঁদিয়া উঠিল। কিন্তু তখন দাঁড়াইয়া কাঁদিবার সময় ছিল না, গাইটা এখনই গিয়া পরের ফসলের ক্ষেতে পড়িবে। রাখালী কাঁদিতে কাঁদিতেই ছুটিয়া গিয়া পুনরায় দড়ি ধরিয়া গাইটাকে ফিরাইবার জন্য চেষ্টিত হইল; গাইটাও নিবৃত্ত না হইয়া রাখালীকে টানিয়া লইয়াই ক্ষেতের দিকে ধাবিত হইল। রাখালী এবার অনন্যোপায় হইয়া উচ্চকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিল।

সহসা পশ্চাৎ হইতে কে আসিয়া খোঁটা ধরিয়া সবলে টান দিল। সে আকর্ষণের বেগ উপেক্ষা করিয়া গাভীটা আর অগ্রসর হইতে পারিল না, থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। পিছন হইতে কে এই টান দিল, দেখিবার জন্য রাখালী ঘাড় ফিরাইতেই রাজু হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল; হাসিতে হাসিতে বলিল, "মুখে আগুন! গায়ে কি একটু জোর নাই? খালি খাবার যম। আবার কান্না হচ্চে।"

রাজুকে দেখিয়া রাখালী নিতান্ত অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। সে দড়ি ছাড়িয়া দিয়া আঁচলে চোখের জল, কপালের ঘাম মুছিতে লাগিল। রাজু যেন তিরস্কারের স্বরে বলিল, "গাইটা যে এখুনি ফসলে পড়েছিল!"

অশ্রুগদ্গদ কণ্ঠে রাখালী বলিল, "কি করবো, আমি যে টেনে রাখতে পারি না।"

মুখভঙ্গী করিয়া রাজু বলিল, "খেতে পারিস্, আর এই গাইটাকে টেনে রাখতে পারিস্ না? সাধে কি গাল খেয়ে মরিস্!"

ভারী মুখে ঝঙ্কার দিয়া রাখালী বলিল, "আমি গাল খাই খাব, তোমার তা'তে কি?"

রাজু বলিল, "আমার আর কি। তবে আমি এসে গাইটাকে না ধরলে এতক্ষণ মজা দেখ্‌তিস্।"

রাখালী এজন্য আপনাকে উপকৃত বোধ করিলেও রাজুর তীব্র কথাগুলা তাহার যেন অসহ্য বোধ হইল। সে রাজুর মুখের উপর সকোপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "তুমি ধরলে কেন?"

একটু শ্লেষের হাসি হাসিয়া রাজু বলিল, "অন্যায় করেছি। এখন ছেড়ে দেব?"

রাখালী মুখ নীচু করিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। রাজু জিজ্ঞাসা করিল, "এখন এটাকে ঘরে নিয়ে যেতে পারবি, না আমাকে সঙ্গে যেতে হবে?"

ভারী গলায় রাখালী উত্তর দিল, "তোমাকে যেতে হবে না, আমিই নিয়ে যাচ্ছি।"

বলিয়া সে রাজুর হাত হইতে দড়িটা কাড়িয়া লইবার উপক্রম করিল। ঈষৎ হাসিয়া রাজু বলিল, "আর তোমাকে এতটা বাহাদুরী দেখাতে হবে না। চল, খানিক এগিয়ে দিয়ে আসি।"

রাজু দড়ি ধরিয়া গাইটাকে লইয়া অগ্রসর হইল, রাখালী তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

যাইতে যাইতে রাজু জিজ্ঞাসা করিল, "আজ না এক যাত্রাওয়ালা বর তোকে দেখতে এসেছিল?"

গম্ভীরভাবে রাখালী উত্তর দিল, "হুঁ।"

রাজু। তোকে দেখে পছন্দ হয়েছে?

রাখালী। হুঁ।

রাজু। তা হ'লে এই যাত্রাওয়ালার সঙ্গেই বিয়ে হ'বে?

রাখালী। হুঁ।

রাজু। চমৎকার হ'বে কিন্তু, খুব যাত্রা শুনবি।

রাখালী। হুঁ।

রাজু এবার যেন একটু রাগিয়া বলিল, "মুখে আগুন, এক হুঁ ছাড়া মুখে আর কোন কথা নাই?"

তাহার হাত হইতে খপ করিয়া দড়ি গাছটা কাড়িয়া লইয়া তর্জ্জন সহকারে রাখালী বলিল, "না, নাই। তুমি যেখানে যাচ্ছিলে, সেখানে যাও তো, আমি আমার গরু নিয়ে যাচ্ছি।"

বলিয়া রাখালী গাইটাকে জোরে জোরে টানিতে টানিতে ঘরের দিকে অগ্রসর হইল। রাজু হাসিতে হাসিতে স্বীয় গন্তব্য পথে প্রস্থান করিল।

স্নানান্তে রাখালী ঘরে ফিরিলে কাদম্বিনী বলিলেন, "হাঁ লা, রাখালী, কবে নাইতে গিয়েছিলি? পুকুরে কি জল ছিল না?"

নলী রান্নাঘরের দাওয়ায় বসিয়া, কুটনা কুটিতেছিল। সে বলিল, "পুকুরে জল থাকবে না কেন, মা? ও যে রাজুদার সঙ্গে রাস্তায় দাঁড়িয়ে গল্প কচ্ছিল।"

সর্ব্বনাশ! রাস্তায় দাঁড়াইয়া এত বড় জোয়ান ছেলের সঙ্গে গল্প! কাদম্বিনী রাগে যেন আগুন হইয়া উঠিলেন; ক্রোধকম্পিত কণ্ঠে বলিলেন, "হাঁ লা পোড়ারমুখী, তোর প্রাণ নাই কি?"

রাখালী নিতান্ত অপরাধীর ন্যায় ভীতিবিবর্ণ মুখখানা নীচু করিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার এই নীরবতায় তদীয় অপরাধের যেন স্পষ্ট প্রমাণ পাইয়া কাদম্বিনী রোষবিকৃত কণ্ঠে বলিলেন, "তোর কি একটুও লজ্জা-সরমের ভয় নাই লা আবাগী? লোক দেখলে বলবে কি? বেরো কালামুখী, আমার বাড়ী থেকে।"

কাদম্বিনী ছুটিয়া আসিয়া রাখালীর ঘাড় ধরিয়া এমন একটা ধাক্কা দিল যে, রাখালী পড়িয়া যাইতে যাইতে সাম্‌লাইয়া লইল। ভিজা কাপড়ে চোখের জল মুছিতে মুছিতে সে কাপড় ছাড়িতে গেল। কাদম্বিনী ক্রোধসমুচ্চকণ্ঠে এই নির্লজ্জা হতভাগীকে অবিলম্বে যমের বাড়ী যাইবার জন্য আদেশ দিতে লাগিলেন।

জ্যেঠাইমা'র এরূপ আদেশের মধ্যে নূতনত্ব কিছু না থাকিলেও এবং এরূপ আদেশশ্রবণে রাখালী অভ্যস্ত হইলেও আজ কিন্তু জ্যেঠাইমা'র তিরস্কারটা তাহার কাছে যেন একটু নূতন বলিয়া বোধ হইল, এবং অনেক ভাবিয়াও তাঁহার এই দুর্জ্জয় ক্রোধের কারণ কিছুই খুঁজিয়া পাইল না। সুতরাং ইহাতে দুঃখ অপেক্ষা তাহার বিস্ময়ের ভাগটাই একটু অধিক হইয়া পড়িল।

বিস্ময়েরই কথা। কেন না, রাজুকে সে কোন দিনই তো পর বলিয়া ভাবে নাই। শুধু সে কেন, জ্যেঠাইমা'কে পর্য্যন্ত রাজুর সঙ্গে পরের মত ব্যবহার করিতে দেখে নাই। রাজুর মা বিধবা হইয়া যখন ভ্রাতৃগৃহে আসেন, তখন রাজু তিন বৎসরের শিশু। তখন হইতে রাজুর মা ভায়ের ঘরেই বাস করিতেছিলেন, রাজুও মামার বাড়ীতেই প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছিল। সুতরাং সে গ্রামের মধ্যে এমনই পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিল যে, গ্রামের কেহই তাহাকে পর বলিয়া মনে করিতে পারে নাই। তা' ছাড়া নম্র মধুর ব্যবহারে সে পাড়ার ছেলে বুড়া সকলেরই নিকট ঠিক ঘরের ছেলের মত হইয়া উঠিয়াছিল।

বয়সে বড় হইলেও রাজুদার সঙ্গে রাখালী সে দিন পর্য্যন্ত খেলাধূলা করিয়াছে, এবং এই খেলাধূলা লইয়া নলীর সঙ্গে তাহার কত ঝগড়াঝাটি হইয়া গিয়াছে। রাখালী যে রাজুর সঙ্গে খেলিবে, নলী ইহা পছন্দ করিত না। রাজু কিন্তু তাহার মতামত গ্রাহ্য না করিয়াই রাখালীকে লইয়া খেলিতে বসিত, এবং নলী ইহাতে রাগিয়া উঠিলে সে রাগে রাজু যথেষ্ট আমোদ অনুভব করিত। রাজু গাছে উঠিয়া জামরুল পাড়িত, এবং পাকা পাকা সেগুলা

জামরুলগুলা নলীর ভাগে দিলেও রাখালীকে ভাগ দেওয়ার জন্ত নলী রাগিয়া নিজের ভাগের জামরুলগুলা ছড়াইয়া ফেলিয়া দিত। তাহার রাগ দেখিয়া রাজু হাসিতে থাকিত। সে রাখালীকে ফুল পাড়িয়া দিত, নলী রাগিয়া রাখালীকে গালাগালি দিয়া তাহার ফুল কাড়িয়া লইতে চেষ্টিত হইত। টানাটানিতে ফুল ছিঁড়িয়া যাইত, নলী মাতার নিকট অনুযোগ করিয়া রাখালীকে বকুনি খাওয়াইত। বকুনি খাইয়া রাখালী রাজুর সঙ্গে খেলিতে যাইত না। রাজু কিন্তু ছাড়িত না, সে খেলিবার জন্য রাখালীকে টানিয়া লইয়া যাইত।

এমনই ঝগড়াঝাটির ভিতর দিয়া রাজুর সঙ্গে সে দিন পর্য্যন্ত খেলাধুলা হইয়াছে। তা'র পর গ্রামের স্কুল ছাড়িয়া রাজু যখন পড়িবার জন্য কলিকাতায় গেল, তখন হইতেই রাজুর সঙ্গে মেলামেশা বন্ধ হইয়াছে। সে তো আজ বছর তিনেকের কথা। এই তিন বছরে রাজুদা কিরূপে যে পর হইয়া গেল, এবং তাহার সহিত কথা কহিলে লোক কেন যে দোষ দিবে, রাখালী ইহা ভাবিয়া পাইল না।

রাখালী ভাবিয়া না পাইলেও কাদম্বিনী কিন্তু তাহাকে রেহাই দিলেন না; অপরে কিছু না বলিলেও এই ব্যাপার লইয়া তিনি রাখালীকে যে সকল কথা বলিতে লাগিলেন, অপরে সে সকল কথা বলিতে কুণ্ঠিত না হইয়া থাকিতে পারিত না। তাহার পর গগন যখন যাত্রাওয়ালা গোবর্দ্ধনের সহিত সম্বন্ধ স্থির করিয়া ফেলিলেন, তখন কাদম্বিনী তাহাকে তাড়া দিয়া বলিলেন, "যত শীগ্গীর পার এ পাপ বিদেয় ক'রে দাও।"

স্ত্রীর অনুরোধে গগন সত্বর পাপ বিদায় করিতে উদ্যোগী হইলেন।

৬

বিবাহের সমস্তই স্থির। কা'ল গায়ে হলুদ, পরশু বিবাহ। এই ছুটো দিন কোন রকমে কাটিয়া গেলে হয়। মেয়ের যে লক্ষণ, তাহাতে নির্ব্বিঘ্নে কার্য্য সুসম্পন্ন হইবে বলিয়া তো মনে হয় না। এখন ভগবানের হাত। ভগবানের দয়ায় এ দিকে তো সকল বিষয়েই সুবিধা হইয়াছে; বিনা পয়সায় এমন পাত্র কি আর পাওয়া যাইবে? শুধু বিশ পঁচিশ টাকা ঘরখরচ। ভাগ্যে নীরদ মাঝে দাঁড়াইয়াছিল! আপনার লোক মাঝে না দাঁড়াইলে কি এমন সুবিধা হইত? এখন চার হাত এক করিয়া দিতে পারিলেই নিশ্চিন্ত হইয়া কাদম্বিনী সাতটা সরিষা মাথায় দিয়া গঙ্গাস্নান করিয়া আসিবেন। আর গগন ভাইঝির বিবাহে খরচের অজুহাতে সাত শত টাকায় রাখালীর বাপের জমী কয় বিঘা বন্ধক দিয়া সেই টাকায় আগামী মাসেই ধূমধামের সহিত নলীর বিবাহকার্য্য সম্পন্ন করিয়া দিবেন।

রাত্রিতে স্ত্রীপুরুষে বসিয়া এইরূপ পরামর্শ আঁটিতেছিলেন, এমন সময় হঠাৎ নলী আসিয়া সংবাদ দিল, রাখালীর কম্প দিয়া ভয়ানক জ্বর আসিয়াছে। সর্ব্বনাশ, কা'ল গায়ে হলুদ, আর আজ রাত্তিরে জ্বর! স্ত্রী-পুরুষে পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল। গগনের মুখে ভীতির রেখা দেখা দিল। কাদম্বিনী স্বামীকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "হোক্ জ্বর, অমন জ্বর ওর হয়েই থাকে। জ্বর হয়েছে ব'লে বিয়ে বন্ধ করলে চলবে না, কা'ল গায়ে হলুদ দিতেই হ'বে।"

স্ত্রীর উৎসাহবাক্যে গগনের ভীতি অনেকটা অপসারিত হইল, স্থির হইল, মেয়ের লক্ষণ যখন ভাল নয়, তখন এমন বাধাবিঘ্ন তাহার উপস্থিত হইবে। কিন্তু এ জন্য বিবাহ বন্ধ রাখা হইবে না। রাখিলে উহার বিবাহ দেওয়া ছঃসাধ্য হইয়া উঠিবে।

পরদিন খানিক বেলায় রাখালীর জ্বর একটু কমিয়া আসিলে পাড়ার পাঁচ জন এয়ো আসিয়া তাহার কপালে হলুদ ছোঁয়াইয়া দিয়া গেল। খানিক পরে জ্বরের উপর আবার এমন প্রবল জ্বর আসিল যে, রাখালীর উত্থানশক্তি পর্য্যন্ত রহিল না। তাহার উত্থানশক্তি না থাকিলেও বিবাহের আয়োজন কিন্তু বন্ধ থাকিল না। জ্বরগায়ে বিবাহ ভাল নয় বলিয়া পাড়ার কোন কোন প্রাচীনা আপত্তি তুলিলে কাদম্বিনী তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন, জ্বর তো তেমন বেশী নয়। ডাক্তার হাত দেখে বলেছে, সামান্ত ম্যালেরিয়া জ্বর। বিবাহের আয়োজন সকলই প্রস্তুত। এই সামান্য জ্বরের জন্য সে আয়োজন কি পণ্ড করা যায়? তা ছাড়া সেখানে বরের গায়ে হলুদ হইয়া গিয়াছে। মেয়ের জ্বর বলিয়া বিবাহ বন্ধ রাখিতে গেলে তাহারা শুনিবে কেন? তাহারা নিশ্চয়ই অন্যত্র মেয়ে ঠিক করিয়া এই লগ্নেই বিবাহ দিয়া ফেলিবে। তখন এই 'দোজ পড়া' মেয়ে লইয়া কি করা যাইবে? তাহা অপেক্ষা বিবাহ হইয়া যাউক।

কাদম্বিনীর এই যুক্তিযুক্ত উত্তরের প্রতিবাদে কেহই কিছু বলিতে পারিল না। প্রবল জ্বরের অবস্থাতেই রাখালীকে কোনরূপে একবার বসাইয়া অধিবাসের কায সারিয়া দেওয়া হইল।

কিন্তু সন্ধ্যার সময় বরের আগমনপ্রতীক্ষায় সকলেই যখন উৎসুক হইয়াছিল, সেই সময়ে বরের বাড়ী হইতে লোক আসিয়া সংবাদ দিল, বরের হাঁপানী রোগ বাড়িয়া যাওয়ায় এ লগ্নে বিবাহ হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। বর যদি রক্ষা পায়, তবে অপর দিন স্থির করা হইবে।

এই নির্ঘাত সংবাদ শ্রবণে কাদম্বিনী ও গগন উভয়েরই মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। হায় হায়, এই অলক্ষণা মেয়েটাকে লইয়া কি হইবে গো! হতভাগী শুধু নিজের অসুখ ডাকিয়া আনিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, বিবাহ না হইতেই বরটাকে পর্য্যন্ত খাইতে বসিয়াছে। এমন রাক্ষসী মেয়ে কেহ কখন বাপের জন্মে দেখিয়াছে কি? এখন এ পাপ কিরূপে বিদায় হইবে গো! গায়ে হলুদ, অধিবাস—হাতে সূতা বাঁধা হইয়া গিয়াছে; আজ বিবাহ না হইলে এই 'দোজ-পড়া' মেয়েকে কে গ্রহণ করিবে?

রাজু আসিয়া রোরুদ্যমানা কাদম্বিনীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া জোর গলায় বলিল, "আমি গ্রহণ করবো, মামীমা, অলক্ষণা রাক্ষসীকে আমি বিয়ে করবো।"

বিস্ময়ে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া শঙ্কাকম্পিত কণ্ঠে কাদম্বিনী বলিয়া উঠিলেন, "তুমি বিয়ে করবে, রাজু?"

স্থির-গম্ভীরকণ্ঠে রাজু উত্তর দিল, "হাঁ মামীমা, আমি বিয়ে করবো। বিয়ের যোগাড় কর তোমরা।"

কথাটা যে শুনিল, সে-ই ভয়ে বিস্ময়ে চমকিত হইয়া উঠিল। রাজুর মত সোনার চাঁদ ছেলে এমন হতভাগা মেয়েটাকে বিবাহ করিবে? শুনিয়া কেহ বা রাজুর মহত্বের প্রশংসা করিল; কিন্তু অনেকেই এই লেখাপড়া-জানা ছেলেটিকে নির্ব্বোধ আখ্যা দিয়া তাহার ভয়াবহ পরিণাম স্মরণে আশঙ্কায় কাতর হইয়া পড়িল। রাজুর মামা বাড়ীতে ছিলেন না, মামী কাঁদিয়া পাড়া মাথায় করিলেন; নিকট-আত্মীয় যাহারা ছিল, তাহারা রাজুকে নিবৃত্ত করিবার জন্য ব্যস্তভাবে ছুটিয়া চলিল।

কিন্তু তাহাদের কষ্ট করিয়া বুঝাইয়া শুঝাইয়া রাজুকে এই অমঙ্গলজনক কার্য্য হইতে নিরস্ত করিবার প্রয়োজন হইল না। সেই অলক্ষণা মেয়েটা নিজেই রাজুর এই নির্ব্বুদ্ধিতাসূচক কার্য্যে বাধা দিয়া সকলের আশঙ্কা দূর করিয়া দিল। তাহার তখন রাজুর গলায় মালা দিবার অবসর ছিল না; তিন দিনের জ্বরবিকারে আক্রান্ত হইয়া সে তখন মৃত্যুর সহিত মাল্যবিনিময় করিবার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়াছিল। বাহিরে তাহার বিবাহের জন্য যখন তুমুল আন্দোলন চলিতেছিল, সে তখন একটা নির্জ্জন অন্ধকারময় কক্ষে পড়িয়া বিকারের ঝোঁকে চীৎকার করিতেছিল, "যাত্রাওলা গো, যাত্রাওলা! আমি তোমার সঙ্গে কথা কইবো না; রাজুদা, যাত্রাওলার সঙ্গেই আমার বিয়ে হ'বে।"

রাজু গিয়া ডাকিল, "রাখালী, রাখালী!"

রাখালী আর্ত্তকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল, "আমি অলক্ষুণে গো, আমি অলক্ষুণে!"

রাজু ছুটিয়া গিয়া ডাক্তার ডাকিয়া আনিল। ডাক্তার নাড়ী টিপিয়া মুখ বাঁকাইয়া চলিয়া গেলেন; ঔষধ দেওয়া প্রয়োজন বোধ করিলেন না।

* * * *

সকালে রাজু শবদাহ সম্পন্ন করিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "পাপ বিদায় ক'রে দিয়ে এলুম, মামীমা, তা'র চিতার ছাই পর্য্যন্ত একটু রেখে আসি নাই, নদীর জলে ধুয়ে মুছে সব পরিষ্কার ক'রে দিয়ে এসেছি।"

কাদম্বিনী আঁচলে শুক্‌না চোখ দুইটা মুছিতে মুছিতে শোককাতর-কণ্ঠে বলিলেন, "হতভাগী সেই গেল, বাবা, কিন্তু বিয়ের যুগ্যি হয়ে বুকে শেল বিঁধিয়ে দিয়ে তবে গেল। আগে গেলে এতটা আক্ষেপ ছিল না, বিয়ের যোগাড়ে এতগুলা টাকাও খরচ হতো না। এমন অলক্ষুণে মেয়েও কি জন্মে রে, রাজু!"

রাজু মামীমার এই আক্ষেপোক্তির উপযুক্ত সান্ত্বনা-বাক্য কিছুই খুঁজিয়া পাইল না; শুধু দুই বিন্দু অশ্রু আসিয়া তাহার নেত্রপ্রান্ত সিক্ত করিয়া দিল।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

বাঙ্গালার বিপ্লব-কাহিনী

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বঙ্গ-বিভাগ প্রত্যাহার জন্য আন্দোলন

(অবশিষ্টাংশ)

স্বদেশী আন্দোলনের যুগে ন্যাশানাল কাউন্সিল অব এডুকেশন্ নামে একটা প্রতিষ্ঠান গড়বার চেষ্টা হয়েছিল। বাঙ্গালার নানা স্থানে ন্যাশানাল স্কুল অর্থাৎ জাতীয় বিদ্যালয় এবং কলিকাতায় জাতীয় কলেজ স্থাপিত হ'ল। দেশের লোক বড় আশায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ভাবতে লাগল, "এই একটা কাযের মত কায হ'ল; বিদ্যালয়ে দৈনিক চার পাঁচ ঘণ্টা পাশ্চাত্যশিক্ষার সঙ্গে দু' এক ঘণ্টাও ত ছেলেরা আমাদের সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র মুখস্থ করবে; আর যা হ'ক যা না হ'ক, নিদেন ধর্ম্মটা ত রক্ষা হ'বে!" অধিকন্তু যখন সেই সঙ্গে শিল্প বাণিজ্য শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল, তখন সেই পরম আশাপ্রদ জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থাদাতা নেতা ও অর্থসাহায্যকারীদের প্রতি গদ্‌গদ ভক্তি জানাবার জন্য হুড়াহুড়ি লেগে গেল।

ঠিক এই সময় দেশমান্য অরবিন্দবাবু বরোদায় মাসিক ৭০০৲ টাকা মাহিয়ানার চাকরী ছেড়ে মাত্র ১০০৲ টাকা মাহিয়ানাতে কলিকাতায় ন্যাশানাল কলেজের অধ্যাপনা করতে এলেন।

যাই হ'ক, যখনই আমাদের অবনতির কথা ওঠে, তখনই শুনা যায়, শিক্ষাই এই অবনতির একমাত্র প্রতীকার। কিন্তু ইংরাজ সরকারের প্রবর্ত্তিত শিক্ষা-প্রণালীর দ্বারা কেবল দাস মনোভাবই (Slave mentality) তয়ের হচ্ছে। জাতীয় শিক্ষা দিতে [illegible] তবেই উন্নতির পথ পরিষ্কৃত হ'বে। তাই জাতীয় শিক্ষা দেওয়ার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা চাঁদা তুলে জাতীয় স্কুল-কলেজ খোলা হয়েছিল, আর অনেক স্কুল-কলেজকে সরকারী সম্পর্কচ্যুত করবার সঙ্কল্প মাত্র করা হয়েছিল।

সরকারী স্কুল-কলেজে যে সকল বিষয় শিক্ষা দেওয়া হ'ত, জাতীয় বিদ্যালয়েও প্রায় সেই সকল বিষয় একটু এদিক ওদিক ক'রে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হ'ল। অধিকন্তু সেই সঙ্গে শাস্ত্রপাঠ আর শিল্প বা কারুকরী শিক্ষার নাম-মাত্র ব্যবস্থাও ছিল। আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, যে সকল ইতিহাসে ভারতের ভূত গৌরবকীর্ত্তন আছে, অথবা নিন্দাজনক কিছুই নাই, সেই রকম ভারতের ইতিহাস পড়াবার চেষ্টা হয়েছিল।

এখন স্থূলদর্শী বিদেশীর জড়বিজ্ঞান আর ধর্ম্মশাস্ত্র অর্থাৎ সূক্ষ্ম জগৎসম্বন্ধীয় ঋষিবাক্য একসঙ্গে পড়াবার ফল কি হ'তে পারে—দেখা যা'ক। এক দিকে জড়-বিজ্ঞান, স্থূলদর্শী ভ্রান্ত মানবের ভ্রান্ত বিষয়-বুদ্ধির দ্বারা উদ্ভাবিত—কাযেই ভ্রান্ত। অন্য পক্ষে ঋষিরা ছিলেন অভ্রান্ত সূক্ষ্মদর্শী ও ত্রিকালজ্ঞ। তাঁ'দের intuition থেকে চির-সত্যের ভাণ্ডাররূপ শাস্ত্রের উদ্ভব, কাযেই শাস্ত্রোক্ত ঋষি বাক্য সকল যদি স্ববিরোধী বা পরস্পর-বিরোধী হয়, তবুও অকাট্য সত্য। মানবজ্ঞানের বিষয়ীভূত যাবতীয় বিষয়ে অনেক স্থলে বিজ্ঞান যা' সত্য ব'লে প্রতিপন্ন করে, ধর্ম্ম-শাস্ত্রের মতে তা' মিথ্যা; আর শাস্ত্র যা' সত্য ব'লে দাবী করে, তা'র অধিকাংশ বিজ্ঞান মিথ্যা ব'লে প্রতিপন্ন করে। এই দুয়ের মধ্যে সমন্বয়ের বিস্তর বৃথা চেষ্টা দেশবিদেশে হয়েছে; এখনও সে চেষ্টা খুবই চল্‌ছে। তা'র ফলে "এটাও সত্য, ওটাও সত্য" এইরূপ মনোভাব অর্থাৎ মানুষের মন কতক জ্ঞাতসারে, বিস্তর অজ্ঞাতসারে সত্য-মিথ্যার খিচুড়ী বা ভণ্ডামীতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। এখন জিজ্ঞাস্য, এই সত্য-মিথ্যার এমন খিচুড়ীকে জাতীয় শিক্ষা বলা হয়েছিল কেন?

সরকারী বিদ্যালয়ে ধর্ম্মসম্পর্কবিহীন শিক্ষার ব্যবস্থা বিদ্যাসাগরের যুগে আরম্ভ হয়েছিল। তা'র উদ্দেশ্য ছিল, কোন পূর্ব্ব-সংস্কার দ্বারা আচ্ছন্ন না হয়ে, নিরপেক্ষভাবে

নিজে বিচার ক'রে ভালমন্দ নিরূপণ করবার শক্তি যা'তে বালকরা অর্জ্জন করতে পারে, তা'র ব্যবস্থা করা। সেই উদ্দেশ্য অনুযায়ী সম্যক্ সুফলও তখন ফলেছিল। লোক-মতে কিন্তু তা' কুফল ব'লে পরে বিবেচিত হ'ল।

বিচারবুদ্ধির দ্বারা বিজ্ঞানের সত্য ধারণা করা মানব-মনের পক্ষে সহজে সম্ভব হয়। শাস্ত্রোক্ত সত্য বিচারের অতীত; তা' কেবল ভক্তি বা অন্ধ বিশ্বাস দ্বারাই স্বীকৃত হয়ে থাকে। বুদ্ধির দ্বারা তা' আয়ত্ত করা অসম্ভব। তা'র ফল এই দাঁড়ায় যে, আশৈশব শাস্ত্র অথবা ঋষিবাক্য সকল সত্যের একমাত্র আধার ব'লে লোকের মনে যে ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে, তা' পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক শিক্ষার দ্বারা প্রাপ্ত বিচার-বুদ্ধিতে নিতান্ত হেয় ব'লে প্রতীত হয়। কাযেই মহামান্য ধর্ম্মশাস্ত্র ও মহাপূজ্য ঋষিদের উপর তা'দের অভক্তি হয়। আমাদের প্রধানতম গৌরবভাজন ঋষিগণ যখন ছেলেদের দৃষ্টিতে এত তুচ্ছ হয়ে যান, তখন বেদ হ'তে আরম্ভ ক'রে, ধর্ম্মের নামে প্রচলিত সামাজিক বিধিব্যবস্থা, লোকাচার ইত্যাদি আমাদের সকল চরম গৌরবের বস্তু বৈজ্ঞানিক সত্যের তুলনায় নিতান্ত হেয় ব'লে মনে হওয়া অসম্ভব নয়। এই প্রকারে গঠিত মনোভাবকেই, বোধ হয়, দাসসুলভ মনোভাব (Slave mentality) ব'লে অভিহিত করা হয়ে থাকে। এই দাস-মনোভাবের আক্রমণ থেকে দেশকে বাঁচাবার জন্য স্বদেশী আন্দোলনের যুগে যে শিক্ষা-প্রণালী প্রবর্ত্তিত হওয়া প্রয়োজন ব'লে নির্দ্দিষ্ট হয়েছিল, তা'কেই জাতীয় শিক্ষা বলা হ'ত, এখনও হয়। বিপ্লববাদের নেতারাও বিশেষ ক'রে এ রকম জাতীয় শিক্ষার প্রয়োজন অনুভব করে-ছিলেন। এ থেকে তাঁ'দের মনোভাবের সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়।

এও বলা যেতে পারে, শাস্ত্রোক্ত সত্যের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক মিথ্যা শিক্ষা দেওয়ার বিধান হয়েছিল বোধ হয় এই জন্য যে, বিজাতীয় বৈজ্ঞানিক শিক্ষার দ্বারা সাংসারিক অভাব-মোচনের জন্য অর্থ উপার্জ্জনের বিশেষ সুবিধা হয়। কারণ, টুলো পণ্ডিতদের কেবল বেদ-উজ্জ্বলা বুদ্ধি দিয়ে যে একালে অন্নসংস্থানের বিষম গোলযোগ ঘটে, তা' কর্ত্তারা যথেষ্ট হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন।

সে যা'ই হ'ক, এ রকম জাতীয় বিদ্যালয়ের কোন প্রয়োজন ছিল না। কারণ, সরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষা-প্রণালী থেকে এর প্রকৃত পক্ষে যা কিছু পার্থক্য, তা' হচ্ছে, সরকারী বিদ্যালয়ে পাস করলে চাকরী জোটে, ব্যবসায় শিক্ষা করবার জন্য অন্য কলেজে ভর্ত্তি হওয়া যায়, আর অনেক স্থলে বেশ খাতির জমে। অন্ততঃ ইহাই আত্মপ্রসাদ লাভের পক্ষে যথেষ্ট ব'লে লোক মনে ক'রে থাকে। কিন্তু জাতীয় বিদ্যালয়ে উপাধি নাই, বা থাকলেও তা'র দ্বারা বিশেষ কোন চাকরীও জোটে না, খাতিরও জমে না।

তা'র পর তথা-কথিত দাস-মনোভাবের প্রতিষেধক-রূপেও এর প্রয়োজন ছিল না। কারণ, অন্য একটা যে প্রতিষেধক আছে, তা'র কাছে এ কিছুই নয়। সরকারী স্কুলকলেজে ছেলেদের বিজ্ঞান বা পাশ্চাত্য বিদ্যা যা' সত্য ব'লে শিখিয়ে দেয়, বিদ্যালয়ের বাহিরে তা'রা এলেই সেকালের ত্রিকালজ্ঞ ঋষিদের আম্‌মোক্তার ঠাকুরমা'রা এক ধম্‌কিতে তা'দের এই সদ্যোলব্ধ সত্যকে চিরকালের জন্য মিথ্যাতে পরিণত ক'রে দেন। আমাদের দেশের অশি-ক্ষিত, শিক্ষিত, অতি-শিক্ষিত, এমন কি, পাশ্চাত্য দেশের উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত প্রায় সকলেই অল্লাধিক ঠাকুরমাপন্থী। এক কথায় আমাদের দেশের লোকমত আর ঠাকুরমা'র মত একই।

আমাদের দেশের কি শিক্ষিত কি অশিক্ষিত প্রায় সকলেরই এমন স্বভাব যে, যে সত্য নিজে প্রত্যক্ষ করা যায়, নিজ বুদ্ধির দ্বারা উপলব্ধি করা যায়, বা যা' স্বাভাবিক ব'লে সহজে ধারণা হয়, তা'কে সত্যের মর্য্যাদা দিতে তা'দের মন ওঠে না। তা'রা সত্যের মর্য্যাদা দেয় তা'কেই, যা' তাঁদের অবোধ্য, যা' অলৌকিক অস্বাভাবিক ব'লে তাদের মনে হয়, অথবা যা আধ্যাত্মিক ব'লে শাস্ত্রের বা ধর্ম্মের তথা-কথিত গুরু ব্যাখ্যা করেন। কুসংস্কারাচ্ছন্ন অসভ্য জাতির মধ্যে সচরাচর এই ভাবটা বেশী দেখতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশে আগে অশিক্ষিতদের মধ্যে এ রকম মনো-ভাবের আধিক্য দেখা যেত। প্রথম স্বদেশী আন্দোলনের সময় থেকে শিক্ষিতদের মধ্যেই যেন এই স্বভাবটির বাড়া-বাড়ি বেশী দেখা দিয়েছে। বিশেষ ছাত্রমহলে শতকরা ৯৯ জন কিছু না কিছু এই ব্যাধিগ্রস্ত। এ যদি দাসমনো-ভাব না হয়, তবে অগত্যা ইহাকে "ঠাকুরমা'র মনোভাব" (Grandmother's mentality) ব'লে অভিহিত করা

যেতে পারে। দাসমনোভাবের প্রভাব থেকে ছেলেদের রক্ষা করবার জন্য ঐ ঠাকুমা-বিনিন্দিত মনোভাবই ছিল যথেষ্ট, তা'র উপর তথা-কথিত জাতীয় শিক্ষার ব্যাপারটা নেহাৎ অকারণ কষ্ট।

আর একটা কথা এই যে, সরকারী বিদ্যালয়ে পাঠ্যের মধ্যে ইংরাজ জাতির প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস প্রভৃতি ছেলেদের মনে জাগাবার চেষ্টা বিলক্ষণ আছে; এবং এ দেশের প্রতি শ্রদ্ধাহীনতা বাড়াবারও অনেক প্রকার উপায় অবলম্বিত হয়েছে। সে চেষ্টা ব্যর্থ করবার জন্য বিশেষ বেগ পেতে হয় না। কারণ, সহজে বালকরা এ চেষ্টাটা ধ'রে ফেল্‌তে পারে; তাই ইদানীং এ চেষ্টা অনেকটা ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু আমাদের শাস্ত্রের মধ্যে পুরোহিতসম্প্রদায় ও তাঁ'দের সহায় যাঁ'রা, তাঁ'দের প্রতি, অন্ধভক্তি, তাঁ'দের অভিসম্পাতের ভয়, এবং চিরদাসত্বের ভাব জনসাধারণের মনে চিরস্থায়ী করবার চেষ্টা যে কত রকমে করা হয়েছে, তা'র প্রমাণ শাস্ত্রের পাতায় পাতায় বিরাজ করছে। অথচ এই অন্যায় ঘৃণিত চেষ্টার কথা কেহ বুঝেও বুঝে না। বুদ্ধ, চৈতন্য প্রভৃতি শত শত মহাপুরুষের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। এই বিংশ শতাব্দীতেও আমরা এই ব্যাপারটা গৌরবের বিষয় ব'লে মনে কর্‌ছি। তাই পূর্ব্বোল্লিখিত দাসমনোভাবের চেয়ে এই ঠাকুরমা-মনোভাব শতগুণে আত্মার (যদি সেটা থাকে) এবং মনুষ্যত্বের অনিষ্টকারী।

অন্য উন্নত দেশের তুলনায় আমাদের দেশের সরকারী শিক্ষাপ্রণালীর ভিতর ভূরি ভূরি দোষ থাকলেও ইহা যে পরিমাণে ছেলেদের মনকে যুক্তিপরায়ণ ও সত্যদর্শনক্ষম করবার পক্ষে মালমসলা যোগায়, তেমনটি শাস্ত্র ত দূরের কথা, আমাদের দেশের কোন শিক্ষার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না।

এই ঠাকুরমা'র মনোভাব শুধু রাজনীতিক স্বাধীনতা নয়, সকল প্রকার উন্নতিলাভের পক্ষে ঘোর অন্তরায়, সেটা নেতারা না হয় না-ও জান্‌তেন। কিন্তু সেটা যে আমাদের স্বভাবের ঘোর দৌর্ব্বল্য, তা' নিশ্চয় জান্‌তেন। তাই জাতীয় শিক্ষার নামে তাঁ'রা যে শিক্ষা দেওয়ার বিধান দিয়েছিলেন, তা'র সঙ্গে এর ফোড়নেরও ব্যবস্থা করেছিলেন।

যে পাশ্চাত্য শিক্ষার গুণে নেতারা নেতৃত্ব করছিলেন, এখনও কর্‌ছেন, কিংবা যে শিক্ষার অভাবে এঁ'দের নেতৃত্ব করা অসম্ভব হ'ত, যাঁ'দের নেতা হয়েছেন, তাঁ'দের পক্ষে সেই শিক্ষা যাতে ব্যর্থ হয়, তথা-কথিত জাতীয় শিক্ষার দ্বারা তা'র পথ পরিষ্কারের চেষ্টা হয়েছিল।

সে যা-ই হ'ক, জাতীয় শিক্ষাকে সার্থক করতে হ'লে যা' করা নিতান্ত উচিত ছিল, তা'র ধার দিয়েও কর্ত্তারা যান নি। দেশীয় ভাষায় সমস্ত বিষয় শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা জাতীয় শিক্ষাপরিষদের প্রধানতম কর্ত্তব্য ছিল। চাঁদার দ্বারা প্রাপ্ত লক্ষ লক্ষ টাকার কতক অংশ দিয়ে আমাদের জাতীয় উন্নতিবিধায়ক বিদেশীয় ভাষায় লিখিত যাবতীয় বিশেষ বিশেষ পুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করতে পার্‌লেও একটা কাযের মত কায হ'ত। দেশের ভাবী উন্নতির জন্য বর্ত্তমানে বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচন করতে হ'লে তা সুদূর অতীত হ'তে অনুসৃত ধর্ম্ম, শাস্ত্র, লোকাচার, কিংবা সম্প্রদায়বিশেষের সংস্কার-বিরুদ্ধ হ'বেই। কারণ, আমাদের অতীতের পরিণামই বর্ত্তমানের এই শোচনীয় অবস্থা। এই অবস্থা হ'তে উদ্ধার হ'তে হ'লে অতীতের প্রভাব থেকেও আগে উদ্ধার হওয়া চাই-ই। সে স্থলে লোকমতের আমূল সংস্কারজন্য বিদ্যালয়ে লব্ধ সত্যকেই দৃঢ়ভাবে ছেলেরা যা'তে গ্রহণ করে ও তা'কে সাধারণে নির্ম্মমভাবে প্রচার করে, তা'র বিধান সুদৃঢ় করা উচিত ছিল। তা' হ'লেই এ রকম শিক্ষাকে জাতীয় শিক্ষা বলা যেতে পার্‌ত।

এই সময় আর একটি মহৎ অনুষ্ঠান আরব্ধ হয়েছিল। বিদেশে শিল্পবাণিজ্য প্রভৃতি জাতিগঠনমূলক শিক্ষা লাভের জন্য বিস্তর বাঙ্গালী ছাত্রকে অর্থসাহায্য দিয়ে য়ুরোপ, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি স্থানে পাঠান হয়েছিল। এই উদ্দেশ্যে দেশীয় লোকের নিকট বিস্তর দান সংগ্রহ করা হয়েছিল। দেশবাসীকে জাতীয়তার পথে অগ্রসর কর্‌বার ইহা একটি অমোঘ উপায়। কিন্তু তা' হ'লে কি হয়, আমরা কিছুই অন্যের কাছে শিখতে ত' পারি না, ঠিকমত অনুকরণ করবার শক্তিও আমাদের নাই, অথচ পারি কেবল অনুকরণ কর্‌তে গিয়ে কায ভণ্ডুল কর্‌তে।

বিদেশে শিক্ষার জন্য হাজার হাজার ছেলে পাঠিয়ে তবে জাপান শক্তিশালী হ'তে পেরেছে ব'লে আমাদের নেতারা ব্যবস্থা দিলেন, "তবে দাও আমাদের দেশের

জনকয়েক ছেলেকে বিদেশে পাঠিয়ে।” কিন্তু যে বিষয় তা'রা শিখতে যাচ্ছিল, সে বিষয় শেখবার শক্তি তা'দের ছিল কি না, তা' প্রায় দেখা হ'ত না। দেখা হ'ত কা'র সুপারিশ-জোর কত।

জাপানের কিন্তু বিদেশে ছেলে পাঠাবার একটা ধারা ছিল। সেখানে যে ছাত্র যে বিষয় বিদেশে শিখতে যাওয়ার উপযুক্ত ব'লে তা'র কায দেখিয়ে নির্ব্বাচিত হ'ত, তা'কে সেই বিষয় দেশে বিদেশী শিক্ষকের সাহায্যে, নিজে সে বিষয়ে সে কতদূর কি ক'রতে পারে, তা বিশেষভাবে চেষ্টা করবার সব রকম সুবিধা দেওয়া হ'ত। এই প্রকার বহু ছাত্রের মধ্যে যা'দের চেষ্টা সম্যক্ সফল হ'ত, তাদেরই বিদেশে পাঠান হ'ত। বিদেশে তা'দের সাহায্য করবার ও তা'দের কাযের তত্ত্বাবধান করবার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত ছিল। সেখানে আশানুরূপ শিক্ষালাভের পর শত শত ছেলে জাপানে ফিরে এসে জাপানকে সর্ব্ববিষয়ে এত শক্তিশালী করতে পেরেছিল।

আর আমাদের দেশ থেকে যা'দের বিদেশে কোন বিষয় শিখ্‌তে পাঠান হ'ত, তা'রা বিদেশে যাওয়ার আগে সে বিষয় প্রায় কিছুই জানত না; কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী দেখিয়ে আর অধিকাংশ স্থলে সুপারিশের জোরেই নির্ব্বাচিত হ'ত। যে বিষয় শেখবার জন্য তা'দের পাঠান হ'ত, তা'র চেয়ে পরের টাকায় বিলাত দেখা আর সাহেবিয়ানা শেখাটাই ছিল তা'দের অধিক বাঞ্ছনীয়। বিদেশে তা'দের বিশেষভাবে সাহায্য এবং তত্ত্বাবধান করবার জন্য বিশেষ কোন বন্দোবস্ত ছিল না। তা'দের সফলতার উপর দেশের মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করছে, এ কথা খুব কম ছাত্রই জান্‌ত। কাযেই তা'দের দায়িত্ববোধের তেমন দৃঢ়তা বা ঐকান্তিকতা ছিল না। তা'দের দেশাত্মবোধ ছিল সখের। এই সব কারণে যতগুলি ছেলেকে বিজ্ঞানসমিতির সাহায্যে বিদেশে পাঠান হয়েছিল, তা'র মধ্যে কেহ দেশে ফিরে এসে উল্লেখযোগ্য বিশেষ কোন কায করতে পেরেছিল ব'লে বোধ হয় কেহ জানে না। তা'দের মধ্যে অনেকেই বিদেশের দু'একটা কারখানা বাহির থেকে দেখে, বিদেশের বড় বড় পুস্তকালয়ে সে বিষয়ের বড় বড় বইএর দু'এক পাতা প'ড়ে, আর ক্যাটালগে নানা প্রকার নাম আর তা'র গুণাগুণ সম্বন্ধে কতকগুলি শব্দ মুখস্থ ক'রে দেশে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছিল; তা'দের অধিকাংশের মন এমন ঠাকুরমাভাবাপন্ন ছিল যে, স্বাধীনতার লীলাভূমিতে থেকেও স্বাধীনতারূপ আলোর জ্যোতি তা'রা চোখে সইতে পারত না। আর কিছু না হ'ক, তা'রা যদি সে দেশ থেকে একটুও স্বাধীনতার ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে আসতে পারত, তা' হ'লে তা'দের সংসর্গে এসে এ দেশের কোন না কোন লোক একটু স্বাধীনতার পক্ষপাতী হ'তে পারত; তা' হ'লে সাধারণের প্রদত্ত বিপুল অর্থের ব্যয় কিছুমাত্রও সার্থক হয়েছে ব'লে আমরা ধন্য হ'তে পারতাম।

আর যা হ'ক বা না হ'ক, স্বদেশী আন্দোলনে সব চেয়ে বড় কায হয়েছিল এই যে, স্বদেশী আন্দোলনের আগে এ দেশের লোক রাজনীতির হিসাবে সাধারণতঃ দু'ভাগে বিভক্ত ছিল,—এক দল যাঁ'রা রাজনীতির কোন ধার ধারতেন না; তাঁ'দের মধ্যে কতক শিক্ষিত আর বাকী সবই অশিক্ষিত জনসাধারণ। আর এক দল ছিলেন, তাঁ'রা সংখ্যায় প্রথম দলের তুলনায় নিতান্ত নগণ্য। রাজনীতিক আন্দোলন করা তাঁ'দেরই ছিল কায। স্বদেশী আন্দোলনের সময় শেষোক্ত দল দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে মডারেট্ অর্থাৎ মধ্যপন্থী আর একৃষ্ট্রিমিষ্ট অর্থাৎ চরমপন্থী নামে অভিহিত হলেন।

আবেদননিবেদন দ্বারা ভাঙ্গা বাঙ্গালা যখন যোড়া লাগল না, তখন আবেদননিবেদন নীতির উপর যাঁ'দের বিশ্বাস আর থাক্‌ল না, তাঁ'রা চরমপন্থী নামে অভিহিত হলেন; আর যাঁ'রা তখনও আবেদন-নিবেদনের উপর ভর ক'রে রইলেন, তাঁ'রা হলেন মডারেট্।

লোকমতের যাঁ'রা ধামাধরা, তাঁ'রা লোকমতের এ রকম পরিবর্ত্তন অনুসারে চরমপন্থী হ'তে বাধ্য হলেন। তা' ছাড়া যে কতকগুলি শিক্ষিত লোক এ কাল পর্য্যন্ত রাজনীতি নিয়ে নাড়াচাড়া করতেন না, তাঁ'রাও এই আন্দোলনের বেগে টানা হয়ে চরমপন্থীর দলে মিশলেন। তখনকার চরমপন্থীদের পলিসি হয়ে দাঁড়াল—আবেদন-নিবেদন দ্বারা ইংরাজরাজের কাছে যখন কিছু আদায় করা অসম্ভব, তখন ইংরাজরাজের আঁতে ঘা দিতে হবে। অর্থাৎ কি না তা'দের ব্যবসা-বাণিজ্যে ব্যাঘাত দিয়েই আমাদের কিছু কিছু অধিকার আদায় করতে হ'বে। এঁ'দের লক্ষ্যের দৌড় ছিল মাত্র কিছু অধিকার আদায় করা।

এই চরমপন্থীদের ভিতর থেকে বৈপ্লবিক গুপ্ত-সমিতির চেষ্টায় আর একটি ক্ষুদ্র দল বেড়ে উঠতে লাগল। এই তৃতীয় দলের নাম বিপ্লবপন্থী, অর্থাৎ ভারতীয় বর্ত্তমান শাসন-প্রণালীর উচ্ছেদপ্রয়াসী। এঁদের অধিকাংশই গুপ্ত-সমিতির কোন ধার ধারতেন না। আর অনেকে ধার ধারতে চাইতেন না। অনেকে আবার বাহিরে মডারেট্ বা এক্‌ষ্ট্রিমিষ্ট আর ভিতরে বিপ্লবপন্থী ছিলেন। কিন্তু গুপ্ত-সমিতির লক্ষ্যের সঙ্গে এঁদের লক্ষ্যের বিশেষ কিছু তফাৎ ছিল না। অর্থাৎ ইংরাজকে এ দেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়ে দেশীয় কোন বিশেষ লোকের হাতে এ দেশের শাসনভার তুলে দেওয়াই ছিল উভয়ের লক্ষ্য।

জনকতক খুব শক্তিশালী সেকেলে নেতা এই দলে যোগ দিয়েছিলেন। দেশের জনসাধারণের মধ্যে মত-দ্বন্দ্বিতার ফলে ছোট বড় বিস্তর বক্তা ও লেখকের আবির্ভাব হয়েছিল। তাঁ'দের বক্তৃতা ও লেখার চোটে দেশের আপামর সাধারণ স্বদেশী কথাটির মানে না বুঝেই স্বদেশী হওয়ার জন্য সাড়া দিয়েছিল। বিদেশীকে দোষ দেওয়া, করকচ নুণ আর ময়লা চিনি খাওয়া, তাঁতের বা দেশী মিলের কাপড় পরা এবং এই রকম আরও কিছু করাকে তাঁ'রা স্বদেশী হওয়া ব'লে বুঝেছিলেন।

এই তথা-কথিত স্বদেশী ভাবটা কেবল হিন্দুদের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। মুসলমানগণ সরকারের পক্ষ নিয়েছিলেন, আর অনেক স্থলে স্বদেশী আন্দোলনের বিরুদ্ধতাচরণও করেছিলেন। কাযেই মুসলমানবিদ্বেষ হিন্দুদের মধ্যে আরও বেড়ে উঠেছিল। এ দেখেও হিন্দু-মুসলমান-সমস্যার প্রতি নেতাদের চিন্তা আকৃষ্ট হয় নি। তখন ইহার সমাধানের চেষ্টা ত অনেক দূরের কথা ছিল, বরং ক্রমে এই সমস্ত আন্দোলনটা এ দেশে হিন্দুয়ানীর প্রাধান্য-বিস্তারের আন্দোলনে পরিণত হ'তে যাচ্ছিল। মুসলমান-গণও এর প্রতিবাদস্বরূপ হিন্দুর ধর্ম্মানুষ্ঠান প্রভৃতির উপর অত্যাচার সুরু করেছিলেন।

বিপ্লববাদের কায আরম্ভ হবার ঠিক আগে দেশের এই রকম অবস্থা দাঁড়িয়েছিল।

[ক্রমশঃ।

শ্রীহেমচন্দ্র কানুনগোই।

উদ্ভট-সাগর

যে সকল মহাপুরুষ মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগিনী প্রভৃতিকে পরিত্যাগ করিয়া আজীবন শ্বশুরালয়েই দিনপাত করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে আমরা "ঘর-জামাই" বলিয়া থাকি। এই সকল "ঘর-জামাই"দিগের প্রতি তীব্র কটাক্ষপাত করিয়া কোনও স্ত্রী-কবি লিখিয়াছেন :—

শ্বশুরগৃহনিবাসঃ স্বর্গবাসো ধরায়াং
যদি নিবসতি কশ্চিৎ পঞ্চষড়্ বাসরাণি।
তদধিকমপি তিষ্ঠেদ্ দুগ্ধলুব্ধো বিড়াল-
স্তদধিকমপি তিষ্ঠেৎ পাদুকাপুণ্যঘাতঃ॥
(বিকটনিতম্বায়াঃ)

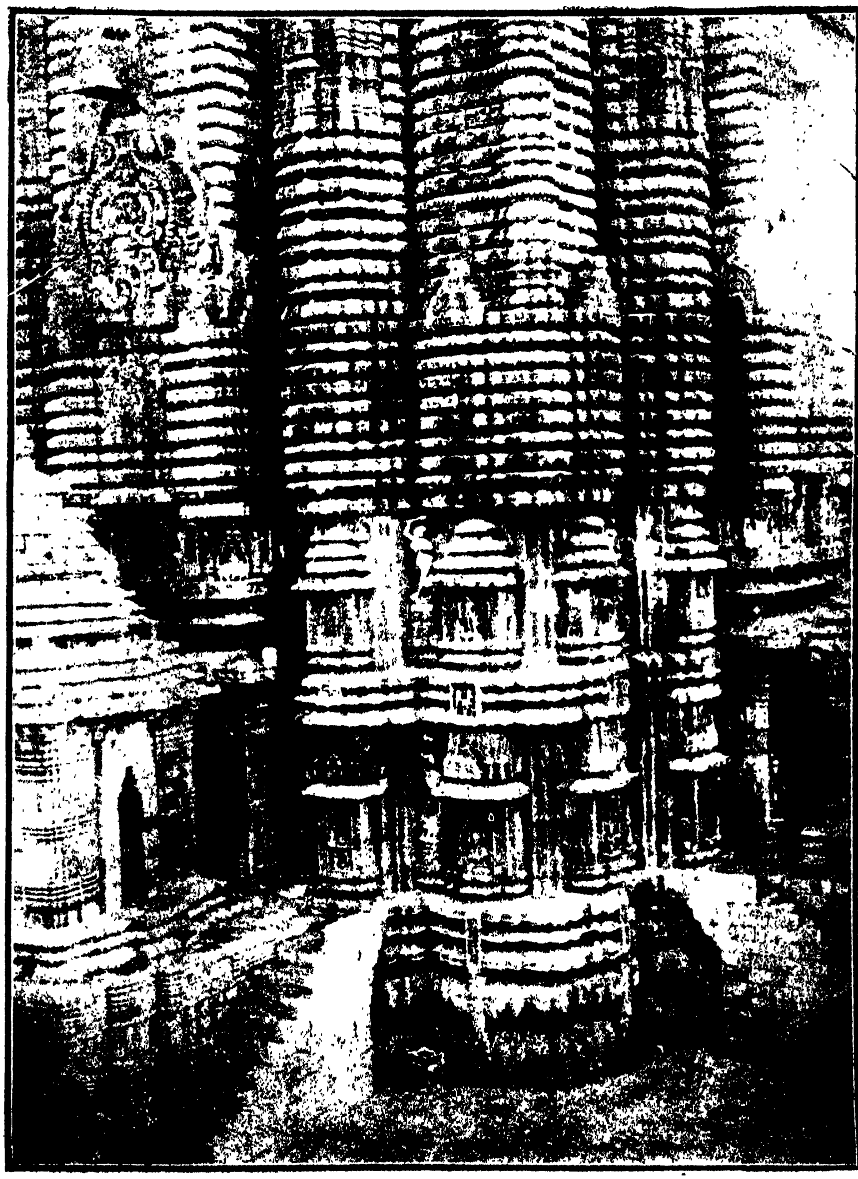
পাঁচ ছয় দিন মাত্র শ্বশুরের ঘরে
যে পুরুষ রয়, তার স্বর্গ এ সংসারে।
তারো বেশী দিন যদি করে অবস্থিতি,
দুগ্ধলুব্ধ বিড়ালের সমান দুর্গতি।
তারো বেশী থাকে যদি সেই স্ত্রী-লম্পট,
তার ভাগ্যে রহে শেষে পুণ্য পটাপট্।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে, উদ্ভট-সাগর।

মূর্ত্তি ও মন্দির

১

ঋগ্বেদ-সংহিতা লইয়া ভারতবর্ষের সভ্যতার ইতিহাসের আরম্ভ। ইন্দ্রাদি দেবতার উদ্দেশ্যে যজ্ঞাগ্নিতে আহুতির সঙ্গে সঙ্গে আবৃত্তির জন্য ঋগ্বেদের মন্ত্র রচিত হইয়াছিল। যজ্ঞানুষ্ঠানে মূর্ত্তির কোন স্থান নাই, কিন্তু মন্দিরের স্থানে অগ্নি-গৃহের প্রয়োজন ছিল। বৈদিক যুগে সকল শ্রেণীর লোকই যে যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেন, এমন কোন প্রমাণ নাই। যজ্ঞে অনধিকারী কোন কোন জাতির মধ্যে তখন মূর্ত্তি-পূজা প্রচলিত থাকাও সম্ভব। কিন্তু বৈদিক যুগের মূর্ত্তি-পূজাসম্বন্ধীয় কোন নিদর্শন বস্তু এখনও আমাদের হস্তগত হয় নাই। সুতরাং বৈদিক যুগের ভাস্কর্য্য সম্বন্ধে কোন কথা বলা যায় না। অবশ্যই অনেক বেদমন্ত্রে অনেক বৈদিক দেবতার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বর্ণনা আছে। কিন্তু নিদর্শন বস্তু ব্যতীত শিল্পের বিচার হইতে পারে না।



লিঙ্গরাজমন্দির—ভুবনেশ্বর

বৈদিক যুগের শেষভাগ, উপনিষদের সময় হইতে হিন্দুর ধর্ম্ম-জীবনে দুইটি আপাত-বিরোধী লক্ষণ প্রকাশ পাইতে আরম্ভ হয়; একটি লক্ষণ উন্নতিশীলতা, আর একটি লক্ষণ রক্ষণশীলতা। বেদের সংহিতা এবং ব্রাহ্মণ ভাগে স্বর্গকামনায় যজ্ঞানুষ্ঠানের এবং তপশ্চরণের বিধান আছে। উপনিষদে স্বর্গকামনায় কর্ম্মানুষ্ঠানের পরিবর্ত্তে পুনঃ পুনঃ



নটরাজ, খিচিং—ময়ূরভঞ্জ

ভিত্তি এবং বৌদ্ধধর্ম্মের লক্ষ্যও জন্ম-মরণের হস্ত হইতে মুক্তি। কিন্তু গৌতম বুদ্ধ জীবাত্মা ও পরমাত্মার (ব্রহ্মের) অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন পরিষ্কার মত প্রকাশ করেন নাই, পক্ষান্তরে, আত্মা আছে কি না ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা একেবারে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। বুদ্ধের উপদেশের সারকথা, অষ্টাঙ্গ সুনীতি মার্গ অনুসরণ করিলে নির্ব্বাণমুক্তি লাভ হয়। সুতরাং বৌদ্ধধর্ম্মকে নিরীশ্বর সুনীতি পথ বলা যাইতে পারে। কিন্তু এরূপ আদর্শ সত্ত্বেও, উপনিষদের ধর্ম্ম যেমন কর্ম্মের সংস্রব ত্যাগ করিতে পারে নাই, তেমনই প্রথমাবধি বৌদ্ধধর্ম্ম ও জড়োপাসনার সংসর্গ ত্যাগ করিতে পারে নাই। প্রাচীন বৌদ্ধ আগমে দেখা যায়, গৌতম বুদ্ধ প্রথমতঃ যে দেশে ধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, সেই মগধে এবং বিদেহে তৎকালে জনসাধারণের মধ্যে বৈদিক যাগযজ্ঞানুষ্ঠানের প্রাধান্য ছিল না; তখন প্রাধান্য ছিল কোন মৃত মহাপুরুষের চিতাভস্মের উপর প্রতিষ্ঠিত স্তূপের এবং যক্ষ বা যক্ষীর আবাস চৈত্য-বৃক্ষের উপাসনার। যখন বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্ব্বাণের সময় নিকটবর্ত্তী হইয়াছিল, তখন আনন্দ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—

জন্মমরণের হস্ত হইতে মুক্তি পাইবার জন্য ব্রহ্ম বা আত্ম-জ্ঞানসাধন বিহিত হইয়াছে। উপনিষদে স্বর্গকামনা নিষিদ্ধ হইলেও যাগযজ্ঞ একেবারে নিষিদ্ধ হয় নাই; চিত্তশুদ্ধির জন্য যজ্ঞানুষ্ঠানের ব্যবস্থা আছে। এই প্রকার ব্যবস্থা হিন্দুর উন্নতিশীলতার সঙ্গে স্বভাবসিদ্ধ রক্ষণশীলতার পরিচয় প্রদান করে।

উপনিষদের পর প্রাচ্য ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয় হইয়াছিল। উপনিষদের কর্ম্ম ও জন্মান্তরবাদ বৌদ্ধধর্ম্মের

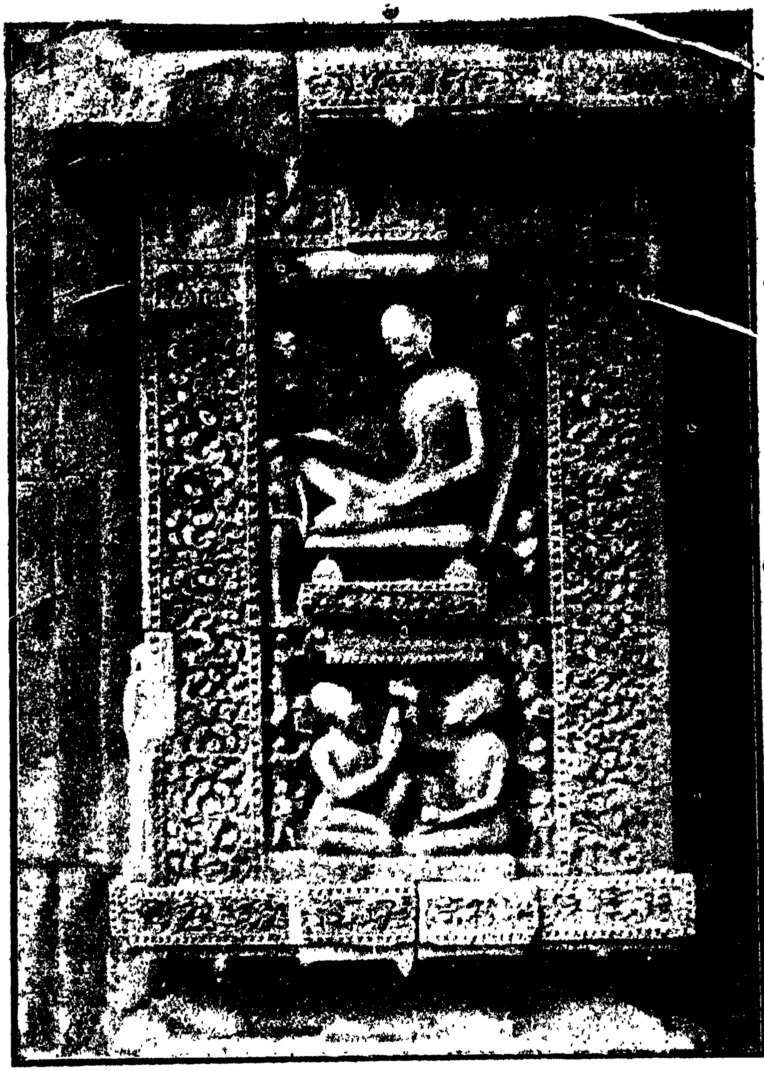
"প্রভো (ভদন্তে)! আমরা তথা-গতের মৃতদেহের কিরূপ সৎকার করিব?"

বুদ্ধ উত্তর করিলেন—

"হে আনন্দ, তথাগতের শরীরপূজা করিয়া নিজের মোক্ষের বাধা উপস্থিত করিও না। নিজের মোক্ষের চেষ্টায় তুমি আত্মনিয়োগ কর। তথাগতের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ অনেক ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ এবং গৃহস্থ আছেন, যাঁহারা তথা-গতের শরীর পূজা করিবেন।"

এখানে বুদ্ধদেব ভিক্ষুর পক্ষে শরীরপূজা নিষেধ

করিয়াছেন, শরীরপূজাকে মোক্ষের অন্তরায়স্বরূপ বলিয়াছেন, কিন্তু গৃহস্থরা যে শরীরপূজা করিবে, এ বিষয়ে তাঁহার কোন সন্দেহ ছিল না, এবং এ বিষয়ে যে বিধি-নিষেধের অবকাশ আছে, তাহাও তিনি মনে করেন নাই। অবশ্যই আনন্দ বুদ্ধের নিষেধবাক্য শুনিয়া ক্ষান্ত হইলেন না, বুদ্ধের দ্বারা ব্যবস্থা করাইয়া লইলেন। চক্রবর্ত্তী রাজার শরীরের ভস্মাবশেষের উপর স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়া লোক যেমন তাহার পূজা করিয়া থাকে, বুদ্ধের দেহের ভস্মাবশেষের উপর স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়া তেমনই করিতে হইবে। চৈত্যবৃক্ষের পূজা সম্বন্ধে মহাপরিনির্ব্বাণ সূত্রে এবং অন্যত্র বৈশালীর লিচ্ছবীগণকে বুদ্ধ উপদেশ দিয়াছেন, তোমরা যদি স্বজাতির মঙ্গলকামনা কর, তবে অন্যান্য সৎকর্ম্মের মধ্যে বৈশালীর উপকণ্ঠস্থিত চৈত্যবৃক্ষগুলিকে যথাবিধি পূজা করিও। মহাপরিনির্ব্বাণ সূত্রে বা অন্য সূত্রে বুদ্ধের বচন ঠিক বিনিবদ্ধ হইয়াছে কি না, এ বিষয়ে সংশয় হইতে পারে, কিন্তু শাক্যপুত্রীয় শ্রমণরা যে বুদ্ধের মহাপরিনির্ব্বাণের অনতিকাল পরেই স্তূপপূজা এবং বোধিবৃক্ষরূপে চৈত্যবৃক্ষের পূজার আরম্ভ করিয়াছিলেন, ভারহুতের এবং সাঁচীর স্তূপের বেদিকার (বেড়ার) লিপিমালা তাহার সাক্ষ্যদান করিতেছে। এই লিপিমালা পাঠে জানা যায়, যাঁহারা চাঁদা তুলিয়া এই সকল বেড়া নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী।



লিঙ্গরাজমন্দির,—ভুবনেশ্বর

বুদ্ধদেব শরীর বা চৈত্যপূজা নিষেধ করিয়া না থাকিলেও প্রতিমার সংস্রব ত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন, এবং সেই উপদেশ যে অনেক দিন পর্য্যন্ত কতক পরিমাণে প্রতিপালিত হইয়াছিল, তাহারও প্রমাণের অভাব নাই। পালি বিনয়পিটকের অন্তর্গত চুল্লবগ্‌গে (ক্ষুদ্রবর্গে) কথিত হইয়াছে, এক সময় বুদ্ধ রাজগৃহ নগরে বেণুবনে বাস করিতেছিলেন এবং ভিক্ষুগণের বাসের জন্য বিহার নির্ম্মিত হইতেছিল। "তখন অনাচারপরায়ণ ষট্‌বর্গীয় ভিক্ষুগণ স্ত্রী-পুরুষের প্রতিভান চিত্র (প্রতিকৃতি) অঙ্কিত করিয়া বিহারের দেওয়াল ভূষিত করিতে লাগিলেন। এই ব্যাপার দেখিতে পাইয়া লোক বলাবলি করিতে লাগিল, "এ যে ভোগসুখরত গৃহীর মত আচরণ!" বুদ্ধ শুনিতে পাইয়া স্ত্রী-পুরুষের চিত্র অঙ্কন নিষেধ করিয়া দিলেন, এবং বিহারের শোভার জন্য মালা, লতা প্রভৃতি অঙ্কিত করিবার অনুমতি

দিলেন। বিনয়পিটকের সুত্তবিভঙ্গে আছে (ভিক্ষুণী বিভঙ্গ, ৪১ পাচিত্তিয়) এক সময় বুদ্ধ যখন শ্রাবস্তীনগরে জেতবনে বাস করিতেছিলেন, তখন কোশলরাজ প্রসেনজিতের উদ্যানের চিত্রাগারে অনেক মনুষ্যচিত্র (প্রতিভান চিত্র) প্রদর্শিত হইতেছিল, এবং অনেক লোক তাহা দেখিতে যাইতেছিল। এই জনপ্রবাহের সঙ্গে ষট্‌বর্গীয়া ভিক্ষুণীরাও দেখিতে গিয়াছিলেন। অমনই লোক নিন্দা করিতে আরম্ভ করিল। শুনিতে পাইয়া বুদ্ধদেব ভিক্ষুণীমাত্রকেই চিত্রাগার দেখিতে যাইতে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব যখন মনুষ্যচিত্র দর্শন বা অঙ্কন নিষেধ করিয়াছিলেন, তখন তিনি যে মনুষ্যাকারে গঠিত প্রতিমা-পূজাও নিষেধ করিয়াছিলেন, এ কথা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

২

স্তূপের এবং বোধিবৃক্ষের পূজা প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম্মের মলিনতার চিহ্নস্বরূপ মনে হইলেও এই সম্পর্কেই প্রাচীন ভারতে কমনীয় শিল্প অভ্যুদিত হইবার অবকাশ পাইয়াছিল। মৌর্য্যসম্রাট অশোকের সময়ের ভাস্কর্য্য-নিদর্শনের মধ্যে অনুশাসনসংবলিত স্তম্ভের শীর্ষ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সকল স্তম্ভের সঙ্গে উপাসনার কোনও সম্পর্ক ছিল কি না বলা যায় না। প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতবর্ষে ভাস্কর্য্য-কলার ধারাবাহিক ইতিহাসের সূত্রপাত হয় খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দে শুঙ্গ বংশের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে, এবং এই শুঙ্গ-শিল্প বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছিল খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দের মধ্যভাগে মধ্যভারতে। শারনাথ, পাটলিপুত্র এবং বিদিশার ভগ্নাবশেষের মধ্যে শুঙ্গশিল্পের কিছু কিছু নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু এই যুগের প্রধান কীর্ত্তি, ভারহুত স্তূপের বেদিকা ও তোরণ, সাঁচীর প্রাচীন স্তূপত্রয়ের বেদিকা ও তোরণ, বোধগয়ার প্রাচীন বেদিকা এবং উড়িষ্যার উদয়গিরির গুহামন্দিরনিচয়ের কারুকার্য্য। এই সকল বেদিকার এবং তোরণের গাত্রে প্রাসাদ ও কুটীর বা কূটাগার অঙ্কিত দেখিয়া মনে হয় যে, প্রাচীনকালের কুটীরই আর্য্যাবর্ত্তের মধ্যযুগের বঙ্কিম শিখরসম্পন্ন মন্দিরের মূল আদর্শ। শুঙ্গযুগের এই সকল বৌদ্ধ বেদিকার এবং তোরণের গাত্রে উৎকীর্ণ ভাস্কর্য্যের মধ্যে বুদ্ধের এবং বৌদ্ধ ভিক্ষুর চিত্র অঙ্কিত হয় নাই। উপাস্য বস্তুর মধ্যে দেবদেবীর প্রতিমা নাই, আছে স্তূপ, চৈত্যবৃক্ষ, বোধিবৃক্ষ এবং নানা প্রকার চিহ্নযুক্ত বেদি। কিন্তু দেবদেবীর যে সকল মূর্ত্তি উৎকীর্ণ হইয়াছে, তাহা উপাস্যরূপে অঙ্কিত হয় নাই, বুদ্ধের উপাসকরূপে অঙ্কিত হইয়াছে। সুতরাং শুঙ্গযুগের ভাস্কর্য্য পরীক্ষা করিলে দুইটি সিদ্ধান্ত মনে উদিত হয়। প্রথম, তৎকালে প্রতিমানির্ম্মাণরীতি প্রচলিত থাকিলেও প্রতিমা-পূজারীতি, বোধ হয়, বিশেষ প্রচলিত ছিল না; প্রতিমার পরিবর্ত্তে দেবদেবীর আশ্রয়বৃক্ষ বা সাঙ্কেতিক চিহ্ন এবং মহাপুরুষের শরীরাবশেষ পূজিত হইত।

দ্বিতীয়, ব্রহ্মা, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতার পৌরাণিক লক্ষণ সকল তখনও পরিকল্পিত হয় নাই। প্রাচীন বৌদ্ধ ত্রিপিটকে নানাশ্রেণীর দেবতার বিবরণ আছে। তন্মধ্যে বেদের ইন্দ্রাদি দেবতা ত্রয়স্ত্রিংশ নামে স্থান লাভ করিয়াছে। শুঙ্গযুগের ভাস্কর্য্যে এই সকল দেবতা মনুষ্যাকৃতি, একটি মস্তক এবং দুইটি হস্তবিশিষ্ট, এবং পুরাণোক্ত বাহনের চিহ্নবিহীন। বৈদিক এবং পৌরাণিক দেবতার মধ্যে ব্রহ্মা এবং ইন্দ্রের মূর্ত্তি বৌদ্ধ ভাস্কর্য্যে পুনঃপুনঃ অঙ্কিত হইয়াছে। ইন্দ্রের বাহন ঐরাবত প্রথম দেখা যায় শক-কুষাণ যুগের মথুরার একখানি বৌদ্ধ-চিত্র-ফলকে, এবং ব্রহ্মার চতুর্ম্মুখাদি পৌরাণিক লক্ষণ অঙ্কিত হইয়াছে মধ্যযুগের বৌদ্ধ-ভাস্কর্য্যে। পৌরাণিক লক্ষণাক্রান্ত মূর্ত্তির মধ্যে শুঙ্গভাস্কর্য্যে একমাত্র দেখা যায় শ্রীমূর্ত্তি। শ্রী "পদ্মস্থা পদ্মহস্তা চ গজোৎক্ষিপ্তঘটপ্লুতা" আকারে শুঙ্গযুগের বেদিকায় এবং তোরণে পুনঃপুনঃ অঙ্কিত হইয়াছে। ফুশে বলেন, এই মূর্ত্তি এখনও শ্রীমূর্ত্তি বলিয়া গণ্য হইতে পারে না, ইহা খুব সম্ভব গৌতম বুদ্ধের জন্মের সাঙ্কেতিক চিত্র। ফুশের সিদ্ধান্ত স্বীকার করা কঠিন। কিন্তু শুঙ্গযুগের শ্রীর মূর্ত্তিতে পৌরাণিক লক্ষণ থাকা সত্ত্বেও ব্রহ্মা, ইন্দ্র প্রভৃতি অন্যান্য দেবতার প্রতিমায় পৌরাণিক লক্ষণের অভাব প্রমাণ করে। শুঙ্গযুগে এই সকল প্রধান দেবতার মূর্ত্তিকল্পনায় পৌরাণিক লক্ষণ প্রবেশ লাভ করে নাই। শুঙ্গরাজগণের সমসময়ের পঞ্চালের এক জন রাজা অগ্নিমিত্রের মুদ্রার অগ্নিমূর্ত্তি এই কথার সাক্ষ্য দান করে। অগ্নিমিত্রের মুদ্রায় অগ্নির মূর্ত্তির পার্শ্বে অগ্নির পৌরাণিক বাহনের কোন চিহ্ন নাই, এবং স্কন্ধের উপর মস্তকের স্থানে প্রজ্বলিত হুতাশন শিখা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে।

শুঙ্গযুগের বৌদ্ধভাস্কর্য্যে দেবদেবীর মূর্ত্তি উপাস্য দেবতার আকারে গঠিত হয় নাই; এই সকল মূর্ত্তিতে দেবভাবের কোন চিহ্ন লক্ষিত হয় না। এই সকল মূর্ত্তি মনুষ্যাকৃতি এবং মানুষভাবপূর্ণ। শুঙ্গশিল্পীর অঙ্কিত মনুষ্যাকৃতি স্বভাবসঙ্গত নহে। শিল্পের উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্যসৃষ্টি। বস্তুর রসোদ্দীপনী শক্তির নাম সৌন্দর্য্য। মনুষ্যের আকৃতি স্বভাবতঃ সুন্দর। শুঙ্গশিল্পিগণের মনুষ্যাকৃতির স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের সম্বন্ধে ঔদাসীন্য দোষের বিষয় বিবেচিত হইতে পারে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে এইরূপ দোষারোপ সঙ্গত নহে। স্বভাবতঃ যাহা সুন্দর, তাহার অবিকৃত প্রতিকৃতি অবশ্য সুন্দর হইবে। কিন্তু এরূপ নকল সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি যদি শিল্পের উদ্দেশ্য হয়, তবে শিল্প না থাকিলেও কোন ক্ষতি নাই; কেন না, মূল বস্তু দেখিয়া সেই সৌন্দর্য্য উপভোগ করা যাইতে পারে। স্বাভাবিক পদার্থে যে সৌন্দর্য্য বা রসোদ্দীপনী শক্তি অনুভূত হয় না, সেই ভাবরসের অবতারণার জন্য শিল্পের সৃষ্টি। বাহন ভিন্ন এ ভাবরসের অবতারণা অসম্ভব। সঙ্গীতে এই ভাবরসের বাহন সুর, কাব্যে এই ভাবরসের বাহন শব্দ, স্থাপত্যে এই ভাবরসের বাহন গৃহ এবং চিত্রে ও ভাস্কর্য্যে এই ভাবরসের বাহন স্বাভাবিক আকৃতি। কিন্তু কোথায় সেই বাহন স্বভাবের অবিকল নকল হইবে, আর কোথায় তাহা ইঙ্গিতমাত্র প্রদর্শিত হইবে, উদ্দেশ্যের হিসাবে এই বিচার করিবেন শিল্পী। যদি বাহনকে অবিকল স্বভাব-সঙ্গত না করিলে রসোদ্দীপনের ব্যাঘাত না হয়, তবে শিল্পী তাহা স্বভাবসঙ্গত স্বীকার করিবার পরিশ্রম স্বীকার না করিয়াও পারেন। যে উদ্দেশ্য লইয়া শিল্পী ভারহুতের বেদিকা এবং সাঁচীর তোরণ বৌদ্ধ আখ্যায়িকার চিত্রের দ্বারা অলঙ্কৃত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, "জাতকমালা"কার আর্য্যশূর তাহা এই দুইটি শ্লোকে অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন,—

"শ্রীমন্তি সদ্‌গুণপরিগ্রহমঙ্গলানি
　　কীর্ত্ত্যাস্পদান্যনবগীতমনোহরাণি।
পূর্ব্বপ্রজন্মসু মুনেশ্চরিতাদ্ভুতানি
　　ভক্ত্যা স্বকাব্যকুসুমাঞ্জলিনার্চ্চয়িষ্যে।
শ্লাঘ্যৈরমীভিরভিলক্ষিতচিহ্নভূতৈ-
　　রাদেশিতে ভবতি যৎ সুগতত্বমার্গঃ।
স্যাদেব রূক্ষমনসামপি চ প্রসাদো
　　ধর্ম্ম্যাঃ কথাশ্চ রমণীয়তরত্বমীযুঃ॥"

"শ্রীসম্পন্ন, সদ্‌গুণময়, মঙ্গলময়, প্রশংসার্হ, অনিন্দ্য মনোহর শাক্যমুনির পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের চরিতকথানিচয় ভক্তিসহকারে স্বরচিত কাব্যকুসুমাঞ্জলির দ্বারা অর্চ্চনা করিব।"

"এই সকল কীর্ত্তিকলাপ বুদ্ধত্বলাভের পথের চিহ্নস্বরূপ; (এই সকল কীর্ত্তিকথার দ্বারা) সেই পথ উপদিষ্ট হইল। (এই কাব্য) কঠিনহৃদয় ব্যক্তিদিগকেও প্রসন্ন করিতে পারে। (ইহা) ধর্ম্মবিষয়ক আখ্যায়িকানিচয়ের রমণীয়তা সম্পাদন করিতে পারে।"

যে সকল শিল্পী ভারহুতের বেদিকায় এবং সাঁচীর তোরণে বুদ্ধের জন্মজন্মান্তরের মনোহর কাহিনী সকল অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদেরও উদ্দেশ্য ছিল, নির্ব্বাণের পথের এই সকল চিহ্নের রমণীয়তাসম্পাদন। কারু-কার্য্যের হিসাবে এই সকল চিত্র নির্দ্দোষ না হইলেও, এই সকল চিত্রে শিল্পী যে রমণীয়তা অর্থাৎ দর্শকের চিত্তকে রসার্দ্র করিবার শক্তি সঞ্চারিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন, এ কথা অস্বীকার করা যায় না।

(৩)

শুঙ্গরাজ্যের অধঃপতনের অনতিকাল পরেই যেন প্রাচ্য ও মধ্যভারতে প্রাচীন শিল্পের ধারা শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল। খৃষ্টীয় প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় শতাব্দে নির্ম্মিত যে কয়খানি মূর্ত্তি এ যাবৎ সাঁচীতে, শারনাথে, এবং শ্রাবস্তীতে পাওয়া গিয়াছে, তাহা মথুরার লাল পাথরের দ্বারা মথুরার কারখানায় নির্ম্মিত। দাক্ষিণাত্যে অন্ধ্ররাজ্যে শুঙ্গশিল্পের ধারা আরও দুই শতাব্দীর অধিককাল অক্ষুণ্ণভাবে প্রবহমান ছিল, এবং খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দে অমরাবতীর মর্ম্মরে উৎকীর্ণ ভাস্কর্য্যে উন্নতির চরম সীমায় পৌঁছিয়াছিল। মথুরায় শুঙ্গশিল্পধারা একেবারে লুপ্ত না হইলেও খৃষ্টাব্দের আরম্ভ হইতে শকক্ষত্রপগণের অধিকারে নবাভ্যুদিত গ্রীকশিল্পের সহিত ঘনিষ্ঠ সংসর্গে আসিয়া প্রাচীন শিল্প নব কলেবর ধারণ করিয়াছিল। মথুরার শক-কুষাণযুগের শিল্পের সংবৎ সহ লিপিযুক্ত অনেক নিদর্শন আমাদের হস্তগত হইয়াছে; এই সকল নিদর্শন পরীক্ষা করিলে মনে হয়, খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী হইতে মথুরায় যেন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের

দেব-দেবী গঠনের একটি বৃহৎ কারখানা খোলা হইয়াছিল। কিন্তু এই কারখানায় তৈয়ারী দেব-দেবীর মূর্ত্তি কলে তৈয়ারী জিনিষের মত প্রাণহীন ভাবরসবিহীন শুষ্ক পাতর। সুতরাং শিল্পরসের অবতারণার হিসাবে মথুরায় শক-কুষাণ-যুগের শিল্পিগোষ্ঠীকে নিপুণ পাতরমিস্ত্রী ছাড়া আর বেশী কিছু, অর্থাৎ সৃষ্টিক্ষম প্রকৃত শিল্পী বলা যায় না। তথাপি মথুরার প্রাচীন শিল্পীদিগের একটি কীর্ত্তি তাঁহাদিগকে ভারত-শিল্পের ইতিহাসে অমরত্ব দান করিয়াছে। এই কীর্ত্তি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবদেবীর প্রচলিত মূর্ত্তির আকৃতির উদ্ভাবন। মথুরার কারখানার বুদ্ধ এবং বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তির সহিত গান্ধারের মূর্ত্তির বিশেষ সাদৃশ্য আছে। অধিকাংশ প্রত্নতত্ত্ববিৎ মনে করেন, বুদ্ধমূর্ত্তি উদ্ভাবিত হইয়াছিল, গান্ধারে এবং মথুরার শিল্পীরা তাহা অনুকরণ করিয়াছিলেন। বুদ্ধমূর্ত্তি যেখানেই উদ্ভাবিত হইয়া থাকুক, জৈন মূর্ত্তিনিচয় যে উদ্ভাবিত হইয়াছিল মথুরায় শক-কুষাণযুগের কারখানায়, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কেন না, আর কোথাও এত প্রাচীন জৈন মূর্ত্তি পাওয়া যায় নাই। খুব সম্ভব পৌরাণিক দেবদেবীর মূর্ত্তি গঠনও প্রথমতঃ মথুরায় এই যুগেই আরম্ভ হয়। মথুরার এই যুগের একখানি বৌদ্ধ চিত্রফলকে ঐরাবত সহ ইন্দ্রের মূর্ত্তির কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। মথুরা হইতে আনীত এবং কলিকাতা মিউজিয়মে রক্ষিত লাল পাতরের একটি সিংহবাহিনী মূর্ত্তি এবং একটি জটামুকুট ·ত্রিশির (অর্থাৎ চতুর্মুখ) মহাদেবমূর্ত্তির ভগ্নাংশ শক-কুষাণ-যুগের তৈয়ারী বলিয়া মনে হয়। মথুরা মিউজিয়মে রক্ষিত লাল পাতরের দ্বারের একখানি পার্শ্বফলকের পশ্চাতে একটি অসম্পূর্ণ লিপি আছে। পাতরখানি চিরিয়া ছ'কালা করায় এই লিপির প্রত্যেক পংক্তির অর্দ্ধাংশ লুপ্ত হইয়াছে। এই লুপ্তাংশ পূরণ করিয়া আমি স্থানান্তরে দেখাইয়াছি, এই লিপিতে কথিত হইয়াছে যে. মহাক্ষত্রপ সোডাসের রাজত্বকালে এক ব্যক্তি ভগবান্ বাসুদেবের মহাস্থানে (অর্থাৎ কৃষ্ণের জন্মস্থানে) একটি চতুঃশালা, তোরণ, এবং বেদিকা প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছিলেন। তৎকালের রীতি অনুসারে এই তোরণ এবং বেদিকা অবশ্যই কারুকার্য্য এবং ভাস্কর্য্যের দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়াছিল, এবং এই ভাস্কর্য্যের মধ্যে পৌরাণিক দেবদেবীর মূর্ত্তি এবং পৌরাণিক আখ্যায়িকার চিত্র থাকাও সম্ভব। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, শক-কুষাণ-যুগে মথুরায় সহসা পৌরাণিক দেবদেবীর এবং জৈন ও বুদ্ধ মহাপুরুষগণের ও দেবদেবীর মূর্ত্তির গড়ন আরম্ভ হওয়ার কারণ কি ?

এই প্রশ্নের সহজ উত্তর, এই শক-কুষাণ-যুগেই আর্য্যাবর্ত্তের উত্তরপশ্চিমার্দ্ধে মূর্ত্তিপূজা-রীতি প্রবলতা লাভ করিয়াছিল। ইহার পূর্ব্বে মূর্ত্তি গঠিত হইত, বোধ হয় স্থানে স্থানে তাহা পূজিতও হইত ; কিন্তু তখন যেন মূর্ত্তিপূজা প্রবলতা লাভ করে নাই ; প্রবল ছিল স্তূপ, চৈত্য,বৃষ,সিংহ,গরুড়াদি ধ্বজ, এবং স্বস্তিকত্রিশূলাদি চিহ্নের পূজা। শুঙ্গভাস্কর্য্যে যে এই সিদ্ধান্তের অনুকূল প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। শুঙ্গ-রাজগণের সমসময়ের দেশীয় রাজগণের মুদ্রার চিত্রও এইরূপ সিদ্ধান্তের অনুকূল। দেবদেবী, যক্ষ, নাগ, এবং বুদ্ধ, তীর্থঙ্কর প্রভৃতিকে লক্ষ্য করিয়াই অবশ্য চৈত্য ও চিহ্নাদির পূজা হইত। সাক্ষাৎসম্বন্ধে প্রতিমাপূজা প্রবল ছিল না বলিয়াই হয় ত দেব-দেবীর আকৃতি সম্বন্ধে কল্পনা-জল্পনা প্রবলতা লাভ করিবার অবকাশ পায় নাই। কিন্তু শক-কুষাণ-যুগে পৌত্তলিক বিদেশীয়গণের সংসর্গগুণে সম্ভবতঃ মথুরায় মূর্ত্তিপূজা প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। শক এবং পহ্লব রাজগণের মুদ্রায় যে সকল দেবদেবীর মূর্ত্তি আছে, তন্মধ্যে কোন কোনটি হিন্দু দেবদেবী বলিয়া মনে হয়। দ্বিতীয় কদফিসস প্রমুখ কুষাণ সম্রাটগণের মুদ্রায় পৌরাণিক দেবদেবীর মূর্ত্তি সুস্পষ্ট। দ্বিতীয় কদফিসস শৈব ছিলেন এবং খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দের তৃতীয় পাদে রাজত্ব করিয়াছিলেন। কুষণরাজগণ মূর্ত্তির বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তাঁহাদের মুদ্রায় নাম সহ অনেক দেবদেবীর মূর্ত্তি পাওয়া যায়। তাঁহারা নিজেদের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইতেন—সম্ভবতঃ সমসময়ে রোমের সম্রাটগণের অনুকরণে প্রজাসাধারণের পূজার জন্য। মথুরার নিকটবর্ত্তী মট্ নামক স্থানে কয়েক জন কুষাণ সম্রাটের মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। এই সকল কারণে অনুমান হয়, কুষাণপ্রভাব আর্য্যাবর্ত্তে মূর্ত্তিপূজাপ্রচারে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। *

[ক্রমশঃ।

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ।

* সাহিত্য-সম্মিলনে ইতিহাসশাখার সভাপতির অভিভাষণ।

খলিফা-বর্জ্জন

পাঠক জানেন, বিগত মার্চ্চ মাসের প্রারম্ভেই নব্য তুরস্কের জাতীয় দল তুরস্কের খলিফার পদ উঠাইয়া দিয়াছেন। যে বন্ধনে পৃথিবীর সমস্ত মুসলমানপ্রধান দেশের সুন্নিসমাজ বদ্ধ ছিল, এত দিন পরে সেই বন্ধন ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রায় চারি শতাব্দী ধরিয়া তুরস্কের নরপাল একাধারে তুরস্ক-সাম্রাজ্যের অধিপতি এবং সমস্ত মুসলমান-সমাজের, অন্ততঃ সর্ব্বদেশীয় সুন্নিসমাজের,—ধর্ম্ম-গুরু ছিলেন। পৃথিবীর যে যে স্থানে সুন্নিমুসলমান আছেন, সেই সেই স্থানেই খলিফার পতনজনিত প্রকম্প বিশেষ-ভাবে অনুভূত হইয়াছে। কেবল যে সুন্নি-সম্প্রদায়ের মুসলমানদিগের মধ্যে খলিফার প্রভাব নিবদ্ধ ছিল,—তাহা বলা যায় না। শিয়াসমাজের মুসলমানগণও খলিফাকে কতকটা সম্মানের দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন। তাঁহারা সুন্নিদিগের ন্যায় খলিফাকে ভগবানের পার্থিব প্রতিচ্ছায় বলিয়া মনে করেন না সত্য, কিন্তু প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মাবলম্বীর রোমের পোপকে যেরূপ সম্মানের দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকে, শিয়াসম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমানগণ খলিফাকে অনেকটা সেইরূপ সম্মানের দৃষ্টিতে দেখিতেন। কাযেই খলিফার পদ বিলুপ্ত হওয়ায় সমগ্র মুসলমানসমাজে একটা বিক্ষোভ উপস্থিত হইয়াছে। তবে এখানে একটা কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, মরক্কোর এবং য়েমেনের নৃপতিরাও খলিফা-পদের দাবী করিতেছেন ; হজের রাজাও যে এইরূপ একটি দাবী উপস্থিত করিয়াছেন, তাহাও সর্ব্বজনবিদিত। কিন্তু ইঁহাদের দাবী সর্ব্বজনসম্মতিক্রমে কখনই স্বীকৃত হয় নাই।



পুত্র-কন্যা সহ খলিফা আবদুল মাজিদ

এখন প্রশ্ন হইতেছে, তুর্করা খলিফার পদ তুলিয়া দিল কেন? ইহার কারণ এই যে, অধুনা পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্র মানবসমাজে যে গণতন্ত্রবাদ ও সাম্যবাদের ঝঙ্কার উঠিয়াছে, নব্য তুর্কীসমাজে সেই ঝঙ্কার বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তৃত করিয়াছে। মুস্তাফা গাজী কামাল পাশা সেই নূতন ভাবের প্রণোদনে এঙ্গোরায় প্রজাতন্ত্রমূলক শাসনযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। নব্য তুর্কদলের বিশ্বাস, ঐরূপ সাম্যমূলক শাসনযন্ত্রে খলিফার ন্যায় এক জন অনন্যসাধারণ ক্ষমতাবান্ ব্যক্তির স্থান নাই। অগত্যা তুরস্কের কর্তৃপক্ষ অধুনা য়ুরোপে প্রতিষ্ঠিত প্রজাতন্ত্রমূলক শাসনযন্ত্রের সহিত আপনাদের নব-প্রতিষ্ঠিত শাসনযন্ত্রের সাম্যরক্ষাকল্পে সুলতানকে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে সুলতানের পদ উঠাইয়া দেওয়া হয়, রাজ্যেশ্বর বা নরনাথ হিসাবে তখন তুরস্কের সুলতান আর সিংহাসনে রহিলেন না। কিন্তু ধর্ম্ম-সম্পর্কিত ব্যাপারের নিয়ামকরূপে খলিফা রহিলেন। সুলতান ষষ্ঠ মহম্মদের নির্ব্বাসনের বা পলায়নের পর সুলতান আবদুল আজিজের পুত্র আবদুল মাজিদ কুস্তুন্তুনিয়ায় খলিফারূপে বিরাজ করিতেছিলেন। আবদুল মাজিদ এক জন প্রতিভাশালী লোক হইলেও তাঁহাকে খলিফার আসনে অধিক দিন প্রতিষ্ঠিত রাখা হয় নাই। তাহার কারণ, নব্য তুর্কদিগের মধ্যে ধর্ম্মভাব অপেক্ষা রাজনীতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষাই অধিকতর প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। খলিফা যে কেবল তুর্কদিগের নহেন, তিনি যে সমস্ত সুন্নিসম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমানসমাজের, ইহা রাজনীতিক ভাবে ভরপুর নব্যতুর্কদল একবারও বিবেচনা করিয়া দেখিলেন না।



সুলতান ষষ্ঠ মহম্মদ

বিনা বাধায় খলিফার পদ রহিত করা হয় নাই। এঙ্গোরা হইতে বিগত ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ দিনে যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল, তাহাতে প্রকাশ যে, খিলাফতের বিলোপসাধন সম্বন্ধে তিন দল লোক ত্রিবিধ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। তথাকার রক্ষণশীল দল এইরূপ আকস্মিক, নিষ্করুণ এবং কঠোর পরিবর্ত্তনের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু এ দেশে এখন মডারেটদিগের যেরূপ অবস্থা হইয়াছে, এঙ্গোরায় রক্ষণশীল দলের অবস্থা অনেকটা সেইরূপই দাঁড়াইয়াছে। তাঁহারা সংখ্যায় অল্প; নব্য দল তাঁহাদের কথা কিছুই শুনিতে চাহেন না। তাঁহারা খিলাফৎ-রহিতকরণ প্রস্তাবের প্রতিকূলবাদী হইলেও ভোট দিবার সময় কোন পক্ষেই ভোট দিবেন না, স্থির করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় উন্নতিশীল দল। ইঁহারা কতকটা আমাদের দেশের রাজনীতিক ক্ষেত্রে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট দলের মত। ইঁহারা বলেন যে, রাজনীতিক ব্যাপার হইতে ধর্ম্মব্যাপারকে সম্পূর্ণ পৃথক করিয়া রাখা প্রয়োজন। সুতরাং খিলাফৎ যখন ধর্ম্মব্যাপার, তখন কোন না কোন উপায়ে উহা রক্ষা করাই কর্ত্তব্য এই দল অবশ্য তাঁহাদের পক্ষসমর্থনের জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের যুক্তি চরমপন্থীদিগের মনোমত হয় নাই। এই চরমপন্থীরা প্রাচীন তুরস্কের প্রতিষ্ঠানগুলি আমূল পরিবর্ত্তিত করিতে চাহেন। তাঁহারা বলেন যে, খিলাফৎ প্রাচীনকালের ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠানের একটা জীর্ণ কঙ্কাল উহা রাখিলে তুরস্কের উন্নতির পথ একেবারে রুদ্ধ হইয়া থাকিবে। তথাকার নব্যদলের মধ্যে অধিকাংশই এই মতাবলম্বী। কিন্তু তাহা হইলেও মুস্তাফা গাজী কামাল পাশা যদি নব্য দলের পক্ষসমর্থন না করিতেন, তাহা হইলে হয় ত এত শীঘ্র খলিফার পদ বিলুপ্ত করিয়া দেওয়া সম্ভব হইত না। নব্য তুর্করা এখন সর্ব্বতোভাবে মুস্তাফা কামাল পাশারই মতানুবর্ত্তী। তাঁহারা তাঁহার গুণে অত্যন্ত মুগ্ধ। তাহা হওয়াও স্বাভাবিক। কারণ, কামালের সামরিক প্রতিভার প্রভাবেই আজ সুদীর্ঘ অমানিশার পর তুরস্কে গৌরবভাস্কর সমুদিত। মস্কৌয়ের বলসেবিক সরকারের সহায়তায় তিনি তুর্ক জাতির যে সামরিক শক্তি সংগঠিত করিয়াছেন,তাহার ফলে স্বাধীন জাতিনিচয়ের মধ্যে

আজ তুরস্ক আত্মরক্ষায় সমর্থ হইয়াছে। নতুবা পরোক্ষে ইংরাজের সাহায্যপুষ্ট গ্রীসের কৃপাণাঘাতে তুরস্ককে খণ্ডবিখণ্ড হইয়া যাইতে হইত। তিনি যে কেবল সামরিক প্রতিভায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী, তাহা নহেন, তাঁহার রাজনীতিক দূরদর্শনও অনন্যসাধারণ। এরূপ ক্ষেত্রে নব্য তুর্ক দল যে অবিচারিত সিদ্ধান্তে তাঁহার মতেরই সমর্থন করিয়াছেন, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। খলিফা এই ব্যাপারের অতি অল্প দিন পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহার সিংহাসন যেন পদ্মপত্রে স্থিত জলবিন্দুর ন্যায় টলটল করিতেছে। কখন্ যে পবনের একটা সজোর ফুৎকারে উহা কাল-বারিধির জলে মিশিয়া যায়, তাহা বলা যায় না। এরূপ অবস্থায় তিনি আত্মপক্ষসমর্থনের জন্য বা আত্মরক্ষার জন্য কিছুমাত্র চেষ্টাও করেন নাই। তিনি লোকমতের অনুবর্ত্তন করিয়া আপনার অসাধারণ ধর্ম্মনিষ্ঠার ও ত্যাগশীলতার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, এই সময়ে তাঁহার আত্মরক্ষার প্রচেষ্টাফলে যদি তুরস্কে অন্তর্ব্বিবাদ আত্মপ্রকাশ করে, তাহা হইলে তুর্ক জাতির যে ক্ষতি হইবে, সে ক্ষতির পূরণ করা কখনই সম্ভব হইবে না। তাই তিনি কয়েক সপ্তাহ জনমতের মুখ চাহিয়াই বসিয়া ছিলেন।



আস্মৎ পাশা

সময় আসিল। খিলাফৎ বিলুপ্ত করিবার জন্য এঙ্গোরার প্রতিনিধি সভায় আইনের যে পাণ্ডুলিপি উপস্থাপিত হইয়াছিল, বিগত ১লা মার্চ্চ তারিখে উক্ত সভায় তাহার আলোচনা হইয়াছিল। সেই সভায় তুরস্কের শাসনযন্ত্র হইতে ধর্ম্মসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানগুলি নির্ব্বাসিত করিবার অনুকূলে যে হেতুবাদ প্রদর্শিত হইয়াছিল, তাহা বিচারসহ ও সুদৃঢ় সিদ্ধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া মনে হয় না।



রৌফ বে

এঙ্গোরা সরকারের পররাষ্ট্রসচিব সেনাপ[তি] আসমৎ পাশা বিগত ৪ঠা মার্চ্চ তারি[খে] এঙ্গোরার প্রতিনিধি সভায় বলিয়াছিলে[ন] —"খিলাফৎ রহিত হইয়া গেলে আমা[দের] ধর্ম্মের কোন পরিবর্ত্তন ঘটিবে না। খলিফা[র] পদ রহিত করিবার জন্য আমরা প্রাণপ[ণে] চেষ্টা করিব সঙ্কল্প করিয়াছি। আমরা গ্রী[ক]দিগের এবং খলিফার সহিত সংগ্রাম [ও] কলহ করিয়াছি বলিয়া কনস্তান্তিনোপ[ল] আমাদের অধিকারমধ্যে রহিবে। আমাদে[র] শক্তির জন্যই অন্যান্য মুসলমানজাতি আমাদের সহিত বন্ধু[ত্ব] করিয়াছেন, খলিফা আমাদের পক্ষে আছেন বলিয়া তাঁহারা আমাদের সহিত সৌহার্দ্দ করেন নাই।" এঙ্গোরা[র] মন্ত্রী রৌফ বে এবং আলি ফৌত পাশা ঐ মতের সমর্থ[ন] করেন। বলা বাহুল্য, ইহার মধ্যে যুক্তিতর্ক কিছু[ই] নাই; ইস্লামধর্ম্ম প্রচারিত হইবার পর হইতেই [যে] প্রতিষ্ঠান মুসলমানসমাজে প্রবর্ত্তিত এবং সম্মানিত হইয়া আসিতেছিল, তাহা রহিত করিয়া দিতে হইলে তাহা-সমর্থনে যেরূপ প্রবল হেতুবাদ প্রদর্শিত হওয়া প্রয়োজন, এ ক্ষেত্রে সেরূপ কোন হেতুবাদ প্রদর্শিত হয় নাই। সে সকল কথা আমরা পরে বলিব। তারের সংবাদেই প্রকা[শ] যে, গুমুশানের এবং কাস্তামুলের প্রতিনিধিরা খলিফা[র] পদ উঠাইয়া দিবার প্রস্তাবে বিশেষ আপত্তি করিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিয়াছিলেন যে, এই সময়ে এইরূপ গুরু পরিবর্ত্তন করা কোনমতেই সঙ্গত নহে। এ সময়ে প্রতিনিধি সভার অনেক প্রয়োজনীয় কার্য্য আছে, সেই সকল কার্য্যে আত্মনিয়োগ করাই এখন প্রতিনিধি সভার অবশ্য কর্ত্তব্য; তন্মধ্যে আর্থিক ব্যাপারের সুব্যবস্থা করাই সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনীয় হইয়াছে। বাহাদের পক্ষে



আলি ফৌত বে

যুক্তি-তর্ক অত্যন্ত দুর্ব্বল, তাহারা যেমন কোন সভাস্থলে প্রতিপক্ষের যুক্তি না শুনিয়া কেবল কোলাহলই করিয়া থাকে, সেইরূপ প্রতিনিধি সভায় নব্য দলের প্রতিনিধিরা গোলমাল করিয়াই তাঁহাদের কথা ডুবাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রথমোক্ত প্রতিনিধিরাও সহজে ছাড়িবার পাত্র ছিলেন না। গোলমাল থামিয়া গেলে তাঁহারা তাঁহাদের বক্তব্য বলিতে থাকেন। তাঁহারা এ কথা স্পষ্টই বলিয়াছিলেন যে, খলিফার পদ উঠাইয়া দিবার অধিকার এঙ্গোরার প্রতিনিধি সভার নাই। তাঁহারা আরও বলিয়াছিলেন যে, প্রতিনিধি সভার কার্য্যের মধ্যে অসামঞ্জস্য ও অসঙ্গতিই উজ্জ্বলভাবে প্রকটিত। আজ তাঁহারা যাহা গড়িতেছেন, কাল তাঁহারাই তাহা ভাঙ্গিতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের এই উক্তিতে কোন সুফল ফলে নাই। যাহারা ভাবের আবেগে ভাসিয়া যায়, যুক্তি তাহাদের গতিভঙ্গ করিতে পারে না। সুতরাং খলিফার পদ তুলিয়া দিবার জন্য ভোটের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক হইয়াছিল।

এঙ্গোরার জাতীয় দল তুরস্ক হইতে খলিফা নির্ব্বাসন-কল্পে যে যে প্রস্তাব গ্রাহ্য করিয়া লইয়াছিলেন,—তাহার মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল ;—

(১) খিলাফৎকে সিংহাসনচ্যুত করা হইল। খিলাফতের ভাব ও ধারণা প্রজাতন্ত্রের ও শাসনযন্ত্রের অন্তর্নিহিত বিধায় খিলাফতের কার্য্যালয় উঠাইয়া দেওয়া হইল।

(২) পদচ্যুত খলিফা, এবং অটোমান বংশের সকল লোক এবং যাঁহারা ঐ বংশের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ, তাঁহাদের কেহই আর তুরস্কে বাস করিতে পারিবেন না। যে সকল নারী উক্ত বংশীয় লোকদিগের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ, তাঁহাদের সন্তানগণও উক্ত বংশীয় বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

(৩) দ্বিতীয় প্রস্তাবে উল্লিখিত ব্যক্তিগণকে এই প্রস্তাব গ্রহণের পর দশ দিনের মধ্যে তুরস্ক পরিত্যাগ করিতে হইবে।

(৪) উঁহারা তুরস্কের নাগরিক অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবেন।

(৫) তুরস্কের এলাকার মধ্যে উঁহাদের যে সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি আছে, তাহা এক বৎসরের মধ্যে বিক্রয় করিয়া ফেলিতে হইবে। সে জন্য তাঁহাদের তুর্কী সরকারের নিকট আবেদন করা প্রয়োজন। এক বৎসর পরে আবেদন করিলে তাহা গ্রাহ্য হইবে না।

(৬) উঁহাদিগের প্রত্যেককে তাঁহার সামাজিক মর্য্যাদার অনুরূপ চলিয়া যাইবার পাথেয় দেওয়া হইবে।

(৭) উঁহাদিগকে এক বৎসরের মধ্যে উঁহাদের সমস্ত স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া ফেলিতে হইবে। যদি উঁহারা ঐ ঐ সময়ের মধ্যে উহা বিক্রয় করিতে না পারেন, তাহা হইলে তুরস্ক সরকার উহা বিক্রয় করিয়া ঐ টাকা সম্পত্তির অধিকারীকে প্রদান করিবেন।

(৮) সুলতান কর্তৃক প্রদত্ত স্থাবর সম্পত্তি জাতীয় সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবে।

(৯) আসবাবসংবলিত সমস্ত রাজভবন জাতীয় সম্পত্তি হইবে।

(১০) রাজকীয় সম্পত্তি বলিয়া পরিজ্ঞাত এবং খাজাই হুমায়ুন্‌ইর সহিত সংলিপ্ত সমস্ত সম্পত্তি জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত হইবে।

(১১) যে সমস্ত স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তি জাতির সম্পত্তি হইল, তাহার রক্ষণাবেক্ষণ প্রভৃতির জন্য একটি কার্য্যতালিকা রচনা করিতে হইবে।

(১২) প্রচারের দিন হইতেই এই আইন জারি হইবে।

(১৩) এই আইন জারি করিবার জন্য একটি বিশেষ কমিশন নিযুক্ত হইবে।

এঙ্গোরার প্রতিনিধি সভা করুণাবর্জ্জন পূর্ব্বক কিরূপ কঠোরতা সহকারে অটোমানবংশীয় ব্যক্তিগণকে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন,—উল্লিখিত ত্রয়োদশ প্রস্তাব হইতে তাহা বেশ বুঝা যাইবে। আসল কথা এই, অটোমানবংশীয় ব্যক্তিগণ এখনও তুর্কী জনসাধারণের শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণ করিতেছেন। এরূপ অবস্থায় যদি উক্ত রাজবংশীয় ব্যক্তিরা তুরস্কে অবস্থিতি করেন, তাহা হইলে হয় ত জনসাধারণের সেই সুপ্ত ভক্তি আবার প্রবল হইয়া উঠিতে পারে। এই শঙ্কাতেই যে তাঁহারা এইরূপ কঠোর ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, তুরস্কে অকস্মাৎ নব্য-দল এত প্রবল হইয়া উঠিল কেন? তুরস্কের এক জন ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্টের মুখেই প্রকাশ যে, ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে

যখন মুস্তাফা গাজী কামাল পাশা এসিয়া মাইনরে গিয়াছিলেন, তাহার পূর্ব্বেই তিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, তুরস্কের উন্নতি ও সংস্কারসাধন করিতে হইলে খলিফার পদ উঠাইয়া দেওয়া এবং ধর্ম্মকে শাসনযন্ত্রের সহিত সম্পর্কশূন্য করা কর্ত্তব্য। কিন্তু তখন এঙ্গোরায় রক্ষণশীল দল সংখ্যায় ও ক্ষমতায় প্রবল। তাঁহারা উহাতে ঘোর আপত্তি করায় ঐ কার্য্য তখন স্থগিত ছিল। নব্য দল তখন কামালের মতের সমর্থন করিলেও তাঁহারা সংখ্যায় অত্যন্ত অল্প ছিলেন। কাযেই মুস্তাফা কামাল পাশা তখন তাঁহার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে সমর্থ হয়েন নাই।



কামাল পাশা

বিরোধী দল এই কথা প্রচারিত করেন যে, তুর্ক-গ্রীক সংগ্রাম উপস্থিত হইবার পরে খলিফা সুলতান আবদুল মাজিদ যেরূপ ভাবভঙ্গী দেখাইয়াছিলেন, যেরূপ ন্যূনতা-স্বীকার ও হীনতা-জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, তাহা দুর্ব্বল এবং পরাজিত পক্ষেরই শোভা পায়, বীরত্বদৃপ্ত নব্য তুর্কদের তাহাতে লজ্জাবোধ হইয়াছিল। সেই জন্য তাঁহারা ব্যক্তিগতভাবে খলিফার উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তুর্ক-গ্রীক সমরে জাতীয় দলের বিরুদ্ধ পক্ষ ঐরূপ মনোভাব প্রকাশিত করিয়াছিলেন। ইঁহারা সুলতানেরই সমর্থক দল। সুতরাং নব্য তুর্করা স্বতঃই মনে করিয়াছিলেন যে, খলিফা প্রকৃতই উন্নতির পরিপন্থী। তৃতীয়তঃ তুর্ক সুলতান এই জাতীয় সঙ্কটের দিনে কোন দুরূহ সমস্যার সমাধানে বা কোন জাতীয় কার্য্যসংসাধনে কোনরূপ অনন্যসাধারণ ক্ষমতার বা প্রজ্ঞার পরিচয় দিতে পারেন নাই; সুতরাং নব্য তুর্করা তাঁহার দিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েন নাই। চতুর্থতঃ তুর্ক রাজবংশীয় যুবকদল প্রায় সকল ব্যাপারে চিত্তের লঘুতা এবং অর্ব্বাচীনতা প্রকাশ করিতেন, সে জন্যও রাজপরিবারের উপর অনেকে হাড়ে চটিয়াছিলেন। পঞ্চম এবং সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল কারণ তুরস্কে স্ত্রীশিক্ষার ও স্ত্রীস্বাধীনতার বিস্তার। নূতন ধরণের শিক্ষাপ্রাপ্তা, স্বাধীনীকৃতা, নব্যা তুর্কী রমণীরা মনে করেন যে, খলিফার প্রদত্ত ধর্ম্মশিক্ষার দ্বারা স্বাধীনতা, বিশেষতঃ স্ত্রীস্বাধীনতা নিহ্নুত হইবে। কামাল পাশার স্ত্রী এক জন উচ্চশিক্ষিতা স্বাধীনতাপ্রাপ্ত মহিলা। সুতরাং খিলাফতের বিলোপকার্য্যে ইদানীন্তন তুর্ক মহিলাদের প্রভাব নিতান্ত অল্প নহে।

যে সময়ে খলিফাকে নির্ব্বাসিত করা হইয়াছিল, সেই সময়ে ঐ সকল কথাই সংবাদপত্রে প্রকাশ পাইয়াছিল।

কিন্তু তাহার পর এই সম্বন্ধে আরও কতকগুলি নূতন ও বিস্ময়কর কথা প্রকাশ পাইয়াছে। ভারতবর্ষীয় মুসলমানগণ প্রথম সে কথা জানিতে পারেন নাই। মিশরের 'আলাকবর' নামক পত্র তথাকার উলেমা আবদুল আজীজ জাভিস্ মহোদয় কামাল পাশার দল কর্ত্তৃক খলিফার পদ উঠাইয়া দিবার কথা বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি মুস্তাফা গাজী কামাল পাশার সামরিক প্রতিভার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন যে, লুসেনের সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইবার পরই যদি মুস্তাফা কামাল পাশা রাজকীয় ব্যাপার হইতে স্বতন্ত্র থাকিতেন অথবা দেহত্যাগ করিতেন, তাহা হইলে তিনি পৃথিবীতে অতুল কীর্ত্তি রাখিয়া যাইতে পারিতেন। তিনি যদি তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র তাঁহার স্থায়সঙ্গত সীমার মধ্যে নিবদ্ধ রাখিতেন, অন্ততঃ খিলাফতের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করিতেন, তাহা হইলেও তাঁহার গৌরব কতকটা অক্ষুণ্ণ থাকিত। কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। তিনি খিলাফত রহিত করিয়া দিয়া সমগ্র ধার্ম্মিক মুসলমানদিগের হৃৎপিণ্ড ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছেন।

উলেমা আবদুল আজীজ জাভিস লিখিয়াছেন যে, সুলতান ওয়াহি উদ্দীন খলিফার পদ পরিত্যাগ করিয়া কুস্তুন্তুনিয়া ছাড়িয়া চলিয়া যাইলে মুস্তাফা কামাল পাশা আবদুল মাজিদ খাঁকে খলিফার পদ প্রদানের প্রস্তাব করিয়া একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। সেই পত্রে এইরূপ একটি অলঙ্ঘনীয় সর্ত্ত করা হইয়াছিল যে, খলিফা কোন অবস্থাতেই তুরস্কের রাষ্ট্রীয় বা রাজনীতিক ব্যাপারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিতে বা তাহার সহিত কোনরূপে সংলিপ্ত থাকিতে পারিবেন না। আবদুল মাজিদ খাঁ সে প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলেন। তিনি বহু বারই সাধারণের সমক্ষে বলিয়াছিলেন যে, তিনি কোন মতেই তুরস্কের রাজনীতিক ব্যাপারে সংলিপ্ত হইবেন না, পরন্তু ধর্ম্মের সেবায় তিনি তাঁহার সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিবেন। তিনি এমন প্রস্তাবও করিয়াছিলেন যে, খিলাফৎ প্রতিষ্ঠানের রক্ষাকল্পে নানা দেশ হইতে মুসলমান সদস্য নির্ব্বাচন পূর্ব্বক কমিটী গঠিত করিতে হইবে; উন্নতিবিধানের জন্য কিরূপ সংস্কার প্রবর্ত্তিত করা কর্ত্তব্য, তাহা সেই কমিটীতে আলোচনা করা হইবে। আবদুল মাজিদ যখন এই সকল বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন; ঠিক সেই সময়েই এঙ্গোরার প্রজাতন্ত্র খলিফার পদ উঠাইয়া দিয়াছেন। বিগত ৪ঠা মার্চ্চ রাত্রি দুইটার সময় কনস্তান্তিনোপলের ওয়ালি, শান্তিরক্ষক পুরুষ ও পুলিস প্রহরী ডলমাবাগচি প্রাসাদে প্রবেশ পূর্ব্বক খলিফা আবদুল মাজিদকে সিংহাসনে উপবেশন করিতে বলেন। তিনি তথায় উপবেশন করিলে তাঁহারা সরকার কর্ত্তৃক তাঁহার পদচ্যুতির সিদ্ধান্ত পাঠ করেন এবং তাঁহাকে সিংহাসন হইতে অবতরণ পূর্ব্বক অবিলম্বে কনস্তান্তিনোপল পরিত্যাগ করিবার আদেশ দেন। ইহার এক ঘণ্টা পরেই দুই ভার্য্যা ও পুত্রকে সঙ্গে লইয়া পদচ্যুত খলিফা আবদুল মাজিদ খাঁ মোটরে চড়িয়া চাতালজায় গমন করেন। তথায় তাঁহার জন্য একখানি স্পেশ্যাল ট্রেণ অপেক্ষা করিতেছিল। যাইবার সময় তিনি অশ্রুপূর্ণ নয়নে সকলের সহিত করমর্দ্দন করিয়াছিলেন।

উক্ত উলেমা মহোদয় এঙ্গোরায় যাইয়া শুনিয়া আসিয়াছেন যে, কামাল পাশা স্বয়ং খলিফা হইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তুরস্কে বিদ্রোহ উপস্থিত হইবার ভয়ে তিনি সে চেষ্টা হইতে বিরত হইয়াছিলেন। তুর্কদিগের খলিফার ও অটোমান বংশের উপর যে প্রবল অনুরাগ আছে, তাহা তিনি জানিতেন। তাঁহারই কার্য্য-ফলে তুরস্কের যে অবস্থা ঘটিয়াছে, তুর্করা তাহা বিশেষ গুরু বলিয়াই মনে করে, সুতরাং তিনি খলিফার পদ গ্রহণ করিলে তাঁহার অবস্থা যে সঙ্কটসঙ্কুল ও বিপদ্‌বহুল হইবে, তাহা তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন। কামাল পাশা যে কেবল নব্য তুর্কদলের উপর নির্ভর করিয়া এই কার্য্য করিতে সাহস পাইয়াছিলেন, তাহা নহে। তাতার জাতিই তাঁহাকে খিলাফতের বিলোপ কার্য্যে বিশেষ সাহস দিয়াছিল। এই তাতার জাতি জন্মতঃ মুসলমানধর্ম্মাবলম্বী হইলেও কার্য্যতঃ ইস্লামধর্ম্মে আস্থাবান্ নহে। ইহাদের সঙ্গদোষে পড়িয়া তুর্কদিগের যে কেবল রাজনীতিক প্রজ্ঞার দৈন্য উপস্থিত হইয়াছে, তাহা নহে; উহার ফলে তুর্কদের সামাজিক অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানগুলির বিপর্য্যয়ও হইয়া পড়িয়াছে। মিশরের উলেমা আবদুল আজিজ জাভিস সাহেব এঙ্গোরার ও তুরস্কের সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছেন যে, ইহারা রুশিয়ারই চর, ইস্লামধর্ম্মের ধ্বংসসাধনকল্পে কেবল তুরস্কে অবস্থান করিতেছে। তুর্কদিগকে নীতিভ্রষ্ট করিবার জন্য ইহারা স্বতঃ পরতঃ



আনোয়ার পাশা

চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। আনোয়ার পাশা এবং সাহেবজাদা সৈয়দ হালেমের জন্য এত দিন ইহারা খিলাফতের সর্ব্বনাশসাধনে সমর্থ হয় নাই। আজ আনোয়ার পাশা নাই, তাঁহার দলবলও কার্য্যক্ষেত্র হইতে অপসৃত হইয়াছে, কাযেই তাতারেরা এখন যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতেছে। প্রত্যক্ষদর্শী মিশরের উলেমা সাহেবের এই উক্তি শঙ্কাজনক।

যাহা হউক, উপস্থিত খিলাফতের অবসান হইয়াছে। যে মহা-প্রতিষ্ঠান সঙ্ঘশক্তিরূপে পৃথিবীর প্রায় সমগ্র মুসলমান জাতিকে সংহত রাখিয়াছিল, আজ নব্য তুর্কদিগের কর্ম্মদোষে তাহা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তাহার ফলে মুসলমানদিগের বক্ষে দারুণ বেদনা বাজিয়াছে। সৌধের যে স্বর্ণচূড়া তাহার ভাতিতে এত দিন দিগ্‌দিগন্ত সমুদ্ভাসিত করিয়া আসিতেছিল, আজ সেই স্বর্ণচূড়া মলিন, শ্রীভ্রষ্ট এবং খণ্ডিতবিখণ্ডিত অবস্থায় পঙ্কে পতিত হইয়াছে, দেখিলে কাহার হৃদয় ভেদ করিয়া সবলে দীর্ঘনিশ্বাস পতিত না হয়? ইস্লামধর্ম্মের মহীয়ান্ প্রবর্ত্তকের তিরোভাবের পরই যে প্রতিষ্ঠানের আবির্ভাব হইয়াছে, যে খলিফাদিগের শিক্ষার ফলে আটলান্টিক সাগরের বেলাভূমি হইতে প্রায় প্রশান্ত বারিধির তীরভূমি পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগে ইস্লামের বিজয়-বৈজয়ন্তী সগর্ব্বে উড়িয়াছিল, প্রায় তের শত বৎসর অক্ষুণ্ণ থাকিয়া আজ সেই খিলাফৎ বিলুপ্ত ও প্রণষ্ট হইয়া গেল, ইহা অপেক্ষা মর্ম্মপীড়াদায়ক ব্যাপার আর কি হইতে পারে? আজ এই দুঃসময়ে মনে পড়ে, ইস্লামধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের মৃত্যুর পরই তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু, ঈশ্বরে প্রগাঢ় বিশ্বাসী আবু বাকর খলিফার পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। খলিফা শব্দের অর্থ ক্ষমতার অধিকারী বা প্রতিনিহিত ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি। ইনিই প্রথম খলিফা। ইঁহার প্রতিভায় ও চরিত্রবলে আরবে মুসলমানধর্ম্মের সঙ্ঘশক্তি সন্ধুক্ষিত হইয়া উঠে। ইনি আরবজাতির মধ্যে কোরেশ সম্প্রদায়ভুক্ত এবং হজরৎ মহম্মদের শ্বশুর ছিলেন। ইঁহার মৃত্যুর পর ওমার খলিফার পদে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ইঁহার সময়েই মুসলমানসমাজে অনেক প্রতিভাবান্ লোকের আবির্ভাব এবং শিরিয়ায়, পারস্যে ও মিশরে মুসলমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। কথিত আছে, ইনিই আলেকজান্দ্রিয়ার বিখ্যাত পুস্তকালয় ভস্মীভূত করিয়াছিলেন। ইঁহার পর ওমায়াদ বংশের ওসমান তৃতীয় খলিফা হইয়াছিলেন। ইঁহার সময়েই ওমায়াদ সম্প্রদায়ের সহিত হাশিমিদা বংশের বিবাদ বাধে। ইনিও আততায়ীর হস্তে নিহত হইয়াছিলেন। চতুর্থ খলিফা হইয়াছিলেন সিংহবিক্রম আলি। ইনি এক জন উদারচরিত্র ও প্রতিভাশালী লোক ছিলেন। কুফা মসজেদে নমাজ পড়িবার সময় ইনি আততায়ীর হস্তে নিহত হয়েন। আলির সহিতই ইস্লাম প্রজাতন্ত্রের অবসান হয়। ইঁহার পর ইঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র হাসানই খলিফার পদে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন; কিন্তু তিনি ঐ পদ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়েন। ওমায়াদ বংশে ১৪ জন খলিফা হইয়াছিলেন। তৎপরে আব্বাসবংশীয় ৩৭ জন খলিফা ৭৫০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১২৫৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাগদাদে রাজত্ব করেন। ইঁহাদের নেতৃত্বপ্রভাবেই মুসলমান-সভ্যতা-ভাস্কর মাধ্যন্দিন-গগনে সমুদিত হইয়াছিল। স্পেনের মূর শাসনকর্ত্তা আব্দার রহমান কর্ডোভায় এক খলিফা বংশের প্রবর্ত্তন করেন। ইঁহারা খৃষ্টীয় ৭৫৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১০৩১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আপনাদিগকে খলিফা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন।



খলিফা আবদুল মাজিদ

ফতিমা বিবির পক্ষীয় দল ৯০৯ খৃষ্টাব্দে মিশরে খিলাফতের প্রতিষ্ঠা করেন; ১১৭১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মিশরীয় নৃপতিরা ঐ খলিফা ছিলেন। ইঁহাদের শেষ সুলতান আবু মহম্মদ আবদুল্লা মামেলুক দাসগণ কর্ত্তৃক সিংহাসনচ্যুত হইলে মামেলুক সুলতানদিগের দ্বারা রক্ষিত হইয়া এই বংশের লোকরা খলিফা বলিয়া পরিচিত ছিলেন। কিন্তু তখন তাঁহাদের প্রভাব বা প্রতিপত্তি অধিক ছিল না। তৎপরে ১৫১৭ খৃষ্টাব্দে অটোমান রাজ্যের অধীশ্বর দ্বিতীয় বৈজিদের পুত্র সেলিম মিশর বিজয় করিয়া মিশরের আব্বাসবংশীয় খলিফার নিকট হইতে খলিফা উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তদবধি বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত তুরস্ক সুলতানগণই খলিফা বলিয়া সম্মানিত হইয়া আসিতেছিলেন। এইবার তাহার শেষ হইল।

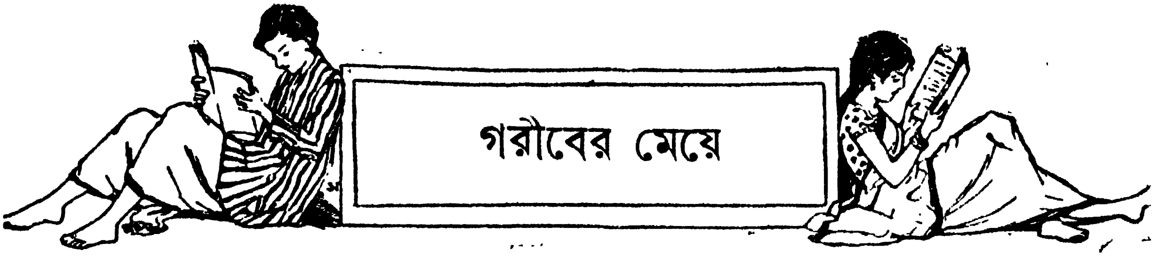
এঙ্গোরার জাতীয় দলের পক্ষ হইতে বলা হইতেছে যে, সত্য বটে, সুলতান প্রথম সেলিম সমস্ত সুন্নি মুসলমান-সমাজের উপর আধিপত্য বিস্তার করিবার উদ্দেশ্যেই মিশরের মামেলুক খলিফাদিগের নিকট হইতে খিলাফৎ গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহার বংশধর তাঁহার সে উদ্দেশ্য সাধিত করিতে পারেন নাই। ইহার ফলে কেবল তুরস্কের অসুবিধাই ঘটিয়া আসিয়াছে। ইদানীং খলিফার শক্তি অনেক ক্ষুণ্ণ হইয়া গিয়াছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে উহা নানা কারণে জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা করা হয়; কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয় নাই। ইদানীং য়ুরোপীয় শক্তিবরগণ খলিফার অস্তিত্বই গ্রাহ্য করিতেন না। ১৯২০ খৃষ্টাব্দের ১০ই আগষ্ট তারিখে সেভার্সের সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। তাহাতে খলিফার নামগন্ধ পর্য্যন্ত উল্লিখিত নাই। অধিকন্তু উহার ১৩৯ সর্ত্তে স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে, তুরস্ক তাহার অধিকৃত রাজ্যের বহিঃস্থিত মুসলমানদিগের উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনরূপ প্রভুত্ব বা প্রভাব বিস্তৃত করিতে পারিবেন না। সুতরাং উক্ত সন্ধিতে কার্য্যতঃ অটোমানের খলিফাকে কেবল তুরস্কের খলিফায় পরিণত করা হইয়াছিল। কনষ্টাণ্টিনোপলে সুলতান-খলিফাকে মিত্রশক্তিবর্গ তাঁহাদের নেতৃত্বাধীন করিয়া রাখে। কিন্তু সেভার্সের সেই সন্ধিপত্র নাকচ হইয়া যাওয়াতে সে কথা এখন আর উপস্থিত করা যায় না।

লিডেন বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ভাষার অধ্যাপক স্নৌক হারগ্রোঞ্জ বলেন যে, খলিফা এককালে মুসলমান সামরিক শক্তির কেন্দ্রস্থল ছিলেন সত্য,—কিন্তু বহুদিন হইল, তাঁহাদের সে শক্তি প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বিগত য়ুরোপীয় মহাসমরে জার্ম্মাণরা অটোমান খলিফার সেই পুরাতন প্রভাব সঙ্কুচিত করিয়া সমস্ত মুসলমান রাজ্যগুলিকে স্বদলে টানিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন,—খলিফা জার্ম্মাণপক্ষে যোগ দিলেও তাঁহাদের সে চেষ্টা সফল হয় নাই। সুতরাং কেবল বিবাদের জন্য ঐ প্রতিষ্ঠান রাখিয়া কোন লাভ নাই।

যাহা হউক, মুসলমানদিগের স্বার্থ মুসলমানগণই ভাল বুঝেন। তাঁহাদের মধ্যে এখন মুসলমান সামরিকতায় কেন্দ্রশক্তি ও মুসলমান-সমাজের সংহতি শক্তিরূপে যদি খলিফা রাখিবার প্রয়োজন অনুভূত হয়, তাহা হইলে তাঁহারা এক জন উপযুক্ত ব্যক্তিকে খলিফা নির্ব্বাচিত করিতে পারেন। শুনিয়াছি যে, এই জন্য সকল দেশের মুসলমানদিগের প্রতিনিধিদিগকে লইয়া একটি সম্মিলন আহ্বান করা হইবে। সেই সম্মিলনে যদি সমগ্র-মুসলমান-ধর্ম্মাবলম্বী মানবদিগের মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিবিধানের জন্য এক জন খলিফা নির্ব্বাচিত করা হয়, —তাহা হইলে কল্যাণ হইবে বলিয়া অনেক ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমান মনে করিতেছেন।

এখন প্রশ্ন হইতেছে, খলিফা আবদুল মাজিদের খলিফাত্ব লুপ্ত হইবে কি? মাননীয় সৈয়দ আমীর আলি বলিয়াছেন, তিনি যখন অবস্থার বিপাকে পড়িয়া কনষ্টাণ্টিনোপল ত্যাগ করিয়াছেন, স্বেচ্ছায় উহা ত্যাগ করেন নাই, তখন তিনিই খলিফা আছেন। সুন্নি উলেমা ও মৌলানাগণ এই সকল কথার বিচার করিয়া দেখিবেন।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়।



দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

গৃহস্বামীর রাত্রির খাওয়া চুকিয়া গিয়াছে। অনুকূলচন্দ্রের শয়নকাল ঠিক সন্ধ্যা ৮টা; ইহার ব্যতিক্রম কোন দিন হয় না, সৌভাগ্যক্রমে তাহা আজও হয় নাই। রান্নাঘরে একবার চৌকিদারী করিয়া আসিয়া তিনি হৃষ্টচিত্তে আহার করিয়া লইয়া শয়ন করিতে গেলেন, যাত্রাকালে স্ত্রী ও কন্যাকে ডাকিয়া বলিয়া গেলেন, "ওগো দেখ, তোমরাও আর অনর্থক রাত জেগে অসুখবিসুখ ক'রে পড়ো না, ওদের দু'খানা খাইয়ে দিয়ে লণ্ঠন নিবিয়ে সময়মতন শুয়ে পড়ো, ভোর না হ'তে আবার ওদে'ঘরে ইষ্টিশানে পৌঁছে আসতে হবে। অত ভোরে ত কিছু মুখে দিতে পারবে না, ও তখন ট্রেণে বসেই কিনে নিয়ে খাবে।"

সন্ধ্যার অপরিস্ফুট অন্ধকারের ছায়ায় দোতলার ছোট ছাতের আলিসার গায়ে হেলান দিয়া নীলিমা চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। কালোর গায়ে আলো ছিটান আকাশভরা নক্ষত্রগুলা প্রাণপণে জ্বলিয়াও এই নিরালোক বাড়ীটাকে এতটুকু উজ্জ্বল করিয়া তুলিতে পারে নাই; কিন্তু ওই অসংখ্য নক্ষত্রসমষ্টির মধ্যে একতমেরই মত অতি ক্ষীণ ক্ষুদ্রতম আলোকসম্পাতে আজ নীলিমার চিত্তটির অন্ধকারের পুঞ্জ ভেদ করিয়া স্মিতশুভ্র রজতালোকের একটি স্নিগ্ধধারা তাহার এই নিরালোক বিজন মনের উপরে অতি ধীরে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। আকাশে বাতাসে সম্মোহন-শক্তির কোন উপাদানই ছড়ান ছিল না, পারিপার্শ্বিক অবস্থাও একান্তই প্রতিকূল। তথাপি এ কি গোলাপী নেশার রঙ্গীন আবেশে চোখের পাতা তাহার জড়াইয়া আসিতেছে, মনের তারে কোন অজানা সুরের একান্ত নবীন-রাগিণী অনর্থক কেবলই এ কি ঝঙ্কৃত হইতে চায়? মায়ের উপর অভিমান ও পিতার উদ্দেশ্যে অপরিসীম ক্রোধ লইয়া সে এখানে নিজেকে লুকাইয়া রাখিবার—অতিথিদের ভোজনব্যাপারে নিরপেক্ষ রাখিবার উদ্দেশ্যে আসিয়া বসিয়াছিল; কিন্তু একটুক্ষণের মধ্যেই কোথা হইতে কোন্ অজ্ঞাত চিন্তার অনাহূত আগমনে কোন্ সময়ে সে সকল অপ্রিয় প্রসঙ্গ পারিবারিক লজ্জায় লজ্জাকর হেয় আন্দোলন যে নিরুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল, তাহা তাহার জানাও ছিল না, সহসা অদূরবর্ত্তী শুভেন্দুর চাপাকণ্ঠের আহ্বানে সসংজ্ঞ হইয়া সে জানিতে পারিল, তাহার অন্তরের সকল বিদ্বেষবহ্নি সহসাই নিবিয়া গিয়াছে এবং সেই নির্ব্বাপিতশিখ অগ্নিজ্বালার স্থানে সুশীতল অজস্র সুধাধারা ক্ষরিত হইয়া পড়িতেছে, তাহারই স্পর্শসুখে দাহ ত জুড়াইয়া গিয়াছেই; পরন্তু সেই অপরিমেয় অমৃতস্পর্শে সমস্ত মনপ্রাণই তাহার সুধাস্রোতে প্লাবিত হইতেছিল। পুলককম্পিত চরণে উঠিয়া আসিয়া শব্দানুসরণে সে ডাকিল, "দাদা!"

শুভেন্দু কাছে আসিল। রাগে দুঃখে সে গর্জ্জিতেছিল। নীলিমাকে দেখিতে পাইয়াই প্রায় কাঁদো কাঁদো মুখে অস্ফুট তর্জ্জনে বলিয়া উঠিল, "কি ঝকমারীর কাযই আমি করেছি, এই তোমাদের কাছে আসা। আমার ত মোটেই আসবার ইচ্ছা ছিল না, তা'তে আবার ওই ছোঁড়াটাকে ঘাড়ে ক'রে। কাকাবাবুর ওই যে কেমন একটা ছোটলোকী গোঁয়ারতুমি, যা ধরবে, না করিয়ে ছাড়বে না। বল্লে কি না, মা-বাপকে একবার দেখে আসা উচিত! আরে, বাপু, মা-বাপ কি আমার—মা-বাপের মতন যে, তাদের দেখে আসবো! তা হ'লে তোমার ঘাড়ে চেপে বসেছি কেন? এখন ওই সভ্য অপমানের হাত থেকে কেমন ক'রে বাঁচা যায়, তাই ভেবে আমার ত মাথা ঘুরচে! কি করি বল্ দেখি?"

নীলিমার মুগ্ধ অন্তরের স্বপ্নবিভোর সুখস্রোত বাস্তবের কঠিন ও তপ্ত স্পর্শে আহত ও আলোড়িত হইয়া উঠিল। মুখ তাহার একটুখানি হইয়া শুকাইয়া গেল, কতকটা বুঝিয়া, কতকটা না বুঝিয়া সে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে?"

শুভেন্দু বিরক্তিতীক্ষকণ্ঠে কহিল, "কি হয়েছে,

জানিস্‌নে না কি? ন্যাকামী করিস্ কেন? আমি না হয় উচ্ছন্নই গেলুম, একটা রাতের ত থাকবার হুকুম হয়েছে, সেটাও না হয় স্রেফ জল গিলেই কাটিয়ে দিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু ওই যে একটা ভদ্রলোকের ছেলেকে ঝক্‌মারী ক'রে এনেছি, ওর পাতে ওই চোকরের রুটি আর মুসুরির দাল ঢালতে তোদের না হয় 'হায়া' লজ্জা নেই, তোরা না হয় পারবি, আমি কেমন ক'রে দাঁড়িয়ে তাই দেখবো ব'লে দে দেখি? আরে ছ্যা, এদের সান্নিধ্যে আবার মানুষ আসে! না কাউকে আনে! ওদের হিন্দুস্থানী দরওয়ানগুলো রুটি ঐ রকমই পাকায় বটে; কিন্তু দালে তাদের ঘি পড়ে কত! আর সে প্যানপ্যানে মুসুর দালও নয়।"

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া নীলিমার দিক্ হইতে কোন প্রকার সাড়াশব্দটুকু পর্য্যন্ত না পাইয়া জ্বলন্ত হইয়া উঠিয়া শুভেন্দু গলা চড়াইয়া কর্কশস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, "গিন্নীঠাকৃরুণকেও আচ্ছা ক'রে জানিয়ে দিয়ে এসেছি, আর তুমি ঠাকৃরুণও জেনে রাখ, তোমাদের বাড়ীর ও ছাই পিণ্ডি সুশীলের পাতে আমি দিতে দেবো না, তার চাইতে তাকে নিয়ে আমি বিদায় হচ্ছি।"

এই বলিয়া রাগে গস গস করিতে করিতে শুভেন্দু চলিয়া যায়; নীলিমা হঠাৎ কি একটা ভাবিয়া লইয়া তাড়াতাড়ি তাহার পথরোধ করিয়া বলিল, "আচ্ছা, একটু দেরি কর তুমি, এক্ষুণি আমি সব জোগাড় ক'রে এনে লুচি টুচি ক'রে দিচ্ছি। কিন্তু দু'ঘণ্টা দেরি হবে।"

শুভেন্দুও অকস্মাৎ ঠাণ্ডা হইয়া নরমসুরে কহিল,"আহা, তা' যদি পারিস রে! কি বলবো তোকে? দেখ দেখি বাবার কি রকম অন্যায়, সাধ ক'রে কি আর দু'টি চক্ষে প'ড়ে দেখতে পারিনে, বারমাস ওদের খাচ্ছি, আর সে কি রাজ-ভোগে খাওয়া, তোদের চৌদ্দ পুরুষেও কখন অমন খাওয়া খায়নি! তা একটা দিনের জন্যে এসেছে, তা'কে এতটুকু একটু যত্ন ক'রে খেতে দিতে পারলে না! লজ্জায় ম'রে যেতে ইচ্ছে করে!"

শুভেন্দু আপন মনে বকিয়া যাইতে লাগিল। নীলিমা আর সে সব কথা কানে না তুলিয়া নিজের কার্য্যে কৃতসঙ্কল্প হইয়া চলিয়া গেল। রান্নাঘরে রাঁধা আহার্য্য সামনে করিয়া স্বর্ণলতা হেঁটমুখে বসিয়া বোধ করি বা নীরবে অশ্রুপাতই করিতেছিলেন। মেয়ের পায়ের শব্দে চকিতচক্ষুতে চাহিয়া দেখিয়া ঈষৎ সঙ্কুচিত হইলেন, সে-ও যে তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিতেই আসিতেছে, এ বিষয়ে তাঁ'র মনে কোন দ্বিধাই ছিল না।

কিন্তু রূঢ় ও কঠিন সম্ভাষণের পরিবর্ত্তে মেয়ে ডাকিল, "মা!"—তাহার গলার অতি নম্র ও অত্যন্ত ব্যথিত স্বরে জননীর নিজের অন্তরের রাশি রাশি পুঞ্জীভূত অকথ্য বেদনা-সিন্ধু উথলিত হইয়া উঠিতে গেল। অতিশয় মর্ম্মভেদী বিলাপ-পূর্ণ কণ্ঠে তিনি প্রত্যুত্তর দিলেন, "মা!"

"তুমি উনোন নিবিও না, মা, আমি ভাল ময়দা, ঘি, হাঁসের ডিম, আলু সব বামাকে দিয়ে আনিয়ে দিচ্ছি। সেই সব দিয়ে দাদাদের খাবার ক'রে দিতেই হবে, না হ'লে দাদা না খেয়ে এক্ষুণি চ'লে যাচ্ছে।"

স্বর্ণলতা তড়িৎস্পৃষ্টার মতই চমকিয়া চাহিলেন; তাঁহার অবরুদ্ধ বক্ষ ঠেলিয়া ক্ষুধিত প্রাণের আর্ত্ত স্বর ছুটিয়া বাহির হইল, "ও সব তুই কোথায় পাবি, মা? কোথা থেকে আনবি?"

নীলিমা সঙ্কল্পদৃঢ় স্থির স্বরে সংক্ষেপে শুধু উত্তর করিল, "সে আমি আনাচ্ছি কি না, দেখো না! আমি এক্ষুণি আসচি?"

ঘণ্টা দুইএর ভিতরেই আহার্য্য প্রস্তুত হইয়া গেলে প্রফুল্ল স্মিতমুখে নীলিমা আসিয়া দ্বারের নিকট দাঁড়াইল। ইতো-মধ্যে একটা চিরপরিত্যক্ত ঘরকে ঝাঁটপাট দিয়া একখানা তক্তপোষের উপর ময়লা তোষক ফর্সা চাদরে ঢাকা দিয়া সে শুভেন্দুদের বসিবার স্থান করিয়া দিয়া গিয়াছিল; একটি বহুদিনের সঞ্চয় পোরসিলেনের বাতিদানীতে একটি বাতি কিনিয়া আনিয়া সে জ্বালিয়া দিয়াছিল। শুভেন্দু সেইখানে শুইয়া ক্ষুধার জ্বালায় জ্বলিতে জ্বলিতে মনে মনে নিজের পিতা হইতে আরম্ভ করিয়া সুশীলের পিতার পর্য্যন্ত মুণ্ডপাত করিতেছিল এবং বিলম্ব দেখিয়া নীলিমার কৃতকার্য্যতার উপরেও ভীষণ সন্দিহান হইয়া পড়িয়া উহাকে একান্তভাবে গালি পাড়িতেছিল। অবশ্য ইহাও মনে মনে। সুশীল কয়েকবার কথাবার্ত্তার চেষ্টা করিয়া বন্ধুর নিকট ধমক খাওয়ায় নিরুপায়ে চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। রান্নাঘরে স্বর্ণলতার নিকট উপস্থিত হইবার প্রবল লোভ হইতে থাকিলেও শুভেন্দুর মনের অত্যন্ত বিরক্ত অবস্থা

দেখিয়া ভরসা করিয়া সে কথা সে প্রকাশ করিতে পারে নাই। অথচ শুভেন্দুর এই আগ্রহহীন মাতৃমিলনের সকল ব্যর্থতাই তাহার মাতৃহীন চিত্তকে ঐ বিস্ময়ে ব্যথায় যেন স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছিল। সেই সঙ্গে ঐ দুঃখসহিষ্ণু দীন-মূর্ত্তি অভাগী নারীর জটিল জীবনযাত্রার চিত্র তাহার গভীর সহানুভূতিপূর্ণ তরুণ চিত্তকে যেন মমতার মন্দাকিনীধারায় অভিষিক্ত করিতে লাগিল। সুশীলের অত্যন্ত আগ্রহ হইতে লাগিল, আহা, যদি সে ঐ বেদনাভারাতুর স্নেহ-বুভুক্ষিত মাতৃহৃদয়কে নিজের ক্ষুধিত চিত্তের ভক্তিপ্রেমে ভরাইয়া তুলিতে পারিত!

নীলিমার হাতে পূর্ব্বে কতকগুলা কাঁচের চুড়ি থাকিত, এখন তাহাও ছিল না। মিশনের অনেক মেয়ে ও টিচারের অনুকরণে সে এখন শুধু হাতেই থাকে। বাজারের সব চেয়ে কম দামী বাজে চুড়ি ঘৃণা করিয়াই সে পরে না। নিজের আসার আগমনী জানাইবার কোন উপায় না থাকায় অগত্যাই সেইখানে থাকিয়া সে ডাকিল, "দাদা!" শুভেন্দুর বোধ করি একটুখানি তন্দ্রা আসিয়া থাকিবে, তাই তাহার সাড়া না পাইয়া অগত্যা সুশীলের দিকে ফিরিয়া মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "মা জিজ্ঞেস করলে, আপনাদের খাবার এইখানেই আনা হবে?"

সুশীল এই প্রশ্নে একেবারে ত্রস্ত হইয়া উঠিল। আগ্রহ-উত্তেজিত কণ্ঠে সে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল,"সে কি,না না. এখানে কেন? এই আমরা তাঁ'র কাছেই যাচ্ছি—শুভুদা! ও শুভুদা! কি বিপদ! ঘুম দিচ্চো নাকি? চল চল, খেয়ে আসা যাক।"

শুভেন্দু ঘুম ভাঙ্গিয়া কাঁচাঘুম ভাঙ্গার বিরক্তিতে মুখ অন্ধকার করিয়া উঠিয়া বসিল এবং সামনেই নীলিমাকে দেখিতে পাইয়া বিরক্তিনীরসকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "হ্যালো! কি ব্যাপার বল ত? ছাই-পিণ্ডি কি দেবে, দিয়েই ফেল না কষ্ট ক'রে, আশায় আশায় আর কতক্ষণ রাখবি? রাত তো শেষ হয়ে এল এদিকে।"

শুভেন্দুর নিজের বোনের প্রতি এই শুষ্ক সম্ভাষণে সুশীল যেন চোর হইয়া গেল। সে শুষ্ক মুখে উঠিয়া তাড়াতাড়ি শুভেন্দুর হাত ধরিয়া তাহাকে বলিল, "উনি তো আমাদের কখন্ থেকেই ডাকাডাকি করছেন; তোমারই যে ঘুম ভাঙ্গে না।"

আহারে বসিয়া শুভেন্দু আয়োজন দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল। ঘুমাইয়া সে স্বপ্ন দেখে নাই ত? কলের ময়দার ধপধপে ফুল্‌কো লুচি, পটল আলু ভাজা, হাঁসের ডিমের কালিয়া, কিসমিসের চাটনী, সন্দেশ রসগোল্লা, এক-খানা রেকাবে কয়েকটুকরা বোম্বাই আম। শুভেন্দু বিস্মিত উল্লাসে উচ্চধ্বনি করিয়া উঠিল "হ্যালো! এ বাড়ীতে কি কর্ত্তা বদল হয়ে আমি বাড়ীর মালিক হয়েছি নাকি? এ সব কোথা থেকে এলো? নেল! তোর খৃশ্চান স্কুলের টিচাররা কি তোকে আলাদীনের প্রদীপ দিয়েছে নাকি রে? বাঃ বাঃ, খাসা মেয়ে তুই!"

স্বর্ণলতার প্রীতিপ্রসন্ন সজল চোখের স্নিগ্ধ দৃষ্টি গভীর স্নেহে নীলিমার আনত মুখের উপর নীরব আশীর্ব্বাদের কিরণ বর্ষণ করিয়া আসিল, সে যে আজ এই আনন্দ-মিলনের দিনকে ব্যর্থ হইতে না দিয়া মায়ের প্রাণকে এই একটি দিনের জন্যও সার্থকতার সুখে ভরিয়া তুলিতে সহায়তা করিয়াছে, তাহার মূল্য যে এই চিরদুঃখিনীর কাছে কত বড়, তা অন্তর্যামী ভিন্ন জানিবে কে? সুশীল সকল কথা না বুঝিলেও স্বর্ণলতার আনন্দস্মিত মূর্ত্তিখানি বিপুল আনন্দে পূর্ণ হইয়া নিরীক্ষণ করিল ও তাহার পর তাঁহারই দৃষ্টির অনু-সরণে অদূরবর্ত্তিনী স্তব্ধস্থিত পাষাণমূর্ত্তিটির মতই অচলা তরুণীর মুখের দিকে সস্নেহ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল। কেবল সেই আনন্দমিলনের সকলটুকু আনন্দের বাহিরে গভীর ভারাক্রান্ত ও নিরানন্দ হইয়া রহিল নীলিমার অপরাধ-পীড়িত মন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

স্বামিস্ত্রীর মধ্যে প্রেম সর্ব্বত্র থাকে না; কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই তাহার একটা ভাণও থাকে; স্বর্ণলতাদের দাম্পত্য-জীবনে আর যাই কিছু থাক না কেন, ইহার ভিতরে মিথ্যার কোন আবরণই ছিল না। বিগতপ্রায় যৌবনসীমায় পৌঁছিয়া কোন অতীত স্মৃতি আঁকড়িয়া ধরিবার জন্য এই প্রৌঢ় দম্পতীর প্রাণের কোণেও বুঝি কখনও ব্যাকুলতাটুকু জাগে নাই। স্ত্রী ঘরকরণার যন্ত্রস্বরূপই ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছিল, সহসা আজ নিঝুম স্তব্ধ রজনীর ঠিক মধ্য-যামে নিদ্রাভঙ্গ হইয়া অনেকক্ষণ বিনিদ্রাবস্থায় চিন্তার পরে

কি যেন একটা সঙ্কল্প স্থির করিয়া লইয়া অনুকূলচন্দ্র শয্যা ত্যাগ করিলেন। গৃহিণীকে সচিবের পদ দিবার প্রয়োজন ঘটিয়াছিল। পাশের ঘরেই স্বর্ণলতা নীলিমার সহিত গভীর নিদ্রামগ্না। অন্ধকারে আন্দাজে আন্দাজে ঘরের মধ্যে অগ্রসর হইয়া আসিয়া চাপাগলায় অনুকূল ডাকিলেন, "গিন্নি! বলি ওগো! একবার উঠে এস ত!"

ঘুমের ঘোরে ধড়মড়িয়া উঠিয়া বসিয়া অর্দ্ধ সন্দেহে স্বর্ণলতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে?"

"ওগো, আমি; বলি একবার এসোই না, আমার এই বুকটায় কেমন একটা ব্যথা ধরলো; একটু হাত বুলিয়ে দাওসে দেখি।"

স্বর্ণলতা মনে মনে ইষ্টদেবকে স্মরণ করিলেন, ভাগ্যে ঘণ্টা দুই পূর্ব্বেই এই ব্যথাটা ধরে নাই!

নিজের বিছানায় ফিরিয়াই অনুকূলচন্দ্রের ব্যথার সেবা করাইবার ইচ্ছাটা সহসা বদলাইয়া গেল। তিনি তখন অত্যন্ত চাপা গলায় মৃদুস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "দেখ, তোমার ওই আইবড় কার্ত্তিক ধেড়ে মেয়েটাকে পার করবার এমন সুযোগ আর কখনও এ জন্মে পাবে না! ভুবন রায়ের ছেলেটাকে যদি হাত ক'রে ওর গলায় মেয়েটাকে গছাতে পার, তা'রই জন্যে কাল থেকে লেগে পড় দেখি। যেমন ক'রে হোক, এ কায করতেই হবে।"

এই প্রস্তাব অকস্মাৎ এমন অপ্রত্যাশিতভাবে পাইয়া স্বর্ণলতা ভীষণভাবে চমকিয়া উঠিলেন ও তাঁহার মুখ দিয়া আচম্‌কা বাহির হইয়া গেল—"আমার কপালে এত সুখ কি হবার? সুশীল আমার জামাই হবেন!"

অনুকূল স্থিরসঙ্কল্পের স্বরে জবাব দিল, "কেন হ'বে না? অতবড় তৈরি মেয়ে রয়েছে, ছেলেও খোকাটি নয়; দুটোকে মেলা মেশা করতে দাও, মেমসাহেবের মত, তা'র পর থেকে নিজেই বিয়ে করতে চাইবে। সাহেবদের ত ওই রকমই হয়ে থাকে।"

স্বামীর চিরজীবনের সকল যুক্তি নির্ব্বিচারে ও নির্ব্বিবাদে পালন করাই স্বর্ণলতার অভ্যাস; তাহাতে মন সায় দিক আর না-ই দিক, প্রতিবাদ তিনি কখন করেন না; কিন্তু আজিকার এই পরামর্শটি তাঁহার বেশ মনঃপূত হইলেও তিনি ইহাকে নির্ব্বিচারে ও নির্ব্বিবাদে গ্রহণ করিতে পারিলেন না। আশাহতভাবে ক্ষীণ প্রতিবাদে উত্তর করিলেন, "সুশীলের বাপ রয়েছে, সে কি নিজের ইচ্ছায় বিয়ে করতে পারে? তার চেয়ে ভুবন বাবুকে বল্লে হয় না যে, যদিই তিনি দয়া ক'রে ওকে নেন, তাঁর দয়ার তো শেষ নেই, যদিই—"

অনুকূল অসন্তোষের চুক্ চুক্ শব্দ করিয়া উঠিলেন, "ওগো, তোমার দয়ার সাগরকে সে কথা আমি বলতে ভুলে যাইনি। তিনি তাহার কাটান্ জবাব বহুকাল পূর্ব্বেই দিয়ে দিয়েছেন। কোন্ বড়লোকের মেয়ের সঙ্গে ছেলের ছোটবেলা থেকে কথা দিয়ে গরীবের মেয়েদের পথ বন্ধ রেখেছেন। ছোক্‌রা চালাক কি কম! দেখছো না, তোমার ছেলেটাকে কি রকম জেণ্টেলম্যান বানিয়ে ফেলেছে। তুমি কি মনে কর, ওকে নিজের জামাই করবার মতলব ওর মনে নেই! তাই আমিও তা'র শোধ নেব ভেবেছি। ওর কাছে ছেলের বিয়ের টাকা তো আর চাইতে যেতে পারব না, ছেলে তো ওরই হাতে, তাই যখন হাতে পেয়েছি, তখন ওর ছেলেকেও আমি ছাড়ছি নে। ওর ঘাড়ে নীলিকে গছাবো, তবে আমার নাম অনুকূল চক্রবর্ত্তী। ছেলে নিজে যেচে বিয়ে না করে, জবরদস্তিতে করবে।"

স্বর্ণলতার বুকের ভিতর আশার ক্ষীণ শিখা নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়া যেটুকু তীক্ষ্ণ ব্যথা মোচড় দিয়া উঠিয়াছিল, তাহাকেও আড়াল করিয়া সহসা এই কথায় জাগিয়া উঠিল—প্রচণ্ড একটা আতঙ্ক। সর্ব্বশরীরমনে শিহরিয়া উঠিয়া তিনি আর্ত্তস্বরে কহিয়া উঠিলেন, "অমন কথা বলো না। সুশীলের বাপের মতের বিরুদ্ধে সে কেন তোমার মেয়ে বিয়ে করতে যাবে? তুমিই বা তাকে কোন্ হিসাবে সে কথা বলবে? সে কায নেই—সে কায নেই, আমাদের তেমন কপাল নয়।"

স্বর্ণলতার হতাশাক্ষুব্ধ ও ভয়ার্ত্ত কণ্ঠস্বরকে চাপা দিয়া অনুকূলের ক্রুদ্ধ কণ্ঠ সপ্তমে বাজিয়া উঠিল, সেই শব্দে জানালার বাহিরে ফাটলে উপবিষ্ট একটা কালপেঁচা অকস্মাৎ ভয় পাইয়া চ্যাঁ চ্যাঁ করিতে করিতে চেঁচাইয়া উঠিয়া উড়িয়া গেল। স্বর্ণলতার দুর্ব্বল বুক দুর্ দুর্ করিয়া উঠিল।

"কপাল আমি তৈরী করব। কপাল আবার কি? কপাল নিজের হাতে, এমন সুযোগ আমি নষ্ট হ'তে দেবো না, এ মানুষ দু'বার পায় না। তুমি আমায় সাহায্য

না কর, চুপ ক'রে ব'সে থাক, কোন রকমে বাধা দিয়েছ কি মরেছ! জেনে রেখে দিও।"

একটা ঘোর অমঙ্গলের আশঙ্কায় স্বর্ণলতার বাম অঙ্গ স্পন্দিত ও তাঁহার সর্ব্বশরীর স্বেদজলে অভিষিক্ত হইয়া গেল। শ্বাস-প্রশ্বাস তাঁহার জীর্ণ বক্ষের মধ্যে যেন চাপিয়া থাকিয়া বহিরাগমনে একান্ত অসম্মতি জ্ঞাপন করিতে লাগিল। তাহার পর কোন্ সময়ে মাথা ঘুরিয়া তিনি যে সশব্দে ঘরের মেজের উপর মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া গিয়া সংজ্ঞা হারাইলেন, তাহা তিনি জানিতেও পারিলেন না।

যখন তাঁহার চৈতন্যোদয় হইল, অবসন্ন দেহভার নিতান্তই হালছাড়া অবস্থায় পৌঁছিয়াছে। অন্তর্জ্ঞানের উদয় হইলেও তাহার বহিঃপ্রকাশ অতি ধীরে অত্যন্ত বিলম্বে একটু একটু করিয়া প্রকটিত হইতে লাগিল। মনে হইল, চিরসংযমের বাঁধভাঙ্গা এ অবসাদ আর কখনও সম্পূর্ণ ঘুচিয়া তাঁহার দেহ-মনকে পূর্ব্বাবস্থায় ফিরাইতে পারিবে না। এই জীবন্মৃত অবস্থাতেই তাঁহাকে থাকিতে হইবে। রাত্রির শেষযামে অকস্মাৎ নিদ্রাভঙ্গে ভীত-ত্রস্ত গৃহবাসী অনুকূলের উচ্চ চীৎকারে তাঁহার কক্ষে সমবেত হইয়া দেখিল, তিনি পাগলের মত বুক চাপড়াইতেছেন ও চেঁচাইতেছেন, "গিন্নি! ওগো গিন্নি! বলি গিন্নি! ওগো, সত্যি কি আমায় ফেলে চ'লে গেলে নাকি? হ্যাঁ গা, কি রকম পাষাণ তুমি! এমন করেই কি ভাসিয়ে যেতে হয়?"

নীলিমা মায়ের মুখের দিকে চাহিয়াই স্তব্ধ ও গতিহীন হইয়া রহিল, এক পা-ও আর সে নড়িতে বা কাছে যাইতেও পারিল না। মা'কে এমন অবস্থায় সে ত আর কখন দেখে নাই।

শুভেন্দু এবং সুশীলও আসিয়াছিল। শুভেন্দু কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া ব্যথিত চোখে মায়ের শাকবর্ণ মুখের ম্লানচ্ছবি দেখিতে লাগিল এবং বাপের কান্নাকে মনে মনে রুষ্ট বিদ্রূপে তিরস্কার করিতে লাগিল। সুশীল শুধু এই সকরুণ দৃশ্যে নিজের আর্দ্রদৃষ্টি কোনমতে ফিরাইয়া এক ঘটি জল ও একখানা পাখা সংগ্রহ করিয়া আনিয়া মূর্চ্ছিতার শুশ্রূষায় মনোযোগী হইতে পারিল।

রোগিণীর চেতনা ফিরিয়া আসিলে অনুকূল হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া সুশীলকে জড়াইয়া ধরিলেন, "বাবা সুশীল! তোমার জন্যেই শুভেন্দুর গর্ভধারিণী এ যাত্রাটা রক্ষা পেয়ে গেলেন, ভাগ্যে তুমি এসেছিলে বাবা! না হ'লে আমার কি হ'ত?"

গতকল্য হইতে এই রুক্ষভাষী, শুষ্কচিত্ত কৃপণের প্রতি যতটাই বিতৃষ্ণা সুশীলের মনে জাগিয়াছিল, ঠিক সেই পরিমাণেই সহানুভূতি এবং শ্রদ্ধা তাহার স্থলাধিকার করিল। বাহিরটা তাহার যতই কঠোর দেখাক, অন্তরের মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন ও প্রচণ্ড প্রেমের নির্ঝর লুকান আছে, ইহা স্থির করিতে তাহার বিলম্বমাত্রও হইল না এবং না জানিয়া অবিচার করার গ্লানিতে সে নিজের প্রতি বিশেষভাবেই বিরক্ত হইল।

মা'কে চোখ মেলিতে দেখিয়া নীলিমা কাছে গেল, স্বর্ণলতার বক্ষে গভীর অবসাদের সঙ্গে সঙ্গেই একটা তৃষিত ব্যাকুলতা ফুটিয়া উঠিল। ব্যাঘ্রী যেমন করিয়া শাবককে আততায়ীর হাত হইতে রক্ষা করিতে চায়, তাঁহার শূন্য দৃষ্টির মধ্যে সেই আগ্রহ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল, রক্তরাগশূন্য পাংশু ওষ্ঠ কম্পিত করিয়া তিনি কি যেন বলিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কণ্ঠের মধ্যে সামান্য একটা অস্পষ্ট শব্দ ভিন্ন আর কিছুই বাহির হইল না। সুশীল তাড়াতাড়ি মুখে এক চামচ জল দিয়া ব্যগ্র হইয়া বলিল, "চুপ করুন, মা, কথা এখন কইবেন না।" তাড়াতাড়ি সে জ্যেঠাইমা'র পরিবর্ত্তে যে স্বর্ণলতাকে শুধু 'মা' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিল, তাহা তাহার নিজের কানে ধরা না পড়িলেও অনুকূল ও নীলিমা দু'জনকারই কানেই উহা ঠেকিয়াছিল এবং ওই একটি শব্দই দু'জনের মনে দুই প্রকার অর্থ বোধ করাইল। নীলিমা এ ঘনিষ্ঠতায় এত বড় বিপদেও যেন একটা কূল দেখিতে পাইল এবং তাহার গুণমুগ্ধ মোহিত মনে তখনই এই কথাটা জাগিল যে, ইহার পর আজই এখনই সুশীল তাহাদের ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে পারিবে না। অনুকূল মনে মনে বলিলেন, "নিজের মুখেই সম্বন্ধটা স্বীকার ক'রে নিলে বাছাধন, আর যাবে কোথায়?"

সে দিন ঘরের ছেলে এবং পরের ছেলে উভয়েরই যাওয়া বন্ধ হইয়া গেল। কেহ কাহাকেও অবশ্য থাকিতে আমন্ত্রণ করিল না, কিন্তু বাড়ীর এই আকস্মিক বিপদে

যাইবার কথাই বা কহিবে কে? তবে খানিকটা বেলা বাড়িলে এবং স্বর্ণলতা অনেকখানি সুস্থ হইয়াছেন বিশ্বাসে নিজের চিন্তায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া শুভেন্দু সবিস্ময়ে ব্যাপারটা ধারণা করিতে গিয়া মনে মনে পরিতপ্ত হইয়া উঠিল। ট্রেণের সময় চলিয়া গিয়াছে মনে পড়িতেই ট্রেণ ফেলের কারণটা মনে পড়িল, মায়ের প্রতি মনটা বিষম বিরক্ত হইয়া উঠিল। মা কি অজ্ঞান হইবার আর দিন বা সময় পান নাই? এই ত এই সময় তাহারা চলিয়া গেলে পর অজ্ঞান হইয়া পড়িলেও চলিত! সুশীল তখনও স্বর্ণলতার মাথার কাছে বসিয়া তাঁহাকে বাতাস করিতেছে, নীলিমা নিতান্ত হতভম্বভাবে তাঁহার পায়ের কাছে বসিয়া আছে। মায়ের অর্দ্ধমুদিতচক্ষুর, শিরাসঙ্কুল পাণ্ডুমুখের ভাবহীনতা ও অতি মৃদু শ্বাসমাত্র জীবিতচিহ্নযুক্ত শীর্ণ দেহ তাহার ভয়ার্ত্ত মনকে যেন নিরাশ্বাসের শেষ সীমায় পৌঁছিয়া দিতেছিল। প্রাণপণে চোখের জলকে সে ঠেলিয়া রাখিলেও সমস্ত বুক জুড়িয়া তাহার একটা প্রবল ক্রন্দনের রোল উঠিয়া তাহার মনটাকে হাহাকারে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতেছিল। তা'র অন্তরের সেই অব্যক্ত আর্ত্তনাদ কেবলই বলিতেছিল, "মা আমার উঠিবেন না।" যে মানুষ জীবনে কখনও এক মুহূর্ত্ত শোয় নাই, তাহার এই যে নিশ্চিন্ত শয়ন, এ যে তাহার শেষ শোওয়া। সে খবর তাহার জানিবার বাকি ছিল না! তাই বুক যেন তাহার ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল।

শুভেন্দু আসিয়া বিরক্তিবিরস মুখে ডাকিল, "নীলি! শুনে যা।"

নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বেও নীলিমাকে উঠিতে হইল।

শুভেন্দু নীরসস্বরে কহিল, "আমাদের আজকের গতিটা কি রকম হবে? ট্রেণ তো ওদিকে ফেল হয়ে গেল, আবার তো চব্বিশটি ঘণ্টা এই পারদঘরে বাস করতে হবে, একটু চা-টা কি দেবে, না আজও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠপ্রদর্শনেই সারবে?"

নীলিমা ভাইএর কথায় ব্যথার উপর বেদনা বোধ করিলেও নীরবে সেটুকু সহিয়া লইয়া তার পর মুখ তুলিয়া বলিল, "জোগাড় ক'রে দিচ্ছি, তুমি মা'র কাছে একটু বসবে?"

শুভেন্দু ঠোঁট বাঁকাইয়া বলিল, "কি করবো ব'সে? আমাদের ডাক্তার সাহেব তো খুব লেগে পড়েছেন দেখতে পাচ্ছি! আমি বাপু ওসবের মধ্যে নেই। জানিওনি কিছু; আর পারিনেও। আচ্ছা, এখন বল দেখি, চা আর কাল রাত্তের সেই ডিমের কালিয়ার ডিম যদি কিছু বাকি প'ড়ে থাকে ত তাই-দুটো হাফ্‌বয়েল ক'রে দাও, দুজনে কোনগতিকে ব্রেকফাষ্টটা সেরে নিই।"

নীলিমার বিষাদবিষণ্ণ মুখ ক্ষণেকের জন্য ঘৃণার বিরাগে আরক্ত হইয়া উঠিল, তার পর সে ভাব দমন করিয়া লইয়া সে সনিশ্বাসে এই কথা মনে মনে ভাবিল যে, মা-বাবার কাছ থেকে ওই বা কি স্নেহ-যত্ন পেয়েছে,যাতে ক'রে ওদের পরে ওর মনে শ্রদ্ধা ভালবাসা জন্মাবে? আমি ত বুঝি মা'র কি দুর্দ্দশা, তবু সকল সময় আমারই মাথার ঠিক থাকে না। ও বেচারীও দুঃখী কম নয়।

অনুকূলচন্দ্র তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকিয়া স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়াই চোখে হাত চাপা দিলেন। কাঁদো কাঁদো গলায় কহিলেন, "গিন্নীর মনে কি শেষে এই ছিল! এমন ক'রে শুয়ে পড়লেন! আহা, সুশীলকে যে একটু যত্ন-আর্ত্তি করবো, তারও আমার উপায়টি আর রইলো না। বাবা সুশীল! তুমি কিছু মনে করো না, বাবা; এ ত তোমারই নিজের ঘরদোর, তুমি নিজে দেখেশুনে নিয়ে কষ্ট ক'রে দুটো দিন থেকে যাও, আমি অকূলে একটু কূল পাই। এ বিপদে আমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত পড়েছে!"

সুশীল প্রবল সহানুভূতিতে বিগলিত হইয়া গিয়া আগ্রহ-প্রদীপ্ত মুখে তাড়াতাড়ি কহিয়া উঠিল, "কিছু ব্যস্ত হবেন না, জ্যেঠামশাই! আমি জ্যেঠাইমা না সারা অবধি যেতেই পারবো না, তা ছাড়া আমি ডাক্তারী পড়চি যখন, তখন আমার একটা কর্ত্তব্যও ত আছে।"

"বটে, তুমি ডাক্তারী পড়ছো, তা হ'লে ত আর কথাই নেই, না হ'লে এই এক্ষুণি মনে করছিলুম, যজ্ঞেশ্বর ডাক্তারকে একবারটি না হয় ডাকিয়েই আনাই। বলি, হঠাৎ এ রকমটাই বা হলো কেন? তা যখন তুমি ডাক্তার রয়েছ, তখন আর বাইরের পর ডাক্তার এসে বেশী কি করতে পারবে?"—

সুশীল উৎকণ্ঠিত ও ব্যগ্র হইয়া উঠিয়া তৎক্ষণাৎ কহিল, "আমিও আপনাকে বল্‌ব বল্‌ব মনে করেছিলুম যে, একজন ডাক্তার এনে দেখানই ভাল। আমি মোটে এই থার্ড ইয়ারে উঠেছি বই ত না, চিকিৎসার আমি কি জানি!

এক জন বিচক্ষণ ডাক্তারের দেখা পাওয়া খুব দরকার। আমি তাঁর অ্যাসিষ্টাণ্ট হ'তে পার্‌ব অবশ্য।"

অনুকূল বিস্ময়-প্রদীপ্ত মুখে দ্রুতস্বরে উত্তর করিলেন, "বিচক্ষণ ডাক্তার! তুমি কোন্ ডাক্তারকে কখন্ বিচক্ষণ হ'তে দেখেছ, সুশীল? ঐ যতক্ষণ শিক্ষানবীশ থাকে, ডাক্তার ততক্ষণই ভাল, কলেজ ছেড়ে যেই প্র্যাক্‌টিসনার হলেন, ভিজিট কর্‌লেন, অমনি তাঁ'র মাথাটি খাওয়া হয়ে গেল! কিসে দুটোর যায়গায় চারটে ভিজিট করবেন, এই চিন্তাই তাঁ'র তখন একমাত্র জপমালা হয়ে বস্‌ল, রোগী মেয়ে কি পুরুষ, তাও তখন তাঁ'রা আর ভাল ক'রে দেখবার অবসর পান না। কতকগুলি জিনিষ কাঁচাতেই মিষ্টি থাকে, ডাক্তার তা'র মধ্যে একটি।"

সুশীল যদি ডাক্তারজাতীয় জীবদিগের সকলকেই ঠিক এই প্রকার "ভ্যামপায়ার" জাতীয় বলিয়া বিশ্বাস করিল না, তথাপি এ ক্ষেত্রে যে কারণেই হউক্, তাহাকে শেষে ঐকমত্যটাই জানাইতে হইল। সে প্রতিবাদ বৃথা জানিয়া নীরব হইয়া রোগীর দিকে চাহিতেই দেখিতে পাইল, অসহায় ও আনায়বদ্ধ জীববিশেষের মতই ভাষাভরা মৌন চক্ষুতে স্বর্ণলতা তাহারই মুখের দিকে অনিমেষে চাহিয়া আছেন। সে দৃষ্টির উদ্বেলিত স্নেহসিন্ধু মুহূর্ত্তেই অনুভব করিয়া সুশীলের দুই চক্ষু অশ্রুতে পূর্ণ হইয়া উঠিল এবং দেখিতে দেখিতে তাহারই প্রতিক্রিয়ায় স্বর্ণলতার দু'চোখের কোণ গড়াইয়া দুইটি অশ্রুর ধারা বহিয়া গেল। সুশীল এ আশানিরাশার মিশান অশ্রুস্রোতের মূলানুসন্ধান না পাইলেও সে অশ্রু যে তাহারই এই সেবাটুকু হইতেই সঞ্জাত, এই বিশ্বাসে মনে মনে দৃঢ় হইয়া এই বিচার করিল যে, যেমন করিয়াই হউক্, ইঁহাকে সুস্থ না করিয়া সে এখান হইতে নড়িবে না।

[ক্রমশঃ।

শ্রীঅনুরূপা দেবী।

অতিকায় তিমি



বৃহদাকার তিমি

ডেনমার্কের একটি নগরের নিকটস্থ উপকূলে হঠাৎ এই গ্রীনল্যাণ্ড তিমি আসিয়া পড়িয়াছিল। অগভীর উপকূল-ভাগে আসিয়া পড়ায় নিকটস্থ ধীবরগণের দৃষ্টি সহজেই আকৃষ্ট হইল। তখন চতুর্দ্দিক হইতে এই প্রাণীটির উপর অবিশ্রান্ত রাইফেলের গুলীবৃষ্টি হইতে লাগিল। ক্রমাগত ৪ ঘণ্টা কাল গুলীবৃষ্টি সহ্য করিয়া তাহার ৫৫ ফুট দীর্ঘ বিশাল দেহের গভীরতম প্রদেশ হইতে প্রাণবায়ু নির্গত হইয়া গেল।

মুক্তি ও ভক্তি

৮

ভক্তির স্বরূপ কি, তাহা লইয়া জ্ঞানী ও ভক্ত এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিলক্ষণ মতভেদ আছে। জ্ঞানী বলেন, মোক্ষের সাধন জ্ঞান, জ্ঞানের সাধন ভক্তি। ভক্ত বলেন, মোক্ষ ত চাই না, জ্ঞান চাই বটে; কিন্তু সেই জ্ঞান কি? তাহা যদি ভক্তির সাধন হয়, তবেই তাহা চাই, নচেৎ তাহা ত উপেক্ষাই, ভক্তিই পরম পুরুষার্থ। শুধু পরম পুরুষার্থ বলিলে চলিবে না; ভক্তি পরম বা চরম অথবা পঞ্চম পুরুষার্থ, ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম পুরুষার্থ, মোক্ষ পরম পুরুষার্থ, আর ভক্তি হইতেছে চরম বা পঞ্চম পুরুষার্থ। ভক্তির এই পঞ্চম পুরুষার্থতাবাদ বাঙ্গালার নিজস্ব। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের ইহাই চরম সিদ্ধান্ত। তাঁহার আবির্ভাবের পূর্ব্বে এই ভক্তির পঞ্চম পুরুষার্থতাবাদ শ্রুতি ও পুরাণশাস্ত্রের অন্তর্নিহিত ছিল। দার্শনিকভাবে সর্ব্বপ্রথমে ইহা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আচার্য্য সনাতন গোস্বামী ও রূপ গোস্বামী কর্ত্তৃক প্রচারিত হয়, তৎপরে জীব গোস্বামী তাঁহার ভাগবতসন্দর্ভনামক গ্রন্থে ইহার বিস্তৃতভাবে আলোচনা ও প্রতিপাদন করিয়াছেন। তাঁহাদের পদাঙ্কসরণী অনুসরণ করিয়া এই ভক্তি-রহস্যের আলোচনা করা যাইতেছে। নিজ নিজ অধিকারানুসারে বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে করিতে মানবের অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হয়, ইহা কি দ্বৈতবাদী অথবা অদ্বৈতবাদী সকল আস্তিক দার্শনিকই স্বীকার করিয়া থাকেন। সেই অন্তঃকরণের বিশুদ্ধ অবস্থা না হইলে পরমার্থ বস্তুর দর্শন হয় না, পরমার্থদৃষ্টি হইলে সাংসারিক নিখিল বস্তুনিচয়ের অসারতা বুঝিতে পারা যায়; তাহার ফলে ঐ সকল বস্তুর প্রতি আস্থা কমিয়া যায়। এ পর্য্যন্ত জ্ঞানী ও ভক্তের কোন মতদ্বৈধ নাই, ইহার পরেই কিন্তু মতভেদ আসিয়া পড়ে। জ্ঞানবাদীর মতে ইহার পর সাধকের অন্তঃকরণে বৈরাগ্যবৃত্তি উত্তরোত্তর প্রবল হইয়া উঠে এবং সেই প্রবল বৈরাগ্যের বশে সাধক অহং বা জীবাত্মাকেও ব্যবহারিক বলিয়া পরব্রহ্মে তাহারও বিলয় করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হয়। এই অবস্থায় জীবের ধ্যেয় শুদ্ধ ব্রহ্মতত্ত্ব, এই ধ্যানে জীবতত্ত্ব বিলীন হইয়া যায়, কেবল নির্গুণ নিরাকার সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের উপলব্ধিমাত্রই থাকে, ইহাই হইল জ্ঞানবাদীর চরম লক্ষ্য। দেহ থাকিতে এই প্রকার অহংভাববিবর্জ্জিত ব্রহ্মোপলব্ধির নামই জীবন্মুক্তি। এই প্রকার জীবন্মুক্তি অবস্থায় যদি দেহপাত হয়, তাহা হইলে আর দেহ পরিগ্রহ করিতে হয় না। ইহারই নাম নির্ব্বাণ। অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিকের মতে ইহাই পরমপুরুষার্থ। ভক্তিবাদী বলেন, শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণ প্রভৃতির মধ্যে এই প্রকার মোক্ষের স্বরূপ বর্ণিত থাকিলেও ইহাই যে জীবের চরম পুরুষার্থ, তাহা ঋষিগণের অভিপ্রেত নহে, প্রেম বা ভক্তিই জীবের চরম পুরুষার্থ, ইহাই শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণাদি শাস্ত্রসম্মত এবং ইহাই যে মানবের আত্যন্তিক পুরুষার্থ, তাহা যুক্তি-প্রমাণ স্বানুভূতির দ্বারাও ব্যবস্থাপিত হইয়া থাকে।

শ্রুতি নিঃসন্দিগ্ধভাবে বলিতেছে—"রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বা আনন্দীভবতি, কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ রস আনন্দো ন স্যাৎ।"

(তিনিই রস, এই জীব সেই রসকে লাভ করিয়াই আনন্দ পাইয়া থাকে, সেই আনন্দস্বরূপ রস যদি না থাকিত, তাহা হইলে এই সংসারে কে স্পন্দিত হইত? কে বা বাঁচিয়া থাকিত?)

এই রস কি? ইহা মধুর, অম্ল, কটু, কষায়, তিক্ত ও লবণ এই ৬ প্রকার রসনেন্দ্রিয়াস্বাদ্য রসের অন্তর্ভূত নহে। কারণ, ইহার কোনটিই আনন্দ বা সুখ নহে, এই ৬ প্রকার রসের উপর জীবের স্পন্দন বা প্রাণনের সহিত ঐকান্তিক সম্বন্ধও নাই; শ্রুতি কিন্তু স্পষ্টই বলিয়া দিতেছে, এই আনন্দময় রস না থাকিলে সকল প্রকার স্পন্দন বা জীবন কথামাত্র শেষ হইয়া পড়ে। সমাধি ও সুষুপ্তিদশায় জীবন থাকে, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ৬টি রসের কোনটিরও আস্বাদন হয় না; সুতরাং এই শ্রুতিনির্দ্দিষ্ট রস যে উক্ত ষড়বিধ লৌকিক রসের অন্যতম নহে, তাহা সিদ্ধ হইতেছে। তবে কি ইহা কবিসমাজে প্রসিদ্ধ শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ প্রভৃতি

নববিধ রসের অন্যতম ? তাহাও হইতে পারে না ; কারণ, এ সংসারে কাব্য-রসের আস্বাদন ব্যতিরেকে অনেক শিক্ষিত বা অশিক্ষিত মানব বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে, শ্রুতি কিন্তু বলিতেছে, এই আনন্দময় রস না পাইলে কেহই জীবিত থাকিতে পারে না, তবে এ রস কি ? ভক্তি-সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ বলেন, এই রস প্রীতি বা প্রেম ; লোকে ইহারই নাম ভালবাসা, এই প্রীতি বা ভালবাসার উপর বিশ্বপ্রপঞ্চ প্রতিষ্ঠিত আছে, ইহারই জন্য বিশ্বপ্রপঞ্চ নির্ম্মিত হইয়াছে, আবার ইহাতেই তাহা মিশিয়া যাইবে।

এই রসময় প্রীতিকে আনন্দ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া শ্রুতিও ইহাই বলিতেছে—

"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্তি অভিসংবিশন্তি।"

(এই আনন্দ হইতেই প্রাণিনিচয় আবির্ভূত হয়, আবির্ভূত হইয়া ইহার দ্বারাই তাহারা জীবিত থাকে, আবার প্রলয়ের সময় তাহারা ইহাতেই মিশিয়া যায়।)

এই প্রীতি বা রস, ইহা নিত্য, জীবহৃদয় ইহার অভিব্যক্তির স্থান বা অধিষ্ঠান, দেহাত্মাধ্যাসকলুষিত অন্তঃকরণে ইহার অভিব্যক্তি হইলে ইহা কাম নামে অভিহিত হয়। এই প্রীতি ও কামের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া কবিরাজ গোস্বামী চৈতন্যচরিতামৃতে বলিয়াছেন—

"কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছা ধরে প্রেম নাম,
আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছা তারে বলি কাম।"

এই পয়ারটির মধ্যে যে গভীর দার্শনিক তত্ত্ব সংক্ষিপ্তভাবে বিবৃত হইয়াছে, তাহার বিশদ ব্যাখ্যান ব্যতিরেকে রসতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হয় না, এই কারণে এইক্ষণে তাহাই করা যাইতেছে।

প্রথমেই দেখিতে হইবে যে, এই রস বা প্রীতি যাহা অন্তঃকরণে অভিব্যক্ত হয়, তাহার স্বরূপ কি, অর্থাৎ তাহা জ্ঞানবিশেষ বা ইচ্ছাবিশেষ অথবা তাহা জ্ঞান ও ইচ্ছার বিষয় আনন্দস্বরূপ কোন পদার্থ।

প্রেমভক্তি-সম্প্রদায়ের আচার্য্য গোস্বামিগণ বলেন, ইহা কেবল জ্ঞানও নহে, কেবল ইচ্ছাও নহে অথবা কেবল আনন্দও নহে। তবে ইহা কি ? তাহারই উত্তর দিতে যাইয়া শ্রীজীব গোস্বামী প্রীতিসন্দর্ভে বলিয়াছেন,—

"এতদুক্তং ভবতি প্রীতিশব্দেন খলু মুৎপ্রমদহর্ষানন্দাদিপর্য্যায়ং সুখমুচ্যতে, ভাবহার্দ্দসৌহৃদাদিপর্য্যায়াপ্রিয়তা চ উচ্যতে। তত্র উল্লাসাত্মকো জ্ঞানবিশেষঃ সুখং, তথা বিষয়ানুকূল্যাত্মকস্তদানুকূল্যানুগত-তৎস্পৃহা-তদনুভবহেতুকোল্লাসময়জ্ঞানবিশেষপ্রিয়তা।"

(ভাগবতসন্দর্ভে প্রীতিসন্দর্ভঃ)

এই সংস্কৃতাংশের অনুবাদ এইরূপ—

"ইহাই বলা হইতেছে যে, প্রীতি এই শব্দ দ্বারা সুখ অভিহিত হইয়া থাকে, মুদ, প্রমদ, হর্ষ ও আনন্দ প্রভৃতি শব্দ এই সুখেরই নামান্তর, (কেবল সুখই যে প্রীতি শব্দের অর্থ, তাহা নহে, কিন্তু) প্রিয়তাও এই প্রীতি শব্দের দ্বারা অভিহিত হয়। ভাব, হার্দ্দ ও সৌহৃদ প্রভৃতি শব্দ এই প্রিয়তার নামান্তর। সেই সুখ ও প্রিয়তার মধ্যে সুখ হইতেছে উল্লাস, ইহাও জ্ঞানবিশেষ, আর প্রিয়তাও জ্ঞানবিশেষ ; এই প্রিয়তা বা জ্ঞানবিশেষকেই বিষয়ানুকূল্য শব্দের দ্বারা নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, (শুধু তাহাই নহে) বিষয়ানুকূল্য হইলে সেই বিষয়ের প্রতি যে স্পৃহা হয়, এবং সেই বিষয়ের অনুভব হইতে যে উল্লাস আবির্ভূত হয়, সেই দুইটিও প্রিয়তার স্বরূপ।"

ইহাই হইল উক্ত উদ্ধৃত সংস্কৃতাংশের সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য, ইহার ভিতরে যে দার্শনিক গূঢ় রহস্য নিহিত রহিয়াছে, এক্ষণে তাহারই বিশদভাবে আলোচনা করা যাইতেছে।

এ সংসারে সকল প্রাণীই চাহে সুখ, সুখের জন্য সকলেই সর্ব্বদা ব্যাকুল, সেই সুখ কি উপায়ে পাওয়া যায়, তাহাই জানিবার জন্য সকলে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে ; সেই সাধন বুঝিয়া তাহা সংগ্রহ করিবার জন্য সকলেই সামর্থ্যানুসারে চেষ্টা করিয়া থাকে ; দেহাত্মবাদী নাস্তিক হইতে আরম্ভ করিয়া নির্গুণ ব্রহ্মবাদী পর্য্যন্ত সকল দার্শনিকই এই সিদ্ধান্ত মানিয়া থাকেন এবং তদনুসারে চলিয়া থাকেন। ইহা কেহই অস্বীকার করেন না বা করিতে পারেন না। সুখের সাধন কিন্তু কি, তাহা লইয়াই যত গণ্ডগোল। ব্যক্তিগত রুচি, শিক্ষা, অভ্যাস ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা প্রভৃতির বৈচিত্র্য নিবন্ধন এই সুখসাধন প্রত্যেকের নিকট বিভিন্ন বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে। তোমার নিকট যাহা সুখের সাধন, হয় ত তাহা আমার পক্ষে উদ্বেগের কারণ হইতে পারে ; না হয়, তাহাতে আমার বিতৃষ্ণার উদয় হইয়া থাকে। এই সুখ-সাধন নির্ণয়ে পরস্পর মতভেদ ও রুচির

বৈচিত্র্যই স্বাভাবিক। ইহাকে উপেক্ষা করা চলে না, ইহাই সংসারে সকল বৈষম্যের মূল। এই সুখ-সাধন আয়ত্ত করিবার জন্য জন্ম হইতে মরণ পর্য্যন্ত সকল প্রাণীই সর্ব্বদা সচেষ্ট; ইহারই নাম জীবের জীবনসংগ্রাম। এই সংগ্রামে জয়লাভের সম্ভাবনা না থাকিলেও ইহাতে জয়ী হইবার আশা কাহাকেও ছাড়িতে চাহে না। এই আশাই সকলের জীবনসম্বল, ইহা কে না বুঝে? কিন্তু এই আশাই সকল প্রকার অশান্তির নিদান। পাপ করিয়া, বিপদে পড়িয়া, সর্ব্বনাশের পথে দাঁড়াইয়াও মানুষ এই আশার প্রেরণায় আরও পাপ করিতে প্রবৃত্ত হয়, সুখের—সম্পদের সমুন্নত শৈলশিখরে চড়িয়াও আবার এই নিত্য নবীন আশার প্ররোচনায় অন্ধ মানব অকস্মাৎ লম্ফ দিয়া বিপদের অন্ধতম গভীর গর্ত্তে নিপতিত হয়। এই আশায় তৃষ্ণাই বাড়িয়া যায়। কিন্তু পিপাসা মিটে না, ইহা আসক্তিকে তীব্র করে, কিন্তু ইষ্ট বস্তুকে দুর্ল্লভ ও আশুবিনশ্বর করে। তাই অশান্তির মাত্রা প্রতিদিনই বাড়াইয়া দেয়। এই আশাময়, পিপাসাময়, ও অশান্তিময় আশার কারাগার হইতে নিষ্কৃতিলাভের পথ দেখাইতে যাইয়া দার্শনিক বলেন, ইহার মূল যে দেহাত্মাভিমান, তাহার উচ্ছেদ কর—আত্মার উপর কল্পিত অনর্থময় সংসারকে মিথ্যা ভাবিয়া উড়াইয়া দেও, শান্তি আসিবে, নির্ব্বাণ বা ব্রহ্মসংস্থালাভ অনায়াসেই হইবে। কর্ম্মী বলিয়া থাকেন, নিজ নিজ অধিকারানুরূপ বিহিত কর্ম্ম বিশ্বাসের সহিত করিতে থাক; সুখের নিরবধি সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইবে, সুখের অল্পতা ও দুর্ল্লভতা দূর হইবে, ভূমা বা নিরবচ্ছিন্ন সুখের সহিত শাশ্বত মিলন হইবে, তুমি শান্তি পাইবে, অমর হইবে। ভক্তিসম্প্রদায়ের আচার্য্যগণের মতে এই জ্ঞান ও কর্ম্মমার্গে মানবের আত্মা তৃপ্তিলাভে সমর্থ হয় না, হইতেও পারে না; কারণ, এই দ্বিবিধ মার্গেই মানবের নিজ স্বভাবে বা স্বরূপে অবস্থিতির সম্ভাবনা নাই, প্রীতি বা প্রেমই মানবাত্মার স্বভাব বা স্বরূপ, সেই প্রীতি এক দিকে উল্লাস বা সুখ, অন্য দিকে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর চিরপরিচিত হইলেও প্রতিক্ষণে নূতন প্রিয়তমের অনাবিল অনুভূতি এই দুইএর মিলনের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রিয়তমের প্রতি আনুকূল্য বা স্বার্থগন্ধ-বিরহিত নিত্য বর্দ্ধনশীল সেবাভিলাষ এই অভিলাষময় উল্লাসময় চির-সুন্দরের অনুভূতিই বৈষ্ণব দর্শনে প্রীতি বা প্রেম শব্দের মুখ্য প্রতিপাদ্য। নৈয়ায়িক বা বৈশেষিক বলিবেন, এ কেমন কথা? ইচ্ছা, সুখ ও অনুভূতি আত্মার এই ৩টি বিশেষ গুণ পরস্পর অত্যন্ত ভিন্ন, প্রত্যক্ষসিদ্ধ এই আত্মবিষয়ে গুণত্রয় এক সময়ে হইতে পারে না, অগ্রে জ্ঞান হয়, তাহার পর ইচ্ছা হয়, তৎপরে ঈপ্সিত বস্তুর প্রাপ্তিনিবন্ধন সুখ উৎপন্ন হয়; ইহাই হইল স্বভাবসিদ্ধ নিয়ম। পূর্ব্বোক্ত প্রকার অনুভব, ইচ্ছা ও সুখ এই ৩টি মিলিত হইয়া একাকারে প্রকাশ পাইলে তাহা প্রীতিপদপ্রতিপাদ্য হয়। এই প্রকার শ্রীজীব গোস্বামীর প্রীতিনির্ব্বাচন; সুতরাং প্রমাণসিদ্ধ হইতে পারে না এবং ইহা নিতান্ত নির্যুক্তিক। সর্ব্বত্র ভেদদর্শনশীল নৈয়ায়িক বা বৈশেষিক দার্শনিকের—এই আপত্তি শুনিয়া ভক্ত দার্শনিক বিচলিত না হইয়া, ইহাই বলিয়া থাকেন যে, এই সিদ্ধান্ত নৈয়ায়িক বা বৈশেষিক দার্শনিকের অভিমত না হইতে পারে বটে, কিন্তু তাই বলিয়া যে ইহা প্রমাণসিদ্ধ নহে, তাহা কি করিয়া বলিব? ইষ্ট বস্তুর আস্বাদনের সঙ্গে উল্লাস ও অভিলাষ মিলিত হইয়া থাকে—ইহা স্থির করিবার জন্য প্রবল দার্শনিকের শরণাপন্ন হইবার কোন আবশ্যকতা নাই। তোমার আমার প্রত্যেকের অবাধিত অনুভূতি প্রতিদিনই এই বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এই দেখ না কেন, আমরা যখন কাশীর ভাল লেংড়া বা লক্ষ্ণৌএর সফেদা আম খাইতে বসি, তখন সেই আম্রের সৌরভ, মধুর স্পর্শ ও ঈষদম্ল ও ঘন মধুর রসের অনুভূতি বা আস্বাদনের সঙ্গে সঙ্গে আরও আস্বাদনের ইচ্ছা ও উল্লাস বা সুখ আমাদের একই সময়ে হইয়া থাকে। সেই আস্বাদন-সুখ ও অভিলাষ মিলিত হইয়াই যে আমাদের আত্মাতে প্রতিভাসমান হয়, তাহা ত আমরা বেশ বুঝিয়া থাকি। তুমি হয় ত শপথ করিয়া বলিবে, এই আস্বাদন, অভিলাষ ও উল্লাস এক সময়ে হইতে পারে না বলিয়া, এক সময়ে হইতেছে বলিয়া যে আমার প্রতীতি হইতেছে, তাহা সম্পূর্ণ ভ্রম ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না। তুমি বা আমি এই সকল মনোবৃত্তির ক্রমিকতা বা বিভিন্ন ক্ষণ বুঝিতে পারি না। কিন্তু যুক্তির সাহায্যে স্থির করিয়া লইতেই হইবে, ইহারা এক কালের বা এক ক্ষণের বস্তু নহে, ইহারা ক্রমিক। নৈয়ায়িকের শপথের উপর যাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস, তিনি এ কথা বেদবাক্যের ন্যায় প্রমাণ বলিয়া মানিয়া লইতে পারেন বা মানিয়া লউন, তাহাতে কিছু

আইসে যায় না। সর্ব্বমানবের অবাধিত স্বারসিক অনুভূতিকে যাঁহারা প্রমাণ বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহারা কিন্তু নিঃসঙ্কোচে এই প্রীতিরূপ বস্তুটির জ্ঞান, ইচ্ছা ও সুখরূপতা অঙ্গীকার করিতে কখনই পশ্চাৎপদ হইবেন না বা হইবার উপযুক্ত কোন কারণও খুঁজিয়া পাইবেন না।

তাই বলি, রস বা প্রীতিতত্ত্বের বিচার করিতে যাইয়া এই শুষ্ক তর্কের কচ্ কচি বা আড়ম্বর হইতে দূরে থাকাই একান্ত বিধেয়, সুতরাং এখন প্রকৃতেরই অনুসরণ করা যাউক্।

প্রকৃত কথাটি এই যে, এই রসময়ী প্রীতির সুদৃঢ় ভিত্তির উপর কর্ম্ম ও জ্ঞান যদি প্রতিষ্ঠিত না হয়, তাহা হইলে সেই কর্ম্ম ও জ্ঞান সিদ্ধিকামী মানবের পক্ষে অনর্থক বা ক্লেশকরই হইয়া থাকে—ইহাই হইল উপনিষদের বা তত্ত্বদর্শী আর্য্য ঋষিগণের চরম কথা বা প্রাণের সিদ্ধান্ত। তাই শ্রুতি বলিতেছে,—

"প্লবা এতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপাঃ।"

(দুঃখময় সংসারসাগরে এই সকল বিহিত যজ্ঞরূপ ভেলা—দৃঢ় নহে অর্থাৎ আত্যন্তিক শান্তিলাভের উপায় নহে।)

শ্রীমদ্‌ভাগবতও উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিতেছে,—

"শ্রেয়ঃ স্রুতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্‌যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্॥"

(শ্রেয়োলাভের একমাত্র পথ তোমার এই প্রীতিলক্ষণ ভক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া, হে প্রভো! যাহারা কেবল বোধলাভের জন্য ক্লেশ পাইয়া থাকে, তাহাদের পক্ষে এই জ্ঞানযোগ কেবল ক্লেশেরই কারণ হইয়া থাকে। যেমন শস্যহীন তুষনিকরের অবঘাত করিলে তাহা নিষ্ফল ও ক্লেশকর হয়, তাহাদেরও তদ্রূপ ভক্তিহীন জ্ঞানযোগ নিরর্থক ও ক্লেশকরই হইয়া থাকে।)

প্রেমহীন জ্ঞান ও কর্ম্ম আত্যন্তিক শ্রেয়োলাভের উপায় নহে,—কিন্তু ভক্তিই উপায় হইয়া থাকে, তাহাই বুঝাইবার জন্য ভক্তিশাস্ত্রের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান প্রমাণস্বরূপ ভাগবত বলিতে আরম্ভ করিয়া নৈমিষারণ্যের পরমর্ষিসভায় মুক্তকণ্ঠে সূত ঘোষণা করিয়াছেন,—

"স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥"

যাহা হইতে প্রপঞ্চাতীত ভগবত্তত্ত্বে ভক্তির উদয় হয়, তাহাই মানবসমূহের পর ধর্ম্ম। সে ভক্তি কেমন? যাহাতে ভোগলিপ্সা বা মুক্তিকামনার লেশমাত্র নাই, বিসদৃশ অবস্থানিচয়ের ঘাতপ্রতিঘাতে যাহা কখনও প্রতিহত হয় না—সেই প্রীতিলক্ষণ ভগবদ্‌ভক্তিযোগই প্রকৃত ভক্তিযোগ—তাহার উদয়ে আত্মা সুখময় প্রসাদলক্ষণ পরমশান্তিকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

(আগামী বারে সমাপ্য)

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ।

দৈহিক মিলন

যৌবনে সই প্রথম মিলি দোঁহার তরুণ দেহের টানে
দেহই মোদের দূতী প্রিয়ে এক ঠাঁয়ে সে জুটিয়ে আনে।
দৌত্যে তা'র আজ নেই প্রয়োজন,
তবুও সে মোর জুড়ায় জীবন,
তনুর কাছে কতই ঋণী তা' ত মোদের মনই জানে।

মান-অভিমান দুঃখ-পীড়া লাঞ্ছনা-লাজ শোকের দিনে,
মিলন মোদের মূল্য হারায় তনুর আনুকূল্য বিনে।
দু'টি দেহের মৃণাল-শিরে,
প্রেমের কমল ফুটলো ধীরে,
ইহ জীবন পেয়েছেই সে মৃণাল দু'টির সরস প্রাণে।

মর দেহই পরম্পরায় রাখ্‌লে এ প্রেম অমর করি,
শোণিতনদী বেয়ে আমার ছুটল দেশে প্রেমের তরী।
দেহই মোদের অহরহ,
যুগল-প্রেমের বার্ত্তাবহ,
যুগে যুগে কইল তা' সে ভবিষ্যতের কানে কানে।

শ্রীকালিদাস রায়।



গুলীনিবারক পরিচ্ছদ

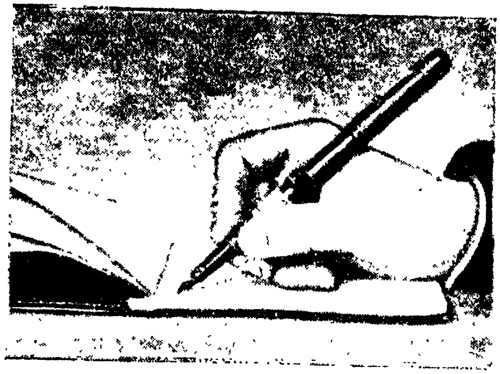
নিউইয়র্কের জনৈক বৈজ্ঞানিক শিল্পী সংপ্রতি এক প্রকার পোষাক তৈয়ার করিয়াছেন, বন্দুক ও পিস্তলের গুলীতে তাহা ভেদ করা যায় না। শিল্পী এই পোষাক প্রস্তুত করিয়া পরীক্ষা দিয়াছেন। তিন জন পুলিসকর্ম্মচারী তাঁহার পার্শ্বে ও বক্ষোদেশে উপর্য্যুপরি পিস্তলের গুলী করিয়া ব্যর্থমনোরথ হইয়াছেন। পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে, সত্যই পিস্তলের গুলী এই পোষাক ভেদ করিতে পারে না। অগ্নিবর্ষণের পর পরিচ্ছদের সংস্পর্শে গুলী সম্পূর্ণ অকর্ম্মণ্য ও চ্যাপটাভাবে ভূমিতলে পড়িয়া গিয়াছিল। মার্কিণ যুবতীরা এইরূপ পোষাক পরিয়া অধুনা অনেকের কাছে গুলী নিবারণের পরীক্ষা দিতেছেন।



পোষাকনির্ম্মাতা পুলিসের নিকট পরীক্ষা দিতেছেন

বাঁশের ফাউণ্টেন পেন

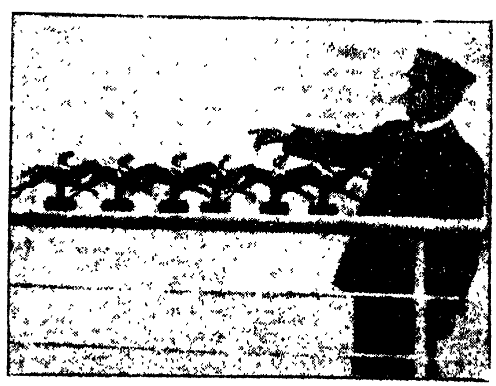
সরু বাঁশ অথবা কঞ্চি হইতে ফাউণ্টেন পেন নির্ম্মিত হইয়াছে। মু[illegible] কাছে কাচের নিব। ইহার মধ্য দিয়া কালি অনায়াসে নির্গত হইতে থাকে। এই কলমের সাহায্যে সাধারণ চিঠি লিখার কাষ ছাড়া, রুল টানা, নকল চিঠি রাখার কাযও স্বচ্ছন্দে নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে।



বাঁশের ফাউণ্টেন পেন্

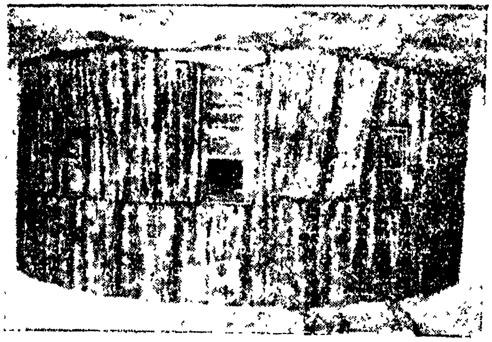
জাহাজে ঘোড়দৌড়

কোনও জাহাজের অধ্যক্ষ যাত্রীদিগকে আনন্দ দান করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার জাহাজে ঘোড়দৌড়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন। অবশ্য জীয়ন্ত ঘোড়ার দৌড় নহে। তিনি কতক গুলি কাঠের ঘোড়া (সওয়ারবিশিষ্ট) তৈয়ার করিয়াছেন। প্রত্যেক ঘোড়ার জন্য রেল পাতা আছে। যাঁহারা ক্রীড়া করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা ঘোড়া বাছিয়া লইয়া সেই রেলের উপর ঘোড়া ছাড়িয়া দেন। রেলের উপর দিয়া কাঠের সওয়ার ও ঘোড়া দৌড়িতে থাকে। এই খেলা দেখিবার জন্য ডেকে দর্শক ভরিয়া যায়।



জাহাজে ঘোড়দৌড়

গাছের শিবির



৪ সহস্র বৎসরের প্রাচীন বৃক্ষত্বকনির্ম্মিত শিবির

কালিফোর্ণিয়া নগরে ভ্রমণকারীদিগের জন্য একটি শিবির আছে। নগরের অনতিদূরে অরণ্যের নিকটেই এই শিবির সংস্থাপিত। প্রায় ৪ হাজার বৎসরের প্রাচীন এক সুবৃহৎ বৃক্ষের ত্বক ও কাষ্ঠ দ্বারা এই শিবির নির্ম্মিত। এই বিরাট মহীরুহের পরিধি ১ শত ৭ ফুট হইবে। শিবিরের চারিদিক ত্বকনির্ম্মিত। গৃহের অভ্যন্তরস্থ আসবাবগুলি বৃক্ষের রক্তবর্ণ কাষ্ঠ হইতে প্রস্তুত। স্থানীয় প্রস্তরে অগ্নিকুণ্ড নির্ম্মিত হইয়াছে। ভ্রমণকারীরা এখানে আসিয়া বিশ্রাম করিতে পারেন এবং নানারূপ সাহায্যও পাইয়া থাকেন।

সৌন্দর্য্যবর্দ্ধনে বিদ্যুৎ

পাশ্চাত্য দেশের রমণীরা দেহের সৌন্দর্য্যবর্দ্ধনের জন্য নানাপ্রকার কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন। সে দেশের



যন্ত্রসাহায্যে মুখের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করা হইতেছে

পুরুষরাও এ বিষয়ে সাহায্য করিবার জন্য নানাবিধ উদ্ভাবনায় রত। দেহের বর্ণ ও মুখকান্তি বৃদ্ধির জন্য সংপ্রতি এক প্রকার যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই যন্ত্র বিদ্যুতের দ্বারা চালিত হয়। বৈদ্যুতিক শক্তিপ্রভাবে বাষ্প জমিলে কাচের ফানুসের মধ্যে মুখমণ্ডল রাখিতে হইবে। এই কাচের আধারে বাষ্পপ্রবাহ সঞ্চারিত করিবার ব্যবস্থা আছে। তাপমান যন্ত্রের (thermometer) সাহায্যে বাষ্পের উত্তাপকে সংযত করিবার ব্যবস্থাও এই যন্ত্রে আছে। কয়েক মুহূর্ত্তমধ্যেই সৌন্দর্য্যবর্দ্ধনক্রিয়া সমাপ্ত হয়। যে পুরুষ বা নারী মুখের সৌন্দর্য্য বাড়াইতে চাহে, সে এই কাচের আধারে একবার মুখমণ্ডল প্রবিষ্ট করাইলেই বাষ্পস্নানে তাহার সৌন্দর্য্য বাড়িয়া যাইবে।

গ্যাস-চালিত নৌকা



বায়ুকক্ষবিশিষ্ট অভিনব নৌকা

ইটালীতে সংপ্রতি মোটরবিশিষ্ট নৌকায় বায়ুকক্ষ (air compartment) রাখিবার ব্যবস্থা করায় জলযাত্রায় বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। সেই নৌকা কখনও জলে ডুবিবে না। নৌকার দুই পার্শ্বে তক্তার ভেলা থাকায় উহা উল্টাইয়া যাইবার সম্ভাবনাও তিরোহিত হইয়াছে। নৌকায় ক্ষুদ্র গ্যাসের এঞ্জিন রাখায় উহার সাহায্যে নৌকা দ্রুত চালিত করিবার সুবিধাও ঘটিয়াছে। এইরূপ নৌকায় কতিপয় যাত্রীও অনায়াসে বসিতে পারে। এই অভিনব নৌকার আবিষ্কার হওয়ায় জলযাত্রা বহুলাংশে যে বিঘ্নশূন্য হইল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

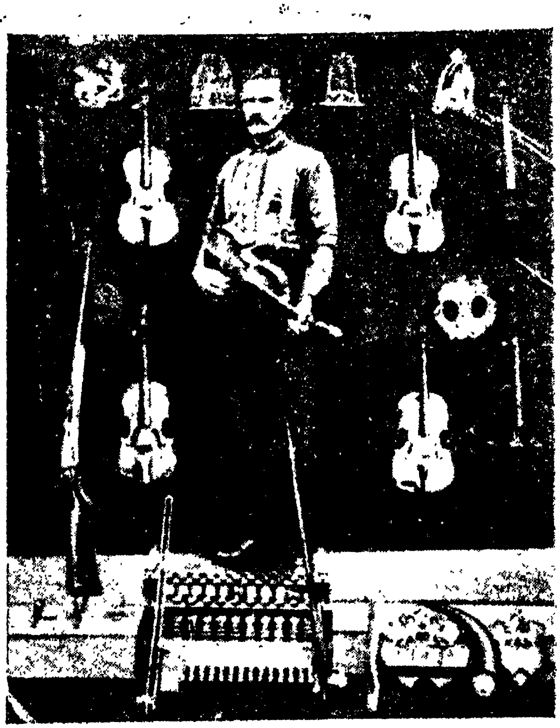


বামের চিত্রে ঝুড়িসহ জননী, মধ্যের চিত্রে শিশুকে ঝুড়িতে বসান হইতেছে, দক্ষিণের ছবিতে শিশুকে বসাইয়া জননী চলিতেছেন।

শিশু বহনের ঝুড়ি

পাশ্চাত্যদেশে মহিলারা অনেক সময় শিশুসন্তানকে লইয়া বায়ুসেবনে গমন করেন। ভারতবর্ষে যাহারা পর্দ্দানসীন নহে, এমন অনেক স্থানের নারী শিশুসন্তান ক্রোড়ে করিয়া অথবা পৃষ্ঠে ঝুলাইয়া কায করিয়া থাকে। পাহাড়ীয়া নারীদিগের মধ্যে এই প্রথাই বেশী দেখা যায়। সংপ্রতি আমেরিকায় সন্তান বহনের সুবিধার জন্য উন্নততর ব্যবস্থা হইয়াছে। সন্তানকে ক্রোড়ে করিয়া থাকা অনেক সময় কষ্টকর হইয়া পড়ে, এ জন্য মাতা ও সন্তান উভয়ের সুবিধা ও আরামের জন্য এক প্রকার ঝুড়ি নির্ম্মিত হইয়াছে। এই ঝুড়িগুলি বেত্র অথবা বেত্রবৎ গুল্ম হইতে নির্ম্মিত। স্কন্ধের উপর দিয়া চওড়া চামড়ার বন্ধনীর সাহায্যে ঝুড়িটি দৃঢ়বদ্ধ থাকে। ঝুড়ির মধ্যে শিশুকে বসাইলে একখানি হাত সম্পূর্ণ মুক্ত থাকে। শিশুর ভারটি স্কন্ধদেশেই অনুভূত হয়। কিন্তু প্রশস্ত বন্ধনী থাকায় স্কন্ধের চর্ম্মে কোন আঘাত লাগে না, কষ্টও হয় না। ঝুড়িটিকে যে কোনও অবস্থায় রাখা যাইতে পারে, এমন ব্যবস্থা আছে। চর্ম্মবন্ধনী ইচ্ছা করিলেই দ্রুত খুলিয়া ফেলা যায়, কিন্তু কোনও আকস্মিক কারণে উহা আপনা হইতে মুক্ত হইবে না।

ছুরির সাহায্যে অপূর্ব্ব শিল্পকার্য্য



কলমকাটা ছুরির প্রস্তুত দারুময় দ্রব্যাদি।

পেনসিলভেনিয়ার জনৈক শিল্পী শুধু কলমকাটা ছুরির সাহায্যে নাকি কাঠের উপর এমন কারুকার্য্য করিয়াছেন যে, নিপুণ শিল্পী নানাবিধ যন্ত্রের সাহায্যেও তেমন উৎকৃষ্ট নক্সা করিতে পারেন কি না সন্দেহ। কাঠ হইতে যে সকল দ্রব্য উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা, এই শিল্পী ছুরির সাহায্যে তাহা অনায়াসে নির্ম্মাণ করিতে পারেন। নানাবিধ বেহালা এমন কি, বারুদ রাখার শৃঙ্গ পর্য্যন্ত তিনি তৈয়ার করিয়াছেন। ইহা শিল্প নৈপুণ্যের পরিচায়ক বটে!



(১) গ্যাসপূর্ণ নল ব্যাগে সন্নিবদ্ধ



(২) পুলিসকর্ম্মচারীরা গ্যাসপূর্ণ নল পরীক্ষা করিতেছে

গ্যাসের সাহায্যে ডাকাইতী বন্ধ

উন্মত্ত জনতাকে নিয়ন্ত্রণ ও দস্যুতস্করকে বাধা প্রদান করিবার জন্য সংপ্রতি পুলিসকে এক অভিনব অস্ত্রে সুসজ্জিত করা হইতেছে। জনৈক মার্কিণ বৈজ্ঞানিক এক প্রকার গ্যাস উদ্ভাবন করিয়াছেন। এই গ্যাস ফাঁপা নলের মধ্যে পূর্ণ করিয়া পুলিস-প্রহরীদিগের হস্তে প্রদত্ত হইতেছে। আধার হইতে গ্যাস মুক্ত হইবামাত্র এমন অবস্থা ঘটে যে, ১০ ফুটের মধ্যে কেহ দাঁড়াইতে পারে না। পুলিস গুলীর পরিবর্ত্তে এই গ্যাসপূর্ণ দণ্ড ব্যবহার করিয়া আশাতীত ফল পাইয়াছে। উল্লিখিত গ্যাসপূর্ণ বোমাও নির্ম্মিত হইতেছে। ব্যাঙ্কের খাজাঞ্চিরা টেবলের নীচে এই বোমা রাখিয়া দেয়। এই বোমা এমনভাবে নির্ম্মিত যে,পায়ের একটু চাপে বোমা হইতে গ্যাস নির্গত হইয়া থাকে। চুরীডাকাইতী নিবারণে এই গ্যাসের বোমা অব্যর্থ। টাকা আদায় করিয়া ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারীরা প্রত্যাবর্ত্তনকালে অনেক সময় পথিমধ্যে দস্যু-তস্করের নিকট লাঞ্ছিত হয় এবং তাহাদের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক টাকা কাড়িয়া লওয়া হয়। এমন ঘটনা নিয়তই সর্ব্বত্র ঘটিতেছে। ইহার প্রতীকারকল্পে এক প্রকার ব্যাগ নির্ম্মিত হইয়াছে। সেই ব্যাগে পিত্তলনির্ম্মিত নলে উল্লিখিত গ্যাস ভরিয়া রাখা হয়। খুব সূক্ষ্ম ও হাল্‌কা চেনের এক প্রান্ত এই নলের গায়ে সংশ্লিষ্ট। অপর প্রান্তে অঙ্গুরীয়। সেই অঙ্গুরীয় বাহকের অঙ্গুলিতে আবদ্ধ থাকে। কেহ বাহকের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক ব্যাগ আকর্ষণ করিতে গেলেই নলের মুখ খুলিয়া যাইবে এবং গ্যাসের প্রভাবে আক্রমণকারীকে সে স্থান ছাড়িয়া পলায়ন করিতে হইবে।



সমুদ্রগর্ভস্থ শুক্তি-রাক্ষস

সমুদ্রগর্ভস্থ শুক্তি-রাক্ষস

পপুয়া দ্বীপের সন্নিহিত সমুদ্রগর্ভে এক জাতীয় বিপুলাকার শুক্তি জন্মে। ইহাদের ওজন প্রায় ৫ মণের অধিক। এই জাতীয় শুক্তির ব্যাদিত মুখের মধ্যে ডুবুরীরা যদি অকস্মাৎ ধরা পড়িয়া যায়,

তাহা হইলে সহসা মুক্ত হইতে পারে না। কারণ, ইহারা ডুবুরীকে এত জোরে চাপিয়া ধরে যে, সে অনেক সময় তাহাদের কবল হইতে আত্মরক্ষা করিতে না পারিয়া প্রাণত্যাগ করে। নিউগিনি প্রদেশের সমুদ্রে প্রবালদ্বীপসমূহ বিদ্যমান। প্রবালাদি সংগ্রহের জন্য ডুবুরীরা প্রায়ই এতদঞ্চলে আসিয়া থাকে, এবং এরূপ দুর্ঘটনাও বিরল নহে।

বিরাট চুরুট



অৰ্দ্ধমণ ওজনের চুরুট

আমেরিকায় এক চুরুটের কারখানায় সংপ্রতি এক বিরাট চুরুট প্রদর্শিত হইয়াছে। চুরুটটি দৈর্ঘ্যে পাঁচ ফুট। ইহার ওজন প্রায় অর্দ্ধ মণ। কনকৃটিকট্ উপত্যকাভূমিতে যে তামাক উৎপন্ন হয়, তাহার পাতা হইতে এই চুরুট তৈয়ার হইয়াছে। এই বিপুলদেহ চুরুটের মূল্য ২ শত ২৫ টাকা।

বালকের তৈয়ারী ডোঙ্গা

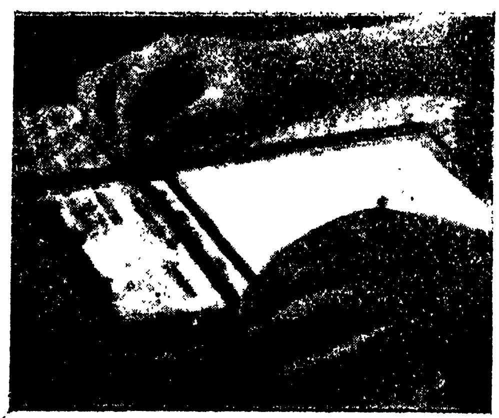
ইংলণ্ডে জনৈক বালক এক অপূর্ব্ব নৌকা বা ডোঙ্গা তৈয়ার করিয়াছে। এই নৌকায় এক জন মাত্র লোক বসিতে পারে। ডোঙ্গা যে ভাবে চালান হইয়া থাকে, এই নৌকা চালাইবার প্রণালীও ঠিক সেইরূপ। বালক যে দিন এই নৌকাখানি টেমস্ নদে ভাসাইয়া দিয়াছিল, সে দিন অসংখ্য লোক ইহা দেখিবার জন্য সমবেত হইয়াছিল।



বালকের নির্ম্মিত অপূর্ব্ব নৌকা।

অন্ধের সোজা লিখিবার প্রণালী

অন্ধ ব্যক্তি যাহাতে সোজাভাবে লিখিতে পারে, এ জ ধাতব ফ্রেমযুক্ত কাগজের প্যাড্ নির্ম্মিত হইয়াছে। আড় আড়িভাবে একটা ব্রাকেট এই ফ্রেমের উপর সন্নিবিষ্ট এই ব্রাকেটের মধ্যে মাত্র এক ছত্র লিখা যাইতে পারে সে ছত্র শেষ হইলে ব্রাকেট সরাইয়া আবার পরের ছ লিখা চলিবে। এই উপায় উদ্ভাবিত হওয়ায় অন্ধগণ অত পর সোজা লিখিতে পারিবে।



অন্ধের সোজা লিখিবার যন্ত্র

নিউইয়র্কের সর্ব্বোচ্চ সৌধ



উলউইচ্ সৌধ

নিউইয়র্ক সহরে একটি ৫৫ তল অট্টালিকা আছে। ইহার মত উচ্চ সৌধ নিউইয়র্ক সহরে আর নাই। ইহার নাম 'উল্‌উইচ্ বিল্ডিং।' ৩ কোটি ৩০ লক্ষ টাকায় উক্ত অট্টালিকা বিক্রীত হইয়াছে। এই ৫৫ তল বাড়ীর উচ্চতা ৭ শত সাড়ে ৯৩ ফুট।

অভিনব সিগারেট-আধার

অঙ্গুলিতে কোনরূপ দাগ লাগিতে না পারে, এ জন্য জনৈক শিল্পী, চুরুটিকা রাখিবার এক নূতন উপায় উদ্ভাবিত করিয়াছেন। একটা অঙ্গুরীয়ে নবোদ্ভাবিত ক্ষুদ্র আধারটি সংলগ্ন করিয়া দিলে তাহাতে নিরাপদে চুরুটিকা রাখা যাইতে পারে। ইহাতে ধূমপানেরও বিশেষ সুবিধা এবং ধূমপানকালে কোন প্রয়োজনে হস্ত ব্যবহার করিতে হইলে টেবলের উপর অথবা অন্যত্র সিগারেট রাখিবার প্রয়োজন ঘটে না। যখন ধূমপানের প্রয়োজন না থাকে সে সময় ইচ্ছামত আধারটি অঙ্গুরীয় হইতে খুলিয়া রাখা চলে; অথবা না খুলিয়া লইলেও বিশেষ কোন অসুবিধা ঘটে না।



সিগারেট রাখিবার অভিনব উপায়

রেডিও সাহায্যে মনের কথা বলা

আমেরিকায় ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে যে, রেডিও সাহায্যে মনের কথা বলিয়া দেওয়া যায়। নিউইয়র্ক নগরে রেডিও প্রদর্শনীতে এক নারীমূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার নামকরণ হইয়াছে 'ম্যাদাম্ রাডোরা।' তারহীন বার্ত্তাপ্রণালীর সহায়তায় এই মূর্ত্তির মুখ হইতে কথা নির্গত হয়, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির স্পন্দনাদি সম্পাদিত হইয়া থাকে। যে টেবলের উপর এই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত, তথায় কোনও প্রকার তারের সংস্রব নাই। যদি কেহ প্রমাণ করিয়া দিতে



রেডিও সাহায্যে মনের কথা বলা হইতেছে

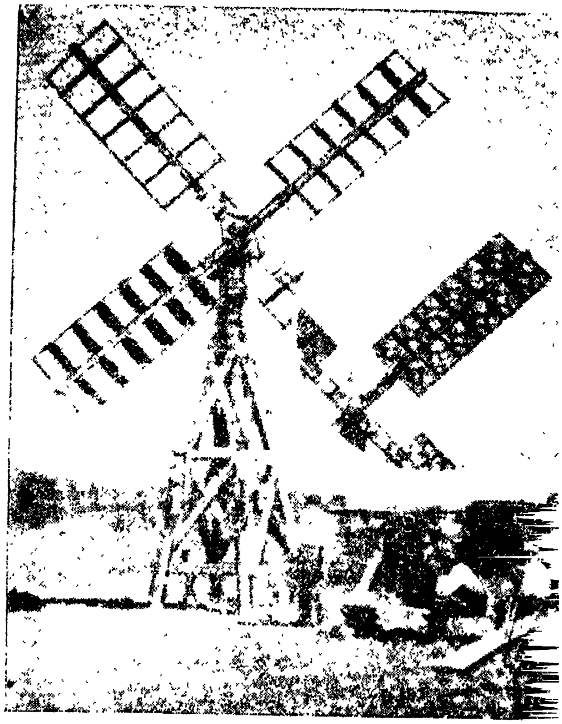
পারেন যে, কোনও প্রকার তারের সংস্রব এই মূর্ত্তিতে বিদ্যমান, তাহা হইলে কর্ত্তৃপক্ষ প্রচুর অর্থ পুরস্কার দিবেন, এমন ঘোষণাও করিয়াছেন। যাঁহারা মনের কথা জানিবার প্রয়াসী, তাঁহাদিগকে একে একে ম্যাদাম্ রাডোরার সম্মুখবর্ত্তী এক বিশেষ স্তম্ভে হাত রাখিয়া দাঁড়াইতে হইবে। এই স্তম্ভে বৈদ্যুতিক সংস্রব আছে। প্রশ্নকারী পুরুষ অথবা নারী সেই অবস্থায় দাঁড়াইবামাত্র ম্যাদাম রাডোরার দেহ সম্মুখবর্ত্তী বর্ত্তুলাকার পদার্থের উপর নত হইয়া পড়ে এবং যে প্রশ্ন করা হয়, রমণীকণ্ঠস্বরে তাহার উত্তর প্রদত্ত হয়।

হস্তিপদনির্ম্মিত পাত্র

জার্ম্মাণীতে হস্তিপদ হইতে বাজে কাগজ রাখিবার ঝুড়ি, তামাকের আধার প্রভৃতি নির্ম্মিত হইতেছে। উপবিভাগে ধাতব চাকতি সন্নিবিষ্ট করিয়া তাহাতে কব্জা ও ডালা লাগান হইয়া থাকে। জার্ম্মাণীতে কোনও বস্তুর অপচয় ঘটে না। এই হস্তিচরণনির্ম্মিত আধারগুলি তথায় বেশ চলিতেছে। স্থায়িত্ব হিসাবে ইহাদের উপযোগিতা আছে।

বায়ুতাড়িত যন্ত্র দ্বারা ক্ষেত্রে জলসেচ

য়ুরোপের হল্যাণ্ড দেশে বহুদিন হইতেই এক প্রকার বায়ু-চালিত যন্ত্রের সাহায্যে শস্যক্ষেত্রে জলসেচন করা হইয়া থাকে। সম্প্রতি ক্যান্‌সাসে এই প্রণালী অবলম্বনপূর্ব্বক জলসেচ করা হইতেছে। এইরূপ একটি যন্ত্রের সাহায্যে



বায়ুতাড়িত যন্ত্র দ্বারা ক্ষেত্রে জলসেচ

পাশাপাশি ৭৫ ফুট গভীর দুইটি কূপ হইতে জল তুলিয়া ৮ একর ভূমিতে পর্য্যাপ্তপরিমাণে জলসেচন করিতে পারা যায়। বায়ুবেগে ইহার পাখাগুলি ঘুরিলে পম্পও কার্য্য করিতে থাকে। পাখাগুলি দিবারাত্রি ঘুরিতেছে; কারণ মৃদু পবনেই ইহারা সঞ্চালিত হয়। বেগে বায়ু বহিলে পম্পের ক্রিয়াও দ্রুত হয় ও প্রচুর পরিমাণে জল উঠিতে থাকে।



হস্তিচরণনির্ম্মিত নানাবিধ আধার

পাহাড়ের উপর জাহাজ-বাড়ী

আমেরিকায় ওক্‌ল্যাণ্ড, কালিফ‌্‌এ—পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চ শিখরে একটি প্রশস্ত কৃত্রিম হ্রদ নির্ম্মিত হইয়াছে। এই হ্রদের মধ্যস্থলে, সৌখীন বড়লোকের সমুদ্রগামী ক্ষুদ্র জলযানের আকার-বিশিষ্ট একটি বাঙ্গলোও (বাটী) গঠিত হইয়াছে। হঠাৎ দেখিলেই মনে হইবে, জলের উপর একটি জাহাজ ভাসিতেছে। জাহাজের আকারবিশিষ্ট এই বাসভবনের দৈর্ঘ্য ৫৪ ফুট। হ্রদের মাঝখানে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপও বিদ্যমান। এই দ্বীপে বাড়ীটিকে সর্ব্বদা নোঙ্গর করিয়া রাখা হইবে। বাড়ীর কাঠামো কাষ্ঠনির্ম্মিত। সর্ব্বসমেত ইহাতে ৫টি গৃহ আছে। প্রত্যেক গৃহ নানাবিধ বিলাসোপকরণে সজ্জিত। চারিপার্শ্বে খোলা বারান্দা। ঘরের ছাত রেলিং দিয়া ঘেরা। শয়ন, উপবেশন, রন্ধন সকল প্রকারের স্বতন্ত্র ঘর আছে। জাহাজের ন্যায় ইহাতে হাল, চিম্‌নি, মাস্তুল, ডেক্‌, চেয়ার, বিদ্যুতের আলো, রেডিও যন্ত্র সমস্তই বিদ্যমান। যে দ্বীপে ইহাকে নোঙ্গর করিয়া রাখা হইয়াছে, তাহাতে গাছপালা, ফলফুল সবই আছে। তীরদেশ হইতে এই জাহাজভবনে যাইবার জন্য একটি সেতুও নির্ম্মিত হইয়াছে। মার্কিণ ধনকুবেরগণের সখ ও খেয়ালের অন্ত নাই। এই জাহাজ-ভবনটি তাহার অন্যতম নিদর্শন।



পাহাড়ের উপর জাহাজভবন।

সুপ্রসিদ্ধ নীলমণি

আমেরিকার কোনও প্রসিদ্ধ জহরতের দোকানে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নীলমণি বিক্রয়ার্থ রক্ষিত হইয়াছে। ইহার ওজন ১২৭ রতি, মূল্য প্রায় ১০ লক্ষ টাকা। বিশেষজ্ঞরা বলিতেছেন, কোহিনুর অপেক্ষাও ইহার আকার বড়। ইদানীং বহুমূল্য মণিগুলি জনসাধারণ প্রত্যক্ষ করিবার অবকাশ পায় না। য়ুরোপীয় রাজন্যগণ স্ব স্ব মূল্যবান্ রত্নগুলি কোষাগারে গোপনে রক্ষা করিয়া থাকেন। গোলকুণ্ডার সুপ্রসিদ্ধ রত্ন লোকচক্ষুর অন্তরালে অবস্থিতি করিতেছে। ভারতবর্ষের কোনও মন্দির হইতে জনৈক ফরাসী সৈনিক 'অর্লফ' জহরৎ চুরী করিয়াছিল। রুসসম্রাট সে রত্ন সযত্নে ভাণ্ডারে সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। পর্ত্তুগাল নরপতির প্রসিদ্ধ 'বাগাঞ্জা' রত্ন দুই চারি জন অনুগত ব্যক্তি ব্যতীত আর কেহ কখনও প্রত্যক্ষ করিতে পায় নাই। এই রত্নের মূল্য ৩০ লক্ষ টাকা হইবে। বলা বাহুল্য, এ সব জিনিষের দাম মানুষের বিলাস-সংস্কারের উপর নির্ভর করে।



শনির দশা

নবম পরিচ্ছেদ

উপদেশ।

দারুণ গ্রীষ্ম। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর শেষ হইয়াছে, বায়ুর লেশমাত্র নাই। পূর্ব্বাকাশে চন্দ্রোদয় হইয়াছে। জ্যোৎস্নার রজতধারায় চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। একটি বাড়ীর বারান্দায় জনৈক যুবা পলকবিহীন নেত্রে জ্যোৎস্নালোকে যমুনার তরঙ্গলহরী দেখিতেছিল।

যুবা সন্তোষ। জ্যোৎস্নালোকে সে দেখিতে পাইল, অদূরে তাহার পিতা দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। তাহার মনে তখন চিন্তার বেগ এতদূর বর্দ্ধিত হইয়াছিল যে, সে পিতার আগমন উপলব্ধি করিতে পারে নাই। সে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেই শুনিতে পাইল, পিতা তাহাকে ডাকিতেছেন। সে নিকটস্থ হইলে বসু মহাশয় কহিলেন, "সন্তু, তোর সঙ্গে গোটাকতক কথা আছে, এখন শুন্‌তে পারবি কি?" সে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িয়া জানাইলে, তিনি তখন তাহাকে সেই স্থানে বসিতে বলিয়া নিজেও তাহার পার্শ্বে বসিলেন।

সন্তোষকুমার পিতার তার পাইয়া দেশে আসিয়াছিল। দুই দিন আসার পর সে অদ্য বৈকালে জ্যেঠাইমা'কে বলিয়াছিল, "বাবা কেন আসতে লিখলেন, তা কই আজও তো বল্লেন না। আমি কিন্তু কা'ল চ'লে যা'ব।"

ভ্রাতৃজায়ার মুখে পুত্রের কলিকাতায় প্রত্যাগমনের প্রস্তাব শুনিয়া, তিনি পুত্রের সন্ধানে আসিয়াছিলেন। সম্মুখের বারান্দায় সন্তোষকে দেখিতে পাইয়া তিনি তাহাকে বসিতে বলিলেন। দুই জনে বহুক্ষণ নীরব রহিলেন। তিনি দেখিলেন, সন্তোষ আপনা হইতে যে কোন কথা বলিবে, সে আশা নাই। তাঁহার সেই সন্তোষ আজ এমনই পর হইয়া গিয়াছে যে, দুইটা কথা বলিয়াও তাঁহাকে তৃপ্ত করে না। আপনা হইতেই তাঁহার চক্ষুর জল অসংবরণীয় হইয়া উঠিল। তিনি পুত্রের মুখের প্রতি নিজের দৃষ্টি কি বলিলেন, "সন্তু, তুই নাকি কা'ল চ'লে যাবি?"

কাতর স্বরে সন্তোষ কহিল, "তাই ইচ্ছে করছি, দিন থাকলে পড়াশুনার ক্ষতি হবে।"

বসু মহাশয়ের বক্ষোভেদ করিয়া একটা ব্যথিত দি বাতাসে মিলাইয়া গেল। তিনি রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে কহি "আমার ইচ্ছে, তুই এখন থেকেই বিষয়গুলো একটু দেখা করিস্। আমার বয়স হচ্ছে, শরীরও ভেঙ্গে পড়েছে, দিন যে আর বাঁচি, তা' বোধ হয় না। আর ডাক্তারী যে তোর বিশেষ প্রয়োজন, তাও ত নয়। তোর খা পরার বিশেষ কোন ভয়ভাবনা ত নেই, সুতরাং থেকে একটু বুঝতে শিখলে পরে তোকে আর ভাবনাই ভাবতে হ'বে না। সেই জন্য তোকে বল্‌ছি, পড়ার দরকার নেই।"

পিতার এই স্নেহের ছলনাটুকু বুঝিতে সন্তোষের ব রহিল না। পিতা যে কেন তাহাকে নিকটে রাখিতে চা তাহাও সে বুঝিতে পারিল। যে পিতা বাল্যকাল হ তাহার লিখাপড়ার বিষয়ে যাহাতে কোন ত্রুটি না সেই দিকেই সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন, আজ তি কি না তাহাকে বলিতেছেন, লিখাপড়ার কোন প্রয়ো নাই! ইহা কিছুই নহে, সুষমার নিকট হইতে আমা দূরে রাখাই তাঁহার উদ্দেশ্য।

পুত্রকে নীরব দেখিয়া তিনি পুনরায় কহিলেন, "এ কি তোর মত নেই?"

সে দৃঢ় কণ্ঠে বলিল, "আর ত বেশী দেরী নেই, দি দিনের জন্য কষ্ট করলে যখন পাশটা করতে পারি, ত অসম্পূর্ণ রাখা আমার ইচ্ছা নয়।"

বসু মহাশয় কহিলেন, "বিষয়কর্ম্ম শেখারও ত দরকার এটাও তো প্রয়োজনীয়।"

"আমার দ্বারা ওসব কোন কালে হ'বে না, বাবা; আ

ওসব কোন কালেও বুঝতে পারি না। আপনি আছেন, দাদাভাই আছেন।" দাদাভাই অর্থে দেওয়ান সদাশিব। সে বাল্যকাল হইতেই সদাশিবকে দাদাভাই বলিয়া ডাকিত।

বসু মহাশয় সন্তোষের মুখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কহিলেন, "সন্তোষ, তোর কাছে যে এ উত্তর পা'ব, আমি সে আশা কোন দিন করি নি। পুরুষের পক্ষে অপারগ কথাটা বড়ই লজ্জাজনক নয় কি? তুই মূর্খ নস্, শিক্ষিত। তোর মুখে এ কথা শোভা পায় না। আর, বাবা, তুই ছাড়া আমার আর কেউ নেই, তাও তুই জানিস্। এই বংশের মানমর্য্যাদা সমস্তই তোর উপর নির্ভর কর্‌ছে। তুই যদি এ বিষয়ে লক্ষ্য না করিস্, তা' হ'লে কি পিতৃ-পিতামহের কীর্ত্তিগুলাও তুই নষ্ট ক'রে দিতে চাস্? সেটা কি তোর পক্ষে গৌরবের বিষয়? তুইই আমার বংশের একমাত্র সন্তান, আর দ্বিতীয় নেই যে, তা'র দ্বারা এর অভাব পুরণ ক'রে নেব। বাবা, এখনও বোঝ, আমার সমস্তই যে তোর উপর নির্ভর কর্‌ছে, এখন জ্ঞান হয়েছে, বয়েস হয়েছে, তুই এখন বুঝতে শিখেছিস্, তোর এখন এ রকম মতিবুদ্ধি তো মঙ্গলের বিষয় নয়!"

"আমি কি কর্‌বো বলুন, আমি ওসব বিষয় একেবারেই বুঝি নে।"

তিনি কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া পুনরায় করুণ কণ্ঠে কহিলেন, "ছি বাবা, এ কথা বল্‌তে নেই, তুই না দেখলে কে দেখবে? আর তা ছাড়া তুই আর একা নস্, তুই এখন বিবাহ করেছিস্, তা'র প্রতিও তোর একটা কর্ত্তব্য আছে ত? তুই আমার উপর রাগ কর্ত্তে পারিস্, কিন্তু সে কি করেছে? তা'র তো কোন অপরাধ নেই। সন্তু, বাবা আমার—এখনও বুঝতে চেষ্টা কর, বুড়ো বয়সে আর আমাকে—" তিনি আর কথা বলিতে পারিলেন না।

সন্তোষ তখন রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে কহিল, "বাবা, আপনি আমায় মাপ করবেন, আমি আপনার সমস্ত আদেশ পালন করেছি, কেবল—" তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল, সে ধীরে ধীরে উঠিয়া চলিয়া গেল। বসু মহাশয় অনেকক্ষণ সেই ভাবে একাকী বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন; পুত্রবধুর ভবিষ্যৎ আশঙ্কায় তাঁহার চিত্ত অস্থির হইয়া উঠিল। বালিকার দুরদৃষ্ট ভাবিয়া অনুশোচনায় তাঁহার হৃদয় ভরিয়া উঠিল। সে রাত্রিতে তিনি আর নিদ্রা যাইতে পারিলেন না।

দ্বিপ্রহরে সন্তোষকুমার অন্দরে আসিতেই জ্যেঠাইমা কহিলেন, "তুই নাকি আজই কলকাতায় যাবি?"

মৃদুকণ্ঠে সন্তোষ কহিল, "তোমায় কে বল্লে?"

জ্যেঠাইমা একটুখানি মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "তুই বলিস্ না ব'লে আমি কি আর শুনতে পাই না? এই তো মোটে দুদিন এয়েছিস্। এর মধ্যে আবার যাবি কেন?"

"এখানে থাক্‌লে আমার শরীর ভাল থাকে না, আর এখানে থেকেই বা কি হ'বে? কেবল গণ্ডগোল বই ত নয়।"

সন্তোষের এই কথাটি জ্যেঠাইমার হৃদয়ে শক্তিশেলের ন্যায় বিদ্ধ হইল। তিনি একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, "এ কি বল্‌ছিস্, সন্তু, বাড়ী ভাল লাগে না, এ আবার কি কথা? এই যে বৌমা মুখটি শুকনো ক'রে ব'সে থাকে, তা' দেখে যে আমাদের কত কষ্ট হয়, তা' তুই বুঝবি কি ক'রে? মা আমার রাজরাণী হয়েও সর্ব্বত্যাগিনী, তা' কি তুই দেখিস্? এমন ক'রে তুই আর পোড়াস্‌নি, সন্তু, লক্ষ্মী বাবা আমার, তোর বাবার চেহারার দিকে একবার নজর ক'রে দেখিস্। ছিঃ ছিঃ, তুই এমন হ'লি কি ক'রে? তোর বুদ্ধিশুদ্ধি সব গেছে। ওই যে একটা পরের মেয়েকে গলায় করেছিস্, সেটার কথাও ত ভাবতে হয়।"

সন্তোস জ্যেঠাইমা'র কথায় বাধা দিয়া কহিল, "অনেক কথাই ত বল্লে; বলি, দোষ কার? আমি ত আগেই বলেছি। এখন আবার ওসব কথা কেন? তোমরা যদি সকলে মিলে আমায় এই রকম জ্বালাতন কর, তা' হ'লে কিন্তু ভাল হ'বে না বল্‌ছি। আমি যদিও বাড়ী আসি, কিন্তু ওসব কথা বল্লে আর এ মুখোও হ'ব না।"

জ্যেঠাইমা ভীত হইয়া বলিলেন, "তুই এখন একটুতেই রেগে উঠিস্, তোকে ত আর লোকের কাছে মুখ দেখাতে হয় না, তোর আর কি বল্। চারিদিকে হাসি-টিট্‌কারী এই বয়সে কি সহ্যি হয়, বল দেখি?"

সন্তোষ কহিল, "যখন করেছিলে, তখন ভাবনি কেন? এখন আমায় নিয়ে টানাটানি কেন? নিজেদের কর্ম্মফল নিজেরা ভোগ কর। বৌ চেয়েছিলে, বৌ পেয়েছ; আবার কি? আমার কি, আমি ইচ্ছে কল্লে এই মুহূর্ত্তেই এই সব ছেড়ে দিয়ে চ'লে যেতে পারি; আর দেখছি, শীগ্‌গীর

তাই করতে হ'বে, নইলে তোমাদের হাত থেকে আর পরিত্রাণ নেই দেখছি।" এই বলিয়া সে আর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া দ্রুতপদে বাহিরে চলিয়া গেল।

জ্যেঠাইমা দেবরপুত্রের দুর্ব্বুদ্ধি দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। তিনি বহুক্ষণ সেই স্থানেই নীরবে বসিয়া রহিলেন।

দুর্ভাগ্যক্রমে বাসন্তী পাশের ঘরেই বসিয়া ছিল। সে নীরবে বসিয়া স্বামী ও জ্যেঠাইমা'র সমস্ত কথাগুলিই শুনিতে পাইয়াছিল। জ্যেঠাইমা'র মুখে নিজের নাম উচ্চারিত হইতে শুনিয়া সে মনে মনে অত্যন্ত লজ্জাবোধ করিতেছিল। স্বামীর যাহা ইচ্ছা, তিনি তাহাই করুন। জ্যেঠাইমা কেন তাঁহাকে ওসব কথা বলিতে যায়েন? তিনি যদি ভাল না বাসেন, কেহ কি জোর করিয়া ভালবাসাইতে পারে? শুধু শুধু ও সমস্ত কথা বলিয়া তাঁহাকে বিরক্ত করার কি প্রয়োজন? স্বামী যে আর কাহাকেও ভালবাসে, সে কথা সে জানিত না; কেহ তাহাকে বলেও নাই। সুতরাং সে কোন দিন স্বামীর চরিত্রবিষয়ে সন্দিহানও হয় নাই। স্বামী ভালবাসেন না, ঘৃণা করেন; সেটা বোধ হয়, গরীবের ঘরের মেয়ে বলিয়াই তিনি তুচ্ছতাচ্ছীল্য করেন। তাহাতে কি? তিনি যদি তাহাতে শান্তি পায়েন, তবে তাঁহাকে অশান্তি দিবার কি দরকার?

দশম পরিচ্ছেদ

উইল

পুত্রের বিসদৃশ আচরণে ক্রমে বসু মহাশয়ের শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। বাসন্তী শ্বশুরের দেহের অবস্থা দেখিয়া বড়ই ভাবিত হইয়া পড়িল। সে মাঝে মাঝে অনুযোগ করিত, কাঁদিত এবং তাঁহাকে খাওয়াইবার জন্য অত্যন্ত জিদ্ করিতে থাকিত। তিনি পুত্রবধূকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য সে যাহা বলিত, তাহাই করিতেন। কিন্তু বিধাতার অলঙ্ঘ্য বিধান কেহই লঙ্ঘন করিতে পারে না। দুর্ভাবনায় দিন দিন তাঁহার শরীর ভাঙ্গিতে লাগিল।

এক দিন দ্বিপ্রহরে বসু মহাশয় আহারে বসিয়াছেন। জ্যেঠাইমা তাঁহাকে নিজের ব্যঞ্জন পরিবেশন করিতেছেন, পার্শ্বে বাসন্তী পাখা লইয়া তাঁহাকে বাতাস দিতেছিল। সন্তোষকুমার কলিকাতায় চলিয়া যাওয়াতে বসু মহাশয় তাহার উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। কিন্তু প্রকাশ্যে কোন কথাই বলেন নাই। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বাসন্তী কহিল, "বাবা, আপনি দিন দিন খাওয়া ছেড়ে দিচ্ছেন, তাইতে আপনার শরীর আরও খারাপ হয়ে যাচ্ছে।" পুত্রবধূর ম্লান শুষ্ক মুখখানির দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন, "চিরকালই কি মানুষ সমান খেতে পারে, মা? বয়স হচ্ছে তো। আর খাব না বল্লেই কি তুমি ছেড়ে দাও, মা?"

বাসন্তী একটা মৃদু নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল, "আপনি মোটেই শরীরের যত্ন করেন না, বাবা, সেই জন্যে শরীর আরও খারাপ হয়ে যাচ্ছে। আপনার শরীর দেখে আমার কিন্তু বড় ভয় হচ্ছে।"

"ভয় কি, মা, আমার শরীরটা একটু খারাপ হয়েছে বটে, আবার শীগ্‌গীরই সেরে যা'বে, তুমি এতে অত ভয় পাচ্ছ কেন, মা?"

বাসন্তী বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "বাবা, আপনি আমার কথা একটুও ভাবছেন না, আপনি গেলে আমাদের কি হ'বে——" সে আর বলিতে পারিল না, অশ্রু আসিয়া তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ করিয়া দিল।

বসু মহাশয় তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন, "শরীর খারাপ হলেই কি মানুষ মারা যায়, মা? তুমি আমার জন্য অত চিন্তা ক'র না। তবে বড়ই দুঃখ রইল, মা, তোমাকে সুখী করতে এনে বড় অসুখী করলাম। এ কষ্ট আমি সঙ্গে নিয়ে যা'ব।"

বাসন্তী স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল, "আপনি ও কথা বল্‌ছেন কেন, বাবা? আমি আপনার কাছে এসে বড় সুখী হয়েছি, আপনি কেন সে জন্যে মনে কষ্ট পান?"

বসু মহাশয় ও প্রসঙ্গ চাপা দিবার জন্য কহিলেন, "চল, মা, আমরা দিন কতক কোথাও হাওয়া খেয়ে আসি। আর তোমার ছেলেটিকে তুমি মোটা ক'রে নিয়ে এস।"

বাসন্তী সহাস্যবদনে কহিল, "তাই চলুন, বাবা, আপনার শরীর ও মন এতেই ভাল হ'বে।" এই বলিয়া সে আবার কহিল, "কোথায় যাওয়া হ'বে?"

"তা, এখনও ঠিক করিনি, মা, তবে শীগ্‌গীর যা'ব। আমারও বোধ হয়, শরীরটা খুব খারাপ হচ্ছে।"

জ্যেঠাইমা বলিলেন, "কাশীটাশীর ওদিকে গেলে হয় না?"

"তাই মা হয় যাওয়া যা'বে। এখন থেকেই একটু আধটু গোছান আরম্ভ করুন, এই লাটের কিস্তিটা দিয়েই আমরা বেরিয়ে পড়বো।"

কর্ত্তা আহারান্তে বহির্ব্বাটীতে চলিয়া গেলেন। বাসন্তী সেইখানে বসিয়া নীরবে আপনার অদৃষ্ট চিন্তা করিতে লাগিল। সে ভাবিতেছিল, শ্বশুরের অবর্ত্তমানে তাহার দশা কি হইবে? যাঁহার দয়ায় সে আজ রাজরাজেশ্বরী হইয়াছে, হয় ত তাঁহার অভাবেই আবার তাহাকে পুনরায় নিরাশ্রয় হইতে হইবে; এই চিন্তাটা কয় দিন হইতেই তাহাকে পীড়িত করিতেছিল।

সন্তোষকুমার নিতান্ত জেদের বশেই কলিকাতায় চলিয়া গেল। বসু মহাশয় তাহাকে অনেক নিষেধ করিয়াছিলেন, কিন্তু সে কিছুতেই রাজী হয় নাই। সে চলিয়া যাইবার পর তিনি মনে মনে স্থির করিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার অবর্ত্তমানে বাসন্তী সন্তোষের হাতে পড়িয়া অত্যন্ত কষ্ট পাইবে। পুত্রের দুর্ম্মতি দূর না হওয়া পর্য্যন্ত বাসন্তীর ভবিষ্যৎ বড়ই অন্ধকার। সুতরাং তিনি জীবিত থাকিতে থাকিতেই পুত্রবধূর একটা ব্যবস্থা না করিলে, পরে হয় ত পুত্র তাহাকে গৃহবহিষ্কৃতা করিয়া দিবে। যদি তা নাও করে, তথাপি তাহাকে সর্ব্বপ্রকারেই কণ্টকশয্যার যন্ত্রণা দিবে। যে বিবাহিতা পত্নীকে এরূপভাবে অবহেলায় রাখিয়াছে, তাহার অসাধ্য কিছুই নাই। তাহার মন এখনও অনাদি-বাবুর কন্যার প্রতি আকৃষ্ট আছে, এ অবস্থায় তিনি মরিয়া গেলে সে হয় ত তাহাকে বিবাহ করিবে, তাঁহার মরণের অপেক্ষা করিয়া বোধ হয় বসিয়া আছে। সে হয় ত বিবাহ করিয়া কলিকাতাতেই বাস করিবে, তখন দেশের প্রতি একেবারেই দৃষ্টি করিবে না। পিতৃপিতামহের ভিটা ও রাধাবল্লভের মন্দির প্রভৃতি সমস্তই নষ্ট হইয়া যাইবে।

তিন চারি দিন পরে বসু মহাশয়ের ভবনে বিপিনবাবু ও তিন চারি জন অপর ভদ্রলোক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নির্জ্জনে তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া তিনি একখানি উইল প্রস্তুত করিলেন। তাহাতে তিনি বাসন্তীকেই সমস্ত বিষয়পত্র, বাড়ী-ঘর, যাবতীয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী করিয়া দিলেন; সন্তোষকুমারের কিছুই ব্যবস্থা করিলেন না, সামান্য মাসহারাও নহে। জ্যেঠাইমা'র মাসিক দুই শত টাকা মাসহারা; যত দিন জীবিত থাকিবেন, বাড়ীতে বসবাস করিবেন। তীর্থাদি ও ধর্ম্মাদির জন্য ষ্টেট হইতে স্বতন্ত্র বৃত্তি পাইবেন। বাসন্তীকে দান-বিক্রয়ের অধিকার পর্য্যন্ত তিনি দিয়া গেলেন। তিনি সর্ব্বপ্রকারেই বধূকে কর্ত্রী করিয়া দিলেন এবং ইহাও লিখিয়া দিলেন যে, তাহার অনুমতি ব্যতীত কেহ কিছু করিতে পারিবেন না, করিলেও গ্রাহ্য হইবে না।

উইল সম্পূর্ণ করিয়া তিনি বৃদ্ধ দেওয়ান ও কলিকাতা হইতে আগন্তুকচতুষ্টয়কে সাক্ষী রাখিয়া নাম সহি করিয়া তাঁহার এটর্ণীর হাতে দিলেন এবং তাঁহাকে বলিয়া দিলেন যে, উইল রেজেষ্টারী হইলে তিনি তাঁহার নিকটেই যেন রাখিয়া দেন। তাঁহার মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধাদি মিটিয়া গেলে, উইল বাসন্তীর নিকটে দেওয়া হয়, ইহার পূর্ব্বে এই কয় জন ব্যতীত অপর কেহ যেন উইলের বিষয় জানিতে না পারে। পরদিন তাঁহারা উইল লইয়া চলিয়া গেলেন। বৃদ্ধ দেওয়ান একবার বলিয়াছিলেন যে, সন্তোষকে বিষয় হইতে একেবারে বঞ্চিত করা উচিত হয় না। তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, "আমার পিতৃপিতামহের পবিত্র ভিটায় যে বিলাত-ফেরতের কন্যা আসিয়া অপবিত্র করিবে, ইহা অসহ্য; ইহাতে আমার আত্মাও অসুখী হইবে, পরলোকে গিয়াও আমি শান্তি পাইব না। আর তা' ছাড়া সন্তোষ শিক্ষিত, মূর্খ নহে, সে নিজের চেষ্টায় উপার্জ্জন করিবে।" সেই দিন হইতে দেওয়ান আর কিছু বলেন নাই।

উইল প্রস্তুত হইয়া গেলে বসু মহাশয় যেন অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন। উইলের বিষয় তিনি ভ্রাতৃজায়া বা বাসন্তীকে কিছুই জানাইলেন না, বাসন্তী অকাতরে বৃদ্ধের সেবায় জীবন-মন অর্পণ করিয়াছিল। তাহার অনাড়ম্বর সাজসজ্জা ও মলিন মুখখানির প্রতি দৃষ্টি পড়িলেই বসু-মহাশয় অসহ্য যন্ত্রণা নিজ বক্ষে অনুভব করিতেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, দুই দিন পরেই পুত্র নিজের অপরাধ বুঝিতে পারিবে, তখন হয় ত সে অনুতপ্ত হইয়া ক্ষমা চাহিতে আসিবে। কিন্তু তাহার কোন লক্ষণই যখন তিনি দেখিতে পাইলেন না, উপরন্তু তিনি পুত্রকে উপদেশ দিয়া, বুঝাইয়া, শাসন করিয়া কিছুতেই যখন তাহাকে ফিরাইতে পারিলেন না, তখন নিজেকে বাসন্তীর নিকট অত্যন্ত

অপরাধী মনে করিতে লাগিলেন। বাসন্তীকে তিনি বহু মূল্যবান্ গহনা, কাপড় ইত্যাদি দিয়াছিলেন, কিন্তু অনাবশ্যকবোধে সে কোন দিনই সে সকল ব্যবহার করিত না। ইদানীং শ্বশুরের শরীরের ও মনের অবস্থা দেখিয়া এবং তিনি তাহার এই মলিন সাজ-সজ্জা দেখিয়া দুই এক-বার বাসন্তীকে এ বিষয় জিজ্ঞাসা করায় সে আজকাল তাঁহাকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য যখনই তাঁহার সম্মুখে যাইত, তখনই বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হইয়া যাইত, কিন্তু গুরুজনের নিকট যে সত্য লুকান যায় না, তাহা অনভিজ্ঞা বাসন্তী বুঝিত না।

বসু মহাশয় বাসন্তীকে সুখী করিবার জন্য সর্ব্বদাই প্রাণপণ করিতেন। বাসন্তীও যথাসাধ্য যত্নে নিজের অবস্থা তাঁহার নিকট গোপন রাখিতে চেষ্টা করিত।

উভয়ে উভয়ের মনোভাব গোপনেই রাখিত, কিন্তু বাসন্তীর দীনা মলিনা মূর্ত্তিই বসু মহাশয়ের হৃদয়ে শেলের ন্যায় বিদ্ধ হইত, শত চেষ্টাতেও বাসন্তী তাহা লুকাইতে পারিত না। নির্ম্মম অসহ্য যন্ত্রণায় এক এক দিন বসু মহা-শয়ের হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া যেন রুদ্ধ হইয়া আসিত, তিনি তখন আর সামলাইতে পারিতেন না। জ্যেঠাইমা দিন দিন দেবরের শরীর দেখিয়া চিন্তান্বিত হইয়া উঠিতেন, তিনি গোপনে মাঝে মাঝে সন্তোষকে আসিবার জন্য পত্র দিতেন, কিন্তু আসা দূরে থাকুক, সে চিঠির জবাব পর্য্যন্ত দিত না।

দিন যেমন কাটিতেছিল, তেমনই ভাবেই কাটিতে লাগিল; কাহারও অপেক্ষা করিল না। শ্বশুরের শরীরের অবস্থা দেখিয়া বাসন্তী পশ্চিমে যাইবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু সংসারের নানাবিধ ঝঞ্ঝাটে ও বাধা-বিপত্তির জন্য যাত্রার দিন ক্রমশঃ পিছাইয়া পড়িতে লাগিল। শেষে এক দিন বসু মহাশয় বলিয়া পাঠাইলেন, আষাঢ় মাসের আধাআধি কাশী যাইবার দিন স্থির হইয়াছে। তখন বাসন্তীর দুশ্চিন্তা কতকটা দূর হইল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

পথিনির্দ্দেশ

এক দিন ধর্ম্মতলার মোড় হইতে সন্তোষ কতকগুলি প্রয়োজনীয় জিনিষ কিনিয়া লইয়া ট্রামের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া ছিল। এমন সময়ে পিছন হইতে একখানি মোটরের শব্দ শুনিয়া সে দূরে সরিয়া যাইতে দেখিল, মোটরের ভিতরে সুষমা বসিয়া রহিয়াছে। সে তাহার দিকে চক্ষু তুলিতেই দেখিতে পাইল, সুষমা সহাস্যবদনে তাহারই দিকে চাহিয়া মৃদু হাস্য করিতেছে। তাহার দৃষ্টির সহিত দৃষ্টি মিলিত হইতেই সে নিজের দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল এবং পরক্ষণেই দেখিল, সুষমা তাহাকে ডাকিতেছে।

সুষমা তাহাকে পথের মধ্যে দেখিয়াই মোটর থামাইয়া সন্তোষকে উঠাইয়া লইয়া কহিল, "সন্তোষদা, আপনি এখানে?"

সুষমাকে সম্মুখে দেখিয়া সন্তোষ প্রথমটা লজ্জায় মরিয়া গেল; তাহার ইচ্ছা হইতেছিল, সে তখনই নামিয়া চলিয়া যায়; কিন্তু পা যেন তাহার চলিতেছিল না। বহু-দিন পরে সুষমাকে দেখিয়া তাহার দেহ যেন অবশ হইয়া আসিতেছিল, মুখ হইতে তাহার কথা বাহির হইতেছিল না, জিহ্বা শুষ্ক হইয়া উঠিতেছিল। সে কিছুতেই নিজের অবস্থা গোপন করিতে পারিতেছিল না। সুষমা তাহার অবস্থা কতকটা বুঝিতে পারিয়া পুনর্ব্বার কহিল, "কথা বল্‌ছেন না কেন? আমাদের উপর রাগ করেছেন?"

বহুক্ষণ পরে নিজেকে প্রকৃতিস্থ করিয়া জড়িতকণ্ঠে সন্তোষ কহিল, "কি কথা বল্‌বো বল?"

সুষমা আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, "কেন সন্তোষদা, কিছুই কি বল্‌বার নেই?"

সন্তোষ স্খলিতকণ্ঠে কহিল, "না, কিছুই আর বল্‌বার নেই, সব শেষ হয়ে গেছে।"

সুষমা সহাস্যবদনে কহিল, "বাঃ, এ কি রকম কথা! আপনি বিয়ে কর্‌লেন, তবু আমাদের একটা খবরও দিলেন না। আমরা কি এত পর হয়ে গেছি?"

সন্তোষকে নিরুত্তর দেখিয়া পুনরায় সে বলিল, "তা খবর যখন নাই দিয়েছেন, তাতে তত ক্ষতি হয় নি, কিন্তু এখন একবার বৌদির সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিন, তাঁ'র সঙ্গে আলাপ কর্‌বার জন্যে আমি কিন্তু ভারী ব্যস্ত হয়েছি।"

সন্তোষ বহুক্ষণ পরে কহিল, "খবর আর কি দেব, সুষমা?"

"কেন? আমরা সেখানে গেলে কি আপনাদের কোন অনিষ্ট হবে?"

"না, সে জন্যে নয়।"

"তবে?"

সন্তোষ চাপা গলায় কহিল,"দিইনি এমনি ইচ্ছে করেই।"

সুষমা বিস্মিতকণ্ঠে কহিল, "এর মানে?"

"মানে আর কি, সেখানে গিয়ে কি হবে?"

সুষমা উচ্চ হাস্য করিয়া কহিল, "গিয়ে কি হবে, তা' তখন বুঝতুম, এখন আর ব'লে ফল কি? এখন চলুন, আমাদের বাড়ী যাবেন; মা আপনাকে দেখবার জন্যে ভারী ব্যস্ত হয়েছেন, আপনি আর যান না কেন?"

সন্তোষ অভিমানক্ষুব্ধ স্বরে কহিল, "আর যাব না সুষমা।"

"কেন?"

"কি জানি, কোথাও যেতে ভাল লাগে না।"

সুষমা বিস্মিতভাবে কহিল, "কেন? আপনাদের বিয়ে হ'লে বুঝি অন্য বাড়ী যেতে নেই?"

সন্তোষ ভাবিতেছিল, সুষমাকে কেমন করিয়া বুঝাইবে যে, সে কতখানি বেদনায় তাহার পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়াছে। সে ত নিজে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছে, আবার কি সুষমাকেও জ্বালাইবে? তাহার চেয়ে দূরে হইতে সে তাহার মূর্ত্তি ধ্যান করিয়া দিন কাটাইয়া দিবে। সে কি এখনও বুঝিতে পারে নাই? কই, সুষমার ভাব দেখিয়া ত তাহা বোধ হয় না যে, সে তাহার বিবাহ হইয়াছে শুনিয়া অসুখী হইয়াছে, সে ত আনন্দই করিতেছে, বেদনার কোন চিহ্নই ত তাহার মুখে ফুটিয়া উঠিতেছে না! তবে কি সুষমা তাহাকে ভালবাসে না? সে কি এত দিন মিথ্যা আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া রাখিয়াছিল? না, এ হইতেই পারে না। মন যে এখনও বলিতেছে, সুষমা তাহাকে ভালবাসে! সে ত বুঝিতে পারিতেছে না।

তাহাকে নীরব দেখিয়া সুষমা কহিল, "কি ভাবছেন? কথার উত্তর দিচ্ছেন না কেন? বউ কেমন হলো, বল্লেন না। আপনি এমনধারা হলেন কেন?"

সন্তোষ বিস্মিতভাবে সুষমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "কেমনধারা হয়েছি, সুষমা?"

"এই ভাল ক'রে কথা বলছেন না, বৌ কেমন হয়েছে, বলছেন না; এ রকম কচ্ছেন কেন?"

"সন্তোষ একটা মৃদু নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল, "আমায় কিছু জিজ্ঞাসা করো না, সুষমা; তুমি আমায় মাপ কর।"

"কেন? মাপ কিসের?"

"কি জানি, আমি তোমার সকল কথার জবাব দিতে পাচ্ছি না, হয় ত তুমি রাগ করছ।"

সুষমা একটু ম্লানভাবে হাসিয়া বলিল,"না না, রাগ কেন করবো, আমি আপনাদের মত অত অল্পে রাগ করি না। আচ্ছা, আপনি সত্যি ক'রে বলুন দেখি, বৌদিকে কি আপনার পছন্দ হয় নি?"

সন্তোষ গম্ভীর কণ্ঠে কহিল, "আমার পছন্দে অপছন্দে কি আসে যায়, সুষমা? বাবা বিয়ে দিয়েছেন, তিনিই বুঝবেন, আমি কে?"

সুষমা সংশয়পূর্ণ কণ্ঠে বলিল,"এ কি কথা বলছেন, দাদা, এ আপনার কি রকম কথা? আপনি শিক্ষিত, আপনি যদি মূর্খের মত কায করেন, তা হ'লে লোক আপনাকে কি বলবে? এটা কি আপনার অন্যায় হচ্ছে না? সে বালিকা, তা'র কি অপরাধ? তা'কে এমন ভাবে অবহেলায় রাখা কি উচিত হচ্ছে? সে যে দিন নিজের অবস্থা বুঝতে পারবে, সেখন তা'র হৃদয় কতখানি বেদনায় ভ'রে উঠবে, তা কি কোন দিন ভেবে দেখেছেন? আর ভেবে দেখুন, আপনার ব্যবহারে কত জন কষ্ট পাচ্ছে। আপনি হয় ত এ তুচ্ছ সামান্য ভাবতে পারেন, কিন্তু এ তুচ্ছ নয়। আপনার বৃদ্ধ পিতা আপনার ব্যবহারে কত কষ্ট পাচ্ছেন, তা' কি কোন দিন ভেবে দেখেছেন? তাঁকে কষ্ট দেওয়া কি আপনার উচিত? পিতা-মাতা সন্তান শত অপরাধে অপরাধী হলেও নীরবে সমস্তই সহ্য ক'রে যান, সন্তানের অকল্যাণের আশঙ্কায় চোখের জল পর্য্যন্ত রুদ্ধ করতে চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁহাদের মনের বেদনা যে কতটা, তা কি কোন দিনও ভেবে দেখেছেন? এই বেদনার ফল অবশ্যই এক দিন না এক দিন আমাদের ভোগ করতে হবেই হবে, এ কখনও কেউ ছাড়িয়ে যেতে পারে না—আপনিও পারবেন না।"

সে পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিল, "দেখুন, বিবাহিতা পত্নীর কাছে পুরুষের কি কর্ত্তব্য আছে, তা' কি আপনি জানেন না? আপনি যে কত বড় অন্যায় করছেন, তা'

অবশ্য এখন না বুঝলেও পরে এক দিন আপনাকে বুঝতেই হ'বে। তখন বুঝতে পারবেন, অনুতাপের তাড়না কি? এখনও বলছি আপনাকে, আপনি রাগ করবেন না, যা' করেছেন, তা'র আর উপায় নেই। কিন্তু এখনও ফেরবার উপায় আছে, এখনও বুঝে দেখুন। ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস রাখুন, তিনিই এক দিন আপনাকে শান্তি দেবেন। স্ত্রীকে সুখী করতে চেষ্টা করুন, মোহ ত্যাগ করুন, মনে রাখবেন, মানুষের অসাধ্য কিছু নেই। আর—একটা—"

সন্তোষ এতক্ষণ নীরবে সুষমার কথাগুলি শুনিয়া যাইতেছিল, সুষমাকে নীরব হইয়া থাকিতে দেখিয়া সে কহিল, "আমাকে—কিছু—বলো না—আমি—পাচ্ছি"—সে আর বলিতে পারিল না, সুষমার মুখের দিকে চাহিয়া সে দেখিল, তাহার মুখে ক্রোধের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছে।

ক্ষণপরে সুষমা বলিয়া উঠিল, "এই যে আপনার বাড়ী এসে গেছে; আজ তা' হ'লে আসি। বেলা হয়ে গেল, মা অপেক্ষা করছেন, আপনি ত গেলেন না।"

মোটর বাটীর দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। সন্তোষ তখন ভাবিতেছিল, সুষমাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেয় যে, কেন সে যায় না। সে যে কত কষ্টে তাহাদের সান্নিধ্য ত্যাগ করিয়াছে, তাহা কি সুষমা বুঝিতে পারে? সে যদি তাহা বুঝিত, তাহা হইলে কি এমন ভাবে কথা বলিতে পারিত?

তাহার চিন্তায় বাধা দিয়া সুষমা বলিল, "বাড়ী এসে গেছে যে; উঠুন, এত কি ভাবছেন?"

সন্তোষ নামিয়া দাঁড়াইল। সুষমা বলিল, "আজ তবে আসি, সন্তোষদা', আর কবে দেখা হবে, জানি না।"

এই বলিয়া সে সোফারকে বাড়ী যাইতে বলিল। মোটর যখন চলিয়া গেল, সন্তোষের তখন ইচ্ছা হইতেছিল, আর একটুখানি সুষমাকে দাঁড়াইতে বলে, আর একবার এক মুহূর্ত সে তাহাকে প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া লয়। আর কি সে তাহাকে দেখিতে পাইবে? হয় ত এই শেষ! সে অনেকক্ষণ একা বসিয়া সুষমার বিষয় চিন্তা করিতে লাগিল।

[ক্রমশঃ।

শ্রীমতী কাঞ্চনবালা দেবী।

সন্ন্যাসী

'সন্ন্যাসী' এই নাম শুনে তুমি কেন হও ওগো রুষ্ট;
সদা বল, ওটা দারা-সুত-ত্যাগী কৌপীনে আছে তুষ্ট!
ক্ষুদ্র মনের ধারণা তোমার, ত্যজি নাই আমি বিশ্ব,
বিশ্বের পতি পুরুষোত্তম, আমি যে তাঁহারই শিষ্য।
তোমাদের বুকে করুণার ধারা পুত্র-কন্যা তরে,
আমার স্নেহ যে চেতনাচেতন সকল বিশ্ব'পরে।
ছাড়িয়াছি আমি দেখিতেছ বটে এক মাতা, এক পিতা,
ছাড়িয়াছি নিজ পুত্র-কন্যা, নারী নিজ বিবাহিতা;
ছাড়িয়াছি বটে মাটীর দেওয়ালে ঘেরা একটুকু ঠাঁই,
ছেড়ে দিছি সব বসন-ভূষণ, সাজ মোর কিছু নাই।
তাই ব'লে আমি ছাড়ি নাই ওগো অসীম গৃহের সুখ,
ছাড়ি নাই আমি মানুষের মায়া, হই নাই চিরমূক,
ঊর্দ্ধে ওই যে অসীম আকাশ আমার গৃহের ছাত;
আঙ্গিনা আমার সব চরাচর নাহি বেড়া নাহি বাঁধ।
ওই যে গগনে উজল তারকা ওরা মোর ঘরে বাতি,
জানে না নিভাতে চিরদিন জ্বলে একই ভাবে সারারাতি।
অসীম বনানী বসুধা জননী রেখেছেন ধরি বুকে,
ওরা যে আমার প্রমোদোদ্যান, আমি ভ্রমি চিরসুখে।
ওই যে প্রভাতে অরুণ-উদয়ে জাগরণ কলরব,
সকল বিশ্ব মুখরিত করি' আমারই গৃহোৎসব।
দিবস-রজনী বিশ্বের যত গুঞ্জন কলতান,
আমারই প্রাণের দেবতা-পূজন—গুণ-কীর্ত্তন-গান।
কে বলেছে তোমা সন্ন্যাসী হ'লে ছেড়ে দেয় সংসার,
সে যে বুকে বাঁধে সকল বিশ্ব—ধরিত্রী পারাবার।

শ্রীগোপীনাথ পাল।

বঙ্গ-সাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান

১

যদিচ কবিকঙ্কণ স্পষ্টাক্ষরে বলেছেন যে,—

'উজির হলো রায়জাদা বেপারিরে দেয় খেদা
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের হ'ল অরি।'

তবুও তাঁ'র গ্রন্থে মোগলরাজ কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবের উপর অত্যাচারের অপর কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না, এবং উক্ত 'রায়জাদা' ব্যক্তিটি কে? হিন্দু না মুসলমান? তাও আমরা অবগত নই। সেকালে হিন্দুও যে হিন্দুধর্ম্মের উপর ভীষণ অত্যাচার করত, তা'র প্রমাণ দাউদ কররাণীর যে সেনাপতি উড়িষ্যার দেউল দেহারা ধ্বংস করেছিলেন, তিনি হচ্ছেন কালাপাহাড় নামে বিখ্যাত, রাজু নামক জনৈক হিন্দু।

কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে সেকালের মুসলমানসমাজের আচারব্যবহারের একটি দেড় পাতা বর্ণনা আছে। তা'র কতক অংশ নিয়ে উদ্ধৃত ক'রে দিচ্ছি,—কবিকঙ্কণ বলেন যে, মুসলমানরা,—

ফজর সময়ে উঠি বিছায়া লোহিত পাটী
পাঁচ বেরি করয়ে নমাজ।
ছিলিমিলি মালা ধরে জপে পীর পেগম্বরে
পীরের মোকামে দেই সাঁজ॥
দশ বিশ বেরাদরে বসিয়া বিচার করে
অনুদিন কিতাব-কোরাণ।
সাঁজে ডালা দেই হাটে পীরের শীরণি বাঁটে
সাঁজে বাজে দগড় নিশান॥

* * * * * * *

আপন টোপর লৈয়া বসিল গাঁয়ের মিয়া
ভুঞ্জিয়া কাপড়ে মুছে হাত।
সুবলী নেহালি পানী কুঁড়ানি বটুনি ছনি
পাঠান বসিল নানা জাত॥
বসিল অনেক মিয়া আপন তরফ লৈয়া
কেহ নিকা কেহ করে বিয়া।
মোল্লা পড়ায় নিকা দান পায় সিকা সিকা
দোয়া করে কলমা পড়িয়া॥
করে ধরি খুর ছুরি কুকুড়া জবাই করি
দশ গণ্ডা দান পায় কড়ি।
বকরি জবাই যথা মোল্লারে দেই মাথা
দান পায় কড়ি ছয় বুড়ি॥
যত শিশু মুসলমান, তুলিল মকতব খান
মখদম পড়ায় পঠনা॥

উক্ত বর্ণনার ভিতর অবশ্য বিদ্রূপ আছে, কিন্তু ধর্ম্ম-বিদ্বেষ মোটেই নেই। মোল্লার উপর যে ঠাট্টা আছে, সেটিকে অনেকে মুসলমানধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষের পরিচায়ক মনে করতে পারেন, তাই কবিকঙ্কণ ব্রাহ্মণ পুরোহিতের যা চরিত্র বর্ণন করেছেন, সে বর্ণনাটির দু'চার ছত্র এখানে উদ্ধৃত ক'রে দিচ্ছি,—

মুর্খ বিপ্র বৈসে পুরে নগরে যাজন করে
শিখায় পূজার অধিষ্ঠান।
চন্দন তিলক পরে দেবপূজা ঘরে ঘরে
চাউলের বোচকা বান্ধে টান॥

* * * * * * *

গালি দিয়া লণ্ডভণ্ডে ঘটক ব্রাহ্মণ দণ্ডে
কুলপাঁজি করিয়া বিচার।
যে নাহি গৌরব করে সভায় বিড়ম্বে তারে
যাবৎ না পায় পুরস্কার॥

ধর্ম্ম যাই হোক্ না কেন, ধর্ম্মযাজকের হচ্ছে একটি ব্যবসাদারের দল। সুতরাং যা'রা ধর্ম্মের ব্যবসা করে, কোন সমাজের লোকই তাঁ'দের তাদৃশ ভক্তির চোখে দেখে না।

মুসলমান শিশুদের যে অনবরত পড়ান হত, এবং মুসলমানরা যে দশ বিশ বেরাদরে ব'সে অনুদিন স্ব-শাস্ত্রের চর্চ্চা করত, এটা অবশ্য তাঁ'দের সভ্যতারই পরিচায়ক, আর এ সভ্যতা সেই শ্রেণীর, আজকের দিনে আমরা যা'কে democratic বলি।

কবিকঙ্কণের একটি বিদ্রূপ আমার কাছে অতি অদ্ভুত

লাগে। মুসলমানদের মালাজপা নিয়ে, শুধু কবিকঙ্কণ নয়, ভারতচন্দ্রও বিদ্রূপ করেছেন। মালা কি হিন্দুরা জপে না? তবে মুসলমানের মালা জপায় কি দোষ হ'ল? তা'রা অবশ্য রুদ্রাক্ষের কি তুলসীকাঠের মালা জপে না, জপে তসরির অর্থাৎ স্ফটিকের মালা। আর স্ফটিকের মালা যে পুরাকালে হিন্দুরাও জপতেন, তা'র পরিচয় কুমারসম্ভবের বক্ষ্যমাণ শ্লোকে পাওয়া যায়,—

"অথাগ্রহস্তে মুকুলীকৃতাঙ্গুলৌ
সমর্পয়ন্তী স্ফটিকাক্ষমালিকাম্।
কথঞ্চিদদ্রেস্তনয়া মিতাক্ষরং
চিরব্যবস্থাপিতবাগভাষত ॥"
(কুমার, ৫ম সর্গ, ৬০ শ্লোক)

২

আমরা হিন্দুরা জ্ঞানমার্গীই হই, ভক্তিমার্গীই হই আর কর্ম্মমার্গীই হই, উপরন্তু আমরা সকলেই ছুঁৎমার্গী। ফলে যাঁ'দের আচার-ব্যবহার অন্যরূপ, তাঁ'দের সঙ্গে এক গ্রামে হলেও, এক পাড়ায় আমাদের বাস করা চলে না। অতি পুরাতন কাল থেকে ব্রাহ্মণরা অগ্রহারে অর্থাৎ স্বতন্ত্র ব্রাহ্মণপল্লীতে বাস করতেন, তা'র প্রমাণ মহাভারতে আছে। বিদর্ভরাজ ভীম কন্যা দময়ন্তী ও জামাতা নলের খোঁজে যে সকল ব্রাহ্মণকে দেশ বিদেশে পাঠিয়েছিলেন, তাঁ'দের বলেছিলেন যে, যে তাঁ'র মেয়ে-জামাইয়ের খবর আনতে পারবে, তা'কে "অগ্রহারাংশ্চ দাস্যামি গ্রামং নগরসম্মিতং।" মাদ্রাজে আজও অগ্রহার আছে এবং কোনও অস্পৃশ্য হিন্দুর ব্রাহ্মণপল্লীর পথ দিয়ে হাঁটবার যো নেই। আজকে কেবল দেশের নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরা যে সত্যাগ্রহ করবে ব'লে ব্রাহ্মণদের শাসাচ্ছে, তা'র কারণ, তা'রা ঐ ব্রাহ্মণ-পথে চল্‌বার অধিকারে বঞ্চিত। হিন্দুর ছায়া মাড়ালে হিন্দুর যখন ধর্ম্ম নষ্ট হয়, তখন সেকালে হিন্দু-মুসলমান যে পাশাপাশি বাস করতে পারত না, সে কথা বলাই বাহুল্য। পরস্পরের কাছ থেকে দূরে দূরে থাকাই তা'রা সুবুদ্ধির কায মনে করত।

ইদানীং দক্ষিণ আফ্রিকায় যাকে Class area বলে অর্থাৎ স্বতন্ত্র জাতের স্বতন্ত্র বাসস্থানের ব্যবস্থা, পূর্ব্বে সেই বন্দোবস্তই বাঙ্গালায় প্রচলিত ছিল। সে কালের অনেক গ্রন্থে এ ব্যবস্থার উল্লেখ আছে। কবিকঙ্কণ বলেন,—

বীরের লইয়া পান বৈসে যত মুসলমান
পশ্চিমদিক বীর দেয় তারে ॥
আইসে চড়িয়া তাজি সৈয়দ মোগল কাজি
খয়রাতে বীর দেয় বাড়ি।
পুরের পশ্চিম পটী বোলায় হাসন হাটী
এক সমুদায় গৃহ বাড়ী ॥

কবিকঙ্কণের পূর্ব্ববর্ত্তী কবি, দ্বিজ হরিরামও মুসলমান পাড়ার প্রায় একই বর্ণনা ক'রে গিয়েছেন। তিনি বলেন যে,—

বীরের সম্মান পায়্যা পশ্চিম দিগেতে গিয়া
বসে যত মোগল পাঠান।
হাসন হাটীর মাঝে সৈদ সকল রাজে
সেক জাদা বৈসে পায়্যা পায়্যা পান ॥
(বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়)

এ সকল বর্ণনা প'ড়ে মনে হয় যে, ষোড়শ শতাব্দীতে এ দেশে মুসলমান বস্তিমাত্রেরই নাম ছিল হাসনহাটী এবং গ্রামের পশ্চিমদিকেই তা'রা বাস করত। অন্য সকল দিক্ ছেড়ে তা'রা যে কেন পশ্চিমদিক্ পছন্দ করত, জানি নে, সম্ভবতঃ ঐ দিক্‌টা মক্কার দিক্ ব'লে।

দ্বিজ হরিরাম এবং কবিকঙ্কণের বর্ণনা থেকে আমরা দেখতে পাই যে, ষোড়শ শতাব্দীতে মুসলমানদের ভিতর দস্তুরমত জাতিভেদ ছিল। কবিকঙ্কণ নিম্নলিখিত জাতি সকলের নাম উল্লেখ করেছেন, (১) জোলা, (২) গোলা, (৩) মুকেরি, (৪) পীঠারি, (৫) কাবারি, (৬) সানাকর, (৭) পটুয়া, (৮) তীরকর, (৯) কাগতি, (১০) কলন্দর, (১১) রঙ্গরেজ, (১২) হাজাম, (১৩) কসাই।

এ সকলই ছিল নিম্নশ্রেণীর মুসলমান। কারও কায ছিল কাপড় বোনা, কারও গরু মারা, কারও সানা বাঁধা, কারও তীর গড়া, কারও পীঠে বেচা, কারও মাছ মারা, কারও কাগজ তৈরী করা, কারও পট আঁকা, কারও কাপড় রঙানো, কারও বলদ চালানো। তার পর "পয়মাল" নামে অদ্ভুত জাত ছিল, যা'রা "হিন্দু হয়ে মুসলমান।"

কিন্তু এ সকল মুসলমানের সঙ্গে হিন্দু কবিরা মোগল, পাঠান ও সৈয়দদের সঙ্গে একটা বিশেষ পার্থক্য দেখান।

দেশী মুসলমানদের অনেকেই নাকি, "রোজা নমাজ না করিয়া" মুসলমান, আবার এদের মধ্যে কোন কোন জাত নাকি,—

"নিরন্তর মিথ্যা কহে নাহি রাখে দাড়ি।"

মোগল-পাঠানদের কায ছিল শুধু যুদ্ধ করা। দ্বিজ হরিরাম তাঁ'দের এই ব'লে পরিচয় ছিলেন,—

কেহ বা সিপাই হয় বীর বিরাদবি বয়
পায়দল হৈয়া কেহ রহে।
কেহ বা ব্যাপার করে কেহ যায় দেশান্তরে
অনুক্ষণ কেহ যুদ্ধ চাহে॥

আমাদের ভাষায় বল্‌তে হ'লে, মোগল-পাঠান-সৈয়দরা সব ছিল ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, আর জোলা-পোনারা সব ছিল শূদ্র। মুসলমানদের এই জাতিভেদ অনেকের কাছে একটু অদ্ভুত লাগে। এমন কি, কোন কোনও য়ুরোপীয় পণ্ডিতের মতে, হিন্দুধর্ম্মের প্রভাবে মুসলমানদের ভিতর এই জাতি-ভেদের সৃষ্টি হয়েছে। আমার মনে হয়, যে সকল হিন্দু মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করেছিল, তা'রা হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করে-ছিল, কিন্তু নিজের নিজের জাতব্যবসা ছাড়েনি ফলে জাতও ছাড়েনি। তাতেই হিন্দুর অনুরূপ জাত মুসলমানদের মধ্যেও আছে। শূন্যপুরাণ প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের প্রথম গ্রন্থ আর অন্নদামঙ্গল শেষ। এ উভয় গ্রন্থেই মুসলমান কর্ত্তৃক হিন্দুর দেবমন্দিরের উপর দৌরাত্ম্যের উল্লেখ আছে। আর উভয় কালেই একই ক্ষেত্রে মন্দির ভগ্ন করা হয়, অর্থাৎ উড়িষ্যায়। সেকালের বঙ্গসাহিত্য আলোচনা করলে দেখা যায় যে, মুসলমান-বাদশারা দেউল দেহরা ভাঙতেন, যাজপুরে যাজনগরে ও উড়িষ্যায়। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁ'র 'বাঙ্গালার ইতিহাসে' প্রমাণ করেছেন যে, যা'র নাম যাজনগর, তা'রই নাম উড়িষ্যা। খাস বাঙ্গালার কোন মন্দির ধ্বংসের উল্লেখ বঙ্গসাহিত্যে নেই। ইহার কারণ, বোধ হয়, সেকালে বাঙ্গালা দেশে এমন কোনও মন্দির ছিল না যা কোন বিধর্ম্মীর চক্ষুঃশূল হ'ত। ভারতচন্দ্র তাঁ'র গ্রন্থারম্ভে বলেছেন যে, নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ—

"ভাইপো সৌলদজঙ্গে খালাস করিয়া।
উড়িষ্যা করিল ছার লুটিয়া-পুড়িয়া॥
বিস্তর লস্কর সঙ্গে অতিশয় জুম।
আসিয়া ভুবনেশ্বরে করিলেক ধুম॥
ভুবনে ভুবনেশ্বর মহেশের স্থান।
দুর্গাসহ শিবের সর্ব্বদা অধিষ্ঠান॥
দুরাত্মা মোগল তাহে দৌরাত্ম্য করিল।
দেখিয়া নন্দীর মনে ক্রোধ উপজিল॥
মারিতে লইলা হাতে প্রলয়ের শূল।
করিতে যবন সবে সমূলে নির্ম্মূল॥

উপরিউক্ত বিবরণ প'ড়ে মনে হয় যে—"history repeats itself"এ কথা ঠিক। বাঙ্গালার শেষ পাঠান বাদশা দাউদ কররাণী যে কায করেছিলেন, বাঙ্গালার শেষ মোগল নবাবও ঠিক সেই কায করেছিলেন। দাউদ কররাণীর সেনাপতি কালাপাহাড়ও ভুবনেশ্বরে গিয়ে ধূম করেছিলেন। এই সব বর্ণনা প'ড়ে মনে হয় যে, পাঠান-মোগলদের, হিন্দুর উপর ততটা বিদ্বেষ ছিল না, যতটা বিদ্বেষ ছিল হিন্দু আর্টের উপর। ভারতচন্দ্র বলেন, নন্দী মারিতে লইলা হাতে প্রলয়ের শূল, কালাপাহাড় কিন্তু ভুবনেশ্বরের নন্দীর নাসাকর্ণ ছেদন করেছিলেন। সেই নাসাকর্ণহীন নন্দী আজও ভুবনেশ্বরের মন্দিরের দ্বার রক্ষা করছে।

দাউদ কররাণী অতিশয় অপদার্থ বাদশা ছিলেন, থাক্‌বার ভিতর তাঁ'র ছিল শুধু অসামান্য রূপ। আলিবর্দ্দি খাঁ সুপুরুষ ছিলেন কি না জানি না, কিন্তু তিনি যে কাপুরুষ ছিলেন, তা'র প্রমাণ ভারতচন্দ্রেই পাওয়া যায়।—আলিবর্দ্দি খাঁ ভুবনেশ্বরে ধম করবার পর, বর্গীরা যখন বাঙ্গালা দেশ আক্রমণ করলে, তখন—

"পলাইয়া কোটে গিয়া নবাব রহিল।
কি কহিব বাঙ্গালার যে দশা হইল॥
লুঠিয়া ভুবনেশ্বর যবন পাতকী।
সেই পাপে তিন সুবা হইল নারকী॥"

ভারতচন্দ্রের এ সকল কথা প্রামাণ্য—কেন না, এ সকল ঘটনা তিনি নিজে দেখেছিলেন, এবং আলিবর্দ্দি খাঁর অত্যাচারের তাঁর আশ্রয়দাতা রাজা কৃষ্ণচন্দ্র একজন বিশেষ ভুক্তভোগী ছিলেন।

কিন্তু আলিবর্দ্দি খাঁ যে উড়িষ্যা ছারখার করেছিলেন, তা'র কারণ আসলে political। কারণ যে কি, তা ভারতচন্দ্রের মুখেই শোনা যাক্।

কটকে মুরশীদ্‌কুলি নবাব আছিল
তারে গিয়া আলিবর্দ্দি খেদাইয়া দিল॥

কটকে হইল আলিবর্দ্দির আমল।
ভাইপো সৌলদজঙ্গে দিলেন দখল ॥
নবাব-সৌলদজঙ্গ রহিল কটকে।
মুরাদবাখর তারে ফেলিল ফাটকে ॥
লুঠি নিল নারী গাড়ী, দিল বেড়ি তোক্।
শুনি মহাবদজঙ্গ চলে পেয়ে শোক ॥
উত্তরিল কটকে হইল স্বরাপর।
যুদ্ধে হারি পলাইল মুরাদবাখর ॥
ভাইপো সৌলদজঙ্গে খালাস করিয়া।
উড়িষ্যা করিল ছার লুঠিয়া পুড়িয়া ॥

পররাজ্য জয় করতে হ'লে যে fire and swordএর নির্ম্মম ব্যবহার করতে হয়,এ কথা স্বয়ং বিস্মার্ক ব'লে গিয়েছেন এবং পণ্ডিত মূর্খ-নির্ব্বিচারে সকল জর্ম্মাণ সমান শিরোধার্য্য করেছেন। যদি কেউ বলেন, যে পলিটিকাল কারণে উড়িষ্যা পুড়িয়ে ছারখার করলেই ত হ'ত, ভুবনেশ্বরের মন্দিরের উপর হস্তক্ষেপ করবার ত কোনই প্রয়োজন ছিল না। এ আপত্তির উত্তর স্বয়ং ভারতচন্দ্রই দিয়েছেন। তিনি বলেন, "নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়।" ভারতচন্দ্রের কথা যে সত্য, তা' জর্ম্মাণরাও সে দিন Rheim এর অপূর্ব্ব সুন্দর গীর্জ্জার উপর গোলা চালিয়ে প্রমাণ করেছেন। আর পৃথিবীর ভিতর অদ্বিতীয় ধার্ম্মিক ও দার্শনিক জাত জর্ম্মাণরা যে খৃষ্টধর্ম্মের বিরোধী, আশা করি, এমন কথা কেউ বলবেন না। সুতরাং আলিবর্দ্দি যে হিন্দুধর্ম্মবিদ্বেষী, এমন কথা জোর ক'রে বলা যায় না।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, অর্থাৎ বাঙ্গালায় মুসলমান আসবার সাড়ে ছ-শ বৎসর পরে, পরস্পরের ধর্ম্ম সম্বন্ধে হিন্দু মুসলমানের মনোভাব কি ছিল, তাও আমরা ভারতচন্দ্রের লেখা থেকেই জানতে পাই।

"মানসিংহে", জাহাঙ্গীরের সঙ্গে ভবানন্দ মজুমদারের যে কথোপকথন আছে, সেটি অবশ্য আগাগোড়া কাল্পনিক। কিন্তু ভারতচন্দ্রের কালে হিন্দু-মুসলমান তর্ক করতে বসলে, হিন্দু যে ভবানন্দ মজুমদারের কথা ও মুসলমান জাহাঙ্গীরের কথা বলতেন, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

মনে রাখবেন যে, আদ্যোপান্ত অন্নদামঙ্গল কৃষ্ণচন্দ্রের সভায়, সুরসংযোগে আবৃত্তি করা হ'ত, এবং সে সভায় সভাসদ হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই ছিল। এ ক্ষেত্রে ভারতচন্দ্র এমন কোন কথায়ই অবতারণা করেন নি যা উভয় সম্প্রদায়ের সভাসদদিগের অবোধ্য কি অপ্রিয় ছিল। "আপরিতোষাদ্বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্।" কালিদাসের এ উক্তির সঙ্গে ভারতচন্দ্রের নিশ্চয়ই পরিচয় ছিল। সুতরাং ধ'রে নেওয়া যেতে পারে যে, ভারতচন্দ্র হিন্দু-মুসলমান-নির্ব্বিচারে সকল সভাজনকে পরিতুষ্ট করতে চেষ্টা করেছিলেন। প্রথমেই চোখে পড়ে যে, এ কথোপকথনে পরিহাস দেদার আছে। বিশেষতঃ উভয় ধর্ম্মের আচার অনুষ্ঠান নিয়ে উভয় পক্ষই নানারূপ রঙ্গব্যঙ্গ করেছেন। ইংরাজী ভাষায় যাকে scepticism বলে, তার একটানা সুর—এ তর্কের ভিতর আগাগোড়া রয়ে গিয়েছে। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভার রসিকতা এ প্রবন্ধে উদ্ধৃত করা আমি সঙ্গত মনে করি না।

আচার অনুষ্ঠান বাদ দিয়ে, যথার্থ ধর্ম্মমত-সম্বন্ধে উভয়ের ভিতর যে বিশেষ কোন প্রভেদ ছিল, এ তর্ক প'ড়ে ত তা মনে হয় না। ভবানন্দ মজুমদারের মুখ দিয়ে ভারতচন্দ্র বলিয়েছেন যে :—

হিন্দু-মুসলমান আদি জীবজন্তু যত।
ঈশ্বর সবার এক নহে দুই মত ॥
পুরাণের মত ছাড়া কোরাণে কি আছে।
ভাবি দেখ, আগে হিন্দু মুসলমান পাছে ॥

এ কথা আমরা অন্য কবিদের মুখেও বহুবার শুনেছি—তবে ভারতচন্দ্রের কথার নূতনত্ব এই যে, তা'র ভিতর ঐতিহাসিক যুক্তি আছে আর তার পর হিন্দু-মুসলমানকে জীবজন্তুর দলে ফেলাটায়, নিতান্ত আধুনিক ধরণের প্রাধান্যই ফুটে ওঠে। এ ধরণের কথাবার্ত্তায় ভক্তির চাইতে জ্ঞানের কথা। জাহাঙ্গীর বলেছিলেন যে, হিন্দুর শাস্ত্র সয়তান-বাজী, উত্তরে ভবানন্দ বলেন যে,

ঈশ্বরের বাক্য বেদ আগম পুরাণ।
সয়তান-বাজী সেই, এ যদি প্রমাণ ॥
সেই ঈশ্বরের বাক্য কোরাণ যে কয়।
সেহ সয়তান-বাজী কহিতে কি ভয় ॥

অর্থাৎ কোরাণ যদি revelation হয়, তা হ'লে বেদও তাই, আর বেদ যদি তা না হয়, ত কোরাণও তা নয়। বলা বাহুল্য যে, এ রকমের তর্ক নিতান্ত একেলে। ভারতচন্দ্র খৃষ্টানধর্ম্ম সম্বন্ধে বলেছেন :—

"যবনেরে কত ভান ফিরিঙ্গীর মত।
কর্ণবেদ নাহি করে না দেয় সুন্নত॥
শৌচ-আচমন নাহি যাহা পায় খায়।
কেবল ঈশ্বর আছে বলে এই দায়॥"

যিনি সকল ধর্ম্মকে সমান নজরে দেখতে পারেন, বলা বাহুল্য, তাঁকে কোন ধর্ম্মেরই গোঁড়া ভক্ত বলা যায় না। আমার মনে হয় যে, বহুকাল পাশাপাশি বাস করবার ফলে, হিন্দু মুসলমানের মনোভাব পরস্পরের মতামত সম্বন্ধে যথেষ্ট উদারতা লাভ করেছিল। অনেকে বলবেন, যে, এই সকৌতুক উদারতা—সে যুগের decadent মনোভাবের পরিচয় দেয়। তা, হ'তে পারে—কিন্তু গোঁড়ামি ও বিদ্বেষবুদ্ধির যে পরিচয় দেয় না, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সে যাই হোক, প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের প্রসাদে আমরা এ সত্যের পরিচয় পাই যে, বর্ত্তমানে হিন্দু মুসলমানের ধর্ম্মবিরোধ যদি একটা জাতীয় মহাসমস্যা হয়ে উঠে থাকে ত, সে সমস্যা আমরা উত্তরাধিকারিসূত্রে লাভ করি নি। সমগ্র প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে cow-killing riotএর নামগন্ধ পর্য্যন্ত নেই, যদিচ মারপিট দাঙ্গা-হাঙ্গামা সেকালে নিত্যকর্ম্মের মধ্যে ছিল।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

শেষ শয়ন

(Mrs. Hemansএর ভাবানুসরণে)

আদরে সোহাগে পাশাপাশি সুখে একই গেহে
লালিত তাহারা হাসিয়া খেলিয়া মায়ের স্নেহে।
আজিকে তাদের অনেক তফাৎ, শায়িত তারা
কেহ বনে মাঠে কেহ বা সলিলে চিহ্নহারা।
একই জননী মাগি কল্যাণ তাদের লাগি
দেবতায় স্মরি বাল্য শিয়রে রহিত জাগি
একই বোঁটায় পাঁচটি কুসুম পড়িত নুয়ে
আজি কোথা তারা স্বপন দেখিছে কোথায় শুয়ে?

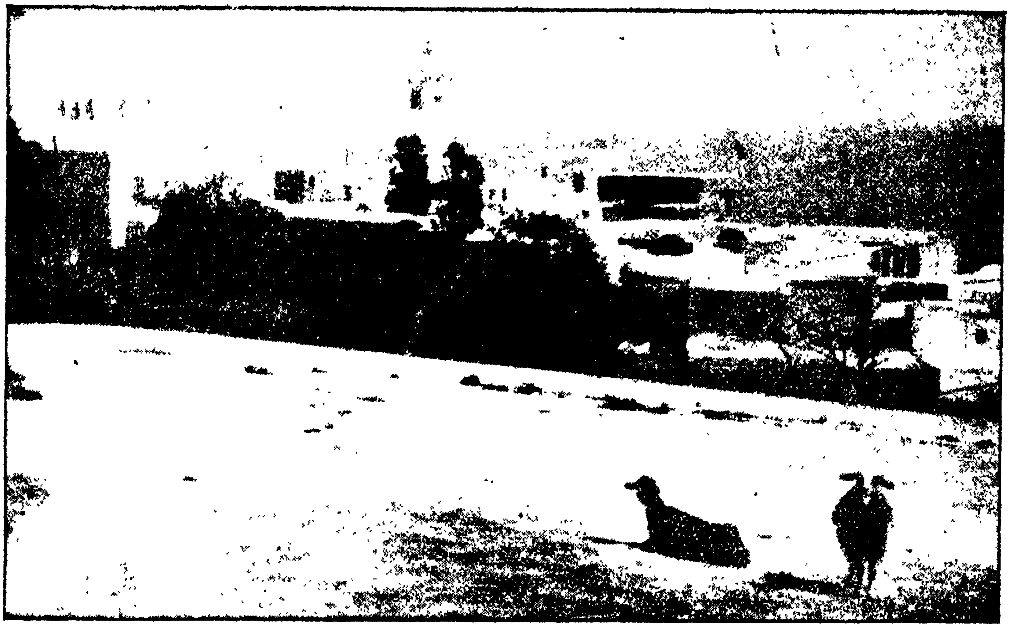
এক জন দূর নেপালের বনে ঘুমায় বুঝি,
এক দিন তারে গুরখা শিকারী পাইল খুঁজি।
পাশ দিয়ে বয় গৈরিক নদী শীর্ণকায়া,
দেবদারু-বন তাহার শিয়রে বিথারে ছায়া।
এক জন আছে নর্ম্মদানীরে গভীর তলে,
তার শোকে সেথা মর্ম্মর গিরি কাঁদিয়া গলে।
সব হ'তে বেশী তারেই সবাই করিত স্নেহ
শুনিতে বিদায়, সাথে তা'র হায় ছিল না কেহ।

আর এক জন হারাল জীবন ব্রহ্মদেশে
ইরাবতী-নীরে গিয়াছে তাহার ভস্ম ভেসে।
বহু দূরে ছোট, সব হ'তে যেবা আছিল গুণী,
ছাত্র জীবন শায়িত তাহার বিলাতে শুনি।
ভগিনী তাদের শায়িত পুরীর সিন্ধুকূলে
ঘুমায়ে পড়েছে সেথা অসীমের চরণমূলে।
এক দিন যারা ছিল কাছাকাছি নিকট অত
আজিকে ঘটেছে হায় রে তাদের তফাৎ কত!

এক দিন যারা একই তরু ছায়ে করিল খেলা,
একই আঙ্গিনায় রচিল যাহারা মোহন মেলা।
তুলসীর তলে করিল মিলিত হরিধ্বনি
কত দূরে তারা একই মায়ের নয়নমণি?
হায় মা ধরণী, তোমাতে এমনি সবি কি শেষ?
মরণের পারে নাহি কি মা আর মিলনদেশ?
তবে কি মা সব বিফল গভীর সে ভালবাসা
এদের আর কি নাহিক কোথাও মিলন-আশা?

শ্রীকালিদাস রায়

প্রাচীন কার্থেজ



সে-দি-বো সৈদ গম্বুজ। মুসলমান কিংবদন্তী অনুসারে সেণ্ট লুই (ফরাসীরাজা একাদশ লুই) মৃত্যুর পূর্ব্বে ইস্‌লামধর্ম্ম অবলম্বন করেন এবং বো সৈদ নাম গ্রহণ করেন।

ইতিহাসপাঠকমাত্রই সুপ্রসিদ্ধ কার্থেজ নগরীর নাম অবগত আছেন। যে মালভূমিতে এক কালে এই প্রাচীনা নগরী বিদ্যমান ছিল, কালের প্রভাবে গ্রাম, নগর প্রভৃতি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলেও, শত শত বৎসরের সঞ্চিত মৃত্তিকাস্তূপের নিম্নে সমাহিত হইলেও সে মালভূমি এখনও বিদ্যমান। অধুনা মৃত্তিকাস্তূপ সরাইয়া ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিকগণ সেই কার্থেজ নগরীর সম্পূর্ণ আবিষ্কারের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাদের সে প্রচেষ্টা অনেকাংশে সফলও হইয়াছে। প্রাচীনত্ব হিসাবে কার্থেজ নগরীর মর্য্যাদা যে খুবই বেশী, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। এই কার্থেজে এক দিন ফিনিসীয়, বার্ব্বার, নিউমিডীয়, রোমক, ভাণ্ডাল, বাইজানতীয় এবং আরব জাতি রাজত্ব করিয়াছিল। প্রত্যেক জাতির আচার, ব্যবহার, আইন, আদালত, সভ্যতা—জীবনযাত্রাপ্রণালীর যাবতীয় বিষয়ের স্মৃতিচিহ্ন যে কার্থেজ নগরীতে বিদ্যমান ছিল, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। কার্থেজ নগরীর বুকের উপর ৩ হাজার বৎসরের মৃত্তিকাস্তূপ পুঞ্জীকৃত হইয়াছিল। মানুষ এখন সেই মৃত্তিকা সরাইয়া মৃতা নগরীর মধ্যে তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বের সভ্যতার ইতিহাস আবিষ্কার করিতেছে—ঐশ্বর্য্য-বৈভবের পুনরুদ্ধার করিতেছে।

কার্থেজ-অন্তরীপ হইতে মালভূমিটিকে দেখিলেই তাহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে অভিভূত হইতে হয়। রাণী দিদো (Dido) খৃষ্টজন্মের নয় শত বৎসর পূর্ব্বে ইহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া সর্ব্বপ্রথম এই স্থানে ফিনিসীয় রাজধানী কার্থেজ নগরী স্থাপন করেন। ফিনিসীয়দিগকে রোমকগণ 'পিউনিক্' নামে অভিহিত করিত। এই কার্থেজ নগরীর প্রথম প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। কথিত আছে, রাণী দিদো এই স্থানে অবতীর্ণ হইয়া দেশীয়-দিগের সহিত এই বন্দোবস্ত করেন যে, একটি বৃষভের চর্ম্ম যতটুকু, সেই পরিমাণ জমী তিনি লইবেন। মূল্য প্রদত্ত হইলে রাণী দিদোর আদেশে সেই চর্ম্ম সূত্রাকারে খণ্ড খণ্ড করা হয়। সেই চর্ম্মসূত্রসমূহ গ্রন্থিবদ্ধ করিয়া যতদূর



[illegible]—বামদিকে প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দেখা যাইতেছে। এই স্থানে প্রাচীন যুগের বহু সমাধি পাওয়া গিয়াছে।

পর্য্যন্ত পরিমাপ করা হইয়াছিল, তিনি ততখানি ভূমি অধিকার করেন। এই ভূমিখণ্ডের এক স্থানে তিনি একটি প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন। এই প্রাসাদের নাম বির্সা (Byrsa), গ্রীকভাষায় উহার অর্থ বৃষভচর্ম।

কার্থেজের প্রাচীন বন্দর কোন স্থানে অবস্থিত ছিল, এখনও তাহা নির্ণীত হয় নাই। মালভূমির উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে সমুদ্রগর্ভে প্রাচীরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এই স্থান খনন করিলে, প্রাচীন যুগে বন্দরটি কোথায় অবস্থিত ছিল, সে সম্বন্ধে নাকি অনেক নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে। এপিয়ান্ (Appian) এবং অন্যান্য রোমক ঐতিহাসিকের বর্ণনা হইতে এইটুকু জানা যায় যে, এক সময়ে বন্দরটি বৃত্তাকার এবং নৌ-সেনাপতির প্রাসাদ তাহার কেন্দ্রস্থলেই বিদ্যমান ছিল। আবার অন্য সময়ে নাকি সমচতুষ্কোণভাবে বন্দর অবস্থিত ছিল। বন্দরে সে সময়ে ২ শত ২০ খানি গ্যালি জাহাজ একসঙ্গে নোঙ্গর করিয়া থাকিতে পারিত। রোমক যুগের অবসানকালের পর হইতে এ পর্য্যন্ত সমুদ্রবেলা সাড়ে ৩ গজ উচ্চ হইয়াছে। সুতরাং উপসাগরগর্ভে ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরের কিয়দংশ যে সমাহিত হইয়া আছে, ইহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে।

বাঁহারা এই প্রাচীন নগরীর পুনরুদ্ধারের জন্য পরিশ্রম করিতেছেন, তাঁহাদের সিদ্ধান্ত এইরূপ যে, খননকার্য্য অত্যন্ত শ্রমসাধ্য। পাহাড়সমূহের মধ্যবর্ত্তী নিম্ন স্থান ও খাদগুলি জলমাটির সাহায্যে এমন ভরিয়া উঠিয়াছে যে, সেই মৃত্তিকা-স্তূপ অপসৃত করা সহজ ব্যাপার নহে। মোটামুটি গণনার হিসাবে দেখা যায় যে, প্রতি শতাব্দীতে অন্ততঃ ১ গজ উচ্চ মৃত্তিকা, বালুকা প্রভৃতি সঞ্চিত হইয়াছে। ২ হাজার বৎসর পূর্ব্বে যে সকল পদার্থ বিদ্যমান ছিল, তাহারা এই সুদীর্ঘকালে ২০ গজ মৃত্তিকাস্তূপের নিম্নে সমাহিত হইয়াছে। এই বিরাট মৃত্তিকাস্তূপ সরাইয়া অন্তর্নিহিত নগরের আবিষ্কার সহজ ব্যাপার নহে। লর্ড কারনারভান্ প্রায় সাড়ে ২২ লক্ষ মণ মাটী সরাইয়া তবে টুট্-আনখ-আমেনের সমাধি-সৌধের উদ্দেশ পাইয়াছিলেন। কার্থেজ নগরী এত বিভিন্ন জাতির অধিকারে আসিয়াছিল যে, এই

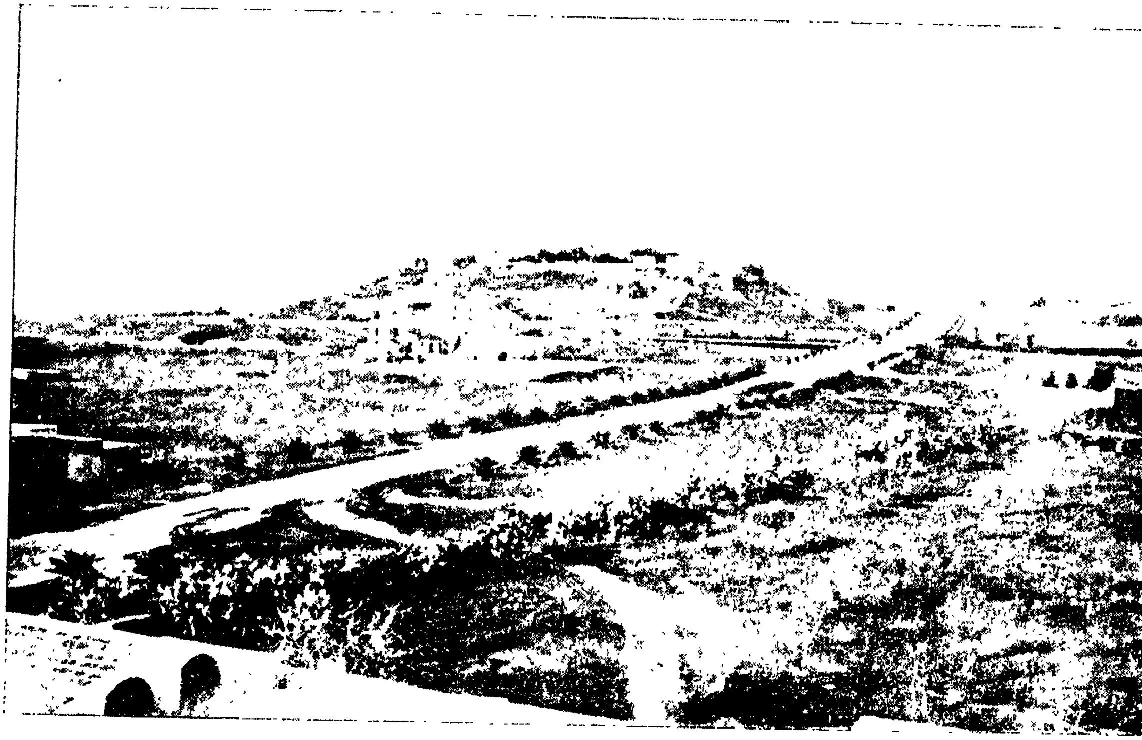




টিউনিসের ইহুদী পরিবার







বিমি প্রাসাদের [illegible]



অষ্ট্রিচের ডিমের খোলা'র উপর প্রাচীন চিত্রপদ্ধতি

স্থান পূর্ণমাত্রায় আবিষ্কৃত হইলে মহামূল্য ঐতিহাসিক উপাদান পাওয়া যাইবে।

বার্কাস্‌বংশ যখন কার্থেজ নগরীতে রাজত্ব করিতেছিলেন (হ্যাসড্রুবাল্, হ্যামিল্‌কার, হ্যানিবল প্রভৃতি এই বংশের রাজা ছিলেন।) সেই সময় এই নগরী ব্যবসায়-বাণিজ্য ও ধনসম্পদে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। সে সময় নগরের অধিবাসীর সংখ্যা ৭ হইতে ১০ লক্ষ ছিল। অন্যান্য বিবরণ হইতে—বিশেষতঃ ফরাসী ঐতিহাসিক উপন্যাস 'সালাম্বো' (Salammbo) পাঠে জানা যায় যে, কার্থেজের অসংখ্য হর্ম্ম্যমালা ও প্রাসাদ সে যুগে অন্যান্য জাতির ঈর্ষাবর্দ্ধন করিত। নগরের চারি পার্শ্বে তখন তিন শ্রেণী করিয়া সুদৃঢ় উচ্চ প্রাচীর বিদ্যমান ছিল। প্রাচীরগুলির উচ্চতা ৫০।৬০ ফুট এবং প্রস্থ ৩০ ফুট হইবে। কার্থেজ ধ্বংস হইবার পূর্ব্বে, খৃষ্টজন্মের ১ শত ৪৬ বৎসর পূর্ব্বে, নগরের কোন কোন অট্টালিকা সপ্ততল পর্য্যন্ত ছিল।



তানীত দেবীর মন্দির।

কেটো (Cato the Elder) কার্থেজ নগরীর বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার 'Delenda est Carthago' চিরস্মরণীয় হইয়া আছে। কেটো কার্থেজ নগরীর ভীষণ শত্রু ছিলেন। তাঁহার বিবরণ পাঠে জানা যায়, নগরীর হর্ম্ম্যমালার গঠন অত্যন্ত সুদৃঢ় ছিল। ১৬ দিবসব্যাপী ভীষণ অগ্নিকাণ্ডের পরও নগরীর সমগ্র বিরাট অট্টালিকা সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় নাই। যাঁহারা নগরের পুনরুদ্ধারে নিযুক্ত আছেন, তাঁহাদের বিশ্বাস, সেই সকল অট্টালিকা এখনও আবিষ্কৃত হইতে পারে।

কার্থেজ যে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয় নাই, তাহার আংশিক প্রমাণ ইতোমধ্যেই পাওয়া গিয়াছে। ২০,৪০ এবং ৬০ ফুট মৃত্তিকাস্তরের নিম্নে বাইজানতীয়, রোমক এবং ফিনিসীয় অধিকারের চিহ্নসমূহ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই আবিষ্ক্রিয়াকার্য্যে যাঁহারা নিযুক্ত আছেন, তন্মধ্যে পীয়ের দেলাত্রের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি ৫০ বৎসর ধরিয়া এই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে কার্য্য করিতেছেন। অনুসন্ধানফলে তিনি ৪টি প্রাচীন যুগের খৃষ্টধর্ম্মমন্দির, রোমক ও ফিনিসীয় সমাধিক্ষেত্র, ক্রীড়াপ্রাঙ্গণ এবং আরও কতিপয় মহামূল্য স্মৃতিচিহ্ন আবিষ্কার করিয়াছেন। কিন্তু এই ৫০ বৎসরব্যাপী চেষ্টার ফলে রোমক ও খৃষ্টীয় যুগের কার্থেজ নগরীর একদশমাংশ মাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে।

কাউণ্ট বায়রন খুন্ দে প্রোরক্ও (Count Byron Khun de Prorok) কার্থেজ নগরীর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কারের জন্য চেষ্টা করিতেছেন। তিনি খননকার্য্যে নিযুক্ত হইবার পর আরব সমাধিক্ষেত্র, খৃষ্টধর্ম্মমন্দির, রোমক

এবং বাইজানতায় স্মৃতিচিহ্নসমূহ আবিষ্কৃত হইয়াছে। খৃষ্টজন্মের ৭ শত বৎসর পূর্ব্বের কতিপয় ফিনিসীয় কবরও মৃত্তিকানিম্নে পাওয়া গিয়াছে।

সম্প্রতি অনুসন্ধানে ব্যাপৃত দলের মসিঁয়ে ইকার্ট তানীত (Tanit) দেবমন্দির আবিষ্কার করিয়াছেন। কার্থেজবাসীরা এই দেবীর উদ্দেশ্যে সে যুগে নরবলি প্রদান করিত। অনুসন্ধান-ফলে বহুসংখ্যক ঘট পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে ৪ হইতে ১২ বৎসর বয়স্ক বালক-বালিকার অস্থিসমূহ রক্ষিত আছে। এই সকল বালক-বালিকাকে সে যুগে অগ্নিকুণ্ডে জীবিতাবস্থায় নিক্ষিপ্ত করা হইত। যে সকল ঘটের মধ্যে অস্থিগুলি পাওয়া গিয়াছে, সেগুলি দেখিতে রক্তবর্ণ— উচ্চতায় ১ ফুটের



ভগ্নাবশেষ অট্টালিকার দৃশ্য।



সেণ্ট সাইপ্রিয়ানের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ।

অনধিক; মুখ প্রশস্ত, ধরিবার হাতল পর্য্যন্ত আছে। প্রত্যেক ঘটের উপর এক-খানি করিয়া টালি—তদুপরি উৎকৃষ্ট বালকবালিকার নাম উৎকীর্ণ। সে যুগে ব্যাল মোলক (Baal Moloch) নামক আর এক দেবতার মন্দিরও ছিল, এই ভীষণ দেবতার তৃপ্তির জন্যও শিশুদিগকে উৎসর্গ করা হইত। আবিষ্কারকগণ এই দেবতার মূর্ত্তিও আবিষ্কার করিবার



টিউনিসের ঘরের মেজে।

আশা রাখেন। সে যুগে মাতা স্বয়ং আপন শিশুকে ব্যাল মোলকদেবের অগ্নি-ময় গহ্বরে নিক্ষেপ করিত।

গভীরতর মৃত্তিকাস্তরের নিম্ন হইতে যে সকল দেব-দেবীর মূর্ত্তি এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে, পরীক্ষায় প্রমাণিত হইয়াছে, সেগুলি মিশরীয়। পুরাতত্ত্ব-বিদ্‌গণ অনুমান করেন যে, ব্যাল্ আমন দেব প্রথমতঃ মিশরীয় দেবতা আমন্ রা (Ammon Ra) ছিলেন।



কার্থেজ—রোমক যুগের ক্রীড়া-প্রাঙ্গণের দৃশ্য



রোমক যুগের জয়দেবতার মূর্ত্তি।

প্রচণ্ড ধ্বনি উত্থিত হইত এবং অন্যান্য বাদ্যধ্বনির মধ্যে উৎসৃষ্ট শিশুকে অগ্নি-কুণ্ডমধ্যে নিক্ষেপ করা হইত।

জুনো পাহাড়ে—ধ্বংসস্তূপমধ্যে একটা জিনিষ আবিস্কৃত হইয়াছে। পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণের ধারণা, গার্গিলিয়সের প্রসিদ্ধ স্নানাগার এই স্থানেই ছিল। এই স্থানে ৪১১ অব্দে ৫ শত ৬৫ জন বিশপ সমবেত হইয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, খৃষ্টানধর্ম্ম ক্যাথলিক থাকিবে না, ডোনা-টিষ্ট (Donatist) হইবে। স্নানাগারের সন্নিকটে একটি খিলানযুক্ত সুবৃহৎ কক্ষের ভগ্নাবশেষ আবিস্কৃত হইয়াছে। সম্ভবতঃ ইহা কার্থেজ নগরীর কোনও ধনবতী মহিলার প্রসাধনকক্ষ ছিল। কারণ, এই কক্ষমধ্যে বহু গন্ধদ্রব্যপূর্ণ পাত্র, সুবর্ণ-কঙ্কণ, হস্তিদন্তনির্ম্মিত চুলের কাঁটা, দর্পণ, নখকাটা কাঁচি প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য পাওয়া গিয়াছে।

ধর্ম্মের জন্য যাঁহারা জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, এমন অনেক ব্যক্তির সমাধি আবিস্কৃত হইয়াছে। শবাধার উদ্‌ঘাটন করিয়া পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ দেখিয়া-ছেন যে, প্রত্যেক শবাধারে তিনটি করিয়া কীলক আছে। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ক্রুশবিদ্ধ করিয়া ইঁহাদিগকে হত্যা করা হইয়াছিল।

কাউণ্ট প্রোরক্ কার্থেজ নগরীর পুনরুদ্ধারব্যাপার সম্বন্ধে আলোচনাপ্রসঙ্গে এক স্থানে বলিয়াছেন যে, খনন-কার্য্য যতই অগ্রসর হইবে, প্রাচীন যুগের কার্থেজবাসিগণের রীতিনীতিসংক্রান্ত অনেক নূতন বিষয় ততই জানিবার সুবিধা হইতে পারে। যখনই দেশের একটা ভীষণ দুর্দ্দিন উপস্থিত হইত, তখন কার্থেজে দেবতার উদ্দেশ্যে শিশু উৎসৃষ্ট হইত। এই ভীষণ প্রথার ফলে শত শত অভিজাত পরিবারের শিশুরা দেবতার ক্রোধশান্তির উদ্দেশ্যে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইত। 'ব্যাল্' দেবতার মূর্ত্তি অত্যন্ত বীভৎস। শৃঙ্গযুক্ত ষণ্ডের ন্যায় মুখমণ্ডল। এই দেবতা অনুক্ষণই যেন সজীব বালকগণকে আহার্য্যরূপে পাইবার জন্য উদ্যত হইয়া আছে। সে যুগে কপিকলের সাহায্যে এই দেবতার বাহু ঊর্দ্ধে উত্তোলিত হইত। তখন ঢাকের

কার্থেজ অন্তরীপের উচ্চতর ভূমি খনন করিয়া ফিনিসীয় যুগের অনেকগুলি সমাধি আবিস্কৃত হইয়াছে। রোমকগণ আগুন লাগাইয়া যখন কার্থেজ ধ্বংস করে, তখন অগ্নি এ অঞ্চলে ব্যাপৃত হয় নাই বলিয়া সমাধিগুলি রক্ষা পাইয়া-ছিল। উল্লিখিত সমাধিগুলি পাহাড় কাটিয়া—কোন কোন ক্ষেত্রে প্রায় ৩০ ফুট নিম্নে নির্ম্মিত হইয়াছিল। কোন কোন সমাধি হইতে অবিকৃত শব পর্য্যন্ত বাহির হইয়াছে। অনেক সমাধিমধ্যে নানাবিধ মণিমুক্তার অলঙ্কারও পাওয়া গিয়াছে। সমাধিভবনের প্রবেশদ্বারে একটি করিয়া মুখোস। ভূতপ্রেত অথবা দুষ্ট আত্মাকে

বিতাড়িত করিবার উদ্দেশে মুখোস রাখার প্রথা সে যুগে প্রচলিত ছিল।

আবিষ্কার ও খননকার্য্যে যাঁহারা নিযুক্ত আছেন, তাঁহারা এ পর্য্যন্ত ৫ হাজার স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা এবং নানাবিধ কঙ্কণ, অঙ্গুরীয়, দীপাধার ও তৈজসপত্র পাইয়াছেন। অধিকাংশই রোমক যুগের। কার্থেজ যাদুঘর (museum) নানাবিধ প্রাচীন যুগের স্মৃতিচিহ্নে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। খৃষ্টজন্মের দুই শতাব্দী পূর্ব্বের একজোড়া চশমা পাওয়া গিয়াছে। ফিনিসীয় যুগের এক সমাধি হইতে উহা আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ ফরাসী পুরাতত্ত্ববিদ পীয়ের দেলাত্রে যে সকল দ্রব্য পাইয়াছেন, তন্মধ্যে ব্রোঞ্জ-নির্ম্মিত ক্ষুর এবং দুগ্ধপাত্র বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।



রোমক যুগের প্রাচুর্য্য (লক্ষ্মী) দেবতার মূর্ত্তি।

পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ আরও আবিষ্কার করিয়াছেন যে, ফিনিসীয় যুগে নগর যে স্থানে ছিল, রোমক যুগে ঠিক সে স্থানে ছিল না। প্রাচীন যুগের ৬টি উচ্চচূড় স্তম্ভ আবিষ্কৃত হইয়াছে। বন্দরের অর্ণবপোত-সমূহের জন্য এই স্তম্ভগুলি নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে। সম্ভবতঃ ইহাদের উপর হইতে রাত্রিকালে আলোক প্রদর্শিত হইত। কিন্তু একটা বিস্ময়ের বিষয় এই যে, সমুদ্রের দিকে না হইয়া জলাভূমির দিকে এই সকল আলোকস্তম্ভের মুখ রহিয়াছে। পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করেন যে, শুধু আলোকস্তম্ভের জন্যই এগুলি ব্যবহৃত হইত না, অনেক সময় ইহাদের উপর হইতে নিক্ষিপ্ত আলোকরেখার সাহায্যে অর্ণবপোতগুলি রাত্রিকালে নিরাপদে নোঙ্গর করিয়া থাকিতে পারিত। এই স্তম্ভগুলির পরিধি ১৫ ফুট।

স্তম্ভগুলির নিম্নস্থ স্থানগুলি খনন করিয়া একটা প্রকাণ্ড প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। উহার দৈর্ঘ্য প্রায় প্রায় দেড় মাইল হইবে। প্রাচীরটি প্রস্থে ১৫ ফুট হইবে। আবিষ্কারের ফলে কিছুদিন পরে হয় ত জানা যাইবে যে, এই স্থানেই বন্দর অবস্থিত ছিল এবং অর্ণবপোতসমূহ হইতে এই স্থানে যাত্রী ও পণ্য অবতীর্ণ হইত।

প্রাচীরের অনতিদূরে কতিপয় কূপ আবিষ্কৃত হইয়াছে। পাহাড় কাটিয়া কূপগুলি নির্ম্মিত হইয়াছিল। কূপগুলি প্রায় ৫০ ফুট গভীর। সম্ভবতঃ এই কূপগুলি ফিনিসীয় যুগের। কারণ, রোমক যুগে কার্থেজ নগরীতে কোনও সুপেয় জলের কূপ ছিল না। বহু অর্থব্যয়ে তাহারা একটা বিরাট জলাশয় খনন করাইয়াছিল। ইতিহাসে তাহার উল্লেখ আছে।

কার্থেজ হইতে ১ শত মাইল দক্ষিণে মাদিয়ার তীর-ভূমির অদূরে একখানি জলমগ্ন গ্যালি জাহাজের অবস্থান আবিষ্কৃত হইয়াছে। বিমানপোতের সাহায্যেই উহা দেখা গিয়াছে। প্রায় ১ শত ২০ ফুট জলের নীচে এই



প্রাচীন মন্দিরের আবিষ্কৃত স্তম্ভ।

অর্ণবপোতের ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে। ডুবুরীরা জলে নামিয়া এই জলমগ্ন জাহাজের অস্তিত্ব পাইয়াছে। টিউনিস্ উপসাগরে পুরাতত্ত্ব-সম্প্রদায়ের অনুসন্ধান চলিতেছে। ফিনিসীয় যুগে যে মহাযুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল, তাহাতে ৫ শত জাহাজ জলে ডুবিয়া গিয়াছিল। ৪৫৩ খৃষ্টাব্দে ভ্যাণ্ডাল যখন রোম আক্রমণ করে, সেই সময় টিউনিস্ উপসাগরে একখানি লুণ্ঠন রণজাহাজ ডুবিয়া যায়। সমুদ্রগর্ভে এই সকল পোতের কোন না কোন অবশেষ পাওয়া যাইতে পারে বলিয়া তথায় বিশেষ অনুসন্ধান চলিতেছে।

রোমক যুগের কার্থেজ যে স্থানে অবস্থিত ছিল, ফিনিসীয় যুগের কার্থেজ ঠিক সেই স্থানে ছিল না। এ সম্বন্ধে পুরাতত্ত্ববিদ্গণ অনেক প্রমাণ পাইয়াছেন। ফরাসী পুরাতত্ত্ববিদ্ খৃষ্টজন্মের ৪ শত বৎসর পূর্ব্বের কতকগুলি দাহ্য পদার্থের আবিষ্কার করিয়াছেন। ঐতিহাসিকগণ যে স্থানকে কার্থেজ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাহা হইতে এই স্থান ২ মাইল দূরে অবস্থিত। বর্ত্তমান কার্থেজ যে স্থানে অবস্থিত, তাহার সাড়ে ৩ মাইল দূরে লা মার্শা নামক স্থানে লাভেজারি নামক উদ্যানের নিম্নে ফিনিসীয় যুগের এক প্রস্তরমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল নিদর্শন হইতে পুরাতত্ত্ববিদ্গণের ধারণা যে, রোমক যুগে যে স্থানে নগরী ছিল, ফিনিসীয় যুগে সে স্থানে কার্থেজ ছিল না।

উত্তর-আফ্রিকা ব্যতীত অন্যত্র খৃষ্টানযুগের সুন্দর ধ্বংসাবশেষ আর কোথাও পাওয়া যায় না। আলজিরিয়ার সেরসেল হইতে টিউনিসিয়ার কার্থেজ পর্য্যন্ত প্রত্যেক স্থান খৃষ্টধর্ম্মানুরাগীর রক্তে অনুরঞ্জিত।

প্রাচীন যুগের খৃষ্টমন্দিরগুলি দেখিতে কিরূপ ছিল, ইহা জানিবার জন্য যাঁহারা উৎসুক, তাঁহারা রোম নগরীতে না যাইয়া আফ্রিকায় গেলে প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইতে পারিবেন। কারণ, রোম নগরের ধর্ম্মমন্দিরগুলি যুগে যুগে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন করিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে। কিন্তু কার্থেজ ও টেবেসায় তাহা নহে। সেণ্ট অগাষ্টাইনের যুগের ধর্ম্মমন্দিরগুলি কিরূপভাবে নির্ম্মিত হইত, তাহার নিদর্শন তথায় এখনও পাওয়া যাইবে।

ফিনিসীয় যুগের শ্রেষ্ঠ নগরী কার্থেজ সম্বন্ধে বহু অনুসন্ধানের এখনও প্রয়োজন। সমগ্র কার্থেজ মালভূমিকে খনন না করিলে সকল বিষয়ের আবিষ্কার সম্ভবপর নহে।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

সন্ধান

১

"আপনার নাম কি মনীষা ?"

পুরীর সাগরকূলে বালুবিস্তারের যে স্থানটায় বালুকা জলসিক্ত, কিন্তু তরঙ্গচূড়ায় বাহিত ফেন যে পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছিতেছে না, সেই স্থানে দুই জন একেবারে সামনা-সামনি আসিয়া পড়িয়াছিল। যে এই কথাটা একটু সন্দেহসঙ্কুচিত-ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, তাহার সঙ্গে একটি বালক; বালকটির মুখে ও চক্ষুতে সদ্যোবিদূরিত ব্যাধির চিহ্ন—সন্ধ্যার আকাশে ধূসর বর্ণলেপের মত দেখা যাইতেছিল। প্রশ্ন-কারিণীকে দেখিলে মনে হয়, দেহে যৌবনের জোয়ারে ভাঁটার টান ধরিয়াছে—রূপলাবণ্যের পুষ্ট প্রবাহ দ্রুত সরিয়া যাইতেছে।

যাহাকে প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করা হইল, সেও প্রশ্নকারিণীর সমবয়সী; কিন্তু তাহাকে দেখিলে মনে হয়—জোয়ারের জলে নদী ভরিয়া যাইবার পর ভাঁটার টানের পূর্ব্বে যেমন থমথম ভাব দেখা যায়—এও তেমনই। তাহার প্রফুল্ল মুখে অস্তগমনোন্মুখ রবির কনক-কিরণ পড়িয়াছিল। সে প্রশ্ন শুনিয়া হাসিয়া উঠিল—হাসিতে কোমল ও মাংসল গালে টোল পড়িল। সে বলিল, "আমি যে সুনীতির মেয়ে-স্কুলের বন্ধু মনীষা, সে বিষয়ে আর কা'রও সন্দেহ থাকতে পারে, আমার নেই; সুনীতির যে সন্দেহ আছে, সে সন্দেহ কিন্তু আমি কখন করতে পারি নি।"

প্রশ্নকারিণী একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "কিন্তু ভেবে দেখ, কত দিন পরে দু'জনে দেখা!"

"বার, চৌদ্দ, না হয় ষোল বছর—এই বই ত নয়!"

সুনীতির ছেলেকে দেখাইয়া সে জিজ্ঞাসা করিল—"এটি কি বড় ছেলে?"

"ঐ একটিই ছেলে।"

ততক্ষণে মনীষার পশ্চাৎ হইতে দুইটি মেয়ে ও একটি ছেলে খালি পায়ে ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া তাহাদের কাছে দাঁড়াইল। মনীষা ছেলেমেয়েদের বলিল, "মাসীমাকে প্রণাম কর।"

ছেলেরা প্রণাম করিল।

মনীষা জিজ্ঞাসা করিল, "কত দিন পুরীতে এসেছ?"

সুনীতি বলিল, "প্রায় এক মাস—ছেলেটির ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা হয়েছিল; বড় রোগা হয়েছিল, আর কাসিটা যেন সারছিল না; তাই একে নিয়ে এসেছি।"

"সঙ্গে কে?"

"কলকাতা থেকেই চাকরবামন এনেছি—তারা আছে।"

"কেন, কর্ত্তাটি?"

"তিনি কলেজের অধ্যাপক—এখন ত ছুটী নেই! তুমি কবে এসেছ?"

"এখনও সপ্তাহ পূরে নি।"

"বেড়াতে এসেছ?"

"তাই বটে। স্বামী সখ ক'রে বাড়ী করলেন। আসার সব বন্দোবস্ত হয়ে গেল; এমন সময় একটা বড় মামলা জুটল। তিনি বল্লেন, 'কবে কোন্ বন্ধু বা আত্মীয় বাড়ীটা চেয়ে বসবেন—না বলতে পারব না। তা'র আগে তুমি ছেলেমেয়েদের নিয়ে দিন কতক থেকে এস—নইলে আমার তৃপ্তি হ'বে না'।"

"আর কত দিন থাকবে?"

"সে কাল ঠিক হ'বে। আজ শুক্রবার—রাত্রির গাড়ীতে তিনি বেরিয়ে পড়বেন, কাল সকালে আসবেন। বুঝতে পারছি, আমি চ'লে আসাতে তাঁ'র কষ্ট হচ্ছে; আমিও আর থাকতে পারছি নে। দেখি, এসে কি বলেন—বোধ হয়, আরও একটা সপ্তাহ থাকতে হ'বে।"

মনীষা অত্যন্ত নিঃসঙ্কোচে তাহাদের স্বামিস্ত্রীর এই বিরহব্যাকুলতার কথাটা ব্যক্ত করিয়া ফেলিল। সুনীতি কিন্তু তাহাতে বিদ্রূপ করিল না; বরং সে যেন কি ভাবিতে লাগিল।

মনীষা বলিল, "এত দিন পরে দেখা—দু'দণ্ড ভাল ক'রে কথা কইতে পারলুম না—সন্ধ্যা হয়ে এল। কাল-পরশু দু'দিনও দেখা হ'বে কি না সন্দেহ; সোমবারে বেলা চারটা বাজতে না বাজতেই আমি আসব—'অতিথি তোমারি দ্বারে।'—এখন বল ত ঠিকানাটা।"

পরস্পরে ঠিকানা বিনিময় হইল।

ততক্ষণ মনীষার ছেলেরা বালুর উপর বসিয়া ছোট ছোট ঝিনুক কুড়াইতেছিল। মনীষা বলিল, "চল,এখন সব বাড়ী চল। কত ঝিনুক নিবি বল ত ?" ছেলেরা উঠিল এবং হাতের বালু ঝাড়িয়া এ উহার গাত্রে দিল। তাহা লইয়া একটা কলহের সূত্রপাত হইতেছিল ; কিন্তু মনীষা তাহাতে বিন্দুমাত্র বিরক্ত না হইয়া খুব হাসিতে লাগিল।

সুনীতি বলিল, "তুমি এখনও খুব ছেলেমানুষ আছ।"

মনীষা বলিল, "বয়সে আর ছেলেমানুষ নেই বটে ; কিন্তু মনে না থেকে উপায় নেই। কর্ত্তাটির স্বভাব এমনই যে, গাম্ভীর্য্য তা'র ত্রিসীমায় ঘেঁসতে পারে না। তিনি হ'লে এতক্ষণ ওদের সঙ্গে ঝিনুক কুড়াতে আরম্ভ ক'রে দিতেন। ওদের সঙ্গে ঠিক ওদেরই মত খেলা করেন ; আমাকে কখন একটু গম্ভীর দেখলে এমন ঠাট্টা করেন যে, গাম্ভীর্য্য বাতাসে কর্পূরের মত উবে যায়।"

একটি মেয়ে বলিল, "মা, কাল বাবার সঙ্গে সমুদ্রে স্নান করব।" আর দুই জন হাততালি দিয়া বলিয়া উঠিল—"কি মজাই হবে !"

মনীষা হাসিয়া বলিল, "দেখলে ত ওদের ভাব !—এখন বুঝতে পারছ, মানুষটি কেমন ?"

ততক্ষণে সূর্য্য ডুবিয়া গিয়াছে, কেবল পশ্চিম আকাশের তলদেশে কতকটা স্বর্ণবর্ণ ও কতকটা রক্তবর্ণ ক্রমে ফিকা হইয়া আসিতেছে ; সমুদ্রের জল ইস্পাতের রং হইতে সীসার রং ধারণ করিতেছে। যাহারা সমুদ্রতীরে বেড়াইতে আসিয়াছিল, তাহারা ফিরিয়া যাইতেছে—পাছে "জেলি ফিস" পদে লগ্ন হয়, সেই জন্য সাবধানে পথ দেখিয়া যাইতেছে। কয় জন ধীবর গোটাকতক বড় মাকরেল মাছ লইয়া যাইতেছে। ফ্ল্যাগ ষ্টাফের কাছে যে স্থানটায় চট্টোপাধ্যায়গৃহিণী কয়জন মহিলাকে লইয়া মজলিস জাঁকাইয়া বসিয়াছেন, সেই স্থান হইতে হারমোনিয়মের সুরে সুর মিশান তাঁহার পুত্রবধূর কণ্ঠোদ্ভূত গান শুনা যাইতেছে :—

"অনন্ত সাগরমাঝে দাও তরী ভাসাইয়া।"

"তবে এখন আসি"—বলিয়া মনীষা বিদায় লইল—কয় পদ যাইয়া আবার ফিরিয়া বলিল, "সোমবারে ঠিক গিয়ে হাজির হ'ব।"

সুনীতি একটু মৃদু হাসিয়া বলিল, "আর কর্ত্তাটি যদি থাকেন ?"

"সোমবারে যে থাকবার যো নেই ; নইলে থাকতেন।"

মনীষা ছেলেদের লইয়া চলিয়া গেল। সুনীতি একবার ফিরিয়া দেখিল, তাহার পর দুর্ব্বল ছেলেটিকে লইয়া ধীরপদে গৃহাভিমুখে চলিল। আজ তাহার মনে একটা নূতন ভাব দেখা দিয়াছে—নূতন চিন্তার উদ্ভব হইয়াছে। মনীষা তাহার সমবয়সী—পাঠ্যাবস্থার বন্ধু। উভয়ে এক স্কুলে পড়িত—মনীষা স্কুলের গাড়ীতে বাড়ী হইতে আসিত ; আর সে স্কুলের ছাত্রাবাসে থাকিত, কেন না, তাহার পিতা কটকে ওকালতী করিতেন। মনীষার পিতা ব্রাহ্ম ; তাহার পিতা হিন্দু। এন্‌ট্রান্স ক্লাসে উঠিয়া তাহার পাঠ শেষ হয়, সে পিতামাতার কাছে ফিরিয়া যায়—মনীষা পরীক্ষা দেয় ও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। তাহার পর এত দিন উভয়ে সাক্ষাৎ হয় নাই। এত দিন পরে দেখা। কিন্তু মনীষা যেন তেমনই আছে ; বয়সের ছাপ যেন তাহাকে ছাপিয়া দিতে পারে নাই ! স্বামীকে লইয়া—ছেলেদের লইয়া তাহার আনন্দ যেন হৃদয় ছাপাইয়া উঠিতেছে—সে তাহা কথায় ব্যবহারে প্রকাশ করিয়া ফেলিতেছে ! কি সুখের জীবন !

অজ্ঞাতে সুনীতি আপনার সঙ্গে মনীষার তুলনা করিয়া ফেলিল। স্বামীর ভালবাসা—সে যেন মাপ করা—দার্শনিক স্বামীর ভালবাসা যেন দার্শনিক ঔদাস্যের মত—তাহাতে রসের অভাব, কোন দিকে তাহাতে এতটুকু বাহুল্য নাই। ছেলের প্রতি ব্যবহারেও সে নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। তিনি কোন দিন তাহার সঙ্গে খেলা করেন নাই ; তাহার দীর্ঘকালস্থায়ী অসুখে বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন—পুরীতে পাঠাইয়া যেন নিশ্চিন্ত হইয়াছেন, নিজে আসিয়া এখানে রাখিয়া গিয়াছেন, কিন্তু এত দিনের মধ্যে আর আসিতে পারেন নাই। আর মনীষার স্বামী বিরলপ্রাপ্ত অবসরেও না আসিয়া থাকিতে পারেন না। সুনীতি ভাবিতে ভাবিতে গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। সে যখন তাহার গৃহের কাছে রাস্তার উপর উঠিল, তখন দূর হইতে চট্টোপাধ্যায়গৃহিণীর পুত্রবধূর কণ্ঠে গীতের একটি চরণ শুনা যাইতেছে :—

"গেছে সুখ গেছে দুখ গেছে আশা ফুরাইয়া।"

সাগরের মৃদু গর্জ্জনের উপর সে গান যেন ভাসিয়া আসিতেছিল।

রাত্রিতে শয্যায় শয়ন করিয়াও সুনীতি কেবল সেই কথা ভাবিতে লাগিল—মানুষে মানুষে ভালবাসায় কত প্রভেদ হয়! সে পুনঃ পুনঃ চিন্তার ধারা পরিবর্ত্তিত করিতে চেষ্টা করিল—পারিল না। সে যেন চিন্তার তাড়না হইতে অব্যাহতি লাভের আশায় সুপ্ত পুত্রকে বক্ষে টানিয়া লইল।

২

পরদিন সুনীতি যখন স্বামীর পত্র পাইল, তখন তাহাতে তাহার তৃপ্তি হইল না। পত্রখানিতেও স্বামীর বৈশিষ্ট্যের পরিচয় সপ্রকাশ—তাহা সংক্ষিপ্ত ও বাহুল্যবর্জ্জিত—কুশল-প্রশ্নে তাহার আরম্ভ, কুশলসংবাদদানে তাহার শেষ—আর কিছু নাই। এত দিন এইরূপ সংক্ষিপ্ত লিপিতে সুনীতি অতৃপ্তির কারণ পায় নাই—আজ পাইল। স্বামীর পত্র সংক্ষিপ্ত হইলেও তাহার উত্তর কখন সংক্ষিপ্ত হইত না; কিন্তু আজ লিখিতে বসিয়া তাহার মনে হইতে লাগিল, কে যেন তাহার উত্তরের বাহুল্যকে বিদ্রূপ করিতেছে; তাহার পত্রও স্বল্পায়তন হইল। সে যেন লিখিবার আর কোন কথা খুঁজিয়া পাইল না; সমুদ্রতীরে বেড়ানর কথা—জেলেদের মাছ ধরার কথা—বাজারে ভীড়ের কথা—এ সব যেন আজ একান্তই অনাবশ্যক বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

সংক্ষিপ্ত পত্রখানা শেষ করিয়া—সেখানা ডাকে দিবার জন্য চাকরের জিম্মা করিয়া দিয়া সুনীতি ছেলেকে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইয়া পড়িল। বেড়াইবার স্থান একটি—সমুদ্রতীর। সেই সময় মনীষার ভৃত্য এক ঝুড়ী ফল ও তরকারী লইয়া আসিল, বলিল, "বাবু এনেছেন।"

বেড়াইতে বেড়াইতে সুনীতি চক্রতীর্থের দিকে খানিকটা অগ্রসর হইল—দেখিল, সমুদ্রের কূলে সিক্ত বালুর উপর এক-খানা সতরঞ্চ পাতা—তাহার উপর মনীষা বসিয়া আছে—পার্শ্বে যিনি, তিনিই যে তাহার স্বামী, সে বিষয়ে সুনীতির সন্দেহ রহিল না। ছেলেরা কাছে ছুটাছুটি করিতেছে—ঝিনুক কুড়াইতেছে—সাগরের তরঙ্গ কূলে আসিয়া যে স্থানে শুভ্র ফেন-হাস্যে ছড়াইয়া গড়াইয়া পড়িতেছে, সেই স্থানে যাইয়া তরঙ্গের ব্যয়িতবেগ সলিলে পা ভিজাইয়া আসিতেছে—তরঙ্গ যেমন পিছাইয়া যাইতেছে, তেমনই অগ্রসর হইতেছে, আবার তরঙ্গ আসিতেছে দেখিয়া ছুটিয়া পলাইতেছে; আর মধ্যে মধ্যে ছুটিয়া আসিয়া পিতামাতার কোলে লুটাইয়া হাসিতেছে। তাহা দেখিয়া পিতামাতার মুখ আনন্দদীপ্তিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে; তাঁহারা পুত্রকন্যার মুখচুম্বন করিতেছেন।

"স্বামিস্ত্রী পরস্পরকে ও আপনাদের পুত্রকন্যাদিগকে লইয়া এমনই আত্মস্থ যে, কাছ দিয়া যে সব লোক যাতায়াত করিতেছে, সে দিকে তাঁহাদের কাহারও দৃষ্টি নাই।

সুনীতি সেই দৃশ্য দেখিল—কি পরিপূর্ণ সুখ ও আনন্দ কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহার বুকের মধ্যে যেন কেমন করকর করিয়া উঠিল ব্যথাটা এমনই যে, তাহাতে তাহার দুই চক্ষু ছাপাইয়া অশ্রু দেখা দিল। সেই সময় তাহার পুত্র কি জিজ্ঞাসা করিয়া মা'র মুখের দিকে চাহিয়া বিস্ময়ে ও কৌতূহলে জিজ্ঞাসা করিল, "মা, তোমার চোখে কি বালী পড়েছে?"

ছেলের কথা শুনিয়া সুনীতি আপনাকে সামলাইয়া লইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু যে জলটায় চক্ষু ভরিয়া উঠিয়াছিল, তাহা বাতাসের স্পর্শে কম্পিত বর্ষার ফুলের দলস্থিত জলের মত ঝরিয়া পড়িল। সুনীতি তাড়াতাড়ি চক্ষু মুছিয়া ফেলিল; বলিল, "কই?"

অনেকদিন রোগ ভোগ করিয়া বিশেষ পিতা পাছে বিরক্ত হয়েন, সেই জন্য সর্ব্বদা "চুপ! চুপ!" শুনিয়া ছেলেটি যেন অকালে তাহার স্বাভাবিক চাপল্য ও কৌতূহল চাপিতে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল। সে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না; কিন্তু মা যে কথাটা উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিলেন, তাহা সে বুঝিতে পারিল।

ভাবিতে ভাবিতে সুনীতি গৃহে ফিরিয়া আসিল।

পরদিনও সে পূর্ব্বদিনের মত চক্রতীর্থের দিকে বেড়াইতে গেল—মনীষার ও তাহার স্বামীর আনন্দভাব দেখিতে। সে দিনও সেই সুখী পরিবারের দৃশ্য দেখিল, দেখিয়া পূর্ব্বদিনেরই মত ভাবিতে ভাবিতে আপনার গৃহে ফিরিয়া আসিল।

৩

মনীষা বলিয়াছিল, সোমবার বেলা চারিটা বাজিতে না বাজিতেই সে সুনীতির বাড়ীতে যাইবে। কিন্তু চারিটা বাজা পর্য্যন্ত তাহার বিলম্ব সহিল না—তাহার পূর্ব্বেই সে আসিয়া হাজির হইল। সুনীতি তখন বারান্দায় একখানা

ডেকচেয়ারে বসিয়া একখানা ইংরাজী উপন্যাস পাঠ করিতে-ছিল ; মনীষাকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া আর একখানা চেয়ার টানিয়া দিল। মনীষা বসিলে সে জিজ্ঞাসা করিল, "ছেলেদের আন নি ?"

মনীষা বলিল, "এখন আনি নি বটে, কিন্তু সে জন্য তুমি দুঃখ করো না, একটু পরে তা'রা সব এসে হাজির হ'বে ; নিমন্ত্রণের অপেক্ষা রাখার শিক্ষা তা'রা কখন পায় নি।"—বলিয়া সে হাসিতে লাগিল।

"সঙ্গে ক'রে নিয়ে এলেই হ'ত। ক' দিন ওদের যত দেখছি, তত আমার এত ভাল লাগ্‌ছে !"

"ক' দিন আবার কোথায় দেখলে ?"

"কাল আর পরশু।"

"বল কি ?"

"আমি যে চক্রতীর্থের দিকে বেড়াতে গিয়েছিলুম—দেখলুম, তোমরা সমুদ্রের তীরে ব'সে আছ।"

"বেশ ত লোক ! কাছ দিয়ে গেলে, আর দেখা দিলে না ! এ হেঁয়ালী কেন ? আহা—জানতে পারলে আমার কর্ত্তাটির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতুম ; দেখতে এক অদ্ভুত প্রকৃতির লোক।"

"সেটা না হয় ভবিষ্যতে হ'বে।"

"হ'বে আর কই ? আমরা চ'লে যা'ব। তিনি বল্‌ছিলেন, আরও দিন কতক থাকতে ; তা' আমি আর পেরে উঠছি নে—তিনি যদি ছুটী ক'রে আসতে না পারেন, তবে আমি এবার শনিবারে তিনি এলেই তাঁ'র সঙ্গে চ'লে যা'ব। আমার স্বাস্থ্য—আমার স্বাস্থ্য, ও যেন তাঁ'র একটা বাতিক বছর বছর দার্জ্জিলিং, ওয়ালটেয়ার, ডিহিরী ক'রে ক'রে কত টাকা যে নষ্ট করলেন !"

"আর গোটা দুই সপ্তাহ থেকে যাও—তা'র পর আমিও যা'ব।"

"থাকতে হয় ত হ'বে ; কিন্তু ভাল লাগে না। তাঁ'রও কষ্ট হচ্ছে। সে যা' হয় হ'বে। এখন বল দেখি, এই ক' বৎসরের কথা। কত কথা যে জিজ্ঞাসা করবার আছে !"

সুনীতি হাসিয়া বলিল, "তুমি কি এত বৎসরের কথা —ঘণ্টাখানেকের মধ্যে পুরতে চাও ? থালীর ভিতর হাতী পুরার গল্প জান ত ?"

"আজকাল যে 'ট্যাবলয়েড' হয়েছে।"

মনীষা সহপাঠীদের কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। কে কোথায় গিয়াছে, তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না—কেবল দুই চারি জনের সঙ্গে এখনও দেখাসাক্ষাৎ হয়—কাহারও কাহারও সঙ্গে অপ্রত্যাশিত স্থানে দেখা হয়, সে কি আনন্দ !

তের চৌদ্দ বৎসরের কথা—সে কি সহজে শেষ হয় ! সে সব কথার আলোচনা করিতে করিতে উভয়ের মনে হইতে লাগিল যেন, সে কাল বায়স্কোপের চিত্রে আবার দেখা যাইতেছে—চিত্রের পর চিত্র কেবল সরিয়া যাইতেছে। কত বিস্মৃত কথা আজ আবার আলোচনার স্পর্শে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল।

সাড়ে চারিটা বাজিলে ভৃত্য আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "চা'র জল আনব ?"

"হাঁ" বলিয়া সুনীতি উঠিয়া গেল। চাকর ছোট ছোট দুইখানা টেবলের উপর আস্তরণ দিয়া গেল। সুনীতি রেকাবীতে খাবার ও ফল লইয়া আসিল।

মনীষা বলিল, "এ যে একেবারে নিমন্ত্রণের আয়োজন !"

"ভারী ত আয়োজন"—বলিয়া সুনীতি চা প্রস্তুত করিতে লাগিল।

অদূরে বালকণ্ঠের কলরব শ্রুত হইল। মনীষা বলিল, "দুঃখ করছিলে—এই নাও, ছেলেরা সব এসে হাজির। দেখ, ঠিক বুঝতে পেরেছে, তুমি খাবার বের ক'রে এনেছ।"

সুনীতি বারান্দার সিঁড়িতে যাইয়া ছেলেদের আদর করিয়া ডাকিয়া আনিল এবং সঙ্গে লইয়া পার্শ্বের ঘরে তাঁহার ছেলের কাছে লইয়া গেল ; বলিল, "সব খেলা কর—আমি খাবার নিয়ে আসছি।"

ছেলেরা নূতন স্থানে আসিয়া বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ হইল না।

ছেলেদের খাওয়ান শেষ হইতে না হইতে বেলা পড়িয়া আসিল। মনীষা বলিল, "চল, বেড়াতে যাই।"

সুনীতি বলিল, "ব্যস্ত হয়ে উঠছ ! আর বুঝি এখানে ভাল লাগছে না ?"

"ভাল ! ভয়ানক ভাল লাগছে। কাঙ্গালকে যখন

শাকের ক্ষেত দেখিয়েছ, তখন এর পর অস্থির হয়ে উঠতে হ'বে—লাঠি ধরতে হ'বে, তবে পাপ বিদায় হ'বে, নইলে নয়। কিন্তু বলতে কি—সমুদ্রের কাছে এসে আমার এক দণ্ডও ঘরে থাকতে ইচ্ছা হয় না; কেবলই সমুদ্র দেখতে ইচ্ছা করে।"

"তুমি যে আবার কবি, তা' ত এখনও জানি নি।"

"কবি! কিন্তু জীবনে কখন কবিতা লিখি নি—তবে পড়ি বটে। আমার কবিতা পড়তে যত ভাল লাগে, তত আর কিছু নয়।"

ছেলেদের লইয়া উভয়ে বাহির হইয়া পড়িল।

বাড়ী যাইবার সময় মনীষা বলিয়া গেল—"কাল আবার এসে পড়ব।"

৪

পরদিনও আসিয়া মনীষা দেখিল, সুনীতি একখানা উপন্যাস পড়িতেছে। সে বলিল, "তোমার কি এখনও উপন্যাস এত ভাল লাগে! মনে আছে, স্কুলে লুকিয়ে উপন্যাস পড়তে—এক দিন তোমার ঘরে একখানা উপন্যাস পেয়ে মিসেস দাশ কি রকম বকেছিলেন?"

সুনীতি বলিল, "আছে! সে কি ভুলা যায়? তিনি বকলে হয় ত ভুলে যেতাম; কিন্তু সেই যে ঝাড়া আধ ঘণ্টা ধ'রে সাধু ভাষায় বক্তৃতা—যেন বেদীর উপর ব'সে আচার্য্যের উপদেশ, সে কি ভুলতে পারা যায়?"

মনীষা হাসিয়া বলিল, "সেই গম্ভীর হয়ে দুলে দুলে বলা—'কদাচ শিক্ষকের বা অভিভাবকের নির্দেশ লঙ্ঘন করিবে না—তাহাতে ঈশ্বর অসন্তুষ্ট হইবেন।'—ইত্যাদি!" বলিতে বলিতে মনীষা চেয়ারে লুটাইয়া হাসিতে লাগিল।

তাহার পর সে সুনীতিকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার এখনও উপন্যাস ভাল লাগে কেমন ক'রে, বল ত?"

"কেন, তোমার লাগে না?—এমন সব নতুন নতুন অপ্রত্যাশিত ঘটনা।—আমার বড় ভাল লাগে।"

"মানুষের জীবনের চাইতে কি কেতাবে নাটকের বা উপন্যাসের অধিক উপাদান থাকতে পারে? যে কেতাবে তা' থাকে, সেইখানাই অসম্ভব ও আজগুবী হয়ে পড়ে; তা'র প্রমাণ—আরব্য উপন্যাস।"

"সাধারণ মানুষের জীবনে নাটকের বা উপন্যাসের কি উপাদান থাকে? এ যে কেবল সেই খাড়া বড়ী থোড় আর থোড় বড়ী খাড়া।"

"ওটা তোমার বুঝবার ভুল।"

"আচ্ছা ধর আমাদের জীবন—এতে নাটকের বা উপন্যাসের উপাদান কি আছে?"

"নিশ্চয়ই আছে। তুমি কি মনে কর, তোমার জীবনে তেমন কিছুই নেই?"

"নিশ্চয়ই নেই।"

"ধর তোমার বিবাহ; তা'র মধ্যেও কি কোন রোমান্স পাওয়া যা'বে না?"

সুনীতি হাসিয়া বলিল, "একেবারেই না। বাবা একটি পাত্র বেছেছিলেন; তিনি এখন বিলাতে পড়তে যেতে চা'ন, তখন কতক খরচও দিয়েছিলেন এবং মাসে মাসে দিতেন। তিনি ফিরে এলে আমার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে। তা'র পর সকলে যেমন সংসার করে, আমিও তেমনই করছি। ছেলের অসুখ, ঝি-চাকরের সঙ্গে বকাবকি, বাড়ীওয়ালার ভাড়া বাড়ানর অত্যাচার—এর মধ্যে কি উপন্যাস নাটকের উপকরণ খুঁজে পাওয়া যায়?"

মনীষা বলিল, "মানুষের জীবন কি সত্যই এতটা বর্ণহীন হয়? আমার মনে হয়, তুমি এত অন্যমনস্ক যে, সে উপাদানগুলার সন্ধান পাও নি। অথবা তুমি উপন্যাসে অসম্ভব দেখে দেখে অল্প উপকরণে আর তোমার তৃপ্তি হয় না—যে রোজ ষোড়শোপচারে আহার করে, সে কি কখন শাকান্নে সন্তুষ্ট হ'তে পারে?"

"তোমার জীবনে কি উপন্যাস নাটকের উপাদান খুব পেয়েছ?"

"পেয়েছি ব'লে পেয়েছি! যদি লিখি, তবে হু হু ক'রে বিক্রী হয়। এক টাকা সিরিজের যে সব বই—অক্ষম লেখকদের যে সব রচনা—কেবল রেশমের খোলসের জোরে বিক্রী হয়—সে সকলের চেয়ে ঢের ভাল যে হয়, তা'তে আর সন্দেহ নেই।"

"তোমাকে সেটা বলতেই হ'বে।"

"বলব।"

"এখনও বেলা আছে—বেড়াতে যা'বার আগে বল, সেইটাই শুনি।"

৬

মনীষা বলিতে লাগিল—

"এন্ট্রান্স ক্লাসে উঠে তুমি স্কুল ছেড়ে বাপমা'র কাছে চ'লে গেলে; আমি পাশ করলুম, তা'র পরে কলেজে পড়তে লাগলুম। বাবার আমি এক মেয়ে। আমার একটিমাত্র ভাই। দাদা বিলাতে পড়তে গিয়েছিলেন; কাযেই আমি যখন পড়তে কলকাতায় এলুম, মা আমাকে ছেড়ে থাকতে পারলেন না—সঙ্গে এলেন। বাবা পাটনায় ওকালতী করতেন; কিন্তু পশার ভাল হ'লেও ওকালতীতে তাঁ'র আগ্রহ ছিল না। তখন তিনি কিছু টাকা জমিয়েছেন—আমাদের ছেড়ে থাকতে ইচ্ছা হ'ত না; কেবল দাদার জন্য খরচ ছিল ব'লে মধ্যে মধ্যে পাটনায় যেতেন—মাসের মধ্যে পনের দিন কলকাতায় আর পনের দিন পাটনায় কাটত।

"আমি কলেজে দু' বৎসর পড়ার পর মা বল্লেন, 'আর প'ড়ে কায নেই।' তিনি আমার বিয়ের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। বাবা বলতেন, 'থাক না কিছু দিন; ছেলেটা ফিরুক; তা'র পর হ'বে।' কিন্তু তিনি বন্ধু-বান্ধবদের বলতেন, 'দেন না একটা ভাল ছেলে দেখে—মনীষার বিয়ে দেব।' বাবা ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন; মা মনে করেছিলেন, স্বামীর ধর্ম্মই স্ত্রীর ধর্ম্ম।

"বাবার এক বন্ধুর সঙ্গে তাঁ'র খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল—জ্ঞান বাবু বাবার বাল্যবন্ধু। আমরা তাঁ'কে 'কাকাবাবু' ব'লে ডাকতুম। তিনি যেমন সরল, তেমনই উদার; কাউকে তিনি কখন অবিশ্বাস করতে জানতেন না, কারও মনে কষ্ট দিতে পারতেন না। তিনি এক দিন এসে বাবাকে বল্লেন, 'দেখ, আমার সম্পর্কে ভাগনে একটা ছেলে বিলাতে পড়তে গিয়েছে। বাড়ীর অবস্থা ভাল নয়। অথচ বেশী বিচারবিবেচনা না করেই বিলাতে গিয়েছে। তা'র এক সহপাঠী বহরমপুরের বড় উকীলের ছেলে—সেও তা'কে উৎসাহ ও টাকা দিয়েছিল। এখন বিদেশে টাকার অভাবে পড়েছে—তা'র দাদা সে দিন তা'র একখানা পত্র নিয়ে আমার কাছে এসেছিল, আমি যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য করলুম। ছেলেটি দেখতে ভাল—বুদ্ধিমানও বটে, অধিকন্তু ব্রাহ্মভাবাপন্ন। যদি বল, তা'র সঙ্গে সম্বন্ধ দেখি। তা'র দাদা এখনও দেশে ফিরে যায় নি, কলকাতাতেই আছে।' বাবা বল্লেন, 'দেখ না! মন্দ কি?'

"তা'র পর কথা দ্রুত অগ্রসর হ'ল। কাকাবাবুর সঙ্গে তাঁ'র দাদা ভাইয়ের ফটো নিয়ে এলেন—বাবা সরল বিশ্বাসে ক'শ' টাকা দিলেন।"

"ঠিক ছয় সপ্তাহের মাথায় দাদাটি কাকাবাবুর সঙ্গে এলেন এবং তাঁ'র ভাইয়ের পত্র দেখালেন। তিনি লিখেছিলেন, তাঁ'র দাদা ও কাকাবাবু যখন এ সম্বন্ধ ভাল মনে করছেন, তখন তিনি তা'তে আপত্তি করবেন না; তাঁ'রা ত তাঁ'র হিতৈষীই বটে। দাদা তাঁ'র ভাইয়ের ফটো দিয়ে গেলেন এবং আমার ফটো নিয়ে গেলেন।

"বাবা মনে করলেন, তিনি নিশ্চিন্ত হলেন। তিনি আরও কিছু টাকা দিলেন। কাকাবাবুর সঙ্গে তিনিও তাঁ'কে একখানা পত্র লিখলেন।

"যথাকালে বাবার পত্রের জবাব এল। তা'তে তিনি লিখলেন, বাবার মেয়ের সঙ্গে যখন তাঁ'র মানবজীবনের সর্ব্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হ'বে, তখন তাঁ'তে আমাতে পত্রব্যবহার হ'লে তা'তে বাবার কি কোন আপত্তি আছে? বাবা ভাবলেন, কি উত্তর দিবেন। মা বল্লেন 'থাক্ না, এখন পত্র লেখা।' শেষে কাকাবাবুর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে বাবা ও মা আমাকে পত্র লিখতেই উপদেশ দিলেন অর্থাৎ আদেশ করলেন।

"যাঁ'কে কখন জানি না, অথচ যাঁ'র সঙ্গে বিয়ে হ'বে কথা হয়েছে, তাঁ'কে পত্র লিখা যে কি বিড়ম্বনা, তা' বুঝতেই পার।"

সুনীতি হাসিয়া বলিল, "কিন্তু বিড়ম্বনার সমুদ্র কেমন ক'রে পার হ'লে?"

"বাবা তাঁ'কে সম্মতি দেবার পর তিনি এক সুদীর্ঘ পত্র লিখলেন—তা'তে অনেক 'কবি' আর তা'র চাইতেও বেশী দার্শনিকের অবোধ্য ফাঁকা কথা—তিনি কি না দর্শনেরই অধ্যয়ন করতে বিলাতে গিয়েছিলেন। পত্রখানায় কথা অনেকই ছিল; কিন্তু সে পত্রখানা পড়লেই বুঝা যায়, তা'তে আন্তরিকতার স্পর্শমাত্র ছিল না। না থাকবারই কথা। তাঁ'র সঙ্গে ত আমার পরিচয় হয় নি বাবা ও মা আমাকে সে পত্রের উত্তর দিতে বল্লেন। আমি যেন কিছুতেই লিখতে পারছিলুম না। একটা 'মেল'



কেটে গেল—তা'র পর জবাব দিতে হ'ল। আমার জবাব অবশ্য খুবই সংক্ষিপ্ত হ'ল।

"জবাব সংক্ষিপ্ত হ'ল ব'লে আবার বাবার কাছে নালিশ রুজু হ'ল—যাঁ'র সঙ্গে আমার এতটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হ'বে, আমি তাঁ'কে একেবারে পরের মত অতি সংক্ষিপ্ত পত্র লিখলে কি তাঁ'র তৃপ্তি হ'তে পারে?—ইত্যাদি। বাবা বল্‌লেন, 'সে ত বটেই।' কিন্তু আমার পরম ভাগ্য, আমাকে আন্তরিকতার অভিনয় করতে হ'ল না। তাঁ'র ফিরে আসবার সংবাদ এল—পড়া শেষ হয়েছে, টাকা পাঠালেই তিনি চ'লে আসবেন। বাবাকে তাঁ'র দাদা সে কথা জানালে বাবা টাকা দিয়ে সে টাকা টেলিগ্রাফে বিলাতে পাঠাতে উপদেশ দিলেন।

"তিনি যখন ফিরে এলেন, তখন আমরা পাটনায়। বাবা বোম্বাইয়ে টেলিগ্রাফ করলেন, তিনি যেন পাটনা হয়ে কলকাতায় যান। তিনি নিজে ষ্টেশনে গিয়ে তাঁ'কে নিয়ে এলেন। তাঁ'র আদর-যত্নের অভাব হ'ল না। কিন্তু তিনি যা'বার জন্য বড় ব্যস্ত। বাবা মা'কে বল্‌লেন, 'ব্যস্ত হ'বে না? কত দিন পরে দেশে এল—আপনার জনদের দেখতে ব্যস্ত হয়ে আছে।' আমার কিন্তু লোকটিকে তেমন ভাল লাগল না—চিঠিতে আন্তরিকতার যে অভাব অনুভব করেছিলাম—কথাতেও তাই পেলাম।

"তিনি কলকাতায় চ'লে গেলেন। ক'দিন পরে আমরাও কলকাতায় গেলাম। তিনি দেশ থেকে ফিরে কলকাতায় এলেন। বাবা তাঁ'কে প্রায়ই নিমন্ত্রণ করতেন; কিন্তু তিনি দু'দিন কাটিয়ে এক দিন আসতেন এবং এলে যা'বার জন্য ব্যস্ত হ'তেন—কায আছে।

"তা'র পর তিনি চাকরীর চেষ্টায় যাচ্ছেন ব'লে কলকাতা থেকে বাহিরে গেলেন। শেষে আমরা জান্‌তে পেরেছিলুম, গিয়েছিলেন কটকে। সেখানে এক ভদ্রলোকের মেয়ের সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ স্থির ক'রে—টাকাও নিয়ে তিনি বিলাতে গিয়েছিলেন। তাঁ'দের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। বোধ হয়, সেখানে চিঠিপত্রে এমন অগ্রসর হয়েছিলেন যে, পেছবার পথ ছিল না।

"ক'দিন পরে এক দিন বাবা একখানা পত্র হাতে ক'রে মা'র ঘরে এসে বল্‌লেন, 'সর্ব্বনাশ হয়েছে।' মা ব্যস্ত হয়ে বল্‌লেন, 'কি হয়েছে?' বাবা পত্রখানা মা'র হাতে দিয়ে বল্‌লেন, 'মানুষ কি ভয়ানক হ'তে পারে! এখন লিখলে বিয়ে করবে না!' তিনি বাইরে গিয়ে কাকাবাবুকে আন্‌তে তাড়াতাড়ি গাড়ী পাঠিয়ে দিলেন।

"কাকাবাবু এসে পত্র প'ড়ে মাথায় হাত দিয়ে বল্‌লেন, 'উঃ—কি পাজি! তোমার কাছে আমার মুখ দেখান বন্ধ করলে! তুমি আমায় মাপ কর।' বাবা বল্‌লেন, 'তোমার দোষ কি, জ্ঞান?' কাকাবাবুর চোখ দিয়ে জল পড়ল। সেই দিন থেকে বাবা অনেক দিন আর তাঁ'কে আমাদের বাড়ী আন্‌তে পারেন নি। তিনি এসেছিলেন, আমার বিয়ের সময়।

"কেমন, উপন্যাস ব'লে মনে হয় না?"

সুনীতি বলিল, "নিশ্চয়—চমৎকার!"

কিন্তু সুনীতির মুখটা যে ফ্যাকাশে হইয়া গিয়াছিল, মনীষা তাহা লক্ষ্য করিল না।

৬

সুনীতি জিজ্ঞাসা করিল, "তা'র পর কি হ'ল?"

মনীষা বলিল,—

"এই প্রত্যাখ্যানে মা ও বাবা বড় কাতর হয়ে পড়লেন। কেবল আমার মনে কোন দাগ লাগল না। কারণ, লোকটিকে আমার মোটেই ভাল লাগে নি।

"এ দিকে দাদার এক টেলিগ্রাম এল—'বাবা, ওখানে মনীষার বিবাহ দিবেন না। সব কথা পত্রে লিখিলাম।' সেই পত্র পেয়ে বাবা ও মা যেন কতকটা স্থির হলেন; বল্‌লেন, 'ভগবান্ যা করেন, আমাদের মঙ্গলের জন্য।' পত্রেও কিন্তু দাদা সব কথা খুলে লিখলেন না; লিখলেন, কোন রকমেই বিয়ে যেন না হয়।

"বাবা মা'কে ও আমাকে নিয়ে পাটনায় ফিরে গেলেন, দিন কতক খুব মন দিয়ে ওকালতী ক'রে যেন সব ভুলতে চেষ্টা করলেন। গরমের সময় আমরা দার্জ্জিলিংএ গেলাম। বাবা কেবলই আমাকে কাছে রাখতেন। বোধ হয়, তাঁ'র মনে হয়েছিল, আমি এ ব্যাপারটায় মনে ব্যথা পেয়েছি।

"প্রায় দেড় মাস দার্জ্জিলিং'এ কাটিয়ে আমরা যখন ফিরলুম, তখন বর্ষা আরম্ভ হয়েছে। বৃষ্টির মধ্যে ট্রেণ দার্জ্জিলিং ষ্টেশন থেকে যাত্রা করল। খানিক্ পথ এসে ট্রেণ দাঁড়িয়ে গেল—পাহাড়ের গা থেকে খানিকটা জমী জলে ধসে প'ড়ে রেলের লাইন বন্ধ করেছে—আর যা'বার উপায়

নেই। এক ট্রেণ লোকের সে যে কি অবস্থা, তা' তুমি নিশ্চয়ই অনুমান করতেও পারবে না; আমিও অনুভব না কর্‌লে অনুমান করতে পারতুম না।

"এ দিকে সন্ধ্যা হয়ে আসে—আলোর অভাব; বৃষ্টিরও বিশ্রাম নাই! সেই সব যাত্রীর কষ্ট দেখে এক জন খৃষ্টান পাদরী আর এক বাঙ্গালী যুবক বৃষ্টির মধ্যে বর্ষাতি গায় দিয়ে ছুটাছুটি করতে লাগলেন, কা'র কাছে খাবার আছে, ভাগ ক'রে দেওয়া; কা'র কাছে দুধ বা 'ফুড' আছে, ছেলেদের খাওয়ান; ষ্টোভ জ্বেলে দুধ গরম বা 'ফুড' তৈয়ার করা—তাঁ'রা এই সব করতে লাগ্‌লেন। তাঁ'দের দেখাদেখি আরও কয়জন সেই কাযে প্রবৃত্ত হ'লেন। এক ট্রেণ লোক বিষম কষ্ট থেকে উদ্ধার পেলে। বাবা পুনঃ পুনঃ ছেলেটির কাযের প্রশংসা করতে লাগলেন—নিজেও তাঁ'দের সঙ্গে যেতে উদ্যত হ'লেন। আমিও তাঁ'র সঙ্গে গেলুম। সন্ধ্যা হ'তে না হ'তে আমরা রাত্রির মত সকলের আবশ্যক ব্যবস্থা শেষ কর্‌লুম।

"যুবকটিকে আমরা দার্জ্জিলিংএও দুই তিন দিন দেখেছিলুম, কিন্তু পরিচয় হয় নি। বাবা পরিচয় নিয়ে জানলেন, তিনি বাবার এক বন্ধুর ছেলে—পিতৃমাতৃহীন, য়ুরোপীয়দের বিদ্যালয় থেকে পাঠ শেষ ক'রে ওকালতী পরীক্ষা দিয়েছেন। বাবা তাঁ'র পরিচয় পেয়ে তাঁ'কে আদর ক'রে বুকে টেনে নিলেন। রাত্রিতে তিনি যখন তাঁ'র বন্ধুর কথা বল্‌তে লাগলেন, তখন বাবাও অশ্রু ফেলতে লাগলেন -তিনিও কান্না রোধ করতে পারলেন না। তিনি বল্‌লেন, 'আমি বড় হতভাগ্য - বাপমা'র সেবা করবার সময়ও পাই নি। তাঁ'দের কথা শুনতে আমার বড় ভাল লাগে; কিন্তু শুনবার অবকাশও পাই না। আজ সে অবসর পেয়েছি।'

"ট্রেণ কলকাতায় এলে তিনি যখন বিদায় নিয়ে বাবার ও মা'র পায়ের ধূলা নিলেন, তখন বাবা বল্‌লেন, "ধীরু, আমি তোমার বাবার বন্ধু -তুমি আমাকে আপনার জনই মনে করো; সর্ব্বদা আমার বাড়ীতে আসবে; নইলে আমি দুঃখিত হ'ব।' তিনি স্বীকৃত হয়ে বিদায় নিলেন; যা'বার সময় আমাকে নমস্কার ক'রে গেলেন। তাঁ'র সেই ব্যবহারের কথা আমি মন থেকে মুছতে পারলুম না—চাইলুমও না।"

সুনীতি বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিল, "এই ত পুরা রোমান্স আরম্ভ হ'ল।"

মনীষা বলিল, "তাই ত বলেছি, মানুষের জীবনে উপন্যাস নাটকের যে উপকরণ থাকে, কেতাবে তা থাকতে পারে না।"

"এখন বল, তার পর কি হ'ল।"

মনীষা বলিতে লাগিল—

"তিনি প্রায়ই আমাদের বাড়ী আসতেন, আমাদের সঙ্গে গল্প করতেন, বাবার সঙ্গে রাজনীতির ও আমার সঙ্গে সাহিত্যের আলোচনা করতেন; মা'র হাতের খাবার খেয়ে বল্‌তেন, 'মা, মা'র হাতের খাবার কত মিষ্ট হয়, আগে তা' জানবার অবসর পাই নি এখন সে আক্ষেপ মিটিয়ে দিলেন।'

"এক দিন বাবা মা'কে বল্‌লেন, 'দেখ, একটা সুসংবাদ আছে।' মা সংবাদটা জিজ্ঞাসা কর্‌লে তিনি বল্‌লেন, 'ধীরুর ইচ্ছা আমাদের সম্মতি থাকলে সে মনীষাকে বিয়ে করে।" মা হর্ষে উৎফুল্ল হয়ে বল্‌লেন, 'কি ভাগ্যি! ভগবানের কি করুণা—মনীষার অদৃষ্ট ভাল বলেই তিনি তা'র আগের সম্বন্ধটা ভেঙ্গে দিয়েছেন। আমরা তাঁ'র মঙ্গলময় উদ্দেশ্য বুঝতে না পেরে ভুল করি।' বাবা বল্‌লেন, 'তা' ত বটেই; কিন্তু পূর্ব্বের কথা ত ধীরুকে বলতে হয়!' মা বল্‌লেন, 'কেন? সে ত কিছু জিজ্ঞাসা করে নি।' বাবা বল্‌লেন, 'সে জিজ্ঞাসাও করে নি, সন্দেহও করে নি। শেষে যদি কিছু মনে করে?' মা বল্‌লেন, 'তুমি যা' ভাল বুঝবে, তাই কর।' বাবা বল্‌লেন, 'আমি তা'কে সব কথা বলব।' জ্যৈষ্ঠের মধ্যাহ্নে আকাশে মেঘ দেখা দিলে আলোটা যেমন ঘোলাটে ঘোলাটে হয়, আমার মনের ভাবটা তেমনই হ'ল। কিন্তু আমার মন যেন ডেকে বল্‌তে লাগল, তিনি সব শুনলে আমার কোন অপরাধ আছে মনে করবেন না। হ'লও তাই।

"বাবা তাঁ'কে ব'লে দিয়েছিলেন, তিনি পরদিন এলে ভেবে জবাব দেবেন। সে দিন বাবা একটু কাযে বাহিরে গিয়েছিলেন। বেলা চারটা বাজবার আগেই তিনি এলেন; বাবা বাড়ী নেই শুনে মা'কে ডাকতে ডাকতে বসবার ঘরে এসে উপস্থিত হলেন। মা তখন কাপড় কাচতে

যাচ্ছিলেন; আমি কার্পেটের একখানা আসন বুনছিলুম। মা বল্‌লেন, 'বাবা, ধীরু, উনি একটু পরেই আসবেন— আমি এসে তোমায় চা দিচ্ছি; যেন পালিও না।' তিনি হেসে বল্‌লেন, 'না খেয়ে আপনার পেটুক ছেলেটি পলাতে জানে, এমন মনে করবার কোন কারণ কি কখন ঘটেছে, মা?' মা বল্‌লেন, 'সেই ত লক্ষ্মী ছেলের ব্যবহার।'

"মা চ'লে গেলে তিনি বল্‌লেন, 'আমার আজ পাঁচটার সময়ই আসবার কথা ছিল; কিন্তু আর দেরী করতে পারলুম না। কোন একটা কথা সাহস ক'রে ব'লে ফেলেছি— আজ তা'রই জবাব পাবার দিন।'—বলিয়া তিনি আমার মুখের দিকে চাহিলেন। তাঁ'র দৃষ্টিতে যে আশা ও আশঙ্কা একসঙ্গে আলো ও ছায়ার মত ফুটে উঠেছিল, তা' দেখে আমি বললুম, 'তা আমি জানি।' তিনি বল্‌লেন, 'তুমি জান? তবে ত কেল্লা ফতেই হয়ে গেছে। বাস।'

"আমি বল্‌লুম, 'বাবা একটা কথা বল্‌বেন।' তিনি বল্‌লেন, 'কথাটা কি?' মনের কোণে যে সঙ্কোচটুকু অনুভব করছিলুম, সেটুকুকে জোর ক'রে ঠেলে দিয়ে সব কথা বল্‌লুম। তুমি হয় ত আমাকে খুবই অতি-সাহসিকা, অর্থাৎ কি না বেহায়া মনে করছ। কিন্তু জানই ত প্রথম ভালবাসায় পরস্পরের মিলনের জন্য যুবক যেমন স্ত্রীজন-সুলভ লজ্জা অনুভব করে, যুবতী তেমনই সাহসী হয়। আমার মনে হয়েছিল, সব কথা আমি বল্‌লে তিনি যেমন বুঝবেন, বাবা বল্‌লেও তা' হ'বে না। কথা বলতে বলতে আমার দৃষ্টি নত হয়ে পড়েছিল—কথা শেষ ক'রে যখন তাঁ'র মুখের দিকে চাইলুম, তখন দেখলুম, তিনি খুব হাসছেন। 'এতে কি হয়েছে—এ যে ছেলেখেলা বল্‌লেও চলে।' ব'লে তিনি হো হো ক'রে হেসে উঠলেন। এমন সময় বাবা ঘরে ঢুকলেন।

"বাবাকে তিনি বল্‌লেন, 'আপনি যে কথার জন্য এক দিন সময় নিয়েছিলেন, সে কথা আমি মনীষার কাছে শুনেছি এবং শুনে বুঝেছি, আমার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন বলেই সে লোকটা অমন ব্যবহার করেছিল।'

"বাবা একবার আমার, একবার তাঁ'র মুখের দিকে চেয়ে ভগবান্‌কে ধন্যবাদ দিলেন। মা চা ও খাবার নিয়ে ঘরে ঢুকলেন।"

৭

সুনীতি কোন কথা বলিল না।

মনীষা বলিল, "গল্পের শেষ অধ্যায় অবধি শুনলে— এখন উপসংহারটুকু অবশিষ্ট।

"আমাদের বিয়ে ঠিক হয়ে গেল। কেবল দাদার ফিরে আসবার অপেক্ষা। তাঁ'র তখন আসবার সময় হয়েছে। মাস দুই কেটে গেল—দাদাও এসে পৌঁছুলেন। তখন আর একটা ব্যাপার জানতে পারা গেল। দাদা বল্‌লেন, বাবার পত্র পেয়ে তিনি বিলাতে সেই লোকটির সন্ধান করেছিলেন; সন্ধান সহজে পান নি, কারণ, তিনি মধ্যে আমেরিকায় গিয়েছিলেন। দাদা খোঁজ ক'রে যা' জানতে পেরেছিলেন, তা'তেই বিয়ে বারণ ক'রে টেলিগ্রাফ করেছিলেন। তিনি বিলাতে একটি মেয়েকে বিয়ে করবেন ব'লে ত্যাগ করেছিলেন—সে তাই তাঁ'র নামে ক্ষতিপূরণের নালিশ করবে ব'লে ভয় দেখিয়ে অনেক টাকা আদায় করে। তিনি সেই টাকা অনেকের কাছে অনেক রকমের কথা ব'লে সংগ্রহ করেছিলেন এবং সকলেই তাঁ'র উপর বিরক্ত হয়েছিল। দাদা বল্‌লেন, 'তোমাদের টেলিগ্রাম না পাওয়া পর্য্যন্ত আমি যে কি উদ্বেগেই কাটিয়েছিলাম— যদি বিয়ে হয়ে যায়!'

মনীষা দেখিল, সুনীতির মুখ একেবারে সাদা হইয়া গেল। সে অজ্ঞান হইয়া চেয়ারে ঢলিয়া পড়িল।

মনীষা তাড়াতাড়ি তাহার মাথাটা সোজা করিয়া দিয়া চাকরকে ডাকিল। সে জল আনাইয়া সুনীতির মুখে চক্ষুতে ঝাপ্টা দিল ও চাকরকে দিয়া পাখা আনাইয়া বাতাস দিতে লাগিল। অল্পক্ষণ পরেই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সুনীতি চক্ষু মেলিল।

সুনীতি যেন অপ্রতিভ হইল এবং সেই ভাবটা গোপন করিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "তুমি বুঝি ভাবছিলে, আমি গল্প শুনে পরপারে যাবার চেষ্টা করছি?"

মনীষা বলিল, "তুমি অমন হয়ে পড়লে কেন? তোমাকে কারণটা বলতেই হবে।"

সুনীতি একটু ম্লান হাসি ওষ্ঠাধরে আনিয়া বলিল, "আমার জীবনেও যে উপন্যাসনাটকের উপাদান ছিল, আজ তা'র সন্ধান পেলুম।"

"কি যে তুমি বল!"

"যিনি তোমাকে বিয়ে করবেন ব'লে করেন নি, তাঁ'রই সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে। আমার বাবার কর্ম্মস্থান কটক।"

এবার মনীষার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। সে আপনাকে বিষম অপরাধী মনে করিয়া বলিল, "আমি না জেনে এ কি সর্ব্বনাশ করেছি! আমাকে তুমি ক্ষমা করতে পারবে কি?"

সুনীতি আবার ম্লান হাসি হাসিল; বলিল, "তুমি আমার উপকারই করেছ। আমার সমস্ত বিবাহিত জীবনটা মিথ্যার আবরণ দিয়ে ঢাকা ছিল—আজ সে ঢাকা সরিয়ে আমি সত্যের সন্ধান পেয়েছি।"

সে উঠিয়া যাইয়া পার্শ্বের ঘরে তাহার ছেলেকে বুকে চাপিয়া ধরিল। তাহার দুই চক্ষু ফাটিয়া অবিরল অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

মেরী করেলী

বিলাতের প্রসিদ্ধ উপন্যাস লেখিকা মেরী করেলীর মৃত্যু হইয়াছে। তিনি জাতিতে পুরা ইংরাজ ছিলেন না—তাঁহার শিরায় ইটালিয়ানের ও স্কচের রক্ত প্রবাহিত হইত। দারুণ প্রায়শ্চিত্ত দেখাইবার জন্য অনেক স্থলে অতি-প্রাকৃতের সাহায্য গ্রহণ করিতেন। এই নূতন উপায়ে লোকের চিত্তরঞ্জন হইত। করেলীর উপন্যাসের কাব্যাংশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি সেই অংশে ভাষারও যে ছটা দেখাইতেন, তাহা সুলভ নহে।



মেরী করেলী

প্রসিদ্ধ গীত-রচয়িতা ম্যাকে তাঁহাকে পালিতা কন্যারূপে গ্রহণ করেন। অল্প বয়স হইতেই করেলীর সাহিত্য-প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল।

তিনি বিলাতের লোকের ধাতু বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং পাঠকরা যেরূপ রচনা চাহে, সেইরূপ রচনায় মনোনিবেশ করেন। বিলাতের ও সমগ্র য়ুরোপের বিলাসী সমাজে পাপের যে স্রোতঃ নিত্য প্রবাহিত, ষ্টেড প্রণীত "মেডেন ট্রিবিউট" পুস্তকে তাহা প্রকাশ পাইয়াছিল। বিলাতে টমাস হার্ডি, উইডা প্রভৃতিও তাহা দেখাইয়াছেন। করেলী তাঁহাদের পথ পরিত্যাগ করিয়া নূতন পথ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি পাপের উপর কশাঘাত করিয়া তাহার

বাঙ্গালী পাঠক তাঁহার কয়খানি পুস্তকের আস্বাদ পাইয়াছেন। সেগুলির মধ্যে 'সন্তপ্ত সয়তান' সর্ব্বপ্রধান বলা যাইতে পারে।

করেলীর উপন্যাসগুলি সমসাময়িক পাঠক-সমাজে অসাধারণ আদর লাভ করিয়াছিল। কিন্তু সে সকল কত দিন স্থায়ী হইবে, বলা যায় না। তবে এ কথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, সমসাময়িক ঔপন্যাসিকদিগের মধ্যে তাঁহার একটু স্বতন্ত্র স্থান ছিল এবং তাঁহার রচনা লক্ষ লক্ষ ইংরাজী পাঠকের চিত্তরঞ্জন করিয়াছে।

গঙ্গার মোহানা

বহু দিবস পূর্ব্বে টিহরি গড়ওয়াল রাজ্যে অবস্থানকালে জাহ্নবীর জন্মস্থান দেখিয়াছিলাম। যদিও গঙ্গার উৎপত্তি ঠিক কোন্ স্থানে,সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে এবং হিমালয়ের পরপারে মানস সরোবরের সন্নিকটস্থ উচ্চ ভূভাগ এসিয়াখণ্ডের অনেক বড় বড় নদী—গঙ্গা, সিন্ধু, ব্রহ্মপুত্র, ইয়াংসিকিয়াং প্রভৃতির প্রকৃত উৎপত্তিস্থল বলিয়া কোন কোন পণ্ডিত নির্দ্দেশ করেন, তথাপি গঙ্গোত্রী এবং তাহার উচ্চতর প্রদেশস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোত ও ঝরণাগুলি যে গঙ্গার প্রথম নদীরূপ পরিগ্রহ করায় সহায়তা করিয়াছে, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। সে যাহা হউক, যথন জাহ্নবীর বাল্যক্রীড়ার স্থান দর্শন করিয়াছিলাম, তথন মনে করি নাই যে, কোন দিন তাহার নদীজীবনের শেষ লীলা অর্থাৎ সমুদ্রে বিলীন হইয়া যাইবার ক্ষেত্রও দেখিবার অবসর হইবে। কিছু দিবস পূর্ব্বে কার্য্য উপলক্ষে কিন্তু এইরূপ সুযোগ ঘটিয়াছিল। গঙ্গার মোহানায় আমরা প্রায় দুই মাস কাল কাটাইয়াছিলাম। পৃথিবীর অন্যান্য নদ-নদীর সাগরসঙ্গমের দৃশ্য অপেক্ষা গঙ্গার মোহানার দৃশ্য যে কোন অংশে হীন নহে, তাহা সকল দর্শকই স্বীকার করিবেন।

কত নূতন ও পুরাতন, জনকোলাহলমুখর ও নীরব নগরপ্রান্ত দিয়া প্রবাহিত হইয়া, উত্তর-পশ্চিম হিমালয়ের পাদদেশ হইতে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত বিশাল প্রান্তরে বারিসেচন করিয়া, গঙ্গা কলিকাতা হইতে কিয়দ্দূর দক্ষিণপশ্চিমমুখে গিয়া, পরে একবারে দক্ষিণমুখী হইয়া সমুদ্রে পতিত হইয়াছে। কলিকাতার নিম্নে দক্ষিণ-পশ্চিমগামী স্রোতাংশ পর্য্যন্ত ভাগীরথী কবির কথায় "সেই চির কলতান উদার গঙ্গা।" কিন্তু যেখান হইতে দক্ষিণদিকে বাঁক আরম্ভ হইয়াছে, সেইখান হইতেই গঙ্গার প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। ডায়মণ্ড হারবারের নিকটেই জলরাশি সুদূরপ্রসারিত ও দ্রুতগামী; কিন্তু ৬ মাইল দূরবর্ত্তী কুলপী নামক স্থানে জাহ্নবীকে দেখিলে আর সেই প্রান্তরপ্রদেশের জাহ্নবী বলিয়া বোধ হয় না। আরও কিছু নিম্নে অর্থাৎ কলিকাতা হইতে প্রায় ৬৯ মাইল দূরবর্ত্তী (নাবিকের হিসাবে) খেজরিতে গঙ্গা ; বাস্তবিকই সমুদ্রের খাড়ি (estuary)। এই স্থানে ইহার বিস্তৃতি প্রায় ১৫ মাইল। খেজরিতে একটি বাতিঘর (Light House) আছে। এই স্থান হইতে মেঘহীন রাত্রিতে পরপারে সাগরদ্বীপের বাতিঘর দেখিতে পাওয়া যায়। সাগর-বাতিঘর কলিকাতা হইতে ৮১ মাইল দূরে অবস্থিত। কলিকাতা হইতে নিম্নগামী গঙ্গা এক দিকে ২৪ পরগণা ও অন্য দিকে হাওড়া, হুগলী ও মেদিনীপুর জিলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। খেজরি হইতে ৫ মাইল দূরে মোহানার পশ্চিম তীরে আমাদের কার্য্যস্থল ছিল।

ঠিক "আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে" না হইলেও তাহার মাত্র দুই এক দিন পূর্ব্বে আমরা উক্ত স্থলে উপস্থিত হই। সুতরাং স্নিগ্ধ বর্ষায় প্রকৃতির নব শ্যামলমূর্ত্তি আমাদিগের নয়নগোচর হইবারই কথা। কিন্তু তরুলতার নবীন পল্লব, যাহা বর্ষার মনোমোহনকারিণী রূপের প্রধান উপাদান, তাহার এখানে তেমন প্রাচুর্য্য নাই। যে স্থানের কথা বলিতেছি, তাহা বাঁধের বাহিরে। বলা দরকার যে, এ সমস্ত স্থানে যাহাতে নদীর জল দেশমধ্যে প্রবেশ করিতে না পারে, তজ্জন্য নদীকূল হইতে কিয়দ্দূরে উচ্চ, সুদৃঢ় বাঁধ দেওয়া আছে। নদীর গতি ও স্রোতের প্রাবল্য হিসাবে বাধের বাহিরের জমী কোথাও সুদূর-বিস্তৃত এবং কোথাও বা সঙ্কীর্ণ। সাধারণতঃ এ স্থলে জমী অর্দ্ধ মাইল হইতে দেড় মাইল বিস্তীর্ণ। লোকালয় ও চাষের জমী সমূহ বাঁধের পরপারে। মোহানার তীরবর্ত্তী ভূমিখণ্ডে ধীবর, পোদজাতি ভিন্ন অন্য কাহারও প্রায় স্থায়ী বসতি নাই বলিলেই চলে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, খেজরির নিকট গঙ্গা প্রায় ১৫ মাইল প্রশস্ত। বস্তুতঃ এই স্থানে ও ইহার নিম্নে নদীর তীরে দাঁড়াইয়া অপর পার আর দেখা যায় না। আকাশরেখা জলের সহিত মিলিত হইয়া গিয়াছে। পরপারে যে সুন্দরবন আছে,তাহা কেবল নদীস্রোতোবাহিত সুন্দরবনের বিশিষ্ট উদ্ভিদাদির কাণ্ড ও ফল দেখিয়া বুঝিতে পারা যায়। জলের ধারে দাঁড়াইয়া তটভূমির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে অনেক স্থলে কিছুই দেখা যায় না। সম্মুখেই শ্রেণীবদ্ধ

বালি-আড়ি দৃষ্টিরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। নদী-তরঙ্গ-উৎক্ষিপ্ত বালুরাশি বায়ু দ্বারা চালিত ও স্তূপীকৃত হইয়া এই সমুদায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালুকা-পর্ব্বতের সৃষ্টি হইয়াছে। সাগর-সঙ্গমের নিকট হইতে অনেক দূর পর্য্যন্ত গঙ্গার পশ্চিম তীরে বালি-আড়ি নদীস্রোতের অভিন্ন সহচর। বালি-আড়ি প্রায়ই নগ্ন—ইহাতে কেবলমাত্র দুই প্রকারের লতা জন্মিতে দেখা যায়। উভয়ই সুদীর্ঘ, ২৫।৩০ হাত পর্য্যন্ত লম্বা হইয়া থাকে। জীবজন্তুর মধ্যে বহু মৎস্য বা কাঁকড়া এই সমুদায় বালুকাস্তূপে বাস করে। যে স্থলে বালি অপেক্ষাকৃত পুরাতন ও অনেকটা দৃঢ় হইয়াছে, সেখানে ইহার পশ্চাদ্দিকে সরীসৃপাদিও আশ্রয় গ্রহণ করে। বালি-আড়ি উত্তীর্ণ হইয়া দেশমধ্যে গমন করিতে গেলে প্রথমেই অল্প-বিস্তর নিম্ন নালার ন্যায় জমী এবং তৎপরেই কাঁটার বেড়া এই বেড়া স্বাভাবিক এবং বালি-আড়ির সহিত সমান্তরালভাবে চলিয়া গিয়াছে, তবে ইহা নিরবচ্ছিন্ন নহে। বেড়ার গাছগুলির মধ্যে শ্বেত রঙ্গণ, পাতরকুচি, কাঁটা-গুড়কামাই, খাম আলু, কাদাতোদালে, বনজাম, নাটা-করঞ্জা, সেওড়া প্রভৃতি অন্যতম। উত্তর-পশ্চিমদিক হইতে প্রবাহিত ঝটিকাবর্ত্তের এবং দক্ষিণ-পশ্চিমের প্রবল মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে গাছগুলি অনুচ্চ, বক্র ও পরস্পরের সহিত অল্পবিস্তর জড়িত হইয়া গিয়াছে। এরূপ ভাবে না থাকিলেও তাহাদের প্রাণধারণ করা দুষ্কর হইত। এই বেড়া অতিক্রম করিলেই বিস্তৃত অনুর্ব্বর জমী। মাঝে মাঝে কেবল দুইচারি জাতীয় গাছের ঝোপঝাপ আছে।

বালি-আড়ির নিকটবর্ত্তী মৃত্তিকা স্বভাবতঃই বালুময়। ক্রমশঃ যতই বাঁধের দিকে অগ্রসর হওয়া যায়, ততই মাটীতে কর্দ্দমের অংশ অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বাঁধ-সন্নিহিত অংশের মাটীও ঠিক বেলে দোঁয়াশ নয়, তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে বালুকাযুক্ত। সহজেই অনুমান করিতে পারা যায় যে, এরূপ মৃত্তিকায় সাধারণ আয়কর বৃক্ষাদি বড় সুবিধামত জন্মিতে পারে না। বাস্তবিকও তাহাই দেখা যায়। বৃক্ষ অথবা গুল্মশ্রেণীর উদ্ভিদের মধ্যে এ স্থলে প্রাধান্য—কাঁটাবাঁশ, কেয়া, উলু, নল ও হিজলী বাদামের। হিজলী বাদামের অদ্ভুতাকৃতি নবাঙ্কুর প্রথম বারিপাতের পর প্রায় সর্ব্বত্রই দেখা যায় এবং বক্রকায়, অনিয়মিতা-—— শাখা-প্রশাখাবিস্তারী হিজলী বাদামের গাছ এ স্থলে চারিদিকেই দৃষ্ট হয়। কেয়াফুলের সৌরভে জন-বিরল নদীসৈকত সুরভিত হইয়া উঠে; কিন্তু ফুলগুলিকে কাহাকেও সদ্ব্যবহার করিতে দেখি নাই।

বনজ তরুলতাদির অবস্থা এইরূপ। কৃষির অবস্থা বলিতে গেলে প্রথমেই এই কথা বলিতে হয় যে, সকল স্থানের মৃত্তিকা চাষের উপযুক্ত নহে। জলসেচনের কোন ব্যবস্থা নাই। পুষ্করিণী প্রভৃতিরও বিশেষ অসদ্ভাব। যে সমস্ত জলাশয় প্রায় ভরাট হইয়া অগভীর জলায় পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তৎসমুদায়ে এক প্রকার বন্য ধান হয়। অভাবের সময় গরীব লোকরা ইহা সংগ্রহ করে। বালুর স্তর অনেক স্থলে গভীর বলিয়া জলসংরক্ষণের বিশেষ অন্তরায় হয়। যে সকল জমীতে কর্দ্দমের অংশ কিছু অধিক, সেরূপ স্থানে কোথাও কোথাও ধান, তিল, খাম আলু ও শণ চাষ হইতে দেখা যায়। কিন্তু তাহার পরিমাণ অতি সামান্য। এইরূপ চর জমীতে তরমুজের ফলন খুব ভালই হইয়া থাকে এবং তরমুজ আকারেও বেশ বড় হয়। বনে জঙ্গলে এক প্রকার মেটে আলু পাওয়া যায়। তাহা পোদরা সংগ্রহ করে এবং নিজেদের প্রয়োজনমত রাখিয়া বাজারে বিক্রয় করিতে আনে।

মনুষ্যের বসতি বিরল বলিয়া এখানে পশুপক্ষীদিগকে নিঃশঙ্কে বিচরণ করিতে দেখা যায়। বর্ষার আধিক্যের সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁকে ঝাঁকে বক ও বগলা আসিতে থাকে। নীলকণ্ঠ, মাছরাঙ্গা, চকোর প্রভৃতিও বিরল নহে। শালিক পাখী, দাঁড়কাক ও এক প্রকার বড় জাতীয় ঘুঘু প্রায়ই আমাদিগের বাসস্থানের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইত। ধূসর বর্ণের খরগোস, সজারু, শেয়াল, খেঁকশেয়ালী ইত্যাদি অল্পবিস্তর দেখা যায়। সন্ধ্যার প্রাক্কালে বালি-আড়ির উপর বসিয়া এক দিকে যেমন সূর্য্য অস্ত যাওয়ার মহিমময় দৃশ্য দেখা যায়, অন্য দিকে তেমনই একটি আশ্চর্য্য জিনিষ নয়নগোচর হয়। দেখা যায়, বালি-আড়ির পশ্চাতে এক ঝোপ হইতে তীরবেগে কৃষ্ণপিণ্ডবৎ কোন পদার্থ বহির্গত হইয়া অন্য ঝোপে প্রবেশ করিল—ইহা বন্য শূকর। এ স্থলে ইহার সংখ্যা নিতান্ত কম নহে এবং ইহাদের ভয়ে লোক রাত্রিতে লাঠি অথবা সড়কি লইয়া যাতায়াত করে। হিংস্র জন্তুর মধ্যে আমরা কেবল দুই একবার বাঘ, ও গো-বাঘা দেখিয়াছি। এই সকল স্থানে চারণের জন্য

অনেক গরু ছাড়িয়া দেওয়া হয়। তাহারা হিংস্র জন্তু দ্বারা প্রায়ই আক্রান্ত হয় না দেখিয়া বুঝা যায় যে, শ্বাপদের প্রাদুর্ভাব এখানে ততটা নাই। অন্য দিকে কীটের উপদ্রব অত্যন্ত অধিক। সন্ধ্যার পর আলো জ্বালাইলেই নানা প্রকার কীটপতঙ্গ আসিয়া উপস্থিত হয়। দেখিতে দেখিতে আলোর চতুর্দ্দিকে একটি ছোটখাট কীটস্তূপ জমিয়া যায়। নানা প্রকারের কীট দেখা যায়; সবগুলিই যে নিরীহ, তাহা নহে। কাহারও স্পর্শে বড় বড় ফোস্কা হইয়া যায়; কাহারও দাঁড়া ভীষণাকৃতি ও ক্ষত উৎপাদন-ক্ষম; আবার কাহারও কর্কশ রবে কানে তালা লাগিয়া যায়। অপ্রত্যাশিত আগন্তুকের অভাব নাই। কখনও ভীতিজনক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি সঞ্চালন করিয়া ৮।১০ ইঞ্চ চওড়া কাঁকড়া আসিয়া উপস্থিত এবং কখনও কীটস্তূপের লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া সর্পও প্রবেশোন্মুখ। সুখের বিষয় যে, বিষধর সর্প অতি অল্পমাত্রায় দেখা যায়। অধিকাংশ সাপই বোড়াজাতীয়। জনপ্রবাদ আছে যে, বালি-আড়িতে বড় বড় অজগর সর্প থাকে। তাহা কিন্তু আমাদিগের নয়নগোচর হয় নাই।

গঙ্গার মোহানার তীরবর্ত্তী অধিকাংশ জমীই নূতন চর—পুরাতন হইলেও অধিক দিনের নহে। কিন্তু বাঁধের বাহিরে সকল স্থানই যে নূতন, তাহা বলা যায় না। বিশেষতঃ মেদিনগর নামক একটি স্থল সম্বন্ধে ইহা আদৌ প্রযোজ্য নহে। এই স্থানে বড় বড় অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়; একটি বিস্তীর্ণ জলাশয়ও এই স্থানে আছে। আজকাল উহা জলায় পরিণত হইয়া গেলেও এক সময় উহা যে প্রকাণ্ড দিঘী ছিল, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। ইহার পূর্ব্ব পাড়ে একটি জরাজীর্ণ শিবমন্দির এখনও বর্ত্তমান। অনেক স্থলে মৃত্তিকা খনন করিতে করিতে ছোট ছোট ইট পাওয়া গিয়াছে। যে সকল ধ্বংসাবশেষ মৃত্তিকার উপরেই অথবা সামান্য নীচে দেখা যায়, সেগুলি গৃহাদির উপরিতন অংশ বলিয়াই বোধ হয়। ভিত্তি আমরা প্রায়ই দেখি নাই। তাহাতে অনুমান করিতে পারা যায় যে, পলি পড়িয়া অট্টালিকাদি ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া গিয়াছে। ইতিহাসে ইহা অবগত হওয়া যায় যে, রাজা নন্দকুমারের সময় অর্থাৎ ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ানী আমলে হিজলি (বর্ত্তমান কাঁথি) লবণ প্রস্তুতের প্রধান কেন্দ্র ছিল ও এতদঞ্চলের অবস্থা যথেষ্ট সমৃদ্ধিশালী ছিল। ইহাও জানা যায় যে, ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে সমুদ্র হইতে ঝটিকাবর্ত্তের সহিত একবার বালুকাময় ভীষণ উত্তাল তরঙ্গ আসিয়া গঙ্গার মোহানার পশ্চিম তীরবর্ত্তী কয়েকটি জনপদ একবারেই বিলুপ্ত করিয়া দেয়। তাহার পর হইতে এই স্থানে আর কেহ বাস করে না। ইহা বনজঙ্গলপরিপূর্ণ ভয়াবহ স্থানই ছিল—মানুষের মধ্যে কেবল ডাকাইতের দলই এখানে বাস করিত। পূর্ব্বোক্ত মৃত্তিকাপ্রোথিত ধ্বংসাবশেষগুলি উক্ত ঝটিকার দ্বারা বিধ্বস্ত গ্রামসমূহের চিহ্ন বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু এ সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান না হইলে কিছুই ঠিক বলা যায় না।

যদি ইহা ঠিক হয় যে, বঙ্কিমচন্দ্রের কপাল-কুণ্ডলার আরম্ভ সাগরসঙ্গমের ঘটনাবলী রসুলপুর নদীর মোহানার নিকট অভিনীত হইয়াছিল, তাহা হইলে সে স্থল আমাদিগের বর্ণিত ভূখণ্ড হইতে অধিক দূরে নহে; এবং তাহার প্রাকৃতিক লক্ষণাদিও একরূপ। সময় সময় গভীর রাত্রিতে, ঘনঘোর অন্ধকারে, অবিশ্রান্ত বারিপাত, উন্মত্ত বায়ুর গর্জ্জন ও সমুদ্রবক্ষ হইতে বাহিত অশ্রুতপূর্ব্ব রহস্যময় শব্দাদির ভিতর নবকুমারের কথা মনে পড়িয়াছে। স্বকীয় আসন্ন বিপদ অর্থাৎ তাঁবু পড়িয়া যাওয়ার ভয় উক্ত চিন্তাকে আরও পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছে। আমাদের কুলী, মজুর ও অন্যান্য অনুচরবর্গ থাকা সত্ত্বেও প্রকৃত দুর্ঘটনায় পড়িয়া আমরা বিশেষরূপ জানি যে, এরূপ রাত্রিতে তাঁবুর আশ্রয় ত্যাগ করিতে হইলে কি অভাবনীয় বিপদে পড়িতে হয়। সে হিসাবে নবকুমার ত এক রকম নিঃসহায় ছিলেন। বস্তুতঃ এ স্থলে প্রবল বায়ু অধিকাংশ সময় বহিতে থাকে। তৎসঙ্গে বৃষ্টি থাকিলে বরং ভাল; তাহা না হইলে বায়ুর সহিত এত সূক্ষ্ম বালুকণা উড়িয়া আইসে যে, পর্দ্দা না থাকিলে দুই তিন ঘণ্টার মধ্যেই গৃহমধ্যে একটি পাতলা বালুকাস্তর জমিয়া যায়। বালু এবং বায়ুর অত্যাচার প্রতিরোধ করিবার জন্যই, বোধ হয়, এতদঞ্চলের লোকেরা ঘরগুলি খুব নীচু করিয়া তৈয়ারী করে।

গঙ্গাকে পুণ্যতোয়া বলিবার অনেক কারণ আছে; তন্মধ্যে প্রধান কারণ সম্ভবতঃ এই যে, হরিদ্বার হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান এসিয়ার অন্যতম মহানগরী কলিকাতা পর্য্যন্ত

বিপুল ভূভাগ জাহ্নবীবারিসিঞ্চিত হইয়া শতাব্দীর পর শতাব্দী অপরিমেয় শস্যরাশি উৎপাদন করিয়া যেরূপ সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছে, সেরূপ দৃষ্টান্ত অন্যত্র বিরল। আমরা বঙ্গবাসী গঙ্গার নিকট বিশেষরূপে ঋণী। কারণ, নিম্নবঙ্গের অনেক স্থানই জাহ্নবীর স্রোতে বাহিত পলিমাটী দ্বারা গঠিত। প্রতি বৎসর কোটি কোটি মণ বালুকা ও মৃত্তিকা শত শত ক্রোশ দূর হইতে গঙ্গাপ্রবাহ দ্বারা চালিত হইয়া আসিয়া গঙ্গার ব-দ্বীপ প্রস্তুত করিতেছে। রাজমহলের নিকট হইতেই জাহ্নবী ক্রমশঃ বহু ধারায় বিভক্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছে এবং সেই স্থানের অনতিদূর হইতেই ব-দ্বীপের সূচনা। সাগরসঙ্গমের নিকট গঙ্গার সে শান্ত প্রকৃতি না থাকিলেও এবং প্রবল তরঙ্গে কূল ভাঙ্গিয়া গেলেও তাহার পরিবর্ত্তে আবার নূতন চরের সৃষ্টি হইতেছে। ক্রমশঃ অধিকসংখ্যক লোক চরে বসবাস করিতেছে এবং ইহাতেও কোন সন্দেহ নাই যে, অদূর ভবিষ্যতে গঙ্গার মোহানার নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ জন-বহুল হইয়া পড়িবে।

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত।

ক্ষুধিত কবি

এখনো প্রণয়-দগ্ধ কঙ্কালের মাঝে,
চিত্ত নহে বিত্তহীন, দীর্ঘ উপবাসী,
শুষ্ক মুখ, দীপ্ত আঁখি, উন্মত্তের হাসি
শিবত্বের দ্যুতিভরা, তবু নত লাজে।

অশ্রান্ত হৃদয় তার, ক্ষুধাশীর্ণ দেহ,
অগ্নিবিদ্যা অগ্নিযজ্ঞ জীবন তাহার,
কেহ ভাবে অভিশপ্ত, উন্মত্ত দুর্ব্বার
জ্ঞানের সাধনে পায় সে অমৃত স্নেহ।

কাম-জয় ব্রতে ফিরে শ্মশানে শ্মশানে,
চিতাভস্মভার অঙ্গে উন্মদ হুঙ্কার,
কোথা পঞ্চ কপালিনী নীলাব্জের হার
তপ্ত রক্ত সুরা শোষে রঞ্জিত-মশানে।

নায়িকার মুখ হেরি, ডাকে সে রাধারে,
কহে কথা দেখে জ্যোতিঃ দীপ্ত সহস্রারে।

শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ।

ক্ষমা

Non-Violance.

৩

> Forgiveness to the injured doth belong.
> But they ne'er pardon who have done the wrong.
> Conquest of Granada, Dryden

(২) মহর্ষি বশিষ্ঠদেবের ক্ষমাগুণ

মহর্ষি বশিষ্ঠ মূর্ত্তিমান ক্ষমাগুণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।—তাঁহার সম্বন্ধে মহাভারতে উক্ত হইয়াছে—(আদি পঃ ১৭৫ অঃ চিত্ররথগন্ধর্ব্ব ও অর্জ্জুনসংবাদ)—

"ব্রহ্মণো মানসঃ পুত্রো বশিষ্ঠোঽরুন্ধতীপতিঃ।
তপসা নির্জ্জিতৌ শশ্বদজেয়াবমরৈরপি ॥
কামক্রোধাবুভৌ যস্য চরণৌ সংববাহতুঃ।
ইন্দ্রিয়াণাং বশকরো বশিষ্ঠ ইতি চোচ্যতে॥
যস্তু নোচ্ছেদনং চক্রে কুশিকানামুদারধীঃ।
বিশ্বামিত্রাপরাধেন ধারয়ন্ মন্যুমুত্তমম্ ॥
পুত্রব্যসনসন্তপ্তঃ শক্তিমানপ্যশক্তবৎ।
বিশ্বামিত্রবিনাশায় ন চক্রে কর্ম্ম দারুণম্ ॥"

ইন্দ্রিয়গণকে সম্পূর্ণরূপে নির্জ্জিত ও বশীভূত করিয়া তিনি বশিষ্ঠ নামে আখ্যাত হইয়াছিলেন,—তাঁহার তপোবনে দেবগণেরও অজেয় কাম ও ক্রোধ পরাজিত হইয়া তাঁহার সম্যক্ বশীভূত ছিল। উদারমতি সেই মহর্ষি—বিশ্বামিত্রের অপরাধ সত্ত্বেও ক্রোধ সংযত করিয়া কুশিকবংশের উচ্ছেদ করেন নাই এবং বিশ্বামিত্র হইতে পুত্রবিনাশরূপ সন্তাপ প্রাপ্ত হইয়া শক্তিসম্পন্ন হইলেও অশক্তের ন্যায় হইয়া বিশ্বামিত্র বিনাশের নিমিত্ত কোনও দারুণ কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হন নাই;—এই সংক্ষিপ্ত বাক্যাংশ হইতেই বশিষ্ঠের ক্ষমার পরিচয় পাওয়া যায়। তথাপি একটু বিশদভাবে এ স্থানে তাঁহার চরিতসম্বন্ধীয় কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে।

যখন পয়স্বিনী নন্দিনীকে বশিষ্ঠের নিকট প্রার্থনা করিয়া প্রত্যাখ্যাত হইয়া—রাজা বিশ্বামিত্র বলপূর্ব্বক উহাকে হরণ করিতে উদ্যত হইলেন এবং যখন নন্দিনী কশাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া কাতরভাবে—অনাথার মত 'হাম্বা হাম্বা' রবে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন—এবং মুনির শরণাপন্ন হইয়া বলিতে লাগিলেন—আপনি আমাকে উপেক্ষা করিতেছেন কেন? তখন সুখদুঃখে সমানভাবাপন্ন—নির্দ্বন্দ্ব মহর্ষি—"ন চুক্ষুভে তদা বৈর্য্যাৎ ন চচাল ধৃতব্রতঃ।"—তিনি তাহাতে ক্ষুব্ধ বা অধীর হইলেন না,—কেবল এই কথা বলিলেন—"কিংকর্ত্তব্যং ময়া তত্র ক্ষমাবান্ ব্রাহ্মণো হ্যহম্।" বিক্রমশালী রাজা বিশ্বামিত্র তোমাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিতেছেন, তখন ক্ষমাশীল ব্রাহ্মণ আমি কি করিব? আরও বলিলেন—"ক্ষত্রিয়াণাং বলং তেজো ব্রাহ্মণানাং ক্ষমা বলম্। ক্ষমা মাং ভজতে যস্মাদ্ গম্যতাং যদি রোচতে॥"—ক্ষত্রিয়ের বল তেজ বা বিক্রম এবং ব্রাহ্মণের বল ক্ষমা—আমি ক্ষমাগুণে আকৃষ্ট হইতেছি, সুতরাং তোমার যদি অভিরুচি হয়, গমন কর। আমি কিন্তু তপোবলে দ্রোহকারীর অনিষ্টসাধন বা প্রতিহিংসা করিতে সমর্থ হইলেও তাহা করিব না।

অতঃপর যখন বশিষ্ঠপুত্র শক্তির মর্য্যাদা লঙ্ঘন করায় কল্মাষপাদ নৃপতি মুনিপুত্রের শাপে রাক্ষসত্ব প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকেই ভক্ষণ করিলেন,—বিশ্বামিত্র তখন মুনি হইয়াছেন, কিন্তু বশিষ্ঠের প্রতি পূর্ব্ববৈরভাব পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। এই বৈরিতাপ্রযুক্ত বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের নির্য্যাতনার্থ—তাঁহার অপর নবনবতি সংখ্যক পুত্রকে একে একে ভক্ষণ করিতে ঐ রাক্ষসের প্রতি আদেশ করিতে লাগিলেন। সিংহ যেমন ক্ষুদ্র মৃগ ভক্ষণ করে,—সেইরূপ সেই রাক্ষসাবিষ্ট রাজা বিশ্বামিত্রের প্ররোচনায়—মহাত্মা বশিষ্ঠের আর আর পুত্রগণকে ক্রমে ক্রমে ভক্ষণ করিলেন—("ভক্ষয়ামাস সংক্রুদ্ধঃ সিংহঃ ক্ষুদ্রমৃগানিব")। মহর্ষি বশিষ্ঠ—বিশ্বামিত্র হইতে সেই সমস্ত পুত্রগণের বিনাশ শ্রবণ করিয়া—মহাদ্রি যেমন মেদিনী ধারণ করে, তাহার ন্যায় পুত্রবিয়োগজনিত নিদারুণ শোক ধারণ করিলেন—"ধারয়ামাস তং শোকং মহাদ্রিরিব মেদিনীম্।" সেই দারুণ শোকে তিনি আত্মহননে উদ্যত হইয়াছিলেন,—তথাপি ঐ শোকের নিমিত্তভূত কৌশিকের বংশোচ্ছেদের কল্পনাও তিনি মনে স্থান দেন নাই।—"চক্রে চাত্মবিনাশায় বুদ্ধিং স মুনিসত্তমঃ,—ন ত্বেব কৌশিকোচ্ছেদং মেনে মতিমতাংবরঃ।" তিনি সুমেরুশৃঙ্গ হইতে আপনাকে নিক্ষিপ্ত করিলেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার কোন ক্লেশ হইল না,—তিনি শিলারাশির উপর যেন তূলারাশিতে পতিত হইলেন—("গিরেস্তস্য তু শিলায়াং তূলরাশাবিবাপতৎ")। সেই মহর্ষি শৈলশিখর হইতে পতিত হইয়া মৃত না হওয়াতে—মহাবনমধ্যে অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া তাহাতে প্রবিষ্ট হইলেন। পরন্তু তখন হুতাশন অতিশয় প্রদীপ্ত হইয়াও তাঁহাকে দগ্ধ করিলেন না—"দীপ্যমানোঽপি শীতোঽগ্নিরভবৎ ততঃ।"—অনন্তর সমুদ্র দর্শন করিয়া স্বীয় কণ্ঠদেশে গুরু প্রস্তরখণ্ড বন্ধনপূর্ব্বক তাহার জলরাশিতে পতিত হইলেন—তথাপি নিমগ্ন না হইয়া সাগরতরঙ্গবেগে তীরে উত্থাপিত হইলেন—"বদ্ধা কণ্ঠে শিলাং গুর্ব্বীং নিপপাত তদম্ভসি। স সমুদ্রোর্ম্মিবেগেন স্থলে ন্যস্তো মহামুনিঃ।"—এক্ষণে সুধীগণ বিচার করিয়া দেখুন—ক্ষমাশীল এই মুনির মত একই ভাবে প্রহ্লাদও ঐরূপ বিবিধ মৃত্যুর কারণ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন।

পরে কালবশে তাহার শোকাবেগ প্রশমিত হইয়াছিল। বিশ্বামিত্র তাহার শতপুত্রবিনাশের কারণ হইলেও তাঁহার প্রতিহিংসাচরণ তিনি মনেও স্থান দেন নাই—আর যে কল্মাষপাদ রাজা রাক্ষসাবিষ্ট হইয়া তাঁহার শতপুত্র ভক্ষণ করিয়াছিল—তাহাকে শাপ হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন—"মন্ত্রপূতেন চ পুনঃ তমভ্যুক্ষ্য বারিণা। মোক্ষয়ামাস বৈ শাপাৎ।" কেবল ইহাই নহে, পরন্তু ব্রাহ্মণীশাপে প্রণষ্টসন্ততি (আদি পঃ ১৮২ অধ্যায়) উক্ত নৃপতির মহিষী মদয়ন্তীতে পরম কারুণিক মহামুনি নিয়োগপ্রথানুসারে অশ্মক নামক বংশবর্দ্ধক পুত্র উৎপাদন করিয়া—তাঁহার পরম হিতসাধন করিয়াছিলেন। অতঃপর যখন তাঁহার পৌত্র পরাশর—তদীয় পিতা শক্তির রাক্ষস কর্ত্তৃক নিধান-বৃত্তান্ত শ্রবণ করত দুঃখার্ত্ত হইয়া সর্ব্বলোক সংহার করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন, তখন ক্ষমাশীল মুনি—তাঁহাকে ঐ ব্যবসায় হইতে নিবারণ করিয়াছিলেন।—

"সর্ব্বলোকবিনাশায় মতিং চক্রে মহামনাঃ।
তং তথা নিশ্চিতাত্মানং স মহাত্মা মহাতপাঃ।
বশিষ্ঠো বারয়ামাস।"——

ঔর্ব্ব মুনির দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া বশিষ্ঠদেব—পৌত্র পরাশরকে তাঁহার সর্ব্বলোকধ্বংসকর প্রতিজ্ঞা হইতে নিরস্ত করিলেন। তিনি কহিলেন—"হে পরাশর, তুমি পরলোক সমস্ত জ্ঞাত আছ—সর্ব্বলোক বিনাশ করা তোমার উচিত নহে।" পিতামহের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিপ্রর্ষি পরাশর সর্ব্বলোকপরাভব হইতে স্বীয় ক্রোধ প্রশমিত করিলেন।

এবমুক্তঃ স বিপ্রর্ষির্ব্বশিষ্ঠেন মহাত্মনা।
ন্যযচ্ছদাত্মনঃ ক্রোধং সর্ব্বলোকপরাভবাৎ॥"

পুনশ্চ রাক্ষস হইতে পিতা শক্তি ব্যসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া পরাশর মন্যুবশতঃ রাক্ষস-সত্রের অনুষ্ঠানে (১) প্রবৃত্ত হইলে—বশিষ্ঠদেব মহর্ষি পুলস্ত্যের সহিত তাঁহাকে উহা হইতে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন। তাঁহারা কহিলেন—

"নৈষ তাত! দ্বিজাতীনাং ধর্ম্মো দৃষ্টস্তপস্বিনাম্
শম এব পরো ধর্ম্মস্তমাচর পরাশর॥"

হে পরাশর, তপস্বিব্রাহ্মণগণের এরূপ ধর্ম্ম নহে,—শমই তাঁহাদিগের পরম ধর্ম্ম—তুমি সেই ধর্ম্ম পালন কর। বশিষ্ঠ ও পুলস্ত্য কর্ত্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া মহামুনি পরাশর ঐ রক্ষঃকুলসংহারাত্মক সত্র সমাপ্ত করিয়াছিলেন।

এইরূপে শমপ্রধান মুনি বশিষ্ঠের চরিত্র আদ্যোপান্ত পর্য্যালোচনা করিলে—ক্ষমার পরিচয় সর্ব্বতোভাবেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাই এই কথা প্রবাদের মত প্রচলিত আছে—

"কৌশিকঃ কুপিতো বিপ্রো জঘ্নে স্বার্থে শতং মুনীন্।
জাতিবিপ্রো বশিষ্ঠস্তু খেদিতোঽপি ক্ষমাপরঃ॥"

(৩) ভৃগুবংশীয়গণের ক্ষমার দৃষ্টান্ত

এক্ষণে বশিষ্ঠদেব কর্ত্তৃক পৌত্র পরাশরের ক্রোধ উপশমনার্থ উদাহৃত ভৃগুবংশীয় তপোধনগণের ক্ষমার কথা আলোচনা করিব। (আদি পঃ ১৭৯।১৮০ অঃ)—যখন পুণ্যকীর্ত্তি দানশৌণ্ড নৃপতি কৃতবীর্য্যের বংশজাত ক্ষত্রিয়গণ অর্থলোভবশতঃ আপনাদিগের যাজক ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণগণের অর্থ হরণ করিবার জন্য দস্যুর মত তাঁহাদিগকে সংহার করিতে লাগিলেন এবং ভার্গবদিগের গর্ভস্থ শিশু পর্য্যন্ত নষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হইলেন—তখন ভৃগুকুল উচ্ছিদ্যমান দেখিয়া ভয়ার্ত্ত ভার্গবপত্নীরা দুর্গম হিমালয় পর্ব্বতে পলায়ন করিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কোনও এক কামিনী ভৃগুকুল রক্ষার জন্য ক্ষত্রিয়ভয়ে এক উরুমধ্যে মহাবীর্য্যসম্পন্ন গর্ভ ধারণ করিলেন। ক্ষত্রিয়গণ তাহা শুনিবামাত্র সেই গর্ভ বিনষ্ট করিতে উদ্যত হইল। ঐ সময় গর্ভস্থ বালক প্রচণ্ড মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ডের ন্যায়—তেজোভাস্বর মূর্ত্তিতে ক্ষত্রিয়গণের দৃষ্টিলোপ করিয়া নির্গত হইলেন। সেই তেজস্বী বিপ্রর্ষি উরু ভেদ করিয়া জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন বলিয়া ঔর্ব্ব নামে লোকবিখ্যাত হইয়াছিলেন। এই ভৃগুনন্দন মহানুভব ঔর্ব্ব—বৈরনির্য্যাতনাভিলাষে সর্ব্বলোকবিনাশের নিমিত্ত ঘোর তপস্যায় নিযুক্ত হইয়া তদ্দ্বারা নিখিললোক সন্তাপিত করিয়াছিলেন। তাঁহার উক্তরূপ তপশ্চরণকালে তাঁহার সমস্ত পিতৃগণ তাহা অবগত হইয়া পিতৃলোক হইতে আগমনপূর্ব্বক কুলনন্দন ঔর্ব্বকে কহিলেন, (২)—"হে পুত্র! তুমি তপোবলে উগ্র হইয়াছ—তোমার প্রভাব আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তুমি এক্ষণে সমস্ত লোকের প্রতি প্রসন্ন হও,—স্বীয় ক্রোধ পরিহার কর। পূর্ব্বে ক্ষত্রিয়গণ যখন ভার্গবদিগের হিংসা করিয়াছিলেন, তখন জিতেন্দ্রিয় ভার্গবগণ আপনাদিগের বধ উপেক্ষা করিয়াছিলেন—যদিও তাঁহারা তাহার প্রতিবিধান করিতে অসমর্থ ছিলেন না। তাঁহারা আরও বলিলেন,—(১)

"হে বৎস! তুমি যে কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করিয়াছ, তাহা আমাদিগের প্রিয় নহে, অতএব তুমি সর্ব্বলোকপরাভবরূপ পাপকর্ম্ম হইতে মনকে নিবৃত্ত কর। হে পুত্র! তুমি তপস্তেজের দূষক ক্রোধ পরিত্যাগ কর। সপ্তলোক কিংবা ক্ষত্রিয়গণকে বিনাশ করিও না।"

ইহা অপেক্ষা ক্ষমাগুণের দৃষ্টান্ত আর কি হইতে পারে? নিজেরা ক্ষত্রিয়গণের উৎপীড়নে গতাসু হইলেও এবং ক্ষত্রিয়গণ কর্ত্তৃক আপনাদিগের বংশ উচ্ছিদ্যমান হইলেও মহর্ষি ঔর্ব্বের পিতৃগণ পিতৃলোক হইতে অবতরণপূর্ব্বক—বৈরনির্য্যাতনোদ্যত পুত্রকে যে ক্ষমার উপদেশ প্রদান করিলেন—তাহা কেবল ভারত-ভূমির জিতেন্দ্রিয় মুনিসমাজেই সম্ভব। এইরূপ এই বংশেরই জমদগ্নিপুত্র পরশুরাম একবিংশতিবার ক্ষত্রিয়বংশ ধ্বংস করার পর পুনশ্চ তদনুষ্ঠানে উদ্যত হইলে,—ক্ষমাশীল তদীয় পিতামহ ঋচীক পিতৃলোক হইতে তাঁহার নিকট আগমন করত তাঁহাকে ঐ কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন।

(৪) দেবযানীর প্রতি শুক্রাচার্য্যের ক্ষমাবিষয়ক উপদেশ

অসুররাজ বৃষপর্ব্বকন্যা শর্ম্মিষ্ঠা—শুক্রকন্যা দেবযানীর সহিত কারণবশতঃ বিবাদ করিয়া নানারূপ অপমানজনক বাক্যে তিরস্কার করত তাঁহাকে বনমধ্যে কূপে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। যযাতি কর্ত্তৃক কূপ হইতে উদ্ধৃত হইয়া দেবযানী পিতা শুক্রাচার্য্যকে পরিচারিকা দ্বারা সংবাদ পাঠাইয়া সেই স্থানে আনয়ন করত সমস্ত অবস্থা নিবেদন করিলেন। তিনি নিজেকে এমনই অপমানিতা মনে করিয়াছিলেন যে, অসুররাজ বৃষপর্ব্বকে পরিত্যাগপূর্ব্বক দেশান্তরে গমনার্থ পিতা শুক্রাচার্য্যকে অনুরোধ করিলেন এবং নিজে অসুররাজ্যের ত্রিসীমানায় গমন করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন। দেবযানীর এই ব্যবসায়টিকে বর্ত্তমান ভারতীয় রাজনীতিকগণের অনুসৃত নন্-কো-অপারেশনএর (Non co-oparation) অনুরূপ বলা যাইতে পারে। কন্যার প্রতি স্নেহপ্রবণ শুক্রাচার্য্য কন্যার এই মর্ম্মান্তিক দুঃখে ব্যথিত হইলেও—তাঁহাকে এইরূপ মনোহর মধুর বচনে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন,—(২)

---

(১) যে যজ্ঞ দ্বারা রাক্ষসকুলের সমূলে ধ্বংস হয়।

(২) "ঔর্ব্ব! দৃষ্টঃ প্রভাবস্তে তপসোগ্রস্য পুত্রক!
প্রসাদং কুরু লোকানাং নিযচ্ছ ক্রোধমাত্মনঃ॥
নানীশৈর্হি তদা তাত ভৃগুভির্ভাবিতাত্মভিঃ।
বধো হ্যুপেক্ষিতঃ সর্ব্বৈঃ ক্ষত্রিয়াণাং বিহিংসতাম্॥"

(১) "ন চৈতন্নঃ প্রিয়ং তাত! যদিদং কর্ত্তুমিচ্ছসি।
নিযচ্ছেদং মনঃ পাপাৎ সর্ব্বলোকপরাভবাৎ॥
মা বধীঃ ক্ষত্রিয়াংস্তাত ন লোকান্ সপ্ত পুত্রক!
দূষয়ন্তং তপস্তেজঃ ক্রোধমুৎপতিতং জহি॥"

(২) "যঃ পরেষাং নরো নিত্যমতিবাদাংস্তিতিক্ষতে।
দেবযানি! বিজানীহি তেন সর্ব্বমিদং জিতম্॥
যঃ সমুৎপতিতং ক্রোধং নিগৃহ্ণাতি হয়ং যথা।
স যন্তেত্যুচ্যতে সদ্ভির্ন যো রশ্মিষু লম্বতে॥
যঃ সমুৎপতিতং ক্রোধং ক্ষময়েহ নিরস্যতি।
যথোরগস্ত্বচং জীর্ণাং স বৈ পুরুষ উচ্যতে॥"

"যিনি অন্য ব্যক্তি কর্ত্তৃক নিন্দিত বা তিরস্কৃত হইয়া উহা সহ্য করেন, তাহাতেই তাঁহার সমস্ত জগৎ জয় করা হয়। যিনি উত্তেজিত ক্রোধকে নিগৃহীত অশ্বের ন্যায় নিগ্রহ করেন—তিনিই প্রকৃত সারথি,—অশ্বের রশ্মিমাত্র অবলম্বন করিলেই সারথি হয় না। যিনি সর্পের নির্ম্মোক (খোলস্) পরিত্যাগের ন্যায় ক্ষমা দ্বারা সমুৎপন্ন ক্রোধকে নিরাস করেন,—তিনিই প্রকৃত পুরুষ। যিনি ক্রোধ সংযত করেন,—নিন্দা বা কঠোর বাক্য সহ্য করেন—স্বয়ং সন্তাপিত হইলেও অন্যকে তাপিত করেন না—তিনিই পুরুষার্থের ভাজন। অজ্ঞান বালক-বালিকাগণ যে পরস্পর অনিষ্টাচরণ করে,—তাহাতে প্রাজ্ঞগণ তাহার অনুকরণ করেন না।"

অসুররাজ কন্যা কর্ত্তৃক নির্জ্জিতা—দলিতা ফণিনীর মত কোপ-পরীতা কন্যা দেবযানীর প্রতি পিতা শুক্রাচার্য্যের এই ক্ষমার উপদেশ—দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার অবশ্য প্রতি-পাল্য কি না—তাহা আপনারা বিচার করুন।

(৫) শমীক মুনির ক্ষমা

রাজা পরীক্ষিৎ মৃগয়া-ব্যপদেশে একটি শরবিদ্ধ মৃগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবন হেতু পরিশ্রান্ত ও পিপাসার্ত্ত হইয়া শমীক মুনির নিকট উপস্থিত হইয়া—নিজ পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক পলায়িত মৃগের সন্ধান জিজ্ঞাসা করিলে, মৌনব্রতধারী মুনি কোনই উত্তর দিলেন না:—ইহাতে রাজা রোষপরতন্ত্র হইয়া শরাসনের অগ্রভাগ দ্বারা একটি মৃত সর্প তুলিয়া তাহার গলদেশে জড়াইয়া দিলেন। পরীক্ষিৎ মুনিকে মৌনব্রতধারী বলিয়া জানিতেন না বলিয়াই ঐরূপ ধৃষ্টতা প্রকাশ করিয়াছিলেন—"ন হি তং রাজশার্দ্দূলস্তথা ধর্ম্মপরায়ণম্। জানাতি ভরতশ্রেষ্ঠস্তত এনমধর্ষয়ৎ।" ক্ষমাশীল মুনি নৃপতি কর্ত্তৃক এইরূপ অপমানিত হইলেও শাপ প্রদান করিলেন না—নির্ব্বিকার অবস্থায়ই উপবিষ্ট রহিলেন।

কিন্তু ঐ ঋষির পুত্র শৃঙ্গী যেমন তেজস্বী, তেমনই ব্রতপরায়ণ ছিলেন এবং তরুণ বয়স হেতু অতিশয় কোপপ্রবণ ছিলেন। তিনি পিতার ঐ অবস্থা দেখিয়া ক্রোধাবেগে অভিভূত হইয়া, রাজাকে সপ্ত রাত্রির মধ্যে তক্ষক কর্ত্তৃক দষ্ট হইয়া যমসদনে গমন করিবার তীব্র শাপ প্রদান করিলেন। শমীক মুনি ইহা অবগত হইয়া পুত্রের চাপল্যে ব্যথিত হইয়া বলিলেন,—

"ন মে প্রিয়ং কৃতং তাত! নৈষ ধর্ম্মস্তপস্বিনাম্।"

হে পুত্র! তুমি যাহা করিলে, আমি ইহাতে অসন্তুষ্টই হইলাম,—এই কার্য্য আমার প্রিয় নহে। তিনি উপদেশচ্ছলে আরও বলিলেন, (১)

যঃ সন্ধারয়তে মন্যুং যোঽতিবাদাংস্তিতিক্ষতে।
যশ্চ তপ্তো ন তপতি দৃঢ়ং সোঽর্থস্য ভাজনম্॥
যৎ কুমারাঃ কুমার্য্যশ্চ বৈরং কুর্য্যুরচেতসঃ।
ন তৎ প্রাজ্ঞোঽনুকুর্ব্বীত ন বিদুস্তে বলাবলম্॥"

(১) "পিত্রা পুত্রো বয়স্থোঽপি সততং বাচ্য এব তু।
স্যাদ্ যথা গুণসংযুক্তঃ প্রাপ্নুয়াচ্চ মহদ্ যশঃ॥
সোঽহং পশ্যামি বক্তব্যং ত্বয়ি ধর্ম্মভৃতাংবর॥
স ত্বং শমপরো ভূত্বা বন্যমাহারমাচরন্।
চর ক্রোধমিমং হত্বা নৈবং ধর্ম্মং প্রহাস্যসি॥
ক্রোধো হি ধর্ম্মং হরতি যতীনাং দুঃখসঞ্চিতম্।
ততো ধর্ম্মবিহীনানাং গতিরিষ্টা ন বিদ্যতে॥
শম এব যতীনাং হি ক্ষমিণাং সিদ্ধিকারকঃ।
ক্ষমাবতাময়ং লোকঃ পরশ্চৈব ক্ষমাবতাম্॥

"পুত্র বয়স্থ হইলেও পিতার অবশ্য শাস্য। যাহাতে পুত্র গুণবান্ ও যশঃ প্রাপ্ত হয়—পিতার ইহা অবশ্য কর্ত্তব্য। তোমার বালত্ব হেতু চপলতা ও দুঃসাহস দেখিয়া বোধ হয় যে, আমাকে অনেক বিষয়েই শিক্ষা দিতে হইবে। তুমি ক্রোধ পরিত্যাগ করত শমপরায়ণ হইয়া বন্য ফলমূল আহার করিয়া তপস্যাচরণ কর। এরূপে ধর্ম্ম আর ক্ষয় করিও না। জিতেন্দ্রিয় মুনিগণের বহু কষ্টে সঞ্চিত ধর্ম্ম ক্রোধ কর্ত্তৃক লুপ্ত হয় এবং ধর্ম্মলোপ হইলে অভিলষিত সদ্গতি লাভ হয় না। ক্ষমাশীল যতিগণের একমাত্র ক্ষমাই সিদ্ধির হেতু। ক্ষমাযুক্ত ব্যক্তিরই ইহলোক ও পরলোকে মঙ্গল হয়। অতএব ক্ষমাশীল ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া তপস্যা কর। একমাত্র ক্ষমাকে অবলম্বন করিয়াই ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইবে।"

ক্ষমাশীল মুনি নিজে রাজা কর্ত্তৃক অপমানিত হইলেও কোনওরূপ মানসিক বিকৃতি প্রাপ্ত না হইয়া যে ক্ষমার উপদেশ দিতেছেন,—দেশবাসিগণ! সেই ক্ষমাগুণ নিজ নিজ চরিত্রে বিকাশিত করিয়া ধন্য হউন। মুনির উপদেশমত কার্য্য করিতে যদি অপারগ হন—তবে সফলতার আশা সুদূরপরাহত।

(৬) দ্রোণাচার্য্যের ক্ষমা

এই প্রসঙ্গে মহাত্মা দ্রোণাচার্য্যের চরিত্রগত এই মহত্ত্বের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব। ভরদ্বাজনন্দন দ্রোণ এবং পৃষৎরাজপুত্র দ্রুপদ বাল্যসখা ছিলেন। দ্রুপদ বাল্যকালে প্রতিদিন ভরদ্বাজের আশ্রমে গমন করিয়া দ্রোণের সহিত ক্রীড়া ও অধ্যয়ন করিতেন। দ্রুপদ দ্রোণের প্রতি প্রীতিবশতঃ প্রায়ই এই কথা বলিতেন যে—যখন আমি পাঞ্চালরাজ্যে অভিষিক্ত হইব, তখন এই রাজ্য তোমারও ভোগ্য হইবে। হে সখে,—আমার ভোগ, ঐশ্বর্য্য ও সুখ সকলই তোমার অধীনে থাকিবে—ইহা আমি সত্য করিয়া শপথ করিতেছি ("অভিষেক্ষ্যতি মাং রাজ্যে স পাঞ্চাল্যো যদা—তদা মম ভোগাশ্চ বিত্তঞ্চ ত্বদধীনং সুখানি চ......সত্যেন তে শপে।" (আদি পঃ ১৩১ অঃ ৪৬ শ্লোঃ)।

ইহার পর পৃষৎরাজার মৃত্যুর পর দ্রুপদ সিংহাসনাধিরূঢ় হইলেন,—ভরদ্বাজ পরলোকপ্রয়াণ করিলে নিঃসম্বল দ্রোণ দারিদ্র্যে অবসন্ন হইলেন। এক দিন শিশুপুত্র অশ্বত্থামা প্রতিবেশী ধনিপুত্র-দিগকে দুগ্ধ পান করিতে দেখিয়া রোদন করিতে লাগিল। দ্রোণ বহু অনুসন্ধান করিয়াও প্রতিগ্রহরূপে একটি দুগ্ধবতী গাভী প্রাপ্ত হইলেন না। পরে অন্য বালকেরা পিষ্টোদক (তরল পিটালী) দ্বারা বালক অশ্বত্থামাকে প্রলোভিত করিল। অশ্বত্থামাও উহা পান করিয়া বাল্য হেতু বিমোহিত হইয়া "আমি দুগ্ধ পান করিয়াছি" বলিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল—(পীত্বা পিষ্টোদকং বালঃ ক্ষীরং পীতং ময়াহপি চ—ননর্ত্ত।) ইহাতে প্রতিবেশী বালকগণ তাহাকে পরিবৃত করিয়া নানাভাবে উপহাস করিতে লাগিল। পুত্রস্নেহাতুর দ্রোণ এই করুণদৃশ্য দেখিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না। দ্রুপদরাজের পূর্ব্ব-প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া তাঁহার নিকট মিত্রতার দাবি করিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন দ্রুপদ ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত থাকায় তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। দ্রুপদ কহিলেন,— (১)

তস্মাচ্চরেথাঃ সততং ক্ষমাশীলো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
ক্ষময়া প্রাপ্স্যসে লোকান্ ব্রহ্মণঃ সমনন্তরান্॥"
(আদি পঃ ৪২ অঃ ৪-৯ শ্লোক।)

(১) অকৃতেয়ং তব প্রজ্ঞা ব্রহ্মন্নাতিসমঞ্জসা।
যদাত্থ মাং ত্বং প্রসভং সখা তেঽহমিতি দ্বিজ॥
সঙ্গতানীহ জীর্য্যন্তে কালেন পরিজীর্য্যতা।
সৌহৃদং মে ত্বয়া হ্যাসীৎ পূর্ব্বং সামর্থ্যবন্ধনম্।

"তোমার এই বুদ্ধি অতীব অসঙ্গত যেহেতু, তুমি কোথাকার কে—হঠাৎ আসিয়া 'আমি তোমার সখা' বলিয়া পরিচয় দিলে। কালক্রমে সকলই জীর্ণ হয়—সুতরাং সৌহার্দ্দও জীর্ণ হয়। তোমার সহিত পূর্ব্বে যে আমার সখ্য হইয়াছিল, তাহা তৎকালীন সম্বন্ধ বশতঃই হইয়াছিল। সমান সমান ব্যক্তির মধ্যেই সখ্য হইয়া থাকে,—বিসদৃশ ব্যক্তির মধ্যে হয় না। কোনও প্রয়োজন বশতঃই তৎকালে তোমার সহিত আমার বন্ধুত্ব হইয়া থাকিবে। অতএব পুরাতন সৌহার্দ্দের কথা ছাড়িয়া দাও। অতুল ঐশ্বর্য্যশালী ভূপালের সহিত শ্রীহীন দরিদ্র ব্যক্তির কখনও সখ্য হইতে পারে না। আমি যে পূর্ব্বে রাজ্যের নিমিত্ত তোমার সহিত প্রতিজ্ঞা করিয়াছি- তাহা ত স্মরণ হয় না। তবে অতিথি বা অভ্যাগতরূপে আসিয়াছ,—এক রাত্রি যাহা ভোজন করিতে বাঞ্ছা হয়, আমি তাহা প্রদান করিতে সম্মত আছি।"

পূর্ব্বে স্বার্থসাধনার্থ সমুচ্চ কণ্ঠে নানারূপ আশার উদ্ঘোষণ করিয়া কার্য্যকালে উহার প্রত্যাহার রাজনীতিক্ষেত্রে ভারতবাসীর নিকট অপরিচিত নহে।

দ্রোণ একে দারিদ্র্য-নিপীড়িত, তাহাতে যাঁহার নিকট বড় মুখ করিয়া হৃদয়ে আশা পোষণ করিয়া আসিয়াছিলেন,—তাঁহার নিকট এইরূপ ভাবে অনাদরসহ প্রত্যাখ্যান প্রাপ্ত হওয়ায় তাঁহার মনের অবস্থা যেরূপ হইয়াছিল তাহা সহৃদয় ব্যক্তিমাত্র সহজেই উপলব্ধি করিতে পারেন। ইহা অপেক্ষা অপমান ও ক্ষোভের বিষয় আর কি হইতে পারে? দ্রোণাচার্য্য এই মর্ম্মান্তিক অপমান বিস্মৃত হইতে পারেন নাই—দ্রুপদকে যথোচিত শিক্ষা দিবার জন্য সংকল্প করিয়াছিলেন এবং এই উদ্দেশ্যে কুরুনন্দন যুধিষ্ঠিরাদির অস্ত্রশিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। কুমারগণের অস্ত্রশিক্ষা সম্পন্ন হইলে গুরু-দক্ষিণাস্বরূপ দ্রুপদরাজ্য জয় করিয়া দ্রুপদকে পরাজয় করিয়া আনিবার প্রস্তাব জ্ঞাপন করিলেন। আচার্য্যের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া কুমারগণ দ্রুপদরাজ্য আক্রমণ ও বিধ্বস্ত করিয়া অমাত্যসহ দ্রুপদকে বদ্ধ করিয়া আচার্য্যকে উপহার প্রদান করিলেন। দ্রোণ তখন বশতাপন্ন ভগ্নদর্প দ্রুপদকে দেখিয়া মৃদু হাস্য করত কহিলেন,—(১)

"এক্ষণে সেই বিপ্রের বশায়ত্ত স্বীয় জীবন প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্বের সখিত্ব কি ইচ্ছা হয়? হে বীর! তুমি প্রাণভয়ে ভীত হইও না। আমরা ব্রাহ্মণ; সুতরাং ক্ষমাশীল। বাল্যকালে আমার সহিত ক্রীড়া করিয়াছিলে, তাহাতেই তোমার প্রতি আমার স্নেহ ও প্রীতি সংবর্দ্ধিত হইয়াছিল—অতএব পুনর্ব্বার তোমার সহিত সখ্য প্রার্থনা করিতেছি এবং তোমাকে এই জিতরাজ্যের অর্দ্ধাংশও প্রদান করিতেছি। পূর্ব্বে তুমি বলিয়াছিলে—রাজা না হইলে কেহ রাজার সখা হইতে পারে না—এই নিমিত্তই আমি তোমার রাজ্যের নিমিত্ত যত্ন করিয়াছি। এক্ষণে যদি তোমার মত হয়—তাহা হইলে আমাকে সখা বলিয়া বোধ কর।"

দ্রোণাচার্য্যের এই মহত্ত্ব লোকাতীত। তিনি করতলগত শত্রুর প্রতিও ক্ষমাশীল এবং জিতরাজ্য প্রত্যর্পণপূর্ব্বক পূর্ব্বসখ্য পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য হস্ত প্রসারিত করিতেও কুণ্ঠিত নহেন।

দ্রুপদরাজাও প্রতিপক্ষ দ্রোণের এই মহত্ত্বে চমৎকৃত হইয়া অবনত-কন্ধরে কহিলেন,—

"অনাশ্চর্য্যমিদং ব্রহ্মন্! বিক্রান্তেষু মহাত্মসু।
প্রীয়ে ত্বয়াহং, ত্বত্তশ্চ প্রীতিমিচ্ছামি শাশ্বতীম্।"

হে ব্রহ্মন্! বিক্রমশালী মহাত্মা পুরুষদিগের পক্ষে ইহা আশ্চর্য্য নহে। আমি আপনার দ্বারা প্রীত হইতেছি এবং আপনিও আমার দ্বারা চিরস্থায়িনী প্রীতি লাভ করেন, এরূপ ইচ্ছা করিতেছি।

দ্রুপদ ও দ্রোণের এই আখ্যান ভারতবাসী মাত্রেরই স্মরণ করা উচিত। শত্রু যখন পরাজিত হইয়াও তোমার ক্ষমাগুণে—মহানুভবতায় ও মহত্ত্বে আকৃষ্ট হইয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে—তখনই তোমার প্রকৃত জয় জানিও। নতুবা পশুবল দ্বারা অর্জ্জিত জয়—জয়পদবাচ্যই নহে।

শ্রীভববিভূতি বিদ্যাভূষণ।

সাম্যাদ্ধি সখ্যং ভবতি বৈষম্যান্নোপপদ্যতে।
আসীৎ সখ্যং দ্বিজশ্রেষ্ঠ ত্বয়া মেঽর্থ-নিবন্ধনম্॥
ন হি রাজ্ঞামুদীর্ণানামেবম্ভূতৈর্নরৈঃ কচিৎ।
সখ্যং ভবতি মন্দাত্মন্! শ্রিয়া হীনৈর্ধনচ্যুতৈঃ॥
একরাত্রং তে ব্রহ্মন্! কামং দাস্যামি ভোজনম্॥

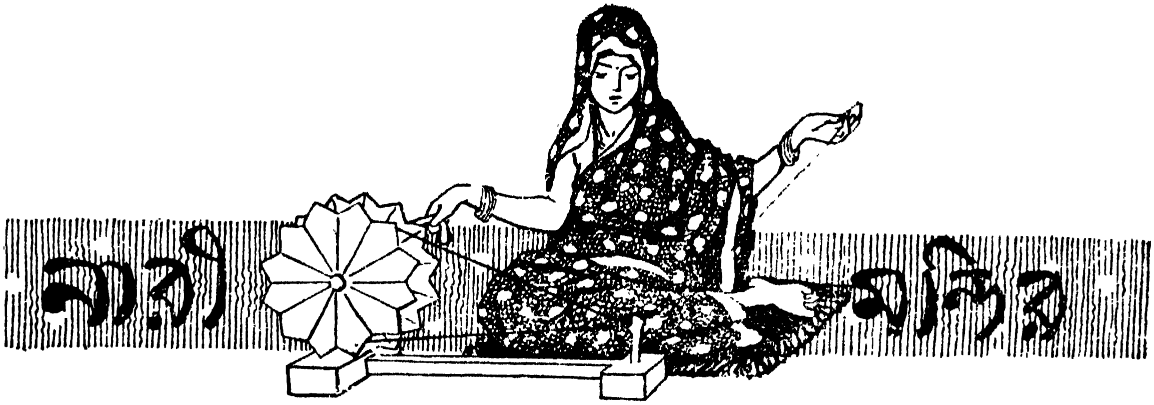
১। "প্রাপ্য জীবং রিপুবশং সখিপূর্ব্বং কিমিষ্যতে।
মা ভৈঃ প্রাণভয়াদ্বীর! ক্ষমিণো ব্রাহ্মণা বয়ম॥
প্রার্থয়েয়ং ত্বয়া সখ্যং পুনরেব জনাধিপ।
বরং দদামি তে রাজন্! রাজ্যস্যার্দ্ধমবাপ্নুহি॥
অরাজা কিল নো রাজ্ঞঃ সখা ভবিতুমর্হতি।
অতঃ প্রযতিতং রাজ্যে যজ্ঞসেন! ময়া তব॥
সখায়ং মাং বিজানীহি পঞ্চাল যদি মন্যসে॥"

দিন ফুরালে

এ দিন যদি ফুরিয়ে যায় আঁধার আসে ঘিরে,
ভাবনা কিসের? আকাশ ছেড়ে ফিরব তখন নীড়ে;
মিলিয়ে যাবে রূপের ভুবন
প্রসার পাবে রসের শ্রবণ,
কর্‌বে সরস পরশ তখন রূপের স্মৃতিটিরে।

তোমার ভূষণ কেশ-প্রসাধন লাগ্‌বে না আর কাযে
তনু ছেড়ে লোভন-শোভা জাগবে মনের মাঝে।
কাঁদব নাক পদ্মশোকে
ফুটবে কুমুদ চন্দ্রালোকে,
নিবিড় হবে বাহুর বাঁধন, স্বপ্ন-সায়রতীরে।

শ্রীকালিদাস রায়।



পর্দার অন্তরালে

য়ুনানী মহিলার স্বাধীনতার কথা জগতে অনেকেই জানে। এসিয়ায় কোন দেশে তেমন স্বাধীনা জেনানা দেখা যায় না। জাপানে ও মহাচীনে নারীর অবরোধ-প্রথা নাই বটে, তবে ঐ দুই দেশের মহিলার স্বাধীনতা য়ুনানী মহিলার স্বাধীনতা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

বরং ব্রহ্মের মহিলারা কতক পরিমাণে য়ুরোপীয় মহিলাদের অপেক্ষা স্বচ্ছন্দচারিণী। তাহারা বাল্যকাল হইতেই সমবয়স্কপুরুষের সহিত হাস্য-পরিহাসে কালাতিপাত করিতে পারে। জাপানী বা চীনা মহিলাদের উপর অভিভাবকের দৃষ্টি ইহা হইতে অনেক কঠোর। তথাপি এসিয়ার এই তিন দেশে এবং আর্ম্মেনীয়ায় ও ইহুদীদেশে পর্দ্দার ব্যবস্থা আদৌ নাই।



ব্রহ্মের মহিলা

ভারতবর্ষ ও মুসলমান দেশ ব্যতীত পৃথিবীর অন্য কোন স্থানে পর্দ্দার ব্যবস্থা নাই। মুসলমানপ্রভাব বিস্তারের পূর্ব্বেও ভারতে নারীর অবরোধপ্রথা কোন না কোনরূপে প্রবর্ত্তিত ছিল, এ কথা অনেকে বলিয়া থাকেন। আমরা এ সম্বন্ধে কোন যুক্তিতর্কের অবতারণা করিতে চাহি না; তবে এটুকু বলিতে বাধ্য যে, ভারতে বহু প্রাচীনকাল হইতেই সদর ও অন্দর বলিয়া গৃহস্থের গৃহের দুইটি স্বতন্ত্র অংশ ছিল, সদর পুরুষের এবং অন্দর নারীর নিজস্ব ছিল। সদর ও অন্দর কথা দুইটি আর্য্য ভাষার অন্তর্গত না হইলেও আর্য্য ভাষায় 'অন্তঃপুর', 'শুদ্ধান্ত' প্রভৃতি নারীর নিজস্ব বাসস্থানের নাম ছিল। ভারতের আর্য্য নারীরা অসূর্য্যম্পশ্যরূপা ও যে ছিলেন না, এমন নহে। তপোবনের ঋষি-পালিতা শকুন্তলাকে দেখিয়া রাজা দুষ্মন্ত তাঁহার রূপ শুদ্ধান্তদুর্ল্লভ বলিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন। তখনও আর্য্য-নারীর শুদ্ধান্ত নিজস্ব বাসস্থান ছিল।

কিন্তু ভারতে অন্তঃপুর বা শুদ্ধান্তের ব্যবস্থা থাকিলেও অবরোধের কাঠিন্য ছিল না, এ কথা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়। ভারতের যে সব প্রদেশে মুসলমান প্রভাব তত পতিত হয় নাই, সে সব প্রদেশে এখনও অবরোধপ্রথা নাই। মহারাষ্ট্র, কঙ্কন, কেরল, অন্ধ্র, গুর্জ্জর প্রভৃতি দেশে নারীর অন্তঃপুর



মহারাষ্ট্র-মহিলা

থাকিলেও অবরোধপ্রথা নাই। মহারাষ্ট্রগৃহিণী ভৃত্যের সঙ্গে সংসারের বাজার করিতে বাহির হইয়া থাকেন, আমি বোম্বাইয়ে ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। মান্দ্রাজী মহিলা আত্মীয়স্বজনের সহিত রাজপথে ভ্রমণে বা কার্য্যোপলক্ষে বাহির হইয়া থাকেন। গুর্জ্জর মহিলা অতিথির সম্মুখে স্বচ্ছন্দচারিণী হইয়া তাঁহাদিগকে পরিতোষরূপে ভোজন করাইয়া আনন্দলাভ করেন, অধিকন্তু তাঁহাদিগকে গান শুনাইয়া আনন্দ দান করিয়া থাকেন।

যে স্থানে মুসলমানের আক্রমণ অত্যন্ত কঠোরতায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, সেই স্থানে অবরোধের কঠোরতাও সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক লক্ষিত হয়। পঞ্জাব, রাজপুতানা ও যুক্তপ্রদেশ ভারতে এ বিষয়ে অগ্রণী। সে স্থানে অন্তঃপুর জেলখানারই অনুরূপ, তাহার গবাক্ষাদি নাই বলিলেই হয়, নারী তথায় পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গের মত জীবন যাপন করে। বাঙ্গালা, উড়িষ্যা বা আসামে অবরোধের এত কড়াকড়ি নাই।

কিন্তু ভারতের যে স্থানে অবরোধের কড়াকড়ি আছে, সে স্থানেও নিম্নশ্রেণীর মধ্যে অবরোধপ্রথা নাই। জাতি যত উচ্চশ্রেণীর হয়, অবরোধের কড়াকড়িও সেই পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

বাঙ্গালায় অবরোধ

বাঙ্গালায় সহরের যাহাই হউক, পল্লীগ্রামে অবরোধপ্রথা অতীব শিথিল। বাঙ্গালী নিম্নশ্রেণীর নারী পুরুষের মত সংসারের রোজগারের কায করে, হাট-বাজার করে, এমন কি, চাষ-আবাদের কাযেও সহায়তা করে। উচ্চশ্রেণীর মহিলারা পরস্পর দেখাসাক্ষাৎ করিয়া থাকেন, সামান্য অবগুণ্ঠন দিয়া পথ চলাচল করেন। বাঙ্গালায় নারীর অন্তঃপুর আছে বটে, কিন্তু অবরোধ নাই, এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অপরিচিতের সহিত মিশামিশি প্রাচ্যের প্রকৃতিবিরুদ্ধ; আবার প্রাচ্যে নারীর পক্ষে আত্মীয়স্বজনের মধ্যে বাছিয়া কথা কহিবার বিধিও আছে। এই ভাবে নানা বাঁধনকষণের মধ্য দিয়া নারীর জীবন গঠন করা ভাল কি মন্দ, তাহার বিচার এখানে করিতেছি না। তবে অবরোধের সার্থকতা থাকুক বা না থাকুক, অবগুণ্ঠনের যে একটা মহিমা আছে, তাহা বোধ হয়, অনেকেই স্বীকার করিবেন।

মুসলমান দেশের অবরোধ

বাঙ্গালীর তীর্থস্থানে, গঙ্গাস্নানে, মেলাছত্রে, শ্মশানঘাটে নারীর অবরোধ স্বতঃই অন্তর্হিত হয়। কিন্তু মুসলমান মহিলাদের সম্বন্ধে এ কথা বলা যায় না। অতি নিম্নশ্রেণীর

মুসলমান নারীও পর্দ্দার বাহিরে পদার্পণ করে না। মুসলমান মহিলা বাহিরে আসিলে বোরকায় সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদন করিয়া পথাতিক্রম করিয়া থাকেন। এ দেশে যে সকল আদিম নিবাসী ও নিম্নশ্রেণীর হিন্দু, মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের নারীরা পথে ঘাটে বাহির হয়, বাজারহাট করে, কৃষিকার্য্যে পুরুষের সহায়তা করে। এ দেশের আদিমনিবাসী নারীদের মধ্যে অবরোধপ্রথা নাই, নিম্ন-শ্রেণীর হিন্দু নারীদের মধ্যেও নাই। কাযেই তাহারা ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিলেও অবরোধের আইন মানিয়া চলে না।

হজরৎ মহম্মদের মুসলমানধর্ম্ম নারীজাতির প্রতি উদারতা ও সমদর্শিতা অবলম্বনে কার্পণ্য করে নাই।

ইসলাম পর্দ্দা-প্রথার অনুমোদন করিয়াছে বটে, কিন্তু কঠোর বা হেরেমের ব্যবস্থা করে নাই। পর্দ্দার অর্থ ইসলামের অভিধানে স্ত্রী-জাতির আবরু রক্ষা করিয়া চলা। মুসলমান নারীর পক্ষে বাহিরে যাতায়াত নিষিদ্ধ নহে। তাঁহারা হজ্জ ব্রত উদ্‌যাপন করিতে পারেন। হজরৎ মহম্মদের কন্যা বিবি ফাতেমা সাধারণ সভায় বক্তৃতাও করিয়াছিলেন।

ভারতবর্ষ, পারস্য ও তাতার ব্যতীত মিশর, তুরস্ক, আরব প্রভৃতি মুসলমান দেশে অবরোধপ্রথার কাঠিন্য নাই। মাননীয় আমীর আলি এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—Throughout the Quran we have no trace of the Zenana system, by which a woman is entirely withdrawn from the society of men and the freer atmosphere outside her own world of four walls.



মাদ্রাজী মহিলা

ইসলাম যে অবরোধপ্রথার সমর্থন করে না, তাহা কোর্-আণের নিম্নলিখিত কথা হইতে প্রতীয়মান হয়—Speak to the men who believe, that they cast down their looks, and guard themselves from immodesty; and speak to the women who believe, that they cast down their looks and guard themselves from immodesty, and make not a display of their ornaments, unless what necessarily appears thereof, and let them draw their kerchiefs over their bosoms and let them not beat with their feet.

(Quran—Sura, XXIV, 30, 31)

এই সম্পর্কে Encyclopaedia Britannica লিখিয়াছেন :—



আদিমনিবাসী ভারতীয় নারী

The seclusion of women in the household is fundamental to the oriental conception of the relation, and its origin must, therefore be sought far earlier than the precept of Islam as set forth by the Quran which merely regulates a practically universal Eastern custom.

কিন্তু সে সব বিধি-নিষেধ সত্ত্বেও মুসলমানদেশে পর্দ্দার যত প্রভাব, এত আর কোথাও নাই। পর্দ্দানশীন কথা মুসলমান দেশেরই আমদানী, সদর ও অন্দর ও তাহাই। মুসলমান নারীর কথা মনে হইলেই লোক পিঞ্জরাবদ্ধ কয়েদীকে মনে করে। সেই নারী জীবনের সহিত জীবজন্তুর জীবনের কোনও প্রভেদ নাই, এমন কথাও প্রতীচ্যের লেখকরা বলিয়া থাকেন। অর্থাৎ জীবজন্তু যেমন আহার, শয়ন ও মৈথুনই জীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করে এবং সেই উদ্দেশ্যসাধন করিতে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে, তেমনই এই পর্দ্দার অন্তরালের নারীরাও করিয়া থাকে। এমন ধারণা করিবার কারণ জানিতে হইলে পর্দ্দার অন্তরাল ভেদ করিয়া সেই নারীজীবনের পরিচয় লইতে হয়। যে সমস্ত প্রতীচ্য মহিলা পর্দ্দা ভেদ করিয়া সেই পরিচয় লইয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের বর্ণনা হইতে মুসলমান দেশের পর্দ্দানশীনদের জীবনচিত্র পাঠকের সম্মুখে ধারণ করিতেছি।





ভদ্র তাতারবংশের নরনারী

তাতার দেশ

পৃথিবীর মধ্যে তাতার দেশের মত পর্দ্দার কড়াকড়ি আর কোথাও নাই, এই



দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত তাতার-মহিলা

কথা ভ্রমকণারীরা বলিয়া থাকেন। এক দিকে কাস্পীয় হ্রদ ও অপর দিকে মহাচীন ও মঙ্গোলিয়া, এই উভয়ের মধ্যে অবস্থিত দেশই তাতার দেশ। এই স্থানেই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সমরখন্দ, তাসখন্দ, বোখারা, কিভ, আন্দিজান, কোকন্দ প্রভৃতি সহর অবস্থিত। এই স্থান হইতে তৈমুর-লেঙ্গ, চেঙ্গিস প্রভৃতি নরত্রাস জগদ্বিজয়ী বীর পৃথিবীজয়ে বহির্গত হইয়াছিলেন। এই স্থান হইতেই বাবর ভারতজয়ে যাত্রা করিয়া মুঘলরাজবংশের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

এই দেশে কত জাতির যে সংমিশ্রণ হইয়াছে, তাহা বলিবার নহে। মুঘল, চীন, ইরাণী, পারসীক, উজবেগ, তুর্কী,—সকল জাতিরই রক্ত তাতারের সহিত মিশ্রিত হইয়াছে। য়ুরোপীয়রা এই মিশ্রিত জাতিকে সার্ট নামে অভিহিত করেন। উজবেগ পূর্ব্বপুরুষগণের নিকট তাতাররা তুর্কীভাষা পাইয়াছে, উজবেগ সর্দ্দারদিগের বংশধররাই কিভ ও বোখারার আমীর হইয়াছিলেন। অধুনা এ সব দেশ বলশেভিক রুসিয়ার অধীনে সাধারণতন্ত্র রাজ্যে পরিণত হইয়াছে বলিয়া শুনা যায়।

সার্ট বা তাতাররা মুসলমান—বোধ হয়, জগতে তাহাদের মত গোঁড়া মুসলমান আর নাই; আর বোধ হয়, তাহাদের মত কঠোর অবরোধপ্রথাও জগতে কোন জাতিরই নাই।

তাতারের পর্দ্দা

কোন ভদ্র তাতার মহিলা কখনও পর্দ্দার বাহিরে দেখা দেন না। যখন বাহিরে যাইবার প্রয়োজন হয়, তখন তাঁহারা আপাদমস্তক বোরকায় আচ্ছাদিত করিয়া যায়েন, পরন্তু তাঁহাদের মুখের উপর কৃষ্ণবর্ণ অশ্বলোমের অবগুণ্ঠন ঝুলাইয়া দেওয়া হয়।

তাতার মহিলাদের অন্দর একবারে লোকচক্ষুর অন্ত-রালে অবস্থিত থাকে। তাঁহাদের মহল স্বতন্ত্র, অঙ্গন স্বতন্ত্র, সেই মহলের কোন দ্বার বা গবাক্ষ পথের দিকে



পার্শী মহিলা (প্রাচীন বেশে)

অবস্থিত নহে, তবে ভিতর অঙ্গনের দিকে জানালা দরজা থাকে বটে। এই অঙ্গনের সহিত সদর মহলের যোগাযোগ থাকে। অতি সঙ্কীর্ণ অন্ধকারময় পথ দিয়া সদর হইতে অন্দরে যাইতে হয়। বুঝিয়া দেখুন, তাতারের পর্দ্দা কিরূপ ভীষণ।

তাতারের অন্দরের অঙ্গনে একটি করিয়া নাহার বা পয়ঃপ্রণালী থাকে। উহার জলে মহিলা ও শিশুসন্তান-দিগের স্নানপানীয়াদির সংস্থান হয়। দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মহিলারা সাধারণ হামামে শৌচ-স্নানাদি সম্পন্ন করে।

তাতার পুরুষরা চারিটি বিবাহ করিতে পারে। অবস্থাপন্ন তাতাররা তাহার উপরেও বাঁদী রক্ষিতা রাখিতে পারে। ইচ্ছা করিলে তাতার পুরুষ যখন তখন স্ত্রী ত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু তাতার নারীরা তাহা পারে না।

অবস্থাপন্ন তাতার-দিগের বালিকা-বিদ্যালয় আছে। তাহাতে বালি-কারা শিক্ষয়িত্রীর নিকট কোর্-আণ শিক্ষা করে। ইহা ছাড়া তাতার নারী জগতের আর কোনও তত্ত্বের খবর রাখে না।



পার্শী মহিলা (আধুনিক বেশে)

বেদিয়া তুর্কী

বোখারা ও কাস্পীয় হ্রদের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগে এক জাতীয় বেদিয়া তুর্কী বাস করে। তাহাদের নারীরা কিন্তু তাতার নারীর মত অবগুণ্ঠন গ্রহণ করে না, পরন্তু অতি অল্পবয়স্ক হইতেই পুরুষের সহিত অবাধে মিলামিশা করে।

ইরাণী নারী

ইরাণের সভ্যতা বহু প্রাচীন। অগ্নি-উপাসক পার্শীরা ইরাণ হইতেই ভারতের গুজ্জর প্রদেশের সাঞ্জানে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিল। ইরাণ মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে বটে, কিন্তু প্রাচীন পারসীকের অনেক আচারব্যবহার এখনও ইরাণে প্রচলিত আছে। অগ্নি-উপাসক পার্শীদের মধ্যে অবরোধ বা অবগুণ্ঠন প্রথা নাই। পার্শী মহিলা প্রায় য়ুরোপীয়ান মহিলা-দের মত স্বাধীনা, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে বিদুষী ও পুরুষের সহিত সমানভাবে ব্যবহার করিয়া থাকেন।

কিন্তু খাস পারস্যে নারীদের অবস্থা ইহার বিপরীত। পারস্য বা ইরাণ প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি। এ স্থানের অধিবাসীরা আর্য্যজাতীয়; সুতরাং পরিবর্ত্তনশীল কালের প্রভাবের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া প্রাচীন সভ্যতার বহুলাদর অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। ইরাণের গুলাব বুলবুলে সেখ সাদি, ইরাণের বিশ্বকর্ম্মা ময়দানব—যাহারা হয় ত তাজ নির্ম্মাণ করিয়াছিল, তাহারা সকলে সেই প্রাচীন সভ্যতাকে জাগাইয়া রাখিয়াছে। কিন্তু ইরাণের নারী মুসলমান বিজেতার প্রভাবে ক্রমে তাতারের মত

একবারে ঘোর পর্দ্দানশীনা হইয়া পড়িয়াছে। জন্মকাল হইতে ইরাণী বালিকা অন্দরে আবদ্ধা থাকে। ৮ বৎসরকাল পর্য্যন্ত সে বাটীর বালকগণের সহিত লিখাপড়া করিতে পায়। তবে উচ্চশ্রেণীর ইরাণী মহিলা আরও কিছুকাল বিদ্যাশিক্ষা করিতে পারেন। যে ইরাণী মহিলা উত্তমরূপে লিখিতে বা পড়িতে জানে, সে এক আশ্চর্য্য পদার্থ বলিয়া গণ্য হয়।

ইরাণের অন্দরমহল

৮ বৎসর বয়সে ইরাণী বালিকা সঙ্গী বালকদিগের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অন্দরে প্রেরিত হয়। ইরাণী অন্দরমহল এক প্রশস্ত অঙ্গনের চতুষ্পার্শ্বে নির্ম্মিত হয়, সেই অঙ্গনের দিকে অনেক দ্বারগবাক্ষ থাকে। অন্দর চারিদিকে উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত হইয়া থাকে। গৃহস্বামী বালকগণের সহিত সদরে কালাতিপাত করেন—অন্দরের সহিত সদরের এক অন্ধকারময় সঙ্কীর্ণ আচ্ছাদিত পথের যোগাযোগ থাকে।

অন্দরের অঙ্গনে ফুলবাগান ও ফোয়ারা থাকে; ঐটুকুই জেনানাদের দৌড়ের সীমানা। উহার মধ্যে


সমরখন্দের তাতার শাসক ও তাঁহার পরিবার


অবগুণ্ঠনবতী পারসীক মহিলা

একমাত্র গৃহস্বামী ও নারীদিগের আত্মীয়-স্বজন প্রবেশ করিতে পারে। ঐ অন্দরের মধ্যে ইরাণী বালিকা সীবন ও সূচিকার্য্যে শিক্ষা পাইয়া থাকে। তথায় সে আত্মীয়দের নিকট মিষ্টান্নাদি প্রস্তুত করিতে শিখে, তাহার জননী যখন আপাদ-মস্তক-মণ্ডিত হইয়া হামামে স্নান করিতে অথবা নারী বন্ধুদের সহিত বাগানবাড়ীতে আমোদ-আহ্লাদ করিতে যায়েন, তখন সে তাঁহার সহিত বাড়ীর বাহির হইতে পারে, অন্যথা গৃহের বাহিরে তাহার পদার্পণ নিষিদ্ধ।

ইরাণের হামাম বা সাধারণ স্নানাগার নারীদিগের মজলিসবিশেষ। এই স্থানে নারীরা পরস্পর সাক্ষাৎ ও আলাপপরিচয় করিয়া থাকেন। সেখানে বাজারের যত গুজব ছড়াইয়া পড়ে। শুক্রবারে নারীরা মসজেদে এক পর্দ্দা ঘেরা স্থানে বসিয়া ভজনাকার্য্যে যোগদান করিতে পারেন।

পারস্যেও নারী গৃহের বাহির হইলে বোরকায় আপাদ-মস্তক আচ্ছাদিত হইয়া পথে চলিয়া থাকেন।

ইরাণের মুসলমানরাও মুসলমানধর্ম্মানুসারে ৪টি পর্য্যন্ত বিবাহ করিতে পারে। কিন্তু আজকাল এ প্রথা উঠিয়া যাইতেছে, এখন ইরাণের পুরুষ প্রায়ই এক পত্নী গ্রহণ করিয়া থাকে। ইরাণী পত্নী স্বামীকে অত্যন্ত ভয়ভক্তি করে বলিয়া শুনা যায়। সময় সময় ভালবাসাও ইহার সহিত স্থান পায়। কিন্তু প্রায়শঃ পুরুষ নারীকে সম্পত্তির মধ্যে গণ্য করে বলিয়া মনের মিলনের অভাব হয়।

ইরাণী নারী অন্দরের মধ্যে আবদ্ধা থাকেন বলিয়া যে একবারে বাহিরের জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়েন, তাহা নহে। তাঁহারা প্রায়ই নারীবন্ধু ও আত্মীয়গণকে নিমন্ত্রণ করিয়া কাছে রাখেন, আবার নারীবন্ধু বা আত্মীয়দের গৃহে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যায়েন।

ইরাণী নারীরা অতীব সুন্দরী। নারীমজলিসে সালঙ্কারা ইরাণী সুন্দরীদের মধ্যে পরস্পর রূপালঙ্কারের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইয়া থাকে। শুনিতে পাওয়া যায়, কোন ইরাণী সুন্দরী এক নূতন ধরণের রেশমী বস্ত্র পরিধান করিয়া এক নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছিলেন। পরে তাঁহাকে আবার যখন ঐ গৃহে নিমন্ত্রণ করা হয়, তখন তিনি গৃহস্বামিনীর এক বাঁদীর অঙ্গে সেই রেশমী বস্ত্র দেখিয়া বিস্মিত ও মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, তাঁহাকে অপদস্থ করিবার নিমিত্ত গৃহস্বামিনী বাঁদীকে সেই পরিচ্ছদে ভূষিত করিয়া নিমন্ত্রিতগণের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ইরাণে এমন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অনেক সময়ে প্রকৃত শত্রুতার উদ্ভব হইয়া থাকে।

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু।

অনুভব

ধরায় বসন্ত নাহি, হৃদয়ে বসন্ত মোর!
রসাল মঞ্জরী দামে—মঞ্জু ফুল-শেজ রচি,
কে স্পর্শিল প্রাণ মোর, কোন রতি কোন শচী?
সর্ব্ব অঙ্গ বেড়ি সে যে বাঁধিল ফুলের ডোর!

অফুরন্ত এ বসন্ত, অনন্ত এ মধুরতা,—
মূর্ত্তি ধরিতেছে মোর প্রাণের আনন্দ-গান,
দু'জনায় নিরিবিলি নব সুধারস পান,
মরমে মরমে ভাসে কত মধুময় কথা।

এ যেন প্রাণের রাস,—রূপ পূর্ণিমার মাঝে
বাহু বাহু ধরাধরি,—দেখাদেখি চোখে চোখে,
নব নব পরিচয় পরিপূর্ণ প্রেমালোকে,
কভু আঁখি মুদে আসে মধুর প্রণয় লাজে।

কত জীবনের স্মৃতি—কত জীবনের ব্যথা,
এ প্রেম-মিলন মাঝে লভিল কি সার্থকতা!

শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ।



লাক্ষার ভবিষ্যৎ

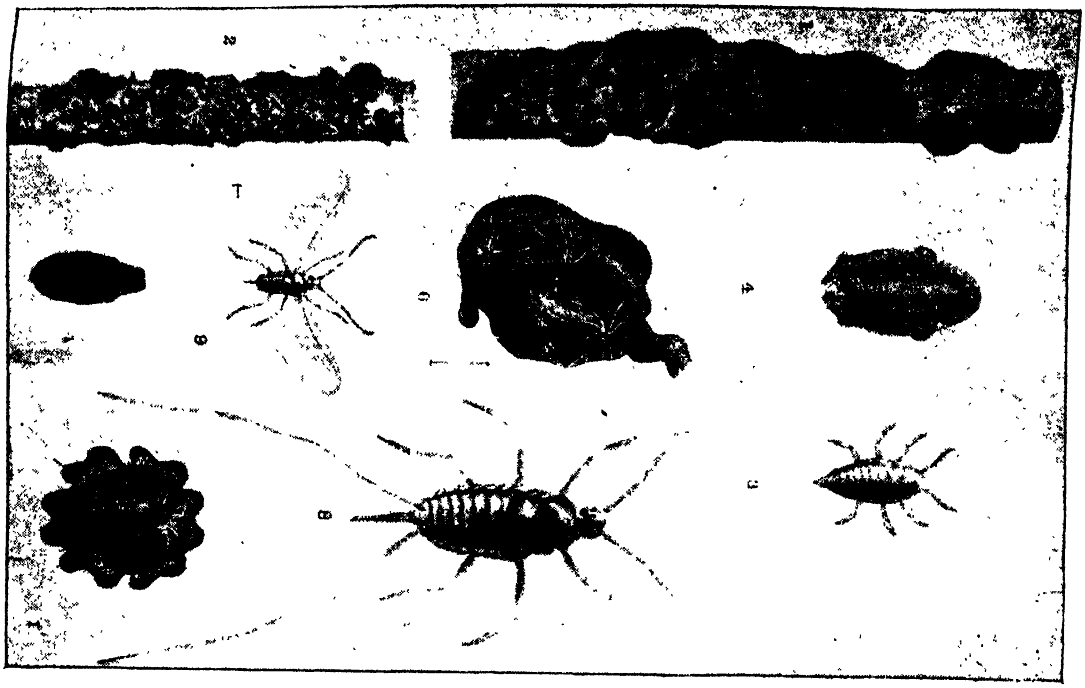
বাঙ্গালীর সহিত লাক্ষার সম্বন্ধ কমিয়া আসিয়াছে বটে, কিন্তু এখনও উঠিয়া যায় নাই। এখনও সহরাঞ্চলে না হইলেও পাড়াগাঁয়ের অনেক স্থলে বাঙ্গালীর অন্তঃপুরে আলতার চলন আছে এবং আলতা লাক্ষাকীটের দেহজাত উজ্জ্বল রক্তবর্ণে রঞ্জিত তুলাখণ্ড ব্যতীত আর কিছুই নহে। লাক্ষাকীট হইতে দুইটি প্রধান দ্রব্য পাওয়া যায়:—রং (lac-dye) ও রজন (lac-resin)। ভারতই এই কীটের জন্মভূমি; শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া শুধু রঙ্গের জন্যই লাক্ষাচাষ হইত। অথর্ব্ববেদ হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্ত্তী সময়ের নানা সংস্কৃত গ্রন্থে লাক্ষার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। মহাভারতে পাণ্ডবগণের উচ্ছেদসাধনের জন্য যে জতুগৃহ রচিত হইয়াছিল, তাহার উপাদানের মধ্যে লাক্ষা ছিল বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু গালার ব্যবহার সে কালে ছিল কি না সন্দেহ। রং প্রস্তুতের কালে রজন গৌণ পদার্থ (bye product) বলিয়াই বিবেচিত হইত এবং উহা কোন কাযে আসিত না। এখন তাহার ঠিক বিপরীত অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। এনিলিন্ রঙ্গের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লাক্ষা রঙ্গের কাটতি আর নাই। বর্ত্তমানে রজন অর্থাৎ গালার জন্যই লাক্ষাচাষ হইয়া থাকে; কার্য্যতঃ প্রায় সমস্ত রঙ্গই ফেলিয়া দেওয়া হয়। পাথুরে কয়লার আলকাতরা হইতে নানাবিধ রং আবিষ্কারের সমসাময়িক কালে গালার বিবিধ প্রকার শিল্পে প্রয়োগ-প্রথাও যদি আবিষ্কৃত না হইত, তাহা হইলে এত দিনে বোধ হয় লাক্ষাচাষ উঠিয়া যাইত।

লাক্ষা-কীটের প্রসার

ভারত ব্যতীত পৃথিবীর অন্য স্থানে লাক্ষা কীট কমই দেখা যায়। শ্যাম, ক্যাম্বোডিয়া, আনাম ও ইন্দো চীনে অল্পবিস্তর লাক্ষা জন্মে। কিন্তু জাপান, ফার্ম্মোজা, জর্ম্মণ পূর্ব্ব আফ্রিকা, মিশর, উগাণ্ডা, ট্রান্সভাল ও দক্ষিণপশ্চিম চীনে লাক্ষাকীট প্রবর্ত্তনের যে চেষ্টা হইয়াছে, তাহাতে কোন ফল হয় নাই। বস্তুতঃ পৃথিবীর বাণিজ্যের গালা ভারত হইতেই সরবরাহ হয়। এতদ্দেশের অধিকাংশ স্থানেই লাক্ষা উৎপাদিত হয় অথবা হইতে পারে। উৎপাদনের কেন্দ্রগুলিকে চারিটি মূল শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারা যায়: (১) মধ্যভারত, ছোটনাগপুর, উড়িষ্যা, বাঙ্গালা, যুক্তপ্রদেশ, বেরার, ছত্রিশগড় ও নাগপুর। এই সকল স্থানের লাক্ষা কুসুম ও পলাশ হইতে উৎপন্ন। (২) সিন্ধুপ্রদেশ; এখানে বাবলাই কীটপোষণবৃক্ষ। (৩) উত্তর ব্রহ্ম ও শানরাজ্য (অশ্বত্থ ও পলাশের লাক্ষা)। (৪) আসাম: কামরূপ, গোয়ালপাড়া ও নওগাঁ জিলায় এবং খাসিয়া, জৈন্তিয়া ও গারো পাহাড়ে অশ্বত্থ ও অরহর গাছে যথেষ্ট পরিমাণে লাক্ষা জন্মে। বর্ত্তমানখণ্ডিত বাঙ্গালায় লাক্ষাচাষ বড় বেশী নাই। মালদহ ও রংপুর জিলায় লাক্ষা কম। মেদিনীপুর ও বীরভূমে তদপেক্ষা কিছু অধিক। কেবলমাত্র বাঁকুড়া ও মুর্শিদাবাদ জিলাতেই ব্যবসায়িক হিসাবে লাক্ষা উৎপাদিত হইয়া থাকে।

কীটের জীবন-বৃত্তান্ত

লাক্ষাকীটের বৈজ্ঞানিক নাম Tachardia lacca, Kerr; ইহার একাধিক জাতি থাকা খুবই সম্ভবপর। অন্ততঃ দেহ-বিনিঃসৃত পুরু অথবা পাতলা রজনস্তরের হিসাবে দুইটি জাতি যে আছে, তাহা সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। লাক্ষাযুক্ত কোন উদ্ভিদের একটি ডাল লইয়া দেখিলে কতিপয় রজনময় বিন্দু দৃষ্ট হইবে। এইগুলি ডিমযুক্ত স্ত্রী-কীট। ডিম ফুটিলে উহা হইতে রক্তবর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ($\frac{১}{২৫}$ ইঞ্চ) কীড়া বাহির হয়। বৃক্ষগাত্রে ১৫-২০ ঘণ্টা বিচরণ করিয়া কোমল শাখাসমূহে কীড়াগুলি অবশেষে আপনাদিগকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে। একবার বসিয়া



(১) বীজযুক্ত শাখা ; (২) রোগদুষ্ট বীজযুক্ত শাখা ; (৩) নবীন লাক্ষা-কীট ; (৪) প্রবীণ স্ত্রী-কীট ;
(৫) স্ত্রী-কোষ হইতে কীড়া বাহির হইতেছে (৬) অপক্ষ পুংকীট ; (৭) সপক্ষ পুংকীট

গেলে আর উহাদিগকে স্থানান্তরিত করা যায় না। বৃক্ষের রস শোষণ করিয়া কীড়াগুলি ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হইতে থাকে এবং পরিপুষ্টির সহিত তাহাদিগের শরীরের চতুর্দ্দিকে রজন ও মোমের আবরণ জমিতে থাকে। স্ত্রী-কীট এই আবরণের মধ্যে সমস্ত জীবন অতিবাহিত করে, কিন্তু প্রায় তিন মাসের মধ্যে পুং-কীট বাহির হইয়া আইসে ও স্ত্রী-কীটগুলির উপর বিচরণ করিয়া তাহাদের গর্ভাধান করে। পুংকীট সপক্ষ অথবা অপক্ষ উভয় প্রকারেরই হইতে পারে। পুং ও স্ত্রী-কীটের আবরণ-কোষের মধ্যে পার্থক্য এই যে, পুং-কোষ ঈষৎ দীর্ঘাকার এবং সম্মুখে ২টি ছিদ্রযুক্ত। স্ত্রী-কোষ বৃত্তাকার এবং ইহার সম্মুখে ২টি ও পশ্চাতে ১টি ছিদ্র। গর্ভাধানের পর পুং-কীটগুলি অল্পদিনই বাঁচে। কিন্তু এই সময় হইতে স্ত্রী-কীট দ্রুতগতিতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে; শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি, বিশেষতঃ মোমযুক্ত শুঁয়াগুলি এত বাড়ে যে, কীটযুক্ত ডালসমূহ দূর হইতে শ্বেতাভ দেখায়। সাধারণ অবস্থায় জ্যৈষ্ঠের স্ত্রী-কীটের সাড়ে ৩ মাস ও কার্ত্তিকের কীটের সাড়ে ৮ মাস পরিপুষ্টির সময়। এই সময়ের শেষ ভাগে স্ত্রী-কীট ডিম্ব প্রসব করে। ডিম্ব প্রসব করিতে আরম্ভ করিলেই উহার শরীর ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইয়া আইসে। ডিম্ব হইতে কীড়া বাহির হইবার তিন সপ্তাহ আগেই স্ত্রী-কীট আহারে বিরত হয়। কীড়া আপনার জননীর উদর বিদীর্ণ করিয়া বহির্গত হয়। এইরূপে সমস্ত বৎসরে লাক্ষাকীট দুই বার উৎপন্ন হয়। সাধারণতঃ প্রত্যেক বংশেই পুং অপেক্ষা স্ত্রী-কীটের সংখ্যা অনেক অধিক, অনুপাত ১ : ৫০০০। কিন্তু সময় সময় পুং-কীটের সংখ্যাধিক্য দেখা যায়; সেরূপ অবস্থায় লাক্ষা ভাল হয় না। এইরূপ সংখ্যার তারতম্য হইবার কারণ কি, তাহা এ পর্য্যন্ত সঠিক জানা যায় নাই। এ স্থলে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করা দরকার। যে গাছে অধিক দিন লাক্ষাচাষ হইতেছে, সে গাছে নানা জাতীয় পিপীলিকা দেখা দেয়। গর্ভাধানের পর স্ত্রী-কীট যখন প্রভূত পরিমাণে উদ্ভিদ্‌-রস শোষণ করিতে থাকে, তখন উহার শরীর হইতে এক প্রকার মধু ক্ষরিত হয়। পিপীলিকারা ঐ মিষ্ট পদার্থের লোভেই আইসে। কিন্তু লাক্ষা-কীটের অভ্যাস—উহারা একত্র দলবদ্ধ হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, স্ত্রী-কীটের গাত্রে তিনটি মোমযুক্ত শুঁয়া আছে। পিপীলিকারা যাতায়াত করিতে করিতে উক্ত শুঁয়াগুলি ভাঙ্গিয়া গিয়া কীটের শরীরে বায়ুপ্রবেশ-পথ রুদ্ধ করে। স্ত্রী-কীটরা চলচ্ছক্তিরহিত বলিয়া কোষ হইতে বাহির হইতে পারে না। ফলে উহারা দম আটকাইয়া মরিয়া যায়। সেই জন্য পোষণ-বৃক্ষে (host tree) অধিক পিপীলিকা দেখিলেই তাহার প্রতীকার করা প্রয়োজন।

পোষণ বৃক্ষাবলী

ভারতের নানা স্থানে নানা প্রকার বৃক্ষে লাক্ষা-কীট চাষ হয়। তন্মধ্যে কুসুম, বাবলা, পলাশ, কুল ও অরহরই প্রধান। অশ্বত্থ, বট, পাকুড়, যজ্ঞ ও ঘোষ ডুমুর গাছেও কতিপয় স্থানে, বিশেষতঃ আসামে লাক্ষা হয়। জঙ্গলের অন্যান্য পাদপের মধ্যে শাল ও শিরীষে লাক্ষা হইতে দেখা গিয়াছে। বাগানের যে সমস্ত ছোট বড় উদ্ভিদে লাক্ষা-কীট পরিপুষ্ট হইতে পারে, তন্মধ্যে আম, লিচু, আতা, নোনা, গোলাপ, ডালিম, ফলসা ও অশোক উল্লেখযোগ্য। পোষক তরুর হিসাবে উৎপাদিত লাক্ষার তারতম্য হয়। কুসুমগাছের লাক্ষা সর্ব্বোৎকৃষ্ট। পশ্চিম-বঙ্গে কুসুমগাছ বিরল নহে। যে পাকড়া বীজের তৈল সরিষার তৈলে ভেজাল দেওয়ার জন্য কলিকাতায় কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বিস্তর আন্দোলন চলিয়াছিল, তাহা এই কুসুমগাছের ফল। দুঃখের বিষয় যে, এ পর্য্যন্ত যে সকল গাছে লাক্ষা জন্মে, সেগুলির উপযুক্ত ভাবে চাষের জন্য কোন চেষ্টাই হয় নাই। অযত্ন-জাত বন-জঙ্গলের গাছ লইয়াই লাক্ষা-জনন চলিয়া আসিতেছে। তাহার ফলে এক দিকে কীটের রঞ্জন-নিঃসরণক্ষমতা যেমন বাড়িতেছে না, অন্য দিকে তেমনই গাছগুলিও অধোগতি প্রাপ্ত হইতেছে। উত্তমরূপে চাষ-দেওয়া ও ছাঁটা গাছ সতেজে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়; কীটও সেরূপ স্থলে যথেষ্ট খাদ্য পাইয়া সুপুষ্ট হয়। সেই জন্য পোষকবৃক্ষের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

আমরা কুসুম গাছের কথা বলিতেছিলাম। কুসুম নদী-নালার নিকটবর্ত্তী এঁটেল জমীতে ভাল জন্মে। বাগিচা করিতে হইলে স্বতন্ত্র স্থানে চারা জন্মাইয়া উহা ২।৩ ফুট উচ্চ হইলে ক্ষেতে বসাইতে পারা যায়। ১৭।১৮ বৎসর পূর্ব্বে কুসুমগাছে লাক্ষাবীজ ছাড়া ঠিক নহে; প্রত্যেক দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় বৎসরে কুসুমে অধিক পরিমাণে লাক্ষা জন্মে। পলাশফুল প্রভৃতির লাক্ষা হইতে কুসুমের লাক্ষা মণ প্রতি ৫—১০ টাকা অধিক দরে বিক্রয় হয়। অন্যান্য পোষক তরুর তুলনায় লাক্ষা উৎপাদনে পলাশেরই কিন্তু প্রাধান্য অধিক পলাশের লাক্ষায় রঞ্জনের অনুপাতে রঙ্গের মাত্রা অধিক বলিয়া ইহার নাম রঙ্গীণ লাখ। কুসুম অপেক্ষা অপকৃষ্ট হইলেও অধিকাংশ বাণিজ্যের লাক্ষা পলাশ হইতেই প্রাপ্ত। নীরেস মাটীতেও পলাশ জন্মে। প্রত্যেক দিকে ২০ ফুট তফাতে গাছ বসাইলে পলাশ পূর্ণ পরিপুষ্ট হইতে পারে। ১০ বৎসরের গাছে লাক্ষা পালন করিতে পারা যায়। বাঙ্গালার স্থানে স্থানে, বিশেষতঃ মুর্শিদাবাদ জিলায় ধানক্ষেতের আইলে কুলগাছে রোপণ করা হয়। বাগিচায় বসাইতে হইলে উভয় দিকে ৩০ ফুট ব্যবধানে গাছ বসাইতে পারা যায়। এক বৎসরের চারা ক্ষেত্রে রোপণ করিতে হয় এবং গাছ ৬ বৎসরের হইলে তাহা কীট-পোষণের উপযুক্ত হইয়া থাকে। বাবলার চাষ সিন্ধুদেশেই অধিক। অরহর গাছে কেবল আসাম অঞ্চলেই লাক্ষা উৎপাদিত হয়। এই গাছগুলি ৩ ৪ বৎসর বাঁচিয়া থাকে। যদি লাক্ষাচাষের জন্য নূতন করিয়া বাগিচা করা হয়, তাহা হইলে ইহাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে,অত্যন্ত গরম হাওয়ায় লাক্ষাকীটগুলি মরিয়া যায়। সেই জন্য যে দিক হইতে গরম হাওয়া চলে, সেই দিকে করঞ্জা, নিম, আকাশ-নিম, শিশু প্রভৃতি দ্রুত বৃদ্ধিশীল গাছ অথবা মহুয়া গাছের অন্তরাল রাখা ভাল। বাগিচা রচনা দ্বারা শুধুই যে লাক্ষা-চাষের সুবিধা হয়, তাহা নহে। পশ্চিমবঙ্গের অনেক স্থানেই কুসুম, পলাশ, কুল প্রভৃতির বাগিচার দ্বারা পতিত জমী উদ্ধার, মৃত্তিকাক্ষয় নিবারণ ও বৃষ্টির জল সংস্থানের কার্যও হইতে পারে। বাগিচার গাছগুলি তিনটি ক্ষেত্রে বিভক্ত করিয়া মাঝে বড় রাস্তা রাখিলে ভাল হয়। তাহাতে উত্তম লাক্ষাকীট জননের ও এক একটি ক্ষেত্রের গাছ-গুলিকে এক এক বৎসর বিশ্রাম দেওয়ার অবসর থাকে। গাছের তলায় জমীতে অনায়াসে কলাই, খেসারি, বরবটি প্রভৃতি দাইল অথবা আদা হলুদ জন্মাইতে পারা যায়।

চাষ-প্রণালী

বৈশাখে ও কার্ত্তিকে, বৎসরে দুইবার লাক্ষা ফসল পাওয়া যায়। চাষ করিবার পূর্ব্বেই পোষক তরু নির্ব্বাচন করিয়া

রাখা ভাল। নির্ব্বাচিত গাছ কুল হইলে বৈশাখী চাষের জন্য ফাল্গুনে ও কার্ত্তিকী চাষের জন্য আষাঢ়ে তাহার ডালপালা ছাঁটিয়া দিতে হয়। কুসুম ও পলাশ ছাঁটার প্রয়োজন হয় না। লাক্ষা ফসল সংগ্রহের সময় যে শাখা-প্রশাখাদি কাটা হয়, তাহাতেই ছাঁটার কায হইয়া যায়। বড় ও পুরাতন কুল গাছ হইলে একবার ভাল করিয়া ছাঁটাইয়া দিলে ৭।৮ বৎসর চলে। আষাঢ় অথবা কার্ত্তিকে নূতন পল্লব বাহির হইলেই গাছ লাক্ষাকীট পালনের উপযুক্ত হয়। চাষের প্রধান প্রয়োজন উৎকৃষ্ট বীজ। বীজলাখের (Brood lac) আঁটি লাক্ষা উৎপাদনকেন্দ্র সমূহের বাজারে পাওয়া যায়। প্রায় ১ ফুট পরিমিত কীট-যুক্ত ডাল এক এক আঁটিতে ন্যূনাধিক ৫০টি থাকে। সময়বিশেষে বীজলাখ ৩-৫ টাকা সের দরে বিক্রয় হয়। বীজলাখ সংগ্রহের সময় দেখা দরকার যে-তখনও কীট বাহির হইতে দেরী আছে; সে গাছে বসাইতে হইবে. বীজ যেন সেই গাছের, অর্থাৎ কুলের বীজ কুলে, পলাশের বীজ পলাশে ইত্যাদি এবং বীজ যথাসম্ভব সুপুষ্ট ও রোগশূন্য হয়। (রোগহীন ও রোগযুক্ত বীজদণ্ড ১ম চিত্রে দেখান হইল)। যদি পোকা বাহির হইবার বেশী দেরী থাকে, তবে ঘরের ভিতর শিকায় তুলিয়া রাখিতে পারা যায়। ২।১ দিন মাত্র দেরী থাকিলে বারান্দায় বাঁশের মাচানের উপর পরস্পর অসংলগ্নভাবে রাখাই ভাল। বীজলাখ হইতে ২।১টি পোকা বাহির হইতে দেখিলেই উহা সঙ্গে সঙ্গে গাছে লাগান দরকার। কলার খোলার ফেঁসো, পাট অথবা শণ দিয়া বীজদণ্ডগুলি আলগাভাবে গাছের সহিত সংলগ্ন করিয়া দেওয়া দরকার। যাহাতে বিষয়ে সতর্ক হওয়া দরকার। গাছ বড় হইলে বাঁশের প্রস্তুত আধারে ১০।১৫টি বীজদণ্ড রাখিয়া উক্ত আধার এমনভাবে বৃক্ষের শাখাপ্রশাখায় ঝুলাইতে হইবে যে, কীট অনায়াসে নূতন ডালে চলিয়া আসিতে পারে। পলাশ গাছ হইলে এক গাছ হইতে ডাল কাটিয়া, ২।১ দিন রৌদ্রে দিয়া অন্য গাছ লাগাইতে পারা যায়। ১ ফুট বীজদণ্ডে যে পোকা থাকে, তাহাতে সাধারণতঃ ১০ ফুট শাখার পক্ষে যথেষ্ট হয়। যখন নীচ হইতে দেখা যাইবে যে, কোন শাখা কীটাবৃত হইয়া রক্তাভ হইয়াছে, তখন বীজদণ্ড অন্য শাখায় স্থানান্তরিত করিতে হইবে। কোন শাখায় অর্দ্ধেকের অধিক পরিমিত অংশও কীটাবৃত হইতে দেওয়া ঠিক নহে। কারণ, বীজের পরিমাণ অধিক হইলে শাখা ঐ সমুদায় শোষণ করিতে পারে না ও ফসল খারাপ হয়। অনতিকালের মধ্যেই কীটগুলি স্থায়িভাবে শাখায় বসিয়া যায়। প্রথম বার চাষ করিতে হইলে কার্ত্তিকেই বীজ লাগান ভাল। তাহা হইলে ঝড় বৃষ্টির দ্বারা কীট নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে না। আষাঢ় মাসে বীজ দিতে হইলে বৃষ্টির আশঙ্কা থাকিলে দিতে নাই। কোষ বাহির হইয়া গেলে বীজদণ্ডগুলি নামাইয়া লইয়া তাহা হইতে লাক্ষা ছাড়াইয়া লইতে পারা যায়। একবার কীট ঠিক হইয়া বসিয়া গেলে তাহার পরে ফসল কাটিবার সময় পর্য্যন্ত লাক্ষাচাষে আর বিশেষ কিছু করিবার নাই।



বীজ সংলগ্ন করিবার জন্য বাঁশের আধার।

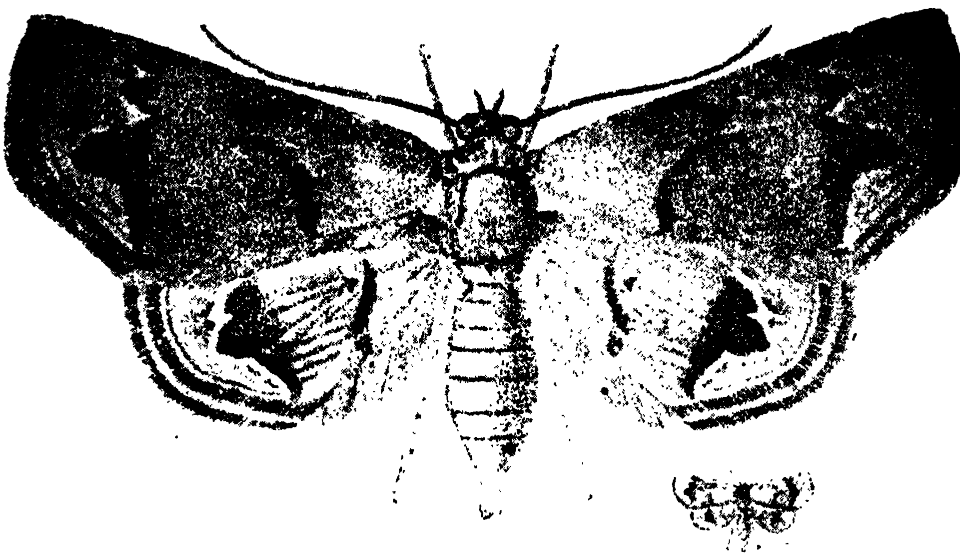
যেখানে বীজের জন্য লাক্ষা রাখিবার দরকার নাই, সেরূপ স্থলে ফসল কাটিবার সময় ইহা দেখা উচিত যে, কোষসমূহ হইতে কীড়া বাহির হইয়া গিয়াছে। সাধারণতঃ কিন্তু

হইয়া পড়ে, অথচ এ দিকে দৃষ্টি না থাকার জন্য অসংখ্য কীট অকারণে নষ্ট হয়। কীড়া বাহির হইবার সঠিক সময় নির্দ্ধারণ কেবল অণুবীক্ষণ যন্ত্রাদির সাহায্যেই হইতে পারে। কিন্তু নির্দ্দিষ্ট অঞ্চলে কীড়া প্রায় নির্দ্দিষ্ট সময়েই বাহির হয়। তাহা হইতে বহির্গমনের সময় মোটামুটি ঠিক করা কঠিন নহে। বাঙ্গালা ও নিকটবর্ত্তী স্থানে বৎসরে দুইবার কীড়া বাহির হইবার সময় নিম্নরূপ :—

সাঁওতাল পরগণা,	(কুসুম)	জ্যৈষ্ঠ—কার্ত্তিক—পৌষ।
ঐ	(পলাশ ও কুল)	চৈত্র—বৈশাখ,ভাদ্র—আশ্বিন।
মুর্শিদাবাদ	(কুল)	আষাঢ়—আশ্বিন।
বীরভূম	ঐ	চৈত্র—বৈশাখ—আশ্বিন।
আসাম	(অরহর)	জ্যৈষ্ঠ—কার্ত্তিক।

পড়িয়া যায়। কার্ত্তিকী ফসল হইতে বৈশাখী ফসলেই রজনের পরিমাণ অধিক। বাঙ্গালার স্থানে স্থানে কার্ত্তিকী ফসল কেবল বীজের জন্য রাখা হয়।

একই গাছ হইতে বৎসরে ২ বার লাক্ষা ফসল পাওয়া সম্ভবপর হইলেও তাহা লওয়া ঠিক নহে। এক গাছের বীজ অন্য গাছে দেওয়াই ভাল। আমরা পূর্ব্বে যে বাগিচায় পোষক তরুসমূহকে তিনটি ক্ষেত্রে বিভক্ত করিতে বলিয়াছি, তাহার উদ্দেশ্য এই যে, পর্য্যায়ক্রমে এক ক্ষেত্রের গাছ হইতে বীজ লইয়া অন্য ক্ষেত্রের গাছে দিলে তৃতীয় ক্ষেত্রের গাছগুলি ১ বৎসর কীটপালন হইতে বিরত থাকিয়া সতেজ হইয়া উঠিতে পারে। বাঁকুড়া ও সাঁওতাল পরগণায় অনেক সময় এক গাছেই দুই ফসল জন্মিতে দেওয়া

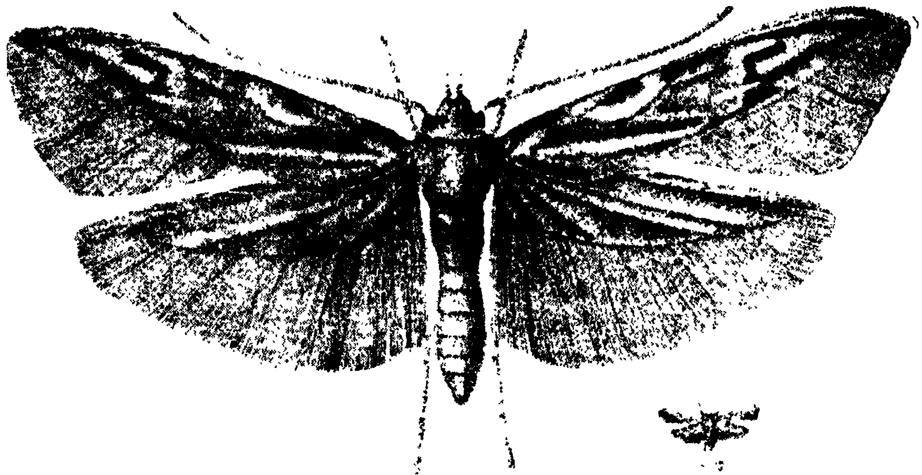


শত্রুকীট (১)

বীজের জন্য ডাল রাখিতে হইলে অন্ততঃ বীজবহির্গমনের ২ সপ্তাহ আগে কাটা দরকার। একবার পোকা দেখা দিলে ৫ সপ্তাহ ধরিয়া উহারা বাহির হইতে পারে। সেই জন্য প্রথম কীটবহির্গমনের পর ডাল কাটিতে অথবা বীজদণ্ড-পোষক তরু হইতে নামাইয়া লইতে উক্ত সময় অপেক্ষা করা উচিত। পরে লাক্ষাযুক্ত ডাল আনিয়া রৌদ্রে দিয়া বেশ করিয়া শুষ্ক করিয়া লইয়া লাক্ষা বাহির করিয়া লওয়া হয়। কুলের লাক্ষা ছুরী দিয়া চাঁচিয়া লওয়াই প্রশস্ত। কিন্তু কুসুম ও পলাশ ডাল হাতে মোচড়াইলেই রজন ভাঙ্গিয়া

হয়। তাহাতে ধ্বংসকারী কীটের উপদ্রব বিশেষ বৃদ্ধি পায়। লাক্ষার শত্রুর মধ্যে দুইটি প্রধান :— ১ম Eublema amabilis; ইহার পক্ষ চা-খড়ির ন্যায় শ্বেতবর্ণ; সম্মুখের দুইটি পাখায় ধূসরবর্ণের একটি দাগ আছে। কীড়া অবস্থায় এই কীট বহুসংখ্যক স্ত্রী-লাক্ষাকীট খাইয়া ফেলে। বৎসরে ২৩ বার ইহারা সন্তান প্রসব করে। বঙ্গ ও বিহারে এই পোকার প্রাদুর্ভাব খুব বেশী। ইহার অত্যাচার নিবারণ করিতে পারিলে লাক্ষা উৎপাদন দ্বিগুণ মাত্রায় বৃদ্ধি পাইতে পারে। ২য় Holcocera pulvera

এই কীট প্রধানতঃ মৃত লাক্ষাকীট ভক্ষণ করে বটে, কিন্তু তাহা করিতে গিয়া জীবন্ত কীটের শরীরের ভিতর দিয়া সুড়ঙ্গ করে। বাঙ্গালার মধ্যে মুর্শিদাবাদ জিলায় ইহা দেখা যায়।



শত্রুকীট (০)

শাখা হইতে ছাড়ান লাক্ষাকে থাম লাখ্ (Stick lac) বলে। থাম-লাখ রৌদ্রে দেওয়া অনুচিত; তাহাতে সন্নিহিত কোষগুলি উত্তাপে একত্র জমিয়া গিয়া লাক্ষা খারাপ হয় এবং পরে তাহা হইতে রং বাহির করিয়া দিতে বেশী বেগ পাইতে হয়। থাম-লাখ বস্তাবন্দি করিয়া রাখিলেও উত্তাপ ও উৎসেচন ক্রিয়া দ্বারা লাক্ষা খারাপ হইয়া যায়। যদি ডাল হইতে লাক্ষা সঙ্গে সঙ্গে ছাড়ান না হয়, তাহা হইলে শক্ত হইয়া যায়; পরে জাঁতা দিয়া মোটা মোটা দানারূপে ভাঙ্গিয়া অবিলম্বে ধুইয়া লইতে হয়। তদ্দ্বারা পূর্ব্বোক্ত দুই জাতীয় কীটের ডিম ফুটিয়া ভবিষ্যতে আর লাক্ষার অনিষ্ট করিতে পারে না। থাম-লাখ কালবিলম্ব না করিয়া বিক্রয় করাই ভাল। যদি কোন কারণে তাহা না হইয়া উঠে, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দানাগুলি রং নিঃশেষ না হওয়া পর্য্যন্ত বেশ করিয়া জলে ধুইয়া, শুষ্ক করিয়া গুদামে রাখিতে পারা যায়। এইরূপ ভাবে প্রস্তুত লাক্ষাকে দানা-লাখ (Seed or grain lac) বলে। এক মণ থাম-লাখ হইতে সাড়ে ১৮ সের দানালাখ ও ৪ মণ রঙ্গের জল পাওয়া যায়। রঙ্গের কোন প্রয়োজন না থাকিলে উহা ক্ষেত্রে ঢালাইয়া দিয়া সাররূপে ব্যবহার করাই সঙ্গত। কীট-দেহাবশেষ হইতে প্রাপ্ত বলিয়া ইহা নাইট্রোজেন-প্রধান সাররূপে পরিগণিত হয়। দানালাখ উত্তমরূপে ঝাড়িয়া ধূলা, আবর্জ্জনা ও কাষ্ঠাংশ মুক্ত হইলে উহা 'বিউলি' লাখে পরিণত হয়। ব্যাপারীগণ এই বিউলি লাখকে ভিত্তি করিয়া দানালাখের দর নির্দ্ধারণ করিয়া ক্রয় করে। ১ বিঘা পলাশের বাগিচায় (৪৪টি গাছ) ১॥—২ মণ থাম-লাখ পাওয়া যাইতে পারে। বীজ সমেত চাষের খরচ বিঘা প্রতি ১২—১৪ টাকা এবং থাম-লাখের সর্ব্ব নিম্ন মূল্য মণকরা ৩০ টাকা। তাহা হইলেই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, বিঘা প্রতি অন্ততঃ ৩০ টাকা লাভ হওয়া সম্ভব। বর্ত্তমান বাজার দরে চাষার লাভ দ্বিগুণ হওয়া উচিত। কিন্তু ব্যাপারী ও মহাজনদিগের অনুগ্রহে তাহা হয় না। এ স্থলে ইহাও বলা দরকার যে, চাষীদিগেরও দোষ আছে। স্থানে স্থানে লাক্ষা উৎপাদনকারিগণ দানালাখের সহিত বালি, কাল লবণ, বাবলার ছাল ও মহুয়াবীজগুঁড়া মিশাইয়া ওজন বাড়াইবার চেষ্টা করে। তাহাতে সমস্ত লাক্ষা-বাণিজ্যের যে যথেষ্ট ক্ষতি হয়, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

গালা প্রস্তুত

সাধারণ চাষীর পক্ষে থাম অথবা দানালাখ মহাজনকে বিক্রয় করিতে পারিলেই তাহার কায মিটিয়া গেল। তাহার পর যাহা কিছু কার্য্য, লাক্ষাকারখানায় হইয়া থাকে। যে সকল প্রণালীতে নানা শ্রেণীর লাক্ষা প্রস্তুত হইয়া বিদেশে চালান যায়, তৎসমুদায় বর্ণনা করিবার স্থান বর্ত্তমান প্রবন্ধে নাই। স্থূলতঃ ২।৪ কথা বলিতে পারা যায় মাত্র। কারখানায় থাম ও দানা, উভয় প্রকারেরই লাক্ষা ক্রয় করা হয়। থাম-লাখ হইলে তাহাকে প্রথমে গুঁড়া করিয়া চালিয়া লওয়া হয়। তৎপরে রঞ্জক পদার্থ বাহির করিবার জন্য চূর্ণ গালা ধৌত করা হইয়া থাকে। বড় বড় পাত্রের টবে

১৮—২৪ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিবার পর পুনঃ পুনঃ জল দিয়া ও উত্তমরূপে নাড়িয়া চাড়িয়া যতক্ষণ না সাদা জল বাহির হয়, ততক্ষণ ধোয়াই নিয়ম। ১ মণ খাম-গালার সহিত ৪ ছটাক কাপড়কাচা সোডা মিলাইয়া দিলে দানালাখের সমস্ত রং বাহির হইয়া গিয়া উহা সুন্দর সোনালী বর্ণে দাঁড়ায়। পরে ঐ লাখ শুকাইয়া গুঁড়া করিয়া তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয়,— বড় দানা, ছোট দানা ও ধুলা। দানালাখের সহিত অতঃপর প্রয়োজনমত দুইটি পদার্থ মিশ্রিত করা হয়, হরিতাল ও চিড়-রজন (Pine rasin); শতকরা ২।৩ ভাগ চিড়-রজন দিলে রঙ্গের ঔৎকর্ষ সাধিত হয়। রজন দেওয়ায় লাখ অপেক্ষাকৃত কম উত্তাপে গলিয়া যায়। শতকরা ১।২ ভাগ রজন দেওয়া দোষ বলিয়া ধরা হয় না; কিন্তু তাহার অধিক হইলেই ব্যবসায়ীরা বাট্টা কাটিয়া লয় সকল প্রকার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত লাক্ষায়ও হরিতাল দেওয়া চলে না—যেমন চোকোলেটের আবরণী গালায়। যাহা হউক, এইপ্রকার গালা-মিশ্রণ প্রস্তুত করিয়া এক বিশেষ রকমের থলে ভর্ত্তি করা হয়। থলেগুলি ২ পর্দ্দা জিনকাপড়ে প্রস্তুত। ১০।১১ গজ লম্বা ও ২।৩ ইঞ্চি ব্যাসযুক্ত। প্রত্যেকটিতে প্রায় আধমণ লাক্ষা-মিশ্রণ ধরে। লম্বা লম্বা ভাটিতে কাঠের কয়লার আগুন জ্বালাইয়া তাহার সম্মুখে এইপ্রকার থলে ধরিয়া লাক্ষা পাক করা হয়; গালা গলিয়া নিম্নে বিশেষ আধারে অথবা মসৃণ পাতরে পড়িতে থাকে। ক্রমশঃ ক্রমশঃ পাক দেওয়াতে সমস্ত দ্রবণীয় গালা বাহির হইয়া আইসে। ঠাণ্ডা না হইতে হইতেই বিভিন্ন উপায়ে দ্রব লাক্ষাকে টানিয়া চাদরের আকারে পরিণত করা হয়। ইহাই চাপড়া লাখ (Shellac) ও বাণিজ্যের দ্রব্য। এক মণ বিউলি লাখ হইতে আধমণ চাপড়া লাখ পাওয়া যায় এবং উহা প্রস্তুত করিবার খরচ মণপ্রতি প্রায় ১৫ টাকা। বিদেশে চালান দিবার জন্য চাপড়া গালা ২ মণ করিয়া বাক্সবন্দী করা হয়।

লাক্ষার ব্যবহার

বর্ত্তমান জগতে লাক্ষা নানা প্রকার কার্য্যে ব্যবহৃত হইতেছে। এতদ্দেশে ইহার ব্যবহার অধিক না হইলেও কতকগুলি কাযে লাক্ষার খুবই চলন আছে। চুড়ি ও খেলানা প্রস্তুতে, কাঠের ও ধাতুর কারুকার্য্যে, রং ও বার্ণিসে, নানাবিধ দ্রব্য জোড়া দিতে ও স্বর্ণকারের কাযে কতক পরিমাণ গালা লাগে। গ্রামোফোন রেকর্ড ও মাইকানাইট প্রস্তুতেও আজকাল দেশমধ্যে নিতান্ত সামান্য পরিমাণ গালা কাটিতেছে না। মার্কিণে বার্ণিস, লিথোগ্রাফ কালি ও বৈদ্যুতিক শিল্পে ব্যবহৃত হইবার জন্য প্রচুর পরিমাণে লাক্ষা ভারত হইতে যায়। যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জামের মধ্যে বিমানপোত ও বিস্ফোরক গোলা বার্ণিসে ও স্রাপনেল্ গোলা ভর্ত্তি করিতে লাক্ষার ব্যবহার বৃদ্ধি পাইতেছে। এতদ্ভিন্ন জাহাজের তলায় ইস্পাতের পাতের উপর ও সামুদ্রিক তড়িৎবার্ত্তাবহ রজ্জুতে (cable) আবরণ দিতে লাক্ষার প্রচলন হইয়াছে। অন্যান্য যে সব ছোট বড় শিল্পে লাক্ষা প্রয়োজন হয়, তন্মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি প্রধান :—মোহরের বাতি, রেশমী হ্যাট, নকল চামড়া, আয়না ও চোকোলেট। আমরা পূর্ব্বে যে মোমের উল্লেখ করিয়াছি, তাহা জুতা পালিশের উৎকৃষ্ট উপাদান।

লাক্ষা-ব্যবসায়

লাক্ষাকীটজাত রং ও রজনের মধ্যে আজকাল কেবল শেষোক্তটিরই কাষ চলে। বিগত তিন বৎসরে (১৯২০-২১, ১৯২১-২২ ও ১৯২২-২৩) যথাক্রমে ৭ কোটি ১৬ লক্ষ ৩০ হাজার ৯ শত ৬৯ টাকা, ৭ কোটি ৫৪ লক্ষ ৯৬ হাজার ৮ শত ৬৫ টাকা ও ৯কোটি ২৭লক্ষ ৯২ হাজার ১শত ১৩ টাকা মূল্যের লাক্ষা রজন রপ্তানী হইয়াছে। পৃথিবীর বাজারে ৩লক্ষ ৫০ হাজার হন্দর চাপড়াগালা আইসে; তাহার শতকরা ৯৭ ভাগেরও অধিক ভারতে উৎপাদিত হয়। অবশিষ্টাংশ শ্যাম ও ইন্দো-চীন হইতে প্রাপ্ত। মিঃ সি, এস, মিশ্র অনুমান করেন যে, ভারতে গড়ে ১৫ কোটি পাউণ্ড (৮২ পাঃ = ১ মণ) খামলাখ জন্মায়; তাহা হইতে ৬ কোটি পাঃ চাপড়ালাখ প্রস্তুত হইতে পারে। কোন্ বৎসর কি পরিমাণ লাক্ষা উৎপাদিত হইবে, তাহার পূর্ব্বাভাস (forecast) না পাওয়ায় লাক্ষা এত অনিশ্চিত ব্যবসায় হইবার কারণ। বিগত কয়েক বৎসরে চাপড়ালাখের দামের ২২ হইতে ২ শত ৮৫ টাকা পর্য্যন্ত উঠতি-পড়তি হইয়াছে। লণ্ডন অথবা নিউইয়র্কে টি, এন নামক বিশেষ শ্রেণীর লাক্ষার নমুনা দেখিয়া তাহার উপর সকল প্রকার লাক্ষার দর নির্দ্ধারণ

করা হয়। টি, এন লাক্ষা ঘোর সোনালি রঙ্গের ও পলাশ হইতে প্রাপ্ত। ভারতের লাক্ষা রপ্তানীর শতকরা ৪২ ভাগ মার্কিণে ও ২৬ ভাগ ইংলণ্ডে যায়; অবশিষ্ট ভাগের খরিদ্দারের মধ্যে জার্ম্মাণী, ফ্রান্স, জাপান, ইতালী ও অষ্ট্রেলিয়া অন্যতম। রপ্তানীর মালের সামান্য পরিমাণ ব্যতীত সমস্তই কলিকাতা বন্দর দিয়া যায় এবং বিদেশীয় বাজারে টি, এন লাক্ষার কাযই সমধিক। লণ্ডনের টি, এন লাক্ষা অপেক্ষা নিউইয়র্কের টি, এন লাক্ষার জন্য কিছু উৎকৃষ্ট মাল প্রয়োজন হয়।

বর্ত্তমান অন্ন-সমস্যার সময় লাক্ষা উৎপাদন সাধারণ চাষীর ও অনেক গ্রাম্য মধ্যবিত্ত লোকের অর্থাভাব মোচনের একটি আংশিক উপায় হইতে পারে। এখন ভারতে যে সকল লোক লাক্ষা সংগ্রহ করিয়া জীবনযাপন করে, তাহাদের সংখ্যা ৮ লক্ষের কম হইবে না। এতদ্ভিন্ন লাক্ষা ব্যবসায়ে সাক্ষাৎ অথবা পরোক্ষভাবে উপকৃত হয়, এরূপ লোকের সংখ্যাও প্রায় ৩ লক্ষ হইবে। কিন্তু লাক্ষা উৎপাদনে ইহাপেক্ষা অনেক বেশী লোকের জীবিকা অর্জ্জনের অবসর আছে। আমরা সেই জন্য শিক্ষিত ব্যক্তিগণকে এই কার্য্যে মনোযোগ দিতে অনুরোধ করি। অন্যান্য কার্য্যের সহিত ইহা অনায়াসে চলিতে পারে; ইহার জন্য স্বতন্ত্র লোকজন রাখা আবশ্যক হয় না।

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত।

জয়ঘণ্টীর আত্মকথা

আমার নাম জয়ঘণ্টী। এই নামটি বাঙ্গালার—কলিকাতা সহরের উদ্যানক বা মালীগণ প্রদত্ত। কিন্তু আমার একটি ইংরাজী বা লাটিন নাম আছে। সেই লাটিন নামটি Rosa Iigantia, কেহ কেহ Rosa Indica নামেও আমাকে অভিহিত করে। আমি রডানিয়া গোলাপ; সুতরাং আমি স্ত্রীজাতীয়া। আমার আদিম বাসস্থান ভারতবর্ষ, কিন্তু কোন কোন বৈজ্ঞানিক বহু অনুসন্ধান পূর্ব্বক স্থির করিয়াছেন যে, চীনদেশই আমার স্বাভাবিক জন্মস্থান। আমি জয়ঘণ্টী হওয়ায় আমার বড় দুঃখ। আমি স্বভাবতঃ অবাধে বর্দ্ধিত হইতে পাই না, একটু বর্দ্ধিত হইলেই কিংবা অল্প বর্দ্ধিত হইবার উপক্রম করিলেই আমাকে সকলে ছাঁটিয়া দেয়; রক্তপাত হয়, সে দিকে কেহই দৃষ্টিপাত করে না। উপরন্তু আমাকে চিরকালই মোট বহন করিতে হয়, সে দুঃখ রাখিবার আমার স্থান নাই! আরও শত শত কি সহস্র সহস্র গোলাপ আছে, তাহারা বড় সুখী, অল্পেই তাহারা কাতর হয়, তাহাদিগের উপর বেশী পীড়ন হইলে তাহারা মরিয়া যায়, এ জন্য তাহাদিগকে স্কন্ধে করিয়া আমাকে থাকিতে হয়, তাহারা সুখে স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করে। তাহারা এতই সুখী বা এতই অলস যে, তাহারা স্ব স্ব খাদ্যপানাদি স্বয়ং আহরণ করিতে সমর্থ নহে, সেই হেতু আমার আশ্রিতকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য আমাকেই খাদ্যাদি আহরণ করিতে হয় এবং আমাকেই তাহা বহন করিয়া তাহাদের শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া দিতে হয়। আমাকে স্বতন্ত্রভাবে কেহ রোপণ করে না—পালন করা ত দূরের কথা। আশ্রিতকে স্কন্ধে লইয়াও আমার নিষ্কৃতি নাই, অপরকে স্কন্ধে করিয়াও যে, আমি একটু হাসিব বা অঙ্গবিস্তার করিব, তাহার যোটি নাই। শাখার উদ্গম দেখিলেই লোক সেই উদ্গমস্থান হইতে পত্রমুকুলটি (leaf-bud) ভাঙ্গিয়া দেয়, কোন কোন সময় তাহাদের অজ্ঞাতসারে যদি বাড়িয়া উঠিতে পাই, আর যদি কেহ অকস্মাৎ দেখিতে পায়, তাহা হইলে বিষম কোলাহল উপস্থিত হয়, অবিলম্বে আমার সে অংশ নির্ম্মমভাবে কর্ত্তিত হয়। আমি অবলা উদ্ভিদমানুষ, কি করিব? নীরবে রসাশ্রুপাত করি, আর স্বীয় অদৃষ্টকে ধিক্কার দিই!

আমার প্রভু একবার আমাকে মুর্শিদাবাদে লইয়া গিয়াছিলেন, সেখানে নওয়াব রৈইসন্নিসা বেগম সাহিবার রমোদ্যানে পুষ্করিণীতটে একটি আশ্রিতকে স্কন্ধে লইয়া রোপিত হইয়াছিলাম। সেখানে পুষ্করিণীর নূতন সারবান মাটীতে স্থান পাইয়া বড়ই আহ্লাদ সহকারে বাস করিতেছিলাম। সার মাটীতে ও পুষ্করিণীতটে স্থান পাইয়া অঙ্গ প্রসারিত করিয়া ফেলিয়াছিলাম। অঙ্গপ্রসারণের প্রথমাবস্থায় কেহ দেখিতে পায় নাই, সুতরাং নিজ স্বভাবানুসারে অমিততেজে সুদীর্ঘ শাখা কয়েকটি প্রসারিত হইয়াছিল। ক্রমে তাহা লোকের দৃষ্টিগোচর হইল; অধিক কি, আমার প্রভুও তাহা দেখিলেন; কিন্তু আমার সম্মুখে কিছু না বলিয়া সর্দার মালীকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন, যেন আমার অঙ্গে কেহ কোনও রূপ আঘাত না করে। এই আশার বাণী

শুনিয়া আমি উল্লসিত প্রাণে কিছু দিন বাড়িতে থাকিলাম। এই সময় হইতে আমার প্রতি মালীগণ বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে লাগিল; আমিও নিঃশঙ্কচিত্তে অবাধে বাড়িতে লাগিলাম। ক্রমে আমার শিরোদেশে পুষ্পাগমের সূচনা দেখিয়া সর্দ্দার আমার প্রভুকে সংবাদ দিল। প্রভু দেখিয়া মালীকে বলিয়া গেলেন যে, আমার গোড়ায় কোনরূপ আগাছা বা বন-জঙ্গল না জন্মে এবং প্রয়োজনমত যেন জলসেচন করে। ক্রমে চৈত্রমাস সমাগত হইল, ফলতঃ আমার পিপাসা বাড়িল, সেই সঙ্গে ভূমিরও রস শুকাইতে লাগিল। মালীরা যথেষ্ট সেবা করিতে লাগিল। চৈত্রমাসের দিন পনর অতিবাহিত না হইতে আমি দুই একটি স্তবক ফুল মস্তকে ধারণ করিলাম। যখন সেই কুঁড়িগুলি প্রস্ফুটিত হইল, তখন আমার প্রভুর আনন্দের আর সীমা রহিল না, তিনি অনেক বন্ধু-বান্ধবকে আনিয়া আমার পরিচয় দিলেন। সে ফুলের তোড়া দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিল এবং কাহারও কাহারও ইচ্ছা হইয়াছিল যে, স্তবকগুলি ভাঙ্গিয়া লইয়া যায়েন, কিন্তু আমার সেবকদিগের উপর আদেশ ছিল যে, সে পুষ্প কেহ না চয়ন করে, কিংবা কেহ না অপহরণ করে। ইতঃপূর্ব্বে আমার প্রভুও জানিতেন না যে, আমি ফুল ধারণ করিতে পারি। এইবার আমার পুষ্পের স্তবক দেখিয়া আমার প্রতি তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা হইল, আমি যে অকিঞ্চিৎকর নহি, ইহা ধারণা হইল। আমারও স্বাতন্ত্র্য আছে, আমারও স্বতন্ত্র স্থান আছে।

অতঃপর আমায় প্রভুর সঙ্গে দ্বারবঙ্গে যাইতে হইল। তথায় যাইয়া দ্বারবঙ্গরাজের রাজনগরস্থ উদ্যানান্তর্গত দুর্গাবাড়ীর আঙ্গিনায় আমি স্থান পাইলাম। পূজাবাড়ীর প্রাঙ্গণটি সুপ্রশস্ত, তাহার চতুঃপার্শ্ব সমুচ্চ প্রাচীর-বেষ্টিত। উক্ত প্রাঙ্গণের পশ্চিমদিকস্থ প্রাচীরের পাদদেশে আমি রোপিত হইলাম,—তখন আমার বয়ঃক্রম ৫।৬ মাস মাত্র, আমার অঙ্গসৌষ্ঠবমধ্যে দুইটি শাখা মাত্র। রোপিত হইবার পর আমার প্রতি যথেষ্ট যত্ন হইতে লাগিল, আমিও প্রফুল্লান্তঃকরণে বাস করিতে লাগিলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে বর্দ্ধিত হইতে থাকিলাম। আমার প্রভু প্রতিদিন আমাকে দেখিতে আসিতেন। দেওয়ালের দিকের শাখাগুলিকে যত্নসহকারে নিয়ন্ত্রিত করিয়া দিতেন, পাছে একাধিক শাখা পরস্পরে বিজড়িত হইয়া পড়ে, সেই জন্য প্রত্যেক শাখাকে প্রাচীরগাত্রে সংলগ্ন করিয়া লোহার পেরেক দ্বারা বাঁধিয়া দিতেন। বহির্ভাগের ছড়িগুলি কখনও ছাঁটিয়া দিতেন, কখনও একবারে কাটিয়া দিতেন। এইরূপে আবদ্ধ থাকায় আমি যথেচ্ছভাবে শাখাপ্রশাখা দ্বারা প্রসারিত হইতে পারিতাম না। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে আমি রোপিত হইয়াছিলাম এবং ১০।১১ মাস কাল নিয়ন্ত্রিতাবস্থায় থাকিয়াও বর্দ্ধিত হইতে পাইয়াছিলাম—ফলতঃ প্রাচীরের গাত্রে যথেষ্ট স্থান পাইয়া, দৈর্ঘে-প্রস্থে যথেষ্ট স্থানাধিকার করিলাম—আমার বোধ হয়, এই স্বল্পদিনমধ্যে উচ্চে ৬ হাত হইতে ৭ হাত পর্য্যন্ত ও প্রস্থভাগে ২০।২২ হাত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিলাম। আমার শরীরে একটিও অপ্রয়োজনীয় ছড়ি কিংবা ফেঁকড়ি থাকিতে পাইত না, সেই জন্য এই অল্পকালমধ্যে এতটা বিস্তার লাভ করিয়াছিলাম।

চৈত্রমাসে বাগানের সব গোলাপই পুষ্পধারণ শেষ করিয়া বিশ্রাম লাভ করিতে লাগিল, এত বড় বাগানে গোলাপফুলের একবারেই মন্বন্তর হইল। গাছে ফুল না থাকিলে গাছের বাহার থাকে না, বিশেষতঃ গোলাপ-গাছের। গোলাপফুলের মরসুম অতীত হইলে গাছগুলি কাঠিসার হইয়া যায়—তখন আর তাহাকে দেখিতে ইচ্ছা করে না। বাগানের যখন এইরূপ অবস্থা দাঁড়াইল, তখন আমার প্রত্যেক শাখাপ্রশাখায় শিরোদেশে কুঁড়ির স্তবক দেখা দিল—ক্রমে সেইগুলি প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল। বোধ হয়, হাজার হাজার স্তবক ফুটিয়াছিল, আর স্তবকে ২০।২৫ হইতে শতাধিক ফুল ছিল। তখন আমার সৌন্দর্য্য,—আমার শোভা,—আমার উল্লাস দেখে কে? এক দিকে যেমন রাশি রাশি পুষ্পে দিক সকল আলোকিত ও উদ্ভাসিত এবং সৌরভে আমোদিত হইতে লাগিল, অন্য দিকে তেমনই ঝাঁকে ঝাঁকে মক্ষিকা আসিয়া গুঞ্জন করিতে করিতে পুষ্পে পুষ্পে বসিয়া মধু আহরণ করিতে লাগিল। আমার সব দুঃখের অবসান হইল—আবার বাঁচিয়া থাকিবার ইচ্ছা হইল।

পূর্ব্বে বলিতে বিস্মৃত হইয়াছি। কিছু দিন পূর্ব্বে আমার বৃদ্ধি দেখিয়া আমার প্রভু আমার গাত্রে অপর নানা জাতীয় গোলাপের চোখ (Bud) বসাইয়াছিলেন, আমিও কৃতজ্ঞচিত্তে তাহাদিগকে গ্রহণ করিয়া বর্দ্ধিত

হইতে দিয়াছিলাম। বিভিন্ন জাতীয় গোলাপের চোথ থাকিলে আমি নিজে পুষ্পিত না হইলেও তাহারা যথাসময়ে পুষ্পিত হইত এবং তাহাতেও লোক বলিত—আমার শোভা হইত। কিন্তু এ সকল গলগ্রহ থাকিলে আমার নিজস্ব শোভা নষ্ট হইত বলিয়া মনে হয়।

চৈত্র-বৈশাখের উত্তাপের সময় আমার শাখাপ্রশাখায় রাশি রাশি পুষ্প প্রস্ফুটিত হইত, তাহাতে সকলে প্রীতিলাভ করিত এবং অনেকে বলিত যে, লতানিয়া গোলাপ—মার্শাল নীল, মেরি ভ্যান হুট্, রাজা নর্সিং প্রভৃতির ফুল আমার ফুল অপেক্ষা বড় হইলেও, আমার স্তবক দেখিয়া লোক আনন্দে অধীর হইত। এই জন্য সেই অবধি প্রাচীরগাত্র আবৃত করিবার জন্য, স্তম্ভ, তোরণদ্বার শোভিত করিবার জন্য আমি নিয়োজিত হই। আবার আমার দেহ কণ্টকাকীর্ণ বলিয়া বেড়ায় নিয়ন্ত্রিত করিলে তাহা ভেদ করিয়া দস্যু-তস্কর প্রভৃতি আসিতে পারে না। আমার শোভাসম্পদ ও গুণগরিমা নিজ মুখে বিবৃত করিলাম, ইহাতে আত্মশ্লাঘাদোষ স্পর্শে, কিন্তু কি করি, কোন কোন সময়ে আত্মশ্লাঘা না করিলে সংসারে বিচরণ করা দায় হইয়া পড়ে। যাহা হউক, আমি এই স্থান হইতে আপাততঃ প্রস্থান করি।

আমি স্বভাবতঃই কষ্টসহ, শীতবহুল স্থানেও থাকিতে পারি এবং গ্রীষ্মপ্রধান দেশেও বাস করিতে পারি, বহু বারিপাতে আমার যেরূপ কোন কষ্ট হয় না, সেইরূপ প্রখর রৌদ্রেও আমার ক্লেশ হয় না। এই জন্য আমার অনেকের নিকট যথেষ্ট আদর, কিন্তু মানুষ এতই স্বার্থপর যে, আমার গুণাগুণ দেখিবার জন্য অপেক্ষা না করিয়া আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাটিয়া শত শত—সহস্র চারা বা কাঠি-কলম (cutting) উৎপন্ন করিয়া তাহাদের গাত্রেই অপর সুখী গোলাপের জোড় বাঁধে, তখন আমার আর স্বাতন্ত্র্য থাকে না, আমি তখন 'কলমের চারা' হইয়া যাই, কিন্তু [illegible] পাইলে আমার স্কন্ধারোহিত কলমের প্রাণ সংহার করি, [illegible]তঃ তাহার প্রাণসংশয় করিয়া তুলি।

কতকগুলি বর্ণসঙ্কর গোলাপের কলমের জন্য এই সকল কাঠিকলম (cutting) প্রস্তুত হইয়া থাকে। সেই সকল কাঠিকলমের বেশ সুচারুরূপে শিকড় জন্মিলেই আমি অপর গোলাপের সহিত সংযোজিত হইবার উপযোগী হই, তখন আমার নাম হয় গ্রাফ্ট (graft)। উক্ত গ্রাফ্টেরও কয়েকটি বিভিন্ন নাম আছে, যথা চোক-কলম (Budded graft), জিব কলম (Tongue graft) ইত্যাদি। আবার আমার কোন শাখা অল্পাধিক ছিন্ন করিয়া ভূমিতে শায়িত করিলে ৩।৪ সপ্তাহমধ্যে সেই ছিন্ন স্থান হইতে ভূগর্ভে শিকড় উদ্ভূত হয়। শিকড়সমূহ পরিমাণে বিস্তৃত হইলে এবং আত্মরক্ষা করিয়া জীবিত থাকিতে পারিবার মত হইলে মূল বৃক্ষ হইতে ছেদন পূর্ব্বক আমাকে স্বতন্ত্র করিয়া লইলে আমি কলমে পরিণত হই, তখন আর আমি 'জয়ঘণ্টী' থাকি না,—তখন আমার নাম হয় Inarch বা দাবা-কলম।

অতঃপর জোড়-কলম। কাঠি-কলমের গাত্রে ভাল জাতীয় অপর গোলাপের শাখা আমার গাত্রে সংযোজিত করিলে এক মাসের মধ্যে আমার গাত্রে উহা সংযোজিত হইয়া যায় এবং উত্তমরূপে জুড়িয়া গেলে উক্ত শাখাটি কর্ত্তিত হয়। তখন আমাকে অন্য স্থানে রোপণের জন্য স্থানান্তরিত করা হয়।

আর এক রকমের কলমের কথা বলি। তাহাকে চোখ-কলম বলে। চোখ-কলমের ইংরাজী নাম—Budding। চোখ-কলমের প্রক্রিয়া ঈষৎ জটিল, এবং সর্ব্বদা ও সর্ব্বত্র সুফল হয় না। এই জন্য লোক বড় চোখ-কলম করিতে রাজি নহে। খাস বাঙ্গালা দেশ অপেক্ষা বেহার হইতে পঞ্জাব পর্য্যন্ত এবং দক্ষিণে উড়িষ্যা হইতে সুদূর দক্ষিণে মাদ্রাজ ও মহীশূরে চোখ-কলমের বড় প্রাদুর্ভাব। বাঙ্গালার সর্ব্বত্র যে চোখ-কলম ভালরূপ হয় না, তাহার একমাত্র কারণ, সর্দ্দিময় দেশের আবহাওয়া সর্দ্দিযুক্ত। বাঙ্গালাদেশ, বিশেষতঃ নিম্নবঙ্গ, বড় রসাল স্থান। নিম্নবঙ্গ আমার যোগ্য স্থান নহে। আমি কিছু শুষ্কভূমি ও অল্পাধিক নীরস আবহাওয়ায় ভাল থাকি, এরূপ স্থানে সমধিক পুষ্প ধারণ করি, এবং পুষ্পও অপেক্ষাকৃত বড় হয়, সুঠাম হয়, বর্ণোজ্জ্বল হয়, সমধিক সুবাসিত হয়—আর কি চাই ?

চোখ-কলমের আরও বৈশিষ্ট্য এই যে, একই বৃক্ষে নানাবিধ গোলাপ ফুটিয়া থাকে। কিন্তু বিশেষজ্ঞ ভিন্ন এক বৃক্ষে নানাজাতীয় গোলাপের চোখ বসাইতে পারে না। যে যে গোলাপের চোখ বসান যায়, তাহাদের প্রত্যেকের প্রকৃতি কিরূপ, তাহা পরিজ্ঞাত না থাকিলে অবিমৃষ্যভাবে

যে সে গোলাপের চোখ অযথাস্থানে সংযোজিত করিলে আমার বড়ই যন্ত্রণা হয়। কিন্তু প্রত্যেকের প্রকৃতি জ্ঞাত থাকিয়া সুচারুরূপে চোখ বসাইতে পারিলে, যখন পুষ্প ধারণ করি, তখন একটা কোলাহল পড়িয়া যায়, একই বৃক্ষে নানাজাতীয় গোলাপ প্রস্ফুটিত হইলে বড়ই কৌতুকের জিনিষ হইয়া থাকি। দ্বারবঙ্গের অন্তর্গত রাজনগরের বাগানে নানাজাতীয় যথা,—টী, হাইব্রিড, নয়সেট্, চায়না প্রভৃতি আমার শাখা প্রশাখায় সুবিবেচনার সহিত যথা-স্থানে সংযোজিত হওয়ায় আমি একটি বিশেষ দর্শনীয়, ফলতঃ আদরণীয় জিনিষ হইয়াছিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সে অবস্থায় আমার যে শোভা হইয়াছিল, তাহার কোনও ফটোগ্রাফ লওয়া কেহ প্রয়োজন বোধ করে নাই।

যাহা হউক, আমার জন্য যে লোক ব্যাকুল হয় না, ইহাই আশ্চর্য্য! গোলাপের মধ্যে আমি যেরূপ কষ্টসহ এবং দীর্ঘজীবী, তাহাতে আমার আসন সকলের উপর। আমি কষ্টসহ বলিয়া নিম্ন-বঙ্গের অধিবাসিগণ আমার গাত্রে জোড়-কলম বাঁধিয়া যেরূপ সহজে আপনাদের কায হাঁসিল করে, উত্তর-ভারতে আমার গাত্রে চোখ বসাইয়া সংক্ষেপে কার্য্য উদ্ধার করিয়া লয়। মহীশূর অঞ্চলে চোখ-কলমের প্রাদুর্ভাব বেশী। কেবল গোলাপের নহে, তথায় লেবু—নানাবিধ লেবু, কমলা, বাতাবী, কাগ্‌জী, পাতী এবং পিয়ারা, নাশপাতি প্রভৃতিও চোখ-কলমে সহজেই উৎপন্ন হয়। বলা বাহুল্য, সে সকল কলমের জন্য আমার অঙ্গ বিদীর্ণ হয় না। যে গাছের কলম করিতে হয়, সেই বর্গীয় বা জাতীয় ফলের চারা প্রস্তুত করিয়া সেই চারা-গাত্রে চোখ বসান হয়। আজকাল আম্রবৃক্ষেরও চোখ বসাইয়া কলম হইয়া থাকে।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দে।

এক্কার গান

(১)

করলে এ কে? দিল্লী থেকে ভাই রে বুঝি এক্কা গেল!
এক্কা গেল, দুঃখ কর, প্রাণ যে বড় ধাক্কা পেল।
ঘোড়ার পিঠে বাঁশের দোলা,
প্রীতি যে তার যায় না ভোলা,
চলন্ত এ ছাপর খাটে ভাগ্যে জীবন রক্ষা হ'ল।

(২)

পাড়েন ঢেঁকি বুকের মাঝে যখন করেন দ্রুত গমন,
এক্কা ছেড়ে গরুড় চ'ড়ে ঠ'কে গেছেন রাধারমণ।
টক্করেতে ক্ষণে ক্ষণে
পেটের ভিতর তূলো ধুনে,
এমন গাড়ীর স্বর্গারোহণ! চোখের বারি সবাই ফেল।

(৩)

রইল টোঙ্গা ডাঙ্গার ডোঙা নেহাৎ জেনো টোঙরা সে ত,
মক্কর পাড়ি উটের গাড়ী তার কাছে কি কল্কে পেত।
মটর চটুল পটু বটে,
ওলাউঠার মতন ছোটে,
পুস্ পুস্ এবং রিক্‌স ছুটো হয় কি তেমন লক্ষ ঠেলো।

(৪)

এক্কা যাবে তাহার সাথে যাবে তাহার দাণ্ডা দড়ি,
ঢাক্‌না এবং রঙিন ঝালর, ঘুঙুর যাবে গুমরে মরি।
লাল কাগজের ঘূর্ণী কি রে
ঘুরবে আহা ঘোড়ার শিরে
সেই বাহারের ছুল্‌কি দোলন কোথায় আহা মিলবে বল?

(৫)

পাণ্ডবগড় ইহার দোসর কুতবমিনার নাতির নাতি,
কেল্লা ত হায় কালকে গড়া, এক যমুনা ইহার সাথী।
চাঁদনী চকের হবার আগে
দাগা দেশ ওর চাকার দাগে
সোয়ারী এর হোয়েন্ত সাঙের ইতিহাসে দেখবে চলো।

(৬)

হায় রে হিঁদু-মুসলমানের দিল্লীর হ'ল ইজ্জৎ হানি,
গৌরব-দীপ নিভলো রে তার কি হবে আর বিদ্যুৎ আনি।
ময়ুর আসন আজ বিদেশী,
তাতে আসে যায় না বেশী,
এক্কা আহা অক্কা পেলে দিল্লী পথের ঝিল্লি মলো।

(৭)

বিহঙ্গ নাগ আগেই গেছে নাই অতিকায় হস্তী রে ভাই,
দেশবিদেশের যাদুঘরে অস্তিত্ব তার অস্থিতে পাই;
যাত্রিগণের নিত্য প্রিয়
একমেব অদ্বিতীয়,—
এক্কা গেলে ফাক্কা সবই যাত্রিজীবন পান্‌সে জলো।

(৮)

লাঞ্ছনা এ সইলে কত পিণ্ডারী আর ঠগীর হাতে,
ক্ষত ইহার উঠলো সেরে ক্ষতি ত কই হয় নি তাতে।
আজকে এ হায় কাহার শরে
ইচ্ছামৃত্যু আনছে ব'রে
ছুটছে ঘোড়া অপ্সরীরা স্বর্গ-দুয়ার ত্বরিত খোলো।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

বিনামেঘে বজ্রাঘাতে বাঙ্গালার গৌরব-গিরির স্বর্ণচূড়া ধূলিসাৎ হইয়াছে। গত ১১ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার সন্ধ্যায় প্রিয় জন্মভূমি বাঙ্গালার বাহিরে—প্রিয়তর পরিজনগণ হইতে দূরে—প্রিয়তম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বহুদূরে পাটনায় আশুতোষ মুখোপাধ্যায় দেহরক্ষা করিয়াছেন। ধূলায় ধূলা মিশিয়াছে—কর্ম্মবীরের কর্ম্মময় জীবনের অবসান হইয়াছে—কর্ম্মবহুল জীবনের কর্ম্মকথা স্মৃতিমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে—বাঙ্গালার পুরুষসিংহ প্রাণত্যাগ করিয়াছেন—বাঙ্গালার গৌরব-রবি অস্তমিত হইয়াছে।

এ সংবাদ এমনই অপ্রত্যাশিত—এতই অতর্কিত—এরূপ মর্ম্মন্তুদ যে, বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। কিন্তু মর-জগতে মৃত্যুর মত কঠোর সত্য বুঝি আর কিছুই নাই। তাই বিশ্বাস করিতে হইয়াছে—আশুতোষ নাই।



আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

যিনি বাঙ্গালার শিক্ষাপ্রণালীকে কুম্ভকার করধৃত মৃত্তিকায় যেমন যে ভাবে ইচ্ছা পুত্তল গঠিত করে, তেমনই ভাবে গঠিত করিয়াছিলেন, যিনি বাঙ্গালায় দীপ্ত তেজে মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ডবৎ বিরাজিত ছিলেন, যিনি বঙ্গজননীর গৌরব-হারের মধ্যমণি ছিলেন—তিনি সহসা মৃত্যুর অন্ধকারে আপনার দীপ্ত জ্যোতিঃ লুপ্ত করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। বাঙ্গালার দীপ নিবিল। জানি, বঙ্গজননী প্রতিভাবান্ সন্তানপ্রসবে বন্ধ্যা নহেন। কিন্তু, তবুও আশুতোষের অভাব পূর্ণ হইবে কি? অশোকের স্মৃতিপূত পাটলীপুত্রে যে বিরাট পুরুষের দেহ শবে পরিণত হইল, তাঁহার অভাব ঘুচিবে কি? আজ তাঁহার জন্য বাঙ্গালা ব্যাপিয়া এই যে হাহাকার—এই যে অশ্রুধার—এই যে অন্ধকার, ইহার শেষ হইবে কি?

এখনও জাহ্নবীর কূলে আশুতোষের চিতা-চিহ্ন বিধৌত হয় নাই—এখনও তাঁহার আত্মীয়-স্বজনের অশ্রু শুকায় নাই—এখনও তাঁহার বন্ধুবান্ধবের শোকের প্রশমন হয় নাই—এখনও বিশ্ববিদ্যালয়ে কে তাঁহার শূন্য স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইবেন, তাহা স্থির হয় নাই। কাযেই আজ আশুতোষের কার্য্যের সমালোচনা করিবার সময় নহে। আজ কেবল শোকের সময়—আজ কেবল তাঁহার উদ্দেশে স্মৃতির পুষ্পাঞ্জলি প্রদানের সময়।

জীবন-কথা

আশুতোষের পিতৃপুরুষের বাস কলিকাতার নিকটে বনাগড়ের কাছে। তাঁহার পিতা ও পিতৃব্য কলিকাতায় আসিয়া যশ অর্জ্জন করেন। পিতৃব্য রাধিকাপ্রসাদ প্রসিদ্ধ এঞ্জিনিয়ার ছিলেন। অন্যতর পিতৃব্য এঞ্জিনিয়ার দুর্গাপ্রসাদের অসাধারণ বিদ্যানুরাগ ছিল। তিনি বহুদিন তাঁহার পুস্তকাগারের মধ্যে ধ্যানমগ্নবৎ দেওবরে বাস করিয়াছিলেন।



বেঙ্গল টাইগার

বসুমতী প্রেস]

[শিল্পী—শ্রীঅতুলকৃষ্ণ বসু

সেই সময় তাঁহারই উপদেশে ও আদর্শে দেওঘর বিদ্যালয়ের ছাত্র সখারাম গণেশ দেউস্করের হৃদয়ে জ্ঞানার্জ্জনস্পৃহার বীজ উপ্ত হয়। আশুতোষের পিতা গঙ্গাপ্রসাদ প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ছিলেন। ৩৬ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার চিকিৎসা-নৈপুণ্যের পরিচয় লাভের সৌভাগ্য আমাদের হইয়াছিল। কিন্তু তখন বালক আমরা চিকিৎসকের চিকিৎসা-নৈপুণ্য অপেক্ষা স্নেহশীলতার পরিচয়ে অধিক মুগ্ধ হইয়াছিলাম। ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ বিখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন—কিন্তু তিনি আরও এক কারণে স্মরণীয় ও বরণীয়। এ দেশে তখন ইংরাজী চিকিৎসাপ্রণালী নূতন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে; চিকিৎসাসম্বন্ধীয় গ্রন্থ বাঙ্গালায় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সেই সময় দেশের মধ্যে অতি সরল ভাবে অবশ্য-জ্ঞাতব্য চিকিৎসাকথা প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে গঙ্গাপ্রসাদ একখানি পুস্তক রচনা করেন। তাহার নাম 'মাতৃশিক্ষা'। মাতার শিক্ষণীয় সকল বিষয় চিকিৎসকের দিক হইতে সেই পুস্তকে বিবৃত হইয়াছিল। তাহার ভাষা সরল ও সরস। তৎকালে সে পুস্তক ঘরে ঘরে আদৃত হইয়াছিল। বাঙ্গালা ভাষায় চিকিৎসা-বিষয়ক পুস্তক রচনা করিয়া যাঁহারা বাঙ্গালা সাহিত্যের এক বিভাগের অভাব দূর করিয়াছেন, গঙ্গাপ্রসাদ তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম অগ্রণী।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জুন তারিখে আশুতোষের জন্ম হয়। কাযেই মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬০ বৎসর পূর্ণ হইতে প্রায় ১ মাস অবশিষ্ট ছিল। ৬০ বৎসর পূর্ণ হইলে হাইকোর্টের জজের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিবার নিয়ম আছে। তিনি ৬ মাস পূর্ব্বেই সে পদ ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং ডুমরাওনের মহারাজের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে তাঁহার পক্ষে একটি মোকর্দ্দমা চালাইবার জন্য পাটনায় গমন করেন। মোকর্দ্দমা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল—এমন সময় ৩ দিন রোগ ভোগ করিয়া আশুতোষ দেহরক্ষা করেন।

ভবানীপুর পদ্মপুকুরে মিত্রদিগের গৃহে যে বাঙ্গালা-বিদ্যালয় ছিল, আশুতোষ প্রথমে শিক্ষার্থী হইয়া তাহাতে প্রবেশ করেন। তাহার পর তিনি সাউথ সুবার্বন স্কুলে ও তথা হইতে প্রেসিডেন্সী কলেজে ও সিটি কলেজে গমন করেন। কালিদাস যেমন বলিয়াছেন,—

"উঠে ধীরে সিংহশিশু গিরিশিরোপরি
শিলায় শিলায় রাখি পদ আপনার"—

আশুতোষ তেমনই পরীক্ষায় পর পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়েন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে তিনি এম এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পর-বৎসর প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে তিনি হাইকোর্টের উকীল হয়েন ও পর-বৎসর হইতে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ফেলো হওয়ায় তদবধি তাঁহার সহিত বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ ছিল। পরলোকগত মহেন্দ্র-লাল সরকার প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানসভায় তিনি কয় বৎসর অধ্যাপকের কাযও করিয়াছিলেন। তিনি একাধিকবার ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে যখন সুরেন্দ্রনাথ নির্ব্বাচনদ্বন্দ্বে একাধিকবার দ্বারবঙ্গের মহারাজা বাহাদুরের নিকট পরাভূত হয়েন, তখন আশুতোষ তাঁহাকে পরাজিত করিয়াছিলেন।

১৯০২ খৃষ্টাব্দে লর্ড কার্জ্জন যে বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন নিযুক্ত করেন, আশুতোষ তাহার সদস্য ছিলেন। আবার ১৯১৭-১৯ খৃষ্টাব্দের কমিশনও তাঁহাকে বাদ দিয়া হয় নাই। ইহার মধ্যে তিনি এসিয়াটিক সোসাইটীর সভাপতি হইয়াছিলেন।

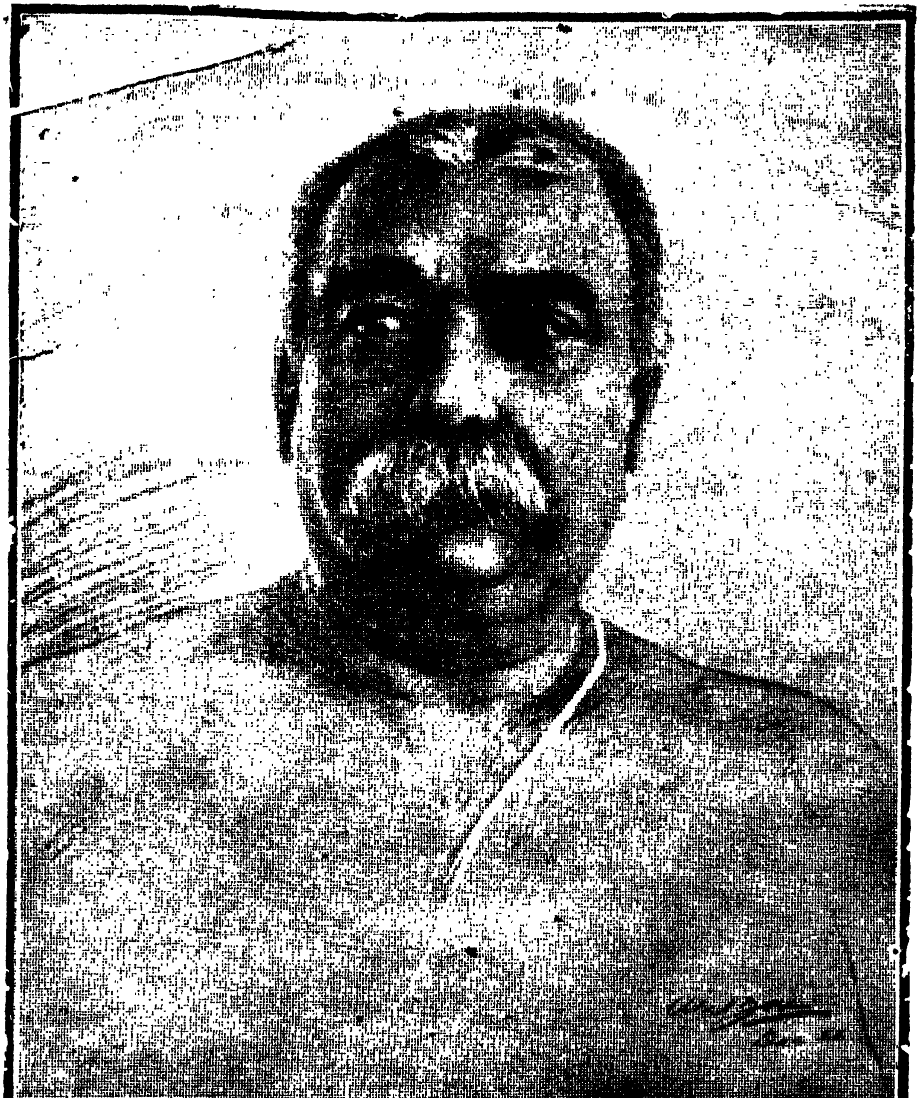
১৯০৪ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম জজ নিযুক্ত হইয়া মৃত্যুর কয় মাসমাত্র পূর্ব্বে সে পদ ত্যাগ করেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চান্সেলার ছিলেন এবং তাহার পর আরও একবার সে পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। সেই সময় তাঁহার সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপার লইয়া বাঙ্গালা সরকারের শিক্ষা-সচিব সার প্রভাসচন্দ্র মিত্রের বিবাদ হয় এবং আশুতোষের কার্য্যকাল শেষ হইলে তাঁহাকে কতকগুলি সর্ত্তে পুনরায় সেই পদ গ্রহণ করিবার জন্য বাঙ্গালার গভর্ণর লর্ড লিটন অনুরোধ করিলে তিনি যে উত্তর দেন, তাহার তুলনা সমগ্র ইংরাজী সাহিত্যে অধিক মিলে না।

আশুতোষ ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণনগরের রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী যোগমায়া দেবীকে বিবাহ করেন। তাঁহার ৪ পুত্র ও ৩ কন্যা।

পারিবারিক জীবন

আশুতোষের পারিবারিক জীবন সুখ ও শান্তিময় ছিল। বোধ হয়, সেই জন্যই তিনি কর্ম্মবহুল জীবনে

কর্ম্মশক্তির অসাধারণত্বে লোককে বিস্মিত করিতে পারিয়াছিলেন। আশুতোষের জননী যেমন পুত্রকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, তিনিও তেমনই মাতৃভক্ত পুত্র ছিলেন। সে দিন আশুতোষের কথায় তাঁহার কোন পরিচিত ব্যক্তি লিখিয়াছেন, লর্ড কার্জ্জন যখন এ দেশে বড় লাট,তখন তিনি জ্ঞাপন করিলে লর্ড কার্জ্জন একটু রঙ্গ করিয়াই বলেন, সম্রাটের প্রতিনিধির আদেশেও কি তিনি বিলাতে যাইবেন না? আশুতোষ তেমনই রঙ্গ করিয়া বলেন, যিনি সম্রাটের অপেক্ষাও তাঁহার কাছে বড়, তাঁহার অসম্মতিতে তিনি কখনই বিদেশে যাইবেন না;—তিনি তাঁহার জননী।



আশুতোষ মুখোপাধ্যায় (প্রৌঢ়ে)

আশুতোষকে একবার বিলাতে যাইতে অনুরোধ করেন; তিনি বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের কার্য্যপদ্ধতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আসিলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরও উন্নতি-সাধন করিতে পারিবেন। আশুতোষ সে প্রস্তাবে অসম্মতি

পুত্র-কন্যার প্রতি স্নেহ আশুতোষ পিতার নিকট হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করিয়াছিলেন। পিতা গঙ্গাপ্রসাদ পুত্রগতপ্রাণ ছিলেন এবং পুত্রকে কখন নয়নের অন্তরাল করিতে চাহিতেন না। আশুতোষও পুত্র-কন্যার প্রতি

অসীম স্নেহশীল ছিলেন। জ্যেষ্ঠা কন্যা কমলা বিবাহের অল্প দিন পরে বিধবা হইলে, তিনি যে পুনরায় কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন, সে কার্য্যে এক দিকে যেমন তাঁহার মতদৃঢ়তা প্রকাশ পাইয়াছিল, অপর দিকে তেমনই কন্যার প্রতি অসাধারণ স্নেহ সপ্রকাশ হইয়াছিল। তিনি আর কোন বিষয়ে সামাজিক নিয়ম লঙ্ঘন করেন নাই। তিনি যে বিধবা কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন—চিরাগত সংস্কার অতিক্রম করিয়াছিলেন, তাহার অন্যতম প্রধান কারণ—স্নেহ। এই কন্যার শোকে তিনি অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন। শুনিয়াছি, মৃত্যুর দিন বাক্‌রোধ হইবার অল্পক্ষণ পূর্ব্বেও তিনি বিকারের ঘোরে এই কন্যার নাম ধরিয়া ডাকিয়াছিলেন, "মা কমলা, যাই।" মৃত্যু তাঁহার শোকতপ্ত হৃদয়ে শান্তির স্নিগ্ধ ধারা বর্ষণ করিয়াছে। কন্যার স্মৃতিরক্ষাকল্পে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বৃত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ৪০ হাজার টাকা দিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার মৃত্যুর অল্প দিন পূর্ব্বে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র বামাপ্রসাদ সান্নিপাতিক জ্বরে পীড়িত হয়। আশুতোষ তখন পাটনায় মোকর্দ্দমা করিতেছেন। তিনি প্রতি শুক্রবারে রওনা হইয়া শনিবারে কলিকাতায় আসিতেন এবং শনিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের কায করিয়া রবিবারে পুনরায় পাটনা যাত্রা করিতেন। শুনিয়াছি, পীড়িত পুত্র জ্বরঘোরে মোটর গাড়ীর কথা বলিয়াছিল। শুনিয়া আশুতোষের চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া আসিয়াছিল; তিনি যাত্রার পূর্ব্বে ৭ হাজার টাকার একখানি চেক লিখিয়া দিয়া গিয়াছিলেন, পুত্র আরোগ্য লাভ করিয়া মোটর গাড়ী কিনিবে।

আশুতোষ আপনার পরিজনগণে পরিবেষ্টিত হইয়া কলিকাতাতেই বাস করিতে ভালবাসিতেন। তাঁহার মৃত্যুর প্রায় ৩ সপ্তাহ পূর্ব্বে যখন আমাদের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়, তখন আমরা রহস্যচ্ছলে বলিয়াছিলাম, "কলিকাতা ও বাঙ্গালা আপনাকে হারাইল। আপনি বাঙ্গালার বাহিরে ব্যবহারাজীবরূপে যে অর্থ অর্জ্জন করিতেছেন, তাহাতে ক্রমে আর সপ্তাহে একবার কলিকাতায় আসাও বন্ধ হইবে।" তিনি উত্তরে বলিয়াছিলেন, "সে কথা মনেও করিবেন না। ব্রাহ্মণ আমি—অর্থ যাহা অর্জ্জন করিয়াছি, তাহাতেই সন্তুষ্ট। আরও অনেকে মোকর্দ্দমা লইতে বলিতেছেন বটে, কিন্তু আর নহে। এইবার কেহ মোকর্দ্দমা দিতে আসিলে বলিব, 'Get out'—আর নহে। এই মোকর্দ্দমা শেষ হইলেই আসিয়া বসিব; এইবার বিশ্রাম।" সে দিন সুস্থদেহ আশুতোষকে দেখিয়া কল্পনাও করিতে পারি নাই—বিশ্রামসুখলাভ তাঁহার অদৃষ্টে ছিল না; তিনি কর্ম্মবহুল জীবনে অসমাপ্ত কাযের মধ্যেই প্রাণত্যাগ করিয়া যাইবেন; আর কল্পনাও করিতে পারি নাই—তাঁহার সহিত আমাদের সেই সাক্ষাৎই শেষ সাক্ষাৎ হইবে! তাঁহাকে আর দেখিতে পাইব না—একবার দেখিব তাঁহার শব—দেখিয়া মনে করিব যেন গিরিচূড়া "লুণ্ঠিত ভূতলে।"

আশুতোষের এই সুখময় পারিবারিক জীবনের যিনি কেন্দ্র ছিলেন, আজ এই শোকের দিনে আমরা যেন তাঁহার কথা বিস্মৃত না হই।

জ্যেষ্ঠা কন্যার অকালমৃত্যুতে তাঁহার মাতৃহৃদয়ে যে ব্যথা বাজিয়াছিল, তাহা তিনি কেবল স্বামীর মুখ চাহিয়া নীরবে সহ্য করিতেছিলেন; আর শোকের জ্বালায় নানা তীর্থে দেব-দর্শন করিয়া ফিরিতেছিলেন। শুনিয়াছি, পুরীর শ্রীমন্দিরে বসিয়া নীলাচলের নীলমণিময় দেবতাকে দর্শন করিতে করিতে তিনি কন্যার কথা স্মরণ করিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতেন।

আশুতোষের মৃত্যুর সময় তিনি কলিকাতায় পীড়িত পুত্রের সেবা করিতেছিলেন। শুক্রবারে সংবাদ আসিল, আশুতোষের শরীর অসুস্থ—তিনি আর সে দিন কলিকাতা যাত্রা করিবেন না। শঙ্কার কোন কারণ সে দিন কেহ কল্পনাও করিতে পারিল না। শনিবারে কলিকাতা হইতে চিকিৎসক পাঠাইবার জন্য টেলিগ্রাম আসিল। রবিবার অপরাহ্ণে সংবাদ আসিল—জ্যেষ্ঠ পুত্র রমাপ্রসাদ টেলিগ্রাফ করিয়াছেন—মা'কে পাঠাইয়া দাও।

শঙ্কাকম্পিত বক্ষে যোগমায়া দেবী সন্ধ্যার ট্রেণে যাত্রা করিলেন; জানিতে পারিলেন না, তখন সব ফুরাইয়াছে। তাঁহার যাত্রার পর সে সংবাদ কলিকাতায় পৌঁছিল। ওদিকে পাটনা হইতে হাইকোর্টের জজ শ্রীযুক্ত দাশ ষ্টেশনে ষ্টেশনে তার করিলেন, পঞ্জাব ডাকগাড়ীতে লেডী মুখোপাধ্যায় পাটনায় আসিতেছেন; পাটনা হইতে স্পেশাল ট্রেণে আশুতোষের শব লইয়া যাওয়া হইতেছে; মৃত্যুসংবাদ না দিয়া পথে তাঁহার পত্নীকে নামাইয়া রাখিবেন। ঝাঝায়

ষ্টেশন-মাষ্টার সহযাত্রী আশুতোষের কনিষ্ঠ জামাতাকে সংবাদ দিয়া আশুতোষের বিধবাকে সেই ষ্টেশনে নামাইয়া লইলেন—তখনও নিদারুণ সংবাদ তাঁহার অজ্ঞাত। তাহার পর আশুতোষের শব লইয়া ট্রেণ আসিল। ব্যাকুল-হৃদয়ে পত্নী পতির দর্শনাশায় পার্শ্বের কক্ষে উঠিলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন, "তিনি কোথায়?" সলিলস্তম্ভিতনেত্র পুত্র বলিলেন, "পার্শ্বের কক্ষে। এখন ব্যস্ত হইও না, মা"। তিনি যে ঘুমাইতেছিলেন! কিন্তু ব্যস্ত হইও না বলিলে কি মন বিলম্ব সহ্য করিতে পারে? মা বলিলেন, "আমাকে কি দেখিতে দিবি না?" পুত্রের অশ্রুপ্রবাহ আর বাধা মানিল না। "তোমাকে দেখাইব বলিয়াই যে, মা, এই আয়োজন"—বলিয়া পুত্র মাতাকে পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষে লইয়া গেলেন। পতির শবের পার্শ্বে আশুতোষের পুত্র-কন্যার জননী—আশুতোষের গৃহের লক্ষ্মী—আশুতোষের সহধর্ম্মিণী—আশুতোষের বিধবা পত্নী লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন।

এ কথা মনে করিতে পাষাণও বিগলিত হয়।

যে পত্নীপুত্রকন্যাকে তিনি প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিতেন, তাঁহাদের নিকট হইতে দূরে আশুতোষের মৃত্যু শোকাবহ সন্দেহ নাই; কিন্তু আশুতোষের পত্নীর এই শোকের কি তুলনা আছে?

ধর্ম্ম-জীবন

আশুতোষের ধর্ম্ম-জীবনের পূর্ণ পরিচয় অনেকের নিকটই প্রকট হয় নাই। তাঁহার কর্ম্ম-জীবনের ঔজ্জ্বল্য যেন তাঁহার ধর্ম্ম-জীবনকে ম্লান করিয়া রাখিয়াছিল—লোককে সে দিকে দৃষ্টিপাত করিবার সুযোগ দেয় নাই।

আশুতোষ হিন্দুর আচারব্যবহার ত্যাগ করেন নাই; তাঁহার গৃহে দুর্গোৎসবও হইত। তবে তিনি গোঁড়ামী পরিহার করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি আহারাদিতে হিন্দুর আচার মানিয়া চলিতেন।

যখন শুনা যায়, তিনি অবসরগ্রহণের কালের পূর্ব্বেই হাইকোর্টের জজের পদ ত্যাগ করিবেন, তখন অনেকে বলাবলি করিতেছিলেন—এইবার তিনি পূর্ণোদ্যমে রাজনীতিক আন্দোলনে যোগ দিবেন এবং রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁহার উপযুক্ত স্থান গ্রহণ করিবেন। তিনি ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিবেন শুনিয়া এসোসিয়েটেড প্রেসের শ্রীযুত কেশবচন্দ্র রায় আমাদিগের সহিত তাঁহার কাছে যাইয়া তাঁহাকে বলেন, তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ না করিয়া লেজিসলেটিভ এসেমব্লীতে যাইলেই ভাল হয়। আশুতোষ সে দিন আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, "পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যও তাহাই লিখিয়াছেন। তিনি বলেন, এবার এসেমব্লীতে কে নায়ক হইবেন, তাহা স্থির করা দুষ্কর। আপনি আসিয়া নায়কের কার্য্যভার গ্রহণ করুন—আমরা আপনার নায়কত্ব স্বীকার করিয়া লইব।" তাহার পর এক দিন তিনি আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, "ব্যবস্থাপক সভায় যাইয়া কি হইবে?" আমরা বলিয়াছিলাম," তবে কি কাশীবাসী হইবেন? থাকিতে পারিবেন ত?" তিনি হাসিয়া বলিয়াছিলেন, "কাশীবাসী হইলে ত নিস্তার পাইব না। সেখানে যে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় আছে?" আমরাও হাসিয়া বলিয়াছিলাম, "তবে কি করিবেন?" তিনি উত্তর দিয়াছিলেন, "জানেন না—পুরীতে বাড়ী করিয়াছি? জগবন্ধুর লীলাক্ষেত্রে থাকিয়া হরিনামের মালা লইয়া জপ করিব।"

আশুতোষের মৃত্যুর পূর্ব্বে জানিতে পারি নাই, এই হাস্যপরিহাসের ফেনপুঞ্জের নিম্নে প্রকৃত ভাবের ধারা প্রবাহিত ছিল। তখন জানিতাম না, কন্যার মৃত্যুর পর তিনি যখন পুরীতে গিয়াছিলেন, তখন যে শ্রীমন্দিরের সান্নিধ্যে সিন্ধুর গর্জ্জনও স্তব্ধ হয়, সেই শ্রীমন্দিরের হর্ম্ম্যতলে পড়িয়া তিনি ভক্তিগদগদকণ্ঠে জগবন্ধুকে ডাকিয়াছিলেন, "আমার জ্বালা জুড়াইয়া দাও।"

আশুতোষের জ্বালা জুড়াইয়াছে। কিন্তু তাঁহার জন্য বঙ্গ-জননীর বুকের যে জ্বালা, সে জ্বালা কিসে জুড়াইবে? কবে জুড়াইবে?

সামাজিক শিষ্টাচার

আশুতোষের সামাজিক শিষ্টাচার অতুলনীয় ছিল বলিলেও, বোধ হয়, অত্যুক্তি হইবে না। তাঁহার গৃহে তিনি অবারিত-দ্বার ছিলেন; আজকাল যে অনেকের বাড়ী কার্ড পাঠাইয়া—এত্তালা করিয়া তবে গৃহস্বামীর দর্শনলাভ সম্ভব হয়, তাহা আশুতোষের ধাতুতে ছিল না। তিনি সকলেরই সহিত মিষ্ট ব্যবহার করিতেন। আমরা দেখিয়াছি, ভৃত্যকে

তিনি পত্র দিয়া ঠিকানা বলিয়া দিলে ভৃত্য তাঁহারই কলম লইয়া খামের উপর হিন্দীতে ঠিকানা লিখিয়া লইয়া চলিয়া গেল।

কেহ নিমন্ত্রণ করিলে তিনি সে নিমন্ত্রণ রক্ষা করা কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিতেন। যত দিন শরীর সুস্থ ছিল, তত দিন তিনি নিমন্ত্রিত হইলেই যাইয়া আহার করিতেন; কেবল আহার করিতেন না—রঙ্গ করিয়া "ছাঁদা" লইয়া আসিতেন। বাঙ্গালী নিমন্ত্রিত হইয়া বিনা কারণে আহার করে না, ইহা তিনি যেন ধারণায় আনিতে পারিতেন না। তিনি বলিতেন, "বাঙ্গালীর ছেলে—পাতে লুচী-সন্দেশ দেখিলে কি না খাইয়া থাকিতে পারে?"

অতি দরিদ্রের গৃহেও তিনি নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতেন। মৃত্যুর ৩ দিন মাত্র পূর্ব্বে পাটনায় তাঁহার মোটর-চালকের নিমন্ত্রণে তিনি তাহার গৃহে যাইয়া আহার করিয়া আসিয়াছিলেন।

যে সামাজিক শিষ্টাচার বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য ছিল এবং প্রতীচ্য সভ্যতার অক্ষম অনুকরণের ফলে আমরা যাহা হারাইতে বসিয়াছি, আশুতোষ তাহা সযত্নে রক্ষা করিয়াছিলেন। যত দিন বাঙ্গালীর প্রকৃত সামাজিক জীবন ছিল, তত দিন বাঙ্গালী এই বৈশিষ্ট্য হারায় নাই। সামাজিক নিমন্ত্রণে ধনিদরিদ্রনির্ব্বিশেষে সকলেই সমবেত না হইলে কেহই আহারে বসিতে পারিতেন না—কেহ নিমন্ত্রিত হইয়া বিশেষ কারণ ব্যতীত নিমন্ত্রণ রক্ষা না করিলে নিন্দিত হইতেন।

আশুতোষের স্মরণশক্তি অসাধারণ ছিল। তিনি যাঁহার সহিত পরিচিত হইতেন, তাঁহার নাম কখন বিস্মৃত হইতেন না। সকলেরই সহিত তাঁহার সদ্ব্যবহার ছিল। তিনি যেরূপ ক্ষমতাশালী ছিলেন, তাহাতে ইচ্ছা করিলে তিনি শত্রুদিগকে চূর্ণ করিয়া দিতে পারিতেন। কিন্তু সে প্রবৃত্তি তাঁহার কখনও হয় নাই—তিনি তাঁহাদিগকে তাঁহার ক্ষমতার একটু পরিচয় দিয়াই নিরস্ত হইতেন।

সারল্য ও আশ্রিতবাৎসল্য

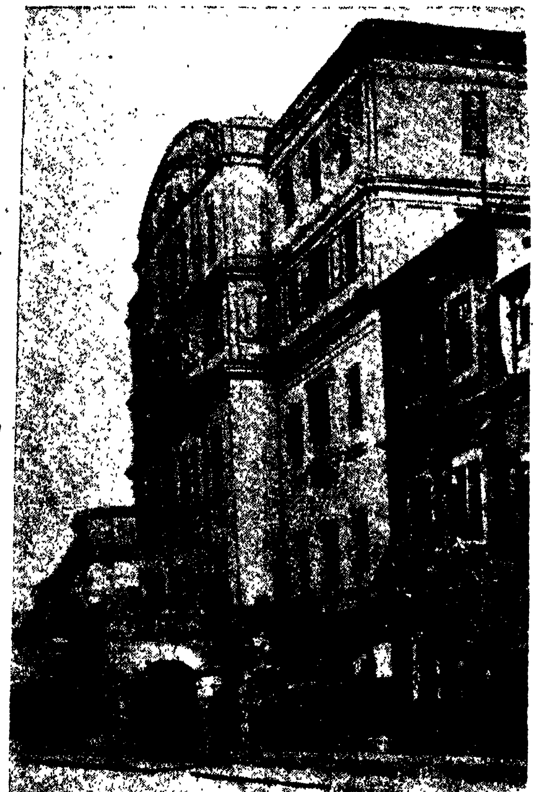
আচারে-ব্যবহারে বেশভূষায় আশুতোষ অতি সরল ছিলেন, তিনি সর্ব্ববিধ বিলাসের বিরোধী ছিলেন। লম্বা কোঁচা বা মিহি কাপড়ের জামা কেহ তাঁহার দেখে নাই। চায়না কোট, সেকেলে ধরণের জুতা ও মোটা ধুতি-চাদর—তিনি ইহাতেই সম্মান অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। বিদ্যাসাগরের পর আশুতোষের ধুতি সর্ব্বত্র আদর আদায় করিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনে তিনি যখন সমগ্র ভারতে ভ্রমণ করেন, তখন ঐ বেশ তিনি ত্যাগ করেন নাই। বিশ্ববিদ্যালয়েও তিনি ধুতি-চাদর "চলচল" করিয়াছিলেন। আশুতোষের বিলাস-বর্জ্জিত জীবন যদি বাঙ্গালী সমাজে অনুকৃত হয়, তবে যে বাঙ্গালীর অসীম উপকার হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

আশ্রিতবাৎসল্য যদি অপরাধ হয়, তবে সে বিষয়ে আশুতোষের অপরাধের সীমা ছিল না। কিন্তু আমাদের দেশে—আমাদের সমাজে আমরা তাহা গুণ বলিয়া বিবেচনা করি। আশ্রিতকে রক্ষা করিবার জন্য আপনার দেহ পর্য্যন্ত দান এ দেশে পুণ্যকার্য্য বলিয়া পরিগণিত। আশুতোষ আশুতোষেরই মত অতি অল্পে তুষ্ট হইতেন—যে তাঁহার আশ্রয় লইত, সে-ই অভয় পাইত। শরণাগত শত্রুরও তিনি নানারূপে উপকার করিতেন। ইহার দৃষ্টান্ত অনেক দিতে পারা যায়।

কর্ম্মজীবন

আশুতোষের কর্ম্মজীবনকে নানা ভাগে বিভক্ত করা যায়। আমরা ব্যবহারাজীব বা বিচারক হিসাবে তাঁহার কর্ম্মজীবনের সমালোচনা করিবার অধিকারী নহি। তবে এ কথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, তাঁহার মত ব্যবহারশাস্ত্রাভিজ্ঞ বাঙ্গালী—ভারতবাসী বিরল। বিচারক হিসাবে তাঁহার সমকক্ষ তাঁহার সময়ে অধিক দেখা যায় নাই। ব্যবহারাজীব হিসাবে তাঁহার যশ ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল।

মাদ্রাজের প্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীব সার বৈশ্যম আয়াঙ্গারের সম্বন্ধে কথা ছিল, তাঁহার পাগড়ীর ভাঁজে ভাঁজে মামলা থাকিত। আশুতোষ ইচ্ছা করিলে তেমনই ভাবে তাঁহার "ব্রীফব্যাগ" পূর্ণ করিতে পারিতেন। তিনি জজীয়তী ত্যাগ করিবেন, এই সংবাদ প্রচারিত হইতে না হইতে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে বড় বড় মামলা লইবার জন্য লোক তাঁহার দ্বারস্থ হইয়াছিল। বাঙ্গালার ব্যবহারাজীবদিগের মধ্যে তাঁহার গুরু সার রাসবিহারী ঘোষ ব্যতীত



বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারবঙ্গ ভবন

আর কেহ এমন আদর লাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহার কায করিবার শক্তি যে অসাধারণ ছিল, সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না। হাইকোর্টের জজের শ্রমসাধ্য কায শেষ করিয়া তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কায করিতেন—আর সে কায কি ভাবে করিতেন, তাহা যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা ব্যতীত আর কেহ বুঝিতে পারিবেন, এমন আশা করা যায় না।

ইহার মধ্যে তাঁহার আরও কায ছিল। এসিয়াটিক সোসাইটীর কায, কলিকাতা মিউজিয়মের কায, বহু সভা-সমিতির কায—তিনি যে কাযে হাত দিতেন, তাহাই সুসম্পন্ন না করিয়া ত্যাগ করিতেন না।

শারীরিক ও মানসিক শক্তি উভয়ই তাঁহাতে অসাধারণ ছিল।

তাঁহার মত শ্রমক্ষমতা তাঁহার সমসাময়িক আর কোন বাঙ্গালীতে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। শ্রান্তি কাহাকে বলে, তাহা যেন তিনি জানিতেন না। আলস্য যেন তাঁহাকে স্পর্শ করিতে সাহস করিত না। মনোযোগের ত্রুটি যেন তাঁহার অজ্ঞাত ছিল। কার্য্যে ঔদাস্য কাহাকে বলে, তাহার ধারণাও যেন তাঁহার ছিল না। এ সব বিষয়ে তিনি বাঙ্গালার জলাভূমিতে অভ্রংলিহ্ গিরির মতই ছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়

বিশ্ববিদ্যালয়ের কাযে আশুতোষের যেন কেমন অশিক্ষিত-পটুত্ব ছিল। আমরা বলিয়াছি, তিনি স্ত্রীপুত্রপরিজনের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল ছিলেন। কিন্তু অনেক সময় আমাদের মনে হইয়াছে, তিনি বুঝি এ সকল অপেক্ষাও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে অধিক ভালবাসিতেন। যখন তাঁহার ভক্তবৃন্দ তাঁহার শব বহন করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অলিন্দে আনিয়া স্থাপিত করিলেন—তখন বহু ভক্তের নয়নই আর অশ্রুশূন্য রহিল না। পশ্চাতে "দ্বারবঙ্গ ভবন" আশুতোষের চেষ্টায় নির্ম্মিত—পার্শ্বে অসমাপ্ত গৃহ—তাহার প্রতি ইষ্টকে যেন আশুতোষের সস্নেহ ভাবনা মাখান রহিয়াছে। এক একবার মনে হইতে লাগিল, তিনি বুঝি নয়ন মেলিয়া তাঁহার বিরাট কীর্ত্তি দেখিবেন। কিন্তু হায়—যে নয়ন মরণে মুদিত হয়, তাহা আর খুলে না—

"উচ্চ স্মৃতিচিহ্ন কিংবা প্রতিমূর্ত্তি তা'র
ফিরে কি আসিতে পারে শবে কভু প্রাণ?"

আশুতোষহীন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যেন কল্পনারও অতীত ছিল।



বিশ্ববিদ্যালয়ের অসমাপ্ত গৃহ



আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

আসিয়াছিলাম। তখন সার আশুতোষ যুবক; কিন্তু তখনই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন।" বিশ্ববিদ্যালয়ের কায তিনি যেন নখদর্পণে দেখিতেন—কোন বিভাগের কোন কায তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না। কোন কায তিনি সামান্য বলিয়া মনে করিতেন না।

লর্ড কার্জ্জন যখন বিশ্ববিদ্যালয় আইন করিয়া এ দেশে উচ্চশিক্ষাবিস্তারের পথ বিঘ্নবহুল করেন, তখন যে আন্দোলন হয়, আশুতোষ তাহার পুরোভাগে ছিলেন। আইন বিধিবদ্ধ হইয়া গেলে সেই আইন অনুসারে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কায চালাইবার ভার আশুতোষের উপর ন্যস্ত হইল। বোধ হয়, তিনি তখন মনে মনে হাসিয়াছিলেন। কারণ, সেই আইনের গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়া তিনি সেই আইনের উদ্দেশ্য সর্ব্বতোভাবে ব্যর্থ করিয়া দিয়াছিলেন। এ বিষয়ে তিনি যাহা করিয়াছিলেন, তাহা একান্তই বিস্ময়কর।

তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে কত দিন পূর্ব্বে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহার পরিচয় আমরা অপ্রত্যাশিত স্থানে পাইয়াছিলাম। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে আমরা যখন অক্সফোর্ডে গমন করি, তখন আমাদের সংবর্দ্ধনা সভায় কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ সার আর্ণেষ্ট ট্রিভেলিয়ানের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হয়। তিনি আমাদের কাছে তাঁহার সময়ের পরিচিত বাঙ্গালীদিগের কথা জিজ্ঞাসা করেন। সার আশুতোষের কথায় তিনি বলেন, "শুনিয়াছি, এখন তিনিই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে আমি হাইকোর্টের কাযে ইস্তাফা দিয়া

বড় লাটের পর বড় লাট ভাইস-চান্সেলার আশুতোষের অসাধারণ কৃতিত্বের সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। আশুতোষ কোন দিন বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনরূপ আঘাত সহ্য করিতে সম্মত ছিলেন না। যখন এক দিকে পাটনায় ও অপর দিকে ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ফলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসার ও আয়ের পথ সঙ্কীর্ণ করিবার সঙ্কল্প হয়, তখন তিনি ভাইস-চান্সেলাররূপে চান্সেলার লর্ড হার্ডিঞ্জকে ভৎর্সনা করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। লর্ড চেমসফোর্ডের

শাসনকালে ভারত সরকারের সহিত তাঁহার বাদানুবাদের অন্ত ছিল না। এমন কি, যখন অসহযোগ মন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণ করিয়া শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ ছাত্রদিগকে বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া আসিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, তখন তিনি পুত্রের শিক্ষাফলের প্রতি বক্রকটাক্ষ করিয়া চিত্তরঞ্জনকে একটু রূঢ় কথাও বলিয়াছিলেন। সে কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের অনিষ্ট শঙ্কা করিয়া।

গভর্ণমেণ্ট যখন পরলোকগত আব্দল রসুল প্রমুখ কয়জন অধ্যাপক নিয়োগব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেন, তখন সরকারের চাকুরীয়া—হাইকোর্টের জজ আশুতোষের কণ্ঠেই প্রতিবাদ প্রবলতম ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। এমন ব্যাপার অনেকবার হইয়া গিয়াছে। স্বাধীনতার সেবক আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়কে স্বাধীনতার পুণ্যভূমিতে পরিণত করিতে প্রয়াস করিয়াছেন। আর অধিকাংশ স্থলেই তাঁহার সে প্রয়াস যে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে, তাহাও উল্লেখযোগ্য।



আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মর্ম্মর-মূর্ত্তি

বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে তিনি যে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন, তাহা অতুলনীয়। তাঁহারই চেষ্টায় সার রাসবিহারী ঘোষের ও সার তারকনাথ পালিতের বিপুল দানে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানশিক্ষাগারের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইয়াছিল। তাঁহারই চেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা জনের দান সংগৃহীত হইয়াছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ সম্বন্ধে আশুতোষের কিরূপ ধারণা ছিল, তাহার পরিচয় তিনি পদে পদে দিয়া গিয়াছেন। "পোষ্ট গ্রাজুয়েট" বিভাগের প্রবর্ত্তন করিয়া তিনি গবেষণার উপায় করিয়া দিয়াছিলেন।

কিরূপে বাঙ্গালার ও বাহিরের পণ্ডিতদিগকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠসূত্রে বদ্ধ করিবেন, এই চিন্তা তিনি সর্ব্বদাই করিতেন। আশুতোষ তাঁহার জীবনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যেরূপ উন্নতিসাধন করিয়াছেন, কোন দেশে কোন লোক তাহা করিতে পারিয়াছেন বলিয়া আমাদের জানা নাই।

গত ২০ বৎসর কাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বলিলে আশুতোষকে বুঝাইত; বিশ্ববিদ্যালয় ও আশুতোষ যেন অভিন্ন ছিলেন। আজ সেই আশুতোষকে হারাইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা কিরূপ হইবে?

আশুতোষের পূর্ব্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও পরোক্ষভাবে সরকারের একটা বিভাগমাত্র ছিল। আশুতোষ তাহাকে সে প্রভাবমুক্ত করিয়া স্বতন্ত্র ও স্বাধীন প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের গৃহে দাঁড়াইয়া তিনি এক দিন তাহার জন্য স্বাধীনতা চাহিয়াছিলেন; বলিয়াছিলেন—সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন—স্বাধীনতার।

তিনি সেই আদর্শ লক্ষ্য করিয়া কায করিয়াছিলেন। সর্ব্বত্র যে সকল হইতে পারিয়াছিলেন, তাহা নহে; কিন্তু তাহাতে তাঁহার চেষ্টার গৌরব ক্ষুণ্ণ হয় না।

তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতি-সাধনকল্পে তাঁহার উৎসাহ, উদ্যম, সময় ও অর্থ ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। মাতৃভক্ত আশুতোষ স্বীয় জননীর সেবায় এত মনোযোগ দিতে পারিয়াছিলেন কি না সন্দেহ।

ছাত্র-সুহৃদ

কৃষ্ণনগরের কালীচরণ লাহিড়ীর বর্ণনায় দীনবন্ধু লিখিয়াছেন, "ছেলেদের কালীবাবু, ছেলেরা কালীর"—আশুতোষের সম্বন্ধেও তেমনই বলা যায়—ছেলেরা যেমন তাঁহার ছিল, তিনি তেমনই ছেলেদের। ছেলেদের কত আব্দার যে তাঁহাকে হাসিমুখে সহ্য করিতে হইত, তাহা যিনিই তাঁহার নিকট গিয়াছেন, তিনিই জানিবার সুযোগ পাইয়াছেন। সে সব আব্দারই যে সঙ্গত, এমনও নহে। কিন্তু ছেলেদের আব্দারে ছাত্রবন্ধু আশুতোষের বিরক্তি ছিল না।

সে সব আব্দারের যেন অন্ত ছিল না। একবার একটি ছেলে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারিয়া তাঁহার গৃহে যাইয়া আব্দার ধরে, তাহাকে পাশ করিয়া দিতেই হইবে। তিনি তাহার অসম্ভব আব্দার রক্ষা করিতে অসম্মত হইলে সে আত্মহত্যার চেষ্টা করিয়াছিল। তবুও ছাত্রদিগের পক্ষে আশুতোষের গৃহদ্বার অনর্গল ছিল। কাহারও গায় হাত দিয়া, কাহাকেও চাপড় মারিয়া, কাহাকেও গালি দিয়া—তিনি স্নেহসহকারে সকলের সহিত আলাপ করিতেন। সকলেই মনে করিত, তিনি তাহাকেই অধিক স্নেহ করেন।

কিসে ছাত্রদিগের সুবিধা হইবে, তাহাই আশুতোষের চিন্তার বিষয় ছিল।

তিনি একবার পরীক্ষকদিগকে উপদেশ দিবার সময় বলিয়াছিলেন, "কড়া হইয়া পরীক্ষা করিবেন না। আমি এমনও জানি, দরিদ্র পিতা পুত্রের পরীক্ষার ফীস যোগাইতে হালের গরু বিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছে। আশা—ছেলেটি পাশ করিলে দু' পয়সা উপার্জ্জন করিতে পারিবে।

একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি—বি, এ, পরীক্ষার ফল আলোচিত হইয়া গিয়াছে—সিণ্ডিকেটের অধিবেশন শেষ হইয়া গিয়াছে। আশুতোষ ঘরে বসিয়া পরীক্ষার ফলের খাতাখানি উল্টাইতে উল্টাইতে দেখিলেন, একটি ছেলে বাঙ্গালায় ১ নম্বর পাওয়ায় অনুত্তীর্ণ! তিনি বলিলেন, "১ নম্বরের জন্য—বাঙ্গালায় ১ নম্বরের জন্য একটা বাঙ্গালীর ছেলে ফেল হইবে! হয় ত একটা সংসার তাহার উপর নির্ভর করিতেছে।" প্রধান পরীক্ষক মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র আচার্য্য বিদ্যাভূষণের ডাক পড়িল। তিনি তখন সভাশেষে গৃহে গিয়াছেন। লোক পাঠাইয়া তাঁহাকে আবার বিশ্ববিদ্যালয়গৃহে আনান হইল। তিনি ১ নম্বর দিলেন—ছেলেটি পাশ হইল। কিন্তু সে যে কেমন করিয়া পাশ হইল, তাহা সে কখন জানিতে পারে নাই।

তিনি যে কত দরিদ্র ছাত্রের পাঠের সাহায্য করিয়াছেন, তাহা তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধুরাও জানেন না।

শিক্ষার আদর্শ

শিক্ষার আদর্শ কি, তাহা আশুতোষের অবিদিত ছিল, এ কথা যাঁহারা মনে করিতে পারেন, তাঁহাদের বুদ্ধির প্রশংসা করা যায় না।

কিন্তু শিক্ষা আর "পাশ" এক নহে। "পাশের" আদর্শ তিনি যে অনেকটা নামাইয়া আনিয়াছিলেন, তাহা কেহই অস্বীকার করে না। তিনি কেন তাহা করিয়াছিলেন, তাহা কেহ ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি?

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আইনের কল্পনাকালে লর্ড কার্জ্জন বলিয়াছিলেন—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যদি ৬ জন গভীর জ্ঞানীর উদ্ভব হয়, তবে তিনি সন্তুষ্ট হইবেন। আশুতোষ তখনই তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "আমি গভীর জ্ঞানী চাহি না—কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ৬ জন নহে, ৬০ লক্ষ শিক্ষিত বাঙ্গালী বাহির হইবে, ইহাই আমার কাম্য।"

তিনি আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, যাহারা জ্ঞানের জন্য জ্ঞানের চর্চ্চা করিবে, তাহাদিগের জন্য তিনি গবেষণার দ্বার মুক্ত করিয়া দিয়াছেন—সে জন্য "পোষ্ট গ্রাজুয়েট ক্লাস" আছে। কিন্তু বন্যার জল যেমন সমগ্র দেশে পলী ছড়াইয়া উর্ব্বরতার বিস্তার করে, তিনি তেমনই, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সমগ্র সমাজে উন্নতির আকাঙ্ক্ষা ছড়াইয়া দিতে চাহেন। হউক বিদ্যা অগভীর—হউক তাহা যৎসামান্য। তাহার স্পর্শ লোককে উন্নতির তৃষ্ণা দান করিবে। লক্ষ লক্ষ লোক যখন শিক্ষার ফলে উন্নতির



হাইকোর্টের জজদিগের মধ্যে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

দাবি করিবে, তখন কে সে দাবি উপেক্ষা করিতে পারিবে ?

সেই জন্যই তিনি পরীক্ষার আদর্শ ক্ষুণ্ণ করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি চাহিতেন, সকলের পক্ষেই উচ্চশিক্ষার পথ সুগম হউক। শিক্ষাতেই শিক্ষার সার্থকতা।

যাঁহারা এই উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়াছেন, তাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর ও পাশের সংখ্যাবৃদ্ধির নিন্দা করিয়াছেন। কিন্তু আশুতোষ কেন সে পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, তাহা যাঁহারা বুঝিয়াছেন, তাঁহারা কখনই সে জন্য তাঁহার নিন্দা করিবেন না।

আশুতোষ বিনা উদ্দেশ্যে কোন কায করিতেন না—এ ক্ষেত্রেও করেন নাই। আমরা তাঁহার মুখে তাঁহার এই উদ্দেশ্যের কথা শুনিয়াছি। তিনি বলিতেন, তিনি শিক্ষার বিস্তারব্যবস্থা করিবেন—তাহার গভীরতা তাহার পর আসিবে, তাহা সময়সাপেক্ষ।

জাতীয়তা

যখন জীবনের অপরাহ্নে সরকারী চাকুরী ত্যাগ করিয়া আশুতোষ সর্ব্বতোভাবে দেশের কাযে আত্মনিয়োগ করিবার অবসর লাভ করিয়াছিলেন, তখনই কাল তাঁহাকে হরণ করিয়া লইয়া গেল, ইহা বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্যেরই পরিচায়ক সন্দেহ নাই।

তিনি সরকারী চাকুরীতে জীবন কাটাইয়াও সর্ব্বতোভাবে জাতীয়তার উপাসক ছিলেন।

কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ভাষাকে শিক্ষার বাহন করাতেই তাঁহার সেই ভাব ফুটিয়া উঠে নাই; কেবল তাঁহার বেশে ও কথায় তাহা সপ্রকাশ হইত না; পরন্তু সেই ভাবই তাঁহার সকল কার্য্য নিয়ন্ত্রিত করিত।

পরিণত বয়সে তাঁহার সহিত প্রথম আলাপের দিনই আমরা তাহার পরিচয় পাইয়াছিলাম। সে দিন বিশ্ববিদ্যালয়গৃহে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকুমার শীল বক্তৃতা দিয়াছেন। সভাপতির কায শেষ করিয়া আশুতোষ ভাইস-চান্সেলারের কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তিনি যাইবার সময় আমাদের কোন বন্ধুকে দেখিতে পাইয়া ডাকিয়া লইয়া গেলেন। বন্ধু আমাদিগকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া চলিয়া গেলেন এবং অল্পক্ষণ পরেই ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "আশুবাবু তোমাকে ডাকিতেছেন। আমি তাড়াতাড়ি বিদায় লইবার চেষ্টা করায় তিনি কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, তুমি বাহিরে অপেক্ষা করিতেছ; শুনিয়া বলিলেন, 'ডাকিয়া আনুন—এখানে আসিলে কি তাঁহার জাতি যাইবে?'" আমরা কক্ষে প্রবেশ করিলেই আমাদিগকে আসন গ্রহণ করাইয়া আশুতোষ বলিলেন, "আপনি আমার কাছে আইসেন না; কেন না, আপনি চরমপন্থী, মনে করেন—আমি সরকারের চাকর; সুতরাং খয়ের খাঁ। সরকার কিন্তু মনে করেন, আমার মত চরমপন্থী আর নাই। তবে আমার কার্য্যপদ্ধতি একটু স্বতন্ত্র রকমের। আমি উঁহাদেরই অস্ত্রে উঁহাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিতে চাহি। জানেন ত 'তোর শীল তোর নোড়া—তোরই ভাঙ্গিব দাঁতের গোড়া।' সশস্ত্র বিদ্রোহ যদি সম্ভব হইত, আমি আজই অস্ত্র ধারণ করিতাম। কিন্তু তাহা সম্ভব নহে। কাযেই ইংরাজ যাহা দিবে, তাহাই লইয়া আপনাদের কাযে লাগাইয়া আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে হইবে, ইহাই আমার উদ্দেশ্য।"

আশুতোষ তাঁহার অবলম্বিত প্রথারই অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন। শুনিয়াছি, ব্যবস্থাপক সভার কার্য্য সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ অনেক বার তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়াছিলেন। ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিতে আশুতোষেরও যে আপত্তি ছিল, এমন মনে হয় না। তিনি যদি ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিতেন, তবে তথায় কার্য্য-পদ্ধতি কিরূপ হইত, তাহার অনুমানচেষ্টা করা আজ নিষ্প্রয়োজন।

কিন্তু যখন তিনি রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া সম্পূর্ণ ও স্বাধীনভাবে রাজনীতিক আন্দোলনে যোগ দিতে পারিতেন—যখন দেশে তাঁহার মত কুশাগ্রবুদ্ধি নেতার অভাব অত্যন্ত অধিক অনুভূত হইতেছিল, সেই সময় তাঁহার তিরোভাব যে তাঁহার দেশবাসীর পক্ষে একান্ত বেদনার কারণ, তাহাতে আর সন্দেহ থাকিতে পারে না।

রাজনীতিক বিষয়ে তাঁহার সহিত যাঁহাদের মতভেদ ছিল, তাঁহারাও আশুতোষের জাতীয়ভাবপ্রবণতায় সন্দেহ করিতে পারেন নাই! সেরূপ সন্দেহ করিবার উপায় ছিল না। কেন না, তাঁহার জাতীয়ভাবপ্রবণতা সর্ব্বকার্য্যে সপ্রকাশ ছিল। যাঁহারাই তাঁহার সহিত কোন কার্য্যের সংস্রবে আসিয়াছেন, তাঁহারাই সে ভাব বুঝিতে পারিয়াছেন।



বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনে আশুতোষ



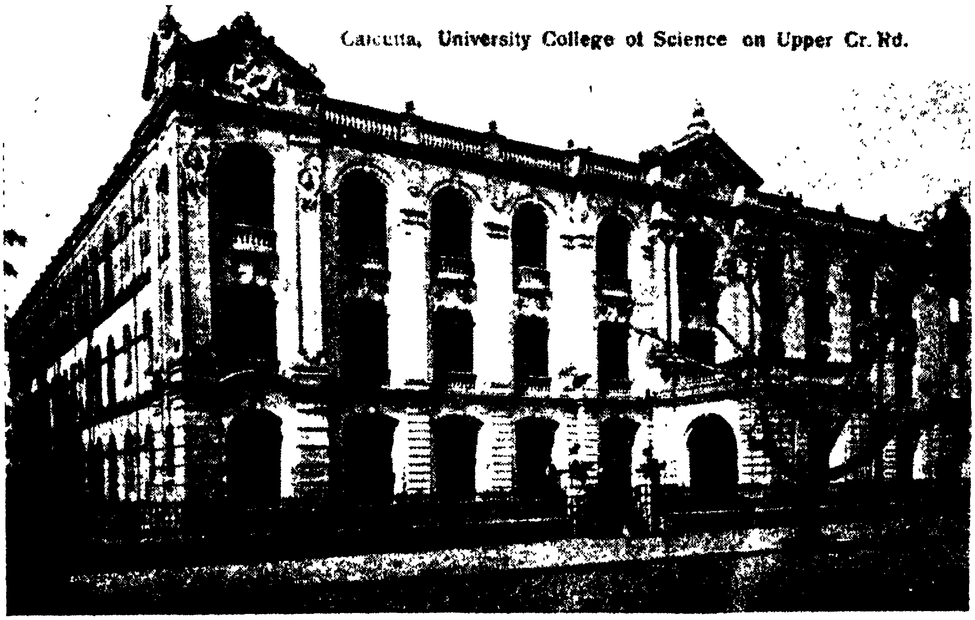
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গৃহ

আশুতোষ কেবল জাতীয়ভাবপ্রবণ ছিলেন না; পরন্তু তিনি দেশের লোকে তাহার কোনরূপ অভাব লক্ষ্য করিলে বিষম বেদনা অনুভব করিতেন। বিদেশীর অনুকরণ তিনি ঘৃণা করিতেন; দেশীয় আচারব্যবহারে দৃঢ় ছিলেন এবং সর্ব্বতোভাবে জাতীয়তার অনুশীলন করিতেন। তিনি দেশকে ভালবাসিতেন—দেশীয় সকল জিনিষের আদর করিতেন। তিনি ছিলেন—বঙ্গজননীর বাঙ্গালী সন্তান; মা'র কোল আলো করা ছেলে। তিনি কি ভক্তি-ঘৃতে প্রজ্বালিত জাতীয়তার পঞ্চপ্রদীপ ব্যতীত মা'র মন্দিরে মা'র প্রতিমার আরতি করিতে পারিতেন? সে যে তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ কায হইত।

যে জাতীয়তার অভাবে আমাদের মুক্তির পথ এখনও সুগম হইতে পারিতেছে না, আশুতোষ সেই জাতীয়তার পুরোহিত ছিলেন। তাঁহার অভাবে বঙ্গদেশে কি সেই জাতীয় ভাবের ঔজ্জ্বল্য কোনরূপে ম্লান হইবে?

দীপ-নির্ব্বাণ

আশুতোষ মোকর্দ্দমা করিতে পাটনায় গমন করিয়াছিলেন। মোকর্দ্দমা শেষ হইয়া আসিতেছিল।



বিজ্ঞান কলেজ

সিমলায় বিশ্ববিদ্যালয় সম্মিলন। তথায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে তাঁহার যাইবার কথা। কিন্তু তিনি যাইতে পারিলেন না। ভাইস-চান্সেলার ভূপেন্দ্রনাথ দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলেন,"আমি অসুস্থ—অক্ষম; আশু-বাবু যাইতে পারিলেন না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থ কে রক্ষা করিবে?" সে শুক্রবারেও আশুতোষ কলিকাতায় আসিলেন এবং শনিবারে বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাদি সারিয়া রবিবারে পাটনা যাত্রা করিলেন। তখন কে কল্পনা করিতে পারিয়াছিল, সেই যাত্রাই মহাপুরুষের মহাযাত্রা? কে মনে করিতে পারিয়াছিল, আশুতোষ আর কলিকাতায় আসিবেন না—আসিবে. তাঁহার মৃতদেহ?

বৃহস্পতিবারে তিনি যথারীতি কায করিলেও—শুক্রবার প্রাতে ভ্রমণে বাহির হইয়া অসুস্থ বোধ করিলেন। কেহই মনে করিতে পারিল না—পীড়ায় গুরুত্ব আছে।

শনিবার প্রাতে তিনি বুঝিলেন, পীড়া বাড়িতেছে। মধ্যম পুত্র শ্যামাপ্রসাদ বিশ্ববিদ্যালয় সম্মিলনের কাযে সিমলায় গিয়াছিলেন। আশুতোষ তাঁহাকে আসিবার জন্য টেলিগ্রাম করিতে বলিলেন। শুক্রবারে কলিকাতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাসমিতিগুলির কার্য্য স্থগিদ রাখিতে অনুরোধ করিয়া তার করা হইয়াছিল; শনিবারে ডাক্তার পাঠাইতে সংবাদ দেওয়া হইল। রবিবার প্রাতে ডাক্তার যখন পৌছিলেন, তখন তিনি বলিলেন—ব্যাধি শিবের অসাধ্য।

বেলা বাড়িতে লাগিল। বিকার দেখা দিল। বিকারের ঘোরে আশুতোষ কয় বার মৃতা কন্যার নাম ধরিয়া ডাকিলেন; কয় বার লেখককে ডাকিলেন—"কাগজ আন—নোট লিখিতে হইবে।"

মধ্যাহ্নের কিছু পূর্ব্বে তিনি, বোধ হয় কিছু বলিবার চেষ্টায়, জ্যেষ্ঠ পুত্র রমাপ্রসাদের গলদেশ বাহুবেষ্টিত করিয়া তাঁহাকে কাছে টানিলেন। কিন্তু—কথা আর ফুটিল না। বলিতে শোকে ভাষা মূক হয়—আশুতোষের বাক্‌রোধ হইল। মৃত্যুর ছায়া ঘনীভূত হইল।

শঙ্কাদুঃসহ দীর্ঘ দিবস—পলের পর পল জানাইয়া রাত্রির উদ্দেশে অগ্রসর হইতে লাগিল।

প্রভাত হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত যাঁহার গৃহে জন-কোলাহলের নিবৃত্তি হইত না; বন্ধুবান্ধব প্রার্থীতে যাঁহার গৃহ সর্ব্বদা পূর্ণ থাকিত, সেই আশুতোষ মৃত্যুশয্যায় শয়ান—দেহ হইতে জীবন দ্রুত বাহির হইয়া যাইতেছে; আর গৃহে—শয্যাপার্শ্বে কেবল অশ্রুপূর্ণনেত্র জ্যেষ্ঠ পুত্র—মধ্যম জামাতা—চিকিৎসক! অদৃষ্টের কি নিষ্ঠুর পরিহাস!

ক্রমে দিন শেষ হইল। গোধূলি যখন রাত্রিতে ডুবিয়া যাইবে, তখন বাঙ্গালার গৌরব-রবি মৃত্যুর সিন্ধুজলে ডুবিয়া গেল।

মধ্যম পুত্র ও বন্ধু সার নীলরতন সরকার যখন সিমলা হইতে আসিয়া পৌছিলেন, তখন সব ফুরাইয়াছে।

আশুতোষের শব কলিকাতায় আনিতে হইবে। মিষ্টার হাসান ইমাম চেষ্টা করিয়া স্পেশাল ট্রেণের ব্যবস্থা করিলেন। রাত্রি প্রায় ১০টার সময় সে ট্রেণ আশুতোষের শব লইয়া যাত্রা করিল।

সংবাদ প্রচার

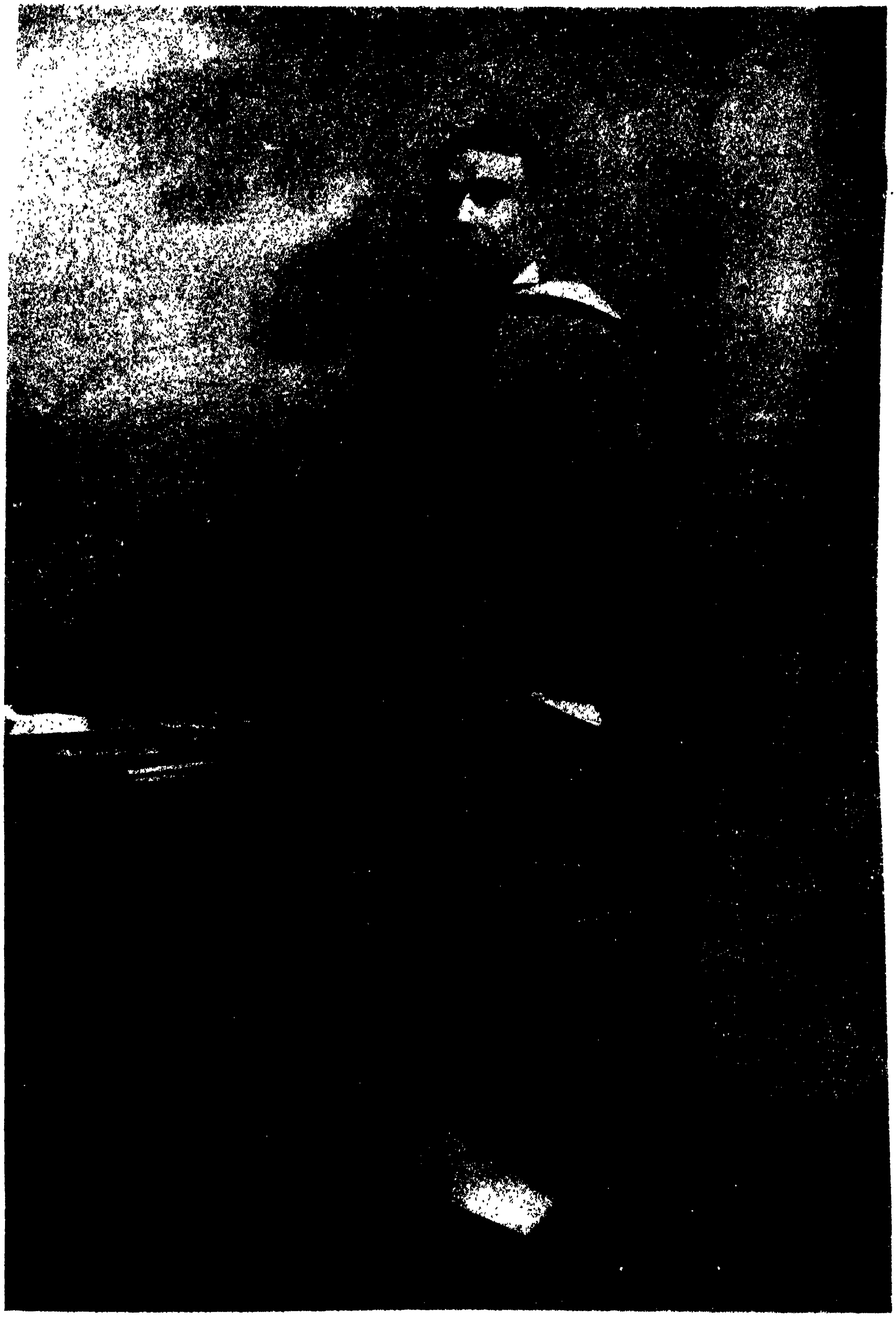
রবিবার সকালেও কলিকাতায় কেহ কল্পনা করিতে পারে নাই, আশুতোষের অবস্থা শঙ্কাজনক। অপরাহ্নে তাঁহার স্বজনগণ সংবাদ পাইলেন—সারিবার আশা নাই। এ যেন বিনামেঘে বজ্রাঘাত!

কিন্তু সহরে কেহ কোনরূপ উৎকণ্ঠার কারণ অনুমানও করে নাই।

সহসা রাত্রি ১১টার সময় সংবাদপত্রের কার্য্যালয়ে সংবাদ আসিল—আশুতোষ মৃত; তাঁহার শব কলিকাতায় লইয়া যাইবার ব্যবস্থা হইতেছে। যে শুনিল, সে-ই শোকে স্তম্ভিত হইল। এ যে অসম্ভব সম্ভব হইয়াছে! বাঙ্গালার দুর্ভাগ্য কি এমনই ভীষণ যে, সত্য সত্যই আশুতোষ মুখোপাধ্যায় অন্তর্হিত হইয়াছেন? রাত্রিতে সংবাদ প্রচারে বিলম্ব ও বিঘ্ন ঘটিল—প্রাতে সংবাদপত্র পাঠ করিয়া কলিকাতাবাসীরা এই দারুণ দুঃসংবাদ জানিতে পারিল—অশ্রুবর্ষণ করিল।

কলিকাতায়

সংবাদ পাইয়া আশুতোষের শবের প্রতি সম্মান-প্রদর্শন করিবার জন্য কলিকাতার গণ্যমান্য লোক হাওড়া ষ্টেশনে সমবেত হইলেন। প্রথমে শুনা গিয়াছিল, ট্রেণ ৮টার সময় ষ্টেশনে পৌছিবে। ক্রমে বিলম্ব হইতে লাগিল—শুনা গেল, ট্রেণ ১০টার সময় পৌছিবে। বেলা



আশুতোষ মুখোপাধ্যায় (ভাইস্‌-চান্সেলারবেশে)

বাড়িতে লাগিল—জনতাও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। যেন ষ্টেশনে লোক আর ধরে না।

সে দিন হাওড়ার সেতু খুলিবার দিন। অনেককে নৌকায় ও ষ্টীমারে পার হইতে হইল। গঙ্গাতীরে কলিকাতার দিকে রাস্তা যানে পূর্ণ হইয়া গেল। নদীর উভয় কূলই লোকে পূর্ণ। তেমন জনতা সচরাচর লক্ষিত হয় না। জ্যৈষ্ঠের প্রখর রৌদ্রেও কেহ স্থান ত্যাগ করিল না।

ট্রেণ আসিয়া পৌঁছিল। আশুতোষের শব গাড়ী হইতে বাহির করিয়া খাটে রক্ষিত হইল।

কিন্তু সেতু যুক্ত করিতে বিলম্ব হইতে লাগিল। শেষে জানা গেল, সেতুর একাংশের সংস্কার প্রয়োজন—বিলম্ব অনিবার্য্য। তখন কলিকাতা কর্পোরেশনের চীফ একজিকিউটিভ অফিসার শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু, বাঙ্গালার এডভোকেট শ্রীযুক্ত সতীশরঞ্জন দাশ, পোর্ট ট্রাষ্টে বাঙ্গালার দেশীয় সওদাগর সভার প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির চেষ্টায় একখানি ষ্টীমার সংগৃহীত হইল। সেই ষ্টীমারে কলিকাতায় শব নীত হইল।

ততক্ষণে কলিকাতার পারে লোক আরও বাড়িয়াছে। চীফ জাষ্টিস্ আদেশ দিয়াছেন, হাইকোর্ট সে দিন খুলা হইবে না; অন্যান্য আদালত বন্ধ হইয়াছে; বাঙ্গালা সরকারের আদেশে—বাঙ্গালার বিরাট পুরুষের প্রতি সম্মানপ্রদর্শনার্থ—সব সরকারী আফিস বন্ধ। লোক দলে দলে সহস্রে সহস্রে শবের শোভাযাত্রায় যোগ দিতে আসিল।

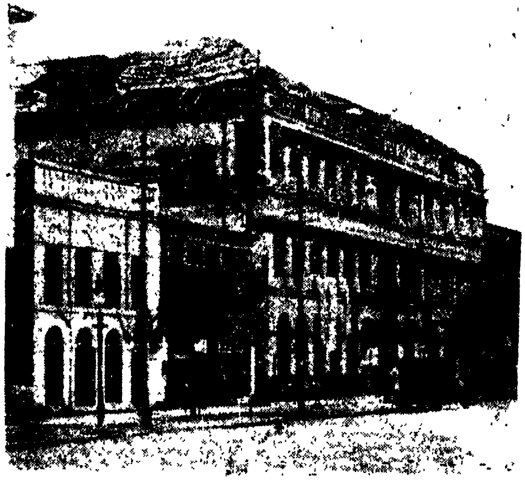
তখন শোভাযাত্রা আরব্ধ হইল। শব বহন করিয়া শববাহীরা হ্যারিসন রোড দিয়া পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইলেন; বিপুল জনতা তাঁহাদিগের অনুসরণ করিল। তাঁহারা যতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন, লোকের সংখ্যা ততই বাড়িতে লাগিল।

কলেজ ষ্ট্রীটের সঙ্গমস্থলে আসিয়া বাহকদল দক্ষিণদিকে



আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের শবদেহের শোভাযাত্রা

ফিরিয়া অদূরে বিশ্ববিদ্যালয়-গৃহে উপনীত হইলেন। সেনেট হাউসের অলিন্দে—প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের মর্ম্মর-মূর্ত্তির পার্শ্বে শব রক্ষিত হইল। তথায় অনেকে আশুতোষের শব দর্শন করিয়া লইলেন। জনতা মূক—কেবল মধ্যে মধ্যে "বন্দে মাতরম্" ধ্বনি উঠিতে ছিল। যে বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপে বিরাজিত ছিলেন, যথায় তিনি স্বাধীনতার জন্য তূর্য্যনাদ করিয়া বাঙ্গালীকে আহ্বান করিয়াছিলেন, যাহাকে তিনি সকল আপদ-বিপদ্ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই বিশ্ববিদ্যালয়-গৃহের অলিন্দে তাঁহার শব শায়িত !



আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের গৃহ

অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল পরে শব লইয়া শববাহীরা যাত্রা করিলেন। সর্ব্বত্র রাস্তা জনগণে পূর্ণ—গৃহের বাতায়নে ও অলিন্দে মহিলারা অপেক্ষা করিতেছিলেন। ক্রমে শববাহীরা ও তাঁহাদের অনুগামী বিরাট জনতা গড়ের মাঠে আসিয়া পড়িলেন— ভবানীপুরের দিকে অগ্রসর হইলেন। হরিশ মুখোপাধ্যায় রোড দিয়া যাইয়া— চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ষ্ট্রীট দিয়া শোভাযাত্রা রসা রোডে পড়িল।

সম্মুখে আশুতোষের গৃহ। আজ সে গৃহে শোকের আর্ত্তনাদ। ততক্ষণে আশুতোষের বিধবাকে গৃহে আনা হইয়াছে। তিনি ঘন ঘন মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িতেছেন। কন্যারা পুত্রবধূরা অশ্রুবর্ষণ করিতেছেন।

শব কেওড়াতলার শ্মশানে নীত হইল। তথায় যে বিরাট লোক সমাগম হইল, বুঝি তাহার তুলনা নাই। সকলেরই ইচ্ছা—একবার—শেষবার আশুতোষের মৃত্যু-নিশ্চল মুখ দেখিবেন—স্মৃতির আধারে তাহার ছবি সযত্নে রক্ষা করিবেন। দর্শনার্থীদিগের মধ্যে মহিলার সংখ্যা বড় অল্প নহে।

সূর্য্য যখন পশ্চিমগগনে হেলিয়া পড়িল, তখন বাঙ্গালার প্রতিভা-সূর্য্যের শব চিতায় শায়িত করা হইল। চন্দন কাষ্ঠে ও ঘৃতে পুষ্ট অনলশিখা ক্রমে আশুতোষের শব দগ্ধ করিয়া ফেলিতে লাগিল—চারিদিকে সহস্র কণ্ঠে "হরিবোল" ধ্বনিত হইতে লাগিল। বাঙ্গালার আকাশে বাতাসে যেন ক্রন্দন ধ্বনিত হইতে লাগিল। বাঙ্গালা যাহা হারাইল, তাহা আর পাইবে না; বাঙ্গালীর যে ক্ষতি হইল, তাহা আর কখন পূর্ণ হইবে না। বঙ্গ-জননীর নয়নে এ শোকাশ্রু নিবারিত হইবে কি ?

উপসংহার

আশুতোষের মৃত্যুতে সমগ্র বঙ্গদেশে—সমগ্র বঙ্গদেশে কেন, সমগ্র ভারতে শোকের প্লাবন বহিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কেন না, ভারতে তাঁহার অভাব সহজে পূর্ণ হইবে না।

যাহা গিয়াছে, তাহা আর আসিবে না। কিন্তু এখন এক বিষয়ে বাঙ্গালীকে বিশেষভাবে চিন্তা করিতে হইবে। আশুতোষের স্থান বিশ্ববিদ্যালয়ে কে অধিকার করিবেন ? কিছু দিন হইতেই সরকার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকার ক্ষুণ্ণ করিতে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। মিষ্টার মার্লের কার্য্যে তাহা সপ্রকাশ হইয়াছিল। তাহার পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাঙ্গালা সরকারের অধীন হইলে শিক্ষা-সচিব শ্রীযুক্ত (এখন সার) প্রভাসচন্দ্র যে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই।

আশুতোষ সে সব চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া আসিয়াছেন। আজ তিনি নাই। এখন কে সে চেষ্টা ব্যর্থ করিতে পারিবেন ? শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসুর শরীর অসুস্থ—তিনি যে আর অধিক দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভার বহন করিতে পারিবেন, এমন মনে হয় না। কিন্তু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সরকারের প্রভুত্ব—বিশ্ববিদ্যালয়কে সরকারের অধীন বিভাগে পরিণত করা কখনই কল্যাণকর বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। সে বিষয়ে বাঙ্গালীকে অবহিত হইতে হইবে।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

আশুতোষ চৌধুরী

গত ৯ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার প্রাতে সার আশুতোষ চৌধুরী লোকান্তরিত হইয়াছেন।

তাঁহার মৃত্যুতে বাঙ্গালার ও বাঙ্গালী সমাজের বিশেষ ক্ষতি হইল। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা দুর্গাদাস চৌধুরী মহাশয় প্রসিদ্ধ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন ও স্ত্রী-শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে সমাজ-সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন। রাজসাহীতে হরিপুরের ব্রাহ্মণ জমীদার চৌধুরীরা প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত বংশ। দিল্লীর বাদশাহরা চৌধুরীবংশের বংশপতিকে "চৌধুরী" উপাধি দিয়াছিলেন। আশুতোষ পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র।



সার আশুতোষ চৌধুরী

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়ন করিয়া একই বৎসরে বি, এ ও এম, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আশুতোষ শিক্ষার্থী হইয়া বিলাতে গমন করেন এবং তথায় কেম্‌ব্রিজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে সেণ্টজন্‌স কলেজে পাঠ করিয়া ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে অঙ্ক-শাস্ত্রের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন (Honours in Mathematical Tripos)। তথায় অবস্থানকালে তিনি 'ঈগল' পত্রের সম্পাদনও করিয়াছিলেন।

ব্যারিষ্টার হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তিনি ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় ব্যারিষ্টারী আরম্ভ করেন।

বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কন্যা প্রতিভা দেবীকে বিবাহ করেন।

ব্যারিষ্টারীতে অসাধারণ যশ অর্জ্জন করিয়া তিনি হাইকোর্টের জজ হইয়াছিলেন। জজীয়তী ত্যাগ করিয়া তিনি পুনরায় ব্যারিষ্টারী করিয়াছিলেন।

আশুতোষের সাহিত্যানুরাগ অসাধারণ ছিল। বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি 'ভারতী' পত্রে ইংরাজ কবিদিগের পরিচয় প্রদান করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার রচনায় বাঙ্গালী পাঠক সূক্ষ্ম সমালোচনা-শক্তির পরিচয় পাইয়াছিলেন।

তিনি কংগ্রেসের বিষয়ে মিষ্টার হিউমের আদর্শের আলোচনাও বাঙ্গালায় করিয়াছিলেন এবং গল্পও লিখিয়াছিলেন। পরিণত বয়স পর্য্যন্ত যে তাঁহার সাহিত্যানুরাগ অক্ষুণ্ণ ছিল, 'মাসিক বসুমতী'র পাঠকগণ তাহার পরিচয় পাইয়াছেন। তিনি উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতিত্বও করিয়াছিলেন।

কংগ্রেসের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। বর্ত্তমানে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির সভাপতিরূপে তিনিই প্রথম ভিক্ষানীতির বিরুদ্ধে কণ্ঠ তুলিয়া বলিয়াছিলেন—পরাধীন জাতির রাজনীতি নাই—A subject nation has no politics তিনি বহুবার কংগ্রেসে বক্তৃতা করিয়াছেন।

তিনি জাতীয় ভাবে ওতপ্রোতঃ ছিলেন। যখন বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সময় ছাত্রদিগকে রাজনীতিক আন্দোলনে যোগ দিতে নিষেধ করিয়া সরকার ইস্তাহার প্রচার করেন, তখন তাহার প্রতিবাদকল্পে যাঁহারা জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কল্পনা পুষ্ট করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতম।

পত্নী প্রতিভা দেবীর সাহিত্য ও সঙ্গীতানুরাগ অসাধারণ ছিল। স্বামীর সাহায্যে তিনি এ দেশে সঙ্গীতের উন্নতিকল্পে বহুবিধ চেষ্টা করিতে পারিয়াছিলেন। সে জন্য প্রতিভা দেবীর নাম বাঙ্গালী কৃতজ্ঞতা সহকারে—শ্রদ্ধাসহকারে স্মরণ করিয়া থাকে ও স্মরণ করিবে।

কয় বৎসর পূর্ব্বে সহসা প্রতিভা দেবীর মৃত্যু হয়। আশুতোষের পক্ষে সে শোক একান্তই দুর্ব্বহ হইয়াছিল। সেই শোকে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় এবং অল্পদিন মাত্র বিরহবেদনা ভোগ করিয়া তিনি মৃত্যুর ক্রোড়ে শোকের বেদনা ভুলিয়াছেন।

আশুতোষ সামাজিক শিষ্টাচারের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। অমন মিষ্টভাষী, অমন শিষ্টাচারী, অমন কোমলস্বভাব বাঙ্গালী-সমাজে বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

তিনি যে কত লোককে কতরূপে সাহায্য করিয়াছেন, তাহা বলা যায় না। বিশেষ তিনি আজীবন বহু ছাত্রকে গৃহে রাখিয়া তাহাদের শিক্ষার সব ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন।

তিনি যেমন উপার্জ্জন করিতেন, তেমনই ব্যয়ে মুক্তহস্ত ছিলেন—সে বিষয়ে তাঁহার গুণ দোষের সীমাকে স্পর্শ করিয়াছিল বলা যায়।

আশুতোষ এ দেশে শিল্পপ্রতিষ্ঠাবিষয়েও বিশেষ চেষ্টিত ছিলেন। তিনি মৃত্যুর ২ বৎসর পূর্ব্বে জার্ম্মাণীতে ও ফ্রান্সে যাইয়া এ দেশে শিল্পপ্রতিষ্ঠার সুযোগ লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছিলেন। দেশে ফিরিয়া তিনি সে সব সুযোগের সদ্ব্যবহার করিবার জন্য দেশের লোককে উপদেশ দিয়াছিলেন।

মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্ব হইতে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল এবং পত্নীর শোক তাঁহাকে একান্ত কাতর করে।

তিনি অজাতশত্রু ছিলেন এবং তাঁহার অমায়িক ব্যবহার সকলকেই মুগ্ধ করিত।

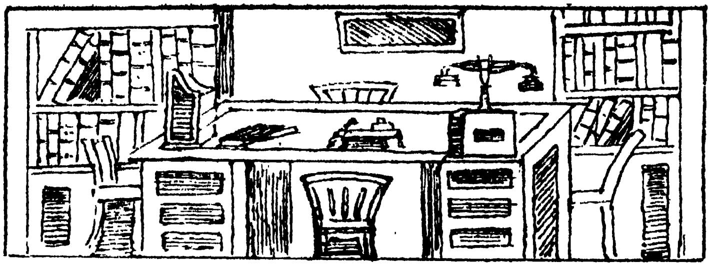
শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

মৃত্যু-জিগীষা

এই যে আমার কাব্যসৃজন, এই যে আমার গান
মৃত্যু সনে যুঝ্‌তে এরা অস্ত্র খরশান।
তার— সারাজীবন মরণ সাথে
যুঝ্‌ছি আমি হাতে হাতে
বুঝ্‌ছি আমি আঁতে আঁতে বীর সে মহীয়ান।

জিন্‌তে তারে পারবে না'ক হয় ত আয়ুধ মোর,
অসি কবচ সঁপতে হবে চরণ-তলে ওর।
তবু— বীর সে, বীরের মর্ম্ম জানে
শীর্ষ ছুঁয়ে সসম্মানে
করবে মোরে দিব্যধামে বীরের আসন দান।

শ্রীকালিদাস রায়

সাময়িক  প্রসঙ্গ

কবি বায়রণ



কবি বায়রণ

গত ১৯শে এপ্রিল কবি বায়রণের মৃত্যুর পর শতবর্ষ পূর্ণ হইয়াছে। গ্রীসের মুক্তির সংগ্রামে সাহায্য করিতে যাইয়া মেসোলঙ্গীতে—স্বদেশ-ত্যাগী কবির ঘটনাবহুল জীবনের অবসান হয়।

তিনি যে কত বড় কবি ছিলেন, তাহা তাঁহার যশের শতাব্দীকালব্যাপী অক্ষুণ্ণতায় প্রতিপন্ন হইবে। বাঙ্গালী অনুবাদে তাঁহার উদ্দীপনাপূর্ণ কোন কোন কবিতার আভাস পাইয়াছেন। অক্ষয়-চন্দ্র সরকার তাঁহার সমুদ্র-সম্ভাষণের অনুবাদ করিয়াছিলেন—

সুনীল গভীর সিন্ধো কল্লোলিয়া চল,
লক্ষ পোত বক্ষে তব বৃথা ভাসি যায়!
ধরাধাম ধ্বংস করে মানবের বল,
নর-গরিমার সীমা সাগর-বেলায়,
না থাকে আঁচড় কভু তব নীলকায়,
তব কীর্ত্তি তব অঙ্গে; মানব যখন
সহসা সাগর-গর্ভে বৃষ্টিবিন্দু প্রায়
হাবু ডুবু খেয়ে ডোবে, কে বল তখন
সে দেহ বহন করে? কে করে দহন?
কে বা হরিবোল বলে? কে করে ক্রন্দন?

বায়রণ বিলাসী ছিলেন—সংস্কারকে তিনি কুসংস্কার মনে করিতেন—ধর্ম্মে তাঁহার বড় আস্থা ছিল না—তিনি উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করিতেন। সেই জন্ত বিলাতের লোক তাঁহাকে তাঁহার প্রতিভার উপযুক্ত প্রশংসা প্রদানে কার্পণ্য করিয়াছিল। আজ শতবর্ষের ব্যবধানে তাঁহার ব্যক্তিগত সব কথা বিস্মৃতির অতলে গিয়াছে—আর তাঁহার কবিত্বপ্রতিভার দ্যুতি সাহিত্যাকাশ উজ্জ্বল করিয়া বিরাজিত।

পাঠকালে তিনি কতকগুলি কবিতা লিখেন। কোন পত্রে তাহার তীব্র সমালোচনা হয়। তাহাতে তাঁহার ক্রোধবহ্নি প্রজ্বলিত হয় এবং তিনি দারুণ বিদ্রূপপূর্ণ একটি দীর্ঘ কবিতা রচনা করেন। তাহা তৎকালে বিশেষ আলোচিত হয়।

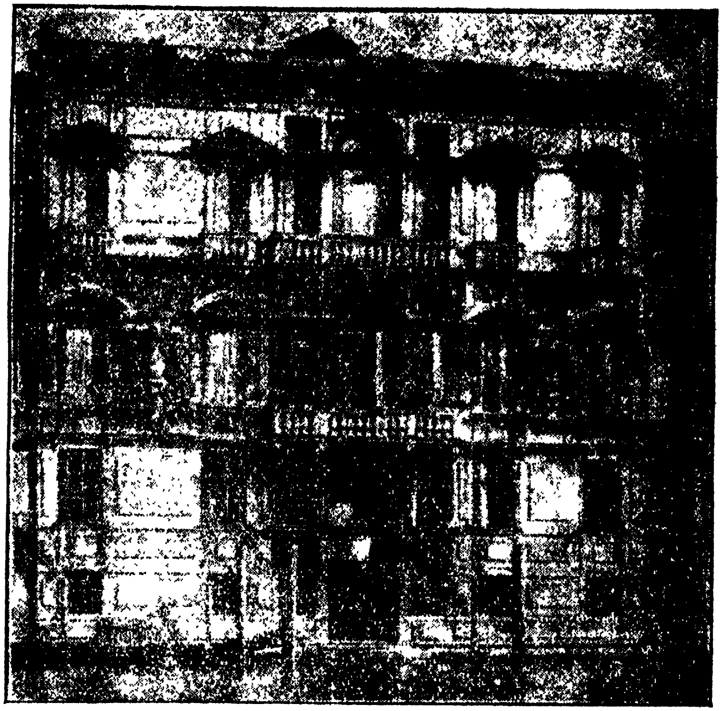
রাজনীতিক কারণে বিলাতের লোকমন যখন উদ্দীপনাপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, তখন বায়রণই তাহাদের কালোপযোগী কবিতা প্রদান করেন। তাই 'চাইল্ড হ্যারল্ড' রচনা করিয়া তিনি সহসা যশস্বী হয়েন। তিনি নিজে বলিয়াছেন, "এক দিন প্রাতে জাগিয়া আমি দেখিলাম, আমি যশস্বী হইয়াছি।" কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহার কবিতায় কবিপ্রতিভার যে জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হইয়াছিল, তাহাতেই তিনি ইংরাজ পাঠকসমাজের প্রিয় হইয়াছিলেন।

তাহার পর হইতে তিনি বহু কবিতা ও কাব্য রচনা করেন। সে সকলে তাঁহার প্রতিভার বৈশিষ্ট্য সপ্রকাশ ছিল। তিনি করুণরসাত্মক কবিতা রচনায় কিরূপ পারদর্শী ছিলেন—তাঁহার এক "প্রিসনার অব সিলন"

খণ্ড কবিতাতেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। 'ডন জুয়ান' বিরাট কাব্যে উচ্ছৃঙ্খল মতও প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে অসাধারণ শক্তির পরিচয়ও পাওয়া যায়।

তিনি স্বাধীনতার উপাসক ছিলেন। গ্রীসের অধিবাসীদিগকে স্বাধীনতা-লাভে প্রোৎসাহিত করিবার জন্য তিনি যে-সব কবিতা লিখিয়াছিলেন, সে সব কালজয়ী। আমাদের মত জাতির পক্ষে যে সে সব কবিতা পাঠের বিশেষ সার্থকতা আছে, তাহা বলাই বাহুল্য।

বাঙ্গালায় নবীনচন্দ্রের কবিতাতে স্থানে স্থানে বায়রণের কবিতার প্রভাব গোপন করাও সম্ভব হয় নাই। 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্যে পলাশীর যুদ্ধের পূর্ব্ব রজনীতে সিরাজের শিবিরের বর্ণনা বায়রণের রচনার ক্ষীণ অনুকরণ—



ভিনিসের গ্রাণ্ড কেনাল পার্শ্বস্থ পালাজো মেসিনিগো প্রাসাদ



নিউষ্টীড আবিতে লর্ড বায়রণের শয়নকক্ষ

"ও কি গো? কিছু না—শুধু
মেঘের গর্জ্জন।
নাচ, গাও, পান কর,
প্রফুল্লিত মন।"

পাঠ করিলে ওয়াটারলুর যুদ্ধের পূর্ব্ব-রজনীর অতুলনীয় বর্ণনা মনে পড়ে।

বায়রণের কবিপ্রতিভার উদ্দেশ্যে আজ বিদেশী আমরা—সাহিত্যসেবক ও মুক্তিকামী আমরা শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন করিতেছি।

রাজা শ্রীনাথ রায়

গত ২১শে জ্যৈষ্ঠ প্রাতে ভাগ্যকুলের রায় পরিবারের সর্ব্বাপেক্ষা প্রবীণ বংশ-পতি রাজা শ্রীনাথ রায় ৮৬ বৎসর বয়সে পরলোকগত হইয়াছেন। তিনি ও

াহার ভ্রাতা রাজা শ্রীযুত ানকীনাথ ও রায় সীতা-াথ রায় বাহাদুর বাঙ্গা-ার—বিশেষ পূর্ব্ববঙ্গে ই জনহিতকর অনুষ্ঠানে কাতরে অর্থ দান রিয়াছেন। রাজা সাহেব ষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন বং জীবনের শেষ ৩০ ৎসর কাল ধর্ম্মালোচনায় ও দেবার্চ্চনাতেই যাপন রিয়াছেন। পূর্ব্ববঙ্গের সিদ্ধ রাজাবাড়ী মঠ সংস্কৃত অবস্থায় পতনো-মুখ হইলে তিনি নিজ ব্যয়ে তাহার সংস্কার করাইয়া দেন। ঢাকা সারস্বত সমাজের তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। পূর্ব্ব-বঙ্গের সকল সৎকার্য্যে তাঁহার যোগ ছিল। আমরা তাঁহার পুত্র কুমার প্রমথনাথকে তাঁহার এই দুর্ব্বিষহ শোকে আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি।



রাজা শ্রীনাথ রায়

তারকেশ্বরে সত্যাগ্রহ

গত বারে আমরা পাঠকগণকে তারকেশ্বরের যে কথা জানাইয়াছি, তাহার পর অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সমগ্র বাঙ্গালী সমাজ এখন তারকেশ্বর তীর্থরক্ষার জন্য অগ্রসর হইয়াছেন।

তারকেশ্বরে সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করিয়া অনাচারী মোহান্তকে বিদূরিত করিবার চেষ্টা চলিতেছে। তারকনাথের ভোগ তীর্থযাত্রীদের—অতিথি, সাধু-সন্ন্যাসীদের সেবায় ব্যয়িত হইবার নিয়ম, কিন্তু এত দিন তাহার অধিকাংশ মোহান্তের বাটীতে লইয়া যাইয়া পোষ্যপ্রতিপালন করা হইতেছিল। স্বামী সচ্চিদানন্দ ঐ ভোগ আবার যাত্রীদিগকে দিবার ব্যবস্থা করিবার জন্য প্রথম সত্যাগ্রহ আরম্ভ করেন। তাহার ফলে মোহান্তের লোক বাধ্য হইয়া ভোগের কতক অংশ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু এই ভোগ-বিতরণ লইয়া স্বামী সচ্চিদানন্দ ও তাঁহার দুই জন স্বেচ্ছাসেবকের বিরুদ্ধে শ্রীরামপুর আদালতে এক মামলাও দায়ের হইয়াছে। মামলায় স্বামীজীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাঁহারা ভোগ লুঠ করিয়াছেন।

এই সত্যাগ্রহের গোলমালে ও যাত্রীদের প্রণামী প্রভৃতির নূতন ব্যবস্থায় তারকনাথের আয় ক্রমশঃই কমিয়া আসিয়াছে। মহাবীর দল ইহাতে বিচলিত হইলেন না। ইহার উপর দেবতার প্রণামী প্রভৃতির জন্য এই সময় আর একটা সুব্যবস্থা হইল। যে যাহা স্বেচ্ছায় প্রদান করিতে লাগিল, তাহা একটি বাক্সবন্দী করিয়া রাখিবার বন্দোবস্ত হইল—কোনও পক্ষেরই তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবার উপায় থাকিল না। পুলিস, মোহান্ত ও মহাবীর দল—তিন পক্ষ হইতেই সে বাক্সে চাবী পড়িল।

এইরূপে মহাবীর দল যখন একরূপ তারকেশ্বর অধিকার করিয়া বসিলেন, তখন আর এক নূতন গোলমাল দেখা দিল। শ্রীযুক্ত জটাধারী সিংহরায় প্রভৃতি যাঁহারা হুগলী আদালতে মোহান্তের বিরুদ্ধে হিন্দু সাধারণের নামে



তারকেশ্বর মন্দিরের সম্মুখে সত্যাগ্রহের দৃশ্য

তাঁহারা তখন গবর্ণমেণ্টের সহিত সত্যাগ্রহ করিয়া হিন্দু-সমাজের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার সঙ্কল্প করিলেন। বিশেষতঃ রিসিভার যখন কেবল মন্দির, দেবতার প্রণামী ও বাজারের উপরই কর্ত্তৃত্ব করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে চাহিলেন, তারকনাথের অন্যান্য বিষয়—সম্পত্তি—জমীদারী, মোহান্তের প্রাসাদ প্রভৃতিতে হস্তক্ষেপ করিতে চাহিলেন না, তখন সরকারী ব্যবস্থাটা যেন কেবল মহাবীর দলের সহিত বিরোধের মতই দেখাইতে লাগিল। সরকার পক্ষ হইতে বলা হইল, জমীদারী প্রভৃতি সম্বন্ধে আদালতের বিচারে স্বত্ব সাব্যস্ত হইয়া যাইলে হিন্দুসাধারণে তখন সে সম্বন্ধে যথা কর্ত্তব্য দেওয়ানী মোকর্দ্দমা আনিয়াছেন, তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের নিকট রিসিভার নিয়োগের প্রার্থনা করিলেন, মোহান্ত তাহাতে সম্মতি দিলে গবর্ণমেণ্ট তাহা সঙ্গে সঙ্গে গ্রাহ্য করিলেন। সরকারী রিসিভার ৫ই জ্যৈষ্ঠ পুলিস প্রভৃতির সাহায্যে মন্দির দখল করিতে আসিলেন। রিসিভার আসিলেন, কিন্তু হিন্দু জনসাধারণ পূজা প্রভৃতির ভার গবর্ণমেণ্টের হাতে তুলিয়া দিতে অসম্মত হইলেন।

করিতে পারিবেন। ব্যবস্থাটা কিন্তু এ পক্ষের কাহারও মনঃপূত হইল না। মহাবীর দল অতঃপর মোহান্তের প্রাসাদ অধিকার করিবার জন্য সত্যাগ্রহের আয়োজন করিলেন। অন্য দিকে রিসিভার যাহাতে মন্দির দখল করিতে না পারেন, তাহার জন্য মন্দিরে যাইবার সমুদায় পথে ধন্নার ব্যবস্থা হইল।

৬ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার হইতে মোহান্তের প্রাসাদ অধিকার



মোহান্তের প্রাসাদের সম্মুখে সত্যাগ্রহের দৃশ্য

করিবার জন্য সত্যাগ্রহ আরম্ভ হইল। পুলিস সেখানে সদলবলে উপস্থিত হইয়া সত্যাগ্রহীদিগকে গ্রেপ্তার করিতেছে এবং যথাসময়ে তাহাদের বিরুদ্ধে প্রাসাদে অনধিকার-প্রবেশ চেষ্টার অভিযোগের বিচার ও তাহাদের কারাদণ্ড হইতেছে। সেই অবধি প্রত্যহ দলে দলে সত্যাগ্রহ, কারাবরণ প্রভৃতি বেশ সুশৃঙ্খলার সহিত চলিতেছে।

সত্যাগ্রহের দ্বিতীয় দিবসে স্বামী বিশ্বানন্দ ১৪৪ ধারা অমান্য করিয়া তারকেশ্বরে অবস্থান পূর্ব্বক সত্যাগ্রহে যোগদান করেন। তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া চালান দেওয়া হয়।

স্থানীয় অধিবাসীরা কংগ্রেসের নিকট সত্যাগ্রহের ভার লইবার জন্য এক আবেদন পেশ করেন। তখন সিরাজগঞ্জে কনফারেন্সে তারকেশ্বরের ভার গ্রহণ করা স্থির হইয়া যায় এবং কংগ্রেসের পক্ষে শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র [illegible]

কংগ্রেস ভার লইলে স্বামী সচ্চিদানন্দ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া নিজে সত্যাগ্রহ করিবার জন্য প্রস্তুত হয়েন এবং ২৭শে জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার তিনি সদলে যাইয়া সত্যাগ্রহ করিয়া গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

রাজা বনবিহারী কাপুর বাহাদুর

বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ শ্রীযুত বিজয়চন্দের জন্মদাতা পিতা রাজা বনবিহারী কাপুর বাহাদুর গত ২১শে জ্যৈষ্ঠ পুত্রের কলিকাতাস্থ প্রাসাদে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। বনবিহারীর বয়স মৃত্যুকালে ৭১ বৎসর হইয়াছিল। তিনি অল্পদিন পূর্ব্বেও সবল ও সুস্থদেহ ছিলেন। অশ্বারোহণে তাঁহার পরম আনন্দ ছিল—তিনি পৌত্রের সঙ্গে [illegible] বেড়াইতে যাইতেন। জমীদারী কাযে তিনি

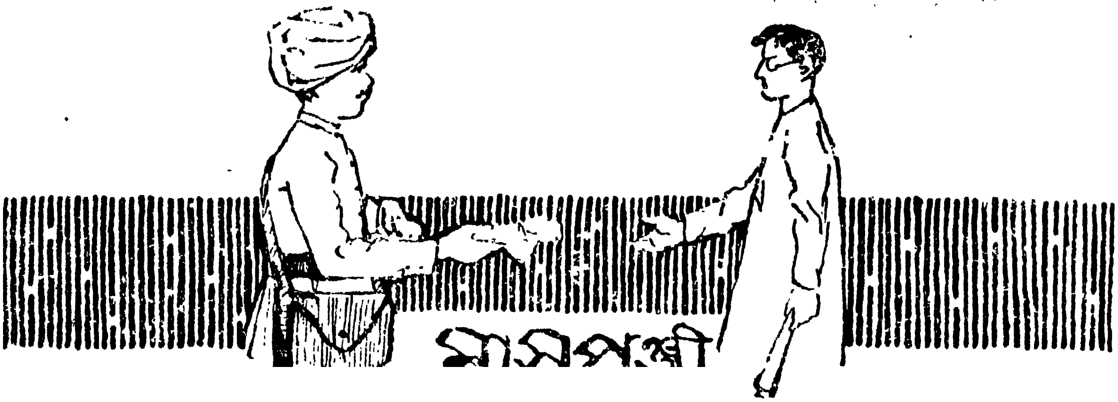
অসাধারণ দক্ষ ছিলেন। বাঙ্গালার প্রজাস্বত্ববিষয়ক আইনের সব খুটিনাটি তাঁহার নখদর্পণে ছিল। লর্ড রিপনের সময় সে বিষয়ে যে সভা হয়, তাহাতে তিনি অন্যতম বক্তা ছিলেন। তিনি প্রথমে সামান্য অবস্থাপন্ন ছিলেন; বৰ্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ মহাতাপচাঁদের এক ভ্রাতা তাঁহাকে দত্তক পুত্র গ্রহণ করেন। ক্রমে তিনি নিজ প্রতিভাবলে বৰ্দ্ধমানরাজের সর্ব্বময় কর্ত্তা হয়েন। তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যও ছিলেন, তিনি মহাতাপচাঁদের দত্তকপুত্র আফতাপচাঁদের ভগিনীকে বিবাহ করেন। লর্ড কারমাইকেল যখন জিলা বোর্ডে বে-সরকারী চেয়ারম্যান দিবার সঙ্কল্প করেন, তখন তিনি বৰ্দ্ধমানে বনবিহারীকে ও বহরমপুরে বৈকুণ্ঠনাথ সেনকে সে পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। বনবিহারী তখন সে পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমরা এই দারুণ শোকে মহারাজাধিরাজ বিজয়চন্দকে আমাদের সহানুভূতি জানাইতেছি।



রাজা বনবিহারী কাপুর বাহাদুর

বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতি

এবার মৌলবী আক্রাম খাঁর সভাপতিত্বে সিরাজগঞ্জে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। স্থানাভাবে আমরা সে অধিবেশনের বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করিতে পারিলাম না।



১লা চৈত্র—

কলিকাতা মাণিকতলায় খানাতল্লাসে পুলিস কর্ত্তৃক আবার বোমা বাহির : ২ জন বাঙ্গালী যুবক গ্রেপ্তার। ৩ আইনের আটক আসামী-দিগকে মুক্তি দিবার প্রস্তাবে বাঙ্গালা সরকার সম্মত না হওয়ায় কলিকাতায় জাতীয় দলের সভায় সমগ্র বাজেট নাকচের সঙ্কল্প পেশোয়ারের শিখ সভার সম্পাদকের প্রতি সীমান্ত প্রদেশ ত্যাগের নোটীশ। রোহিলখণ্ড-কুমায়ুন রেলপথে ঝড়ের ফলে ট্রেণ নাশ, পাঁচখানি গাড়ী নদীগর্ভে পতিত, বহু লোক হতাহত। খলিফার অস্তিত্ব-লোপে কামাল পাশার কৈফিয়ৎ। জার্ম্মাণ পার্লামেণ্ট ভঙ্গ। সাম্প্রদায়িক গণ্ডী-নির্দ্দেশক আইন হইতে উত্তমাশা অন্তরীপ প্রদেশের অব্যাহতি। পারস্যে বিদ্রোহীদের শাস্তি।

২রা চৈত্র—

মাদ্রাজ হাইকোর্ট কর্ত্তৃক অসহযোগ আন্দোলনে লিপ্ত সাত জন ব্যবহারাজীবের সনন্দ নষ্ট। প্রসিদ্ধ গুর্খা জন-নায়ক শ্রীযুত দলবাহাদুর গিরির কারামুক্তি। বাঙ্গালা কাউন্সিলে চরমানাইর সংক্রান্ত প্রশ্নে বাধা। পাটনায় বিহার-উড়িষ্যা অনুশীলন সমিতির বার্ষিক সভায় সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বক্তৃতা। দিল্লীতে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে সরকারী দাবী মঞ্জুরের শেষ পালা। আসামে আচার্য্য রায়ের সভাপতিত্বে ছাত্র কনফারেন্স। কলিকাতায় মুসলমান গ্র্যাজুয়েট সভায় স্বরাজ্যদলের বিরোধিতা। মিশরে জাতীয় পার্লামেন্টের প্রথম অধিবেশন।

৩রা চৈত্র—

গুজরাট গন্ধী ভাণ্ডারে রেঙ্গুনের কোন ভাটিয়ার দশ হাজার টাকা দানের কথা। দিল্লীতে জাতীয় দলের বৈঠকে লবণ-শুল্কের আলোচনা। উত্তর কলিকাতা কংগ্রেস কর্ত্তৃক নিযুক্ত শোভাবাজার তদন্ত কমিটীর অধিবেশন। ভারতের মুসলমান সমাজে নমাজের সময় পূর্ব্বতন খলিফা মহামান্য আবদুল মজিদ খাঁরই নামোচ্চারণের ব্যবস্থা। নোয়াখালীতে লবণ রাখার অপরাধে ভিখারী নর-নারীও গ্রেপ্তার।

৪ঠা চৈত্র—

ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে রাজস্ব আইনে পণ্ডিত মালব্যের আপত্তি ও তীব্র বক্তৃতা; মালব্যজীর প্রতিবাদ-প্রস্তাব ভোটের জোরে গৃহীত। যুক্তপ্রদেশেও এক দফা বাজেট বরাদ্দ অগ্রাহ্য। কলিকাতায় মিউনিসিপাল নির্ব্বাচন।

৫ই চৈত্র—

মৌলানা মহম্মদ আলির কলিকাতায় আগমন, গড়ের মাঠে কলিকাতা মোসলেম পলিটিক্যাল ক্লাবের সভায় সহরে গো-হত্যা সমিতি স্থাপনের প্রস্তাবে ও শ্রীযুত দাশের বিরোধিতায় মৌলানা সাহেবের প্রতিবাদ। কানপুরে বলশেভিক মামলা আরম্ভ। মুলতান মিউনিসিপ্যালিটীতে মদের দোকান বন্ধের ব্যবস্থা। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় শিক্ষা-মন্ত্রীর অন্যায় মন্তব্যে স্বরাজ্যদলের সভা ত্যাগ। মাণিকতলার বোমার সম্পর্কে বেঙ্গল টেকনিক্যালের ছাত্র গ্রেপ্তার। রঙ্গপুরে চারিটি বালিকার নিরুদ্দেশের সংবাদ। কাঁথীতে লবণ-তৈয়ারীতে কঠোর কারাদণ্ডের সংবাদ। ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় লবণ-কর হ্রাস। কুড়িগ্রামে বৈষ্ণবী-হরণের সংবাদ। পাঞ্জাবের জলন্ধর সহরে কলিকাতার শিখ নেতা সর্দ্দার লছমন সিংহের লোকান্তর।

৬ই চৈত্র—

সিরাজগঞ্জে নারী-হরণের মোকদ্দমায় বাদীর ও সঙ্গী পুলিস প্রভৃতির প্রতি আসামীদের প্রহারের সংবাদ। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় রাজস্ব ব্যয় না-মঞ্জুর, বড় লাট কর্ত্তৃক ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার অগ্রাহ্য রাজস্ব আইন পুনরায় বজায়। কলিকাতার মিউনিসিপাল রেলওয়ে ধ্বংসের প্রস্তাব। কলিকাতা খেলাফৎ সম্মিলনের অধিবেশন; মৌলানা মহম্মদ আলি সভাপতি।

৭ই চৈত্র—

ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে দমননীতি-মূলক আইনগুলির প্রত্যাহারের প্রস্তাব গৃহীত। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় সরকারের বহু দাবী অগ্রাহ্য। আফগান সরকারের আটক অস্ত্র-প্রত্যর্পণে সরকারের সম্মতি।

৮ই চৈত্র—

মাণিকতলা বোমা সম্পর্কে ত্রিপুরায় খানাতল্লাস, চাঁদপুরে গ্রেপ্তার, বেলগাছিয়ায় খানাতল্লাসে পিস্তল ও রিভলভারের সন্ধান। ডাঃ কিচলুর কারামুক্তি। গাজিয়াবাদে হিন্দু-মুসলমানে হাঙ্গামা। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সদলবলে চীন-যাত্রা। আয়র্ল্যাণ্ডে বৃটিশ সৈন্যের উপর গুলী, অনেকে হতাহত।

৯ই চৈত্র—

ফরক্কাবাদ জেলে পার্ব্বতী দেবীর প্রতি দুর্ব্ব্যবহারের অভিযোগ। কলিকাতায় কমলা বোর্ডিংয়ে পুলিসের খানাতল্লাস। অমৃতসর হইতে তৃতীয় সাহিদী জাঠের যাত্রা। নাভার শাসক মিঃ উইলসন জনষ্টন মোটর দুর্ঘটনায় আহত।

১০ই চৈত্র—

হোলি উৎসব উপলক্ষে পঞ্জাবের ঝঙ্গ জেলায় হিন্দু-মুসলমানে হাঙ্গামায় উভয় পক্ষেই কয়েক জন আহত। বরিশালে নাজিরের মহল্লায় ভীষণ অগ্নিকাণ্ড। উত্তরপাড়ায় ঘোষপাড়ার নৌকা-ডুবী, কয়েকজনের মৃত্যু।

১১ই চৈত্র—

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় মন্ত্রীর বেতন হ্রাসের প্রস্তাব গৃহীত। মধ্যপ্রদেশে স্বরাজ্যদলের উৎপাতে হস্তান্তরিত বিভাগগুলির ভারও

গবর্ণর গ্রহণ করিলেন। অমৃতসরে প্রবন্ধক কমিটীর প্রচারক ভাই অমর সিং গ্রেপ্তার। ভাই ফেরুতে এ পর্য্যন্ত দেড় হাজার আকালীর আত্মত্যাগের সংবাদ। জলপাইগুড়ী জেলায় ডুডুমারী গ্রামে যুবতী-হরণের সংবাদ। রাষ্ট্রীয় পরিষদে রাজস্ব আইনের আলোচনা। ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রেঙ্গুনে উপস্থিতি। ঢাকায় এক শাহা কর্ত্তৃক মুসলমানদের বিরুদ্ধে অভিযোগে ২৩ জন গ্রেপ্তার। বিলাতের পার্লামেণ্টে ভারতের শাসনসংস্কার সম্বন্ধে আলোচনা। কেপটাউনে শ্রীমতী নাইডুর সভা-সমিতিতে বক্তৃতার সংবাদ।

১২ই চৈত্র—

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় জেলের খরচ না-মঞ্জুর, পুলিসের ব্যয়ও কমিল। রাষ্ট্রীয় পরিষদে রাজস্ব আইন গৃহীত। বিহারের মন্ত্রী শ্রীযুত গণেশচন্দ্র দত্ত সিংহ তাঁহার মাহিনার বারো আনা অংশ স্বাস্থ্য বিভাগের জন্য দান করিলেন। জব্বলপুরের মিউনিসিপাল কমিটী জেলা ও কাউন্সিল বড় লাটের অভিনন্দন প্রদানে অসম্মত। বাঙ্গালার মন্ত্রীদের বেতনের টাকা বন্ধে লাট-প্রাসাদে পরামর্শ, মন্ত্রীদিগকে সদ্য সদ্য পদত্যাগ করিতে হইল না। তাঞ্জোরে ডাঃ নাইডু প্রভৃতির প্রতি ১৪৪ ধারা জারী করিয়া কংগ্রেস ও খেলাফৎ সম্মিলনে যোগদানে নিষেধ। আসামে পূর্ণ দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থার প্রস্তাব ভোটের জোরে গৃহীত। কানপুরের বলশেভিক মামলায় শ্রীযুত মানবেন্দ্র রায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগে বিলাতে প্রধান মন্ত্রী প্রভৃতির নিকট তাঁহার অনুযোগ।

১৩ই চৈত্র—

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় পুলিসের খাট-মশারির খরচ না-মঞ্জুর। তারকেশ্বরে মহাবীর দলের শাখা অফিস খুলিল। আসাম ব্যবস্থাপক সভায় ভূতপূর্ব্ব রাজনৈতিক বন্দীদের কাউন্সিল নির্ব্বাচনে বাধা দূর করাইবার প্রস্তাব। শোভাবাজার হাঙ্গামায় ট্যাক্সি-চালকের অর্থদণ্ড। বার্ম্মা ব্যবস্থাপক সভার মধ্যেই একজন সদস্য পুলিসে গ্রেপ্তার। গ্রীসে সাধারণতন্ত্র ঘোষণা, রাজা সিংহাসন-চ্যুত।

১৪ই চৈত্র—

জৈতোর দিকে চতুর্থ সাহিদী জাঠার যাত্রা। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার বন্দরের দাবীতে সরকারের পরাজয়। যুক্তপ্রদেশের কাউন্সিলে সরকারের দুইবার পরাজয়। মৌলানা হজরৎ মোহানীর দণ্ড-হ্রাস। বাঁকুড়ার মেডিকেল স্কুলে শ্রীযুত ঋষিবর মুখোপাধ্যায়ের ৫০ হাজার টাকার সম্পত্তি দান। লী কমিশনের কার্য্য শেষ। আচার্য্য প্রফুল্ল-চন্দ্রের কুমিল্লা পরিদর্শন। ইটালীতে পাহাড়ের ধ্বংসে অনেকের মৃত্যু।

১৫ই চৈত্র—

মাদ্রাজে ভূমি রাজস্ব বিল প্রত্যাখ্যাত। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় আবার বাজেট আলোচনা। মাণিকতলা বোমা সম্পর্কে ফরিদপুরে খানাতল্লাস। বাঙ্গালার শাসন পরিষদে শ্রীযুত ভূপেন্দ্রনাথ বসুর নিয়োগ। তাঞ্জোরে একজন এম এল সি কর্ত্তৃক ১৪৪ ধারা অমান্য করিয়া মিরাসদারদের সভায় যোগদান। বোম্বায়ের শ্রীযুত এন এম যোশীর কলিকাতায় আগমন। স্কোয়াড্রন-লীডার ম্যাকলারেণের ইংলণ্ড হইতে ভারত-যাত্রা।

১৬ই চৈত্র—

বারাকপুর চাঁদমারীর গুলীমারা ব্যাপার করোনারের মতে হঠাৎ সংঘটিত বলিয়া সাব্যস্ত। গুরুদ্বার কমিটীর ৫৭ জন সদস্যের দণ্ড। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় গবর্ণরের সেলুন ও সাম্রাজ্য প্রদর্শনীর ব্যয় না-মঞ্জুর। জব্বলপুরে বড়লাট গমনে হরতাল। শান্তিপুরে একজন বাগ্দী ও দুইজন মুচী কমিশনার। কলিকাতায় নিখিল ভারত গো-রক্ষিণী সভার ষষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশন, ভারত-সভাগৃহে কেরাণী-সংঘের অধিবেশন। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ভীষণ ঝঞ্ঝা।

১৭ই চৈত্র—

কলিকাতায় ইউনিভারসিটী ইনষ্টিটিউট হলে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের চতুর্থ বাৎসরিক অধিবেশন, সভাস্থলে হাতাহাতি, গোল-যোগে সভা-ভঙ্গ। কলিকাতা হইতে আগরপাড়া পর্য্যন্ত ১০ মাইল দৌড়ের প্রতিযোগিতা। লিলুয়া কারখানায় অগ্নিকাণ্ডে ৩ লক্ষ টাকা ক্ষতি। উপনিবেশ সংক্রান্ত অনুসন্ধান সমিতির ভারতীয় সদস্যগণের লণ্ডনে উপস্থিতি।

১৮ই চৈত্র—

মহাত্মা গন্ধীর সহিত স্বরাজ্য দলের পরামর্শ। ভাইকম সত্যাগ্রহ আশ্রমে খানাতল্লাস। ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে প্রস্তাব আদি গৃহীত। বড লাটের বিশেষ ক্ষমতায় রাজস্ব বিল মঞ্জুরে সরকারের কৈফিয়ৎ। তৃতীয় মন্ত্রিপদগ্রহণে শ্রীযুত প্রভাস-চন্দ্র মিত্রের অসম্মতি। চাঁদপুরের ল্যাংটা বাবার বিষম অধঃপতনের সংবাদ। কলিকাতায় পুরাতন করপোরেশনের শেষ অধিবেশন। জেমশেদপুরে শ্রমিকদের ধর্ম্মঘট। কেপ টাউনে জেনারেল স্মাটসের সহিত শ্রীমতী নাইডুর সাক্ষাৎ। সিংহলের বক্তৃতার জন্য মৌলানা সৌকৎ আলিকে গ্রেপ্তার করিবার কথা পার্লামেণ্ট মহাসভায় আলোচিত। ফ্রান্সে ভীষণ বন্যা, অনেকে হতাহত।

১৯শে চৈত্র—

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বাজেট আলোচনার সময় সরকার পক্ষের গোলমাল। মৌলানা সৌকৎ আলি অপেক্ষাকৃত সুস্থ। আসামে মন্ত্রীদের বেতন-হ্রাসের প্রস্তাব গৃহীত। আচার্য্য রায়ের চট্টগ্রাম-গমন। কানপুরের বলশেভিক মামলা দায়রায় সোপরদ্দ। মধুবাণীতে ভীষণ কাণ্ড, কয়েকজন জীবন্ত দগ্ধ।

২০শে চৈত্র—

ভাইকম সত্যাগ্রহে এক দল লোকের আপত্তিতে সত্যাগ্রহ ২ দিন স্থগিত। যুক্তপ্রদেশের কাউন্সিলে সরকারের আবার পরাজয়। আসামেও কয়েকটি দাবী অগ্রাহ্য। বাঙ্গালার মন্ত্রীদের বেতন-প্রদানে একাউণ্টেণ্ট-জেনারেলের আপত্তি। মাণিকতলার বোমার সম্পর্কে পাবনায় কয় স্থানে খানাতল্লাস। পাটনা ইঞ্জিনীয়ারিং স্কুলটিকে কলেজ করিবার প্রস্তাব। পুনা জজ-কোর্টে ডাকাতি। মাদ্রাজ কাউন্সিলে দেবোত্তর বিল গৃহীত। ভারতীয় জয়েণ্ট কমিটীর সভ্যগণ নিযুক্ত। পদচ্যুত খলিফার বিরোধিতায় তাঁহার অর্থ-সাহায্য বন্ধ।

২১শে চৈত্র—

তাঞ্জোরে পুলিসের জুলুমে তাহাদের সহিত তিন মুসলমান ভাইয়ের লড়াই। নাগপুরে শোভাযাত্রায় সমস্যা সম্পর্কে সরকারী তদন্ত কমিটীতে সাক্ষ্যগ্রহণ। আসাম কাউন্সিলে আবগারী বিভাগের দাবী না-মঞ্জুর। যুক্তপ্রদেশে শ্রীমতী পার্ব্বতী দেবীর মুক্তির প্রস্তাব গৃহীত। শ্রীযুত ভি জে প্যাটেল বোম্বাই কর্পোরেশনের নূতন প্রেসিডেণ্ট হইলেন। নাগপুরে মিউনিসিপ্যালিটী বয়কটের প্রস্তাব। হুগলী জেল হইতে পণ্ডিত শ্রীযুত মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ীর মুক্তি। নিখিল ভারত কংগ্রেসের তিলক ভাণ্ডারের হিসাব প্রকাশ। হাবড়া পিলখানার হাঙ্গামায় ১৩ জন আসামী দায়রায় সোপরদ্দ, ২ জনের মুক্তি। লাহোরে প্লেগের ভীষণ প্রকোপ। কলিকাতা নিমতলায় মোটর ডাকাতি, পিস্তলের গুলীতে দরোয়ান খুন, ৩ জন ডাকাত গ্রেপ্তার। সিন্ধুর লারকানা জেলায় আবার হিন্দু-মুসলমানে বিরোধ। হৃষীকেশে স্থানীয় মোহান্তের পক্ষসমর্থনে সভা। মাদ্রাজ কাউন্সিলে লঘু অপরাধী

মোপলাদের মুক্তির প্রস্তাব গৃহীত। লণ্ডনে ভারত-সচিবের দপ্তরে ভারতীয় উপনিবেশ কমিটীর অধিবেশন। মক্কা-যাত্রীর জাহাজ ফিরিঙ্গীস্থান অগ্নিকাণ্ডে ধ্বংস।

২২শে চৈত্র—

মহাত্মা গন্ধী কর্ত্তৃক আবার ইয়াং ইণ্ডিয়ার ভারগ্রহণ, পুরাতন কার্য্যপদ্ধতিতেই তাঁহার বিশ্বাস-প্রকাশ। কানপুর মিলে হাঙ্গামায় পুলিসের গুলীবর্ষণ, অনেকে হতাহত। বিখ্যাত ডাক্তার আর এল দত্ত মহাশয় লোকান্তরিত। লণ্ডনে তুর্ক বৈমানিক দল বিমান পরিচালন বিদ্যা শিখিতে গিয়াছেন। বৃটিশ গায়েনায় ধর্ম্মঘটীর উপর পুলিসের গুলী।

২৩শে চৈত্র—

বাবর আকালী ষড়যন্ত্র মামলায় ৯১ জন আসামী দায়রা সোপরদ্দ। খেলাফৎ প্রতিনিধিদের ছাড়পত্রে এখনও বাধা। ষ্ট্রাণ্ড রোড মোটর ডাকাতি সম্পর্কে কয় স্থানে খানাতল্লাস, একখানি মোটর ধৃত। আদালতের অবমাননায় লালা দুনীচাঁদের অর্থদণ্ড। লাহোরে প্লেগের প্রকোপে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা স্থগিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটে ব্যয়সঙ্কোচের আলোচনা। ২৪ পরগণা, প্রতাপনগরে সশস্ত্র ডাকাতি। বগুড়ায় প্রজা কনফারেন্স।

২৪শে চৈত্র—

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের কাউন্সিলে কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর ৫ জন অলডারম্যান নির্ব্বাচিত। আচার্য্যদেব কর্ত্তৃক স্বাজীগঞ্জ জাতীয় বিদ্যালয় পরিদর্শন। ঢাকার বহু নমঃশূদ্রের হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগের আশঙ্কা।

২৫শে চৈত্র—

কাউন্সিল-প্রসঙ্গে মহাত্মাজীর অভিমত, বাধা-প্রদানের নীতি ঠিক নহে। কোচিনে আইন অমান্যে শ্রীযুত জর্জ্জ জোসেফের নেতৃত্ব। শ্রীযুত কেশব মেনন ও মাধবনের কারাদণ্ড। বিহারে ব্যবস্থাপক সভার ব্যবস্থার উপর লাটের অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রয়োগ। কানপুর হাঙ্গামার তদন্ত কমিটি গঠিত। জৈঠোতে আর একটি সাহিদী জাঠ প্রেরণ। কলিকাতায় ইণ্ডিয়া প্রেসে অগ্নিকাণ্ডে ৭০ হাজার টাকা ক্ষতি। তারকেশ্বরে মোহান্তের লোক কর্ত্তৃক স্বামী বিশ্বানন্দের মাথা কাটিয়া আনিতে যাওয়ার অভিযোগ, স্বেচ্ছাসেবক প্রহৃত, মহাবীর দল কর্ত্তৃক বাজার লুঠের অজুহাত। ফিলাদেলফিয়া ও বারলিন হইতে সুবর্ণপদকপ্রাপ্ত, সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ডের সম্মুখে বেলগাছিয়ার উদ্যানের সভায় প্রশংসাপ্রাপ্ত স্বর্গীয় সঙ্গীতবিদ্যাবিশারদ কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের শোক-সভা। পাটনায় রাজনীতিক কনফারেন্স। বাঙ্গালী আটক আসামীদের সম্বন্ধে পার্লামেণ্ট মহাসভায় আলোচনা। প্রিন্স অব ওয়েলসের দক্ষিণ আফ্রিকাযাত্রা স্থগিত।

২৬শে চৈত্র—

পঞ্জাব কাসুরের কংগ্রেস সম্পাদক আবার ১৭ বি ধারায় গ্রেপ্তার। অনোয়াড সম্পাদক রাজদ্রোহে ধৃত। ডাকাতি সম্পর্কে কলিকাতার নানাস্থানে খানাতল্লাস। পাট পচানয় কচুরী পানার ব্যবহার সম্বন্ধে সরকারী ইস্তাহার প্রকাশ। শ্রীরামপুরে ষাটটা ডিনেমাইট প্রাপ্তি। ভাইকমে কংগ্রেস নেতাদের কারাবরণে মহাত্মার অভিনন্দন। গয়ায় মেথরদের ধর্ম্মঘট, কয়জনের গ্রেপ্তারে ৪০০ মেথর সত্যাগ্রহ করিয়া কারাবরণে অগ্রসর।

২৭শে চৈত্র—

লাহোরের বন্দে মাতরম্ পত্রিকার ক্ষতিপূরণ মামলায় হাইকোর্টে দণ্ডবৃদ্ধি। মৌলানা মহম্মদ আলি কর্ত্তৃক মহাত্মা গন্ধীর সহিত মুসলমান সমাজের তুলনার কথার প্রতিবাদ। কারাগারে অধ্যাপক গিদ্বানীর প্রতি দুর্ব্ব্যবহারের কথা। শ্রীরামপুরে জাল আমীনের কারাদণ্ড। পাঞ্জাবে প্লেগে এক মাসে ২৫ হাজার লোকের মৃত্যু। জামশেদপুরে ধর্ম্মঘটের অবসান। পার্লামেণ্টে ভারতীয় লাটদের ছুটীর কথার আলোচনা।

২৮শে চৈত্র—

পাঞ্জাব কংগ্রেসের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি আগা সফদারের কারামুক্তি। বালিয়ায় মাসবিক্রেতাদের উপর পুলিসের জুলুমে হুলস্থূল। ভাইকম সত্যাগ্রহে গ্রেপ্তার স্থগিত, কিন্তু রাজপথে পূর্ব্ববৎ বাধা, স্বেচ্ছাসেবকরা সমস্ত দিন অনাহারে দণ্ডায়মান। কলিকাতায় মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যোগেন্দ্রনাথ পোদ্দারের মৃত্যুতে ধাত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ। পার্লামেণ্ট মহাসভায় হাতাহাতি। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক তুর্ক সন্ধি মঞ্জুর।

২৯শে চৈত্র—

তারকেশ্বরে মোহান্ত কর্ত্তৃক মন্দিরদ্বার অসময়ে বন্ধে উপবাসী যাত্রীদের প্রতি নির্দ্দয়তা। বিহারের বিদ্যালয়সমূহে বালকবালিকাদের চরকা কাটার সম্বন্ধে ব্যবস্থাপক সভার প্রস্তাবে সরকারের সম্মতি। কলিকাতা কর্পোরেশনের নব নির্ব্বাচিত সদস্যগণের প্রথম অধিবেশন ও অলডারম্যান নির্ব্বাচন। বঙ্গীয় ছাত্র সংগঠন সমিতির উদ্যোগে কলিকাতায় ওভারটুন হলে সভা। পাঞ্জাবে গুরুদ্বার আইনের সংশোধন আদির জন্য সরকার কর্ত্তৃক আবার কমিটী-গঠনের প্রস্তাব। বিলাতে ভারতীয় জয়েণ্ট কমিটীর সদস্য মনোনীত।

৩০শে চৈত্র—

শিরোমণি কমিটীর ৫৭ জন সদস্যের মামলায় পঞ্জাব ব্যবস্থাপক সভার সদস্য সর্দ্দার যোধ সিং মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছেন, এই ধারণায় তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়নের সঙ্কল্প। কলিকাতায় বুদ্ধ বিহারে যুবক সম্মিলনীর অধিবেশন। ভাইকমে মিঃ জর্জ্জ জোসেফ প্রভৃতির কারাদণ্ড। তারকেশ্বর ব্যাপারে দেশবন্ধু দাশ মহাশয়ের তদন্ত কমিটী সংগঠনের কথা। যশোহর প্রতাপকাঠির নারী-নিগ্রহ মামলার আসামীদের শাস্তির সংবাদ। হংকং-গামী জাহাজে চীনা বোম্বেটের উপদ্রব।

৩১শে চৈত্র—

তারকেশ্বরে মহাবীর দলের চেষ্টায় যাত্রীদের উপর জুলুম বন্ধ। ক্লাইভ ষ্ট্রীট ও হ্যারিসন রোডের সঙ্গম-স্থলে মিঃ কেস নামক এক য়ুরোপীয়ের মোটরের উপর গুলী-নিক্ষেপের সংবাদ। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সাংহাইয়ে উপস্থিতি।

ভ্রম-সংশোধন

গত বারে শ্রীযুত ঋদ্ধিবর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের দানশীলতার সংবাদে দুইটি ভুল হইয়া গিয়াছে। তিনি কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর ভাইস-চেয়ারম্যান ছিলেন না, ছিলেন তাঁহার অগ্রজ স্বর্গীয় নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয়। আর, বাঁকুড়ার মেডিকেল স্কুল বাড়ীটির সংস্কারের জন্য স্কুল কর্ত্তৃপক্ষ দশ হাজার টাকার ওয়ারবণ্ড জমা রাখিয়াছেন।

সম্পাদক—শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

কলিকাতা, ১৬৬ বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী' বৈদ্যুতিক রোটারী মেসিনে শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



জল কলে

চিত্র— [illegible]

বসুমতী প্রেস



আষাঢ়] সচিত্র-মাসিক-বসুমতী [১৩৩১

গৃহস্থ-দর্শন

৩

গৃহস্থের এক প্রধান গুণ সাবধানতা, অবধান, অপ্রমাদ: প্রমাদের যে সকল হেতু, তাহা পরিহার করা একান্ত কর্ত্তব্য। আপনার জনকে পর মনে করা এবং পরকে আপনার মনে করা প্রমাদের একটা লক্ষণ, গৃহস্থ ব্যক্তি এইরূপ প্রমাদে পড়িয়া অনেক অকার্য্য করিয়া ফেলেন, স্বজনের কথা শত্রুবাক্যের ন্যায় পরিহার্য্য মনে করেন, স্বীয় শাস্ত্রের কথায় বিশ্বাসহীন হয়েন, পক্ষান্তরে, বিষকুম্ভ পয়োমুখ ছদ্মশত্রুর কথায় বিভ্রান্ত হয়েন। গৃহস্থের এই প্রমাদ নানা কারণে হয়, তন্মধ্যে স্বজন ও পরজনের স্পষ্ট লক্ষণ না থাকা একটা কারণ। স্বজনের লক্ষণ দেখিয়া যদি পূর্ব্ব হইতেই বুঝিতে পারা যায়, ইনি স্বজন, তাহা হইলে তাঁহাকে আর পর বলিয়া বোধ হইবার সম্ভাবনা থাকে না। স্বজনের লক্ষণ যত স্পষ্ট হয়, ততই চিনিবার পক্ষে সুযোগ হয়। আর একটা কারণ আত্ম-গুপ্তির অভাব। যদি গৃহদ্বার সর্ব্বদা উন্মুক্ত ও রক্ষকহীন অবস্থায় থাকে, তবে সেই সুযোগে গৃহমধ্যে তস্করের প্রবেশ ঘটিতেই পারে, গৃহদ্বার সুরক্ষিত থাকিলে এ ভাবে তস্করপ্রবেশ গৃহমধ্যে হয় না। তস্কর প্রবেশ করিলে, গৃহের বহুমূল্য দ্রব্য অপহরণেই প্রবৃত্ত হয়। অতএব আত্মগুপ্তি আবশ্যক। আত্মরক্ষা বা আত্মগুপ্তি সাব-ধানতার একটা বিশেষ অবস্থা।

এই সাবধানতা ভাষার সহিত বিশেষভাবে সংবদ্ধ। ভাষার ভিতর দিয়া মানব-মনোবৃত্তি সঞ্চরণ করে। ভাষা মনোবৃত্তির রাজপথ। ভাষার সাবধানতা ব্যতীত আত্মগুপ্তি কোনক্রমেই হয় না। এখন অসহযোগের আন্দোলন চলিয়াছে, কিন্তু ইহার মূলে যে পদ্ধতি অবলম্বনীয়, যাহা আশ্রয় করিয়া জাতি পরাধীন হইলেও স্বাধীন, মুমূর্ষু হইয়াও চিরজীবী থাকিতে পারে, সেই অসহযোগের প্রকৃত উপদেশ ধর্ম্মশাস্ত্রে আছে, ভাষার সংযম সেই অসহযোগের মূলমন্ত্র। "ন ম্লেচ্ছভাষাং শিক্ষেত" (বশিষ্ঠ স্মৃতি ৬ অঃ)। ম্লেচ্ছভাষা শিক্ষার ফলে যে সহযোগ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এখন সেই সহযোগ

পরিহারে বিদ্বেষ প্রকাশ পাইতেছে, কিন্তু শাস্ত্রাদেশ মানিয়া যদি ম্লেচ্ছভাষা শিক্ষা না করা হইত, যদি চাকুরির লোভে ম্লেচ্ছভাষা পাঠে দলে দলে লোক না ছুটিত, তাহা হইলে ত অনেক বিষয়ে অসহযোগ স্বতঃপ্রতিষ্ঠিত থাকিত। পূর্ব্ববর্ত্তী সামাজিকগণ শাস্ত্রকারদিগের দূরদৃষ্টি অনুভব করেন নাই, তাঁহারা ভাষাসংযমের উপদেশে ও ব্যবহারে কেন যে নিয়মের প্রগাঢ়তা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। বর্ত্তমানে ত এ সব কথাই উঠে না; এখন মূল-উপায়ে জ্ঞান নাই, তাহার অনুষ্ঠান নাই, কিন্তু ফলাকাঙ্ক্ষা আছে। তাহার জন্য নতুন-ক্রন্দন সর্ব্বত্র, এরূপ প্রমাদ এখন পদে পদে। ভগবৎকৃপা ব্যতীত এ প্রমাদ দূর হইবার নহে;— তাঁহার কৃপা হইলে সমাজ আর্যপদ্ধতি অবলম্বন করিবে, আত্মগোপ্তা বা আত্মগুপ্ত হইবে।

যজ্ঞকালে অযজ্ঞিয় ভাষা প্রয়োগ করিতে নাই, "নাযজ্ঞিয়াং বাচং বদেৎ"। ভাষার রন্ধ্রে মনে অযজ্ঞিয় ভাব যেন প্রবেশ না করে, ইহাই নিষেধের তাৎপর্য্য।

অতএব গৃহস্থ ব্যক্তির পক্ষে ভাষাসংযম সর্ব্বথা কর্ত্তব্য, প্রমাদের পথে বাধাদান ও আত্মগুপ্তির প্রধান উপায় ভাষাসংযম। সংযম অর্থে ভাষাগত এক বিশিষ্টতা প্রতিপালন। সে বিশিষ্টতা অন্য ভাষাতে আছে কি না, জানি না, সংস্কৃত ও সংস্কৃতমূলক ভারতীয় ভাষাসমূহে সে বিশিষ্টতা আছে। সে বিশিষ্টতা প্রতিপালনে যত্ন করিতে হইলে অন্য ভাষায় কথোপকথন পরিত্যাগ করিতে হয়।

গৃহস্থ মানবে বিহিত ভাষাসংযম অধুনা অপ্রতিপালিত হইলেও গৃহস্থ দর্শন ন্যায়শাস্ত্রে এই ভাষাসংযম সুরক্ষিত। ন্যায়াচার্য্যগণ যখন দেখিলেন, এই ন্যায়শাস্ত্রের ভাব অবলম্বন করিয়া কোন কোন মতবাদ শাস্ত্ররূপে সমাজে প্রবেশ করিতেছে, তখন তাঁহারা আপনাদিগের লক্ষণ প্রকট করিলেন, আপনাদিগের ভাষা অনন্যসাধারণ করিলেন। ন্যায়শাস্ত্রকে চিনিবার পক্ষে অন্যের আর কোন কষ্ট থাকিল না। যে ন্যায়শাস্ত্র গৃহস্থভাবে আপনার করুণা ও দানে সর্ব্বদর্শনের কল্যাণসাধন করিয়াছেন, তিনিই আপনার গৃহস্থভাবে যে বিশিষ্টতা আছে, ভাষার একটি দুর্ভেদ্য বেষ্টনী প্রদান করিয়া সেই বিশিষ্টতা অনাবিল করিয়া রাখিয়াছেন। সূত্রের ভাষ্যে ও বৃত্তিতে সে বিশিষ্টতা ছিল, কিন্তু অন্যে যেমন সেই বিশিষ্টতার অনুকরণ করিয়া নিজের সহিত সামাস্থাপনে প্রবৃত্ত হইয়াছে, পরবর্ত্তী আচার্য্যগণ তেমনই নূতন ভাবে আপনাদিগের বিশিষ্টতা রক্ষা করিয়াছেন, এ পক্ষেও গৃহস্থ-দর্শন সর্ব্বাগ্রগণ্য। সূত্র, ভাষ্য ও বৃত্তির ভাষা-সংযমের আলোচনা বারান্তরে করিব, আজ নব্য ন্যায়ের প্রসঙ্গ তুলিতেছি, নব্য ন্যায়ের চিন্তাধারা বৌদ্ধ-বিজয়ী মহামনীষী উদয়নাচার্য্যের হৃদয় হইতে অঙ্কুরাকারে উদ্ভূত, উপাধ্যায়চূড়ামণি গঙ্গেশের প্রতিভায় প্রবৃদ্ধ। বৌদ্ধ-ন্যায় যখন গৌতমীয়ন্যায়ের ভাষাবিশিষ্টতা অপহরণে প্রবৃত্ত, তখন উদয়নাচার্য্য বিশিষ্টতা রক্ষার নূতন উপায় করিলেন, সে ভাষা পাঠে সহজে এক প্রকার অর্থ অনুভূত হয়, কিন্তু তাহা অঘটন-ঘটনাময়, তেমন অর্থ ন্যায়মতে অসঙ্গত। আর একটি গূঢ় অর্থ আছে যাহা ন্যায়মতসিদ্ধ; এই যে ভাষার আত্মগুপ্তি, এই যে বৌদ্ধ-জৈনন্যায় হইতে আত্ম-বৈশিষ্ট্য রক্ষার জন্য ভাষার বেষ্টনী স্থাপন, তাহা প্রসিদ্ধ ন্যায়াচার্য্যগ্রন্থে পরিস্ফুট; দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি।

উদয়নাচার্য্যের লক্ষণাবলী গ্রন্থে দ্রব্যের যে সকল লক্ষণ আছে, তন্মধ্যে একটি, -

"গন্ধাসমবেত গগনারবিন্দসমবেত জাতিমদ্বা।"

এই লক্ষণ পাঠমাত্রে গগনারবিন্দ বা আকাশ-কমলের বোধ হয়, আকাশ-কমল আকাশ-কুসুমকেও অতিক্রম করে,—যে ন্যায়শাস্ত্র অসংখ্যাতির প্রতিকূল, সেই ন্যায়-শাস্ত্রের প্রকরণ গ্রন্থে আকাশ-কমলের কথা অতীব বিচিত্র। অসংখ্যাতি অর্থে যাহা একেবারেই নাই, তাহার অখণ্ড জ্ঞান, বিষয়ের অপ্রসিদ্ধি হেতু নৈয়ায়িকেরা এরূপ জ্ঞান মানেন না। খণ্ড খণ্ড ভাবে সে জ্ঞান হইতে পারে, খণ্ড খণ্ড অর্থে বিষয়বিভাগ। আকাশ-কুসুম বা আকাশ-কমল এইরূপ একটা অখণ্ড জ্ঞান হয় না, কেবল আকাশ ও কেবল কুসুম বা কমলের অখণ্ড জ্ঞান হয়। আকাশকে পৃথক্ বিষয় ও কমলকে পৃথক বিষয় ধরিয়া অথচ জ্ঞানের ভিতর একটা তাহার সম্বন্ধসূত্র রাখিয়া ভ্রম হইতে পারে—কিন্তু তাহা অসংখ্যাতি নহে, অন্যথাখ্যাতি। জলের কমলকে আকাশের বলিয়া বুঝাই ভ্রম—যাহা যাহার নহে, তাহা

তাহাতে আছে বলিয়া মনে করাই ভ্রম—অতএব তাহা অন্যথাখ্যাতি। অন্যথা (অন্য প্রকারে, যাহা যাহাতে নাই —সেই প্রকারে তাহাতে) খ্যাতি (জ্ঞান), অসৎ-খ্যাতি নহে। অতএব নৈয়ায়িকমতে আকাশ-কমল-ঘটিত লক্ষণ হইতে পারে না, কেন না, সেরূপ পদার্থ নাই, অথচ লক্ষণ আছে —"গগনারবিন্দসমবেত।" অতএব এ লক্ষণের অর্থ কি? অর্থ এই,—যাহা গন্ধে থাকে না, গগনে থাকে ও অরবিন্দে—পদ্মে থাকে, এমন যে জাতি, তাহা দ্রব্যত্ব, সেই জাতিই দ্রব্যের লক্ষণ, সেই জাতি বিশিষ্ট যাহা, তাহাই দ্রব্য। 'গন্ধে থাকে না ও গগনে থাকে' —এই যে 'থাকে না' তাহা 'অসমবেত' শব্দের এবং 'থাকে' ইহা সমবেত শব্দের অর্থ।

'থাকা' একটা সম্বন্ধ; সম্বন্ধ নানাবিধ শ্যামবাবু ঘরে থাকেন, এখানে থাকা এক সম্বন্ধ আর অগ্নিতে উষ্ণতা থাকে—এখানে থাকা আর এক সম্বন্ধ। শ্যামবাবু ঘর হইতে বাহিরে আসিতে পারেন ঘরের ভিতর যাইতেও পারেন, শ্যামবাবু যখন বাহিরে, তখন ঘরও আছে, শ্যাম-বাবুও আছেন, কিন্তু শ্যামবাবু তখন ঘরে নাই, পক্ষান্তরে, অগ্নিতে যে উষ্ণতা থাকে, তাহার থাকা এরূপ নহে অগ্নিও আছে এবং উষ্ণতাও আছে অথচ অগ্নিতে উষ্ণতা নাই, এমনটা ঘটে না, অগ্নি নির্ব্বাণ হইলে উষ্ণতা থাকে না বটে কিন্তু অগ্নি ও উষ্ণতাকে ঘর ও শ্যামবাবুর ন্যায় পৃথগ্‌ভাবে দেখা যায় না,—এই যে 'থাকা'র প্রভেদ, ইহা সম্বন্ধভেদমাত্র। শ্যামবাবু ও ঘরের সম্বন্ধ সংযোগ, অগ্নি ও উষ্ণতার সম্বন্ধ নিশ্চয়ই সেইরূপ নহে, তাহা হইলে শ্যামবাবু ও ঘরের ন্যায় অগ্নি ও উষ্ণতাকে পৃথগ্‌ভাবে দেখা যাইত, অগ্নি ও উষ্ণতার সম্বন্ধ আর কিছু; সে সম্বন্ধের পারিভাষিক বা ন্যায়শাস্ত্রীয় নাম 'সমবায়'; উষ্ণতা অগ্নিতে সেই সম্বন্ধে থাকে, এই জন্য উষ্ণতা অগ্নিতে 'সমবেত'। বরফে উষ্ণতা নাই, অতএব বরফে ঐ উষ্ণতা অসমবেত। উষ্ণতা অগ্নির একটা গুণ। অগ্নি দ্রব্য। গুণ যেমন দ্রব্যে সমবেত, জাতিও সেইরূপ দ্রব্যে সমবেত। জাতিকেও তাহার আশ্রয় হইতে পৃথগ্‌ভাবে দেখা যায় না। একটা ঘট দেখিলে সকল ঘটেরই স্বরূপজ্ঞান হয়—এই স্বরূপজ্ঞানের মূলে জাতি বর্ত্তমান। এক ঘটে যে ঘটত্বজাতি আছে, তাহা সর্ব্বত্র—এই জন্য একের পরিচয়েই সামান্যাকারে সকল ঘটের পরিচয় হয়। দ্রব্যত্ব ও জাতি সকল দ্রব্যে বর্ত্তমান এক দ্রব্যের পরিচয়ে সামান্যাকারে সকল দ্রব্যের জ্ঞান হয় সেই যে দ্রব্যত্বজাতি, তাহা গন্ধে অসমবেত, গন্ধে থাকে না। গন্ধ গুণ, পুষ্পে গন্ধ আছে, পুষ্প আশ্রয়, গন্ধ আশ্রিত, পুষ্প দ্রব্য গন্ধ গুণ, দ্রব্যত্ব দ্রব্যে থাকে, গুণে থাকে না। অতএব দ্রব্যত্ব গন্ধে অসমবেত, (গন্ধাসমবেত)। কিন্তু গগন সমবেত। গগন আকাশ দ্রব্য, শব্দ গুণ। আকাশে শব্দ থাকে, আকাশ আশ্রয়, শব্দ আশ্রিত। দ্রব্যত্ব, এই গুণাশ্রয় আকাশ দ্রব্যে থাকে এবং পদ্মেও সমবেত। পদ্ম দ্রব্য—দ্রব্যত্ব তাহাতেও সমবেত। এই জাতিই দ্রব্যের লক্ষণ। যতক্ষণ দ্রব্যকে বুঝাইতে না পারা যায়, ততক্ষণ দ্রব্যত্ব নাম লইয়া দ্রব্যের লক্ষণ করা যায় না। এই জন্য সেই জাতিটিকে বুঝাইবার জন্য 'গন্ধাসমবেত গগনসমবেত অরবিন্দসমবেত' এই কয়টি বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে। দ্রব্যত্বজাতি ব্যতীত আর কোন জাতিই ঐরূপ হইতে পারে না। 'সত্তা' একটি জাতি,—যাহা 'সৎ', সত্তা তাহাতে আছে। দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম —এই তিনটি 'সৎ' নামে প্রধানতঃ অভিহিত; 'সত্তা' এই তিন পদার্থেই আছে—'গন্ধাসমবেত' এই বিশেষণ না দিলে, সত্তা জাতিকে বাদ দেওয়া যায় না, গগন ও পদ্ম দ্রব্য সত্তা তাহাতে সমবেত, সেই সত্তা জাতি, দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম এই তিন পদার্থে থাকাতে তাহা দ্রব্য-লক্ষণ হয় না—লক্ষণ কেবল লক্ষ্যেই থাকিবে, তদতিরিক্তে থাকিবে না এবং সকল লক্ষ্যস্থলেই যাইবে, ইহাই লক্ষণের মর্ম্ম। সত্তা জাতি যখন লক্ষ্য দ্রব্যের অতিরিক্ত যে গুণ ও কর্ম্ম তাহাতেও থাকে, তখন তাহা দ্রব্যলক্ষণ নহে, এরূপ লক্ষণ হইলে তাহাতে অতিব্যাপ্তি-দোষ অর্শে। কেবল 'গন্ধাসমবেত' বলিলে রূপাদিতে অতিব্যাপ্তি হয় রূপে যে রূপত্বজাতি আছে, তাহা গন্ধে অসমবেত। 'গন্ধাসমবেত' 'গগনসমবেত' এই মাত্র বলিলে, 'গগন-সমবেত' এই অংশে উপলক্ষণ সম্বন্ধ বা বিশেষণ সম্বন্ধ বর্ত্তমান, তাহা বুঝা যায় না, অথচ এ স্থলে উপলক্ষণ সম্বন্ধই ধরিতে হইবে, ইহা বুঝাইবার জন্য 'অরবিন্দসমবেত' এই অংশ আছে। উপলক্ষণ ও বিশেষণে প্রভেদ এই যে, একের সম্বন্ধ

সাধারণ, অন্যের সম্বন্ধ অসাধারণ; অতএব সাধারণ বিশেষণ ও অসাধারণ বিশেষণ ইহা সহজসংজ্ঞা। উপলক্ষণ—বিশেষণকে স্পর্শ করে মাত্র, বিশেষণ একেবারে জড়াইয়া থাকে। পাচক ব্রাহ্মণ স্নান করিতে যাইতেছেন—এখানে পাচকত্বের ব্রাহ্মণে উপলক্ষণ সম্বন্ধ, যখন স্নান করিতে যাইতেছেন, তখন তাঁহার পাচকত্ব না থাকিলেও, তিনি পাকপ্রবৃত্ত না থাকিলেও—কোন সময়ে তিনি পাচক বলিয়া পাচকত্বের সাধারণ সম্বন্ধ তাঁহাতে আছে, অথচ এ পাচকত্ব তাঁহাকে বিশেষণের মত জড়াইয়া নাই, সেইরূপ জড়াইয়া থাকিলে, ঐরূপ প্রয়োগ হয় না। যেমন শুক্লাম্বরশোভিত রামনাথ গমন করিতেছেন—এ স্থলে 'শুক্লাম্বরশোভিতত্ব' বিশেষণ, শুক্লাম্বর রামনাথকে একেবারে জড়াইয়া আছে। শুক্লাম্বর না হইয়া স্বর্ণাঙ্গুরীয় হইলেও ঐ বিশেষণ জড়াইয়া থাকিত, রামনাথ শুক্লাম্বর ছাড়িয়া নীলাম্বর পরিধানে গমন করিলে, তখন আর তাঁহাকে শুক্লাম্বর-পরিশোভিত বলা যাইবে না। কেন না, তখন তাঁহার শুক্লাম্বর কটিদেশে নাই। এ সম্বন্ধ পাচক-ব্রাহ্মণের পাচকত্ব সম্বন্ধবৎ নহে যে, অন্য সময়েও পাচক বলিবে। স্কুলের ছাত্ররা আমার ভুল ধরিতে পারেন, "শুক্লাম্বর-পরিশোভিতত্ব' বিশেষণ হইল কিরূপে? 'শুক্লাম্বর-পরিশোভিত' ইহা বিশেষণ বটে," তা হউক, আমরা বুড়ো মানুষ, কত ভুলই আছে, ব্যবস্থায় ভুল, সমাজ-জ্ঞানে ভুল, ঠকামিতে ভুল, সভ্যতায় ভুল, ঠিকে ভুল; আমাদের ভুল পদে পদে, না হয় এখানেও আর একটা ভুল বাড়িল, বোঝার উপর শাকের আঁটিটা বৈ ত নয়। তবু কিছু বলা ভাল; যাহা বিশেষ্যকে সাধারণ ভাব হইতে পৃথক্ করে, তাহা বিশেষণ, "শুক্লাম্বর-পরিশোভিতত্ব" রামনাথকে অন্য ভাব অন্য বস্ত্রধারণাবস্থা ও নগ্নাবস্থা হইতে পৃথক্ করিতেছে, তাই তাহা বিশেষণ। কিন্তু বিশেষণকে জড়াইয়া না থাকিলে তাহা আমাদের উদ্দিষ্ট অসাধারণ বিশেষণ নহে, উপলক্ষণ মাত্র। এখন দেখ, ঐ যে দ্রব্যলক্ষণ, উহাতে গগনসমবেতত্ব যদি জাতির বিশেষণ হয়, তাহা হইলে গগনসমবেতত্ববিশিষ্ট জাতিমান্—কেবল গগনই হয়, অন্য দ্রব্যে ঐ জাতি থাকিতে পারে না। কেন না, গগনসমবেতত্বজড়িত জাতির মধ্যে রামনাথের শুক্লাম্বর-পরিশোভিতত্বে শুক্লাম্বরের ন্যায় গগন বিশেষভাবেই উপযোগী, শুক্লাম্বর ছাড়িয়া রামনাথকে যেমন ঐখানে ধরা যায় না, গগন ছাড়িয়া এখানেও তেমনই জাতিকে ধরা যাইবে না। গগনকে না ছাড়িলে ঐ যে গগন সমবেতত্ববিশিষ্ট জাতি, তাহা অন্যত্র থাকে না, অতএব পৃথিবী, জল ইত্যাদি দ্রব্যে দ্রব্যলক্ষণ থাকিল না, লক্ষ্যে লক্ষণ না যাইলে অব্যাপ্তিদোষ হয়। এই জন্য 'অরবিন্দসমবেতত্ব' বিশেষণ, এই বিশেষণ দেওয়ার ফলে বুঝা গেল, এ দুইটিই অসাধারণ বিশেষণ নহে, এ দুইটি অসাধারণ বিশেষণ হইলে, 'গোলাকার চতুষ্কোণ' শব্দ প্রয়োগের ন্যায় একান্ত বিরুদ্ধার্থ হইয়া উঠে; যে বস্তু গোলাকার, তাহা চতুষ্কোণ হয় না, যাহা চতুষ্কোণ, তাহা গোলাকার হয় না, সেইরূপ গগনসমবেতত্ব অসাধারণ বিশেষণ হইলে সে জাতির আশ্রয় কেবল গগনই হয়, অরবিন্দসমবেতত্ব অসাধারণ বিশেষণ হইলে সেই জাতির আশ্রয় কেবল অরবিন্দই হয়, সুতরাং একত্র দুইটি অসাধারণ বিশেষণ যোগ একেবারেই বিরুদ্ধ, অথচ দুইটি বিশেষণ আছে। সুতরাং ঐ দুইটিকে অসাধারণ বিশেষণ বলা যায় না, সাধারণ বিশেষণই বলিতে হয়। আমি যাহা সাধারণ বিশেষণ নাম দিয়াছি, তাহার ন্যায়মত প্রচলিত সংজ্ঞা উপলক্ষণ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, উপলক্ষণ বিশেষণকে জড়াইয়া থাকে না। এখানেও দেখ, গগনসমবেতত্ব ও অরবিন্দসমবেতত্ব যদি জাতিকে একেবারে জড়াইয়া থাকিতে না পারিল, তাহা হইলে আর কোন বিরোধ নাই। দ্রব্যত্ব জাতি গগনসমবেতও বটে, অরবিন্দসমবেতও বটে, সুতরাং ঐ বস্তুদ্বয়সমবেতত্ব সাধারণভাবে যে জাতিত্বে আছে, তাহা দ্রব্যত্ব—ঐরূপ ভাবেই ঐ লক্ষণ করা হইয়াছে। এতগুলি বিশেষণের বিশেষ্য জাতি, জাতি না বলিলে, রূপ এক, গগন দুই, অরবিন্দ তিন—এই যে ত্রিত্ব সংখ্যা, তাহা জাতি নহে, গুণ এই ত্রিত্ব সংখ্যার একটা সম্বন্ধ রূপেও আছে, সুতরাং রূপে অতিব্যাপ্তি হয়। রূপ, দ্রব্য না হইলেও দ্রব্যাশ্রিত গুণ হইলেও তাহাতে দ্রব্যলক্ষণ যাইয়া পড়ে। জাতি বলিলে সে দোষ হয় না। রূপে ত্রিত্ব সংখ্যা সমবায় সম্বন্ধে থাকে না, পর্য্যাপ্তি সম্বন্ধে থাকে, অথচ উক্ত জাতির সমবায় সম্বন্ধে যাহা আশ্রয়, তাহাই

দ্রব্য, এই মর্ম্মের লক্ষণ করিতেই হইবে,তাহা হইলে 'জাতি' না বলিলেও ত রূপে অতিব্যাপ্তি নাই, এরূপ আশঙ্কা করিতে পার বটে, কিন্তু তাহার উত্তরও স্পষ্ট। লক্ষণ ত 'জাতিমৎ' আছে, সমবায় সম্বন্ধের সূচক নাই, জাতি শব্দ প্রদানই সেই সমবায় সম্বন্ধের স্থান, যাহা গন্ধাসমবেত, গগনসমবেত ও অরবিন্দসমবেত,তাহার সমবায় সম্বন্ধ যথায় বর্ত্তমান, তাহাই দ্রব্য। এইরূপই ঐ লক্ষণের মর্ম্মার্থ; জাতি শব্দ প্রয়োগ না করিলে, ঐরূপ ভাব অভিব্যক্ত হইত না।

এই হইল ভাষাসংযম বা ভাষাবিশিষ্টতার একটি ক্ষুদ্র উদাহরণ। ইহার মধ্যে যে পর্য্যাপ্তি ও সমবায় সম্বন্ধের কথা উঠিয়াছে, বারান্তরে তাহার বিচার করিয়া ভাষাবিশিষ্টতার কিরূপ প্রসার গঙ্গেশোপাধ্যায় নব্য ন্যায়ে আছে, তাহা যথাসম্ভব সহজে ও সংক্ষেপে বুঝাইবার ইচ্ছা থাকিল।

শ্রীপঙ্ক

নারী

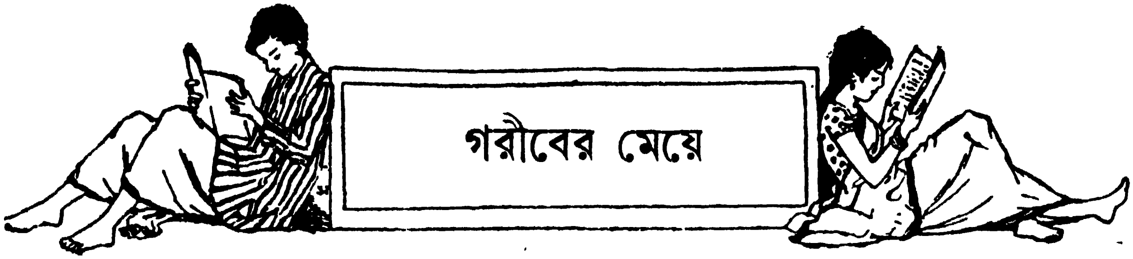
'বিশ্ব-দেবের অতুল সৃষ্টি
প্রকৃতির লীলা-ভূমি
অসীম কালের আনন্দ-মধু
অন্তরে তব বহে আনা শুধু
সুন্দর অতি মন্থর গতি
মঙ্গলময়ী তুমি।'
সঙ্কোচে কহে সরি' এক কোণে
সঙ্গীত-স্বরে তারি
'পরিচয় মোর কিছু নাই আর,
হে পুরুষ, শুধু নারী।'

'যাও দূরে সরি' অভিশাপ চির
ধরণীতে ধূমকেতু।
এ কি সচপল চল-চঞ্চলা
বিলাস-আলসে লুলিতাঞ্চলা
ছলনা-মূর্ত্তি খলতা-বৃত্তি
চির-বন্ধন-হেতু।'
অশ্রু-সজল ব্যাকুল কণ্ঠে
লুটায়ে চরণে তারি
রমণী কহিল—'হে সাধু পুরুষ,
এ যে গো কেবলি নারী।'

'চিনিতে নারিনু রমণী তুমি কি
মানুষী পিশাচী দেবী ?
নির্ঝর-ঝর প্রীতি রস-ধারে
প্রেমের তীর্থে বরিছ সবারে
সত্য মিথ্যা কে জানে তোমারে
ভাবনা, ডরি কি সেবি।'
করুণে চাহিয়া হাসিয়া কাঁদিয়া
মধুরে কহিল সে
'ভ্রান্ত পুরুষ কি ভাবনা, ভয়
এ শুধু রমণী যে!'

কম্পিত-হৃদে পুলকে হর্ষে
পুরুষ যখনি কহে
'জননী-ভগিনী-প্রণয়িনী নাম,
যথাযোগ্য লও অর্ঘ্য-প্রণাম
সিক্ত করেছ শুষ্ক জগতে
সার্থক স্নেহ ব'হে।'
সে দিনও কণ্ঠে পুলকে ঢালিয়া
অন্তর-সুধাবারি
রমণী বুঝাল ভক্ত পুরুষে
সে যে গো শুধুই নারী!

শ্রীভক্তিসুধা হার (রায়)



গরীবের মেয়ে

চতুৰ্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

পৃথিবীকে অচলার মতই দেখাইলেও যেমন ভূগোল-শাস্ত্রে তাহার বিপরীত প্রমাণ পাওয়া যায়, মানুষের জীবনস্রোতকেও কখনও কখনও রুদ্ধগতি বোধ হইলেও বাস্তবিকই কালচক্র কোনও স্থানে এবং কোন দিনই যে গতিহারা হইয়া থাকে না, সহসা অতর্কিতে সে তাহা একদা প্রমাণ করিয়া দেয়। স্বর্ণলতার দশম-বর্ষীয় জীবন চল্লিশের পরেও ঠিক একই বিধিতে বদ্ধ হইয়া চলিয়া আসিলেও সে দিনের ভোরে সেই যে সহসা স্রোতোহত হইয়া পড়িয়াছিল, তখন হইতে তাঁহার জীবন-নদীর মুখ ফিরিয়া দাঁড়াইল, পুরাতনে সে আর প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিল না। সুশীল তাহার যথাসাধ্য, এমন কি, তাহারও চেয়ে অধিক করিয়াছিল। অর্থাৎ নিজে জলে পানি না পাইয়া গৃহস্বামীর অজ্ঞাতে যজ্ঞেশ্বর ডাক্তার, নন্দলাল কবিরাজ, এমন কি, ঠিক সম্মুখবর্ত্তী প্রতিবেশী সেখ কেরামতুল্লার অনুরোধে হাকিম নসীর-কেও ডাকিয়া আনিয়া রোগী দেখাইয়াছিল, কিন্তু সকল ফলই সমান হইল, অর্থাৎ অফলা হইয়া গেল। চিকিৎসাশাস্ত্রের বিভিন্ন পথাবলম্বী তিন ব্যক্তির মধ্যে ঔষধ-নির্ব্বাচনে যতই কেন না অনৈক্য ঘটুক, রোগ-নির্ণয়ে কিন্তু সকলেই একতাবলম্বন করিয়াছিলেন। রোগ যে এপিলেপ্সি বা অপস্মার, তাহাতে সন্দেহ নাই। রোগীর জীবনে আপাততঃ ভয় নাই বটে, কিন্তু তাহাতে ভরসাও কম, যে কোন উত্তেজনায় প্রাণবিয়োগ হইতে পারে। বাক্‌শক্তি চিরদিনের মত একেবারে চলিয়া গিয়াছে। যজ্ঞেশ্বর বাবু বলিলেন, "ইঁহার জীবনে যে এইরূপ ঘটনাই ঘটিবে, তাহা যে কেহ অনুমান করিবার ইচ্ছা করিলেই করিতে পারিত। তবে এখনও এ অবস্থার চেয়ে ইঁহার মৃত্যু ঘটিলেই শুভ হইত এবং শীঘ্রই তাহা ঘটাও অসম্ভব নহে।"

ডাক্তার চলিয়া গেলে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুশীল ভাবিল, বাস্তবিকই ডাক্তারীতে মানুষের মনকে কতকটা কঠোর করে। আহা, বেচারী জ্যেঠাইমা! না, উঁহাকে ভাল করিতে হইবে। না হইলে নীলিমার কি হইবে?

সুশীল স্বর্ণলতার জীবন-মরণের মধ্যে যে নীলিমার জন্যই বিশেষ করিয়া চিন্তিত হইল, তাহার কারণ, এ কয় দিনে সে কি দিনে কি রাত্রিতে সদাসর্ব্বদাই নীলিমার সান্নিধ্যে থাকিয়া তাহাকে ভাল করিয়াই দেখিয়াছে। তাহার অবস্থা যে কত দূর শোচনীয়, তাহাও সে এই সুযোগে অন্তর দিয়া অনুভব করিয়াছে। এই মা ভিন্ন জগতে যে তাহার মুখ চাহিতে দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই, ইহা বুঝিয়াই এই দুরবস্থা-পালিতা কিশোরীর প্রতি তাহার স্নেহ সহানুভূতির যেন আর অবধি ছিল না। তাহার স্বর্ণলতাকে বাঁচাইবার ইচ্ছা ও চেষ্টা ইহার মুখ চাহিয়াই যেন শতগুণে উথলিয়া উঠিয়াছিল। দিনের মধ্যে অন্ততঃ পচিশবারও সে নীলিমাকে এ বিষয়ে তাহার আন্তরিক বিশ্বাস জানাইতেছিল। তাই যজ্ঞেশ্বর বাবুর মন্তব্যে তাহার মনটা বিশেষ-ভাবেই বিমর্ষ হইয়া গেল। এমন সময় দ্বারের দিকে চাহিতেই সে দেখিল, নীলিমা আড়ষ্ট কাঠের মত হইয়া সেই ভাবে দাঁড়াইয়া আছে। সে সবই শুনিয়াছে বুঝিয়া সুশীলের মনে বড় দুঃখ হইল, কাছে আসিয়া স্নেহশীতল স্নিগ্ধ কণ্ঠে সে কহিল, "ও সব বাজে কথায় মন খারাপ করো না, আমি বলছি, জ্যেঠাইমা ভাল হবেন!"

সহসা দৈববাণীর মতই এই দৃঢ় উচ্চারিত আশ্বাসবাণী কয়টি নীলিমার ভয়ত্রস্ত দুঃখবিদারিত মনের উপর শীতল জলের ধারার মতই নিপতিত হইয়া তাহাকে যেন এক মুহূর্ত্তে জুড়াইয়া দিল এবং গভীরতম কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিয়া সে আত্মহারাবৎ সেই একমাত্র

আশ্বাসদাতার দুই পায়ের উপর অকস্মাৎ আর্ত্তভাবে কাঁদিয়া লুটাইয়া পড়িল।

সুশীল এই আকস্মিক বন্যাপ্লাবনের জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিল না। সে নীলিমার এই কার্য্যে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিল। সে যে কি বলিবে, কি করিবে, কি করিয়া উহাকে পায়ের উপর হইতে উঠাইবে, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া খানিক ক্ষণ বিপন্নভাবে থাকিয়া উহাকে কাঁদিতে দিল; তাহার পর অনেকখানি ইতস্ততঃ করিয়া নতদেহে বাহু ধরিয়া নিজের অশ্রু-ধৌত পদতল হইতে উহাকে উঠাইবার চেষ্টা করিয়া কহিল, "স্থির হও, নীলিমা! অত কাতর হ'লে ত চলবে না, আমাদের ধৈর্য্যের উপরই যে জ্যেঠাইমা'র জীবন নির্ভর করছে, তা কি তুমি বুঝতে পারছো না?"

নীলিমা সেই আকর্ষণে ও সম্ভাষণে সর্ব্বশরীরে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়া বসিল এবং যথাসাধ্য ক্রন্দনবেগ সংবরণ করিতে করিতে অস্ফুট ও অস্থির কণ্ঠে কহিল, "মা গেলে আমি যে এখানে একটি দিনও আর থাকতে পারবো না! মা গেলে এক মুহূর্ত্তও আর আমি এখানে থাকতে পারবো না। আমার তখন কি হ'বে?"

সুশীলের বুকের মধ্যে এই হতাশাকাতর কণ্ঠের কাতর প্রশ্ন গভীর বলে আহত হইল, "তখন আমার কি হ'বে?" বাস্তবিক এ সংসারের যে বিধিব্যবস্থা সে এই কয় দিনেই জানিতে পারিয়াছে, তাহাতে মাতৃহীনা বালিকার পক্ষে এখানে পড়িয়া থাকা একান্তই আত্মাহুতি দেওয়া, ইহা সে ভালরূপেই বুঝে। এই রাত্রিদিন অকাতরে রোগীর সেবার সহিত সমস্ত সংসারের সমুদায় কার্য্যসাধন করিয়াও তাহাকে পিতার মুখের কঠোর ভর্ৎসনা ব্যতীত আর কিছুই কখন শুনিতে সুশীল ত এক দিনও শুনে নাই। মমতামথিত স্নেহভরে সে অকস্মাৎ নিজের কাপড়ে তাহার অশ্রুপ্লাবিত মুখ মুছাইয়া দিয়া উৎসাহদীপ্ত প্রফুল্ল মুখে কহিয়া উঠিল, "ভয় কি নীল! আমরা দু'জনে মিলে জ্যেঠাইমা'কে বাঁচিয়ে তুলবো! না বাঁচার কথা মনে করবো কেন? কেমন? যত্ন করলে কি না হয়?"

নীলিমার মনের মধ্যে ভয়ের তাড়না কোথায় সরিয়া গেল, আর তাহার স্থানে এ কি প্রবল হইয়া উঠিল—বুকভরা লজ্জা! এই স্পর্শ, এই কণ্ঠ, এই আদরের "নীল" ডাক, এ কি নীলিমা আজ সুশীলের কাছে লাভ করিয়া বসিল! এ যে তাহার গোপন বাসনারও অতীত! এ যে তাহার ঘুমন্ত স্বপ্নেরও অগোচর! এই তরুণ হাতের কোমল স্পর্শের অনুভূতি তাহার অশ্রু-আর্দ্র কপোলে আবীর গুলিয়া দিল; তাহার কান্না-ধোয়া চোখের পাতা আবেশে বিহ্বল হইয়া সহসা নামিয়া পড়িল; তাহার সুখশিথিল থরকম্পিত দেহলতা এই আভ্যন্তরিক সুখোচ্ছ্বাসে যেন এলাইয়া শিথিল হইয়া আসিল। কণ্ঠে তাহার ভাষা হারাইয়া গেল, বক্ষের মধ্যে প্রবল রুদিতোচ্ছ্বাস রুদ্ধ হইয়া রহিল।

তাহাকে নিরুত্তর দেখিয়া সুশীল আরও কিছু বলিতে গিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া সহসা বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া গেল। সে মুখের উপর এমন একটি সুখের উচ্ছ্বাস ও আবেগের তরঙ্গ অতর্কিতেই ফুটিয়া উঠিয়াছিল, অজ্ঞাতেই হিল্লোলিত হইতেছিল যে, যত বড় আনাড়ীই হৌক, উহার আবির্ভাব যে কাহারও চোখে না পড়িয়া যায় না। সুশীল সবিস্ময়ে নীলিমার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া বুঝিল, তাহার মনে এই মুহূর্ত্তে মা হারাইবার ভয়ের ভাবনা একেবারেই জাগ্রত নাই! কিন্তু এমন অকস্মাৎ সেটা যে কেমন করিয়া সরিয়া গেল, সেইটুকুতেই তাহাকে যেন ফাঁপরে ফেলিল। সে আরও কতকগুলি ভাল ভাল সান্ত্বনার কথা শুনাইতে চাহিতেছিল, কিন্তু ঐ হর্ষ-মধুর ঈষদ্ভিন্ন অধরোষ্ঠ, অর্দ্ধমুক্ত-স্মিতদৃষ্টি ও আরক্তোজ্জ্বল গণ্ড এই শোকসংবাদের মধ্যে কেমন যেন একটা ব্যবধানের সৃষ্টি করিয়া তুলিল। তাহার পর অতি সহসা তাহার মনে পড়িয়া গেল যে, এইমাত্র "নীল" বলিয়া ডাকিয়া সে নিজের কাপড়ে উহার মুখ মুছাইয়া দিয়াছে! সুশীলের তরুণ কণ্ঠদেশ ব্যাপিয়া ইহারই স্মৃতি লজ্জার রক্তিমায় দ্রুত ফুটিয়া উঠিল। কাযটা সে হয় ত অন্যায় করিয়াছে, হয় ত অত্যন্তই অন্যায় করিয়াছে! নীলিমা হয় ত তাহার এই অকথ্য ধৃষ্টতায় বিশেষভাবেই ক্রুদ্ধ হইয়াছে। বিনতার মত ব্যবহার যে ঠিক ইহার সহিত করা সঙ্গত নহে, সে কথাটা তাহার মনে পড়া উচিত ছিল। সুশীল ক্ষিপ্রচরণে উঠিয়া দাঁড়াইল, চলিয়া যাইবার জন্য মুখ ফিরাইতেই তাহার ঠিক সাম্‌নাসাম্‌নি হইয়া গেল

অনুকূলের সহিত। অনুকূলের কুঞ্চিত শীর্ণ মুখে একটা বিজয়দৃপ্ত হিংস্র হাসি।

শুভেন্দু দুই দিন মা'র রোগ আরোগ্যের জন্য অপেক্ষা করিয়া যখন দেখিল, মা'র আর ভাল হইবার মত গতিক নহে এবং ডাক্তারের মুখে শুনিল যে, এ রোগ আর আরোগ্য হইবে না, তখন সে ভোরের ট্রেণ ধরিয়া কলিকাতা যাত্রা করিল। পড়াশুনার এত বাঘাত জন্মান তাহার সঙ্গত বোধ হইল না। সুশীলও অবশ্য যাইবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়াছিল, কিন্তু সে সেই নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিল এবং অনুকূলও সনির্ব্বন্ধে তাহাকে থাকিবার জন্যই অনুরোধ করিলেন। নীলিমা উৎকণ্ঠিত ও উৎকর্ণ হইয়া দ্বারের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিল, সুশীলের মুখে "না; আমি এখন যাব না" এই কথাটি শুনিতে পাইয়াই তাহার হৃৎপিণ্ডটা বুকের মধ্যে উল্লাসে লাফাইয়া দোল খাইল।

সুশীল যাইবে না। ধনিসন্তান চিরসুখে পালিত সুশীল দরিদ্রের দৈন্যের অংশ গ্রহণ পূর্ব্বক শুধু তাহাদের প্রতি অনুকম্পাপরবশ হইয়াই তাহাদের সাহায্যার্থ রহিল, আর শুভেন্দু তাহার মা'র শেষটুকুর জন্যও অপেক্ষা করিতে পারিল না! অন্তরের দুই তারে এই হর্ষ-বিষাদের দুই বিভিন্ন সুর ধ্বনিয়া উঠিতে থাকিলেও নীলিমার বক্ষে যে আনন্দের সুরটাই প্রবল হইয়া উঠিতেছিল, তাহা তাহার কাছে অজ্ঞাত রহিল না। সে মনে মনে বলিল, "তোমার এত দয়া না হ'লে কি আমার মন এমন ক'রে তোমার পায়ে লুটিয়ে পড়তো! উঃ! কি ভাল তুমি! কত মহৎ!"

অপরাহ্নে সুশীল ও নীলিমা রোগীর দুই পাশে দুই জন বসিয়া ছিল। রোগী যথাপূর্ব্ব নিদ্রাচ্ছন্নবৎ পড়িয়া আছেন। অনুকূল ঘরে ঢুকিলেন। তাঁহার হাতে এক কৌটা চা এবং একটা বড় মোড়কে বাঁধা কয়েকটা জিনিষ-পত্র। ছেঁড়া ছাতাটা এক স্থানে ঠেস দিয়া রাখিয়া তিনি নীলিমাকে বলিলেন, "এই চা নে; যা দেখি, খুব ভাল ক'রে এক কাপ চা তৈরী ক'রে সুশীলকে দে' দেখি! আহা, দিনরাত খেটে খেটে বাছার মুখটি শুকিয়ে গেছে!"

নীলিমা কিছু বিস্মিত, কিছু প্রীতভাবে বাপের হাত হইতে মোড়কগুলি গ্রহণ করিয়া নিঃশব্দে আজ্ঞা পালন করিতে গেল। তাহার অনেক মূল্যে সংগৃহীত চা-চিনি সবই আজ শেষ হইয়া গিয়াছিল, তাই ভাবিয়া তাহার মনে সুশীল থাকার আনন্দটাও যেন অঙ্গহীন হইয়া পড়িতেছিল। এ কয় দিন কত দুঃখেই যে সে এ দুই জনের চা, জলখাবার ও লুচির ময়দা-ঘি যোগাইয়াছে, তাহা সে-ই জানে। তাহার আর ত কোনই সম্বল নাই!

কাঠ-কুটায় উনান ধরাইয়া সেই আগুনে একটা ঘটিতে জল চড়াইয়া নীলিমা পাতর-বাটিতে চা ভিজাইবার ব্যবস্থা করিতেছে, চটিজুতার শব্দে বুকের সঙ্গে হাত কাঁপিয়া পাতরবাটিটা পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল। ঘরে ঢুকিয়া এই কাণ্ডটা চোখে পড়িতেই সুশীল হাসিয়া ফেলিয়া বলিল,—"বাঃ, বাঃ, বাঃ, খুব কাযের লোক ত দেখছি! এ দিকে জ্যেঠামশাই আমায় তাড়া দিয়ে দিয়ে তুলে দিলেন যে, চা নাকি প'ড়ে প'ড়ে ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। এখন দেখছি, চা জুড়িয়ে পাতরবাটি হয়ে গেছে! উঃ, কি আশ্চর্য্য! তুমি ম্যাজিক করতে জান, নীল?"

নীলিমা তাড়াতাড়ি ভাঙ্গা বাটি লুকাইয়া ফেলিয়া পাত্রান্তরে চা ভিজাইতে দিল ও কোন মতে বক্ষের দ্রুত তাল সংহত রাখিয়া মৃদুস্বরে কহিল, "বসুন, এখনই আমি চা তৈরী ক'রে দিচ্ছি।"

সুশীল হাসিয়া উঠিয়া কহিল, "বাঃ, 'বসুন' বল্লে যে বড়? তা হ'লে ত বসাই হ'বে না দেখছি; ভদ্র-লোকরা কি আর রান্নাঘরে বস্‌তে পারে? আমি তো বাইরের লোক, বৈঠকখানায় বসি গে যাই।"

নীলিমার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল, সে নত চোখে চা ঢালিতে ঢালিতে ক্ষীণভাবে হাসিয়া বলিল, "তা হ'লে কি বলবো?"

সুশীল পুনশ্চ হাসিয়া উঠিয়া উত্তর দিল, "বাঃ, আর যেন কোন কথাই বল্‌বার মত নেই? কেন, 'বস' বল্‌তে পারো না কি? চিরদিনই আমি বুঝি তোমার কাছে বাইরের লোক হয়েই থাকবো? আমায় অত পর পর মনে কর কেন বল তো? কৈ, আমি তো করি না? করি কি? হাঁ, নীল! সত্যি ক'রে বলো? আমি কি কিছুতেই তোমাদের পরের মতন করেছি?—ও কি করছো? বাটিতে আর ধরছে না,

তবু ঢালতেই হবে? কেন, ওটা আর একটা বাটিতে ঢেলে নেওয়া কি যায় না?"

নীলিমা এ কথার অর্থ না বুঝিয়া সরলভাবে কহিল, "আচ্ছা, তাই দিচ্ছি, না হয় আপনি ওটা আগে খান, তা'র পর ঐতেই বাকিটা আবার ঢেলে দেবো।"

সুশীল গরম চায়ে ফুঁ দেওয়া বন্ধ করিয়া ত্বরিতস্বরে বলিয়া উঠিল, "বাঃ, আবার সেই 'খান' 'খান' বল্লে কিন্তু আর একটুও খাবো না, তা' এই ব'লে দিচ্ছি দেখে নিও। বল 'খাও,' না হ'লে এই রইলো তোমার চা, আমি জ্যেঠাইমা'র কাছে চল্লুম ফিরে।"

নীলিমা লজ্জায় ও আনন্দে বিকশিত হইয়া উঠিয়া স্মিতমুখে মৃদু মৃদু কহিল, "আচ্ছা, আর বলবো না। খাও, হয়েছে ত? যান, আপনি ভারী দুষ্টু!"

সুশীল কৌতুকে করতালি দিয়া উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল, "যান্ যান্, আপনিও কম দুষ্টু নন। এবার থেকে এই শাস্তি! ও কি! আমায় আবার দিচ্ছেন যে, ওটা ত আমি চাই নি, ওটা তুমি খাবে, আপনি খাবেন,—তোমার অভ্যাস নাই? না-ই থাকলো? রাত জাগা ত আর এর আগে কখন অভ্যাস ছিল না? লক্ষ্মীটি! সত্যি তুমি খেয়ে ফেল। তোমার খাওয়া বড্ড কম হয়। আমি দেখেছি, কাল রাত্তিরে তুমি কিচ্ছু খাওনি, আজ সেই দুপুরবেলা একেবারে খেলে; রাত্তিরে আবার কি কর্‌বে, সে তুমিই জানো।"

নীলিমার চোখে জল আর চাপা থাকে না, এমনই হইয়া উঠিল। এত করিয়া তাহার মত তুচ্ছকে যত্ন করা! তাহার কার্য্যকলাপ এমন করিয়া উল্‌টিয়া দেখা, এও কি কখন সম্ভব? এই সুদর্শন, তরুণ, শিক্ষিত ধনিসন্তানের পক্ষেও সম্ভব? সহসা নীলিমার মনে হইল, এও ত হিন্দুর ঘরেই জন্মিয়াছে! মা-বাপ ত এরও হিন্দু! এর মধ্যে এমন উদারতা কোথা হইতে আসিল?

নীলিমাকে নিরুত্তর ও চিন্তিত দেখিয়া সুশীল তড়াক করিয়া উঠিয়া পড়িল এবং চা-পাত্রের বাকি চা-টা একটা মার্জ্জিত পাত্রে ঢালিয়া লইয়া মুহূর্ত্তমধ্যে তাহার মুখের সামনে তুলিয়া ধরিল, "লক্ষ্মীটি! খেয়ে ফেল, না খেয়ে খেয়ে এত খাটলে মারা পড়বে যে! না, নীল! তা কর্‌লে হ'বে না, সে আমি শুনবো না, কথা শোনো, খেয়ে ফেল।"

নীলিমার বক্ষ-শোণিত যেন কল-কল্লোলে সমুদ্রের তরঙ্গের মতই উত্তাল হইয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। তাহার সর্ব্বশরীরে যেন সহস্র তড়িৎ-শিখা ছুটাছুটি করিয়া ফিরিতে লাগিল, হাত বাড়াইয়া সে চায়ের বাটিটা তুলিয়া ধরিয়া এক নিশ্বাসে তাহা নিঃশেষ করিতেই, তাহার মনে হইল, ইন্দ্রদেবতার হস্ত-পরিবেশিত স্বর্গীয় সুধাপাত্র সে যেন নিঃশেষ করিল। তাহার দেহ, প্রাণ, মন, আত্মা সকলই যেন সেই সুধাসারে প্লাবিত হইয়া সুধা-স্রোতে তলাইয়া সুধামাখা হইয়া গেল। তাহার চিরদিনের দুঃখ, দারিদ্র্য, অত্যাচার, অবিচার সমুদায় যেন আজ নিঃশেষ হইয়া গিয়া তাহাকে কোন অজ্ঞাত পুলকের আলোকের আনন্দের মহাসাম্রাজ্যে সম্রাজ্ঞীর আসনে অধিষ্ঠিত করিয়া দিয়া গেল। তাহার পৃথিবী আর ধূলার ধরণী রহিল না, তাহার জীবনকে আর জীবন-সংগ্রাম মনে হইল না, তাহার অপরিতৃপ্ত বাসনারুদ্ধ কুমারীজীবনকে সুপরিতৃপ্ত কল্যাণপূর্ণ মহীয়সী মহিলার বরেণ্য জীবন বলিয়া সে আনন্দাপ্লুত গর্ব্বানুভব করিল।

সুশীল কিন্তু অত কথার কোন ধারই ধারিল না, সে নিজের ভাবে ভোর রহিয়াই হাস্যদীপ্ত উৎফুল্ল মুখে বলিতে লাগিল, "দেখ দেখি কেমন হলো! যাই বল বাপু, চা-টি শুধু নিজে খেয়ে কিন্তু সুখ হয় না, বেশ দুই তিন জনে ব'সে গল্পে সল্পে 'সিপ' ক'রে ক'রে খাওয়া যা'বে তবে না! হাঁ, একটা কথা, জ্যেঠাইমা আজ বেশ ভাল আছেন। কেমন ক'রে জানলুম? বাঃ, আমি ডাক্তারী পড়ছি না? তা ছাড়া আরও শোনো, তুমি চ'লে এলে একটু পরেই জ্যাঠামশাই যখন আমায় চা খেতে আস্‌তে বল্লেন, জ্যেঠাইমা যে কি ভয়ানক চম্‌কে উঠেছিলেন! একেবারে দু' চোখ ঠিক্‌রে চেয়ে আমায় যেন মিনতি ক'রে কি বল্লেন! অবশ্য, কি বল্‌তে চান, সেটা ঠিক বোঝা গেল না, আমার ত মনে হলো, যেন না যাই বল্‌ছেন, —কিন্তু জ্যেঠামশাই তার উল্টোই বল্লেন। যা হোক, এই বুঝতে পারাগুলোও ত ভালরই লক্ষণ বল্‌তে হ'বে।"

নীলিমা এই বর্ণনা শুনিয়া কিন্তু মনে মনে বিশেষ-ভাবেই উৎকণ্ঠাচঞ্চল হইয়া উঠিল। তাহার বাপের এই আকস্মিক মুক্তহস্ততা সুশীলকে ঠেলিয়া চা পান করিতে

পাঠান এবং সেই সঙ্গে সেই সংবাদে তাহার মায়ের অর্দ্ধমূর্চ্ছিত চিত্তে আকস্মিক উদ্বেগের সঞ্চার! এ সকলই কি কোন অর্থসঙ্গতিপূর্ণ ষড়যন্ত্র? অথবা—আর কিছু না ভাবিয়াই সে ত্বরিতপদে উঠিয়া বলিল, "মা'র কাছে যাই। এতক্ষণ—"

বলিতে বলিতেই তাহার নজর পড়িয়া গেল উঠানের প্রান্তে প্রস্থানোদ্যত পিতৃ-মূর্ত্তির উপরে। লজ্জায় ও অপমানে তাহার মুখ কালো হইয়া গেল। তাহার অন্তরে একটা সূক্ষ্ম সন্দেহ জাগিয়া উঠিল, কিন্তু বাপের উপর বিদ্বিষ্ট বিরাগে ইন্ধন চড়াইতে গিয়া সে অকস্মাৎ সবিস্ময়ে দেখিল যে, কোথা দিয়া সেই পর্ব্বত-প্রমাণ বিরক্তি ও অভিমানের বোঝা গলিয়া পড়িয়া সেখানে একটা কৃতজ্ঞতার স্ফটিকনির্ঝর প্রবাহিত হইতেছে। সুখাপ্লুত ও বেপমানা হইয়া সে মনে মনে পিতৃচরণোদ্দেশে সেই প্রথম আন্তরিক প্রণিপাত জানাইয়া অন্তর্যামীর কাছে আকুল অন্তরে প্রার্থনা জানাইল, "আমার কি এত বড় কপালজোর আছে, ঠাকুর? যদি স্বর্গে মর্ত্ত্যে কোথাও কোন জাগ্রত দেবতা থাক, তবে আমি যেন ওঁকে পাই। আমার বাবার ইচ্ছাই যেন পূর্ণ হয়। আমি বুঝেছি, আমি বুঝেছি, তিনি যা চাইছেন, আমি বুঝেছি! আমার কি সেই ভাগ্য!"

— —

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

খর সূর্য্যতাপতপ্ত ধরণীবক্ষে সে দিন প্রথম বারিপাত হইয়াছিল। ধরণীর ধূলা-ধূসরিত মলিন অঙ্গ মার্জ্জিত পরিশুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। ধূলি-মলিন আকাশের নিমা অপসৃত হইয়া সুপ্রসন্ন ও সমুজ্জল নীলিমায় খেলয়ের সমুদায়টুকুই নয়নরঞ্জন শোভা ধারণ করিয়াছিল। বসন্তের শ্যামলতা এত দিন পরে ধূলিজাল ভেদ রিয়া আজই প্রথম লোক-লোচনে আত্মপ্রকাশ করিতে বসর পাইয়াছে। মনে হইতেছিল, বরবর্ণিনী প্রকৃতি তী এত দিন পরে তাঁহার ধূসর ওড়নাখানি অঙ্গ হইতে লিয়া ফেলিয়া যেন নীল আঙ্গিয়া ও হরিৎ বসনে অঙ্গ জ্জিত করিয়াছেন।

অনভ্যস্ত পরিশ্রমে ও দারুণ গ্রীষ্মে সুশীলের একটু স্বাস্থ্যভঙ্গ ঘটিয়াছিল। দুই দিন জ্বর লুকাইবার পর আজ তিন দিনের দিন তাহার জ্বরটা একটু বেশীই হইয়াছিল। অনুকূল জানিতে পারিয়া তাড়াতাড়ি নীলিমাকে দিয়া বিছানা করাইলেন, মাথার দিব্য দিয়া সুশীলকে শয়ন করাইয়া নীলিমাকে আদেশ দিলেন, "মাথায় বাতাস দে।" নিজে ডাক্তার ডাকিতে বাহির হইয়া গেলেন। সুশীলের কোন ওজর-আপত্তিই টিকিল না। দেখিয়া শুনিয়া নীলিমার সদ্য-শঙ্কিত চিত্ত উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

সুশীল বিমর্ষমুখে পাশ ফিরিয়া শুইয়া ছিল, বারকতক পাখার বাতাস কপালে ঠেকিতেই উদ্ধত স্বরে বলিয়া উঠিল "খবরদার! বলছি, তুমি জ্যেঠাইমার কাছে যাও, কথা শুনছো না কেন?"

নীলিমা স্মিতমুখে উত্তর করিল, "ক'জনের কথা শুনবো বল?" বলিয়া সে নিঃশব্দে হাসিতে লাগিল।

সুশীল দ্বিগুণ চটিয়া তাহার হাতের পাখাখানা ধরিয়া ফেলিয়া গম্ভীর মুখে বলিল, "ন্যায়ের পক্ষেই জয় থাকা সঙ্গত! আমার তো কিছুই হয়নি; তুমি আসল ফেলে নকল নিয়ে বসলে চলবে কেন? না না, যাও।"

নীলিমার আজকাল সাহস বাড়িয়াছিল। নিজের মনের দুরাকাঙ্ক্ষায় পিতৃদত্ত ইন্ধনের বলে সে এখন নিজেকে যথেষ্ট বলীয়ান্ বলিয়া মনে করিতেছিল। সে জোর করিয়া পাখা চাপিয়া ধরিয়া হাস্যোদ্ভাসিত মুখ সুশীলের সম্মুখে অসঙ্কোচে উন্নত করিয়া দীপ্তমুখে কহিল, "নাও দেখি কেড়ে, কক্ষনো পারবে না।"

"পারবো না! দেখ তবে,"—সুশীল নিজের সমস্ত শক্তি দিয়া এমন জোরে একটা টান মারিল যে, পাখা ত কত দূরে ছিটকাইয়া পড়িল, নীলিমাও সেই সঙ্গে তাল সামলাইতে না পারিয়া সশব্দে ধরাশায়ী হইল।

"ছি ছি! কি করলুম!" বলিতে বলিতে সুশীল এক লম্ফে খাট হইতে নামিয়া নীলিমাকে টানিয়া তুলিল। নীলিমার একটা হাতে একটু বিশেষভাবে চোট লাগিয়াছিল। সে তাহা স্বীকার না করিলেও সুশীল সেই আহত স্থানের সংবাদ জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার শুশ্রূষায় যত্নবান্ হইল। দুই একবার মৃদু আপত্তি করিয়া নীলিমা অগত্যাই থামিয়া গেল। ডাক্তার যখন

আসিলেন, তখন রোগীর জ্বর বড় একটা ছিল না ; কিন্তু তাঁহাকে নীলিমার বাঁহাতে "বাড়" বাঁধিতে হইল। সুশীল গভীর অপরাধিভাবে দুঃখে লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইয়া রহিল। ঐ ভাঙ্গা হাতে কেমন করিয়াই বা নীলিমা রান্নাবান্না করিবে ভাবিয়া তাহার বুক ভাঙ্গিয়া পড়িবার মত হইল। অবশেষে সে থাকিতে না পারিয়া অনুকূলকে গিয়া বলিল, —"নীলিমা তো রাঁধতে পারবে না, একটা বামুন খুঁজে আনলে হয় না ?"

অনুকূল তৎক্ষণাৎ কহিলেন, "বিলক্ষণ! তুমি আবার কোথায় খুঁজতে যাবে ? আমি এখনই আনছি।"

এই কথাটা স্বর্ণলতার ঘরের মধ্যেই হইল। স্বর্ণলতার ডাগর চোখের দৃষ্টি ভয়ার্ত্তের মত দেখাইলেও সে দিকে কেহ দৃষ্টিদানও করিল না। তাহার দরখাস্ত এত শীঘ্র মঞ্জুর হইল দেখিয়া সুশীলের খুসীর সীমা রহিল না। মনে মনে সে বলিল, "জ্যেঠামশাই মানুষ ত নেহাৎ মন্দ নন।"

নীলিমার হাত সারিতে দিন পাঁচেক লাগিল। ইতোমধ্যে স্বর্ণলতার অবস্থা অনেকখানি উন্নত হইলেও তাঁহার বাকশক্তি যে আর কখন ফিরিয়া আসিবে না, তাহা জানিতে পারা গিয়াছে। সুশীলের এখানে আসার পর তিন সপ্তাহ অতিবাহিত হইয়া গিয়াছিল। আজ সকালে সুশীলের পিসীমা পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতে তাহাকে বাড়ী ফিরিবার জন্য আদেশ ছিল। ভুবন বাবুর শরীর তেমন সুস্থ নহে, এ দিকে বিনতার বিবাহের কথা চলিতেছে, তরু স্বামীর কর্ম্মস্থান হইতে ছেলেমেয়ে সঙ্গে বাপের বাড়ী আসিয়াছে। এই সব নানা কারণে সুশীলের বাড়ী ফিরা অনিবার্য্য হইয়াছিল। পত্র পাঠান্তে এক দিকে বাড়ীর জন্য, দিদির জন্য, পিতার জন্য উদ্বেগ এবং অপর দিকে স্বর্ণলতার এবং নীলিমার জন্য উৎকণ্ঠা, দুই দিক হইতে দুইটা তরঙ্গ আসিয়া যেন সুশীলের মনকে তরঙ্গিত করিতে লাগিল। তাহার মনের উপর যেন একটা অশান্তির মেঘ আচ্ছন্ন করিয়া ধরিল।

অনুকূলের কাছে পত্রের উল্লেখ করিবামাত্র তিনি যেন একেবারেই আকাশ হইতে পড়িলেন, বলিলেন, "সে কি কখন হয় ? গিন্নীর এ রকম অবস্থা, মেয়েটা কোন্ দিকে কি করবে ; আরও কিছুদিন থেকে যাও।"

থাকিবার উপায় নাই শুনিয়া তিনি বিশেষ চিন্তিতভাবে কহিলেন, "তা হ'লে আগামী কালকেই একটু হলুদ দিয়ে আগামী পরশু দিনেই, কি কালই না হয় শুভকার্য্য সম্পন্ন ক'রে দিই ?"

সুশীল বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া গিয়া মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহা দেখিয়া অনুকূল পুনশ্চ স্পষ্ট স্বরেই কহিলেন, "নীলিকে তোমার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে একসঙ্গেই আমায় ত তোমার বাপের কাছে পাঠাতে হ'বে ! তা'র পর এই আধমরা স্ত্রী নিয়ে আমার যা দশা হয় হোক, সে আমি বুঝবো তখন। বিয়ের দেরি ত আর কোনমতেই করা চলে না।"

সুশীল কোনমতে ভাষা খুঁজিয়া লইয়া সাশ্চর্য্যে কহিল, "বিয়ের কথা আপনি কি বলছেন ? বিয়ে কাল পরশু আপনি দেবেন বলছেন, এর মানে কি ? আমি কিছুই বুঝতে পারছি নে যে !"

অনুকূল শান্ত ও সংযত স্বরে উত্তর দিলেন, "নীলিকে তুমি পছন্দ করেছ, তা আমি জানি, সেও তোমার জন্যে মরছে, তাও আমার সব জানা আছে। বিয়ে তোমাদের দিতেই ত হবে। তা' ছাড়া আর উপায় কি ?"

সুশীল যেন কেমন বিমূঢ় হইয়া গেল। বহুক্ষণ সে নির্ব্বাক বিস্ময়ে বাক্যহারা হইয়া থাকিবার পর সেই অসীম বিস্ময়ের তরঙ্গ তাহার বক্ষে ঈষৎ সংহত হইয়া আসিয়া কণ্ঠমধ্য হইতে একটা শিথিল স্খলিত ধ্বনি উত্থিত হইয়া আসিল —"তা হ'লে না হয় আমার বাবার মত আপনি জিজ্ঞাসা করুন।"

অনুকূল একটি ডাবা হুঁকায় তামাক টানিতেছিলেন ; একরাশি ধোঁয়া মুখে জমিয়াছিল, সেগুলাকে বাহির হইতে দিয়া তাহার পর কহিলেন, "ওহে ! তা' কি আর আমি না করেছি ? তিনি কোন্ জমীদারের মেয়েকে বাগ্‌দত্ত হয়েছেন, তাই গরীবের মেয়েকে বউ করতে রাজী ন'ন।"

সুশীলের সহসা যেন একটা ঘুমের ঘোরের স্বপ্ন টুটিয়া গেল, চটকাভাঙ্গা হইয়া উঠিয়া সে এক মুহূর্ত্তের মধ্যেই যেন বর্ত্তমানের বাহিরে দূর অতীত দিনের মধ্যে ফিরিয়া চলিয়া গেল। সেখানে তাহার মনের সিংহাসনে অতি উজ্জ্বল ভাস্বর মূর্ত্তিতে আলোকময়ী বালিকা-প্রতিমার

সমুজ্জ্বল মূর্ত্তিখানি তেমনই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, সে দেখিতে পাইল। সেই চাবুক খাওয়ার দিনের কথা মনে পড়িল,—তাহার পর আরও কত দিন দুই জনের চাক্ষুষ হইয়াছে। দেশের বাড়ীর নিমন্ত্রণে, কলিকাতার চিড়িয়াখানায়, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে, একজিবিসনে, বায়স্কোপে, তাহাদের কলিকাতার বাসায় নিমন্ত্রিতা সুলেখা তাহার মা-বাপের সঙ্গে কতবারই আনাগোনা করিয়াছে। সে সব কি ভুলিবার? ভুবন বাবুর সেই প্রাণভরা 'মা! মা!' ডাক। সে যে তিনি কণ্ঠই প্রাণের মধ্য দিয়া ডাকেন, সুশীল অপ্রবীণ হইলেও তাহা বুঝিতে পারে! সুলেখার মুখের সেই সুলোহিত রক্তোচ্ছ্বাস, সেই সলজ্জ মন্দ হাস্য, সেও যে চির-অবিস্মৃত স্মৃতির মতই বুকের মধ্যে আলো হইয়া আছে! নীলিমার সঙ্গে থাকিয়া কয় দিন সে তাহার কথা ভাবিবার অবসর না পাইলেও তাহার সে ভাস্বর ছবি এতটুকুও ত ম্লান হয় নাই! বিশেষ তাহার পিতার মনোনীতা বাগ্‌দত্তা সে! মনে মনে নীলিমার জন্য সুশীলের একটা ব্যথা বোধ হইল, এত দিন এ ভাবে সে একটি মুহূর্ত্তের জন্যও তাহার কথা ভাবিয়া দেখে নাই, কিন্তু কথাটা যখন উঠিয়াই পড়িয়াছে, তখন তাহার বারেকের জন্য মনে হইয়া গেল, তা হইলে কিন্তু মন্দ হইত না! চিরদুঃখিনী নীলিমা হয় ত সুখী হইত। প্রকাশ্যে কুণ্ঠিত মৃদুবাক্যে সে কহিল, "বাবা যখন অমত করেছেন, তখন আর আমার ত কোনই হাত নেই জ্যেঠামশাই!"

অনুকূলের তামাকুবর্ণে অনুরঞ্জিত ওষ্ঠাধরে একটা তীক্ষ্ণ হিংস্রহাসি ফুটিয়া উঠিল। তিনি পূর্ব্বের সেই শান্ত-সংযত ভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক কঠিন কণ্ঠে কহিলেন, "তোমার বাবা না হয় অমত করতে পারেন, কিন্তু তুমি কেমন ক'রে পারবে? ভদ্রসন্তান হয়ে একটা ভাল লোকের মেয়ের মাথা খেয়ে তা'কে পরিত্যাগ ক'রে যাবে, এ কি ধর্ম্মে সইবে? না এ ন্যায়ের রাজ্যে আমরাই তা সহ্য ক'রে নিতে পারবো?"

সুশীলের সর্ব্বশরীরের মধ্যে অকস্মাৎ যেন জ্বলন্ত তরল ধাতুর প্রবাহ বহিয়া গেল, কর্ণে তাহার যেন কোথা হইতে কে একসঙ্গে সহস্র কামান দাগিয়া দিল। সে ভয়ার্ত্ত ব্যাকুল কণ্ঠে আর্ত্তনাদের মত অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিল—"এ কি বলছেন! আমায়? আমি?—আমি—আমি? এ সব কথা আপনি আমায় বল্‌ছেন?"

এই বারংবার "আমি" শব্দ দিয়া কি ঘোর বিস্ময়, কি নিরতিশয় অভিমান, কি তীব্র উগ্র ব্যথিত ভর্ৎসনা ও অকথ্য ভীতি সে প্রকাশ করিতে গেল, তাহা বুঝিবার শক্তি বা আগ্রহ সেখানে কাহার আছে? সমস্ত প্রকৃতি যেন সেই অকথ্য অভিযোগের অপরিসীম লজ্জায় মূহ্যমান ও বিস্ময়াতঙ্কে সুশীলেরই সহিত সমানভাবে বজ্রস্তম্ভিত হইয়া রহিল। সুশীলের বক্ষের মধ্যে রুদ্ধ শ্বাস যেন জগতের সমুদায় বায়ুস্তরকেই সেই মুহূর্ত্তে চিররুদ্ধ অনুভব করিয়া মহাভারে স্তব্ধ হইয়া রহিল। তাহার অন্তরের রাশি রাশি লজ্জায় তাহার সম্মুখের সমুজ্জ্বল ও খর সূর্য্যকিরণ যেন একেবারে আচ্ছাদিত ও মসীবর্ণ ধারণ করিল। কিন্তু প্রকৃতি যে লজ্জায় মুখ ঢাকা দিলেন, মানুষ যে তাহা নিজের হাতেই দান করিয়াছে! তাহার পাষাণ চিত্ত ইহাতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত হইল না। এবার উগ্র ও রুদ্র মূর্ত্তি ধারণ করিয়া শ্লেষের স্বরে অনুকূল উত্তর করিলেন—

"হাঁ তুমি! তুমি! তুমিই! তুমি আমার সতের বছরের আইবুড় মেয়েকে কোলে জড়িয়ে তার গালে—তুমি আমার সতের বছরের আইবুড় মেয়ের সঙ্গে এক বাটির চায়ে দু'জনে মিলে একসঙ্গে চুমুক দাও নি? তোমায় সে তা'র মা-বাপকে লুকিয়ে লুকিয়ে মাঝরাত্রে গরম লুচি ভেজে চব্যচুষ্য রেঁধে বেড়ে খাওয়ায় না? দু'জনে তোমার শোবার ঘরের খাট থেকে প'ড়ে তা'র হাত ভেঙ্গে যায়নি কি? আমি ও সবের 'আই-উইটনেস,' আদালতে হলপ ক'রে সাক্ষী দেবো, আমার মেয়ে নিজের মুখে এ সব—আরও অনেক কথাই স্বীকার করবে। তখন তুমি করবে কি? আর তোমার বাপের মুখখানিই বা কতটুকু হয়ে যাবে? সে কথাটা ভেবে দেখ, আমি অম্‌নি ছাড়বো, তা' মনেও ভেবো না।"

যদি সুশীলের ভাল করিয়া কিছু মনে করিবার অবস্থা থাকিত, তবে সে হয় ত ধরণীকেই শুধু দ্বিধা হইবার জন্য সকাতরে অনুরোধ করিত; কিন্তু তাও তাহার নাকি ছিল না, তাই সে শুধু অতলজলে অর্দ্ধমগ্ন অভাগা ব্যক্তির মতই যন্ত্রণার্ত্ত ঊর্দ্ধ স্বরে উচ্চারণ করিল—"ভগবান্!"

অনুকূল শ্লেষপূর্ণ কঠোর কণ্ঠে সঙ্গে সঙ্গেই কহিয়া উঠিলেন, "কি করবে ভগবান্? তোমার হয়ে হাকিমের কাছে সাক্ষী দেবে কি? আমি নিজে দেবো, এই চোখে সব দেখেছি যে? আর আমার মেয়ে দেবে। মনে করো না, সে তোমার দিক নেবে। সে তোমায় পাবার জন্যে মরছে, সে কি আমি বুঝিনি মনে কর? তার চেয়ে বিয়েটা ভালয় ভালয় ক'রে যাও, বাপ দু'দিন না হয় একটু বিরক্ত হ'বে, তার পর একমাত্র ছেলে তুমি, বউও খুব কুৎসিত হ'বে না, ভুলে-যাবেখন।"

সুশীলের চক্ষুর অন্ধকাররাশি ও বক্ষের অনিশ্বাসিত রুদ্ধ বায়ুপ্রবাহ জমাট বাঁধিয়া তাহার ভিতরে বাহিরে যেন একটা প্রলয়ঝটিকার সৃষ্টি করিতেছিল। তাহার বক্ষের শোণিততরঙ্গ তুফানের বেগে গভীর কলকল নাদ করিয়া উঠিতে লাগিল। অশ্রুর নির্ঝর ঠেলিয়া কোনমতে বাষ্পরুদ্ধ স্বরে সে উত্তর করিল—"আমি নীলিমার সঙ্গে বিনতার চেয়ে ভিন্ন ভাবে কোন ব্যবহারই করিনি—" তাহার পর আর কোন কিছুই সে বলিতে পারিল না। ইহার চেয়ে বেশী কথা বলিতে তাহার আত্মমর্যাদা, অভিমান এবং মনের অবস্থা কেহই তাহাকে সাহায্য করিল না। আর বলিবার মত তাহার ছিলই বা কি?

অনুকূলের চোখ দুইটা আভ্যন্তরিক উল্লাসে বাঘের চোখের মতই উজ্জ্বল দেখাইল। তিনি আবার বেশ সহজ স্থির কণ্ঠেই কথা কহিলেন; বলিলেন, "কোলে ক'রে চুমু খাওয়া অত বড় পরের মেয়েকে—তা'র পর ডাক্তার যে নীলির হাতে 'বাড়' বেঁধেছিল, সে নীলিকে কোথায় পেয়েছিল? এ সবগুলোকে আদালতে দাঁড়িয়ে কি বোনের সঙ্গে সমান ব্যবহার প্রমাণ করতে পারবে, সুশীল?"

সুশীল আতঙ্কে ভরা স্তব্ধ মুখে নিঃশব্দে বারেক তাহার আততায়ীর প্রশান্ত মুখের দিকে চাহিয়া দেখিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিল এবং দুই জানুর মধ্যে সেই ঢাকা মুখ সে লুকাইল। অসংবরণীয় বিপুল ক্রন্দনের বেগকে সে আর কোনমতেই যেন ঠেলিয়া রাখিতে পারিতেছিল না। এ কি অকথ্য কলঙ্কের ডালি নিরপরাধে তাহার মাথায় চাপিয়া বসিল? ইহার বিপুল লজ্জা, নিদারুণ ভয় ও অপমান তাহার তরুণ কিশোর প্রাণে আর যেন সে সহিতে পারিতেছিল না।

সুশীলের কান্না আসিল। কিন্তু না, না, না। কাঁদিবে সে কাহার কাছে? পাষাণ পাষাণ পাষাণ! একটা নির্ম্মম রক্তলোলুপ রাক্ষসের মত মনুষ্যচর্ম্মাবৃত প্রস্তরস্তূপের মত এই অমানুষের কৃপা ভিক্ষা করিয়া সে ইহার পায়ে ধরিয়া কাঁদিবে? কখন না—কখন না, তাহার অপেক্ষা নীলিমাকে বিবাহ—সেও সহস্রবার শ্রেয়ঃ।

ইহা ভাবিতে গিয়াও ঘৃণায় সুশীলের সর্ব্বশরীর মন যেন গুটাইয়া এতটুকু ছোট্ট হইয়া গেল। নীলিমার উপরও মনটা তাহার একেবারেই বিতৃষ্ণ হইয়া উঠিল। এই পিশাচের মেয়ে, সেও কিছু কম পিশাচিনী নয়! আগাগোড়াই তাহাকে লইয়া ইহারা একটা মস্ত বড় চক্রান্ত গড়িয়া তুলিয়াছে! নীলিমা নিশ্চয়ই ইহার মধ্যবর্ত্তিনী। সে নিশ্চয়ই সমস্ত জানে এবং স্বেচ্ছায় ইহার প্রধান ভূমিকা লইয়াছে! তাহার অহেতুক জড়িমা, অকস্মাৎ লালিমা, অনাবশ্যক লজ্জাভিনয় এ সকলেরই আজ এই মুহূর্ত্তে সুশীল যেন একটা মূল দেখিতে পাইল। এ সকলই অভিনয়োৎকর্ষ। তাহাকে ফাঁদে ফেলিবার প্রচেষ্টা! সে যখন ভগিনীর মত স্নেহভরে তাহার সহিত অসঙ্কোচে মেলামেশা করিয়াছে, এই পিশাচের দল তখন তাহার সেই সরল বিশ্বস্ততার এই এত বড় নির্ম্মম প্রতিদানকল্পনায় নিষ্ঠুর চক্র গঠন করিতেছিল! তবে কি স্বর্ণলতার ঐ রোগের মধ্যেও কোন হীন কৌশল, হেয় অভিনয়

সুশীল নিজের চিন্তার আঘাতে নিজেই আহত হইয়া মাথা তুলিল। সে নিজের মনকে পীড়ন করিয়া বলিল, "এত ছোট, এত নীচ হয়ো না! জ্যেঠাইমা বেচারী নিশ্চয়ই এর মধ্যে নাই"—তাহার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া তুলিয়া সহসাই মনের মধ্যে সেই সে দিনের ব্যাকুল দৃষ্টি জাগিয়া উঠিল। সেই যে দিন বড় আদরে গৃহস্বামী এই জটিল ষড়যন্ত্রের সৃষ্টিকর্ত্তা নিজে যাচিয়া ঠেলিয়া মেয়ের কাছে তাহাকে চা খাইতে পাঠাইতেছিলেন! সে দৃষ্টি যে একান্ত মিনতিভরা নিষেধদৃষ্টি, সে দিনও এ সংশয় তাহার মনে জাগিয়াছিল। আজ তাহা নিঃসন্দেহ হইয়া গেল। জ্যেঠাইমা'র স্বাভাবিক বুদ্ধি অথবা এ

চক্রান্তের কোন আভাস তাঁহার অর্দ্ধচেতনার মধ্যে জাগ্রত হইয়াই যেন তাহাকে সে দিন সাবধান করিয়া দিতে চাহিতেছিল। মূঢ় সে, মূঢ় সে, তখনও কেন সে কথা সে বুঝিতে পারিল না?

শিকারী যেমন সানন্দ আগ্রহে শিকারকরা পাখীর মৃত্যুযন্ত্রণা নিরীক্ষণ করে তেমনই কবিরাই প্রসন্ন মুখে অনুকূল আবৃতমুখ সুশীলের বর্ম্মাক্ত মস্তির প্রতি স্থির-চোখে চাহিয়া চাহিয়া মনে মনে বলিলেন, "ওষুধ ঠিক ধ'রে গেছে!" প্রকাশ্যে মনের প্রফুল্লভাব দমনে রাখিয়া পরম গম্ভীর মুখে তিনি কহিয়া গেলেন, "বেশ ক'রে ভেবে দেখ, সুশীল! হয় কালই তোমায় নীলিকে বিয়ে করতে হয়, না হয় কালই আমায় ফৌজদারীতে তোমার নামে নালিশ দায়ের ক'রে দিতে হয়। এর আর তৃতীয় পন্থা নেই। ও মেয়ে আর কেউ তো বিয়ে করবে না' আর করলেও তা'তে অন্যপূর্ব্বা দোষ হ'বে। বিয়ে কর; সব ঢাকা প'ড়ে যাবে। বিয়ে না কর, খবরের কাগজে শুদ্ধ এই কেলেঙ্কারী ব্যাপারে নাম উঠে যা'বে। আমার তাতে লজ্জা নেই, আমরা গরীব মানুষ, বড় লোকের অত্যাচার আমাদের উপর কি রকম পড়ে, সেটা দশেধর্ম্মে দেখতে পেলে তা'তে আমাদেরই লাভ। ধরো, তোমাদের চেষ্টায় আদালত জোর ক'রে তোমার সঙ্গে ওর বিয়ে যদি নাও দেয়, অন্য কোন দেশভক্ত ছেলে ওকে 'মরাল কারেজ' দেখাবার জন্যে সেইখানে দাঁড়িয়েই বিয়ে ক'রে নেবে, কিন্তু তোমার ত অন্ততঃ পাঁচটি বছর ঘানি টানাটি বন্ধ করাতে কারু বাপেরও সাধ্য হবে না। সেইটি ত বাকী থাকবে! আচ্ছা, বেশ ক'রে চিন্তা কর, আমিও ততক্ষণ সবাইকে খবরটা জানিয়ে আর পুরুতের নাপিতের, টোপর মালা আর আভ্যুদিক জিনিষের ব্যবস্থা ক'রে আসি। পরশু দিন তখন তোমার বাপকে 'তার' ক'রে দিলেই হবে। না হয়, একেবারে গিয়েই দাঁড়ান ভাল।"

এই বলিয়া বারেক সুশীলের যথাপূর্ব্ব করস্থিত লুক্কায়িত মুখের উদ্দেশে একটা ক্রূর কটাক্ষ ক্ষেপণ করিয়া মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে অনুকূল প্রস্থান করিলেন। আর সুশীল তেমনই কর্ত্তব্যবিমূঢ়, ব্যথাহত, আর্ত্ত—সেই স্থানে ঠিক সেই একই অবস্থায় বসিয়া রহিল।

। ক্রমশঃ।

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।

প্রতীক্ষমাণা

পথ দিয়া ওই কে আসে কে যায়
কেমনে জানিব আমি,
এইটুকু শুধু মনে আমি জানি
তুমি আস নাই স্বামী!
তুমি কাছে এলে বুক সে আমার
আপনি উঠিত দুলে;
সমীর আসিয়া চুমিয়া যাইত
মোর এলো করা চুলে,
তুমি এলে মোর সান্ধ্য-গগন
সুষমায় যেত ভরে'
অকারণে হাসি ফুটিয়া উঠিত
আমার মুখের 'পরে।
আসিতে গো যদি আপনি তোমার
বাঁশরী উঠিত বাজি'।
আঙিনায় মোর ফুটিয়া উঠিত
নবীন কুসুমরাজি।
কঙ্কণ দু'টি আপনি বাজিয়া
উঠিত—রিণিকি-ঝিনি;
যেন গো তাহারা চাহিত বলিতে
—চিনি ও গো, তোমা চিনি!
আসিলে না তুমি ও গো প্রিয়তম,
ঘনায়ে আসিছে রাতি,
কেমনে কাটিবে রজনী আমার
আর কেহ নাই সাথী।
পথ দিয়া ওই কেবা আসে যায়
কেমনে জানিব আমি,
জানি আমি শুধু এইটুকু মনে
তুমি আস নাই স্বামী!

শ্রীবিজয় সেন গুপ্ত।

কর্সিকা



আজাসিওর ধোপানী

নেপোলিয়ানের জন্মভূমি কর্সিকা দ্বীপ রমণীয়তার জন্য প্রসিদ্ধ। কোনও ঐতিহাসিক পর্য্যটক কর্সিকা দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে, যদি কর্সিকা দ্বীপ না হইয়া রমণী হইত, তাহা হইলে তাহাকে নিরন্তর প্রলোভন হইতে আত্মরক্ষার চেষ্টায় ফিরিতে হইত। কারণ, কর্সিকা যেমন দরিদ্র, তেমনই সৌন্দর্য্যের আধার। নির্ব্বাসনকালে নেপোলিয়ানের চিত্তমাঝে এই মোহিনী কর্সিকার স্মৃতি নিত্য জাগিয়া থাকিত। ভূমধ্য সাগরের ঊর্ম্মিরাশি কর্সিকাকে ধৌত করিয়া তাহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের স্তুতি গান করিতেছে। এমন রমণীয় দ্বীপ পৃথিবীতে অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়।

এই দ্বীপ ইতিহাসপ্রসিদ্ধ—নানা ঘটনার লীলা ইহার প্রত্যেক প্রস্তরে যেন লিখিত হইয়া আছে। এখানকার নর-নারীদিগের হৃদয়বৃত্তি উদ্দাম হইলেও নীচতা, শঠতা হইতে মুক্ত। স্তেয়, জঘন্য পাপে এ দেশের নর-নারীর আসক্তি অত্যন্ত অল্প। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য এখানকার ফল-ফুল, লতা-পল্লব, পর্ব্বত, প্রান্তরে অপর্য্যাপ্ত ভাবেই দেখিতে পাওয়া যাইবে; কিন্তু এখানকার নর-নারীর বহিঃসৌন্দর্য্য সেই অনুপাতে অধিক নহে। বহিঃসৌন্দর্য্য তেমন থাকুক আর না থাকুক, তাহাদের অন্তরের সৌন্দর্য্য সে বহিরাবরণ দেখিয়া নির্ণয় করা সুকঠিন।

বহুদিন হইতেই য়ুরোপে একটা প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে যে, কর্সিকা দ্বীপ দস্যু-তস্করে পূর্ণ এবং তাহারা সর্ব্বদাই পথিক অথবা



আজাসিও নগরে নেপোলিয়ানের অশ্বারূঢ় মূর্ত্তি

বলিয়া মনে করিয়া থাকে। কিন্তু এরূপ অবস্থা আর কত কাল থাকিবে, তাহা বলা যায় না।

সূর্য্যালোকে উদ্ভাসিত কর্সিকা যে না দেখিয়াছে, সে কখনই ইহার সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে পারিবে না। তুষারস্তূপ কর্সিকার স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য পরিপুষ্ট করিয়া থাকে। রাজপথগুলি সর্ব্বদাই অশ্ব, অশ্বতর, গর্দ্দভ ও মোটরযানে পরিপূর্ণ থাকে।

পশুরা প্রায়ই গৃহস্থের শয়নকক্ষে স্থান পায়; কিন্তু তাহাদের প্রতি ব্যবহার করুণার দ্যোতক নহে। বালক-বালিকারা কদাচিৎ গৃহে থাকে; তাহারা যথেচ্ছ কায করিয়া থাকে। এজন্য তাহারা প্রায়ই স্বেচ্ছাচারী হয়। কর্সিকার একটা বিশেষত্ব এই যে, পার্ব্বত্যপ্রদেশে কৃষিকার্য্যের প্রভূত চেষ্টা দেখা যায়, কিন্তু উর্ব্বর সমতল ক্ষেত্র প্রায়ই অকর্ষিত অবস্থায় পড়িয়া থাকে। দ্বীপের চারিদিকে সমুদ্র, কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়, নাবিকের সংখ্যা এখানে অত্যন্ত কম।

য়ুরোপের কুরুক্ষেত্রসমরে কর্সিকার যুবকবৃন্দ

তৎপর। কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শীরা কখনই এই কথা স্বীকার করিবেন না। দেশীয়দিগের মধ্যে পরস্পরের সহিত বিবাদ নিত্য ঘটনার মধ্যে পরিগণিত, তাহা স্বীকার্য্য।

রাত্রিকালে কর্সিকার নারীরা নিরাপদে একাকিনী ভ্রমণ করিয়া থাকে, কেহ তাহাদের প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করে না; কিন্তু ফরাসীদেশের রাজধানী প্যারী নগরীতে দিবাভাগেই পুলিসপ্রহরী নিয়ত সতর্ক—পাছে কোথাও কোনরূপ অত্যাচার ঘটে। কর্সিকায় নদীর সংখ্যা অল্প হইলেও সেতুর সংখ্যা সমধিক। এইরূপ সেতুর উপর দিয়া কোনও কর্সিকান্ সুন্দরীকে দেখিলে পুরুষ তাহার সৌন্দর্য্যের প্রশংসা কীর্ত্তন করে বটে, কিন্তু কখনও তাহার সম্ভ্রমহানির কোন চেষ্টা পর্য্যন্ত করে না।

কর্সিকা দ্বীপে দস্যুর রাহাজানি এখনও পর্য্যন্ত অজ্ঞাত—ঐ শব্দটা তথায় নিতান্তই অর্থহীন। চোরকে কর্সিকানগণ আন্তরিক ঘৃণা করিয়া থাকে। এই বিংশ শতাব্দীতেও কর্সিকাবাসীরা চৌর্য্যকে নিতান্ত ঘৃণার বিষয়



ড্রিল প্রদর্শনীর পর আজাসিওর বালিকারা বিশ্রাম করিতেছে



কর্সিকার শ্রমজীবী ও গোয়ালিনী—পথিমধ্যে সাক্ষাৎকার

ফ্রান্সের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছিল। ইহার জন্য কর্সিকার লাভ কিছুই হয় নাই। রাজ্যসীমাবৃদ্ধিই বল, অথবা শাসনপদ্ধতির কোনও রূপ পরিবর্ত্তনই বল, কিছুই ঘটে নাই। কর্সিকার অধিবাসিসংখ্যা ৩ লক্ষ, তন্মধ্যে ৫০ হাজার সমর্থ বীরপুরুষ ফ্রান্সের জন্য জীবন আহুতি দিয়াছিল। এত বড় স্বার্থত্যাগের বিনিময়ে কর্সিকার জন্য ফরাসী-সরকার কোনও ব্যবস্থাই করেন নাই।

পৃথিবীর সর্ব্বত্রই বড় বড় নগর নানাবিধ কারখানায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু কর্সিকার বড় নগরগুলি সম্পূর্ণ নূতন ধরণের। এখানকার নগরস্থ বড় বড় কারখানায় খুব অল্পসংখ্যক লোকই কায করে। সমুদ্রতীরবর্ত্তী নগর কয়টি বাদ দিলে ভিতরের ৩টি বড় নগরের প্রত্যেকটিতে ৩ হাজারের অধিক লোকের বসবাস আছে।

কর্সিকাবাসীরা অত্যন্ত সাদাসিধা বেশভূষার ভক্ত। সার্ডিনীয়গণ যেমন বর্ণ-বৈচিত্র্যবহুল পরিচ্ছদের ভক্ত, কর্সিকানরা ঠিক তাহার বিপরীত। ইহারা জানে, কর্সিকা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে অতুলনীয়া; তাই বেশভূষার আড়ম্বর তাহাদের নাই।

কর্সিকার অধিবাসীরা শরীরগত গঠন হিসাবে অলস নহে। কিন্তু মানুষের দাসত্ব, সময়ের দাসত্ব—ঘড়ীর কাঁটার ন্যায় সময়ের ভৃত্য হিসাবে কায করিতে তাহারা রাজী নহে। ধনবান্ ভৃত্যের অপেক্ষা, দরিদ্র ভদ্রলোক হইয়া থাকিতে তাহাদের আন্তরিক ইচ্ছা। দাসত্ব—তা সে যে কোনও প্রকারের হউক না, কর্সিকাবাসীর প্রকৃতিবিরুদ্ধ -অত্যন্ত ঘৃণার্হ।

গ্রীকগণ কর্সিকাকে পরম রমণীয় দ্বীপ বলিয়া সর্ব্বপ্রথম অভিহিত করেন। পরিব্রাজকগণ একবাক্যে বলিয়া থাকেন- যত প্রকার অসুবিধাই থাকুক না, কর্সিকা ভ্রমণকারীর চিত্তহরণকারী দ্বীপ। বর্ত্তমান যুগে পৃথিবীর মধ্যে এমন দেশ আর নাই, কারণ, আধুনিকতার সংস্রবে আসিয়াও এই দ্বীপের অধিবাসীরা এখনও পর্য্যন্ত 'আধুনিক' হইয়া উঠিতে পারে নাই। সরলতা,



আজাসিও রাজপথের একটি দৃশ্য—মঠের সন্ন্যাসিনীযুগল গাড়ী করিয়া মঠে ফিরিতেছেন

মহাপ্রাণতা এবং আন্তরিকতা—এক কথায় মনুষ্যত্ব বলিতে যাহা বুঝায়, কর্সিকানগণের মধ্যে এখনও তাহা প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। মেনার্ড উইলিয়মস্ নামক ঐতিহাসিক বলেন যে, শুধু এই জন্যই শত অসুবিধা সত্ত্বেও ইহাদিগকে দেখিয়া, ইহাদের সহিত আলাপ-পরিচয় করিয়া হৃদয় বিমল আনন্দ জন্মে।

কর্সিকা দ্বীপের প্রধান বন্দর ও নগর আজাসিও। এই নগরে নেপোলিয়ান জন্মগ্রহণ করেন। ১৮১১ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ নেপোলিয়ান আজাসিও নগরকে কর্সিকার রাজধানীতে পরিণত করেন। ইতিহাস বলে, নেপোলিয়ানের জননী লেটিজিয়া রামোলিনো বোনাপার্টি এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করাতেই সম্রাট্ তথায় রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন।



এই অট্টালিকায় এক দিন সম্রাট নেপোলিয়ানের জীবনরক্ষা হইয়াছিল। তখন নেপোলিয়ান কর্সিকার দ্বিতীয় সংখ্যক ন্যাশনাল গার্ড নামক সেনাদলের লেফ্‌টেনাণ্ট কর্ণেল



কর্সিকার মহিলা রুটী প্রস্তুত করিতেছে।

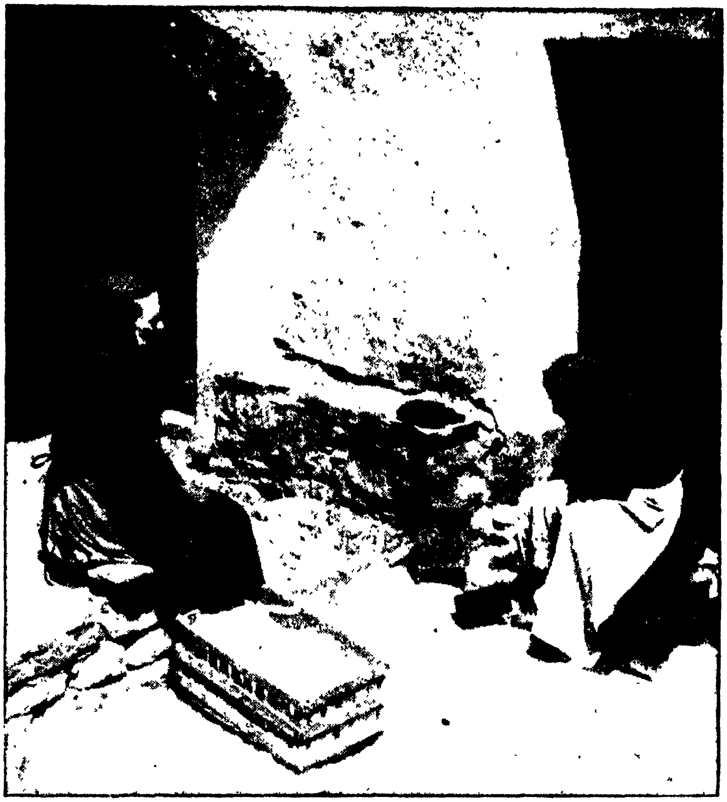
এখনও পর্য্যন্ত বোনাপার্টির ভক্ত-সংখ্যা তথায় অধিক।

আজাসিও নেপোলিয়ানের জন্মভূমি; কিন্তু তাঁহাকে এ স্থান ত্যাগ করিয়া ফ্রান্সে থাকিতে হইয়াছিল। ইহা কর্সিকার পক্ষে অপমানজনক, কিন্তু কর্সিকাবাসীরা তাঁহার স্মৃতিকে ভুলিতে পারে নাই। আজাসিও নগরের রাজপথ, পান্থনিবাস, গুহা, এমন কি, সিনেমা পর্য্যন্ত নেপোলিয়ানের নাম বহন করিতেছে।

নেপোলিয়ান যে গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা এখনও বিদ্যমান। এই বাসভবনটি অনেকটা সেনানিবাসের মত আকারবিশিষ্ট। নেপোলিয়ান যে শয্যার উপর ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, এখনও তাহা বিদ্যমান। যে আসনে নেপোলিয়ান-

কাতর হইয়া বসিয়া ছিলেন, তাহাও শয্যার এক পার্শ্বে সুরক্ষিত।

আজাসিওতে নেপোলিয়ানের দুইটি মূর্ত্তি আছে। মূর্ত্তিযুগল সৌষ্ঠব-সম্পন্ন না হইলেও দর্শনীয়। উল্লিখিত মূর্ত্তি দুইটির মধ্যে প্লেস্ ড দামাংস্থিত মূর্ত্তিটিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যে ভাস্কর এই প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়াছিল, শুনা যায়, সে না কি অশ্বটির ক্ষুর সন্নিবিষ্ট



কর্সিকার কফি প্রস্তুতপ্রণালী

করিতে না পারিয়া আত্মহত্যা করিয়াছিল। নেপোলিয়ানের মূর্ত্তির চারি পার্শ্বে তাঁহার চারি ভ্রাতার প্রতিমূর্ত্তি আছে। এগুলি ভিন্ন ভিন্ন ভাস্করের রচিত।

নেপোলিয়ানের স্মৃতিকে বাদ দিলেও আজাসিও পর্য্যটকের পক্ষে রমণীয়। এখানে আসিলে মনের মধ্যে কেবল সৌন্দর্য্যের স্বপ্ন জাগিয়া উঠে। পাহাড়, প্রান্তর ও সমুদ্রের বিচিত্র সৌন্দর্য্য



কর্সিকার সরাপের দোকানের অভ্যন্তরস্থ দৃশ্য

উপভোগ্য। আজাসিওর অধিবাসীরা অলস সত্য, কিন্তু যতক্ষণ সূর্য্যালোক থাকিবে, দলে দলে নরনারী রাজপথে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছে— দেখিতে পাওয়া যাইবে।

বালকরা পথে মার্ব্বেল খেলিয়া বেড়ায়, পয়সা লইয়া ক্রীড়া করে, কোন জিনিষ দেখিলেই ফুটবলের ন্যায় পদ দ্বারা তাড়িত করিয়া থাকে। ছোট ছোট বালিকারা রবারের বল লইয়া পথে পথে সারাদিন খেলা করিতেছে দেখিতে পাওয়া যায়। কিশোর-কিশোরীগণ পাঠ্য পুস্তকসহ রাজপথ দিয়া চলাফিরা করিতেছে। আজাসিও নগরে স্কুলের সংখ্যা কম নহে। ছাত্র-ছাত্রীগণও অত্যন্ত পাঠানুরাগী।



কর্সিকার কৃষক-পরিবারের সান্ধ্যভোজদৃশ্য

কর্সিকার অধিবাসীরা ফরাসী, ইতালীয় অথবা কর্সিকান্—যে কোন ভাষায় কথা বলুক না কেন, পাঁচ জন একত্র হইয়া আলোচনাপ্রসঙ্গে অত্যন্ত হস্তচালনা করিয়া থাকে—ইহা তাহাদের মুদ্রাদোষ বলিতে হইবে।



কর্সিকার বৃদ্ধা পিতামহী



কর্সিকা-যুবতীর হাস্য



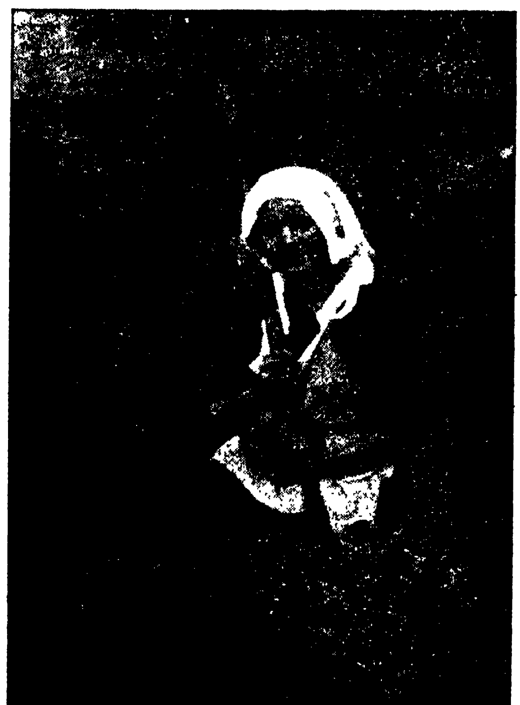
পার্ব্বত্যপথে পুলিস প্রহরা

পরিণতবয়স্ক নরনারীদিগের ভ্রমণের জন্য সমুদ্র-তীরে একটা নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে। বৃদ্ধামাতামহী অথবা পিতামহীরা দৌহিত্র-দৌহিত্রী, পৌত্র-পৌত্রীদিগকে লইয়া সেখানে বিচরণ করিয়া থাকেন।

চৌর্য্যভীতি কর্সিকায় বিরল বলিলেই চলে। বন্দরে খোলা যায়গায় মালপত্র পড়িয়া থাকে, কেহ ভ্রমেও তাহা অপহরণ করিতে চেষ্টা করে না। গৃহস্থের বাটীর বহির্ভাগেও মূল্যবান্ দ্রব্যাদি পড়িয়া থাকিলে কেহ তাহা চুরী করিতে আসে না। কিন্তু পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে আজাসিও নগরের সুখ্যাতি নাই। নেপোলিয়ান সেণ্ট-হেলেনা দ্বীপে নির্ব্বাসিত অবস্থায় বলিয়াছিলেন যে, তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া যদি তাঁহার জন্মভূমিতে নীত হয়েন, তাহা হইলে তদবস্থায় তিনি শুধু পুষ্প-সৌরভের



কর্সিকার কৃষক



কৃষক-রমণী



উৎস হইতে রমণীরা জল লইয়া যাইতেছে



প্রভাতে গোয়ালিনী দুগ্ধ বেচিতেছে

ভ্রাণেই বলিয়া দিতে পারিবেন যে, এই তাঁহার জন্মভূমি। কর্সিকা দ্বীপের সে সুখ্যাতি সত্য; কিন্তু নগরের অধিবাসীরা নগরকে সুপরিচ্ছন্ন রাখে না, ইহাও অন্যতম সত্য।

যে সকল মহাত্মার স্মৃতি-মূর্ত্তি আজাসিওতে বিদ্যমান আছে, তন্মধ্যে সেণ্ট আন্তোইন্ই আজাসিওবাসীদিগের প্রিয়তম। নেপোলিয়ানের নামে অনেকগুলি ফুটবল দল আছে; সেণ্ট আন্তোইন্ দলও সমসংখ্যক। প্রতি বৎসর ১৭ই জানুয়ারী তারিখে সেণ্ট আন্তোইনের উৎসব হয়। তখন দলে দলে যাত্রী সেই ধর্ম্মমন্দিরে সমবেত হয়। সেণ্ট আন্তোইনের উৎসব বিশেষ প্রসিদ্ধ।



কর্সিকার তুষার-কিরীটী রোট্টাণ্ডো পর্ব্বতের দৃশ্য

কর্সিকার যুবকগণ নৃত্য-বিদ্যার বিশেষ অনুরাগী, কিন্তু তাহারা কোনও মহিলার কটিদেশ বাহু-বেষ্টনে বদ্ধ করিয়া সঙ্গীতের তালে তালে কক্ষতলে বিচরণ করিতে আদৌ পছন্দ করে না। নৃত্যকালে তাহারা প্রকৃত নৃত্যকলার অনুসরণ করিয়া থাকে।

সমগ্র কর্সিকা ভ্রমণ-কালে যাত্রীকে সর্ব্বদাই চড়াই উৎরাই পার হইতে হয়। উচ্চাবচ জমীর উপর দিয়া পথ বিস্তৃত। অনেকগুলি গিরিসঙ্কটের



প্রাচীন ধর্ম্মমন্দিরে কর্সিকার বালিকারা পূজার অর্ঘ্য নিবেদন করিতেছে



আরণ্য পুষ্পপুঞ্জমধ্যে কর্সিকার বালক

অস্তিত্ব কর্সিকায় বিদ্য-মান। গিরিবর্ত্মগুলি মনোরম। পথ কখনও গভীর অরণ্যের মধ্য দিয়া প্রস্তৃত। প্রত্যেক স্থানই চিত্তাকর্ষক, পরম রমণীয়। প্রথম দৃশ্যের পর দ্বিতীয় দৃশ্য অধিকতর মনোরম—ক্রমেই দৃশ্য হইতে দৃশ্যান্তরে মনে হইবে, ইহার মত রমণীয় ব্যাপার আর দেখা যায় নাই। কর্সিকার ইহা অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সাগোন কর্সিকার অন্যতম বন্দর। এই বন্দরে পূর্ব্বে বিশপের বাসভবন ছিল। কথিত



পোটোভেসিওর গ্রাম্যপথ

আছে, তিনি প্রায়ই ভোজ দিতেন। এই উৎসব উপলক্ষে এমন অনেক ব্যাপার ঘটিত যে, গ্রেগরী দি গ্রেট বিশপের কৈফিয়ৎ তলব করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে বিশেষরূপে তিরস্কারও করিয়াছিলেন। বার্ব্বারী জলদস্যুরা সাগোনস্থিত ধর্ম্মমন্দির ভাঙ্গিয়া দিয়া গিয়াছিল। তদবধি সাগোন শ্রীহীন, নষ্টগৌরব হইয়া পড়িয়াছে। সাগোন সম্বন্ধে কিংবদন্তী এইরূপ; কিন্তু



সোপানাবলী সংবলিত কর্সিকার নগরপথ

করিবার পর অত্যুন্নত পাহাড়যুগলের মধ্যে কার্গেসি নগর বিদ্যমান। ইহাকে নগর না বলিয়া গণ্ডগ্রাম বলাই সঙ্গত। দুইটি পাহাড়ের উপর দুইটি প্রাসাদ-দুর্গ ধ্বংসাবস্থায় বিদ্যমান। এই প্রাসাদদুর্গ দুইটি বহু শতাব্দীর প্রাচীন স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। উপত্যকাভূমি উদ্যানে পরিপূর্ণ। এই সহরে দুইটি গ্রীক ও রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মমন্দির পরস্পর সম্মুখীন-ভাবে দাঁড়াইয়া আছে।

গ্রীকগণ যে এই স্থানে বসবাস করিয়াছিল, সে সম্বন্ধে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। পূর্ব্বে পিলপনে-সীয় গ্রীকগণ নাকি তুরস্কের দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া জেনোয়ার সাহায্যপ্রার্থী হয়। এই গ্রীকগণ কোনও নিরাপদ স্থানে বসবাসের আবেদনও করে। জেনোয়া গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে ধর্ম্ম ও শাসনব্যাপারে স্বাধীনতা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া তাহাদিগকে কর্সিকা দ্বীপে পাঠাইয়া দেয়। প্রথমতঃ ৭ শত লোক বর্ত্তমান কার্গেসি ও সাগোনের মধ্যবর্ত্তী স্থানে আসিয়া বসবাস করে। কর্সিকাবাসীরা যখন স্বাধীনতার সংগ্রামে লিপ্ত, সেই সময় এই গ্রীকগণ জেনোয়ার নিকট বিশ্বাসভঙ্গজনিত অপরাধ করে নাই—তাহারা জেনোয়ার প্রতি আনুগত্য ও ভক্তি প্রাণপণে প্রকাশ করিয়াছিল। ১৭৩১ খৃষ্টাব্দে তাহাদের নগর অগ্নিদাহে দগ্ধ হইয়া যায় এবং গ্রীকগণ ১৫ মাইল দূরবর্ত্তী আজাসিও নগরে পলায়ন করে।

প্রকৃতপক্ষে ম্যালেরিয়াবিষ এই বন্দরকে ধ্বংস করিয়া ফেলিয়াছিল। পানামার ন্যায় কর্সিকার ম্যালেরিয়া-বাহী মশক ভীষণ সর্ব্বনাশ করিয়াছে। এই বন্দরে অধুনা বাণিজ্যপোত কদাচিৎ আসিয়া থাকে। সন্নিহিত পাহাড় হইতে কাঠের কয়লা সঞ্চিত হয়। শুধু তাহা সংগ্রহ করিবার জন্য মাঝে মাঝে দুই চারিখানি জাহাজ এখানে আসিয়া থাকে।

সাগোন নামে এক নদী আছে। নদী তেমন বৃহৎ নহে। ইহার উপর সিমেণ্ট দ্বারা নির্ম্মিত একটি সেতু বিদ্যমান। সেতু পার হইয়া কতি-পয় পাহাড় বেষ্টন করিয়া রাজপথ চলিয়া গিয়াছে। জলপাইকুঞ্জ অতিক্রম



ইউক্যালিপটস বীথি।



বোনিফেসিও গুহার দৃশ্য

কর্সিকা ফ্রান্সের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর মসিয়ে দে মার্ব্যো বর্ত্তমান গির্জ্জা ও গ্রাম গঠিত করিয়া গ্রীকগণকে বসবাস করিতে দেন। সে সময়ে ১ শত ১০ ঘর অধিবাসী গ্রীকভাষায় কথা কহিত এবং গ্রীক প্রথা অনুসারে দেবতার পূজা-অর্চ্চনা করিত। কর্সিকানদের সহিত প্রথমতঃ তাহাদের বিশেষ সংস্রব ছিল না। কর্সিকানরা গ্রীকদিগকে উৎপীড়িত করিত। কিন্তু যখন তাহারা দেখিল যে, গ্রীকগণ পরিশ্রমী ও শিল্পানুরাগী, তখন তাহারা বিবাদ মিটাইয়া ফেলিল। পরস্পরের মধ্যে বিবাহ আরব্ধ হওয়ায় উভয় দলের গোলমাল মিটিয়া গেল। তদবধি গ্রীক ও কর্সিকানগণের মধ্যে কোনও বিবাদ-বিসংবাদ নাই।

কার্গেসিতে গ্রীক রীতিনীতি অথবা পোষাক-পরিচ্ছদের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত এখন আর নাই। গ্রীক সৌন্দর্য্য কর্সিকার নারীতে এখন আর দেখা যায় না। গ্রীক জীবনের বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

কর্সিকায় অপর্য্যাপ্ত বাদাম উৎপন্ন হয়। প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীতে বাদামগাছ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল বাদাম রৌদ্রে শুকাইয়া গৃহস্থগণ ময়দা প্রস্তুত করিয়া থাকে। এই বাদাম-চূর্ণ হইতে যে রুটী প্রস্তুত হয়, তাহা যেমন সুস্বাদু, তেমনই পুষ্টিকর। কিন্তু কর্সিকা-বাসীরা বাদাম-চূর্ণের রুটী অধিক পছন্দ করে না। বাদামের মিষ্ট স্বাদ নাকি পেষণকালে টক হইয়া যায়।

কলম্বসের জন্মস্থান কর্সিকা দ্বীপ, ইহা বোধ হয় অনেকেই অবগত নহেন। কাল্‌ভি নগরে ১৪৪১ খৃষ্টাব্দে ক্রীষ্টোফার কলম্বস্ জন্মগ্রহণ করেন। কলম্বসের কোনও ঘনিষ্ঠ বন্ধু তাঁহার জীবনচরিত রচনা করেন। একবার কোনও ব্যক্তি এই লেখকের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রস্তাব করেন যে, যদি তিনি জীবনচরিতে এই কথা লিপিবদ্ধ করেন যে, কলম্বস্ জেনোয়াতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি জীবনচরিতকারকে নানা বিষয়ে সাহায্য করিবেন। কিন্তু এই লেখক উত্তরে বলিয়াছিলেন, "কলম্বস্ কখনও আমাকে তাঁহার জন্মস্থানের কথা বলেন নাই, আমি কি করিয়া সত্যের অপলাপ করিব?" কিন্তু অধুনা প্রকাশ পাইয়াছে, কর্সিকা দ্বীপের কাল্‌ভি নগরেই, কলম্বস্



অরণ্যের সুন্দর দৃশ্য

জন্মগ্রহণ করেন। সেখানে একটি পুরাতন স্মৃতিসৌধ আছে, তাহার গাত্রে আমেরিকার আবিষ্কারক কলম্বসের পরিচয়, জন্ম-তারিখ, মৃত্যুর দিন ও বৎসর ক্ষোদিত রহিয়াছে।

বাষ্টিয়া নগর কর্সিকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নগর। অন্যান্য কর্সিকান্ নগরের সহিত বাষ্টিয়ার যথেষ্ট পার্থক্য আছে। এখানকার নারীরা স্বতন্ত্র প্রকৃতির। তাহাদের বেশভূষা, আচারব্যবহারের সহিত দ্বীপের অন্যান্য স্থানের নারীর পার্থক্য বুঝিতে পারা যায়।



দক্ষিণ কর্সিকার যুগল-যুবতী

এই নগরের নারীরা উত্তম বেশভূষার পক্ষপাতিনী। এখানে গীত ও নাট্যাভিনয়ে বহু দর্শকের সমাগম হইয়া থাকে। বিক্রেয় পণ্য নগরে উৎপন্ন হয়। পূর্ব্বে বাষ্টিয়া ক্ষুদ্র গ্রাম ছিল। ধীবরগণ মৎস্য ধরিয়া বিক্রয় করিত এবং সেই জন্যই এই গ্রামের প্রসিদ্ধি ছিল; কিন্তু ১৩৮০ খৃষ্টাব্দে জেনোয়ার জনৈক শাসনকর্ত্তা এই স্থানে একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। সেই দুর্গের সাহায্যে তিনি কর্সিকা-বাসীদিগের সহিত যুদ্ধ করিতেন। দুর্গ-প্রাকারের





ওটা গ্রামের দৃশ্য



বাষ্টিয়ার নেপোলিয়ান-মূর্ত্তি



বাষ্টিয়া নগরের প্রাচীনতম অংশের রাজপথ

নাম হইতেই এই নগরের নামের উৎপত্তি হয়। পূর্ব্বে এই স্থানেই রাজধানী ছিল। সম্রাট্ নেপোলিয়ানের যুগে তাঁহার মাতার নির্দ্দেশে আজাসিওতে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। বর্ত্তমানে বাষ্টিয়া নগরে সামরিক শাসনকর্ত্তা বাস করিয়া থাকেন।

বাষ্টিয়ার প্রাচীন অংশে বহুতল অট্টালিকা-সমূহ বিরাজিত। তত্রত্য রাজপথগুলিও সংকীর্ণ; এমন অপ্রশস্ত যে, পথের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া কর-যুগল প্রসারিত করিলে, উভয় পার্শ্বস্থ অট্টালিকা স্পর্শ করা যায়। সোপানাবলী-সংবলিত রাজপথও সেখানে বিদ্যমান। এইরূপ পথ



পথিপার্শ্বস্থ উৎস—ধোপা কাপড় কাচিতেছে

বন্দর পর্য্যন্ত প্রসৃত। উন্নতশীর্ষ অট্টালিকা-শোভিত রাজপথগুলি সুদৃশ্য নহে। বাষ্টিয়ার প্রাচীন অংশে ভ্রমণ করিয়া পর্য্যটক আদৌ আনন্দ লাভ করিতে পারেন না। অন্য কোনও দেশ হইলে এত দিনে এই সকল অট্টালিকা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া রাজপথকে বিস্তৃত করা হইত। কিন্তু নগরের নূতন অংশ সুদৃশ্য ও মনোরম।

আজাসিওর সহিত বাষ্টিয়ার প্রতিযোগিতা আছে। অন্যান্য বন্দরের সহিতও সে প্রতিযোগিতা বিদ্যমান। এক বন্দরে কোনও বিষয়ের উন্নতি ঘটিলে অপর বন্দরের অধিবাসীরা সমান সুবিধা

ও উন্নতির জন্য তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিয়া থাকে। কর্সিকাবাসীদিগকে অলস বলিয়া উল্লেখ করা হইয়া থাকে; কিন্তু এ বিষয়ে তাহাদিগকে অলস বলা চলে না।

আজাসিও হইতে বাষ্টিয়া পর্য্যন্ত যে রেলপথ আছে, তাহাতে এক ট্রেণে ৬ জন প্রথম শ্রেণীর অধিক যাত্রী লইবার স্থান নাই। ট্রেণ ক্ষুদ্র, স্থানও অল্প। মার্কিণ পরিব্রাজকগণ কর্সিকা-দর্শনের জন্য তথায় প্রতি বৎসর গমন করিয়া থাকেন।

কর্সিকার সমতল ক্ষেত্রের অধিকাংশ স্থান ম্যালেরিয়া-পূর্ণ। এজন্য গ্রীষ্মকালে সমতল ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া অধিবাসীরা পাহাড় ও পর্ব্বতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। গ্রীষ্মকালে যেমন গ্রীষ্ম, তেমনই মশকের উৎপাত বর্দ্ধিত হয়। এই সময়ে জ্বরের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব ঘটে। যেরূপ উৎসাহ, চেষ্টা ও আয়োজন করিলে দেশকে ম্যালেরিয়া ও মশকের উৎপাত হইতে মুক্ত করা যায়, কর্সিকাবাসীদিগের মধ্যে সেরূপ উৎসাহের ও চেষ্টার একান্ত অভাব। অন্ততঃ মিঃ মেনার্ড উইলিয়মস্ এইরূপই অনুমান করেন। তাঁহার বিশ্বাস, একটু চেষ্টা করিলেই এই দ্বীপের উর্ব্বর অংশ-সমূহ হইতে প্রচুর শস্য উৎপন্ন করা সম্ভবপর; ম্যালেরিয়াও অনায়াসে দূরীভূত হইতে পারে।

ইদানীং ইউকালিপটস্ বৃক্ষ প্রচুর পরিমাণে কর্সিকায় রোপণ করা হইতেছে। ইহাতে স্থানে স্থানে মশকের অত্যাচার ও প্রাদুর্ভাব কমিয়া গিয়াছে।

কর্সিকানগণ ক্রমেই আপনাদের অবস্থা সম্বন্ধে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিতেছে। তাহারা বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে যে, যদি একবার বাদামগাছগুলি কোনও রোগে আক্রান্ত হয় এবং উপযুক্ত ফল প্রদান না করে, তাহা হইলে কর্সিকায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ হইবে। কাসাবিয়াঙ্কা নামক একটি জমীদারীতে প্রায় ১৫ হাজার বিঘা জমীতে উৎকৃষ্ট ফসল উৎপাদন করিবার জন্য নানা প্রকার চেষ্টা হইতেছে। এখানকার গো, মেষ প্রভৃতি গৃহপালিত জীবগুলিও ক্রমশঃ পরিপুষ্টদেহ হইয়া উঠিতেছে। এই সমতল ক্ষেত্র হইতে জ্বর ও মশক দূরীভূত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা আরব্ধ হইয়াছে।

পোর্টোভেসিও "কর্কের" জন্য প্রসিদ্ধ। সমুদ্রতট হইতে ইহার প্রাকৃতিক দৃশ্য অত্যন্ত মনোরম। কিন্তু এখানকার জীবনযাত্রা আনন্দবিহীন, এখানকার বালকরা ক্রীড়া-কৌতুকেও যেন অনাসক্ত। বালিকাদিগের মধ্যেও স্ফূর্ত্তির অভাব প্রতীয়মান হয়। পোর্টোভেসিও এবং বোনিফেসিও এই উভয় স্থানে কর্ক হইতে ছিপি প্রস্তুত হইয়া থাকে। বোনিফেসিও নগরে সেণ্ট ডোমিনিকের এক গির্জ্জা আছে; উহা খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত হয়। এই গির্জ্জার সংলগ্ন অট্টালিকায় সংপ্রতি একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত আছে। প্রাসাদের অদূরে সেণ্ট বার্থলোমিউ কূপ অবস্থিত। এই কূপের চারি পার্শ্বে সোপানাবলী বিদ্যমান। ধাপের সংখ্যা ৩ শত হইবে। শুনা যায়, এই সোপানশ্রেণী এক রাত্রির মধ্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

কেয়া

বরষার প্রাতে জেগে উঠ ধীরে অবগুণ্ঠন টানি,
কা'র অভিশাপে কণ্টক-বনে বন্দিনী, ফুলরাণি!
বাদল আঁধার ঘনাইয়া আসে,
আঘাত কে দেয় দুয়ারের পাশে?
শ্যামল বর্ণ রাজপুত্র সে
পরশিল তনুখানি।
সোনার কাঠির মৃদুল পরশে
চোখ মেলে চাও, রাণি!

সজল আকাশ জল ছল ছল, দেয়া ঘন ঘন ডাকে।
সন্ধ্যা আঁধারে ওগো কেয়া বধূ! চাও ঘোম্‌টার ফাঁকে
বরষা ঝরিছে ঝর্ ঝর্ ঝর্,
ঘোম্‌টা খোলার এই অবসর;
আঁধারে এসেছে শ্যামল সে বর
চোখ তোল, দেখ তা'কে।
দল মেল, কেয়া! শুভ অবসর
এল সন্ধ্যারি ফাঁকে।

শ্রীলীলা মিত্র।

বর্ত্তমান সমস্যা

চেরাপুঞ্জীতে বর্ষার ধারা যেমন প্রবল, আমার প্রতি আপনাদের অনুগ্রহও তেমনই প্রবল; তাহার বর্ষণে আমার যে অবস্থা হইয়াছে, তাহাতে নির্ব্বাক্ হইয়া কেবল আপনাদের অনুগ্রহ নতশিরে গ্রহণ করিলেই সঙ্গত হইত; কিন্তু তাহা হইলে আপনারা সন্তুষ্ট হইবেন না; আমারও আপনাদের নিকট আগমনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। এক বৎসরকাল আমি ভারতের নানা স্থানে ঘুরিয়াছি। মহাত্মা গন্ধীর যে বাণী লইয়া আমি নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়াছি, আজ সেই বাণী বহন করিয়াই আপনাদের দ্বারে অতিথি। মহাত্মার এই বাণীই আমাদের স্বরাজলাভের শ্রেষ্ঠ উপায়। কোন কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিকেও বলিতে শুনিয়াছি, মহাত্মা বোধ হয় প্রকৃতিস্থ নহেন পরন্তু উন্মাদ। এক সময় আমারও কতকটা সেইরূপ ধারণা ছিল। তাঁহার সঙ্গে আমার প্রায় ২৩ বৎসরের ঘনিষ্ঠ পরিচয়—বন্ধুত্ব। তিনি যখন বলিলেন, চরকায় সূতা কাট, তাহাতেই ভারতের স্বরাজ সম্ভব হইবে; তখন আমিও মনে করিলাম, বুঝি বা তাঁহার মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটিয়াছে। কেন না, আমি পাশ্চাত্য শিক্ষার "আলোক" পাইয়াছি।

অনেকে বলেন, এ দেশে বড় বড় কলকারখানার প্রয়োজন; আজকাল দু' চারটি কলকারখানা প্রতিষ্ঠিতও হইতেছে। আপনারা দেখিতে পাইতেছেন, এই শিলচরের কাছেই খনিতে ও কলে কায চলিতেছে। ব্যক্তিগতভাবে আমিও কতকগুলি কলকারখানার সঙ্গে নানা সম্পর্কে জড়িত। কিন্তু তবুও আমার বিশ্বাস, মহাত্মার এই বাণীতে অন্তর্নিহিত গুরুত্ব বিদ্যমান। এই চরকা-খদ্দর, হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য ও অস্পৃশ্যতাবর্জ্জন এই তিনটিই স্বরাজলাভের প্রকৃত উপায়। রাজনীতিক ব্যাপারে অনেক মতভেদ থাকিতে পারে, আমি রাজনীতি লইয়া বড় আলোচনা করি না, সে কার্য্য যোগ্যতর ব্যক্তিরা করিতেছেন। একান্ত পরিতাপের বিষয়, গঠন-কার্য্যে তাঁহাদের অনেকেরই আগ্রহ দেখিতে পাই না। আমি একবার মহাত্মাজীকে লিখিয়াছিলাম যে, বাঙ্গালা দেশ স্বরাজের স্বল্পদরব্যাপী পথ না পাইলে তাহার পক্ষে স্বরাজলাভ করা কঠিন হইবে—এক লম্ফে সাগর পার হইয়া লঙ্কায় পৌছান আমরা চাহি। কিন্তু রাতারাতি স্বরাজ লাভ হয় না; সে জন্য জীবনব্যাপী সাধনার প্রয়োজন। আয়ার্লণ্ডের দেশভক্ত ম্যাকসুইনি অনশনব্রতাবলম্বী হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, আমরা এই একটা ভুল করি যে, অভীষ্ট দুই এক বৎসরে সিদ্ধ না হইলে মনে করি, জীবনে তাহা সিদ্ধ হইল না; তাই অবসাদ-সাগরে ডুবিয়া যাই। আয়ার্লণ্ডের পক্ষে যদি এ কথা সত্য হয়, তাহা হইলে ভারতের পক্ষে যে আরও অধিক সত্য, তাহা বলাই বাহুল্য। জাতির ভাগ্যবিধাতা আমাদের স্বরাজলাভের পথে কতরূপ পরীক্ষার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন! এই সুরমা উপত্যকায় হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতি লক্ষ্য করিয়া পরম আনন্দলাভ করিয়াছি। এক দিন শাহ্ জালাল ইসলাম-ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, তখন সহস্র সহস্র লোক সেই ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। আবার এই শ্রীহট্টবাসী ব্রাহ্মণের পুত্র শ্রীচৈতন্য এক দিন তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মে বঙ্গদেশ প্লাবিত করিয়াছিলেন। উভয় ধর্ম্মেই অসাধারণ উদারতা ছিল। ইসলামের স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী সর্ব্বজনবিদিত; ধনী ও নির্ধন অভিজাত সম্প্রদায়ের লোক ও জনসাধারণ সকলেরই পক্ষে ইহার দ্বার সর্ব্বদা উন্মুক্ত। হিন্দুধর্ম্মেও এক দিন উদারতার অভাব ছিল না, কিন্তু কালে ইহাতে বহু ত্রুটি প্রবেশ করিয়াছে। আমি ব্রাহ্মণ, আমি মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশ করিতে পাইব; আমি কায়স্থ, আমি অলিন্দ হইতে দেবদর্শন করিব; আমি নবশাক, আমি সোপান পর্য্যন্ত আরোহণ করিতে পারিব; আর ঐ যে তথাকথিত নিম্নশ্রেণী উহারা দূর হইতে উদ্দেশে দেবতাকে প্রণাম করিবে—এই যে পার্থক্যাত্মক ব্যবস্থা, এই যে অস্পৃশ্যতা ইহাই নানা অনিষ্টের মূল। স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, হিন্দুধর্ম্ম ভাতের হাঁড়ির ভিতর প্রবেশ করিয়াছে। এক জন তথাকথিত অস্পৃশ্য জাতির লোক আমাকে এক গ্লাস

জল আনিয়া দিলে তাহা পান করিবার সাহস আমার হয় না; অথচ বরফ,সোডা, লেমনেডে কোনরূপ আটকায় না। এ সব আমাদের আত্মকৃত পাপ। মাদ্রাজে বিজ্ঞবর সার টি. মাধবরাও বলিয়াছিলেন, আমাদের দুর্দ্দশার চৌদ্দ আনা আমাদের স্বকৃত; কাযেই তাহার প্রতীকার সম্ভব। আর মাত্র দুই আনা আমাদেব রাজনীতিক পরাধীনতার ফল। এই যে তথাকথিত নিম্নজাতিদিগকে আমরা নানা অধিকারে বঞ্চিত রাখিতেছি, ইহাতে কি ঈশপের উদর ও অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গল্প মনে পড়ে না? এই যে কৃষকরা—ইহারা সমাজের মেরুদণ্ড। ইহাদিগকে বাদ দিলে সমাজের কি অবস্থা হয়? তাহার পর হিন্দু-মুসলমান সমস্যার কথা' এই সুরমা উপত্যকায় শতকরা ৫৫ জন লোক মুসলমান; বাঙ্গালায় শতকরা ৫২ জন মুসলমান ৪৮ জন হিন্দু; এ অবস্থায় অস্পৃশ্যতা বর্জ্জিত না হইলে ও হিন্দু-মুসলমানে সম্প্রীতি সংস্থাপন ব্যতীত আমাদের উন্নতি অসম্ভব। হিন্দু-মুসলমানে সম্প্রীতি এ দেশে নূতন নহে। হুসেন শাহ বাদশাহের রূপ ও সনাতন নামে দুই জন হিন্দু মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহারা চৈতন্যের আদেশে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছিলেন। বিদ্যাপতি হুসেন শাহকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন, "চিরঞ্জীব রহু পঞ্চগৌড়েশ্বর।" হুসেন শাহের প্রতিনিধি চট্টগ্রামের শাসনকর্ত্তা পরাগল খাঁ মুসলমান হইলেও মহাভারতের অনুবাদ আরম্ভ করাইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র ছুটী খাঁ ঐ অনুবাদ সম্পূর্ণ করান; সেই অনুবাদ "পরাগলী মহাভারত" নামে পরিচিত। ২ শত বৎসর পূর্ব্বে যে দুই সম্প্রদায়ে এইরূপ সদ্ভাব ছিল, আজ তাহাদের এই ভাবান্তরের কারণ কি? মুসলমান সম্রাট্ ঔরঙ্গজেবের সময় মহারাষ্ট্র-জাতির অভ্যুদয়কালে ঔরঙ্গজেব শিবাজীর দমন জন্য হিন্দুসেনাপতি যশোবন্ত সিংহকে পাঠাইয়াছিলেন। আমার বাড়ী খুলনা জিলায়। তাহারই নিকটে প্রতাপাদিত্য যখন স্বাধীনতা ঘোষণা করেন, তখন তাঁহাকে দমন করিবার জন্য আকবর কোন মুসলমান সেনাপতিকে বিশ্বাস না করিয়া হিন্দু সেনাপতি মান সিংহকে পাঠাইয়াছিলেন। তখনও হিন্দু-মুসলমানে বিরোধভাব ছিল না।

দাদাভাই নৌরোজী, গোখলে প্রভৃতি যে স্বরাজ চাহিয়াছিলেন, তাহার কারণ, এ দেশের লোকের দ্বারা এ দেশ শাসন করিবার ব্যবস্থা করিলে শাসনের ব্যয় কম হইবে এবং তাহাতে দেশের স্বাস্থ্যোন্নতির ও শিক্ষা-বিস্তারের সুবিধা হইবে। বিলাতে শতকরা ৯৮ জন লোক শিক্ষিত, আব আমাদের দেশে ৫ জন অর্থাৎ ৫ জন মাত্র লোক লিখিতে ও পড়িতে পারে। এই শিক্ষা-সমস্যার সমাধান করা একান্ত প্রয়োজন। পারস্যে শিক্ষা বাধ্যতামূলক হইয়াছে; মিশরে জগলুল পাশার অধীনে শিক্ষাবিস্তারের ব্যবস্থা হইতেছে। এ দেশে শিক্ষা বাধ্যতামূলক হইলে পূর্ব্ব ও উত্তরপূর্ব্ববঙ্গে মুসলমান ও অন্যান্য তথাকথিত অনুন্নত জাতির উপকার হইবে; সুতরাং তাহাদিগকেও এ বিষয়ে অবহিত হইতে হইবে।

হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে প্রবেশলাভ করিয়া অস্পৃশ্যতা কিরূপ উৎকট আকার ধারণ করিয়াছে, তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। মগগণ যখন দেশ মন্থন করিতে করিতে এবং অনেক স্থলে মহিলাদিগের উপর অত্যাচার করিতে করিতে দক্ষিণ-বঙ্গের দিকে অগ্রসর হইতেছিল, তখন কোন গ্রামে পুরুষরা প্রাণভয়ে পলায়ন করিলে এক জন স্ত্রীলোক মান-ইজ্জৎ বাঁচাইবার জন্য পুষ্করিণীতে ঝাঁপাইয়া পড়ে; দেখিয়া দয়াপরবশ হইয়া এক জন মগ তাহাকে জল হইতে তুলিয়া আনে। মগ তাহার কেশ স্পর্শ করিয়াছিল, এই "অপরাধে" সমাজ তাহাকে পরিত্যাগ করিল! যে দেশে শতকরা ৯৯ জন তথাকথিত নিম্নজাতি, সে দেশে তাহাদিগকে বাদ দিলে সমাজের অবস্থা কিরূপ হয়? স্বরাজ আসিলে কাহারা আমাদের সেনাদল পুষ্ট করিবে? যাহাদের বাহুতে বল আছে, সেই নমঃশূদ্র প্রভৃতি অনুন্নত জাতিই তখন আজিকার উচ্চশ্রেণীর চশমাধারী বি. এ., এম. এ. পাশ করা বাবুর দলকে পশ্চাতে ফেলিয়া যাইবে।

আমি যে আজ বিজ্ঞানচর্চ্চা অবহেলা করিয়া মহাত্মার বাণী প্রচার করিয়া ফিরিতেছি, ইহার কারণ কি? ইহার কারণ, বিজ্ঞানচর্চ্চায় বিলম্ব করা যায় কিন্তু স্বরাজসাধনায় বিলম্ব করা চলে না। বঙ্গদেশে আমরা কিছু অতিমাত্রায় শিক্ষিত ও সভ্য হইয়াছি; তাই অন্ধ্র দেশে শতকরা ৯০ জন লোক খদ্দর পরে, আর বাঙ্গালায় শিক্ষিত

সমাজে শতকরা ১ জনও পরে কি না সন্দেহ। এই যে ৫ কোটি লোক; ৭০।৭৫ বৎসর পূর্ব্বে যখন এ দেশে বিদেশী কাপড়ের আমদানী ছিল না, তখন কে ইহাদের কাপড় যোগাইত? আর আজ যদি বিদেশ হইতে কাপড় আমদানী বন্ধ হয়, তবে কি সকলে দিগম্বর হইবে? আসামে যথেষ্ট তূলা উৎপন্ন হয়, এই তূলা স্বেচ্ছাসেবকদিগকে দিয়া ঘরে ঘরে যোগাইলে কত টাকার কাপড় পাওয়া যায়! আমরা হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিয়া বৎসরে ৬০ কোটি টাকা বিদেশীদের হাতে তুলিয়া দিতেছি। ৩০ নম্বরের উপর যে সূতা, তাহা ম্যাঞ্চেষ্টারের। সেই সূতায় প্রস্তুত কাপড় আমরা "দেশী" বলিয়া ব্যবহার করিতেছি, অথচ খদ্দর ব্যবহার করি না! ৪ টাকা দিয়া যদি এক জোড়া বিলাতী কাপড় কিনি, তবে সে ৪টি টাকা সাগরপারে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। আর খদ্দরে যদি ৫ টাকাও পড়ে তবুও সে আমার দেশের লোকে পায়। সেকালে ভদ্রঘরের মহিলারা চরকায় সূতা কাটিতেন। এখন যদি প্রত্যেক গৃহস্থ তরিতরকারীর সঙ্গে কিছু জমীতে তূলার চাষ করেন, এবং সেই তূলায় ঘরে সূতা কাটা হয়, তবে যে বাড়ীতে প্রতিদিন ২ তোলা সূতা কাটা হয়, সে বাড়ীতে বৎসরে ১৬ খানা কাপড়ের সংস্থান হয়। অথচ আমরা অতি দরিদ্র জাতি, আমাদের দৈনিক ৫ পয়সা আয়ের সঙ্গে যদি ১ পয়সা বাড়াইতে পারি, তাহা হইলেও অনেক উপকার হয়। ভারতের নানা প্রদেশ হইতে লোক আসিয়া বাঙ্গালায় অন্নার্জ্জন করিতেছে; আর আমরা শুধু ডেপুটীগিরি ও দারোগাগিরির জন্য কামড়াকামড়ি করিতেছি। এই যে আমরা রেলে ষ্টীমারে ঘুরিতেছি, ইহারও প্রতি টাকায় ১২ আনা বিলাতের লোক লইতেছে, আর দেশের লোক কুলী-মজুরের কায করিয়া ৪ আনা মাত্র পাইতেছে। বাঙ্গালী জাতি আপনাদের প্রকৃত অবস্থা যত দিন উপলব্ধি করিতে না পারিবে, তত দিন আমাদের বাঁচিবার উপায় নাই। আমাদিগকে বস্ত্র-সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। বাড়ী বাড়ী তূলা যোগাইয়া সেই তূলায় কাটা সূতা সংগ্রহ করিয়া জোলা-তাঁতীর দ্বারা খদ্দর প্রস্তুত করিতে হইবে। ব্যবসাটি ব্যাপারীর হাতে যাইলেই সর্ব্বনাশ হইবে।

আর এক কথা এই, বাঙ্গালীকে কেরাণীগিরির মোহ ত্যাগ করিয়া ব্যবসার ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে। তাহা হইলে এক দিকে যেমন আমাদের অন্ন-সমস্যার সমাধান হইবে, আর এক দিকে তেমনই চাকরী লইয়া হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ দূর হইবে। বর্ত্তমানে আমাদের যে সব সমস্যা, সে সকলের সমাধানের উপায় মহাত্মা গন্ধী নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন—হিন্দু-মুসলমান-প্রীতি, অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জন ও চরকা-চলন।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়।

শিলচরে সাধারণ সভায় প্রদত্ত বক্তৃতার শ্রুতলিপি।

সত্যাগ্রহী

ধন্য তুমি সত্যাগ্রহী, গাইছে জগৎ তোমার জয়;
নাইকো হিংসা, নাইকো দ্বেষ,
নাইকো লজ্জা, নাইকো ভয়।

সত্য ধর্ম্ম সার বুঝেছ, সত্য হেতু জীবন পণ;
সইছ কত দুঃখ জ্বালা ছাড়নি ত সত্য ধন।

শতেক বাধা তুচ্ছ ক'রে, হাস্যাননে যাচ্ছ ধেয়ে;
সসম্ভ্রমে জগদ্বাসী তোমার পানে দেখছে চেয়ে।

মুক্ত কৃপাণ তপ্ত গোলা দেখেও থাক অটল স্থির;
কিছুতে না কাঁপে হিয়া, জয় জয় জয় সত্যবীর।

শুনতে পাই ত পুরাণেতে দৈত্যকুলের চাঁদের কণা;
হরিভক্ত প্রহ্লাদেরো ছিল যে ঠিক এই সাধনা।

হস্তিপদে অহিবিষে ছিল না তিলমাত্র ভয়;
লেলিহান বহ্নিমুখে, সাগরজলে হাস্যময়।

সত্যই যার বর্ম্ম-চর্ম্ম সত্যই যার শিরস্ত্রাণ;
ভয় পেয়ে ভয় পলায় দূরে, হয় না কাছে আগুয়ান।

সেই শুনেছি—আজ দেখিনু ধন্য মোরা ভাগ্যবান্;
ফুল্ল-কমল কোমল-কায়ে শক্তি এ যে—ধাতার দান।

বন্দি তোমায় সত্যাগ্রহী, ধর্ম্মবলে বলীয়ান্;
সিদ্ধি লভ ধর্ম্মযুদ্ধে বিশ্ব-মাতার সুসন্তান্।

শ্রীমনোমোহন চক্রবর্ত্তী, বিদ্যারত্ন।



শনির দশা

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

পিতৃ-বিয়োগ

রজনীর দ্বিতীয় যাম উত্তীর্ণ হইয়াছে। কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর গাঢ় অন্ধকারে দিগ্‌দিগন্ত সমাচ্ছন্ন, আকাশে তারকারাজি ক্ষীণ আলোক বিতরণ করিতেছে। জনকোলাহলপূর্ণ গ্রামখানি তখন নীরব নিস্তব্ধ। কচিৎ দুই এক জন পথিক সেই গাঢ় অন্ধকার ভেদ করিয়া রাজপথ অতিক্রম করিয়া চলিতেছে।

পথের ধারে রাধামাধব বসুর বিশাল ভবনে কেবল একটি কক্ষ হইতে তখনও আলোকরশ্মি দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। গ্রাম তখন নীরব হইলেও বসু মহাশয়ের অট্টালিকায় তখনও মানুষের কথাবার্ত্তা শুনা যাইতেছিল। সহসা কেহ দেখিলে বুঝিতে পারিত, সকলেরই মুখে একটা উৎকণ্ঠার চিহ্ন ফুটিয়া রহিয়াছে, সকলেই যেন অত্যন্ত ব্যস্ত।

দ্বিতলের বৈঠকখানায় একটি পালঙ্কের উপরে বৃদ্ধ বসু মহাশয় শয়ন করিয়া আছেন। তাঁহার রুগ্ন পাণ্ডুর মুখে মৃত্যুর চিহ্ন স্পষ্টরূপেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। শিয়রে বাসন্তী পাখা লইয়া, তাঁহার মুখের উপর দৃষ্টি স্থির রাখিয়া নীরবে ব্যজন করিতেছিল। তাহার মুখে হতাশার ভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছিল। মাঝে মাঝে অঞ্চল দিয়া সকলের অজ্ঞাতে সে নিজের চক্ষু মুছিয়া ফেলিতেছিল। পার্শ্বে জ্যেঠাইমা বসিয়া বসু মহাশয়ের গাত্রে হস্ত বুলাইতেছিলেন। শীর্ণ হস্তদ্বয় বক্ষঃস্থলে স্থাপিত করিয়া বৃদ্ধ মুদিতনেত্রে শয়ন করিয়া ছিলেন। মাঝে মাঝে রোগের যন্ত্রণায় তাঁহার মুখ হইতে অস্ফুট যন্ত্রণাব্যঞ্জক শব্দ নির্গত হইতেছিল। কক্ষস্থিত ক্ষীণ আলোকে বাসন্তীর বেদনাক্লিষ্ট মুখখানি আরও ম্লান দেখাইতেছিল।

পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষে দুই তিন জন ডাক্তার লইয়া বৃদ্ধ দেওয়ান বসিয়া আছেন। অদ্য প্রাতঃকাল হইতে বসু মহাশয়ের কলেরার মত হইয়াছে, প্রথমে তিনি কাহাকেও কিছু বলেন নাই, ক্রমশঃ অসুখ বেশী হওয়ায় তিনি আর লুকাইতে পারেন নাই। নাড়ীর অবস্থা খারাপ দেখিয়া সন্তোষকে টেলিগ্রাম করা হইয়াছিল, সে এখনও আসিয়া পৌছিতে পারে নাই।

টেবলের উপরিস্থ ঘড়ীতে একটা বাজিয়া গেল। তাহার শব্দে বসু মহাশয় চক্ষু উন্মীলিত করিয়া পার্শ্বস্থিত বাসন্তীকে কহিলেন, "মা, তুমি এখনও শোও নি? বউঠাকরুণ কোথায়?"

জ্যেঠাইমা ঈষৎ ঝুঁকিয়া পড়িয়া কহিলেন, "এই যে আমি কাছেই আছি।"

বসু মহাশয় ক্ষীণকণ্ঠে কহিলেন, "আপনি একটু বিশ্রাম করুন, আমি এখন একটু ভাল বোধ কচ্ছি।" তাহার পর বধূর দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া তিনি কহিলেন, "মা, শোন। তোমার সঙ্গে গোটাকতক কথা আছে। অধীর হয়ো না, মা, জগতের নিয়মই এই। এ থেকে কেউই পরিত্রাণ পায় না। সকলকেই এক দিন যেতে হবে। ও কি, কাঁদছ মা, ছি, কেঁদ না। আমি বলি শোন। মা, আমিই তোমাকে এই দুঃখের মধ্যে এনেছিলুম, তখন মনে আশা ছিল যে, তোমাকে সুখী করতে পারবো; কিন্তু তা' আর দেখে যেতে পেলুম না। আজ আমি যাচ্ছি, মা, মনে কোন কষ্ট-দুঃখ নেই, কেবল তোমাকে একা রেখে যাচ্ছি, তোমাকে দেখবার কেউ রইল না, এই আমার—" তিনি আর বলিতে পারিলেন না। বাসন্তীর দুই গণ্ড বহিয়া অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। বসু মহাশয় একটুখানি সামলাইয়া লইয়া বলিলেন, "মা, আমার বর্ত্তমানে যাহারা আমার আশ্রয়ে আছে, আমার অবর্ত্তমানে

তাহারা যেন আশ্রয়হারা না হয়। এদের উপর যেন তোমার দৃষ্টি থাকে। আর মা, তুমি অভিমানের বশে কখনও কোন দিন এ ঘর ত্যাগ করো না। তুমি বুদ্ধিমতী, সবই বুঝতে পারছো। এই ঘর ছাড়া তোমার আর কোন উপায়ই নেই, এ কথাটা সর্ব্বদা মনে রেখো। আর একটা কথা তোমাকে বল্‌তে চাই, আমার এ কথাটা মনে রাখবে তো, মা?" বাসন্তী উচ্ছ্বসিতভাবে কাঁদিয়া উঠিল।

বহুক্ষণ পরে বাসন্তীকে শান্ত করিয়া বসু মহাশয় পুনরায় কহিলেন, "মা, সন্তোষ যদি কোন দিন নিজের অপরাধ বুঝতে পেরে তোমার কাছে আসে, তা হ'লে তাকে ক্ষমা করো, মা, অভিমান ক'রে তাকে ফিরিয়ে দিও না। বল মা, তুমি তা' করবে?"

বাসন্তী রোদনরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "আপনি আশীর্ব্বাদ করুন, বাবা।"

"আমি আশীর্ব্বাদ কর্‌ছি, তুমি তা' পার্‌বে, মা। বৌদিদিকে কখনও কষ্ট দিও না। এখন তিনিই তোমার একমাত্র সহায় রইলেন, আর কেউ রইল না।"

জ্যেঠাইমা ও বাসন্তী একসঙ্গে দুই জনই কাঁদিয়া উঠিলেন। বসু মহাশয়ের শীর্ণ গণ্ডস্থল বহিয়া অশ্রুধারা বহিতে লাগিল।

পরদিন প্রাতঃকালে বসু মহাশয়ের নাড়ীর অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হইয়া পড়িল। তিনি যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলেন। বাহ্যজ্ঞানশূন্যা বাসন্তী নির্নিমেষ-নেত্রে নিয়তই তাঁহার মুখের ভাব পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল। তাহার অন্তরের ক্রন্দন আর যেন সে রুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিতেছিল না, নিজেকে যেন সে একান্ত নিরাশ্রয় মনে করিতেছিল। কেবলই তাহার মনে হইতেছিল, বাবা যদি না বাঁচেন, তবে তাহার দশা কি হইবে? এই বিশাল জগতে তাহার আর কোন স্নেহাবলম্বনই নাই, ইঁহার অভাবে সে আজ কোথায় কাহার কাছে দাঁড়াইবে, এই অপরিমেয় দুঃখ সহ্য করিয়া তাহাকে আর কত কাল বাঁচিয়া থাকিতে হইবে?

সারাপথ দুঃসহ বেদনায় কাটাইয়া প্রাতঃকালে সন্তোষ গৃহে আসিয়া পৌঁছিল। সে দ্বিতলের সোপান অতিক্রম করিতেই সম্মুখে বৃদ্ধ দেওয়ান সদাশিব বাবুকে দেখিয়া ভগ্নকণ্ঠে কহিল, "দাদাভাই, বাবা—"

বৃদ্ধ তাহার পৃষ্ঠে হস্ত দিয়া কহিলেন, "ভয় কি, ভাই, তিনি ভাল আছেন।"

সন্তোষ বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, "কোথায় তিনি? আমাকে নিয়ে চলুন।"

দেওয়ান কহিলেন, "খুব সাবধানে চল, ভাই, হঠাৎ তোকে দেখলে শ্বাস বন্ধ হ'তে পারে। তুই বেশী উতলা হস্‌নি।"

তখন উভয়ে নীরবে রোগীর গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন। মুক্ত দ্বারপথে দেখা গেল, সম্মুখেই পিতা শয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন, শিয়রে ঈষৎ অবগুণ্ঠনে মুখ আবৃত করিয়া একটি কিশোরী উপবিষ্টা রহিয়াছে। সন্তোষ বুঝিতে পারিল, এ অপর কেহ নহে, তাহারই অনাদৃতা পত্নী। সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে একটা বিদ্বেষের ভাব ফুটিয়া উঠিল। সে ভাবিতেছিল, ইহারই জন্য আজ সে পিতার স্নেহে বঞ্চিত, গৃহবহিষ্কৃত, ভিখারীর অধম; অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইয়াও সে আজ এখানে অতিথিমাত্র। অভিমানে ক্ষোভে সন্তোষের বক্ষ ফাটিয়া যাইতেছিল, তাহার কেবলই মনে হইতেছিল, ইহার সম্মুখে বাবা যদি কিছু বলেন, তখন সে লজ্জা রাখিবে কোথায়? তাহার কম্পিত পদদ্বয়কে কোন রকমে টানিয়া আনিয়া সে পিতার পদতলে মুখ লুক্কায়িত করিয়া নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিল।

বাসন্তী কিন্তু সন্তোষকে দেখিয়া কোনরূপ কুণ্ঠিত ভাব দেখাইল না। সে যেমন ভাবে বসিয়া ছিল, তেমনই ভাবেই বসিয়া রহিল। জ্যেঠাইমা পূজা আহ্নিকের জন্য উঠিয়া গিয়াছিলেন, সে একাকীই বসিয়া ছিল। নিকটস্থ ঘড়ী দেখিয়া বাসন্তী তাড়াতাড়ি পাখা রাখিয়া টেবলের দিকে অগ্রসর হইল, সন্তোষ পরিত্যক্ত ব্যজনী উঠাইয়া লইয়া ধীরে ধীরে বাতাস দিতে লাগিল। সদাশিব বাবু বাসন্তীকে উঠিতে দেখিয়া তাহার দিকে অগ্রসর হইলেন। বাসন্তী মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "কোন্ অষুধটা দেব?"

দেওয়ান টেবল হইতে একটি শিশি তুলিয়া লইয়া তাহার হস্তে দিলেন। বাসন্তী গমনোদ্যতা হইলে তিনি

মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, "যদি ঘুমিয়ে থাকেন, তা হ'লে উঠিয়ে অষুধ দিও না।" এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

বাসন্তী কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া কি করিবে ভাবিতেছে, এমন সময়ে ক্ষীণকণ্ঠে বসু মহাশয় ডাকিলেন, "মা !"

বাসন্তী তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া তাঁহার মুখের উপর নত হইয়া স্নিগ্ধস্বরে কহিল, "বাবা, আমায় ডাকছেন ?"

বসু মহাশয় কহিলেন, "বড় তেষ্টা।" বাসন্তী শিশি হইতে ঔষধ ঢালিয়া তাঁহার মুখে দিল। তিনি তাহা পান করিয়া ক্ষীণস্বরে ডাকিলেন, "বউ ঠাকরুণ !"

বাসন্তী কহিল, "জ্যেঠাইমা জো করতে গেছেন।"

"আমায় বাতাস দিচ্ছে কে ?"

বাসন্তী তখন কি বলিবে ? সে স্থির হইয়া নতবদনে দাঁড়াইয়া রহিল।

তিনি পুনরায় কহিলেন, "বৌমা, সদাশিব ?" কোন উত্তর না পাইয়া তিনি পুনরায় বলিলেন, "সদাশিব, কথা বলছ না কেন ?"

এবার সন্তোষ স্থির থাকিতে পারিল না, সে রুদ্ধ-কণ্ঠে কহিল, "বাবা !"

যেন তাড়িতস্পর্শে আহত হইয়া বসু মহাশয় চমকিত হইয়া উঠিলেন। তিনি চক্ষু উন্মীলিত করিয়া শিয়রে উপবিষ্ট পুত্রকে দেখিয়া ক্ষীণকণ্ঠে ডাকিলেন, "সন্তু— বাবা—"

সন্তোষ পিতার মস্তকে মস্তক রক্ষা করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। কিয়ংক্ষণ পরে বাসন্তী জড়িতস্বরে কহিল, "বাবা কেমন ধারা কচ্ছেন, আমি মাথায় জল দিচ্ছি, একটু জোরে বাতাস দিন।"

সন্তোষ প্রথমে বুঝিতে পারে নাই; তাহার পর নিজের কপালে ঠাণ্ডা লাগায় নিজের মস্তক উঠাইয়া লইতেই দেখিল, সম্মুখে বাসন্তী বরফ লইয়া তাহার পিতার কপালে বুলাইতেছে। পিতা যে অজ্ঞান হইয়া গিয়াছেন, তাহা সে বুঝিতে পারে নাই, এক্ষণে সে কি করিবে, তাহা ঠিক করিতে না পারিয়া এক পার্শ্বে সরিয়া বসিল। বাসন্তীর তখন রাগ হইতেছিল। সে মুখে কিছু না বলিয়া বাঁ হাতে পাখা লইয়া নিজেই বাতাস করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে বসু মহাশয়ের জ্ঞানসঞ্চার হওয়ায় তিনি অত্যন্ত জড়িত স্বরে ডাকিলেন, "মা !"

বাসন্তী তাঁহার মুখের উপর নত হইয়া কহিল, "কেন, বাবা ?"

"সে কোথায় গেল ?"

বাসন্তী কিছুই উত্তর দিতে পারিতেছিল না, এমন সময় জ্যেঠাইমা আসিয়া সন্তোষকে সম্মুখে দেখিয়া নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন।

বসু মহাশয় ডাকিলেন, "সন্তু, কাছে আয় !" সন্তোষ অগ্রসর হইয়া পিতার নিকট আসিতেই তিনি তাহার দিকে চাহিয়া কহিলেন, "সন্তু, বাবা, আজ আমি চলেছি। আজ তোকে একটা কথা বলি, বল্, রাখবি ?"

সন্তোষ কোন কথা বলিল না দেখিয়া তিনি পুনরায় কহিলেন, "আর আমায় কষ্ট দিসনি, অনেক দিন ধ'রে কষ্ট পাচ্ছি, আজকে আর তুই 'না' বলিস্‌নি। শোন, বাবা, আমার উপর রাগ ক'রে তুই আর আমার মা'কে কষ্ট দিস্‌নি। আজ পাঁচ বছর ধ'রে তা'র যন্ত্রণা দেখে দেখে বুক আমার ভেঙ্গে গেছে। তুই লিখাপড়া শিখেছিস্, আমার দোষে মা'কে আমার কষ্ট দেওয়া কি উচিত হচ্ছে ? যাক্, সে সবই আমার বরাতের দোষ— এতে তোর কোন অপরাধ নেই। কিন্তু আজ আর তুই আমার অবাধ্য হস্‌নি, তুই বল্ একবার, মা'কে আমার সুখী করবি ?"

সন্তোষের অবাধ্য কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হইল, "বাবা —আমায়—মাপ করুন, আমি পারব—"

বসু মহাশয় বিরক্তিপূর্ণ স্বরে কহিলেন, "বাবা, এখনও বুঝলি না, মৃত্যুকালেও আমাকে শান্তিতে মরতে দিলি না ? কিন্তু আমি ব'লে যাচ্ছি, মনে রাখিস্, এক দিন— তোকে—এর জন্যে—"

ক্রমশঃ বসু মহাশয়ের শ্বাসের লক্ষণ প্রকাশ পাইতে লাগিল। ডাক্তার আসিয়া নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বলিয়া গেলেন, আর সময় নাই। সন্তোষ কাঁদিতে লাগিল, সে তখন পিতার বক্ষের উপর মস্তক রাখিয়া ক্রন্দন-জড়িতকণ্ঠে কহিল, "বাবা—বাবা—শুনে যান, যদি পারি—আপনার—"

তাহার আর কিছু বলিতে হইল না, বসু মহাশয় ক্ষীণ-স্বরে অর্দ্ধোচ্চারিত ভাষায় কহিলেন, "মা—স—রাধা—" তাহার পর স্থির। বসু মহাশয়ের আত্মা শান্তির অন্বেষণে শান্তিধামে চলিয়া গেল। জ্যেঠাইমা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন; সন্তোষ পিতার বক্ষে পড়িয়া গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিতে লাগিল; বাসন্তী মূর্চ্ছিত হইয়া বসু মহাশয়ের পদতলে পড়িয়া গেল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

উইল-সংবাদ

বসু মহাশয়ের মৃত্যুতে বাসন্তী নিজেকে অত্যন্ত অসহায়া বোধ করিতে লাগিল। সে মুখে কিছু প্রকাশ করিত না বটে, কিন্তু অন্তরের মধ্যে জ্বলিয়া পুড়িয়া যাইতেছিল। যে মহানুভবের দয়ায় সে রাজরাজেশ্বরী হইয়াছিল, আজ হয় ত তাঁহার অভাবে আশ্রয়হীনা ভিখারিণীরও অধম হইতে হইবে। স্বামিপ্রেমে বঞ্চিতা অনাদৃতা, তবুও সে শ্বশুরের অপরিসীম স্নেহ-যত্নে কোন দিনই কিছুর অভাব বোধ করে নাই। কি যে তাহার ছিল, আর কি যে সে হারাইল, তাহা সে ভিন্ন আর কে বুঝিতে পারে? শুধু একটা বিরাট আর্ত্ত হাহাকার তাহার হৃদয় হইতে ঠেলিয়া ঠেলিয়া উঠিতেছিল, সান্ত্বনার কিছুই ছিল না।

তাহার কেবলই মনে হইতেছিল, সে এখন সকলের নিকট ঘৃণা ও অবহেলার পাত্রী হইয়া থাকিবে। মৃত্যু ভিন্ন তাহার আর কোন উপায়ই নাই। সে এখন গলগ্রহ, তাহাদের সুখের অন্তরায়, পথের আবর্জ্জনা ছাড়া আর কিছুই নহে। তবু চিরদিন তাহাকে এই বিষের জ্বালায় জর্জ্জরিত হইয়া এই স্থানেই এই মাটী কামড়াইয়া পড়িয়া থাকিতে হইবে, তাহার দ্বিতীয় আশ্রয় নাই। তথাপি তাহার মনে হইতেছিল, এখানকার সঙ্গে তাহার যেন সমস্ত সম্পর্কই শেষ হইয়া গিয়াছে, সে যদি আজ এখান হইতে চলিয়াও যায়, তথাপি বাধা দিতে কেহ আর আসিবে না। চোখের জলে তাহার বক্ষ ভাসিয়া যাইতে লাগিল, মর্ম্মরাচ্ছাদিত গৃহতলে পড়িয়া সে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহার পর তাহার চির-অতৃপ্তিভরা জীবনকে যিনি স্নেহের স্নিগ্ধধারায় তৃপ্ত করিয়া তাহার সকল দুর্ভাগ্যের বেদনাকে ঢাকিয়া রাখিয়াছিলেন, সেই একমাত্র ব্যথার ব্যথী, অসহায়ের সহায় স্নেহময় শ্বশুর তাহার, তিনিও আর ইহজগতে নাই—তাহার চারিদিকের শূন্যতা হাহাকার করিয়া উঠিল, অজ্ঞাতে তাহার বদ্ধ ওষ্ঠ হইতে বাহির হইল, "দয়াময়!"

অন্ধকার কক্ষমধ্যে একাকী কম্বলের শয্যায় শয়ন করিয়া সন্তোষ নানাবিধ দুশ্চিন্তায় অস্থির হইয়া উঠিতেছিল। সংসারের প্রার্থিত সকল সুখের বস্তু যাঁহারা পায়েন, তাঁহারা ভবিষ্যতে তেমনই সুখের দৃশ্য কল্পনা করিয়া থাকেন, দুঃখের কল্পনাও করিতে পারেন না—অথবা করিতে চাহেনও না। সংসারের পথ যে সর্ব্বদাই কণ্টকাকীর্ণ, তাহা বুঝিবার শক্তি তাঁহাদের থাকে না, তাঁহারা নিজে যাহা ভাল বুঝেন, তাই করিয়া থাকেন, অপরের কোন কথাই তাঁহারা গ্রাহ্য করেন না।

সন্তোষকুমার আবাল্য সুখের ক্রোড়েই লালিত-পালিত হইয়াছিল। দুঃখের অবস্থা যে কিরূপ কঠিন, ভগবানের দয়ায় সে কখনও তাহা অনুভব করে নাই। আজ পিতার অবর্ত্তমানে সে নিজেকে অত্যন্ত বিপদ্‌গ্রস্ত মনে করিতেছিল। সে বিষয়াদির কিছুই বুঝিত না, পিতা বর্ত্তমানে সে কোন দিন বুঝিতেও চেষ্টা করে নাই। আজ পিতার অভাবে সে যেন বিব্রত হইয়া পড়িল। সে আরও ভাবিতেছিল, বিষয়াদি দেখিতে গেলে তাহাকে এখানেই বাস করিতে হইবে, এখানে থাকিলে সর্ব্বদাই তাহাকে বাসন্তীর সঙ্গ গ্রহণ করিতে হইবে, সুতরাং ইহা একেবারেই তাহার পক্ষে অসম্ভব। বাসন্তীর উপরেই তাহার রাগ হইতে-ছিল; সে যদি পিতার সম্মুখে না পড়িত, তাহা হইলে হয় ত কখনও তাহার সুখের আশা থাকিত। কিন্তু এখন আর জীবনেও সে আশা নাই। সে আর জন্মে তাহার শত্রু ছিল, তাই এ জন্মে তাহার প্রতিশোধ লইতে আসিয়াছে। তাহার নিজের উপরেও যে রাগ না হইতেছিল, এমন নহে। সে ইহাও ভাবিতেছিল যে, সে বিবাহ করিল কেন? সে বিবাহ না করিলে ত কেহ কিছু করিতে পারিত না। ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, সে যাহা করিয়া ফেলিয়াছে, তাহা ত আর ফিরিবে না।

সুষমা যে এ বিবাহে অসুখী নহে, তাহাও তাহার কথায় সে সে দিন বুঝিতে পারিয়াছিল। সুষমার উপর তাহার ত আর অধিকার নাই। সে ত চিরদিনের মতই তাহাদের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছে। সে যে বিবাহিত, সুষমার বিষয় চিন্তা করাও যে তাহার অনুচিত। সে যদি যথার্থই তাহাকে ভালবাসে, বিবাহ না করে, তথাপি তাহাকে বিবাহ করিবার সাধ্য তাহার কোথায়? সুখ বলিতে যাহা কিছু, তাহা তাহার আর নাই। যে দায়িত্ব সে স্কন্ধে গ্রহণ করিয়াছে, তাহা এখন ফেলিবে কোথায়? মৃত্যু ভিন্ন তাহার আর অব্যাহতি নাই। কিন্তু ভগবানের এমনই সূক্ষ্ম বিচার যে, দারুণ যন্ত্রণায় মৃত্যুকে যখন লোক আহ্বান করে, সে-ও তখন দূরে সরিয়া যায়।

বসু মহাশয়ের ভগিনীকে 'তার' করা হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার এক কন্যার জ্বরাতিসার হওয়ায় তিনি ভ্রাতার মৃত্যুশয্যায় আসিতে পারেন নাই। জ্যেঠাইমা একাকিনী কোনমতে বাসন্তীকে শান্ত করিতে পারিতেছিলেন না। সে রাত্রিতে কোনমতেই আহার করিতে চাহে না, প্রাতে অনেক সাধ্যসাধনায় একবারমাত্র হবিষ্যান্ন করিয়া নিজের গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দেয়। জ্যেঠাইমা শত চেষ্টাতেও তাহার দ্বার মুক্ত করিতে পারেন না। জ্যেঠাইমা অতিশয় বুদ্ধিমতী ছিলেন, বাসন্তীর অবস্থা যে তিনি না বুঝিয়াছিলেন, এমন নহে; সন্তোষের বুদ্ধি যে ভাল নহে, তাহাও তিনি জানিতেন। দেবরের অবর্ত্তমানে বাসন্তীর যে কি হইবে, তাহা ভাবিয়া তিনিও অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলেন। তথাপি তাঁহার বয়স হইয়াছিল, তিনি যতটা ধৈর্য্য ধরিতে পারিয়াছিলেন, বাসন্তীর ততটা ধৈর্য্য ধরিবার শক্তি ছিল না। তিনি এই সব ভাবিয়া নীরব থাকিতেন। এক একবার ইচ্ছা হইত, সন্তোষকে বুঝাইয়া বলেন, কিন্তু মৃত্যুশয্যায় দেবরের একান্ত অনুরোধেও সন্তোষ যখন তাঁহার কথা রাখিল না, তখন তাঁহার কথাই যে রাখিবে, এমন সম্ভাবনা কি? আর সন্তোষের সে দিনকার ব্যবহারে তিনি তাহার উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলেই বা কি, তাঁহার সন্তোষ অসন্তোষে তাহার কি আইসে যায়?

যথাদিনে মহাসমারোহে বহু অর্থব্যয়ে স্বর্গীয় বসু মহাশয়ের দানসাগর শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইয়া গেল। নানা দেশ হইতে আগত নানা কুটুম্ব-কুটুম্বিনী ও ব্রাহ্মণপণ্ডিত বিদায় হইয়া গেলেন। সন্তোষকুমার ও দেওয়ানের সৌজন্যে সকলেই আপ্যায়িত হইয়া গিয়াছিলেন। শ্রাদ্ধের পর গ্রামে এইরূপ জনরব রটিয়াছিল যে, এক মাস গরীব-দুঃখীর খাওয়া-পরার কোনও অভাব ছিল না। জ্ঞাতিবর্গও কার্য্যের কোন নিন্দা করিতে পারেন নাই।

শ্রাদ্ধ মিটিয়া গেলে সন্তোষ এক দিন দেওয়ানের নিকট বসিয়া হিসাবের কাগজপত্র দেখিতেছিল। এমন সময়ে একটি ভদ্রলোক আসিয়া কহিলেন, "আপনিই কি সন্তোষ বাবু?"

সন্তোষ তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বিস্মিত হইয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে সে কহিল, "আপনি কে? আমি ত আপনাকে কখনও দেখিনি। আপনি কা'কে খুঁজছেন?"

"আমি এক জন এটর্ণী। আমি বিশেষ দরকারে সন্তোষবাবুর কাছে এসেছি, তিনি কোথায়?"

সন্তোষ উদ্‌ভ্রান্তভাবে কহিল, "আপনার যা' বল্‌বার থাকে, বলুন; আমিই সেই সন্তোষবাবু।"

আগন্তুক তখন নিজের জামার অভ্যন্তর হইতে একখানি মোড়কবিশিষ্ট লম্বা কাগজ বাহির করিয়া কহিলেন, "এটি আপনার পিতার উইল। তিনি তাঁ'র সর্ব্বস্ব তাঁ'র পুত্রবধূকে দান ক'রে গিয়েছেন, এত দিন তাঁ'র নিষেধ থাকায় উইলের বিষয় প্রকাশ করা হয়নি। তাঁ'র আদেশ ছিল যে, শ্রাদ্ধের পর এই উইলের কথা যেন প্রকাশ করা হয় এবং তাঁ'র পুত্রবধূকে যেন এটা দেওয়া হয়।"

সন্তোষ ঈষৎ উত্তেজিত কণ্ঠে কহিল, "তবে তা'কেই দিবেন; আমার খোঁজ কচ্ছেন কেন?"

"তিনি ব'লে গিয়েছিলেন যে, আমার ছেলের হাতে দিলে এটা তা'কেই দেওয়া হবে।"

সন্তোষ শুষ্ক কণ্ঠে কহিল, "তবে দিন।"

তাহার হস্তে উইল দিয়া এটর্ণী বাবু সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। সন্তোষকুমার তাঁহাকে আহার করিতে



অপরিচিত

বলায় তিনি বলিয়াছিলেন, নিকটেই তাঁহার এক আত্মীয় আছেন, তিনি সেইখানেই থাইবেন। তাঁহার অনিচ্ছা দেখিয়া সে দ্বিরুক্তি করিল না। তিনি চলিয়া গেলে সন্তোষকুমার উইলখানি আগাগোড়া পাঠ করিয়া গম্ভীর কণ্ঠে কহিল, "দাদাভাই, আপনিও দেখ্‌ছি উইলের কথা জানতেন, আমাকে এত দিন বলেননি কেন ?"

দেওয়ান ম্লান মুখে কহিলেন, "স্বর্গীয় কর্ত্তার নিষেধ ছিল।"

"কেন ? তিনি কি ভেবেছিলেন, এ খবরে আমি ম'রে যা'ব ?"

"তা কি ক'রে বুঝবো, ভাই ? তবে তিনি বলেছিলেন, তাঁ'র মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত যেন উইলের কথা গোপন থাকে।"

সন্তোষ রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, "আপনি ভারি অন্যায় করেছেন।"

দেওয়ান একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, "এতে আমার অপরাধ কি, ভাই, তুমি কি আমাকে তাঁ'র আদেশ অমান্য করতে বল ?"

সন্তোষ উত্তেজিত কণ্ঠে কহিল, "এমন কথা আমি আপনাকে বল্‌ছি না ; তবে তাঁ'র মৃত্যুর পরেও ত আপনি আমায় জানাতে পারতেন।"

"কি করব, ভাই ! তোমার অদৃষ্ট, তোমারই ঐশ্বর্য্য, অথচ তুমিই আজ কাঙাল।"

সন্তোষ স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "আপনি সে জন্যে কষ্ট করবেন না, দাদাভাই। আমার অদৃষ্টে যা আছে, তা' কেউ লঙ্ঘন করতে পারবে না। আমার বরাতে যদি সুখ থাকে, তা হ'লে কেউ-ই উল্টে দিতে পারবে না। আমি পুরুষমানুষ, মূর্খ নই, আমার কি ভাবনা আছে ? তাঁ'র বিষয় তিনি যা'কে দিয়ে সুখী হ'ন, তাকেই দেবেন ; এতে লুকোচুরীর কি আছে ? আমি ভাববো, গরীবের ঘরে জন্মেছিলুম, আমার কিছু নেই।" এই বলিয়া সে উইলখানি সদাশিব দেওয়ানের হস্তে দিয়া বলিল, "এই নিন, এ যার জিনিষ, তাকেই দেবেন ; এর জন্যে আমাকে আর কিছু অনুরোধ করবেন না।" এই বলিয়া সে চলিয়া গেল।

দেওয়ান উথলখানি হস্তে লইয়া উদ্‌ভ্রান্তভাবে যমুনার তরঙ্গ-লহরীর দিকে চাহিয়া রহিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

পতি-সম্ভাষণ

তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। জগৎ ধূসরবর্ণ যবনিকায় ঢাকিয়া পড়িয়াছে। চতুর্দ্দিক অন্ধকারে আবৃত হইয়া গিয়াছে। রাত্রি গভীর। এই সময়ে বাসন্তী মুক্ত গবাক্ষ-পথে দাঁড়াইয়া সুপ্ত শান্ত জগতের দিকে চাহিয়া ভাবিতেছিল, এই যে গভীর অন্ধকারে জগৎ ঢাকিয়া যাইতেছে, ইহারও একটা নির্দ্দিষ্ট পরিবর্ত্তন আছে ; কয়েক ঘণ্টা পরেই আবার প্রভাতের আলোয় দিগন্ত উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। কেবল আমারই চির-অতৃপ্তিভরা জীবন চিরান্ধকারেই মগ্ন থাকিবে। এই হৃদয়ের বিরাট অন্ধকার বুঝি কখনও কাটিবে না ! হতাশার নিদারুণ যন্ত্রণা বক্ষে বহন করিয়া কত দিন, কত দিবারাত্রি আমাকে এমনই ভাবেই কাটাইয়া যাইতে হইবে, তাহা কে বলিতে পারে ? নব-পুষ্পিত জীবনে একবার তাহার আশার আলোক উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল ; তখন কি পূর্ণানন্দেই তাহার জীবন ভরিয়া উঠিয়াছিল ! কিন্তু কি পাপে, কি অপরাধে যে সে পরিত্যক্তা হইল, তাহা সে বুঝিতে পারিল না।

বাসন্তীর মন আজ অত্যন্ত বিষণ্ন হইয়াছে। আজ প্রাতে সে জ্যেঠাইমা'র মুখে শুনিয়াছে যে, তাহার শ্বশুর তাহাকে সমস্ত বিষয়ের উত্তরাধিকারিণী করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু শ্বশুরের এই অন্যায় অবিচারে তাহার মন অত্যন্ত বিষণ্ন হইয়াছে ; নিজের ভবিষ্যৎ আশঙ্কায় সে আকুল হইয়া উঠিয়াছে। তাহার স্বামী যে নীরবে এই অপমান সহ্য করিয়া যাইবেন, তাহা তাহার বিশ্বাস হইতেছিল না। সে ইহাতে নিজেকে অত্যন্ত দুর্ভাগিনী মনে করিতেছিল। ইহাও কি অদৃষ্টের ছলনা ? শ্বশুরের মৃত্যুর পর সে মনে আশা করিয়াছিল, এখন হয় ত সর্ব্বদাই সে প্রিয়তমের মুখখানি দেখিতে পাইবে। সে বার মাস নিকটে না থাকিলেও বিষয়াদির জন্য প্রায়ই তাঁহাকে বাড়ী আসিতে হইবে, কিন্তু উইলের বি...

শুনিয়া অবধি তাহার সে আশারও আর কোন ভরসাই নাই। স্ত্রীর অর্থ গ্রহণ করিয়া সন্তোষকুমার যে গৃহে বাস করিবে না, ইহা নিশ্চয়। তাহার কেবলই মনে হইতেছিল, বাবা কেন এমন ভুল করিলেন? তিনি জ্ঞানী হইয়া এমন অজ্ঞানের মত কায করিলেন কেন? তাহার ভবিষ্যতের দিকে একবার ভাবিয়াও দেখিলেন না? এ ত তাঁ'কে জব্দ করিলেন না, এ যে বাসন্তীকেই জব্দ করা হইল! ইহার পরিণাম কি? একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় বাসন্তীর চোখের জল গণ্ড বাহিয়া পড়িতে লাগিল।

পরদিন দ্বিপ্রহরে আহারে বসিয়া সন্তোষ কহিল, "আমি আজ রাত্রির গাড়ীতেই চ'লে যাচ্ছি।"

জ্যেঠাইমা কহিলেন, "আর দুটো দিন থাক্‌লে হ'ত না, বাবা? এখন চারিদিকে গণ্ডগোল, ঠাকুরপো নেই, তুই যদি এ সব এখন না দেখিস্, তবে কে দেখবে?"

সন্তোষ কহিল, "যা'র জিনিষ, সে-ই দেখবে—আমি কে?"

"সে কি হয়, বাবা, মেয়েমানুষ কি বিষয় দেখতে পারে?"

"তিনি যখন দিয়ে গেছেন, তখন জেনেই গেছেন যে, বিষয় দেখবার ক্ষমতা আছে।"

জ্যেঠাইমা বিষণ্ণ মুখে কহিলেন, "তা' কি হয় রে পাগল, যার যা, কথায় বলে,'যার কাজ তারে সাজে, অন্য লোকে লাঠি বাজে।' এও হয়েছে তাই। মেয়েমানুষ কি ও সব পারে?"

সন্তোষ বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে কহিল, "তবে কি তোমার ইচ্ছে, আমি বৌয়ের ভাত খাই? লোকেও দেখুক, তোমরাও দেখ, কেমন এই কি না? কিন্তু তা' হচ্ছে না, আমি এখনও অত পাগল হইনি। আমার পেটে বিদ্যে আছে, বরাতে থাকে ক'রে খাব, না থাকে, উপোস ক'রে থাক্‌ব। তবু এইটে জেনে রেখে দিও, না খেতে পেয়ে যদি মরেও যাই, তবুও তোমাদের কাছে ভিক্ষে চাইতে আস্‌ব না।"

জ্যেঠাইমা অনাবশ্যক বোধে সে দিন আর কোন কথা বলিলেন না। আহারান্তে সন্তোষ বহির্ব্বাটীতে চলিয়া গেলে তিনি বাসন্তীকে আহার করিতে ডাকিলেন। বাসন্তী আসিলে তিনি তাহার মুখের দিকে চাহিয়াই বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহাদের কথাবার্ত্তা সে সমস্ত শুনিয়াছে। তিনি তখন আর তাহাকে কিছু বলিলেন না, উভয়ে নীরবে আহার সমাধা করিয়া উঠিয়া গেলেন।

অবশেষে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বাসন্তী স্থির করিল যে, সে একবার না হয় সন্তোষকে বলিয়াই দেখুক। এই কথা মনে উদয় হওয়াতেই তাহার যেন একটা বিষম লজ্জা আসিয়া তাহার সমস্ত সঙ্কল্প বালির বাঁধের মত ভাসাইয়া লইয়া যাইতে চাহিল। সে যদি বা পাঁচ হাত অগ্রসর হইতেছিল, আবার লজ্জা আসিয়া তাহাকে দশ হাত দূরে সরাইয়া লইয়া যাইতেছিল।

পাঁচ বৎসর তাহার বিবাহ হইয়াছে, এ পর্য্যন্ত কোন দিন সে একাকী স্বামীর সাক্ষাৎও পায় নাই, উভয়ের মধ্যে কোন কথাবার্ত্তাও হয় নাই। দুই জনই দুই জনের নিকট একেবারেই নূতন। শ্বশুরের মৃত্যুশয্যায় সে একবার কথা কহিয়াছিল বটে, কিন্তু ইচ্ছাতেই হউক, আর না শুনিয়াই হউক, সন্তোষ তাহার কথার উত্তরও দেয় নাই, সেই অপমানটাও সে বিস্মৃত হইতে পারে নাই। কিন্তু সে কি করিবে? বিধাতা তাহার ভাগ্যে এইরূপই লিখিয়াছেন। তাহা খণ্ডন করিতে শক্তি তাহার কোথায়? তাহার ভাগ্যে যদি সুখই থাকিবে, তবে তাহার এমন হইবে কেন? সবই আছে অথচ কিছুই নাই।—প্রতিদিন সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে তাহার মনে আশা হইত, আজ হয় ত তিনি কথা বলিবেন, রাত্রির অন্ধকারে শূন্য শয্যায় একাকিনী শয়ন করিয়া একটা ব্যর্থতার নিশ্বাস তাহার বুক হইতে নির্গত হইয়া পড়িত; শত চেষ্টাতেও সে তাহা রুদ্ধ করিতে পারিত না।

একাকিনী অন্ধকার কক্ষে বসিয়া তাহার যেন ক্রমেই অতিষ্ঠ বোধ হইতেছিল। সে বাহিরে আসিতেই দেখিতে পাইল, সন্তোষ বাহিরের দিকে চলিয়া যাইতেছে। সে তখন লজ্জা, ভয়, সঙ্কোচ সব দূরে সরাইয়া দিয়া কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া কহিল, "শুনুন—"

চলিতে চলিতে হঠাৎ বিস্মিত হইয়া সন্তোষ পিছন ফিরিয়া দেখিল, কে এক জন থামের অন্তরালে দাঁড়াইয়া আছে। ক্ষণেক দাঁড়াইয়া সে ভাবিল, "আমার কি

তবে শুনিবার ভুল হইল? যাহা অসম্ভব, তাহা কেমন করিয়া হইবে?” এই বলিয়া সে গমনোদ্যত হইলে পুনরায় পিছনে আহ্বান শুনিল, “একটা কথা বল্‌ছিলুম—”

সন্তোষ এবার ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, “আমায় কিছু বল্‌ছো?”

বারান্দা অন্ধকার হইলেও সন্তোষ বাসন্তীকে চিনিতে পারিয়াছিল। তথাপি সে ভাবিতেছিল, যাহার সহিত কখনও কোন দিন সামান্য একটু দৃষ্টিবিনিময়ও হয় নাই, সে কেমন করিয়া অসঙ্কোচে এমন ভাবে কথা বলিতে পারে? সে ভুল শুনিয়াছে, এই ভাবিয়া সে চলিয়া যাইতেছিল। কিন্তু পুনরায় যখন সে পিছনে আহ্বান শুনিল, তখন সে ফিরিয়া দাঁড়াইল।

বহুক্ষণ নীরব থাকিয়া সন্তোষ পুনরায় কহিল, “বল, আমায় কিছু দরকার আছে?”

যদিও বাসন্তীর লজ্জা হইতেছিল, তথাপি সে তাহা দমন করিয়া রুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, “আপনি কি আজই চ'লে যাচ্ছেন?”

যদিও সন্তোষের বাসন্তীকে বলিবার অনেক কথা ছিল, কিন্তু আজ আর তাহাকে কিছুই বলিতে ইচ্ছা করিতেছিল না। সে তখন ভাবিতেছিল, ইহার ত কোন অপরাধ নাই, দীর্ঘ কয় বৎসর যাহাকে অবহেলায় রাখিয়া আসিয়াছে, আজ সেই যখন নিজের অবস্থা ভুলিয়া উপযাচিকা হইয়া দু'টা কথা বলিতে আসিয়াছে, তখন শুনিয়া যাইতে তাহার ক্ষতি কি? হয় ত এই শেষ। সে তখন কহিল, “হাঁ, আজ রাত্রির গাড়ীতেই যাব।”

বাসন্তী তখন অনুচ্চকণ্ঠে কহিল, “আমি তবে—একা—কি করবো?” তাহার স্বর তখনও কম্পিত হইতেছিল।

“বাবা সব বন্দোবস্ত ক'রে গেছেন, তোমায় কিছু ভাবতে হ'বে না।”

বাসন্তী তখন উইলখানি লইয়া কহিল, “এখানা আমি কি করবো? এটা তবে আপনার কাছেই রেখে দিন।”

“এ নিয়ে আমি কি করবো, তোমার জিনিষে আমার কোনই অধিকার নেই। তুমি ত সব বুঝতে পার, তবে মিছামিছি কেন অমন কচ্ছ?”

বাসন্তী রোদনরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, “আমি কি করবো?”

সন্তোষ শুষ্ককণ্ঠে কহিল, “তোমার যা' ইচ্ছে। আমার সঙ্গে তোমার কোন দিন কোন সম্পর্ক ছিল না, থাক্‌বেও না—”

আরও কি সে বলিতে যাইতেছিল; কিন্তু নিজেই তাহা রুদ্ধ করিয়া লইল। ইহাও তাহার বলিবার ইচ্ছা ছিল না; অতর্কিতে সহসা তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়াছিল। সে কিয়ৎক্ষণ পরে নিজেকে সংযত করিয়া দৃঢ় কণ্ঠে কহিল, “তোমাকে বলিবার ইচ্ছা ছিল না, তুমি নিজেই যখন শুন্‌তে চাইছ, তখন বলা ভিন্ন উপায় দেখছি না। তোমার অর্থে, তোমার অন্নে আমি জীবিকা নির্ব্বাহ করব না। আমি স্থির করেছি, কলকাতায় গিয়ে চাকরী করবো; জীবনের বাকী ক'টা দিন এই রকমেই কাটিয়ে দেব। তুমি মনে করো, তোমার স্বামী ম'রে গেছে, তুমি বিধবা। আর—” সে আর বলিতে পারিল না। আবেগে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল।

বাসন্তী তখন অগ্রসর হইয়া উইলখানি তাহার পদপ্রান্তে রাখিয়া যুগ্মহস্ত আপনার বক্ষোমধ্যে দিয়া নতবদনে দাঁড়াইয়া রহিল। ক্রোধে ক্ষোভে তাহার দুই চক্ষু অশ্রুতে ভরিয়া আসিতেছিল।

সন্তোষ উইলখানি বাসন্তীর দিকে ছুড়িয়া দিয়া কহিল, “আমার এতে কোন দরকার নেই। আমি পয়সা চাই নে। আমি এক দিন যা পেয়েছিলুম, তাহার কাছে রাজার রাজ্যও তুচ্ছ ছিল; মনের ইচ্ছাও তাই ছিল; কিন্তু বিধির চক্রে তা' উল্টে গেছে। মানুষ ভ্রমের দাস, ভুলের বশে যা' ক'রে ফেলেছি, তা' আর ফেরাবার উপায় নেই। সেই জন্যে দূরে থেকে তা'র প্রায়শ্চিত্তের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছি।”

অনভিজ্ঞা কিশোরী তখনও বুঝিতে পারিতেছিল না যে, তাহার স্বামী কিই বা পাইয়াছিলেন, আর কিই বা হারাইয়াছেন। তাহা তাহার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে সে কিছুই উপলব্ধি করিতে পারিতেছিল না। সে কেবল অজ্ঞাত সত্যের অন্বেষণের জন্য অন্ধকারের মধ্যে হাতড়াইয়া বেড়াইতেছিল। সে বক্তার অভিপ্রায় কিছুই বুঝিতে

পারিল না। অনেক ক্ষণ ধরিয়া চিন্তা করিয়া সে ঠিক করিল, পিসীমা'র কাছে শুনিয়াছিলাম যে, এখন বিয়ে কর্ত্তে তাঁর ইচ্ছে ছিল না। বাবা জোর ক'রে বিয়ে দিয়েছেন ব'লে সেই অভিমানে উনি সকলকে জব্দ করছেন। বাবার উপর অভিমানে বাসন্তীর কেবলই কান্না আসিতেছিল। তিনি জানিয়াও তাহাকে কেন এমন বিড়ম্বনায় ফেলিয়া গেলেন? সে স্ত্রীলোক, সে কেমন করিয়া সমস্ত রক্ষা করিবে? উনি ত স্পষ্টই বলিলেন, উঁহার কিছু চাহি না; আর কিছু দেখিবেনও না। সে একা কি করিবে, আর তাহার দোষই বা কি? বাবার উপর রাগ করিয়াই উনি অমন করিতেছেন।

বহুক্ষণ নীরবে থাকিয়া বাসন্তী কহিল, "এখানা আপনি নিয়ে যান। আমি কি করবো তবে? আমি ত কিছু জানি নে।"

সন্তোষ দৃঢ় কণ্ঠে কহিল, "তোমায় কতবার বলবো, ওতে আমার কোন দরকার নেই; তুমি কি—"

বাসন্তী তখন ভগ্নকণ্ঠে কহিল, "আমারই বা এতে কি দরকার? কেবল " এই বলিয়া সে উইলখানি ছিন্নভিন্ন করিয়া সন্তোষের পদতলে নিক্ষেপ করিল।

সন্তোষ ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিল, "এ মন্দ নয়! শুধু শুধু ছিঁড়ে ফল কি? রাখলে ভালই হতো।"

বাসন্তী রোদনরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, "আমারই কি সত্ত দর— আমিই— দোষী "

সন্তোষের দৃষ্টি হঠাৎ ক্ষণেকের জন্য বাসন্তীর মুখের উপর নিবদ্ধ হইল। সে দেখিল, বাসন্তী দুই হস্তে নিজের মুখমণ্ডল আচ্ছাদন করিয়া রহিয়াছে। সন্তোষ মনে মনে অনুভব করিল যে, বাসন্তী কাঁদিতেছে। তাহার ইচ্ছা হইল, তাহাকে বলিয়া যায় যে, সে কেবল কষ্ট দিবার জন্যই তাহাকে বিবাহ করিয়া আনিয়াছিল, "দোষী তুমি নও, দোষ আমারই।" কিন্তু সে মনের দুর্ব্বলতাটাকে আর প্রশ্রয় না দিয়া স্খলিত চরণে বহির্ব্বাটীর দিকে চলিয়া গেল। সে যখন বাহিরে যাইতেছিল, যতক্ষণ তাহার মূর্ত্তি দেখা যাইতেছিল, বাসন্তী অনিমেষ নয়নে প্রিয়তমের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। তাহার মূর্ত্তি দৃষ্টির অন্তরালে চলিয়া গেলে বাসন্তী নিজ কক্ষে গিয়া শীতল মৃত্তিকায় পড়িয়া উচ্ছ্বসিত আবেগে অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিল। সে দিন আর তাহার রুদ্ধ দ্বার মুক্ত হইল না।

[ক্রমশঃ।

শ্রীমতী কাঞ্চনমালা দেবী।

দিনেকের সাথী

সেই এক দিন—মেঘমুক্ত জ্যোৎস্না সম
যে দিন পড়িলে লুটি অকস্মাৎ গৃহতলে মম,
বরষার নিশীথের সিক্ত কৃষ্ণ পক্ষ আবরণে
ধরণী আবৃত ছিল; ঝঞ্ঝা শুধু চঞ্চল চরণে
চীৎকারি ছুটিতেছিল দিক্ হ'তে দূর দিগন্তরে,
অশ্রান্ত ঝরিতেছিল ধারা, ঘন কৃষ্ণ মেঘ-স্তরে
বিদ্যুতের খেলা মুহুর্মুহু, রাজপথ জনহীন,
বিহগ-কূজন ক্ষান্ত মুকুলিত কদম্ব-বিপিন।
এ হেন দুর্য্যোগময় বর্ষার সে রাতে
কবির ছিল না ভাষা স্তব তব পারেনি গাঁথিতে।
প্রভাতের সূর্য্যালোকে ছন্দে তব করিব আরতি
এই আশা ছিল মনে। অতি ক্ষুদ্র শ্রাবণের রাতি
না পোহাতে গেলে চলি নিশান্তের সুখস্বপ্ন সম;
সুখ-স্মৃতি শেল সম বিঁধে গেলে হৃদয়ে নির্ম্মম।
আজ সূর্য্যালোকে ভরা প্রভাতের আকাশের তলে
দিনেকের সাথী মম স্তুতি তব রচি' অশ্রুজলে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ মৈত্র।

প্রাচীন ভারতে দাসত্ব-প্রথা

প্রাচীন যুগে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা (**Individual liberty**) মানবমাত্রেরই নিজস্ব ধন বলিয়া পরিগণিত হইত না। প্রায় প্রত্যেক সমাজেই বহুসংখ্যক মানব স্বাধীনতাহীন হইয়া পশু ও পণ্যের মধ্যে পরিগণিত হইয়া ধনী প্রভুর আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া তাঁহারই প্রদত্ত অন্নে জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইতেন। নানা কারণে মানবের এইরূপ অবনতি ঘটিত। প্রাচীন যুগের সংকীর্ণ-হৃদয় অসভ্য মানব বিজিত শত্রুকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া, তাহাকে বধ করিয়া তাহার যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিত। মানবসমাজের প্রায় সর্ব্বত্রই এইরূপ রীতি প্রচলিত ছিল। সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে যখন স্বার্থজ্ঞান আরও পরিস্ফুট হইল, তখন তাহারা ক্রমে শত্রুকে বধ করা অপেক্ষা তাহাদের স্বাধীনতা হরণ করিয়া তাহাদিগকে নিজের সেবায় নিযুক্ত করাই শ্রেয়ঃকল্প বলিয়া জ্ঞান করিল। ইহার ফলে মানবের শত্রুশোণিতলিপ্সা কিছু কমিল বটে, কিন্তু হতভাগ্য বিজিত শত্রুর অবস্থা এক হিসাবে শোচনীয়তর হইয়া উঠিল। বিজেতার হস্তে নিধন হইলে মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাহার সমস্ত দুঃখ-কষ্টের অবসান হইত। কিন্তু দাসত্বের ফলে জীবন রহিয়া গেল বটে, ফলে তাহা পশুজীবনের মত চিরকাল যাতনাশরীর-ধারণেই পর্য্যবসিত হইল। দাসের জীবনে সুখ, শান্তি, আত্মোন্নতির চেষ্টা, ইন্দ্রিয়াদির সুখভোগ, স্নেহ, মায়া, সবই অপসারিত হইল। কেবলমাত্র প্রভুর ইচ্ছার উপর দাসের অস্তিত্ব নির্ভর করিতে লাগিল। প্রভু ইচ্ছা করিলে দাসকে বধ করিতে পারিতেন; ইচ্ছামত শাসন করিতে পারিতেন। প্রভু ইচ্ছা করিলে দাসকে দাসীর গর্ভে সন্তান উৎপন্ন করিতে হইত। সে সন্তানের উপর দাস-পিতার কোন স্বত্ব বা দায়িত্ব থাকিত না। দাসের সন্তান প্রভুর সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইত।

বিজিত শত্রুকে এইরূপে দাসত্বে পরিগণিত করা প্রায় সকল প্রাচীন সমাজেই দেখা যায়। প্রাচীন ইহুদী সমাজেও বিজিত শত্রুকে সেবার নিমিত্ত ক্রীতদাস করিয়া রাখার ব্যবস্থা ছিল। রোমক, আসীরীয়, গ্রীক ও অন্যান্য প্রাচীন সমাজমাত্রেই এইরূপ আচার দেখা যায়। তাঁহারাও কোন নূতন নগর বা দেশ জয় করিলে বিজিত শত্রু-দিগকে হয় বধ করিতেন, না হয় নিষ্ক্রয়মূল্য গ্রহণ করিয়া ছাড়িয়া দিতেন এবং তাহাদের স্ত্রীপুত্রাদির প্রতিও সেইরূপ আচরণ করিতেন। বিজাতীয় বর্ব্বর শত্রু হইলে ত কথাই ছিল না। তাহাদিগকে বধ করিলে বা দাস করিলে কোন পাপ বা দোষ বিবেচিত হইত না। স্বজাতী-য়ের প্রতি সময়ে সময়ে অনুকম্পা প্রকাশ করিয়া সদয় ব্যবহার কথা হইত। কিন্তু ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত অতি বিরল। গ্রীক স্বজাতীয় গ্রীককে দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ করিতে পরাঙ্মুখ হইতেন না। কেবল স্পার্টায় স্বজাতীয় বা স্বনগরবাসী গ্রীককে দাসরূপে রাখার প্রথা নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু অন্য নগরবাসী বা অন্য সমাজভুক্ত গ্রীককে দাসরূপে রাখায় কোন নিষেধ ছিল না। স্পার্টায় পূর্ব্বতন গ্রীক অধিবাসী হেলটগণই ইহার দৃষ্টান্ত।

বিজিত শত্রুর প্রতিও রোমকদিগের ব্যবহার আরও কঠিনতর ছিল। সার্ডিনীয়, আফ্রিকান, স্পেনীয়, গল জাতীয় বা টিউটন বা ডেনীয় শত্রুকে তাঁহারা প্রায়ই বধ করিতেন। বিশেষ দয়াপরবশ হইলে পরে তাহাদিগকে পশুরূপে পরিগণিত করিয়া সমাজের যত প্রকার শ্রমসাধ্য নীচকার্য্যে নিযুক্ত করিতেন। রোম ও গ্রীসে যুদ্ধের সময় অনেক সুসভ্য গ্রীকও রোমকদিগের দাসরূপে রোমে নীত হয়েন। এই সকল গ্রীক দাসরূপে রোমক-সমাজে প্রবেশ করিয়া রোমকপ্রভুর সন্তানদিগের গৃহ-শিক্ষক বা হিসাবনবীশ, বা কৃষিতত্ত্বাবধায়করূপে রোমক-দিগের উন্নতিকল্পে যথেষ্ট সাহায্য করেন। এই প্রকার শিক্ষিত গ্রীক দাসের মধ্যে সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক পলি-বিয়াস ও রোমক নাট্য-সাহিত্যের জন্মদাতা এনুনিয়াস্… প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

দাসত্ব-প্রথার প্রবর্ত্তনের ফলে প্রাচীন পাশ্চাত্য সমাজমাত্রেরই বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটে। পাশ্চাত্য সমাজমাত্রই দাসদিগের পরিশ্রমের উপর নির্ভর করিত। দাসদাসীরা সমাজে যাহা কিছু পরিশ্রমের কায, সমস্তই করিত। বাটীর ভৃত্যের কার্য্য, খনির কার্য্য, পাকশালার কার্য্য, কৃষিক্ষেত্রের কার্য্য, শিল্পশালার কার্য্য, জাহাজ চালান, গৃহশিক্ষকের কার্য্য, হিসাবের কার্য্য সমস্তই ইহাদের হাতে ন্যস্ত ছিল। ফলতঃ এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, প্রাচীন সমাজমাত্রেরই জীবন দাসদিগের হস্তে ছিল। ইহারই ফলে দাসরা সমাজে বড়ই প্রয়োজনীয় ছিল, এবং দাসত্ব-প্রথা একটি ঈশ্বরপ্রণোদিত সুব্যবস্থা বলিয়া পরিগণিত হইত। এই সকল কারণেই গ্রীস ও রোমের অনেক বড় বড় পণ্ডিতও দাসত্ব-প্রথার সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। এমন কি, এরিষ্টটলও দাসত্ব-প্রথা মানবের করুণার পরিচায়ক ও সমাজের অবশ্য-প্রয়োজনীয় বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে দাসের দাসত্ব তাহার স্বাভাবিক নৈতিক অবনতিরই ফল এবং উহা সমাজের অবনতির পরিচায়ক নহে। সমাজের এইরূপ অবস্থা ও চিন্তার ফলে দেখা যায় যে, গ্রীক সমাজে দাস রাখা দোষ বলিয়া বিবেচিত হইত না এবং কোন বড় ঐতিহাসিকের মতে এক সময়ে এটিকার (Attica) ৩ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে প্রায় ১ লক্ষ লোক দাস ছিল। (Zimmern, Greek Commonwealth P. 170)

দাস সমাজে এইরূপ প্রয়োজনীয় হওয়ায় দাসব্যবসায় প্রবল ভাবেই চলিত। প্রাচীন যুগে কার্থেজ, এথেন্স, রোম, করিন্থ প্রভৃতি প্রধান প্রধান নগরীতেই দাসের বাণিজ্য প্রবলভাবে প্রচলিত ছিল। দাসের গুণানুসারে, দৈহিক বলানুসারে, দাসীর সৌন্দর্য্যানুযায়ী মূল্য নিরূপিত হইত। দাসব্যবসায় তৎকালে একটি বিশেষ লাভের ব্যবসা ছিল। কার্থেজিনীয়, গ্রীক ও অন্যান্য নানাজাতীয় লোকই এই ব্যবসায়ে লিপ্ত হইতেন। কার্থেজিনীয় গভর্ণমেণ্ট প্রকাশ্যেই সৈন্যসামন্ত পাঠাইয়া নানা দেশ হইতে লোক ধরিয়া আনিয়া তাহাদিগকে দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ করিতেন। রোমকদিগের বিশাল সাম্রাজ্য হইতে নানা জাতীয় সভ্য অসভ্য লোক দাসরূপে রোমের বাজারে প্রেরিত হইত। কোন কোন গ্রন্থকারের মতে এক সময়ে ২৫ টাকায় একটি দাস মিলিত।

দাসের প্রতি ব্যবহার

দাস সমাজে প্রয়োজনীয় হইলেও তাহার প্রতি দুর্ব্ব্যবহারের ত্রুটি হইত না। অবশ্য, গ্রীসের স্থানবিশেষে, বিশেষতঃ এথেন্সে দাসের প্রতি কিছু অনুকম্পা দেখান হইত। কিন্তু পাশ্চাত্য জগতের সর্ব্বত্রই দাসকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখা ও তাহার প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করা সমাজের আদর্শ ছিল। দাস আইনতঃ পণ্যদ্রব্য বলিয়া পরিগণিত হইত। তাহার উপর প্রভুর যথেচ্ছাচার করিবার ক্ষমতা ছিল। দাসের প্রাণ বধ করা আইনতঃ কোন অপরাধ বলিয়া পরিগণিত হইত না। রোমের আইনজ্ঞ পণ্ডিতরা বলিতেন যে, দাসত্ব লৌকিক আইনে নিষিদ্ধ বা নীতিবিরুদ্ধ নহে।

এইরূপ চিন্তার ফলে রোমক জাতির ভীষণ অবনতি ঘটিল। লোক শ্রমবিমুখ হইয়া সমস্ত কার্য্য দাসদিগের হস্তে ন্যস্ত করিয়া আমোদপ্রমোদে মন দিল। আমোদপ্রমোদেও দাসকে নিযুক্ত করা হইল। দাসের প্রাণ ত প্রাণ নহে, তাহাকে কষ্ট দিয়া প্রাণে মারিয়া নানা প্রকার পৈশাচিক আমোদের সৃষ্টি হইল। দাসদিগকে বন্য পশুর সহিত যুদ্ধ করিতে দেওয়া হইল বা পরস্পর যুদ্ধ করিয়া রোমক দর্শকের আনন্দবর্দ্ধনের জন্য রক্তপাত ও প্রাণপাত করিতে বাধ্য করা হইল। এ আনন্দে ছোট-বড় স্ত্রী-পুরুষ সকলেই যোগ দিতেন। রাজনীতিকরাও প্রজাসাধারণের প্রিয়পাত্র হইবার জন্য gladiator ক্রীড়ার অনুষ্ঠান করিতেন। জুলিয়াস্ সীজার প্রায় ৬ শত দাসকে এইরূপে পরস্পরকে হত্যা করিতে বাধ্য করেন। সম্রাট টাইটাসের আমলে এরূপ পৈশাচিক উৎসব প্রায় শত দিবস ধরিয়া চলে ও তাহাতে কত দাসই রোমের আনন্দার্থ প্রাণ বিসর্জ্জন করে! সম্রাট ট্রাজানের বিজয়োৎসবে ১ শত ২৩ দিন ধরিয়া এইরূপ ক্রীড়া দেখান হয় এবং তাহার ফলে অন্যূন ১০ হাজার দাসের প্রাণ যায়।

বহু শতাব্দী ধরিয়া এইরূপ ব্যবস্থা চলিবার পর রোমক সাম্রাজ্যে ষ্টৈইক (stoic) দর্শনের প্রভাবে মানবের সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃত্বের আদর্শ প্রচারিত হয়।

খৃষ্টধর্ম্মও এই সময় ধীরে ধীরে রোমকদিগের মধ্যে প্রচারিত হইতে থাকে। তাহার ফলে অনেকেই এই সমস্ত ক্রীড়া পৈশাচিক ও ঘৃণিত বোধ করিয়া অনাদর করিতে থাকেন। কিন্তু তাহাতেও ঐ নৃশংস ব্যাপার একেবারে উঠিয়া যায় নাই। অবশেষে যখন প্রাচ্য খৃষ্টান ধর্ম্মপ্রচারক টেলিমেকাশ রঙ্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া বিবদমান দাস-যোদ্ধৃদ্বয়কে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিতে গিয়া দর্শকবৃন্দের লোষ্ট্রাঘাতে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন, তখন হইতেই সম্রাট Honorius এর আদেশে এই নৃশংস বর্ব্বরোচিত আমোদ রোমক সাম্রাজ্য হইতে উঠিয়া যায়।

উহার পর কতিপয় সহৃদয় রোমক সম্রাটের অনুকম্পায় দাসদিগের অবস্থা অনেক উন্নত হয়। কিন্তু উহাতে দাসত্ব-প্রথা য়ুরোপ হইতে একেবারে অপসারিত হয় নাই। মধ্যযুগেও দাসত্ব-প্রথা বিলক্ষণ প্রচলিত ছিল। মুসলমান সমাজেও দাস রাখিবার ব্যবস্থা ছিল এবং মধ্যযুগে ও বর্ত্তমান যুগেও অনেক মুসলমান দেশে সমাজে দাসব্যবসায় এখনও প্রচলিত আছে। আরব দাসব্যবসায়ীর অত্যাচারে কত সুবিশাল নিগ্রোজনপদ উৎসন্ন হইয়া গিয়াছে ও যাইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। নব্যযুগে য়ুরোপীয়রাও দাসব্যবসায় প্রচলিত করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই এবং তাহার ফলে আফ্রিকাবাসী কৃষ্ণকায়দিগের উপর যে কি ভীষণ অমানুষিক অত্যাচার হইয়াছিল, তাহা ইতিহাসপাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। বর্ত্তমানেও আমেরিকায় স্বাধীনতাপ্রাপ্ত কৃষ্ণকায় দাসকে শ্বেতাঙ্গের হস্তে যে কত লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়, তাহাও ইতিহাসপাঠকদিগের অজ্ঞাত নহে।

প্রসঙ্গক্রমে পৃথিবীর নানা স্থানের কথাই বলা হইল। এবার ভারতীয় দাসত্ব-প্রথার কথা বলিব। ভারতেও দাসত্ব-প্রথা ছিল। তবে এখানে একটু বিশেষত্ব ছিল। এখানে দাসত্ব-প্রথা এত বিস্তৃতও হয় নাই এবং কোন কালেও উহা সমাজের ভিত্তিস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায় নাই। অবশ্য, পুরাকালে এখানেও দাসরা অস্বতন্ত্র ছিল এবং তাহাদের হস্তান্তর বা ক্রয়-বিক্রয়ও হইত। তবে ভারতে কোন দিনই বিস্তৃত দাসব্যবসায় চলে নাই আর সমাজও তাহাদের প্রতি যথেচ্ছ ব্যবহার চালাইতে দেয় নাই। এই প্রবন্ধে ভারতীয় দাসের অবস্থা বিবৃত হইবে।

বৈদিক যুগেই দাসের উল্লেখ পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের কয়েকটি দানস্তুতির মধ্যেই রাজগণ কর্ত্তৃক অন্যান্য দানীয় বস্তুর সঙ্গে দাসদানের কথার উল্লেখ আছে। পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, এই সকল দাস বিজিত অনার্য্যগণেরই সন্তান। উহাদিগের মধ্যে যাহারা যুদ্ধে বন্দী হইয়াছিল, তাহাদিগকেই দাসরূপে পরিণত করা হইয়াছিল। এই সামান্য অনুমানমাত্র ভিন্ন উক্ত যুগে দাসদিগের সামাজিক অবস্থা বা আইনের চক্ষুতে উহাদের কিরূপ অধিকার ছিল, তাহাও আমরা জানি না। গৃহকার্য্যে দাসী বা দাসগণ নিযুক্ত হইবার উল্লেখমাত্র পাওয়া যায়।

বৈদিক যুগের পর বৌদ্ধ সাহিত্য হইতে আমরা দাসদিগের সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারি। সুত্র বিনয়াদি প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থ ও তৎপরবর্ত্তী কালের জাতকগ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, সমাজে তিন চারি শ্রেণীর দাস ছিল। অন্যান্য দেশের ন্যায় এখানেও নানা কারণে সমাজে দাসত্বের ও দাসের উৎপত্তি হইত।

১। এই দাসগুলির মধ্যে প্রথম শ্রেণীর দাসরা কতকগুলি ছিল যুদ্ধে বন্দীকৃত শত্রু বা তাহাদের সন্তানসন্ততি।

২। (দ্বিতীয় শ্রেণীর) আবার কতক লোক কোন বিশেষ অপরাধে অপরাধী হইলে দণ্ডস্বরূপ তাহাদের স্বাধীনতা অপহরণ করিয়া তাহাদিগকে দাসরূপে নীচ কার্য্যে নিযুক্ত করা হইত।

৩। এতদ্ভিন্ন বহুলোক দুর্ভিক্ষের সময়ে অন্নাভাবে ধনী লোকের নিকট আত্মবিক্রয় করিত। ইহারাও দাসত্বে নিযুক্ত হইত। ঐরূপ উত্তমর্ণের ঋণ পরিশোধ না করিতে পারিলেও তৎপরিবর্ত্তে ঋণীকে দাসত্ব স্বীকার করিতে হইত। কেহ কেহ বা ঐরূপ ঋণ শোধ না করিতে পারিয়া বা অর্থের জন্য স্ত্রী, পুত্র বা কন্যাকে দাসদাসীরূপে বিক্রয় করিত।

বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তির সময় সমাজে দাসের সংখ্যা খুব কম ছিল বলিয়া বোধ হয় না। দাসদিগকে সর্ব্বদাই প্রভুর আয়ত্তাধীন থাকিতে হইত। প্রভু অপরাধস্থলে

দাসকে শাসন করিতে পারিতেন। তবে প্রাণদণ্ডাদি দিতে পারিতেন কি না, তাহা জানিবার উপায় নাই। দাসীর গর্ভে প্রভুর সন্তান হইলে সে-ও দাসরূপে পরিগণিত হইত। দাসের সম্পত্তি প্রভুর সম্পত্তি হইত। ফলতঃ দাসদিগের অবস্থা বিশেষ ভাল ছিল না। তাহাদিগকে বস্তু বা দ্রব্য বা পণ্য বলিয়া বিবেচনা করা হইত। বৌদ্ধ জৈনাদি ধর্মসঙ্ঘে তাহাদিগকে প্রবেশাধিকার দেওয়া হইত না। সময়ে সময়ে অবশ্য দয়ালু প্রভু কোন কোন দাসকে স্বাধীনতা দিতেন। স্বাধীনতা দেওয়া না দেওয়া তাঁহাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিত। দাসদিগকে স্বাধীনতা দিবার কল্পে বুদ্ধদেব বা মহাবীরের ন্যায় ধর্মাত্মা মনীষীরা বিশেষ কোন চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহারাও গতানুগতিকের মত তৎকালের সামাজিক অবস্থা পরিবর্ত্তনের জন্য প্রয়াসী হয়েন নাই।

বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তি ও প্রচারের প্রায় ২ শত বৎসর পরে মৌর্য্য সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়। মৌর্য্য সাম্রাজ্যের স্থাপনের সঙ্গে মহামতি কৌটিল্যের প্রযত্নে দাসদিগের অবস্থা উন্নত করিবার জন্য এবং ভবিষ্যতে যাহাতে আর কেহ দাসত্বে নীত না হয়, এই মহদুদ্দেশ্যের সাফল্যের জন্য বিশেষ চেষ্টা হয়। কৌটিল্য-প্রণীত অর্থ-শাস্ত্রের দাসকল্প নামক অধ্যায়ের বিধিগুলি পাঠ করিলে কৌটিল্যের উদার নীতি ও মহানুভাবতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। শুধু তাহাই নহে, সমসাময়িক পাশ্চাত্য আদর্শের সহিত কৌটিল্যপ্রণীত বিধিগুলির তুলনা করিলে তাৎকালিক ভারতীয় সমাজনীতির উদারতারও বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। যে যুগে কৌটিল্য অর্থশাস্ত্র গ্রন্থে "ন ত্বেবার্য্যস্য দাসভাবঃ—ম্লেচ্ছানামেব অদোষঃ প্রজাং বিক্রেতুম্ আধাতুম্ বা" এই মহান্ উদারনীতি প্রচার করিয়াছেন, সেই যুগেই, প্রায় সেই সময়েই গ্রীসের প্রধান দার্শনিক Aristotle দাসত্ব-প্রথাকে মানবের উদারতাব্যঞ্জক, প্রকৃতির নিয়মানুমোদিত ও সমাজের পক্ষে কল্যাণকর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ("For that some should rule and others be ruled is a thing not only reasonable, but expedient. From the hour of their birth some are marked out for subjugation. others for rule.") দাসত্বপ্রথার সমর্থন করিয়া তিনি আর এক স্থলে বলিয়াছেন যে—"And whereas there are many kinds both of subjects and rulers, that rule is the better, which is exercised over better subjects; for example to rule over men is better than to rule over wild beasts."

"Nature would like to distinguish between the bodies of freemen and slaves making the one stong for servile labour the other upright and although useless for such services, useful for political life in the arts of war and peace."

পাঠকমাত্রই তাঁহার যুক্তিগুলি হইতে তৎকালের প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের চিন্তা ও আদর্শের প্রভেদ বুঝিতে পারিবেন।

অর্থশাস্ত্রের বিধিগুলি হইতে বুঝা যায় যে, দাসব্যবসার ও দাসত্ব-প্রথার মূলোচ্ছেদের চেষ্টা হইয়াছিল। ইহা আমাদের পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে। সুসভ্য য়ুরোপে মাত্র পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে বহু মহাত্মার প্রাণপাত ও জীবন উৎসর্গ করার ফলে যে ঘৃণিত প্রথা তিরোহিত হইয়াছে এবং মুসলমান জগতের নানা স্থানে যাহা আজিও বিশেষভাবে প্রচলিত আছে, ভারতে প্রায় ২২ শত বৎসর পূর্ব্বে তাহার মূলোচ্ছেদের ব্যবস্থা দেখা যায়।

দাসত্ব-প্রথা নিবারণের জন্য অর্থশাস্ত্রের বিধিগুলি হইতে কয়েকটি উদ্ধৃত করিব :—

১। প্রথমতঃ যে কোন জাতীয় অপ্রাপ্তব্যবহার কাহাকেও দাসরূপে বিক্রয় করা একেবারে নিষিদ্ধ ছিল। আত্মীয়স্বজনও নিজ সন্তানসন্ততিকে বিক্রয় করিলে দণ্ডার্হ হইতেন। শুধু তাহাই নহে, ক্রেতা, শ্রোতা প্রভৃতি সকলেই দণ্ডের ভাগী হইতেন। দণ্ডের মানও খুব গুরু ছিল। পূর্ব্ব সাহসদণ্ড হইতে বধদণ্ড পর্য্যন্ত প্রযুক্ত হইত। (উদরদাসবর্জ্জং............etc,) (পৃঃ ১৮১—কৌটিল্য, অর্থশাস্ত্র।)

দ্বিতীয়তঃ—যদি কেহ স্বেচ্ছায় আত্মবিক্রয় করিত, তাহা হইলে সে নিজেই দাস হইত। তাহার স্ত্রী-পুত্রাদি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র থাকিত।

এই দুইটি বিধি দ্বারা নূতন দাস সংগ্রহ করা বা উহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা একেবারে বন্ধ করার চেষ্টা হইয়াছিল। অন্য কয়েকটি বিধি দ্বারা তৎকালে বিদ্যমান দাসদিগের স্বাধীনতালাভের পথ প্রশস্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। সেগুলি এই—

১। দাস প্রভুর কার্য্য করিবার পর অবশিষ্ট সময়ে পরিশ্রম করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে পারিত। ঐ অর্থ উহারই হইত। উত্তরাধিকারসূত্রেও দাস সম্পত্তি পাইতে পারিত, এবং এইরূপে সংগৃহীত নিষ্ক্রয়মূল্য দিয়া স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিত। মূল্য দিতে উদ্যত হইলে প্রভুমাত্রই দাসকে স্বাধীনতা দিতে বাধ্য হইতেন। নচেৎ দণ্ডার্হ হইতেন।

২। বিশেষ অত্যাচারস্থলে উচ্চবর্ণের দাসকে নীচকর্ম্মে নিযুক্ত করিলে, শবাদি বহনাদি কার্য্য, মলমূত্র বহন প্রভৃতি নীচ ও অশুচি কার্য্য করাইলে দাস আইনের সাহায্যে স্বাধীনতা লাভ করিত। দাসীদিগের পক্ষে ঐরূপ ধর্ম্ম নষ্ট করিলে বা উহাদের প্রতি বলাৎকার করিলে উহারা স্বাধীন হইত, এবং উহাদের গর্ভে সন্তান জন্মিলে সন্তানও অদাস বা স্বাধীন হইত।

এই সমস্ত বিধির ফলেও যাহারা স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিত না, তাহাদেরও অবস্থার উন্নতিকল্পে কতকগুলি বিধি প্রণীত হইয়াছিল। যথা--

১। দাসের উপর গুরুদণ্ডপ্রয়োগ বা অত্যাচার করিলে প্রভু দণ্ডিত হইতেন।

২। দাসের সম্পত্তি দাসের অন্য আত্মীয়রা পাইত; উত্তরাধিকারী অভাবে মাত্রই উহা প্রভুগামী হইত।

৩। নিষ্ক্রয়মূল্য সংগ্রহ করিলেই তাহারা স্বাধীন হইয়া যাইত।

৪। স্বোপার্জ্জিত বা উত্তরাধিকারসূত্রে লব্ধ ধন দাসরা যথেচ্ছ ভোগ করিতে পারিত।

এই সকল ব্যবস্থার ফলে মৌর্য্যযুগে দাসত্ব-প্রথা, বোধ হয়, একেবারেই উঠিয়া যায়। দুই চারি জন দাস যাহারাও রহিয়া গিয়াছিল, তাহাদের অবস্থাও এত উন্নত হইয়াছিল যে, তাহাদিগকে পাশ্চাত্য সমাজের দাসের তুলনায় দাস বলিতে পারা যাইত না। মৌর্য্যযুগে এ দেশে যে সকল গ্রীক দূত বা পর্য্যটক আসিয়াছিলেন, তাঁহারা একবাক্যেই বলিয়া গিয়াছেন যে, ভারতীয়দিগের মধ্যে দাসত্ব-প্রথা নাই। তাহারা স্বজাতীয় বা বিদেশীয় কাহাকেও দাসত্বে নিযুক্ত করে না।

যাহা হউক, আমাদের মনে হয়, দাসত্বপ্রথা ভারত হইতে একেবারেই বিলুপ্ত হয় নাই। কারণ, পরবর্ত্তী যুগের স্মৃতিগ্রন্থ ও কাব্যনাটকাদিতে আমরা দাসের ভূরি ভূরি উল্লেখ দেখিতে পাই। মনুসংহিতায় সপ্তপ্রকার দাসের উল্লেখ আছে, যথা—

ধ্বজাহৃতো ভক্তদাসো গৃহজঃ ক্রীতদত্রিমৌ।
পৈতৃকো দণ্ডদাসস্থ সপ্তৈতে দাসযোনয়ঃ ॥ ৮-১৫।

এই সপ্তপ্রকার দাসের মধ্যে যে সকল দাস যুদ্ধে বন্দী হইয়া আত্মসমর্পণ করায় দাসত্ব প্রাপ্ত হইত, তাহাদিগকে ধ্বজাহৃত বলিত। যাহারা অন্নের জন্য অন্যের দাসত্ব স্বীকার করিত, তাহারাই ছিল ভক্তদাস। আর যাহারা দুষ্কর্ম্মের দণ্ডস্বরূপ বা ঋণশোধের জন্য দাসত্ব স্বীকার করিত, তাহারাই ছিল দণ্ডদাস। অবশিষ্ট কয় প্রকার দাস --দাসের সন্তানসন্ততি, অথবা ক্রয় বা উত্তরাধিকারসূত্রে লব্ধ দাস।

মনুসংহিতায় দাসত্ব-প্রথার নিন্দা বা উহার উচ্ছেদের কথা বিশেষ নাই। কেবল ব্রাহ্মণ দাসত্বে অনিচ্ছাসত্ত্বেও সংস্কৃত দ্বিজাতিকে দাসে পরিণত করিলে বা নীচকার্য্য করাইলে উহায় ৬ শত পণ দণ্ড হইবে, এই কথাটি মাত্র আছে। ইহা ভিন্ন শূদ্রকে বলপূর্ব্বক দাস্য করাইতে বাধ্য করাইবে, এই নৃশংস যুক্তিটি আছে। (মনু-৮-৪১৩-১৪)

শূদ্রন্তু কারযেদ্দাস্যং ক্রীতমক্রীতমেব বা।
দাস্যায়ৈব হি সৃষ্টোঽসৌ ব্রাহ্মণস্য স্বয়ম্ভুবা ॥
ন স্বামিনা নিসৃষ্টোঽপি শূদ্রো দাস্যাদ্বিমুচ্যতে।
নিসর্গজং হি তৎ তস্য কস্মাৎ তদপোহতি ॥

বর্ত্তমান মনুসংহিতাকারের শূদ্রবিদ্বেষ ও দাসত্বের সমর্থন অনেকটা আরিষ্টটলের যুক্তিরই মত। তুলনায় বোধ হয় যে, গ্রীক আদর্শে দাসত্বের পুনঃপ্রভাব ভারতে ঘটিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারের ফলে বৈদিকধর্ম্মবিদ্বেষী শূদ্র পরিব্রাজকের প্রতি আক্রোশই মনুর শূদ্রবিদ্বেষের কারণ বলিয়া অনুমিত হয়। মনুর পরবর্ত্তী স্মৃতিকাররা সকলেই দাসের ও দাসত্ব-প্রথার উ:।।

করিয়াছেন। নারদে পঞ্চদশ প্রকার দাসের উল্লেখ আছে, যথা—

গৃহজাতস্তথা ক্রীতো লব্ধো দায়াদুপাগতঃ।
অন্নাকালভৃতস্তদ্বদাহিতঃ স্বামিনা চ যঃ॥
মোক্ষিতো মহতশ্চর্ণাৎ যুদ্ধে প্রাপ্তঃ পণে জিতঃ।
তবাহমিত্যুপাগতঃ প্রব্রজ্যাবসিতঃ কৃতঃ॥
ভক্তদাসশ্চ বিজ্ঞেয়স্তথৈব বড়বাকৃতঃ।
বিক্রেতা চাত্মনঃ শাস্ত্রে দাসাঃ পঞ্চদশঃ স্মৃতাঃ॥

এই পঞ্চদশ প্রকার দাসের উল্লেখ অন্য বহু প্রকার স্মৃতিতেই পাওয়া যায়। মনু ভিন্ন অনেক স্মৃতিকারই দাস্যমোক্ষের অনেকগুলি বিধি লিখিয়া গিয়াছেন। কাত্যায়ন ব্রাহ্মণের দাসত্বের একেবারেই বিরোধী। অন্য বর্ণকেও অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলপূর্ব্বক দাস্যে নিযুক্ত করা তাঁহার অভিমত নহে। পরন্তু তিনি বলিয়াছেন যে, ইচ্ছা করিলে অন্য তিন বর্ণের লোক দাসত্ব গ্রহণ করিতে পারে। তাহাও আনুলোমক্রমেণ অর্থাৎ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র স্ববর্ণের বা উচ্চবর্ণের দাস হইতে পারে। নীচবর্ণের অধীনে দাসত্ব কোনমতেই হইতে পারে না। নিম্নে তাঁহার মতটি উদ্ধৃত করিলাম; যথা—

স্বতন্ত্রস্যাত্মনো দানাদ্দাসত্বং দারবৎ ভৃগুঃ।
ত্রিষু বর্ণেষু বিজ্ঞেয়ং দাস্যং বিপ্রে ন বিদ্যতে॥
বর্ণানামানুলোম্যেন দাস্যং ন প্রতিলোমতঃ।
রাজন্যবৈশ্যশূদ্রাণাং ত্যজতাং হি স্বতন্ত্রতাম্॥

স্মৃতিকারদিগের সকলেরই মতে দাস অধন। তাহার ধনে তাহার স্বামীরই অধিকার। তবে দাসকে কষ্ট বা যন্ত্রণা দিলে প্রভু দণ্ডার্হ হইতেন।

দাস্যমোক্ষের ব্যবস্থা মনু ভিন্ন প্রায় সকল স্মৃতিতেই আছে। যাজ্ঞবল্ক্য বলেন যে, বলপূর্ব্বক দাসীকৃত ব্যক্তি (রাজাদেশে) মুক্তি লাভ করিবে। আর যে দাস স্বামীর প্রাণরক্ষাকর্ত্তা, সে নিষ্ক্রয়ে বা স্বামীর ইচ্ছায় স্বাধীন হইতে পারিবে। যাজ্ঞবল্ক্যের পর নারদ দাস্যমোক্ষের অনেকগুলি উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার বিধি ও যুক্তিগুলি বিশেষ পর্য্যালোচনার বিষয়। নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম—

চৌরাপহৃতে বিক্রীতা যে চ দাসীকৃতা বলাৎ।
রাজ্ঞা মোচয়িতব্যাস্তে দাসত্বং তেষু নেষ্যতে॥
যশ্চৈষাং স্বামিনং কশ্চিৎ মোক্ষয়েৎ প্রাণসংশয়াৎ।
দাসত্বাৎ স বিমুচ্যেত পুত্রভাগং লভেত সঃ॥
অন্নাকালভৃতো দাস্যাৎ মুচ্যতে গোযুগং দদৎ।
ভক্ষিতং চাপি যত্তস্য ন তদ্ধ্যতি কর্ম্মণা॥
ঋণং তু সোদয়ং দত্বা ঋণী দাস্যাদ্বিমুচ্যতে।
কৃতকালব্যপরমাৎ কৃতকোঽপি বিমুচ্যতে॥
তবাহমিত্যুপগতো যুদ্ধে প্রাপ্তঃ পণে জিতঃ।
প্রতিশীর্ষপ্রদানেন মুচ্যতে তুল্যকর্ম্মণা॥

ইহাতেই বুঝা যায় যে, যদিও দাসত্বের একেবারে নিষেধ হয় নাই, তথাপি নিষ্ক্রয়ের দ্বারা ও অন্যান্য নানা উপায়ে দাসত্বের মোক্ষের কিরূপ ব্যবস্থা ছিল। ইহা ভিন্ন অনেকেই স্বেচ্ছায় দাসকে মুক্তি দিতেন। ফল কথা, হিন্দুসমাজে দাসত্বের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি কোন কালেই হয় নাই। তবে উহা নানা কারণে একেবারে লোপ পায় নাই। নানা জাতীয় বিদেশী এ দেশে রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে অনেকেই গ্রীক, পারসীক, শক, হুন—সকলেই দাসত্বের প্রতি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তাঁহাদের আদর্শে আবার আমাদেরই নৈতিক অবনতি ঘটিয়াছিল; দাসত্ব-প্রথা একেবারে উঠিয়া যায় নাই।

হিন্দু স্বাধীনতার অবসানের পর ও মধ্যযুগে ভারতে দাসত্ব প্রচলিত ছিল। ঐ সময়ের নিবন্ধগুলি হইতে উহার প্রমাণ পাওয়া যায়। বিদ্যাপতির লিখনাবলী নামক গ্রন্থেও পলায়িত দাসকে ধরিবার জন্য লিখিত রাজাদেশ বা writ এর প্রতিলিপি আছে; আবার দাস্য-মোক্ষ পত্রও আছে। মুসলমানযুগে উহাদের আদর্শে আবার দাসত্ব-প্রথা বেশ জাঁকাইয়া উঠিয়াছিল। মুসলমানের ঘরে বান্দা-বান্দী ও হিন্দুর ঘরেও গোলাম-নফর থাকিত। সম্প্রতি কয়েকখানি দাস-ক্রয়ের দলিলও পাওয়া গিয়াছে। তবে উহা আমাদের আলোচ্য বিষয়ের বহির্ভূত।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাঙ্গালার সাহিত্য পঞ্জিকা

(১৯২১)

'মাসিক বসুমতী'তে রসরাজ অমৃতলাল বসু মহাশয় পুরাতন পঞ্জিকা লিখার প্রথা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। আমি সেই মহাজনস্থাপিত পন্থা অনুসরণ করিয়া 'মাসিক বসুমতী'র পাঠকবর্গকে সাহিত্যের পুরাতন পঞ্জিকা শুনাইতে চাহি। তবে এ কথা অবশ্য সূচনাতেই স্বীকার্য্য যে, রসরাজের পঞ্জিকা ও এ পঞ্জিকায় প্রভেদ বিস্তর। রসরাজ একেবারে তিন কুড়ি বৎসরের পুরাতন বার্ত্তার অবতারণা করিয়াছেন; আমার পাঁজী মাত্র এক বৎসরের পুরাতন। খুব পাকা রসে সিক্ত করিয়া পরিবেশন করিতে জানিলে ষাট বৎসরের বাসি জিনিষও কেমন আদরণীয় হয়, রসরাজের পুরাতন পঞ্জিকা তাহার প্রমাণ। আমার এ পঞ্জীতে রসলেশ নাই, এ একেবারে পুরীর শ্রীভোগের দাঁতভাঙ্গা লাড্ডু; এমন জিনিষ এক বৎসরের বেশী পুরাতন পরিবেশন করিতে সাহস হইল না।

ভাল, বাঙ্গালার সাহিত্য-পঞ্জিকা বাঙ্গালা বৎসর অনুসারে লিখিত না হইয়া ইংরাজী বৎসর অনুসারে লিখিত হইল কেন? এই প্রবল জাতীয়তার দিনে ইহার অবশ্যই ভাল একটা কৈফিয়ৎ চাহি। কৈফিয়ৎটা একটু অসঙ্কোচে দিতেছি। জিজ্ঞাসা করি, বাঙ্গালায় কি ইংরাজী বৎসরমতে কোনও কায হয় না? বাঙ্গালী পুত্র বাঙ্গালী পিতার কাছে নেহাতই ইংরাজীতে চিঠি না লিখিলে, চিঠিতে ইংরাজী সন-তারিখটাই দিয়া থাকে। বাঙ্গালী বাড়ীওয়ালা বাঙ্গালী ভাড়াটিয়া হইতে ইংরাজী মাস হিসাবেই ভাড়া লয়। ঝি-চাকরের বেতনও আজকাল ইংরাজী মাস হিসাবে চলে। গোয়ালার ফর্দ্দ, মুদীর ফর্দ্দ ইংরাজী মাস হিসাবে আসে। খবরের কাগজওয়ালা বাঙ্গালা মাসের খবর রাখে না। ঝাড়ুদারণী যখন জিজ্ঞাসা করে, 'বাবুজী, এ মাসের আর কয় দিন বাকী?' বাবুজী তখন বাঙ্গালা মাস হিসাবে জবাব দিলে, সে তাঁহাকে মনে মনে যুয়াচোর সিদ্ধান্ত করিয়া বসে। তাহা ছাড়া বাজারে যত ঘোষের ডায়েরী, বসুর ডায়েরী, উকীলের ডায়েরী, ডাক্তারের ডায়েরী, কংগ্রেসওয়ালার ডায়েরী ইত্যাদি রকমারী ডায়েরী বহি বিক্রীত হয়, সবই ত ইংরাজী মাস-বৎসর-ওয়ারি প্রস্তুত দেখিতে পাই। তবে অবশ্য যাহাকে বলে 'নূতন পঞ্জিকা', তাহা ইংরাজী বৎসরক্রমে প্রকাশের রেওয়াজ নাই। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয়ও তাঁহার 'পুরাতন পঞ্জিকা' (অবশ্য একটা কৈফিয়ৎ দিয়া) বাঙ্গালা বৎসর ধরিয়াই আরম্ভ করিয়াছেন। তা করুন, কিন্তু আমার, এবং বোধ করি তাঁহারও, আশা আছে, পঞ্জিকা সংস্কারের আন্দোলন অচিরে সুপথে পরিচালিত হইয়া ইংরাজী বৎসর মতেই পঞ্জিকা সঙ্কলন অনুমোদন করিবে। ইতি---কৈফিয়তের প্রথম দফা।

দ্বিতীয় দফায় আমার বক্তব্য এই, আপনারা অবশ্যই শুনিয়া থাকিবেন—অন্ততঃ দুষ্ট লোক এই রকম একটা কথা বলে যে,—আমাদের নূতন পঞ্জিকাগুলির গণিতাংশ সবটাই ইংরাজী nautical calendar হইতে নকল করা হয়। পঞ্জিকাওয়ালারা অবশ্য সে কথা স্বীকার করেন না। তাঁহারা অনেক বড় বড় কথা বলেন, যাহা শুনিয়া আমার মত হতভাগ্যেরও প্রাণ স্বদেশ-প্রেমে নৃত্য করিতে থাকে। তাঁহাদের পণ্ডিতরা নাকি স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণ ও গণনা দ্বারা 'দিনচন্দ্রিকা,' 'দিনকৌমুদী' প্রভৃতি গ্রন্থ সংশোধন করিয়া লইয়া তৎসাহায্যে পঞ্চাঙ্গ, গ্রহস্ফুট, গ্রহগণের উদয় অস্ত, বাল্য-বার্দ্ধক্য, বক্রতা, বক্রতা ত্যাগ এবং আরও কত কি বিষয় নির্ণয় করেন। এই সকল মহামহোপাধ্যায় জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের গণিতজ্ঞান জয়যুক্ত হউক। তাঁহারা যে পঞ্জিকাতে ইংরাজী তারিখ

দেন, ইহাই ইংরাজীর ও ইংরাজীওয়ালাদের প্রতি একটা অনুগ্রহ। আমার দশা অন্যরূপ। আমি আমার এই পঞ্জিকার বিবরণ সঙ্কলন বিষয়ে কোনও রূপ মৌলিক গণনা বা পর্য্যবেক্ষণের দাবী করি না; ইহা ইংরাজ সরকারের দপ্তর হইতে ইংরাজী ভাষায়, ইংরাজী বৎসর-ওয়ারি প্রকাশিত দলিল (অর্থাৎ বেঙ্গল লাইব্রেরীর পুস্তক, পঞ্জী বা ক্যাটালগ) অবলম্বনে সঙ্কলিত হইয়াছে। কলিকাতা গেজেটে যাঁহাদের ঐ সকল দলিলের সঙ্গে পরিচয় ঘটে, তাঁহারা জানেন যে, উহাদের বিবরণগুলি বাঙ্গালা মাস বা দিনওয়ারি সাজাইয়া দেওয়া চলে না।

পাঠক লক্ষ্য করিবেন, এই প্রবন্ধের নামকরণ করা হইয়াছে, "বাঙ্গালার সাহিত্য-পঞ্জী" "বাঙ্গালা সাহিত্য—পঞ্জী" নহে। প্রবন্ধের নামের 'র-টা' মুদ্রাকরের প্রমাদ বা প্রবন্ধকারের উন্মাদসূচক নহে। বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা যে করিব না, তাহা নহে; কিন্তু এ পঞ্জিকাতে বাঙ্গালা ছাড়া অন্য সাহিত্যের কথাও কিছু কিছু শুনাইব। কেন না, বাঙ্গালায় কেবল বাঙ্গালা-ভাষার বই ছাপা হয় না, এবং কেবল বাঙ্গালা বহির আলোচনা করিলে বাঙ্গালীর সাহিত্যালোচনার সকল কথাও বলা হয় না। অবশ্য, বাঙ্গালায় এমন অনেক ভাষার বই ছাপা হয়—যাহার সহিত বাঙ্গালীর সাহিত্য-চর্চ্চার কোনও সম্পর্ক নাই। পঞ্জিকা হিসাবে সে সকল বহির কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বিবরণেরও মূল্য আছে।

এই প্রবন্ধের পাঠকগণের মধ্যে এমন লোক হয় ত দুই চারি জন থাকিতে পারেন—যাঁহারা বেঙ্গল লাইব্রেরীর ক্যাটালগ সম্বন্ধে বিশেষ তথ্য কিছু জানেন না। তাঁহাদের পরিতোষের জন্য তৎসম্বন্ধে দুই চারিটা কথা আগে বলা প্রয়োজন। ১৮৬৭ সন (অবশ্য ইংরাজী সন) হইতে একটা আইন চলিয়া আসিতেছে—যাহার ব্যবস্থামতে বৃটিশ ভারতে কোনও গ্রন্থ অর্থাৎ পুস্তকাদি এবং (সংবাদপত্র ভিন্ন অন্যবিধ) সাময়িক পত্র ছাপা হইলেই এক মাসমধ্যে প্রথমে তাহার এক খণ্ড এবং পরে চাহিলে আরও দুই খণ্ড সরকার বাহাদুরকে দিতে হয়। বাঙ্গালা দেশে ঐরূপে সরকার বাহাদুরকে যত গ্রন্থ দেওয়া হয়, বেঙ্গল লাইব্রেরীর কর্ম্মচারীরা তাহার একটা গেজেটে প্রকাশ করেন। ঐ বিবরণের নাম বেঙ্গল লাইব্রেরীর ক্যাটালগ। যখন বাঙ্গালার সব গ্রন্থই (অবশ্য ব্যবসায়ীদের পণ্যদ্রব্যের বিজ্ঞাপন ছাড়া) বেঙ্গল লাইব্রেরীর ক্যাটালগে উদ্ধৃত হওয়ার নিয়ম আছে, তখন ঐ ক্যাটালগ দেখিলে কোন্ বৎসরের কোন্ পাদে (কোয়ার্টারে) কত বহি মুদ্রিত হইয়াছে, তাহার একটা নির্ভুল বিবরণ পাইয়া যাইবার কথা। কিন্তু কার্য্যতঃ প্রিণ্টারগণের স্বেচ্ছা বা অনিচ্ছাকৃত দোষে অনেক বই সরকার পায়েন না, কাযেই বেঙ্গল লাইব্রেরীর ক্যাটালগেও সেগুলি উঠে না। ঐরূপ পুস্তকের সংখ্যা অনুমান করা কঠিন হইলেও, খুব বেশী নহে, ইহা বলা যাইতে পারে। তবে কোনও কোনও সাময়িক পত্র (সংবাদপত্র বলিয়া declared হওয়ার অজুহতে) সরকারকে দেওয়া হয় না। কাযেই সাময়িক পত্রের হিসাবে ত্রুটি একটু অধিক থাকে। সরকারকে যে তিন খণ্ড পুস্তক বা সাময়িক পত্র দেওয়া হয়, (নিতান্ত বাজে জিনিষ না হইলে) তাহার এক খণ্ড ইদানীং ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে আর এক খণ্ড ইণ্ডিয়া আফিস লাইব্রেরীতে এবং তৃতীয় খণ্ড বৃটিশ মিউজিয়ম লাইব্রেরীতে রাখা হয়। এইরূপে বাঙ্গালীর চিন্তার ফল বাঙ্গালা দেশের ত বটেই, বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্যান্য স্থানের লোকরাও উপভোগ করিবার সুযোগ পায়। ইহা ছাড়া কলিকাতা গেজেটেও একবার বিজ্ঞাপনের কাযটা হইয়া যায়; এবং বেঙ্গল লাইব্রেরীতে চিরদিনের জন্য তাহার একটা বিবরণ রক্ষিত থাকে।

ইংরাজী ১৯২৩ সনের বেঙ্গল লাইব্রেরীর ক্যাটালগে উল্লিখিত মোট পুস্তক ও সাময়িক পত্রের সংখ্যা ৪৬৮১। তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী তিন বৎসরের হিসাবও এখানে দিতেছি। ১৯২২ সনে মোট রেজেষ্টারী করা * পুস্তক ও সাময়িক পত্রের সংখ্যা ৪৩৮২; ১৯২১ সনে ৪২২৯ এবং ১৯২০ সনে ৩৭৬৬। পাঠক লক্ষ্য করিবেন, বাঙ্গালা দেশে লেখনীকণ্ডূয়ন বৎসর বৎসরই কেমন বাড়িয়া যাইতেছে। কবিতা উপন্যাস লিখা সখের বিষয় ত আছেই;—বাঙ্গালায় এখন ঘরে ঘরে কাব, আর

* বেঙ্গল লাইব্রেরীর ক্যাটালগে উঠার নামই রেজেষ্টারী

পাড়ায় পাড়ায় ঔপন্যাসিক —তাহা ছাড়া যা' তা' একটা পুস্তক লিখিয়া পয়সা রোজগারের লোভও কম নহে। অর্থলোভের ফলে 'পাঠ্য" পুস্তকের সংখ্যা হু হু করিয়া বাড়িয়া যাইতেছে, যদিও গ্রন্থকারগণের তাহাতে লাভ কিরূপ হইতেছে, তৎসম্বন্ধে মতভেদ আছে। আর অ-"পাঠ্য" পুস্তকের, বিশেষতঃ অপাঠ্য উপন্যাসের চাহিদা নাকি এত অধিক যে, তাহার ফলে বাঙ্গালায় রীতিমত literary profession (সাহিত্যরচনা ব্যবসায়ের) সৃষ্টি হইয়াছে। মা সরস্বতীর (দুষ্টা সরস্বতী নহে ত ?) জয় জয়-কার ! এ ত গেল মুদ্রিত পুস্তকের কথা। লেখনীকণ্ডূয়নের মুদ্রিত উৎপাত বোধ হয়, বাঙ্গালা দেশে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভোগ করিতে হয় বেঙ্গল লাইব্রেরীর লাইব্রেরিয়ানকে, তবু ভাগ্য যে, সকল কবিতা, গল্প বা উপন্যাস ছাপা হয় না। হইলে বেঙ্গল লাইব্রেরিয়ানের কথা কি ?—মা বসুমতীকে আবার মহাবিষ্ণুর শরণাপন্ন হইতে হইত। অমুদ্রিত রচনার ভার যে কত, তাহা প্রত্যেক সাময়িক পত্রের সম্পাদকই বোধ করি কিছু কিছু "বেত্তি, ন বেত্তি বা।"

১৯২৩ সনে বাঙ্গালার সাময়িক পত্রের সংখ্যা (অর্থাৎ বেঙ্গল লাইব্রেরীতে রেজেষ্টারী করা হয় যে সকল সাময়িক পত্র, তাহাদের সংখ্যা) ছিল ১৯৭ ; ইহার কতকগুলি মাসিক, কতক পাক্ষিক, কতক ত্রৈমাসিক, কতক চাতুর্ম্মাসিক এইরূপ নানাবিধ। এই ১৯৭ খানি সাময়িক পত্রের মোট প্রকাশিত সংখ্যা ১৩৬৩। বলা ভুলা, এই ১৩৬৩ খানি পত্র পূর্ব্বোক্ত ৪৬৮১ খানি গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। ১৯৭ খানি সাময়িকপত্রের মধ্যে ৮ খানি বাঙ্গালা (ইহাদের মোট প্রকাশিত সংখ্যা ৩৯), ৭০ খানি ইংরাজী (মোট প্রকাশিত সংখ্যা ৩৯), ২০ খানি বাঙ্গালা ও ইংরাজী ২ ভাষায় চালিত, খানি বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ২ ভাষায়, ২ খানি সংস্কৃত পত্রিকা, ২ খানি সংস্কৃত ও ইংরাজী এবং একখানি আরবী ও ইংরাজী ২ ভাষায় চালিত। বাকী কয়খানি অন্যান্য ভাষায় অর্থাৎ হিন্দী, অসমীয়া ও গারো ভাষায়। বিষয় অনুসারে ভাগ করিলে উক্ত ১৯৭ খানি সংবাদপত্রের মধ্যে ২ খানি শিল্প (আর্ট) সম্বন্ধীয়, ১ খানি কেবল গল্পাত্মক, ৪ খানির আলোচ্য কেবল ইতিহাস বা প্রত্নতত্ত্ব, ১ খানির আলোচ্য ব্যবহারশাস্ত্র - অর্থাৎ আইন, ১৬ খানি চিকিৎসাশাস্ত্র-সম্বন্ধীয়, ৪ খানির বিষয় বিজ্ঞান, ১৩ খানি ধর্ম্মবিষয়ক, আর বাকীগুলি বিবিধ-বিষয়ক।

ঠিক ষাট বৎসরের পুরাতন সাহিত্যের খবর যদিও আমি দিতে পারি না, তবু তাহারই প্রায় কাছাকাছি ৫৬ বৎসর পূর্ব্বকার অর্থাৎ ১৮৬৭ সনের খবর কিছু কিছু আমার জানা আছে। ঐ বৎসরের বেঙ্গল লাইব্রেরীর পুস্তকপঞ্জীতে দেখিতে পাই, তখনকার দিনে বাঙ্গালা সাময়িক পত্রের মধ্যে 'বামাবোধিনীর' কাটতি অধিক ছিল, উহার কোনও কোনও সংখ্যা ৬২৫ কপি করিয়া ও কোনও কোনও সংখ্যা ৬০০ কপি করিয়া ছাপা হইত। 'ধর্ম্মতত্ত্বেরও' কোনও কোনও সংখ্যার ৬২৫ কপি ছাপা হইলেও, কোনও কোনও সংখ্যার আবার মাত্র ৩০০ কপি করিয়া ছাপা হইয়াছে দেখা যায়। জানি না, ইহাতে কোনও ভুল আছে কি না। ইংরাজী সাময়িক পত্রের মধ্যে তখন **'Bengal Punch'** বলিয়া একখানি কাগজ ছিল, উহার ১৫০০ কপি মুদ্রিত হইত, এখানি কিন্তু ইংরাজ-পরিচালিত কাগজ ছিল। সে স্থলে ১৯২৩ সনের অবস্থা কিরূপ ? বাঙ্গালা মাসিক পত্রের মধ্যে ১ খানি ১২ হাজার, ১ খানি ৯ হাজার ও আর ১ খানি সাড়ে ৭ হাজার করিয়া ছাপা হইয়াছে। বাঙ্গালী-সম্পাদিত ১ খানি ইংরাজী মাসিক পত্র ৮৫০০ করিয়া ছাপা হইতেছে। এমন অবস্থায় ষাট বৎসর পূর্ব্বের কলিকাতায় দুর্ভিক্ষের দিনে (যথা ১২৭১ সালের আশ্বিনের ঝড়ের পরে *) যদি মুদি মহাশয়রা উৎকৃষ্ট বালাম চা'লের দাম ৩ টাকা (মণকরা), ও মেছুনী ঠাকুরাণীরা 'পাকা' রুই মাছের সেলামী ৬ আনা (সের হিসাবে) হাঁকিয়া থাকিতে পারে, তবে আজকালকার (চিরস্থায়ী সুভিক্ষের) বাজারে উৎকৃষ্ট বালাম চা'লের মূল্য ৯ টাকা এবং কাঁচা ডাঁসা সকল প্রকার রুইয়ের কিম্মত ১ টাকা পাঁচ সিকা হওয়াতে অন্য যে কেহ আপত্তি করুক, সাময়িক পত্রের পরিচালকদের অন্ততঃ কোনও আপত্তি করা উচিত নহে। আর অন্যেই বা আপত্তি করিবে কেন ? বাঙ্গালার আর্থিক উন্নতি যে সব দিকেই, এ কালের মুদীর ছেলেকেও ৩০ টাকার

* শ্রীযুত অমৃতলাল বসু লিখিত 'পুরাতন পঞ্জিকা' দ্রষ্টব্য।

কেরাণীগিরির জন্য (কেন না, মুদীগিরি বড় ছোট কাব হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া উহা মারবাড়ীর হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইতেছে) ১০টা মুদীদোকানের মূলধন ব্যয় করিয়া বি, এ, পাশ করিতে হইতেছে, আর সে পাশ করার জন্য জুতা পায়ে দিতে হয়- ৯ টাকা জোড়ার, জামা গায়ে দিতে হয় (গরমের দিনে) ৭ টাকা জোড়ার, আর বিদ্যালয়ে বসিয়া নোট লিখিতে হয়-- ১২ টাকা দামের ষ্টাইলো পেন দিয়া। অর্থ না থাকিলে এতটা করে কি করিয়া? আর মেছুনীরও খরচই কি কম? সেকালের মৎস্য-গন্ধারা কিঁ অলঙ্কার ধারণ করিতেন, সে বিষয়ে আমি বিশেষ খবর রাখি না; কিন্তু একালে ভারী ভারী সোনার তাগা, বালা, হার না হইলে কাহার চলে? বাঙ্গালা আর সে বাঙ্গালা নাই, বাঙ্গালীর জীবনটা দিন দিন কিছু কিছু খাটো হইয়া পড়িতেছে বটে, কিন্তু জীবনযাত্রার মাপকাঠীটা (যাহাকে ইংরাজীতে বলে standard of living) উত্তরোত্তরই বেজায় লম্বা হইয়া যাইতেছে!

সাময়িক পত্রগুলির মধ্যে মাত্র ৭টি ভাষার লীলা দেখিয়াছি,-- বাঙ্গালা, ইংরাজী, সংস্কৃত, আরবী, হিন্দী, অসমীয়া, গারো. কিন্তু সাময়িক পত্র ছাড়িয়া পুস্তকগুলির প্রতি লক্ষ্য করিলে তাহার ৩ গুণ অর্থাৎ ২১টি ভাষার সাক্ষাৎ লাভ করি। দেবের মধ্যে যিনি মহাদেব, তাঁহার বিদ্যা মাত্র ১০টি; মহাদেবের বিদ্যা কি না! তাই তাঁহাদের নাম মহাবিদ্যা। আর বাঙ্গালার মুদ্রালয়ের ভোলা মহেশ্বরদের বিদ্যার অবধি নাই। "চন্দ্রে শোভে যোলকলা হ্রাস-বৃদ্ধি তায়। কৃষ্ণচন্দ্র পরিপূর্ণ চৌষট্টি কলায়।" শুধু ভাষা নহে, বিষয়বৈচিত্র্যই বা কত! প্রথমে ভাষাগুলির নামই বলিয়া যাইতেছি, আপনারা অবধান করুন:— ১। অসমীয়া, ২। আও নাগা, ৩। আঙ্গামী, ৪। আঙ্গামী নাগা, ৫। আরবী, ৬। ইংরাজী, ৭। উর্দ্দু, ৮। ওড়িয়া, ৯। গারো, ১০। গুজরাটী, ১১। তিব্বতীয়, ১২। নেপালী, ১৩। পারসী, ১৪। প্রাকৃত, ১৫। বাঙ্গালা, ১৬। মণিপুরী, ১৭। মারবাড়ী, ১৮। মুসলমানী বাঙ্গালা, * ১৯। লুসাই, ২০। সংস্কৃত, ২১। হিন্দী। এখন বিষয়-বৈচিত্র্যের কথা শুনুন। বেঙ্গল লাইব্রেরীর পুস্তক-পঞ্জীতে গ্রন্থসমূহ নিম্নলিখিতরূপ বিষয়ভেদে বিভাগ করা হয়:— ১। আর্ট (শিল্পকলা), ২। জীবনচরিত, ৩। নাটক যাত্রাসহ ৪। উপন্যাস বা কথাসাহিত্য, ৫। ইতিহাস (ভূগোলসহ), ৬। সাহিত্য শিক্ষা বিষয়ক গ্রন্থ (ব্যাকরণসহ), ৭। ব্যবহারশাস্ত্র, ৮। চিকিৎসাশাস্ত্র, ৯। দর্শন, ১০। কাব্য (পদ্য-গ্রন্থ), ১১। রাজনীতি, ১২। গণিত বিজ্ঞান, ১৩। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, ১৪। ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, ১৫। বিবিধ। সকল ভাষায় অবশ্য সকল শ্রেণীর গ্রন্থ হয় না। আলোচ্য বর্ষে কয়েকটি ভাষায় অতি অল্পসংখ্যক পুস্তকই মুদ্রিত হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়- আঙ্গামী, মণিপুরী, আও নাগা, গারো ও প্রাকৃত ভাষায় মাত্র এক একখানি পুস্তক পুস্তক-পঞ্জীতে উঠিয়াছে; আঙ্গামী নাগা, আরবী, মারবাড়ী, নেপালী ও পারসীভাষায় ২ খানি করিয়া, তিব্বতীয় ভাষায় ৩ খানি, লুশাই ও উর্দ্দুভাষায় ৪ খানি করিয়া পুস্তক পুস্তক-পঞ্জীতে স্থান পাইয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা বেশী বই হইয়াছে বাঙ্গালা ভাষায়, উহাদের সংখ্যা ১৬৭৯, ইহার পরে ইংরাজী, হিন্দী, অসমীয়া ও ওড়িয়া পুস্তকের সংখ্যা যথাক্রমে ৬২৭, ২৪৫, ১১৩, ও ৬৮। এই সংখ্যাগুলিতে ২ ভাষায় বা ৩ ভাষায় লিখিত পুস্তকগুলি ধরা হয় নাই। আঙ্গামী নাগা, আও নাগা, গারো, লুশাই, মারবাড়ী ও প্রাকৃত ভাষায় কেবল ধর্ম্মবিষয়ক পুস্তক (প্রথম ৪টিতে খৃষ্টানধর্ম্মবিষয়ক ও শেষ ২টিতে জৈন ধর্ম্মবিষয়ক পুস্তক) প্রকাশিত হইয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক পুস্তক হইয়াছে ভাষাশিক্ষা (সাহিত্য-ব্যাকরণাদি) বিষয়ে; ইহাদের সংখ্যা ৭৩৬। ভাষাশিক্ষা-বিষয়ক গ্রন্থগুলি অবশ্য প্রায় সবই "পাঠ্য" পুস্তক; ইহাদের মধ্যে আবার অনেকগুলি অন্য পুস্তকের "বিশদ ব্যাখ্যা।" "পাঠ্য" পুস্তক সকল বিষয়েই আছে, যথা,— আর্টের মধ্যে ড্রইং বহি, (গণিত) বিজ্ঞানের মধ্যে পাটীগণিত ইত্যাদি। বস্তুতঃ পুস্তক ও সাময়িক পত্রের মোট সংখ্যা ৪৬৮১ হইতে ১৩৬৩ খানি সাময়িক পত্র বাদ গেলে যে ৩৩১৮ খানি পুস্তক থাকে, তাহার মধ্যে ১৩৮০ খানিই "পাঠ্য" (educational) পুস্তক, বাকি ৩৩০১

* বেঙ্গল লাইব্রেরীর পুস্তকপঞ্জীতে, এই ভাষাকে বাঙ্গালা ভাষা হইতে স্বতন্ত্ররূপে গণনা করা হয়; কারণ বিশেষজ্ঞের সুগম্য।

খানি অ-"পাঠ্য" (non-educational)। সে যাহা হউক, বাঙ্গালা ১৬৭৯ খানি পুস্তকমধ্যে ৭৩৬ খানি "ভাষা"-বিষয়ক পুস্তকের পরে "বিবিধ"বিষয়ক পুস্তক ৬৪৭খানি উল্লেখযোগ্য। ইহার পর ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ৪০৯, উপন্যাস ২৬০, ইতিহাস ১৭৭, গণিত ১১৮, কাব্য ১০৬, নাটক-যাত্রা ৮৫, ব্যবহারশাস্ত্র ৫৮, শিল্পকলা ৫১, চিকিৎসাশাস্ত্র ৫২।

এখন কেবল বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিত পুস্তকের সংখ্যাগুলি বলি। পার্শ্বে মুসলমানী বাঙ্গালায় প্রকাশিত পুস্তকের সংখ্যা দেওয়া গেল :—

বিষয়	বাঙ্গালা পুস্তকের সংখ্যা		মুসলমানী বাঙ্গালায় লিখিত পুস্তকের সংখ্যা
সাহিত্য বা ভাষাশিক্ষা	৫৯০	+	০
বিবিধ	২৫৪	+	৭
উপন্যাস ও গল্প	২০৭	+	৯
ধর্ম্ম	১৬১	+	১৮
ইতিহাস ভূগোল	১১৫	+	০
গণিত বিজ্ঞান	৮৬	+	০
কবিতা	৬৭	+	১
নাটক-যাত্রা	৭৮	+	০
শিল্পকলা	৩৯	+	০
চিকিৎসাশাস্ত্র	৩১	+	০
জীবনচরিত	৩০	+	০
প্রাকৃত বিজ্ঞান	১৬	+	০
ব্যবহারশাস্ত্র	১২	+	০
রাজনীতি	৯	+	০
দর্শন	৩	+	০
ভ্রমণবৃত্তান্ত	৩	+	০

এই তালিকায় বাঙ্গালা ধর্ম্মবিষয়ক গ্রন্থ চতুর্থ স্থানে পড়িয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ধর্ম্মবিষয়ক গ্রন্থগুলিতে সংস্কৃতের অতিরিক্ত প্রাচুর্য্যহেতু উহার অনেকগুলি ২ ভাষায় লিখিত গ্রন্থমধ্যে স্থান পায়; অনেকগুলি আবার বাঙ্গালা অনুবাদ সহ মূল সংস্কৃত গ্রন্থ —সেগুলিও বাঙ্গালার মধ্যে ধরা হয় না, যদিও বাঙ্গালা অনুবাদই তাহাদের প্রধান আকর্ষণ বলিতে হইবে। "বিবিধ"-বিষয়ক পুস্তকাবলীর বিবিধত্ব এমন বিচিত্র যে, তাহাতে অন্য বিভাগের সহিত ঐ বিভাগের কোনও তুলনামূলক আলোচনা চলে না। "বিবিধ" শ্রেণীতে কৃষির কথা থাকে, বাণিজ্য বিষয়ক পুস্তক থাকে, দেশের দারিদ্র্যকাহিনী, জমীদারের অত্যাচার, মহাজনের উৎপীড়ন, জলকষ্ট, সমবায়সমিতি, বিধবার বাধ্যতামূলক ব্রহ্মচর্য্যের নিন্দা, কুমারীর (নানা-দায়মূলক) চিরকৌমার্য্যের প্রশংসা, শিক্ষাসংস্কার, বিবাহবিধি সংস্কার, জাতিবিশেষের ব্রাহ্মণত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব বা বৈশ্যত্বের প্রমাণ, ছেলেদিগকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠান যে জাতীয় অবনতির চিহ্ন এবং মেয়েদিগকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠান যে জাতীয় উন্নতির পরাকাষ্ঠা, ব্রাহ্মণের পক্ষে উপবীতত্যাগ ও কায়স্থের পক্ষে উপবীতগ্রহণ উভয়ই যে হিন্দুসমাজসংস্কারের অতি প্রয়োজনীয় উপায়, ইত্যাদি বহু বিষয়ের কথা থাকে। জানি না, এক বেঙ্গল লাইব্রেরীর লাইব্রেরিয়ান ব্যতীত বাঙ্গালা দেশের আর কোন সৌভাগ্যশালী ব্যক্তির মন এমন বিচিত্র ভোজ্যে পুষ্ট হয় কিনা। বিবিধ-বিষয়ক পুস্তকসমূহের কথা ছাড়িয়া দিলে, মোটের উপর পাঠ্যপুস্তকের পর ধর্ম্মবিষয়ক পুস্তকেরই আধিক্য দেখা যায়. এই অবস্থা যে কেবল ১৯২৩ সনেই ঘটিয়াছে, তাহা নহে, প্রায় প্রতি বৎসরই এইরূপ অবস্থা দৃষ্ট হয়, এবং ইহাই স্বাভাবিক। কেন না, বাঙ্গালী জাতি সর্ব্বাগ্রে চাহে শিক্ষা— তা যেরূপ শিক্ষাই হউক, এবং যে উদ্দেশ্যেই হউক। তাহার পরেই অন্য সকল চিন্তার পূর্ব্বে বা সঙ্গে সঙ্গে তাহার অন্তরের গূঢ়নিবিষ্ট ধর্ম্মভাব আত্মপ্রকাশ করে। ধর্ম্মের পর অন্য সাহিত্যের কথা। ইহার মধ্যে উপন্যাস ও গল্প-পুস্তকই অধিক জনপ্রিয় বলিয়া বোধ হয়। প্রত্যেক বৎসর যতগুলি করিয়া নূতন উপন্যাস বা গল্পপুস্তক প্রকাশিত হয়, তাহাদের সংখ্যা (ধর্ম্ম ছাড়া) সাহিত্যের অন্য যে কোনও শাখার নূতন পুস্তকের সংখ্যা হইতে অধিক। ১৯২৩ সনে প্রথম প্রকাশিত (অর্থাৎ প্রথম সংস্করণের) গল্পপুস্তকের সংখ্যা ১৬৬, ১৯২২ সনে তাহা অপেক্ষাও অধিক, নূতন গল্পপুস্তক (১৯২ খানি) প্রকাশিত হইয়াছিল। দুঃখের বিষয়, অধিকাংশ গল্প-পুস্তকই একবার বই দুইবার মুদ্রিত হয় না; শৈশব-মৃত্যুর পরিমাণ বাঙ্গালার সাহিত্যরাজ্যে বাঙ্গালার পারিবারিক জীবন অপেক্ষা অধিক বই অল্প নহে।

শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত।

চন্দননগর-পরিচয়

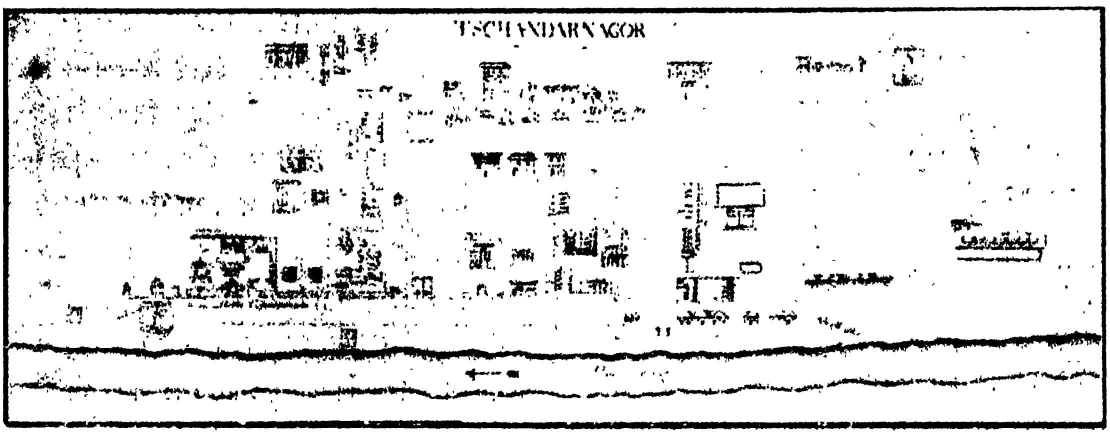
পুরাতন যুগ

প্রথম পরিচ্ছেদ

ফরাসীদের আগমনের পর

প্রায় সার্দ্ধ দুই শত বৎসর পূর্ব্বে যে সকল য়ুরোপীয় বণিকজাতি ব্যবসায়-ব্যপদেশে ভাগীরথীর উপকূলে কুঠী স্থাপন করিয়া ক্রমে স্থানলাভ ও ক্ষমতাবৃদ্ধির জন্য প্রতিযোগিতা ও আকিঞ্চন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে বৃটিশদের কথা ছাড়িয়া দিলে একমাত্র ফরাসীরাই এই বিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত টিকিয়া আছে, এবং আজিও অন্যান্য পাশ্চাত্য বণিকদল হিংসাকুল নেত্রে চাহিয়া থাকিত।

ফরাসীদের প্রথম ভারতাগমনের বিস্তৃত ইতিহাস পাওয়া যায় না। ফ্রান্স হইতে ভারতোদ্দেশে প্রথম ১৫০৩ খৃষ্টাব্দে দুইখানি জাহাজ ছাড়া হয়। কেহ বলেন, তাহাদের আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই; আবার কেহ কেহ বলেন, এই অভিযানের কর্ত্তা গোনেভিল (Sieur de Gonneville) ছয় মাস থাকিয়া ফিরিয়া যায়েন। (১) উহার একশত বৎসর পরে প্রথম ফরাসী



পুরাতন চন্দননগরের নক্সা

সমভাবেই তাঁহাদের এই ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ড চন্দননগরে ফরাসী ত্রিবর্ণ পতাকা উড্ডীন রহিয়াছে। ভারতমাতার সুবিশাল শুভ্র অঙ্কে তিলচিহ্নসম আজিকার এই ক্ষুদ্র চন্দননগর, পার্শ্বস্থিত বৃটিশ ভারতের দ্বিতীয় নগরী কলিকাতার তুলনায় সামান্য হইলেও, ইহার ঐতিহাসিক মূল্য ও পূর্ব্বগৌরব অকিঞ্চিৎকর নহে।

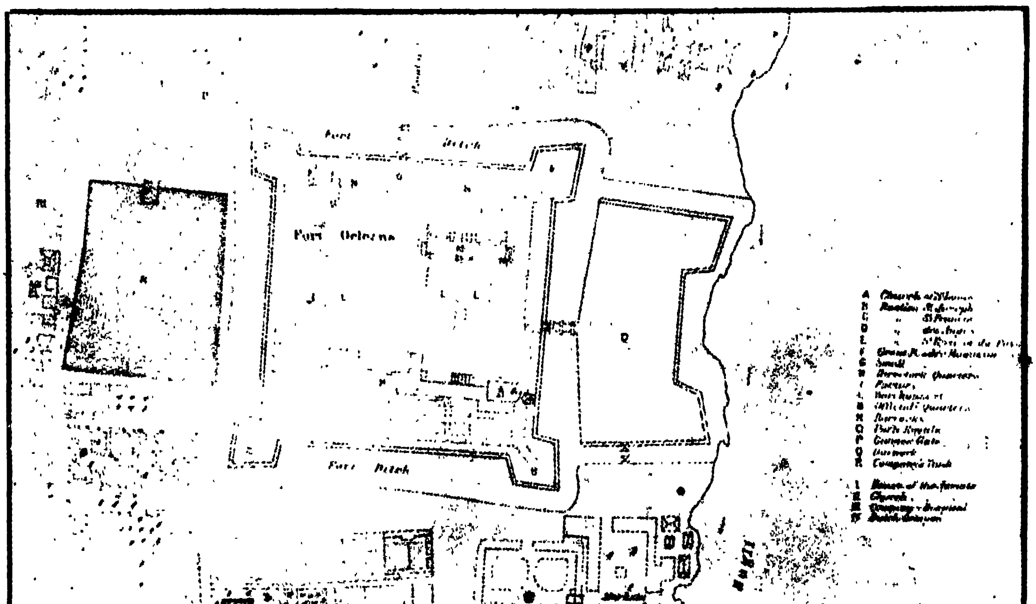
যখন কলিকাতা একটি সামান্য নগণ্য গ্রাম মাত্র ছিল, তখন চন্দননগর একটি সমৃদ্ধিশালী নগর। তখনকার চন্দননগরের সমৃদ্ধি দর্শনে নিকটবর্ত্তী ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী গঠিত হয়। কিন্তু তাহাদের কার্য্য-কলাপ বিশেষ কিছু জ্ঞাত হওয়া যায় না। তৎপরে কার্ডিন্যাল রিচেলু (Cardinal Richelieu) নামক এক ব্যক্তি এ বিষয়ে চেষ্টিত হয়েন। তিনিও বিশেষ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। পরে অপ্রতিহতপ্রভাব শক্তিশালী ফরাসীরাজ চতুর্দ্দশ লুইএর রাজত্বকালে তাঁহার দূরদর্শী অর্থ-সচিব কোলবেয়ার (Colbert) দ্বারা

(১) History of the British Empire in India and the East—By E. H. Nolan.

১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে এক ফরাসী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গঠিত হয়। পরবৎসর ম্যাডাগাস্কারের সহিত ব্যবসায় আরম্ভ হয়। তাঁহারা প্রথম ভারতে পশ্চিম ও দক্ষিণ অংশে অবতরণ করেন এবং সুরাট, মসলিপাটম ও করোম্যাণ্ডেলে কুঠী স্থাপন করেন। ঐ কোম্পানী প্রথম কবে চন্দননগরে আগমন করেন, ঠিক কোন্ সময়ে এই নগরের প্রতিষ্ঠা হয়, তাহা নির্ণয় করা দুষ্কর।

জানা যায়, পণ্ডিচারী নগরী সংস্থাপিত হইবার দুই বৎসর পরে সায়েস্তা খাঁ যখন বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা ছিলেন, সেই সময়ে একখানি ফরাসী জাহাজে এক দল ফরাসী বণিক চন্দননগরে আসিয়া উপস্থিত হয়েন। ইঁহাদের আগমনকালসম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত দেখা যায়। ইউল (Yule) ও অন্যান্য অনেকে বলেন, উহা ১৬৭৩ খৃষ্টাব্দের কথা। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ম্যালিশন কিন্তু ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দ বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। ষ্ট্রেণশ্যাম মাষ্টার (Streynsham Master) ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার ভ্রমণ-বিবরণের মধ্যে একটি বৃহৎ ভূমিখণ্ড ও তন্মধ্যে ফরাসীদের কুঠী দেখিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। (১) ইহার নামোল্লেখ না হইলেও ইহা চন্দননগর ভিন্ন আর কিছু হওয়া সম্ভব নহে। ঐতিহাসিক গ্রাণ্টও (James Grant) ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দ বলিয়াছেন। (২)

ফরাসীদের আগমন-কাল সম্বন্ধে যেমন একটা বিশেষ নির্দ্দিষ্ট সময় ইতিহাসে পাওয়া যায় না, তেমনই ফ্রান্সের কোন্ ফরাসী চন্দননগরে প্রথম আগমন করেন, সে সম্বন্ধেও অধিকাংশ ইংরাজী ইতিহাস নীরব। যত দূর জানিতে পারা যায়, চন্দননগরের সংস্থাপক ও প্রথম গভর্ণরের নাম দেলান্দে (Andre Boureau Deslandes)। মিঃ ব্রাড্লে বার্ট তাঁহার চন্দননগরশীর্ষক প্রবন্ধে (৩) ইঁহাকেই চন্দননগরের



আরলাঁ দুর্গ ও চতুঃপার্শ্বস্থ স্থানের নক্সা

(১) The Diary of William Hedges vol iii.
(২) Cassel's Illustrated History of India vol. i.
(৩) Chandernagore—The Calcutta Review, 1918.

ভিত্তিস্থাপক বলিয়াছেন। ইনি ফরাসী কোম্পানীর প্রথম ডিরেক্টর কেরণ (Caron) কর্তৃক একটি অভিযানের নায়করূপে বাঙ্গালায় প্রেরিত হয়েন। এই অভিযান প্রথম বালেশ্বর, তৎপরে হুগলীর প্রান্তসীমায় প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করে। সম্ভবতঃ পূর্ব্বোক্ত বণিক-সম্প্রদায় এই অভিযানেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তৎপূর্ব্বে চন্দননগরের কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। ফরাসীদের আগমনের পূর্ব্বে এই স্থানের অবস্থা অতি সামান্য ছিল। সে সময় মধ্যবিত্ত ভদ্র গৃহস্থের বাস বড় ছিল না; গঙ্গার ধারে কয়েক ঘর ধীবর বাস করিত। ১৭০১ খৃষ্টাব্দেও ইহা একটি সামান্য পল্লী ছিল। কিন্তু এই সময়ের মধ্যেই দস্যু ও বিদ্রোহীদের হস্ত হইতে কুঠী ও পল্লী রক্ষার্থ ফোর্ট দে আরলাঁ (Fort de Orleans) নামক একটি দুর্গ নির্ম্মিত হয়। এই দুর্গ নির্ম্মাণের কাল সম্বন্ধে একটু মতভেদ দেখা যায়। কেহ বলেন, ইহার নির্ম্মাণ সময় ১৬৯৬-৯৭ খৃষ্টাব্দ (১) কেহ বলেন, ১৬৯১-৯৩, (২) ফরাসী ভরতের আন্নুয়ার গ্রন্থে (৩) দেখা যায়, ১৭৪২ খৃষ্টাব্দের ১২ই মে দুর্গনির্ম্মাণ আরম্ভ হয়। ইহা পুনর্নির্ম্মাণ বা সংস্কারের কথা বলিয়াই অনুমান হয়। উক্ত কোন গ্রন্থই মূল ইতিহাস নহে। দুর্গ যে সময়েই নির্ম্মিত হউক, শোভাসিংহের বিদ্রোহের পর কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়ম ও চুঁচুড়ার কোর্ট গষ্টেভাস্ নির্ম্মাণের সমসাময়িক, তাহা বহু গ্রন্থে দেখা যায়। ক্যাপ্টেন এলেকজেণ্ডার হ্যামিল্টন (Capatin Alexander Hamilton) বলিয়াছেন, ১৭২৩ খৃষ্টাব্দে দুর্গের সন্নিকটে মাত্র কয়েক ঘর গৃহস্থ বাস করিতেন।

প্রথমাবস্থায় ওলন্দাজ, ফরাসী ও দিনেমার বণিকগণ পাশাপাশি তাঁহাদের অস্থায়ী কুঠী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সাধারণ শত্রু মোগল সরকারের ভয়ই ইহার কারণ বলিয়া ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন। চন্দননগরের দক্ষিণ প্রান্তে ভাগীরথীপার্শ্বে যে স্থানে দিনেমারদের কুঠী ছিল, তাহা এখন ফরাসী অধিকারভুক্ত। উহাকে এখনও "দিনেমার-ডাঙ্গা" বলে; কোন সময় "ডেনমার্ক-নগর" বলিত।(১) ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে ফরাসী কোম্পানীর নিকট হইতে বাঙ্গালার সর্ব্বত্র কুঠী স্থাপনের অনুমতি পাইয়া বাদশার নিকট হইতে ফারমান লাভের চেষ্টা হয়। তাহার ফলে তাঁহাদের ভাগীরথীকূলে প্রথমাবতরণের দ্বাদশ বর্ষ পরে ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ ঔরঙ্গজেবের নিকট হইতে চন্দননগরের ফরাসী সন্নিবেশ অনুমোদিত হইয়া এই স্থানে কুঠী নির্ম্মিত হয় এবং ১৬৯১ খৃষ্টাব্দে স্পষ্টভাবে ফরাসীরা এই স্থানে আগমন করেন। তখন তাঁহারা ৬০ বিঘা মাত্র ভূমি নবাবের নিকট হইতে ইজারা লইয়াছিলেন।



প্রাচীন দিনেমার কুঠির ধ্বংসাবশেষ

(১) The Early History and Growth of Calcutta.
(২) Thacker's Guide to Calcutta.
(৩) Aanuaire de Etablishments France Dans lindes Pour Annee 1923.

(১) Map of French Settlement of Chandernagore, 1870-71.

এই সময় মসিয়ে দেলান্দে কর্ত্তৃক একটি উপাসনা-মন্দির নির্ম্মিত হইয়া জেসুইট পাদ্রীদের হস্তে উহার ভার অর্পিত হয়। উঁহারা ইহার আয়তন বর্দ্ধিত করিয়া পল্লী-উপাসনা-মন্দিরে পরিণত করেন। কিন্তু ১৬৯৯ খৃষ্টাব্দে কোম্পানীর আদেশে বৈদেশিক মিশনারীর নিয়োগ নিষিদ্ধ হওয়ায় জেসুইটদের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়। এক্ষণে সে গীর্জ্জার চিহ্নমাত্রও নাই এবং চন্দননগরের স্থাপয়িতার কোন স্মৃতি-চিহ্ন কোন স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় না। কেবল গীর্জ্জার পুরাতন রেজেষ্টারি বহিতে তাঁহার ও ম্যাডাম দেলান্দের নাম এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। ১৬৯০ হইতে ১৬৯৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে চন্দননগরে উঁহাদের পাঁচটি সন্তান হয়। ইহাদের নাম ও দীক্ষাভিষেক রেজিষ্টারে দৃষ্ট হয়। প্রথমটি ১৬৯০ খৃষ্টাব্দের ১৭ই আগষ্ট জন্ম গ্রহণ করে, নাম ফ্রাংকায়স লুই বরু দেলান্দে। সম্ভবতঃ এই প্রথম ফরাসী-সন্তান চন্দননগরে জন্ম গ্রহণ করেন। (১)



ফ্রান্সিস্ ডুপ্লে

চন্দননগর এই নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন স্থানীয় লেখক বলিয়াছেন, (২) দেলান্দে কর্ত্তৃক এই নাম প্রদত্ত হয়। কিন্তু তাহার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। ইহার আর একটি নাম ফরাসডাঙ্গা। ভাগীরথীবক্ষ হইতে এই স্থানটিকে দেখিতে ধূর্জ্জটি-ললাটস্থ চন্দ্রকলা সদৃশ বলিয়া "চন্দ্রনগর" হইতে চন্দননগর নামের উৎপত্তি, কি কোন সময় এখানে চন্দনের ব্যবসা ছিল (৩) বলিয়া এই নাম, তাহাও সঠিক বলা যায় না। (১) ফরাসীদের অধিকারে আসায় লোক ইহাকে ফরাসডাঙ্গা বলিয়া থাকে, কি বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ক্লাইভপ্রমুখ ব্যক্তিগণ "ফ্রান্সডঙ্গী" (২) নামে আখ্যায়িত করিতেন বলিয়া ইহা এই নাম প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাও অজ্ঞাত।

দুর্গ-নির্ম্মাণ সম্বন্ধে যত দূর জানা যায়, তাহাতে প্রকাশ, বঙ্গের সুবাদারকে অর্থোপঢৌকনে ও অন্য প্রকারে প্রসন্ন করিয়া ফরাসীরা বহু চেষ্টা সত্ত্বেও ১৬৯৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দুর্গ-নির্ম্মাণের অনুমতি পায়েন নাই। পরে কলিকাতা ও চুঁচুড়ার ন্যায় চন্দননগরে সুবিখ্যাত অরল্যাঁ দুর্গ, বর্দ্ধমানের চেতুয়া ও বন্দর উপরিভাগের ভূস্বামী শোভাসিংহের বিদ্রোহাচরণ এবং গঙ্গার পশ্চিমদিকস্থ রাজাদের সহিত মোগলদের যুদ্ধ-বিগ্রহ উপলক্ষ করিয়া ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে অনুমতি অনুসারে ভাগীরথী-কূলসমীপে নির্ম্মিত হইয়াছিল। (৩)

এই দুর্গ গঙ্গা হইতে প্রায় ৩০ গজ পশ্চিমে সহরের ঠিক মধ্যস্থলেই ছিল। ইহা লম্বে ও প্রস্থে ১২০ গজ এবং পূর্ব্বে ও উত্তরে দুইটি ফটক ছিল। প্রতি কোণে প্রতি বুরুজে ১০টি (কেহ বলেন ১৬টি) করিয়া কামান সজ্জিত ছিল। গঙ্গার

(১) Storia do Mogor Vol. IV.

(২) U. F. C. Mission School Magazine, Nov. 1921 —Chandernagore.

(৩) ক্ষিতীশ গ্রন্থাবলীতে উল্লেখ আছে, নদীয়ার ধার্ম্মিক রাজা রুদ্র হুগলীর সান্নিধ্য হইতে চন্দনকাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সুতরাং উহা চন্দননগর হইলেও হইতে পারে। Hooghly Past and Present.

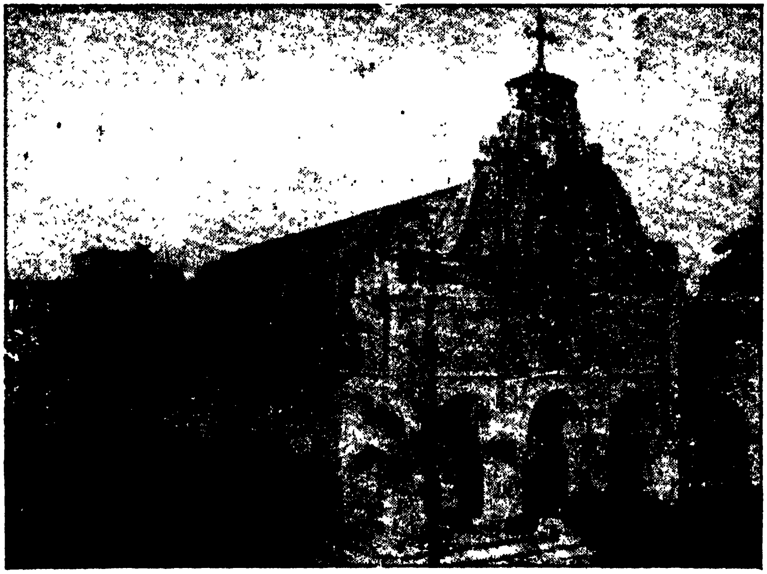
(১) "Chandan-nagore" or city of sandal wood—Carey's Tour in the Hugli and Howrah Dist. Chandernagore—city of sandal wood.—The Imperial Gazetteer of India Vol. II. "Ville du bois de Santal"—Les Colonies Francaises.

(২) ১৭৫৭ খৃঃ অব্দে ৩০শে মার্চ্চ ক্লাইভ নবাবকে পত্রে লিখেন,—"

"......to destroy the fortifications of France-dongy......" Bengal in 1756 57.

(৩) Old Fort William in Bengal—The Indian Records Series Vol II.

দিকে ৮টি এবং অন্যত্রও কয়েকটি কামান বসান থাকিত। গঙ্গার ধারে একটি গুদাম ভিন্ন ভিতরে ভাল অট্টালিকা আর বড় কিছু ছিল না। উহার ঠিক পশ্চাতে কুঠী, দক্ষিণে গভর্ণমেণ্টভবন ও ডাইরেক্টারদিগের থাকিবার স্থান এবং উত্তরে কর্ম্মচারীদের বাসস্থান ও ব্যারাক ছিল। ভিতরে একটি উপাসনাগারও ছিল; উহার ছাতে ছোট আকারের কামান বসান ছিল। দুর্গের পশ্চাতে একটি প্রকাণ্ড জলাশয় (বর্ত্তমান লালদীঘি) এবং দুই পার্শ্বে গড় ছিল। বাজার নিকটেই ছিল এবং



পুরাতন গির্জ্জা

পশ্চাতে ডাচ্ অষ্টেগন অর্থাৎ ডাচ্ ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর কোয়ার্টার ছিল। উল্লিখিত পুষ্করিণীর পশ্চাতে কোম্পানীর হাঁসপাতাল এবং নিকটে জেসুইটদের বাড়ী ও গীর্জ্জা ছিল। (১) দুর্গের গঠন সম্বন্ধে এইটুকু জানা যায় যে,

(১) Orme's Military Transactions of the British Nation in Indostan Vol. II. ও Life of Lord Clive Vol. I.

ক্লাইভ কর্ত্তৃক চন্দননগর আক্রমণের সময়ও উহা বিশেষ আড়ম্বরজনক বা দৃঢ় ছিল না। উহা বহিরঙ্গহীন ইষ্টকনির্ম্মিত সামান্য আকারের ছিল। উহা প্রাকার বা তদ্রূপ কিছুর দ্বারা পরিবেষ্টিতও ছিল না। ১৮ ফিট উচ্চ ১॥ ফুট চওড়া সামান্য মাটীর গাঁথুনির প্রাচীরমাত্র ছিল। (১) আবার এক জন আধুনিক গ্রন্থকার বলিয়াছেন, এই দুর্গ খুব জমকাল রকম এবং ইংরাজদের কলিকাতার দুর্গ অপেক্ষা মজবুত ছিল। (২) কাহারও মতে দুর্গের চতুর্দ্দিকে অনেক বাড়ী ছিল। অন্য ঐতিহাসিক বলিয়াছেন, সে সময়ে গীর্জ্জা ভিন্ন ইষ্টক-প্রস্তর-নির্ম্মিত অট্টালিকা সম্ভবতঃ আর ছিল না।



জানা যায়, বর্ত্তমান সেণ্ট মেরীর কনভেণ্টের সন্নিকটে নদীতীরে ইটালীয় মিশনের দ্বারা একটি ছোট গীর্জ্জা

(১) Bengal in 1756-57—Indian Records Series.

(২) Calcutta—Past and Present.



বারদুয়ারির ক্লক্ টাওয়ার্

১৭২৬ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল।(১) কিন্তু উহার বহির্দ্বারে এখনও লিখা দেখা যায়, ১৭২০ খৃষ্টাব্দ। চন্দননগরের প্রাচীনতম যে সব সৌধ আজিও বিদ্যমান, ইহাই বোধ হয়, সে সকলের অন্যতম।

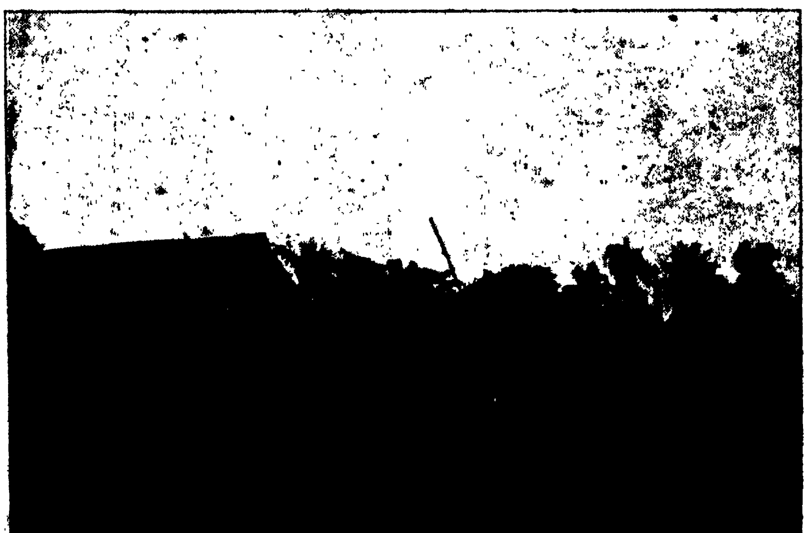
দেলান্দের চন্দননগর ত্যাগের পর ১৭০১ খৃষ্টাব্দে চন্দননগর পণ্ডিচারীর শাসনাধীন হয়। ইহা দুর্গবেষ্টিত হইবার পর বাণিজ্যবিষয়ে প্রভূত উন্নতি লাভ ও প্রচুর পণ্যদ্রব্য নগরাভ্যন্তরে নিঃসঙ্কোচে রাখিবার সুবিধা হইলেও, উপযুক্ত লোক ও ফ্রান্সের দৃষ্টির অভাবে প্রায় ৩০ বৎসর-কাল এখানে (১৭৩১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যত দিন না ডুপ্লে [Joseph Francois Dupleix] পর্য্যবেক্ষক বা ডাইরেক্টররূপে আগমন করেন, তত দিন) নগরের কোন বিশেষ উন্নতি পরিলক্ষিত হয় নাই; বরং সঞ্চিত শ্রীরও হ্রাস হইয়াছিল।

এই যুগে এখানকার স্থানীয় অধিবাসীদের কথা বা সামাজিক অবস্থা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য প্রভৃতির সম্বন্ধে কোন বিশেষ উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় না।

গঙ্গার দিক হইতে চন্দননগরের আকার কতকটা ধনুকাকৃতি, মানচিত্রে বাঙ্গালা ৫এর মত দেখা যায়। উহা লম্বে ২ এবং প্রস্থে দেড় মাইল ছিল, ইহাই জানা যায়। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে জমীর পরিমাণ ৯৪২ একর ছিল; ১৮৭০-৭১ খৃষ্টাব্দে সার্ভে ম্যাপে দেখা যায়, মোট পরিমাণ প্রায় ২৩৭৭ একর অর্থাৎ প্রায় পৌনে ৪ বর্গ-মাইল জমী ছিল। উহার ভৌগোলিক অবস্থা বেশ সুবিধাজনক, কলিকাতার তুলনায় সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ, ইহাও কেহ কেহ বলিয়া থাকেন।(১) পূর্ব্বে ভাগীরথী

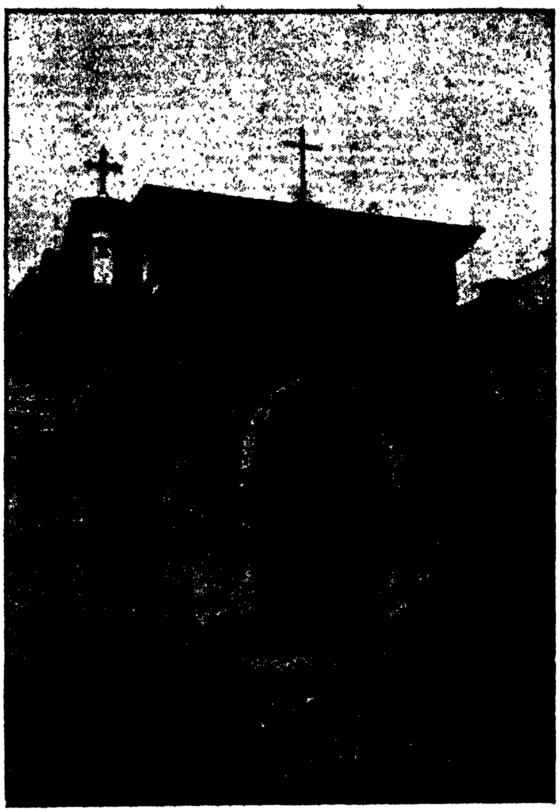
(১) Calcutta Review Vol. IV. 1845.

(১) The East Indian Gazetteer.

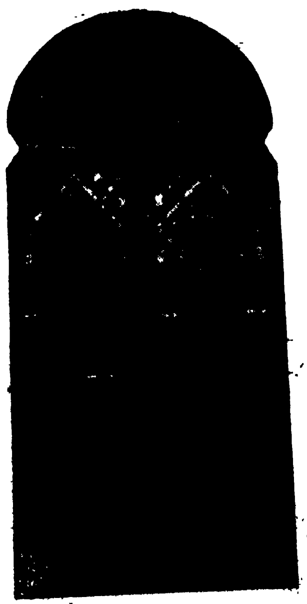


কুঠির ঘাট

এবং পশ্চিমে এক্ষণে যে স্থানে রেল ষ্টেশন,পূর্ব্বে উহার অনতিদূরে সরস্বতী নদী প্রবাহিত হইত। উত্তরে এক্ষণে সামান্য অংশ ভিন্ন অন্য ৩ দিক প্রায় গড়বেষ্টিত। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ইহার গঠন কিছু ভিন্ন প্রকারের ছিল। তখন কোন কোন অংশ ইংরাজ রাজ্যের সহিত বিশেষ মিশ্রিতভাবে থাকায় উভয় গভর্ণমেণ্টের শাসনবিষয়ে সর্ব্বদা অসুবিধা ঘটিত এবং তজ্জন্য উভয় গভর্ণমেণ্টের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর দ্বারা প্রথম ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা সেপ্টেম্বর উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে একটি সুবিধামত সীমা নির্দ্ধারণ করিয়া অস্থায়িভাবে এক স্বীকারপত্রে সহি হয়। পরে ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ্চ পারীনগরে ফ্রান্সের রাজার পক্ষে দে লুস্ (Drouyn Lhuys) এবং ইংলণ্ডেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার পক্ষে মিঃ কাউলের (Mr. Cowley) দ্বারা এক স্বতন্ত্র পাকা একরারনামা স্বাক্ষরিত হইয়া নূতন সীমা নির্দ্ধারিত হয়। এক্ষণে উত্তর-পূর্ব্বে যে অংশকে বৃটিশ চন্দননগর বলে, উহা সেই সময় হইতেই ফরাসী অধিকার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে।



পুরাতন গির্জ্জার বহির্দ্বার



পুরাতন গির্জ্জার কবাট, ইহাতে ১৭২০ খৃঃ খোদিত আছে

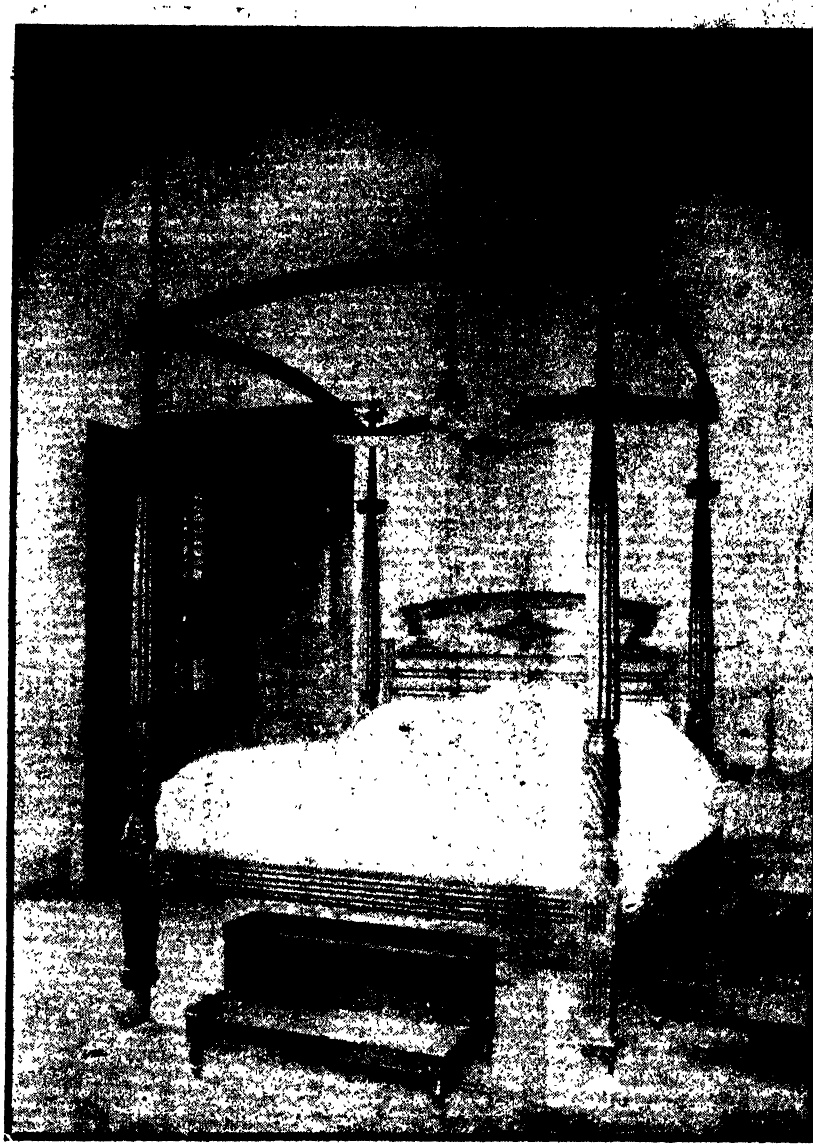
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

স্বর্ণযুগ

১৭৩১ খৃষ্টাব্দে ডুপ্লে চন্দননগরে আগমন করেন। ফরাসী বণিকসম্প্রদায়ের প্রথমাগমনের পর হইতে ডুপ্লের দেওয়ানী পদগ্রহণের সময় পর্য্যন্ত যে চন্দননগর একটি সামান্য উপনিবেশ বলিয়াই গণ্য ছিল, তাঁহার আগমনের সহিত যেন যাদুমন্ত্রপ্রভাবে তাহা অচিরে চিত্রফলকে প্রতিফলিত চিত্রের ন্যায় সুন্দর নগরীতে পরিণত হইল। ডুপ্লের পদার্পণকালে যে গঙ্গার ঘাটে পাচ ছয়খানি মাত্র সামান্য নৌকা অব্যবহার্য্যভাবে বাঁধা থাকিত, ৪ বৎসরের মধ্যে সেই স্থানে ৪০ খানিরও অধিক সমুদ্রগামী জাহাজের গতায়াত পরিদৃষ্ট হইতে লাগিল এবং ১০ বৎসরের মধ্যে উহা ৭২ খানিতে পরিণত হইয়াছিল। নিস্তব্ধ গ্রামের জঙ্গলপূর্ণ নিস্তব্ধ প্রান্তরের পরিবর্ত্তে সুপ্রশস্ত সুন্দর রাজবর্ত্ম-বেষ্টিত ন্যূনাধিক দ্বিসহস্র ইষ্টকনির্ম্মিত অট্টালিকাপরিশোভিত ও ১ লক্ষ অধিবাসীতে পূর্ণ নগর রচিত হয়। অন্তর ও বহির্ব্বাণিজ্যে চন্দননগরের খ্যাতি চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। সুরাট, জেডো, মোচা, জেড্ডা, বসোরা, চীন, তিব্বত, পারস্য প্রভৃতি স্থানের সহিত

অচিরে বাণিজ্যসম্বন্ধ স্থাপিত হইয়া যে সময় সুতানুটির সামান্য পর্ণ-কুটীর ভাঙ্গিয়া প্রাচীন কলিকাতার পত্তন আরম্ভ হইতেছিল, সেই সময় ইহা সম্পদের শীর্ষ-স্থানে উপনীত হয়; এক কথায় বাঙ্গালার সমস্ত য়ুরোপীয় উপনিবেশের মধ্যে ইহা প্রথম স্থান অধিকার করে। ইহাই চন্দননগরের গৌরব বা স্বর্ণযুগ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। (১)

তখনকার সময়েও চন্দননগর একটি স্বাস্থ্য-কর প্রিয় স্থান বলিয়া পরিগণিত হইত। ক্লাইভ ও হেষ্টিংসের সময় কলিকাতায় প্রায় ৩ হাজার ঘর মাত্র লোকের বসবাস ছিল। সুতরাং উহা হইতেও এরূপ স্থির করা যায় যে, তথাকার তুলনায় চন্দননগর জনবহুল নগর ছিল। (২)



ডুপ্লের ব্যবহৃত পর্য্যঙ্ক (চন্দননগর গবর্ণমেণ্ট ভবন হইতে)

চন্দননগরের এই অভ্যুদয়ের মূলে ছিল,—ডুপ্লের অসামান্য প্রতিভা, অলৌকিক সাহস, অদম্য উৎসাহ ও সর্ব্বোপরি ভারতীয়দের মন বুঝিবার ক্ষমতা। তাঁহার ব্যবসায়াভিজ্ঞ বুদ্ধির সহিত উক্ত গুণাবলীর সংমিশ্রণে তিনি এত শীঘ্র এতাদৃশ সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন।

(১) History of the French in India গ্রন্থ অবলম্বনে লেখক কর্ত্তৃক লিখিত "ডুপ্লের সময়ে চন্দননগর" প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

(২) The Early History and Growth of Calcutta.

তাঁহার নিজ সৌভাগ্য ও চন্দননগরের প্রভূত অর্থ-সম্পদ-বৃদ্ধির মূলে তাঁহার নিজ সম্পত্তিও যথেষ্ট সাহায্যের কারণ হইয়াছিল; এবং তাঁহার সকল উন্নতির জন্য তিনি তাঁহার অসাধারণ চতুরা পত্নীর সহকারিতা যথেষ্ট লাভ করিয়াছিলেন। (১)

ডুপ্লের সুশাসনগুণে শুধু চন্দননগরের নহে, পার্শ্ববর্ত্তী উপনগরসমূহের প্রজাপুঞ্জও ধনৈশ্বর্য্যমণ্ডিত হইয়াছিল

(১) The Calcutta Review, 1918.

এবং চন্দননগর সকল প্রকার সুখসমৃদ্ধিতে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়াছিল। সুবাদারের অত্যাচার ও তৎকালীন মহারাষ্ট্রীয় বর্গীর উপদ্রবও তিনি প্রশমনে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই সকল কারণেই উপরে উক্ত অত্যাচারপ্রপীড়িত বাহিরের লোকরা তখন দলে দলে আসিয়া এই উপনিবেশে আশ্রয় লইয়া ইহার শ্রী ও গৌরববৃদ্ধির সহায়ক হইয়াছিল।

ডুপ্লের রাজনীতি প্রসিদ্ধ ছিল। কেহ কেহ বলেন, তিনি যদি তাঁহার নীতি ও উদ্দেশ্যের অনুকূলে আবশ্যক সহায়তা প্রাপ্ত হইতেন, তাহা হইলে ভারতে এই বিশাল ইংরাজ অধিকারের মধ্যে কেবল ৫টি নগর মাত্র ফরাসী অধিকারে না থাকিয়া বোধ হয় ইহার বিপরীতই ঘটিত। (১) এমনও শুনা যায়, সেই নীতি ধরিয়াই আজ ইংরাজ ভারতের অধীশ্বর। ইংরাজের এই নীতিগ্রহণের আভাস ইতিহাসেও পাওয়া যায়। (২) ডুপ্লের উদারতা, দানশীলতা প্রভৃতি মনুষ্যজনোচিত গুণাবলীর অভাব ছিল না। তিনি সহরের অধিবাসিগণকে বিশেষ স্নেহের দৃষ্টিতে দেখিতেন। কথিত আছে, এখানে একটি বড় ঝড় হওয়ায় বহু লোক নিরাশ্রয় হয়; ঝড়ের পর দুর্ভিক্ষ হয়। এই সময় ডুপ্লে দুস্থ ও বিপন্ন লোকদিগকে অকাতরে প্রভূত অর্থ মুক্তহস্তে বিতরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রদত্ত অর্থে বহু বিপন্ন ব্যক্তির গৃহ পুনর্নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাঁহার দানশীলতা ও প্রজানুরাগের কথা সমগ্র বঙ্গে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার এই গুণাবলীর সহিত সৌন্দর্য্যপ্রিয়তাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি চন্দননগরের সুখৈশ্বর্য্যের সহিত উহার নানাপ্রকার শোভা-সংবর্দ্ধনেও যথেষ্ট যত্নবান্ ছিলেন। আজিকার চন্দননগরের শোভা-সৌষ্ঠব কতকটা তাহারই পরিচায়ক। তাঁহার দ্বারা নির্ম্মিত গরুটির অতুলনীয় প্রাসাদ ও সুন্দর বৃক্ষবীথি তাঁহার সৌন্দর্য্যানুভূতির শ্রেষ্ঠ উদাহরণ ছিল। এই প্রাসাদের কথা পরে বিবৃত হইবে।



ফরাসী প্রজাতন্ত্রের প্রতীক। পার্শ্বে ডুপ্লের সহিত যে আশাশোটা ব্যবহৃত হইত, তাহার চিত্র (চন্দননগর গভর্ণমেণ্ট ভবন হইতে)

এহেন ডুপ্লের স্মৃতিরক্ষাকল্পে, কি সরকার, কি অধিবাসী যাহা করিয়াছেন, তাহা এই —তাঁহার নামে গঙ্গার ধারে 'কে ডুপ্লে' নামে একটি রাজপথ, 'ডুপ্লেপটী' (বর্ত্তমান দিগলেস্‌পটী) নামে একটি পল্লী, একটি বিদ্যালয় ও প্রায় পৌনে ২ শত বৎসরের পরে তাঁহার নামে তাঁহার প্রস্তর-মূর্ত্তিসহ 'ডুপ্লে পার্ক' নামক একটি সাধারণ উদ্যান।

১৭৪১ খৃষ্টাব্দে ডুপ্লে পণ্ডিচারীতে বদলী হয়েন। তাঁহার

(১) প্রজাবন্ধু—২০শে কার্ত্তিক, সন ১২৮৯ সাল।

(২) The History of the British Empire in India [illegible] Nolan

চন্দননগরত্যাগের সহিত উপযুক্ত নেতৃহীন হওয়ায় চন্দননগরের সৌভাগ্য-রবি অস্তমিত হইতে আরম্ভ হয়। তাঁহার মত উৎসাহী ও দক্ষ শাসক আর কেহ চন্দননগরে আইসেন নাই। এ দিকে ইংরাজদিগের উন্নতির সহিত কলিকাতার উন্নতিতেও চন্দননগরের ব্যবসার বিশেষ হানি হয়। ঐ সময় উভয় নগরী উভয়কে ঈর্ষান্বিতভাবে দেখিতেছিল। ডুপ্লের সময়ে চন্দননগরের অধীনে কাশিমবাজার, ঢাকা, বালেশ্বর, জোগদীয়া ও পাটনায় যে সকল কুঠী সংস্থাপিত হইয়াছিল, চন্দননগরের অবনতির সহিত তাহাদিগেরও অবনতি ঘটে।

ডুপ্লের সময়ে সম্পদ্ ও নাগরিক শোভার সহিত ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় অধিবাসীদের দ্বারাও নগর সুশোভিত হইয়াছিল। তখন এখানে খৃষ্টান অধিবাসীও অনেক ছিল। সে সময়ে জেস্যুইট্ মিশনারীরা এখানকার প্রায় ৪ সহস্র লোককে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করাইয়াছিলেন। (১) তখন য়ুরোপীয় অন্য জাতিদের মধ্যে দিনেমার বণিকগণ এখানে বাস করিতেন। ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দেও দিনেমার কোম্পানীর অধ্যক্ষ মিঃ সোয়েডম্যান (Mr. Soetman) এই স্থানে থাকিতেন এবং তাঁহার নামে যে সব মালপত্র আসিত, তাহা এখানেই রাখা হইত। চন্দননগরের তদানীন্তন গভর্ণর মসিয়ে দে লেজরিট (Mons. de Lejrit) এখান হইতে মাল প্রেরণ বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিতেন। পরিশেষে কাশিমবাজারের ফরাসী এজেন্ট মসিয়ে ল'র



ডুপ্লে পার্কস্থিত ডুপ্লের প্রস্তরমূর্ত্তি

(Mons. Law) চেষ্টায় তাঁহারা শ্রীরামপুরে কুঠী স্থাপনের পরোয়ানা ও ২০ একর জমী সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয়েন। (১)

সহরের উন্নতির সহিত ক্রমে যে সকল শ্রীসম্পন্ন লোকের উদ্ভব বা বাস হইয়াছিল, তন্মধ্যে দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর নাম সর্ব্বপ্রধান। এই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি তৎকালে সম্ভ্রম ও সম্পদে এ প্রদেশের মধ্যে এক জন শ্রেষ্ঠ লোক ছিলেন, বলা যাইতে পারে। ইন্দ্রনারায়ণ ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজারাম খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে যশোহরের কোন স্থান হইতে অতি শৈশবে তাঁহাদের বিধবা মাতার সহিত চন্দননগরে—সম্ভবতঃ গোন্দলপাড়ায়—তাঁহাদের মাতুলালয়ে আগমন করেন। তাঁহারা উভয়েই পাঠশালায় বাঙ্গালা ও পারসী ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। কথিত আছে, বালক ইন্দ্রনারায়ণ লিখাপড়ায় আদৌ মনোযোগী ছিলেন না; ফরাসী সৈনিকদিগের পক্ষী শিকারের সময় তাহাদের অনুসরণ করিয়া মাঠে-জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইতে বড় ভালবাসিতেন। ফরাসী বীরগণের এইরূপ সাহচর্য্যের ফলে ক্রমে তিনি ফরাসী ভাষায় অভিজ্ঞতা লাভ এবং লক্ষ্যবেধ ও অশ্বচালনায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। ইহাই উত্তরকালে তাঁহার ভাগ্য-লক্ষ্মীলাভের কারণ।

ইন্দ্রনারায়ণ প্রথম ফরাসী কুঠীতে একটি সামান্য

---

(১) Chandernagore—The Calcutta Review, 1918.

(১) The Life and Times of Carey, Marshman and Ward Vol I. ও Good Old Days of Hon'ble John Company, Vol III.



১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে বর্গী কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত একটি অট্টালিকা

স্বার্থহানির সম্ভাবনা থাকায় ভ্রাতৃদ্বয়ের চেষ্টায় উভয় পক্ষের বিশ্বাস ও মিত্রতা অক্ষুণ্ণ থাকার পক্ষে বিশেষ সহায়তা হইয়াছিল এবং তদ্দ্বারা রাজারাম ও ইন্দ্রনারায়ণ উভয়েই স্ব স্ব প্রভুর নিকট যথেষ্ট প্রতিপত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ইন্দ্রনারায়ণের নাম ক্রমে বহু দূর পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। কথিত আছে, কৃষ্ণনগরাধিপতি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ইন্দ্রনারায়ণের নিকট স্বয়ং আসিয়া মধ্যে মধ্যে ৮।১০ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত ঋণ লইতেন।

চাকরী প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহার কার্য্যদক্ষতা দেখিয়া গুণগ্রাহী ফরাসী বণিকগণ কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাঁহাকে বঙ্গদেশের ফরাসী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ান বা প্রধান কর্ম্মচারীর পদ প্রদান করেন। এই সময় হইতে তিনি বেতনের পরিবর্ত্তে বিক্রয়লব্ধ লাভের উপর কমিশন পাইতে লাগিলেন। প্রতিভাশালী ইন্দ্রনারায়ণের ন্যায় সহায় পাওয়ায় কর্ম্মবীর দূরদর্শী ডুপ্লে অসাধ্যসাধন করিলেন। বলা বাহুল্য, ফরাসী বণিকদের শ্রীবৃদ্ধির সহিত ইন্দ্রনারায়ণেরও শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। প্রবাদ আছে, এই সময় তাঁহার বার্ষিক আয় ৬।৭ লক্ষ টাকা হয়।

রাজারাম উর্দ্দু ও পারসী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া, এই সময় মুরশিদাবাদে নবাব সরকারে একটি বড় চাকরী করিতেছিলেন। শুনা যায়, নবাব সরকার ও ফরাসী কোম্পানীর মনোমালিন্য বা বিবাদে উভয় সহোদরের

ইন্দ্রনারায়ণ নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন। ক্রিয়াকলাপে, জলাশয়, ঘাট, অতিথিশালা, দেব-মন্দির প্রতিষ্ঠা প্রভৃতিতে তিনি বিস্তর অর্থ ব্যয় করিতেন। নিরাশ্রয় অভ্যাগতকে তিনি যথেষ্ট দান করিতেন। চৌধুরী মহাশয়দের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে হইতে খলিসানীর বসু ও গোন্দলপাড়ার হালদার মহাশয়রাই এখানকার মধ্যে ধনী জমীদার বলিয়া পরিচিত ছিলেন। ইন্দ্রনারায়ণের



পুরাতন লক্ষ্মীগঞ্জের ঘাট

উন্নতি ও প্রতিপত্তিতে ঈর্ষান্বিত হইয়া হালদাররা প্রকাশ্য বিরুদ্ধাচরণে সাহসী না হইলেও, তাঁহাকে সামাজিক অপদস্থ করিবার অভিপ্রায়ে একটা মিথ্যা অপবাদ দ্বারা সমাজচ্যুত করেন। সেই সময় কবিবর ভারতচন্দ্র বর্দ্ধমান- রাজের ভয়ে বা কর্ম্ম-প্রার্থনায় (১) ইন্দ্রনারায়ণের আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু সামাজিক অপবাদ হেতু তিনি তথায় আহার করিতেন না, দিনেমার কোম্পানীর দেওয়ান গোন্দল পাড়ানিবাসী রামেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে ভোজন করিতেন।

কয়েক বৎসর সমাজচ্যুত হইয়া থাকিবার পর চৌধুরী মহাশয় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পরামর্শে তাঁহার চারিটি কন্যাকে চারি মেলের কুলীনসন্তানের হস্তে সমর্পণ পূর্ব্বক কুলীনসমাজকে আয়ত্ত করিয়া লুপ্ত সামাজিক মর্য্যাদার উদ্ধারসাধন, অধিকন্তু একটি পৃথক্ ব্রাহ্মণ-সমাজ গঠিত করিয়া তাহার দলপতি হয়েন।

এই হালদারদের সম্পর্কে ইন্দ্রনারায়ণের একটি মহত্ত্বের কথা বলিয়া তাঁহার কথা শেষ করিব। হালদার-গোষ্ঠীর অগ্রণী ছকড়ি বাবু আলিবর্দ্দী খাঁর সময়ে নবাব সরকারে রাজস্ব বিভাগে কাজ করিতেন। তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করায় তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। পরে রাজারাম ও ইন্দ্রনারায়ণের চেষ্টায় ডুপ্লের সাহায্যে নবাবকে অনুরোধ করায় উক্ত দণ্ডের পরিবর্ত্তে তাঁহার ১ লক্ষ টাকা জরিমানা হয় এবং ইন্দ্রনারায়ণ রাজারামের সাহায্যে সেই দিনই উহা প্রদান করিয়া তাঁহার উদ্ধারসাধন করেন। এই ব্যাপারের পর শ্রোত্রীয় ছকড়ি বাবু কৌলীন্য-মর্য্যাদা খর্ব্ব করিয়াও কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ তাঁহার এক কন্যাকে ইন্দ্রনারায়ণের পুত্র লালমোহনের হস্তে সমর্পণ করেন এবং যৌতুকস্বরূপ



কে ডুপ্লের পুরাতন দৃশ্য (ষ্ট্রাণ্ড রোড)

(১) বঙ্গভাষার লেখক Bharat Chandra Raya ও Bengal Magazine Vol. I.

নিজের গোষ্ঠীপতিত্ব ও চন্দননগরের মধ্যে এক বিস্তৃত ভূখণ্ড জামাতাকে প্রদান করিয়া তাহাকে "লালবাগান" নামে অভিহিত করেন।

ইন্দ্রনারায়ণ ফ্রান্সের সম্রাটের নিকট হইতে ২টি স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পরবৎসর চন্দননগর আক্রমণের সময় ক্লাইভের গোলা তাঁহার বিশাল বাসভবন



পুরাতন লক্ষ্মীগঞ্জ

চূর্ণ করিয়া দেয়। কথিত আছে, ইংরাজ-সেনা তাঁহার আবাস লুণ্ঠন করিয়া প্রায় ৬৫ লক্ষ টাকার অলঙ্কার ও নগদ টাকা লইয়া যায়। ইহার পর হইতেই চৌধুরী-বংশ দ্রুতবেগে হতশ্রী হইয়া যায়। এখন তাঁহাদের সবই গিয়াছে, আছে কেবল ইন্দ্রনারায়ণের প্রতিষ্ঠিত তাঁহার স্মৃতিবিজড়িত "চৌধুরী ঘাট", "নন্দদুলালের মন্দির" প্রভৃতির ভগ্নাবশেষ মাত্র। (১)

ইন্দ্রনারায়ণের ন্যায় প্রতিপত্তিশালী লোক সে সময় এখানে আর কেহ না থাকিলেও, দেওয়ান রামেশ্বর ও তাঁহার সহোদর রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়দের দানশীলতার কথাও শুনা যায়। ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তখন অনেক ধনবান্ ব্যবসায়ী ব্যক্তি ব্যবসার্থ এখানে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। চন্দননগরে লক্ষ্মীগঞ্জ নামক সুবিখ্যাত গঞ্জের সূত্রপাত এই সময়েই হয়।

(১) ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী—শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রবর্ত্তক, ফাল্গুন, সন ১৩২৮ সাল।

মহামতি ডুপ্লের শাসনকালের বা তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী সময়ের চন্দননগরের সামাজিক অবস্থার ইতিহাস না পাওয়া যাইলেও বুঝা যায় যে, সে সময় চন্দননগরের অন্যান্য বিষয়ের সহিত সামাজিক অবস্থাও তুলনায় যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছিল। কিন্তু তথনও ঘৃণিত দাস-ব্যবসা যথেষ্ট প্রচলিত ছিল। য়ুরোপীয় বণিকগণের হুগলী, চুঁচুড়া, শ্রীরামপুর ও কলিকাতার আড্ডার ন্যায় এখানেও রীতিমত দাসের আড়ত ছিল; দাসের হাট বসিত; নৌকা বোঝাই দাস-দাসী স্থানান্তরে প্রেরিত হইত। এমন কি, ছাগ-মেষের মত দাস-দাসীর আবাদ একটা লাভের ব্যবসা ছিল। সামান্য নামমাত্র মূল্য হইতে তখনকার ৩ শত মুদ্রা পর্য্যন্ত মূল্যে তাহারা বিক্রীত হইত। এই ব্যবসার প্রধান উৎসাহদাতা ছিলেন ফরাসী কোম্পানী। তাঁহাদের চেষ্টায় এখান হইতে দাস-দাসী খরিদ হইয়া মরিসস ও বুর্কোঁ দ্বীপের মানুষ-বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রেরিত হইত। বহুগুণসম্পন্ন দয়াবান ডুপ্লের চরিত্রও এ দোষে কলঙ্কিত ছিল এবং সেই সঙ্গে স্বনামপ্রসিদ্ধ ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীও এই দোষমুক্ত ছিলেন না। পাটনা হইতে ডুপ্লের এক দফায় ৩ শত ক্রীত-দাস-দাসী ক্রয় করিবার কথা জানা যায়। ফরাসী সরকার প্রত্যেক দাসখতের জন্য পাঁচ সিকা এবং মূল্যের উপর শতকরা ৫ টাকা শুল্ক লইতেন। (১)

১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের ১৭ই সেপ্টেম্বর চন্দননগরের তদানীন্তন গভর্ণর মসিয়ে মণ্টিনী (Mons. Montigny) আইন করিয়া ঘোষণার দ্বারা এই ব্যবসা রহিত করেন। তিনি প্রচার করেন, যে ব্যক্তি কোন দাসচালানকারীর সন্ধান দিবেন, তিনি দোষীর নিকট হইতে ৪০৲ টাকা পাইবেন এবং সেই ক্রীতদাসও ১০৲ টাকা পাইবে। "গভর্ণরের স্বাক্ষরিত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে কোন জাহাজের কাপ্তেন কোন দেশীয় লোককে লইতে পারিবেন না", এ হুকুমও সেই সঙ্গে প্রচারিত হয়। এই সব আইনের বাঁধাবাঁধি সত্ত্বেও ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে ২৭টি বালক-বালিকাকে ইংলির নিকট একখানি ডেলেঙ্গা নৌকা হইতে মিঃ হিউয়েট (Mr. Hewitt) উদ্ধার করেন। (১)

বাঙ্গালার কবিওয়ালা, যাত্রাওয়ালা প্রভৃতির প্রাদুর্ভাবের মূল অনুসন্ধান করিলে চন্দননগরের নাম আসিয়া পড়ে। এখানে কবির গানের বিশেষ প্রাদুর্ভাব হয়। কবিওয়ালা রাসু, নৃসিংহ, নিত্যানন্দ বৈরাগী, আনটুনী ফিরিঙ্গী প্রভৃতি এই স্থানের এবং এই সময়ের লোক। (২) তাঁহাদের সম্বন্ধে অন্যত্র বলা হইবে।

[ক্রমশঃ।

শ্রীহরিহর শেঠ।

(১) 'চন্দননগর ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা।'—শ্রীচারুচন্দ্র রায়। প্রবর্ত্তক, ফাল্গুন, সন ১৩২৮ সাল।

(১) Selections from the Calcutta Gazette 1789-97.

(২) Bengali Literature in the Nineteenth Century.

বিচার

[কবীর]

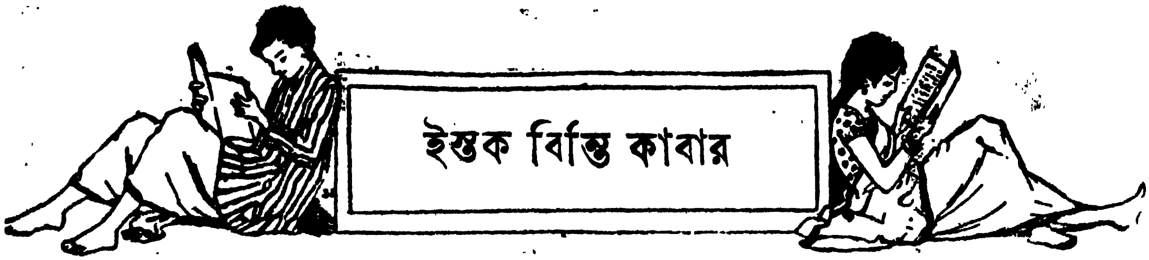
১

পুত্রের শির মুণ্ডন কালে
কত না যতন তোর
খুরের আঘাতে হয় ত বাছার
ঝরিবে নয়ন-লোর!

২

দুর্ব্বল ছাগ বলি দিস্ যবে
কাঁদে না ত তোর প্রাণ,
প্রিয়জন মিলি অকাতরে তারে
করিস্ মরণ দান!

শ্রীকমলকৃষ্ণ মজুমদার।



ইস্তক বিস্তি কাবার

১

চট্টগ্রাম জিলার 'বন্দরবন' সবে মাত্র মহকুমায় পরিণত হইয়াছে। একটি ইংরাজী বিদ্যালয়, একটি ডাকঘর, একটি থানা ও একটি ডাক-বাংলা বক্ষে ধারণ করিয়া বন্দরবন মহকুমা চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী পল্লীসমূহমধ্যে নিজ শুভাদৃষ্টজনিত গর্ব্ব প্রকাশ করিতেছিল। সেই সময় অনেক সুপারিশ ধরিয়া বন্দরবনের ইংরাজী বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শিক্ষক রামরূপ চট্টোপাধ্যায় নিজের শিক্ষকতা কার্য্যের উপর পোষ্টবাবুর কাযটিও যোগাড় করিয়া লইয়া বন্দরবনে আপন পরিবারবর্গকে আনিয়া রাখিতে সাহসী হইলেন। দ্বিতীয় শিক্ষকের বেতন ত্রিশ টাকা, ইহার উপর পোষ্টমাষ্টারের বেতন দশ টাকা পাইয়া রামরূপ বন্দরবনে একটি বাসা ভাড়া লইলেন এবং স্ত্রী, দশমবর্ষীয় পুত্র ও বৃদ্ধা পিতৃস্বসার খরচ-খরচা রাজার হালে চলিয়া যাইবে বলিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন। রামরূপ অবসরমত পোষ্ট অফিসের চাকরী করেন। পোষ্টমাষ্টার রামরূপ ও জনার্দ্দন পিয়ন লইয়াই বন্দরবনের পোষ্ট অফিস।

প্রাতেই পিয়ন ষ্টেশন হইতে শীলকরা ডাকের থলি আনিয়া রামরূপকে দেখিয়া লইতে বলে এবং রামরূপ থলি ও শীল দেখিয়া ঠিক আছে বলিলে পিয়ন পার্শ্বের কামরায় গিয়া তামাকু সাজিয়া রামরূপকে আনিয়া দেয়। রামরূপ ভি, পি, ইন্‌সিওর, মণিঅর্ডার ইত্যাদি খাতায় জমাখরচ লিখিয়া পিয়নের হাতে বিলির জন্য দিয়া গৃহে আইসেন এবং সত্বর স্নানাহার করিয়া অপরাহ্ণ চারিটা পর্য্যন্ত স্কুলের শিক্ষকতা করিয়া বাটী ফিরিবার কালে ডাকঘরের নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম করিয়া সায়ংকালে গৃহে ফিরেন; কিঞ্চিৎ জলযোগাদির পর বাসার বাহিরের ঘরে আসিয়া বসেন। এই সময়টা রামরূপের বড়ই ফাঁকা ফাঁকা ঠেকিত। কারণ, সন্ধ্যার পর বাড়ী ছাড়িয়া থাকিতে বিদেশে তিনি বড় সাহস করিতেন না। সেই জন্য বন্ধুগণকে সন্ধ্যার পর তাঁহার বাসায় আসিতে অনুরোধ করায় বন্ধুগণ আসিয়া রাত্রির প্রথম ভাগটির সদ্ব্যয়সাধন করিতেন। পরিবারবর্গ আসিলেও তাহাই চলিল।

বন্দরবনে রামরূপের তিন জন বিশিষ্ট বন্ধু ছিল। প্রথম ইংরাজী স্কুলের প্রধান শিক্ষক ইয়াংচো। ইয়াংচো জাতিতে আরাকানবাসী মগ। বাঙ্গালীর সঙ্গে মিশিয়া তিনি বাঙ্গালাভাষা বেশ শিখিয়াছিলেন। দ্বিতীয় রাধানাথ ঘোষ; বনবিভাগে চাকরী করেন। তৃতীয় যতীন্দ্রনাথ লাহিড়ী; বন্দরবন থানার সব ইন্‌স্পেক্টার। যতীন্দ্রের নিবাস ঢাকা জিলায় ও যতীন্দ্র রামরূপের সহপাঠী। পাঠাবস্থা অতিক্রম করিলে রামরূপ ও যতীন্দ্রের মধ্যে কিছুদিন ছাড়াছাড়ি হইয়াছিল, কিন্তু কর্ম্মস্থলে পুনর্মিলিত হওয়ায় রামরূপ বড়ই আনন্দিত হইয়াছিলেন। আপনাকে বন্দরবনের একাধিপতি জ্ঞান করিলেও যতীন প্রতিদিন সন্ধ্যার পর রামরূপের বাসায় আসিয়া গল্প-গুজব করিয়া যাইত। এইরূপে রামরূপের দিনগুলি বেশ সুখেই কাটিতে লাগিল।

২

প্রথমে দৈনন্দিন কার্য্যাবলীর বিবৃতি, তৎপরে সংসার-কাহিনী, তৎপরে পরচর্চ্চা, তৎপর গল্প-গুজব ইত্যাদি যখন একঘেয়ে হইয়া উঠিল, তখন সন্ধ্যার পর সময় কাটাইবার অন্য কোন সুন্দর উপায় না পাইয়া রামরূপ এক জোড়া তাস কিনিয়া রাখিলেন। ইয়াংচো ভিন্ন অপর বন্ধুত্রয় তাস খেলা বিশেষরূপেই অবগত ছিলেন। ইয়াংচোরও শিখিতে বিলম্ব হইল না। ক্রমে প্রতি সন্ধ্যায় রামরূপের বাসায় তাস খেলা এরূপ অধিক প্রসার বৃদ্ধি করিল যে, ঝড়-বৃষ্টি বজ্রাঘাতেও তাসের মৌতাতগ্রস্ত বন্ধু কয়েকটি যথাকালে উপস্থিত থাকিয়া আড্ডা জমায়েত রাখিতেন।

আজ শনিবার। তাসের আড্ডা বেশ জমিয়া গিয়াছে। ইয়াংচো ও রামরূপ এক পক্ষে থাকিয়া এরূপ হারিয়াছেন যে, প্রতিপক্ষ যতীন ও রাধানাথ "বটপত্র" ধরিবার স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিতেছে। জগতে দর্প পতনের মূল, ইহাই প্রমাণ করিবার জন্য পরক্ষণেই রামরূপ ও ইয়াংচোর দিকে তাসের এরূপ "পড়তা" পড়িল যে, দেখিতে দেখিতে প্রতিপক্ষে ধৃত পাঞ্জা-ছক্কা উঠিয়া গিয়া একখানি মাত্র পাঞ্জা অবশিষ্ট রহিল। পাঞ্জাখানিও টলমল, কেন না, রামরূপের দিকে চারিখানা "কাগজ" জমিয়া গেল।

পুনরায় তাস বণ্টিত হইল। যতীন্দ্র ও রাধানাথ অনেক "প্রাতঃস্মরণীয়" নাম উচ্চারণ করিলেও হাতে তাস ভাল আসিল না। ত্ব'কুড়ি সাতের খেলা রাখাই দায়। যাহা হউক, খেলা আরম্ভ হইল। রামরূপ ইস্তক কাবার করিলেন, কিন্তু যতীন জিতের সময় যে সকল বিদ্রূপবাণ ব্যবহার করিয়াছিল, এইবার সেইগুলি ফিরিয়া আসিবে, এই চিন্তায় ক্রীড়াকৌশলে এতই নিবিষ্টমনা হইয়াছিল যে, রামরূপের "ইস্তক কাবার" ধ্বনি তাহার কর্ণে পৌছিল না। ক্রীড়াশেষে উভয় পক্ষই পিট গণিতে লাগিল। রামরূপ গণনা শেষ করিয়াই কাগজ চারিখানা ও পাঞ্জাটি যতীনের মুখে বুলাইয়া ত্বই একটি মধুর বুলির সহিত উঠাইয়া ফেলিল।

যতীন বলিয়া উঠিল, "খবরদার, এই দেখ, ত্ব'কুড়ি সাতের খেলা কাঁটায় কাঁটায় হয়েছে।"

রামরূপ বলিল, "অত চালাকি কেন, ইস্তক কাবারের খেলা চাই।"

এই ইস্তক কাবার লইয়া মহা গণ্ডগোল বাধিল। যতীন কিছুতেই স্বীকার করিল না যে, রামরূপ ইস্তক কাবার করিয়াছে। ইয়াংচো ও রাধানাথ উভয়েই বলিল, রামরূপ ইস্তক কাবার করিয়াছে। কিন্তু যতীন শুনিল না। এইবার খেলার সময় যতীন অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়াছিল, তাহার উপর এই বাদানুবাদে এত উত্তেজিত হইল যে, তাহার নিম্নশ্রেণীর আসামী ও কনষ্টেবলগণের প্রতি যে ভাষা ব্যবহার করিত, সেই ভাষায় রামরূপকে অতি কদর্য্য গালি প্রদান করিতে লাগিল। ইয়াংচো ও রাধানাথের মধ্যবর্ত্তিতা বিফল হইতে লাগিল। এমন সময় দারুণ কোপে রামরূপ হঠাৎ বলিয়া ফেলিল, "ষ্টুপিড্, বেরো এখান থেকে, আর কখনও এখানে আসিস্ নি।"

একটা সদর থানার পদস্থ কর্ম্মচারী, একটা সহরের দিনত্বনিয়ার মালিক, সহস্র সহস্র অধিবাসীর ভীতিপ্রসূত সম্মানে সংবর্দ্ধিত, দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ ইন্স্পেক্টর এরূপ অপমানে দারুণ ব্যথা পাইয়া নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেলে, ভয়ঙ্কর ঝটিকা-অবসানে তূষ্ণীর ন্যায় কিছুক্ষণ সেই মহলে নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল। সহসা রামরূপের গৃহমধ্য হইতে একটা আর্ত্তনাদ ও রামরূপের জ্যেষ্ঠপুত্র অনিলের দ্রুত আগমনে সে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হইল। অনিল হাঁফাইতে হাঁফাইতে আসিয়া বলিল, "রাঁধ্তে রাঁধ্তে কড়া উল্টে মা'র কপাল গরম তেলে পুড়েছে, বাবা, শীগ্গির এস।" অমনই সকলে অন্তঃপুরে দৌড়িয়া গিয়া দেখিল যে, রামরূপের স্ত্রী চুল্লীর পার্শ্বে পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতেছে, গরম তৈলে সমস্ত কপাল, মস্তকের ও দেহের অনেক স্থল পুড়িয়া গিয়াছে এবং রামরূপের পিতৃস্বসা চুণ ও নারিকেলতৈল গুলিয়া প্রলেপ দিবার উপক্রম করিতেছে। যতীনের উপর ক্রোধের উপশম হইতে না হইতেই এই আকস্মিক বিপদে রামরূপ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পিতৃস্বসার হস্ত হইতে সেই পাত্রটি লইয়া তাড়াতাড়ি ক্ষতস্থলে প্রলেপ দিতে বসিল। ইয়াংচো রাধানাথকে ডাক্তারের বাড়ী পাঠাইয়া দিয়া তীব্রযন্ত্রণাপীড়িতাকে বাতাস দিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে ডাক্তার আসিয়া ঔষধাদির ব্যবস্থাপূর্ব্বক রামরূপকে অভয় দিয়া চলিয়া গেলে ও জ্বলনের কিঞ্চিৎ প্রশমন ঘটিলে রামরূপ ইয়াংচো ও রাধানাথকে লইয়া বাহিরের ঘরে আসিয়া বসিল। সামান্য খেলার জন্য হঠাৎ এরূপ আত্মহারা হইয়া সহপাঠী যতীনকে বাসা হইতে তাড়াইয়া দিয়া অতি গর্হিত কায করিয়াছে বলিয়া রামরূপ অনুতাপ করিতে লাগিল এবং সেই রাত্রিতেই ইয়াংচো ও রাধানাথকে সমভিব্যাহারে লইয়া গিয়া যতীনের থানায় উপস্থিত হইল। ইচ্ছা যে, ক্ষমা চাহিয়া যতীনের ক্রোধের নিরাসসাধন করিয়া পূর্ব্বমিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখিবে। কিন্তু সে থানায় গিয়া দেখিল, যতীন অফিসঘরে নাই। যতীনের সহিত

দেখা করিবার অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু যতীন আসিল না। পরদিন প্রাতঃকালে রামরূপ থানায় গিয়া যতীনকে ধরিল এবং পূর্ব্বরাত্রির ঘটনার জন্য ক্ষমাভিক্ষা করিল, কিন্তু পুলিশের ইন্‌স্পেক্টর "হাঁ" কিংবা "না" কিছুই না বলিয়া অফিসঘর হইতে উঠিয়া গেল। রামরূপ বুঝিল, যতীনের রাগ পড়ে নাই।

পরদিন প্রাতঃকালে রামরূপ পোষ্ট অফিসে বসিয়া খাতা লিখিতেছিল। এমন সময় ডাকপিয়ন জনার্দ্দন ষ্টেশন হইতে শীলমোহর করা ডাকের থলি লইয়া উপস্থিত হইল। জনার্দ্দন পুরাতন ও বিশ্বাসী পিয়ন। সে প্রতিদিন প্রাতঃকালে ডাকের থলি আনিয়া রামরূপের সম্মুখে টেবলে রাখিয়া দেয় এবং রামরূপ থলিটি ও শীল ঠিক আছে বলিলে, পার্শ্বের কুঠরীতে গিয়া তামাকু সাজিয়া আপনি সেটি ভাল করিয়া ধরাইয়া রামরূপকে দিয়া থাকে। তাহার পর রামরূপ চিঠিপত্র, মনিঅর্ডার, পুলিন্দা প্রভৃতি বিলি হইবার জন্য পিয়নকে বুঝাইয়া দিলে, পিয়ন ডাকঘরের ছাপ মারিয়া বিলি করিবার জন্য লইয়া যায়। আজ রামরূপ নিবিষ্টচিত্তে পোষ্ট অফিসের খাতায় একটা ঠিক মিলাইবার জন্য যখন একাগ্রমনে খাতা দেখিতেছিল, সেই সময় জনার্দ্দন আসিয়া ডাকের থলি সম্মুখে রাখিয়া দাঁড়াইল। রামরূপ তখন হিসাবে মগ্ন। পিয়ন বলিল, "বাবু, ব্যাগ দেখে নিন।"

রামরূপ না দেখিয়াই বলিল, "ঠিক আছে, যা।"

পিয়ন পার্শ্বের কামরায় গিয়া তামাকু সেবন করিয়া রামরূপের হাতে হুঁকা দিলে,তাম্রকূটের ধূম বুদ্ধির গোড়ায় লাগায় হিসাব ঠিক মিলিয়া গেল; রামরূপ হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। তাহার পর সে তামাকু নিঃশেষ করিয়া ডাকের থলিটির শীল ভাঙ্গিল। শীল খুলিয়া একে একে সমুদায় চিঠিপত্র, মনিঅর্ডার, ইনসিওর, পুলিন্দা মিলাইয়া লইতে গিয়া দেখিল, একখানা ১ শত ৫০ টাকার ইনসিওর মিলিতেছে না। রামরূপের সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল, দরদর ধারে ঘর্ম্ম ঝরিতে লাগিল। সে বার বার হিসাব দেখিল, কতবার মেলের থলিটি ঝাড়িয়া দেখিল, কিন্তু ইনসিওরের খামটি মিলিল না। হঠাৎ থলিটির এক দিকে রামরূপের দৃষ্টি পড়িলে রামরূপ দেখিল যে, মেলের থলিটির এক যায়গা কাটা। দেখিয়াই রামরূপের মাথা ঘুরিয়া উঠিল। রামরূপ পিয়নকে ডাকিল ও থলির কর্ত্তিত অংশটি দেখাইল। পিয়ন সদন্তে বলিল, "তুমি ত দেখে বল্লে ঠিক আছে, তবে ত গেছি। আমি দায় খালাস।"

রামরূপ বলিল, "হাঁ, তুই ত জানিস্ যে, না দেখে আমি তোর উপর বিশ্বাস করেই বলেছি 'ঠিক আছে', আমি কি সত্যই দেখেছিলুম ?"

"ও সব জানি না, মশাই, আমি দায়ে খালাস" বলিয়া জনার্দ্দন পিয়ন শনৈঃ শনৈঃ গৃহ হইতে বহির্গমন করিবার উদ্যোগ করিলে, রামরূপ উহাকে ধরিয়া বলিল, "বল্ ব্যাটা, ডাকের থলি কাটা কেন ? আর ১ শত ৫০ টাকার ইনসিওর কোথায় ?"

পিয়ন "আচ্ছা দেখাচ্ছি কে চোর", বলিয়াই সবলে হাত ছিনাইয়া লইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে সে ঘর হইতে দৌড়িয়া বাহির হইয়া গেল।

পিয়ন চলিয়া গেলে রামরূপ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। তাহার বক্ষঃ স্পন্দিত হইতে লাগিল। তাড়াতাড়ি পোষ্ট অফিসের কামরা বন্ধ করিয়া রামরূপ ইয়াংচোর বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইল এবং তাহাকে সকল ঘটনা যথাযথ বিবৃত করিল। ইয়াংচো বলিল, "চল, যতীনের কাছে যাই, সে উপায় বলিয়া দিবে।"

রামরূপ যতীনের নিকট যাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিল। ইয়াংচো বলিল, "সে তাসের ঝগড়ার জন্য কি এত কালের বন্ধু, বন্ধুর বিপদে সাহায্য না করিয়া থাকিতে পারে ? যতীন ত' ছেলেমানুষ নয় যে, সে সামান্য ব্যাপার মনে ক'রে রেখেছে; কোন ভয় নাই। চল, আমিও সঙ্গে যাই।"

এই বলিয়া ইয়াংচো রামরূপকে টানিয়া লইয়া থানায় উপস্থিত হইল। উহারা গিয়া দেখিল, পিয়ন পূর্ব্বেই থানায় উপস্থিত হইয়াছে। উহারা থানার অফিসঘরে পৌছিতেই জনার্দ্দন পিয়ন বলিয়া উঠিল, "এই যে মাষ্টার বাবু, নিস্পেক্টর বাবু, আপনি বিচার কর।"

ইয়াংচো আদ্যোপান্ত যথার্থ ঘটনা বিবৃত করিয়া যতীনের পরামর্শ চাহিলে, যতীন বলিল, "আচ্ছা, আগে আমায় লিখতে দিন" এই বলিয়া ঘাড় গুঁজিয়া থানার

বহিতে লিখিতে লাগিল। লিখা শেষ হইলে জলদগম্ভীর স্বরে হাঁকিল, "পাঁড়ে! পিয়নের হাতে হাতকড়ি লাগাও।" পাঁড়ে তখন দীর্ঘগুম্ফ মোচড়াইতে মোচড়াইতে পার্শ্ববর্ত্তী ঘর হইতে আসিয়া পিয়নের হাতে হাতকড়ি লাগাইলে, যতীন বলিল, "আমি এখনই তদারক করিব।"

এই বলিয়া জমাদার ও পিয়নকে লইয়া যতীন পিয়নের গৃহে উপস্থিত হইয়া খানাতল্লাসী করিল, কিন্তু কিছুই পাইল না। থানায় ফিরিয়া আসিয়া যতীন রামরূপের দিকে চাহিয়া বলিল, "এ কথা কি সত্য যে, জনার্দ্দন পিয়ন আপনার নিকট থলি রাখিবার পর আপনি ঠিক আছে বলিলে তবে চলিয়া যায়?"

রামরূপ বলিল, "হাঁ, আমি পূর্ব্ববিশ্বাসে না দেখিয়াই বলিয়াছিলাম।"

যতীন গম্ভীর স্বরে বলিল, "আপনার সাক্ষ্য আছে?"

রামরূপ বলিল, "না, তখন আর কেহ ছিল না।"

যতীন তখন পিয়নকে জিজ্ঞাসা করিল, "এ কথা কি সত্য যে, পোষ্টমাষ্টার বাবু থলি না দেখিয়াই বলিয়াছিলেন, থলি ঠিক আছে?"

জনার্দ্দন উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "না, নিস্পেক্টর বাবু, উনি বেশ ক'রে থলি দেখে তবে বলেছেন। ও থলির ইন্‌সিওর উনি গাফ কোরে গরীবকে ফাঁসাচ্ছেন।"

এই উত্তর শুনিয়া ক্রোধে রামরূপের চক্ষু আরক্তবর্ণ হইল। রামরূপ চীৎকার করিয়া সক্রোধে বলিল, "কি সয়তান! আমি—"

যতীন বাধা দিয়া বলিল, "পোষ্টমাষ্টার মহাশয়, স্মরণ রাখিবেন, এটা থানা। পাঁড়ে! পিয়নের হাতকড়ি খোল।"

পাঁড়ে পিয়নকে ছাড়িলে, যতীন হুকুম দিল, "এই হাতকড়ি এই বাবুর হাতে লাগাও, আমি উহাকে ধরিলাম।"

দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ ইন্‌স্পেক্টরের আদেশ শুনিয়া রামরূপ বজ্রাহতের ন্যায় স্তম্ভিত হইল এবং ইয়াংচো উপহাস মনে করিয়া হাসিয়া উঠিল। কিন্তু পাঁড়ে আদেশ অনুযায়ী যখন হাতকড়ি সত্য সত্যই রামরূপের দুই হাতে পরাইতে লাগিল, ইয়াংচো তখন তাহাকে সরাইয়া দিয়া "ও কি হে, ঠাট্টা বোঝ না—খোল, খোল" বলিয়া উভয়ের মধ্যে গিয়া দাঁড়াইল। ইহাতে পাঁড়ে একটু সরিয়া দাঁড়াইলে যতীন উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "থানায় ঠাট্টা চলে না। পাঁড়ে, হুকুম তামিল কর, নইলে গাফলতি হইবে।"

পাঁড়ে রামরূপের হাতে হাতকড়ি লাগাইয়া দিল। বিস্মিত ইয়াংচো তখন ব্যাপার হৃদয়ঙ্গম করিল। বুঝিল, ইহা যতীনের উপহাস নহে, ইহা একটি জীবন্ত সত্য। তখন ইয়াংচো বলিল, "যতীন! তুমি কি মনের কোণেও ঠাঁই দিতে পার যে, রামরূপ কখনও এরূপ অপরাধ করিতে পারে? রামরূপকে ছাড়িয়া দাও। অমনি না ছাড়, আমি জামিন হইতেছি, ছাড়িয়া দাও।"

যতীন বলিল, "অপরাধ করিতে পারে কি না পারে, সে বিচার হাকিম করিবেন। আর এ মামলায় আইনে জামিন লিখে না, আর আমি সেই আইন মানিতে বাধ্য; সুতরাং আমি উহাকে সদরে চালান দিব, সেখানে নির্দ্দোষ প্রমাণিত হইলেই অব্যাহতি। থানার ইস্তক এইখানেই কাবার।"

এ কথা শুনিয়া ইয়াংচোর বুঝিতে বাকী রহিল না যে, যতীন সেদিনকার সামান্য বিবাদের এই নিদারুণ প্রতিহিংসা লইতেছে। বিপদের উপায় নির্দ্ধারণের জন্য অসন্দিগ্ধভাবে রামরূপকে ইয়াংচোই থানায় আনিয়া তাহার এই অমানুষিক নির্য্যাতনের কারণ হইয়াছে ভাবিয়া ইয়াংচো আপনাকে শত ধিক্কার দিল, আর সানুনয়ে যতীনকে অনেক বুঝাইল; কিন্তু কোন ফল ফলিল না। প্রতিহিংসার উন্মত্ত আইনের দারুণ আজ্ঞাবহ ইন্‌স্পেক্টর কোন কথা শুনিল না। রামরূপকে সদরে চালান দিল।

ইয়াংচো ও রাধানাথ পরামর্শ করিয়া স্থির করিল যে, রামরূপের পরিবারবর্গকে চট্টগ্রামে উহাদের নিজ গ্রামে রাখিয়া আসিয়া উভয়ে মিলিয়া মোকর্দ্দমার তদ্বির করিবে।

৩

রাধানাথ এই নিদারুণ সংবাদ যখন রামরূপের বাসায় গিয়া দিল, রামরূপের স্ত্রী তখন আছাড় খাইয়া মাটীতে

পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। নয়ন-জলে মেদিনী সিক্তা হইল, কিন্তু কঠোরতর নিয়তির অন্তর সিক্ত হইল না। পিসীর হাহাকার, স্ত্রীর আর্ত্তনাদ, পুত্রের উচ্ছ্বাসময় ক্রন্দন সান্ত্বনায় প্রশমিত হইবার নহে। একের সামান্ত অসাবধানতায় একসঙ্গে এতগুলি অসহায়ের এ ভীষণ শাস্তি কোন্ পাপের ফলে? সর্ব্বশক্তিমান্ নিয়ন্তাই জানেন, এ বিধান মানবের না দৈবের।

রাধানাথ ফরেষ্ট অফিস হইতে ছুটী লইয়া রামরূপের পরিবারবর্গকে চট্টগ্রামে পৌছিয়া দিবার জন্য নৌকা-যোগে যাত্রা করিল। কিয়দ্দুর যাইতে না যাইতেই রামরূপের পিতৃস্বসার বিসূচিকা রোগ দেখা দিল। চিকিৎসক বা ঔষধ নদীবক্ষে নৌকার উপর কিরূপে পাওয়া যাইবে? রোগ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, এবং দিনেকের মধ্যেই বৃদ্ধা সেই নৌকার উপরই সকল দুঃখের হাত হইতে চিরকালের জন্য অব্যাহতি লাভ করিলেন।

রাধানাথের বিপত্তির বর্ণনা দুঃসাধ্য। একটি স্ত্রীলোক ও একটি বালককে নৌকায় রাখিয়া কিরূপেই বা বৃদ্ধার মৃতদেহের সৎকার করা যায়, ইহা ভাবিয়া রাধানাথ আকুল হইল। নদীর স্রোতে ভাসাইয়া দিয়া বৃদ্ধার মৃতদেহের অবমাননা করা রাধানাথের পক্ষে সম্ভবপর নহে। রাধানাথ স্থির করিল যে, নিকটবর্ত্তী কোন পল্লী দেখিলেই নৌকা তীরে রাখিয়া, পল্লীবাসিগণের সাহায্যে বৃদ্ধার দেহের সৎকার করিবে। একটি পল্লী নিকটস্থ হইলে রাধানাথ মাঝিকে বলিয়া নৌকা তীরে লাগাইল, এবং রামরূপের স্ত্রী ও পুত্রকে নৌকায় রাখিয়া লোকজনের সন্ধানে চলিল। বাঙ্গালী জাতির শ্মশান-বন্ধু ব্যতীত অপর বন্ধু পর্য্যাপ্ত মিলিয়া থাকে, তাই অতি কষ্টে ও অর্থের লোভে দুই জন মাত্র সাহায্যকারী প্রাপ্ত হইয়া রাধানাথ সেই রাত্রিতে মৃতের সৎকার করিয়া যখন ফিরিয়া আসিল, তখন রজনী অবসানো-মুখ। তথায় আসিয়া রাধানাথ নৌকা দেখিতে পাইল না। রাধানাথের বুকটা ধড়াস্ করিয়া উঠিল। তবে কি স্থানভ্রম হইয়াছে? না, ঐ যে সেই বটগাছ, তাহার পার্শেই ত সেই খেজুরগাছ—ঠিক ত' ইহার সম্মুখেই নৌকা ছিল! নৌকা কোথা গেল? মাঝি কি অপর স্থানে লইয়া গিয়াছে? তাহাই হইবে; একটু এদিক্ ওদিক্ দেখিলেই পাওয়া যাইবে। এইরূপ ভাবিয়া রাধানাথ কূলে কূলে দুই মাইল পথ অনুসন্ধান করিল, কিন্তু নৌকার কোনও সন্ধান পাইল না।

ধূসর অঙ্গাবরণ-ধারিণী ঊষাদেবী রাধানাথের তমসাচ্ছন্ন হৃদয়ে আশালোকের উন্মেষ করিলে রাধানাথ ভাবিল, এইবার দিবালোকে নৌকার সন্ধান করা কঠিন হইবে না। কিন্তু মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের খরকরও যখন নৌকাখানি রাধানাথের নেত্রপথে উপস্থিত করিতে পারিল না, তখন রাধানাথ বুঝিল যে, বিপদ্ কখনও একাকী আইসে না। কিন্তু এক্ষণে উপায়? ক্ষুধাতৃষ্ণায় দেহ অবসন্ন, ঘোর দুঃখে চিত্ত বিষন্ন, হতাশায় হৃদয় আচ্ছন্ন; রাধানাথ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া এক গাছ-তলায় মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। নদীগর্ভে উদাস দৃষ্টি, হৃদয়ে উদাস চিন্তা। এমন সময় ও কি! কি একটা নদীর স্রোতে ভাসিয়া আসিতেছে না? চিত্তের সমুদায় বৃত্তি, শরীরের সমুদায় চেষ্টা বিস্ফারিত নয়নদ্বয়ে ন্যস্ত করিয়া রাধানাথ দেখিল যে, একটা মৃত-দেহ জলে ভাসিয়া আসিতেছে। রাধানাথের বক্ষঃ ঘন ঘন স্পন্দিত হইতে লাগিল। মৃতদেহ স্ত্রীলোকের! তবে কি তাহাই হইয়াছে? যে চিন্তার ছায়ামূর্ত্তি রাধানাথের বক্ষের কক্ষে উঁকি মারিতে না মারিতে রাধানাথ সবলে তাড়াইয়া দিয়াছে, তাহাই কি বাস্তবে পরিণত হইয়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত? রাধানাথ আর থাকিতে পারিল না। নদীবক্ষে ঝম্প দিয়া তটের নিকটে সেই মৃতদেহ আনিয়া দেখিল, একটি স্ত্রীলোক এক বালককে মৃত্যুদৃঢ়করে আঁকড়াইয়া আছে। জলপ্রবাহ দূরে যাউক, মৃত্যুও বুঝি সেই অভাগিনীর প্রাণসম পুত্রকে মাতার স্নেহময় বক্ষ হইতে বিচ্যুত করিতে পারে নাই। চিনিতে বিলম্ব হইল না। এ যে রামরূপের স্ত্রীপুত্র! আর রাধানাথের ভাবিতে হইবে না। রাম-রূপের যথাসর্ব্বস্বের ভাবনা ভগবান্ স্বয়ংই ভাবিয়াছেন। তিনি নিরাশ্রয় মাতাপুত্রের চির-আরামপ্রদ আশ্রয়বিধান করিয়াছেন!

ক্রমে ক্রমে এক এক জন করিয়া অনেক লোক তথায় জমায়েত হইল। তাহার মধ্যে এক জনকে

রাধানাথ চিনিল। সে সেই নৌকার মাঝি। তাহার নিকট হইতে সে অবগত হইল যে, সেই রাত্রিতে খাঁড়ির মধ্যে হঠাৎ জোয়ার আসিয়া লঙ্গরের কাছি ছিঁড়িয়া নৌকা ভাসাইয়া লইয়া যায় ও মাঝি সামলাইতে না পারায় কিছু দূরে নৌকা জলমগ্ন হয়। মাঝি কোন প্রকারে সাঁতরাইয়া বাঁচিয়াছে মাত্র; আরোহীদিগের কেহই বাঁচিয়া নাই। মাঝি কিয়ৎকাল হা-হুতাশ করিয়া নৌকার সন্ধানে ছুটিল।

রাধানাথের করুণ কাহিনী সমাগত সকলের হৃদয়ে সহানুভূতি জাগাইয়া দিলে, সমবেত চেষ্টায় রাধানাথ রামরূপের স্ত্রীপুত্রকে চিতানলে ভস্মসাৎ করিয়া রামরূপের মোকর্দ্দমার তদ্বির করিতে ছুটিল।

আজ চট্টগ্রামের পুলিসসাহেবের অফিসে ভয়ঙ্কর সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। মেলপুলিন্দা চুরী ধরা পড়িয়াছে। অনেকগুলি কর্ম্মচারী একটা কামরায় বসিয়া মেলপুলিন্দা চুরীর মামলার কথাবার্ত্তা কহিতেছে। এমন সময় যতীন তথায় প্রবেশ করিল। হো হো করিয়া সকলে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া যতীনের করমর্দ্দন-পূর্ব্বক তাহার কৃতকার্য্যতার প্রশংসা করিল। "পুলিসসাহেব" এরূপ চুরী ধরিবার জন্য যতীনের অনেক প্রশংসা করিয়াছেন এবং যতীন এই অপরাধটিকে ধরায় তাহার পদোন্নতি যে অবশ্যম্ভাবী, তাহা শুনাইয়া দিলেন। ইহার পর যতীন উহাদিগকে যেন মনে রাখেন,এই অনুরোধ দন্তবিকাশসহ তাহারা করিতে লাগিল। যতীন হাস্যাননে সকলকে তাহাদের সদিচ্ছার জন্য ধন্যবাদ দিয়া আদালতে চলিল।

৪

রাধানাথ চট্টগ্রামে পৌছিয়া ফৌজদারী আদালতে উপস্থিত হইল। একে একে অনেক আসামী কাঠগড়ায় আসিয়া দাঁড়াইল,কিন্তু রামরূপকে সে দেখিতে পাইল না। পেস্কার মহাশয়ের নিকট তদ্বির করিয়া জানিল যে, রামরূপের তদন্ত এখনও শেষ হয় নাই, আসামী চট্টগ্রামের জেলে। রামরূপের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য রাধানাথ জেলখানায় যাইবার উপক্রম করিয়া বাহিরে আসিবামাত্র যতীন হন্ হন্ করিয়া রাধানাথের সম্মুখে আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "কি ভায়া! মামলার তদ্বিরে না কি? বেশ, বেশ!"

রোষে, ক্ষোভে, উত্তেজনায় রাধানাথের মুখ হইতে কথা উচ্চারিত হইবার পূর্ব্বেই যতীন পাশ কাটাইয়া সরিয়া গেল।

রাধানাথ আদালতের ব্যাপার [illegible]গত নহে; বিশেষতঃ চট্টগ্রামে কোন জানা-শুনা লোক না থাকায় বড়ই বিপদে পড়িল। সে ভাবিল, জেলে গিয়া রামরূপের সহিত সাক্ষাৎপূর্ব্বক কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইবে। তৎপরে লোকজনকে জিজ্ঞাসা করিয়া রাধানাথ জেলের ফাটকে পৌছিলে দেখিল, যতীন জেল হইতে বাহিরে আসিতেছে। চেখোচোখি হইলেই রাধানাথ মুখ ফিরাইয়া লইল। যতীনের ওষ্ঠাধরে হাসির বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল।

রাধানাথ আসামীর সহিত সাক্ষাতের জন্য জেলারের নিকট আবেদন করিল, কিন্তু জেলার মহোদয় আদেশ দিলেন যে, বর্ত্তমান সময়ে তদন্ত শেষ না হওয়া অবধি রামরূপের সহিত সাক্ষাৎ হইবে না। রাধানাথ বুঝিল, ইহাও যতীনের কারসাজি। হতাশ হৃদয়ে সে আবার আদালতে আসিয়া পেস্কারের নিকট হইতে মোকর্দ্দমার তারিখ জানিয়া বন্দরবনে ফিরিয়া আসিল।

ইয়াংচো সাগ্রহে রামরূপের প্রত্যাবর্ত্তন অপেক্ষা করিতেছিল। সমস্ত অবগত হইয়া সে যার-পর-নাই মর্ম্মাহত হইল। তাহা হইলেও এখনও কর্ত্তব্য আছে; এজন্য সে প্রথমে ডাকপিয়নকে সত্য কথা বলিবার জন্য অনুরোধ করিল, তৎপরে যাহার নামে ইন্সিওরটি আসিয়াছিল, তাহাকে অর্থ দিয়া এবং উর্দ্ধতন ডাক-কর্ম্মচারীকে সমুদায় বলিয়া সাহায্যার্থ চেষ্টা করিল, কিন্তু সকলই ব্যর্থ হইল। তখন মোকর্দ্দমার দিন ইয়াংচো রাধানাথসহ চট্টগ্রামে আসিয়া ভাল উকীল নিযুক্ত করিল। সে তারিখে মামলা হইল না। ইয়াংচোর বুঝিতে বাকী রহিল না যে, যতীন হায়রাণ করিতেছে এবং মোকর্দ্দমার মিথ্যা সাক্ষী তৈয়ার করিতেছে।

এক দিন হঠাৎ রাধানাথ সদরের উচ্চতম কর্ম্মচারীর নিকট হইতে এক নোটিশ পাইল। উহা রাধানাথের নিজ কর্ম্মে গর হাজির থাকার জন্য কৈফিয়ৎ তলব। রাধানাথ বুঝিল,রামরূপের মামলা তদ্বির করার জন্য যতীন বনবিভাগের উচ্চতম কর্ম্মচারীকে তাহার বিরুদ্ধে লাগাইয়া আসিয়াছে। তদ্বির ছাড়িতে হইবে অথবা চাকরী

ছাড়িতে হইবে, বিষম সমস্যা! রাধানাথ স্থির করিল, চাকরী যায় যাউক্, সে তদ্বির ছাড়িবে না। ইহার পর কতিপয় দিবস মামলার তদ্বিরে ইয়াংচোর সহিত চট্টগ্রামে যাওয়ার ফলে রাধানাথ চাকরী হইতে বিতাড়িত হইল।

মামলা হইতে লাগিল। প্রথমে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট, তৎপরে দায়রায় মোকর্দ্দমা গেল। দায়রায় যতীন অম্লানবদনে বলিল যে, রামরূপের বাসায় খানাতল্লাসীর সময় ইন্‌সিওরের খালি খামখানি পাইয়াছে এবং ডাকপিয়ন জনার্দ্দন ও তল্লাসীর দুই জন সাক্ষী সেই কথার প্রতিধ্বনি করিল। মোকর্দ্দমায় ইয়াংচোর যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় হইল, রাধানাথের চাকরী গেল, আর হতভাগ্য রামরূপের দুই বৎসর সশ্রম কারাবাসদণ্ডের আদেশ হইল।

দুঃখের উপর দুঃখ দিতে অনিচ্ছুক হইয়া ইয়াংচো বা রাধানাথ কেহই রামরূপকে তাহার পারিবারিক দারুণ দুর্ঘটনার কথা জানায় নাই। সুতরাং রামরূপ স্ত্রী-পুত্রের চিরবিয়োগদণ্ড জানিতে না পারিয়া কোনরূপে বুক ধরিয়া কায়িক দণ্ড ভোগ করিতে লাগিল। ইয়াংচো চাকরীতে ইস্তফা দিয়া দেশে চলিয়া গেল, রাধানাথ চাকরী হারাইয়া স্ত্রী-পুত্রসহ লাঞ্ছনা ও দারিদ্র্য ভোগ করিতে লাগিল, আর যতীন পদবৃদ্ধি ও মাহিনাবৃদ্ধি সহ জিলার উচ্চ কর্ম্মে সুপ্রতিষ্ঠিত হইল।

রামরূপের পরিত্যক্ত গৃহের আসবাব ইত্যাদি ক্রমে ক্রমে অন্তর্হিত হইতে লাগিল। কিছুকাল পরেই গৃহের দ্বার ও জানালা সকল কোথায় চলিয়া গিয়া যেন লজ্জায় লুকাইয়া রহিল। চালের খড় ও বাঁশ-কাঠ অনর্থক নষ্ট হয় দেখিয়া সহৃদয় প্রতিবেশিগণ চুল্লীসাৎ পূর্ব্বক সে সকলের সদ্ব্যবহার করিলেন। পর্জ্জন্যদেবের বারিধারা মাটীর দেওয়ালগুলিকে ধরণীশায়িত করিয়া দিলে কিছুকাল পরে একটি অনতি-উচ্চ মৃত্তিকা-স্তূপ রামরূপের ভদ্রাসনের স্মৃতিরক্ষার জন্য প্রয়াস পাইতে লাগিল।

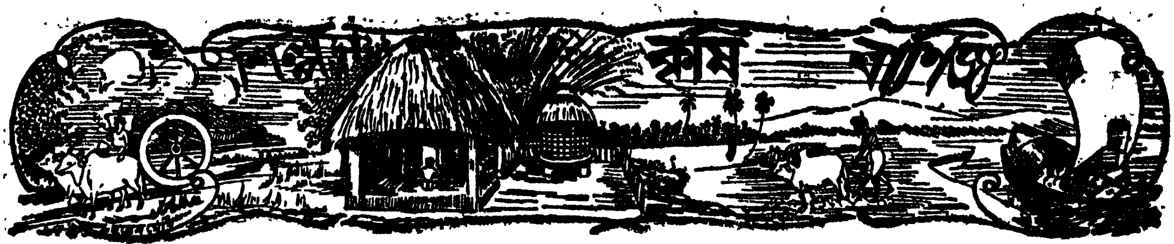
৫

দুই বৎসর অতীত হইলে, এক দিন প্রাতে রামরূপ চট্টগ্রামের কিঞ্চিৎ দূরবর্ত্তী এক জেল হইতে পাথেয় সহ মুক্তি লাভ করিয়া উন্মত্তের মত নিজ গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল। অদৃষ্ট-দেবের গুরুভারবহনক্ষম মস্তকে সমস্ত দুঃখ, সমস্ত ক্লেশ, সমস্ত জ্বালা, সমস্ত অপমান নিক্ষেপ করিয়া স্ত্রী-পুত্রের মুখ দেখিয়া সব ভুলিবার জন্য উধাও হইয়া ছুটিল। সন্ধ্যার পর রামরূপ নিজ ভদ্রাসনের সন্নিকটস্থ হইয়া স্বগৃহের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, কিন্তু ভদ্রাসন কোথায়! তাহার সেই শান্তিময় পর্ণকুটীর কোথায়! তবে কি রামরূপ উত্তেজনাবশে স্থান ভুল করিয়া অপর কোনও অজ্ঞাত স্থলে আসিয়াছে? কৈ না—এই ত সেই বসুদের পুষ্করিণী, এই ত সেই অশ্বত্থ বৃক্ষ, এই ত সেই সুঁড়িপথ, এই ত পার্শ্ববর্ত্তী বিকাশ মুখোপাধ্যায়ের বাটী! রামরূপের গৃহ কৈ, রামরূপের ভদ্রাসন কৈ—সম্মুখে একটা মৃত্তিকা-স্তূপ যে!

আর চরণ চলিল না, স্থাণুর ন্যায় অচল রামরূপ উদাস দৃষ্টিতে চতুর্দ্দিক্ দেখিতে লাগিল। এমন সময় বিকাশ বাবু বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, এক জন কে অন্ধকারে দাঁড়াইয়া আছে। "কে কে" বলিয়া আতঙ্কে চীৎকার করিলে ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর আসিল, "আমি রামরূপ।"

"রামরূপ! রামরূপ! এসেছ ভাই—এস এস—ভিতরে এস" বলিয়া বিকাশ বাবু করদ্বয় ধারণপূর্ব্বক ভিতরে টানিয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করিলেন ও নিজ পুত্রকে আলোক আনিতে বলিলেন। কিন্তু রামরূপ বলিল, "আগে বলুন, আমার স্ত্রী-পুত্র কোথায়, আমার ভদ্রাসন কোথায়?" রামরূপের পদদ্বয় ধরণীবক্ষে দৃঢ়সংবদ্ধ হইয়া গিয়াছে, বিকাশ বাবুর করাকর্ষণ রামরূপকে বিন্দুমাত্রও চালিত করিতে পারিল না। অবশেষে বিকাশ বাবু সেই স্থলেই দণ্ডায়মান হইয়া সংক্ষেপে রামরূপের স্ত্রী-পুত্র ও ভদ্রাসনের শোকাবহ ইতিহাস বিবৃত করিলে রামরূপ স্থির হইয়া সমুদায় শুনিল। নেত্রদ্বয় পলকশূন্য—বিস্ফারিত, জ্বালাময়, শুষ্ক। শনৈঃ শনৈঃ শ্লথপাদক্ষেপে রামরূপ সেই মৃত্তিকা-স্তূপের উপর গিয়া দণ্ডায়মান হইল। পরক্ষণেই তাণ্ডবনৃত্য, অট্টহাস্য ও করতালি সংযোগে "ইস্তক বিস্তি কাবার" "ইস্তক বিন্দি কাবার" এই উচ্চ ধ্বনি সমগ্র পল্লীর নৈশ-নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া প্রতিবেশিগণের হৃদয়ে দারুণ ব্যথা জাগাইয়া দিল। ইহার পর লোক বহুদিন ধরিয়া গভীর রাত্রিতে সেই মৃত্তিকা-স্তূপের উপর অট্টহাস্য ও করতালি সহকারে "ইস্তক বিস্তি কাবার" এই কথা শুনিয়া সন্ত্রাসিত হইত।

শ্রীশিবচন্দ্র ঘোষ।



বাঙ্গালায় তুলার চাষ

এক সময়ে বাঙ্গালার কার্পাসজাত বস্ত্রাদি দেশদেশান্তরে খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। হ্রস্ব-তন্তু কার্পাস লইয়া ঢাকাই শিল্পিগণ সূক্ষ্মতম বস্ত্র বয়নে যে অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা জগতে বিরল। প্রতীচ্যের আধুনিকতম কল-কব্জাও সেই উপাদানে সেরূপ বস্ত্র প্রস্তুত করিতে পারে নাই। কিন্তু সে দিন আর নাই। বর্ত্তমান সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ভারতের তুলা-ফসলের অনুপাতে বঙ্গদেশে শতাংশের এক অংশ তুলাও জন্মায় না। ১৯২২-২৩ খৃষ্টাব্দে ভারতে ২ কোটি ১১ লক্ষ ১৯ হাজার ২ শত একর জমীতে তুলার চাষ হইয়াছিল; তাহার মধ্যে বাঙ্গালার অংশ মোটে ৭১,৭৯৮ একর। আবার ভারতোৎপাদিত ৫১ লক্ষ ৯৬ হাজার গাঁট (১ গাঁট ৪ মণ ৩৫ সের) তুলার মধ্যে বঙ্গে উৎপাদনের মাত্রা মোটে ১৭ হাজার ৪ শত ৮৬ গাঁট। সুতরাং ইহা স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, তুলা অথবা বস্ত্রের জন্য বাঙ্গালী সর্ব্বতোভাবে পর-মুখাপেক্ষী। শুধু তাহাই নহে, অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাঙ্গালায় বিলাতী কাপড়ের কাটতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক; এক কলিকাতা বন্দর যে পরিমাণ কার্পাসজাত বিলাতী মাল আমদানী করে, তাহা ভারতের ৪টি প্রধান বন্দরের উক্ত শ্রেণীর দ্রব্য আমদানীর সমষ্টির সমতুল্য। এই সমস্ত মালের কাটতি অবশ্য বঙ্গের বাহিরেও হয়, কিন্তু তুলা উৎপাদনে বাঙ্গালা যে বিশেষ পশ্চাৎ-পদ, তাহা অস্বীকার করা যায় না।



কার্পাস-বৃক্ষ

বর্ত্তমান তুলার চাষ

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলের বিবরণী প্রভৃতি ও তাৎকালিক অন্যান্য গ্রন্থাদি হইতে জানিতে পারা যায় যে, সে কালের বাঙ্গালার সর্ব্বোৎকৃষ্ট কার্পাস ঢাকার উত্তরপশ্চিম অঞ্চলে জন্মাইত। নদীর চড়ায়, ডাঙ্গা জমীতে উহার চাষ হইত; বৈশাখী ও কার্ত্তিকী ২টি ফসল ছিল, তন্মধ্যে প্রথমটিই উচ্চ দরে বিক্রয় হইত। এই তুলার গাছের বর্ণ রক্তাভ, দৈর্ঘ্য ৩।৪ হাত; ডালপালা অপেক্ষাকৃত কম ও তুলার তন্তু দীর্ঘ, সূক্ষ্ম ও কোমল। সাধারণ কার্পাসের তুলনায় ইহার চাষের জমী ও উৎপাদনের মাত্রা কম হইলেও সে সময়ে লোক ইহা খুব

যত্নের সহিত চাষ করিত। কারণ, ইহা হইতেই প্রসিদ্ধ ঢাকাই মসলিনের তুলা পাওয়া যাইত। সেরূপ উচ্চ শ্রেণীর কার্পাসবস্ত্রের কাটতি বাদশাহী যুগের অবসানের সহিত চলিয়া গিয়াছে। তাহার ফলে উক্ত বিশেষ শ্রেণীর কার্পাসচাষ প্রায় লোপ পাইয়াছে, অথবা উহা অধোগতি প্রাপ্ত হইয়া এরূপ অবস্থায় আসিয়াছে যে, আজকাল উহাকে চিনিয়া বাহির করা কঠিন। বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালায় জলদী ও নাবি দুই শ্রেণীর তুলা-ফসল দেখিতে পাওয় যায়। মৈমনসিংহ, চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য প্রদেশ ও ত্রিপুরায় ১৯২২-২৩ খৃষ্টাব্দে জলদী তুলার জমী ৭০ হাজার ২ শত ৯৮ একর ছিল এবং উক্ত বৎসরে বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জিলায় উভয় শ্রেণীর তুলার জন্য মোট ১৫ শত একর জমীর চাষ হয়। এতদ্দেশের তুলা-চাষের জমীর অধিকাংশই চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য প্রদেশে অবস্থিত এবং পূর্ব্ববঙ্গে অনেক তুলাই গারো পাহাড়ের দীর্ঘফলীয়, হ্রস্ব ও স্থূলতন্তু কার্পাস জাতির বংশধর। বাঙ্গালার জল-হাওয়া অত্যুৎকৃষ্ট জাতীয় দেশী (যথা Gossypim obtusifolium) অথবা বিদেশী তুলা উৎপাদনের উপযোগী নহে। অতিবৃষ্টি অথবা অনাবৃষ্টি উভয়ই তুলা-চাষের পক্ষে ক্ষতিকর। পূর্ব্ববঙ্গের অনেক স্থলে পূর্ব্বোক্ত এবং পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গে শেষোক্ত কারণে ভাল তুলা জন্মায় না। পূর্ব্বে বাঙ্গালায় তুলাচাষের পরিসর



গাছ-কার্পাস

ইহার অন্যতম কারণ এই হইতে পারে যে, ৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বেও পশ্চিমবঙ্গে জলাভাব এত অধিক হয় নাই। তখনও বড় বড় জলাশয়ে সকল সময় জল থাকিত এবং তাহাতে পানীয় জল ব্যতীত ক্ষেত্রের কাযও চলিত। মেদিনীপুর ও বাঁকুড়ায় সেচ দিয়া তুলা চাষ করিতে আজ-কালকার অনেক বৃদ্ধ ব্যক্তি দেখিয়াছেন। আজকাল পশ্চিমবঙ্গে জলের অভাবে যে অনেক জমী পতিত থাকিয়া যাইতেছে, তাহা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। তুলা ডাঙ্গা জমীর ফসল; অধিক পরিশ্রম ও জলসেচসাপেক্ষ এবং পাট অপেক্ষা কম মূল্যবান্। এই সমস্ত কারণে ইহার চাষের জমীর যে সঙ্কোচ হইবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি?

তুলার ভবিষ্যৎ

ইদানীন্তন কার্পাস চাষ ও ব্যবসায়ের উন্নতি সম্বন্ধীয় যাবতীয় সরকারী চেষ্টা Indian Cotton Committeeতে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। নিখিল ভারতের অবস্থাদি বিবেচনা করিয়া কার্পাস কৃষি ও শিল্পের পরিসর বৃদ্ধিকল্পে উপায়াদি নির্দ্ধারণ ও তদনুযায়ী কার্য্যাদির অনুষ্ঠান করিবার ভার এই কমিটীর হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। ইঁহারা কিন্তু তুলাচাষের অনুপযুক্ত বলিয়া বাঙ্গালার কথা একবারেই ছাড়িয়া দিয়াছেন। ১৯২২-২৩ খৃষ্টাব্দের কার্য্যবিবরণীতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যদিও উক্ত

সওদাগর সভার প্রতিনিধিস্বরূপ বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলের ম্যানেজিং ডাইরেক্টার শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার লাহিড়ী বাঙ্গালার একমাত্র প্রতিনিধি আছেন, তথাপি বাঙ্গালায় তুলাচাষের বিস্তৃতি অথবা উন্নতির জন্য কমিটী কোন কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করেন নাই। তাহার অন্যতম কারণ এই হইতে পারে যে, বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ, পঞ্চনদ ও যুক্তপ্রদেশে অপেক্ষাকৃত অল্প চেষ্টায় অধিক ফল পাওয়া সম্ভবপর; সেই জন্য সর্ব্বাগ্রে এই সমস্ত অঞ্চলের উপরই কমিটীর দৃষ্টি পড়িয়াছে। বাঙ্গালায় তুলাচাষের ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল না হইলেও ইহা নিশ্চয় যে, চেষ্টা করিলে এ প্রদেশেও বর্ত্তমান অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে তুলা উৎপাদিত হইতে পারে। কিন্তু সাধারণ কৃষকবর্গ যে বিস্তৃতভাবে তুলা চাষ করিতে আরম্ভ করিবে, এরূপ আশা করা যায় না। তাহারা অনেক আগেই দেখিয়াছে যে, তুলাচাষে যে পরিশ্রম ও ব্যয় হয়, তদনুরূপ ফসল পাওয়া যায় না। কেবল যে সকল স্থানে বড় বড় তন্তুবায় সমাজ থাকায় এখনও পর্য্যন্ত দেশী মোটা কাপড়, গামছা প্রভৃতি প্রস্তুত হয়, সেই সকল স্থানের সান্নিধ্যেই আজকাল তুলা উৎপাদিত হয়। উচ্চ শ্রেণীর দেশী তাঁতের কাপড়ও স্থানীয় তুলাচাষের সহায়তা করে না। কারণ, উক্ত প্রকার বস্ত্র বয়নে প্রায়ই বিদেশীয় সূতা ব্যবহৃত হয়। সেই জন্য তুলাচাষের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে হইলে শিক্ষিত ভদ্র ব্যক্তিগণের এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা দরকার। বিশেষ বিশেষ স্থানের উপযুক্ত বিশেষ বিশেষ জাতীয় তুলা উৎপাদন দ্বারা তাঁহারা যদি কৃষকের মনে প্রতীতি জন্মাইতে পারেন যে, তুলা আয়কর ফসল, তাহা হইলে কৃষক নিজেই তুলাচাষে প্রবৃত্ত হইবে। কিন্তু ইহা সংঘটিত করিতে হইলে প্রথম প্রথম পরীক্ষাস্বরূপে যে চাষ দরকার, তাহা করিতে কৃষক কখনও সম্মত হইবে না।



মার্কিণ বীজ হইতে উৎপন্ন কার্পাস

তুলার জমী

ভারতে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীর জমীতে তুলা জন্মায়:— ১। কাথিয়াবাড়, গুজরাট প্রভৃতি অঞ্চলের সারবান দোঁয়াশ কৃষ্ণ মৃত্তিকা; ২। মধ্যপ্রদেশ, ছোট নাগপুর প্রভৃতির মিশ্রিত লাল ও কাল কাঁকুরেমাটী; এবং ৩। গঙ্গা ও সিন্ধুর পলীপুষ্ট মাটী। প্রথম শ্রেণীর জমী, যাহাতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট কার্পাস হয়, তাহা বঙ্গদেশে নাই। দ্বিতীয় শ্রেণীর জমী পশ্চিমবঙ্গে বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদিনীপুর প্রভৃতি জিলার স্থানে স্থানে দৃষ্ট হয়। তৃতীয় শ্রেণীর জমী পশ্চিম ও পূর্ব্ববঙ্গের অনেক স্থলে আছে বটে, কিন্তু সে সকল জমীতে তুলার স্থান অন্যান্য ফসল দ্বারা অধিকৃত হইয়াছে। সকল দিক হইতে বিবেচনা করিয়া দেখিলে বোধ হয় যে, পশ্চিমবঙ্গের বিহার ও উড়িষ্যা-সংলগ্ন কয়েকটি জিলাতেই বিস্তৃতভাবে তুলার চাষ হওয়া সম্ভব। ঘুটিংযুক্ত মাটী এই সকল জিলার অনেক স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়। যদি সেরূপ জমী দোঁয়াশ ও সারযুক্ত হয় এবং তাহাতে প্রয়োজনমত জলসেচের ব্যবস্থা করিতে পারা যায়, তাহা হইলে সেরূপ জমীতে তুলাচাষে সাফল্য লাভ করিবার সম্ভাবনা আছে। নাইট্রোজেন, ফসফরিক এসিড ও পটাস সমপরিমাণে থাকিলে তুলার জমী উৎকৃষ্ট হয়। কিন্তু তাহা

না হইলেও উপযুক্ত সার দ্বারা সাধারণ ভাল মৃত্তিকাকে বিশেষভাবে তুলাচাষের উপযোগী করিয়া লইতে পারা যায়। তবে ইহা স্মরণ রাখা দরকার যে, তুলায় সার অপেক্ষা চাষ অধিক প্রয়োজনীয়। নূতন কাঁকুরে জমী হইলে প্রথম বৎসর তুলা মিশ্র ফসল হিসাবে উৎপাদন করাই ভাল। অরহর, বরবটি প্রভৃতি সবুজ সাররূপে চাষ করিলেও জমীর অনেক উন্নতি সাধিত হয় এবং উহার রস সংরক্ষণ করিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। তুলা-বীজের খৈল, ছাই, গোবর, ক্ষার প্রভৃতির প্রয়োগেও জমীর উর্ব্বরতা যথেষ্ট বাড়ে। বিঘা প্রতি ৩০ সের হাড়ের গুঁড়া, অথবা ১ মণ চূণ ও ১৪ সের লবণ প্রয়োগ করিয়া অনেক স্থানে উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ যে প্রকার জমীই হউক, উহার গভীর কর্ষণ প্রয়োজন। কাঁকর, ঘুটিং প্রভৃতি বাছিয়া, ৩।৪ বার লাঙ্গল দিয়া জমী তৈয়ারী করিয়া উহার সহিত সার মিশ্রিত করিয়া লওয়া দরকার। বীজ বপনের অনেক আগেই জমী প্রস্তুত করিতে হয়; তাহা হইলে তাপ, জল ও বায়ু প্রবেশ করিয়া জমীর



দেশীয় দীর্ঘ-তন্তু কার্পাস



সমস্ত দোষ নষ্ট হয় ও উহা চাষের সম্পূর্ণ উপযুক্ত হইয়া উঠে।

বাঙ্গালার উপযুক্ত তুলা

যে কোন প্রকার তুলা চাষ করিয়া লাভবান্ হইবার আশা কম। অনেকেই তথা-কথিত উন্নত জাতীয় তুলার চাষ করিয়া বিফলমনোরথ হইয়াছেন। বঙ্গদেশে ২ জাতীয় তুলার চাষ হইয়া থাকে এবং তাহাদের সমগুণ-বিশিষ্ট তুলাই এতদ্দেশে সফল হইতে পারে। প্রথম Gorsypium arboreum জাতীয় বড় গুল্ম কার্পাস। স্থানভেদে ইহার নাম বুড়ী, রাম, দেব, নর্ম্মা অথবা ব্রাহ্মণ কার্পাস। সাধারণতঃ ইহা ভিটে জমী অথবা বাগানেই দেখা যায় ও বহু বৎসর বাঁচিয়া থাকে। ইহার পত্র পঞ্চ খণ্ডিত, সর্ব্বাঙ্গ অল্পবিস্তর লোমযুক্ত, পুষ্প পীতাভ অথবা মধ্যস্থলে পীতদাগযুক্ত বেগুনী রঙ্গের। সচরাচর বহুবিস্তৃতভাবে ইহার চাষ হয় না। কিন্তু মানভূমের

৫।৬ বৎসর একই গাছ হইতে ফসল পাওয়া যায়। ইহা অনেক পরিমাণে অনাবৃষ্টিসহ। প্রথম বৎসরে বুড়ী কার্পাস হইতে বিঘা প্রতি আধমণ তুলা পাওয়া যাইতে পারে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বৎসরে ফসল দ্বিগুণ, এমন কি, চতুর্গুণ হইয়া থাকে। পঞ্চম বৎসরে ফসল প্রথম বৎসর অপেক্ষাও কমিয়া যাইতে পারে। সেরূপ অবস্থায় গাছগুলি তুলিয়া ফেলাই ভাল। যাঁহারা তুলাচাষের জন্য অধিক পরিশ্রম অথবা ব্যয় করিতে অনিচ্ছুক, অথচ যথেষ্ট বাগানবাগিচার মালিক, তাঁহারা কিয়দংশ জমীতে এই কার্পাস দিয়া রাখিতে পারেন। বাগানের অপরাপর কাযের সহিত ইহার চাষ অনায়াসেই চলিতে পারে। অগ্রহায়ণ পৌষ মাসে ইহার ফসল হয় এবং তুলাও শুভ্র, চিক্কণ ও দীর্ঘতন্তুযুক্ত হইয়া থাকে। মানভূম ও সিংভূম জিলায় এই জাতীয় তুলার চাষ এখনও উঠিয়া যায় নাই এবং চাষ করিতে হইলে এই সকল স্থান হইতে বাছা বীজ আনয়ন করাই ভাল। বুড়ী অথবা G. arboreum কার্পাসের একটি উপজাতি আছে; উহার নাম Var neglectum। বঙ্গদেশের সর্ব্বত্রই এক সময়ে এই উপজাতির চাষ ছিল। ইহা হইতে এক দিকে যেমন বিখ্যাত ঢাকাই মসলিনের তুলা পাওয়া যাইত, অন্য দিকে তেমনই বাঙ্গালার আজকাল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কার্পাসকেন্দ্র — চট্টগ্রাম পার্ব্বত্যপ্রদেশের মোটা তুলাও ইহা হইতেই জাত। জল, বায়ু, মৃত্তিকা ও চাষের পার্থক্যে এই উপজাতির এত বিভিন্ন 'প্রকারে'র (forms) সৃষ্টি হইয়াছে যে, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। সাধারণতঃ ক্ষেত্রজ ফসল হিসাবে ইহার চাষ হয় এবং গাছগুলি ঝাড়াল ও ২।২৷৷০ হাত উচ্চ হয়। বর্ষার প্রারম্ভেই ইহার বীজ বপন করা হয় ও কার্ত্তিক অগ্রহায়ণে ফসল পাকে। হ্রস্বতন্তু হইলেও এই কার্পাসের ফসল মন্দ হয় না। সেইজন্য জলপাইগুড়ি, মৈমনসিংহ, ত্রিপুরা প্রভৃতি অঞ্চলে ইহার চাষ এখনও টিকিয়া আছে। ব্যবসায় জগতে বাঙ্গালাদেশের তুলা "কুমিল্লা" নামে পরিচিত।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, জলদী ও নাবি উভয় শ্রেণীর তুলা-ফসলের বাঙ্গালায় চাষ হয়। ফলতঃ ভারতের সমস্ত তুলাকেই জলদী ও নাবি ২ ভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়। জলদী ফসল বর্ষার প্রারম্ভে বুনিয়া উহার শেষে তুলিয়া লওয়া হয়। ইহাতে ৫।৬ মাসের অধিক সময় লাগে না; ইহা প্রায়ই মিশ্র ফসল। উৎপন্ন তুলা হ্রস্বতন্তু, স্থূল ও মলিন। এখন ইহারই চাষ বাঙ্গালায় অধিক হইতেছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর তুলা বর্ষার শেষে বসাইয়া বৈশাখে সংগ্রহ করা হয়। এই ফসল পাকিতে ৭।৮ মাস সময় লাগে। এই শ্রেণীর তুলা উৎকৃষ্টতর এবং ইহার সহিত প্রায় অন্য ফসল বুনা হয় না। অবশ্য, ইহার চাষে অধিক পরিশ্রম ও ব্যয় আছে এবং অবস্থাবিশেষে জলসেচেরও প্রয়োজন হইতে পারে। এই শ্রেণীর তুলার ফসল নষ্ট হইলে কৃষকের সমূহ ক্ষতি হয়। সেইজন্য সে জলদী তুলার পক্ষপাতী। তাহাতে তুলা নিকৃষ্ট হইলেও ফসল মন্দ হয় না এবং মিশ্র চাষের জন্য ফসল নষ্ট হইয়া গেলেও একত্রোৎপাদিত অন্য ফসল হইতে কৃষক অনেকটা ক্ষতিপূরণ করিয়া লইতে পারে। কিন্তু জলদী জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া থাকিলে বাঙ্গালায় তুলা-চাষের উন্নতি সম্ভব নহে। সেইজন্য ভারতের অন্যান্য স্থলের উৎকৃষ্ট তুলা ও বিদেশী তুলা বাঙ্গালার স্থানবিশেষে প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

নিম্নোদ্ধৃত তালিকায় কতিপয় দেশীয় ও বিদেশীয় কার্পাসের তন্তুর প্রসারের ও বীজের অনুপাতে তুলার পরিমাণ দৃষ্ট হইবে। আশা করা যায় যে, ইহা হইতে অনেক পাঠক নিজের মনোমত তুলা নির্ব্বাচন করিয়া লইতে পারিবেন ;—

প্রদেশ ও তুলার নাম	তন্তুর প্রসার ইঞ্চ হিঃ	তুলার অনুপাত
বোম্বাই—		
খান্দেশ	৪/৮ — ৫/৮	৩৮
নবসরী	৭/৮ — ১	৩১
কুমতা ধারবাড়	৭/৮ —	২৬
মার্কিণ ধারবাড়	৬/৮ — ৭/৮	১০
সিন্ধু	৪/৮ — ৫/৮	৩৫
মধ্যপ্রদেশ—		
বাণী	১ — ৭/৮	২৫
ওমরা [সাধারণ]	৫/৮ — ৬/৮	৩৫
বুড়ী	৭/৮ — ১	৩১
মাদ্রাজ—		
ক্যাম্বোডিয়া [সেচ দেওয়া]	৬/৮ — ১ ২/৮	৩০-৩৩
পশ্চিমে	৬/৮	২১

প্রদেশ ও তুলার নাম	তন্তুর প্রসার ইঞ্চ হিঃ	তুলার অনুপাত
পঞ্চনদ—		
সিন্ধু পঞ্জাব	৪/৮	৩৩
মার্কিণী	৭/৮	৩২-৩৩
যুক্তপ্রদেশ—		
বাঙ্গালা	৪/৮	৩৫
কানপুর মার্কিণ	৭/৮ — ১	৩১
বাঙ্গালা—		
কুমিল্লা	৩/৮ — ৪/৮	৪৫
ভারতে উৎপাদিত—		
অপল্যাণ্ড মার্কিণী	১·১২	
সি আয়ল্যাণ্ড	১·৬৫	
মৈশরী	১·৫২	

চাষ-প্রণালী

তুলার বিভিন্ন জাতি এবং জল-হাওয়া ও মৃত্তিকার পার্থক্যে :তুলাচাষ-প্রণালীর পার্থক্য হইতে পারে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে সে সমুদায়ের বিস্তৃত আলোচনা করিবার স্থান নাই। স্থূলতঃ ইহা বলিতে পারা যায় যে, তুলা-চাষে প্রথমেই লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, বর্ষাকালে যেন ফসলের ফুল না হয়। বর্ষাকালে ফুল হইলেই তাহার ফল ভাল হইবে না এবং কীট দ্বারাও যথেষ্ট ক্ষতি হইবে। সেই জন্য বৈশাখী চাষের জন্য ফাল্গুনেই জমী তৈয়ারী করিয়া রাখিয়া দিতে হইবে। জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়ে বৃষ্টি হইলে উক্ত প্রস্তুতীকৃত ক্ষেত্রে ৩ হাত অন্তর দাঁড়া বাঁধিয়া দাঁড়ার উপর ২ হাত অন্তর চারাগুলি বসাইয়া দিবে। অবশ্য, এই প্রথায় প্রথমেই চারা তৈয়ারী করিয়া লইতে হয়। ক্ষেত্রে একবারে তুলার বীজ বসাইতে হইলে আরও কিছু দিন আগে বীজবপন প্রয়োজন। তুলা-বীজের গাত্রসংলগ্ন লোমের জন্য বীজগুলি প্রায়ই জড়াইয়া থাকে। সেই জন্য কাদা, গোবর ও জল মিশাইয়া তাহাতে বীজগুলি উত্তমরূপে মাখাইয়া লইয়া পরস্পর অসংলগ্নভাবে রাখা হয়। শুষ্ক হইলে বীজগুলি চটের মধ্যে দিয়া ঘষিলে পূর্ব্বোক্ত লোমগুলি উঠিয়া গিয়া উহারা আর জড়াইয়া যায় না। পূর্ব্বোক্ত চারার পরিবর্ত্তে প্রতি গর্ত্তে ৩।৪টি বীজ দিয়া অল্প মাটী ঢাকা দিয়া বৃষ্টি না হইলে জল দিতে হয়। তুলার সহিত অপর ফসল বুনিলে এরূপ ফসল দেওয়া দরকার যেন, তাহা তুলার ফল পরিপক্ক হইবার কিছু দিন আগে উঠিয়া যায়। গাছ প্রায় ২ হাত উচ্চ হইলে তাহার ডগা ছাঁটিয়া দিতে হয়; তাহাতে শাখা-প্রশাখা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া অধিক ফল ধরিতে পারে। সাধারণতঃ ২।৩ বারের অধিক এইরূপ ডগা ছাঁটার প্রয়োজন হয় না। মাঝে মাঝে নিড়ানি ও প্রয়োজন হইলে শীতের ফসলে জলসেচ ভিন্ন তুলার অন্য পাইট দরকার হয় না। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠের গাছে আশ্বিন-কার্ত্তিকে ফুল ধরে। ভাদ্রে জমী প্রস্তুত করিয়া আশ্বিনের শেষে যে ফসল বুনা হয়, তাহার ফুল ফাল্গুন-চৈত্রে হয়। ফল পুষ্ট হইয়া উঠিলেই আর জলসেচের প্রয়োজন নাই। প্রায় পরিপক্কাবস্থায় জলসেচ তুলার ফসলের পক্ষে বরং ক্ষতিকর। বিদেশীয় অথবা দেশীয় উৎকৃষ্ট জাতির চাষ শীতকালেই করা ভাল। বহুবর্ষজীবী গাছের ফসল লওয়ার পর একবার ছাঁটিয়া দেওয়া দরকার। রোপা অথবা ছিটান হিসাবে বিঘা প্রতি ২।২॥০ সের বীজ প্রয়োজন হইতে পারে। বিঘা প্রতি চাষের খরচ ৩০।৩৫৲ টাকা পড়ে। উৎপন্ন তুলার পরিমাণ দেড় মণের অধিক গড়পড়তায় ধরিতে পারা যায় না। তুলা ও বীজের মোট দাম ৫০৲ টাকা হইতে পারে। সুতরাং চাষীর মুনাফা থাকে প্রায় ১৫৲ টাকা। কিন্তু কোনরূপে ফসলের হানি হইলে এই পরিমাণ লাভও থাকে না। সেই জন্য অনেক কৃষক অবিমিশ্রভাবে তুলার চাষ করিতে সাহসী হয় না।

চাষবৃদ্ধির উপায়

বাঙ্গালায় তুলা-চাষের পরিসর বৃদ্ধি করিতে হইলে, ৩টি বিষয়ের উপর প্রধানতঃ লক্ষ্য রাখা দরকার, ১। এখনও যে সমুদায় জিলায় তুলাচাষ হয়, সে সমুদায় স্থানের সর্ব্বোৎকৃষ্ট গাছের বীজ সংগ্রহ; ২। উৎকৃষ্ট স্থানীয় বীজ ও সুপরিচিত ভিন্নস্থানীয় বীজের পাশাপাশি উৎপাদন দ্বারা উহাদের দোষগুণ নির্ণয় এবং ৩। পরীক্ষিত বিশেষ বিশেষ জাতীয় তুলার বীজ ও সংক্ষিপ্ত চাষ-প্রণালী উপযুক্ত ব্যক্তিবর্গকে বিনামূল্যে বিতরণ। আপাততঃ কৃষিবিভাগ হইতে ২।১ জাতীয় তুলার বীজ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু উহা বঙ্গের সকল স্থানের পক্ষে উপযুক্ত নহে এবং বীজও যে পরিচিত লক্ষণযুক্ত

গাছ হইতে প্রাপ্ত, তাহারও কোন নিশ্চয়তা নাই। বলা বাহুল্য যে, বিভিন্ন জাতি অথবা উপজাতির বর্ণসঙ্কর দ্বারা তুলার যেমন উন্নতি, তেমনই অবনতিও হইয়াছে। শেষোক্তের মাত্রাই বোধ হয় অধিক। সেইজন্য সঙ্কর বীজের প্রবর্ত্তন অপেক্ষা প্রথমতঃ বিশুদ্ধ জাতীয় বীজ লইয়াই পরীক্ষা করা ভাল। Indian Cotton Committee বঙ্গে তুলা-চাষের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিলেও দেশীয় জনসাধারণ দ্বারা গঠিত সমিতি দ্বারা বাঙ্গালায় তুলা-চাষ বৃদ্ধি পাওয়া সম্ভব। এইরূপ সমিতি হইলে তাহার ধারাবাহিক চেষ্টা দ্বারা বঙ্গে দীর্ঘতন্তু বিদেশীয় তুলা উৎপন্ন হউক আর না-ই হউক, অন্ততঃ মধ্যম শ্রেণীর বুড়ী কার্পাস জাতীয় শুভ্র সুচিক্কণ ও কোমলতন্তু যে যথেষ্ট পরিমাণে উৎপাদিত হইতে পারিবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এক সময়ে এই শ্রেণীর তন্তুই কার্পাসজগতে একাধিপত্য লাভ করিয়াছিল। এখনও সমধিক মাত্রায় উৎপাদন করিতে পারিলে, এই শ্রেণীর কার্পাস-চাষে যথেষ্ট লাভ আছে।

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত।

জিলাটিন্

জিলাটিনের নাম সকলেই শুনিয়াছেন। দ্রব্যটির নাম হইতেই প্রমাণ হইতেছে যে, তাহা আটাজাতীয় এক প্রকার থল্থলে পদার্থ। জন্তু-জানোয়ারের শিং, ক্ষুর ও চামড়াতেই ইহাকে বেশী মাত্রায় দেখিতে পাওয়া যায়। এই সব জিনিষে যে জিলাটিন্ থাকে, তাহা একেবারে খাঁটি জিনিষ নহে। নানা জিনিষের সহিত মিশিয়া থাকে বলিয়া এই মিশ্র জিলাটিন্‌কে বিবিধ বৈজ্ঞানিক উপায়ে ছাঁকিয়া বাহির করিতে হয়; এই নানা বৈজ্ঞানিক উপায়ের একটির বিবরণ আমরা এই প্রবন্ধের যথাস্থানে আলোচনা করিব। জিলাটিনের একটি প্রধান গুণ এই যে, ঠাণ্ডা জলের সহিত ইহা কখনও মিশিতে চাহে না, কিন্তু সেই জলকেই একটু গরম করিলে, সমস্ত জিলাটিন্ গলিয়া জলের সহিত এমন ভাবে মিশিয়া যায় যে, মনে হয়, যেন জলে কোন জিনিষই নাই। একটু ঠাণ্ডা করিলে সেই জলেই আবার সমস্ত জিলাটিন্ আটাজাতীয় পদার্থের মত থিতাইয়া পড়ে। আসলে জিলাটিন্ হইতেছে একটি খাঁটি জৈব পদার্থবিশেষ। জীবজন্তুর দেহ বা দেহাংশ হইতেই ইহার উৎপত্তি। বীক্ষণাগারে রাসায়নিকের হাতে নানা পদার্থের সংমিশ্রণে ইহাকে আজও তৈয়ারী করিতে পারা যায় নাই। আজকাল বৈজ্ঞানিকরা বীক্ষণাগারে বসিয়া নানা প্রকার বর্ণ প্রস্তুত করিতেছেন এবং সেগুলির মূল্য জৈব বর্ণসমূহের মূল্য হইতে অপেক্ষাকৃত অল্প বলিয়া, বাজারে তাহাদের কাটতি অত্যন্ত অধিক। এই বর্ণসমূহের মধ্যে এনীলিন্ ও তাহার সংমিশ্রণজাত বর্ণাবলীই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কোন সুদূর ভবিষ্যতে এনীলিনের মত জিলাটিনের নব-প্রস্তুতপ্রণালী আবিষ্কৃত হইলে, জৈব জিলাটিন্‌কেও হয় ত হার মানিতে হইবে। ভবিষ্যতের জল্পনা ছাড়িয়া দিয়া আমরা জিলাটিনের বর্ত্তমান কথারই আলোচনা করিব।

চিকিৎসকগণ বলেন যে, খাঁটি জিলাটিন্ রুগ্ন ব্যক্তির অতি উপাদেয় খাদ্য; এই জিলাটিন্ সম্পূর্ণ মিশ্রপদার্থ-বিবর্জ্জিত হওয়ায় রোগীর পক্ষে হানিকর হইতে পারে না। রোগীর অরুচি হইলে এই জিলাটিন্ ক্ষুধা ও অগ্নি-বর্দ্ধক বলিয়া আজকাল আমেরিকা ও বিলাতের বড় বড় হাঁসপাতালে চিকিৎসকগণ জিলাটিনের ব্যবহার প্রচলিত করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন শেষ অবস্থায় অপর কোন পথ্যগ্রহণে অক্ষম রোগী অতি সহজেই জিলাটিন খাইতে পারে বলিয়া আজকাল ইহার আরও আদর বাড়িয়াছে। শর্করা বা সাধারণ চিনি পদার্থটি আমাদের শরীরের পক্ষে একটি অল্প প্রয়োজনীয় জিনিষ নহে। নড়াচড়া, দৌড়ঝাঁপ প্রভৃতি শরীরের অঙ্গবিক্ষেপজনিত কার্য্যাবলীর মূল উত্তেজকের অন্যতম পদার্থ এই চিনি বা শর্করা। মানবদেহের লিভার বা যকৃতে এই চিনিই গ্লাইকোজেনের (Glycogen) নাম ধরিয়া সঞ্চিত হইয়া থাকে। মানব-শরীরের অঙ্গসঞ্চালন ও অঙ্গ-বিক্ষেপে এই চিনি প্রতিক্ষণেই ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে এবং সুচতুর মানব প্রতিদিনই নানা আকারে এই চিনিই উদরসাৎ করিয়া সেই ক্ষয়ের স্থান পূর্ণ করিয়া চলিতেছে। এমন অনেক রোগী আছে, চিকিৎসকগণের নির্দ্দেশে

যাহারা এককালীন চিনি পরিত্যাগ করিয়াছে। এই প্রকার রোগীর পক্ষেও জিলাটিন্ উপকারী এবং উপাদেয়। তদ্ভিন্ন জিলাটিনের আর একটি বিশেষ গুণ এই যে, ইহা শরীরের পাকযন্ত্রকে অনাবশ্যক এবং অকারণ ভারগ্রস্ত করে না। এক্ষণে আমরা জিলাটিনের প্রস্তুত-প্রণালীর আলোচনা করিব।

জন্তু-জানোয়ারের ছাল-চামড়া, শিং এবং ক্ষুর ছাড়াও তাহাদের হাড় হইতে জিলাটিন্ তৈয়ারী হইয়া থাকে। ডেন্মার্ক দেশে এই উপায়ে আজকাল জিলাটিন্ প্রস্তুতের নব পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছে। আমাদের ভারতবর্ষ হইতে আমেরিকা ও বিলাতে বৎসরে যে পরিমাণ জন্তু-জানোয়ারের হাড় চালান যায়, তাহার পরিমাণ পৃথিবীর আর সমস্ত দেশের আমদানী মাল হইতে বেশী। বলিতে গেলে, এক মার্কিণই পৃথিবীর অপর সমস্ত দেশ হইতে অধিক পরিমাণ জিলাটিন্ খরচ করিয়া থাকে। মার্কিণের এই জিলাটিন্ খরচের হিসাব-তালিকায় আইস্ক্রীম্ই (গুঁড়া বরফ দিয়া তৈয়ারী নানা প্রকার মুখরোচক শীতল খাদ্যদ্রব্য) শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে। মার্কিণজাতির মত এমন আইস্ক্রীম্-ভক্ত দ্বিতীয় জাতি দুনিয়ায় আর খুঁজিয়া পাওয়া ভার এবং তাঁহাদের এই অতিপ্রিয় খাদ্যটির অন্যতম প্রধান উপাদান এই জিলাটিন্। জিলাটিন্ দিয়া আইস্ক্রীম্ প্রস্তুতের কথাটা শুনিতে বড়ই অদ্ভুত, বিশেষতঃ সেই জিলাটিন্ই যখন আবার গরু, শূকর প্রভৃতি জন্তু-জানোয়ারের অস্থি-পঞ্জর হইতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রস্তুত, তখন আমাদের হিন্দুস্থানে ইহা শুনিতে আরও অদ্ভুত ও আপত্তিজনক সন্দেহ নাই। আমাদের দেশের বাজারে ও দোকানে যে সকল আইস্ক্রীম্ তৈয়ারী হয়, তাহাতেও ঐ জিলাটিনের প্রয়োগবিধি প্রচলিত আছে কি না, তাহা আইস্ক্রীম্-ব্যবসায়ীরাই ভাল বলিতে পারেন। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন যে, খুব ভাল জিলাটিন্ যে সে জন্তু-জানোয়ারের অস্থিপঞ্জর হইতে তৈয়ারী হয় না; সাধারণতঃ মহিষের, বিশেষতঃ জলবিহারী মহিষের অস্থিপঞ্জরই জিলাটিনের উৎকৃষ্ট উপাদানরূপে গণ্য হইয়া আসিতেছে। মার্কিণ ও যুক্তরাজ্যে যে সকল অস্থিপঞ্জর আমদানী হইয়া থাকে, তাহাতে সাধারণতঃ এই প্রকার বাছাই করা অস্থিপঞ্জরের ভাগই বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে মহিষের সংখ্যা বড় কম নহে এবং বিদেশে তাহাদের যে পরিমাণ অস্থিপঞ্জর চালান দেওয়া হইয়া থাকে, তাহার পরিমাণ বড় অল্প নহে।

আইস্ক্রীম্ প্রস্তুত করিতে যে জিলাটিনের ব্যবহার আছে, তাহা যে খুবই খাঁটি এবং নানাপ্রকার রোগ-বীজাণু-বিবর্জ্জিত, এ কথা বলাই বাহুল্য। এই খাঁটি জিলাটিনের বৈজ্ঞানিক প্রস্তুত-প্রণালী মোটামুটি খুবই সহজ। জন্তু-জানোয়ারের হাড়মাত্রেই চূণের সহিত ফস্ফরাসের যোগে সংগঠিত হইয়া থাকে; ইহা ছাড়া তাহাতে ক্যাল্সিয়াম্ ও ম্যাগ্নেসিয়াম্ নামক ধাতব পদার্থের সহিত অঙ্গারের দুইটি যৌগিক বা Compoundকেও দেখিতে পাওয়া যায়। জন্তু-জানোয়ারের অস্থিপঞ্জর হইতে নানাপ্রকার তীব্র অ্যাসিড বা অম্লপদার্থ দ্বারা পূর্ব্বোক্ত ৩টি যৌগিককে বাদ দেওয়াই হইতেছে, জিলাটিন্ প্রস্তুতের প্রথম কথা। তাহারা বাদ পড়িলে অস্থিতে বাকি যে জিনিষটা থাকে, তাহাই আমাদের অতিপরিচিত জিলাটিন্। এই বাছাই করা জিলাটিন্ অবশ্য খুবই অপরিষ্কৃত অবস্থায় থাকে—বৈজ্ঞানিক উপায়ে ইহাকে পরিশুদ্ধ করিলেই খাঁটি জিলাটিন্ বাহির হইয়া পড়ে। সুবৃহৎ ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে জিলাটিন্ প্রস্তুতের যে একটা মোটামুটি হিসাব দেওয়া গেল, বৈজ্ঞানিকের ক্ষুদ্র বীক্ষণাগারে সেই পদ্ধতিই সমানভাবে প্রযোজ্য। আমরা বৈজ্ঞানিকের সহিত বীক্ষণাগারে গিয়া একবার জিলাটিন্ প্রস্তুতের এই নব পদ্ধতিটির বিষয় প্রত্যক্ষ করি। ধবধবে সাদা বিলাতী লবণের সহিত মাঝে মাঝে যে দুই এক টুকরা শক্ত জিনিষ হাতে ঠেকে, তাহা জন্তু-জানোয়ারের পরিষ্কৃত এবং পরিশুদ্ধ অস্থিপঞ্জরের ভগ্নাবশেষ ব্যতীত আর কিছুই নহে; এই খণ্ড অস্থির এক টুকরাকে হাইড্রোক্লোরিক্ অ্যাসিড্ (Hydrochloric Acid) নামক অম্লপদার্থের মধ্যে কয়েক দিন ডুবাইয়া রাখিলে, পূর্ব্বোক্ত যৌগিক ৩টি অ্যাসিডের সহিত মিশিয়া যায় এবং পাত্রের তলায় আঠার মত থল্থলে যে জিনিষটা বাকি পড়িয়া থাকে, তাহাই অপরিষ্কৃত জিলাটিন্। সাধারণতঃ অস্থির দেড় ভাগ এই জিলাটিন্

দিয়া "গঠিত ; বাকি উপাদানটা পূর্ব্বোক্ত যৌগিক ৩টি দিয়া পূর্ণ হইয়া থাকে। পাত্রের তলদেশস্থ এই অপরিষ্কৃত জিলাটিন্‌কে পৃথক্ পাত্রে রাখিয়া ফিল্‌টার ওয়াটার দ্বারা বার বার ধৌত করিলে যে জিলাটিন্ পাওয়া যায়, তাহাতেই আবার চুণের জল ঢালিয়া পরিষ্কার করা হইয়া থাকে। বাজারে বা বিদেশে বিক্রয় এবং রপ্তানীর আগে জিলাটিন্ খাঁটি কি না, জানিবার জন্য মার্কিণদেশের সরকার লোক নিযুক্ত করিয়াছেন। বীক্ষণাগারে পরীক্ষার পর, "এই জিলাটিন্ খাদ্যরূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে" এই বলিয়া তাঁহারা আদেশ-লিপি দিলে তবেই তাহা রপ্তানী বা বিক্রীত হইয়া থাকে ; সুতরাং ভেজাল দেওয়া অখাদ্য জিলাটিন্ কখনও মার্কিণের বাজারে বিক্রীত বা মার্কিণ বন্দর হইতে রপ্তানী হইতে পারে না। নিজ মার্কিণে বাৎসরিক ৮০ লক্ষ পাউণ্ড জিলাটিন্ শুধু আইসক্রীম্ খাদ্যের উপকরণরূপেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে ; তদ্ভিন্ন জ্যাম্ ও জেলীর উপকরণরূপেও ইহার কম কাটতি নাই। আইস্‌-ক্রীম্, জ্যাম্ ও জেলীর উপাদান ব্যতীত চিকিৎসাশাস্ত্রেও ইহার খুব প্রচলন আছে। চিকিৎসকের নানা ঔষধের বটিকা এই জিলাটিনের আবরণে (Coating) শক্ত করা হইয়া থাকে। আবার ফটোগ্রাফের রঙ-বেরঙের সেই পাতলা, স্বচ্ছ, ছোট ছোট নেগেটিভগুলিও এই জিলাটিন্ দিয়া তৈয়ারী হয়। জিলাটিনের এই অত্যুৎকৃষ্ট নেগেটিভ, ফটোগ্রাফে যে নবযুগ আনয়ন করিয়াছে, তাহা সকলেই জানেন। খাদ্যের তালিকায়, চিকিৎসকের চিকিৎসালয়ে এবং ফটোগ্রাফের দোকানে জিলাটিনের এই প্রভূত ব্যবহার সত্যই আজকাল তাহাকে একটি প্রধান বাণিজ্যদ্রব্যের মধ্যে গণ্য করিয়াছে। এই অত্যুৎকৃষ্ট লাভজনক ব্যবসায়ের প্রচলন মার্কিণ ছাড়া এক ডেন্‌মার্ক ব্যতীত পৃথিবীর অপর আর কোনও স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায় না।

শ্রীত্রিগুণানন্দ রায়।

বরণ

ভারত-মাতার আশীষ লইয়া
এলে কি তীর্থ হইতে, বীর,
শুনাও সবারে মুক্তিমন্ত্র
অভয় শঙ্খ জননীর।
জাগাও সবার সুপ্ত পরাণ
ঘুচুক মোহ তন্দ্রা ভয়,
মিলিত কণ্ঠে ধ্বনিয়া উঠুক
জনম-ভূমি জননী জয়।

এস হে প্রিয়, এস হে বন্ধু, এস হে সখা, এস হে বীর,
তীর্থ-স্নাত-মুক্ত শুদ্ধ দুলাল ভারত-জননীর।

স্বরাজতীর্থে মাতৃধ্যানে
লভিয়া শান্তি লভিয়া তৃপ্তি,
সঙ্গে এনেছ ভক্তি-পূরিত
স্বার্থত্যাগের উজল দীপ্তি ;
মুক্ত কর হে সবার বন্ধ
যুক্ত কর হে সবার হাত,
তাহাতে হউক ভারত মাতার
সজল আঁখির করুণাপাত।

মুক্তিমন্ত্র অভয় বাণী
সাধনা স্বর্গে পেয়েছ যাহা,
লুব্ধ, মুগ্ধ, সুপ্ত সমাজে
গভীরে ঘোষণা কর হে তাহা,
তোমার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলায়ে, তোমারি তানে ধরিয়া তান,
তন্দ্রা-জড়িত অবশ পরাণে নবীন চেতনা করিব দান।

জীবন-যজ্ঞে যে দিন গর্ব্বে
দিয়াছিলে প্রিয় ত্যাগের হবি,
পূর্ণাহুতি সে মহা-যজ্ঞে
চাহিবে তোমার যা কিছু সবই,
মায়ের সেবায় আপনা বিলায়ে
আপনারে বড় করিয়া তোল,
বিশ্বে যেথায় পাপের দম্ভ
সে পথে উঠুক মরণ-রোল।

এস হে প্রিয়, এস হে বন্ধু, এস হে সখা, এস হে বীর,
তীর্থ-স্নাত মুক্ত শুদ্ধ দুলাল ভারত-জননীর।

শ্রীজিতেন্দ্রপ্রসাদ বসু।

আশুতোষ-বিয়োগে

জ্ঞানের সুমেরু-গিরি অকস্মাৎ গেল কি রে ধ্বসি' ?
ব্যোমকক্ষ হ'তে আজ বৃহস্পতি পড়িল কি খসি' ?
স্মৃতি-সূর্য্যমণ্ডলেরে চিরতরে গ্রাসিল কি রাহু ?
আজি কি অবশ হ'ল অর্জ্জুনের দশ শত বাহু ?
শৌর্য্যের পর্ব্বত-চূড়া ভূমিকম্পে পড়িল কি লুটি' ?
দিগ্বিজয়-বৈজয়ন্তী উপপ্লবে গেল কি রে টুটি' ?
দানধারা নিঃস্রাবিয়া ঐরাবত পড়িল মূরছি ?
বিশ্রাম লভিল কি রে বিশ্বামিত্র নব বিশ্ব রচি' ?
নাহি আজি আশুতোষ, অমানিশি ঘিরিছে ভুবনে
গগনে তারকা শুধু, খদ্যোতেরা স্পন্দিছে গহনে।

হে মহাপুরুষ, আজি চ'লে গেলে মহাযাত্রাপথে
আলোকিয়া ব্যোমরাজ্য মহিমার অগ্নিময় রথে।
মোরা হেথা ছত্রভঙ্গ, রথিহারা অক্ষৌহিণী সম
ধ্বস্তব্যূহ, অস্ত্রায়ুধ,—প্রত্যাসন্ন ঘনঘোর তমঃ।
তোমার বিহনে আজি মনস্বিতা হলো অশরণা,
তেজস্বিতা ভিখারিণী, ওজস্বিতা সজলনয়না।
মনীষা লক্ষ্মীর অই খসে' পড়ে কিরীটের মণি
আজি বিশ্বভারতীর দেবালয়ে স্তব্ধ শঙ্খধ্বনি।
স্তব্ধ তব বজ্রকণ্ঠে মেঘমন্দ্র, হে বাগ্মিসত্তম,
গম্ভীর গুম্বজে শুধু প্রতিধ্বনি করে গম্‌গম্।
বঙ্গের সংহিতাকার মনু তুমি বিশ্বহিতব্রত
তোমার প্রয়াণ এ যে মন্বন্তর—কল্পান্তের মত।

এ বঙ্গের তুঙ্গতম ন্যায়নিষ্ঠ ধর্ম্মাধিকরণ,
তোমার শৃঙ্খলামালা নিজ কণ্ঠে করেছে ধারণ।
তোমার সুপর্ণ-দৃষ্টি গুহ্যতম রন্ধ্রতলে পশি'
এনেছে সুবর্ণ-সত্য বিশ্বালোকে, কষোপলে কষি'।
তোমার অঙ্গুলিস্পর্শে মুক্তগ্রন্থি জটিলের জটা,
ভাস্বর করেছ তুমি অস্যুৎকীর্ণ হীরকের ছটা।
[illegible]াহিত তথ্যপুঞ্জ তব পাশে পড়িয়াছে ধরা,
[illegible] করেছে তোমা স্বয়ংবরা যুক্তিপরম্পরা।
তব নীতি-মাল্য বঙ্গ সমাদরে বরিল উষ্ণীষে
প্রীতিমাল্য তব কণ্ঠে বিনিময়ে দিল সে হরিষে।

সত্যরাজরথ্যাপরে রথধ্বজা তুলি, কর্ম্মবীর,
করেছ বিজয়যাত্রা। কৃতাঞ্জলি ভক্তিনত শির
দাঁড়াইল দুই পাশে মৌনে পৌর জানপদ যত,
রাজশ্রীমণ্ডিত মৌলি কত শত হইল প্রণত।
স্তব্ধ আজি ব্রহ্ম-ক্ষত্র, সেই জৈত্র রথের ঘর্ঘর
শিবিরে ফিরেছ তুমি জয় করি' জীবন-সমর।

কাঁদিছে হিমাদ্রি, তার নবীভূত মৈনাকের শোক,
ভারতের এ দুর্দ্দৈবে কাঁদে আজি সারা জীব-লোক।
কাঁদিছেন সুরধুনী পুন তাঁ'র ভীষ্মেরে হারায়ে,
কাঁদিছেন বঙ্গমাতা কোটি বাহু আকাশে বাড়ায়ে।
কাঁদেন বাগ্দেবী, শোকতন্ত্রী বাজে অশ্রুধারাঘাতে,
ক্ষুধিত মরাল কাঁদে, পদ্মবন মুদিত প্রভাতে।
কাঁদে বিশ্ববিদ্যালয় লক্ষ লক্ষ নয়নে তাহার
গ্রন্থ, যন্ত্র ভাসাইয়া ঝরে খর অশ্রুর পাথার।
কাঁদে দীনা বঙ্গভাষা শত কণ্ঠে, সহস্র নয়নে,
অনাথ-আশ্রম হ'তে এনে যারে বাণীর আসনে,
বসাইলে, যা'র পদে নোয়াইলে উদ্ধতের শির,
সে আজিকে উচ্চ রোলে করে সারা বিশ্বেরে বধির।
তিব্বতী, তামিল, পালী, হিব্রু, গ্রীক, আর্ম্মেনী, ফরাসী,
তা'র সাথে কেঁদে সারা। সাঁওতালী, পুস্ত, নাগা, খাসী,
যাদের মর্য্যাদা দিলে, বাণীকণ্ঠহারে দিয়া স্থান
শবরী-কবরী হ'তে, তারা আজি শোকের তুফান।
আসিংহল জম্বুদ্বীপ, চীন হ'তে তুরস্কের শেষ,
শতার্দ্ধ ভাষায় কাঁদে তোমা লাগি সারা মহাদেশ।
আবেস্তাজাতক কাঁদে, বাইবেল, পুরাণ, কোরাণ
কাঁদে হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, পারসীক, ইস্‌লাম, খৃষ্টান।
সাহিত্য, বিজ্ঞান, প্রত্ন, ইতিহাস, দর্শন, গণিত,
আজন্ম যত্নের ধন, যা'রা তব বুকের শোণিত,
এই মূঢ় জড়-দেশে মুক্তিপথে যারা পরিত্রাতা
তোমার পদাঙ্কে তা'রা আজি শোকে লুটাইছে মাথা।
বঙ্গের যৌবন কাঁদে কর্ণধারহীন তরী পরি;
শৈশব কৈশোর কাঁদে প্রত্যাসন্ন দুর্ব্বিপাক স্মরি'
পরীক্ষা-পূতনা হ'ল তব মন্ত্রে যশোদার প্রায়
বালগোপালের দল আজি পুন ভয়ে চমকায়।

সর্ব্বশাস্ত্রসমাশ্রয়, প্রজ্ঞালোকে কল্পতরূপম,
গণ্ডূষে পিইলে তুমি পণ্ডা-সিন্ধু অগস্ত্যের সম।
কাঞ্চনজঙ্ঘার মত উর্দ্ধমুখী তোমার গৌরব,
কাঞ্চনচম্পার মত তব গুণ যশের সৌরভ,
শান্ত, দান্ত, কুশাগ্রধী, ব্রহ্মতেজে ভাস্বর উজ্জ্বল,
কপটতা শঠতার চিরশত্রু, সংগ্রামে অটল,
অকুণ্ঠ কুঠার তোমা জামদগ্ন্য করিল অর্পণ,
নিঃশঙ্ক, অসংখ্য সনে যুঝিয়াছ সহস্রলোচন;
শিবরুদ্র সমবায়ে ব্যক্তিত্বের পূর্ণ-পরিণতি,
মূর্ত্তহোমহুতাশন, অষ্টবজ্র শক্তির সংহতি।
তোমারে রচিল প্রজ্ঞারশ্মিরাজি অধিশ্রয় লভি,'
আজি তুমি অস্তমিত মনঃসৌর-জগতের রবি।

জীবনে অন্বর্থনামা, ভীমকান্ত তুমি আশুতোষ,
ক্ষেমবন্ধু, ক্ষমাসিন্ধু, শুভ্রস্মিত সদা বীতরোষ,
তব রাজভূষাতলে অক্ষমালা, কিরীটে ধুতুরা ;
পত্নী তব অন্নপূর্ণা লোকমাতা চির-স্নেহাতুরা।
রুদ্র তুমি হান শূল অবিতথ অনৃতের বুকে
কে পারিত দাঁড়াইতে ও ললাট-বহ্নির সম্মুখে ?
'মুখ' তুমি, বঙ্গমা'র ভীতিরুদ্ধ অন্তরের বাণী
হুঙ্কারি' কহিলে বিশ্বে তাই তোমা মুখপাত্র জানি।
হে আচার্য্য, 'উপাধ্যায়' তপোগুরু, আশ্রমে তোমার
শ্রমণ স্নাতক কত লভে গেল ব্রহ্মবিদ্যাসার।
তব নালন্দার মঠে দীক্ষা নিল কত পর্য্যটক,
কত দীপঙ্করে তুমি দেশে দেশে পাঠালে সাধক।
তব মঠে শীলভদ্র জিনমিত্র ধর্ম্মপালগণ
মহামানবের তরে করিতেছ কল্যাণ মনন।
হে 'সম্বুদ্ধ', তব কীর্ত্তি, বঙ্গে মহাবোধির বোধন,
তব চৈত্যসঙ্ঘারাম, মহাভিক্ষু পরশে গগন।
তুমি বোধিদ্রুম সম, সুবিরাট তোমার ছায়ায়
বরিয়া আনিলে তুমি সিদ্ধার্থের ধ্যানে পুনরায়।

ছিলে রাজ'চক্রবর্ত্তী,' মনোরাজ্যে তব রাজসূয়,
প্রেমে বিশ্ব বশীভূত, দূরীভূত সকল প্রত্যূহ।
বাৎসল্যের মধু-উৎস, প্রেমলোকে সোমের মতন
হেমসিংহাসন হ'তে বহু উচ্চ তব রত্নাসন।
মূর্ত্ত সারস্বতব্রত, বেদব্রাহ্মী তোমার দীধিতি
লভিল তোমায় বুঝি সরস্বতী পৌরুষ প্রকৃতি।

বিদ্যাসাগরের যোগ্য ভক্ত শিষ্য, বঙ্গে তাঁ'র ধারা
শুভ্রমনোভাবতলে তব গুণে হয়নিক হারা।
উর্জ্জস্বল সত্যসন্ধ, তাঁরি মত তেজস্বী ব্রাহ্মণ
বীরসিংহ, মাননিক কারো কোন' ভ্রূভঙ্গিশাসন।
ক্ষুদ্র স্বার্থ, তুচ্ছ যশ, রুদ্রমূর্ত্তি রাজা কি সমাজ
সব হ'তে বড় 'সত্য' চিত্তে তব রাজ অধিরাজ।
জাগাইল শৌর্য্য তব অরাতিরো সভক্তি বিস্ময়,
বঙ্গের শশকচিত্তে ঘুচাইলে শাসকের ভয়।

করিয়াছ রাজসেবা কোন' দিন করনি গোলামী,
দাসত্ব করেনি চিত্ত, হয়নিক কারো অনুগামী।
চাণক্যের মত তুমি করিয়াছ দর্পে সচিবতা,
ক্ষাত্রশক্তি চিরদিন ব্রাহ্মণের চরণে প্রণতা।
রাজসিংহাসন ঢেকে বসিয়াছ হে নরশার্দ্দূল,
তব পার্শ্বে সিংহদের শিবা বলি হইয়াছে ভুল।

বিরাট ব্যক্তিত্ব তব, মন্ত্রসিদ্ধ তর্জ্জনী-হেলনে
সহস্র উদ্যত ফণা অনুদ্ধত লুটেছে চরণে।

ভাষায়, ভূষায়, ভাবে, ভঙ্গি, নিষ্ঠা, অশনে, ব্যসনে
জাতীয় স্বাতন্ত্র্যগর্ব্ব রক্ষিয়াছ ও আর্য্যজীবনে।
রাণা প্রতাপেরি মত ছিল তব চিত্তের প্রতাপ
নিজস্বতা বিসর্জ্জনে জেনেছিলে নারকীয় পাপ।
নমস্ত করেছ নিঃস্ব বঙ্গমা'রে এই বিশ্বলোকে,
বাড়ালে মর্য্যাদা তাঁ'র বিজাতীয় বিজেতারো চোখে।
'স্বধর্ম্মে নিধন শ্রেয়ঃ পরধর্ম্ম ভয়াবহ' জানি'
সর্ব্ব অর্থে সর্ব্বভাবে পালিয়াছ ভাগবত বাণী।
বিজাতীয় মোহে মুগ্ধ, স্বার্থলুব্ধ, গতানুগতিক
ক্ষুদ্রচেতা শুদ্রমনা চাটুকারে দেছ শত ধিক।
পাশ্চাত্য-শিক্ষার হ্রদে রোহিতের সম অধিকারী
সফরীরা লভিয়াছে লজ্জাকুণ্ঠা তোমায় নেহারি।

ব্রহ্মার ভাণ্ডার লুঠি' খুলিয়াছ জ্ঞান বিশ্বজিৎ
ডেকেছ সে যজ্ঞে মহামানবেরে তুমি পুরোহিত।
পাশ্চাত্য প্রাচ্যের মহামিলনের প্রয়াগসঙ্গমে
বর্ষে বর্ষে কুম্ভমেলা অনুষ্ঠিত তোমার আশ্রমে।
সারস্বত দানসত্রে করিয়াছ প্রবেশে অবাধ
সুলভ করেছ তুমি হে আচার্য্য মায়ের প্রসাদ।
নূতন করিয়া তুমি গঠিয়াছ জাতীয় জীবনে
নবীন প্রেরণা দিলে এ দেশের কৈশোর যৌবনে।
তোমার আকাঙ্ক্ষা, আশা, অনুভূতি আদর্শ তোমার,
চিত্তে চিত্তে বিলাইয়া ব্রত তব করেছ প্রচার।
চিরতরে গেছ তুমি হেন কথা বলিব কেমনে ?
নিজেরে লক্ষধা করি' রেখে গেছ জীবনে জীবনে।

হে ভাস্কর, অস্ত গেলে, স্মৃতি তব রক্তাভ্র আকাশে,
সূর্য্যের মরণ কোথা ? সে যে ব্যোমে ফিরে ফিরে আসে।
নিজ দ্যুতি রাখি কোটি তারকায়, গ্রহ, উপগ্রহে,
সূর্য্য যায় অস্তাচলে, লুপ্ত নয় সে যে সুপ্ত রহে।
তামসী শর্ব্বরীশেষে পুন তব হইবে উদয়
সমাপ্ত তোমার কর্ম্ম এ কথা ত মনে নাহি লয়।
ভাগ্যে তুমি নহ যোগী, ইহদ্বেষী, আত্মমোক্ষকাম,
জাতীয় মুমুক্ষা তব জপমন্ত্র ছিল অবিরাম,
ভাগ্যে তুমি কর্ম্মফল কর নাই ব্রহ্মে সমর্পণ,
ব্রহ্ম হ'তে দেশ তব শ্রেষ্ঠতর সাধনার ধন।
পুনর্জ্জন্ম দিবে তোমা কর্ম্মঘন প্রাক্তন তোমার,
সাধিতে অপূর্ণ ব্রত বঙ্গভূমে ফিরিবে আবার।

শ্রীকালিদাস রায়।

মূর্ত্তি ও মন্দির

৪

মথুরায় শক-কুষাণ যুগের শিল্পিগণ মূর্ত্তির কায়া মাত্র গড়িতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু সেই কায়ায় সজীবতা এবং রসোদ্দীপনী শক্তি সঞ্চারিত করিয়াছিলেন মধ্য এবং প্রাচ্য ভারতের গুপ্তযুগের শিল্পিগণ। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দের প্রথম ভাগে প্রাচ্য ভারতে গুপ্তরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এবং চতুর্থ শতাব্দী সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই প্রায় সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত গুপ্তসম্রাটের পদানত হইয়াছিল। এই শতাব্দে রাষ্ট্রীয় একতা প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে আর একটি মহত্তর ব্যাপার ঘটিয়াছিল ; আর্য্যাবর্ত্তে প্রাচীন অর্ব্বাচীন দেশীয় বিদেশীয়, সকল প্রকার শিক্ষা-দীক্ষার সমন্বয়ের ফলে যাহা এখন হিন্দু-সভ্যতা নামে পরিচিত, তাহা আবির্ভূত হইয়াছিল। কুষাণসম্রাটগণের সময়েই বোধ হয় এই সমন্বয়ের সূত্রপাত হয়। কুষাণ-যুগে যে এই ব্যাপার কত দূর অগ্রসর হইয়াছিল, শেষ কুষাণ সম্রাটের বাসুদেব নামেই তাহার সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়। অধ্যাপক কার্ণ [ভট্টকর্ণ] দেখাইয়াছেন, ভগবদ্গীতায় উপদিষ্ট ভক্তিতত্ত্বের সহিত মহাযানসূত্র সদ্ধর্ম্মপুণ্ডরীকে নিবদ্ধ উপদেশের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। কুষাণ-গুপ্তযুগে ভক্তির প্রচার শিক্ষা-দীক্ষা সমন্বয়ের নিশ্চয়ই বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। যখন প্রাচীন জ্ঞানমার্গ এবং বৌদ্ধ-নীতিমার্গ প্রবল ছিল, তখন সাধকগণের মধ্যে যাঁহারা নিম্ন অধিকারী, তাঁহারাই কেবল ধর্ম্মতৃষ্ণার তৃপ্তিসাধনের জন্য শিল্পের আশ্রয় লইতেন। কিন্তু ভক্তি সাকার ধ্যানকে সাধক-সমাজের সর্ব্বোচ্চ স্তরে পৌছাইয়া উচ্চাঙ্গের শিল্পের অভ্যুদয় সাধিত করিয়াছিল। মনুষ্যের সর্ব্বোচ্চ কল্পনা ঈশ্বরকল্পনা ; এবং ঐশ্বরিক ভাবকে নয়নমনের গোচর করান মনুষ্যের শিল্পের সর্ব্বোচ্চ লক্ষ্য। গুপ্তযুগের ভক্তগণ মথুরার কারখানায় উদ্ভাবিত কায়া লইয়া সেই মহান লক্ষ্য সাধনের জন্য ব্রতী হইয়াছিলেন। তাঁহাদের এই মহাব্রত সফল হইয়াছিল। ভারতের শিল্পী দেবভাব প্রকাশে যতটা সাফল্য লাভ করিয়া গিয়াছেন, পৃথিবীর আর কোন দেশের আর কোন যুগের শিল্পী তত দূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। আর্য্যাবর্ত্তে গুপ্তযুগে যে মন্দির ও মূর্ত্তিনির্ম্মাণরীতি অর্থাৎ স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহা নানা পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া নানা শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া প্রায় সহস্র বৎসর জীবিত ছিল। এই সুদীর্ঘ কালের আর্য্যাবর্ত্তের শিল্পের ইতিহাসের অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করাও এখানে অসম্ভব। এখানে কেবল দুই একটি উদাহরণ দিয়া উহার অন্তর্নিহিত রস-ধারার আভাস দিতে চেষ্টা করিব।

এই মধ্যযুগের স্থাপত্যের পরিণতি শিখর বা মঞ্জরী-বিশিষ্ট মন্দিরে। মন্দিরের নিম্নভাগ গর্ভগৃহ এবং উপরিভাগ শিখর নামে পরিচিত। গর্ভগৃহ গবাক্ষহীন ; উহার ভিতরে আলোকপ্রবেশের একমাত্র পথ সম্মুখের দ্বার। সুতরাং আধ-আঁধারে অথবা প্রদীপের ক্ষীণ আলোক ভিন্ন গর্ভগৃহের অভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত আরাধ্য বস্তু বা প্রতিমা দর্শনের উপায় নাই। আঁধার অজ্ঞেয়তাসূচক, আধ-আঁধার রহস্য সূচিত করে। মনুষ্যের প্রকৃত আরাধ্য বস্তু অজ্ঞেয় নহে, কিন্তু অতীন্দ্রিয় এবং রহস্যাবৃত গর্ভগৃহের অভ্যন্তরের আধ-আঁধার সর্ব্বদাই উপাসককে এই তথ্য স্মরণ করাইয়া দেয়।

ভারতীয় মন্দিরের নির্ম্মাণপদ্ধতির আর একটা বিশেষত্ব, উপরিভাগের ভার বহনের জন্য খিলানের পরিবর্ত্তে সমান্তরালভাবে প্রস্তরফলক বা ইষ্টক সাজান হয়। হিন্দুরা যে প্রাচীনকালে খিলানের ব্যবহার জানিতেন, তাহার প্রমাণের অভাব নাই। খিলান অতি প্রাচীনকালে ব্যাবিলনে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। গ্রীক শিল্পীরা ব্যাবিলনের নিকট হইতে অনেক বিষয় ধার করিয়া থাকিলেও খিলান গ্রহণ করেন নাই। তাহার কারণ, খিলান তাঁহাদের ভাবের

এবং রুচির সহিত খাপ খায় নাই। হিন্দুরাও সেই নিমিত্তই মন্দিরে খিলান ব্যবহার করেন নাই। খিলান ঠেলাঠেলি, প্রতিযোগিতা, অধৈর্য্য সূচিত করে। আর ভার বহনের জন্য সমান্তরালভাবে সাজান প্রস্তরফলক বা ইষ্টক সূচিত করে শান্তভাব, সংযম, তিতিক্ষা। স্থাপত্যের অন্তর্নিহিত ভাব বিষয়ে এতদূর পর্য্যন্ত গ্রীক এবং হিন্দুর মধ্যে সাদৃশ্য আছে। কিন্তু হিন্দুর মন্দিরের উচ্চ শিখর প্রকাশ করে হিন্দু-হৃদয়ের অন্য একটি ভাব,—গর্ভগৃহস্থ আরাধ্য বস্তু লইয়া তৃপ্ত না থাকিয়া আকাশব্যাপী অনন্তের অন্তে পৌছিবার জন্য উর্দ্ধমুখী প্রবল আকাঙ্ক্ষা। গথিক গির্জ্জার শিখর সূক্ষ্মাগ্র খিলানের পৃষ্ঠারূঢ় হইয়া এই আকাঙ্ক্ষা আরও তীব্রভাবে প্রকাশ করে। কিন্তু গথিক আকাঙ্ক্ষার এই তীব্রতার সহিত যেন অসহিষ্ণুতা জড়িত আছে। হিন্দুর মন্দিরের শিখরে এই উর্দ্ধমুখী আকাঙ্ক্ষার সহিত সংযম এবং তিতিক্ষার সামঞ্জস্য সাধিত হইয়াছে।



মহিষমর্দ্দিনী, খিচিং, ময়ুরভঞ্জ

হিন্দুর প্রাচীন স্থাপত্য হিন্দু সভ্যতার স্বভাবগত আর একটি লক্ষণ প্রকাশ করে। বলা বাহুল্য, শিল্পশাস্ত্রে মন্দিরনির্ম্মাণ সম্বন্ধে বিস্তর নিয়ম আছে। সেই নিয়মগুলি পাঠ করিলে মনে হয়, হিন্দুর স্থাপত্য নির্জ্জীব নকলনবিশী; ইহাতে শিল্পীর ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং উদ্ভাবনী শক্তি নিয়োগের কিছুমাত্র অবকাশ নাই। কিন্তু যে সকল প্রাচীন মন্দির এখনও বিদ্যমান আছে, তাহা পরীক্ষা করিলে দেখা যায়, স্থাপত্যে হিন্দুর উদ্ভাবনী শক্তি আশ্চর্য্যরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। যে সকল মন্দির এখনও বিদ্যমান আছে, তাহাদের আকারে অনেক বৈচিত্র্য লক্ষিত হয়; এবং মন্দিরের শোভাসম্পাদক ভাস্কর্য্যে ত বৈচিত্র্যের সীমাই নাই।

আর্য্যাবর্ত্তের মধ্যযুগের মন্দিরের মধ্যে ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মন্দির সর্ব্বোচ্চ এবং সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। এই মন্দিরের পীঠ (plinth) নাই। গর্ভগৃহের প্রাচীর প্রাঙ্গণ হইতে একেবারে গাঁথিয়া তোলা হইয়াছে। শিখর যদিও বঙ্কিমভাবেই গড়া হইয়াছে, মন্দিরের উচ্চতা নিবন্ধন শিখরের বঙ্কিম ছাঁদ শীঘ্র লক্ষিত হয় না; মনে হয়, যেন শিখরটি কাত হইয়া মন্দিরের কারুকার্য্য সুন্দর হইলেও সুন্দর দেখায় না। তাহার কারণ, কারুকার্য্যের বাহুল্য বশতঃ কোন



নাগ, খিচিং, ময়ূরভঞ্জ

অংশই ভাল করিয়া দেখিতে পাওয়া যায় না বা উপভোগ করা যায় না। লিঙ্গরাজ মন্দিরের কারুকার্য্যে এইরূপ চক্ষুর পীড়াদায়ক বাহুল্য নাই। মন্দিরের গাত্রে যে পার্শ্বদেবতার মূর্ত্তি, অষ্টদিকপালের মূর্ত্তি এবং ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক দৃশ্য অঙ্কিত হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটির চারিদিকে মনোহর লতাকর্ম্ম আছে। কিন্তু লতাকর্ম্মের বাহিরে খানিকটা যায়গা কারুকার্য্যহীন সাদা থাকায় এই প্রতিমা এবং লতাকর্ম্ম ভালরূপে দেখা যায়।

৬

হিন্দুর দেবতা-কল্পনার প্রধান বিশেষত্ব, হিন্দুর দেবতা একাধারে উপাস্য এবং উপাসক। ঋগ্বেদে আছে, যজ্ঞভাগী দেবতারা নিজেরা যজ্ঞ করিয়া স্বর্গলাভ করিয়াছিলেন। যজুর্ব্বেদমতে স্বয়ং প্রজাপতি প্রজাসৃষ্টির জন্য তপস্যা করিয়াছিলেন। মহাভারত-পুরাণাদিতে পুনঃপুনঃ উক্ত হইয়াছে, শিব মহাযোগী, এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি প্রয়োজনমত তপশ্চরণ করিয়া থাকেন। মধ্যযুগের দেবদেবীমূর্ত্তির উৎকৃষ্ট নিদর্শনে এই উপাস্য উপাসকের ভাবের সুন্দর মধুর মিলন দেখা যায়। দেবতার প্রতিমার কায়ায় উপাস্য দেবতার লক্ষণ সকল বিদ্যমান রহিয়াছে, কিন্তু মুখমণ্ডলে ফুটিয়া উঠিয়াছে গভীর ধ্যানমগ্ন উপাসকের ভাব। একসঙ্গে অনেকগুলি উৎকৃষ্ট মূর্ত্তি দেখিলে মনে হয়, "কত যোগীন্দ্র ঋষি মুনিগণ, না জানি কি ধ্যানে মগন।"

উঠিয়াছে। অথচ প্রকৃত প্রস্তাবে শিখর ঈষৎ বাঁকা হওয়ায় সেই কাত ভাব চক্ষুর পীড়াদায়ক হয় না। প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়া মন্দিরের আমলকের দিকে তাকাইলে বোধ হয়, কেহ যেন দেহ মন প্রাণ ঊর্দ্ধে টানিয়া তুলিতেছে। এই বিরাট রেখদেউলের রেখা ছাঁদ যেমন মনোহর, ইহার সকল অংশই তেমনই মানানসহি।

লিঙ্গরাজ মন্দিরের বহির্ভাগের কারুকার্য্য এবং ভাস্কর্য্য সুন্দরও বটে এবং দেখায়ও সুন্দর। অনেক

মধ্যযুগের হিন্দু শিল্পীরা নিশ্চলভাবে উপবিষ্ট বা দণ্ডায়মান মূর্ত্তিতে এই ধ্যানের বা যোগের ভাব প্রকাশ করিয়া ক্ষান্ত হয়েন নাই, অনেক মূর্ত্তিতে ক্ষিপ্রগতির সঙ্গে সঙ্গেও তাঁহারা এই ভাব ফুটাইয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছেন, এবং অনেক মূর্ত্তিতে অন্য প্রকার ভাবও প্রকাশ করিয়াছেন। এবার আমার ময়ূরভঞ্জরাজ্যের প্রাচীন রাজধানী খিচিং, তাম্রশাসনোক্ত খিজ্জিঙ্গকোট্টের, ভগ্নাবশেষ খননের সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল। ময়ূরভঞ্জের

বর্ত্তমান অধিপতির পূর্ব্বপুরুষ বশিষ্ঠগোত্রীয় ভঞ্জবংশীয় নৃপতিগণ সম্ভবতঃ দশম একাদশ শতাব্দে খিচিংএর ঠাকুরাণীর বর্ত্তমান মন্দিরের সন্নিহিত ভগ্নস্তূপে পরিণত মন্দিরগুলি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই ভগ্নস্তূপে কুড়াইয়া বা খনন করিয়া যে সকল প্রতিমার ভগ্নাংশ পাইয়াছি, উদাহরণস্বরূপ তাহার কয়েকটির চিত্র এখানে প্রকাশ করিব।

কূর্ম্মপুরাণের অন্তর্গত ঈশ্বর-গীতায় কথিত হইয়াছে, এক সময় সনক, সনন্দ, সনৎকুমার, কপিল, কণাদাদি মুনিগণ নর-নারায়ণের নিকট উপস্থিত হইয়া জ্ঞানযোগ সম্বন্ধে উপদেশ চাহিয়াছিলেন। তখন নরঋষি অন্তর্হিত হইলেন এবং নারায়ণ তাপসবেশ পরিত্যাগ করিয়া শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ধারণ করিলেন। এমন সময় শশাঙ্কশেখর শিব আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং নারায়ণের অনুরোধ অনুসারে ঋষিগণের নিকট জ্ঞানযোগ ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। উপসংহারে শিব বলিলেন—

"সোহহং প্রেরয়িতা দেবঃ পরমানন্দসংশ্রিতঃ।
নৃত্যামি যোগী সততং যস্তদ্বেদ স যোগবিৎ॥"

"(জগৎ) প্রেরয়িতা (পরিচালক), পরমানন্দময়, যোগী (যোগাভ্যাসরত) সেই আমি সর্ব্বদা নৃত্য করিয়া থাকি; যে তাহা জানে, সে যোগবিৎ।" তাহার পর—

"এতাবদুক্ত্বা ভগবান্ যোগিনাং পরমেশ্বরঃ।
ননর্ত্ত পরমং ভাবমৈশ্বরং সম্প্রদর্শয়ন্॥"



নাগ, খিচিং, ময়ূরভঞ্জ

"এই বলিয়া যোগিগণের পরমেশ্বর ভগবান্ (শিব) পরম ঐশ্বর ভাব দেখাইয়া নৃত্য করিয়াছিলেন।"

চিত্রে দেখা যায়, একখানি নটরাজ প্রতিমার উপরের অংশ এবং পাদপীঠ কোন প্রকারে জোড়া দিয়া ফটো তোলা হইয়াছে। প্রতিমার দেহের অধিকাংশ ভাগই এখনও পাওয়া যায় নাই। তথাপি এই ভগ্নাংশ দেখিয়াই মনে হয়, পুরাণের বর্ণনা যেন মূর্ত্তি ধারণ

করিয়াছে। নটরাজের মুখমণ্ডলে চিত্তবৃত্তির সম্পূর্ণ নিরোধজাত যোগানন্দ সমাধির ভাব চমৎকার প্রতিবিম্বিত হইয়াছে; কমনীয় দেহখানি ধীর-গম্ভীরভাবে নৃত্যের ছলে বিশ্বলীলার অভিনয় করিতেছে। তামিল দেশের সুপ্রসিদ্ধ নটরাজ মূর্ত্তিতে গতিশীলতা প্রবলতর। খিচিংএর মূর্ত্তিতে গতির ও স্থিতির, জ্ঞানের ও কর্ম্মের সামঞ্জস্য সাধিত হইয়াছে।

অপর চিত্র খিচিংএ প্রাপ্ত একখানি মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি। এই মূর্ত্তির নিম্নভাগ বড় অসাবধানে ক্ষোদিত হইয়াছে, বোধ হয়, আনাড়ীর হাতের কায। কিন্তু উপরার্দ্ধ বড় সুন্দর। মার্কণ্ডেয়পুরাণান্তর্গত দেবী-মাহাত্ম্যে মহিষমর্দ্দিনীর স্তবে উক্ত হইয়াছে—

"চিত্তে কৃপা সমরনিষ্ঠুরতা চ দৃষ্টা
ত্বয্যেব দেবি বরদে ভুবনত্রয়েঽপি ॥"

"হে দেবি, একা তোমাতেই চিত্তে কৃপা এবং সমর-নিষ্ঠুরতা একত্র দেখা যায়; তুমি ত্রিভুবনের বরদায়িনী।"

এই মূর্ত্তির মুখমণ্ডলে পুরাণোক্ত ভাব সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে। দেবী যেন ইচ্ছার বিরুদ্ধে কঠোর কর্ত্তব্য-জ্ঞানের অনুরোধে এই নিষ্ঠুর অসুরবিনাশ কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন। প্রাচীন গ্রীক ভাস্করেরা যখন হিরেক্লস কর্ত্তৃক সিংহবিনাশের চিত্র বা অন্য কোন অনুরূপ ঘটনার চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তখন নিধনকারী দেবতার মুখমণ্ডল কতকটা সৌম্য করিয়াছেন। কি প্রাচীন গ্রীসে, কি ভারতবর্ষে দেবাসুরের যুদ্ধে অসুরবিনাশের চিত্রে গীতার—

"যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়"

এই আদর্শই প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু গ্রীক ভাস্কর্য্যে হত্যাকারীর মুখে কৃপা প্রকাশিত হয় নাই।

আর একখানি চিত্র খিচিংএর লুপ্ত বড় মন্দিরের নাগমূর্ত্তির। বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে কি দেখিতেছে!

অপর চিত্রে আর একটি নাগ আরাধ্য দেবতার গলে মালা পরাইয়া দিতে উদ্যত হইয়াছেন। মুখমণ্ডল আনন্দে ঢল ঢল।

যে মন্দিরের শোভাসম্পাদনের জন্য খিচিংএর (মহিষমর্দ্দিনী ছাড়া) এই কয়েকটি এবং আরও অনেক দেব-দেবীর এবং নাগনাগীর মূর্ত্তি গঠিত হইয়াছিল, তাহা আকারে ভুবনেশ্বরের ব্রহ্মেশ্বর বা রাজারাণীয়া মন্দিরের অপেক্ষা বড় না হইলেও সৌন্দর্য্যে অতুলনীয় ছিল। যে কিছু ভগ্নাংশ আমরা এ পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহা অবলম্বন করিয়া চিত্রেও যে এই মন্দিরের পূর্ণাবয়ব দেখাইতে পারিব, এমন সাহস করি না। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, এই মন্দিরের গর্ভগৃহের বহির্ভাগের অলঙ্কারে অসাধারণ কলা-কৌশল এবং সুরুচির পরিচয় পাওয়া যায়। বাড়াবাড়ির এবং ইন্দ্রিয়পরায়ণতার নিদর্শন অপেক্ষাকৃত বিরল। যে জিনিষটা দেখিতে ভাল লাগে, সেই জিনিষটাকে অতি-প্রকাশিত বা অতি স্ফীত করিয়া দেখান শিল্পে ইন্দ্রিয়-পরায়ণতার পরিচায়ক। অলঙ্কারের বাহুল্যও ইন্দ্রিয়-পরায়ণতার নিদর্শন। খিচিংএর বড় মন্দিরের কারুকার্য্যে এই ইন্দ্রিয়পরায়ণতা লক্ষিত হয় না, সকল অঙ্গই সংযত-ভাবে অলঙ্কৃত হইয়াছিল। এই মন্দিরের শিখরে অতি অল্প কারুকার্য্য ছিল। যে স্থানের অলঙ্কার সহজে দেখা যায় না, সেই স্থানকে অলঙ্কৃত করা বিড়ম্বনা মাত্র; উচ্চ মন্দিরের শিখর কারুকার্য্যখচিত করা বৃথা পরিশ্রম। লিঙ্গরাজের মন্দিরের শিখরও প্রায় অলঙ্কারশূন্য। মন্দিরের সৌন্দর্য্যের ভিত্তি গঠনের ছাঁদ এবং মানানসহি অঙ্গাবয়ব। যে অলঙ্কার সেই ছাঁদ এবং মানানকে দর্শকের অগোচর করিয়া রাখে, সেই অলঙ্কার স্বতন্ত্র-ভাবে দেখিতে যত সুন্দর এবং সরস হউক না কেন, মন্দিরের হিসাবে কদর্য্য।

৬

সুন্দর মন্দিরের এবং মূর্ত্তির দর্শন ও মনন যেমন রস-বোধ বৃত্তির প্রস্ফুরণের সহায়তা করে, তেমনই কার্য্য-করী বৃত্তির প্রস্ফুরণেরও সহায়তা করে। লিঙ্গরাজের মত মহান্ মন্দির গড়িতে ও সাজাইতে যে অসামান্য ধৈর্য্য, সাবধানতা এবং শ্রমশীলতার দরকার হইয়াছিল, তাহা পুনঃপুনঃ স্মরণ করিলে স্মরণকর্ত্তার অভ্যাসগত জড়তা এবং উচ্ছৃঙ্খলতা কতক পরিমাণে শিথিল না হইয়া পারে না। অন্য জাতির এই প্রকার কীর্ত্তি দেখিলে অনেক সময় নৈরাশ্যের উদয় হইতে পারে; কিন্তু নিজের জাতির নিজের জাতির মহান্ কীর্ত্তি হৃদয়ে আশার সঞ্চার না করিয়া পারে না। উড়িষ্যা কতটুকু দেশ! প্রকৃত

প্রস্তাবে উড়িষ্যা কয় দিনের জন্যই বা একেবারে স্বাধীন রাজ্য ছিল। উড়িষ্যার রাজাকে হয় গৌড়াধিপতির প্রাধান্য স্বীকার করিতে হইত, নহে ত তেলুগুভাষী দক্ষিণ কলিঙ্গের রাজার পদানত হইতে হইত। গঙ্গবংশীয়রা দক্ষিণ কলিঙ্গ হইতে আসিয়া উড়িষ্যা জয় করিয়া থাকিলেও, শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে তাঁহারা উড়িয়াদিগের কাছে পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, যেমন প্রাচীন গ্রীসের কাছে রোম সাম্রাজ্যকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছিল। ভারতবর্ষেও শক, তুখার, হূণ প্রভৃতি আক্রমণকারীকে প্রাচীন হিন্দুদিগের অনুগত হইতে হইয়াছিল। বস্তুতঃ ইতিহাসে দেখা যায়, বাহুবলে যাহা অসাধ্য, শিক্ষা-দীক্ষার বলে অনেক সময় তাহা সাধ্য; শিক্ষা-দীক্ষার বলে স্বরাজ্য কেন, সাম্রাজ্য লাভ করাও যাইতে পারে।

যখন মহাত্মা রাজা রামমোহন প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তখন হিন্দুর শিক্ষা-দীক্ষা মূল হইতে বিচ্যুত হইয়া অধঃপতনের চরমসীমায় পৌঁছিয়াছিল। তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রচলনের সহায়তা করিয়া উনবিংশ শতাব্দের শিক্ষাদীক্ষাকে সময়ের উপযোগী করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু যাঁহারা ইংরেজী শিক্ষাবিধানের প্রকৃত বিধাতা হইয়াছিলেন, তাঁহারা বর্ত্তমান লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন, অতীতের দিকে চাহিয়া,এ দেশের লোকের ধাত হিসাব করিয়া, বিধি-ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। এইরূপ শিক্ষার ফলে যাহা হইবার, তাহা হইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষা-দীক্ষার বিরুদ্ধে এখন দেশব্যাপী বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে। অনেকে জাতীয় শিক্ষা প্রবর্ত্তনের জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন; এখন জিজ্ঞাস্য,—জাতীয় শিক্ষা কি? এ সম্বন্ধে আমাদের যাহা মনে হয়, তাহা সংক্ষেপে নিবেদন করিয়া এই সুদীর্ঘ প্রস্তাবের উপসংহার করিব। আমাদের মনে হয়, যে শিক্ষা জাতিগত আত্মজ্ঞান দান করে, তাহাই জাতীয় শিক্ষা। আমাদের জননী জন্মভূমি আমাদিগের স্বভাবে কোন কোন দোষগুণের বীজ বপন করিয়া রাখিয়াছেন, আমরা আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের নিকট হইতে উত্তরাধিকারীসূত্রে কি প্রকার মতি-গতি শক্তিসামর্থ্য লাভ করিয়াছি,যে শিক্ষার দ্বারা তাহা সঠিক জানিয়া লওয়া যায়, তাহাই জাতীয়-শিক্ষা। যে যুগে আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষরা পূর্ণমাত্রায় আত্মশক্তি প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সেই কুষাণ-গুপ্তযুগের সাহিত্য, শিল্প ও দর্শন আমাদের জাতীয় শিক্ষার ভিত্তি হওয়া উচিত। এই যুগেই রামায়ণ, মহাভারত বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে; অশ্বঘোষ, আর্য্যশূর, কালিদাস, ভারবি, ভবভূতির কাব্য রচিত হইয়াছে; বৌদ্ধ-দর্শন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে; ষড়দর্শনের প্রচলিত ভাষ্য সঙ্কলিত হইয়াছে; এবং হিন্দু আর্য্য-শিল্প জন্মগ্রহণ করিয়াছে। শিল্পে সমাজের বাহ্য এবং অন্তর্জীবনের চিত্র পূর্ণমাত্রায় প্রতি-বিম্বিত হয় এবং দর্শনের সূক্ষ্মতত্ত্বও দৃষ্টিগোচর হয়। এই শিক্ষাসংস্কারে য়ুরোপের দৃষ্টান্ত আমাদের স্মরণীয় এবং কতক পরিমাণে অনুসরণীয়। য়ুরোপের শিক্ষা-দীক্ষার জন্ম হইয়াছিল গ্রীসে খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম ও চতুর্থ শতাব্দে। তাহার পর মেসিডনীয়রা সেই শিক্ষা-দীক্ষার বিস্তারসাধন করিয়াছিলেন; রোম তাহা সযত্নে রক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু য়ুরোপের মধ্যযুগে খৃষ্টধর্ম্মের অনুচর ইহুদীয় সঙ্কীর্ণতা তাহাকে অনেক দিন পর্য্যন্ত পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছিল। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দে ইটালী প্রবর্ত্তিত "রিনায়সান্স" বা নব শিক্ষা অর্থাৎ গ্রীসের পুনরুজ্জীবিত প্রাচীন শিক্ষা-দীক্ষা য়ুরোপকে মুক্তিদান করিয়াছে। আমাদেরও মুক্তির জন্য কুষাণ-গুপ্তযুগের শিক্ষা-দীক্ষার পুনরুজ্জীবন প্রয়োজন। কিন্তু এই পুন-রুজ্জীবনের ব্যবস্থা করিবে কে? যাঁহারা দেশের নায়ক, দেশের ব্যবস্থাপক, তাঁহারা গণের হিতসাধনে এত ব্যস্ত যে, জনে-জনের উন্নতি না হইলে যে গণের প্রকৃত উন্নতি সম্ভব নহে; এ কথা হিসাব করিবার তাঁহাদের যেন অবসরই নাই। সুতরাং এই পুনরুজ্জীবনের ব্যবস্থা করিতে হইবে বাঙ্গালা সাহিত্যকে। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাঙ্গালার শিক্ষা-দীক্ষায় যে প্রাণের চাঞ্চল্য অধিকমাত্রায় দেখা যায়, তাহার কারণ বাঙ্গালা সাহিত্য। সাহিত্য বাঙ্গালীর ভরসা।

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ।

পুরাতন পঞ্জিকা

৯

এই যে "স্ত্রী-জাতির অধিকার—স্ত্রী-জাতির অধিকার" ব'লে আমরা গুম্ফবিশিষ্ট অধম জীব একটা চীৎকার কর্‌তে আরম্ভ করেছি, এটা কেবলমাত্র বাইরে আমাদের পুরুষগিরির একটা পসার বাড়াবার জন্য, নইলে সংসারে যা কিছু সত্য স্বাধীনতা, সত্য অধিকার, তা কেবল একমাত্র স্ত্রীলোকের-ই। পাঠক! যখন বৌমার মেজাজটা ভাল থাকবে, তখন একবার গোপনে মাথার দিব্যি দিয়ে জিজ্ঞেসা করো দিকি যে, 'লক্ষ্মি! এ বাড়ীতে তুমি কর্ত্তা না আমি কর্ত্তা?' ঐ দেখ, মা আমার একটু মুচ্‌কে হাস্‌ছেন। হ্যাঁ বাবাজি, যে দিন তোমার বাপ তোমার হাত থেকে লাটিম কেড়ে নিয়ে একখানি ফার্ষ্ট বুক দিয়েছিলেন, সে দিন কি মনে করেছিলে, একটা অধিকার পেলুম? যে দিন মাষ্টার মশাই বলেছিলেন যে, এই গর্ম্মির ছুটীর পর আমায় ১৩৩টে **Greatest Common Measure** ক'সে এনে দেখাতে হবে, সে দিন কি মনে করেছিলে, একটা অধিকার পেয়েছ? যে দিন বিধবা মা বল্লেন, বাবা, আর আমি সংসার-ও চালাতে পারিনি, পড়ার খরচ-ও জোটাতে পারিনি, একটা চাকরী-বাকরীর চেষ্টা কর, সে দিন কি মনে করেছিলে, আজ একটা অধিকার পেলুম? বৌমা, তোমাকেও জিজ্ঞাসা করি, ঐ যে ছোঁড়া—না হয় মিন্‌সে-ই হ'ল, এই ত নাকে-মুখে দু'টি গুঁজে কোটের বোতাম আঁটতে আঁটতে পরের গোলামী কর্‌তে ছুট্‌ল, এটা কি তোমার রান্নাঘরের ভাঁড়ার ঘরের কর্ত্তৃত্বের অধিকারের চেয়ে বেশী প্রলোভনীয় অধিকার? আর মা লক্ষ্মি, তুমি যদি মুখখানি ঘুরিয়ে বল, "আর আমি আগুনতাতে গিয়ে হাঁড়ি ঠেলতে পারি না, একটা উড়ে-ফুড়ে যা হয় দেখ"; তখন বাবু-উপাধিবিশিষ্ট জীবটি কি বলতে পার্‌বেন, "আমিও আর টাকার জন্য গোলামী কর্‌তে পারিনি, তুমি যা হয় একটা চেষ্টা-বেষ্টা দেখ?" যে রাস্তায় দশপা চল্‌তে আমরা তিনবার গাড়োয়ানের কাছে, মুটের কাছে, টিকেওয়ালার কাছে অপমানিত হই, সেই রাস্তায় তোমাদের চল্‌তে বারণ করি ব'লে কি তোমাদের অধিকার কেড়ে নিই? হিন্দুর ত অবরোধ প্রথা নেই, চোরডাকাতের ভয়ে যেমন সোনা-জহরত সিন্দুকে বন্ধ ক'রে রাখতে হয়, শিলা-বিগ্রহাদি দেব-মূর্ত্তিকে যেমন ইতরের স্পর্শের অন্তরালে মন্দিরমধ্যে রাখতে হয়, সহরের মধ্যে তোমাদের-ও তেমন-ই অন্তঃপুরমধ্যে রক্ষা করি, নইলে পল্লীগ্রামে বা তীর্থস্থানে তোমাদের কোথায় যেতে বাধা মা? কিন্তু নারি! ভালবাসাই তোমার সর্ব্বস্ব, যাকে ভালবাস, তার জন্য প্রাণ অনায়াসে দিতে পার, কিন্তু প্রতিদান-ও তুমি চাও সুদসমেত। কুব্জার ন্যায় ঈর্ষা-দাসী ঐ ভালবাসার পাছু পাছু ঘুরতে থাকে আর ফিস্‌ ফিস্‌ করে। মা'র মতন ছেলেকে কে অমন ভালবাসে, কিন্তু বিয়ে দিয়ে আনার পর সেই ছেলে যদি বৌয়ের ঘরে একটু বেশী বসে, তা'কে লুকিয়ে সাবানটা এসেন্সটা কিনে এনে দেয়, অমনই মা মনে করেন, ছেলে আমার পর হয়ে গেল। এ দিকে আবার স্বামী যদি বাড়ীর ভিতর ঢুকে বলেন, "মা, আমার খাবার হয়েছে, এখন দেবে কি?" অমনই বৌমার অভিমান,—"আমি পরের মেয়ে দু'দিন এইছি বই ত নয়, মা-ই ওঁর সর্ব্বস্ব!"

স্নেহ-ভালবাসার তীব্র আতিশয্যে ঈর্ষার জন্ম, দেহ বৃদ্ধি মানব-মনের এটি প্রাকৃতিক নিয়ম। নারী-চরিত্রের এই বিচিত্রতা সত্ত্বে-ও কুটুম্ব-কুটুম্বিনীপরিবৃত একান্নবর্ত্তী সংসারে সহস্রসংযমে আমাদের দিন এক রকমে চ'লে যাচ্ছিল, কিন্তু পাঠশালা-সাহিত্যে বিলাতী ডুবালের প্রবেশের পর আমাদের বৈঠকী সাহিত্যে যখন বিলাতী প্রণয় বা 'লভ্‌' দেখা দিল, তখন চক্ষুলজ্জার পর্দ্দা একেবারে গুটিয়ে উঠ্‌ল। দু' পাঁচ জন পুরুষ বন্ধু নিয়ে স্বামী যে বাড়ীতে ব'সে একটু খোসগল্প আমোদ-আহ্লাদ করেন, এটা মেম-সাহেবদের বড় সহ্য হয় না, তাই বিলাতে সন্ধ্যার পর আনন্দের জন্য ইতর-সাধারণের মদের দোকান আছে, আর ভদ্রলোকের আছে ক্লব্‌; আমাদের সংসার চালিয়ে তার উপর ক্লব চালাবার কড়ি নেই, আর একবার কর্ম্মস্থল

থেকে ফিরে কাপড়-চোপড় ছেড়ে ফের যে ধড়াচুড়ো এঁটে বাইরে বেরুব, তার শক্তি বা উৎসাহ নেই ; সুতরাং বৈঠকখানার পাঠ উঠিয়ে দিয়ে শয়ন-মন্দিরে "দেহি পদপল্লবমুদারম্" বৈ গতি কি ! গিন্নী যদি কৃপা ক'রে দু'খানা রুটী সেঁকতে যান, কর্ত্তা ততক্ষণ ঘরে নজর-বন্দী। এই জন্যে একটা ছুটী-টুটী পেলেই স্বামী-মশাইরা অমনি পাশ পেয়েছি-টেয়েছি যা হোক্ একটা অছিলা ক'রে বাড়ী ছেড়ে প্রবাসে চম্পট দেন ; প্রবাসে কেবল বন্ধুসমাগম হয় না, অনেক নূতন বন্ধু-ও জোটে।

মা ! কিছু মনে করো না, আমি তোমাদের নিন্দা করিনি, যা করেছি, তা ব্যাজস্তুতি। শাস্ত্র, সংস্কার, প্রবৃত্তি সব-ই আমার মস্তক নারীর চরণে অবনত ক'রে দেয়। পুরুষ বীর হ'তে পারে, কিন্তু তোমরা বীরপ্রসবিনী ; পুরুষ বিদ্বান্ হ'তে পারে, কিন্তু নারী বিদ্বানের জননী ; ত্যাগী সন্ন্যাসী পুরুষের-ও প্রসূতি রমণী।

১০

এই কলিকাতার পুরাতন দিনে এক জন মহীয়সী মহিলা যে তেজ, সাহস ও প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্বের অভিনয় দেখিয়ে গেছেন, তার একটা গল্প বলি।

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান্ কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা একবার মতলব করলেন যে, জেলেরা কলকাতার সম্মুখস্থিত গঙ্গায় জাল ফেলে মাছ ধ'রে বিক্রী ক'রে ফাঁকি দিয়ে খায়, অতএব এই গঙ্গায় মাছ ধরার ইজারা দিলে কোম্পানীর বেশ একটা আয় হ'তে পারে ; অমনি ইজারার নোটীশ-ও বেরুল। বিপন্ন জেলেরা মুখের অন্ন ইংরাজরা কেড়ে নিচ্ছে, এই ভয়ে রাণী রাসমণির দরজায় গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়ল ; রাণী সব কথা শুনে বল্লেন, ওদের যেতে বল, আমি এর বন্দোবস্ত কচ্ছি। কর্ম্মচারীদের হুকুম দিলেন, যত টাকা ডাক উঠে, আমার নামে ইজারা ডেকে নাও ; আশাতিরিক্ত টাকায় রাণীর নামে ডাক উঠল, ইংরাজ-উকীলের বাড়ী থেকে পাকাপোক্ত দলিল লেখাপড়া হ'ল, এখন চিৎপুর থেকে মেটেবুরুজ পর্য্যন্ত রাণী রাসমণির ইজারা। ইজারা পেয়ে-ই রাণী আর এক উকীল দিয়ে কোম্পানীকে নোটীশ দিলেন যে, কলকাতার সামনে গঙ্গার জলের উপর যত জাহাজ, বোট, ভড় প্রভৃতি আছে, এ সব তিন দিনের মধ্যে সরিয়ে নেওয়া হ'ক, নইলে মাছ সব জাহাজ টাহাজের তলায় গিয়ে লুকায় আর আমার ইজারার সম্পূর্ণ সর্ব্বভোগে ব্যাঘাত ঘটে। কোম্পানীর চক্ষু স্থির ! বাঙ্গালার বাঘিনীর বুদ্ধির প্রভাবে অর্থলোভী ইংরাজের বিড়াল-চক্ষু বিস্ফারিত ! তখন সাধ্য-সাধনা, অনুরোধ-উপরোধ, সুপারিস-আরাধনা, শেষ—খরচা-খেসারত দিয়ে ইজারা ফেরত, সেই অবধি গঙ্গায় ও-সব উৎপাত আজ-ও হয়নি।

আজ আমরা হ'লে হয় জেলে-মালার কথা ভ্রূক্ষেপে-ও আন্তাম না, আর না হয় সভা করতুম, বক্তৃতা দিতুম, রেজিলিউসন পাশ করতুম, আর্টিকেলের উপর আর্টিকেল লেখা যেত, আর বোম্বাই, মাদ্রাজী, বর্ম্মা, সিংহলী, ভাটিয়া, মাড়োয়ারী সব মিলে প্রসেসন্ ক'রে গঙ্গাস্নান ! কেমন ইংরাজ জব্দ হ'ত, সব বাসায় গিয়ে ম'রে থাকত।

আর একবার ঐ রাণী রাসমণি একা ক্ষেপা গোরার দল তাড়িয়েছিলেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে মিউটিনির পর পশ্চিমাঞ্চল একটু ঠাণ্ডা হ'লে কলকাতায় বেজায় গোরার আমদানী হয় ; সেই সময়-ই হাইলাণ্ডার গোরার এ দেশে প্রথম প্রবেশ, লোকে এদের নেংটা গোরা বলত। কেল্লা, দমদমা, বারাকপুর এ সব যায়গায় আর গোরা ধরে না, কাজে-ই কুইন্স কালেজ, হিন্দু কালেজ, ফ্রি স্কুল এই রকম অনেক বাড়ীতে-ই গোরাদের বাসা দেওয়া হয় ; একে রক্তখেকো গোরা, তাতে মদ খেয়ে মাতাল ; সেই সময় তাদের উৎপাতে কলকাতার অনেক লোক অস্থির হয়ে উঠেছিল। এক দিন্ দুপুর-বেলা কতকগুলো মাতাল গোরা রাণী রাসমণির বাড়ী ঢুকে পড়ে, দরওয়ানরা তা'দের রুখতে না পেরে পালিয়ে যায়, সরকার লোকজন-ও যা ছিল, চম্পট দেয়, বাবুরা তখন কেহ বাড়ীতে ছিলেন না, অন্দরে মেয়েরা ভয় পেয়ে ছাতের উপর দিয়ে পাশাপাশি বাড়ীতে পালিয়ে যান, একা রাণী রাসমণি দু' হাতে দু' তরোয়াল নিয়ে ঠাকুরঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ান ; গোরারা অন্দরে ঢুকেছিল, কিন্তু ঠাকুরঘরের কাছ পর্য্যন্ত

পৌঁছুতে পারেনি, এমন সময় পুরুষদের কে বাড়ীতে ফিরে আসেন, পুলিসে ও কেল্লায় খবর পাঠান হয়, সেখান থেকে পল্টন সার্জ্জন সব এসে গোরাদের বের ক'রে নিয়ে যায়। এই রাণী রাসমণি বাঙ্গালীর মেয়ে, কলকাতার বৌ। যাঁরে আমরা এখন অশিক্ষিতা নারী বলি, তিনি প্রকাণ্ড জমীদারী চালিয়েছেন রাণীর মত! কোম্পানীর কুটিল কৌশলকে ব্যর্থ করেছেন চাণক্যের চেয়ে চক্রীর মত! দক্ষিণেশ্বরে কালীমন্দির প্রতিষ্ঠা ক'রে সাক্ষাৎ ভগবান্ রামকৃষ্ণ দেবের কৃপা লাভ করেছেন, ভক্তিমতী সাধিকার মত। সাধে কি সেকালের যশোরের জনকতক চাষা কল্‌কাতা দেখতে এসে দেশে ফিরে গেলে যখন তাঁ'দের গ্রামবাসীরা জিজ্ঞাসা করেছিল, "সব-ই ত দেখেছিস্, কিন্তু রাণী রাসমণিকে দেখেছিস্?" তাতে তা'রা উত্তর দিয়েছিল, "দেখেছি বৈ কি—ইয়া গোঁফ, ইয়া চৌপাট্টা দাড়ী, এক ধারে এক ছালা চিঁড়ে মজুত, আর এক ধারে এক ছালা চেনি মজুত, একবার এক থাবা চিঁড়ে-ই বা গালে পূরছে, আবার এক থাবা চেনি-ই বা গালে পূরছে।" চাষা-বুদ্ধিতে চিঁড়ে চিনি ঐশ্বর্য্যের পরিচায়ক আর চৌপাট্টা দাড়ী-গোঁফ বীরত্বের পরিচায়ক।

তখন আমাদের শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট দিয়ে প্রায় প্রত্যহ প্রাতে-ই বাজনা বাজিয়ে গোরার পল্টন, সেপাইর পল্টন, ঘোড়সওয়ার পল্টন, কামানের গাড়ী কুচ ক'রে যেত; শিখ পল্টন-ও সেই প্রথম কলকাতায় আসে, তখন-ও তা'দের ব্যাণ্ডের বদলে দেশী বাদ্য ঢোল-সানাই ছিল। শ্যামবাজারের রাস্তায় মাতাল গোরার তখন বড়ই উৎপাত ছিল, গৃহস্থলোকের প্রায়-ই সদরদরজা বন্ধ ক'রে বাস করতে হ'ত; এক দিন দুটো গোরা কিন্তু বেশ আপনাপনিই জব্দ হয়েছিল, দুঃখের কথা, হাসিরও কথা বটে। Aristotle বলেছেন, painless infirmity একটা comic দৃশ্যের উপাদান; ঘটনাটা নেহাৎ যাতনাশূন্য না হলে-ও মারাত্মক নয়, তাই বলছি।

ফড়েপুকুরের কাছাকাছি অমনি এক যায়গায় একটা বুড়ী এক চেঙ্গারি ওল বেচছিল, দিব্যি রাঙ্গা রাঙ্গা বড় বড় ওল; দুটো গোরা সেখান দিয়ে যেতে যেতে ঐ ওলের চেঙ্গারি দেখিয়ে ইসারায় জিজ্ঞাসা করে, "ও কি করে?" বুড়ী ইসারায় মুখে হাত তুলে বুঝিয়ে দেয় যে, "খায়।" গোরা দুটি দু'জনে দুটো ওল তুলে নিয়ে বুড়ীকে দুটো টাকা ফেলে দেয়; সে সময় বোধ হয় দুটো ওল দু' পয়সার বেশী হবে না, সুতরাং বুড়ী তুলে দিয়েছে, এখন-ই এসে কেড়ে নেবে, মনে ক'রে গোরারা একটু এগোতে-ই চাঙ্গারি মাথায় ক'রে স'রে পড়ে। গোরারা মদের সঙ্গে চাট্ করবে মনে ক'রে ওল দু'টি হাতে ক'রে পাঁচ মাথার দিকে যেতে যেতে আর লোভ সংবরণ করতে না পেরে এক একটা মুকী গালের ভিতর পূরে চর্ব্বণ—আর অমন-ই গোটা নাল ভাঙ্গন আর গালফুলো গোবিন্দর মা। বুড়ীকে ত আর খুঁজে পেলে না, তার পর এর দরজায় ধাক্কা মারে, ওর দরজায় লাথি মারে, আর যেন গর্জ্জে বেড়াতে লাগল। এমন সময় এক জন দোকানী সাহস ক'রে এগিয়ে গিয়ে ইসারাইঙ্গিতে বুঝিয়ে নিজের দোকানে নিয়ে গিয়ে খানিকটে তেঁতুলগোলা খাইয়ে দিলে, তবে কতকটা সুস্থির হয়। দোকানী বুঝিয়ে দিলে, ও জিনিষ সিদ্ধ ক'রে খেতে হয়, অমনি খেতে নেই। তবে একটা লাভ—ওলে দুটো টাকা গেল বটে, কিন্তু রমের দামটা বেঁচে গেল। সেই মুখ-কুট্‌কুটুনির উপর মদ পড়লে আর রক্ষা থাকত না।

১২৭১ সালের বিজয়ার কোলাকুলির পর মন থেকে প্রতিমা-বিসর্জ্জনের অবসাদ ঘোচাবার জন্য দুটা সামাজিক খোসগল্প ক'রে নিলুম। পূজা ফুরুল, কিন্তু এখন-ও পূজার ছুটী ফুরুতে দেরি আছে। যখন রেল হয়নি বা হয়েও বেশী বিস্তৃতি লাভ করেনি, তখন এই পূজার সময়-ই চাকরেরা প্রবাসের কর্ম্মক্ষেত্র হ'তে নিজের বাস্তুতে এসে পারিবারিক গৃহস্থালীর মধ্যে দিন কতক জুড়াবার অবকাশ পেতেন, সেই জন্য-ই পূজায় একটা লম্বা রকম ছুটীর ব্যবস্থা ছিল, ক্রমে এখন তা'র সঙ্কোচ হয়ে আসছে। রেল হবার পরে আবার কলকাতাবাসী চাকুরেদের মধ্যে কেউ কেউ একটু বাইরে বেড়াতে যাবার সখ মেটাতে আরম্ভ করেন। নৌকায় বা বজরা ক'রে বেড়াতে যাবার ব্যবস্থা-ও তখন পর্য্যন্ত ছিল। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে আমি-ই বাবা ও তাঁর দু' এক জন বন্ধুর সঙ্গে মস্ত এক নৌকায় চ'ড়ে কালনা পর্য্যন্ত পূজার

ছুটীতে বেড়াতে যাই; আর আয়েস ক'রে বেড়াবার জন্ত নৌকা গদাইনস্করি চালে চলে, মাঝে মাঝে গঙ্গার ধারে কার-ও বাগানে বা বড় রকম একটা গঙ্গার চড়ায় ছোট তাঁবু খাটিয়ে রান্না-খাওয়ার ব্যবস্থা হ'ত; এই রকম ভাবে কালনায় পৌঁছুতে প্রায় দিন ছয়েক লেগেছিল। ৭১ সালে-ও রাঢ় ভূমিতে ম্যালেরিয়া শেকড় গাড়েনি, সুতরাং কলকাতার ভদ্রলোক সুখচর, চুঁচুড়া, ফরাসডাঙ্গা, বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থানে পূজার ছুটীতে বেড়াতে যেতেন। তখন বর্দ্ধমান থেকে লোক বেড়িয়ে ফিরে এলে-ও পাড়ার পাঁচজন এসে সেখানকার রাজবাড়ী, শ্যামসায়র, গোলাপবাগ, গোলকধাঁধা, সুন্দরের সুড়ঙ্গ প্রভৃতির গল্প শুনতে আসত; আর যিনি রাজমহল ভাগলপুর মুঙ্গের পর্য্যন্ত ঘুরে আসতেন, তিনি ত একেবারে নূতন বিলেতফেরত W. C. Bonnerjee। সখ, সঙ্গতি বা সুহৃদ যাঁদের নিয়ে যেতে পারলে, তাঁ'রা ত্রয়োদশীর দিন-ই কলকাতা হ'তে শুভযাত্রা করলেন, বাকি বেশীর ভাগ বাড়ীতে ব'সে-ই ছুটী কাটাবার যা হোক্ একটা উপায় ক'রে নিলেন। স্কুলের পণ্ডিত মশাইরা পূজার কয় দিন প্রায় কোন না কোন বাড়ীতে ব্রতী ছিলেন, এখন টোল বন্ধ ক'রে দেশে গেলেন; মাষ্টার মশাইরা বাড়ীর ও-পাড়ার ছেলেদের ধ'রে ধ'রে ঘরে পুরে সমস্ত দুপুর বেলাটা পুরাণো পড়া পড়াতে আরম্ভ করলেন, আর কেরাণীরা ঘরে বসেও কেরাণীগিরির মহলা দিতে লাগলেন। কেরাণী তখনও ছোট কথা হয়নি, কেরাণী কথার সঙ্গে তখন-ও মর্য্যাদা মাখান ছিল; তখনও বাঙ্গালীরা হাতের লেখার চর্চ্চা কলাবিদ্যার হিসাবে করতেন। মেল-রাইটার, বুক-কিপার তখনকার বড় চাকরে, এঁরা ৩।৪ দিন অফিস কামাই করলে অনেক সময় আফিসের সাহেব তাঁ'দের বাড়ীতে পর্য্যন্ত দেখতে ছুটে আসতেন; সালঙ্কার ওল্ড ইংলিশ লিপিকর্ম্ম-পটু উকীল-পাড়ার কেরাণী গয়ংগচ্ছ ক'রে বেলা ১২টার পরও আফিস পৌঁছুলে সুইন হো এণ্ড ল' জাতীয় মনিবগণ তাঁ'দের বড় একটা বেশী বকতে-টকতে পারতেন না। তখন যাঁদের বাড়ীতে লেখাপড়ার চর্চ্চা ছিল, তাঁ'দের বাড়ীতে একটা বা ততোধিক মাদুরে ব'সে লেখবার উপযোগী ডেস্ক থাকত। অনেক কেরাণী-ই তখন হাতে বাঁধা পাগড়ী মাথায় দিয়ে আফিস যেতেন; পাগড়ী একটা ইজ্জতের চিহ্ন, তখনকার রিপুকর্ম্ম দরজী ও নাপিত-ও মাথায় পাগড়ী বাঁধত। নিত্য আহারের পর মাথায় পাগড়ী বাঁধা অভ্যাস হওয়ায় কেরাণীরা ছুটীর দিন-ও আহারের পর মাথায় একটা চাদর জড়াতেন, না হ'লে তাঁ'দের উর্দ্ধক হ'ত; সেই চাদর মাথায় জড়িয়ে তাঁ'রা ব'সে যেতেন ডেস্ক নিয়ে সমস্ত দিন ধ'রে ব'সে লিখতে; অভ্যস্ত কর্ম্ম ছুটীর খাতিরে স্থগিদ রাখলে পাছে লেখা খারাপ হয়ে যায়, আর আলস্যে ঘুম আসে, এই আশঙ্কায়-ই তাঁ'রা লেখা কায পারতপক্ষে বন্ধ রাখতেন না। গোরা ইঞ্জিনিয়ারদের মধ্যে একটা সংস্কার আছে, তাঁ'রা সোমবারে কোন নূতন কায আরম্ভ করেন না; ইহার কারণ বোধ হয়, রবিবারে বিশ্রামের পর সোমবারে মিস্ত্রী ও কর্ম্মীদের হাত একটু জড়সড় থাকে। ইষ্টমন্ত্র জপ থেকে কুটনো-কোটা মাটী-খোঁড়া প্রভৃতি সকল কায-ই নিত্য অভ্যাসের ফলে ধোপদস্ত থাকে।

আমরা ছেলেরা ত কবে ছুটী ফুরুবে, সেই দিন গুণতে আরম্ভ করিছি, একে বাড়ীতে-ও সেই nominative governs the verb আছে,—$(\frac{3}{4}+\frac{1}{8}+\frac{9}{16}) \div (\frac{2}{3}+\frac{7}{15})$ গোছ অঙ্ক কসা আছে। তার উপর নূতন জুতো, ক্লাশ-ফ্রেণ্ডদের দেখাতে পারছিনি,—স্কুলটা যদি নিদেন এক দিনের জন্ত খুলে আবার বন্ধ হয়, তা হ'লে বাঁচি।

ভাগ্যে কোজাগর পূর্ণিমা এসে পড়ল, তাই কতকটা আবার উৎসাহ এল। দশভুজার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে-ই ছানার সন্দেশের অন্তর্ধান ও নারিকেলছাপার আবির্ভাব, কোজাগরের রাত্রিতে সেই নারিকেলছাপা আর তার সঙ্গে ঝুনানারিকেল চিঁড়ে আর তালের ফোঁফল ভক্ষণে একটা নূতন আমোদ, কিন্তু তার চেয়ে বেশী আমোদ ঐ দিন শেষ রাত্রে আমরা যাত্রা শুনতে পাব। পাড়ায় মৈত্র মশাইদের বাড়ী খুব ধুমধামে দুর্গোৎসব হ'ত, ঐ তিন দিন খিচুড়ী, সাদা ভোগ ও লুচি মিঠাইএর দীয়তাং ভুজ্যতাংএর ভিড়ে রাজু ঢুলীর ঢাক-ঢোল ছাড়া আর কোন প্রকারের আমোদের বন্দোবস্ত থাকত না। যাত্রা হ'ত কোজাগরের রাত্রে। সাজ বাজনা আরম্ভ হ'ত বটে রাত দুপুরের পর-ই, কিন্তু

আমরা রাত্রি ৩টা৪টার আগে যাবার হুকুম পেতুম না।

এবার নিমাই দাসের যাত্রা, পালা রাবণবধ। আমরা যখন পৌছুলুম, তখন আসরে "দা দিনি দো দিনিক্ দিদো" বাজনার বোল চলছে, আর রাবণ একখানা টিনের তরোয়াল হাতে ক'রে লম্বা লম্বা পা তুলে ফেলে নাচছে। এখনকার পাঠক, তোমরা রাবণ কখন দেখতে পেলে না, এটা আমার একটা বড় আপশোষ। থিয়েটারে যে বেহারী চাটুয্যে, অমৃত মিত্তির, ক্ষেত্তর কেত্তর ওরা কি আর রাবণ,—যেন মাণিকপীর! রাবণ দেখেছি আমি আর আমার সেকালের সেই খেলুড়ীরা। রাবণ পরেছেন ইজের, তার উপর শালুর লম্বা ঝুলদার চাপকান, মুড়োয় সব চওড়া জরির ফিতা লাগান, আর নিজের মুখে একটা মস্ত মুখোস, আর ঘাড়ের দিক থেকে লাগান যেন একখানা ছোটখাট টানাপাখা, সেই টানাপাখায় দু' দিকে আর আটটা মুখ আঁকা, ঘাড়ের পিছন দিকে আর একটা মুখোসের মুখ। আরে বাপ্ রে! রাবণের মত রাবণ বটে! আর সেই রাবণ নাচছে "দা দিনিদো দিনিক দিদো"—সেই নাচটা হচ্ছে তার বীররস—সেই নাচের বীররসের ঝাঁঝ কতকটা এদানীকার সখীদের পায়ে নেমেছে। কিন্তু নিমাই দাসের রাবণের চেয়ে বিখ্যাত অভিনেতা ছিল তার মন্দোদরী। মন্দোদরীর নাম ছিল ঝোড়ো; ঝোড়ো নাচতে গাইতে বলতে সব দিকে মজবুত, ঝোড়োর নাচের বিচিত্রতার কথা বোধ হয় আমি প্রবন্ধান্তরে বলেছি, সুতরাং পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন।

বর্ত্তমান যুগে থিয়েটারের বড় বড় অভিনেতাদের মুখের উপর ইলেকট্রিক লাইট দেওয়া ফেসান হয়েছে, কিন্তু আমাদের সেকালে বাঙ্গালা লেখাপড়া করা, সুতরাং অশিক্ষিত যাত্রাওয়ালারা আর্টের এই কদরটুকু জানতেন; যাত্রা হ'লেই দু'জন মশালচি আনাতে হ'ত, তারা দু'দিক থেকে দু'টো জলন্ত মশালের আলো প্রধান প্রধান গায়ক ও অভিনেতাদের মুখের সামনে ধ'রে থাকত। বালক-বালিকা শ্রোতাদের যাত্রার আসরে একটু বিশেষ কায ছিল, গান আরম্ভ হ'লেই শুয়ে প'ড়ে নাক ডাকান আর সং এলেই তড়াক ক'রে উঠে ব'সে আনন্দ আহ্লাদের হাসিতে আসর আলো ক'রে দেওয়া। নবীন নাট্যকারগণ, সহজ-মানবপ্রকৃতির এই বাল-লক্ষণ দেখে আপনারা অঙ্ক সাজাবার একটা ইঙ্গিত পেতে পারেন।

অধিকারী মশাইরা এই প্রাচীনকে মাফ করবেন, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, কার পরামর্শে কোন্ বে-রসিক ধনীর বিদ্‌ঘুটে সখ মেটাবার চেষ্টায় আপনারা সেই গোবিন্দ রাধাকৃষ্ণ নীলকণ্ঠ মার্জ্জিতরুচি মতি রায় ভূষণ দাস প্রভৃতি প্রবর্ত্তিত প্রথা পরিবর্ত্তিত ক'রে থিয়েট্রিক্যাল যাত্রা নাম দিয়ে এই কাঁঠালের আমসত্ত্ব, ছোকরার গান দোয়ারকী প্রভৃতি বাদ দিয়ে একটা কিম্ভুত পদার্থ সৃষ্টি করেছেন? [ক্রমশঃ।

শ্রীঅমৃতলাল বসু।

চিত্রিতা

[বৃন্দাবনে শেঠমহাত্মাদের মর্ম্মর হর্ম্ম্যগাত্রে লিখিত (Tresco Painting) প্রাচীর-চিত্র দর্শনে লিখিত]

ভেসেছিলে প্রেমাকর চিত্রকর ধ্যানে,
মরাল গ্রীবার ভঙ্গী—ক্ষীণবর তনু,
ভুরুশর বাঁকায়েছে যেন ফুলধনু,
কাহারে বিঁধিতে যেন দর্পে ফুলবাণে।
হেমন্তশিশিরশুভ্র সিক্ত শ্বেত শাড়ী,—
জড়ায়ে রয়েছে অঙ্গে;—নতা শ্রোণীভারে,
কণ্ঠে কেশে মণিমালা, অধর আধারে
অতি মৃদু রঙ্গ হাসি চিত্ত লয় কাড়ি।

পথে বাধা রাধারাণী চেয়েছে পশ্চাতে
টানিছে নিচোল বুঝি রঙ্গী শ্যামরায়,
স্খলিত মন্থর গতি চিত্রিতার প্রায়,
অপাঙ্গে কটাক্ষ, বক্ষ ঢাকা দু'টি হাতে।
সজল অঞ্চল হ'তে বারিবিন্দু ঝরে,
মুক্তারাজি ইন্দুচক্র শিখী পান করে।

শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ।

নারী-জাগরণ

মার্কিণদেশে রাজনীতিক্ষেত্রে নারীর অভ্যুত্থান কিরূপ কার্য্যকর হইয়াছে, সে সম্বন্ধে প্রবল আন্দোলন চলিতেছে। রাজনীতিক্ষেত্রে সত্যই নারী-সম্প্রদায় বিশেষ আগ্রহ দেখাইয়াছেন কি না, বাস্তবিক এ বিষয়ে তাঁহাদের অভ্যুত্থান বা জাগরণের বিশেষ কোন মূল্য আছে কি না, সে সম্বন্ধে নানা দিক হইতে নানা সংবাদপত্রে বিবিধ আলোচনা হইতেছে। 'লিটারারী ডাইজেষ্ট' পত্রে এ সম্বন্ধে সংপ্রতি একটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধও প্রকাশিত হইয়াছে।

উল্লিখিত প্রবন্ধ পাঠে জানা যায় যে, অনেকে এমন প্রশ্ন করিতেছেন, নারীর নিকট 'ভোট' বা মতের মূল্য এবং অর্থ কি দাঁড়াইয়াছে, তাহা বুঝা যায় না। সত্যই কি নারী তাঁহার ভোট ব্যবহার করেন? রাজনীতিক্ষেত্রে এ জন্য প্রকৃতই কি কোন পরিবর্ত্তন অনুভবযোগ্য হইয়াছে? সাধারণ ব্যাপারে মার্কিণ নারীরা কোনও অনুরাগ দেখাইতেছেন কি? এইরূপ নানা প্রশ্ন নানা ব্যক্তি উত্থাপিত করিতেছেন। কেহ কেহ আবার এমন কথাও বলিতেছেন যে, রাজনীতিক ব্যাপারে নারী এত অল্প সংখ্যায় যোগদান করিতেছেন যে, তাহা সম্পূর্ণ উপেক্ষণীয়। আবার এমন কথাও শুনা যাইতেছে যে, শুধু পুরুষের ভোটসংখ্যাকে দ্বিগুণ করা ব্যতীত ইহাতে আর কোনও ফল হয় নাই।



শ্রীমতী ম্যাক হণ্ট নোলাস, মার্কিণ-কংগ্রেসের সদস্য—কন্যাসহ

'লিটারারী ডাইজেষ্ট' পত্রের সম্পাদক বলিতেছেন, উল্লিখিত প্রশ্নগুলি আমাদের নহে। অনেক সাময়িক ও সংবাদপত্রে ঐ প্রকার প্রশ্ন কিছু দিন হইতে প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে।

বাস্তবিক সে কথা অতিরঞ্জন নহে। 'আটলাণ্টিক' নামক পত্রে শ্রীমতী জর্জ্জ ম্যাডেন্ মার্টিন নাম্নী কোনও মহিলা বিগত ফেব্রুয়ারী মাসে লিখিয়াছেন যে, তিনি বিগত ১৪ মাস পুনঃ পুনঃ যুক্তরাজ্যে গতায়াতের ফলে এই বুঝিয়াছেন, মার্কিণ-নারীরা রাজনীতিক্ষেত্রে কোনও প্রকার আসক্তি প্রকাশ করেন না। তিনি পল্লী ও সহর সর্ব্বশ্রেণীর নানা নারীর সহিত মিশিয়া দেখিয়াছেন, প্রকৃতপক্ষে সাধারণ ব্যাপারে, রাজনীতিক্ষেত্রে কাহারও কোন প্রকার আসক্তি দেখেন নাই। এমন কি, শিক্ষিতা মহিলারা অনেক সময় দেশে কি ঘটিতেছে, তাহার সংবাদ পর্য্যন্ত রাখেন না,



মহিলা সদস্যের চা-পানের কক্ষ



মহিলা সদস্যের লিখিবার কক্ষ



ইংলণ্ডের মহিলা সদস্য—ভাইকাউণ্টেস এস্টর, ডচেস্ এথল, শ্রীমতী ফিলিপসন্, শ্রীমতী উইন্‌ট্রিংহাম, লেডী টেরিংটন, মিস্ বন্‌ফিল্ড, মিস্ জিউসন

সদস্য প্রার্থিনীর জন্য যখন নির্বাচন কার্য্য চলিয়াছিল, তখন তিনি ভোট দিয়াছিলেন।—লেখক বলেন যে, নারী সদস্য নির্ব্বাচন-ব্যাপারে এইটুকু দেখা গিয়াছে যে, নারী কখনও অপর নারীকে ভোট দিবে না।

প্রবন্ধের উপসংহারে লেখক বলিয়াছেন, "এ বিষয়ে মার্কিণ ও ইংরাজ মহিলার প্রভেদ বিস্ময়োদ্দীপক। ইংলণ্ড অপেক্ষা আমেরিকার গণতন্ত্রপ্রণালীর বিকাশ অত্যধিক। কিন্তু ইংলণ্ডের নারীরা নারীর জন্য যেরূপ ভোট দেন, পরিশ্রম করেন, নারীর পরাজয়ে আপনাদিগকে পরাজিত বলিয়া মনে করেন, স্বাধীনতার লীলাভূমি মার্কিণে ঠিক তাহার বিপরীত। ইংরাজ মহিলারা স্বচ্ছন্দে ভোট দিয়া থাকেন, কিন্তু মার্কিণ-মহিলারা স্বামী, পিতা ও ভ্রাতার নির্দ্দেশানুসারে ভোট দিয়া থাকেন। ইহার হেতু নির্ণয় করা কঠিন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, মার্কিণে নারী-জাগরণের কোনও সুফল প্রত্যাশা করা যায় না।"

নিউইয়র্ক হইতে প্রকাশিত 'টাইমস' পত্র এই বিষয়ের আলোচনা করিয়া এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন,—"নারী-সমস্যার এই ব্যাপারে অন্ধকারের মধ্যে এইটুকু আলোক দেখা যাইতেছে যে, নারী এখনও মৃদুস্বভাবা, কোমলহৃদয়া এবং স্নেহ-প্রেম দয়া-মায়া হইতে বঞ্চিতা হয় নাই। তাহাদের হৃদয় এখনও পূর্ব্ববৎ আছে।"

শ্রীমতী ক্যারী চ্যাপ্‌ম্যান ক্যাট আন্তর্জ্জাতিক নারী-সমিতির প্রেসিডেণ্ট। তিনি মিঃ রসেলের প্রবন্ধের জবাব দিয়াছেন। ইংরাজনারী অপেক্ষা মার্কিণ-নারী ভোটের ব্যাপারে কেন উৎসাহ প্রকাশ করে না, তাহার কারণও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে মার্কিণ-নারী যেখানে পুরুষের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে দাঁড়াইয়াছেন, সেখানে পুরুষই দলবদ্ধ হইয়া নারীকে হটাইয়া দিয়াছে। তাহা ছাড়া ইংলণ্ডে শুধু এক পার্লামেণ্টের দ্বারাই দেশের সকল ব্যাপারের মীমাংসা হয়, কিন্তু আমেরিকায় তাহা নহে, ভিন্ন ভিন্ন জিলায় ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা। কাযেই সমগ্র যুক্তরাজ্যের রাজনীতিক অবস্থার পুঙ্খানুপুঙ্খ সংবাদ রাখা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। সুতরাং মার্কিণ-নারীকে তীব্রতার অপরাধে দোষী করা যায় না। অনভিজ্ঞতাকে পড়িয়াই তাহার এই দুর্দ্দশা।

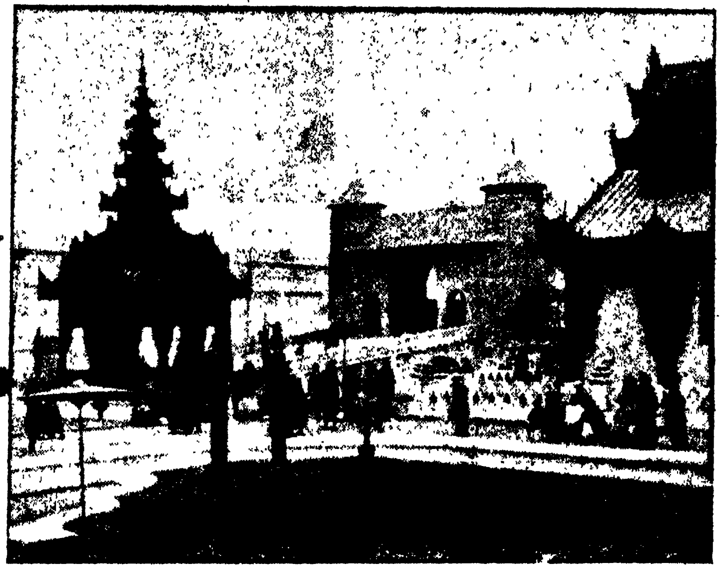
এমন প্রমাণও পাইয়াছেন। উপসংহারে তিনি বলিয়াছেন, "আমার মতে মার্কিণ-নারীরা সাধারণতঃ কোনও রাজনীতিক ব্যাপারে—জাতীয় অনুষ্ঠানে বিন্দুমাত্র আসক্তি অনুভব করেন না।"

চার্লস এডোয়ার্ড রসেল নামক জনৈক প্রসিদ্ধ মার্কিণ লেখক 'মেহুরী' পত্রে মার্চ্চ সংখ্যায় এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাঁহাতে তিনি বলিয়াছেন যে, শুধু ভোটারের সংখ্যাবৃদ্ধি ব্যতীত প্রকৃত কায কিছুই হয় নাই। কোনও নারী দেশের ব্যাপারে আপনাকে তেমন ভাবে সংশ্লিষ্ট রাখেন নাই। ৪ বৎসর ধরিয়া নারী-জাগরণের আন্দোলন সত্ত্বেও যুক্তরাজ্যের কংগ্রেসে মাত্র এক জন নারী সদস্য হইয়াছেন। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসে সভ্যনির্ব্বাচনের সময় ২২ জন নারী সদস্যপদপ্রার্থী ছিলেন। তন্মধ্যে এক জন নারী তাঁহার পিতৃপরিত্যক্ত পদে অস্থায়িভাবে মনোনীত হইয়াছিলেন; কিন্তু অস্থায়িভাবে দীর্ঘকাল

আমেরিকার কংগ্রেসে মাত্র একজন মহিলা সদস্য আছেন, বিলাতে—ইংলণ্ডে সে স্থলে সাত জন মহিলা সদস্য পার্লামেণ্টে কায করিতেছেন।

বৃটিশ সাম্রাজ্যপ্রদর্শনী

ইংলণ্ডে, ওয়েম্ব্লিতে সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্যপ্রদর্শনীক্ষেত্র দর্শকদিগের জন্য উন্মুক্ত হইয়াছে।' এই বিরাট প্রদর্শনীতে বিভিন্ন দেশের সভ্যতা, শিল্পললিতকলার নিদর্শন সংগৃহীত করিয়া ইংরাজ সমগ্র জগৎকে বিস্ময়মুগ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সমগ্র পৃথিবীর মানচিত্র খুলিলেই ইংরাজের অধিকৃত প্রদেশের রক্তিমবর্ণ দর্শকের মন বিস্ময়ে পূর্ণ করিয়া ফেলে। পৃথিবীর প্রত্যেক মহাদেশে, সমুদ্রগর্ভস্থ দ্বীপাবলীর মধ্যে ইংরাজের অধিকৃত স্থান নাই, এমন ব্যাপার দেখা যায় না। ইংরাজ নিজের মাতৃভূমির বক্ষোদেশে যে প্রদর্শনী খুলিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার অধিকৃত সমগ্র স্থান হইতেই দর্শনীয় দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন। জনৈক বিচক্ষণ দর্শক প্রবন্ধান্তরে এই প্রদর্শনী সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশকালে বলিয়াছেন, "যে স্থানে বৈচিত্র্য, যে স্থানে বিভিন্ন স্বরের সমাবেশ, সেই স্থানেই সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়। আমি এই বিচিত্র প্রদর্শনী দেখিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, বিভিন্ন বিচিত্র বর্ণের সমাবেশে চিত্র যেমন মনোজ্ঞ হয়, এই প্রদর্শনীও প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দেশের পরস্পরবিরোধী সভ্যতা ও বিচিত্র ব্যাপারের সমবায়ে সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে।"



ওল্ড লণ্ডন ব্রিজ

সংবাদপত্রে এই প্রদর্শনী সংক্রান্ত যে সকল বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে এইটুকু বুঝা যায় যে, সমগ্র জগৎকে যেন এক পৃষ্ঠার মধ্যে অঙ্কিত করিয়া দেখান হইয়াছে—ইংরাজ তাঁহার অধিকৃত সমগ্র দেশকে এই প্রদর্শনীতে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

প্রদর্শনীক্ষেত্রে—বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের ভবন নির্ম্মিত হইয়াছে। উহার বারান্দায় দাঁড়াইলে নিম্নে আলোকিত পৃথিবীর বিরাট মানচিত্র দেখিতে পাওয়া যাইবে। এই মানচিত্র অনুক্ষণ আবর্ত্তিত হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিমুহূর্ত্তেই বৃটিশ অধিকৃত স্থানের রক্তরাগচিহ্ন দর্শকের মনকে বিস্ময়বিহ্বল করিয়া তুলিবে। এই গবর্ণমেণ্ট-ভবনে বড় বড় অক্ষরে ইংরাজের অক্ষয়কীর্ত্তির কথা বৃটিশ সরকার লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। এই ভবনের চারিপার্শ্বে ৬টি বিরাট সিংহমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। আর একটি বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় আছে। পৃথিবীর মানচিত্রে সপ্তসমুদ্রের সমাবেশ আছে। সেই ক্ষুদ্রাকার সপ্তসমুদ্রে ক্ষুদ্রতম আকারের বৃটিশ পোতসমূহ ভাসিতেছে—সমুদ্রপথে বৃটিশের জাহাজ কোথা দিয়া কোথায় গমনাগমন করে, তাহা এই দৃশ্য হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়।

বৃটিশ ভবন হইতে বাহির হইয়া দর্শক ইংরাজের নৌবহর, সামরিক ও অসামরিক কার্য্যপদ্ধতির ব্যবস্থা—কিরূপে ইংরাজ কোন্ দেশ জয় করিয়াছে, কিরূপে পালন করিতেছে, কি ভাবে শত্রুর আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া দেশ রক্ষা করিতেছে, তাহার প্রত্যক্ষ পরিচয়জ্ঞাপক নিদর্শন দেখিতে পাইবেন। এই বিভাগে কৃষি, ঔষধ, ডাকবিভাগ, তাড়িতবার্ত্তা, টেলিফোন প্রভৃতি যাবতীয় ব্যাপারের ক্রমোন্নতির পরিচায়ক সকল প্রকার নিদর্শন দর্শকের চিত্তকে বিমোহিত করিবার জন্য শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে সন্নিবিষ্ট আছে। অন্ততঃ এক মাস ধরিয়া পর্য্যবেক্ষণ না করিলে এই বিভাগের সকল ব্যাপার বুঝিয়া উঠা কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে।

পুরাতন লণ্ডন সেতু অতিক্রম করিয়া দর্শক প্রদর্শনীক্ষেত্রের ভারতবর্ষ বিভাগে উপনীত হইবেন। তথায় তাজমহল দণ্ডায়মান। প্রাঙ্গণমধ্যবর্ত্তী নির্ঝরিণী ও জলস্রোত পার হইয়া দর্শক একেবারে বেলুচিস্থানের কার্পেটবয়নকারীদিগের সম্মুখে পৌছিবেন। পার্শ্বে—প্রতি কক্ষে ভারতীয় শ্রমশিল্পজাত দ্রব্যাদির সমাবেশ! ভারতীয় চিত্রশিল্প, অন্য নানাবিধ ললিতকলা-শিল্পসংক্রান্ত দ্রব্য স্তরে স্তরে সজ্জিত রহিয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা দর্শনীয় বিষয় হরিদ্বার রেল ষ্টেশন। মেলার সময় লক্ষ লক্ষ যাত্রী কিরূপে এই প্রসিদ্ধ তীর্থে রেলযোগে গতায়াত



মালয়ভবনের প্রাঙ্গণ

করে, তাহার ব্যবস্থা প্রদর্শিত হইয়াছে। মেলার সময় প্রতিদিন অন্ততঃ ৭৫ হাজার যাত্রী যাহাতে হরিদ্বারে যাইতে পারে, রেলকর্তৃপক্ষকে তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়, তখন যাত্রীদিগের সুবিধা ও স্বাস্থ্যের জন্য গবর্ণমেণ্ট কিরূপ বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন, এই দৃশ্যে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। আদর্শ দৃশ্যে ২৫ হাজার নরনারী, বালকবালিকার মূর্ত্তি আছে। লক্ষ্ণৌ নগরের প্রসিদ্ধ শিল্পীরা এই কুম্ভমেলার দৃশ্য গড়িয়াছে। ভারতবর্ষ বিভাগে গালা ও নীল চাষের দৃশ্যও দেখিতে পাওয়া যাইবে।



পাহাড় হইতে জলে পড়িবার দৃশ্য

সমরকন্দের কার্পেট, কাশ্মীরের রেশম, কাশীর পিত্তলের দ্রব্যসম্ভারের মধ্যে বিষ্ণু, শিব, কৃষ্ণ এবং গণপতির বিবিধ মনোজ্ঞ মূর্ত্তি বিরাজমান।

ভারতবর্ষ হইতে একেবারে হাজার



ব্রহ্মদেশীয় মন্দির

হাজার মাইল দূরবর্ত্তী কানাডার দৃশ্য। এই বিভাগে বিরাট হলঘরের মধ্যে মৃদু আলোকের বন্দোবস্ত আছে। কারণ, এখানকার সকল দৃশ্য সমুজ্জ্বল আলোকে উপভোগ্য নহে। হলঘরের চারিধারে কানাডার প্রাকৃতিক দৃশ্য প্রকটিত। সর্ব্বাপেক্ষা রমণীয় চিত্র ডাক্তভার বন্দর। বন্দর নকল হইলেও সত্যই জলের উপর দিয়া ক্ষুদ্রাকার পোত সকল গতায়াত করিতেছে দেখিতে পাওয়া যাইবে। চুম্বকের সাহায্যে এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে। অথচ দর্শক তাহা বুঝিতে পারিবেন না। নায়াগ্রাপ্রপাতের 'ভীষণে মধুর' দৃশ্যও অনন্যুকরণীয়ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। কানাডার যাবতীয় দর্শনীয় বিষয় এই বিভাগে অতি সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট আছে। কানাডার ফল-ফুলের বাগান প্রসিদ্ধ। প্রদর্শনীক্ষেত্রে তাহা এমনই ভাবে অনুকৃত হইয়াছে যে, অভিজ্ঞ দর্শককে সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিতে হইবে, ইহা কৃত্রিম নহে।

কানাডার রেলপথ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রেলওয়ের উন্নতির জন্যই কানাডার দ্রুত উন্নতি ঘটিয়াছে। প্রদর্শনীক্ষেত্রে সেই রেলপথের দৃশ্য, অতি চমৎকারভাবে দেখান হইয়াছে। কেমন করিয়া মাল চালান দিতে হয়, জলপথ ও স্থলপথে কত দ্রুত মাল স্থানান্তরে পাঠান যাইতে পারে, সে সকল দৃশ্যও বাদ পড়ে নাই। কানাডা বিভাগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট দৃশ্য বান্‌ফ্‌এর প্রাকৃতিক চিত্র। এই পার্ব্বত্যদৃশ্য অতি মনোজ্ঞভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলি সূর্য্যালোকে, চন্দ্রালোকে বা অন্ধকারে যেমন দেখায়, বৈজ্ঞানিক উপায়ে এখানেও তেমনই ভাবে দেখাইবার ব্যবস্থা আছে। কয়েক মিনিট অন্তর একবার দিবা আবার রাত্রি হইতেছে। ইহাতে দৃশ্যগুলির মনোহারিতা আরও বাড়িয়াছে।

কানাডা বিভাগের পরেই অষ্ট্রেলিয়ার প্রারম্ভ। প্রথম দৃশ্যেই দর্শক অভিভূত হইয়া পড়িবেন। যুবকযুবতীরা ফেনপুষ্পিত সমুদ্রতরঙ্গে অবগাহন করিতেছে। প্রমোদপ্রয়াসী যুবকযুবতীর অবগাহনদৃশ্য হইলেও অষ্ট্রেলিয়ার নরনারীরা কর্ম্মপ্রবণ। অষ্ট্রেলিয়াবাসীরা



সদা চলমান গাড়ী



প্রদর্শনীক্ষেত্রে হ্রদের দৃশ্য—বামে পারস্য মন্দির, পশ্চাতে অষ্ট্রেলীয় ভবন

নিরামিষ অপেক্ষা আমিষের ভক্ত। বরফে জমান ভেড়া, গরু প্রভৃতির মাংস কিরূপ ভাবে রক্ষা করা হয়, তাহার দৃশ্য এই বিভাগে প্রচুর। প্রকাণ্ড আকারবিশিষ্ট প্রাণীগুলির মৃতদেহ কি ভাবে খণ্ড খণ্ড করিয়া রাখা হয়, তাহার দৃশ্যও দেখিতে পাওয়া যাইবে। অষ্ট্রেলিয়ার অধিবাসীরা পশুপালন ব্যাপারে বিশেষ তৎপর। কি ভাবে তাহারা গোমেষাদি পালন করিয়া থাকে, তাহার দৃশ্য অতি সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট আছে। ফলসংগ্রহ, উহা শুষ্ক করিবার প্রণালী, তুলার চাষ, স্বর্ণখনির দৃশ্য প্রভৃতি অষ্ট্রেলিয়ার বিশিষ্ট ব্যাপারগুলিও প্রত্যক্ষবৎ দর্শন করিয়া দর্শকের চিত্ত অভিভূত হইয়া পড়িবে।

কানাডার পর নিউজিলাণ্ড বিভাগ। এই ভবনের এক স্থানে ২টি পক্ষিমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যাইবে। এই জাতীয় পক্ষী এখন আর দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রাগৈতিহাসিক যুগে এই শ্রেণীর পাখী অষ্ট্রেলিয়ায় বিদ্যমান ছিল। ইহাদিগকে 'মোয়া' বলিত। আর এক স্থানে এক কাঠুরিয়া কতিপয় চমৎকার ও বিরাট 'বাহাদুরী' কাষ্ঠবেষ্টিত হইয়া দণ্ডায়মান। এই শ্রেণীর কাষ্ঠ নিউজিলাণ্ডের বৈশিষ্ট্য। উল্লিখিত দৃশ্যের পার্শ্বে হস্তিদন্ত ও মুণ্ডের বিবিধ অংশ বিদ্যমান। প্রকৃতপক্ষে সেগুলি হস্তিদন্ত নহে। নিউজিলাণ্ডে এক শ্রেণীর শূকর আছে, কাপ্তেন কুক তাহাদিগকে সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কার করেন। এই শূকরের অস্থি ঠিক হস্তিদন্তের ন্যায় সুদৃশ্য ও মূল্যবান্। নিউজিলাণ্ডের প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলিও অতি মনোরম। আগ্নেয়গিরি এবং তুষারকিরীটী পর্ব্বতগুলি অতিশয় মনোরম। একটি তুষারমণ্ডিত পর্ব্বত জাপানের ফুজিয়ামা আগ্নেয়গিরির মত দেখিতে। নিউজিলাণ্ডের অন্যান্য শ্রমশিল্প—চামড়া পরিষ্কার, বাতি ও সাবান প্রস্তুতপ্রণালী প্রভৃতির দৃশ্যও দর্শকের চিত্তকে অভিভূত করিবে। প্রত্যেক বিভাগে সিনেমার বন্দোবস্তও আছে। তাহাতে সকল বিষয়ই বিশদরূপে দর্শকদিগকে দেখান হইতেছে। নিউজিলাণ্ডের প্রাচীন যুগের



সুইচব্যাক্ রেলে চড়িয়া অবতরণ

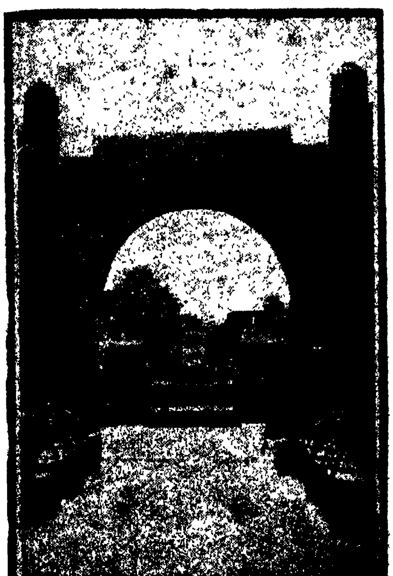
বাদ পড়ে নাই। দেশীয় গৃহ, তাহার নির্ম্মাণপ্রণালী সবই এই বিভাগে দেখিতে পাওয়া যাইবে।

ইহার পরই মালয় বিভাগ। রবার প্রস্তুত করিবার জন্য মালয় প্রসিদ্ধ। বৃক্ষ উৎপাদন হইতে রবার প্রস্তুত করিবার প্রণালী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করিয়া দেখান হইয়াছে। টিনের খনির কায কি ভাবে হইয়া থাকে—পূর্ব্বে কিরূপ ছিল, আধুনিক যুগেই বা কিরূপ, তাহারও দৃশ্য আছে। প্রাচীনকালের চৈনিক খনি অতিশয় উপভোগ্য। রেশমবয়ন ব্যাপারই সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়োদ্দীপক। নারীরা কি ভাবে রেশম প্রস্তুত করিয়া থাকে, তাহা চমৎকারভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। নারীরা রেশম লইয়া তাঁতে বস্ত্র বয়ন করিতেছে—নানা বর্ণের রেশম ব্যবহার করিতেছে, এ দৃশ্য দেখিলে দর্শককে অভিভূত হইতে হইবে। মালয়ের প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলি সযত্নে সন্নিবিষ্ট আছে। অরণ্যানী ও পর্ব্বতের উপর সূর্য্যাস্তদৃশ্যের রমণীয়তা দর্শককে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিবে।

মালয়ের কারুশিল্প বিভাগ দর্শনীয় হইলেও শুনিতে পাওয়া যাইতেছে যে, উহার মৌলিকতা অল্প। বিশেষজ্ঞগণ বলেন, মাদুর-বয়ন শিল্প ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে মালয় ভারতবর্ষ ও যবদ্বীপের নিকট ঋণী। অস্ত্র, বস্ত্র, রৌপ্য নিৰ্ম্মিত দ্রব্যাদির নির্ম্মাণপ্রণালীতে ভারতবর্ষের আদর্শ বিদ্যমান। মালয়ের পর সিঙ্গাপুর বিভাগ। ইহার একটি জিনিষ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সিঙ্গাপুর ডক ও বন্দরের যে নমুনা সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা ইংরাজ দর্শকদিগের পক্ষে অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। ভবিষ্যতে সিঙ্গাপুর রাজনীতিক্ষেত্রে বিশিষ্ট অভিনয়ক্ষেত্র হইবার সম্ভাবনা বলিয়া অনেকের ধারণা। এ জন্য এই বন্দর ও ডকের নমুনাটি বেশ বৃহৎভাবেই দেখান হইয়াছে।



ভারতীয় ভবনের দৃশ্য। সপ্তদশ শতাব্দীর ভাস্কর্য্যের আদর্শে গঠিত



নাইজিরীয় বিভাগ—আফ্রিকার একটি দৃশ্য

তাহার পর সারাওয়াক। এই বিভাগটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রপরিসর হইলেও বহু কৌতূহলোদ্দীপক বিষয় এখানে সংগৃহীত আছে। সারাওয়াকের তৈলের কারখানা সুপ্রসিদ্ধ। কিরূপে তৈল ব্যবহারের উপযোগী করিয়া সংগৃহীত হয়, তাহার দৃশ্য এই বিভাগে আসিলে উত্তমরূপে দেখিতে পাওয়া যাইবে।

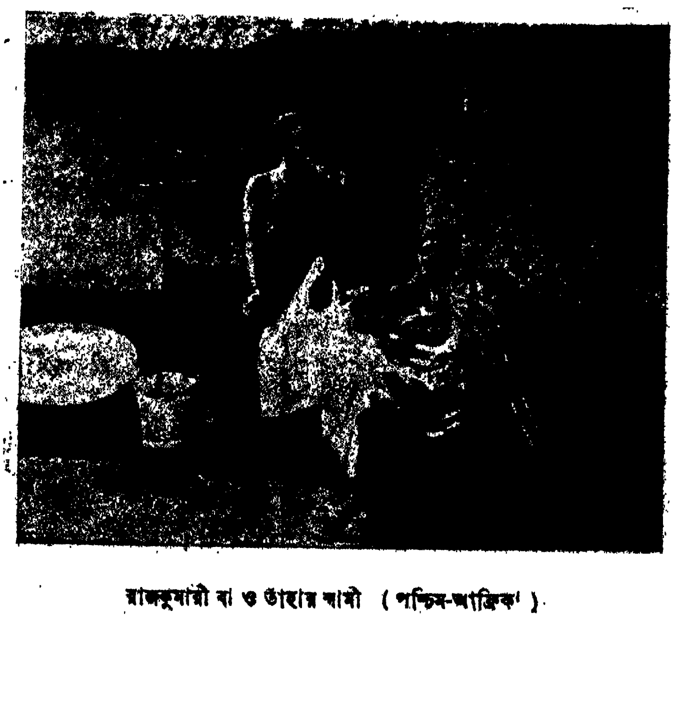
প্রদর্শনীতে হংকং সর্ব্বাপেক্ষা মনোজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছে। এই বিভাগে রাজপথ ও গৃহাদির নমুনা এমন ভাবে সাজান হইয়াছে যে, দর্শককে মনে করাইয়া দেয় যে, তিনি যথার্থই হংকং সহরে ভ্রমণ করিতেছেন। খাটি



বিরাট 'সুইচ ব্যাক্' রেলযোগে দুর্গে আরোহণ

চীনারা এখানে কার্য-কর্ম করিতেছে। এই উপনিবেশকে যথাযথভাবে লোকচক্ষুর গোচর করিবার জন্ত শিল্পীরা হংকং নগরে আদর্শ নমুনা গড়িয়া জাহাজে করিয়া বিলাতে পাঠাইয়াছে। কোথাও কোনও ত্রুটি নাই, এমনই নিপুণভাবে হংকংকে গড়িয়া শিল্পীরা দর্শকমাত্রেরই প্রশংসা অর্জন করিয়াছে।

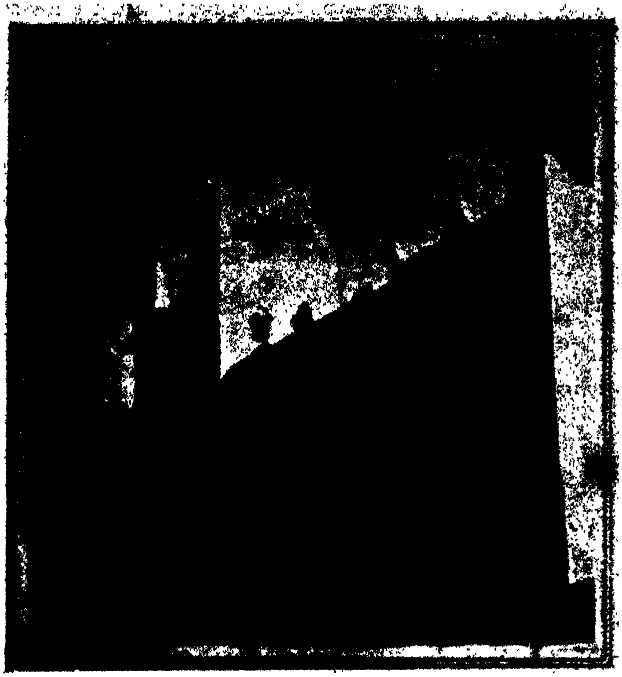
পশ্চিম-আফ্রিকাবিভাগ প্রদর্শনীক্ষেত্রের অন্ততম মনোরম দৃশ্য। এই বিভাগ লোহিত মৃত্তিকা-নির্ম্মিত প্রাচীরে বেষ্টিত। প্রাচীরের অন্তরালে পশ্চিম-আফ্রিকার চমকপ্রদ রহস্তময় দৃশ্তসমূহ সন্নিবিষ্ট। সাহারা মরুভূমি অতিক্রম করিয়া উত্তর-আফ্রিকায় যে মূল্যবান্ পণ্যসমূহ নীত হয়, তাহা অনেকেই জানেন; কিন্তু কোথা হইতে এই সকল দ্রব্য আইসে, তাহার ইতিহাস কয় জন অবগত আছেন? এই নিম্নিত গোল্ড কোষ্ট (Gold Coast) বহুদিন পর্য্যন্ত উপকথায় পর্য্যবসিত ছিল। কিন্তু ক্রমে ইংরাজের অনুসন্ধিৎসা ও অধ্যবসায় প্রভাবে সে রহস্তময় স্থান আবিষ্কৃত হয়। কিন্তু সকল রহস্তের উদ্ঘাটন কি হইয়াছে? এখনও বহু বৈজ্ঞানিক ও পরিব্রাজক পশ্চিম-আফ্রিকার রহস্তাবৃত স্থানের আবিষ্কারে রত আছেন। প্রদর্শনীক্ষেত্রে এই পশ্চিম-আফ্রিকার আবিষ্কৃত প্রদেশ, তত্রত্য শ্রমশিল্প প্রভৃতির মনোজ্ঞ নিদর্শন বহুল পরিমাণে সংগৃহীত হইয়াছে। আফ্রিকার কোনও রাজবংশের মহিলা রাজকুমারী বা স্বহস্তে মৃত্তিকা



রাজকুমারী বা ও তাহার স্বামী (পশ্চিম-আফ্রিকা)

হইতে তৈজস নির্ম্মাণ করিতেছেন, ইহা দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হইবে। পার্শ্বের ঘরে ধাতব পদার্থ হইতে দ্রব্যাদির নির্ম্মাণপ্রণালী প্রদর্শিত হইতেছে। গোল্ড কোষ্ট বিভাগের দর্শনীয় জিনিষগুলি দেখিতে এক সপ্তাহে কুলায় না।

পশ্চিম-আফ্রিকা বিভাগের এক প্রান্তে নাইজিরিয়া বিভাগ বিদ্যমান। এই স্থানে সায়রালিওনি ও আসান্তির গ্রাম ও পল্লীর দৃশ্যগুলি সুসজ্জিত রহিয়াছে। পর্ণকুটীরগুলি দেখিতে যেমন সুন্দর, তেমনই মনোরম। এই স্থানে সামরিক শৃঙ্খলা অত্যন্ত বেশী। ইংরাজ সামরিক কর্ম্মচারীরা সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিতেছেন। এ স্থানে একটা মজার জিনিষ দেখিতে পাওয়া যাইবে। প্রাঙ্গণের ঠিক মধ্যস্থলে একটি চুণকামকরা কাষ্ঠের প্রকাণ্ড খুঁটি পোতা আছে। তাহার উপরিভাগে একটি পাত্রে কিছু খাদ্যদ্রব্য রক্ষিত হইয়াছে। আকাশ-দেবতার [ইন্দ্র ?] প্রীতির জন্য উক্ত খাদ্যদ্রব্য দেশীয়গণ রক্ষা করিয়াছে। আকাশ-দেবতা প্রসন্ন হইয়া বৃষ্টি দান করিবেন বলিয়া উহারা তাঁহার উদ্দেশে ঐরূপ আহার্য্য প্রদান করিয়া থাকে।



পূর্ব্ব-আফ্রিকা—আরব-ভবনের দৃশ্য

নাইজিরিয়ার পরেই পূর্ব্ব-আফ্রিকার সুদানের তুষার শুভ্র প্রাচীর দেখিতে পাওয়া যাইবে। তোরণ-পার্শ্বেই প্রকাণ্ড হস্তী ও সিংহ দ্বার রক্ষা করিতেছে। সুদানের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিয়া দর্শক বহুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া থাকিবেন। এ স্থানের দোকানঘরগুলিতে শতকরা ৭৮ ভাগ বৃটিশ পণ্য, বাকি সব বৈদেশিক। দেশীয় দোকানগুলিতে কালে সবই বৃটিশ পণ্য বিক্রয় করিবে, এইরূপ ব্যবস্থা হইতেছে।

তাহার পরই দক্ষিণ-আফ্রিকা বিভাগ। প্রধান তোরণের সম্মুখে আন্টনি ভ্যান রিবেকের মূর্ত্তি দণ্ডায়মান। ১৬৫২ খৃষ্টাব্দে এই ব্যক্তি কেপটাউনকে অধিকারভুক্ত করিয়া লয়েন। দক্ষিণ-আফ্রিকা বিভাগে শ্রমশিল্পজাত নানাবিধ দ্রব্যাদির সমাবেশ আছে। কেমন করিয়া স্বর্ণ ও হীরকখনির



পশ্চিম-আফ্রিকার হীরকখনিতে মিস্ত্রোরা হীরক পরিষ্কার করিতেছে



নাইজিরীয় ভবনের দৃশ্য

কার নির্ব্বাহ করা হয়—কিরূপে হীরাকে খনি হইতে তুলিয়া কাটিয়া ছাটিয়া ব্যবহারোপযোগী করা হয়, এ সকল ব্যাপার প্রদর্শনীতে আসিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে। অষ্ট্রীচ পাখীর বিভাগে দেখিবার ও জানিবার মত অনেক বিষয় আছে। এ স্থানে পাখীরা চলিয়া বেড়াইতেছে। পক্ষিশালার পার্শ্বেই দক্ষিণ-আফ্রিকার রেলষ্টেশনের দৃশ্য। প্লাটফরমে একখানি ট্রেণ দাঁড়াইয়া আছে। গাড়ীগুলির দ্বার খোলা। যে কেহ তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে পারেন। দর্শকরা পান-ভোজন করিতে চাহিলে রেস্তোঁরা গাড়ীতে বসিয়া সেই দেশের খাদ্য—সেই দেশের উপযোগী মূল্য দিয়া ভোজন করিতে পারিবেন। দক্ষিণ-আফ্রিকার প্রাগৈতিহাসিক যুগের অধিবাসীদিগের অঙ্কিত চিত্র এবং গুহায় ক্ষোদিত ভাস্কর্য্য প্রভৃতিও এ স্থানে আসিলে দর্শক দেখিতে পাইবেন।

দক্ষিণ-আফ্রিকা বিভাগ হইতে বাহির হইয়া কয়েক পদ অগ্রসর হইলেই ভারতসমুদ্র পার হইয়া একেবারে সিংহলে উপনীত হওয়া যাইবে। সিংহলভবনের



হংকং প্রাসাদের তোরণ



প্রদর্শনীক্ষেত্রে চৈনিক রাজপথ

বারান্দায় চা-র পূজা যেন মূর্ত্তিমানরূপে দেখা যাইবে। সিংহলের চা-র চাষ প্রসিদ্ধ। বারান্দা অতিক্রম করিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলে সিংহলী শ্রমশিল্পজাত দ্রব্যাদি দর্শকের মনোরঞ্জন করিবে। সিংহলভবনটিই সিংহলী ভাস্কর্য্যের বিচিত্র দৃষ্টান্ত। একটি কক্ষমধ্যে মণি-মুক্তার প্রচুর সমাবেশ। প্রায় দেড় কোটি টাকার মুক্তার মালা এখানে সংগৃহীত হইয়াছে। সিংহলী রবার এককালে খুব চড়াদরে বাজারে বিক্রীত হইত। এখন তাহার তেমন বিক্রয়াধিক্য না থাকিলেও এই রবার যে উৎকৃষ্টজাতীয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। রবারের সমাবেশ দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়।

বৃটিশ গায়না বিভাগ খুব বড় না হইলেও মন্দ নহে। হীরকখনির কাষ কিরূপে হয়, তাহা এখানেও বেশ দেখিতে পাওয়া যাইবে। খনির মধ্যে বিপুলকায় নিগ্রোরা হীরকখণ্ড আবিষ্কারে পরিশ্রম করিতেছে। প্রকৃতির মনোরম দৃশ্যগুলি এমনই অকৃত্রিমভাবে অনুকৃত যে, দেখিবামাত্র শিল্পীর প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। দক্ষিণদিকে এক স্রোতস্বিনীতীরে একখানি কুটীর। এক জন কিশোরী গৃহে বসিয়া সূতা কাটিতেছে। বারান্দার চারিদিকে বিচিত্রদর্শন পক্ষী এবং শাখামৃগগুলি খেলা করিতেছে।

তাহার পর পশ্চিম-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ বিভাগ। প্রত্যেক দ্বীপে অন্ততঃ এক দিন করিয়া বেড়াইলে সকল জিনিষ দেখিয়া উঠা যায়। বারমুডাভবনে দ্বীপের আবিষ্কারক টমাস মূরের ভবনের প্রতিকৃতি দেখিতে পাওয়া যাইবে। কবির একটি গৃহের আসবাবপত্র দিয়া একটি কক্ষ সুসজ্জিত করাও হইয়াছে।

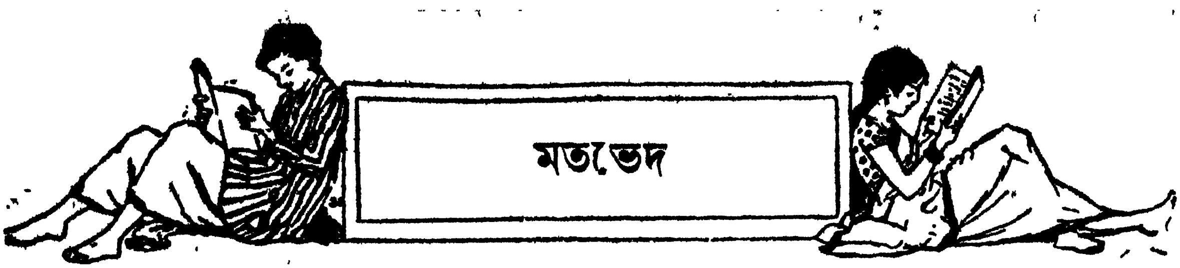
গবর্ণমেণ্ট প্রাসাদের সন্নিকটে নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড বিভাগ। ইহা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রায়তন হইলেও, এখানকার যাবতীয় শ্রমশিল্পের সমাবেশে স্থানটি পরম উপভোগ্য হইয়াছে। বিভিন্ন জাতীয় মৎস্য, পক্ষী ও পশুর নমুনা শ্রেণীবদ্ধভাবে বিদ্যমান।

বিরহিণী

আজি এ সাধের রজনী আমার
বিফলে কাটিল, সই !
হের, গগনের চাঁদ এসে ফিরে গেল,
(মোর) শ্যামচাঁদ এল কই ?
সাজানু কত না ফুল থরে থরে,
শুকা'ল সকলি অভিমানভরে ;
মরমে মরিল বকুলের মালা
প্রিয়ের পরশ বই ;
আজি এ সাধের রজনী আমার
বিফলে কাটিল, সই !
ওই পূরব আকাশে ফুটি ফুটি করে
উষার অরুণ আঁখি,
কদমের শাখে পল্লব-ফাঁকে
ডাকিয়া উঠিল পাখী,
মধুপ ধরিল মধুহরা গান,
যমুনা তুলিল কুহু-কুহু তান ;
সখি, আমার কুঞ্জকাননের পথে
সে বাঁশী বাজিল কই ?
আজি এ সাধের রজনী আমার
বিফলে কাটিল, সই !

সখি, বৃথাই অঙ্গের রতন-ভূষণ
(আমি) তেয়াগিব অবহেলে,
খুলিব শিথিল কবরী, কাজল
ধুইব নয়ন-জলে ;
আমারি বুকের বেদনা নিরখি'
হের লো উষার ঝরিতেছে আঁখি,
সখি, যদি না আসিল প্রাণনাথ, কেন
জীবন ধরিয়া রই ?
আজি এ সাধের রজনী আমার
বিফলে কাটিল, সই !

শ্রীমতী প্রীতিময়ী কর।



মতভেদ

মহাত্মা গন্ধী যখন অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের প্রবর্তনা করিয়াছিলেন, তখন তিনি এই কথাই বলিয়াছিলেন যে, সরকার যখন ভারতবাসীর আশা এবং আকাঙ্ক্ষার চরিতার্থতাসাধনে বিশেষ ব্যস্ত নহেন, তখন ঐ সরকারের সহিত আমাদের সহযোগিতা পরিত্যাগ করিতে হইবে। যে সরকার প্রজার আশা ও আকাঙ্ক্ষার পূর্ণ পরিতৃপ্তি করিতে উদাসীন, সেই সরকার দুষ্ট, দুষ্টের সহিত সম্পর্কবর্জ্জনই শিষ্টের কর্ত্তব্য। এই সম্পর্কবর্জ্জন বা সহযোগিতা-পরিত্যাগই "নন-কো-অপারেশন।" আমাদের এই নন-কো-অপারেশন সম্পূর্ণ হিংসাশূন্য হওয়া চাই; কারণ, হিংসার পথে চলিলে আমরা সরকারকে আঁটিয়া উঠিতে পারিব না, সরকারের সহিত সংগ্রামে আমরা চূর্ণ হইয়া যাইব। সুতরাং সে পথ আমাদের সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। দ্বিতীয়তঃ, অসহযোগের সংগ্রাম, অধর্ম্মের বিরুদ্ধে ধর্ম্মের সংগ্রাম (The struggle of Non-co operation is one of religion against irreligion)। যাহা ধর্ম্ম্য ব্যাপার, তাহা সম্পূর্ণ অধর্ম্মশূন্য এবং যথাসম্ভব সাত্ত্বিক হওয়াই আবশ্যক। অতএব কেবল বাহ্য হিসাবে নহে, অন্তরের দিক হইতেও এই আন্দোলন সম্পূর্ণ হিংসাশূন্য হওয়া চাই। নতুবা ইহা ফলোপধায়ী হইবে না। বর্জ্জন হিসাবে তিনি এই পঞ্চবিধ কার্য্য (boycott) সমর্থন করেন।

(১) কাউন্সিল বা সরকারের ব্যবস্থাপক সভা বর্জ্জন।

(২) সরকারের প্রদত্ত উপাধি এবং অবৈতনিক কার্য্য বর্জ্জন।

(৩) সরকারের আদালত বা ধর্ম্মাধিকরণ বর্জ্জন।

(৪) সরকারী বিদ্যালয়সমূহ বর্জ্জন।

(৫) বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন।

এই পঞ্চবিধ বর্জ্জনকার্য্য কখনও পাঁচ দফায়, কখনও তিন দফায় বিভক্ত করা হয়। এই কয়টি বর্জ্জনমূলক কার্য্যের সহিত তিনি একটি গঠনমূলক কার্য্যও সংযুক্ত করিয়া দেন। উহা হইতেছে খদ্দর প্রস্তুত। এই খদ্দর প্রস্তুত কার্য্যে প্রত্যেক অহিংস অসহযোগীকে অন্ততঃ অর্দ্ধঘণ্টাকাল আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। ঐকান্তিকতার সহিত এবং একনিষ্ঠ হইয়া এই অহিংস অসহযোগ সাধনা করিতে পারিলে শীঘ্রই স্বরাজ আমাদের করতলগত হইবে, ইহাই মহাত্মা গন্ধীর বাণী। মহাত্মার শেষ কথা—ইহাতেও যদি কায না হয়, এই সকল করিলেও যদি সরকার নিজ নীতি পরিত্যাগ না করেন, তাহা হইলে প্রজা হিসাবে আইনভঙ্গ (civil disobedience) করিতে হইবে,—অর্থাৎ খাজনা টেক্স দেওয়া বন্ধ করিতে হইবে। প্রথম অবস্থার কার্য্য অর্থাৎ পঞ্চবিধ বর্জ্জন ও খদ্দর প্রস্তুত কার্য্য সম্পূর্ণ সফল ও ভিতরে বাহিরে হিংসালেশমাত্র বর্জ্জিত হইলে, তবে শেষোক্ত উপায় অর্থাৎ চরম উপায় গৃহীত হইতে পারিবে। অন্যথা নহে।

মহাত্মার এই মত কংগ্রেস প্রায় বিনা আপত্তিতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমুখ কয়েক জন চরমপন্থী প্রথমে এই মতগ্রহণে কথঞ্চিৎ দ্বিধা প্রকাশ করিলেও পরে অব্যাজে ঐ মতে দীক্ষিত হয়েন। কংগ্রেসের পর মোসলেম লীগ এবং খিলাফৎ সমিতিও এই সাধনপদ্ধতি সমীচীন বলিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত জনসাধারণ এই মত এবং কর্ম্মপদ্ধতি যেরূপ আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন, কর্ম্মক্ষেত্রে উহা সংসাধনে তাঁহারা সেরূপ আন্তরিকতা প্রদর্শন করেন নাই। পরন্তু বাহ্য অহিংসার অন্তরালে অন্তরে অনেকে হিংসার, কঠোর হিংসার না হউক, অন্ততঃ মৃদু হিংসার ভাবও পোষণ করিতেছিলেন। ব্যবহারাজীবদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই কতকটা পেটের দায়ে, কতকটা বিলাসিতার মোহে, আর কতকটা অর্থলোভে আদালত বর্জ্জন করিতে পারেন নাই। তরুণ যুবকগণ বিদ্যালয় বর্জ্জনে যেরূপ আগ্রহ প্রকটিত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের

হংকং প্রাসাদের তোরণ

অভিভাবকগণ জাতীয় বিদ্যামন্দির সংগঠনে সেরূপ কর্ম-শক্তি প্রকাশিত করিতে পারেন নাই। স্থানে স্থানে খদ্দর প্রস্তুত কার্য্য দ্রুত অগ্রসর হইলেও ঐ কার্য্যে উন্মাদনার ও বৈচিত্র্যের অভাব ছিল বলিয়া বহু স্থানে লোক দিবসে অন্ততঃ অর্দ্ধঘণ্টার জন্যও উহাতে আত্মনিয়োগ করিতে চাহে নাই। ফলে মহাত্মার নির্দ্দেশমত কার্য্য-গুলি দেশের জনসাধারণ কর্ত্তৃক বিশেষ নিষ্ঠার ও আগ্রহের সহিত প্রতিপালিত হয় নাই।

এ দিকে জনসাধারণের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি করিবার জন্য অনেকে আইনভঙ্গ প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। কর্ত্তৃপক্ষ কলিকাতায় সভাসমিতি করা নিষিদ্ধ করিয়া দিলে সেই আদেশ ভঙ্গ করিয়া বহু লোক কারাবরণ করিলেন। অন্ধ্র দেশে ও কাথিয়াবাড়ে খাজনা-টেক্স দেওয়া বন্ধ করিয়া দিবার আয়োজনও হইতেছিল। ইতোমধ্যে মাদ্রাজে, বোম্বাইয়ে ও অবশেষে চৌরী-চৌরায় অহিংস অসহযোগীদের মধ্যে হিংসানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠাতে মহাত্মা আইনভঙ্গ, পিকেটিং প্রভৃতি বন্ধ করিয়া দিবার প্রস্তাব করিলেন। ১৯২২ খৃষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারী নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটী সেই প্রস্তাব গ্রাহ্য করিয়া লইলেন। এই সময়ে উত্তেজনার অভাবে জনসমাজে ক্রমশঃ একটা অবসাদ উপস্থিত হইল।

১৯২২ খৃষ্টাব্দের ১০ই মার্চ্চ মহাত্মা ধৃত এবং ১৮ই মার্চ্চ বিচারপতি মিঃ সি এন ব্রুমফিল্ডের বিচারে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। সেই দিনই তাঁহার ধর্ম্মপত্নী শ্রীমতী কস্তুরী বাই তাঁহার এই কয়টি অনুরোধ প্রচারিত করেন;—(১) ভারতের সমস্ত নরনারী যেন খদ্দর পরেন এবং অন্যকে খদ্দর পরিতে প্ররোচিত করেন। (২) সকল নারীই যেন ধর্ম্ম্য ব্রতের ন্যায় চরকায় সূতা কাটিতে থাকেন এবং ব্যবসায়ীরা যেন বিদেশী বস্ত্রের ব্যবসায় বন্ধ করিয়া দেন।

দেশের জনসাধারণের মধ্যে একটা অবসাদ আসিয়া পড়াতে অনেকে চিন্তিত হইয়া পড়েন। এই সময়ে কংগ্রেসকর্ম্মী দেশবন্ধু শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন দাশ প্রভৃতি কারাগারে অবস্থিতি করিতেছিলেন। সেই সময়ে সম্ভবতঃ দেশবন্ধু শ্রীযুত দাশের মনে কাউন্সিলে প্রবেশ পূর্ব্বক সরকারের প্রতিষ্ঠান সমূহকে ও সরকারের কার্য্যগুলি অচল করিবার সঙ্কল্প প্রথম উদিত হইয়াছিল। কারণ, তিনি যখন কারাগারে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন তাঁহার সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী বাসন্তীদেবীই চট্টগ্রামের সভানেত্রী হইয়া তাঁহার অভিভাষণে কাউন্সিলে প্রবেশ করিবার প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করিবার জন্য সকলকে অনুরোধ করেন। সেই প্রস্তাবে তখন সদস্যগণের মধ্যে অনেকেই অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাহার পর কারামুক্ত শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন দাশ যখন গয়া কংগ্রেসের সভাপতি হইয়াছিলেন, তখন তিনি সেই প্রস্তাব করিলে উহা অধিকাংশের মতে অগ্রাহ্য হয়। এই সময়ে প্রয়াগের পণ্ডিত শ্রীযুত মতিলাল নেহেরু এবং মুসলমান সমাজের অন্যতম নেতা হাকিম আজমল খাঁ দেশবন্ধুর সহিত একমত হইয়া কাউন্সিলে প্রবেশের প্রয়োজনীয়তার কথা প্রচার করিতে থাকেন। তাঁহারা বলেন যে, "নির্ব্বিকল্প অহিংস অসহযোগের উপর লোকের আস্থা কমিয়া গিয়াছে এবং সাধারণের মধ্যে একটা অবসাদ আসিয়া পড়িয়াছে। সুতরাং উহার পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক। আমরা কাউন্সিলে সহযোগিতা করিতে যাইব না, কাউন্সিলে প্রবেশ পূর্ব্বক আমরা স্বরাজ চাহিব। সরকার যদি আমাদিগকে তাহা দিতে না চাহেন, তাহা হইলে আমরা সরকারের শাসনযন্ত্রকে অচল ও আড়ষ্ট করিয়া ফেলিব; তাহা হইলে সরকার আমাদিগকে স্বরাজ দিতে বাধ্য হইবেন।" অন্যপক্ষে ডাক্তার আন্সারী, শ্রীযুত রাজাগোপাল আচারিয়ার, শ্রীযুত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি বলেন যে, "মহাত্মা গন্ধীর নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মকাণ্ড হইতে রেখামাত্র বিচলিত হওয়া হইবে না।" ফলে প্রথম দল "পরিবর্ত্তন-প্রয়াসী" ও শেষোক্ত দল "পরিবর্ত্তনবিরোধী" বলিয়া অভিহিত হয়েন।

এই বিষয়ের মীমাংসা করিবার জন্য মৌলভী আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্বে দিল্লীতে কংগ্রেসের একটি বিশেষ অধিবেশন হয়। তাহাতে কংগ্রেসে দলাদলি পরিহারার্থ এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, "যাঁহারা কাউন্সিলে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করেন এবং কাউন্সিলে প্রবেশ করিতে যাঁহাদের মনে বিবেক-সম্মত কোন বাধা জন্মে না, তাঁহারা কাউন্সিলে প্রবেশ

করিতে পারেন।" এই অনুমতিসূচক প্রস্তাব অনুসারেই দাশ-নেহেরুদল কাউন্সিলে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতে থাকেন। কোকনদ কংগ্রেসে সেই প্রস্তাবই সমর্থিত হয়। ফলে স্বরাজ্যপন্থীরা কাউন্সিলে প্রবেশ করেন।

৫ই ফেব্রুয়ারী মহাত্মা কারামুক্ত হইয়া পরে সাগর-তীরে জুহুতে অবস্থিতি করিতে থাকেন। তথায় পণ্ডিত মতিলালের সহিত মহাত্মার কংগ্রেসে মতভেদের কথা আলোচিত হয়। তাহার ফল তখন অপ্রকাশিত থাকে। অবশেষে বিগত মে মাসের মধ্যভাগে মহাত্মা গন্ধীর টেলিগ্রাম পাইয়া মিঃ দাশ জুহুতে মহাত্মার সহিত সাক্ষাৎ করেন। সেই সময় এক দিকে মহাত্মা গন্ধী, অন্য দিকে দেশবন্ধু দাশ এবং পণ্ডিত নেহেরু থাকিয়া কাউন্সিল-বর্জ্জনের প্রসঙ্গ আলোচনা করেন। এক সপ্তাহের অধিককাল এই আলোচনা চলে। শেষে বিগত ২২শে মে তারিখে উভয় পক্ষের মূলনীতি লইয়াই মতভেদ হওয়াতে দুই পক্ষ দুইটি স্বতন্ত্র ইস্তাহার প্রকাশ করেন। সেই ইস্তাহারে দেখা গেল যে, উভয় পক্ষের মধ্যে মূলনীতি লইয়াই মতভেদ ঘটিয়াছে। মহাত্মা গন্ধী যে ইস্তাহার প্রচারিত করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি এই কয়টি কথাই বলিয়াছিলেন :—

(১) স্বরাজ্যপন্থী বন্ধুবর্গের সহিত কাউন্সিল-প্রবেশ-প্রস্তাব আলোচনা পূর্ব্বক আমি দুঃখের সহিত সাধারণকে জানাইতেছি যে, তাঁহারা এই ব্যাপারটি যেরূপ দৃষ্টিতে দেখিতেছেন, আমি উহা সেরূপ দৃষ্টিতে দেখিয়া উঠিতে পারিলাম না। আমি সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি যে, স্বরাজ্যপন্থীদিগের মত গ্রহণ করিবার জন্য আমার ইচ্ছার এবং চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। তাঁহাদের মত গ্রহণ করিতে পারিলে আমার কার্য্য অনেক পরিমাণে সুকর হইত।

(২) কার্য্যের বা কার্য্যপদ্ধতির সূক্ষ্মাংশ লইয়া এই মতভেদের উদ্ভব হয় নাই। এই মতভেদ অকপট এবং মূলনীতিগত। অসহযোগ আন্দোলনকে আমি যেরূপ বুঝি, তাহার সহিত কাউন্সিল-প্রবেশের সামঞ্জস্য সাধন হয় না। অসহযোগ আন্দোলনের অর্থ লইয়া মতভেদও এই মতভেদের কারণ নহে। আসলে যে মনোভাব লইয়া এই অত্যাবশ্যক বিষয়টির বিচার করিতে হয়, সেই মনোভাব লইয়াই আমাদের মতদ্বৈধ ঘটিয়াছে। সেই মনোভাব দেখিয়াই ত্রিবিধ বর্জ্জনের সাফল্য বা অসাফল্যের বিচার করিতে হইবে, প্রকৃত ফল কতটুকু লাভ হইয়াছে, কেবল তাহাই দেখিয়া বিচার করিলে চলিবে না। এই দিক দিয়া বিচার পূর্ব্বকই আমি বলিতেছি যে, কাউন্সিলে প্রবেশ না করিয়া কাউন্সিলের বাহিরে থাকিলেই দেশের পক্ষে সুবিধা হইবে।

(৩) আমি আমার স্বরাজ্যপন্থী বন্ধুদিগকে এ কথা বুঝাইয়া দিতে পারি নাই। কিন্তু আমি ইহা বুঝিতেছি যে, তাঁহারা যত দিন এইরূপ ভিন্ন দৃষ্টিতে অর্থাৎ ভিন্ন রকমের মনোভাব লইয়া এই বিষয়টির বিচার করিবেন, তত দিন কাউন্সিলেই তাঁহাদের স্থান, সে বিষয়ে সংশয় নাই। আমাদের সকলের পক্ষে তাহাই ভাল। এই আলোচনাপ্রসঙ্গে আমি যাহা বলিয়াছি, তাহাতে স্বরাজ্যপন্থীদিগের প্রত্যয় জন্মাইতে পারি নাই। তাঁহারা যোগ্য লোক; বিশেষ বিবেচনা না করিয়া তাঁহারা কাউন্সিলে প্রবেশ করেন নাই। সুতরাং যত দিন অভিজ্ঞতার দ্বারা তাঁহারা তাঁহাদের কর্ম্মপদ্ধতির নিষ্ফলতা বুঝিতে না পারিতেছেন, তত দিন তাঁহারা তাঁহাদের গৃহীত কর্ম্মপদ্ধতি পরিত্যাগ করিবেন না।

(৪) এখন উভয় পক্ষের মতের দোষগুণ বিচার অনাবশ্যক। কাউন্সিল-প্রবেশ যখন ধার্য্য হইয়া গিয়াছে, তখন কি করিতে হইবে, এখন তাহাই বিচার্য্য। দিল্লীর এবং কোকনদের কংগ্রেসে যে মন্তব্য গৃহীত হইয়াছে, তাহাতে কাউন্সিল-প্রবেশের অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছে। যাঁহাদের বিচারবুদ্ধিতে এখন কাউন্সিলে প্রবেশ করিবার বাধা নাই, তাঁহারা কাউন্সিলে প্রবেশ করিতে পারেন। সুতরাং স্বরাজ্যপন্থীরা কাউন্সিলে প্রবেশ করিতে পারেন, পরিবর্ত্তনবিরোধী দলের তাহাতে বাধা দেওয়া উচিত নহে। স্বরাজ্যপন্থীরা দেশ-হিতৈষী, তাঁহারা যদি অভিজ্ঞতার দ্বারা তাঁহাদের ভ্রম বুঝিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহারা প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন, ইহা আমি জানি।

(৫) আমি পূর্ব্বে বুঝিতাম যে, কাউন্সিলে প্রবেশ করিলে সুবিধামত কায করা সম্ভব হইবে, তাহা হইলে

আমি কাউন্সিলে প্রবেশ করিতাম। আমি তাহা হইলে কেবল বাধা প্রদানের নীতি অবলম্বন না করিয়া কংগ্রেসের গঠননীতির পুষ্টিসাধনে চেষ্টা করিতাম। তাহা হইলে আমি ভারত সরকারের ও প্রাদেশিক সরকারের ব্যবস্থাপক সভাকে নিম্নলিখিত ভাবের প্রস্তাব গ্রাহ্য করাইয়া লইবার চেষ্টা করিতাম :—

(ক) সরকারের যত কাপড় ক্রয় করা প্রয়োজন হইবে, তাহা এ দেশে হাতে কাটা সূতার প্রস্তুত, হাতে বোনা খদ্দর কিনিতে হইবে।

(খ) বিদেশ হইতে আমদানী বস্ত্রের উপর উচ্চ-হারে আমদানী শুল্ক বসাইতে হইবে।

(গ) মদ, গাঁজা প্রভৃতি মাদক দ্রব্যের কর উঠাইয়া দিতে হইবে।

(ঘ) এবং অন্ততঃ সেই অনুপাতে সামরিক ব্যয় সঙ্কোচ করিতে হইবে।

ব্যবস্থাপক সভায় এই মন্তব্যগুলি গৃহীত হইলেও যদি সরকার ঐ প্রস্তাব অনুসারে কার্য্য করিতে অসম্মত হইতেন, তাহা হইলে আমি সরকারকে ঐ ব্যবস্থাপক সভাকে বিদায় দিয়া ঐ কয়টি বিশেষ বিষয় সম্বন্ধে ভোটদাতাদিগের মত লইতে বলিতাম। যদি সরকার ব্যবস্থাপক সভা ভঙ্গ করিতে অসম্মত হইতেন, তাহা হইলে আমি ব্যবস্থাপক সভার সদস্যপদ ছাড়িয়া দিয়া সমস্ত দেশকে দেওয়ানী আইন অমান্য করিবার জন্য প্রস্তুত করিতাম। যখন সেই অবস্থা ঘটিবে, তখন স্বরাজ্যপন্থীরা দেখিতে পাইবেন যে, আমি তাঁহাদের সহিত ও তাঁহাদের নেতৃত্বে কার্য্য করিবার জন্য প্রস্তুত হইব।

(৬) পরিবর্ত্তনবিরোধী দলকে তিনি বলিয়াছেন,—"আইন অমান্য করিবার যোগ্যতার পরীক্ষা পূর্ব্ববৎই রহিয়াছে। এই শিক্ষানবিশীর সময় স্বরাজীরা কি করিলেন বা বলিলেন, সে দিকে দৃষ্টি না দিয়া একনিষ্ঠভাবে কংগ্রেসের গঠনমূলক কার্য্যসাধনে আত্মনিয়োগ করা কর্ত্তব্য। খদ্দর বয়ন, জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা, হিন্দু-মুসলমানে একতাস্থাপন প্রভৃতি অনেক আড়ম্বরহীন কার্য্যে এখন পরিবর্ত্তনবিরোধী দলকে আত্মনিয়োগ করিয়া থাকিতে হইবে।

(৭) কংগ্রেসের গঠনমূলক কার্য্যে স্বরাজীরা ও পরিবর্ত্তনবিরোধীরা একযোগে কার্য্য করিতে পারিবেন।

মহাত্মা প্রথমে যাহা বলিয়াছিলেন, এখনও ঠিক সেই কথাই বলিতেছেন যে, অহিংস-অসহযোগ একটা ধর্ম্ম ব্যাপার ; অধর্ম্মের সহিত, অন্যায়ের সহিত সংগ্রাম করিতে হইলে ধর্ম্মকেই, সাত্ত্বিকভাবকেই, সম্পূর্ণভাবে আশ্রয় করিতে হইবে। স্বরাজ্যপন্থীরা ঠিক তাহা বুঝেন নাই, সেই জন্যই মহাত্মা বলিয়াছেন যে, যে প্রকার মনোভাব লইয়া অহিংস অসহযোগের কথা বিচার করিতে হয়, সেই প্রকার মনোভাবের পার্থক্য ঘটাতেই উভয় দলের মতভেদ ঘটিয়াছে।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মতিলাল নেহেরু এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ স্বরাজ্যপন্থীদিগের পক্ষ হইতে ঐ দিনই একটি স্বতন্ত্র ইস্তাহার প্রচার করিয়াছেন। উহাতে এই কথা আছে,—

(১) আমরা মহাত্মার কথাগুলি বিশেষ প্রণিধান করিয়া দেখিয়াও তাঁহার সহিত একমত হইতে পারিলাম না।

(২) কাউন্সিলে প্রবেশ করিবার প্রয়োজনীয়তার কথা আমরা মহাত্মাকে বুঝাইয়া দিতে পারি নাই। নাগপুর কংগ্রেসে অসহযোগ সম্বন্ধে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল, তাহার সহিত ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশের অসঙ্গতি কোথায়, তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম। কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনটা যদি কেবলমাত্র একটা বিশেষ মনোভাব হয়,—উহা যদি জাতীয় জীবনের প্রকৃত ব্যাপারের—বিশেষতঃ আমলাতন্ত্রমূলক শাসনযন্ত্রের পরিবর্ত্তনশীল ভাব বুঝিয়া—একটা জীবন্ত কার্য্যনীতির বিনিয়োগ না হয়, তাহা হইলে আমাদের অসহযোগ বিসর্জ্জন দিয়াও দেশের প্রকৃত কল্যাণসাধনে আত্ম-নিয়োগ করাই কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হয়। আমাদের মতে অসহযোগের দুইটি লক্ষ্য ; প্রথমতঃ, যে সকল ব্যাপারে জাতীয় উন্নতি অব্যাহতভাবে বিকাশ পায়, সেই সকল ব্যাপারে আত্মনির্ভরশীল ও আত্মপ্রত্যয়ী হইতে হইবে ; দ্বিতীয়তঃ, ব্যুরোক্রেসী স্বরাজসিদ্ধির পথে যে সকল বাধা প্রদান করে, তাহা প্রতিহত করিয়া দিতে

হইবে। অতএব অসহযোগের সহিত কাউন্সিল প্রবেশের অসামঞ্জস্য হইতে পারে না।

(৩) আমরা কাউন্সিলে যাইয়া যে প্রতিরোধ (obstrnction) করিব বলিয়াছি, তাহা ইংলণ্ডীয় পার্লামেণ্ট ব্যবহৃত প্রতিরোধ শব্দের সহিত একার্থবোধক নহে। এ দেশে সে প্রকার প্রতিরোধ বা বাধাদান সম্ভবে না। ব্যুরোক্রেশী আমাদের স্বরাজপ্রাপ্তি-পথে যে সমস্ত বাধা ঘটাইবেন, আমরা কেবল তাহারই প্রতিরোধ করিব। এ সম্বন্ধে অন্য একটা শব্দ পাইলেই ভাল হয়।

অতঃপর তাঁহারা তাঁহাদের অবলম্বিত কার্য্যপদ্ধতির এইরূপ বিবৃতি করিয়াছেন :—

(ক) যত দিন পর্য্যন্ত আমাদের অধিকার স্বীকার পূর্ব্বক শাসনপদ্ধতির পরিবর্ত্তন, তথা পার্লামেণ্ট কর্ত্তৃক আমাদের সহিত একটা আপোষনিষ্পত্তি না হইতেছে, তত দিন পর্য্যন্ত আমরা বাজেট না-মঞ্জুর করিতে থাকিব। এই সম্বন্ধে এই কয়টি কথা বলা আবশ্যক। ভারত সরকারের মোট রাজস্ব ১ শত ৩১ কোটি টাকা; তন্মধ্যে কেবলমাত্র রেলওয়ে বাবদ ১৬ কোটি টাকা সম্বন্ধে ব্যবস্থাপক সভার মত প্রকাশের অধিকার আছে। আবার যে সকল অর্থ সম্বন্ধে ব্যবস্থাপক সভার ভোট দিবার অধিকার নাই, তাহার মধ্য হইতে ৬৭ কোটি টাকা, অর্থাৎ অর্দ্ধেকেরও অধিক টাকা সামরিক কার্য্যে ব্যয়িত হয়। অর্থাৎ মোট টাকার শত ভাগের এক ভাগ টাকার ব্যয় সম্বন্ধে দেশের লোকের মত দিবার অধিকার আছে। সে অধিকারও সম্পূর্ণ নহে। বড় লাট ইচ্ছা করিলে ব্যবস্থাপক সভা কর্ত্তৃক যে টাকা মঞ্জুর হয় নাই, সে টাকা মঞ্জুর করিতে পারেন। সুতরাং কার্য্যতঃ বাজেট-ব্যাপারে দেশের লোকের কোন হাত নাই; স্বরাজ্যপন্থীরা এরূপ বাজেট মঞ্জুরের কোন দায়িত্ব লইতে পারেন না। যত দিন এই দুই পদ্ধতির পরিবর্ত্তন না হইতেছে, তত দিন পর্য্যন্ত বাজেটে বাধা দেওয়াই কর্ত্তব্য বলিয়া অনেকে মনে করেন।

(খ) যে সকল আইন প্রণয়ন পূর্ব্বক আমলাতন্ত্রের আমলারা স্বীয় ক্ষমতার পুষ্টিসাধন করিবেন, আমরা সেই সকল আইন প্রণয়নে বাধা দিব। ইহার মধ্যে দুই একটি আইনের ফলে দেশের লোকের হয় ত কিঞ্চিৎ উপকারও হইতে পারে, কিন্তু সেই সামান্য উপকারলাভের জন্য আমলাদিগের অপ্রতিহন্যমান ক্ষমতা বর্দ্ধিত করা কখনই সঙ্গত নহে।

(গ) আমাদের জাতীয় জীবন যাহাতে স্বচ্ছন্দে গড়িয়া উঠে এবং তাহার ফলে ব্যুরোক্রেশীর অধিকার খর্ব্ব হয়, সেইরূপ আইন আমরা ব্যবস্থাপক সভায় পেশ করিব।

(ঘ) অর্থনীতিক ব্যাপারে আমরা একটা নির্দ্দিষ্ট নীতিরই অনুবর্ত্তন করিব এবং যাহাতে ভারতের ধন বিদেশে নীত না হয়, আমরা সে দিকে দৃষ্টি রাখিব।

ব্যবস্থাপক সভায় তাঁহারা এই নীতির অনুবর্ত্তন করিবেন। ব্যবস্থাপক সভার বাহিরে তাঁহারা যে নীতি অবলম্বন করিবেন, তাহা এই :—

(১) আমরা কংগ্রেসের গঠনমূলক কার্য্যে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করিব এবং কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠানগুলির দ্বারা সেই কার্য্য সংসাধন করিবার চেষ্টা করিব।

(২) যে মুহূর্ত্তে আমরা বুঝিব যে, আইন অমান্য না করিলে ব্যুরোক্রেশীর স্বার্থপরতাপূর্ণ স্বৈরিতার গতিরোধ করিবার সম্ভাবনা নাই, সেই মুহূর্ত্তেই আমরা ব্যবস্থাপক সভা পরিত্যাগ পূর্ব্বক মহাত্মার সহিত একযোগে দেশকে আইন অমান্য করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ করিব।

(৩) ইতোমধ্যে আমরা দেশের সর্ব্বত্র শ্রমিক ও কৃষকদিগের সঙ্ঘ গঠন করিব। উহা ভারতের মধ্যে একটি উৎকট সমস্যা। ধনীরা যাহাতে মজুরদিগকে, জমীদাররা যাহাতে প্রজাদিগকে নিপীড়িত করিতে না পারে এবং শ্রমিকরাও যাহাতে অসঙ্গত দাবী করিয়া সাধারণের অসুবিধা জন্মাইতে না পারেন, তাহারও ব্যবস্থা করিব।

ইহাই হইল স্বরাজ্যপন্থীদিগের মত ও কর্ম্মতালিকা। এই দুই দলের কর্ম্মপদ্ধতি এবং মনোভাব যে ভিন্ন, তাহা তাঁহাদের উভয় পক্ষের ইস্তাহার ভাল করিয়া পাঠ করিলেই উপলব্ধ হইবে। মহাত্মা গন্ধী যাইতেছেন সাত্ত্বিক পথে—ধর্ম্মের পথে; দাশ-নেহেরু যাইতেছেন রাজসিক পথে,—রাজনীতিক পথে। মহাত্মার উক্তির

অন্তরাল হইতে যেন গীতার কর্ম্মযোগের ভাবটা কতকটা ফুটিয়া বাহির হইতেছে, দাশ-নেহেরুর বাণী যেন পেনের (Paine) Rights of Manএর ভিতর দিয়া ঝঙ্কৃত হইতেছে। দুই পক্ষের দুইটি পথই ভিন্ন; সেই ভিন্নতা, সেই পার্থক্য, কেবল শাখাপল্লবে নিবদ্ধ নহে,—একেবারে কাণ্ড ও মূল পর্য্যন্ত প্রসৃত। যে মনোভাব উভয়ের দৃষ্টিশক্তিকে প্রভাবিত করিতেছে, সেই মনোবৃত্তিতেই এই ভেদের বনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত। সেই জন্যই সিরাজগঞ্জ প্রাদেশিক সমিতিতে গৃহীত গোপীনাথ সাহা সম্বন্ধীয় মন্তব্যে মহাত্মার সহিত দেশবন্ধুর মতবিরোধ ঘটিয়াছে। সত্য বটে, কংগ্রেসের গঠনমূলক কার্য্যে এবং পরিণামে আইনভঙ্গ ব্যাপারে উভয় পক্ষই একমত। কিন্তু সে ঐকমত্য বাহ্য।

এই মতভেদ সুপ্রকাশ হইবার পর সিমলায় বক্তৃতাকালে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু স্পষ্টই বলিয়াছিলেন যে, মহাত্মার উপর স্বরাজ্যপন্থীদিগের অচলা ভক্তি রহিয়াছে। তাঁহার সাধুতায় ও সত্যনিষ্ঠায় এবং তাঁহার কর্ম্মপদ্ধতির ফলোপধায়িতায় তাঁহারা কখনই সন্দিহান হয়েন নাই। বর্ত্তমান যুগে মহাত্মাকে নেতৃরূপে পাইয়া ভারতবাসী ধন্য হইয়াছে,—কিন্তু বড়ই দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, তাঁহার নেতৃত্ব অনুসারে কায করা দেশের লোকের শক্তিতে কুলায় নাই। মহাত্মা তাহাদের ত্রুটিবিচ্যুতি দেখাইয়া দিতেছেন। কিন্তু ত্রুটিবিচ্যুতি মানুষের প্রকৃতিগত। সেই জন্য স্বরাজ্যপন্থীরা অল্পশক্তি লোকদিগের জন্য একটি স্বতন্ত্র কর্ম্মতালিকা স্থির করিয়াছেন। তাঁহারা মহাত্মার কার্য্যের পথপ্রস্তুতকারক শ্রমিক মাত্র।

উল্লিখিত বিবরণ হইতে বুঝা যায় যে, খদ্দরের ফলোপধায়িতার উপরই মহাত্মা গন্ধীর প্রগাঢ় বিশ্বাস। তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন যে, কাউন্সিল-প্রবেশ দ্বারা কোন ফল হইবে না, কেবল একান্তমনে খদ্দরের সাধনা করিতে পারিলেই অচিরকালমধ্যেই স্বরাজ আমাদের করতলগত হইবে। তিনি আরও শুনিয়াছিলেন যে, স্বরাজ্যপন্থীদিগের মধ্যে খদ্দরের ব্যবহার কমিয়া যাইতেছে। স্বরাজ্যপন্থীদিগের মধ্যে অনেক লোক খদ্দর পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিদেশী বস্ত্রনির্ম্মিত পোষাক পরিধান করেন, ইহা তিনি জানিতে পারেন এবং সেই জন্য তাঁহার মনে অত্যন্ত বেদনা উপস্থিত হয়। পরিবর্ত্তনবিরোধী দলের মধ্যে অনেকে গৃহে বিদেশী বা মিলের কাপড় পরিধান করেন, কেবল বাহিরে যাইবার সময় খদ্দর পরেন। মহাত্মা বলেন যে, যাহাদের অন্তরের ভাবের সহিত বাহিরের কাযের মিল নাই,—যাহারা ভণ্ড ও ভাক্ত—তাহাদের দ্বারা কংগ্রেসের কার্য্য পরিচালিত করিলে আমাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। যে সকল ব্যবহারাজীব এখনও আদালতে ব্যবহারাজীবের কার্য্য করিতেছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধেও মহাত্মা ঐ কথা বলেন। তিনি সেই জন্য এই কথাই প্রকাশ করেন যে, কংগ্রেস যে মত গ্রহণ করিয়াছেন,—যে কার্য্যপদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন—তাহাতে যাঁহারা অন্তরে বাহিরে দৃঢ় এবং গাঢ় বিশ্বাসী নহেন, তাঁহাদের হস্তে কংগ্রেসের কার্য্যপরিচালনভার অর্পণ করিলে উহা হইতে কখনই ঈপ্সিত ফললাভ করা সম্ভব হইবে না। সেই হেতু তিনি স্বরাজ্যপন্থী বা পরিবর্ত্তনকামী দলকে কংগ্রেসের কার্য্যপরিচালন সমিতির সদস্যপদ ত্যাগ করিতে বলেন। আমেদাবাদে নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটীর যে অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে তিনি ৪টি প্রস্তাব উপস্থিত করিবেন বলিয়া জ্ঞাপন করেন। সেই ৪টি প্রস্তাবের মর্ম্ম এই;—

(১) প্রত্যেক সদস্যকে অবশ্যকর্ত্তব্য মনে করিয়া প্রত্যহ অন্ততঃ আধ ঘণ্টা করিয়া চরকায় সূতা কাটিতে হইবে এবং প্রতি মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে ১০নং সূতার নীচে নয়, এইরূপ ১০ তোলা স্বহস্তে কাটা সূতা নিখিল ভারতীয় খাদি বোর্ডের নিকট পাঠাইতে হইবে। যে সদস্য যথাসময়ে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ সূতা পাঠাইতে অসমর্থ হইবেন, তিনি সদস্যপদ ত্যাগ করিয়াছেন মনে করিয়া তাঁহার স্থানে অন্য এক জনকে সদস্য নির্ব্বাচিত করা হইবে।

(২) প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর যে সকল সেক্রেটারী এবং উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী, তাঁহাদিগকে প্রদত্ত উপদেশগুলি পালনে অমনোযোগী হইবেন, তাঁহাদিগকে পদচ্যুত মনে করিয়া তাঁহাদের স্থানে অন্য লোককে যথানিয়মে নির্ব্বাচন করা হইবে।

(৩) যাহারা পঞ্চবিধ বর্জ্জনের পক্ষপাতী ন

পূর্ণমাত্রায় আস্থাবান্ নহেন, তাঁহারা যেন কংগ্রেসের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মচারিপদ পরিত্যাগ করেন এবং নির্বাচকমণ্ডলী যেন ঐ পঞ্চবিধ বর্জ্জনের একনিষ্ঠ সাধকদিগকে ঐ সকল পদে নিয়োগের জন্য নির্ব্বাচিত করেন।

(৪) মৃত গোপীনাথ সাহা মিঃ ডেকে হত্যা করিয়াছেন বলিয়া এই কংগ্রেস কমিটী গভীর দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন। ঐ জিঘাংসার মূলে কুপথে চালিত স্বদেশপ্রেমের অস্তিত্ব ছিল, ইহা বিশেষভাবে বুঝিতে পারিলেও এই কমিটী ঐরূপ রাজনীতিক হত্যার ঘোর নিন্দা করিতেছেন এবং বিশেষভাবে প্রকাশ করিতেছেন যে, ঐরূপ কার্য্য কংগ্রেসের মূলনীতির সম্পূর্ণ বিরোধী এবং স্বরাজ্যস্থাপনের ও নিরুপদ্রব আইন অমান্য করিবার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত-করণের পরিপন্থী।

নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটীতে এই প্রস্তাবগুলি মহাত্মা গন্ধী স্বয়ং উপস্থিত করিবেন জানিতে পারিয়া স্বরাজ্যপন্থীরা বুঝিতে পারিলেন যে, ঐ প্রস্তাবগুলি যদি গৃহীত হয়, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে কংগ্রেস ছাড়িতে হইবে। কংগ্রেস হইতে চ্যুত হইলে তাঁহাদের প্রভাব ক্ষুণ্ণ হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। এ দিকে আমেদাবাদ অঞ্চলে মহাত্মার প্রভাব অতিশয় প্রবল। সেই জন্য তাঁহারা স্বরাজ্যদলের গড়মান্দারণ এলাহাবাদেই এই কমিটীর অধিবেশন করিতে চাহেন। কিন্তু তাঁহাদের সে প্রয়াস ব্যর্থ হয়। বিগত ২৭শে জুন শুক্রবার আমেদাবাদের মিউনিসিপ্যাল হলে নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটীর বৈঠক বসিয়াছিল। এই সভায় ১ শত ৮০ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। মৌলানা মহম্মদ আলী ইহার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। নিয়মিত সভার অধিবেশন হইবার পূর্ব্বে পরিবর্ত্তনপ্রয়াসী ও পরিবর্ত্তনবিরোধীদিগকে লইয়া একটা আপোষ সভা হইয়াছিল। সে সভায় মহাত্মা উপস্থিত ছিলেন না।

ঐ দিন অপরাহ্ণ ৭টার সময় নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটীর অধিবেশন হইলে প্রথমে মহাত্মার কারামুক্তির জন্য আনন্দ প্রকাশ করা হয়। তৎপরে মহাত্মা গন্ধী তাঁহার প্রথম প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন। এই সময়ে প্রয়াগের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মতিলাল নেহেরু ইহাতে আপত্তি করিয়া বলেন যে, মহাত্মা সদস্যদিগের পক্ষে যে নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিতে চাহিতেছেন, তাহা তাঁহার ক্ষমতার অতীত (ultra vires) এবং নিয়মবিরুদ্ধ। কংগ্রেসের নিয়মকানুন কংগ্রেসই করিয়াছেন, নূতন একটা ব্যাপার না হইলে কংগ্রেসের অধীন নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটী তাহার পরিবর্ত্তন করিতে পারেন না। কংগ্রেসের নিয়মকানুন, ব্যবস্থা প্রভৃতি কংগ্রেসই পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ। ইহার উত্তরে মহাত্মাজী বলেন যে, প্রস্তাবগুলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বোধ হওয়াতে হয় ত তাঁহার দৃষ্টি অনুরঞ্জিত হইয়া গিয়াছে। তাঁহারাই যখন নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, তখন উহার পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতা তাঁহাদের আছে। এই উপলক্ষে স্বরাজ্যপন্থীরা বঙ্গের একনিষ্ঠ কর্ম্মী শ্রীযুত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে বলিতে দিতে আপত্তি করিয়া অত্যন্ত সংকীর্ণতার পরিচয় দিয়াছিলেন। যাহা হউক, সভাপতি মৌলানা মহম্মদ আলী এই আপত্তি সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত না করিয়া কমিটীর সদস্যদিগের উপর উহার মীমাংসাভার অর্পণ করেন। পণ্ডিত মতিলালের প্রস্তাবের অনুকূলে ৬৯ এবং প্রতিকূলে ৮২টি ভোট হওয়াতে ঐ আপত্তি অগ্রাহ্য হয়।

পরদিন অর্থাৎ ২৮শে জুন শনিবার মহাত্মা গন্ধী তাঁহার প্রথম প্রস্তাব উপস্থিত করিলে পণ্ডিত শ্রীযুত মতিলাল নেহেরু উহার তীব্র প্রতিবাদ করেন। তিনি বলেন, গত দুই বৎসরের মধ্যে কোন নূতন অবস্থা উপস্থিত হয় নাই, সুতরাং এই প্রস্তাব উপস্থিত করিবার কোন কারণ জন্মে নাই। বক্তৃতা-প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, চরকার সহিত তাঁহার কোন বিবাদ নাই সত্য, কিন্তু তিনি উহাকে অতিশয় অনুরাগের বস্তু বা চরকাই স্বরাজলাভের একমাত্র পন্থা, ইহা মনে করেন না। বক্তৃতান্তে পণ্ডিত মতিলাল এবং তাঁহার সহিত দেশবন্ধু দাশ ও অন্যান্য স্বরাজ্যপন্থীরা সভাস্থল ছাড়িয়া চলিয়া যান। ইঁহাদের সংখ্যা ৫৫ জন। ইঁহাদের অধিকাংশই বঙ্গদেশ ও বেহার হইতে আগত।

সভাস্থলে তখন ১ শত ৯০ জন সদস্য ছিলেন। ইহার মধ্যে কয়েক জন এই অবস্থায় দৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এখনও মহাত্মা বলিতেছেন যে, এক রক্তাক্ত

লোকদিগের দ্বারাই কংগ্রেস পরিচালিত হওয়া আবশ্যক। সুতরাং ভিন্নমতাবলম্বী লোক লইয়া কংগ্রেস পরিচালিত করিবার ব্যবস্থা ভাল হইল না। ইহার ফলে তাঁহার মতে উভয় পক্ষেরই কর্মশক্তি ক্ষুণ্ণ হইবে। গোপীনাথ সাহা প্রস্তাব সম্বন্ধে দেশবন্ধু দাশের সংশোধক প্রস্তাবের অনুকূলে যে ৭০টি ভোট হইয়াছিল, এ বিষয়ে তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। মহাত্মার প্রস্তাবে ও দেশবন্ধুর সংশোধনপ্রস্তাবে যেন কোন পার্থক্য নাই, ইহা মনে করিয়া দাশ মহাশয় আত্মবঞ্চনা করিতেছেন। সিরাজগঞ্জের প্রস্তাব কংগ্রেসের মূলনীতির ও পরিচালন-নীতির বিরোধী।

ইহার পর মহাত্মা ৩রা জুলাই তারিখের 'নিউ ইণ্ডিয়া' পত্রে লিখিয়াছেন,—"কমিটীর কার্য্য-নির্ব্বাহপদ্ধতি দর্শনে এই ধারণাই দৃঢ়ীভূত হইয়াছে যে, ঐ দুইটি পদ্ধতি একই প্রতিষ্ঠানের দ্বারা পরিচালিত করা সম্ভব হইবে না। স্বরাজীরা বৃটিশ লোকমতকে অনুকূল করিতে চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা স্বরাজলাভের আশায় বৃটিশ পার্লামেণ্টের পানে চাহিতেছেন। পরিবর্ত্তনবিরোধীরা স্বরাজলাভের জন্য দেশের লোকের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন। এই দুইটি স্বতন্ত্র মনোভাবপ্রসূত। ইহা বলাতে কেহ যেন এমন না বুঝেন যে, একটা পথ অভ্রান্ত হইলেই আর একটা পথ ভ্রান্ত হইবে, আমি এই কথা বলিতেছি। এই দুইটি পন্থার প্রত্যেক পন্থাই অভ্রান্ত হইতে পারে। কিন্তু একই প্রতিষ্ঠান দ্বারা উভয়বিধ কার্য্য পরিচালিত করিতে গেলে তাহার ফলে উভয় দলই দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে, এবং জাতীয় কল্যাণের ক্ষতি জন্মিবে। এক দল কাউন্সিলের ভিতর দিয়া লোকশিক্ষা দিতে চাহেন, অন্য দল জনসাধারণের মধ্যে কার্য্য করিয়া তাহাদিগকে শিক্ষাদান করিতে, এবং যাহাতে তাহাদের নিয়ম ও শৃঙ্খলার সহিত কার্য্য করিবার শক্তি জন্মে, তাহা করিতে চাহেন। এক পক্ষ দেশের লোকের উন্নতির জন্য সরকারের মুখাপেক্ষী, অন্য পক্ষ ইহাই প্রতিপন্ন করিতে চাহেন যে, শাসনযন্ত্র যতই উৎকৃষ্ট আদর্শের অনুযায়ী হউক না কেন, যে জাতি আত্মশাসনে ও আত্মসংযমে অক্ষম, সে জাতির জাতীয় শক্তি বিকাশে উহার প্রয়োজন অতি অল্প।" ইহাতেই বুঝা যায়, মহাত্মা একমতাবলম্বী লোক দিয়াই তাঁহার কার্য্য পরিচালন সমিতি চালাইতে ইচ্ছুক। বোম্বাইয়ের 'লোকমান্য' নামক পত্রে প্রকাশ,—আমেদাবাদের বৈঠক শেষ হইলে মহাত্মা বলিয়াছিলেন যে, "এই দুই দিনের কার্য্য করিবার রীতি দেখিয়া আমি অত্যন্ত নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছি। আমার মনে হইতেছে যে, আমাদের কর্ম্মীরা স্বরাজলাভের একান্ত অযোগ্য। যে সকল প্রস্তাব এবং সংশোধক প্রস্তাব ঐ সভায় উপস্থাপিত করা হইয়াছে, নিয়মপালন এবং ভোট-গণনা সম্বন্ধে যে সকল কৌশল অবলম্বিত হইয়াছে, তাহা সমস্তই আমাদের স্বরাজলাভের অযোগ্যতাই সপ্রমাণ করিয়া দিতেছে।" এই বলিয়া তিনি কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলেন। মৌলানা মহম্মদ আলীও কাঁদিয়াছিলেন। তখন মহাত্মা বলেন যে, "আমি কংগ্রেস ছাড়িয়া দিয়া অন্য প্রতিষ্ঠান দ্বারা কার্য্য চালাইব ভাবিতেছি।" এই ব্যাপারে মহাত্মার মনে এত বেদনা লাগিয়াছিল যে, তাঁহার শরীর কিঞ্চিৎ অসুস্থ হইয়া পড়ে।

কেহ কেহ বলিতেছেন যে, স্বরাজ্যপন্থীরা ক্রমশঃ লোকমান্য তিলক মহাশয়ের প্রবর্ত্তিত সংবাদী সাহচর্য্য (responsive co-operation) অবলম্বন করিবেন। আমাদের মনে হয়, তাঁহাদের কার্য্যপদ্ধতি ঠিক সেইরূপ হইবে কি না, এখনও তাহা বলা কঠিন। অন্ততঃ আর কিছুদিন ধরিয়া তাঁহাদের কার্য্যকলাপ না দেখিলে তাহা বুঝা যাইতেছে না।

আসল কথা, আমেদাবাদের এই মিলন স্থায়ী হইবে বলিয়া মনে হইতেছে না। যে ঝটিকা আপাততঃ মহাত্মার উদারতায় প্রহত হইল, তাহা যে বেলগাঁওয়ের কংগ্রেসে ৬ মাস পরেই পূর্ণবেগে প্রকাশ পাইবে না, তাহা কে বলিতে পারে?

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়।



স্ত্রী

১

সে বছর মাণিকডাঙ্গায় ম্যালেরিয়ার প্রকোপও যেমন বেশী হইয়াছিল, কলেরারও তেমনই ধূম পড়িয়া গিয়াছিল। এই দুই বিকট রাক্ষসী যখন তাহাদের ভীষণ মুখব্যাদান করিয়া ক্ষুদ্র গ্রামখানির উপর একসঙ্গে ঝুঁকিয়া পড়িল, তখন তাহাদের সেই বিশ্বগ্রাসী বদন-বিবরে একে একে অনেককেই প্রবেশ করিতে হইয়াছিল। সে সময় বাঁড়ুয্যেবাড়ীর হরনাথও এই মহোৎসবের বলিস্বরূপ হঠাৎ যে দিন সংসার ফেলিয়া চলিয়া গেল এবং তাহারই দিন-দুই পরে স্ত্রী সারদাসুন্দরীও যখন স্বামীর এই মহাযাত্রার পথের পথিক হইয়া তাহার সহিত মিলিত হইল, সে দিন ছোট ভাই কালীনাথের বহুদিনকার চমক হঠাৎ ভাঙ্গিয়া গেল এবং এই পরিত্যক্ত সংসারটির জন্ত তখন ডাক আসিয়া পৌছিল—ছোট বৌ মানদাসুন্দরীর উপর।

ক্রোশ ৪।৫ দূরবর্ত্তী বকুলতলা গ্রামে কালীনাথের শ্বশুরবাড়ী। শ্বশুর হরিবল্লভ বাবু বৃদ্ধ এবং বিপত্নীক—কিন্তু তিনি প্রচুর ধন-সম্পত্তির অধিকারী। পর পর ৫টি পুত্রের পর এই কন্তাটির জন্মের পর যখন তাঁহার স্ত্রীবিয়োগ ঘটে, তখন আড়াই বছরের এই কন্তাটিকেই তিনি বুকে চাপিয়া পত্নী-শোক সহ্য করিয়াছিলেন। তাহার পর ধরিতে গেলে তিনি একরূপ নিজ হাতেই মানদাকে 'মানুষ' করিয়াছিলেন—নিজেই তাহাকে লিখাপড়া শিখাইয়াছিলেন। তাহার পর বড় কুলীনের ঘর দেখিয়া কালীনাথের হাতেই কন্তাকে সম্প্রদান করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু অত্যধিক স্নেহবশতঃ এ যাবৎ তিনি কন্তাকে তাহার শ্বশুরালয়ে পাঠাইতে পারেন নাই। আর এ পক্ষ হইতেও বধূকে আনিবার জন্ত এ পর্য্যন্ত তেমন বিশেষ কোন চেষ্টাচরিত্রও হয় নাই। ইহার একটা কারণ ছিল। হরনাথ ভাবিত—ছোটবৌ বড় লোকের মেয়ে, [illegible] সহ্য করা অন্যায় নাই। এ টানাটানির সংসারে যত দিন না আইসে, তত দিনই ভাল। সুতরাং বিবাহের পর হইতে এই দীর্ঘ সাত বৎসর কালের অধিকাংশই মানদার পিতৃগৃহেই অতিবাহিত হইয়াছে। মাঝে মাঝে সে ইচ্ছা করিয়া শ্বশুরালয়ে আসিত। দশ পনর দিন থাকিবার পর হরনাথ আবার তাহাকে পাঠাইয়া দিত। তবে কালীনাথ যখন তখন শ্বশুরালয়ে গিয়া স্ত্রীকে দেখিয়া ও দেখা দিয়া যাইত এবং টাকা-কড়ির প্রয়োজন হইলেই সে স্ত্রীর নিকট হইতে গোপনে গোপনে তাহা প্রাপ্ত হইত। তাহার পর হঠাৎ যে দিন তাহাদের এই বিপদের বার্ত্তা বকুলতলায় আসিয়া পৌছিল, তাহার দুই চারি দিন পরেই হরিবল্লভ বাবু নিজে কন্তাকে জামাতার গৃহে রাখিয়া গেলেন এবং মানদাও মাণিকডাঙ্গায় আসিয়া তাহার স্বামীর ক্ষুদ্র সংসারটি ঘাড়ে করিয়া লইবার সঙ্গে সঙ্গে ৭ বছরের ভাশুর-পুত্র গোপালকেও ধূলা ঝাড়িয়া কোলে তুলিয়া লইয়া তাহার সেই ২১ বছর বয়সেই পাকা গৃহিণী সাজিয়া বসিল।

কিন্তু মানদা দেখিল—সংসারে বড় বেগোছ, বড় টানাটানি—বড় শ্রীহীন ভাব।

দুই ভাই হরনাথ ও কালীনাথ কেহই ভালরূপ তেমন লিখাপড়া শিখে নাই। পৈতৃক দুই দশ বিঘা জমী-জায়াত যাহা ছিল, অতি কষ্টে তাহা দ্বারা কোন রকমে এই পরিবারের মোটা ভাত-কাপড়ের সংস্থান হইত। কালীনাথ সংসারের কোন খবরই রাখিত না। পল্লীগ্রামে নিকর্ম্মা লোকরা যাহা করিয়া থাকে, কালীনাথও তাহাই করিত। দোকানে দোকানে বসিয়া তামাকের শ্রাদ্ধ করা, বাজে গল্প করা, ঘোঁট, তাস খেলা, মাছধরা, সন্ধ্যার পর এর তার বৈঠকখানাতে একটু আড্ডা দেওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি,—এমনই করিয়াই কালীনাথ বছরের পর বছর কাটাইয়া আসিয়াছে। কিন্তু এখন আর তাহা করিলে চলে না। একেই ত টানাটানির সংসার, তাহার উপর হরনাথের [illegible] সংসারের খরচ

পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বাড়িয়া দিয়াছে। শ্রীমতী ইচ্ছা করিয়াই মানদা বাড়াইয়া তুলিয়াছে। অযত্নবশতঃ বলিয়াই হউক, অথবা অন্ত যে কারণেই হউক, খুব কষ্ট করিয়া থাকাটা মানদা পছন্দ করিত না, পারিতও না। ছেলেবেলা হইতে মানদা নূতন চক্‌চকে টাকা বড় ভালবাসিত, সে জন্ত হরিবল্লভ বাবু যখনই নূতন টাকা পাইতেন, সেগুলি মানদাকে দিতেন। এই সময়ে তাহার সেই নূতন টাকার বাক্সে প্রায় ১২ শত টাকা জমিয়াছিল। এই টাকার অধিকাংশ দিয়া প্রথমে কয়েক বিঘা উৎকৃষ্ট জমী মানদা কালীনাথকে দিয়া কিনিয়া ফেলিল। তাহার পর বহুকালের জীর্ণ ভগ্নপ্রায় বাড়ীখানিকে খুব ভাল করিয়া মেরামত করিয়া লইল। খিড়কীতে যে বাগান ছিল, তাহা এত দিন সাপ ও শিয়ালের বাসা হইয়া জঙ্গলাকারে পড়িয়া ছিল; মানদা জঙ্গল কাটাইয়া, বাগান সাফ করাইয়া, চারিদিকে মাটীর প্রাচীর তুলিয়া দিল এবং তাহাতে ভাল ভাল আম, লিচু, লেবু, নারিকেলের গাছ বসাইয়া দিল। তাহার পর বাপের বাড়ী হইতে ভাল দুগ্ধবতী গরু আনাইয়া শূন্য গোয়াল পূর্ণ করিল। কাষকর্ম্ম করিবার জন্ত এক জন নাপিতের মেয়েকে ঝি রাখিল। এই সমস্ত ব্যয়-বন্দোবস্ত করিবার পর মানদা হিসাব করিয়া দেখিল যে, সাবেক যে কয় বিঘা জমী ছিল এবং নূতন যে কয় বিঘা কেনা হইল, ইহার সব ধানটা যদি পাওয়া যায়, তাহা হইলে আর ভাত-কাপড়ের অভাব হয় না। তবে, ইহার উপর আরও ১০।১৫ টাকা করিয়া যদি মাসে বাহির হইতে আইসে, তাহা হইলে বেশ স্বচ্ছলতার সহিতই সংসারটি চলে। তখন এক দিন দুপুরবেলা কালীনাথ খাইতে বসিলে, মানদা এ কথা সে কথার পর এই কথারই উত্থাপন করিয়া বলিল—"দেখ, বাইরে থেকে দু'পয়সা না আন্‌লে ত আর কুলোয় না।—কি গো, কথা কচ্ছ না যে?"

"কথা আর কি কইব বল। যাতে কুলোয়, তাই কর। তুমিই ত মা'হক্ কতকগুলো খরচ বাড়িয়ে ফেল্‌লে! 'দুটো লোকের সংসার—এরই জন্যে একটা ঝি না রাখলে কি আর চল্‌তো না!' তার পর, খোকাটার এখনও কথা ফোটেনি, এখন থেকেই তাকে পড়াবার জন্যে মাষ্টারের কি দরকার বল,

"কি বল্‌ছো গো! বেটের কোলে ৮ বছরের ছেলে হ'ল—পড়বে না?"

"আহা, পড়বে না বৈ, কি! পড়বে না ত কি আর মুখ্যু হয়ে ব'সে থাকবে? আমি সে কথা বলিনি। আমি বল্‌ছি, পড়া ত ওর—অ আ ই ঈ, তা এর জন্যে মাসে তিনটে ক'রে টাকা—এটা শুধু শুধু নয় কি? তার পর দেখ—এক বিপর্য্যয় গরু পুষে, সে একজনা বাড়্‌তি খরচ। তা ছাড়া খাওয়া-দাওয়ায়ও আড়ম্বর তোমার কম নয়।"

"দেখ, আড়ম্বর কিছুই নয়। সংসার করতে গেলে, হিঁদুর ঘরে একটা গরুও পুষতে হয়—একটা ঝিও রাখতে হয়। তবে গরীবের সংসারে অন্যায় আড়ম্বর কিছু করতে নেই বটে, আমিও তেমন কিছু করি নি। যেটুকু না হ'লে নয়, সেইটুকুই খালি করা।"

"যাক্, এখন আমায় কি করতে হবে? বল ত, কলকাতায় গিয়ে না হয় একটা কাযকর্ম্মের সন্ধান করি। আর তাতেই বা এমন কি সুবিধে হবে? তেমন লেখাপড়া শিখিনি যে, একটা মোটা মাইনের চাকরী হবে। বড় জোর না হয় বিশ পঁচিশটে টাকা—এই ত?"

"আমি তোমায় দেশ ছেড়ে যেতে বল্‌ছি না, আর তা গেলেও চলবে না। আমি বলি কি—দেশে থেকেই যাতে আর কিছু আয় বাড়ে, তা কল্লে হয় না?"

"কি করবো বল।"

মাথাটি হেঁট করিয়া, বাঁ হাতের বালাগাছটি ঘুরাইতে ঘুরাইতে মানদা খানিক ভাবিয়া বলিল—"আচ্ছা, এক কায কল্লে হয় না? জমীগুলো ভাগীদারদের কাছ থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে তুমি নিজে কিষেণ খাটিয়ে আবাদ করতে পার না?"

"খুব পারি। কিন্তু বিশ বিঘে জমীর আবাদখরচও বড় কম নয়। যেমন করেই হোক্, ২শ' খানি টাকা হাতে ক'রে নিয়ে তবে এ কাযে নাম্‌তে হবে।"

"আচ্ছা—তাতে আটকাবে না।" তাহার পর কালীনাথের মুখের দিকে চাহিয়া, মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে বলিল—"কিন্তু শুধু এই নিয়েই থাকলে হবে না—আরও একটা কায তোমায় করতে হবে। এতে অনিচ্ছা

[illegible] বাড়ীতেই রাখবে, কিন্তু [illegible] হুপয়সা [illegible] হ'চ্ছে—বুঝতে পাচ্ছ ত ?"

"বুঝতে সবই পাচ্ছি—এখন কথা[illegible], চুপ্ ক'রে [illegible] দিকি ?"

[illegible] মৃদু হাসিতে হাসিতে মানদা বলিল—[illegible], এ পাড়ায় মুদীখানা দোকান ত একখানিও [illegible]। আমি বলি কি, ছোটখাট একখানা দোকান [illegible] করতে পার, আর বেশ বুঝে চালাতে পার, আমার [illegible] হয়, তা থেকেও মাসে দশ বিশ টাকা আয় হয়।"

কালীনাথের খাওয়া প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল। [illegible] সহিতই কালীনাথ বলিল—"এতে আমার [illegible] খুব মত, মানদা! কিন্তু এখনও আমি ঠিক বুঝে উঠতে পাচ্ছি নি যে, টাকা আস্‌বে কোত্থেকে। তোমার যা পুঁজিপাটা ছিল, সে সব ত শেষ ক'রে ব'সে আছ। কিন্তু এও আমি ব'লে রাখছি, এর জন্যে তোমার গায়ের গহনা একখানিও নষ্ট করা হবে না [illegible]।"

"তা কম্মিন্ কালেও দরকার হবে না। আমি যেখান থেকেই পারি, এর জন্যে আমি তোমার হাতে পাঁচ শ' টাকা দেবো। আমি কিন্তু টাকা দিয়েই খালাস, লাভ-লোকসান উন্নতি-অবনতি সে কিন্তু তোমারই উপর সব নির্ভর।"

দুধের বাটিটাতে চুমুক দিয়া কালীনাথ বলিল—"গরু পোষার দোষ দিচ্ছিলুম বটে, কিন্তু গরু না থাক্‌লে এমন বাটিভরা ক্ষীরের মত দুধটুকু খাবার মজাও হ'ত না। যাক—ভগবান্ তোমার মঙ্গল করুন, তুমি দীর্ঘজীবী হও।"

"যাও! তামাসা করতে হবে না। তা হ'লে তোমার মত ত—আমি টাকার যোগাড় করি ?"

দাঁড়াইয়া উঠিয়া কালীনাথ বলিল—"নিশ্চয়ই, এর আর কথা কি আছে।"

দিন পাঁচ সাত পরে, এক দিন পাল্কী করিয়া গোপালকে লইয়া মানদা পিত্রালয়ে চলিয়া গেল। [illegible] উঠিবার সিঁড়িতেই পিতার সহিত সাক্ষাৎ [illegible]। [illegible] দিবানিদ্রার পর নীচে বৈঠক[illegible] [illegible] করিয়া [illegible]—"কে, কে—মানি,—কখন্ এলি, মা ?"

"এই ত আসছি, বাবা!" বলিয়া পিতাকে প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা লইল।

"চেহারা যে বড্ড খারাপ হয়ে গেছে যে—কেমন সব আছিস্ বল ত, মা!"

স্বভাবসিদ্ধ সেই মুখটেপা হাসি হাসিতে হাসিতে মানদা বলিল—"সকলেই ভাল আছি, তবে খেতে পাচ্ছি না, বাবা!"

"চল মা, ওপরে চল, হাত-পা ধুয়ে ঠাণ্ডা হ—তার পর সব শুনবো এখন।" তাঁহার আর নীচে নামা হইল না। কন্যাকে লইয়া উপরে উঠিয়া গেলেন।

সন্ধ্যার পর পিতা-পুত্রীতে বসিয়া কথা হইতেছিল। হরিবল্লভ বাবু বলিলেন—"পাঁচ শ' কেন মা, তোকে আমি আজই পাঁচ হাজার দিতে পারি, কিন্তু কালীনাথ যে তেমন হিসিবী নয়—একেবারে দিলে তা থাক্‌বে কি ?"

"না বাবা, অত টাকার এখন কোন দরকার নেই। পরে যদি দরকার হয়, তখন আর কিছু নিয়ে গেলেই হবে।"

মাসখানেকের মধ্যেই কালীনাথ বাড়ীর কাছেই পাড়ার মধ্যে একখানি ছোটখাট দোকান খুলিল। আর সঙ্গে সঙ্গে জমীজায়গাও সব খাসে আনিয়া, চাষবাসেরও বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিল।

চৈত্র মাস কাবার হইলে, কালীনাথ দোকানের মোটামুটি একটা হিসাব করিয়া মানদাকে আসিয়া বলিল—"এই ৩ মাসে খরচ বাদ প্রায় শ' খানেক টাকা লাভ হয়েছে।"

শরতে মা আনন্দময়ীর আগমনে যেমন সিক্ত প্রকৃতির চারিদিকে একটা নিরাবিল আনন্দ, হাস্য ফুটিয়া উঠে, ছোটবৌ মানদার আগমনেও এই ছয় মাসের মধ্যে, এই শ্রীহীন সংসারেও তেমনই স্বচ্ছলতার আনন্দ, সাফল্যের শ্রী ফিরিয়া আসিয়াছিল।

পূর্বে যে সংসারটিকে গ্রামের লোক নিতান্তই অবহেলা ও ঘৃণা করিয়া দেখিয়া আসিয়াছে, এখন



কাল-বৈশাখী

বসুমতী প্রেস] [শিল্পী—শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত

তোমার খাটুনি খুবই বাড়বে, কিন্তু সংসারেও দুপয়সা আয় না হ'লে—বুঝতে পাচ্ছ ত ?"

"বুঝতে সবই পাচ্ছি—এখন কথাটা [illegible], টপ্‌ ক'রে ব'লে ফেল দিকি।"

[illegible] মৃদু হাসিতে হাসিতে মানদা বলিল—"[illegible], এ পাড়ায় মুদীখানা দোকান ত একখানিও নেই। আমি বলি কি, ছোটখাট একখানা দোকান যদি করতে পার, আর বেশ বুঝে চালাতে পার, আমার বোধ হয়, তা থেকেও মাসে দশ বিশ টাকা আয় হয়।"

কালীনাথের খাওয়া প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল। খুব উৎসাহের সহিতই কালীনাথ বলিল—"এতে আমার বাস্তবিকই খুব মত, মানদা! কিন্তু এখনও আমি ঠিক বুঝে উঠতে পাচ্ছি নি যে, টাকা আস্‌বে কোত্থেকে। তোমার যা পুঁজিপাটা ছিল, সে সব ত শেষ ক'রে ব'সে আছ। কিন্তু এও আমি ব'লে রাখছি, এর জন্যে তোমার গায়ের গহনা একখানিও নষ্ট করা হবে না কিন্তু।"

"তা করবার দরকার হবে না। আমি যেখান থেকেই পারি, এর জন্যে আমি তোমার হাতে পাঁচ শ' টাকা দেবো। আমি কিন্তু টাকা দিয়েই খালাস, লাভ-লোকসান উন্নতি-অবনতি সে কিন্তু তোমারই ওপর সব নির্ভর।"

দুধের বাটিটাতে চুমুক দিয়া কালীনাথ বলিল—"গরু পোষার দোষ দিচ্ছিলুম বটে, কিন্তু গরু না থাক্‌লে এমন বাটিভরা ক্ষীরের মত দুধটুকু খাবার মজাও হ'ত না। যাক—ভগবান্ তোমার মঙ্গল করুন, তুমি দীর্ঘজীবী হও।"

"যাও! তামাসা করতে হবে না। তা হ'লে তোমার মত ত—আমি টাকার যোগাড় করি ?"

দাঁড়াইয়া উঠিয়া কালীনাথ বলিল—"নিশ্চয়ই, এর আর কথা কি আছে।"

দিন পাঁচ সাত পরে, এক দিন পাল্কী করিয়া গোপালকে লইয়া মানদা পিত্রালয়ে চলিয়া গেল। উপরে উঠিবার সিঁড়িতেই পিতার সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি দিবাহ্নিক নিদ্রার পর নীচে বৈঠকখানায় [illegible]ছিলেন। হঠাৎ কন্যাকে দেখিয়া, একটু চমকিত হইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে রে—মানি,—কখন্ এলি, মা ?"

"এই ত আসছি, বাবা!" বলিয়া পিতাকে প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা লইল।

"চেহারা যে বড্ড খারাপ হয়ে গেছে রে—কেমন সব আছিস্ বল ত, মা।"

স্বভাবসিদ্ধ সেই মুখ-টেপা হাসি হাসিতে হাসিতে মানদা বলিল—"সকলেই ভাল আছি, তবে খেতে পাচ্ছি না, বাবা।"

"চল মা, ওপরে চল, হাত-পা ধুয়ে ঠাণ্ডা হ—তার পর সব শুনবো এখন।" তাঁহার আর নীচে নামা হইল না। কন্যাকে লইয়া উপরে উঠিয়া গেলেন।

সন্ধ্যার পর পিতা-পুত্রীতে বসিয়া কথা হইতেছিল। হরিবল্লভ বাবু বলিলেন—"পাঁচ শ' কেন মা, তোকে আমি আজই পাঁচ হাজার দিতে পারি, কিন্তু কালীনাথ যে তেমন হিসিবী নয়—একেবারে দিলে তা থাক্‌বে কি ?"

"না বাবা, অত টাকার এখন কোন দরকার নেই। পরে যদি দরকার হয়, তখন আর কিছু নিয়ে গেলেই হবে।"

মাসখানেকের মধ্যেই কালীনাথ বাড়ীর কাছেই পাড়ার মধ্যে একখানি ছোটখাট দোকান খুলিল। আর সঙ্গে সঙ্গে জমীজারাত সব খাসে আনিয়া, চাষ-বাসেরও বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিল।

চৈত্র মাস কাবার হইলে, কালীনাথ দোকানের মোটামুটি একটা হিসাব করিয়া মানদাকে আসিয়া বলিল—"এই ৩ মাসে খরচ বাদ প্রায় শ' খানেক টাকা লাভ হয়েছে।"

শরতে মা আনন্দময়ীর আগমনে যেমন সিক্ত প্রকৃতির চারিদিকে একটা নিরাবিল আনন্দ, হাস্য ফুটিয়া ওঠে, ছোটবৌ মানদার আগমনেও এই ছয় মাসের মধ্যে, এই শ্রীহীন সংসারেও তেমনই স্বচ্ছলতার আনন্দ, সাফল্যের শ্রী ফিরিয়া আসিয়াছিল।

পূর্ব্বে যে সংসারটিকে গ্রামের লোক নিতান্তই অবহেলা ও তুচ্ছ করিয়া দেখিয়া আসিয়াছে, এখন আবার নূতন করিয়া, অন্য ভাবে এই সংসারের প্রতি,



কাল-বৈশাখী

বসুমতী প্রেস]

[শিল্পী — শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত

তাহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। কি স্ত্রী, কি পুরুষ, সকলেই একবাক্যে মানদার প্রশংসা করিয়া বলিতে বাধ্য হইল—"হ্যাঁ, লক্ষ্মীমন্ত বটে! বাড়ীতে পদার্পণ করেই, ছোটবৌ তেমন ভাঙ্গা সংসারকে কেমন গ'ড়ে পিটে সাজিয়েই তুলে ফেল্লে!"

২

কয় বৎসর পরে যখন 'নন্-কো-অপারেশনের' প্রবল ঝড় বাঙ্গালার উপর দিয়া বহিয়া গেল, তখন ক্ষুদ্র মাণিকডাঙ্গাতেও তাহার একটা ধাক্কা না লাগিয়া পারিল না। তখন নূতন উৎসাহ, নূতন উদ্যম। গ্রামময় খুব একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল এবং প্রথম প্রথম দিনকতক বিলাতী কাপড়-চোপড় পোড়ানর ধূমও বড় কম হইল না। এই সময় হঠাৎ এক দিন কালীনাথের দ্বারা এমন একটি ঘটনা ঘটিয়া গেল, যাহার বিষময় ফলের কথা, সে এই নূতন আবেগ ও উত্তেজনার মধ্যে থাকিয়া, ইহার পূর্ব্বে একটি দিনের জন্যেও ভাবিবার প্রয়োজন বোধ করে নাই। এই ব্যাপার উপলক্ষে সকলেরই মনে ভয়ানক একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হইল এবং সমস্ত গ্রামখানি যেন ভয়ে ভাঙ্গিয়া, মুসড়িয়া, শিহরিয়া উঠিল।

ব্যাপারটি এই,—মুসলমানপাড়ার কাদের সেখ হাট হইতে একজোড়া বিলাতী কাপড় কিনিয়া, কালীনাথের দোকানের সম্মুখ দিয়া বাড়ী ফিরিতেছিল। দোকানের দাওয়ার উপর তখন বৈকালিক তাসের আড্ডা খুবই জমিয়া উঠিয়াছিল। এই বিলাতী কাপড় কেনা লইয়া প্রথমে কাদেরের সঙ্গে তাহাদের দুই একটা কথা, পরে তর্কা-তর্কি এবং শেষে রাগারাগি গালাগালি হইয়া গেলে, যুবকের দল উত্তেজিত হইয়া কাদেরের কাপড় জোড়াটি ছিনাইয়া লইয়া তাহা জ্বালাইয়া দেয় এবং তাহাকে যৎপরোনাস্তি গালি-গালাজ ও অপমান করিয়া বোধ হয় দুই একটা গলাধাক্কাও দেয়। এই অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য কাদের পাড়ায় আসিয়া সকলের সহিত পরামর্শ করিয়া দল বাঁধিল এবং সেই দিনই থানায় যাইয়া দারোগার শরণাপন্ন হইল। প্রথম হইতেই এ গ্রামের যুবকগণের প্রতি দারোগার ক্রুদ্ধদৃষ্টি ছিল। সুতরাং এমন একটা সূত্র পাইয়া দারোগা কালবিলম্ব না করিয়াই [illegible] তৎক্ষণাৎ মাণিকডাঙ্গায় আসিল এবং তদন্তাদি শেষ করিয়া ও দুই চারি জন সাক্ষীর জবানবন্দী লিখিয়া লইয়া কালীনাথ ও অপর একটি যুবককে গ্রেপ্তার করিয়া চালান দিল।

রাত্রিতে এই সংবাদ যখন মানদার কানে পৌঁছিল, তখন তাহার মাথার উপর কে যেন একখানি [illegible] পাতর চাপাইয়া তাহাকে সেই স্থানে বসাইয়া দিল। একবার নন্দর মা খাইবার জন্য বলিতে আসিয়াছিল, মানদার ভাব দেখিয়া কোন কথা আর বলিতে সাহস পাইল না—আস্তে আস্তে চলিয়া গেল। গোপাল সন্ধ্যার সময়ই খাইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, নন্দর মা তাহার কাছে আসিয়া বসিল। খুব যখন গভীর রাত্রি, তখন আর একবার নন্দর মা আসিয়া দেখিল—সেই একই ভাবে মানদা দালানের মেজেতে বসিয়া আছে। সে কোন কথা বলিবার আগেই মানদা অতি মৃদুস্বরে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"রাত পোয়াতে আর দেরী কত, নন্দর মা?"

"রাত ত সবে এখন দুপুর কি একটা মা। এ ভাবে ব'সে থেকে আর কি ফল হবে বল, চল, শোবে এস।"

"না, নন্দর মা, আমি শুতে পারবো না। গোপালকে নিয়ে তুই শুগে যা।" তাহার পর খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—"বকুলতলায় কে গেছে বল্তে পারিস্?"

"ও বাড়ীর ছোট্ ঠাকুদ্দা কাকে পাঠিয়েছেন, তা ত বলতে পারি না, মা! কাল সকালেই কর্ত্তাবাবু এসে পড়বেন। ভগবান্ আছেন, ভাবনা কিসের, মা, চল, তুমি শোবে চল।"

মানদার চক্ষুতে এ পর্য্যন্ত একটি ফোঁটা জল কিন্তু দেখা দেয় নাই। কেবল একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"কোথাকার কোন্ হাজতে, গারদের ভেতর, হয় ত তিনি অনাহারে অনিদ্রায় প'ড়ে আছেন, আমি শোব কেমন ক'রে, নন্দর মা?" তাহার পর খানিক চুপ করিয়া থাকিবার পর খুব মৃদু কণ্ঠে বলিল—"কথা কইতে ভাল লাগছে না—গোপালকে নিয়ে তুই শুগে যা, মা।"

পরদিন বেলা যখন প্রায় ১০টা, তখন হরিবল্লভ বাবু আসিয়া পড়িলেন এবং কন্যার এই অবস্থা দেখিয়া যার-পর-নাই বিচলিত হইলেন। কিন্তু মনের অবস্থা চাপিয়া রাখিয়া, কন্যাকে খুবই সাহস দিয়া, অবিচলিত-ভাবেই বলিলেন—"হয়েছে কি, মা, কেন এমন ক'রে আহার-নিদ্রা ত্যাগ ক'রে একেবারে ভেঙ্গে পড়েছিস? এ রকম ব্যাপার ত আজকাল হাজার হাজার হচ্ছে, তা এর জন্যে তোর ভাবনাটা কিসের? তুই চট্ ক'রে আমায় দুটি ভাত দে দেখি—আমি এই দুপুরের ট্রেণেই হুগলী যাই। এর জন্যে এত দুর্ভাবনার ত কোনই দরকার নেই, মা! কালই আমি যদি না কালীকে ফিরিয়ে আনতে পারি ত বৃথাই আমি এত দিন মামলা-মোকর্দ্দমা ক'রে চুল পাকিয়েছি, জান্‌বি।"

সেই দিন আর তাহার পরের দিন কি ভাবে যে মানদার কাটিল, তাহা, যিনি দিনদুনিয়ার মালিক, যিনি রাত্রিদিনের সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনিই জানেন।

এই দুই দিন মানদাকে উঠিতেও হইয়াছে, রাঁধিয়া গোপালকে খাওয়াইতেও হইয়াছে, কিন্তু নিজে এক মুঠি অন্নও মুখে দেয় নাই। পাড়ার অনেকে আসিয়া খাওয়াইবার জন্য অনেক চেষ্টাই করিয়াছে, কিন্তু কেহই তাহাকে অন্নস্পর্শ করাইতে পারে নাই। পিতা যে বলিয়া গিয়াছেন, "যেমন ক'রে পারি ফিরিয়ে আন্‌বোই",—কেবল সেই কথার উপর নির্ভর করিয়াই মানদা প্রাণ ধরিয়া এই দুই দিন পথের দিকে চাহিয়া কাটাইয়াছে, আর যিনি নিখিল বিশ্বের নিয়ন্তা, কায়-মনোবাক্যে শুধু তাঁহারই চরণ স্মরণ করিয়াছে।

মানদার এই সত্যকারের আরজি বোধ হয় সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাবিচারকের আসনের তলায় গিয়া পৌঁছিল।

সন্ধ্যার কিছু পরেই হরিবল্লভ বাবু কালীনাথকে সঙ্গে করিয়া বাড়ী ঢুকিয়াই উঠান হইতে ডাকিলেন—"মানি!" মানদা দুই হাতে বুকখানাকে চাপিয়া ধরিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইতেই তিনি বলিলেন—"মা,—সমস্ত দিন আমাদের পেটে দুটি ভাত পড়ে নি,—শীগ্‌গির দুটি রাঁধবার যোগাড় দেখ্।"

কতখানি মৎলব খাটাইয়া, কিরূপ ফিকির-ফন্দী এবং তদ্বির করিয়া যে হরিবল্লভ বাবু কালীনাথকে ফিরাইয়া আনিতে পারিয়াছিলেন এবং এই ফিরাইয়া আনিবার মূল্যটা যে তাঁহার সঙ্গের হাজার টাকাতেও কুলায় নাই, হুগলীতে যে তাঁহাকে আরও কিছু ঋণ করিতে হইয়াছিল, এ সকল বৃত্তান্ত তিনি কন্যাকে কিছুই জানাইলেন না; এবং মানদারও এ সকল জানিবার কোনই প্রয়োজন ছিল না। সে শুধু কম্পিত বক্ষের উপর হাত দুটি জোড় করিয়া, ভগবানের চরণতলে বার বার মাথা নোয়াইয়া মনে মনে বলিতে লাগিল—"বড় বিপদেই বাঁচিয়েছ, ঠাকুর! তোমার পায়ের তলাতে যখন সংসার পেতেছি, দয়াময়, তখন এম্‌নি করেই আমার সকল অন্ধকার যে তোমাকে দূর করতে হবে, প্রভু!"

৩

"যে প্রকাণ্ড লবণময় জলরাশি পৃথিবীকে আবৃত করিয়া আছে, তাহার নাম মহাসাগর। মহাসাগর পাঁচ অংশে বিভক্ত,—উত্তর, দক্ষিণ, আট্‌লাণ্টিক, প্রশান্ত ও ভারত।"

পৌষ মাস। দুই দিন পূর্ব্বে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া শীতও যেমন পড়িয়াছে, বাতাসের জোরও তেমনই প্রবল। সন্ধ্যার আগেই মানদা রান্নাঘরের কাযকর্ম্ম সারিয়া, গোপালকে খাওয়াইয়া, দালানের মধ্যে বসিয়া কতকগুলি সুপারি লইয়া কাটিতেছিল। সম্মুখে একখানি মাদুরের উপর বসিয়া গোপাল তাহার ভূগো-লের পড়া মুখস্থ করিতেছিল।

উঠান হইতে কে ডাকিল—"দিদিঠাকরুণ!"

বইয়ের উপর হইতে মুখ তুলিয়া গোপাল চেঁচাইয়া উঠিল—"কে গো, এখানে এস।"

দালানের কবাট ঈষৎ ফাঁক করিয়া, কালো রঙের খর্ব্বাকৃতি যে একটি লোক মস্ত একটা বাঁশের লাঠি হাতে করিয়া আসিয়া দাঁড়াইল, সে শম্ভু—হরিবল্লভ বাবুর অনেক দিনের পুরাতন চাকর। শম্ভু সেই স্থান হইতেই মানদাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"সব ভাল আছ ত, দিদিঠাকরুণ?"

"হ্যাঁ শম্ভু, বকুলতলায় খবর সব ভাল ত?"

"না, দিদিঠাকরুণ, ভাল আর কৈ? কর্ত্তাবাবুর বড় অসুখ" বলিয়া গামছার খুঁট হইতে একখানি

ভাঁজকরা পত্র বাহির করিয়া মানদার হস্তে দিয়া বলিল—"সেই জন্যই ত তোমাকে নিতে এসেছি, দিদিঠাকরুণ!"

পত্রখানি বার দুই তিন পাঠ করিয়া মানদা বলিল,—"এত দিন বাবার অসুখ হয়েছে, এর আগে আমি কোন খবর পেলুম না!"

"অসুখটা হয়েছিল বটে, কিন্তু গোড়ায় ত এতটা বাড়াবাড়ি হয়নি, দিদিঠাকরুণ! তোমার এখান থেকে গিয়ে একটু সামান্যি জ্বর হয়। তা ও-রকম ত ওঁর মাঝে মাঝে হয়েই থাকে। তার পর, হঠাৎ কি রকম ঠাণ্ডা-ফাণ্ডা লেগে, বুকে সর্দ্দী ব'সে একেবারে 'নিমুনিয়া'তে ধ'রে গেল! তবে, ভয় কিছু নেই, দিদিঠাকরুণ! ডাক্তাররা সকলেই বলছে—'তেমন শক্ত কিছু নয়—সেরে উঠবেন'।"

শম্ভুর হাত-মুখ ধোয়া হইলে, তাহাকে কিছু জল খাইতে দিয়া মানদা বলিল—"জল খেয়ে, তুমি একবার দোকানে যাও, শম্ভু। ব'লে এস, দোকান বন্ধ ক'রে এখনই যেন বাড়ী আসেন।"

কালীনাথ বাড়ী আসিলে, মানদা ভ্রাতার পত্রখানি তাহার হস্তে দিল। কালীনাথ পড়িয়া বলিল—"তা হ'লে কাল ভোরেই তুমি চ'লে যাও, আমি আজই পাল্কীর বন্দোবস্ত ক'রে রাখছি।"

মানদা বলিল—"বাবা ভাল না হওয়া পর্য্যন্ত আমি ত আসতে পারবো না,—তোমার খাবার উপায়?"

"তুমি গোপলাকে নিয়ে যাও,—আমার যা হয় ব্যবস্থা ক'রে নেবো এখন।"

"'নেবো এখন' বললে ত হবে না। কোন ব্যবস্থা না দেখে আমিও ত যেতে পারবো না। দু' এক দিনের জন্যে হ'লে সে আলাদা কথা ছিল। হয় ত পনর কুড়ি দিন কি এক মাসও হ'তে পারে। এ অবস্থায়, তোমার দুটি খাবার ব্যবস্থা না দেখে আমিই বা যাই কি ক'রে!"

তখন ও-বাড়ীর ন'গিন্নীকে ডাকিয়া আনা হইল। তিনি বলিলেন—"আমার শরীর ভাল থাকলে এর জন্যে আর কোন ব্যবস্থা করবার দরকারই হ'ত না। তবে, এর জন্যে তোদের ভাবনা নেই। ঐ দামিনী আজ কদিন হ'ল শ্বশুরবাড়ী থেকে চ'লে এসেছে, ওকেই আমি ব'লে ক'য়ে মাসখানেকের জন্যে এনে দেবো এখন।"

মানদা জিজ্ঞাসা করিল—"দামিনী কে, খুড়ীমা?"

"ঐ আমাদের শশীর বোন গো! কালী, তুই কি দেখিস্ নি তাকে? আহা, বড় ভাল মেয়ে! ও রাঁড় হয়ে এই ৪ বছর সেখানেই ছিল না! তার পর যায়েদের সঙ্গে বনিবনাও হ'ল না, তাই সেখানকার যা কিছু সব বেচে কিনে, এই দিনকতক হ'ল এখানে চ'লে এসেছে। শশী মরবার পর থেকে ভিটেটায় শ্যাল-কুকুরের বাস হয়েছিল, আহা, ছুঁড়ীটা এসে তবু রোজ একবার ক'রে এখন সন্ধ্যে পাবে!"

"তা হ'লে, এ ভার তোমারই ওপর থাকলো, খুড়ীমা! বড় জোর আমার একটা মাস দেরী হবে। বাবাকে একটু ভাল দেখলেই আমি চ'লে আসবো।"

"আচ্ছা—আচ্ছা—মা, তুই নিশ্চিন্তি হয়ে যা। বাপকে গিয়ে যেন ভালই দেখিস্। কালীর একমুঠো ভাতের জন্যে তোকে অত উতলা হ'তে হবে না, মা! দামিনী ভাল মেয়ে, আমি বললে সে কথা ফেলতে পারবে না। আর এতে তার সুবিধে বই অসুবিধেও কিছু নেই! একটা মাস ত তার খাওয়াটা বাইরে থেকে নিখরচে চ'লে যাবে এখন!"

এই ব্যবস্থাই স্থির হইল এবং পরদিন প্রাতে গোপালকে সঙ্গে করিয়া মানদা বকুলতলায় চলিয়া গেল।

মানদা আসিয়া দেখিল, পিতার সেই দীর্ঘাকার, নধর শরীর একেবারে 'পাত' হইয়া গিয়া বিছানার সহিত মিশিয়া গিয়াছে! পিতা যে তাহার শুধু পিতাই ছিলেন, তাহা ত নহে,—মা-ও যে তাহার তিনিই ছিলেন! এমন করিয়া কন্যাকে ভালবাসিতে বোধ হয় কেবল তিনি ভিন্ন অন্য কোন পিতা পারিতেন না। আর পিতার প্রতিও এমন অচলা ভক্তি, এমন গভীর শ্রদ্ধা, বুঝি কেবল এক মানদারই ছিল! পরস্পরের প্রতি তাহাদের এই স্নেহ-ভালবাসার ওজন যে ঠিক কতখানি, তাহা বাহির হইতে যতই কেন অনুমান করা হউক না, তাহার সঠিক পরিমাণ সেই দুইটি অন্তঃকরণ ছাড়া আর ত কেহ বুঝিতে পারিবে না!

আশপাশের তিন চারিখানি গ্রামের মধ্যে যে কয় জন ভাল ডাক্তার ছিলেন, সকলেই হরিবল্লভ বাবুর চিকিৎসা করিতেছিলেন। এই দিন তাঁহারা আসিয়া ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—"আর কোন ভয় নেই, বিপদ কেটে গেছে; এখন এ রোগীকে মারে কার সাধ্য ?" বাড়ীশুদ্ধ সকলেই তখন অনেকটা নিশ্চিন্ত হইল এবং রোগমুক্তির এই সময়টাতে যাহাতে শুশ্রূষার সামান্য কোন রকম ব্যতিক্রম বা অনিয়ম না হয়, সে বিষয়ে প্রাণপণ চেষ্টা চলিতে লাগিল। কিন্তু দিন চারি পরে হঠাৎ এক দিন ডাক্তাররা রোগীকে বার বার পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—"তাই ত! বড় সুবিধা দেখছি না,—এখন কেবল ভগবানের হাত।"

চারি দিন ধরিয়া যাঁহারা রোগীর সম্বন্ধে কেবলই বলিয়া আসিতেছেন—"এ যাত্রা আর কোন ভয় নেই," তাঁহারাই আজ আবার হঠাৎ যখন মত প্রকাশ করিলেন—"আর ত জীবনের কোন আশাই নেই," তখন চিকিৎসা-তন্ত্রের এই জটিল প্রহেলিকার মীমাংসা করিবার মত অবস্থা কাহারও ছিল না এবং সকলেই তখন দুশ্চিন্তা ও নৈরাশ্যে কাতর হইয়া একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। মানদা অনেক করিয়া দুই হাতে বুকখানাকে চাপিয়া ধরিয়া রাখিয়াছিল,—এইবার আর পারিল না; অন্তরালে গিয়া একেবারে আছড়াইয়া পড়িল।

সেই দিন শেষ রাত্রিতে হরিবল্লভ বাবু সকলের আকুল ক্রন্দন উপেক্ষা করিয়া, মানদার কোলে মাথা রাখিয়া শেষ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। বাড়ীতে কান্নার রোল পড়িয়া গেল। সকাল হইলে সমস্ত গ্রামের লোক আসিয়া বহির্বাটীর প্রাঙ্গণ ছাইয়া ফেলিল। সকলেই ম্লান মুখে 'হায় হায়' করিতে লাগিল।

তাহার পর যথাদিনে হরিবল্লভের শ্রাদ্ধাদি কার্য্য খুব সমারোহের সহিতই সুসম্পন্ন হইয়া গেল। শ্রাদ্ধের দিন কালীনাথও আসিয়াছিল। তাহার যাইবার সময় এমন দিনেও মানদা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিল না—"খাবার কোন কষ্ট হচ্ছে না ত ?" ছোট্ট একটি "না" বলিয়া কালীনাথ বিষণ্ণ চিত্তে বাহির-বাটীতে চলিয়া আসিল। তথায় তাহার জ্যেষ্ঠ শ্যালক বলিলেন—"উপস্থিত যেমন ব্যবস্থায় আছ, তেমনই ভাবে আর মাসখানেক চালিয়ে নাও ভাই। মানি একেবারে কি রকম ভেঙ্গে পড়েছে, দেখছো ত ? আর শরীরও তা'র বড়ই খারাপ হয়েছে। একটা মাস থাকুক এখানে।" কালীনাথ সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

সত্যই মানদা বড় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। সে কখনও চীৎকার করিয়া কাঁদিতে পারিত না। তাহা পারিলে বোধ হয়, সে তাহার শোকদগ্ধ অন্তর অনেক পরিমাণে হাল্কা করিতে পারিত। তাহা পারে নাই বলিয়াই আজ যেন তাহার এই গভীর বেদনার গন্‌গনে আগুনে তাহার বুকের হাড়-পাঁজরাগুলি জ্বলিয়া উঠিয়া অহর্নিশি তাহাকে ভিতরে ভিতরে দগ্ধ করিতে লাগিল।

৪

প্রায়ই দেখা যায় যে, হঠাৎ কোনও বিশেষ কারণে কোন একটি কায করিবার প্রয়োজন হইলে, প্রথমে আমরা এমনই সহজ ও সরলভাবে তাড়াতাড়ি তাহার সূচনা করিয়া ফেলি এবং ভবিষ্যতে যে তাহা হইতে কত বড় ভয়ানক ফল ফলিতে পারে, সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র চিন্তা না করিয়া, আমরা এমনই অন্ধভাবে ও নির্বিচারে তখন নিশ্চিন্ত থাকি যে, দিন কতক পরেই যখন সেই অতি সামান্য ও তাচ্ছীল্যের সহিত আরব্ধ কার্য্যের বিষময় ফল প্রকাণ্ড ও ভীষণ হইয়া আমাদের চক্ষুর সম্মুখে আসিয়া দেখা দেয়, কেবল তখনই আমরা অতীত কালের সেই দিনটির প্রতি দৃষ্টি ফিরাইয়া, মনে মনে সহস্রবার নিজেকে ধিক্কার দিয়া বলি—"আহা, তখন যদি একবার ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিতাম!" কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা আক্ষেপের কথা এই যে, বুঝিতে যখন পারা যায়, প্রতীকারের তখন আর সময় থাকে না।

কিন্তু দোষটা এ ক্ষেত্রে ঠিক কাহার ? মানদার, না ন'গিন্নীর, না কালীনাথের ? মানদার দোষ ত দেওয়া যাইতে পারে না। যে অবস্থায় পড়িয়া সে দামিনীর উপর স্বামী ও সংসার ফেলিয়া চলিয়া যাইতে

বাধ্য হইয়াছিল, সে অবস্থায় বেশী দূর চিন্তা করিয়া দেখিবার মত ক্ষমতা তখন তাহার ছিল না। তাহা ছাড়া ন'গিন্নীর মত প্রবীণ ও বুদ্ধিমতী বিশেষ এক জন আপনার জন যখন দামিনীকেই আনিয়া রাখিবার জন্ত পরামর্শ ও ব্যবস্থা করিলেন, তখন ইহার উপর কথা আর কি থাকিতে পারে? তাহার পর ন'গিন্নীরই বা ইহাতে দোষ কতটুকু? দামিনীকে তিনি যতদূর জানিতেন, তাহার মধ্যে ত কোন অন্যায়, কোন কু, কোন বিরুদ্ধ-ভাব একটি দিনের জন্তও দেখা দূরের কথা, কানে পর্য্যন্ত তিনি শুনেন নাই। তাই তিনি সেই প্রথম দিন দামিনীর পরিচয় দিতে গিয়া যে বলিয়াছিলেন,—"আহা, বড় ভাল মেয়ে!" সে কথা তিনি সত্যই বলিয়াছিলেন। সে কথার ভিতর এতটুকু প্রচ্ছন্ন মিথ্যা ত তখন ছিল না! সুতরাং দোষ ন'গিন্নীরও নহে কিংবা দামিনীরও নহে। তাহার পর কালীনাথকেও ইহার জন্ত দায়ী করা চলে না। সে লিখাপড়া শিখে নাই বটে, এবং হরনাথের মৃত্যুর আগের দিন পর্য্যন্ত লক্ষীছাড়ার মত কেবল বৃথা কাষেই দিন কাটাইয়া আসিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার চরিত্র, সে ত এমন করিয়া একটি দিনের জন্তও হারায় নাই! সুতরাং দোষ কাহার?

দোষ যাহারই হউক, শাস্ত্রবাক্য মিথ্যা হয় নাই—অগ্নি ও ঘৃত কাছাকাছি থাকিলে বিপদ অনিবার্য্য। মন্দ কথা কখনই চাপা থাকে না। এই কথা লইয়া প্রথমে মেয়েমহলে একটু কানাকানি হইতেই কথাটা একেবারে ৩ ক্রোশ ডিঙ্গাইয়া বকুলতলায় মানদার কর্ণে গিয়া পৌছিল। কিন্তু সে সময় মানদা ইহা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারে নাই। শেষে নন্দর মা যখন এক দিন গোপনে আসিয়া, নিভৃতে তাহাকে চুপি চুপি সকল কাহিনী জানাইয়া, তাহাকে সত্বর মাণিক-ডাঙ্গায় যাইবার জন্ত বিশেষ করিয়া পীড়াপীড়ি করিয়া গেল, তখন সমস্ত জগৎটা যেন তাহার পায়ের নীচে ঘুরিতে লাগিল। কোন রকমে চৈত্রমাসের বাকী কয়টা দিন তথায় কাটাইয়া, বৈশাখ মাস পড়িতেই সে মাণিকডাঙ্গায় চলিয়া আসিল।

আসিয়া দেখিল, এই তিনটি মাসের মধ্যে কালী-নাথের অনেক বিষয়েই অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সে আর এখন আগেকার মত তেমন করিয়া মানদার মুখের দিকে চাহিয়া কথা কহিতে পারে না এবং বেশী কথাও বড় বলে না। মানদা কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে, 'হাঁ-হুঁ' দিয়াই চলিয়া যায়। মানদা আসিবার পর হইতে বেশীর ভাগ সময় সে দোকানেই কাটাইতে আরম্ভ করিল, বাড়ীতে অতি অল্প সময়ই থাকে। অনেক রাত্রিতে যখন গৃহে আইসে, তখন মুখে তাহার কিসের একটা তীব্র গন্ধ বাহির হয় এবং সে সময় মেজাজও তাহার সেইরূপ তীব্র ও রুক্ষ থাকে।

গোপালের কয় দিন হইতে অত্যন্ত জ্বর হইয়াছিল। দ্বিপ্রহরে কালীনাথ খাইতে আসিলে মানদা বলিল—"আর ত ছেলেকে বিনে চিকিচ্ছেয় ফেলে রাখা যায় না—তুমি ডাক্তার ডেকে আন।" কিন্তু, কালীনাথ সেই যে ডাক্তারকে ডাকিতে গেল, সে দিন সমস্ত দিন-রাত ও তাহার পরদিন আর সে বাড়ী ফিরিল না। দুই দিন পরে রাত্রি প্রায় ২টার সময় কালীনাথ যখন টলিতে টলিতে গৃহে ফিরিল, তখন মানদা আর সহ্য করিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিল—"এমন ক'রে যে অধঃপাতে যাবে, এ কথা স্বপ্নেও কখনও ভাবি নি।"

জড়িত কণ্ঠে কালীনাথ উত্তর করিল—"এক দিনেই কি কেউ ভাবে,—ক্রমে ক্রমেই ভাবে।"

"তা' বৈ কি। তুমি না হয় লজ্জা-সরমের মাথা খেয়েছ, কিছুতেই তোমার কিছু যায় আসে না! কিন্তু তোমার অখ্যাতিতে আমার যে গাঁয়ে কান পাতবার যো থাক্‌ছে না।"

বিকৃত কণ্ঠে ধমক দিয়া কালীনাথ বলিয়া উঠিল—"আচ্ছা, আচ্ছা,—বড্ড লেক্‌চার ঝাড়্‌চো যে দেখতে পাচ্ছি। কান পাততে না পার, সোজা রাস্তা—চ'লে যাও। বাপের বাড়ী ছিলে, মাথার দিব্যি দিয়ে ত আন্‌তে বলা হয়নি।"

"তাই এসেছি ব'লে বড় অসুবিধেই তোমার হয়েছে, বুঝতে পাচ্ছি। কিন্তু এ যে আমার হাতে গড়া সংসার; অনেক কষ্টেই যে এ সংসার আমি নতুন ক'রে সাজিয়েছি। এখন ত আর সে দিন নেই; তাই এসেছি ব'লে বড় গায়ের জ্বালাই হয়েছে! ছি—ছি—কি আর বল্‌বো, গলায় দড়ি তোমার!"

সব রোগ—শুধু হাঁসপাতালে থাক্‌লেই সারে না। আত্মীয়স্বজনের দ্বারা একটু দেখা-শুনো হ'লে শীঘ্র উপকার হবার সম্ভাবনা। তোমার কি কেউ আপনার জন নেই ?"

কি ভাবিয়া কালীনাথ বকুলতলার নাম করিল।

* * * *

পরদিন প্রভাতে ডাক্তার বাবু কালীনাথকে পরীক্ষা করিতে আসিয়া 'নার্সকে' প্রশ্ন করিলেন যে, টেলিগ্রাম পাইয়া কেহ ইহাকে দেখিতে আসিয়াছে কি না? শুশ্রূষাকারিণী অঙ্গুলি হেলাইয়া এক জন লোককে দেখাইয়া দিল। লোকটি অভিবাদন করিয়া বলিল, "আজ্ঞে, ডাক্তার বাবু, আমরা এসেছি।"

ডাক্তার বাবু রোগীর ঘরে প্রবেশ করিতে করিতে বলিলেন, "তুমি কে বাপু ?"

"আজ্ঞে, আমি শম্ভু—বাড়ীর চাকর; আর ওই ওনার মাথা যিনি কোলে ক'রে ব'সে রয়েছেন, উনি আমার দিদিঠাকুরুণ—ওনারই স্ত্রী।"

রোগী তখন যেন সারারাত্রির ঘোর অনিদ্রার পর প্রভাতবায়ুর স্নিগ্ধ স্পর্শে শুশ্রূষাকারিণীর কোমল অঙ্কে মাথা রাখিয়া ঘুমাইতেছিল।

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়।

অনুরোধ

মরিলে, সখি লো, রচিও সমাধি
সাধের কদম-তলে,
দিয়ো লো সজনি, বকুলেরি মালা
সে সময়ে মোর গলে।

রাখিও আমারে সেইখানে সই,
যেথায় আসিয়া কালা,
বাজা'ত মোহন বাঁশরী—শুনিয়া
ছুটিত ব্রজের বালা।

যেথায় নাচিত ময়ুর ময়ুরী
মোহন পেখম তুলি,
বহিত যেথায় যমুনা উজান
শ্যামের সোহাগে ছুলি'।

উঠিত যেথায় গোকুল মাতা'রে
শ্যামের বাঁশরী-তান,
শাখে বসি' শারী গাহিয়া যেথায়
মোহিত ব্রজের প্রাণ।

বসিত যেথায় শ্যাম নটবর
ধড়াটি বিছায়ে ভূমে,
বনভূমি যেথা হইত ধন্য
আদরে চরণ চুমে।

যেথায় যাইয়া ভুলিতাম, সখি,
লইয়া যাইতে বারি,
যেথায় সকলে খেলিতাম সই,
বঁধুয়ার সনে হোরি।

তুলিত যেথায় থাকিয়া থাকিয়া
পঞ্চমে মুহু মুহু—
হৃদয়-ভোলান, মরম-কাঁপান
কোকিল-ভাষিত কুহু।

তুলিত যেথায় মধুর সঙ্গীত
যমুনা মধুর তানে,
শুনিতাম বসি শ্যামেতে আমাতে
আকুল হইয়া প্রাণে।

রচিও, সজনি, সেইখানে তুমি
সাধের সমাধি মোর,
সেথা র'বে মোর অন্তিম শ্বাস
অন্তিম আঁখির লোর।

শ্রীপরিতোষকুমার চন্দ্র।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত

শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ

[SWAMIJEE IN AMERICA AND IN EUROPE.]

প্রথম পরিচ্ছেদ

রথযাত্রার পরদিন ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ, আষাঢ়—সংক্রান্তি। শ্রীশ্রীভগবান রামকৃষ্ণ বলরাম-মন্দিরে সকালবেলা ভক্ত-সঙ্গে বসিয়া আছেন। নরেন্দ্রের (স্বামী বিবেকানন্দের) মহত্ত্ব-কথা বলিতেছেন—

[নরেন্দ্রের মহত্ত্ব 'A prince among men']

"নরেন্দ্রের খুব উঁচু ঘর,—নিরাকারের ঘর। পুরুষের সত্তা। এত ভক্ত আসছে, ওর মত একটি নাই।

"এক একবার ব'সে ব'সে আমি খতাই। তা দেখি, অন্য পদ্ম কারুর দশদল, কারুর ষোড়শদল, কারুর শতদল ; কিন্তু পদ্মমধ্যে নরেন্দ্র সহস্রদল !

"অন্যেরা কলসী, ঘটী, এ সব হ'তে পারে ; নরেন্দ্র জালা !

"ডোবাপুষ্করিণীরমধ্যে নরেন্দ্র বড় দীঘি! যেমন হালদার পুকুর।

"মাছের মধ্যে নরেন্দ্র রাঙাচক্ষু বড় রুই, আর সব নানারকম মাছ,—পোনা, কাঠী, বাটা এই সব।

"খুব আধার,—অনেক জিনিষ ধরে। বড়, ফুটোওলা বাঁশ।

"নরেন্দ্র কিছুর বশ নয়। ও আসক্তি, ইন্দ্রিয়সুখের বশ নয়। পুরুষ পায়রা। পুরুষ পায়রার ঠোঁট ধরলে ঠোঁট টেনে ছিনিয়ে লয়,—মাদী পায়রা চুপ ক'রে থাকে।

[আগে ঈশ্বরলাভ। আদেশ হ'লে লোকশিক্ষা]

তিন বৎসর পূর্ব্বে [১৮৮২ খৃঃ] নরেন্দ্র দু' একটি ব্রাহ্মবন্ধু সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। রাত্রিতে ঐখানেই ছিলেন। প্রত্যূষ হইলে ঠাকুর বলিলেন, "যাও পঞ্চবটীতে ধ্যান কর গিয়ে।" কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর গিয়া দেখেন, তিনি বন্ধুসঙ্গে পঞ্চবটীমূলে ধ্যান করিতেছেন। ধ্যানান্তে ঠাকুর তাঁহাকে বলিতেছেন,"দেখ, ঈশ্বরদর্শনই জীবনের উদ্দেশ্য; ব্যাকুল হইয়া নির্জ্জনে গোপনে তাঁহার ধ্যান চিন্তা করিতে হয় ও কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করিতে হয়, ঠাকুর আমাকে দেখা দাও।" ব্রাহ্মসমাজের ও অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীদের লোকহিতর কর্ম্ম যথা স্ত্রীশিক্ষা, স্কুল স্থাপন, বক্তৃতা [Lecture] দেওয়া সম্বন্ধে বলিলেন, "আগে ঈশ্বরদর্শন কর। নিরাকার সাকার দুই দর্শন। বাক্য-মনের অতীত যিনি, তিনিই আবার ভক্তের জন্য রূপ ধারণ ক'রে দর্শন দেন আর কথা কন। দর্শনের পর তাঁহার আদেশ লইয়া লোকহিতকর কর্ম্ম করিতে হয়। একটা গানে আছে—মন্দিরে ঠাকুর প্রতিষ্ঠা হয় নাই, পোদো কেবল শাঁক বাজাচ্ছে, যেন আরতি হচ্ছে ; এক জন তাই তাকে ধিক্কার দিয়া বলিতেছে—

মন্দিরে তোর নাহিক মাধব !
[ওরে] পোদো, শাঁক্ ফুঁকে তুই করলি গোল !
তায় চামচিকে এগার জনা, দিবানিশি দিচ্ছে থানা—

"যদি হৃদয়-মন্দিরে মাধব প্রতিষ্ঠা করিতে চাও, যদি ভগবান্ লাভ করিতে চাও, তা হ'লে শুধু ভোঁ ভোঁ ক'রে শাঁক ফুঁকলে কি হবে! আগে চিত্তশুদ্ধি কর। মন শুদ্ধ হ'লে ভগবান্ পবিত্র আসনে এসে বসবেন। চামচিকার বিষ্ঠা থাকলে মাধবকে আনা যায় না। এগার জন চামচিকে অর্থাৎ একাদশ ইন্দ্রিয়!

"আগে ডুব দাও। ডুব দিয়ে রত্ন তোল, তার পর অন্য কায। আগে মাধব প্রতিষ্ঠা, তার পর ইচ্ছা হয় বক্তৃতা [Lecture] দিও।

"কেউ ডুব দিতে চায় না। সাধন নাই, ভজন নাই, বিবেকবৈরাগ্য নাই, দুই চারটে কথা শিখেই অমনি লেকচার্!

"লোকশিক্ষা দেওয়া কঠিন। ভগবান্‌কে দর্শনের পর যদি কেউ তাঁর আদেশ পায়, তা হ'লে লোকশিক্ষা দিতে পারে।"

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের রথযাত্রার দিন কলিকাতায় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত পণ্ডিত শশধরের দেখা হয়। নরেন্দ্র উপস্থিত ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ পণ্ডিতকে বলিলেন, "তুমি লোকের মঙ্গলের জন্য বক্তৃতা [Lecture] কর্‌ছ; তা বেশ। কিন্তু বাবা, ভগবানের আদেশ ব্যতিরেকে লোকশিক্ষা হয় না। ঐ দুদিন লোক তোমার লেক্‌চার শুনবে, তার পর ভুলে যাবে। হালদার পুকুরের পাড়ে লোক বাহ্যে করত; লোক গালাগাল দিত, কিন্তু কিছুই ফল হয় নাই। অবশেষে সরকার যখন একটি নোটীশ [Notice] মেরে দিলে, তখন তা' বন্ধ হ'ল। তাই ঈশ্বরের আদেশ না হ'লে লোকশিক্ষা হয় না।"

তাই নরেন্দ্র গুরুদেবের কথা শিরোধার্য্য করিয়া সংসার ত্যাগ করিয়া নির্জ্জনে গোপনে অনেক তপস্যা করিয়াছিলেন। অতঃপর তাঁহার শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া এই লোকশিক্ষাব্রত অবলম্বন করিয়া দুরূহ প্রচারকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন।



শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব

কাশীপুরে যখন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পীড়িত হইয়া আছেন [১৮৮৬ খৃঃ], এক দিন একটি কাগজে লিখিয়াছিলেন—"নরেন্দ্র শিক্ষে দিবে।"

স্বামী বিবেকানন্দ মাদ্রাজীদের নিকট আমেরিকা হইতে পত্র লিখিয়াছিলেন। তাহাতে লিখিয়াছিলেন যে, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের দাস; তাঁহারই দূত হইয়া তাঁহার মঙ্গলবার্ত্তা তিনি সমগ্র জগৎকে বলিয়াছেন।

"It was your generous appreciation of him whose message to India and to the whole world, I, the most unworthy of his servants, had the privilege to bear; it was your innate spiritual instinct which saw in him and his message the first murmurs of that tidal wave of spirituality which is destined at no distant future to break upon India in all its irresistible powers" etc ; *Reply to Madras Address.*

মাদ্রাজে তৃতীয় বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে, আমি সারগর্ভ যাহা কিছু বলিয়াছি, সমস্তই পরমহংসদেবের, অসার যদি কিছু বলিয়া থাকি, সে সব আমার—

"Let me conclude by saying that if in my life I have told one word of truth it was his and his alone; and if I have told you many things which were not true, correct and beneficial to the human race, it was all mine and on me is the responsibility" *Third Lecture, Madras.*

কলিকাতায় রাধাকান্ত দেবের বাড়ীতে যখন তাঁহার অভ্যর্থনা হয়, তখনও তিনি বলিয়াছিলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শক্তি আজ জগদ্‌ব্যাপী। হে ভারতবাসিগণ, তোমরা তাঁহাকে চিন্তা কর, তাহা হইলে সকল বিষয়ে মহত্ত্বলাভ করিবে। তিনি বলিলেন—

"If this nation wants to rise it will have to come enthusiastically round his name. It does not matter who preaches Ramkrishna, whether, I or you or any body. But him I place before you and it is for you to judge, and for the good of our race, for the good of our nation, to judge now what you shall do with this great idea of life. * * * * Within ten years of his passing away this power has encircled the globe. Judge him not through me. I am only

a weak instrument. His character was so great that I or any of his disciples, if we spent hundreds of lives, could do no justice to a millionth part of what he really was.

গুরুদেবের কথা বলিতে বলিতে স্বামী বিবেকানন্দ একবারে পাগল হইয়া যাইতেন। ধন্য গুরুভক্তি!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

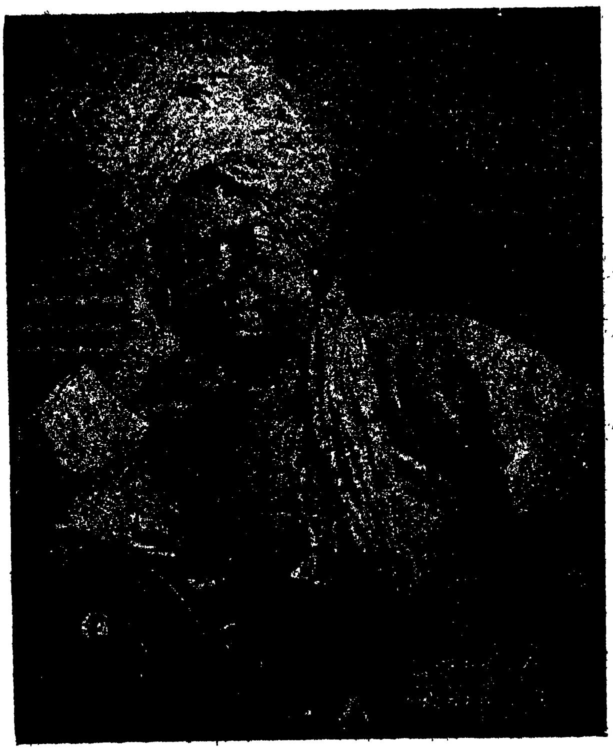
[স্বামীজী কর্তৃক শ্রীরামকৃষ্ণের প্রচার কার্য্য]

আজ আমরা একটু আলোচনা করিব, পরমহংসদেবের সেই বিশ্বজনীন সনাতন হিন্দুধর্ম্ম স্বামীজী কিরূপ প্রচার করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

১। ঈশ্বর-দর্শন

(Realisation of God)

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম কথা—ঈশ্বরকে দর্শন করিতে হইবে। কতকগুলি মত মুখস্থ বা শ্লোক মুখস্থ করার নাম ধর্ম্ম নহে। এই ঈশ্বর-দর্শন হয়, যদি ভক্ত ব্যাকুল হইয়া তাঁহাকে ডাকে, সে এই জন্মেই হউক অথবা জন্মান্তরেই হউক। এক দিনের তাঁহার কথাবার্ত্তা আমাদের মনে পড়ে। দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে কথা হইতেছিল।



স্বামী বিবেকানন্দ

পরমহংসদেব কাশীপুরের ৺মহিমাচরণ চক্রবর্ত্তীকে বলিতেছিলেন—(রবিবার ২৬শে অক্টোবর, ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ)।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (মহিমাচরণ ও অন্যান্য ভক্তদের প্রতি)। শাস্ত্র কত পড়বে? শুধু বিচার করলে কি হবে? আগে তাঁকে লাভ করবার চেষ্টা কর। বই প'ড়ে কি জানবে? যতক্ষণ না হাটে পৌঁছান যায়, ততক্ষণ দূর হ'তে কেবল হো হো শব্দ। হাটে পৌঁছিলে আর এক রকম, তখন স্পষ্ট স্পষ্ট দেখতে পাবে, শুনতে পাবে, 'আলু লও' 'পয়সা দাও।'

"বই প'ড়ে ঠিক অনুভব হয় না। অনেক তফাৎ। তাঁহাকে দর্শনের পর শাস্ত্র, Science সব খড়কুটো বোধ হয়।

"বড় বাবুর সঙ্গে আলাপ দরকার। তাঁর ক'খানা বাড়ী, ক'টা বাগান, কত কোম্পানীর কাগজ, এ সব আগে জানবার জন্য অত ব্যস্ত কেন?

"কিন্তু যো-সো ক'রে বড় বাবুর সঙ্গে একবার আলাপ কর, তা ধাক্কা খেয়েই হউক আর বেড়া ডিঙ্গিয়েই হউক, তখন ইচ্ছা হয় ত তিনিই ব'লে দিবেন, তাঁর কখানা বাড়ী, কত বাগান, কত কোম্পানীর কাগজ। বাবুর সঙ্গে আলাপ হ'লে আবার চাকর দ্বারবান্ সব সেলাম করবে।" (সকলের হাস্য)।

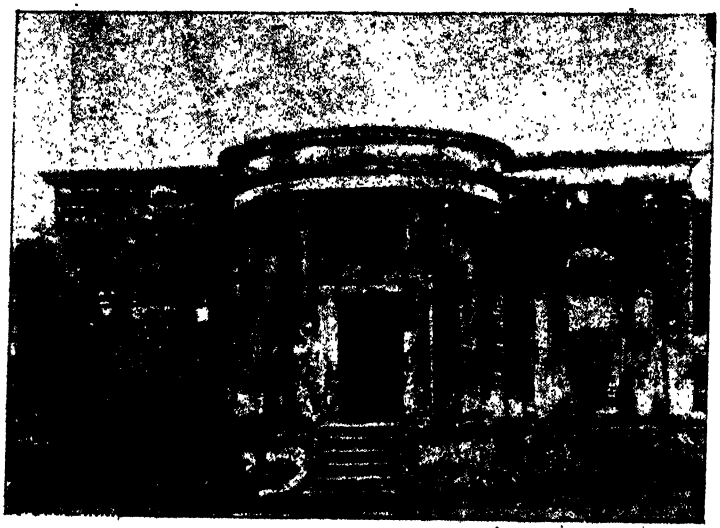
এক জন ভক্ত। এখন বড় বাবুর সঙ্গে আলাপ কিসে হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাই কর্ম্ম চাই। সাধন চাই। ঈশ্বর আছেন ব'লে ব'সে থাকলে হবে না। তাঁর কাছে যেতে হবে। নির্জ্জনে তাঁকে ডাকো, প্রার্থনা করো—'দেখা দাও' ব'লে। ব্যাকুল হয়ে কাঁদো। কামিনীকাঞ্চনের জন্য পাগল হয়ে বেড়াতে পার, তবে তাঁর জন্য একটু পাগল হও। লোক বলুক যে, ঈশ্বরের জন্য অমুক পাগল হয়ে গেছে। দিনকতক না হয় সব ত্যাগ ক'রে তাঁকে একলা ডাকো। শুধু 'তিনি আছেন' ব'লে

ব'সে থাক্‌লে কি হবে? হালদার পুকুরে বড় মাছ আছে। পুকুরের পাড়ে শুধু ব'সে থাক্‌লে কি মাছ পাওয়া যায়? চার কর, চার ফেল। ক্রমে গভীর জল থেকে মাছ আস্‌বে, আর জল নড়্‌বে। তখন আনন্দ হবে। হয় ত মাছের খানিকটা একবার দেখা গেল, মাছটা ধপাস্‌ ক'রে উঠ্‌লো। যখন দেখা গেল, আরও আনন্দ। *

ঠিক এই কথা স্বামীজীও চিকাগোর ধর্ম্মসমিতি-সমক্ষে বলিলেন—অর্থাৎ ধর্ম্মের উদ্দেশ্য ঈশ্বরকে লাভ করা, দর্শন করা—

"The Hindu does not want to live upon words and theories. He must see God and that alone can destroy all doubts. So the best proof a Hindu sage gives about the soul, about God, is 'I have seen the soul I have seen God.' * * The whole struggle in their system is a constant struggle to become perfect, to become divine, to reach God and see God; and their reaching God, seeing God, becoming perfect even 'as the father in Heaven is perfect' constitutes the religion of the Hindus"—*Lecture on Hindusm* (Chicago Parliament of Religions)



দক্ষিণেশ্বর ঠাকুরের বাসগৃহের সম্মুখ

আমেরিকায় অনেক স্থানে স্বামী বক্তৃতা দিয়াছিলেন, সকল স্থানেই এই কথা। Hartford নামক স্থানে বলিয়াছিলেন—

"The next idea that I want to bring to you is that religion does not consist in doctrines or dogmas. * * * The end of all religions is the realisation of God in the soul. Ideas and methods may differ, but that is the central point. That is the realisation of God, something behind this world of sense—this world of eternal eating and drinking and talking nonsense—this world of also shadows and selfishness. There is that beyond all books, beyond all creeds, beyond the vanities of this world—and that is the realisation of God within yourself. A man may believe in all the churches in the world, he may carry on his head all the sacred books ever written; he may baptise himself in all the rivers of the earth; still if he has no perception of God I would class him with the rankest atheist."

স্বামী তাঁহার 'রাজযোগ' নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, আজকাল লোক বিশ্বাস করে না যে, ঈশ্বরদর্শন হয়; লোক বলে, হাঁ, ঋষিরা অথবা খৃষ্ট প্রভৃতি মহাপুরুষগণ আত্মদর্শন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু আজকাল আর তাহা হয় না। স্বামীজী বলেন, অবশ্য হয়—মনের যোগ (concentration) অভ্যাস কর, অবশ্য হৃদয়-মধ্যে তাঁহাকে পাইবে—

"The teachers all saw God, they all saw their own souls, and what they saw they preached. Only there is this difference that in most of these religions, especially in modern times a peculiar claim is put before us and that claim is that these experiences are impossible at the present day, they were only possible with a few men, who were the first founders of the religions that subsequently bore their names. At the present time these experiences have become obsolete and therefore we have now to take religion on belief. This I entirely deny. Uniformity is the rigorous law of nature; what once happened can happen always." *Rajyoga : Introductory.*

স্বামী New York নামক নগরে ৯ই জানুয়ারী, ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে বিশ্বজনীন ধর্ম্ম কাহাকে বলে (Ideal of a Universal Religion), এই বিষয়ে একটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন—অর্থাৎ যে ধর্ম্মে জ্ঞানী, ভক্ত, যোগী বা কর্ম্মী সকলেই মিলিত হইতে পারে। বক্তৃতা সমাপ্ত হইবার সময় ঈশ্বরদর্শন যে সব ধর্ম্মের উদ্দেশ্য, এই কথা বলিলেন,—জ্ঞান, কর্ম্ম ভক্তি এগুলি নানা পথ, নানা উপায়—কিন্তু গন্তব্যস্থান একই অর্থাৎ ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার। স্বামী বলিলেন—

Then again all these various *Yogas* (work or

* [illegible] তাঁহার শিষ্যদের বলিলেন।—"Blessed are the pure in spirit, for they shall see God."

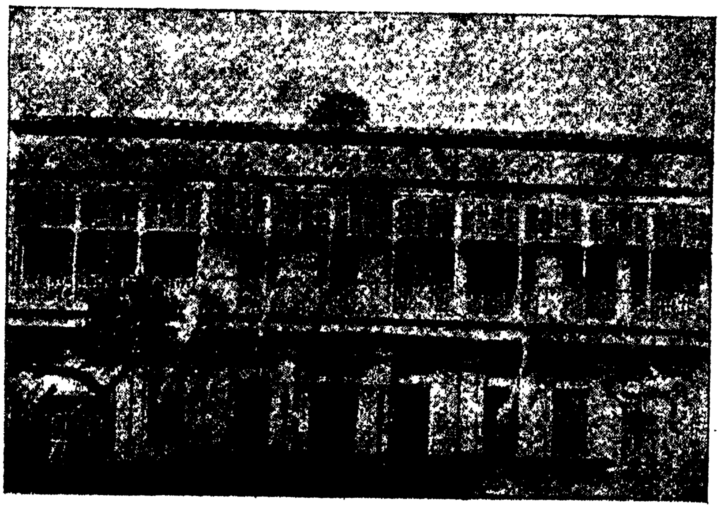
worship, psychic control or philosophy) have to be carried out into practice ; theories will not do. We have to meditate upon it, realise it until it becomes our whole life. Religion is realisation, not talk nor doctrine, nor theories, however beautiful they may be. It is being and becoming, not hearing or acknowledging ; it is not an intellectual assent. By intellectual assent we can come to a hundred sorts of foolish things and change them next day, but this being and becoming is what is religion."

মাদ্রাজীদের নিকটে তিনি যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতেও ঐ কথা—হিন্দুধর্ম্মের বিশেষত্ব ঈশ্বরদর্শন—বেদের মুখ্য উদ্দেশ্য, ঈশ্বরদর্শন—

"The one idea which distinguishes the Hindu religion from every other in the world, the one idea to express which the sages almost exhaust the vocabulary of the Sanskrit language is that man must realise God. * * Thus to realise God, the Brahman as the Dvaitas (dualists) say, or to become Brahman as the Advaitas say is the aim and end of the whole teachings of the Vedas." *Reply to Madras Address.*

স্বামী, ২৯শে অক্টোবর, (১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে) লণ্ডন নগরে বক্তৃতা করেন :-বিষয়, ঈশ্বরদর্শন (Realisation)। এই বক্তৃতায় কঠোপনিষৎ পাঠ করিয়া নচিকেতার কথা উল্লেখ করিলেন। নচিকেতা ঈশ্বরকে দেখিতে চান, ব্রহ্মজ্ঞান চান। ধর্ম্মরাজ যম বলিলেন, বাপু, যদি ঈশ্বরকে জানিতে চাও, দেখিতে চাও, তাহা হইলে ভোগ আসক্তি ত্যাগ করিতে হইবে, ভোগ থাকিলে যোগ হয় না, অবস্তু ভালবাসিলে বস্তুলাভ হয় না। স্বামী বলিতে লাগিলেন, আমরা বলিতে গেলে সকলেই নাস্তিক, কতকগুলি বাক্যের আড়ম্বর লইয়া ধর্ম্ম ধর্ম্ম বলিতেছি। যদি একবার ঈশ্বরদর্শন হয়, তাহা হইলেই প্রকৃত বিশ্বাস আসিবে।

"We are all atheists and yet we try to fight the man who tries to confess it. We are all in the dark ; religion is to us a mere nothing, mere intellectual assent, mere talk—this man talks well and that man evil. Religion will begin when that actual realisation in our souls begins. That will be the dawn of religion * * Then will real faith begin."



বলরাম-মন্দির

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

২। সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়

(Harmony of all Religions)

নরেন্দ্র ও অন্যান্য কৃতবিদ্য যুবকগণ, ঠাকুর রামকৃষ্ণের সকল ধর্ম্মের উপর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলেন। সকল ধর্ম্মে সত্য আছে, এ কথা পরমহংসদেব মুক্তকণ্ঠে বলিতেন। কিন্তু তিনি আরও বলিতেন, সকল ধর্ম্মই সত্য—অর্থাৎ প্রত্যেক ধর্ম্ম দিয়া ঈশ্বরের কাছে পৌছান যাইতে পারে। এক দিন, ২৭শে অক্টোবর, (১৮৮২ খৃষ্টাব্দে) কেশবচন্দ্র সেন কোজাগর লক্ষ্মীপূজার দিন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর রামকৃষ্ণকে ষ্টীমারে করিয়া দেখিতে গিয়াছিলেন ও তাঁহাকে তুলিয়া লইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। পথে জাহাজের উপরে অনেক বিষয়ে কথা হয়। ঠিক এই সকল কথা ১৩ই আগষ্ট অর্থাৎ কয়েক মাস পূর্ব্বে হইয়াছিল। এই সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় কথা আমাদের diary হইতে উদ্ধৃত করিলাম।

৺কেদারনাথ চাটুর্য্যে সে দিন দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে মহোৎসব করিয়াছিলেন। উৎসবান্তে দক্ষিণের বারান্দায় বসিয়া বেলা ৩।৪টার সময় কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)। মত পথ। সকল ধর্ম্মই সত্য। যেমন কালীঘাটে নানা পথ দিয়া যাওয়া যায়। ধর্ম্ম কিছু ঈশ্বর নয়। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম আশ্রয় ক'রে ঈশ্বরের কাছে যাওয়া যায়।

"নদী সব নানা দিক দিয়ে আসে, কিন্তু সব নদী সমুদ্রে গিয়ে পড়ে। সেখানে সব এক।

"ছাতে নানা উপায়ে উঠা যায়। পাকা সিঁড়ি, কাঠের সিঁড়ি, বাঁকা সিঁড়ি, আর শুধু একটা দড়ি দিয়াও উঠা যায়। তবে উঠবার সময় একটা ধ'রে উঠতে হয়—দু' তিন রকম সিঁড়িতে পা দিলে উঠা যায় না। তবে ছাদে উঠ্‌বার পর সব রকম সিঁড়ি দিয়ে নামা যায়, উঠা যায়।

"তাই প্রথমে একটা ধর্ম্ম আশ্রয় কর্‌তে হয়। ঈশ্বর-লাভ হ'লে সেই ব্যক্তি সব ধর্ম্মপথ দিয়ে আনাগোনা কর্‌তে পারে। যখন হিন্দুদের ভিতর থাকে, তখন সকলে মনে করে হিন্দু, যখন মুসলমানদের সঙ্গে মেশে, তখন সকলে মনে করে মুসলমান, আবার যখন খৃষ্টানদের সঙ্গে মেশে, সকলে ভাবে ইনি বুঝি খৃষ্টান।

"সব ধর্ম্মের লোকরা এক জনকেই ডাক্‌ছে। কেউ বল্‌ছে ঈশ্বর, কেউ রাম, কেউ হরি, কেউ আল্লা, কেউ ব্রহ্ম। নাম আলাদা, কিন্তু একই বস্তু।

"একটা পুকুরে চার ঘাট আছে। এক ঘাটে হিন্দুরা জল খাচ্ছে, তা'রা বল্‌ছে জল। আর এক ঘাটে মুসলমান, তা'রা বল্‌ছে পানি। আর এক ঘাটে খৃষ্টান, তা'রা বল্‌ছে 'water'। আবার এক ঘাটে কতকগুলা লোক বল্‌ছে 'aqua'। (সকলের হাস্য)। বস্তু এক—জল। নাম আলাদা, তবে ঝগড়া কর্‌বার কি দরকার? সকলেই এক ঈশ্বরকে ডাক্‌ছে ও সকলেই তাঁর কাছে যাবে।

এক জন ভক্ত (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)। যদি অন্য ধর্ম্মে ভ্রম থাকে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। তা ভ্রম কোন্ ধর্ম্মে নাই? সকলেই বলে, আমার ঘড়ী ঠিক যাচ্ছে। কিন্তু কোন ঘড়ীই একেবারে ঠিক যায় না। সব ঘড়ীকেই মাঝে মাঝে সূর্য্যের সঙ্গে মিলাইতে হয়।

"ভুল কোন্ ধর্ম্মে নাই? আর যদিই ভুল থাকে, যদি আন্তরিক হয়, যদি ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকে, তা হ'লে তিনি শুনবেনই শুনবেন।

"মনে কর, এক বাপের অনেকগুলি ছেলে—ছোট-বড়। সকলেই 'বাবা' বল্‌তে পারে না। কেউ বলে 'বাবা', কেউ 'বা', কেউ বা কেবল 'পা'। যারা 'বাবা' বল্‌তে পার্‌লে না, তা'দের উপর বাপ রাগ কর্‌বে না কি? (সকলের হাস্য)। না, বাপ সকলকেই সমান ভালবাস্‌বে।*

"লোক মনে করে, 'আমার ধর্ম্ম ঠিক; আমি ঈশ্বর কি বস্তু বুঝেছি, ওরা বুঝতে পারে নাই। আমি ঠিক তাঁ'কে ডাক্‌ছি, ওরা ঠিক ডাক্‌তে পারে না, অতএব ঈশ্বর আমাকেই কৃপা করেন, ওদের করেন না।' এ সব লোক জানে না সে, ঈশ্বর সকলের বাপ-মা, আন্তরিক হ'লে তিনি সকলকেই দয়া করেন।"

কি প্রেমের ধর্ম্ম! এ কথা তিনি তো বার বার বলিলেন, কিন্তু কয় জন ধারণা করিতে পারিল? কেশব সেন কতকটা পারিয়াছিলেন। আর স্বামী বিবেকানন্দ জগতের সম্মুখে এই প্রেমের ধর্ম্ম অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া প্রচার করিলেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ মতুয়ার বুদ্ধি (dogmatism) করিতে বার বার নিষেধ করিয়াছিলেন। 'আমার ধর্ম্ম সত্য ও তোমার মিথ্যা' এটির নাম 'মতুয়ার বুদ্ধি'—এইটি যত অনর্থের মূল। স্বামী এই অনর্থের কথা চিকাগো ধর্ম্মসমিতি-সমক্ষে বলিলেন। বলিলেন, খৃষ্টান মুসলমান ইত্যাদি অনেকেই ধর্ম্মের নামে কত রক্তারক্তি, কাটাকাটি, মারামারি করিয়াছেন।

Sectarianism, bigotry and its horrible descendant, fanaticism have possessed long this beautiful earth. It has filled the earth with violence, drenched it often and often with human blood, destroyed civilazation and sent whole nations to despair." *Lecture on Hinduism.* (Chicago Parliament of Religions.)

স্বামী অপর এক বক্তৃতায় 'সকল ধর্ম্ম সত্য' এ কথা বিজ্ঞানশাস্ত্রের প্রমাণ দিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন,—

"If any one here hopes that this unity will come by the triumph of any one of these reiigions and

* ঠিক এই কথা একখানি ইংরাজী গ্রন্থে আছে—Maxmuller's Hibbert Lectures. মোক্ষমূলরও এই উপমা দিয়া বুঝাইয়াছেন যে, যাঁহারা দেবদেবী পূজা করেন, তাঁহাদের ঘৃণা করা উচিত নহে।

destruction of the others, to him I say, Brother, yours is an impossible hope. Do I wish that the Christian would become Hindu? God forbid. Do I wish that the Hindu or Buddhist would become Christian? God forbid.

"The seed is put in the ground, and earth and air and water are placed around it. Does the seed become the earth or the air or the water? No, it becomes a plant, it assimilates the air, the earth and the water, converts them into plant substance and grows a plant.

"Similar is the case with religion. The Christian is not to become a Hindu or a Buddhist nor the Hindu or the Buddhist to become a Christian. But each must assimilate the others and yet preserve its own law of growth."

আমেরিকায় স্বামী Brooklyn Ethical Society নামক সভায় হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। অধ্যাপক Dr. Lewis James সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেখানেও প্রথম কথা, সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়। স্বামী বলিলেন, এক জনের ধর্ম্ম সত্য, আর সকলের ধর্ম্ম মিথ্যা, এরূপ হইতে পারে না। যে ধর্ম্ম সত্য বলিতেছে, সে একটি ব্যাধিবিশেষ বলিতে হইবে। সকলের পাঁচটি আঙ্গুল, আর এক জনের যদি ছয়টি হয়, বলিতে হইবে যে, ইহা তাহার একটি রোগবিশেষ।

"Truth has always been universal. If I alone were to have six fingers on my hand while all of you had only five, you would not think that my hand was the true intent of nature, but rather that it was abnormal and diseased. Just so with religion. If one creed alone were to be true and all the others untrue, you would have again to say that, that religion is diseased. If one religion is true, all the others must be true. Thus the Hindu religion is your property as well as mine." *Lecture at Brooklyn.*

স্বামী চিকাগো ধর্ম্ম-মহাসভা সম্মুখে যে দিন প্রথম বক্তৃতা করিতে দণ্ডায়মান হয়েন, যে বক্তৃতা শুনিয়া প্রায় ছয় সহস্র লোক মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে মুক্তকণ্ঠে আসন ত্যাগ করিয়া অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন, * সেই বক্তৃতা-মধ্যে এই সমন্বয়বার্ত্তা ছিল। স্বামী বলিয়াছিলেন,—

"I am proud to belong to a religion which taught the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal toleration, but we accept all Religions as true. I belong to a religion into whose sacred language, the Sanskrit, the word 'exclusion' is untranslatable."

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

৩। বিবেকানন্দ, কর্ম্মযোগ ও স্বদেশহিতৈষণা

ঠাকুর রামকৃষ্ণ সর্ব্বদা বলিতেন, 'আমি ও আমার' এইটি অজ্ঞান, 'তুমি ও তোমার' এইটি জ্ঞান। এক দিন সুরেশ মিত্রের বাগানে মহোৎসব হইতেছিল, রবিবার, ১৫ই জুন, ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ। ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও ভক্তেরা অনেকে উপস্থিত ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের কয়েক-জন ভক্তও আসিয়াছিলেন। ঠাকুর প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ও অন্যান্য ভক্তদের বলিলেন,—"দেখ, 'আমি ও আমার এইটির নাম অজ্ঞান। কালীবাড়ী রাসমণি করেছেন, এই কথাই লোক বলে। কেউ বলে না যে, ঈশ্বর করেছেন। ব্রাহ্মসমাজ অমুক ক'রে গেছেন, এই কথাই লোকে বলে। এ কথা আর কেউ বলে না, ঈশ্বর ইচ্ছায় এটি হয়েছে। 'আমি করেছি,' এটির নাম অজ্ঞান। হে ঈশ্বর, আমার কিছুই নয়, এ মন্দির আমার নয়, এ কালীবাড়ী আমার নয়, এ সমাজ আমার নয়, এ সব তোমার জিনিষ, এ স্ত্রী-পুত্র-পরিবার এ সব কিছুই আমার নয়, সব তোমারই জিনিষ, এ সব কথা জ্ঞানীর।

"আমার জিনিষ, আমার জিনিষ ব'লে সেই সকল জিনিষকে ভালবাসার নাম মায়া। সবাইকে ভালবাসার নাম দয়া। শুধু ব্রাহ্মসমাজের লোকগুলিকে ভালবাসি, এর নাম মায়া। শুধু দেশের লোকগুলিকে ভালবাসি, এর নাম মায়া। সব দেশের লোককে ভালবাসা, সব ধর্ম্মের লোককে ভালবাসা, এটি দয়া থেকে হয়, ভক্তি থেকে হয়। মায়াতে মানুষ বদ্ধ হয়ে যায়, ভগবান্ থেকে বিমুখ হয়। দয়া থেকে ঈশ্বরলাভ হয়। শুকদেব, নারদ এঁরা দয়া রেখেছিলেন।"

ঠাকুরের কথা—শুধু দেশের লোকগুলিকে ভাল-বাসা, এর নাম মায়া। সব দেশের লোককে ভালবাসা, সব ধর্ম্মের লোকদের ভালবাসা, এটি দয়া থেকে হয়—ভক্তি থেকে হয়। তবে স্বামী বিবেকানন্দ অত স্বদে-শের জন্য ব্যস্ত হয়েছিলেন কেন?

স্বামী চিকাগো ধর্ম্ম মহাসভায় এক দিন বলিয়াছিলেন, আমার গরীব স্বদেশবাসীদের জন্য এখানে অর্থ ভিক্ষা

---

* "When Vivekananda addressed the audience as sisters and brothers of America, there arose a peal of applause that lasted for several minutes." *Dr. Barrows's Report.* "But eloquent as were many of the brief speeches, no one expressed so well the spirit of the Parliament of Religions and its limitations as the Hindu monk. * * * He is an orator by divine right." *Newyork Critique.*

করিতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু দেখিলাম, ভারী কঠিন, খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদের নিকট যাহারা খৃষ্টান নয়, তাহাদের জন্য টাকার যোগাড় করা কঠিন।

"The crying evil in the East is not religion—they have religion enough; but it is bread that these suffering millions of *burning India* cry out for with parched throats. * * *

"I came here to ask aid for my impoverished people and fully realised how difficult it was to get help for heathens from Christians in a Christian land."—Speech before Parliament of Religions." (*Chicago Tribune*)

স্বামীর এক জন প্রধান শিষ্যা শিষ্টার নিবেদিতা (Miss Margaret Noble) বলেন যে, স্বামী যখন চিকাগো নগরে বাস করেন, তখন ভারতবাসীদের কাহারও সহিত দেখা হইলে তিনি অতিশয় যত্ন করিতেন, তা তিনি যে জাতিই হউন—হিন্দু হউন বা মুসলমান বা পার্শী বা যাহাই হউন। তিনি নিজে কোন ভাগ্যবানের বাটীতে অতিথিরূপে থাকিতেন। সেইখানেই নিজের দেশের লোককে লইয়া যাইতেন। গৃহস্বামীরাও তাঁহাদের খুব যত্ন করিতেন; আর তাঁহারা বেশ জানিতেন যে, তাঁহাদের যত্ন যদি না করেন, তাহা হইলে স্বামীজী নিশ্চয়ই তাঁহাদের গৃহত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাইবেন;—

"At Chicago any Indian man attending the great world Bazar, rich or poor, high or low, Hindu, Mahomedan, Parsi, what not, might at any moment be brought by him to his hosts for hospitality and entertainment and they well knew that any failure of kindness on their part to the least of these would immediately have lost them his presence."

দেশের লোকের কিরূপে দারিদ্র-দুঃখ বিমোচন হয়, তাহাদের কিসে সৎশিক্ষা হয়, কিসে তাহাদের ধর্ম্মসঞ্চয় হয়, এই জন্য স্বামী সর্ব্বদা ভাবিতেন। কিন্তু তিনি দেশের লোকের জন্য যেরূপ দুঃখিত ছিলেন, আফ্রিকাবাসী নিগ্রোর জন্যও সেইরূপ দুঃখিত থাকিতেন। শ্রীমতী নিবেদিতা বলেন, স্বামী যখন দক্ষিণ United States মধ্যে ভ্রমণ করিতেছিলেন, কেহ কেহ তাঁহাকে আফ্রিকাবাসী (coloured man) মনে করিয়া গৃহ হইতে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন তাঁহারা শুনিলেন, ইনি তাহা নহেন, ইনি হিন্দু সন্ন্যাসী ও বিখ্যাত স্বামী বিবেকানন্দ, তখন তাঁহারাই অতি সমাদরে তাঁহাকে লইয়া গিয়া সেবা করিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "স্বামী, যখন আমরা তোমাকে বলিলাম, 'তুমি কি আফ্রিকাবাসী?' তখন তুমি কিছু না বলিয়া চলিয়া গিয়াছিলে কেন?"

স্বামী বলিলেন, "কেন, আফ্রিকাবাসী নিগ্রো কি আমার ভাই নয়?" অর্থাৎ স্বদেশবাসী কি জগৎছাড়া? নিগ্রোকেও যেমন ভালবাসা, স্বদেশবাসীকেও সেইরূপ ভালবাসা, তবে তাহাদের সঙ্গে সর্ব্বদাই থাকা, তাই তাহাদের সেবা আগে। ইহারই নাম অনাসক্ত হইয়া সেবা। ইহারই নাম কর্ম্মযোগ। সকলেই কর্ম্ম করে, কিন্তু কর্ম্মযোগ বড় কঠিন। সব ত্যাগ ক'রে ভগবানের অনেক দিন ধরিয়া নির্জ্জনে ধ্যান-চিন্তা না করিলে এরূপ স্বদেশের উপকার করা যায় না। 'আমার দেশ' বলিয়া নয়, তাহা হইলে ত মায়া হইল; 'তোমার (ঈশ্বরের) এরা', তাই এদের সেবা করিব। তোমার আদেশ, তাই দেশের সেবা করিব; 'তোমারই এ কায' আমি তোমার দাস, তাই এই ব্রত পালন করিতেছি, সিদ্ধি হউক, অসিদ্ধি হউক, সে তুমি জান; আমার নামের জন্য নয়, এতে তোমার মহিমা প্রকাশ হইবে।

যথার্থ স্বদেশহিতৈষিতা (Ideal patriotism) কাহাকে বলে, লোকশিক্ষার জন্য স্বামী তাই এই দুরূহ ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন। যাহাদের গৃহ-পরিজন আছে, কখন ভগবানের জন্য যাহারা ব্যাকুল হয় নাই, যাহারা 'ত্যাগ' এই কথা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করে, যাহাদের মন সর্ব্বদা কামিনীকাঞ্চন ও এই পৃথিবীর মানসম্ভ্রমের দিকে, যাহারা ঈশ্বরদর্শন জীবনের উদ্দেশ্য শুনিয়া অবাক্ হয়, তাহারা স্বদেশহিতৈষিতার এই মহান্ উচ্চ আদর্শ কিরূপে গ্রহণ করিবে? স্বামী স্বদেশের জন্য কাঁদিতেন বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বদা এটিও মনে রাখিতেন যে, এই অনিত্য সংসারে ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু। স্বামী বিলাত হইতে ফিরিবার পর হিমাচল দর্শন করিতে আলমোরায় গিয়াছিলেন। আলমোরাবাসীরা তাঁহাকে সাক্ষাৎ নারায়ণ বোধে পূজা করিতে লাগিলেন। স্বামী নগাধিরাজ দেবতাত্মা হিমগিরির অত্যুচ্চ শৃঙ্গাবলী সন্দর্শন করিয়া ভাবে বিভোর হইয়া রহিলেন। বলিলেন, আজ এই পবিত্র উত্তরাখণ্ডে সেই পবিত্র তপোভূমি দেখিতেছি, যেখানে ঋষিগণ সর্ব্বত্যাগ করিয়া, এই সংসারের কোলাহল হইতে প্রস্থান করিয়া নিশিদিন ঈশ্বরচিন্তা করিতেন। তাঁহাদেরই শ্রীমুখ হইতে বেদমন্ত্র বিনির্গত হইয়াছিল। হায়! কবে

আমার সে দিন হইবে? আমার কতকগুলি কায করিবার ইচ্ছা আছে বটে, কিন্তু এই পবিত্র ভূমিতে অনেক দিন পরে আবার আসিবার পর সকল বাসনা এককালে অন্তর্হিত হইতেছে। ইচ্ছা হয়, বিরলে বসিয়া শেষ কয়দিন হরিপাদপদ্মচিন্তায় গভীর সমাধিমধ্যে নিমগ্ন হইয়া কাটাইয়া যাই।

"It is the hope of my life to end my days some where within this Father of Mountains, where Rishis lived—where Philosophy was born." *Speech at Almora.*

হিমালয় দেখিলে আর কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা হয় না—মনে এক চিন্তার উদয় হয়—কর্ম্ম-সন্ন্যাস।

"As peak after peak of this Father of Mountains began to appear before my sight, all those propensities to work, that ferment that had been going on in my brain for years, seemed to quiet down and the mind reverted to that one eternal theme which the Himalayas always teach us, the one theme which is reverberating in the very atmosphere of the place, the one theme that I hear in the rushing whirlpools of its rivers—Renenuciation."

এই কর্ম্ম-সন্ন্যাস, এই ত্যাগ, করিতে পারিলে মানুষ অভয় হয়—আর সকল বস্তুই ভয়াবহ।

"সর্ব্বং বস্তু ভয়ান্বিতং ভুবি নৃণাং বৈরাগ্যমেবাভয়ম্।"

'Everything in this life is fraught with fear.
It is renunciation that makes one fearless.'

"এখানে আসিলে আর সাম্প্রদায়িক ভাব থাকে না, ধর্ম্ম লইয়া ঝগড়া-বিবাদ কোথায় পলাইয়া যায়। কেবল একটি মহান্ সত্যের ধারণা হয়—ঈশ্বরদর্শনই সত্য, আর যাহা কিছু জলের ফেনার ন্যায়—ভগবানের পূজাই একমাত্র জীবনে প্রয়োজন, আর সকলই মিথ্যা।"

"ঈশ্বরই বস্তু, আর সব অবস্তু। অথবা মধুকর পদ্মের উপর বসিতে পাইলে আর ভন্ ভন্ করে না।"

"Strong souls will be attracted to this Father of Mountains in time to come, when all this fight between sects and all those differences in dogmas will not be remembered any more, and quarrels between your religion and my religion will have vanished altogether, when mankind will understand that there is but one eternal religion and that is the perception of the Divine within, and the rest is mere froth! Such ardent souls will come here, knowing that the world is but Vanity of vanities, knowing that everything is useless except the worship of the Lord and the Lord alone."—*Speech at Almora.*

ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলিতেন, অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বাঁধিয়া যেখানে ইচ্ছা যাও। স্বামী বিবেকানন্দ অদ্বৈত-জ্ঞান আঁচলে বাঁধিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছিলেন। সন্ন্যাসীর গৃহ, ধন, পরিজন, আত্মীয়, কুটুম্ব, স্বদেশ, বিদেশ আবার কি? যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে বলিলেন, ঈশ্বরকে না জানলে এ সব ধন, বিদ্যা কি হবে? হে মৈত্রেয়ি, আগে তাঁকে জান, তার পর অন্য কথা! স্বামী এইটি জগৎকে দেখাইলেন। তিনি যেন বলিলেন, হে জগদ্বাসিগণ, আগে বিষয় ত্যাগ করিয়া নির্জ্জনে ভগবানের আরাধনা কর, তাহার পর যাহা ইচ্ছা কর, কিছুতেই দোষ নাই; স্বদেশের সেবা কর, ইচ্ছা হয় কুটুম্ব পালন কর, কিছুতেই দোষ নাই; কেন না, তুমি এখন বুঝিতেছ যে, সর্ব্বভূতে তিনি আছেন—তিনি ছাড়া কিছুই নাই—সংসার, স্বদেশ কিছুই তিনি ছাড়া নহে।" ভগবানের সাক্ষাৎকারের পর দেখিবে, তিনিই পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছেন। বশিষ্ঠদেব রামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, রাম, তুমি যে সংসার ত্যাগ করিবে বলিতেছ, আমার সঙ্গে বিচার কর; যদি ঈশ্বর এ সংসার ছাড়া হন, তবে ত্যাগ করিও।' * রামচন্দ্র আত্মার সাক্ষাৎকার করিয়াছিলেন, তাই চুপ করিয়া রহিলেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলিতেন, ছুরীর ব্যবহার জানিয়া, ছুরী হাতে কর। স্বামী বিবেকানন্দ যথার্থ কর্ম্মযোগী কাহাকে বলে, দেখাইলেন। দেশের কি উপকার করিবে? স্বামী জানিতেন যে, দেশের দরিদ্রদের ধন দিয়া সাহায্য করা অপেক্ষা অনেক মহৎ কার্য্য আছে। ঈশ্বরকে জানাইয়া দেওয়া প্রধান কার্য্য; তৎপরে বিদ্যাদান; তাহার পর জীবনদান; তাহার পরে অন্নবস্ত্রদান। সংসার দুঃখময়। এই দুঃখ তুমি কয় দিনের জন্য ঘুচাইবে? ঠাকুর রামকৃষ্ণ কৃষ্ণদাস পালকে † জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা, "জীবনের উদ্দেশ্য কি?" কৃষ্ণ-দাস বলিলেন, "আমার মতে জগতের উপকার করা, জগতের দুঃখ দূর করা।" ঠাকুর বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "তোমার ওরূপ রাঁড়ীপুতী ‡ বুদ্ধি কেন? জগতের দুঃখনাশ তুমি করবে? জগৎ কি এতটুকু? বর্ষাকালে গঙ্গার কাঁকড়া হয় জান? এইরূপ অসংখ্য জগৎ আছে।

* যোগবাশিষ্ঠ।

† শ্রীকৃষ্ণদাস পাল দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে ঠাকুর রামকৃষ্ণকে দর্শন করিয়াছিলেন।

‡ রাঁড়ীপুতী বুদ্ধি—বিধবার ছেলের বুদ্ধি, হীন বুদ্ধি; কেন না, সে ছেলে অনেক নীচ উপায়ে মানুষ হয়; পরের তোষামোদ করিয়া, ইত্যাদি।

এই জগতের পতি যিনি, তিনি সকলের খবর নিচ্ছেন। তাঁকে আগে জানা—এই জীবনের উদ্দেশ্য। তার পর যা হয় কোরো, কারুর উপকার করতে ইচ্ছা হয় কোরো"। স্বামীও এক স্থানে বলিয়া গিয়াছেন—

"Spiritual knowledge is the only thing that can remove our miseries for ever ; any other knowledge satisfies wants only for a time. * * * He who gives spiritual knowledge is the greatest benefactor of mankind. * * * Next to spiritual help (ব্রহ্মজ্ঞান) comes intellectual help (বিদ্যাদান)—the gift of secular knowledge is far higher than the giving of food and clothes ; the next gift is the gift of life and the fourth the gift of food." *Karmayoga* (New York) ; *My Plan of Campaiug* (Madras)

ঈশ্বরদর্শনই জীবনের উদ্দেশ্য ; আর এ দেশের ঐ এক কথা। আগে ঐ কথা, তাহার পর অন্য কথা! 'রাজনীতি' (Politics) প্রথম হইতে বলিলে চলিবে না। আগে অনন্যমন হইয়া ভগবানের ধ্যান-চিন্তা কর, হৃদয়মধ্যে তাঁহার অপরূপ রূপ দর্শন কর। তাঁহাকে লাভ করিয়া তখন 'স্বদেশে'র মঙ্গলসাধন করিতে পারিবে ; কেন না, তখন মন অনাসক্ত ; 'আমার দেশ' বলিয়া সেবা নহে—সর্ব্বভূতে ভগবান্ আছেন বলিয়া তাঁহারই সেবা। তখন স্বদেশ বিদেশ ভেদবুদ্ধি থাকিবে না। তখন কিসে জীবের মঙ্গলসাধন হয়, ঠিক বুঝিতে পারা যাইবে। ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলিতেন, "দাবাবড়ে যারা খেলে, তারা ঠিক চাল বুঝতে তত পারে না ; যারা উদাসীন, কেবল ব'সে খেলা দেখে, তারা উপর-চাল বেশ ব'লে দিতে পারে।" কেন না, উদাসীনের নিজের কোন দরকার নাই, রাগদ্বেষবিমুক্ত। উদাসীন অনাসক্ত জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ নির্জ্জনে অনেক দিন সাধন করিয়া যাহা লাভ করিয়া বসিয়া আছেন, তাঁহার কাছে আর-কিছুই ভাল লাগে না ;—

যং লব্ধ্‌ চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥

হিন্দুর রাজনীতি সমাজনীতি তাই সমস্তই ধর্ম্মশাস্ত্র। মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর ইত্যাদি মহাপুরুষ এই সকল ধর্ম্ম-শাস্ত্রের প্রণেতা। তাঁহাদের কিছুরই প্রয়োজন নাই। তথাপি ভগবান্ কর্ত্তৃক প্রত্যাদিষ্ট হইয়া গৃহস্থের জন্য তাঁহারা শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। তাঁহারা উদাসীন হইয়া দাবাবড়ের চাল বলিয়া দিতেছেন, তাই দেশকালপাত্র বিশেষে তাঁহাদের কথায় একটি ভুল হইবার উপায় নাই।

স্বামী বিবেকানন্দও কর্ম্মযোগী। অনাসক্ত হইয়া পরোপকারব্রতরূপ কর্ম্ম করিয়াছেন। তাই কর্ম্মীদের সম্বন্ধে তাঁহার এত মূল্য। তিনি অনাসক্ত হইয়া এই দেশের মঙ্গলসাধন করিয়াছেন, যেমন পূর্ব্বতন মহাপুরুষগণ জীবের মঙ্গলার্থে বরাবর করিয়া গিয়াছেন। এই নিষ্কাম ধর্ম্ম পালনার্থ যেন আমরাও তাঁহার পদানুসরণ করিতে পারি। কিন্তু এটি কি কঠিন ব্যাপার! প্রথমে হরি-পাদপদ্মলাভ করিতে হইবে। তজ্জন্য বিবেকানন্দের ন্যায় ত্যাগ ও তপস্যা করিতে হইবে। তবে এই অধিকার হইতে পারে।

ধন্য ত্যাগী মহাপুরুষ! তুমি যথার্থই গুরুদেবের পদানুসরণ করিয়াছ। তাঁহার মহামন্ত্র—আগে ঈশ্বর-লাভ, তাহার পর অন্য কথা, তুমিই সাধন করিয়াছ! তুমিই বুঝিয়াছিলে, ভগবান্‌কে ছাড়িয়া দিলে, 'অতি-বাদী' হইলে, এ সংসার যথার্থই স্বপ্নবৎ, ভেল্কীবাজি ; তাই সর্ব্বত্যাগ করিয়া তাঁহার সাধন আগে করিয়াছিলে। যখন দেখিলে, সর্ব্ববস্তুর প্রাণ তিনি, যখন দেখিলে, তিনি ছাড়া কিছুই নাই, তখন আবার এই সংসারে মনো-নিবেশ করিলে ; তখন হে মহাযোগিন্! সর্ব্বভূতস্থ সেই হরির সেবার জন্য আবার কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিলে ; তখন তোমার গভীর অপার প্রেমের অধি-কারী সকলেই হইল—হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বিদেশী, স্বদেশবাসী, ধনী, দরিদ্র, নর, নারী সকলকেই তুমি প্রেমালিঙ্গন দান করিয়াছ! তখন তীব্র বৈরাগ্যবশতঃ যে গর্ভধারিণী মাতৃদেবীকেও ত্যাগ করিয়া চক্ষুর জলে ভাসাইয়া, গৈরিকবস্ত্র ধারণ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলে, তখন সেই মা'কে আবার দর্শন দিলে ও বাৎসল্য স্বীকার করিয়া তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলে।

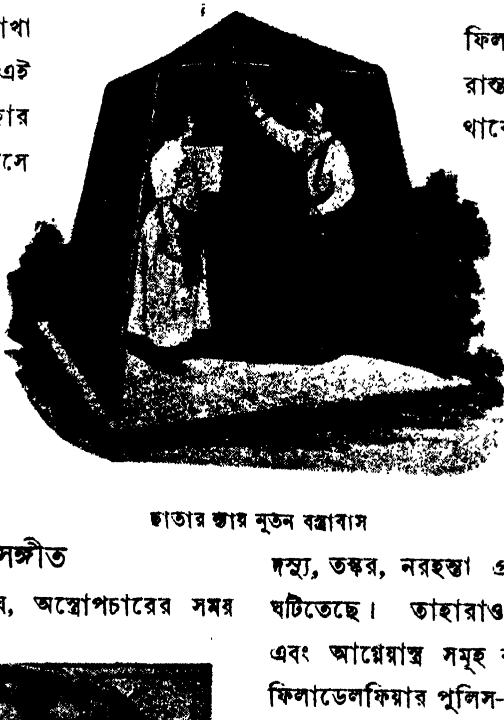
পরসংখ্যায় ঠাকুরের উপদেশ সম্বন্ধে আমেরিকা ও ইংলণ্ডে স্বামীজী কিরূপ প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা বিবৃত করিতে চেষ্টা করা হইবে।

[ক্রমশঃ।



অভিনব তাম্বু

মোটর গাড়ীতে সহজে বহন করা যাইতে পারে, এইরূপ ভাবে এক প্রকার তাম্বু নির্ম্মিত হইয়াছে। এই বস্ত্রাবাসকে ভাঁজ করিয়া ব্যাগের আকারে পরিণত করা যায়। এই তাম্বুর চারি কোণে ৪টি ইস্পাতের লঘুভার দণ্ড সংলগ্ন থাকে। শীর্ষদেশকে উচ্চ করিবার জন্য ৪টি দণ্ডের মাঝখানে ১টা পেঁচ আছে। এই পেঁচটিকে ইচ্ছামত উঠান বা নামান যাইতে পারে। ছাতা যেমন খোলা যায় ও অনায়াসে মুড়িয়া রাখা যায়, কতকটা সেই প্রণালীতে এই বস্ত্রাবাসকে ব্যবহার করা যায়। ইহার মধ্যে দুইখানি ক্যাম্পখাট অনায়াসে পাতা চলে। আশেপাশে বেশ-ভূষা—প্রসাধনক্রিয়ার জন্যও স্থান থাকে। তাম্বুর নিম্নভাগে ক্যানভাসের মেঝে, একটি দরজাও আছে। এইরূপ বস্ত্রাবাস মোটরবিহারী ভ্রমণকারীদিগের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক।



ছাতার ন্যায় নূতন বস্ত্রাবাস

অস্ত্রোপচারে সঙ্গীত

পরীক্ষায় প্রমাণিত হইয়াছে যে, অস্ত্রোপচারের সময় এবং পরে সঙ্গীতের দ্বারা রোগীর বিশিষ্ট উপকার হইয়া থাকে। মার্কিণ হাঁসপাতালে শল্যচিকিৎসকগণ অস্ত্রোপচারের সময় গ্রামোফোন বা ফনোগ্রাফের মধুর সঙ্গীতের সাহায্য লইয়া থাকেন। নিউইয়র্কের ব্রুক্‌লিন্ হাঁসপাতালে অনেকবার এই প্রকারে অস্ত্রোপচার হইয়াছে।

গুলীনিবারক পুলিস-গাড়ী

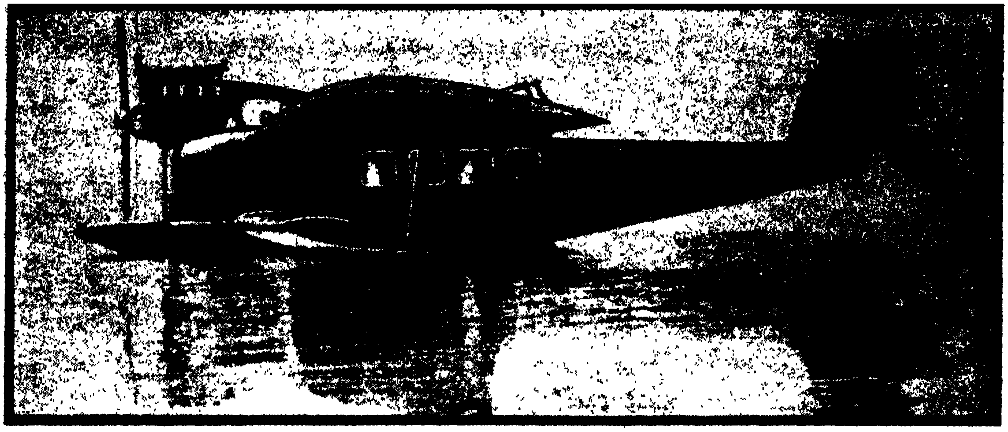
ফিলাডেলফিয়ার পুলিস রাস্তায় রাস্তায় মোটরে চড়িয়া পাহারা দিয়া থাকে। এই মোটর এমন ভাবে নির্ম্মিত যে, আততায়ীর গুলীতে ইহার কোনও অনিষ্ট হয় না। পুলিস-প্রহরীরা এই গাড়ী চড়িয়া দ্রুতধাবনকালে লক্ষ্যভেদ শিক্ষা করিয়া থাকে। এ জন্য রাজপথের স্থানে স্থানে লক্ষ্যভেদ করিবার ব্যবস্থা আছে। পাশ্চাত্য দেশের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দস্যু, তস্কর, নরহন্তা প্রভৃতির বুদ্ধিবৃত্তিরও চরমোৎকর্ষ ঘটিতেছে। তাহারাও দুষ্কার্য্যের জন্য দ্রুতগামী মোটর এবং আগ্নেয়াস্ত্র সমূহ ব্যবহার করিয়া থাকে। এ জন্য ফিলাডেলফিয়ার পুলিস-বিভাগ গুলীনিবারক দ্রুতগামী



ফনোগ্রাফ সঙ্গীতের সাহায্যে হাঁসপাতালে অস্ত্রোপচার হইতেছে



গুলীনিবারক মোটরে চড়িয়া পুলিস লক্ষ্যভেদ শিক্ষা করিতেছে

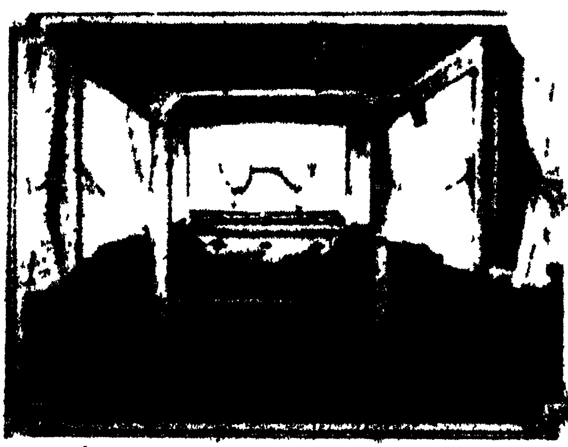


অভিযানকারীদিগকে বহন করিবার একখানি ব্যোমরথ

মোটর নির্ম্মাণ করাইয়া পথে পথে পাহারা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

বিমানপোতে পৃথিবীর তুষারস্তব্ধ প্রদেশ অতিক্রম

উত্তরমেরুর তুষারাচ্ছন্ন মরুপ্রান্তরের উপর দিয়া বিমান-যোগে যাতায়াতের পথ আবিষ্কারের জন্য উদ্যম ও আয়োজন চলিতেছে। বিমানারোহী অভিযানকারীরা অনুমান করেন যে, উত্তরমেরুতে সম্ভবতঃ ১০ লক্ষ বর্গ-মাইলব্যাপী স্থান তুষারে সম্পূর্ণভাবে আচ্ছন্ন হইয়া আছে। এই স্থান জীবের অনধিগম্য এবং সম্পূর্ণ অপরিচিত। এ পর্য্যন্ত কোনও মানব এই অঞ্চলের কোন সংবাদই অবগত হইতে পারে নাই। এই জন-বর্জ্জিত, অধিকারিবিহীন তুষারাচ্ছন্ন স্থানের উচ্চলোকে উষ্ণ বায়ুপ্রবাহ বিদ্যমান, বৈজ্ঞানিকগণ এমন অনুমানও করিতেছেন। সেই অনুমান অনুসারে আবিষ্কারকগণ আশা করেন যে, তাঁহাদের প্রচেষ্টা ফলবতী হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। অভিযানকারীরা বিমান-যোগে এই প্রদেশ অতিক্রম করিতে পারিলে য়ুরোপ ও জাপানে গতায়াত বিশেষ সহজসাধ্য হইবে এবং অভিযানকারীদিগের অভিজ্ঞতালব্ধ বিবরণ হইতে ভবিষ্যতে আবহাওয়া সম্বন্ধে নানাবিধ সঠিক পূর্ব্বাভাস প্রকাশ করা বৈজ্ঞানিকগণের পক্ষে সুবিধাজনক হইবে বলিয়াই



ব্যোমরথের কেবিন



দক্ষিণে আমুণ্ডসেন, বামে তাঁহার সহকারী ; যাত্রার পরিচ্ছদ

অনেকে মনে করিতেছেন। অভিযানকারীদিগকে অনুসন্ধানে পাঠাইবার জন্য কতিপয় ব্যোমপোত ব্যবহৃত হইবে। ইংলণ্ডে এ জন্য এক বিরাটকায় ব্যোমপোত নির্ম্মিত হইয়াছে। এক দল শ্রমসহিষ্ণু বৈজ্ঞানিক অভিযানের জন্য প্রস্তুত। আর্কটিক সমুদ্রের উপর দিয়া মেরুর আকাশপথে এই ব্যোমপোত যাত্রার জন্য প্রস্তুত। আর-৩৬ সংখ্যাজ্ঞাপক এই বিরাট ব্যোমপোত স্বচ্ছন্দে অভিযানকারিগণকে গন্তব্য স্থানে লইয়া যাইতে পারিবে বলিয়া সকলেরই বিশ্বাস। প্রকৃতির যে কোনও প্রকার বিপ্লবে এই ব্যোমরথ অক্ষত অবস্থায় থাকিতে পারিবে, এমনই দৃঢ়ভাবে উহা নির্ম্মিত হইয়াছে। মানবের শক্তি ও জ্ঞানের চরম প্রকাশ এই পোত-নির্ম্মাণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই ব্যোমরথের এঞ্জিনগুলি অত্যন্ত শক্তিশালী। নাবিক ও আরোহীদিগের বাসস্থানও বিবিধ প্রকার সুখস্বাচ্ছন্দ্যে পূর্ণ। নিদারুণ শীতে—উত্তর-মেরুর অবর্ণনীয় হিমসমুদ্রের মধ্যে যাহাতে চালকগণ কোনরূপ কষ্ট অনুভব করিতে না পারে, এই ব্যোমপোতে তাহার উৎকৃষ্ট বন্দোবস্ত আছে।

দক্ষিণমেরু আবিষ্কারকারী রোল্ড আমণ্ডসেন্ এই বাহিনীর নেতা। ২ খানি ব্যোমপোত উত্তরমেরুতে যাইবে। প্রত্যেক পোত একাদিক্রমে ১৩ শত মাইল অনায়াসে উত্তীর্ণ হইতে পারে। উত্তরমেরুর সন্নিহিত কোনও প্রদেশে ষ্টেশন করিয়া, তথা হইতে শেষ যাত্রার উপযোগী সকল প্রকার দ্রব্যাদি লইয়া অভিযানকারীরা অবশিষ্ট পথ অতিক্রম করিবেন, এইরূপই স্থির হইয়াছে।

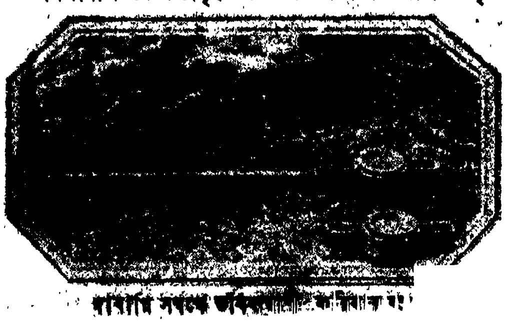




ব্যোমরথের ঊর্দ্ধগমনকালের দৃশ্য—কেবিন দেখা যাইতেছে আর-৩৬ সংখ্যক পোতের অধ্যক্ষ মিঃ এফ্, এম, বুথবি; নিশাযাপনের শয্যাগৃহ এবং ভোজনাগারের আংশিক দৃশ্য

যন্ত্রসাহায্যে দাবাগ্নির পূর্ব্বাভাস

য়ুরোপ, আমেরিকা সর্ব্বত্রই বনে সময় সময় আগুন লাগিয়া সর্ব্বনাশ ঘটিয়া থাকে। পূর্ব্বাহ্ণে দাবাগ্নির সম্ভাবনা [illegible] পারিলে অগ্নিনির্ব্বাণের সুবিধা হয় এবং [illegible] যাহাতে কোন অনিষ্ট করিতে না পারে, তাহার



দাবাগ্নি সম্বন্ধে [illegible]

ব্যবস্থাও সম্ভবপর হয়। এ জন্য মিঃ এম্, ই, ডন্‌লপ্ এবং মিঃ এইচ, টি, গিস্‌বরণ নামক দুই জন বৈজ্ঞানিক অনেক পরীক্ষার পর এক প্রকার যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই যন্ত্রের সাহায্যে অরণ্যের ভূমিতল কি পরিমাণ আর্দ্র, তাহা নির্ণীত হইয়া থাকে। যখন অত্যন্ত গরম পড়ে, চারিদিক শুকাইয়া উঠে, সেই সময় বৃক্ষসমূহের তলদেশে দহনশীল পদার্থগুলি কি পরিমাণে শুষ্ক হইয়াছে, তাহা এই যন্ত্রের সাহায্যে বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং আগুন লাগিলে কিরূপ বিপদের ও সর্ব্বনাশের সম্ভাবনা থাকিতে পারে, তাহারও পূর্ব্বাভাস পাওয়া যায়। যন্ত্রটি অত্যন্ত সাধারণ। একটা সরু নল এবং তাহার মাথায় একটি গোলাকার চাকতি। নলের মধ্যে তালজাতীয় গাছের মসৃণ, ঋজু অংশ প্রবিষ্ট থাকে। উহা আর্দ্রতার হ্রাসবৃদ্ধি অনুসারে স্ফীত বা সঙ্কুচিত হয়। মাথার দিকে চক্রবৎ যে অংশ আছে, তাহাতে সূচের ন্যায় একটি কাঁটা আছে। এই কাঁটা আর্দ্রতার হ্রাসবৃদ্ধি নির্ণয় করিয়া দেয়।

গোবৎসের দুগ্ধপানের ব্যবস্থা

আমেরিকার সবই অভিনব। যে সকল গোবৎস কোনও কারণে ক্রমশঃ শীর্ণ হইয়া পড়ে, তথায় তাহাদিগকে কৃত্রিম উপায়ে দুগ্ধ পান করাইবার উপায় নির্দ্ধারিত হইয়াছে। একটা কাঠের কাঠামো দাঁড় করাইয়া তাহাতে সুদৃঢ়ভাবে একটা পাত্র এমন ভাবে রাখা হয় যে, বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিলেও তাহা স্থানচ্যুত হইবে না। সেই আধারের নিম্নভাগে রবারনির্ম্মিত 'নিপ্‌ল' বা বোঁটা আঁটা থাকে। পাত্রের মধ্যে দুগ্ধ ঢালিয়া দিয়া গোবৎসকে উহা পান করিতে শিখান হইয়া থাকে। অবশ্য, এই শিক্ষাকার্য্যে কিছু সময় যায় বটে, কিন্তু ইহাতে দুগ্ধের অপচয় কিংবা পাত্র ভগ্ন হইবার সম্ভাবনা থাকে না। মার্কিণ কৃষকগণ এই উপায়ে বিশেষ সুফল লাভ করিয়াছে। যাঁহারা গরু, ভেড়া, মহিষ প্রভৃতি জীব অধিক সংখ্যায় পালন করিয়া থাকেন, সম্ভবতঃ মার্কিণ পদ্ধতি তাঁহাদের উপকারে লাগিতে পারে।

কাঠকয়লার গ্যাসে মোটর চালান

কাঠের কয়লা পুড়াইয়া যে গ্যাস উৎপন্ন হয়, তদ্দ্বারা সংপ্রতি ফ্রান্সে মোটর গাড়ী চালান হইয়াছে। ইহাতে খরচও অনেক কম। ৬০ মাইল পথ যাইতে ২৫ সেণ্ট মাত্র খরচ পড়িয়াছে। ৬০ মাইল পথ যাইতে প্রায় সাড়ে ১৬ সের মাত্র কয়লা লাগে। গাড়ীর একাংশে গ্যাস উৎপন্ন করিবার কক্ষ আছে। পরীক্ষায় প্রমাণিত হইয়াছে যে, এই উপায়ে মোটর গাড়ী চালান বিশেষ সন্তোষজনক।



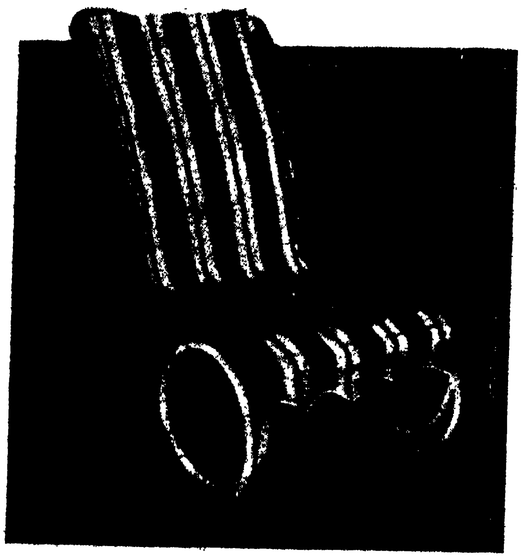
কৃত্রিম উপায়ে গোবৎসকে দুগ্ধপান করান হইতেছে



কাঠকয়লার গ্যাস দ্বারা চালিত মোটর গাড়ী

ইস্পাতের আরাম-কেদারা

জনৈক সামরিক কর্মচারী যুদ্ধক্ষেত্রে আহত হইবার পর আর সেনাদলে যোগ দিতে পারেন নাই। দীর্ঘকাল হাঁসপাতালে থাকিবার পর তিনি আরামপ্রদ এক প্রকার আরাম-কেদারা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই আরাম-কেদারা দীর্ঘকালস্থায়ী এবং স্বল্পব্যয়ে নির্ম্মাণ করা যায়। দুই খণ্ড দীর্ঘ ইস্পাতের স্প্রীং লইয়া তিনি এই আরাম-কেদারা প্রস্তুত করিয়াছেন। ইস্পাতের দণ্ড দুইটি স্প্রীংএর গুণযুক্ত—ইচ্ছামত অবনমিত অথবা পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। নিম্নভাগস্থ ইস্পাতের দণ্ড পরিমাণমত দীর্ঘ, ইহাতে হেলান দিলে চেয়ার উল্‌টাইয়া যাইবার কোন সম্ভাবনা নাই। ক্যাম্বিসের একটি আবরণের দ্বারা দণ্ড দুইটিকে আচ্ছন্ন করা হয়। লেপের ওয়াড় যে ভাবে পরাইতে হয়, এই ক্যাম্বিসের আচ্ছাদন ঠিক তেমনই ভাবে চেয়ারটিতে পরান হইয়া থাকে। ময়লা হইয়া গেলে উহা অনায়াসে খুলিয়া লইয়া ধৌত করা যাইতে পারে।



ইস্পাতের স্প্রীংনির্ম্মিত আরাম-কেদারা

সঙ্গীতের উৎকর্ষে শব্দের আলোকচিত্র

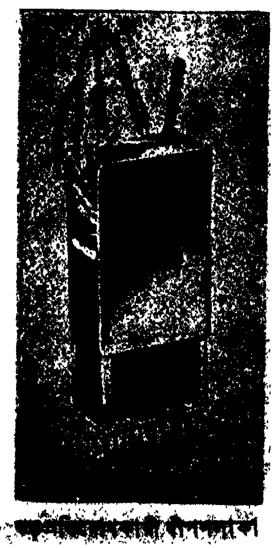
যন্ত্র-সঙ্গীতের কম্পন ক্যামেরার সাহায্যে আলোকচিত্রে ধরিয়া রাখা যায়। অবশ্য সাধারণ ক্যামেরায় তাহা হয় না। এ জন্য স্বতন্ত্র যন্ত্র ক্যামেরায় সংযুক্ত হয়। এই যন্ত্রের সাহায্যে ফটোগ্রাফ তুলিবার প্লেটে শব্দতরঙ্গের রেখাগুলি পরিষ্কার ও সুসঙ্গতভাবে মুদ্রিত হইয়া যায়। এই চিত্রের সাহায্যে কোন্ যন্ত্রের শব্দ কোন্ শ্রেণীর, তাহা নিঃসংশয়ে নিরূপিত করা সহজ। ইহাতে রেডিও-সংক্রান্ত গবেষণারও বিশেষ সুবিধা হইতেছে। ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্রের সঙ্গীততরঙ্গের গতি ও প্রকৃতি ইহাতে জানিতে পারা যাইবে।



ক্যামেরার সাহায্যে শব্দতরঙ্গের আলোকচিত্র মুদ্রিত হইতেছে

অভিনব দীপশলাকা

ঝড়বৃষ্টির মধ্যে দীপশলাকা জ্বালিবার প্রয়োজন সকলেরই হইয়া থাকে। কিন্তু সাধারণতঃ বাহিরে দিয়াশলাই জ্বালিলে ঝড়ের প্রকোপে বা বৃষ্টিধারার প্রভাবে উহা নিবিয়া যায়। এজন্য সংপ্রতি ঝড়বৃষ্টি-প্রতিরোধকারী এক প্রকার দীপশলাকার আধার নির্ম্মিত হইয়াছে। এই আধারে দিয়াশলাইয়ের বাক্স বন্ধ করিয়া অনায়াসে পকেটে রাখা চলে। জ্বালিবার প্রয়োজন হইলে আধারটিকে উপরের দিকে ঠেলিয়া দিতে হয়। অর্দ্ধভাগ উপরের দিকে ঠেলা পাইবার পর আপনা হইতে

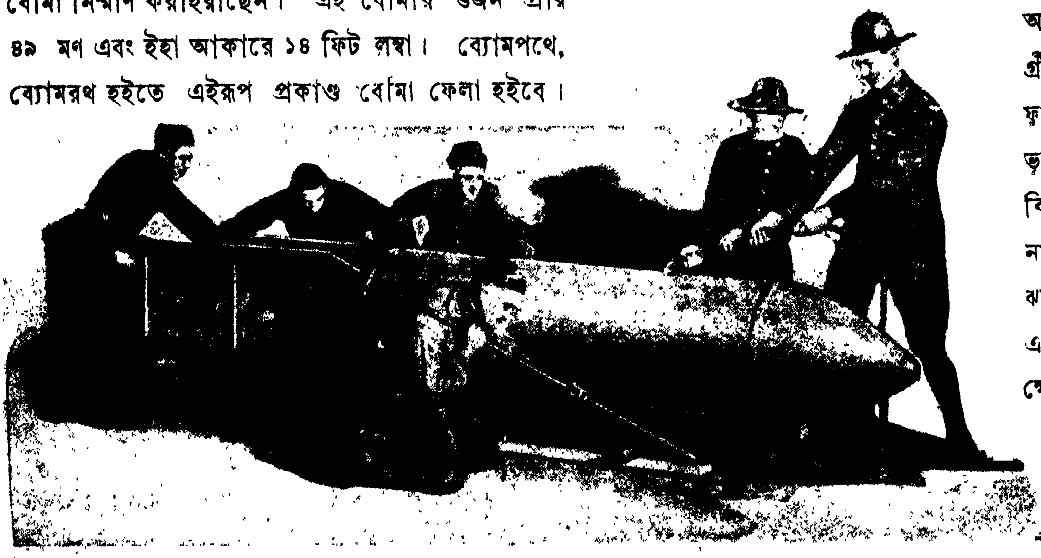


ঝড়বৃষ্টিপ্রতিরোধকারী দীপশলাকা

আধারের এক পার্শ্বে ত্রিকোণাকার (V) একটি কক্ষ গড়িয়া উঠে। দীপশলাকা জ্বালিয়া এই কক্ষমধ্যে ধরিলে ঝড়ের বেগ অথবা বৃষ্টিপাত বশতঃ উহা সহজে নিবিবে না। যাঁহারা বাহিরে বাহিরে থাকেন, এই আধার তাঁহাদের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়।

বিমানের বিরাট বোমা

মার্কিণ যুক্তরাজ্যের সমরবিভাগ সংপ্রতি একটি প্রকাণ্ড বোমা নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। এই বোমার ওজন প্রায় ৪৯ মণ এবং ইহা আকারে ১৪ ফিট লম্বা। ব্যোমপথে, ব্যোমরথ হইতে এইরূপ প্রকাণ্ড বোমা ফেলা হইবে।

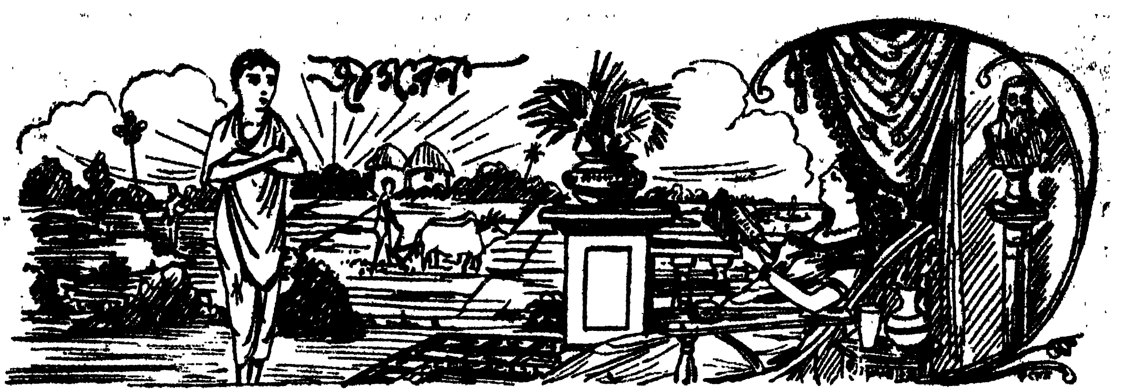


ব্যোমরথের বিরাট বোমা

এই ব্যোমপোত ও বোমা উভয়ে মিলিয়া যেরূপ সংহার-শক্তির পরিচায়ক, তাহা কল্পনা করিলেও শরীর শিহরিয়া উঠে। নিউইয়র্কে সামরিক বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিবৃন্দের ভোজসভায় এই বোমা প্রদর্শিত হইয়াছিল। য়ুরোপ ও আমেরিকা সৃষ্টিধ্বংসের উপযোগী মারণাস্ত্র নির্ম্মাণেই অবহিত। নূতন নূতন যন্ত্র, অভিনব ও প্রচণ্ড শক্তিশালী আগ্নেয়াস্ত্র প্রভৃতির উদ্ভাবনে বৈজ্ঞানিকগণের প্রতিভা সর্ব্বদাই নিযুক্ত।

মধ্যরাত্রির সূর্য্য

নরওয়ে ও সুইডেনে মধ্যরাত্রিতে সূর্য্য প্রকাশিত হয়, ইহা যাঁহারা স্বয়ং দেখেন নাই, তাঁহাদিগের পক্ষে ইহা ইন্দ্রজাল অথবা উপকথা বলিয়া মনে হয়। অথচ যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা কতই কবিত্বপূর্ণ ভাষায় ইহার সৌন্দর্য্যের বর্ণনা করিয়া থাকেন। মে-মাসের শেষ হইতে জুলাই মাসের শেষ দিন পর্য্যন্ত নরওয়ে সুইডেনে সূর্য্যদেব দিবানিশি গগনে প্রকাশিত থাকেন। এই অবিরাম দিবালোকে একটি নক্ষত্র প্রকাশ হইতে দেখা যায় না, কিন্তু চন্দ্রমা পাংশুবর্ণ ধারণ পূর্ব্বক হিমানীমণ্ডিতের ন্যায় দেখা দিয়া থাকেন। এই অল্পকাল স্থায়ী গ্রীষ্ম ঋতুতে ফুল সকল বনভূমি আলোকিত করিতে না করিতে ঝরিয়া পড়ে এবং কৃষকগণ ক্ষেত্রস্থ শস্য সংগ্রহ করিতে না করিতে তাহাদের শ্রমের ফল হিমানীপাতে নষ্ট হইয়া যায়। মধ্যরাত্রিতে সূর্য্যদেব দেখা দিবার কয়েক সপ্তাহ পরেই দিবামান হ্রাস হইতে থাকে, বায়ু শীতল হয় এবং রাত্রিতে বিলক্ষণ শীতানুভব হয়। আগষ্ট মাসের মাঝামাঝি ইহা ঘটে। এই সময়ে মাঠের হরিদ্বর্ণ তৃণ সকল পীতাভ হয়, পক্ষী সকল উড়িয়া দক্ষিণাঞ্চলে গমন করে এবং একে একে নীল আকাশে নক্ষত্র সকল ঝিকমিক করিয়া দেখা দিতে আরম্ভ করে। এই সময়ে চন্দ্রমাও আপনার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যে প্রকাশিত হইয়া জ্যোৎস্নালোক বিতরণ করিতে থাকেন এবং তদ্দ্বারা অনন্ত-দেশবাসীদিগের ভীষণ শীত ঋতুর দুঃখ অপনোদন করেন।



৬

অত্যন্ত কৌতূহলে ভয় ও ভাবনা মিশিয়া সাহেবের আহারে রুচি ও প্রবৃত্তি মুহূর্তে তিরোহিত হইয়া গেল। হাতের কাঁটা ও ছুরি ফেলিয়া দিয়া চেয়ারে হেলান দিয়া বসিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, এ সব কি ক'রে হ'ল, অমরনাথ?

অমরনাথ কহিল, আপনি কোন্‌টা জান্‌তে চাইছেন?

সাহেব ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিলেন, তুমি কি রাগ করলে, বাবা? আমি সমস্ত ব্যাপারটাই জান্‌তে চাইছি। কিন্তু, সে না হয় পরে হবে, তোমাকে আঘাত করলে কে? পুলিস?

অমরনাথ ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না, গ্রামের লোকই আঘাত করেছে, কিন্তু এই যে ঠিক সত্য, তাও নয়, রায় মশায়।

তা' হ'লে সত্যটা কি?

অমরনাথ বলিল, দেখুন, এর মধ্যে সত্য শুধু এইটুকু যে, আমার ফোঁটা কয়েক রক্তপাত হয়েছে।

সাহেব ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া প্রশ্ন করিলেন, কিন্তু এ কায় আমার হাটের মধ্যেই ত হ'ল?

অমরনাথ নীরবে সায় দিয়া জানাইল, তাই বটে।

এখনও তোমার খাওয়া-দাওয়া বোধ করি কিছুই হয় নি?

না।

সাহেব বলিলেন, তোমার বাড়ী ত খুব কাছে নয়,—কিন্তু এ বাড়ীতেও উদ্যোগ আয়োজন বোধ হয় কিছুই হ'তে পারবে না। এখানে তুমি কিছুই খাবে না, না?

অমরনাথ একটুখানি হাসিয়া বলিল, না।

সারাদিনটা তা হ'লে উপবাসেই কাট্‌লো?

অমরনাথ ইহার উত্তর কিছুই দিল না, কিন্তু বুঝা গেল, সমস্ত দিনটা তাহার উপবাসেই কাটিয়াছে। সাহেব নিশ্বাস ফেলিয়া আস্তে আস্তে বলিলেন, তা হ'লে আর বিলম্ব কোরো না, বাবা, বাড়ী যাও। এই বলিয়া তিনি সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, চল, তোমাকে একটু-খানি এগিয়ে দিয়ে আসি।

অমরনাথ ব্যস্ত হইয়া উঠিল; কহিল, সে কি [illegible]! —আমাকে আবার এগিয়ে দেবেন কি! তা ছাড়া, খাওয়া আপনার শেষ হয় নি,—উঠ্‌তে আপনি কিছুতে পারবেন না, রায় মশায়।

সাহেব জিদ্ করিলেন না, কোন বিষয়েই জিদ্ করা তাঁহার স্বভাব নয়। শুধু যাইবার সময় ধীরে ধীরে বলিলেন, যে জন্যে তুমি এত রাত্রে এসেছিলে, তার আভাস-মাত্র পাওয়া ভিন্ন আর কিছুই জান্‌তে পারলাম না। কিন্তু কাল যখন হোক একবার এসো, অমরনাথ।

অমরনাথ স্বীকার করিয়া প্রস্থান করিলে সাহেব কহিলেন, এ অঞ্চলে অমরের গায়ে কেউ আঘাত করতে সাহস করবে, এ কথা সহজে কেউ বিশ্বাস করতে চাইবে না। ভিতরে ভিতরে ব্যাপারটা হয় ত অনেক দূর এগিয়ে গেছে। তা ছাড়া আমারই হাটের মধ্যে এ দুর্ঘটনা ঘট্‌লো!

ভাবে বুঝা গেল, যে সাহেবের আহারে আর প্রবৃত্তি নাই, আলেখ্য বিমর্ষ অধোমুখে খাদ্য বস্তু লইয়া খাওয়ার ভান করিতে লাগিল মাত্র। মিনিট দশ পনেরো পূর্ব্বেও ডিনারের যে উৎসব পূর্ণ উদ্যমে চলিয়াছিল, ঐ অপরি-চিত লোকটার আসা ও যাওয়ার মধ্যেই সমস্ত যেন নিরুৎসাহে নিবিয়া গেল। তাহার কথাবার্ত্তা সংক্ষিপ্ত

এবং প্রাঞ্জল, এমন কি, হিন্দুত্বের গোঁড়ামির দিক দিয়া, এক প্রকার সরল রূঢ়তাও আছে, অনাড়ম্বর বেশ-ভূষা একটু বিশেষ করিয়াই চোখে পড়ে, সম্প্রতি একটা মারা-মারি করিয়া আসিয়াছে এবং তাহা পুলিসের বিরুদ্ধে হইলে এক ধরণের বীরত্বও আছে, কিন্তু রে সাহেবের উচ্ছ্বসিত প্রশংসার হেতু ইন্দু বা তাহার দাদা সম্পূর্ণ উপলব্ধি না করিতে পারিয়া ইন্দুই প্রথমে প্রশ্ন করিল, ইনি কে, আলো ?

রে সাহেব ইহার জবাব দিলেন ; কহিলেন, ইনি এক জন নবীন অধ্যাপক, টোলে অধ্যাপনা করেন, গুটি-কয়েক বিদেশী ছাত্রও আছে, কিন্তু অধ্যাপনার কায এখন বিরল হয়ে এলেও এ দেশে আরও অধ্যাপক আছেন, সুতরাং এ তাঁর বিশেষত্ব নয় ; অধুনা দেশের কাযে লেগে গেছেন, কিন্তু একেও অসাধারণ বলিনে, অসাধারণত্ব যে এঁর ঠিক কোথায়, তাও আমি জানিনে, কিন্তু এই ভবিষ্যদ্বাণী আমি নিঃসংশয়ে ক'রে যেতে পারি, ইন্দু, অমরনাথ বেঁচে থাকলে এক দিন এঁকে মানুষ বলেই দেশের মানুষকে স্বীকার করতে হবে।

কাহারও ভবিষ্যদ্বাণীর উপরে তর্ক করা চলে না, বিশেষতঃ তিনি গুরুজনস্থানীয় হইলে নীরব হইতেই হয়, ইন্দু চুপ করিয়া রহিল, কমলকিরণ প্রশ্ন করিল, মিষ্টার রে, এই লোকটিই কি আপনার প্রজাদের উত্তে-জিত করবার চেষ্টা করেছিলেন ?

সাহেব মাথা নাড়িয়া বলিলেন, হাঁ।

আপনার হাটের মধ্যে ইনি গিয়েছিলেন কেন ? বোধ করি এই উদ্দেশ্যেই ?

সাহেব প্রশ্ন শুনিয়া হাসিলেন ; কহিলেন, বিলাতী কাপড়ের বিক্রী বন্ধ করতে।

কমল কহিল, অর্থাৎ নন্‌-কো-অপারেশনের ভিলেজ পাণ্ডা। দোকানদারের দল বিরক্ত হয়ে তাই নবীন অধ্যাপকের রক্তপাত করেছে, এই না মিষ্টার রে ?

সাহেব সায় দিয়া বলিলেন, খুব সম্ভব তাই।

কমল কহিল, এবং তা'রা খবর দিয়ে পুলিস এনে হাজির রেখেছিল ?

আলেখ্য এতক্ষণ চুপ করিয়া শুনিতেছিল, সে-ই ইহার উত্তর দিল ; সলজ্জ মৃদুকণ্ঠে বলিল, আমিই এক দিন পুলিসের সাহায্য চেয়ে ম্যাজিষ্ট্রেটকে চিঠি লিখে দিয়েছিলাম।

কমল কহিল, ঠিক কায করেছিলেন, এখন শুধু এইটুকু বাকী আছে—লোকটিকে প্রসিকিউট করা। অন্ততঃ মার্কেট আমার হ'লে আমি তাই করতাম।

সাহেব কি একটা বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার সে দিনের হরতালের কথা মনে পড়িল, যে দিন রাগ করিয়া রাস্তার লোক কমলের পিতার গাড়ীর কাচ ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল। এ অপরাধ তিনি ক্ষমা করেন নাই, অনেককেই কারাগারে যাইতে হইয়াছিল। ক্ষণ-কাল নিঃশব্দে থাকিয়া শেষে কহিলেন, আমার মনে হয়, তাতে লাভের চেয়ে লোকসানের মাত্রাই বেশী হোতো কমল। হয় ত, কাল কিংবা পরশু আমাদের যাকে হোক হাটের একটা ব্যবস্থা করতে যেতেই হবে, সহজে মীমাংসা হবে না,—অথচ পুলিসের লোক মধ্যে না থাকলে মনে হয়, এর প্রয়োজনই হ'ত না।

ইন্দু কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে খবর দেওয়া কি আপনার মত নিয়ে হয় নি ?

সাহেব কন্যার অধোমুখের প্রতি কটাক্ষে চাহিয়া কহিলেন, আমার মতামতের আবশ্যকই ছিল না, ইন্দু। তোমরা একটা কথা জান না যে, সাংসারিক সকল ব্যাপার থেকেই আমি অবসর নিয়েছি, বিষয় এখন আলোর, বিলি-ব্যবস্থা যা-ই করতে হোক, তাকেই করতে হবে। ভুল যদি হয়েও থাকে, তাকেই এর সংশোধনের ভার নিতে হবে।

কমল চকিত হইয়া বলিল, আপনি জীবিত থাকতে সে কি ক'রে হ'তে পারে ?

সাহেব হাসিমুখে কহিলেন, তা হ'লে আমি বেঁচে নেই, এই কথাই মনে ক'রে নিতে হবে।

কমল বলিল, মনে করা কঠিন, এবং আলেখ্যর মত অনভিজ্ঞের এ ভার বহন করা আরও বেশি কঠিন।

ইন্দু বলিল, বিস্তর ভুল-চুক হবে।

সাহেব কহিলেন, ভুল-চুকের দণ্ড আছে। হ'লে নিতে হবে।

ইন্দু কহিল, তা ছাড়া, বিপদ বাধাবার শত্রু যখন আশে-পাশে রয়েছে।

সাহেব কহিলেন, আশে-পাশে শত্রুই শুধু থাকে না, ইনু, মিত্রও থাকে। তারা বিপদ উদ্ধারের পথ দেখিয়ে দেয়। সে যার থাকে না, সংসারে সে পরাভূত হয়। একাকী বাপ তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে না, মা।

ইনু তাহা স্বীকার করিল এবং তাহার দাদা ইহাকে প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত মনে করিয়া মৌন হইয়া রহিল।

পরদিন সকালেই রে সাহেবের অনুজ্ঞামত অমরনাথ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রাতরাশ সেই মাত্র শেষ হইয়াছে, বসিবার ঘরে সকলে আসিয়া উপবেশন করিলে সাহেব যে কথাটা সর্ব্বপ্রথমে জানিতে চাহিলেন, তাহা লোকটার নাম, যে হাটের মধ্যে তাহাকে আক্রমণ করিয়াছিল।

অমরনাথের মুখের ভাবে বিস্ময় প্রকাশ পাইল, জিজ্ঞাসা করিল, কেন?

সাহেব বলিলেন, এর একটা প্রতীকার হওয়া চাই।

অমরনাথ কহিল, কিন্তু আপনি ত আর কিছুর মধ্যেই নেই, রায় মশায়।

সাহেব বলিলেন, আমি নেই সত্য, কিন্তু যিনি আছেন, তাঁর ত এ বিষয়ে কর্ত্তব্য আছে।

পিতার ইঙ্গিত আলেখ্য বুঝিল। নয়ন গাঙ্গুলীর আত্মহত্যার পর হইতে সে গ্রামের লোকজনের সম্মুখে সহজে আসিতে চাহিত না, আসিয়া পড়িলেও নীরব হইয়াই থাকিত। তাহার সর্ব্বদাই মনে হইত, ইহারা এই দুর্ঘটনায় তাহাকেই সর্ব্বতোভাবে দায়ী করিয়া রাখিয়াছে এবং অন্তরালে যে সকল কঠিন ও কটু বাক্য তাহারা উচ্চারণ করে, কল্পনায় সমস্তই সে যেন স্পষ্ট শুনিতে পাইত, এবং ইহার লজ্জা তাহাকে যে কতদূর আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা শুধু সে নিজেই অনুভব করিত।

আলেখ্য পিতার প্রশ্নের সূত্র ধরিয়া বলিল, বেশ, আমিই আপনাকে তাঁদের নাম জানাতে অনুরোধ করছি। এই বলিয়া আজ সে অনেক দিনের পরে মুখ তুলিয়া চাহিল। সেই শান্ত, বিষণ্ণ মুখের প্রতি অমরনাথ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি পাতিয়া ক্ষণকাল নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া শেষে ধীরে ধীরে বলিল, দেখুন, তা'রা আপনার প্রজা, কেবলমাত্র কৌতূহলবশেই যদি তাদের পরিচয় জানতে চেয়ে থাকেন, এ কৌতূহল আপনাকে দমন করতে হবে।

আলেখ্য কহিল, তা'রা আমার প্রজা না হ'লে আপনাকে আমি জিজ্ঞাসাও করতাম না। জমীদারের একটা কর্ত্তব্য আছে,—এই অন্যায়ের আমি প্রতীকার করতে চাই।

অমরনাথ বলিল, আপনি তাদের শাস্তি দিতে চান, কিন্তু তাতে প্রতীকার হবে না।

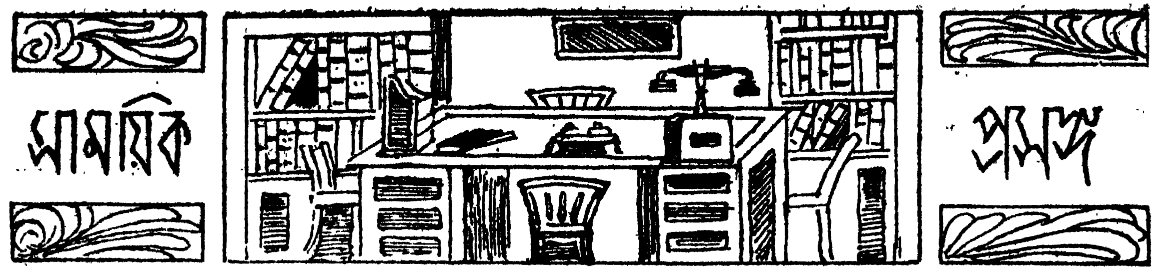
আলেখ্য কহিল, অন্যায়ের প্রতীকার ত শুধু শাস্তি দিয়েই হয়!

অমরনাথ মুচকিয়া হাসিয়া কহিল, এই নিয়ে আমি আপনার সঙ্গে তর্ক করতে চাইনে এবং জমীদার কি ক'রে প্রজার শাসন ক'রে থাকেন, তাও আমি জানিনে। কিন্তু এ কথা নিশ্চয় জানি, অন্যায় এবং অজ্ঞতা এক জিনিস নয়, এবং শাস্তি দিয়েও এর কিছুমাত্র প্রতীকার হবে না।

এক মুহূর্ত্ত স্থির থাকিয়া অমরনাথ পুনশ্চ কহিল, আমাকে তা'রা আঘাত করেছে সত্য, কিন্তু সেই আঘাতের শাস্তি দিতে যাওয়ার মত পণ্ডশ্রম আর নেই। মার খাওয়াটাই যদি আমার কাছে বড় হ'ত, সেখানে আমি যেতাম না। আমার আঘাতে যথার্থই যদি আপনি বিচলিত হয়ে থাকেন ত এইটুকু প্রার্থনা আমার মঞ্জুর করুন, এই নিয়ে আমার প্রতি তা'দের আর বিরূপ ক'রে তুলবেন না।—এই বলিয়া অমরনাথ উঠিয়া দাঁড়াইল।

[ক্রমশঃ।

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।



নিজ বাসভূমে ক্রীতদাস

এ দেশের রাজনীতিকদিগের মুখে বড় বড় কথা খুবই শুনিতে পাওয়া যায়। কাউন্সিল-প্রবেশ বা কাউন্সিল-বর্জ্জন, রাজনীতিকগণের পক্ষে এখন ইহাই মস্ত সমস্যা। এ সমস্যার ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া আমাদের মনীষীরা এখন যেরূপ হাবুডুবু খাইতেছেন, তাহাতে ঘরের দ্বারে গোষ্পদে যে আমাদের ভরা ডুবি হইতেছে, তাহার খবর রাখিবার অবসর প্রাপ্ত হয়েন না। বিদেশে ভারতবাসী কত জন কোথায় কি ভাবে বাস করে, তাহারা সে সমস্ত দেশের আইনকানুনে কি ব্যবহার প্রাপ্ত হয়,—তাহার হিসাব হয় ত অনেকের নখদর্পণে আছে, কিন্তু আমাদের এই নিজ বাসভূমে—এই সাগরমেখলা শৈলকিরীটিনী জন্মভূমি ভারতের অভ্যন্তরে আমাদের কত আপনার জন ক্রীতদাসরূপে বিদেশী বণিকের কামধেনুদোহনে সহায়তা করিতেছে, তাহার সংবাদ কয় জন রাখেন? তাহাদের দৈনন্দিন জীবন-নাটকের অঙ্ক-গর্ভাঙ্ক নাই, একটানা স্রোতে তাহাদের জীবনপ্রবাহ বহিয়া যাইতেছে, তাহাদের সুখ-দুঃখের অনুভূতি আছে কি না সন্দেহ; অথচ তাহাদের ব্যথায় ব্যথী হইয়া কথা কহিবার কয় জন আছে?

এই যে আমাদের ঘরের পার্শ্বে আসামের চা-বাগিচায় ভারতের কুলী চা-করদিগের অর্থার্জ্জনের প্রধান বাহনরূপে জীবনের মধ্যাহ্ন অতিপাত করিতেছে, তাহাদিগের অবস্থা কিরূপ, সে অবস্থার উন্নতি সাধিত হইতে পারে কি না, কি উপায়ে সে উন্নতিসাধনে অগ্রসর হওয়া যায়, তাহা কয় জন রাজনীতিক চিন্তা করিয়া থাকেন? বিলাতে শ্রমিক দলের কোন কোন সদস্য এখন বোম্বাইয়ের কাপড়ের কলের কুলীর দুঃখমোচনে তৎপর হইয়াছেন। ঐ সঙ্গে বাঙ্গালা বিহারের কয়লার খনির কুলীর অথবা জামসেদপুরের টাটার কারখানার শ্রমিকগণের দুঃখমোচনের কথাও যে না উঠিয়াছে, এমন নহে। ভারতে কুলীর কাযের খরচ কমাইয়া দিবার কথা হইতেছে; পরন্তু ১২ বৎসরের ন্যূনবয়স্ক বালক-বালিকাকে একবারে কাযে নিযুক্ত না করিবার ব্যবস্থা হইতেছে বলিয়াও শুনা যাইতেছে; নারী-কুলীর শ্রমলাঘবের কথাও উত্থাপিত হইতেছে। এ সব দয়ার কথা শুনিলে মনটা কেমন চঞ্চল হইয়া উঠে। এ দেশের দরিদ্র কৃষক ও জন-মজুরের ঘরে বালকবালিকা ও স্ত্রীলোক পুরুষের কার্য্যে কত সহায়তা করে, তাহা সকলেই জানে। সে সহায়তা না পাইলে একাকী গৃহস্থ সংসারের অন্নসংস্থান করিতে পারে না। সুতরাং এ দয়ার উদ্দেশ্য বুঝিয়া উঠিতে বেগ পাইতে হয়। আসল ব্যথা যেখানে, সেখানে কোন কথা উঠে না কেন, তাহা এ দেশের রাজনীতিকরা আলোচনা করেন না কেন? বিহারের কোন কোন কুঠিয়াল য়ুরোপীয়ান গ্রামের লোককে বেগার খাটাইয়া থাকেন, এ কথা প্রায়ই শুনা যায়। চম্পারণের কৃষাণ-বিদ্রোহ কি জন্য ঘটিয়াছিল, তাহা একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝা যায়। অসহযোগী আন্দোলনকারীরা শত চেষ্টা করিলেও সন্তুষ্ট কৃষাণ অসন্তুষ্ট হইত না, এ কথা সকলেই বুঝে। ভাগীরথীর উভয় তটস্থ পাটের কলের কুলীদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল, সুতরাং তাহারা বিদ্রোহী হয় না; তবে মাঝে মাঝে তাহারা যে বেতনবৃদ্ধির জন্য বা কোনও উচ্চ কর্ম্মচারীর মন্দ ব্যবহারের জন্য ধর্ম্মঘট করে, উহা তাহাদের সাধারণ অবস্থার পরিচায়ক নহে, উহা সাময়িক চাঞ্চল্য বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

আসামের চা-বাগিচার কুলী-বিদ্রোহ সাময়িক কারণে উদ্ভূত হয় নাই। অসহযোগের বিরাট আন্দোলনের দিনে যে বিরাট কুলী-বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল, উহা

একদিনের অসন্তোষের বা আন্দোলনকারীদের উত্তেজনার ফল নহে। সে বিদ্রোহ অল্পে প্রশমিত হয় নাই। বহুদিনের পুঞ্জীভূত অসন্তোষানল এক দিনের মিষ্ট কথায় নির্ব্বাপিত হইবার নহে। তাই চাঁদপুরে কুলী সিপাহীর বন্দুকের গুলীতে বুক পাতিয়া দিতে প্রস্তুত হইয়াছিল, তবু চা-বাগিচায় ফিরিতে চাহে নাই।

সে অবস্থার প্রতীকার হইয়াছে কি না, কেহ জানে না কেন না, এ দেশের রাজনীতিক হুজুগ দুই চারি দিন থাকে, তাহার পর সে হুজুগ নিভিয়া গেলে অন্য হুজুগ উপস্থিত হয়। সুদূর আসামের জঙ্গলে কুলীরা কায করে, সেখানে যাহাতে এজিটেটাররা পদার্পণ না করিতে পারে, তাহার জন্য সিপাহীর বন্দুক, বেয়নেট ও ফৌজদারী নানা আইনের ধারার বেড়া দেওয়া আছে। সরকারী বা বে-সরকারী ইন্স্পেক্টর বা ভিজিটরের শুভাগমনকালে লাটবেলাটের সফরের মত চা-বাগিচা পোষাকী কাপড় পরিধান করে; সেই পোষাকী কাপড়ের ব্যবধান ভেদ করিয়া কুলীর শরীরের অস্থিপঞ্জর বা শুষ্ক উদরের চিহ্নমাত্র দেখা যায় না।

মাঝে মাঝে বিলাতে "আসাম ডিনার" হয়। যে সব ভাগ্যবান্ শ্বেতাঙ্গ ব্যবসাদার চায়ের বা চা-বাগিচার কারবারে পেটভরা ডিভিডেণ্ট উপভোগ করেন, তাঁহারা বৎসরে একবার সভাস্থ হইয়া খানা-পিনা করেন। রোষ্ট রিফ ও বিয়ারের বোতলের সদ্ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর অপর প্রান্তের সাত সমুদ্র তের নদী পারের স্বর্ণ-ডিম্বপ্রসবিনী রাজহংসী চা-বাগিচার দুই চারিটা সুখ-দুঃখের কথাও যে উঠে না, এমন কথা বলা যায় না। এবারও বিলাতের লণ্ডন সহরে বাৎসরিক 'আসাম ডিনার' হইয়াছিল। ঝুনা ব্যুরোক্রাট সার জন হিউয়েট সেই উপলক্ষে অনেক গবেষণার কথা কহিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে ভারতের ভাগ্যবিধাতা ভারত-সচিব লর্ড অলিভিয়ারও কুলীর সুখ-দুঃখের কথায় পঞ্চমুখ হইয়াছিলেন। কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। ডিনারের পর বক্তৃতা—উহার প্রভাব কত দূর স্থায়ী, তাহা সকলেরই বিদিত।

এই যে পেটমোটা ডিভিডেণ্টভোগী ডিরেক্টর ও সেয়ারহোল্ডাররা আসাম ডিনারে ভোজ মারিতে বসিয়াছিলেন, ইঁহাদের মধ্যে কয় জন দিনান্তে একবার দরিদ্র কুলীর কথা ভাবিয়া থাকেন? বর্ত্তমান শ্রমিক সরকারের চ্যান্সেলার অফ দি এক্সচেকার মিঃ ফিলিপ স্নোডেন পার্লামেণ্টের কমন্স সভায় সে দিন ভারতের চায়ের উপর আমদানী শুল্কের সম্পর্কে রক্ষণনীতি প্রসারের কথায় বক্তৃতা দিবার সময়ে বলিয়াছিলেন যে, ভারতের চায়ের ব্যবসায় খুবই সমৃদ্ধিসম্পন্ন। এ কথা তিনি এক বিন্দুও অতিরঞ্জিত করিয়া বলেন নাই। কেন না, যাঁহাদিগের সম্মুখে তিনি বক্তৃতা করিতেছিলেন, পার্লামেণ্টের সেই সদস্যদিগের মধ্যে সকলেই জানেন যে, বিলাতের চা-ব্যবসায়ী ভারতে চায়ের ব্যবসায় করিয়া শতকরা ১০০৲ হইতে ১৫০৲ টাকা ডিভিডেণ্ট দিয়া থাকেন। আমরা ভারতবাসীরাও জানি যে, আজ ৫০ বৎসরেরও উপর হইতে আসামের চায়ের ব্যবসায়ে সোনা ফলিয়া আসিতেছে।

আসামে বর্ত্তমানে ন্যূনাধিক ৯ শত চা-বাগিচা আছে। প্রায় ১৫ লক্ষ একর (৩ বিঘায় এক একর) জমী লইয়া চা-ব্যবসায় বিস্তৃত। তন্মধ্যে ৫ লক্ষ একর জমীতে চায়ের ফসল উৎপন্ন হইতেছে; বক্রী জমী ক্রমে আবাদে পরিণত হইতেছে। এই সকল চা-বাগিচা হইতে বৎসরে প্রায় ২৩ কোটি পাউণ্ড (পাউণ্ড প্রায় অর্দ্ধ সের) চায়ের পাতা ও গুঁড়া প্রস্তুত হয়। ইহার আয়ের কথা শুনিলে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইতে হয়। হাজামজার কথা ধরিতেছি না, ব্যবসায়ের মন্দার কথাও ধরিতেছি না, গড়পরতায় বৎসরে আসামে চায়ের ব্যবসায় হইতে শতকরা ১ শত টাকা লাভ হয়! বুঝিয়া দেখুন, সাত সমুদ্র তের নদীর পারে বসিয়া ডাইরেক্টার ও সেয়ারহোল্ডারদের পেট মোটা হইবে না কেন বা বিয়ার-বিফের ভোজের সময় তাহাদের মুখে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিবে না কেন?

এত বড় আয়ের জমীদারী যাহাদের পরিশ্রমে খাড়া হইয়াছে, তাহাদের নাম 'কুলী'। আমি বলশেভিক সাম্যবাদের (ইংরাজী সংবাদপত্রের মারফতে আমরা যাহার বিভীষিকার কথা শুনিয়াছি) পক্ষপাতী নহি। এ জগতে Brain ও Capitalএর প্রাপ্য অংশ ধনী মহাজন চিরদিনই প্রাপ্ত হইবেন, না হইলে সামাজিক বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হইবে ও ফলে সমাজ ধ্বংস হইবে।

তবে সঙ্গে সঙ্গে শ্রমের কদরও হওয়া উচিত, এ কথা আমাদের সঙ্গে বোধ হয় নিরপেক্ষ জগদ্বাসিমাত্রই বলিবে। শ্রমিক ও ধনী মহাজন তাঁহাদের শ্রম, মস্তিষ্ক ও অর্থের সমবায়ে যাহা গড়িয়া তুলেন, তাহার উপস্বত্ব ন্যায্য হিসাবে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিলে শ্রম ও ধনে বিবাদ উপস্থিত হয় না। ন্যায্য হিসাবটা কি—ইহাই সমস্যা, এ সমস্যার মীমাংসা করে কে? এই সমস্যাসমাধানের নিমিত্ত এখন জগতে তুমুল বাদানুবাদ ও তর্কসমর চলিতেছে।

আমি আসাম চা-বাগিচার কুলীদের সম্পর্কে এ সমস্যার কথা তুলিতে চাহি না। আসামের কালা জঙ্গলে হিংস্র শ্বাপদসঙ্কুল স্থানে জলের মত অর্থব্যয় করিয়া যাঁহারা চায়ের আবাদ বানাইয়াছেন, তাঁহারা যে এই ব্যবসায়ের পথিপ্রদর্শক এবং সে জন্য তাঁহাদের মস্তিষ্ক ও অর্থের উপযোগী ফল উপভোগ করিতে অধিকারী, এ কথা আমি সহস্রবার স্বীকার করি। কিন্তু সেই সঙ্গে যে শ্রমিকদের প্রাণপাত পরিশ্রমের ফলে আজ তাঁহাদের আবাদে সোনা ফলিতেছে, সেই শ্রমিক কুলীদিগের প্রতি মানুষের মত ব্যবহার করা হয়, তাহাও আমরা কেন, প্রত্যেক নিরপেক্ষ ব্যক্তিমাত্রই দেখিতে চাহেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেন, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মার্কিণ দেশে কাফরী ক্রীতদাসদিগের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করা হইত, এ যুগে আসামের কুলীদিগের প্রতি প্রায় সেইরূপই ব্যবহার করা হয়। যে অবস্থায় থাকিয়া এই বিংশ শতাব্দীতেও ইহারা চা-বাগিচায় জীবনযাপন করে, তাহা শোচনীয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বর্ব্বররা বিজিত দাসের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করে, সুসভ্য ইংরাজ চা-করের চা-বাগিচায় ভারতীয় কুলী তাহার অনুরূপ ব্যবহার প্রাপ্ত হয়, এমন কথা কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। অবশ্য, এ কথা আমাদের বিশ্বাস হয় না। তবে ব্যবহার যে নিন্দনীয়, তাহার প্রমাণের অভাব নাই। সে ব্যবহারের উন্নতিবিধানও খুব সম্ভবপর। যাহা সম্ভবপর, তাহা ধনী মালিকদের বাস্তবে পরিণত করা কর্ত্তব্য নহে কি?

চা-বাগিচার ভারতীয় কুলী কেমন অবস্থায় থাকে, কি খায়, কি পরে,—তাহার সংবাদ চা-বাগিচার চৌহদ্দীর বাহিরের লোক পূর্ব্বে জানিবার সুযোগ পাইত না অথবা পাইলেও সে বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দিত না। এখন কাল পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। মহাত্মা গন্ধীর নেতৃত্বাধীনে দেশের শিক্ষিত লোক এখন দেশের মূক জনসাধারণের কথা ভাবিতে শিখিয়াছে, তাহাদের সুখ-দুঃখের কথা আপনার করিয়া লইতে অভ্যস্ত হইয়াছে। বোম্বাইয়ের বিখ্যাত শ্রমিক নেতা মিঃ যোশী সম্প্রতি আসামের চা-বাগিচা অঞ্চলে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন। তিনি বোম্বাইয়ের 'সার্ভ্যাণ্ট অফ ইণ্ডিয়া' পত্রে তাঁহার ভূয়োদর্শন লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার অভিমত এই যে, "আসাম চা-বাগিচার কুলীরা যাহাতে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয়, তাহাই দেখা এখন ভারতের চিন্তাশীল দেশহিতৈষী রাজনীতিকগণের প্রধান ও প্রথম কর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছে। আসামের চুক্তিবদ্ধ কুলীর নিয়োগ-ব্যাপার সম্বন্ধে একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে নিরপেক্ষ ইংরাজমাত্রই লজ্জিত হইবেন সন্দেহ নাই।"

কথাগুলি কি ভাবিয়া দেখিবার নহে? কুলীদের সহিত বাগিচা-কর্ত্তৃপক্ষের যে কাযের চুক্তি হয়, তাহাতে তাহাদের কত অসুবিধার ও কত অভিযোগের কারণ উপস্থিত হইতে পারে, তাহা কেহ ভাবিয়া দেখেন না। এক পক্ষে দরিদ্র নিরক্ষর কুলী, অপর পক্ষে প্রায়শঃ শিক্ষিত উচ্চপদস্থ ইংরাজ। মধ্যে আছেন সরকার—সে সরকারও ইংরাজের। সুতরাং চুক্তির আইন যে পক্ষপাতিতাদোষদুষ্ট হইবে, তাহাতে বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই। সে আইন যে কোন সভ্য সরকারের আইন-পুস্তকের কলঙ্কস্বরূপ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। এই আইনের দ্বারা চা-কররা তাঁহাদের সুবিধা মত ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছেন।

তবে মিঃ যোশী বলিয়াছেন, এই আইন অংশতঃ সংশোধিত বা রদ করা হইয়াছে। কিন্তু এখনও যে চুক্তির আইন বাহাল আছে, তাহারও পরিবর্ত্তন ও সংশোধন একান্ত প্রয়োজন। এই আইনের দ্বারা কুলীদিগের স্বাধীনতা হরণ করা হইয়াছে। মিঃ যোশী তিনটি আইনের ধারার কথা উদ্ধৃত করিয়াছেন।

ঐ ধারা অনুসারে আইনের দোহাই দিয়া চা-কররা কুলীদিগকে প্রাচীন রোমক গ্লাডিয়েটারদিগের মত

ব্যবহার করিতে পারেন। চুক্তিমত কুলীরা যদি কায করিতে অসম্মত হয়, তাহা হইলে চা-কররা তাহাদিগকে যুদ্ধে বিজিত রোমক ক্রীতদাসদিগের মত কায করাইতে বাধ্য করিতে পারেন। তাঁহারা কুলীদিগের উপর সর্ব্বদা নজর রাখিয়া থাকেন এবং যাহাতে বাহিরের লোক তাহাদের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিতে না পারে, তাহারও ব্যবস্থা এই তিন ধারায় আছে। চা-করদিগের এমন বন্দোবস্ত আছে, যাহার দ্বারা কুলী-দিগের ভাগ্যের উপর তাঁহাদের পূর্ণ কর্তৃত্ব করিবার ক্ষমতা থাকে। কুলীদের তেমন organisation নাই, তাহারা অতীব দুর্ব্বল। তাহাদের দৈনন্দিন জীবন চা-কররা এমন বাঁধাধরা আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন যে, বাগিচায় "গরুবাছুরের" মত তাহাদিগকে থাকিতে হয়। কুলীরা চা-বাগিচার চৌহদ্দীর মধ্যে কূপবদ্ধ মণ্ডুকের মত অবস্থান করে, বহির্জগতের কোন খবর তাহাদিগকে জানিতে দেওয়া হয় না। সুতরাং তাহারা যে কোন কালে জ্ঞান বা সভ্যতার আলোক প্রাপ্ত হইবে, তাহার কোন সম্ভাবনা থাকে না। এক কথায়, য়ুরোপের মধ্যযুগে যে feudal system প্রচলিত ছিল, এখন চা-বাগিচায় সেই প্রথাই প্রচলিত; চা-কররা যেন মধ্যযুগের Barons বা জমীদার, আর কুলীরা তাঁহাদের Serfs বা ক্রীতদাস।

কুলীরা প্রায়শঃ মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার ও উড়িষ্যা এবং যুক্তপ্রদেশ হইতে আমদানী হয়। সুতরাং একবার চা-বাগিচায় পদার্পণ করিলে আর তাহাদের মুক্তির কোন উপায় থাকে না। চুক্তি যত অল্পকালের জন্যই করা হউক না, সে চুক্তির মেয়াদ বাড়াইয়া লইতে বিলম্ব হয় না। কুলী চা-বাগিচায় পদার্পণ করিবার পর যখন নিজের নীরস দুঃখময় জীবনের বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে থাকে, তখন সে বাগিচা হইতে ঘরে ফিরিয়া যাইতে ব্যাকুল হয়; অথচ বাগিচা 'যক্ষি-বুড়ীর' মত তাহাকে এমন আঁকড়াইয়া ধরে যে, তাহার নিস্তারের কোনও উপায় হয় না। ইহার কারণ এই যে, সে তাহার সামান্য বেতন হইতে এমন কিছু উদ্বৃত্ত করিতে পারে না, যাহাতে সে ঘরে ফিরিবার রেলভাড়া দিতে সমর্থ হয়।

এমন অবস্থায় কুলী যে ক্রীতদাসে পরিণত হইবে, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি আছে? এ অবস্থা হইতে মুক্ত হইবারই বা তাহার কি উপায় আছে? সে যে আত্মবিশ্বাসী হইবে, আত্মনির্ভরশীল হইবে, এমন শিক্ষাদীক্ষাও তাহার নাই। আসাম চা-বাগিচাগুলিতে ন্যূনাধিক ১০ লক্ষ কুলী আছে, উহাদের মধ্যে মাত্র ৫ হাজার কুলী সামান্য লিখাপড়া জানে। ইহার কারণ এই যে, চা-কররা তাঁহাদের বাগিচায় প্রাথমিক শিক্ষার বিদ্যালয় অতি অল্পই প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। বোধ হয়, চা-কররা মনে করেন, কুলীরা শিক্ষালাভ করিলে তাহাদের 'চোখ ফুটিবে' ও তাহাতে তাঁহাদের স্বার্থহানি হইবে!

এ দিকে সরকার এ বিষয়ে একরূপ উদাসীন। তাঁহারা বোধ হয় ভাবেন, ১০ লক্ষ লোকের যেখানে অন্নসংস্থান হইতেছে, সেখানে কোনওরূপ উন্নতির প্রয়োজন থাকিতে পারে না। কিন্তু এই উদরান্নসংস্থান কিরূপে হইতেছে, সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করাও যে সরকারের কর্ত্তব্য, তাহা কি আবার বলিয়া দিতে হইবে? আমাদের ব্যবস্থাপক সভাসমূহও এ বিষয়ে পূর্ণ অনভিজ্ঞ। অতি অল্প সদস্যই, বোধ হয়, আসামের কালা জঙ্গলের চা-বাগিচার ও তাহার নগণ্য কুলীর খবর রাখিবার প্রয়োজন অনুভব করেন। আসাম সরকার একটি বড় চা-বাগিচার ম্যানেজারকে শ্রমিক-গণের প্রতিনিধিরূপে তাঁহাদের ব্যবস্থাপক সভায় মনোনীত করিয়াছেন। এই ব্যবস্থা অতীব সমীচীন, কেন না, ব্যাঘ্রকে মেষপালের রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত করাও যেরূপ, ইহাও তদ্রূপ!

এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া মিঃ যোশী প্রতীকারের কয়েকটি প্রস্তাব উত্থাপিত করিয়াছেন। তিনি বলেন, কুলীদের চুক্তিসম্পর্কিত বে-আইনী আইন রদ করা আশু কর্ত্তব্য। সঙ্গে সঙ্গে কুলীদের অবস্থার উন্নতি-সাধন এবং তাহাদের কাযের সুব্যবস্থা করাও উচিত। আর এক প্রতীকারের কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যাহাতে ভবিষ্যতে চা-কররা ব্যক্তিগতভাবে কুলী সংগ্রহ করিতে না পারে, তাহার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। কুলী সংগ্রহের ভার এখন হইতে সরকারকে স্বয়ং

লইতে হইবে; সেই সংগ্রহব্যাপারে সকল তথ্য জানিবার অধিকার ব্যবস্থাপক সভাকে প্রদান করিতে হইবে। যাহাতে কুলীরা ইচ্ছামত ন্যায়সঙ্গত কারণে ঘরে ফিরিয়া যাইতে পারে, তাহারও ব্যবস্থা করিতে হইবে। যখন সে প্রথম চুক্তিবদ্ধ হয়, তখনই তাহাকে রেলে বাড়ী ফিরিয়া যাইবার জন্য একখানা পাশ দেওয়া যুক্তিসঙ্গত। ন্যায়সঙ্গত কারণ দেখাইতে পারিলে কুলী সেই পাশ গৃহপ্রত্যাগমনের সময়ে ব্যবহার করিতে পারিবে, এইরূপ ব্যবস্থা করা উচিত।

যদি আপত্তি উঠে, কুলীদের শিক্ষা-দীক্ষা, কুলীদের স্বাস্থ্য, কুলীদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য সুব্যবস্থিত করিবার খরচা দিবে কে? তাহা হইলে তাহার উত্তরে এক কথায় বলা যাইতে পারে,—খরচা যোগাইবে তাহারা—যাহারা কুলীর শ্রমে শতকরা শত টাকা প্রতি বৎসরে লাভ করিতেছে। সরকার কেবল মুখে এ দেশের মূক জনসাধারণের 'মা-বাপ' সাজিলে চলিবে না, যদি যথার্থই সরকার সে দাবী করিতে চাহেন, তবে তাঁহাদিগকে চা-বাগিচার এই সমস্ত উন্নতিবিধানে আইন প্রণয়ন করিয়া বাগিচার কর্ত্তৃপক্ষদিগকে বাধ্য করিতে হইবে। কুলীসংগ্রহের ব্যবস্থার ভার সরকারকে লইতে হইবে বটে, তবে উহার বাবদে যে খরচা (সরঞ্জামী ও অন্যান্য) হইবে, তাহাও চা-করদিগের নিকট আদায় করিয়া লইতে হইবে। ফল কথা, লাভের গণ্ডা ষোল আনা আদায় করিব, অথচ লাভের মূলের খোরাক যোগাইব না—বামুনের গোরুর মত 'নিখাগী' অথচ কামধেনু করিয়া চা-বাগিচা চালাইব,—এ সঙ্কল্প হইতে চা-করদিগকে বিচ্যুত করিতে হইবে। সে একচেটিয়া অধিকার-ভোগের কাল আর নাই, ভারতে নবজাগরণ হইয়াছে, এ কথা চা-করদিগকে অনুক্ষণ স্মরণ রাখিতে হইবে।

আরও একটা বক্তব্য আছে। যে দেশ হইতে কুলী সংগ্রহ করা হইবে, সেই দেশের ব্যবস্থাপক সভার সদস্যদিগের মধ্যে একটি কমিটী গঠিত করিতে হইবে। এই কমিটী কুলীসংগ্রহ ব্যাপার কি ভাবে অনুষ্ঠিত হইতেছে, সর্ব্বদা সে বিষয়ে নজর রাখিবেন। পরন্তু কমিটী তাঁহাদের সুযোগ, সুবিধা বা অবসরমত চা-বাগিচায় গিয়া কুলীদিগের অবস্থা মাঝে মাঝে প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়া দেশের লোককে ঘোষণা দ্বারা জানাইবেন। বলা বাহুল্য, তাঁহাদের যাবতীয় ব্যয়ভার চা-বাগিচার কর্ত্তৃপক্ষদিগকে যোগাইতে হইবে। আমাদের বিশ্বাস, চা-কর্ত্তৃপক্ষ যদি বুঝেন যে, তাঁহাদের কাযের উপর নজর রাখিবার ক্ষমতাবান্ লোক আছেন, তাহা হইলে অন্ততঃ লোক-লজ্জার ভয়েও তাঁহারা চা-বাগিচার কুলীর দুরবস্থা ঘুচাইতে পথ পাইবেন না। কেন না, এখনকার গণতন্ত্রের যুগে লোকমতের তুল্য প্রবল শক্তি-শালী নিয়ামক আর কেহই নাই।

ভারতের বাহিরে ভারতবাসী

ভারতের বাহিরে কোথায় কত ভারতবাসী আছেন, তাহার হিসাব জানিতে অনেকে ইচ্ছা করেন। বিগত শীতকালে ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় এই সম্বন্ধে একটা হিসাব প্রদত্ত হইয়াছিল। পাঠকদিগের অবগতির জন্য সেই হিসাবটি নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

দেশের নাম	ভারতীয় অধিবাসীর সংখ্যা।
কানাডা	১ হাজার ২ শত
অষ্ট্রেলিয়া	২ হাজার
নিউজিলাণ্ড	৬ শত ৬
দক্ষিণ-আফ্রিকা	১ লক্ষ ৬১ হাজার ৩ শত ৩৯
ষ্টেট সেটেলমেণ্ট	১ লক্ষ ৪ হাজার ৬ শত ২৮
ফেডেরেটেড মালয় ষ্টেট	৩ লক্ষ ৫ হাজার ২ শত ১৯
বৃটিশ মালয়	৬১ হাজার ৮ শত ১৯
সিংহল	৭ লক্ষ ৫০ হাজার
মরিসস	২ লক্ষ ৬৪ হাজার ৫ শত ২৭
কেনিয়া	২২ হাজার ৮ শত ২২
ত্রিনিদাদ	১ লক্ষ ২১ হাজার ৪ শত ২০
বৃটিশ গায়না	১ লক্ষ ২৪ হাজার ২ শত ৩৮
ফিজি	৬০ হাজার ৬ শত ৩৪
জ্যামেকা	১৮ হাজার ৪ শত ১
আমেরিকা	৩ হাজার ১ শত ৭৫
মোট	২০ লক্ষ ২ হাজার ৭ শত ২৮

"ছেলে ধরার" হুজুগ

সংপ্রতি কলিকাতায় একটা ছেলে ধরার হুজুগ উঠিয়াছিল। এইরূপ হুজুগ যে ইতঃপূর্ব্বে উঠে নাই, এমন নহে। এ দেশে বড় বড় সেতু নির্ম্মাণাদির সময় জনরব রটে, নরবলি দিতে হইবে—এবার জনরব ছিল, খিদিরপুরে যে নূতন পোতাশ্রয় বা ডক নির্ম্মিত হইতেছে, তাহারই জন্ত নরবলি দিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে রটে, কলিকাতার শিখ ট্যাক্সিচালকরা ছেলে ধরিয়া লইয়া যাইতেছে। এই হুজুগ তুলিয়া কলিকাতার গুণ্ডা শ্রেণীর অনেক লোক যেখানে সেখানে ট্যাক্সিগাড়ী ভাঙ্গিয়া দেয় ও শিখ চালকদিগকে প্রহার করে। ব্যাপারটা এতদূর বিস্তৃতি লাভ করে যে, কয় জন শিখ স্ত্রী-পুরুষ হতাহত হয় এবং কয় দিনের জন্ত তাহারা ট্যাক্সিচালান বন্ধ রাখিতে বাধ্য হয়।



নিহত শিখ ট্যাক্সিচালকদিগের বাড়ী

কয় দিনেই অবশ্য হুজুগের অবসান হইয়াছিল। কিন্তু ইহার মধ্যে একটা বিষয় বিশেষভাবে ভাবিয়া দেখা প্রয়োজন। এমন সব হাঙ্গামা হয় কেন? যাহারা অনাচার অত্যাচার করিয়াছিল, তাহাদের কাহার ছেলে কেহ ধরিয়া লইয়া যায় নাই, পরন্তু তাহারা কেবল অনাচারের আনন্দেই মত্ত হইয়াছিল। এই সব হাঙ্গামার মধ্যে বাঙ্গালী বড় দেখা যায় না। দেখা যায়, "পরদেশী" নিম্ন শ্রেণীর লোক। ইহারা যে যখন তখন হাঙ্গামা করে—কথায় কথায় ছোরা বাহির করে, এ সাহস ইহাদের হইল কেমন করিয়া? "বুক বলিয়াছে কার সোহাগে?" আমরা দেখিতে পাই, রাস্তায় ইহারা ফুটপাথ দখল করিয়া পণ্য বিক্রয় করে; অথচ সে জন্ত কেহ তাহাদিগকে দণ্ড দেয় না; হয় ত বা বীটের পাহারাওয়ালা পার্ব্বণী লইয়াই চলিয়া যায়। গোয়ালা ফুটপাথে গরু বাঁধে, সরবতওয়ালা রাস্তায় জল ফেলে, ফলবিক্রেতা পথে বসিয়া ফল বেচে; কোচম্যান নির্দ্দিষ্ট ভাড়া পাইলেও অধিক পাইবার দাবি করে ও সে জন্ত যাত্রীদিগকে বিরক্ত করে। এ সব ব্যাপারের প্রতীকার করা আইনের পক্ষে অসাধ্যসাধন নহে; কিন্তু আইন কেহ আমলে আনে না, পুলিসও নহে—কর্পোরেশনও নহে, আবার পুলিসে "পরদেশীর" সংখ্যাই অধিক—বোধ হয়, শতকরা ৯০ জনই "পরদেশী", পরদেশীদের সঙ্গে ইহাদের সহানুভূতি স্বাভাবিক। উপরওয়ালারা কিছু দেখিয়াও দেখেন না। এই সব ব্যাপারে দিনে দিনে অশিক্ষিত গুণ্ডা শ্রেণীর লোকের অনাচারপ্রবণতা বাড়িয়া যায় এবং তাহারা একটু সুযোগ পাইলেই লাঠি লইয়া বাহির হয়। কলিকাতার গলিতে গলিতে যে গুণ্ডামী হয়, তাহার নায়ক কাহারা? কলিকাতার পুলিস একটা হিসাব দিলে দেখা যায়, কলিকাতা সহরে যে সব অপরাধ অনুষ্ঠিত হয়, সে সকলের কতগুলি বাঙ্গালীদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়, আর কতগুলিই বা "পরদেশীদিগের" কায। এই সকল "পরদেশীর' প্রতি পুলিস কিরূপ লক্ষ্য রাখে? সকল দেশেই এই নিম্নশ্রেণীর মধ্যে অনাচারপ্রবণতা দেখা যায়—তাহারা সামান্ত ব্যাপারে উত্তেজিত হইয়া উঠে ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা করে। কিন্তু তাহাদিগকে দমন করিবার জন্ত যে আয়োজন করিয়া রাখা পুলিসের কর্ত্তব্য, তাহা করা হয় কি? কলিকাতায় কি এমনও শুনিতে পাওয়া যায় নাই যে, পুলিসের লোক চুরী করায় ধরা পড়িয়াছে, পুলিস বিশেষ অনাচার অত্যাচারের অনুষ্ঠান করিয়াছে? শ্যামপুকুর থানায়



প্রহরিবেষ্টিত ট্যাক্সি

একটা কনষ্টেবল এক জন নিরপরাধ লোককে প্রহারে পাতিত করিয়া তাহার পেটের উপর নৃত্য করিয়া তাহাকে থানায় টানিয়া লইয়া গিয়াছিল; তাহার সঙ্গীরা তাহাকে নিবারণ না করিয়া তাহার সাহায্যই করিয়াছিল। এই গত শীতকালে ইডন্ গার্ডেনে যে প্রদর্শনী হয়, তাহাতে এক জন লোকের শাল প্রভৃতি কেহ কাড়িয়া লইয়াছিল এবং অপহৃত দ্রব্য এক জন কনষ্টেবলের বোঁচকায় পাওয়া গিয়াছিল। যতদূর মনে হয়, উভয় ক্ষেত্রেই কনষ্টেবল—বাঙ্গালী নহে—"পরদেশী"।

কলিকাতায় পুলিসের শাসন যে শিথিল, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। পুলিস জাতিনির্ব্বিশেষে কর্ত্তব্যপালনপর না হইলে সহরের লোকের ধন-প্রাণ নিরাপদ হইবে না। যে সব স্থানে কলকারখানায় এইরূপ বহু "পরদেশী" থাকে, সে সব স্থানের সম্বন্ধেও ঠিক এইরূপ বলা যায়।

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটী

গত মাসে ভারতে সর্ব্বপ্রধান ঘটনা আমেদাবাদে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর অধিবেশন। মহাত্মা গন্ধী কারাবদ্ধ হইবার পর তাঁহার ব্যবস্থাপক সভাবর্জ্জন প্রস্তাব স্বরাজ্যদল কর্ত্তৃক ক্ষুণ্ণ হয়। মহাত্মা গন্ধীর কারামুক্তির পর এই অধিবেশনে তিনি যোগদান করেন।

অধিবেশনে তিনি নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি উপস্থাপিত করিবেন বলিয়া জানাইয়াছিলেন :—

১। চরকা ও হাতে কাটা সূতার খদ্দর স্বরাজ প্রতিষ্ঠার পক্ষে অত্যাবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। কংগ্রেস ইহাও নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে, এই দুইটি আইন অমান্য করিবার সূচনার পক্ষে প্রয়োজনীয়। ইহা সত্ত্বেও সমগ্র দেশের কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানসমূহের সভ্যগণ এ যাবৎ হাতে সূতা কাটা অবহেলা করিয়া আসিয়াছেন। এই জন্য নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটী এই প্রস্তাব গ্রহণ করিতেছেন যে, যাবতীয় প্রতিনিধিমূলক কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানসমূহের সভ্যগণ পীড়ায় অশক্ত হইয়া না পড়িলে অথবা অনবরত ভ্রমণ হেতু অসম্ভব না হইলে প্রত্যহ অন্ততঃ আধ ঘণ্টা সূতা কাটিবেন। এই সূতা প্রতি মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে নিখিল ভারত খাদিবোর্ডের সম্পাদকের নিকট পৌছান প্রয়োজন। উহা ভাল পাকবিশিষ্ট ও সমরেখ হওয়া দরকার। প্রথম বারের সূতা ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট তারিখের মধ্যে সম্পাদকের নিকট পৌছিবে; এবং ইহার পরে নিয়মিত মাসিক কিস্তিতে প্রতি মাসের



পুলিস কমিশনারের আফিসের সম্মুখে সমবেত ট্যাক্সি

১৫ইর মধ্যে পৌঁছিবে। যদি কোন সভ্য নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ সূতা দিতে না পারেন, তাহা হইলে তিনি পদত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইবে, এবং চলিত নিয়মানুযায়ী তাঁহার শূন্য স্থান পরিপূর্ণ করিয়া লওয়া হইবে। যিনি এইরূপে পদত্যাগ করিবেন, পরবর্ত্তী সাধারণ অধিবেশনের পূর্ব্বে তিনি পুনর্নির্ব্বাচনপ্রার্থী হইতে পারিবেন না।

২। প্রাদেশিক কমিটীর সেক্রেটারী এবং কংগ্রেস কমিটী সমূহের সভ্যগণ উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ম্মচারিগণ সময়ে সময়ে উঁহাদের নিকট যে সকল উপদেশ প্রেরণ করেন, তদনুযায়ী কায করেন না, এইরূপ অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে। অতএব নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটী এই প্রস্তাব গ্রহণ করিতেছেন যে, উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ম্মচারিগণের কোন বিশেষবিষয়ক নির্দ্দেশসমূহ সেই বিষয়ের ভার যাঁহাদের হাতে, তাঁহারা যদি কার্য্যে পরিণত করিতে অবহেলা করেন, তাহা হইলে মনে করা হইবে,উঁহারা নিজ নিজ পদত্যাগ করিয়াছেন ও প্রচলিত নিয়মানুযায়ী শূন্য স্থান পূর্ণ করা হইবে। যে সভ্য এইরূপে পদত্যাগ করিবেন, তিনি পরবর্ত্তী সাধারণ নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে পুনরায় নির্ব্বাচনপ্রার্থী হইতে পারিবেন না।

৩। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটী মনে করেন, যাঁহারা কংগ্রেসের মূলনীতি, অসহযোগসম্বন্ধীয় বিবিধ প্রস্তাব, ও কলের কাপড়, সরকারী আইন আদালত, বিদ্যালয়, উপাধি, এবং আইনসভা বর্জ্জন, এই পঞ্চবিধ বর্জ্জন স্বয়ং সম্পূর্ণভাবে প্রতিপালন করেন, কংগ্রেসের নির্ব্বাচকমণ্ডলী কেবল তাঁহাদিগকেই কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানসমূহের বিভিন্ন পদে নিয়োগ করুন। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটী সঙ্গে সঙ্গে এই প্রস্তাবও গ্রহণ করিতেছেন যে, যাঁহারা এই পঞ্চবিধ বর্জ্জনে আস্থাবান্ নহেন এবং স্বয়ং এই সকল বর্জ্জনের অনুষ্ঠান করেন না, তাঁহারা পদত্যাগ করিবেন, এবং ঐ সকল পদের জন্য পুনর্নির্ব্বাচন হইবে। যে সকল সভ্য পদত্যাগ করিবেন, তাঁহারা যদি ইচ্ছা করেন, তবে পুনর্ব্বার নির্ব্বাচনপ্রার্থী হইতে পারেন।

৪। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটী পরলোকগত গোপীনাথ সাহা কর্ত্তৃক পরলোকগত মিষ্টার ডের হত্যাকাণ্ডের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন এবং মৃত ব্যক্তির পরিবারবর্গের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছেন। যে স্বদেশ-প্রেম গোপীনাথকে এই হত্যাকাণ্ডে প্রযুক্ত করিয়াছিল,উহা যতই বিপথে পরিচালিত হউক না কেন, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটী উহা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতেছেন; কিন্তু তাহা হইলেও কমিটী এইরূপ রাজনীতিক হত্যাকাণ্ড অত্যন্ত নিন্দনীয় মনে করেন এবং উঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, এইরূপ ব্যাপার কংগ্রেসের মূলনীতি ও অহিংস অসহযোগ সম্বন্ধীয় প্রস্তাবের বিরোধী। কমিটীর মতে এইরূপ কায স্বরাজলাভের অন্তরায় এবং আইন অমান্যকরণের জন্য প্রস্তুত হইবার পথে বিঘ্নস্বরূপ। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর মতে আইন অমান্যকরণ সর্ব্বাপেক্ষা নির্দ্দোষভাবে আত্মোৎসর্গের অবসর দেয়, কিন্তু এই আত্মোৎসর্গ সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ পারিপার্শ্বিকের মধ্যেই সম্ভবপর।

এই সকল প্রস্তাবে স্বরাজ্যদলের আপত্তি ছিল। তাই কেহ কেহ আশা করিয়াছিলেন, এইবার দলাদলিতে কংগ্রেস ভাঙ্গিয়া যাইবে। কার্য্যকালে কিন্তু তাহা হয় নাই।

মহাত্মা গন্ধী তাঁহার প্রথম প্রস্তাব উপস্থাপিত করিবার পর স্বরাজ্যদল সভাস্থল ত্যাগ করেন। মহাত্মা গন্ধী তখন জয়ী হইয়াও বলেন, স্বরাজ্যদল সভাস্থল ত্যাগ না করিলে যখন এরূপ জয় হইত না, তখন তিনি প্রস্তাবের দণ্ডাত্মক শেষাংশ ত্যাগ করিলেন।

ইহার পর মহাত্মা গন্ধী তাঁহার দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রস্তাব নিম্নলিখিতরূপে পরিবর্ত্তিত করেন,—

"যে হেতু নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটী জানিতে পারিয়াছেন যে, কংগ্রেসের উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীরা যে সকল আদেশ করেন, সে সব অনেক সময় পালিত হয় না, সেই জন্য স্থির হইল যে, প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীগুলির কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতিসমূহ এ বিষয়ে শাসনাত্মক উপায়ও অবলম্বন করিতে পারিবেন এবং লোককে পদচ্যুত করিতেও পারিবেন। যদি প্রাদেশিক সমিতিরই ত্রুটি হয়, তবে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি পূর্ব্বোক্তরূপ ক্ষমতা পরিচালন করিতে পারিবেন।

"নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটী এ বিষয়ে কংগ্রেসের ভোটারদিগের মনোযোগ আকৃষ্ট করিতেছেন যে, কলের কাপড়, সরকারী আদালত ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, উপাধি ও ব্যবস্থাপক সভা বর্জ্জন কোকনদে কংগ্রেসের অধিবেশনে যে ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা ব্যতীত পূর্ব্ববৎ বলবৎ আছে এবং যাঁহারা কোকনদে গৃহীত পরিবর্ত্তন ব্যতীত অন্যরূপে অক্ষুণ্ণ ঐ পঞ্চবিধ বর্জ্জন আপনারা পালন না করেন, তাঁহাদিগকে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠানে নির্ব্বাচিত করা না হয়। কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠানে যাঁহারা এরূপ বর্জ্জনাদেশ পালন করেন না, তাঁহারা যেন পদত্যাগ করেন।"

সকল দল এই ব্যবস্থায় সম্মত হইয়া আসিয়াছেন। আমরা আশা করি, অতঃপর উভয় দল একযোগে গঠন-কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া স্বরাজের পথ সুগম করিবেন।

—

অধ্যাপক সরোজকান্ত মিত্র

সন ১২৯৮ সালে ঢাকা জিলায় শ্যামসিদ্ধি গ্রামের মিত্র-পরিবারে অধ্যাপক সরোজকান্ত জন্মগ্রহণ করিয়া ঢাকা কলেজ হইতে ইতিহাসে অনার্সে বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতায় অধ্যয়ন করিতে আইসেন এবং পরে কেম্‌ব্রিজে যাইয়া ৩ বৎসরে ইতিহাস, অর্থনীতি ও আইন—৩টি বিষয়ে পরীক্ষায় সম্মান সহকারে উত্তীর্ণ হয়েন।



অধ্যাপক সরোজকান্ত মিত্র

দেশে ফিরিয়া তিনি সিটি কলেজে অধ্যাপনা ও কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী করেন। বাত-ব্যাধিতে পীড়িত হইয়া তিনি কলিকাতা ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়েন এবং বেরিলী কলেজে গমন করেন।

তিনি সুধী ও সদ্‌গুণসম্পন্ন ছিলেন। সংপ্রতি তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

চশমা-চটক





পাঁসনে

টিকির সঙ্গে পাঁসনে

কেমন ?

মলের উপর চুটকি

যেমন !

করতলগত

পড় বাবা আত্মারাম

চশমা হাতে মনসারাম।





ভাজকরা চশমা

চোখে ঠুলি

ছাগল দাড়ী

চোরা গোপ্তায়

লম্বা পাড়ি।

ভাটপাড়া

ভাটপাড়ার এ ট্রেডমার্কা

লম্বা সুঁতোর গেরো দান

শাস্তর তন্তোর মিথ্যে,

সওয়ায় টিকি, চশমা,

বর্তমান।





পরী (FAIRY)

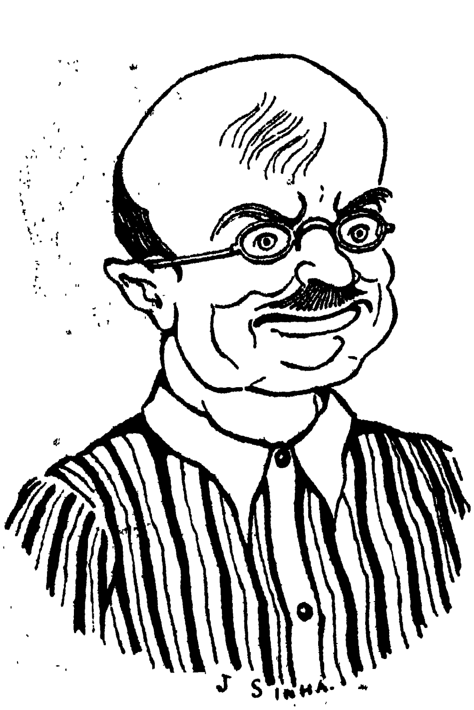
নাকের ডাঁটিয়
চশমাখানি
কবির যেন
কাব্যি-রাণী।

✵

বগলশ গুগ্‌লু

ডোরা কাটা
বগলস দেওয়া
সেবন যেন
কাব্যির হাওয়া।

✵



সাদাসিধে

চশমার চাউনি জুল জুল
পড়ুয়ার পক্ষে যমের ভুল।



বগলশ ঝুলি

জাফরীর ফাঁকে চাউনি বাঁকে
চাদের ঘাটে কলসী কাঁকে।



ঠুলি

চোখে ঠুলি ভুরু তুলি
যেন ঘানি টানে
গরুর চোখে দুনিয়া দেখে
তাতেই গরব প্রাণে।



দূরবীণ চশমা

ঘরের কোণে মা বোন মরে,
কেটে স্নেহের ডোর
দুরবীণ চশমা চোখে প্রেমিক
বিশ্বপ্রেমে ভোর।



কাজরী চশমা

চক্ষু বোজা চক্ষু মেলা
দুই-ই সমান
উপাসনার ভারী মজা
করতে হয় না ভাণ।



বন্ধনমুক্ত

ভাবটা যেন উড়ু উড়ু
ডানা নাড়ে নাড়ে;
সংসার-শিকলে বাঁধা
আছে বসে দাঁড়ে।

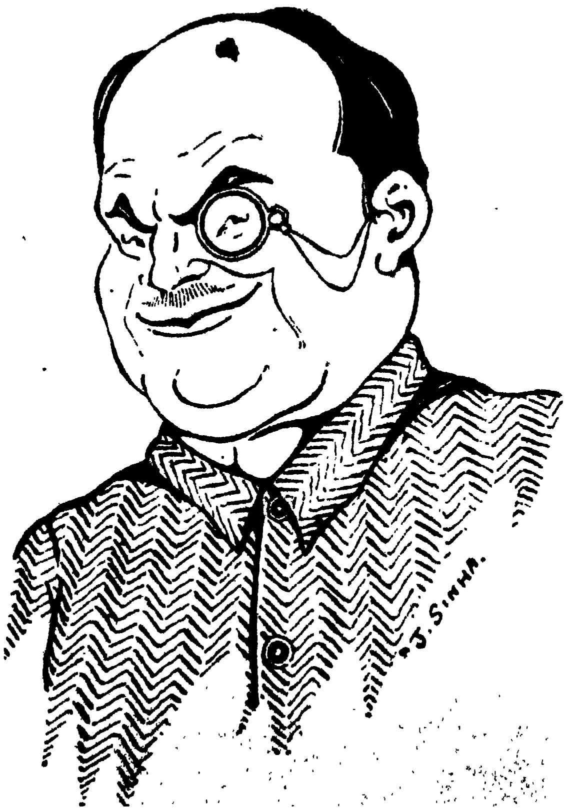


অখণ্ড মণ্ডলাকার

অখণ্ড মণ্ডলাকার
গেরাম ভারী গুরু সাকার

এক-চোখো

বিধুমুখে মুচকি হাসি
এই চাওনি-ই গলায় ফাঁসী



[শিল্পী—শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র সিংহ।



১লা বৈশাখ—

সুবিখ্যাত দস্যু বাবর দেব ও ধবলজী ভাইএর প্রাণদণ্ডের আদেশ, তাঁহাদের হাসি মুখে দণ্ড গ্রহণ। যশোহর প্রতাপকাটি গ্রামে ২ জন হিন্দু মহিলা-হরণে ৩টি মুসলমানের সশ্রম কারাদণ্ড। বাঙ্গালা সরকার কর্ত্তৃক ব্যবস্থাপক সভার নির্দ্ধারণ নাকচ। রাত্রিতে আলো না জ্বালাইয়া মোটর চালাইবার জন্য কলিকাতায় সহকারী পুলিস কমিশনার মিঃ এন্. এন্. সেনের দণ্ড। গ্রীসে সামরিক আইন জারি। বিলাতে গোপন-সভায় ভারত সম্বন্ধে আলোচনা।

২রা বৈশাখ—

আলিপুর ষড়্‌যন্ত্র মামলার রায়ে জুরীরা একমত—আসামীরা নির্দ্দোষ। ১ নং রাজাবাগান ষ্ট্রীটের সুশান্তকুমার সিংহের পদব্রজে পেশোয়ার যাত্রা। মেদিনীপুর জিলার কেশবপুরে ১২ বৎসর বয়স্ক জমীদার-পুত্রের পিতার রক্ষার্থে প্রাণদান। এলাহাবাদে মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের চুঙ্গি (octroi) কমিটির কার্য্যের প্রতিবাদে সত্যাগ্রহ। কলিকাতায় 'ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজ' নামক সংবাদপত্রখানির সম্পত্তি বিক্রয়। মীরাট, হাপুরে হিন্দু-মুসলমানে ভীষণ দাঙ্গা। প্যারিসে বিদেশী যাত্রীর উপর কর আদায়। বিলাতে কমন্স সভায় ভারত-প্রসঙ্গে ভাইকাউণ্ট কার্জ্জনের স্পষ্ট কথা—দ্বিধা বিভক্ত শাসনের নিন্দা।

৩রা বৈশাখ—

শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন দাশ কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রথম মেয়র ও শ্রীযুত সাহিদ সুরাওয়ার্দ্দী প্রথম ডেপুটী মেয়র নির্ব্বাচিত। বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ স্যার বিজয়চাঁদ মহতাবের বাঙ্গালার শাসন-পরিষদের সদস্যপদ ত্যাগ। আগ্রার বিখ্যাত দস্যুসর্দ্দার রাজকের সহকারী আবদুল করিম গ্রেপ্তার। রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীটে কুলপী বরফ খাইয়া নোনা পাগলার মৃত্যু। ৭৫ বৎসরের বৃদ্ধের ভাইকম সত্যাগ্রহে যোগদান। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ বসুর নির্ব্বাচন নাকচের জন্য ডাক্তার শশিকুমার সেনগুপ্তের আবেদন অগ্রাহ্য। মেজর মার্টিনের নেতৃত্বে মার্কিণ ব্যোমযাত্রিদলের পৃথিবী পরিভ্রমণে যাত্রা। ডেরা ইস্মাইলখানে ডাকাতের ভীষণ অত্যাচার—১৮ জন লোক উধাও।

৪ঠা বৈশাখ—

পুনা রাস্তবেদা জেলে মৌলানা হজরত মোহানীর প্রায়োপবেশন ব্রত অবলম্বন। শ্রীযুত ভূপেন্দ্রনাথ বসুর বাঙ্গালার শাসন-পরিষদের সদস্যপদ গ্রহণ। আলিপুর ষড়্‌যন্ত্র মামলার রায়—সকল আসামীর মুক্তি। পরে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ৩ আইনে ৩ জন আসামী—সন্তোষকুমার মিত্র, অরোক্রকুমার লাহিড়ী, ধীরেন্দ্রনাথ রায়চৌ ও নরেন্দ্রনাথ সরকার—পুনরায় গ্রেপ্তার। তাঁহাদিগকে মুক্ত করিবার জন্য হাইকোর্টে শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের বিফল চেষ্টা। ১৬ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের মামলায় হিমালয় এসিওরেন্স কোম্পানীর অব্যাহতি। কয়লার খনি লইয়া কাশিমবাজারের মহারাজার সহিত লো কোম্পানীর মামলায় রিসিভার নিয়োগের আদেশ নাকচ। মান্দ্রাজের ভূতপূর্ব্ব এডভোকেট জেনারেল শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারের ভাইকম সত্যাগ্রহ পরিদর্শনে গমন। বৈমানিক ম্যাকলারেণের এদেশে গমন।

৫ই বৈশাখ—

রঙ্গপুর কড়িগ্রামে সভায় গভর্ণরের কার্য্যের নিন্দা। বোম্বাই সরকার কর্ত্তৃক মিউনিসিপ্যালিটী সমূহকে জাতীয় বিদ্যালয়ে অর্থ সাহায্যের অনুমতি দান। যুক্তপ্রদেশে চতুর্থ বার্ষিক লিবারেল কনফারেন্স। হ্যারিসন রোডে য়ুরোপীয়কে গুলী মারা সম্পর্কে কলিকাতার নানা স্থানে খানাতল্লাস—এক জন যুবক গ্রেপ্তার। ব্রহ্মদেশের সীমান্তে চীনা-বিদ্রোহিদল কর্ত্তৃক ৩ শত গ্রাম ধ্বংস। তারকেশ্বর ত্যাগ করিয়া মোহান্তের কলিকাতা আগমন। ফতেগড় জেলে পার্ব্বতী দেবীর সহিত তাঁহার ভ্রাতার সাক্ষাতে বাধা। জাপানের ব্যবসার বাজারে মন্দা। খুলনায় বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজের চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশনে উপবীত গ্রহণের প্রস্তাব গৃহীত। নাভার চতুর্থ সাহিদী জাঠ গ্রেপ্তার। মধ্যপ্রদেশে চারী সত্যাগ্রহের নেতা মৌলানা আবদুল মজিদ খাঁ আজাদের ৩৮০ দিন অন্ন ত্যাগের পর অন্ন গ্রহণ—ঐ সময় তিনি ফলমূল ও দুধ খাইয়া কাটাইয়াছেন। সিটি কলেজের ছাত্র অন্নদামোহন দত্তের পদব্রজে হরিদ্বার যাত্রা।

৬ই বৈশাখ—

কলিকাতা শোভাবাজারে বলদেব ঠাকুরের আখড়া হইতে অনাচারী মোহান্তের বহিষ্কার, সাধারণের কমিটী কর্ত্তৃক মন্দিরের কার্য্যভার গ্রহণ। তারকেশ্বরে মহাবীর দল কর্ত্তৃক পূজা প্রভৃতির ভার গ্রহণ, মোহান্তের অনুচরবর্গ কর্ত্তৃক কারা-প্রথম। ভাটপাড়ায় ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলনের সপ্তম বার্ষিক অধিবেশন, সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় যাদবচরণ ন্যায়াচার্য্য। রাজা রামমোহন রায়ের জন্মভূমি খানাকুল কৃষ্ণনগরে (জেলা হুগলী) বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের পঞ্চদশ বার্ষিক অধিবেশন। মেদিনীপুরে জিলা বোর্ডে লাট-অভ্যর্থনায় আপত্তিতে বিপদ, চেয়ারম্যান শাসনদলের প্রতি অনাস্থা। মাদারীপুরে শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর সভাপতিত্বে বঙ্গীয় শিক্ষক সম্মিলনীর অধিবেশন। বিলাতে কবি বায়রণের মৃত্যুর শত বার্ষিক স্মৃতি উৎসব। মিশরে বৃটিশ সৈনিক খুন। বিলাতে প্রধান মন্ত্রীর কথা—ভারতকে ঔপনিবেশিক মর্য্যাদা প্রদান করাই ব্রিটিশ সরকারের অভিপ্রায় ও আদর্শ।

৭ই বৈশাখ—

ভাটপাড়া ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলনের বিচার-সভায় পণ্ডিতে পণ্ডিতে হাতাহাতি। যুক্তপ্রদেশে মিসেস্ জাওলা প্রসাদের সন্তানেত্রীত্বে সামাজিক সম্মিলন। মীরাট হাপুরে হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা সম্পর্কে বহু লোক গ্রেপ্তার। মাদ্রাজে নিখিল ভারত ডাক বিভাগের কর্ম্মচারিবৃন্দের প্রথম বার্ষিক সম্মিলন। তারকেশ্বরে হিন্দুসভা তদন্ত কমিটী কর্ত্তৃক অনাচার সম্বন্ধে তদন্ত। বৈমানিক ম্যাকলারেণের বোগদাদে গমন।

৮ই বৈশাখ—

তারকেশ্বরে তরবারি মামলা সম্পর্কে মোহান্তের ৩ জন দরোয়ান গ্রেপ্তার। নানকানা সাহেবে মোহান্ত খুন সম্পর্কে গুরুদ্বারের সহকারী ম্যানেজার সর্দ্দার বট সিং গ্রেপ্তার। সীমান্তে গ্রামলুণ্ঠনকারী দস্যুদল গ্রেপ্তার। দ্বারভাঙ্গার অগ্নিকাণ্ডে ৬৫০ খানি বাড়ী ভস্মীভূত। বেগে মোটর চালাইবার অভিযোগে ভাইকাউণ্ট কার্জ্জনের অর্থদণ্ড। পাঞ্জাব লুধিয়ানায় ৪ জন আকালী নেতা গ্রেপ্তার। পঞ্চম সাহিদী জাঠার জারালপুর হইতে লাহোর গমন। ষড়যন্ত্রের অভিযোগে বরিশালে কয়েক জন যুবক গ্রেপ্তার। ফরিদপুর চকবাজারে নূতন ৺কালীমাতার গৃহে গো-মাংস নিক্ষিপ্ত। জামসেদপুরে স্বামী অভেদানন্দের বক্তৃতা। ইংলণ্ডে ভীষণ ভূমিকম্প।

৯ই বৈশাখ—

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের য়ুরোপ পরিভ্রমণের পর কলিকাতায় প্রত্যাগমন। ভারতের বর্ত্তমান শাসনপদ্ধতির ত্রুটি নির্দ্ধারণের জন্য তদন্ত কমিটী নিয়োগ। মিঃ এম. এস. ডি. বাটলার ভারতীয় রাষ্ট্রীয় পরিষদের সভাপতি নিযুক্ত। হরিশ পার্কে জন-সভায় শ্রীযুত বিপিনচন্দ্র পালের ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের কার্য্যের নিন্দা। শ্রীযুত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী, মিসেস্ বেসাণ্ট ও মিস এমিলি লুটিয়েন্সের বিলাত যাত্রা। পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর এলাহাবাদ মিউনিসিপাল বোর্ডের চেয়ারম্যানের পদত্যাগ। মাদ্রাজের অসহযোগী নেতা শ্রীযুত বিজয় রাঘব আচারিয়ার পুনরায় ওকালতী আরম্ভ।

১০ই বৈশাখ—

বঙ্গীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার ফল প্রকাশ। বৈমানিক ম্যাকলারেণের করাচী আগমন। মহাত্মা গন্ধী কর্ত্তৃক ভাইকম সত্যাগ্রহ পরিচালনা সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান। সত্যাগ্রহী নেতা কৃষ্ণস্বামী আয়ারের কারাদণ্ড। পাঞ্জাব ব্যবস্থাপক সভার সদস্য সর্দ্দার মহেন্দ্র সিংহ গ্রেপ্তার। মুসলমানগণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারকল্পে সার ইব্রাহিম ভাই করিম ভাই কর্ত্তৃক বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে ১০ লক্ষ টাকা দান। শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুর বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সদস্যপদ ত্যাগ। সুইজারল্যাণ্ডে রেলওয়ে দুর্ঘটনায় অগ্নিকাণ্ড ও বহু লোকের প্রাণহানি। সম্রাট কর্ত্তৃক লণ্ডনে সাম্রাজ্য প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন। মার্কিণ গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক জাপানবাসীদিগের মার্কিণ গমন বন্ধ হওয়ায় জাপানের প্রতিবাদ।

১১ই বৈশাখ—

শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু মাসিক ১৫ শত টাকা বেতনে ৩ বৎসরের জন্য কলিকাতা কর্পোরেশনের চীফ একজিকিউটিভ অফিসার নিযুক্ত, কর্পোরেশনের পুরাতন ভাইস-চেয়ারম্যান মিঃ জে. সি. মুখোপাধ্যায় উহার ডেপুটী একজিকিউটিভ অফিসার নিযুক্ত। মাণিকতলা বোমার মামলার রায়—দুই জন আসামীই দায়রায় সোপর্দ্দ। হাওড়া হাঙ্গামায় দুই জন আসামীর আত্মসমর্পণ। লর্ড সিংহের কলিকাতা হইতে শিলং গমন। শ্রীরামপুর আদালতে শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন দাশের সাক্ষ্য প্রদান। আসাম শিবসাগর ডিসাংপানিতে বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠা। গাইবান্ধার দেবর কর্ত্তৃক বেশ্যাপল্লীতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃজায়া বিক্রয়।

১২ই বৈশাখ—

নবদ্বীপে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর মন্দিরে সেবাইতগণের মধ্যে মারামারিতে কৃষ্ণনগরে ৩টি মামলা। বিদেশী আমদানী লৌহের উপর শুল্ক বসাইয়া টাটার কারখানাকে সাহায্য করিবার জন্য সরকারগঠিত টেরিফ বোর্ডের রিপোর্ট প্রকাশ। মাদ্রাজ কুদালোর জেলে সুব্রহ্মণ্য গুপ্তের প্রায়োপবেশন। কেনিয়ায় ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলনে ব্যবস্থা-পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সদস্য শ্রীযুত যোশী প্রমুখ বহু বিশিষ্ট ভারতীয়ের কারাদণ্ড। বোম্বায়ে নিখিল ভারত আয়ুর্ব্বেদ সম্মিলনের চতুর্দ্দশ অধিবেশন। পুনায় জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক ১৪৪ ধারার নোটিশ দ্বারা মদের দোকানে পিকেটিং বন্ধ। নূতন আইরিশ সঙ্কট, আলষ্টারের সহিত ফ্রি ষ্টেটের সীমা নির্দ্ধারণের চেষ্টা বিফল।

১৩ই বৈশাখ—

শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন দাশের মেদিনীপুর হইতে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় নির্ব্বাচন নাকচ। স্বহস্তপ্রস্তুত কামানের সাহায্যে বাঙ্গালী যুবক নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের আত্মহত্যা। চাঁদপুর মহকুমায় জাল নোটে পোষ্টাফিসের কার্য্যাধ্যক্ষ গ্রেপ্তার। 'সিটি অফ সিঙ্গাপুর' জাহাজে আগুন লাগিয়া বহুসংখ্যক মোটর গাড়ী ভস্মীভূত বেলিয়াঘাটায় চোরের আড্ডা প্রকাশ, এক রাত্রিতে দেড় শত লোক গ্রেপ্তার। চাকরী অভাবে জনৈক হিন্দুস্থানীর আত্মহত্যা। রেলগাড়ীতে করাচীর সুবিখ্যাত নেতা শ্রীযুত সিধবাকে বৃটিশ সৈনিকের পদাঘাত ও গালি।

১৪ই বৈশাখ—

টাঙ্গাইলে হিন্দু জমীদার, উকীল ও মোক্তারগণ কর্ত্তৃক অসহায় দরিদ্র-পল্লীর উপর ভীষণ অত্যাচার। মার্কিণ ভ্রমণকারী পিটার জাভিটোকীর উপর পুলিসের কড়া নজর। বরোদা রাজ্যে বিশ্বানগরে হিন্দু-মুসলমান দ্বন্দ্বের আপোষ মীমাংসা। মাদ্রাজের কোচিনে বজ্রাঘাতে ছয় জন লোক নিহত। শিরোমণি গুরুদ্বার প্রবন্ধক কমিটী কর্ত্তৃক ভাইকমে অন্নসত্র প্রতিষ্ঠা। মস্কোয়ের প্রাচ্য বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রাচীতে বিপ্লববাদ প্রচারের জন্য দুই সহস্র কমিউনিষ্ট প্রেরণের ব্যবস্থা। ঢাকায় কাপড়ের দোকানে পিকেটিং আরম্ভ।

১৫ই বৈশাখ—

বিখ্যাত দস্যু-নেতা রাজক আগ্রায় গ্রেপ্তার। বোম্বাই কর্পোরেশন হইতে মহাত্মা গন্ধীকে অভিনন্দন জ্ঞাপন। বোম্বাই শোলাপুরের সাজোলা তালুকে দুর্ভিক্ষ ও প্রজাবৃন্দের বর্দ্ধিত হারে ট্যাক্স প্রদানে অসম্মতি। ইংলণ্ডের খনিতে বিস্ফোরণে ১ শত লোকের জীবন্ত সমাধি। মৌলানা আবুল কালাম আজাদের চিকিৎসার জন্য য়ুরোপ গমনের পাসপোর্টে বাধা। ফরাসী বৈমানিক লেপ্টেনাণ্ট ডইসীর আড়াই দিনে প্যারিস হইতে বোগদাদে আগমন। জার্ম্মাণ অর্থ বিদেশে ব্যয় নিষিদ্ধ।

১৬ই বৈশাখ—

তারকেশ্বরে ভোট-লুটের অভিযোগে স্বামী সচ্চিদানন্দ গ্রেপ্তার। কবীন্দ্র শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চীনের পিকিন সহরে প্রবেশ। অমৃতসরে 'আকালী' নামক সংবাদপত্রের রিপোর্টার গ্রেপ্তার। মুঙ্গের ও ভাগলপুর জিলা বোর্ড নির্ব্বাচনে কংগ্রেস পক্ষের জয়লাভ। শ্রীহট্ট মানহানি মামলায় 'পরিদর্শক' সম্পাদক ও পত্রলেখকের ক্ষমা প্রার্থনা। কলিকাতায় বালিকা বিক্রয় ব্যবসায়ে ২ জন স্ত্রীলোক গ্রেপ্তার। পাটনার আয়-কর সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা নিত্যবালা দেবীর পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার। সুইডেনের দেশলাই কারখানার মালিকগণ কর্ত্তৃক বোম্বাই, মাদ্রাজ, কলিকাতা ও করাচীতে কারখানা স্থাপনের আয়োজন। কানপুরে বলশেভিক ষড়যন্ত্রের মামলার সাহায্যে বিলাতের শ্রমিক-নেতা মিঃ ল্যান্সবারীর ব্যারিষ্টার প্রেরণের সঙ্কল্প। হুগলীতে জন-সভায় লাট বয়কট প্রস্তাব গৃহীত। মেদিনীপুর জিলা বোর্ডে চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত শাসমলের বিরুদ্ধে অনাস্থার প্রস্তাব প্রত্যাহৃত।

১৭ই বৈশাখ—

বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসভার পক্ষ হইতে তারকেশ্বর ব্যাপার সম্বন্ধে তদন্ত। ফরিদপুর জিলার মৌজুড়ী গ্রামে জনৈক মুসলমান ছেলের অন্নপ্রাশনে ২ শত নিমন্ত্রিত হিন্দুর অন্ন ভোজন। কুমিল্লা হইতে ১ শত স্বেচ্ছাসেবকের পদব্রজে সিরাজগঞ্জ প্রাদেশিক কনফারেন্সে গমন। বাঙ্গালার নানা স্থানে নারী-নির্য্যাতনের প্রতিকারকল্পে কলিকাতায় নারীরক্ষা সমিতি গঠন। তুর্কস্থান, বোখারা, সেমিরেটসিস্ক, যোরেশামা প্রভৃতি স্থানে বলশেভিকদিগের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। মৈমনসিংহ ও টাঙ্গাইলে মিউনিসিপাল নির্ব্বাচনে কংগ্রেস পক্ষের জয়। পুনায় মেল ব্যাগ হইতে ২০ হাজার টাকা উধাও।

১৮ই বৈশাখ—

কালীঘাট নিখিল ভারত অনাথ আশ্রমের ম্যানেজার শুকদেব বন্দ্যোপাধ্যায়ের ২টি অনাথ বালিকাকে অন্যায়ভাবে আটক রাখার অভিযোগে ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ড। কলিকাতায় বিনা লাইসেন্সে অস্ত্র রাখায় বাঙ্গালী যুবকের ২ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড। নোয়াখালি জিলার রাজাবলিয়া গ্রামে অবৈধ উপায়ে লবণ প্রস্তুতে ২ জনের কারাদণ্ড। বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে মদ বিক্রয় বন্ধের ব্যবস্থা। ফরাসী ব্যোম-পর্য্যটকের করাচী আগমন। স্বামী সচ্চিদানন্দের জামিনে মুক্তিলাভ। ভাইকম সত্যাগ্রহে মহাত্মার পূর্ণ সহানুভূতি। হাওড়া ষ্টেশনে ট্যাক্সি ডাকাতি—৩ জন আসামী গ্রেপ্তার। বার্লিনে মে পর্ব্বের উৎসবে হাঙ্গামা, পুলিস কর্ত্তৃক গুলী বর্ষণ।

১৯শে বৈশাখ—

হাওড়া, বাঁটরায় নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের ৫ বৎসরের কন্যা রাধারাণী দেবীর উপর অমানুষিক অত্যাচারে শিবদাস কুণ্ডুর ১৩ ঘা বেত্রদণ্ড। পুনায় পক্ষী শিকারে ধলার গুলীতে কালার মৃত্যু—বিচারে ধলার মুক্তি। কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র মামলার আসামী শিঙ্গার ভেলুচেটীর জামিনে মুক্তি। আসামের গভর্ণর কর্ত্তৃক ব্যবস্থাপক সভার নির্দ্ধারণ নাকচ। পুনায় জাতীয় শিক্ষা-সম্মিলন। তারকেশ্বরে ভোটলুটের দায়ে আরও ৫ জন গ্রেপ্তার।

২০শে বৈশাখ—

ভাইকমে আকালী দল, বিরাট সংবর্দ্ধনার ব্যবস্থা। মান্দালয়ে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড, ২॥ লক্ষ টাকা ক্ষতি। বড় লাটের শাসন-পরিষদের আইন-সচিব মিঃ (?) স্যর মহম্মদ সফির কার্য্যকাল বৃদ্ধি। যুক্তপ্রদেশের হরদই জিলায় ভীষণ বন্যায় বহু লোকের প্রাণনাশ। স্যর চিমনলাল শীতলবাদ ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের নূতন সভাপতি নির্ব্বাচিত। আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ভীষণ ঘূর্ণিবাত্যায় ১ শত লোকের প্রাণহানি। অমৃতসর স্বর্ণমন্দিরের প্রধান গ্রন্থী জ্ঞানী কর্ত্তার সিং গ্রেপ্তার। শ্রীহট্টে আসাম-মন্ত্রী প্রমদাচরণ দত্তের বিরুদ্ধে নির্ব্বাচন মামলা। বার্লিনে রুস দূতাবাসে খানাতল্লাসী। প্রবল ঝড়ে যশোহর জিলার শ্রীরামপুর মহকুমার বহু গ্রাম ধ্বংস।

২১শে বৈশাখ—

আফগানিস্থানে দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে সর্দ্দার ও মোল্লাগণের বিদ্রোহ। বিলাতের পথে জাহাজে জনৈক য়ুরোপীয় কর্ত্তৃক লালা লাজপৎ রায়ের গান্ধী টুপী সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত। ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে ১৪৪ ধারা জারি, ৩ জন লোকের রাজ্যমধ্যে বক্তৃতা প্রদান নিষিদ্ধ। মোম্বাসায় ট্যাক্স বন্ধে দুই জন বিশিষ্ট ভারতীয় গ্রেপ্তার। বি, বি, সি, আই রেলে দিল্লী একস্‌প্রেস ট্রেণ সংলগ্ন ডাকগাড়া ভস্মীভূত। পদব্রজে পেশোয়ার গমনের পর পরাগরঞ্জন দের কলিকাতায় প্রত্যাগমন। মাদ্রাজে গির্জ্জার পঞ্চমদিগের সহিত খৃষ্টানদিগের ভীষণ দাঙ্গা। হুগলীর জজ আদালতে তারকেশ্বরে রিসিভার নিয়োগের আবেদন।

২২শে বৈশাখ—

রেঙ্গুনে ৮ সহস্র জাহাজের কুলীর ধর্ম্মঘট। বলরাম দে ষ্ট্রীটের লেডী ডাক্তার হিরণপ্রভা ঘোষের আত্মহত্যা। ঢাকা জিলার পাইকপাড়ায় ডাকাতি, ৭ হাজার টাকা লুঠ। মোহান্তের তারকেশ্বর হইতে আসবাবপত্র কলিকাতায় আনিবার চেষ্টা। রঙ্গপুর জিলায় সন্তোষপুরে এক সঙ্গে নারীহরণ, গো-জবাই ও নায়েব হত্যার সংবাদ। মাদ্রাজের গঞ্জাম জিলায় ১৪৪ ধারার আদেশে বিবাহের মিছিল বন্ধ। বাঁকুড়ার বারাসত গ্রামে ৩টি মেয়ে চুরির সংবাদ। ফরাসী বৈমানিক ডইসীর কলিকাতা আগমন। লণ্ডনে মোটর দুর্ঘটনায় রয়েল একাডেমীর সভ্যগণ আহত।

২৩শে বৈশাখ—

চন্দননগরে প্রবর্ত্তক সংঘের জাতীয় মেলা ও প্রদর্শনীর উদ্বোধন। হাওড়া জিলার সাঁকরাইলে এক সঙ্গে মাতা-পুত্র খুন। বিহারে ভীষণ কলেরা, বর্ত্তমান বৎসরে ১০ হাজার লোকের মৃত্যু। জেনারেল ডায়ারের পক্ষাঘাত রোগ, অবস্থা সঙ্কটজনক।

২৪শে বৈশাখ—

৩ জন পর্ত্তুগীজ বিমানবিহারীর করাচী ত্যাগ। অর্দ্দাস কালীভাই আমীনকে বৃটিশ গায়ানার সুপ্রীম কোর্টে ব্যারিষ্টারী করিবার অনুমতি প্রদান। হুগলী জিলার সোমনগর গ্রামের নিকট পুষ্করিণী খননে ভূগর্ভ হইতে পিত্তল বাটী বাহির। চন্দননগরে প্রবর্ত্তক সংঘের মেলায় আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। ভাইকমে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। বরিশালে মিউনিসিপ্যালিটির এলাকার মধ্যে আবগারী দোকান বন্ধ।

২৫শে বৈশাখ—

বাঙ্গালা সরকার কর্ত্তৃক কলিকাতা কর্পোরেশনের চিফ একজি-কিউটিভ অফিসার নিয়োগ অনুমোদন। লাহোরের বন্দে মাতরম্ পত্রের বিরুদ্ধে ১০ হাজার টাকার ডিক্রীতে লালা লাজপৎ রায়ের নির্দ্দোষ। পর্ত্তুগীজ বৈমানিকের বিপ্লব, যোধপুর রাজ্যে উড়ো-জাহাজ ধ্বংস। বরিশালে ঐ আইনে শ্রীযুত হরিদাস সরকার গ্রেপ্তার। রাজাইলের অন্তর্গত বাখিলপ্রাচীন গ্রামে ১৪ বৎসরের বালিকার উপর পাশবিক অত্যাচারে বালিকার মৃত্যু। শ্রীযুত অনিলবরণ রায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর নূতন সম্পাদক নির্ব্বাচিত।

২৬শে বৈশাখ—

রেলে জাল টিকিট চালাইবার চেষ্টায় ২ জন কেরাণীর কারাদণ্ড। বাজাওর সংকামুণ্ডে বিদ্রোহীতে পুলিসে লড়াই, ১২ জন বিদ্রোহী নিহত। পুসকুরার মৌলানা আবুবকর সাহেব কর্ত্তৃক লাল ইস্তাহার জারি। তারকেশ্বরে মোহান্তের লোকগণের বাজারে অত্যাচার—অনেক লোক আহত। শিলিগুড়ী হইতে লোমহর্ষণ নারী-নিগ্রহের সংবাদ। বারাকপুরের কংগ্রেসকর্ম্মী জগন্নাথ প্রসাদের কারামুক্তি।

২৭শে বৈশাখ—

কাণপুর বলশেভিক ষড়্‌যন্ত্র মামলা সম্পর্কে শ্রীযুত মানবেন্দ্রনাথ রায়ের বিরুদ্ধে ওয়ারেণ্ট। চট্টগ্রামে গুলীমারা মামলায় সকল আসামীর অব্যাহতি লাভ। ওডায়ার-নায়ার মামলায় সাক্ষ্য দিবার জন্য যুক্তপ্রদেশের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী পণ্ডিত জগৎনারায়ণের বিলাত যাত্রা। শ্রী সাহিবী জাঠায় অমৃতসর আকালতক্ত হইতে জৈঠো গমন। তারকেশ্বরে মোহান্তের লোকগণ কর্ত্তৃক মহাবীরদল আক্রান্ত ও প্রহৃত, মন্দিরের নিকট জনৈক ব্রাহ্মণের মৃতদেহ।

২৮শে বৈশাখ—

বোম্বায়ে ৫ শতাধিক পাঠান গ্রেপ্তার। কৃষ্ণনগরে (নদীয়া) নিখিল বঙ্গ ও আসামের ধীবর সমিতির প্রথম অধিবেশন। লণ্ডনে রুমানিয়ার রাজ-দম্পতীর আগমন। লণ্ডনে শ্রমিকদলের পরামর্শসভায় লালা লাজপৎ রায়ের ভারতে শাসিতমূলক স্বরাজ প্রবর্ত্তন দরকার। কটক, বালেশ্বর ও পুরীর জিলা বোর্ড নির্ব্বাচনে জাতীয় দলের জয় লাভ।

২৯শে বৈশাখ—

অমৃতসরে 'অনোয়ার্ড' সম্পাদক ব্রহ্মচারী, স্বামী সাধী ওর্ডায়ানন্দের ২ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড। [illegible] মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে তুলসীচরণ গোস্বামীর [illegible] মামলা খারিজ। তেলিনীপাড়া মহরম হাঙ্গামার মামলায় ৫ জন আসামীর কারাদণ্ড, ১৬ জনের অব্যাহতি। মহাত্মার সহিত আলোচনার জন্য শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন দাশের বোম্বাই গমন। করাচীতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচনে পোঁয়াকারের বিরোধী দলের সর্ব্বত্র জয়লাভ। কুড়িগ্রামে (রংপুর) কৃষ্ণকুমার মিত্র, নারীরক্ষা সমিতি গঠ

৩০শে বৈশাখ—

অমৃতসর খালসা কলেজের ৯ জন অধ্যাপকের পদত্যাগ। সার আবদার রহিম বঙ্গীয় শাসন পরিষদের ভাইস-প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচিত। বসিরহাটে খুড়তুত ভাইকে খুন করার জনৈক ব্রাহ্মণযুবকের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। বাঁকুড়ার নিকট ট্রেণে ফিরিঙ্গী কর্ত্তৃক ভারতীয় মহিলার সতীত্বনাশের চেষ্টা। কলিকাতা মার্কুইস ষ্ট্রীটে অগ্নিকাণ্ড, ৫০ হাজার টাকা ক্ষতি। ফরাসী প্রধান মন্ত্রীর ও মন্ত্রিসভার পদত্যাগের সংবাদ। স্বামী অভয়ানন্দের কাশী হইতে তারকেশ্বর আগমন।

৩১শে বৈশাখ—

তারকেশ্বরে স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট নিয়োগ—আকালীদল কর্ত্তৃক তারকেশ্বরে অন্নসত্র স্থাপনের ব্যবস্থা। হাওড়ায় মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য জনৈক ভদ্রলোকের ৪ লক্ষ টাকার সম্পত্তি দান। কনষ্টাণ্টিনোপলে ভীষণ ভূমিকম্প, ৫০ জন লোকের মৃত্যু। ব্রহ্মদেশের পংক্তীতে মহিলা কর্ম্মকারেদের অধিবেশন। মানিকগঞ্জে সংক্রান্তি মেলা মুসলমানগণ কর্ত্তৃক বর্জ্জন। কবিরাজ যতীন্দ্রনাথ সেনের মৃত্যু।



কেশ-সম্বরণ

বসুমতী প্রেস]

[শিল্পী—শ্রী[illegible]



শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত

শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ

[SWAMIJEE IN AMERICA AND IN EUROPE.]

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

৪। ঈশ্বর সাকার না নিরাকার

এক দিন কেশবচন্দ্র সেন শিষ্যবৃন্দ লইয়া দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে ঠাকুর রামকৃষ্ণকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। কেশবের সঙ্গে নিরাকার সম্বন্ধে অনেক কথা হইত। পরমহংস দেব তাঁহাকে বলিতেন, আমি মাটির কালী মনে করি না। চিন্ময়ী কালী। যিনি ব্রহ্ম, তিনিই কালী। যখন নিষ্ক্রিয়, তখন, 'ব্রহ্ম'; যখন সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করেন, তখন কালী; অর্থাৎ যিনি কাল-সঙ্গে রমণ করেন। তাঁহাদের নিম্নলিখিত কথাবার্ত্তা এক দিন হইয়াছিল—

[illegible]

যেন সচ্চিদানন্দসমুদ্র, কূল-কিনারা নাই। ভক্তি-হিমে এই সমুদ্রের স্থানে স্থানে জল বরফ হয়ে যায়; স্থানে স্থানে যেন জল বরফ আকারে জমাট বাঁধে; অর্থাৎ ভক্তের কাছে তিনি সাক্ষাৎ হয়ে কখন কখন সাকাররূপ হয়ে দেখা দেন। আবার জ্ঞানসূর্য্য উঠলে সে বরফ গলে যায়—অর্থাৎ 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা' এই বিচারের পর সমাধি হ'লে রূপটুপ সব উড়ে যায়। তখন কি তিনি, মুখে বলা যায় না—মন বুদ্ধি অহংতত্ত্ব দ্বারা তাঁকে ধরা যায় না।

"যে লোক এই একটা ঠিক জানে, সে আর একটাও জানতে পারে। যে নিরাকার ভাবতে পারে, সে সাকারও ভাবতে পারে। সে সাকারকেই গেলে না—কোথাও [illegible]"

সকলে নিরাকার পূজায় অধিকারী নয়, তাই সাকার পূজার বিশেষ প্রয়োজন, এ কথাও পরমহংস দেব বুঝাইলেন। তিনি বলিলেন—

"এক মা'র পাঁচ ছেলে। মা মাছের নানারকম আয়োজন করেছেন, যার যা' পেটে সয়। কারু জন্য মাছের পোলাও করেছেন। যার পেটের অসুখ, তার জন্য মাছের ঝোল করেছেন। যেটা যার পেটে সয়।"

এ দেশে সাকার পূজা হয়। খৃষ্টান মিশনরীরা আমেরিকা ও য়ুরোপে এদেশবাসীদিগকে অসভ্য জাতি বলিয়া বর্ণনা করেন। তাঁহারা বলেন যে, ভারতবাসীরা পুতুল পূজা করেন—ও তাঁহাদের অবস্থা বড় শোচনীয়।

স্বামী বিবেকানন্দ এই সাকার পূজার অর্থ আমেরিকায় প্রথমেই বুঝাইলেন; বলিলেন, ভারতবর্ষে পুতুল পূজা হয় না।

"At the very outset I may tell you there is no polytheism in India. In every temple, if one stands by and listens, he will find the worshippers applying all the attributes of God to these images." *Lecture on Hinduism.*

ঈশ্বরকে ভাবিতে গেলেই সাকার চিন্তা বই আর কিছু আসিতে পারে না, এ কথা মনোবিজ্ঞান (Psychology) সাহায্যে স্বামী বুঝাইতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন—

"Why does a Christian go to Church? Why is the cross holy? Why is the face turned towards the sky in prayers? Why are there so many images in the Caltholic church? Why are there so many images in the minds of Protestants when they pray? My brethren, we can no more think about anything without a material image than we can live without breathing. Omnipresence to almost the whole world means nothing. Has God superficial area? If not, then when we repeat the word we think of the extended earth; that is all." *Lecture on Hinduism (Chicago).*

স্বামীজীও বলিলেন, "অধিকারিভেদে সাকার পূজা ও নিরাকার পূজা। সাকার পূজা কুসংস্কার নহে—মিথ্যা নহে, নিম্নস্থানীয় সত্য।"

"If a man can realise his divine nature most easily with the help of an image, would it be right to call it a sin? Nor even when he has passed that stage, should he call it an error? To the Hindu man is not travelling from error to truth but from lower to higher truth."

স্বামীজী বলিলেন, সকলের পক্ষে এক নিয়ম হইতে পারে না। ঈশ্বর এক, কিন্তু তিনি নানা ভক্তের নিকট নানা ভাবে প্রকাশ হইতেছেন। হিন্দু এইটি বুঝেন।

"Unity in variety is the plan of nature and the Hindu has recognised it. Other religions lay down certain fixed dogmas and try to force society to adopt them; they place before society one kind of coat which must fit Jack and John and Henry, all alike. If it does not fit John or Henry, he must go without a coat to cover his body. The Hindus have discovered that the absolute can be realised, thought of or stated only through the relative."

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

৫। পাপবাদ

(THE DOCTRINE OF SIN)

স্বামীজীর গুরুদেব ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, ঈশ্বরের নাম লইলে ও আন্তরিক তাঁহার চিন্তা করিলে পাপ পলাইয়া যায়। যেমন তুলার পাহাড় অগ্নিস্পর্শে একক্ষণে পুড়িয়া যায়; অথবা যেমন বৃক্ষে পাখী অনেক বসিয়াছে, হাততালি দিলে সব উড়িয়া যায়। এক দিন কেশব বাবুর সহিত কথা হইতেছিল—

শ্রীরামকৃষ্ণ (কেশবের প্রতি)। মনেতেই বদ্ধ, মনেতেই মুক্ত। আমি মুক্ত পুরুষ, সংসারেই থাকি, আর অরণ্যেই থাকি—আমার বন্ধন কি? আমি ঈশ্বরের সন্তান, রাজাধিরাজের ছেলে, আমায় আবার বাঁধে কে? যদি সাপে কামড়ায়, বিষ নাই, বিষ নাই; জোর ক'রে বল্লে বিষ ছেড়ে যায়। তেমনই 'আমি বদ্ধ নই' 'আমি বদ্ধ নই' 'আমি মুক্ত' এই কথাটি রোক ক'রে বলতে বলতে তাই হয়ে যায়। মুক্তই হয়ে যায়।

"খৃষ্টানদের একখানা বই (Bible) এক জন দিলে। আমি প'ড়ে শুনাতে বল্লাম। তাতে কেবল পাপ আর পাপ!

"তোমাদের ব্রাহ্মসমাজেও কেবল 'পাপ' আর 'পাপ'। যে ব্যক্তি 'আমি বদ্ধ' বার বার বলে, সে শেষে বদ্ধই হয়ে যায়। যে রাতদিন 'আমি পাপী' 'আমি পাপী', এই করে, সে তাই হয়ে যায়!

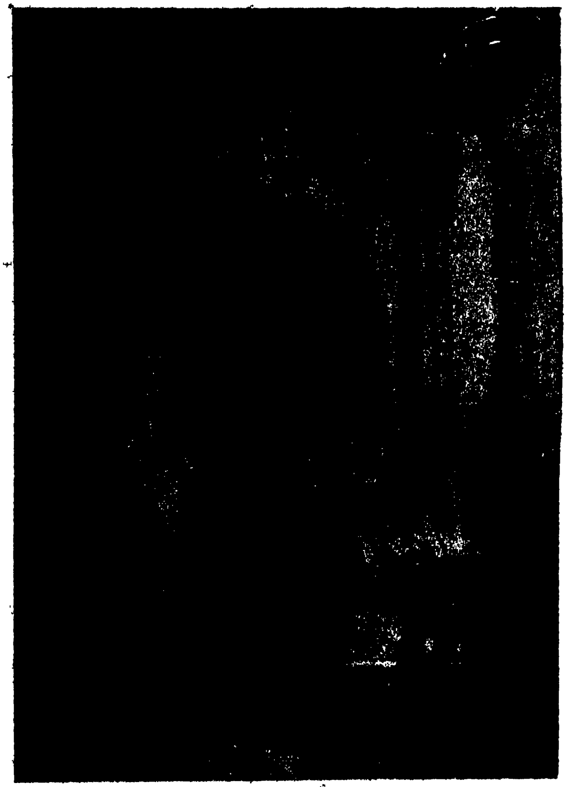
"ঈশ্বরের নামে এমন বিশ্বাস হওয়া চাই—কি! আমি তাঁর নাম করেছি, আমার এখনও পাপ থাকবে! আমার আবার বন্ধন কি, পাপ কি? কৃষ্ণকিশোর পরম হিন্দু, সদাচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ। সে বৃন্দাবনে গিয়েছিল। এক দিন ভ্রমণ কর্‌তে কর্‌তে তার জলতৃষ্ণা পেয়েছিল। একটা কুয়ার কাছে গিয়ে দেখলে, এক জন

লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাকে বল্লে, 'ওরে, তুই আমায় এক ঘটী জল দিতে পারিস? তুই কি জাত?' সে বল্লে, 'ঠাকুর মশাই, আমি হীন জাত মুচি'। কৃষ্ণকিশোর বল্লে, 'তুই বল্ শিব, আর জল তুলে দে।'

"ভগবানের নাম কর্‌লে দেহ মন সব শুদ্ধ হয়ে যায়। কেবল 'পাপ' আর 'নরক' এ সব কথা কেন? একবার বল যে, 'অন্যায় কর্ম্ম যা করেছি, তা আর কর্‌বো না।' আর তাঁর নামে বিশ্বাস কর।"

স্বামীজীও খৃষ্টানদের এই পাপবাদ সম্বন্ধে বলিলেন, পাপী কি! তোমরা অমৃতের অধিকারী Sons of Immortal Bliss, তোমাদের ধর্ম্মযাজকরা রাত্রি-দিন নরকাগ্নির কথা বলেন, সে কথা শুনিও না।

"Ye are the children of God, the sharers of immortal bliss, holy and perfect beings, ye divinities on earth. Sinners? It is a sin to call a man so. Come up oh lions! and shake off the delusion that you are sheep! You are souls immortal, spirits free and blest and eternal, ye are not bodies, matter is your servant, not you the servant of matter" *Lecture on Hinduism* (*Chicago*).



কেশবচন্দ্র সেন

আমেরিকায় হার্টফোর্ড নামক স্থানে স্বামী বক্তৃতা করিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। এখানকার American Consul Patterson তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন ও সভাপতির কার্য্য করিয়াছিলেন। স্বামী আবার খৃষ্টানদের পাপবাদ সম্বন্ধে বলিলেন, যদি ঘর অন্ধকার হয়, তা হ'লে 'অন্ধকার' 'অন্ধকার' 'অন্ধকার' কর্‌লে কি হইবে? আলো আলো, তবে ত হবে—

"Shall we advise men to kneel down and cry:—O miserable sinner that I am! No, rather let us remind them of their divine nature. * * If the room is dark, do you go about striking your [illegible] and crying, 'It is dark!' No, the only way [illegible] its light is to strike a light and then the [illegible] goes. The only way to realise the light above you is to strike the spiritual light within you and the darkness of impurity and sin will flee away. Think of your higher self, not of your lower."

স্বামী পরমহংস দেবের কাছে একটি গল্প * শুনিয়াছিলেন, সেই গল্পটি বলিলেন।—"একটা বাঘিনী একটা ছাগলের পাল আক্রমণ করেছিল। পূর্ণগর্ভা, তাই লাফ দিতে গিয়ে ছানা হয়ে গেল। বাঘিনীর মৃত্যু হ'ল। ছানাটি ছাগলের সঙ্গে মানুষ হ'তে লাগল, আর তাদের সঙ্গে ঘাস খেতে লাগল ও 'ব্যা—অ্যা,' 'ব্যা—অ্যা' করতে লাগল। কিছু দিন পরে সে ছানাটি বেশ বড় হ'ল। এক দিন ছাগলের পালে আর একটি বাঘ পড়ল। সে দেখে অবাক্ যে, একটা বাঘ ঘাস খাচ্ছে, আর ব্যা—ব্যা কর্‌ছে, আবার তাকে দেখে ছাগলের মত পালাচ্ছে! তখন তাকে ধ'রে জলের কাছে নিয়ে গেল ও বল্লে, 'তুইও বাঘ, তুই ঘাস খাচ্চিস কেন, আর ব্যা—ব্যা কর্‌চিস্ কেন—দেখ্, আমি কেমন মাংস খাচ্চি, তুইও খা, ঐ দেখ্ জলে তোর মুখ দেখা যাচ্চে, আমারই মত।' বাঘটা সব দেখিল, মাংসেরও আস্বাদ পাইল।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

৬। 'কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ'—সন্ন্যাস।

RENUNCIATION.

এক দিন ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

* [illegible]

দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ীতে কথাবার্ত্তা কহিতে-ছিলেন।

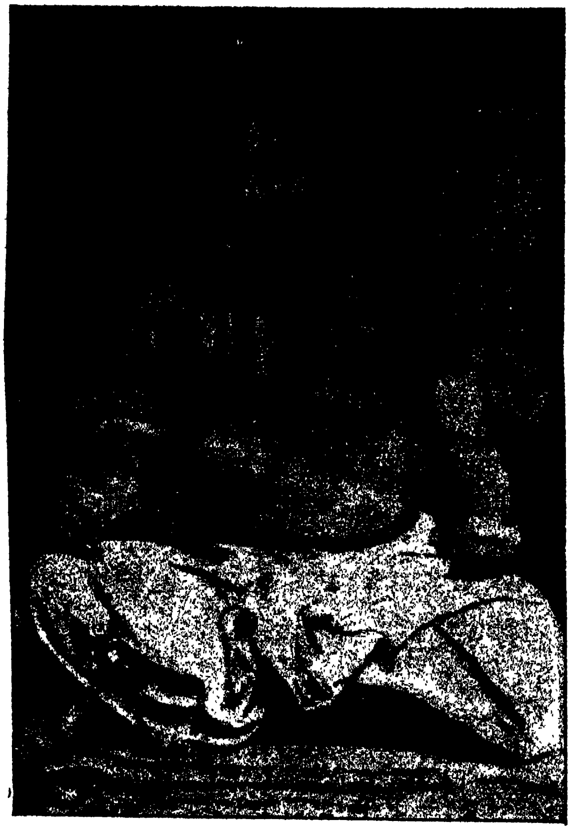
শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়ের প্রতি)। কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ না করলে লোকশিক্ষা দেওয়া যায় না। দেখ না, কেশব সেন ঐটি পারলে না ব'লে কি হলো শেষটা। তুমি নিজে ঐশ্বর্য্যের ভিতর, কামিনীকাঞ্চনের ভিতর থেকে যদি বল সংসার অনিত্য, ঈশ্বরই বস্তু, অনেকে তোমার কথা শুনবে না। আপনার কাছে গুড়ের নাগরী রয়েছে, পরকে বলছো, গুড় খেও না! তাই ভেবে চিন্তে চৈতন্যদেব সংসার ত্যাগ করলেন। তা না হ'লে জীবের উদ্ধার হয় না।

বিজয়। হাঁ, চৈতন্য-দেব বলেছিলেন, কফ যাবে ব'লে পিপ্পলখণ্ড তৈয়ের করলাম *— কিন্তু উল্টা উৎপত্তি হ'ল, কফ্ বেড়ে গেল; নবদ্বীপের অনেক লোক ব্যঙ্গ করতে লাগলো ও বল্লে, নিমাই পণ্ডিত বেশ আছে হে; সুন্দরী স্ত্রী, প্রতিষ্ঠা, অর্থের অভাব নেই, বেশ আছে!

শ্রীরামকৃষ্ণ। কেশব যদি ত্যাগী হোতো, অনেক কাষ হোতো। ছাগলের গায়ে ক্ষত থাক্‌লে আর ঠাকুরসেবা হয় না, বলি দেওয়া হয় না। ত্যাগী না হ'লে লোকশিক্ষার অধিকারী হয় না। গৃহস্থ হ'লে ক'জন তার কথা শুনবে?

স্বামী বিবেকানন্দ কামিনীকাঞ্চনত্যাগী, তাই তাঁহার ঈশ্বরবিষয়ে লোকশিক্ষা দিবার অধিকার। বিবেকানন্দ

* পিপ্পল-খণ্ড—অর্থাৎ নবদ্বীপের হরিনাম প্রচার।



বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

বেদান্তে ও ইংরাজী ভাষা ও দর্শনাদিতে পণ্ডিতাগ্রগণ্য, তিনি অসাধারণ বাগ্মী, সেই কি তাঁহার মাহাত্ম্য? ইহার উত্তর ঠাকুর রামকৃষ্ণ দিবেন। দক্ষিণেশ্বরের কালী-বাড়ীতে ভক্তদের সম্বোধন করিয়া পরমহংস দেব ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে বিবেকানন্দ সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—

"এই ছেলেটিকে * দেখছো, এখানে এক রকম। দুরন্ত ছেলে, বাবার কাছে যখন বসে, যেন জুজুটি; আবার চাঁদনীতে যখন খেলে, তখন আর এক মূর্ত্তি। এরা নিত্যসিদ্ধের থাক্। এরা সংসারে কখন বদ্ধ হয় না। একটু বয়স হলেই চৈতন্য হয়, আর ভগ-বানের দিকে চ'লে যায়। এরা সংসারে আসে জীবশিক্ষার জন্য। এদের সংসারের বস্তু কিছু ভাল লাগে না— এরা কামিনীকাঞ্চনে কখনও আসক্ত হয় না।

"বেদে আছে হোমা পাখীর কথা। খুব উঁচু আকাশে সে পাখী থাকে। সেই আকাশেই সে ডিম পাড়ে। ডিম পাড়লেই ডিমটা পড়্‌তে থাকে। ডিম পড়্‌তে পড়্‌তে ফুটে যায়। তখন ছানাটা পড়্‌তে থাকে। পড়্‌তে পড়্‌তে তার চোখ ফোটে আর ডানা বেরোয়। চোখ

* স্বামী বিবেকানন্দ তখন General Assembly কলেজে পড়েন। বয়স সবে ১৯।২০। তাঁহার বাড়ী তখন কলেজের কাছে সিমুলিয়াই। পিতার নাম ৺বিশ্বনাথ দত্ত, হাইকোর্টের আটর্ণি। বালকের নাম নরেন্দ্র। কলেজে থাকিয়া বি এ পাশ করিয়াছিলেন। তখন Hastie সাহেব প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। এক্ষণে তাঁহার মা আছেন ও ভাই-ভগ্নীরা আছেন। স্বামীর জন্মদিন—সোমবার, পৌষ-সংক্রান্তি, ১২৬৯ সাল, প্রাতে ৬।৩৩।৩৩ সময়, সূর্য্যোদয়ের ৬ মিনিট পূর্ব্বে। বয়স ৩৯ বৎসর ৫ মাস ২৪ দিন হইয়াছিল

ফুটলেই দেখ্‌তে পায় যে, সে প'ড়ে যাবে, আর মাটীতে লাগলে একেবারে চুরমার্‌ হয়ে যাবে। তখন সে পাখী মা'র দিকে চোঁচা দৌড় দেয়, আর উঁচুতে উঠে যায়।"

বিবেকানন্দ এই 'হোমাপাখী—' তাঁর জীবনের এক লক্ষ্য মা'র কাছে চোঁচা দৌড় দিয়ে উঠে যাওয়া—গায়ে মাটী না ঠেক্‌তে ঠেক্‌তে অর্থাৎ সংসার স্পর্শ না করতে করতে ভগবানের পথে অগ্রসর হওয়া।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ বিদ্যাসাগরকে বলিয়াছিলেন, পাণ্ডিত্য! শুধু পাণ্ডিত্যে কি হবে? শকুনিও অনেক উঁচুতে উঠে, কিন্তু নজর ভাগাড়ের দিকে! কোথায় পচা মড়া! পণ্ডিত অনেক শ্লোক ফড়র্‌ ফড়র্‌ কর্‌তে পারে, কিন্তু মন কোথায়? যদি হরিপাদপদ্মে থাকে, আমি তাকে মানি, যদি কামিনীকাঞ্চনে থাকে, তা হ'লে আমার খড় কুটো বোধ হয়।

বিবেকানন্দ শুধু পণ্ডিত নহেন, তিনি সাধু মহাপুরুষ। শুধু পাণ্ডিত্যের জন্য ইংরাজ ও আমেরিকাবাসিগণ ভৃত্যের ন্যায় সন্তানের ন্যায়, তাঁহার সেবা করেন নাই। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, ইনি আর এক জাতীয় লোক। লোক সম্মান, টাকা, ইন্দ্রিয়সুখ, পাণ্ডিত্য প্রভৃতি লইয়া রহিয়াছে; ইঁহার এক লক্ষ্য ঈশ্বরলাভ।

"Truth never comes where lust and fame and greed of gain reside. No man who thinks of woman
As his wife can ever perfect be.
Nor he who owns however little, nor he—
Whom anger chains can ever pass through Maya's gates.
So give these up, Sannyasin bold, say
"Om tat sat Om!"

Song of the Sannyasin by Vivekananda.

আমেরিকায় তাঁহার প্রলোভন কম হয় নাই। একে জগদ্ব্যাপী প্রতিষ্ঠা। তাহাতে সর্ব্বদাই পরমাসুন্দরী উচ্চবংশীয়া সুশিক্ষিতা মহিলাগণ আসিয়া আলাপ ও সেবা করিতেন। তাঁহার এত মোহিনী শক্তি যে, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে তাঁহাকে বিবাহ করিতে চাহিতেন। এক জন অতি ধনাঢ্যের কন্যা (heiress) সত্য সত্য এক দিন আসিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "স্বামী! আমার সর্ব্বস্ব ও আমাকে আপনাকে সমর্পণ করিলাম।" স্বামী তদুত্তরে বলিলেন, "ভদ্রে! আমি সন্ন্যাসী, আমার বিবাহ করিতে নাই। সকল স্ত্রীলোক আমার মাতৃস্বরূপা।"

ধন্য বীর! তুমি গুরুদেবের উপযুক্ত শিষ্য! তোমার গাত্র যথার্থই পৃথিবীর মৃত্তিকা স্পর্শ করে নাই! তোমার গাত্রে কামিনীকাঞ্চনের দাগটি পর্য্যন্ত লাগে নাই। তুমি প্রলোভনের রাজ্য হইতে পলায়ন কর নাই। তাহার মধ্যে থাকিয়া, শ্রীনগরে বাস করিয়া, ঈশ্বরের পথে অগ্রসর হইয়াছ! তুমি সামান্য জীবের ন্যায় দিন কাটাইতে চাহ নাই! তুমি দেবভাবের জলন্ত দৃষ্টান্ত রাখিয়া এ মর্ত্ত্যধাম ত্যাগ করিয়া গিয়াছ!

অষ্টম পরিচ্ছেদ

৭। স্বামী ও কর্ম্মযোগ, নিষ্কাম কর্ম্ম

পরমহংস দেব বলিতেন, কর্ম্ম সকলেরই করতে হয়। জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম, এ তিনটি ঈশ্বরের কাছে পৌঁছিবার পথ। কর্ম্ম করলে, অনাসক্ত হয়ে কর্ম্ম করতে হয়। 'আমি কর্ত্তা' এটি অজ্ঞান, আমার ধন-জন কার্য্যকলাপ, এও অজ্ঞান। আপনাকে অকর্ত্তা জেনে ঈশ্বরকে ফল সমর্পণ ক'রে কায করতে হয়। গীতায় যে আছে কর্ম্মযোগ, সে এই। তবে কর্ম্মযোগ বড় কঠিন। অনেক-দিন নির্জ্জনে ঈশ্বরের সাধনা না করলে অনাসক্ত হয়ে কর্ম্ম করা যায় না। কোন্‌ দিক্‌ থেকে আসক্তি এসে পড়ে, ইহা জান্‌তে পারা যায় না। মনে করছি, আমি অনাসক্ত হয়ে ঈশ্বরে ফল সমর্পণ ক'রে দানাদি কার্য্য করছি। কিন্তু বাস্তবিক আমি লোকমান্য হবার জন্য করছি, নিজেই বুঝতে পারছি না। যে ব্যক্তি গৃহস্থ, যার গৃহ, পরিজন, আত্মীয়কুটুম্ব আমার বলবার আছে, তাকে দেখে নিষ্কাম কর্ম্ম ও অনাসক্তি, পরার্থে স্বার্থত্যাগ, এ সকল শিক্ষা করা বড় কঠিন। কিন্তু সর্ব্বত্যাগী কামিনীকাঞ্চনত্যাগী সাধু-মহাপুরুষ যদি নিষ্কাম কর্ম্ম ক'রে দেখান, তা হ'লে লোক সহজে বুঝতে পারে।

স্বামী বিবেকানন্দ কামিনীকাঞ্চনত্যাগী। তিনি নির্জ্জনে গুরুর কৃপায় অনেক দিন সাধনা করিয়াছিলেন। তিনি যথার্থ কর্ম্মযোগের অধিকারী। তবে তিনি সন্ন্যাসী, মনে করিলেই ঋষিদের মত অথবা তাঁহার গুরুদেব পরমহংস দেবের মত কেবল জ্ঞান-ভক্তি লইয়া থাকিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার জীবন কেবল

াগের দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্ত হয় নাই। সংসারীরা সকল বস্তু গ্রহণ করে, অনাসক্ত হইয়া তাহাদের রূপ ব্যবহার করিতে হয়, স্বামীজী তাহাও দেখাইয়া য়াছেন। তিনি অর্থ ও মান, এ সকলকে সন্ন্যাসীর য় কাকবিষ্ঠা জ্ঞান করিতেন বটে, অর্থাৎ নিজে ভোগ করিতেন না; কিন্তু তাহাদিগকে পরার্থে কিরূপে বহার করিতে হয়, তাহা নিজে কায করিয়া দেখাইয়া য়াছেন। যে অর্থ বিলাত ও আমেরিকার বন্ধুবর্গের কট হইতে তিনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সে সমস্ত অর্থ বের মঙ্গলকল্পে ব্যয় করিয়াছেন। স্থানে স্থানে, যথা লিকাতার নিকটস্থ বেলুড়ে, আলমোড়ার নিকটস্থ মায়াবতীতে, কাশীধামে ও মাদ্রাজ ইত্যাদি স্থানে মঠ াপন করিয়াছেন। দুর্ভিক্ষপীড়িতদিগকে নানা স্থানে দিনাজপুর, বৈদ্যনাথ, কিশেনগড়, দক্ষিণেশ্বর ও ন্যান্য স্থানে—সেবা করিয়াছেন। দুর্ভিক্ষের সময় াতৃমাতৃহীন অনাথ বালকবালিকাগণকে অনাথাশ্রম রিয়া রাখিয়া দিয়াছেন। রাজপুতানার অন্তর্গত কিশেনগড় নামক স্থানে অনাথাশ্রম স্থাপন করিয়াছেন। মুরশিদাবাদের নিকট ভাবদা গ্রামে এখনও অনাথাশ্রম চলিতেছে। স্বামী হরিদ্বারনিকটস্থ কন্খলে পীড়িত সাধুদিগের জন্ত সেবাশ্রম স্থাপন করিয়াছেন, প্লেগের সময় প্লেগব্যাধি-আক্রান্ত রোগীদিগকে অনেক অর্থব্যয় করিয়া সেবা-শুশ্রূষা করাইয়াছেন। দরিদ্র কাঙ্গালের জন্ত একাকী বসিয়া কাঁদিতেন! আর দের সমক্ষে বলিতেন, "হায়! এদের এত কষ্ট, ঈশ্বরকে চিন্তা করবার অবসর পর্য্যন্ত নেই!"

তিনি সন্ন্যাসী। তাঁহার কর্ম্মের কি প্রয়োজন?

"Who sows must reap" they say, and
"cause must bring
The sure effect. Good good; bad bad;
and none
Escape the law. But whoso wears a form
Must wear the chain." Too true: but far beyond
Both name and form is Atman ever free
Know thou art that, Sanyasin bold! say
"Om tat sat Om!"

Song of the Sannyasin by Vivekananda.

কেবল লোকশিক্ষার জন্ত। লোককে শিক্ষা দিবার জন্ত ঈশ্বর তাঁহাকে এই সকল কর্ম্ম করাইলেন। এখন সংসারী লোক শিখিবে যে, যদি তাহারাও কিছু দিন নির্জ্জনে ঈশ্বরের সাধনা করিয়া ভক্তি লাভ করে, তাহারাও স্বামীজীর ন্যায় নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে পারিবে, যথার্থ অনাসক্ত হইয়া দানাদি সৎকার্য্য করিতে পারিবে। স্বামীজীর গুরুদেব ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলিতেন, "হাতে তেল মেখে কাঁঠাল ভাঙ্গলে আঠা লাগবে না।" অর্থাৎ নির্জ্জনে সাধনের পর ভক্তিলাভ করিয়া পৃথিবীর কার্য্যে হাত দিলে, যথার্থ নির্লিপ্তভাবে কায করা যায়। স্বামী বিবেকানন্দের জীবন অনুধ্যান করিলে, নির্জ্জনে সাধন কাহাকে বলে, তাহার আভাস পাওয়া যায়। বিবেকানন্দের এ সকল কর্ম্ম লোকশিক্ষার জন্ত।

কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি॥

এই গীতোক্ত কর্ম্মযোগ অতিশয় কঠিন। তাই সাধুরা জ্ঞান ও ভক্তিপথ অবলম্বন করিয়া সংসার-কোলাহল ত্যাগ করিয়া নির্জ্জনে ঈশ্বরসাধন করেন। তবে বিবেকানন্দের ন্যায় উত্তম অধিকারী বীরপুরুষ কেবল এই কর্ম্মযোগের অধিকারী। ভগবান্‌কে অনুভব করিতেছেন, অথচ লোকশিক্ষার জন্ত সংসারে কর্ম্ম করিতেছেন, এরূপ মহাপুরুষ পৃথিবীতে কয়টি? ঈশ্বরপ্রেমে মাতোয়ারা, কামিনীকাঞ্চনের দাগ একটিও লাগে নাই, অথচ জীবের সেবার জন্ত ব্যস্ত হইয়া বেড়াইতেছেন, এরূপ আচার্য্য কয়টি দেখা যায়?

স্বামীজী লণ্ডনে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ১০ই নবেম্বর বেদান্তের কর্ম্মযোগ ব্যাখ্যায় গীতার কথা বলিলেন—

"Curiously enough the scene is laid on the battle-field, where Krishna teaches the philosophy to Aryuna and the doctrine which stands out luminously in every page of the Gita is intense activity, but in the midst of that, eternal calmness. And this idea is called the secret of work to attain which is the goal of the Vedanta." *Practical Vedanta, (London).*

বক্তৃতায় স্বামীজী কর্ম্মের মধ্যে সন্ন্যাসীর ভাবের ("calmness in the midst of activity") কথা বলিয়াছেন। স্বামী 'রাগদ্বেষবিবর্জ্জিত' হইয়া কর্ম্ম করিতে চেষ্টা করিতেন। তিনি যে এ রূপ কর্ম্ম করিতে পারিতেন, সে কেবল তাঁর তপস্যার গুণে।

শ্রীম

"জ্যাকা"

১

ঠিক সেই দিন পর্য্যন্ত আমি এক জন "বড় সাহেব" ছিলাম। রং'টা দোয়াতের কালীর মত, বা নদেরচাঁদ দাস, টুপী পরিলে মাথার তেলে ভিজিয়া উঠে, তথাপি আমি বড় সাহেব, কারণ, নাম জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীনদেরচাঁদ দাসের পরিবর্ত্তে এন্ দাস বলিতাম, মসীকৃষ্ণবর্ণ যথাসাধ্য সাবানের সাহায্যে শুভ্র করিবার চেষ্টা করিতাম এবং চাপরাসী ও কেরাণী 'সাহেব' না বলিলে চটিতাম। কিন্তু সেই দিন আমার চোখ খুলিয়া গিয়াছে, এখন আর সাহেব না বলিলে চটি না এবং ফিরিঙ্গীর পোষাক পরিয়া আফিসে যাই না। আমার নিজেরই মনে হয় যে, এখন আমি অনেকটা ভদ্রলোক হইয়াছি।

সেটা একটা রেলের ষ্টেশন, স্বামীজী নাম করিতে বারণ করিয়া দিয়াছেন, তাই করিব না। আমি সেই রেলের ষ্টেশনে নামিয়া মোটরে চড়িয়া 'দওরা' করিতে যাইব। গাড়ীখানা ষ্টেশনে আসিয়া থামিল। আমার আফিসের জমাদার এবং মোটরের সোফার আসিয়া সেলাম করিল, আর তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে একটা কর্ত্তিত-লাঙ্গুল মলিন বিলাতী কুকুর তাহার লাঙ্গূলের ধ্বংসাবশেষ নাড়িয়া বড় সাহেবকে খাতির করিল। কি জানি কেন, মনটা মানুষ ছাড়িয়া কুকুরের দিকে দৌড়াইল।

কুকুরটি বিলাতী, তাহার দৃষ্টি দেখিয়া বোধ হইল যে, সে তাহার মলিন ত্বকের জন্য বড়ই কুণ্ঠিত। সম্ভ্রান্ত ভদ্রসন্তান অবস্থার হীনতার জন্য সহসা প্রকাশ্যে মলিন বসনে বাহির হইতে যেমন লজ্জা বোধ করেন, সে যেন তেমনই কুণ্ঠা বোধ করিতেছিল। তাহার নিকটে গিয়া মাথায় হাত দিতে সে একেবারে আমার পায়ের তলে লুটাইয়া পড়িল; তাহার পর আমার মুখের দিকে চাহিল। কুকুরে কি কাঁদে? কিন্তু আমি স্পষ্ট দেখিলাম, তাহার চোখের কোণ দিয়া এক ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। কি জানি কেন, একটা অব্যক্ত ব্যথায় আমার মন আকুল হইয়া উঠিল।

জমাদারকে কুকুরটির কথা জিজ্ঞাসা করায় সে উত্তর দিতে পারিল না, কারণ, সে তখন 'সাহেবের' সাবানের বন্দোবস্ত করিতে ব্যস্ত ছিল। সে বলিল, "হুজুর, মালুম নেহি।" ষ্টেশনের কেহ তাহার সন্ধান দিতে পারিল না। আমি যখন চলিলাম, সে আমার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। ডাকবাংলায় সে আমার কুকুরের মত আমার পাশে বসিয়া রহিল। সে তাহার ব্যবহারে জানাইয়া দিল যে, সে ভদ্র, ভদ্র ব্যবহার তাহার অভ্যস্ত, দারিদ্র্যের তাড়নায় তাহার অঙ্গ মলিন হইয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার মন স্ফটিক জলের মত নির্ম্মল।

মাঘের বেলা পড়িয়া আসিল, তখন সে উঠিল। আমি ভাবিলাম যে, এইবার সে নিজগৃহে চলিয়া যাইবে। তাহাকে বিদায়-সম্ভাষণ করিবার জন্য ডাকিলাম, কিন্তু সে দূরেই দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার চোখ দেখিয়া বুঝিলাম যে, সে আমাকে ডাকিতেছে, তাহার সঙ্গে যাইবার জন্য আহ্বান করিতেছে—সে নিঃশব্দ আহ্বান আমার মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিল, আমি একটা কালো বর্ম্মা চুরুট মুখে দিয়া ইজিচেয়ার ছাড়িয়া উঠিলাম। আমাকে উঠিতে দেখিয়া সে আনন্দে অধীর হইয়া উঠিল এবং নৃত্য করিতে করিতে আমার আগে আগে ছুটিয়া চলিল।

সে ষ্টেশনটা অতি ছোট, নিকটে কোন গ্রাম নাই, অনেক দিন আগে সেখানে একটা বড় ষ্টেশন ছিল, যখন ছোট এঞ্জিন অল্পদূর চলিয়াই জল লইত, সেই সময়ে রেল কোম্পানীর অনেক লোক এই ষ্টেশনে বাস করিত। তাহাদের বাসের ঘরগুলা একটা বিকটাকার রাক্ষসের কঙ্কালের মত পড়িয়া আছে, তাহাদের দরজা-জানালাগুলা কে খুলিয়া লইয়া গিয়াছে, ছাতগুলা পড়িয়া গিয়াছে। লোকজনের 'লাইনের' অদূরে একটা বাংলা, আমার বলা উচিত, একটা বাংলা ছিল, কারণ, বাংলার ইটের দেওয়ালগুলা ব্যতীত আর কিছুই ছিল

বেড়াইল। বাংলাটার চারিদিক ঘুরিয়া দেখিলাম, এক কোণে একটা বড় করবীগাছ মাথা তুলিয়া আছে, আর এক দিকে বড় বড় ঝোপের ভিতরে অপরাজিতা ফুটিয়া আছে, চারিদিকে কাঁটা গাছের মধ্যে দুই একটা গাঁদাফুলের গাছ এখনও দেখা যায়। দেখিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, এই স্থানটায় একটা সযত্নে সাজান বাগান ছিল। বাগান ছাড়িয়া বাংলার উপরে উঠিলাম, অস্তগামী সূর্য্যের আলোকে দেখিলাম যে, দেওয়ালে তখনও স্থানে স্থানে চূণ লাগিয়া আছে। এক যায়গায় একটা কুলুঙ্গীর মধ্যে অনেকগুলা রঙের সমাবেশ দেখা গেল, তাহার মধ্যে আমার মনে হইল যেন, বাঙ্গালা অক্ষরে কে কবে কি লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছে।

কুকুরটা আমার কাছেই উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, সে যেন আমাকে সাহায্য করিতে আসিয়া কেবল ভাষার অভাবে কিছু বলিতে পারিতেছিল না। তাহার জীবনের সমস্ত ইতিহাস যেন সেই জীর্ণ মলিন অক্ষরগুলিতে লেখা আছে, তাহা যেন সে পড়িয়াও মুখে বলিতে পারিতেছিল না। তাহার ডাগর ডাগর চোখ দু'টা আমাকে যেন বড় করিয়া এই কথাগুলা শুনাইয়া গেল। আমি অনেক কষ্টে অক্ষর কয়টা পড়িলাম। তাহাতে লেখা ছিল, "শ্রীমাধুরীময়ী দেবী।"

কোন্ দিক দিয়া মাঘের সূর্য্য অস্ত গেল, ঘন ঘোর ছায়া আসিয়া আমাকে বেষ্টন করিল, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। আমি তখন ভাবিতেছিলাম, এই দূরদেশে কবে কোন্ বাঙ্গালী আসিয়াছিল, কবে সে সপরিবারে এই বাংলায় বাস করিয়া গিয়াছে, কবে কোন্ কুলমহিলা সঙ্গিহীন জীবনের সুদীর্ঘ সময় অতিবাহিত করিবার জন্য এই কুলুঙ্গীর বর্ণ-বিন্যাসের মধ্যে তাহার স্মৃতি জড়াইয়া রাখিয়া গিয়াছেন। হঠাৎ আমার চমক ভাঙ্গিয়া গেল। কারণ, একটা কোমল সুশীতল নাসা আমার হস্তের মধ্যে প্রবেশ করিল। তখন আমি বুঝিলাম যে, আমি জীর্ণ বাংলার মধ্যে দাঁড়াইয়া আছি, আর সেই কুকুরটি আমাকে পরিত্যাগ করে নাই।

দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ফিরিয়া আসিলাম। আসিবার সময়ে মনে বড়ই কষ্ট হইল, কারণ, এই সঙ্গিহীন বিদেশবাস ক্রমে অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল, ভারতের এই সুদূর প্রান্তে মাতৃ-ভাষায় বঙ্গাক্ষরে লিখিত নামটি এই অল্পক্ষণের মধ্যেই পরম আত্মীয়ের মত আমার বক্ষের একটা নিভৃত কোণ অধিকার করিয়া লইয়াছিল।

জমাদার আসিয়া জানাইয়া দিয়া গেল যে, তখনও আমি "বড় সাহেব" আছি, কারণ, আমার বিলম্ব দেখিয়া সে খুঁজিতে বাহির হইয়াছে। সেই অন্ধকারে আলোক পাইয়া অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হইয়া গেলাম। সকালবেলায় মোটরে চড়িয়া "টুরে" যাইবার কথা ছিল; কিন্তু আমার বিজ্ঞ বিচক্ষণ জমাদার আমার ভাবগতিক দেখিয়া বুঝিয়া লইল যে, সাহেব এই স্থানে দুই এক দিন "মোকাম" করিতে ইচ্ছা করেন এবং "আরাম" করিবেন। তখন সে নিরীহ পল্লীবাসীর কুক্কুট ও ডিম্বের সন্ধানে বাহির হইল। কুকুরটি আমার কাছেই রহিয়া গেল।

২

ষ্টেশনের "পয়েন্টস্‌ম্যান্" অনেক দিন এই ষ্টেশনে কায করিয়াছে, এখন তাহার বয়স হইয়াছে, সুতরাং বয়সের ধর্ম্ম অনুসারে সে অনেক অনাবশ্যক কথা বলে। বুড়া বলিয়া লোক তাহাকে কিছু বলে না। বহুদিন পূর্ব্বে সমাহিত "সাহেবদের" নাম করিয়া সে অজস্র অশ্রু বিসর্জ্জন করে এবং নূতন ষ্টেশন-মাষ্টার তাহাকে কোন কথা বলিলে সে তাহাকে গ্রাহ্য করে না। দ্বিতীয় দিন বৈকালবেলায় যখন সেই জীর্ণ বাগানটির চারিধারে আমি ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম, তখন সেই বুড়া আসিয়া আমাকে সেলাম করিল, তাহার সহিত বাংলার এবং কুকুরের কি সম্বন্ধ, না জানিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি কি চাও?" বুড়া আবার সেলাম করিয়া বলিল, "সাহেব, ঐ কুকুরটি আমার।"

তাহার কথা আমাকে আশ্চর্য্য করিয়া দিল। কারণ, আমার মন তখন অজ্ঞাত মাধুর্য্যে মণ্ডিত মাধুরীময়ীর স্মৃতিবিজড়িত জীর্ণ বাংলাখানিকে বড়ই মধুর করিয়া তুলিয়াছিল। আমি আমার মনের চিত্রপটে কল্পনার অনন্ত ভাণ্ডার দিয়া কুকুরের অধিকারীর যে চিত্র আঁকিয়া তুলিয়াছিলাম, তাহাতে আর এই পক্ককেশ বৃদ্ধে অনেক তফাৎ। আমি যখন অন্যমনস্ক হইয়া

বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কুকুর যদি তাহার, তবে সে এই জীর্ণ বাংলায় কেন আসে, তখন সে আর একবার সেলাম করিয়া আমাকে বসিতে অনুরোধ করিল।

যেখানে বাংলার ফটক ছিল, সেই স্থানে একটা ছোট বটগাছ জন্মিয়াছিল, বুড়া সেই গাছটা কাটিতে কাটিতে বলিল যে, অনেক দিন পূর্ব্বে সব গাড়ী এই ষ্টেশনে থামিত, তখন অনেক "সাহেব" এবং অনেক লোকজন এই ষ্টেশনে বাস করিত, ষ্টেশনের "বড় সাহেব" এই বাংলায় থাকিত এবং অনেক "বড় সাহেবকে" সে আসিতে ও যাইতে দেখিয়াছে। তাহাদের মধ্যে এক সময়ে এক ছোক্‌রা সাহেব আসিয়াছিল, তাহাকে বড় সাহেব করা রেল কোম্পানীর অত্যন্ত অন্যায় হইয়াছিল; কারণ, তাহার মুখ হইতে শিশুর ভাব তখনও মুছিয়া যায় নাই। সেই শিশু বড় সাহেবের সঙ্গে আর একটি শিশু আসিয়াছিল, সেটি তাহার মেম। এই ষ্টেশন হইতে অনেক দূরে হিন্দুস্থানের এক কোণে বাঙ্গালা মুলুক আছে, সেই শিশু দুইটি আর এই কুকুরটি সেই বাঙ্গালা মুলুক হইতে আসিয়াছিল। পরে তাহারা চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু কুকুরটি লইয়া যায় নাই।

বুড়ার কথা শুনিয়া বুঝিলাম যে, আমার স্বপ্নের কতকটা ঠিক। ভারতের এই সুদূর প্রান্তে মাধুরীমণ্ডিতা কোন মাধুরীময়ী কোন প্রবাসীর তৃষিত চিত্তের তীক্ষ্ণ পিপাসা শান্ত করিয়াছিলেন, সেই জীর্ণ গৃহের ক্ষুদ্র লিপি আর এই কুকুর তাহার স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ রহিয়া গিয়াছে।

বুড়াকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "সাহেব কুকুর ছাড়িয়া গেল কেন?" বুড়া কহিল, "সাহেব, তুমি বাঙ্গালা মুলুক জান? সেখানকার লোক সরিষার তৈলে দুর্গন্ধ পায় না! আমি কিন্তু এখনও সরিষার তৈলের গন্ধ পাইলে নাকে কাপড় দি।" আমি যখন তাহাকে বলিলাম যে, আমিও বাঙ্গালা মুলুকের লোক, তখন সে লজ্জিত হইল।

অনেকক্ষণ পরে সে বলিল, "সাহেব, আমি বুড়া হইয়াছি, আমার সমস্ত জীবন প্রায় কাটিয়া গিয়াছে, আমার তুলনায় তুমি এখনও ছেলেমানুষ আছ, তুমি জীবনের কিছুই বুঝ না; এ জীবনটা সমুদ্রের মত, কখনও বা আয়নার মত শান্ত থাকে, আবার কখনও প্রলয়ের রুদ্রমূর্ত্তি ধরে। একটা দমকা হাওয়া আর তার সঙ্গে একটা প্রকাণ্ড ঢেউ আসিয়া আমার সাহেবের জীবনটা সুখস্বাচ্ছন্দ্যের শান্তি হইতে প্রলয়ের রুদ্র তাণ্ডবে পরিণত করিয়া দিয়া গিয়াছিল। সাহেব, তুমি কি সাদী করিয়াছ?" আমি বলিলাম "না।" সে বলিল, "তবে তুমি বুঝিতে পারিবে না, সেই ঝড়ের পর দিন বাঙ্গালী মা-জী চলিয়া গেল, তাহার পরে সাহেব চাকরী ছাড়িয়া দিল, সঙ্গে সঙ্গে রেল কোম্পানীর হাওয়া বদলাইয়া গেল। এখন আর এখানে ডাকগাড়ী থামে না। কোন গাড়ী এঞ্জিন বদলায় না। সাহেব চাকরী ছাড়িয়া চলিয়া গেল, জিনিষপত্র পড়িয়া রহিল, অনেক দিন পরে রেল কোম্পানীর লোক আসিয়া জিনিষপত্র নীলাম করিয়া গেল বটে, কিন্তু জ্যাকাকে লইয়া গেল না। আমার নাম গোবিন্দামারুতী, সাহেবের যখন আর কেহ রহিল না, তখন আমিই রহিয়া গেলাম। কারণ, সাহেব যত দিন এ দেশে ছিল, তত দিন আমাকেই দুর্গন্ধময় সরিষার তৈল আনিতে পুনায় যাইতে হইত।"

জ্যাকা লেজ নাড়িয়া জানাইল যে, তাহার নাম জ্যাকা। কিন্তু সে বাঙ্গালী সাহেবের উত্তরাধিকারী গোবিন্দামারুতীর দিকে ফিরিল না। বুড়া যখন জ্যাকাকে লইয়া যাইবার অনুমতি চাহিল, তখন জ্যাকা এমন করুণ ভাবে আমার দিকে চাহিয়া রহিল যে, আমার প্রাণ তাহাকে ছাড়িয়া দিতে চাহিল না; আমার মনে হইল যে, জ্যাকা তাহার অব্যক্ত ভাষায় বলিতেছিল যে, সে যাইতে চাহে না।

হঠাৎ জ্যাকা পাগল হইয়া উঠিল, সে ডাকিতে ডাকিতে ছুটিয়া চলিয়া গেল, বুড়া তাহার পিছনে পিছনে ছুটিল। আমি মনে করিলাম যে, জ্যাকার হয় ত মতের পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে, সে তাহার মনিবের উত্তরাধিকারীর গৃহেই ফিরিয়া গেল।

মনটা ক্ষুণ্ণ হইল। কারণ, বাঙ্গালীর কুকুর বলিয়া জ্যাকার উপরে আমার একটু স্নেহ জন্মিয়াছিল। ক্ষুণ্ণ মনে ধীরে ধীরে ডাক-বাংলার দিকে চলিলাম। তখন কুয়াসায় চারিদিকের পাহাড়-পর্ব্বত ঢাকিয়া গিয়াছিল; সেই ঘন কুয়াসার আবরণ ভেদ করিয়া সহসা দুইটি

কয়জনমূর্ত্তি আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, তাহার মধ্যে এক জন গোবিন্দামারুতী।

আর এক জন পরিষ্কার বাঙ্গালায় আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, শুনিলাম, আপনি বাঙ্গালী।" অভ্যাসের দোষে তাঁহাকে নমস্কার করায় তিনি বলিলেন, "দেখুন, জ্যাকা আমার কুকুর, এই ১২ বৎসর ধ'রে তাকে আমি ভুলবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু ভুলতে পারিনি, তাই তাকে খুঁজতে এসেছি।"

তখন বাহিরের কুয়াসা ঘন হইয়া আসিল বটে, কিন্তু মনের কুয়াসা অনেকটা কাটিয়া গেল।

৩

"সমস্তই ভুল, বড় বড় ভুল লইয়া আমরা সংসার বাঁধিয়া বসিয়া থাকি, অথচ যদি কেহ সে ভুল দেখাইয়া দেয়, তখন রাগিয়া অস্থির হই। সেই রাগটা আর একটা প্রকাণ্ড ভুল, রাগের বশে যাহা করি, তাহার জন্য অবশিষ্ট জীবনের প্রতিদিন অনুতাপ করি; কিন্তু যাহা যায়, যে যায় সে আর কখনও ফিরিয়া আসে না, গড়িয়া তোলা যত কঠিন, তাহার তুলনায় ভাঙ্গিয়া ফেলা ততই সহজ! কিন্তু ভাঙ্গিবার সময়ে, জিনিষটা যে কষ্টে গড়িয়া তোলা হইয়াছিল, সে কথাটা একেবারেই মনে হয় না। মানুষ নিজের গড়া জিনিষ যখন ভাঙ্গে, তখন *যে ব্রহ্মদৈত্য তাহাকে পাইয়া বসে, সে যে মানুষকে* অতীত বা ভবিষ্যতের কথা ভাবিতে দেয় না।" স্বামীজী যখন কথাগুলা বলিলেন, তখন সেগুলা ধ্রুব সত্য বলিয়া মনে হইল।

জ্যাকা নিশ্চিন্ত মনে তাঁহার কোলের কাছে বসিয়া ছিল, তাহার চোখের করুণ ভাবটা কমিয়া আসিয়াছিল, আর গোবিন্দামারুতী গায়ে একখানা মোটা কম্বল জড়াইয়া আর একটা বুড়া কুকুরের মত বারান্দায় অপেক্ষা করিতেছিল।

"জ্যাকা যখন এক মাসের শিশু, তখন সে তাহার মনিবের বাংলায় আশ্রয় পাইয়াছিল। অগ্রহায়ণের দুরন্ত শীতে সে মনিবের মৃগচর্ম্মের জুতার মধ্যে কুণ্ডলী পাকাইয়া শুইয়া থাকিত এবং যথাসাধ্য তাহার মনিব দুইটির পশ্চাৎ পশ্চাৎ গৃহ হইতে গৃহান্তরে যাইবার চেষ্টা করিত।"—বলিতে বলিতে স্বামীজীর চোখ দুইটি জলে ভরিয়া আসিল। আমার মনে হইল যে, একবার মুখ ফুটিয়া কারণের কথা জিজ্ঞাসা করি; কিন্তু সেই অজ্ঞাত মাধুর্য্যমণ্ডিতা মাধুরীময়ীর অদৃষ্ট মূর্ত্তি আমাকে নিষেধ করিয়া গেল।

"পুরুষ ভাবে যে, স্ত্রী তাহার সম্পত্তি। কত দিন ধরিয়া পুরুষের মনে এই ভাব চলিয়া আসিতেছে, তাহা কেহ বলিতে পারে না, অথচ সকল দেশে প্রায় সমস্ত সভ্য সমাজে নারী পুরুষের সম্পত্তি। পুরুষ মনে করে যে, যে স্ত্রী তাহার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছে, তাহার কোনই স্বাধীনতা নাই, তাহার দেহ, মন, প্রাণ সমস্তই পুরুষের নিজস্ব সম্পত্তি। আমরা স্ত্রীর সহিত পর-পুরুষকে কথা কহিতে দেখিলে হয় ত সকল সময়ে প্রকাশ্যে আপত্তি করিতে পারি না; কিন্তু মনে মনে হিংসায় জ্বলিয়া মরি। আমার স্ত্রীর অঙ্গ পরপুরুষ স্পর্শ করিয়াছে, শুনিলে মনে করি যে, সে স্ত্রী অশুচি হইয়া গিয়াছে, আমার সম্পত্তির অপচয় হইয়াছে; তখন রাগে, হিংসায়, বিদ্বেষে মানুষ পশুতে পরিণত হয়।"

স্বামীজী বলিতেছিলেন, আর আমি শুনিতেছিলাম, নানা কথা জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা হইতেছিল বটে, কিন্তু লজ্জা আসিয়া আমার কণ্ঠরোধ করিয়া দিতেছিল, আমার মনে হইতেছিল যে, এই ভুল কি সকলেই করে, আর সকলেই কি পরে তাহা বুঝিতে পারে?

"ভোলা যায় না, এই বারো বৎসর দেশে বিদেশে, মানুষের বনে আর জনহীন অরণ্যে অনর্থক ঘুরিয়া বুঝা গেল যে, ভোলা যায় না। ভুল ভোলা যায়, কিন্তু স্মৃতি পাতরে ক্ষোদা মূর্ত্তির মত মনের কেন্দ্র অধিকার করিয়া থাকে। অনেক দিন ধরিয়া মনে করিতেছি যে, ফিরিয়া আসিব, নানা কারণে ফিরিয়া আসা হয় না। আমার কেহ নাই, সংসারে কোন বন্ধন নাই, দেশে গৃহ নাই, সংসারের সুখ-দুঃখের একমাত্র চিহ্ন এই সুদূর বিদেশে রাখিয়া গিয়াছি; সুতরাং যেখানেই থাকি; মনে হয় যে, একবার এইখানে ফিরিয়া আসি।

"মাধুরী যখন বারো বৎসরের, তখন তাহাকে বিবাহ করিয়াছিলাম, তাহার এক বৎসর পরে সাত সমুদ্র তের নদী পারে তাহাকে এই পর্ব্বতসঙ্কুল নির্দ্দয় দেশে লইয়া

আসিয়াছিলাম। তাহার সঙ্গিহীন জীবন দুঃসহ হইয়াছিল বলিয়া এই বন্ধুর শিলাসঙ্কুল ভূমি বহু অর্থব্যয়ে নন্দন-কাননে পরিণত করিয়াছিলাম ; যে জানালায় সে তাহার নামটা লিখিয়া গিয়াছে, তাহার নীচে যে বুগেনভিলিয়া গাছটা বড় হইয়া উঠিয়াছে, তাহা এক আষাঢ়ের ভরা বাদলের দিনে সে নিজের হাতে পুতিয়া রাখিয়া গিয়াছে, ঐ বনের চারিদিকে যে গাঁদার রাশি এখনও ফুটিয়া থাকে, তাহা সে-ই বাঙ্গালা দেশ হইতে আনিয়াছিল।

"ব্রহ্মদৈত্য যখন আমার স্কন্ধে আসিয়া চাপিল, তখন এক মুহূর্ত্তের মধ্যে সমস্ত কথা ভুলিয়া গেলাম, সেই মুহূর্ত্তের পাপের প্রায়শ্চিত্ত এই সুদীর্ঘ যুগ ধরিয়া করিয়া আসিতেছি। প্রতিদিন প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আমার সেই সুখের দিনের কথা স্মরণ করি, অন্য কথা মনে হয় না। আমার এই সন্ন্যাসীর বেশ মিথ্যা ছলনা, আমার দেশভ্রমণ, মনের আবেগ রোধ করিবার বৃথা চেষ্টা। যখন ভুল করিয়াছিলাম, যখন নিজের হাতে গড়িয়া তোলা সংসার ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিলাম, যখন ব্রহ্মদৈত্য আমার স্কন্ধে ভর করিয়াছিল, তখন এ দেহে যৌবনের বল ছিল।

"এখন বুঝিতেছি যে, আমার এ জীবনের এই সন্ধ্যা, তাহাতে প্রভাত বা মধ্যাহ্ন আর আসিবে না ; জীবনের সন্ধ্যার শ্যামায়মান আলোকে মধ্যাহ্নের সুখের দিনের তীব্র ছবি মনের পটে ফুটিয়া উঠিয়া প্রতিনিয়ত আমাকে ব্যাকুল করিয়া তুলে। যৌবন মনের, তাহার দেহের সহিত সম্পর্ক অতি অল্প ; মনের যৌবন যখন ঢলিয়া পড়ে, তখন দেহের বল তাহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে না। যৌবনে কবি গাহিয়াছিলেন, 'ভুল করেছিনু ভুল ভেঙ্গেছে।' কিন্তু তাহার পরের কথাটা তিনি লিখিয়া যান নাই। আমার বার বৎসর পূর্ব্বের ভুল গত বার বৎসরের প্রত্যেক দিন ভাঙ্গিয়াছে, কিন্তু তাহার পরে?"

তাহার পরে কি, সে কথা বলা বড়ই কঠিন, সুতরাং আমিও উত্তর খুঁজিয়া পাইলাম না। জ্যাকা তখন কোলের কাছে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, গোবিন্দামারুতী বারান্দার থামে ঠেস দিয়া ঢুলিতেছিল, মিস্ত্রী "খানা তৈয়ার" বলিতে আসিয়া তিনবার ফিরিয়া গিয়াছিল, কারণ, তখন রাত্রি অনেক।

সেই গভীর রাত্রিতে নৈশ নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া ষ্টেশনে কুলীর দল গান করিতেছিল, আমার কি মনে হইতেছিল জান? যে স্বপ্ন আনিয়া দেয়, সে-ই আবার কেন তাহা ভাঙ্গে? সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেলে সে কেন মানুষকে সেই সুখ-স্বপ্নের স্মৃতির জন্য পাগল করিয়া দেয়? সে কেন করে? কিসের জন্য করে? করিয়া তাহার কি সুখ? ভুল কি মানুষ করে, না সে করায়? জীবনের এই বৃহত্তর প্রশ্নগুলার কথা আমাকে তখন অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল, ক্ষুধা-তৃষ্ণার অবসর ছিল না।

বড় সাহেবী এবং সরকারী কায ভুলিয়া সেই ডাক-বাংলায় দশ দিন রহিয়া গেলাম, সেই সন্ন্যাসী জীর্ণ বাংলার জঙ্গল নিজের হাতে পরিষ্কার করিল এবং তাহারই স্পর্শে আসিয়া বুড়া গোবিন্দামারুতী তাহার বৃদ্ধবয়[illegible] অবলম্বন রেলের চাকরীটি হারাইল।

৪

সরকারী কায সারিয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম যে, স্বামীজী সেই জীর্ণ বাংলার মধ্যে আস্তানা গাড়িয়া বসিয়া গিয়াছেন, গোবিন্দা আর জ্যাকা তাঁহার চেলা হইয়াছে। স্বামীজীকে অনেক বুঝাইয়া আমার সঙ্গে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিলাম ; কিন্তু তিনি যে কথা বলিলেন, তাহার আর উত্তর খুঁজিয়া পাইলাম না।

তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস যে, এক যুগ পরে ঘুরিতে ঘুরিতে তিনি যেমন আবার তাঁহার নষ্ট নীড়ে ফিরিয়া আসিয়াছেন, এক দিন সেই ভাবে মাধুরীময়ীও ফিরিয়া আসিবে। এ বিশ্বাস তাঁহার কিছুতেই টলাইতে পারিলাম না। প্রমাণস্বরূপ স্বামীজী আমাকে দেখাইয়া দিলেন যে, জ্যাকা প্রতিদিন প্রত্যেক ট্রেণের সময়ে ষ্টেশনে গিয়া উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। তাহার উদাহরণ দেখিয়া গোবিন্দাও যাইতে আরম্ভ করিয়াছে। বুড়া বলে যে, তাহার সাহেব আবার বড় সাহেব হইবেন, ষ্টেশনে আবার সকল গাড়ী থামিতে আরম্ভ করিবে এবং মাইজী ফিরিয়া আসিলে তাহাকে আবার দুর্গন্ধ সরিষার তৈল সংগ্রহ করিতে পুনরায় যাইতে হইবে। ৭।৮ দিন ডাক-বাংলায় থাকিয়া যখন কোনমতেই স্বামীজীকে সে স্থান

পরিত্যাগ করাইতে পারিলাম না, তখন বাধ্য হইয়া কর্ম্মস্থলে ফিরিলাম। জ্যাকা আমাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া গেল।

স্বামীজীর অনুরোধমত তাঁহার প্রকৃত পরিচয় রেল কোম্পানীকে জানাইয়া সেই জীর্ণ বাংলাটি খরিদ করিয়া লইলাম। রেল কোম্পানী স্বামীজীর পরিচয় পাইয়া জানাইল যে, স্বামীজীর আসবাবপত্র বিক্রয় করিয়া যে টাকা হইয়াছিল, তাহা সুদে বাড়িয়া অনেক টাকা হইয়াছে। বাংলার জমীর দাম কাটিয়া লইয়াও অনেক টাকা বাঁচিল, সেই টাকা দিয়া জীর্ণ বাংলার উপরে একখানা চাল তুলিয়া দিয়াছিলাম।

মেষে মেষে বেলা বাড়িয়া চলিল, আমার সেই সঙ্গিহীন সুদীর্ঘ প্রবাসে স্বামীজী আর জ্যাকা ক্রমশঃ আমার পরম আত্মীয় হইয়া উঠিলেন। ছুটী পাইলে বাঙ্গালী যেমন দেশে ছুটিয়া যায়, আমিও সেইরূপ ছুটী পাইলে স্বামীজীর নিকট ছুটিয়া যাইতাম। প্রতিদিন জ্যাকা ষ্টেশনের প্লাটফরমে আমাকে অভ্যর্থনা করিত, তাহার নির্ব্বাক চোখ দুইটি প্রতিদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করিত, "তুমি আসিলে, সে আসে নাই?" গাড়ীর সমস্ত যাত্রী ষ্টেশন ছাড়িয়া গেলে তবে সে ফিরিত। বোধ হয় তাহার মনে হইত যে, তাহার প্রিয়তম ফিরিয়া আসিয়াছে, কিন্তু তাহাকে ছলনা করিবার জন্য লুকাইয়া আছে। কি জানি কেন, তাহার ভাব দেখিয়া নিত্য আমার চোখ জলে ভরিয়া আসিত।

আমার ইচ্ছা হইত যে, স্বামীজীর ভুলের কথাটা খুলিয়া জিজ্ঞাসা করি, কিন্তু বৃদ্ধ স্বামীজীর সম্মুখে লজ্জা আমার জিহ্বা জড়াইয়া ধরিত, তালু শুষ্ক হইয়া যাইত, আমার কোন কথাই জিজ্ঞাসা করা হইত না।

মধ্যে মধ্যে স্বামীজী বলিতেন যে, উৎকট সাহেবীয়ানার অনুকরণ আমাদের একটা মস্ত ভুল, আমরা ইংরাজী শিখিয়া, ইংরাজী পোষাক পরিয়া মনে করি যে, আমরা "সাহেব" হইয়াছি; আমরা মাতৃভাষা ব্যবহার করিবার সময়ে দশটা কথার মধ্যে পাঁচটা ইংরাজী কথা ব্যবহার করি, ইংরাজী ভাব অনুকরণ করিয়া বাঙ্গালা লিখি, কিন্তু আমাদের দেহের মধ্যে হাজার বৎসরের পুরান দেশীয় ভাব যে মজ্জাগত হইয়া রহিয়া গিয়াছে, তাহা আমরা প্রতি পদে ভুলিয়া যাই। স্বামীজী এই কথাটা প্রায়ই বলিতেন।

পূর্ব্বের কথা এবং পরের কথা মিলাইয়া আমি স্বামীজীর ভুলের কথাটা জুড়িবার চেষ্টা করিতাম। বৃদ্ধের ইংরাজী ভাবাপন্ন প্রথম যৌবনের জীবনে স্বামীজী কি ভুল করিয়াছিলেন? তাঁহার উৎকট সাহেবীয়ানা কোন অপরিচিত পুরুষকে মাধুরীময়ীর নিকটে আনায় তাঁহার মজ্জাগত দেশীয় ভাব তাঁহার হৃদয়ে ঈর্ষার বহ্নি জ্বালিয়া দিয়াছিল? তাহার খণ্ড খণ্ড কথাগুলা একত্র যোজনা করিয়া আমি যে সমস্ত উপাখ্যানের সৃষ্টি করিতাম, তাহা লিখিলে হয় ত দশখানা উপাখ্যান হইয়া যাইত।

অনেক দিন কাটিয়া গেল। ক্রমে বৃদ্ধের আর জ্যাকার মায়ার বন্ধন আমাকে নাগপাশের মত আবদ্ধ করিল। দেশে আমার কেহ ছিল না, সুতরাং আমার সমস্ত মায়া ঐ দুইটি প্রাণীর উপর গিয়া পড়িয়াছিল। ক্রমে আমার মনের ভাবও পরিবর্ত্তিত হইয়া তাঁহাদিগের মনের ভাবের সহিত মিশিয়া গিয়াছিল। আমিও মনে করিতাম যে, মাধুরীময়ী এক দিন ফিরিয়া আসিবেন, তাঁহার মনের চাঞ্চল্য শান্ত হইয়া যাইবে, তখন তিনি যৌবনের নষ্ট নীড়ের জন্য ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়া আসিবেন।

৫

অনেক দিন কাটিয়া গিয়াছে, জ্যাকা বুড়া হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু তাহার চোখের উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি এখনও শান্ত হয় নাই। দীর্ঘ জীবনের গুরু ভার স্বামীজী আর গোবিন্দার দেহ নোয়াইয়া দিয়াছে। দীর্ঘ কাল প্রবাসে থাকিয়া আমার মন মাঝে মাঝে চঞ্চল হইয়া উঠে, এই নিষ্পাদপ শিলাসঙ্কুল দেশে প্রবাসীর মন স্বভাবতঃ শস্য-শ্যামল মাতৃভূমির দিকে ছুটিয়া যাইতে চাহে। স্বামীজীর কি মনে হয়, তাহা জানি না, কিন্তু আমার মন মধ্যে মধ্যে দেশে ফিরিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে।

স্বামীজী বলেন যে, মাধুরী যে দিন আসিবে, সে দিন ষ্টেশনে দাঁড়াইয়া সে তাহার স্বহস্ত-রোপিত বুগেনভিলিয়ার রক্তচ্ছটায় তাহার নীড় উদ্ভাসিত দেখিতে পাইবে; সে বুঝিবে যে, তাহার জন্য অনেকে প্রতীক্ষা

করিয়া আছে। বৃদ্ধ জ্যাকা কম্পিতপদে যখন তাহাকে অভ্যর্থনা করিবে, তখন সে বুঝিবে যে, তাহার প্রবাসের এই দীর্ঘ দিন ধরিয়া সে কেবল তাহারই চিন্তা করিয়াছে। শুনিয়া আমি মনে করিলাম, সে দিন কবে আসিবে? সে দিন আসিলে এই বৃদ্ধ এবং তাহার বৃদ্ধ কুকুরের মায়ামুক্ত হইয়া এই নিষ্ঠুর প্রবাসের শেষে আমি আবার আমার দেশে ফিরিয়া যাইব। দিন ত কাটিয়া গেল, কিন্তু সে দিন ত আসে না!

হঠাৎ এক দিন তার পাইয়া ছুটিয়া গেলাম; গিয়া শুনিলাম, জ্যাকা আমাকে মুক্তি দিয়া গিয়াছে। যে দিন তিনি আসিলেন, সে দিনও ষ্টেশনে গিয়া দাঁড়াইয়াছিল, কিন্তু তাহার বৃদ্ধ হৃদয় আনন্দের বন্যার বেগ সহ্য করিতে পারে নাই। জ্যাকা মাধুরীদেবীর কোলে চড়িয়া তাঁহাকে স্বামীজীর নিকট পৌঁছাইয়া দিয়া গিয়াছিল, জীর্ণ বাংলায় ফিরিয়া সে একদণ্ডকাল বাঁচিয়া ছিল। জীর্ণ বাংলার সেই জীর্ণ বাতায়নতলে মাধুরীদেবী তাহাকে স্বহস্তে শোয়াইয়া রাখিয়াছেন, তাহার বৃদ্ধ নয়নের উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি চিরদিনের মত শান্ত হইয়া গিয়াছে।

আমি মুক্ত, আমরা সকলেই দেশে ফিরিব, কিন্তু জ্যাকাকে এ নিষ্ঠুর, নিষ্পাদপ, নির্ব্বান্ধব দেশে একা রাখিয়া যাইতে আমার মন সরিতেছে না, কারণ, জ্যাকা যে আমাদেরই মত বাঙ্গালী।

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রিয়া

সারাটি দিবস গৃহ-কাযে কে সে দূরে রয় স'রে স'রে,
যদি কভু পড়ে চ'খে চ'খ তার সরমে কে যায় ম'রে?
বাধ-বাধ ভাব তবু কে আমার ঘরে আসে ছল ক'রে,
ঘোমটার আড়ে কে চাহে চকিতে যদি কাছে এসে পড়ে?
কাহার ছবিটি নিশিদিন মোর ভরিয়া রয়েছে হিয়া?
আমার জীবন-প্রিয়া সে যে গো আমার পরাণ-প্রিয়া।

কাঁখে নিয়ে কে সে ভরা কলসীটি পথে যেতে ধীরে চলে,
প্রতি পদে পদে জড়িত চরণ লজ্জায় পড়ে ঢলে?
নেয়ে এসে কে সে মরাইয়ের পাশে কালো এলোচুল ঝাড়ে
আনমনে কে সে পান সাজে বসি ঘরের কোণের আড়ে?
টিপ্‌পরা কার কচি মুখখানি আছে হিয়া উজলিয়া?
আমার জীবন-প্রিয়া সে যে গো আমার পরাণ-প্রিয়া।

ঘোমটাটি খুলে দিলে "যাও" বলি কে করে কপট রোষ?
ভুল হয়ে গেলে কোন কাযে তার কে দেয় আমারে দোষ?
প্রতি ভঙ্গিমা হ'তে সদা কার সুষমা ঝরিয়া পড়ে?
রবির কিরণ মূর্চ্ছিত হয় কাহার কাঁকন পরে?
নয়নে নয়নে রাখিতে কাহারে চঞ্চল সদা হিয়া?
আমার জীবন-প্রিয়া সে যে গো আমার পরাণ-প্রিয়া।

শ্রান্ত হৃদয়ে ফিরি যবে ঘরে সারাটি দিনের শেষে,
বাতায়ন-পাশে আমারে হেরিয়া কে দাঁড়ায় মৃদু হেসে?
গামছা তো করি আনে তাড়াতাড়ি দিয়ে গাড়ুভরা জল;
আসন পাতিয়া ধরে দেয় কেবা রেকাবে সাজায়ে ফল?
ভুবন-ভুলান হাসি কে সে হাসে প্রাণখানি হরে নিয়া?
আমার জীবন-প্রিয়া সে যে গো আমার পরাণ-প্রিয়া।

কে সে দিয়ে জল তুলসীর তলে, দুয়ারে সন্ধ্যাকালে,
মুখরি পল্লী শঙ্খ বাজায়ে ঘরে ঘরে দীপ জ্বালে?
ছেলে-মেয়েদের পাড়াতে গে' ঘুম কে পড়ে ঢুলিয়া ঘুমে?
বকুলের বাস চাঁদের আলোয় কারে যায় সুখে চুমে?
কার কথাগুলি ভুলিতে পারি না সুদূর প্রবাসে গিয়া?
আমার জীবন-প্রিয়া সে যে গো আমার পরাণ-প্রিয়া।

নিশীথে কে আসে একগাল হেসে, আধ লাজে ধীরে শয়নে,
স্বর্গ-সুষমা কে সে আনে হানি চঞ্চল চল নয়নে?
অমৃত ভরিয়া কে আনে অধরে, দুটি রাঙা কচি গালে,
পরশ-মদিরা কে দেয় ঘনায়ে সোহাগের মৃদু জালে?
কারে মনে হয় যেন সদা দূরে, সবলে এ বুকে নিয়া?
আমার জীবন-প্রিয়া সে যে গো আমার পরাণ-প্রিয়া।

শ্রীকালীপদ ঘোষ

অধ্যাপক শরৎকুমার দত্ত

গত ২২শে জুন তারিখে অধ্যাপক শরৎকুমার দত্তের জীবনান্ত হইয়াছে। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের ১৩ই সেপ্টেম্বর তারিখে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল; সুতরাং মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৫০ বৎসরও হয় নাই। যে সব বাঙ্গালী বিদেশে বহু কষ্টে বিদ্যার্জ্জন করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া আইসেন এবং দেশকে তাঁহাদের লব্ধ বিদ্যার ফল প্রদান করিবার পূর্ব্বেই দেহ ত্যাগ করেন—তাঁহাদের মৃত্যু কেবল তাঁহাদের বন্ধুবান্ধবের—আত্মীয়স্বজনের শোকের কারণই হয় না; পরন্তু দেশের ও দেশবাসীর দুর্ভাগ্যও সূচিত করে। শরৎকুমারের অকালমৃত্যুতে আমরা সেইরূপ এক জন বিদ্বান্ ও কর্ম্মী হারাইয়াছি।



অধ্যাপক শরৎকুমার দত্ত

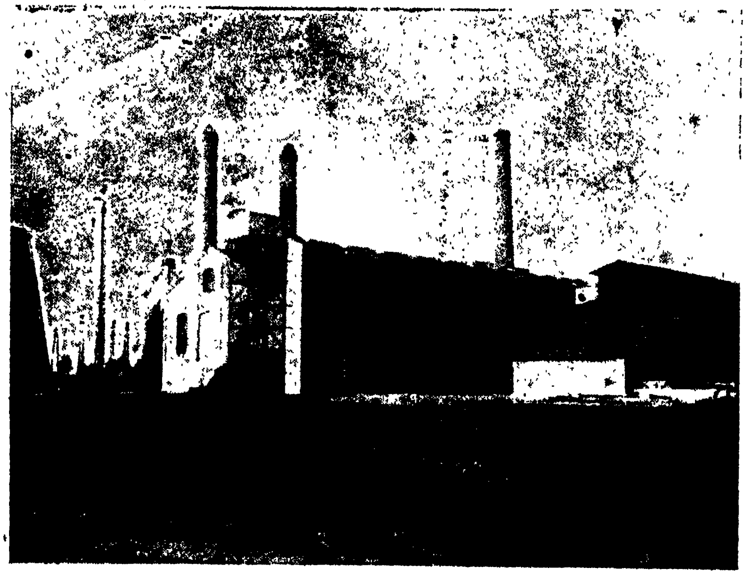
অতি অল্পবয়সে শরৎকুমারের পিতৃবিয়োগ হয়। পিতা বঙ্কুবিহারী কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ডাক্তারী করিতেছিলেন। ২৪ বৎসর বয়সে বিসূচিকায় তাঁহার মৃত্যু হয়।



শরৎকুমার ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রবোধকুমার মাতুলালয়েই পালিত হইয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই শরৎকুমার অধ্যয়নশীল ছিলেন। রাজীবপুরের বিদ্যালয়ে তাঁহার শিক্ষা আরম্ভ হয় এবং তথা হইতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি মাসিক ৫৲ টাকা বৃত্তি পাইয়া কলিকাতায় হেয়ার স্কুলে অধ্যয়ন আরম্ভ করেন।

হেয়ার স্কুল হইতে এনট্রান্স পরীক্ষা দিয়া শরৎকুমার বৃত্তিলাভ করেন ও প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবেশ করেন। কলেজে তিনি অধ্যয়নশীল বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। তখনও বিজ্ঞান ও সাহিত্য উভয় বিভাগ এনট্রান্সের পরই পৃথক হয় নাই। কিন্তু বি, এ, পরীক্ষায় কেহ সাহিত্য কেহ বিজ্ঞান পাঠ করিতে পারিতেন। সাহিত্যানুরাগী হইলেও শরৎকুমার বিজ্ঞানানুশীলনপ্রিয় ছিলেন এবং বিজ্ঞানের দিকেই গমন করেন। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে তিনি বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন এবং পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়ন উভয় বিদ্যাতেই "অনার্স" লাভ করেন। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে তিনি গণিতে এম, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৯০২ খৃষ্টাব্দে আবার পদার্থবিজ্ঞানে এম, এ, দেন।

শরৎকুমার যেমন অধ্যয়নশীল ছিলেন, ব্যায়ামেও তাঁহার তেমনই অনুরাগ লক্ষিত হইত। তখন তিনি ফুটবল খেলায় বিশেষ



জার্ম্মাণীর একটি কারখানা

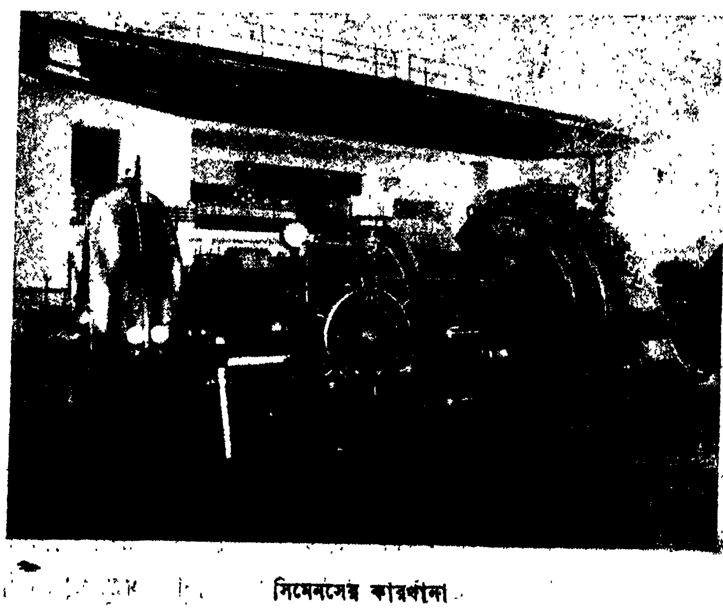
কৃতিত্বপরিচয় দিয়াছিলেন। অধ্যয়নে ও খেলায় সমান তৎপর এই যুবকটি তখন কলিকাতার ছাত্রসমাজে সুপরিচিত ও সর্ব্বজনপ্রিয় ছিলেন।

১৯০৩ খৃষ্টাব্দে শরৎকুমার বিবাহ করেন। সেই সময় বিদেশে বিদ্যার্থীদিগের জন্য টাটা ছাত্রবৃত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং শরৎকুমারই সর্ব্বপ্রথম সেই বৃত্তি লাভ করেন। বিবাহের প্রায় ১ মাস পরে শরৎকুমার বিদ্যালাভার্থ জার্ম্মাণী যাত্রা করেন।

জার্ম্মাণীতে যাইয়া তিনি শিল্পবিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। সার্লেটনবুর্গ স্কুলে (Charletonburg Tecnische Hochschule) তিনি ৬ বৎসর অধ্যয়ন করেন। তথায় তিনি তাঁহার বিদ্যার পরিচয় দিয়া মেডেল প্রাপ্ত হয়েন এবং নিজগুণে অধ্যাপকদিগের স্নেহ লাভ করেন।

জার্ম্মাণীতে এঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তাহার পূর্ব্বে বাঙ্গালায় নবজাগরণ হইয়াছে। বঙ্গভঙ্গের পর সরকার ছাত্রদিগকে রাজনীতিক আন্দোলনে যোগ দিতে নিষেধাজ্ঞা প্রচার করায় জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং যে স্থানে বর্ত্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজ নির্ম্মিত হইয়াছে, সেই স্থানে "পার্শীবাগান" নামে পরিচিত গৃহে তাহারই বিজ্ঞান বিভাগ স্থাপিত হইয়াছিল। সে কাযের জন্য সার তারকনাথ পালিত টাকা দিয়াছিলেন। শরৎকুমার যখন প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তখন জাতীয় বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগটিই সুচালিত হইতেছে। শরৎকুমার যে খ্যাতি লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, তাহাতে সরকারী চাকরী তাঁহার পক্ষে সুলভ ছিল। কিন্তু তিনি সরকারী চাকরী না লইয়া অপেক্ষাকৃত অল্প বেতনে জাতীয় বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগে (**Bengal Technical Institute**) অধ্যক্ষের পদ লইলেন। যোগ্য ব্যক্তির হস্তে সে প্রতিষ্ঠানের ভার ন্যস্ত হইল।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, তিনি বহু দিন তথায় কায করিতে পারিলেন না। শরৎকুমার অনেক আশা লইয়া সে কাযে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, দীর্ঘ ৬ বৎসরকাল



সিমেনসের কারখানা

তিনি জার্ম্মাণীর বিজ্ঞান শিক্ষাদানপ্রণালীর সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন—মনে করিয়াছিলেন, দেশের শিক্ষার্থীদিগকে মনের মত করিয়া গড়িয়া তুলিবেন। কিন্তু তাহা হইল না। এই বিজ্ঞানকলেজে যাঁহারা পরিচালক ছিলেন, তাঁহাদিগের সহিত শরৎকুমারের মতের মিল হইল না। শরৎকুমার মতকে সর্ব্ববিধ স্বার্থ অপেক্ষা উচ্চ আসন দিতেন। তিনি পদত্যাগ করিলেন।

তিনি পদত্যাগ করিবার পরই শিবপুর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে বৈদ্যুতিক এঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা দিবার জন্য অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু সাধারণতঃ এ দেশীয় অধ্যাপকদিগের সহিত য়ুরোপীয় অধ্যাপকদিগের ব্যবহারে যে প্রভেদ করা হয়, তাহা তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না। কাযেই ১৯১০ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে শিবপুরে চাকরী লইবার পর ১৯১৩ খৃষ্টাব্দেই তিনি সে কাযে ইস্তফা দিলেন।



ডাইনামো

তখন তাঁহার কন্যা ও পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে—সংসারের ভার তাঁহাকে বহন করিতে হইতেছে। এই অবস্থায় তিনি সহসা মোটা মাহিয়ানার চাকরী ছাড়িয়া দিলেন। মনে আছে, তিনি চাকরী ছাড়িয়া দিলে আমরা তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, "তাই ত, চাকরীটা ছাড়িয়া দিলে!" তিনি যে উত্তর দিয়াছিলেন, আজও ভুলিতে পারি নাই—"তুমি কি মনে কর, তো বন্ধুটি লাথি না খাওয়া পর্য্যন্ত চাকরী ছাড়িবে? জানই ত, সে আমার দ্বারা সম্ভব হইবে না।"

বাস্তবিক শরৎকুমার বিদ্যায় যত বড় ছিলেন—তার ও আত্ম-সম্মান-জ্ঞানে তদপেক্ষাও বড় ছিলে আর সেই জন্যই তাঁহার বন্ধুরা তাঁহাকে অসাধারণ শ্র দৃষ্টিতে দেখিতেন।

চাকরী ছাড়িয়া শরৎকুমার আবার জার্ম্মাণী যা করিলেন। তথায় তিনি পৃথিবীর অন্যতম অতি বির বৈদ্যুতিক এঞ্জিনিয়ারিং কারখানায় (Siemens-Schuckert Werke) প্রবেশ করিলেন। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে তাঁহ পত্নী তথায় তাঁহ সহিত মিলিত হলেন।

৪ বৎসরকা শরৎকুমার ঐ বিরাট কারখান কায করেন। তাহারই মধ্যে জার্ম্মাণ-যু আরব্ধ হয় এবং সে সময় তাঁহাকে এ কারখানায় কিরূপ কায করিতে হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। এ ৪ বৎসরের মধ্যে তিনি অনেক সময় কোম্পানীর বার্লিন "ডাইনামো ওয়ার্কসে" কায করিয়াছিলেন। সে কাযে তাঁহার এতই যশ হইয়াছিল যে, তাঁহাকে কোম্পানীর তরফে নানা কারখানায় ডাইনামো বসাইতে যাইতে হইয়াছিল।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী তারিখে তিনি Jaroslaw's Paper and Mica Factoryতে কা গ্রহণ করেন। বার্লিনের এই কোম্পানীর কারখানার মত এই জাতীয় কাযের বিরাট কারখানা পৃথিবীতে আ

নাই। কিছু দিন শরৎকুমারই সেই কারখানার সকল ভার পাইয়া কায করিয়াছিলেন।

জার্ম্মাণ যুদ্ধের অবসান হইলে শরৎকুমার জার্ম্মাণী হইতে ইংলণ্ডে আগমন করেন ও তথা হইতে ১৯২২ খৃষ্টাব্দে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বৈজ্ঞানিক দ্রব্যাদির ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হয়েন এবং বিলাতে শাখা স্থাপিত করিয়া কলিকাতায় "আডেয়ার দত্ত" কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত করেন। কনিষ্ঠ প্রবোধকুমার বিলাতের শাখার ভার লইয়াছেন।

'বসুমতী'র জন্য যখন জার্ম্মাণী হইতে রোটারী ছাপাখানা আনান হয়, তখন কলিকাতার ইংরাজ এঞ্জিনিয়াররা তাহা খাটাইবার উপায় করিতে পারেন নাই। কলকব্জার কাযে শরৎকুমারের অসাধারণ অভিজ্ঞতার জন্য আমরা তখন সে কাযে তাঁহার সাহায্য লইয়াছিলাম।

শরৎকুমারের মত সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী সুধী বিরল। সর্ব্বোপরি তিনি চরিত্রগুণে সকলের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিতেন।

যুদ্ধের সময় জার্ম্মাণীতে তাঁহাকে আহার্য্য সম্বন্ধে যে কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল, বোধ হয়, তাহাতেই তাঁহার স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল এবং তাহাই তাঁহার এই অকালমৃত্যুর কারণ। শরৎকুমারের সমগ্র জীবন সংগ্রাম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বাল্যে তাঁহাকে দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া জয়ী হইতে হইয়াছিল। তিনি মাইনর পরীক্ষা হইতে যদি বৃত্তি লাভ না করিতেন, তবে তাঁহার পক্ষে উচ্চ শিক্ষালাভ করা সম্ভব হইত না। তিনি যখন বি, এ, পরীক্ষা দেন, তখন তিনি প্রাইভেট পড়াইয়া ভ্রাতাকে পড়াইয়া ছিলেন। তাহার পর তিনি বিশেষ চেষ্টায় জীবনে সাফল্যলাভ করিয়াছিলেন।

আমাদের সামাজিক ও ব্যবসায়িক জীবনে শরৎকুমার যে স্থানটুকু অধিকৃত ও আলোকিত করিয়াছিলেন, আজ তাঁহার অভাবে কে তাহা অধিকার করিবে? আজ আমাদের মধ্যে সে স্থান অধিকার করিবার উপযুক্ত কাহারও সন্ধান পাইতেছি না।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

বারণ

[১]

বোঁটা ছিঁড়ে ফুল তুলে
গাঁথিবে কি ফুলহার?
—নিরমম হৃদয়ের
নিরদয় ব্যবহার!
ফুল—সে যে ফুটে র'বে
কানন উজল করে',
লুঠিয়া লইবে কেন
হাসিরাশি থরে-থরে?

[২]

শিশির দু'হাতে দলি'
তুলে নেবে দূর্ব্বাদল?
—কচি বুক—কাঁচা ঘুম—
আহা বড় নিরমল!
শিশির শ্যামল বুকে
স্বপনের সুখে ভোর,
নিতে হয় নিয়ো পরে—
ভেঙো না স্বপন ওর!

[৩]

সঙ্গীতের তরে পাখী
পিঞ্জরে পূরিবে কি গো?
—স্বরগের স্বাধীনতা
শুকা'য়ে মরিবে যে গো!
পাখী—সে সবুজ বনে
তুলিবে অবুঝ তান,
ধরো না, বেঁধো না তা'রে
শুনিতে শিখানো-গান!

শ্রীসদাশিব বন্দ্যোপাধ্যায়

পুরাতন যুগ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পতনের যুগ

বণিকরূপে আসিয়া ফরাসী কোম্পানী ক্রমে চন্দননগরে আধিপত্য ও প্রতিপত্তির যথেষ্ট অধিকারী হইবার পর হইতে আজ পর্য্যন্ত কোন দিনই কর্ত্তৃপক্ষদিগকে যুদ্ধবিগ্রহের জন্য কোনরূপ চিন্তাকুল হইতে হয় নাই। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে য়ুরোপে ইংরাজ ও ফরাসীর মধ্যে সমরানল প্রজ্বলিত হইলে এ দেশেও যুদ্ধসম্ভাবনা এক প্রকার নিশ্চিত হইয়া দাঁড়াইল। এ দিকে অর্থ, ফৌজ, যুদ্ধোপকরণ সকলেরই অভাব; তদুপরি কোম্পানী দেশীয় ব্যবসায়ীদের নিকট ২৬।২৭ লক্ষ টাকা ঋণগ্রস্ত, (১) সেখানেও আর টাকা পাইবার সুবিধা ছিল না। তদানীন্তন গভর্ণর মসিয়ে রেনো (Mons. Renault) এই প্রতিকূল অবস্থায় প্রমাদ গণিলেন। ইতঃপূর্ব্বে পণ্ডিচারী হইতে যে ৩ লক্ষ মুদ্রা পাইয়াছিলেন, যুদ্ধে সহায়তা না করার জন্য তাহা নবাবকে জরিমানা দিতেই খরচ হইয়া গিয়াছিল। (১) পণ্ডিচারীর নিকট পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিয়াও, প্রয়োজন মত সাহায্য না পাইয়া, তিনি তাঁহার নিজের বুদ্ধি ও শক্তিতে যতটা হয়, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন যুদ্ধোপকরণ যাহা ছিল, সে সকলের সংস্কার করিলেন দুর্গরক্ষার জন্য সে সময় অবস্থায় যাহা করা যাই পারে, দ্রুতগতিতে তা করিতে লাগিলেন।



এডমিরাল ওয়াটসন

এ দিকে ক্লাইব এ মিরাল ওয়াটসন্‌কে লই জলে ও স্থলে যুদ্ধের জ প্রস্তুত হইতে লাগিলেন তাঁহারা ধীরে ধীরে অগ্রস হইয়া ক্রমে চন্দননগর হই ৩ মাইল দক্ষিণে ভাগীরথী পরপারে কাউগাছি নাম স্থানে (২) কেণ্ট, টাইগা স্যালস্‌বারি, ব্রীজওয়াটা এবং কিংসফিশার্ নাম জাহাজ ও সৈন্য সমভি ব্যাহারে কেহ বলেন, ১৮ কেহ বলেন ১৯শে মা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই সময় দুর্গমধ্যে যে স সৈন্য ছিল, তন্মধ্যে প্রকৃত প্রস্তাবে শিক্ষিত সৈন্য অল্প

(১) Bengal in 1756-1757, Vol. I. Indian Records Series.

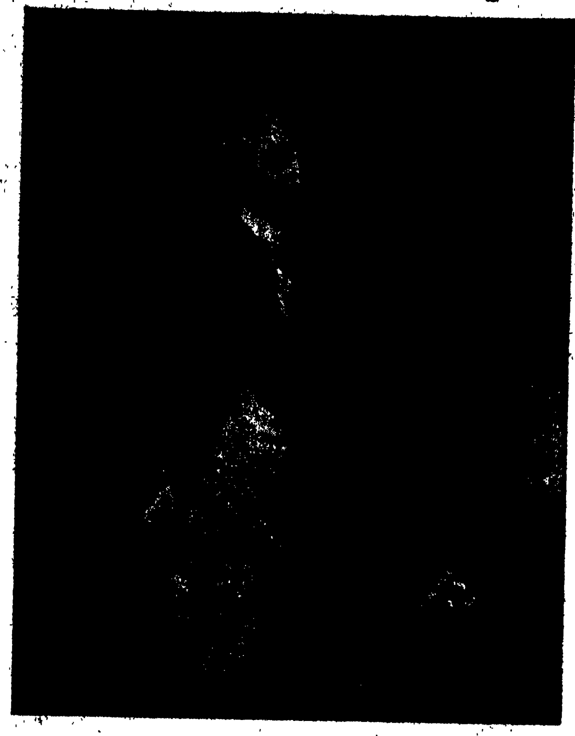
(১) Letter from M. Renult to Marquis Dupl 30th Sep. 1757—Bengal in 1756-57 Vol. I.

(২) Bengal in 1756-57, Vol III. Indian Recor Series.

ছিল। ঠিক যে কত সৈন্য সে সময় ছিল, তদ্বিষয়ে মতভেদও পরিলক্ষিত হয়। সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণ্য ঐতিহাসিক অর্ম্ম (Orme) বলেন, সে সময় দুর্গমধ্যে মোট ৬ শত য়ুরোপীয় ও ৩ শত সিপাহী রক্ষিসৈন্য ছিল। তন্মধ্যে প্রকৃত সৈনিক ৩ শত য়ুরোপীয় বলা যাইতে পারে, অবশিষ্ট মাঝিমাল্লা ও স্থানীয় অধিবাসী। (১) ঐতিহাসিক গ্রাণ্টও (James Grant) ঐরূপই লিখিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, স্মলেটের (Smollett) মতে ঐ সংখ্যা মোট ১২ শত। (২) কেহ বা ১ সহস্র বলিয়াছেন। আবার এক জন বলিয়াছেন মোট ২ শত ১২জন সৈন্য ও কর্ম্মচারী মাত্র ছিল।

ক্লাইবের সৈন্য কয়েক দিন অবস্থান ও মধ্যে মধ্যে অল্পবিস্তর গোলাবর্ষণ করিয়া অবশেষে ২৩শে মার্চ্চ ভাগীরথী হইতে দুর্গ আক্রমণ করিল। প্রথমে উভয় পক্ষেই ঘোররূপে গোলাবর্ষণের পর, অবশেষে পরদিন প্রাতে বেলা ৯টার সময় রেনোর পক্ষে দুর্গরক্ষা অসম্ভব হইল। বহুক্ষণ যুদ্ধের পর ফরাসী কামান নিস্তব্ধ হইল। দুর্গ হইতে শুভ্র পতাকা দেখাইয়া রেনো যুদ্ধ হইতে ক্ষান্ত হইয়াছেন, জানাইলেন। তাঁহার বুদ্ধি-কৌশল, সাহসিকতা, জাহাজ ডুবাইয়া নদীপথ বন্ধের চেষ্টা ব্যর্থ হইল, তিনি ও তাঁহার দেশবাসীর শেষ পর্য্যন্ত প্রাণপণ সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। তিনি উপায়ান্তর না দেখিয়া ক্লাইবের নিকট ফরাসী জাতির আশা, ভরসা, মর্য্যাদা সবই বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হইলেন।

যুদ্ধশান্তির জন্য শুভ্র পতাকা প্রদর্শিত হইবার অল্পক্ষণ পরেই কাপ্তেন কুট্ (Captain Eyre Coote) সর্ত্ত সকল ঠিক করিবার জন্য ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষের নিকট প্রেরিত হইলেন। তিনি সমস্ত ঠিক করিয়া ফিরিয়া আসিলেন এবং পরে বৈকাল ৩টার সময় উপযুক্ত সৈন্যসহ পুনরাগমন পূর্ব্বক দুর্গ অধিকার করিলেন। যে সময় সন্ধির আলোচনা হইতেছিল, তখন অনেক লোক গোপনে দুর্গ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করে। অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় দুর্গ সম্পূর্ণরূপে ইংরাজদের অধিকারে আসিল। (১)



রবার্ট ক্লাইভ

সৈন্যদের গোপনে পলায়নে [illegible] বিশেষরূপে ক্ষুব্ধ হয়েন এবং ক্লাইবের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার জন্য তাঁহার আদেশে প্রায় সমস্ত প্রধান অট্টালিকা বিনষ্ট করিয়া দেওয়া হয়, ও দুর্গের মূলদেশ পর্য্যন্ত উৎপাটিত করিয়া উহার চিহ্ন লোপ করিয়া দেওয়া হয়। (২)

এই ব্যাপারে বহুসংখ্যক ফরাসী কেহ দিনেমারদের শ্রীরামপুরের কুঠীতে, কেহ চুঁচুড়ার ওলন্দাজ কুঠীতে এবং কতকগুলি কাশিমবাজারে মসিয়ে ল (Mons. Law)র নিকট গমন করিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। চন্দননগরের গভর্ণর ও কাউন্সিল এই সময় চুঁচুড়ায় স্থানান্তরিত হয়। এই সময়

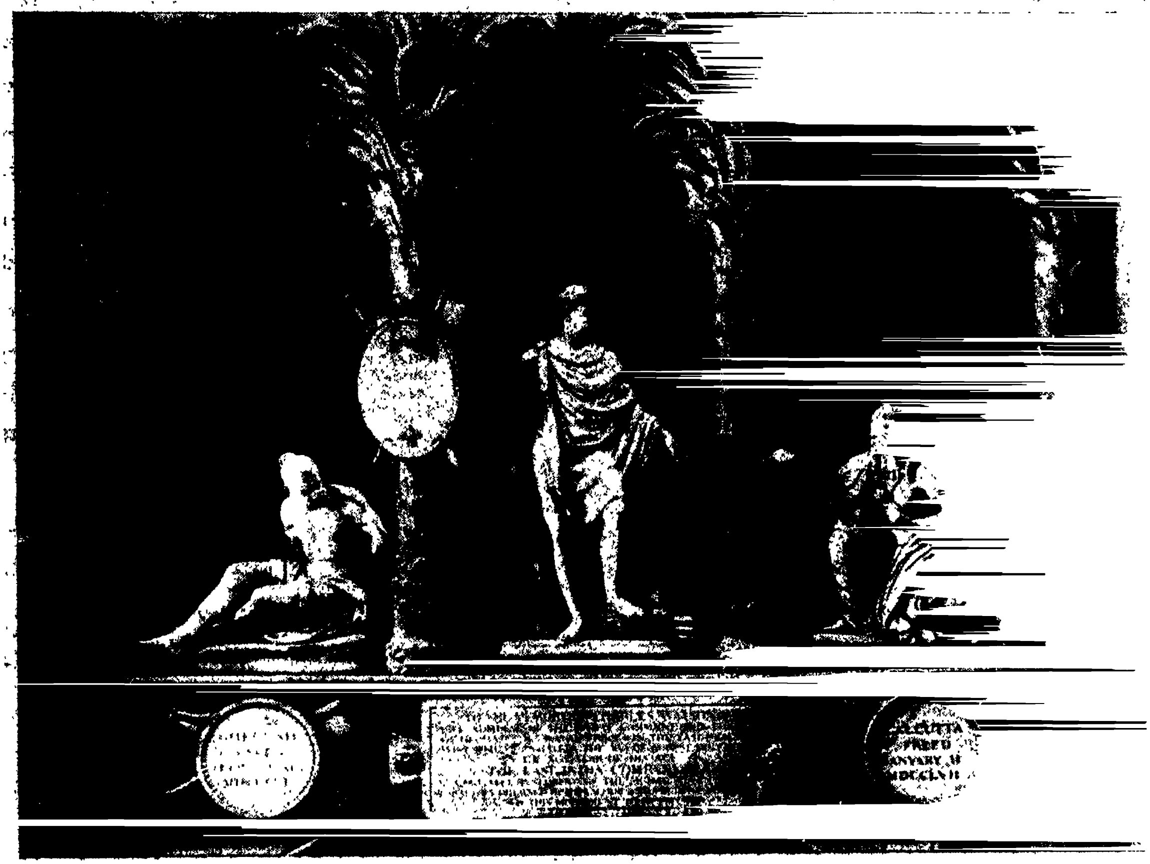
(১) Orme's Military Transactions of the British Nation in Indostan Vol. II.

(২) Cassell's Illustrated History of India Vol. I.

(১) প্রধানতঃ Orme's Indostan ও Cassell's Illustrated History of India হইতে গৃহীত।

তাঁহারা শুধু আশ্রয় নহে, অর্থ, সুপরামর্শ, এমন কি, অস্ত্র-শস্ত্র পর্য্যন্ত দিয়া ফরাসীদিগকে সাহায্য করিয়াছিলেন। (১)

অর্লেন্স্‌ দুর্গ হস্তগত হইবার পর, ইংরাজরা তথা হইতে প্রাপ্ত বহুসংখ্যক কামান ও অন্যান্য যুদ্ধোপকরণ লইয়া যায়েন। সমস্ত সহরে ইংরাজ সৈন্যের দ্বারা লুণ্ঠনের পরিমাণ নির্ণয় করা অসম্ভব। তবে উহা যে খুব বেশী, তাহাতে সন্দেহ নাই। সমস্ত লুণ্ঠিত দ্রব্যের মূল্য সম্বন্ধে দ্রব্যসম্ভার ছিল, তাহা বিক্রয় করিয়া ২৮ লক্ষ ৬০ হাজার পাউণ্ড ইংরাজ পাইয়াছিলেন; তাহার পর সাধারণ প্রজার সম্পত্তি যাহা লুঠ হইয়াছিল, তাহা স্বতন্ত্র। (৩) শুনা যায়, এক ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর বাটী লুণ্ঠন করিয়া ৬৫ লক্ষ টাকার অলঙ্কার ও নগদ টাকা লইয়া যাওয়া হয়। (৪) সুতরাং মোট লুঠের পরিমাণ ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, উহা সুপ্রচুর। চন্দনন-



চন্দননগর বিজয়ী এডমিরাল ওয়াট্‌সনের প্রতিমূর্ত্তি। পার্শ্বে বন্দী চন্দননগর ও মুক্ত কলিকাতা (ওয়েষ্টমিনিষ্টার এবি হইতে)

কেহ বলেন, উহার পরিমাণ ১ লক্ষ ৩০ হাজার পাউণ্ড (২) আবার কেহ বলেন, ১০ লক্ষ ১ ষ্টারলিং (৩) মূল্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায় মহাশয়ের বহু গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধে দেখা যায়, কোম্পানীর পণ্যশালায় যে

ধ্বংসের পর ইংরাজরা গরুটী অধিকার করেন। তথাকার প্রাসাদ তাঁহাদের একটি সৈন্য-নিবাসে পরিণত করেন।

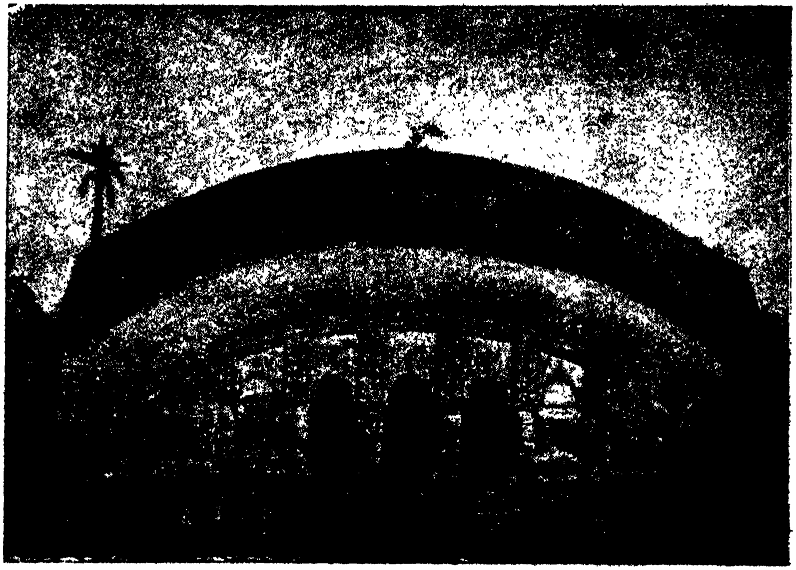
চন্দননগর ইংরাজের অধিকারে যাওয়ার ঠিক প

(১) Rise and Progress of the British Power in India, Vol. I.

(২) Chandernagore—The Calcutta Review, 1918.

(৩) "চন্দননগরের যুদ্ধ। শ্রীচারুচন্দ্র রায়। 'প্রবর্ত্তক' ১৩২৯।"

(৪) "ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী।" শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টো- 'প্রবাসী' বা 'বাংলা' ১৩২৮।



ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রী৺নন্দদুলালের মন্দির

বিশেষ ইতিহাস কিছু পাওয়া যায় না। ৭ বৎসর তাঁহাদের অধিকারে থাকার পর, ইংলণ্ডের ইতিহাসে সুপ্রসিদ্ধ সাতবর্ষব্যাপী যুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে, ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে পারীর সন্ধির সহিত ফরাসীরা দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে বা বাঙ্গালার কোন অংশে সৈন্য রাখিতে পারিবেন না, মাত্র স্যালুট্ করিবার জন্য কয়েকটি কামান রাখিতে ও জাতীয় পতাকা উড্ডীন করিতে পারিবেন, এই সর্ত্তে চন্দন-নগর পুনঃ প্রাপ্ত হয়েন।



ইহার পর ১৭৬৯ হইতে ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মসিয়ে শেভালিয়ে (Mons. Chevalier) চন্দন-নগরের গভর্ণর থাকেন। তিনি দুপ্লের সময়ের প্রণষ্ট গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য প্রত্যাশাবান্ হইয়াছিলেন এবং প্রথম প্রথম কিছু চেষ্টাও করিয়াছিলেন। পরে ক্ষমতার অভাব এবং কলিকাতার ইংরাজদের তীক্ষ্ণদৃষ্টি থাকায় তাঁহার রাজনীতিক উচ্চাশার সাফল্য-সম্ভাবনা না দেখিয়া তিনি সামাজিক দিক দিয়া চন্দন-নগরের উন্নতির প্রয়াস পাইয়াছিলেন। গরুটীস্থিত দুপ্লের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষের উপর তিনি এক অতি সুরম্য পল্লী-ভবন নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে উহা দেখিয়া গ্রাঁপি (Grandpre) নামক এক পর্য্যটক উহাকে উৎকৃষ্ট, এমন কি, ভারতের মধ্যে এক উৎকৃষ্ট ভবন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। (১) এই স্থানে সর্ব্বদা উৎসব আনন্দের অবধি ছিল না। এই বাটী ও উহার প্রাসাদের কথা, শেভালিয়েরের মহা আড়ম্বরের সহিত ঐ স্থানে বসবাসের এবং তৎকালীন বড় বড় ইংরাজ কর্ম্মচারীদের ঐ স্থানে আসিয়া আনন্দোৎসবে যোগদানের কথা বহু পুস্তকে উল্লেখ পাওয়া যায়।

গরুটীর কি ঠিক নাম, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন।

(১) Chandernagore—The Calcutta Review, 1918.



শ্রীশ্রী৺নন্দদুলাল জীউর মূর্ত্তি

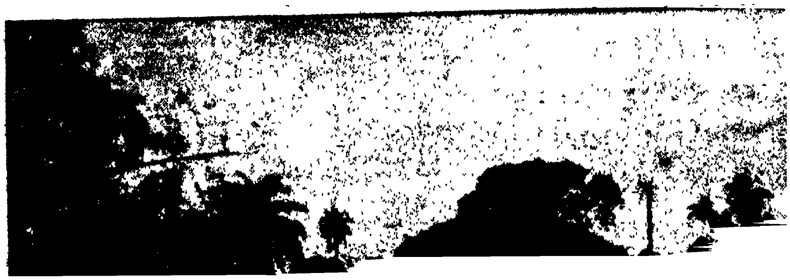
আড়াই মাইল দক্ষিণে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ও ভাগীরথীর মধ্যে অবস্থিত। পরিমাণ মাত্র ১ শত ২০ বিঘা, কিন্তু এই ক্ষুদ্র ঐতিহাসিক স্থানটির সৌন্দর্য্য ও গৌরব এক সময় যথেষ্ট ছিল। ইহা প্রথম ফরাসী গভর্ণর সুপ্রসিদ্ধ ডুপ্লের পল্লীনিবাস ছিল। নর্থব্রুক্ কোম্পানীর ইজারা লইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে যে স্থানটিকে দেখিলে সুন্দরবনের জঙ্গল মনে আসিত, তাহা এক দিন ফরাসী গভর্ণরের সুরম্য উদ্যান-ভবন ছিল।



ফরাসী গভর্ণমেণ্ট প্রদত্ত ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর সুবর্ণ পদক

দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে এই জনমানবপূর্ণ আড়ম্ব
মনোরম প্রাসাদ চুঁচুড়া, শ্রীরামপুর, কলিকাতা ও চ
নগরের খ্যাতনামা ব্যক্তিগণের ও অভিজাতসম্প্রদায়
সুসজ্জিতা সুন্দরীগণের সমাগমে মুখরিত হইত।
স্থানেই ফরাসী গভর্ণর বাহাদুর ক্লাইভ, হেষ্টিংস, ভির
লেষ্ট ও সার উইলিয়ম জোন্সকে আড়ম্বরেব সা

ইতিহাসে গিরেটী (Ghyretty) নামেই উহার কথা লিখিত আছে। লোক সাধারণতঃ গরুটী বা গৌরহাটী বলিয়া থাকেন। পূর্ব্বে কেহ কেহ ফরাসগঞ্জও বলিত। ফ্রেঞ্চ গার্ডেন নামেও ইহা কোন কোন ইতিহাসে বর্ণিত হইয়াছে। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত বোল্টস্এর বাঙ্গালার মানচিত্রে ফ্রেঞ্চ গার্ডেন এবং জোসেফ্ সার্ভে ম্যাপে ওল্ড ফ্রেঞ্চ গার্ডেন উল্লেখ আছে। ইহা চন্দননগরের সীমান্তর্গত না হইলেও চন্দননগরের কথাপ্রসঙ্গে ইহার বিবর বাদ দেওয়া যায় না।





সংবর্দ্ধনা করিতেন। প্রাসাদের উত্তরে সুদীর্ঘ বৃক্ষবীথিকা নিমন্ত্রিতদের যানাদিতে সমাচ্ছন্ন থাকিত। সময় সময় ৫০খানিরও অধিক অশ্বযান পরিদৃষ্ট হইত। প্রাসাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ সুন্দর ও সুপ্রশস্ত কক্ষটি ৩৬" ফিট উচ্চ ছিল। উহার বহু চিত্রশোভিত গৃহপ্রাকার, মূল্যবান্ আসবাবপত্র, সাজ-সজ্জা ও বিচিত্র ছাত, উপবিষ্ট অনেকেরই ভার্সেইয়ের কোন কোন সম্ভ্রান্ত পল্লীনিবাসের কথা মনে করাইত। এই প্রাসাদের মধ্যে এমন বৃহৎ কক্ষ ছিল, যাহাতে একত্রে ১ শত নিমন্ত্রিত নরনারী স্বচ্ছন্দে ভোজন করিতে পারিত। (১)

১৮২৪ খৃষ্টাব্দে বিশপ্ হিবার (Bishop Heber) যখন এই স্থান দর্শন করেন, তখন তিনি এক প্রকাণ্ড অট্টালিকা ভগ্নাবস্থায় দেখিতে পায়েন এবং ইহাকে এ প্রদেশে ফরাসী উপনিবেশের স্বর্ণযুগে গভর্ণরের পল্লীনিবাস বলিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন, ইংরাজদের চন্দননগর আক্রমণকালে ইহা বিনষ্ট হয়। যখন বিশপ্ কুরি (Right Rev. Doniel Corrie L. L. D.) ভারতে আগমন করেন, তখন এই প্রাসাদ পরিত্যক্ত হইলেও ভগ্ন হয় নাই এবং অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী অবস্থাতেই ছিল। উহার সুন্দর সোপান, চিত্রবিচিত্রময় ভগ্নপ্রায় উচ্চ স্তম্ভ সকল, বিবিধ কারুকার্য্যবিশিষ্ট পেডিমেণ্ট দেখিয়া উহাকে

(১) J. C. Marshman Calcutta Review, vol. iv. 1845.



দেওয়ান রামেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের অতিথিশালার ভগ্নাবশেষ

তৎকালীন এ দেশের সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর অট্টালিকা বলিয়াছেন। ইহা দর্শনে বিলাতের শ্রপসায়ারের ধ্বংসপ্রায় মোরেটন করবেট (Mor‹ton Corbet) নামক সুপ্রসিদ্ধ অট্টালিকার কথা তাঁহার মনে উদিত হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছেন, এই প্রদেশের মধ্যে উহাই পতনোম্মুখ উন্নতির একমাত্র নিদর্শন। (১)

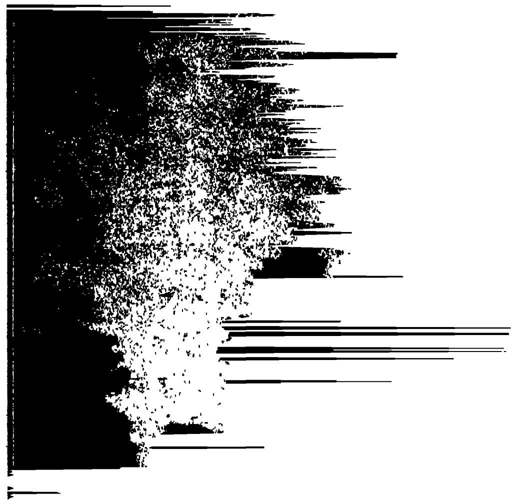


এই গরুটার প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক মার্শম্যান যথার্থই বলিয়াছেন, গৌড়ের ধ্বংসাবশিষ্ট প্রাসাদ ও মসজেদসমূহ দর্শনে দর্শকের মনে উহার পূর্ব্ব-গৌরবের কথা উদিত হইয়া যে একটা গভীর দুঃখে হৃদয় ভরিয়া উঠে, যদি এরূপ

(১) Heber's Journey through

নিদর্শন বঙ্গে আর কোথাও থাকে, তবে তাহা ফরাসী গভর্ণরের ভগ্ন প্রাসাদ-পূর্ণ এই গরুটীর বাগান।

কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে ধ্বংসাবশিষ্ট প্রাসাদের তোরণপার্শ্বস্থ ভগ্ন স্তম্ভ, বৃক্ষবীথিকা প্রভৃতি যে সকল দৃষ্টিগোচর হইত, ফরাসী গবর্ণমেণ্টের এ দিকে দৃষ্টি না থাকায়, কল-ওয়ালাদের অনুগ্রহে তাহাও এখন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। আছে গঙ্গার ধারের একটুকু ভগ্ন অংশ মাত্র।



গরুটীর প্রাসাদ-সংলগ্ন উদ্যানস্থিত বৃক্ষ-বীথিকা

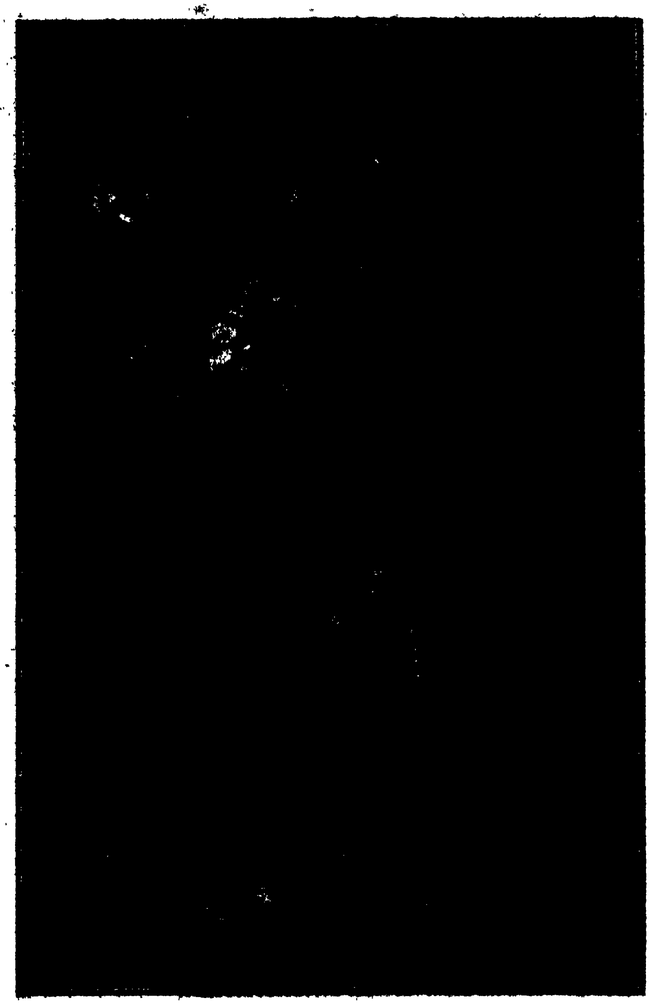
শেভালিয়ের সময়েই বানের জল হইতে সহরকে রক্ষা করিবার বা গড় মেরামতের অছিলায় ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে উহাকে অপেক্ষাকৃত ভাল করিয়া পরিখাবেষ্টিত করা হইয়াছিল। ইহাতে কলিকাতার কোম্পানীর সন্দেহ হওয়ায়, প্রথম এক জন কর্ম্মচারীকে ঐ কায সম্বন্ধে রিপোর্ট করিবার জন্য সরকারীভাবে পাঠান হয়। কাউন্সিল তাঁহাদের সন্দেহ ঠিক এবং সন্ধির ধারা অমান্য হইতেছে বুঝিয়া ৮ শত সিপাহীসহ ১ জন এঞ্জিনিয়ার প্রেরণ করেন। চন্দননগরের কর্ত্তারা প্রথম উহা অবহেলা করিয়া উৎসাহের সহিত কায শেষ করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু কাউন্সিলের নিকট হইতে উহা নষ্ট করিবার আদেশ আইসে। (১)

১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে য়ুরোপে ইংরাজ ও ফরাসীর মধ্যে যুদ্ধ বাধিলে এখানেও পুনরায় বন্ধুত্ব নষ্ট হইল। ৬ই জুলাই এখানে যুদ্ধসংবাদ পৌছিলে ১০ই জুলাই ইংরাজরা কর্ণেল ডো'র (Colonel Alexander Dow) সহিত সামান্য সৈন্য প্রেরণ করিয়া বিনা বাধায় চন্দননগর দখল করেন। মসিয়ে শেভালিয়ে সে সময় গরুটী ভবনে অবস্থিতি করিতেছিলেন। কর্ণেল ডো তথায় পৌছিলে, তিনি গোপনে সে স্থান হইতে পলায়ন করেন এবং পরে কটকে ধৃত হয়েন। হেষ্টিংস তাঁহার সহিত সদয় ব্যবহার করেন এবং ফ্রান্সে যাইবার আদেশ প্রদান করেন।

পাঁচ বৎসরের পর ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে উভয় সন্ধির সহিত চন্দননগর ফরাসীদিগকে পুনরায় অর্পণ করা হয়। ইহার মধ্যে কিছু কাল কলিকাতার কোর্টের বিচারপতি সার রবার্ট চেম্বারর্স (Sir Chambers) চুঁচুড়া ও চন্দননগরের বিশেষ জজ হয়েন। তিনি ১৭৮১ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে প্রাপ্ত হয়েন। (১)

(১) Chandernagore—The Calcutta Review, 1918.

(১) Chandernagore—The Calcutta Review,



গরুটীস্থিত ডুপ্লে প্রাসাদের অধুনালুপ্ত ভগ্ন তোরণ-স্তম্ভ

পুনরায় ১০ বৎসর না যাইতেই ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারী ফ্রান্সের সহিত ইংলণ্ডের আবার যুদ্ধ-ঘোষণা হয়। জুন মাসে এই সংবাদ কলিকাতায় পৌঁছিলে ইংরাজ সৈন্য আর একবার বিনাড়ম্বরে বিনা বাধায় চন্দননগর অধিকার করে। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ দ্বারা গরুটী অধিকারের কথা জানা যায় (১) কিন্তু কারণ কিছু পাওয়া যায় না। ২০শে জুন কলিকাতার সকাউন্সিল গভর্ণর জেনারল মিঃ রিচার্ড্ বার্চকে (Mr. Richard Birch) চন্দননগরের অধ্যক্ষ জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেট্ এবং মিঃ দে ব্রেট্যাল্‌কে (Mr. De Bretal) উহার সহকারী অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়া চন্দননগরে পাঠান। (১) অল্পদিনের মধ্যে (৩০শে জুলাই) ফরাসী গভর্ণমেণ্টের সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি, এমন কি, নোঙ্গর, আলকাতরা, চর্ব্বি, দড়ি, চাপরাসখানি পর্য্যন্ত চন্দননগরের অস্ত্রাগারে সংগৃহীত হইয়া কলিকাতা গেজেটে বিজ্ঞাপন প্রচারের পর বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট নীলামে বিক্রয় করিয়া লয়েন। (২)

(১) Annuaire de Etablissment France Dans l'indes Pour l'annee 1923.

১৮০২ খৃষ্টাব্দে এমিনের সন্ধির সহিত চন্দননগর পুনরায় মুক্ত হয়, কিন্তু অল্পদিন পরে বিরোধের সহিত আবার উহা ইংরাজের হস্তগত হয়। মধ্যে কয়েক মাসের কথা ছাড়িয়া দিলে এইবার দীর্ঘকাল উহা ইংরাজের অধিকারে থাকে। এই সময়ের মধ্যে এখানকার ব্যবসা-বাণিজ্য সামান্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ইহা ঠিক অব্যবহিত পূর্ব্বের তুলনায় কিছু উন্নতিলাভ করে (৩) এবং যেরূপ দাঙ্গা, বিদ্রোহ মধ্যে মধ্যে দেখা যাইতেছিল, ঐ সময়ে তাহা আর দৃষ্ট হয় নাই। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর ফ্রান্সের রাজা অষ্টাদশ লুইর সময়ে এই উপনিবেশ পুনরায় ফরাসীদের হস্তে অর্পিত হয়। এই উপলক্ষে একটি উৎসব হয়, তাহাতে উভয় রাজার উদ্দেশে "স্বাস্থ্যপান" করা হয়। এই দান ও গ্রহণ ব্যাপারে ইংরাজ পক্ষে মিঃ গর্ডন্ (Mr. Gordon) এবং কর্ণেল লভডে (Mr. Colonel Loveday) ও ফরাসী পক্ষে কমিশনর নিয়োজিত হইয়াছিলেন। (৪) ইংরাজ কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ গ্রহণ ও প্রত্যর্পণ এইবারেই শেষ হয় এবং এই সময় হইতে অদ্যাবধি উহা অব্যাহত-ভাবে ফরাসীদের অধিকারেই আছে। ইতোমধ্যে

(১) Selections from Calcutta Gazette, June 20th, 1793.

(২) Selections from Calcutta Gazette, 18th July 1793.

(৩) The Calcutta Review, 1918—Chandernagore.

ইংরাজ বা অন্য জাতির সহিত কোন সংঘর্ষ উপস্থিত না হইলেও, অন্তর্বিপ্লবে ফ্রান্সের রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া তথায় প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়। ইহাতে চন্দননগরের কিছু ইষ্টাপত্তি হয় নাই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নানা কথা

ইংরাজ কর্ত্তৃক বারবার চন্দননগর আক্রমণ ও অধিকার এবং প্রত্যর্পণের কাল সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইল, কোন কোন গ্রন্থে উহার কিছু পার্থক্য দেখা যায়। যাহা অধিকাংশ পুস্তকে লিখিত আছে, তাহাই এ স্থলে বলা হইল। চন্দননগর প্রথম ইংরাজের হস্তগত হইবার পূর্ব্বে কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধশতাব্দী কালমধ্যে, উহার উত্থান ও পতনের একটা মোটামুটি পরিচয় সাধারণ ইতিহাস সকল হইতে যাহা সংগ্রহ করা যায়, তাহাই সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে। কিন্তু দুর্গের পর বিশেষতঃ ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে চন্দননগর ইংরাজের হস্তগত হইবার পর হইতে শেষবার ফরাসীদের অধিকারে আসা পর্য্যন্ত, এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে বিস্তার, ধনে, সম্ভ্রমে চন্দননগরের পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায় না। যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি ভিন্ন এই সময়ের অন্য বিষয় যাহা কিছু সংগ্রহ করিতে পারা গিয়াছে, তাহাই সংক্ষেপে এই পরিচ্ছেদে লিখিত হইয়াছে।

... এই সময়ে প্রথম চন্দননগরের কোন মানচিত্র সংগ্রহ করিতে পারা যায় নাই। ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দের যে নকশার নকসা পাওয়া যায়, তাহাতে দেখা যায়, এ গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড বা রু দে বেনারস রাস্তার তখন ছিল, উত্তর অংশ "চুঁচুড়ার রাস্তা" এবং দক্ষিণ 'কোম্পানীর বাগানের রাস্তা।" এখন যে হ উর্দ্দু বাজার বলে, তখন ঐ স্থানেই বাজার ছিল। ঠিক পশ্চাতে দুর্গের দক্ষিণে ডাচ্ অষ্টেগন্ লালদীঘির পূর্ব্বে গঙ্গার ধার পর্য্যন্ত জমীখণ্ডে অ দুর্গ এবং উত্তরে বর্ত্তমান হাঁসপাতালের সম্মুখে যে মাঠ আছে, উহার মধ্যে জেসুইটদের আবাস ছিল, এবং উহার ঠিক পূর্ব্বে তাঁহাদের গীর্জ্জা ছি ১৭৩৫ খৃ ২৬শে কোম্পানী জেসুইটদিগকে জমী দান রিয়াছিলেন তাহা স বর্ত্তমান বাজারের লালদী পশ্চিম দিকে নীব হাঁস ছিল।



শিশু বাবুর প্রতিষ্ঠিত শিব-মন্দির

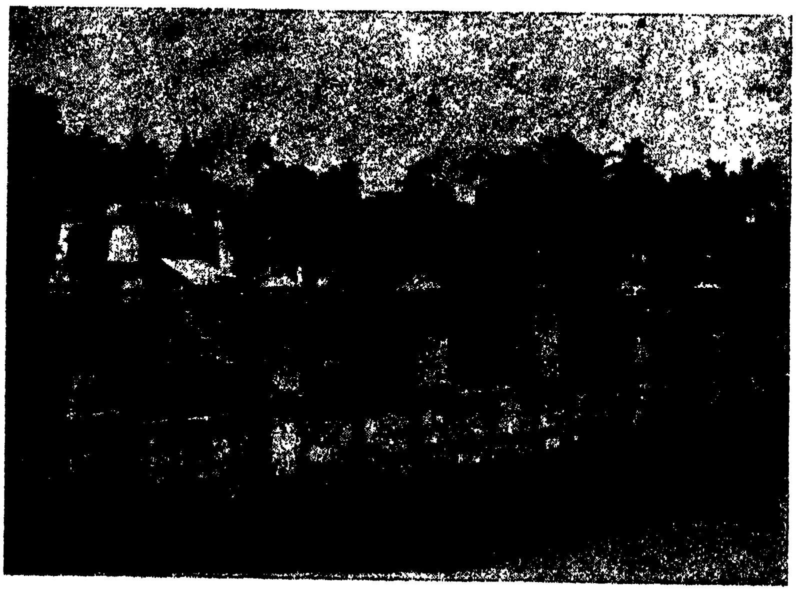
প্রবেশের ফটক ছিল, তাহার একটি এখনও আছে, নাম—'ডাকার ফটক।"

চন্দননগরে এখনও তৎকালের ঐতিহাসিক বিজড়িত কয়েকখানি অট্টালিকা অসংস্কৃত বা ভগ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। যুদ্ধকালে যে যে ব সাময়িক হাঁসপাতাল হইয়াছিল, তাঁহা এখনও যায়। ম্যাডাম্ রস্ নামে নবাব সিরাজদ্দৌলার বেগমের এক বন্ধু যে বাটীতে বাস করিতেন,

(১) Annuales des Etablissements Francais l'Indes Pour l'Annee 1923

এখনও বর্ত্তমান আছে। ইটালীয় মিশনের দ্বারা নির্ম্মিত গীর্জ্জা, ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ, মহারাষ্ট্রীয় দস্যুর দ্বারা বিধ্বস্ত অট্টালিকা, একটি পুরাতন বিদ্যালয়ের ভগ্ন দেওয়াল প্রভৃতি এখনও পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। "সাহেবদের" গোরস্থানটিও তৎসময়ের। (১)

চন্দননগরের নিকটবর্ত্তী তৎকালে যে সকল স্থান ছিল, তাহার মধ্যে গঙ্গার ঠিক পরপারে ডেভিলস্ রিচ (Devils Reach) নামক একটির উল্লেখ পাওয়া যায়। তথায় বহু মন্দির একত্রে বিরাজিত ছিল। (২) উহার নিকটে "বাঁকি বাজার" নামক আর একটি স্থান ছিল। তথায় জার্ম্মাণীর সম্রাট অষ্টেণ্ড ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নামে একটি কুঠী স্থাপন করেন। ডাচ্ ও ইংরাজদের চেষ্টায় সুজা-উদ্দিনের রাজত্বকালে কর্ত্তৃপক্ষকে ৩ লক্ষ ২০ হাজার টাকা ঘুষ দিয়া তাঁহাদের বিতাড়িত করা হয়। (৩) হজেস্-এর ডায়ারিতে বুদরি (Buddery) নামক একটি স্থানের উল্লেখ আছে, উহা এখনকার ভদ্রেশ্বর। কিন্তু ইতিহাসে একটি বিদেরা নাম পাওয়া যায়; উহা এক্ষণে কোন্ স্থান, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। পশ্চিম দিকে ব্যাজড়া নামক স্থানটিও পুরাতন। কথিত আছে, চন্দননগর আক্রমণের পূর্ব্বে ক্লাইব ঐ স্থানে ছাউনি করিয়াছিলেন। (৪)



"সাহেবদে"র সমাধি স্থান

তৎকালীন সামাজিক অবস্থা, রীতিনীতি প্রভৃতি বিষয় ধারাবাহিকরূপে যথাযথ লিপিবদ্ধ করা কঠিন। এ সম্বন্ধে কোন ইতিহাস নাই। পুরাতন বিভিন্ন গ্রন্থের এখান ওখান হইতে বা প্রচলিত জনশ্রুতি প্রভৃতি হইতে যাহা সামান্য সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহাই এখানে বলিতে চেষ্টা করিব।

বাঙ্গালার অন্যান্য স্থানসমূহের প্রচলিত সামাজিক প্রথা সকল এখানেও বিদ্যমান ছিল। এখানেও মধ্যে মধ্যে সতীদাহের উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে আনুমানিক একবিংশতিবর্ষীয়া এক ব্রাহ্মণ-যুবতী (১) এবং ১৮০৮ খৃঃ অব্দের ২৩শে আগষ্ট এক জন ৯০ বৎসর বয়স্কা কায়স্থ পরিবারের বৃদ্ধা রমণীর সহমৃতা হওয়ার কথা জানা যায়। (২) দাসব্যবসা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রায় শেষ পর্য্যন্ত বিশেষরূপেই প্রচলিত ছিল, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

সমাজে বিশেষ বর্দ্ধিষ্ঠ বা সঙ্গতিপন্ন লোক তখন অধিক ছিল বলিয়া বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। যে সকল দেবমন্দির, প্রতিষ্ঠিত ঘাট বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠান সকল অধুনা ভগ্ন বা অসংস্কৃত অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার অধিকাংশই প্রায় ১ শত বৎসরের মধ্যে নির্ম্মিত হইয়াছে।

(১) Thacker's Guide to Calcutta.
(২) Diary of William Hodges Esq. Vol III.
(৩) History of India by John Clark.
(৪) "চন্দননগরের কথা" 'প্রবর্ত্তক' পৌষ [illegible]

(১) "Selections from Calcutta Gazette, 1785 Seton-kerr.
(২) "The Good Old Days of the Honourable John Co.

প্রাচীন কীর্ত্তি সকল হইতে এখনও যাঁহাদের নাম লোক শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখ করিয়া থাকেন, তন্মধ্যে শিশুরাম বন্দ্যোপাধ্যায় এক জন। ইনি বিশিষ্ট দাতা বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তাঁহার খ্যাতির পরিচয় দিবার জন্য এক্ষণে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দিরচতুষ্টয় ও ভাগীরথীতীরে একটি সুন্দর ঘাটের ভগ্নাবশেষ মাত্র আছে। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত একটি অতিথিশালা ছিল। তাহার চিহ্নমাত্র আর দেখা যায় না। তিনি অনুমান ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে মানকুণ্ডা গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং অনুমান ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার পিতা বর্ত্তমান থাকিতেই গোন্দলপাড়ায় আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। তিনি প্রথম সিপ্‌-সরকারী কার্য্যের দ্বারা সৌভাগ্য অর্জ্জন করেন। তৎপরে নিজে স্বাধীনভাবে আমদানী ও রপ্তানীর কায করিয়া বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। মরিশস্, বুরবঁ,



মেরিয়ানার মূর্ত্তি

জাভা প্রভৃতি দেশের সহিত তাঁহার বাণিজ স্থাপিত ছিল। নিজস্ব ১১ খানি গামী জাহাজ ও ৫২ স্লুপ্‌ ছিল। কথিত কোন সময় বৃটিশ গভ রসদ পাঠাইবার তাঁহার নিকট হইতে গুলি ধার লইয়াছি শেষাবস্থায় শিশু কতকগুলি জাহাজ তলগামী হওয়ায় দুর্ভাগ্যসূচনা হয় এব তিনি বিশেষ দুর হয়েন। কিন্তু তখনও যতদূর পারিয়াছেন, দান করিতে বিরত নাই। শুনা যায়, শে বারে নিঃস্ব হইয়া পড়িলে পাছে অতিথি বিমুখ হয়, এই আশঙ্কায় জীবনের শেষাবস্থায় তিনি সপ

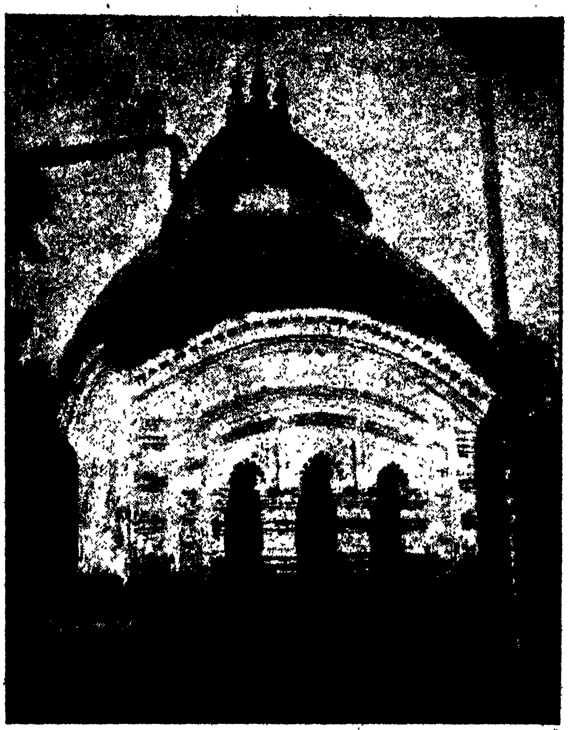


বজরায় বক্ষে বা য়াছিলে

চন্দ কিঙ্কর নাম ক প্রসিদ্ধ নাম শু ইঁহার কাল পূর্ব্বে। সম্বন্ধে প্র বা

(১)

ইনি দারিদ্র্যের তাড়নায় দিল্লীতে এক বৈশ্য সওদাগরের নিকট প্রথম অতি সামান্য বেতনে চাকুরী গ্রহণ করিয়া, ঘটনাচক্রে বাদশাহের অনুগ্রহে হুগলীর ফৌজদারের পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইঁহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। যে স্থানে ইঁহার বাটী ছিল, তাহার চতুর্দ্দিক পরিখাবদ্ধ ছিল; ঐ স্থানকে লোক আজিও কিঙ্কর সেনের গড় বলে। (১)



শ্রীশ্রী৺দশভূজা দেবীর মন্দির

গোন্দলপাড়ানিবাসী সুপ্রসিদ্ধ স্বর্গীয় গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পিতামহ রামমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও সে সময়ের এক জন ধনী লোক ছিলেন। তিনি প্রথম কলিকাতার ঠাকুরদের জমীদারীতে দেওয়ান ছিলেন। তাঁহার কাযের পুরস্কার স্বরূপ গোপী মোহন ঠাকুর মহাশয় তাঁহাকে রাজসাহী, জিলায় একটি লাভজনক জমীদারী প্রদান করেন। ইহা হইতেই তাঁহার সৌভাগ্যের বিকাশ আরম্ভ হয়। ইনি পরোপকারী বলিয়া পরিচিত ছিলেন। (১)

প্রেমনারায়ণ বসু, দেবী সরকার, দেওয়ান রামপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, কাশীনাথ কুণ্ডু, ফিরিঙ্গী কমল বসু, কাশীনাথ শ্রীমানী, নীলকণ্ঠ সরকার প্রভৃতি সেকালের কতিপয় খ্যাতনামা লোকের কথা ও কাহারও কাহারও কীর্ত্তিকাহিনীও শুনা যায়। তাঁহারা ঠিক কোন্ সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা অজ্ঞাত থাকিলেও, যতদূর জানা যায়, তাহাতে আনুমানিক ১ শত বৎসর বা সামান্য পূর্ব্বের লোক বলিয়া মনে হয়। তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত কথা পরবর্ত্তী কালের কথাপ্রসঙ্গে পরে বলা হইবে। এই যুগের দাতাদিগের প্রসঙ্গে ভিন্নদেশীয়



(১) 'আগন্তুক'

(১) The Modern History of the Indian Chifes, Rajas, Zemin-

হইলেও মহাপ্রাণ ক্লড্ মার্টিনের (Major General Claud Martin) কথা না উল্লেখ করিলে ত্রুটি থাকিয়া যায়। ইনি ফ্রান্সের লিঁয় নগরের এক জন অধিবাসী। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে প্রায় ৪০ লক্ষ টাকার সম্পত্তি রাখিয়া লক্ষ্ণৌ নগরে ইনি দেহত্যাগ করেন। এই বিপুল সম্পত্তির সমস্তই শিক্ষার্থ ও অন্যরূপ দানে ব্যয়ের জন্য ইনি উইল করিয়া গিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ১৷৷০ লক্ষ টাকার সুদ হইতে কলিকাতা, লক্ষ্ণৌ এবং চন্দননগরের দুঃস্থ অধিবাসীদিগের সাহায্যের জন্য ব্যয় হইবে ব্যবস্থা করিয়া যায়েন। তাঁহার নাম স্মরণীয় রাখিবার জন্য রূ জেনারেল্ মারতাঁ। নামে একটি রাস্তা এবং গির্জ্জার দেওয়ালে একখানি প্রস্তর-ফলক দেওয়া আছে। (১)

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, কবি ভারতচন্দ্র প্রভৃতি অনেক সুবিখ্যাত লোক মধ্যে মধ্যে চন্দননগরে আসিতেন এবং বাসও করিতেন। সুপ্রসিদ্ধ দর্পনারায়ণ ঠাকুর চন্দননগরে ফরাসী গভর্ণমেণ্টের অধীনে চাকুরী করিয়া যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করিয়াছিলেন। (২) টাকীর জমীদার বৈকুণ্ঠনাথ রায় চৌধুরী বরাহনগর পরিত্যাগ করিয়া এখানে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। ফরাসী গভর্ণমেণ্টের সহিত তাঁহার বিশেষ সৌহার্দ্দ ছিল এবং তিনি সাধারণের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। এখানে গঙ্গাতীরে তিনি একটি বলেন ওটি) ঘাট পুনর্নির্ম্মিত করাইয়া দিয়াছিলে "বৈকুণ্ঠ মুনসীর ঘাট" নামে একটি ঘাট আজিও (পাওয়া যায়।

ব্যবসাবাণিজ্য পূর্ব্বে এখানে খুবই বিস্তৃত বাঙ্গালার অন্য স্থান হইতে শস্য, অহিফেন, ও রেশম বহু পরিমাণে এখানে আমদানী হইত। ইহাকে খুব জাঁকজমক ও ধনসম্পদশালী উপ বলিয়াছিলেন। (২) অহিফেনের কার্য বরাবরই যথেষ্ট পরিমাণে আছে। কেহ বলিয় অহিফেন এখানকার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য ছিল। (সম্বন্ধে প্রমাণ না যা ইংরাজ মেণ্ট যথ সরে ৩ বাক্স আ দিতেন, সর্ত্ত এখানে উহা প্র করিতে প না। (৪) হইতে করিতে যায় যে, কোন সময়ে এখানে অধিক পরিমাণে অ প্রস্তুত হইত।



শ্রীশ্রী৺ বোড়াইচণ্ডী দেবীর মন্দির ও নাট বাংলা

যে বস্ত্রশিল্পের জন্য চন্দননগর আজিও বি তাহা পূর্ব্বকাল হইতেই এখানে প্রসিদ্ধি লাভ ক ছিল। এখানকার তাঁতিদের পূর্ব্বপুরুষগণই ঠ-

(১) Selections from Calcutta Gazette, 1798 to 1805.

(২) The Modern History of the Indian Chiefs, Rajas, Zaminders etc.

(১) ভারত-গৌরব।

(২) The Life of Lord Clive Vol. I.

(৩) Gazetteer of the World,

(৪) Notes on the Right bank of the Hc Calcutta Review, 1845.

তাঁতের উদ্ভাবক বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। (১) এখানে সূতা রং করা ও অন্যান্য রঞ্জনকার্য্য খুব ভাল হইত, এবং বহু দিন হইতে উহা এখানকার প্রসিদ্ধ কাম ছিল। দড়ি, চট, চুরুট ও গালার কাযও এখানে প্রবল ছিল। পূর্ব্বকার দড়ির কারখানার সম্পর্কে এখানে এখনও রু কয়দেরিয়ে নামক একটি রাস্তা আছে, প্রাচীনকালে চিনসুরা সিগার নামে যে চুরুট পৃথিবীর বহু স্থানে আদরের সহিত ব্যবহৃত হইত, শুনা যায়, উহা প্রধানতঃ এই স্থানেই প্রস্তুত হইত। গালাবাড়ী নামে যে প্রকাণ্ড অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও দণ্ডায়মান ছিল, তাহাতে একটি বড় গালার কারখানা ছিল। যে নীলের চাষ এক সময় বাঙ্গালার নিজস্ব সম্পদ ছিল বলিলেও হয়, এখানে তাহার কাযও ছিল, এবং যে য়ুরোপীয় এ প্রদেশে প্রথম নীলের চাষ করেন, তিনি এক জন চন্দননগরবাসী ছিলেন। তাঁহার নাম লুই বোনো (Louis Bonnaud)।

বোনো ফ্রান্সের মার্শেই নগরের এক জন অধিবাসী। তিনি প্রথম ওয়েষ্ট ইণ্ডিস্, তৎপরে বুরবঁ দ্বীপে ব্যবসার্থ বাসস্থাপন করেন। সহরের উত্তরে প্রথম তালডাঙ্গা নামক স্থানে এক খণ্ড জমী খাজানা করিয়া লইয়া একটি ছোট নীলের কারখানা স্থাপিত করেন। তৎপরে গোন্দলপাড়ায় একটি বড় রকমের কারখানা স্থাপন করেন। উহা সম্ভবতঃ বর্ত্তমান পাটকলের দক্ষিণে ছিল। এই সময়ে তিনি তাঁহার হাজিনগরের উদ্যান-ভবনে একটি দড়ি ও ক্যাম্বিসের বড় কারখানা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষে উহা অগ্নিসাৎ হওয়ায় বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েন। তৎপরে মালদহ জিলায় জনৈক ধনী ইংরাজের সহিত একত্রে বৃহদায়তনের নীলের কায আরম্ভ করেন। (২) এখানে বোনো পরিবারের এখনও যথেষ্ট নাম আছে। জন্ পিপ্ দ্বারা লিখিত নীল সম্বন্ধে একখানি পুস্তকে লুই বোনোর কথা লিখিত আছে। ডুমন্ত (Dumont) নামক আর এক জন য়ুরোপীয় নীল উৎপন্ন করিয়া, উহা লণ্ডনে চালান করিতেন উল্লেখ পাওয়া যায়। (১) চন্দননগরের আশে-পাশে, ন-পাড়া, খুসিগঞ্জ প্রভৃতি স্থানেও নীলের চাষ হইত জানা যায়। (২)

পুরাকালে চন্দননগরের শিক্ষা ও বাণিজ্য বিষয়ক বিবরণ জানিবার উপায় নাই। লালদীঘির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে একটি বিদ্যালয় ছিল জানা যায় এবং ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের মানচিত্রে বর্ত্তমান আদালতের পশ্চাতে একটি স্কুলের উল্লেখ দেখা যায়। সে সময়ের কবি পাঁচালীওয়ালা ভিন্ন বিশেষ শিক্ষিত লোকের নাম বা তাঁহাদের রচিত গান ভিন্ন তৎকালীন লিখিত কোন গ্রন্থাদির কথাও জানা যায় না। প্রাচীন দলিলাদি হইতে তৎকালের বাঙ্গালা গদ্য রচনার নমুনা মাত্র সংগ্রহ করা যাইতে পারে। জানা যায়, ফাদার গেরেন (Father J. F. M. Guerin) নামক এখানকার গির্জ্জার এক পাদরী ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে "কৃপাশাস্ত্রের অর্থবেদ" নামক একখানি বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত পুরাতন পুস্তক চন্দননগর হইতে প্রকাশ করেন। পর্ত্তুগীজ ভাষায় লিখিত মূলগ্রন্থ কেরি ও মার্শম্যানের ১ শত ৫০ বৎসর পূর্ব্বের লিখা। ঐ পুস্তকে এইরূপ লিখা আছে ;—

কৃপার শাস্ত্রের অর্থবেদ / সূর্য্যের আর চন্দ্রের গ্রহণ গণনার সহিত ১৪০ বৎসরের / আরম্ভ ১৮৩৬ সাল অবধি / সহর চন্দননগর / এবং সমস্ত বাঙ্গলা দেশের নিমিত্তে / করিয়াছেন জাকবছ ফ্রানছিস্কাস সারিয়া গেরেন / চন্দননগর সর্ব্বগ্রাহ্যর পাদরী / দ্বিতীয় বার এবং শুদ্ধরূপে শ্রীরামপুরে মুদ্রাঙ্কিত হইল। / সন ১৮৩৬ / (৩)

এই সময়ের মধ্যে ডাকের প্রচলন হইয়াছিল। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা হইতে চন্দননগরে ২॥০ তোলা ওজনের চিঠির ডাকমাশুল এক আনা ধার্য্য ছিল। কলিকাতা হইতে চন্দননগরে ও গরুটীতে পাল্কী ও বেহারার মোট ভাড়া ও মজুরী লাগিত ২৪॥০ টাকা। (৪) এই সময় হইতেই শ্বেতবর্ণের পরিবর্ত্তে ফরাসী ত্রিবর্ণ জাতীয় পতাকা স্থির হয়। ডি ফ্রেস্ (D Fresre) নামক

(১) চন্দননগরের [illegible]—'বিবর' [illegible] খণ্ড।
(২) Carey's Good Old Days.

(১) Selections from Calcutta Gazette, 178
(২) Selections from Calcutta Gazet e, 1789-97.
(৩) Bengali Literature in the Nineteenth Century.
(৪) Good Old Days of Honourable John Company.

কোন কর্মচারী বাঙ্গালার গভর্ণর মিঃ ইুয়ার্টকে ২০শে আগষ্ট ইহা লিখিয়া জ্ঞাত করেন। (১) ফরাসী রাজ-লক্ষ্মী মেরিয়ানার মূর্ত্তি কোন্ সময় হইতে পূজিত হইয়া আসিতেছে, তাহার কোথাও উল্লেখ পাই নাই। এই মূর্ত্তি-অঙ্কিত মোহর গভর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত কাগজপত্রে ও দলিলাদিতে সর্ব্বদা ছাপ দেওয়া হয় এবং এই মূর্ত্তি গভর্ণ-মেণ্ট-ভবনে ও প্রধান অফিসে রক্ষিত হইয়া থাকে। পূর্ণাবয়ব এই প্রতিমা দেখিতে কতকটা আমাদের সরস্বতীমূর্ত্তির সদৃশ।

ফরাসীদের আগমনের পর হইতেই আমাদের এই চন্দননগরের পরিচয়কথা আরম্ভ হইয়াছে। ইতিহাসে দেখা যায়, ডুপ্লের সময়ে উহা উন্নতির শীর্ষস্থানে উপনীত হইয়াছিল এবং যুদ্ধের পর হইতেই অবনতির পথে নামিতে আরম্ভ হয়। ডুপ্লের সময়ে যে স্থান অন্ততঃ লক্ষ অধিবাসীতে পূর্ণ ছিল, তৎস্থলে ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে যায়, লোকসংখ্যা ৪১ হাজার ৩ শত ৭৭। (১) সর্ব্বদিকেই অধোগতি অনুমিত হইয়া থাকে। ফরাসীদের আগমনের পূর্ব্বে যে সময়ের ইতিহা কারে সমাচ্ছন্ন, তথনকার দিনে ৺বোড়াইচণ্ডী, ৺ প্রভৃতি দেব-দেবীর প্রতিষ্ঠাদির কিংবদন্তী আলোচনা করিলে ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে অন্ধ মধ্যে কোন ঔজ্জ্বল্যের বিকাশ অসম্ভব নহে। ঐ অবলম্বনে নিশ্চয়ই কোন যোগ্য লোক পরে তথ্যের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবেন। আমরা চন্দন নবযুগের পরিচয়ে মন্দিরাদির কথাপ্রসঙ্গে প সকল কিংবদন্তী ও প্রবাদকথা বিবৃত করিব।

[ক্রমশ

শ্রীহরিহর

(১) Selections from Calcutta Gazette, 1789-1797.

(১) A Gazetteer of the World.

প্রেয়সী

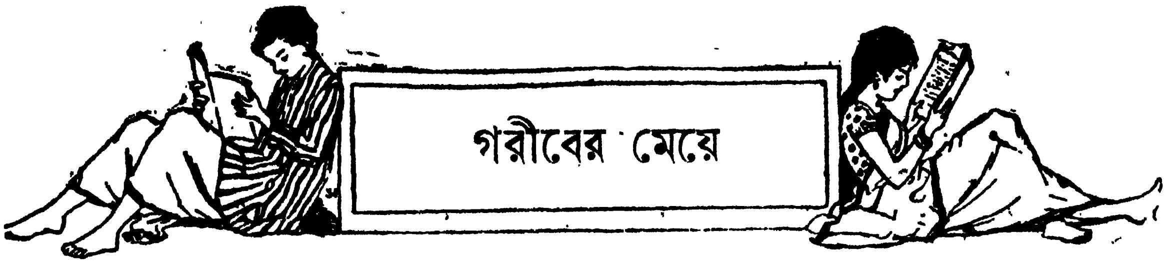
বিবাহের রাতে ছিলে তুমি
শুধু সঙ্কোচ-নত বালিকা,
দু'টি কম-হাতে দিলে তুলে গলে
বেলার শুভ্র মালিকা।

ফুলশয্যায় বিশ্বের লাজে
তোমারে ফেলিল ঢেকে,
আলোয় তোমার খুলিল না আঁখি,
ফুটিল না কথা মুখে।

তার পর ক্রমে হ'য়ে গেল ভাব,
মিলনে নিখিল-হারা,
কাটিল যে বাজে গল্পগুজবে
কত না রজনী সারা।

এখন দেখি যে সংসার-কাযে
সদাই তারি গো ব্যস্ত,
কথায় কথায় বিরক্ত বেজার —
থাকিতে হয় গো ত্রস্ত।

শ্রীহৃষীকেশ দত্ত



গরীবের মেয়ে

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

শুষ্ক, জরা, পুষ্পঝরা, শীর্ণ শাখায় নব বসন্তের নবীনাগমে নবপত্রমুকুলে যে নূতনতর শোভাসম্পদের সমাবেশ করে, কোকিলের কুহুতে, পাপিয়ার প্রিয়ানুসন্ধানে, শ্যামা-দোয়েল-বুলবুলের আনন্দগীতির মধ্য দিয়া যে উৎসব সমারোহ চলিতে থাকে, তরুণ জীবনে যখন নব বসন্তের সমাগম হয়, তখন সেখানেও ঠিক তাহারই অনুকরণ চলে। নীলিমার শীর্ণশীর্ণ হৃদয়-কাননেও এই বসন্তাগম ঘটিয়াছিল। তাহার অনাদৃত জীবন যৌবন এত দিন পরে সহসা আজ ফাল্গুনসমাগম লাভ করিয়া সার্থক ও সত্য হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার অন্তরের সুপ্ত কামনারাশি জাগ্রত হইয়া উঠিয়া প্রেমের মুকুলকে মুঞ্জরিত করিয়া তুলিয়াছিল। তাহার সেই বসন্তপুষ্পাভরণা জীবনোদ্যান ভরিয়া আশারূপী কোকিলের পঞ্চম স্বর, কল্পনারূপিণী বাণীর বীণার ঝঙ্কার, নব নব বাসনার পুলক-সঙ্গীতে পাপিয়া-দোয়েলের মধুর কণ্ঠ ধ্বনিত হইতেছিল, আর শীতল স্নিগ্ধ নির্ঝরধারার মত অপ্রতিহতগতিলাভে ছুটিয়া চলিয়াছিল প্রেম। ইহার মধ্যে নীলিমা কতখানিই না তাহার মনের মন্দির সাজাইয়া তুলিয়াছিল! পিতার ইচ্ছার পরিচয় পাইয়া, সুশীলের নিকট অপর্য্যাপ্ত আদর-যত্ন লাভ করিয়া নিজেকে সে উচ্চাকাঙ্ক্ষার চরমে উন্নীত করিয়াছিল। তাই সকল কর্ম্মের মধ্যে আজকাল তাহার আগ্রহ, আনন্দ ও উন্মাদনার অন্ত ছিল না। প্রভাতোদয় হইতে দিব-সান্তকালাবধি তাহার যেমন হস্তপদের বিশ্রাম ছিল না, মনের ভিতরেও তেমনই তরতর বেগে কল্পনা ও আনন্দের স্রোত সমান গতিতে বহিয়া চলিয়াছিল। এ বাড়ীর চির-নিয়মিত কদন্ন সে কোন দিনই সুশীলের পাতে পরিবেশন করিতে পারে নাই, অনেক রাত্রিতে ইচ্ছাবিলম্বে পিতার শয়নের পর গরম লুচি, বিবিধ ব্যঞ্জন সযত্নে রন্ধন করিয়া সে কি পরিতৃপ্ত সুখেই যে তাহা সুশীলের সম্মুখে নিবেদন করিয়া দিত, সে আনন্দ তাহার জানাই-বার স্থান কোথায়? এই সকল সংগ্রহ কত দুঃখেই যে তাহাকে করিতে হয়, সুশীল যদি তাহার বিন্দুবিসর্গও জানিত ত কখনই সে ইহার কণিকামাত্র গ্রহণ করিত না। কিন্তু সে যে তাহার এই গোপন দুঃখ জানে না, তাহার জন্যই সে শুধু নিজেকে যে এত বড় দুঃসাহসের কার্য্যে ঠেলিয়া দিতে পারিয়াছে, এইটুকুই যে তাহার সকল কষ্টের একমাত্র সান্ত্বনা, পরম পুরস্কার! সুশীল চিরসুখাভ্যস্ত, এ সংসারের সকল নিয়মের সহিত তাহার কোন পরিচয়ই নাই, সে স্বপ্নেও জানে না, তাহাকে ঐটুকু স্বাচ্ছন্দ্য দান করিতে নীলিমা কত বড় ত্যাগ-স্বীকার এই দিনের পর দিন ধরিয়া করিয়া চলিয়াছিল। তাই সে অবলীলাক্রমেই সেগুলি সহজভাবে গ্রহণ করিতেছিল, কিন্তু নীলিমার আত্মা পর্য্যন্ত যেন এই দানের মোহে ও ত্যাগের সুখে বিভোর হইয়া উঠিয়াছিল।

কখন কখন বড় সঙ্কটে পড়িয়াই এক একবার সে এমনও ভাবিয়াছে যে, ইহার চেয়ে স্পষ্ট করিয়াই উহাকে গিয়া বলি, আমায় কিছু টাকা দাও ত, খরচের জন্য কিছু হাতে নাই। আবার দারুণ লজ্জায় তাহার কৌমারচিত্ত সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছে। মনে মনে নিশ্বাস ফেলিয়া সে কল্পনা করিয়াছে, সে দিন তাহার কত দিন পরে আসিবে, যে দিন ঐ কথাগুলি নিঃসঙ্কোচ অধিকারে সে তাঁহাকে বলিতে পারিবে? এমন কি, সুশীলের খোলা সুট-কেশটা তাহার অসাক্ষাতে গুছাইয়া রাখিতে রাখিতে তাহার প্রত্যেক বস্তুটিকে সে নিতান্ত নিজস্ব বলিয়াই মনে করিয়া সযত্নে সন্নিবেশিত করিয়াছে। তাহার জুতা দু'পাটির ধূলা ঝাড়িয়া কত দিন সেই ধূলা সে মাথায় মাখিয়া পুলককণ্টকিতশরীরে মানসনেত্রে ধ্যান করি-য়াছে—সুশীলের সেই গৌর সুন্দর সুগঠিত সুকোমল পা দু'খানি! সে দিন কবে আসিবে, যে দিন সেই দুইটি সে বুকে তুলিয়া লইয়া সেবা করিতে পারিবে!

সেই দিন অনুকূল বাড়ী ফিরিলে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল, নীলিমা তাহার কোন সংবাদই জানিত না। সে রান্নাঘরে তখন বাটা ছানার সন্দেশ ও নিমকি প্রস্তুত করিতে একান্তমনে নিযুক্ত ছিল। কখনও এ সকল কার্য্য স্বহস্তে না করিলেও প্রবল ইচ্ছা ও বুদ্ধির সহায়তায় সে আজকাল অনেক বস্তরই প্রস্তুতপ্রণালী আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। তৈয়ারি খাবার একখানি পরিমার্জ্জিত রেকাবে সাজাইয়া একবার তৃপ্তনেত্রে সেগুলি পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক একটা সুখের নিশ্বাস গ্রহণ করিয়া সে প্রফুল্ল স্মিত মুখে সুশীলের সন্ধানে চলিল।

বেলা তখন অবসানের পথে ঢলিয়া পড়িয়াছে। স্বুবর্ণোজ্জ্বল আলোকের বন্যায় ধরিত্রী স্নাত হইতেছিলেন; আকাশের অঙ্গেও সে আলোর লহরী ইন্দ্রভবন বা স্বপ্নলোক রচনা করিয়া দিতেছিল। দিকে দিকে কোকিলের আনন্দকূজন শ্রুত হইতেছে। জনবিরল বাড়ীটার কোথাও কোন সাড়া নাই। নীলিমা নিজ অন্তরের পুলকোচ্ছ্বাসে পূর্ণ হইয়া মৃদুমৃদু গাহিয়া উঠিল—

"অন্তর মম বিকসিত কর, অন্তরতর হে!"

সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া সাম্‌নের দালানের একটুখানি মাত্র দূরে দেওয়ালের গায়ে পিঠ রাখিয়া কে এক জন রহিয়াছে! কে এক জন? না, কে এক জন হইবে কেন—সুশীলই ত দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া মুহ্যমান হইয়া পড়িয়া আছে।

এই ভাঙ্গা বাড়ীটার সমস্ত ছাত প্রাচীর একসঙ্গে ভাঙ্গিয়া পড়িতে দেখিলে সে যত না স্তম্ভিত হইত, এই অভূতপূর্ব্ব দৃশ্যের দ্রষ্টা হইয়া নীলিমার পুলকচঞ্চল চিত্ত তদপেক্ষাও বিস্ময়রসে ডুবিয়া গেল। তাহার হাস্যোদ্ভাসিত মুখ মুহূর্ত্তে কালিমাময় হইয়া উঠিল। ক্ষণকাল অবাক্ বদ্ধ দৃষ্টিতে দাঁড়াইয়া থাকিয়া তাহার পর সে সন্দেহশিথিল শ্লথ চরণে ধীরে ধীরে সুশীলের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। আর সেই সঙ্গে সঙ্গেই তাহার বিকসিত হৃৎপদ্ম মুদিত হইয়া আসিয়া তাহার বোধ হইল, অকস্মাৎ যেন তাহাদের মাঝখানে একটা প্রলয়ের অন্ধকার মাথা তুলিয়াছে। সেটা যেন উভয়ের ব্যবধান-যবনিকা!

অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী হইয়াও যখন সে সুশীলের দিক্ হইতে কোনই সাড়াশব্দ পাইল না, তখন কি যেন একটা নিদারুণ অজ্ঞাত আতঙ্কে নীলিমার সারাপ্রাণ হইয়া আসিল। সহসা তাহার মনে হইয়া গেল, সুশীল অমন মূর্চ্ছাতুর,শোকাহতবৎ পড়িয়া আছে—এ বিপদ যেন শুধু তাহারই নহে,ইহার মধ্যে নী যেন একটা অংশ আছে। মনে করিতেই মন বিস্ময়ে চমকিয়া উঠিল,সুশীলের বিপদে তাহার কো ঘটিবে? সুশীলের ক্ষতির সঙ্গে তাহার লাভলো সম্বন্ধ কি? যেখানে লাভের হিসাব পাওয়া যা সেখানের খাতায় লোকসানের হিসাব চড়ে কি কিন্তু মন এ যুক্তিতর্কে ত সায় দিতে পারি নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই সুশীলের বাড়ী হইতে কো সন্দেশ আসিয়াছে, এই বিশ্বাসে কৃতনিশ্চয় হইয়া নীলিমা স্নিগ্ধ শান্ত কণ্ঠে কহিল,—"কি খবর আমায় বল? দিদিরা, কাকাবাবু, পিসীমা, সেখানে ভাল আছেন ত?"

উত্তর না পাইয়া তাহার আতঙ্কভীত চিত্ত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে লাগিল, সকল দ্বিধা প পূর্ব্বক সহসা সে আত্মবিস্মৃত হইয়াই সুশীলের মস্তকের উপর হাত দিয়া মুখ তুলিতে চেষ্টা সভয় কাতরকণ্ঠে সে কহিল, "যা হয়েছে, আমাকে আমি যে আর থাকতে পারছিনে, আমার ব করছে যে—"

ইলেক্‌ট্রিক তারের কোথাও হাতটা ঠেকিলে যের শরীর যেমন শিহরিয়া উঠে, নীলিমার অ সেই ভীরু সসঙ্কোচ স্পর্শটুকুতে সুশীলের ব আড়ষ্ট শরীরমনে তেমনই তাহারই প্রতিক্রিয়া ঘটি চকিত চঞ্চল হইয়া নিজেকে সরাইয়া লইয়া মুখ এবং সেই শান্ত স্নিগ্ধ সমুজ্জ্বল অপরাহ্লালোকে নী আগ্রহব্যাকুল দুটি চোখের সহিত তাহার মিলিত হইল, তাহা দেখিয়া অপর পক্ষে নীলিমা নখ হইতে কেশাগ্র অবধি কাঁপিয়া স্থির হইয়া সে দেখিল, তাহার মধ্য হইতে সকল করুণা, সহৃদয়তা, সমস্ত মমতা অপসৃত করিয়া দিয়া স্থলে সুস্পষ্টাক্ষরে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে অক ও অপ্রচ্ছন্ন তিরস্কার! নীলিমা সভয়ে দুই প হটিয়া গেল। তাহার জীবনে যে একটা মস্ত ব

হইয়া গিয়াছে, সে বিষয়ে বিনা বিচারেই এবার তাহার মনের মধ্যে স্থিরসিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু সেটা যে কি এবং কোথা হইতে ঘটিল, এ রহস্য তাহার কাছে একান্ত জটিল ও অভেদ্য বোধ হইলেও সে বিক্ষুব্ধ চিত্তে ও শঙ্কিত মুখে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিল। এই ঘৃণা-ভরা ক্রুদ্ধ দৃষ্টি একটি ক্ষণের মধ্যেই যেন তাহাদের দু'জন-কার এই একটি মাসের সকল ঘনিষ্ঠতা, সকল পরিচয়কে আড়াল করিয়া পাষাণপ্রাচীরের মতই উদ্যত হইয়া উঠিয়া তাহাদের মাঝখানের অর্দ্ধহস্তপরিমিত জমীটুকুকে চাপিয়া রহিল। তাহারই অদৃশ্য অটল অভেদ্য দেহ নীলিমার গতি ও বাক্য একসঙ্গেই রোধ করিয়া দিল।

দুই জনের কেহই কোন কথা কহিল না। বহুক্ষণাবধি সুশীল তাহার আরক্ত ও কঠিন দৃষ্টি বাহিরের শূন্যপথে সংন্যস্ত রাখিয়া অবশেষে আর একবারের জন্য তাহা অকারণ স্তব্ধ, অজানা ভয়ে আড়ষ্ট নীলিমার মৌন নত মুখে স্থির করিয়া ধরিল। সার্চ্চলাইট যেমন করিয়া নদীর তলদেশাবধি ভেদ করিতে চায়, তেমনই করিয়া সেই তীক্ষ্ণ রুক্ষ দৃষ্টি যেন এই পাষাণে পরিবর্ত্তিতা মূর্ত্তি-রূপিণী নারীর অন্তরদেশ পর্য্যন্ত উলটিয়া দেখিতে চাহিল। তাহার পর কি ভাবিয়া অনুসন্ধানে বিরত হইয়া সে মুখ ফিরাইল ও তাহার চিরবিকল চিত্ত যেন নূতন করিয়া আর একবার ইহার উপর গভীরতর ঘৃণার তরঙ্গে প্লাবিত হইয়া গেল। বাপের উপর তাহার সকল বিদ্বেষ, সকল বিরক্তি, সমস্ত ক্রোধই যেন পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়া ইহারই উপরে নিপতিত হইয়া গেল। সুশীলের জ্বালা-ভরা নিরতিশয় অপমানপীড়িত চিত্ত নীরব কোপে জ্বলিয়া জ্বলিয়া নিজেরই মধ্যে স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়া লইল যে, এই ঘৃণিত ষড়যন্ত্রে নীলিমা নিঃসংশয়ই জড়িত আছে। উহার মুখে যে অপরাধের কালি মাখান! উহার ব্যবহার কি লজ্জাহীন ও কাপট্যপূর্ণ! এই অপ-রাধিনী বিশ্বাসহন্ত্রীর অঙ্গস্পৃষ্ট বাতাস, তাহার নিশ্বাসের মৃদু শব্দ, তাহার স্তব্ধ স্থির পাষাণমূর্ত্তি অসহনীয় বোধ করিয়া সুশীল তৎক্ষণাৎ নিঃশব্দে উঠিয়া নীরবে প্রস্থান করিল। আর সঙ্গে সঙ্গেই নীলিমার চোখের সাম্‌নে সারা বিশ্বটা ভূমিকম্পে দুলিয়া উঠিল; তাহার বোধ হইল, তাহার পদতলের অবলম্বন কোথায় সরিয়া টলিয়া যাইতেছে।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

কি হইল? কেন হইল? কিসের জন্য হইল? ইহার কিছুই যদি খুঁজিয়া না পাইয়াও কাহাকেও সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়, তবে কার্য্যের চাইতেও কারণটার জন্যই সে যেন সমধিক ব্যাকুলচিত্ত হইয়া পড়ে।—কি করি-লাম যে, আমায় তুমি অমন করিয়া গেলে?' এই প্রশ্ন-টাই নীলিমার মনে সব চেয়ে প্রবল স্বরে বাজিয়া উঠিতেছিল বলিয়াই সেই প্রশ্নটাকে বাহিরে পাঠান আজ তাহার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষাই কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। কিছু যে একটা ঘটিয়াছে, সেটা যে সামান্য কিছুও নয়—বড় অসামান্য, বড় অসাধারণ কোন কিছু এবং সেটা যে নীলিমারই সর্ব্বনাশের আয়োজন, সেই কথাটাই শুধু এই আকস্মিক ব্যাপারের, এই অনুদ্‌ঘাটিত গভীর রহস্যের তলদেশ হইতে সহজেই ভাসিয়া উঠিতেছিল। আর সবই ইহার প্রচ্ছন্ন। সেই আসন্ন সন্ধ্যার আলো-ছায়াভরা সন্ধিক্ষণে নীলিমার শত উদ্দীপনাভরা, সহস্র কল্পনালোকে সমুজ্জ্বল, পরিপূর্ণ চিত্ত একেবারে অতলের অন্ধকারে আছাড় খাইয়া পড়িয়া আর্ত্ত ঊর্দ্ধস্বরে চীৎকার করিয়া বলিল, "আমার সব গেল! ওরে আমার সব গেল রে!"

যাহার থাকে, তাহারই যায়; যাহার কিছু ছিল না, তাহার কোথা হইতে কি যাইবে? এই যে সাধারণ একটা হিসাব পড়িয়া আছে, কি আশ্চর্য্য, নীলিমার মন একবারের জন্যও ত সে দিক ঘেঁসিয়া গেল না! তাহার ছিল কি, আর গেল কি? তাহার কোন হিসাবই সে করিল না, শুধু তাহার বেদনার তীক্ষ্ণ শরে-বিদ্ধ প্রাণ হু হু করিয়া জ্বলিতে জ্বলিতে দারুণ জ্বালার সহিত অনুভব করিতে লাগিল যে, তাহার সব গেল! সব গেল! সব গেল!

অপরাহ্ণ সায়াহ্নে ও সন্ধ্যা রাত্রিতে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। জনবিরল পল্লী প্রায় নিঃসাড় হইয়া আসিয়া-ছিল। মধ্যে মধ্যে পাদচারী পথিকের গমনাগমন

পথচারী কুক্কুরের সতর্ক চীৎকারে অনুসূচিত হইতেছিল মাত্র। অদূর আম্রকাননে শৃগালের দল কোলাহল করিয়া উঠিতেই কুকুরগুলা তারস্বরে ডাকিয়া উঠিয়া উহাদিগকে নীরব করিয়া দিল। বাড়ী নিস্তব্ধ—ঘোর নিস্তব্ধ। ইহার কোথাও কোন সাড়াশব্দ নাই, আলো নাই। ইহার মধ্যে জীবিত জীবের নিবাস কল্পনা করাই কঠিন। জীর্ণদ্বার মুক্ত ও রুদ্ধ হইবার শব্দ শুনা গেল, নিবিড় অন্ধকারে সাবধানন্যস্ত পদক্ষেপ সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া আসিল। আর একটু হইলেই আগন্তুক সেই একই স্থানে একই ভাবে অবস্থিত অসাড় অস্পন্দ নীলিমার ঘাড়ের উপরেই পড়িয়া যাইত; কিন্তু ক্ষীণ নক্ষত্রালোকে অস্পষ্টভাবে দেখিতে পাইয়া সে গতি রুদ্ধ করিয়া দিল এবং একটুখানি ঝুঁকিয়া পড়িয়া চিনিতে পারিয়া বলিয়া উঠিল, "নীলি? জেগে আছিস? আচ্ছা, একটা আলো জেলে আন্ দেখি চট ক'রে।"

কোন্ অন্ধকারের গুহাগহ্বরাশ্রিত পলাতক মনটাকে টানিয়া আনিয়া নীলিমা যখন পিত্রাদেশ পালনার্থে উঠিয়া দাঁড়াইল, আহার নিজের উপর দিয়া এই কয় ঘণ্টার মধ্যেই কত বড় যে একটা বিপ্লব ঘটিয়া গিয়াছে, তাহা সে তখনই যেন ভাল করিয়া অনুভব করিতে পারিল। কি দুর্ব্বল, কি অবসন্ন, কি অপরিসীম অবসাদগ্রস্তই তাহার সমস্ত শরীর-মন ইতোমধ্যে হইয়া পড়িয়াছে!

প্রদীপ হাতে ফিরিয়া আসিয়া সে যাহা দেখিল, তাহাতে হাতের প্রদীপ ত তাহার পড়িয়া গেলই, নিজেও যেন সে সেই সঙ্গে সঙ্গে পতনোন্মুখী হইল। হয় ত মূর্চ্ছিতই সে হইত, যদি না সেই মুহূর্ত্তে বাপের কঠোর ভৎর্সনার আঘাত তাহার অবসাদে অবসন্ন চিত্তকে ব্লিষ্টারপ্রয়োগের মতই চেতাইয়া তুলিত। অনুকূল মেয়ের কাণ্ডে একান্ত বিরক্ত ও অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়া চাপা তর্জ্জনে গালি দিয়া উঠিলেন—

"দিন দিন কচি খুকী হচ্চিস্ না কি? ভাঙ্গলি পিদীমটে? বড়লোকের ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিচ্চি ব'লে সেই আহ্লাদে কি মাথারও ঠিক নেই না কি? যা শীগ্‌গির যা, একটা লণ্ঠন জেলে নিয়ে এসে এই টোপর, চেলি, কলা, পান, হলুদ, বাতাসা সব ভাল ক'রে তুলে পেড়ে রেখে দে। আর খাবারদাবার যদি কিছু তোমার গুষ্টীর পিণ্ডী থাকে ত তাই নিয়ে এস। কাল আবার উপোস ক'রে মরতে হবে ত তোমার চৌদ্দপুরুষের পিণ্ডী চট্‌কাতে! যাও না, উদাসিনী রাজকন্তের মতন অবাক্ হয়ে দেখছো কি আমার মুণ্ডু? টোপর কখন চোখে দেখ নি, না আমাকেই কখন চেনো না?"

নীলিমা এ আদেশও পালন করিল। কেমন করিয়া যে করিল, সে কথা সে নিজেও বুঝিল না। কাপ্তেনের হুকুমে অকূল সমুদ্রের ভীষণ ঝটিকার সময়েও যে অভ্যাসে ভীত নাবিকরা হাল ছাড়ে না, সেনাপতির আদেশে গোলাবৃষ্টির মধ্য দিয়াও সৈন্যদল যে অভ্যাসে অগ্রসর হয়, শুধু সেই চিরাভ্যস্ত বাধ্যতার ফলেই নীলিমাও নিজের শরীর-মনের সেই প্রবল কম্পন ও অচলতার মধ্য দিয়া এই সকল কার্য্য সমাধা করিয়া রান্নাঘরে গেল। রান্না আজ কিছুই হয় নাই। সেই সুশীলের জন্য সযত্নে প্রস্তুত রেকাবে ভরা খাবারগুলি মাত্র অযত্নে পড়িয়া আছে। নির্ব্বিচারে তাহাই আনিয়া সে বাপের সাম্‌নে ধরিয়া দিল। তাহার মায়ের ঘরে দাঁড়াইয়া তখন তাহার বাপ হাত-মুখ নাড়িয়া তাঁহাকে কোন কথা বুঝাইতেছিলেন। লণ্ঠনের আলোতে নীলিমা দেখিল, স্বর্ণলতার মুখের চেহারায় অকথ্য ভয়ের ও অস্বাভাবিক লজ্জার ছায়া দেদীপ্যমান। তিনি প্রহারভীত বালকের মতই ভয়ার্ত্ত চক্ষুতে স্বামীর দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন। তখন নীলিমার মনে পড়িল, আজ মধ্যাহ্নের পর হইতে এই মা যে তাহার বাঁচিয়া আছেন, সে কথাও তাহার মনে ছিল না!

অনুকূল মেয়ের দিকে লক্ষ্যমাত্র না করিয়া আপন মনের উৎসাহেই বলিয়া যাইতে লাগিলেন—"ছোঁড়াটা কি কম বজ্জাত! কিছুতেই রাজী করতে পারিনে। শেষকালে নালিশের ভয় দেখিয়ে তবে না তার মুখখানা বন্ধ করি। বলেছি, যদি আমার মেয়েকে বিয়ে না করে, তা হ'লে বাপবেটীতে মিলে তা'র নামে ফৌজদারী করবো। সমস্ত পৃথিবী জানবে, ভুবন রায়ের ছেলে সুশীল রায় কি জঘন্য চরিত্রের মন্দ লোক। তখন কোথায় থাকবে তোমার পিতৃভক্তি আর কোথায়

থাকবে বড়লোকের মেয়ে সুলেখা! এখন কোন গতিকে কালকের দিনটায় দু'হাত এক ক'রে চারটে মন্তর পড়িয়ে দিতে পারলেই সকল পাপের শান্তি হয়ে যায়! আজই দিতুম—তা যদি বে-আইনী হয়েছে ব'লে বিয়েটা ক্যান্‌সেল করিয়ে নেয়, সেই ভয়েই শুধু আমার ভরসা হলো না।"

নীলিমার সমস্ত শরীরের রক্ত হিমশিলায় জমাট বাঁধিয়া গেল। তাহার চলন্ত হৃৎপিণ্ড দম-ফুরানো ঘড়ির মত সহসা থমকিয়া থামিয়া পড়িল। তার চারি দিকের বায়ুস্তর অকস্মাৎ কঠিন পদার্থেরই মত ভারী হইয়া উঠিল। অসাড় হাত হইতে খাদ্যভরা রেকাবখানা কোন্ সময় যে ঝন্ ঝন্ করিয়া পড়িয়া খাবারগুলা কক্ষভূমির ইতস্ততঃ ছড়াছড়ি হইয়া গিয়াছিল, তাহা সে জানিতে পারে নাই; সে খবরটা জানিতে পারিল পিতৃমুখের কঠোর তিরস্কারে :—

"বলি আহ্লাদের চোটে কি আমার ঘরকন্নার কিছু আর রেখে যাবে না? বলি তুমিই না হয় বড়মানষের বউ হচ্চো, আমায় কি রাজা ক'রে দেবে বলতে পার যে, সর্ব্বস্ব ভেঙ্গে ছড়িয়ে লোকসান করছো? বলি ব্যাপারখানা কি, বলতে পার?"

বাপের খাবারগুলা কুড়াইয়া দিয়া কোন রকমে নীলিমা সেখান হইতে পলাইয়া আসিল। নিজের ঘরে খিল দিয়া অন্ধকারে শয্যাহীন তক্তাখানায় গিয়া বসিতেই চারিদিক হইতে একসঙ্গে একত্র বাঁধভাঙ্গা জলরাশির মত বিবিধ ও বিভিন্ন চিন্তাস্রোত তাহার বুকের মধ্যে বিচিত্র তালে তরঙ্গিত হইতে লাগিল। প্রথমতঃ ঘোর বিস্ময়ের স্থলাধিকার করিল—অপরিমেয় আনন্দ। এই গাঢ় সূচিভেদ্য অন্ধকারের আশ্রয়ে যখন মায়ের আর্ত্ত চক্ষু ও বাপের চাতুরীভরা বাক্য দর্শন-শ্রবণের অতীত হইয়া গেল, তখন শুধু একান্ত হইয়া জাগিয়া উঠিল, এত দিনের সংশয়-সংকীর্ণ ক্ষীণ কল্পনার পূর্ণ পরিণতির সার্থকতা ও সুখ। সর্ব্বদেহে মনে আহ্লাদে কণ্টকিত হইয়া নীলিমা মনে মনে সুশীলের তরুণ রূপ ধ্যান করিল। কি সুন্দর সুঠাম দেহ! কি ঔদার্য্যব্যঞ্জক গভীর দৃষ্টি! আর কি সুমিষ্ট হাস্য-নীলিমার চিত্তচকোর কি দুরন্ত ক্ষুধায় মনে মনে গ্রাস করিয়া লইয়াছে! তাহার মুদিত হৃদয়কোরক সেই হাস্য-রশ্মিবিভাসিত হইয়াই আজ এই সহস্র দলে বিকসিত হইয়া তীব্র শোভাকুল দৃষ্টিতে সেই গগনব্যবধান দীপ্ত সূর্য্যের পানে গোপন আকাঙ্ক্ষায় শুধু চাহিয়া ছিল। উঃ, কি আনন্দ! কি আনন্দ! কি আনন্দ রে!—আজ সেই মরুমরীচিকা সত্য হইতে, স্বপ্ন সফল হইতে চলিল! কি আনন্দ! নীলিমার জীবনে আজ অপ্রত্যাশিত কল্পনাতীত এ কি বিপুল আনন্দ! এ কি অসীম সুখ! স্বর্গরাজ্য বাস্তবিকই কি মর্ত্ত্যমানবীর উপভোগে ধরণীর এক প্রান্তে নামিয়া আসিল না কি?

নীলিমা আনন্দোদ্বেলিত বক্ষে মনে মনে অনুভব করিতে লাগিল, সুশীলের সুকোমল, তপ্ত, স্নিগ্ধ স্পর্শ, তাহার সেই প্রণয়গভীর দৃষ্টি, সেই স্নেহ-সুশীতল দৃষ্টি সে নিজের পিপাসিত দেহ-মনে মর্ম্মে মর্ম্মে উপভোগ করিয়া লইল। নিজেকে তাহার ঘরের নবোঢ়া বধূ, গৃহলক্ষ্মী, সন্তানজননী—সকল ভাবেই এক একবার ভাবিয়া লইল। জীবনে এ কি সার্থকতা! স্বপ্নে এ কি সুবিপুল সুখ! এ কি অযাচিত করুণা, হে দয়াময়!

ঈশ্বরের নাম লইতে গিয়া নীলিমার মনে পড়িল যীশুকে। মাসাবধি এ নাম সে লয় নাই। সত্য কথা বলিতে গেলে বলিতে হয়, সুশীলের ভিন্ন কোন দেব-মানবেরই নাম বা স্মৃতি এই একটি মাস তাহার মনের ভিতর প্রবেশাধিকারই পায় নাই। তাই আজ এমন সময়ে আনন্দসাগর যখন কূলপ্লাবী হইয়াছে, সেই সময় এই স্মৃতি স্মৃতিপথে উদিত হইয়া তাহার ভরাচিত্তে সামান্য একটা দোল খাওয়াইয়া দিল। যীশু?—না, ও নাম, ও স্মৃতি এ জীবনের মতই অতীত হইয়া যাউক্! ভ্রমেও আর কখন যেন উহা তাহার মুখে উচ্চারিত না হয়। সুশীলের মুখে সে গল্প শুনিয়াছে, তাহার পিসীমা নিত্য শিবপূজা করেন, তাহার পিতা দুই বেলা সন্ধ্যার্চ্চনা করিয়া থাকেন; সে দেখিয়াছে, সুশীলও গায়ত্রী জপ করে। সরোজিনী-পিসীমার নিকটে সে শিবপূজা-বিধি শিখিয়া লইবে, ভুবন বাবুর আহ্নিকের স্থান সে সযত্নে সাজাইয়া দিবে। কোন্ দেবতার ইঁহারা উপা-

তাঁহাকেই উপাস্য করিবে। কে বলে, হিন্দুর ধর্ম্মে মুক্তি নাই; তাহাদের জীবনে উদারতা নাই, ত্যাগ নাই—সংযম নাই? যে বলে, সে দেখুক—সুশীলকে। তাহার ত্যাগ—তাহার—তাহার—

নীলিমার হর্ষোদ্দীপ্ত আনন্দ-স্মিত মুখ সহসাই সেই ঘনান্ধকারে তাহারই মত কালিমাখা হইয়া গেল। তাহার মানসনেত্র তন্মুহূর্ত্তেই অপরাহ্লালোকে দৃষ্ট সুশীলের সেই ভর্ৎসনা-কঠোর ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টি প্রত্যক্ষ করিল। সে দৃষ্টির অগ্নি-কষা নীলিমার চিত্তে দগ্ধ ক্ষত সৃষ্টি করিয়া যে ভিতরে ভিতরে অনির্ব্বাণ হইয়াই রহিয়াছিল, সঙ্গে সঙ্গে ইহাও তখনই তখনই প্রমাণ হইয়া গেল। কেন যে সুশীল অস্পৃশ্য জাতির স্পর্শের মতই তাহার হাতের ছোঁয়া হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া লইয়া তীব্র বিরাগে তাহার সান্নিধ্য পরিত্যাগ করিয়াছিল, এইবার সেই জটিল রহস্যের জাল আপনা আপনিই মুক্ত হইয়া গেল। উঃ, কোথায় স্বর্গ, কোথায় নন্দন? কোথায় আনন্দলোক? জ্বালা—জ্বালা! চারিদিক্ ব্যাপিয়া এ যে শুধু রাশি রাশি অগ্নিদাহ! অফুরন্ত আগুনের দাহকরী জ্বালা! সুশীল ত স্বেচ্ছায় তাঁহাকে গ্রহণ করিতেছে না।

নীলিমা দুই হাতে বুক চাপিয়া ধরিয়া লুটাইতে লাগিল। সেই দৃষ্টি! সেই ঘৃণা! সেই অকথ্য ঘৃণা! তাহার বিনিময়ে এই সুখাকাঙ্ক্ষা? সুখ—কোথায় সুখ? পাগল—সে পাগল! যা'র চোখে ওই বিদ্বেষের লেখা—যাহার মনে ঐ ঘৃণার অবহেলা, তাহাকে চক্রান্তে জড়াইয়া আত্মসাৎ করিলেই সে কি তাহার আপন হইবে? অসম্ভব! নীলিমার আশা অসম্ভব আশা! নীলিমার পিতার দুরভিসন্ধি তদপেক্ষাও অসঙ্গত অকার্য্য! জোর করিয়া তিনি তাহাকে উহার গলায় ঝুলাইয়া দিবেন, কিন্তু সে ভার তাহার সহিবে কি?—সহিবে কি?

সারারাত্রি ধরিয়াই সেই স্তব্ধ নিঝুম নিরালায় নিরালোকে একাকিনী বসিয়া সে ভাবিল। প্রখর ঝিল্লী-রব ভিন্ন তাহার সেই অমীমাংসিত চিন্তার দ্বিতীয় কোন সাক্ষ্য রহিল না। তাহার প্রাণের ব্যাকুল নিবেদনে কোথাও হইতে কোন সাড়া আসিল না। অন্তরের সংশয়দ্বন্দ্বের কোনই সমাধান হইল না। একবার তাহার মন দারুণ বিদ্রোহভরে এই দুরন্ত লোভকে দূরীভূত করিয়া দিয়া বলে, কি হইবে অমন হীনমূল্যে হেয় হইয়া দস্যুর মত লুটিয়া লইয়া? তেমন করিয়া কাড়িয়া লুটিয়া কেহ কি চিরদিন কাহাকেও আপন করিয়া রাখিতে পারে? আবার মন বলে, দু'দিন দু'দিনই সই! দু'দিনের স্মৃতিকেও ত চিরদিনের সম্বল করিয়া রাখিতে পারিব? স্বর্গ যখন মর্ত্ত্যলোকের দ্বারে আসিয়াছে, তখন কেনই বা না প্রবেশ করিব?

সহসা পূর্ব্বদিকের জানালা দিয়া পীতাভ আলোর রেখা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। তন্দ্রাভঙ্গবৎ নীলিমা সবেগে উঠিয়া পড়িয়া ঘন শ্বাসে আত্মগতই বলিয়া উঠিল, "না না, সে আমার কায নেই, সে সুখ আমি চাইনে, দুঃখই আমার থাক!"

দ্বার খুলিয়া দ্রুতপদে সুশীলের দ্বারে আসিয়া সে মৃদু মৃদু দ্বারে করাঘাত করিল। তখনও ভোরের আলো ভাল করিয়া ফুটিতে পারে নাই। পূর্ব্বাকাশের প্রান্তটি মাত্র গোলাপের অর্দ্ধস্ফুট মুকুলদলের মতই আধখোলা হইয়াছে। নিদাঘতপ্ত নিশির তাপদাহ প্রশমিত করিয়া মিষ্ট শীতল বায়ু সবেমাত্র বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। সশঙ্কনেত্রে চারিদিকে চাহিয়া নীলিমা পুনশ্চ সেই রুদ্ধ দ্বারে অধীর করাঘাত করিল। দ্বারের ফুটায় মুখ রাখিয়া যতটুকু সম্ভব স্বর ঈষদুচ্চ করিয়াই বলিল, "আপনি চ'লে যান, এখনই ট্রেণ ছাড়বে। আর দেরি করবেন না।"

ঘর নিঃসাড়; কোথাও কোন শব্দমাত্র নাই। তবে ত সুশীল নিদ্রা যাইতেছে! সে ত এই অবস্থাতেও ঘুমাইতে পারিয়াছে! তবে বৃথা কেন নীলিমার সঙ্কোচ? এ সংসারে নীলিমার কোনও ভয় নাই। বৃথা সন্দেহ! সুশীল ভালবাসে! নিশ্চয়ই সে তাহাকে ভালবাসে এবং তাহার হইতে তাহার এমন কিছু আপত্তি নাই। আর যদিই থাকে, তবে তা থাকুক, এ লোভ নীলিমা কিছুতেই দমন করিতে পারিবে না।

[ক্রমশঃ।

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।

আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্য

ইংরাজ যখন বণিকের তুলাদণ্ড ফেলিয়া প্রথম রাজদণ্ড গ্রহণ করেন, তখন আমাদের সাহিত্যে ভাঙ্গনের দশা পড়িয়াছিল। তদানীন্তন সাহিত্যের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙ্গালা সাহিত্যের জীবনীশক্তি বড় ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছিল। ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলে' পুরাতন সাহিত্যের চরমোৎকর্ষের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার পরবর্ত্তী লেখকগণ ভারতচন্দ্রের প্রদর্শিত পথই অবলম্বন পূর্ব্বক চলিয়াছিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারেন নাই; অধিক কি, মাইকেল মধুসূদনের আগমন পর্য্যন্ত ভারতচন্দ্রের ন্যায় শক্তিশালী কোন লেখকই বঙ্গসাহিত্যে উদিত হয়েন নাই। ইংরাজী ১৭৫৭ অব্দে পলাশীর যুদ্ধ হয়—১৭৬০ খৃঃ অব্দে ভারতচন্দ্র পরলোকে গমন করেন। ভারতচন্দ্রের পরলোকগমনের পর কয়েক জন ভারতচন্দ্রের অনুকরণে কাব্যাদি লিখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সাহিত্যের আসর কবির দলই জমাইয়া রাখিয়াছিলেন। সুতরাং ভারতচন্দ্রের পর হইতে ঈশ্বর গুপ্ত, রঙ্গলাল ও মধুসূদনের আবির্ভাবকাল পর্য্যন্ত বঙ্গসাহিত্যের স্রোতোগতি ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতেছিল। যদি ইংরাজী শিক্ষাদীক্ষায় বাঙ্গালা সাহিত্যের রূপান্তর না ঘটিত, তাহা হইলে তৎকালীন বঙ্গসাহিত্য কি আকার গ্রহণ করিত, তাহা অনুমান করা অতি কঠিন। প্রকৃত কথা বলিতে গেলে, সাহিত্য তখন প্রাণশক্তি হারাইয়া গতানুগতিক পথের মধ্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল,—কৃত্রিমতার কঠোর শৃঙ্খল ইহার সর্ব্বাঙ্গ নিষ্পিষ্ট করিতেছিল। স্বাভাবিকতা হারাইয়া নিতান্ত সীমাবদ্ধ হইয়া সাহিত্যের প্রাণশক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া গিয়াছিল, কেবল তাহার সামান্য স্পন্দন কবিওয়ালাদের গানে ধ্বনিত হইতেছিল।

ইংরাজ যখন দেশের প্রথম রাজা, তখন সমাজে, সাহিত্যে, ধর্ম্মে সর্ব্বত্রই ধ্বংসের লীলা চলিয়াছে। তখন দেশের অবস্থা বড় ভীষণ—ইংরাজের হস্তে দেওয়ানী ও খাজনা, কিন্তু শিষ্টের রক্ষণ ও দুষ্টের দমন নবাবের হাতে। ইংরাজ ভাত দিবার কেহ নহেন, কিন্তু আপনার পাওনা ষোলগণ্ডা বুঝিয়া লয়েন। সিতাব রায়, রেজা খাঁ, দেবী সিং—এ সেই দেবী সিং যাহার নাম শুনিয়া মাতার অঙ্কে শিশু পর্য্যন্ত আতঙ্কে চমকাইয়া উঠিত—গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ প্রভৃতি দুর্দ্দান্ত লোকের হাতে রাজস্ব আদায়ের ভার দিয়া ইংরাজ আপনার ব্যবসায়-বাণিজ্য চালাইতেন। দেশের রাজা কে, বুঝা যাইত না; [illegible]-কল কথা, সে সময় অরাজকতার সময়। বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দমঠ' ও 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসদ্বয়ে এই যুগের অনি[illegible]ন্দের চিত্র দিয়াছেন। জমীদারগণও তখন প্রজার ন্যায় উৎপীড়িত; সে সময় কাব্যকলা-সৃষ্টির সময় নহে। কিন্তু সময় যতই মন্দ পড়ুক না কেন, তখনও এমন এক স্তরের লোক ছিলেন, যাঁহারা সে সময়েও সুবিধামত সাহিত্যরসের আস্বাদ উপভোগ করিতে নিবৃত্ত হইতেন না। ইংলণ্ডে ঘরোয়া যুদ্ধ বাধিয়া দেশের অবস্থা যখন সাংঘাতিক, তখন এক দল কবি নিজের মনে গান গাহিয়া যাইতেছিলেন, কোন দিকেই ভ্রূক্ষেপ করিতেন না—এই ক্যাভেলিয়ার কবিরা জগতের কোন ধারই ধারিতেন না। তেমনই আমাদের দেশে সর্ব্বত্রই যখন বিপর্য্যয়ের কাণ্ড চলিতেছিল, সে সময় এক দল কবি বড় বড় নগরে ব্যবসায়ীর ও ধনীদের মনোরঞ্জনার্থ গান রচনা করিয়া বেড়াইতেন—ইঁহারাই কবিওয়ালা, তদানীং সাহিত্য ইঁহাদেরই লীলাক্ষেত্র হইয়াছিল।

ইংরাজ ক্রমশঃ পূরাপূরিই রাজা হইলেন—দেওয়ানী ফৌজদারী সমস্তই তাঁহাদের হাতে আসিল। বিলাতে বোর্ড অফ ডিরেক্টারগণ বুঝিলেন, ইংরাজ আর কেবল বণিক নহেন,—রাজা; সুতরাং শাসনের সুশৃঙ্খলার জন্য নানাপ্রকার বন্দোবস্ত করা হইতে লাগিল। দেশের উন্নতিসাধন করিতে হইলে দেশবাসীর শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করিতে হয়। ভারতবর্ষ [illegible]

জুলু বা নিগ্রো নহে অথবা পার্ব্বত্য অসভ্য জাতি নহে; ভারতের স্বতন্ত্র সভ্যতা আছে, ইতিহাস আছে—বিচার-ব্যবস্থা সমস্ত বিষয়েই স্বাতন্ত্র্য আছে। এই জাতির শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইলে কিরূপ শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করা যায়, ইহাই হইল তখনকার প্রধান সমস্যা। এক দল লোক বলিলেন, ভারতবর্ষ যদি স্বীয় স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে চাহে, তবে তাহাকে শিক্ষা করিতে হইবে ভারতের শিক্ষা—ভারতের দর্শন, ইতিহাস, ভারতের ভাষা ও সাহিত্য। আর এক দল অমনই বলিলেন—ভারতকে যদি উঠিতে হয়, তবে য়ুরোপীয় বিজ্ঞান, দর্শন ও ইতিহাস এই সকলের চর্চ্চা করিতে হইবে, নচেৎ এই সাত শত বৎসরের পরাধীন জাতি সহস্র বৎসরেও উঠিবে না। লর্ড মেকলে—এই লর্ড মেকলেই বলিতেন যে, সমগ্র প্রাচ্যগ্রন্থ একত্র স্তূপাকার করিয়া যদি এক তাক বিলাতী কেতাবের কাছে রাখা যায়, তাহা হইলে প্রাচ্যগ্রন্থের কোন মূল্যই দেখা যাইবে না—যাউক্ সে সকল দুঃখের কথা—ইনি এই দলের ধুরন্ধর হইলেন। রাজা রামমোহন রায় এই দলে যোগ দিলেন। মিশনরীরা ত ইহাই চাহেন। তাঁহারা আসিয়া দেখিয়াছিলেন—এ আবার কেমন দেশ! জীবন্ত নারীকে এ দেশের লোক বাঁশের আগায় বাঁধিয়া ঢাক-ঢোল বাজাইয়া পোড়াইয়া মারে! লোক গায় বঁড়িশা বিঁধিয়া কাঁটার উপর লাফাইয়া পড়িয়া শরীরকে যন্ত্রণা দিয়া ধর্ম্ম-কর্ম্ম করে, পুতুল সাজাইয়া চারিদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া নাচে, এক জাতি আর এক জাতির ছায়া মাড়ায় না। ইংরাজী শিক্ষা ভিন্ন এ জাতির অন্য কি গতি আছে? ইংরাজ সুসভ্য, ইংরাজ স্বাধীন—তাঁহাদের ভাষা, ভাব, দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান এই সকল অধ্যয়ন করিয়া ইহা-দিগকে একটা জাতি হইতে হইবে। লর্ড মেকলে মিনিট লিখিলেন, তদনুযায়ী কার্য্য আরম্ভ হইল। মহা আড়ম্বরে পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠিত হিন্দু কলেজে—এই য়ুরোপীয় সভ্যতার কেল্লায়, "ইয়ং বেঙ্গলের" ফৌজ তৈয়ারী হইতে লাগিল।

এই "ইয়ং বেঙ্গল" কেমন, আপনারা জানেন? ইহার আদর্শ-পুরুষ রেভারেণ্ড কে, এম, ব্যানার্জি প্রভৃতি। এ সময় যাঁহারা ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত হইতে লাগিলেন, তাঁহারা ইংরাজী ভাবে এমনই অনুপ্রাণিত হইলেন যে, দেশের ধর্ম্ম, সমাজ বা আচার-ব্যবহার কোন বিষয়েই তাঁহাদের আস্থা রহিল না। ইংরাজী শিক্ষায় কেহ কেহ এমনই প্রমত্ত হইলেন যে, তাঁহাদের বিশ্বাস হইল যে, গোখাদক ইংরাজজাতির ন্যায় "নিষিদ্ধ" মাংস ভক্ষণ না করিলে দেশ উন্নত হইবে না। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ কেবল অমেধ্য মাংস সেবনে তৃপ্ত হইতেন না, পরন্তু এই অপবিত্র পদার্থ প্রতিবাসী গৃহস্থের ছাতের উপর নিক্ষেপ করিয়া "নৈতিক সাহসের" পরিচয় দিতেন। বিলাতী সভ্যতার তীব্র আলোকে তাঁহাদের চক্ষু এরূপ বিকৃত হইয়া গিয়াছিল যে, তাঁহারা স্ব-সমাজ ও স্ব-ধর্ম্মের কোন স্থলেই কিছু গ্রহণীয় দেখিতে পাইতেন না। ইঁহারা আহারে-বিহারে, বেশভূষায়, কথায়-বার্ত্তায় সম্পূর্ণরূপে "সাহেব" হইয়া গিয়াছিলেন। যাহা য়ুরোপীয় রুচিসঙ্গত না হইত, তাহা তাঁহাদের মনঃপূত হইত না; এক কথায় বলিতে গেলে এই "ইয়ং বেঙ্গল" ইংরাজী সভ্যতার পল্টন। ইংরাজের অবাধ অনুকরণের ফলে ইঁহারা এতদ্দেশীয় লোকের সহানুভূতি হারাইয়া ঘৃণা ও বিদ্বে-ষের পাত্র হইয়াছিলেন। এই "ইয়ং বেঙ্গল" দেশীয় সাহিত্যে কিছুই পঠনীয় দেখিতেন না; ধর্ম্মকর্ম্ম ইঁহারা ত্যাগ করিয়াছিলেন,—এ দেশের সকলই তাঁহারা ভাঙ্গিয়া গড়িতে চাহিয়াছিলেন। কালাপাহাড়ের ন্যায় তাঁহারা ধ্বংস করিয়া গিয়াছিলেন, গঠনের ক্রিয়া পরে আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু এই অনুচিকীর্ষার ফলে আমাদের সমাজের যেরূপ ক্ষতি হইয়াছিল, তেমনই ইহার দ্বারা কতকটা উপকারও হইয়াছিল। এই "ইয়ং বেঙ্গলের" বিকৃত চিত্র মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতার' নবকুমার এবং দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশীর' নিমচাঁদ।

"ইয়ং বেঙ্গলের" প্রধান দোষ—স্বজাতীয় আচার, ব্যব-হার, ধর্ম্ম, সমাজ, সাহিত্যে প্রবল ঘৃণা, কিন্তু ইঁহাদের প্রধান গুণ সাহস ও স্বাধীনতাপ্রিয়তা। ইংরাজ স্বাধীন ও সুসভ্য, আমরা পরাধীন ও বর্ব্বর, এই চিন্তা তাঁহাদের চিত্তে সর্ব্বদাই জাগরূক থাকিত। স্বদেশের কুসংস্কার-পুঞ্জ দূর করিয়া স্বদেশকে স্বাধীনতার দীপ্ত আলোকে গৌরবোজ্জ্বল করিবার জন্য তাঁহারা বদ্ধপরিকর হইয়া-ছিলেন। দেশের যাহা কিছু, সবই ভাঙ্গিতে হইবে,

আর ইংরাজের অনুকরণে সমস্তই গড়িতে হইবে, এইরূপ ভাব কেবল তাঁহাদের মনে কেন, তখনকার সাহিত্যেও ফুটিয়া উঠিয়াছিল। ইংরাজী সভ্যতা ও সাহিত্যের অনুচিকীর্ষায় আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্যের জন্ম। য়ুরোপীয় সভ্যতার প্রভাব বাঙ্গালা সাহিত্যের উপর যে ভাবে পড়িয়াছে, তাহার আলোচনার গুরুত্ব বর্ণনাতীত।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, পুরাতন সাহিত্যের জীবনীশক্তি ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল। বৈষ্ণবপদকর্ত্তার মাধুর্য্যরসস্নিগ্ধ বঙ্গভাষা কৃত্রিমতাদোষদুষ্ট হইয়া ক্রমশঃ ম্লান ও বিশুষ্ক হইতেছিল। কবিওয়ালার দল সাহিত্যের ভাঙ্গা হাট জমাইয়া রাখিয়াছিল মাত্র। ভারতচন্দ্রের অনুকরণ করিয়া যাঁহারা কাব্য লিখিতেছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কাহারও ভারতচন্দ্রের ন্যায় শব্দমন্ত্র-দক্ষতা ছিল না। অনেকেই তাঁহার আদিরসাত্মক বর্ণনার অতি কুৎসিত অনুকরণ করিতেছিলেন মাত্র। মুদ্রাযন্ত্রের আইনের কঠোরতায় এই সমস্ত অশ্লীল পুস্তকের মুদ্রণ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। কবির লড়াই শেষ অবস্থায় অতি শোচনীয় অবস্থাপন্ন হইয়াছিল, সুতরাং এ সমস্ত বস্তু ইংরাজী-তন্ত্রে নবদীক্ষিত ব্যক্তিবর্গের অনুমোদিত হয় নাই। তাঁহারা ধ্বংসোন্মুখ পুরাতন সাহিত্যের দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া নূতন বনিয়াদ্ পত্তন করিয়া সাহিত্যের নূতন মন্দির গড়িবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; সুতরাং পুরাতনের সহিত নূতনের আর কোন যোগ রহিল না। আধুনিক সাহিত্য পুরাতনের বিকাশ নহে,—ক্রমবিকাশের সূত্রানুসারে আধুনিক সাহিত্যের উৎপত্তি, বিকাশ বা পুষ্টি ঘটে নাই। পরন্তু আধুনিক সাহিত্যের উৎপত্তি ও বিকাশের ইতিহাস সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; ইংরাজী কথায় বলিতে গেলে ইহা evolution নহে, পরন্তু revolution.

অনুচিকীর্ষার ফলে আমাদের এই নূতন সাহিত্য জন্মগ্রহণ করিয়াছে—ইহা সত্য। পুরাতন সাহিত্যের সহিত নূতন সাহিত্যের বড় একটা সম্বন্ধ ছিল না, ইহাও সত্য। তাহা বলিয়া যাহা আমরা লাভ করিলাম, তাহার কি কোন মূল্য নাই? "মাইকেল বাঙ্গালার মিল্টন, হেমচন্দ্র বাঙ্গালার পিণ্ডার, নবীনচন্দ্র বায়রণ, রবীন্দ্রনাথ শেলী, বঙ্কিমচন্দ্র স্কট"—বুঝিলাম। অনুচিকীর্ষার ফলে এই সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে, কিন্তু তাহা বলিয়া কি যে সকল সাহিত্যিক আমাদিগের গৌরবস্থল, আমাদিগের মাথার মণি, তাঁহাদিগের দান সর্ব্বতোভাবে বিজাতীয় ও অগ্রাহ্য বলিয়া গণ্য হইবে? বঙ্গবাণীর যে মূর্ত্তি ইঁহারা অর্চ্চনা করিয়াছেন, আজ তাঁহাকে "উল্কামুখী আয়া" বলিয়া গালাগালি করিতে যাওয়া কি দেশদ্রোহিতা নহে? অনুকরণেচ্ছা কি সর্ব্বত্রই নিন্দনীয়? আজ আমাদের অত্যন্ত দুর্ভাগ্য যে, যাঁহারা আমাদের অত্যন্ত পূজনীয় ও আদরণীয়, তাঁহাদেরই আমরা নিন্দা ও কুৎসা রটনা করিতেছি। এই সকল সাহিত্য-গুরুকুলের যাঁহারা নিন্দা করেন, তাঁহারাই যে কেবল দোষী, এমন নহে; পরন্তু যাঁহারা এ সকল দোষঘোষণার প্রতিবাদ না করিয়া শ্রবণ করিয়া যায়েন, তাঁহারাও সেইরূপ দোষভাক্।

পুরাতন চলিয়া যায়, নূতন আসিয়া তাহার স্থান গ্রহণ করে। পুরাতন নমস্য, কিন্তু নূতনকেও সাদর-সম্ভাষণ করিয়া ঘরে তুলিতে হয়। সাহিত্য সমাজের দর্পণ মাত্র—প্রাচীন বাঙ্গালা-সাহিত্য প্রাচীন সমাজের ভাব ও আদর্শের প্রতিবিম্ব। অপর দিকে এই নব-জাগরণের যুগের সাহিত্য নূতন যুগের চিন্তা-প্রণালী ও আদর্শের চিত্র। আধুনিক যুগের আদর্শ প্রাচীন সাহিত্যের নিকট দাবী করা যেমন মূর্খতা, আধুনিক সাহিত্যের নিকট প্রাচীন আদর্শের দাবী করাও তদ্রূপ।

পূর্ব্বপক্ষ বলেন যে, আধুনিক সাহিত্যের সহিত দেশের প্রাণের কোন যোগ নাই, ইহা বাঙ্গালার ধাতুসহ নহে, ইহাতে বাঙ্গালার আদর্শ নাই, অর্থাৎ ইহার ভাব-ভঙ্গী আদর্শ সবই বিলাতী,—বিলাতী সভ্যতার ধ্বংসের সহিত এই "বাবু-সাহিত্য" বিলুপ্ত হইবে। এ সাহিত্যের পঠনপাঠন কয়েক জন বাবুর বা বঙ্কিমী ভাষায় "এজু"র মধ্যে নিবদ্ধ—বাঙ্গালার অভ্যন্তরে, হাটে, মাঠে, ঘাটে ইহাদের প্রচলন নাই। দেশের জনসঙ্ঘ এই সাহিত্যের সহিত অপরিচিত ও অনভ্যস্ত—এ সাহিত্যের কোন মূল্যই নাই। কথাটা শুনিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়, পদতল হইতে পৃথিবী সরিয়া যায়। কি ভয়ানক! এই অভ্রভেদী সাহিত্যের বিরাট্ মন্দির আকাশ-প্রাসাদ মাত্র! আমরা যাহা এত দিন ধরিয়া সাধন করিলাম, তাহা স্বপ্নসঞ্চরণ মাত্র! সবই বৃথা, কিছুই নহে, সকলই ভস্মনি হুতম্! কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম!

ভাবিয়া দেখা যা'ক্, অভিযোগের গুরুত্ব কিরূপ? আধুনিক সাহিত্যের সহিত দেশের প্রাণের কি কোন সম্বন্ধই নাই? ইহা কি সত্যই ধর্ম্মহীন? ধর্ম্মের সহিত প্রাচীন সাহিত্য ওতপ্রোতভাবে সংযুক্ত ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। রামাই পণ্ডিতের 'শূন্যপুরাণ,' মাণিকচন্দ্র ও ময়নামতীর গাথাসমূহ ধর্ম্ম-সাহিত্য বটে; কারণ, এগুলি ধর্ম্মপূজক ও নাথপন্থীদের সাহিত্য। বৈষ্ণব-সাহিত্যে পদাবলী ও চরিতশাখা ধর্ম্মের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। লোক-সাহিত্যে চণ্ডীমঙ্গল, মনসা-মঙ্গল ও ধর্ম্ম-মঙ্গল প্রভৃতি সকলই দেবদেবী-মাহাত্ম্যে পূর্ণ। কাশীদাস ও কৃত্তিবাসের গ্রন্থ বাঙ্গালার হিন্দুসাধারণ ধর্ম্মগ্রন্থবৎ পাঠ করিয়া থাকে। সুতরাং প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, বাঙ্গালীর সাহিত্য ধর্ম্মের সহিত সংযুক্ত না হইলে টিকিবে না। এখন জিজ্ঞাস্য—ধর্ম্মের স্বরূপ কি সর্ব্বকালেই সমান থাকে? ধর্ম্মের যাহা প্রাণ, তাহা শাশ্বত, নিত্য ও সার্ব্বভৌম; কিন্তু ধর্ম্মের যাহা রূপ, তাহা ত পরিবর্ত্তনশীল। আমাদের বর্ত্তমান সাহিত্য নীতি ও ধর্ম্মশূন্য unmoral বা Godless, এ কথা কখন বলা যায় না। যে সাহিত্যে উচ্চ আদর্শ নাই, তাহা পরিণামে নষ্ট হয়। ধর্ম্মহীনতা সাহিত্যের প্রধান শত্রু বটে, কিন্তু ধর্ম্ম অর্থে যে লৌকিক ধর্ম্মই বুঝিতে হইবে, তাহার কোন অর্থ নাই। আজ যদি চণ্ডী-মঙ্গলের ন্যায় গ্রন্থ রচিত হয়, তাহার সেরূপ আদর হইবে না। এই নূতন যুগের মধ্যে পুরাতন কিরূপে দাঁড়াইবে? বঙ্গ-সাহিত্য আমাদের অতি শ্রদ্ধার বস্তু বটে, কিন্তু গোঁড়ামিও ভাল নহে—তাহা দৃষ্টি বিকৃত করিয়া দেয়। যে বৈষ্ণব-পদাবলীর এত সমাদর, তাহার সকল পদ রাধা-কৃষ্ণলীলাত্মক হইলেও সকল পদকর্ত্তার বা সকল পদের সমান আদর নাই। বিদ্যাপতি ও চণ্ডিদাসের বিশেষ সমাদর; কারণ, তাঁহাদের পদাবলী সাহিত্য-রসের উৎস। যে রসের আস্বাদে শরীর রোমাঞ্চিত হয়, বাস্তব জগতের দুঃখ-ক্লেশ ভুলিয়া মন কল্পনার নন্দনে বিচরণ করে, সেই রসের মূর্ত্তি বিশেষভাবে তাঁহাদের পদে পাওয়া যায়। সুতরাং যে ভাবের উদ্বোধনে দেশ, কাল, পাত্রের মুখাপেক্ষিতা নাই, সেই সার্ব্বভৌম ভাবের বিকাশের জন্য চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতি অমর হইয়াছেন। আধুনিক সাহিত্যে যদি সৎসাহিত্যের সমূহ উপাদান বর্ত্তমান থাকে, তবে তাহা কেন টিকিবে না, তাহা বুঝা যায় না। যে সাহিত্য নানা রসের সঞ্চার করিয়া হৃদয়ে আনন্দের সৃষ্টি করে—মনের উন্নতিসাধন করে, তাহাই সৎসাহিত্য-পদবীবাচ্য। ধর্ম্মের আবরণ থাকিলেই ধর্ম্ম-সাহিত্য হয় না, পরন্তু লৌকিক ধর্ম্মের আবরণ না থাকিলেও সাহিত্যকে ধর্ম্ম-বিবর্জ্জিত বলা যায় না। বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থে কালী-মাহাত্ম্য ফুটে নাই, ফুটিয়াছে কামকলার অতীব ঘৃণ্য চিত্র। সুতরাং আধুনিক সাহিত্য ধর্ম্ম-সাহিত্য না হইলেও ধর্ম্ম-বর্জ্জিত সাহিত্য নহে। আর সাহিত্যকে যে লৌকিক ধর্ম্মের গতানুগতিক পথেই চলিতে হইবে, এমন কথা কোন আলঙ্কারিকই মাথার দিব্য দিয়া বলেন নাই। সাহিত্যের গতি ও লক্ষ্য ধর্ম্মের গতি ও লক্ষ্য হইতে বিভিন্ন। সাহিত্যের উদ্দেশ্য আনন্দদান; শিক্ষা দেওয়া তাহার গৌণ উদ্দেশ্য—তাহাও প্রেয়সীর সস্মিত সরস উপদেশের মত। সুতরাং সৌন্দর্য্যসৃষ্টি ও আনন্দদান সাহিত্যের মুখ্য কার্য্য, কিন্তু গৌণতঃ ইহার দ্বারা লোকশিক্ষার কার্য্যও হইয়া থাকে। সাহিত্যের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, সাহিত্যের দুইটি ভাগ আছে—প্রথম ধর্ম্ম-সাহিত্য, দ্বিতীয়—লোক-সাহিত্য বা সুকুমার শিষ্ট সাহিত্য (**secular**)। এখন বক্তব্য, শিষ্ট সাহিত্যের ঘটনা পৌরাণিক বা ধর্ম্মসংশ্লিষ্ট না হইয়া সাধারণ মানবের জীবন-কাহিনীঘটিত হইতে পারে। এই জন্য কি সুকুমার সাহিত্যকে উড়াইয়া দিতে হইবে? আধুনিক সাহিত্য ধর্ম্ম-সাহিত্য নহে বলিয়া যাঁহারা ইহাকে উড়াইয়া দিতে চাহেন, তাঁহারা নিতান্ত বাতুল। তাঁহাদের কথা সত্য হইলে আজ সংস্কৃত সাহিত্যের মৃচ্ছকটিক, মেঘদূত, মালবিকাগ্নিমিত্র, মালতীমাধব, রত্নাবলী প্রভৃতি লুপ্ত হইত। সাহিত্য ও ধর্ম্মে পার্থক্য আছে। সাহিত্য কেহ সর্ব্বত্র ধর্ম্মবোধে পাঠ করে না। যাঁহারা হর-গৌরীর লীলামাহাত্ম্য পাঠ করিবেন, তাঁহাদের পাঠ্য শিবপুরাণ আর যাঁহারা সাহিত্যের সৌন্দর্য্য সম্ভোগ করিবেন, তাঁহাদের পঠনীয় কুমারসম্ভব। যাঁহারা ফল-শ্রুতির দৈর্ঘ্য দেখিয়া সাহিত্য-চর্চ্চা করিবেন, তাঁহারা মহাভারতবর্ণিত শকুন্তলার উপাখ্যান পাঠ করিবেন,

কিন্তু যাঁহারা কবির সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিতে মুগ্ধ হইতে চাহেন, তাঁহারা পড়িবেন—অভিজ্ঞানশকুন্তলম্। পূর্ব্বপক্ষ ভুলিয়া যায়েন যে, ধর্ম্ম-সাহিত্য ভিন্ন সাহিত্যের আর একটি ভাগ আছে, তাহা সুকুমার সাহিত্য বা শিষ্ট সাহিত্য।

পূর্ব্বপক্ষের অপর আপত্তির আলোচনা করা যাউক। বর্ত্তমান সাহিত্য জাতীয় সাহিত্য নহে, উহা বৈদেশিক আদর্শে গঠিত—দেশের প্রাণের সহিত এই "বাবু-সাহিত্যের" কোন সম্বন্ধ নাই। ইহা আলমারির সাহিত্য, আলমারির তাক সুশোভিত করিয়া রাখাই এই সাহিত্যের উদ্দেশ্য, ইহার অধিক এতদ্দ্বারা আর কিছু আশা করা যায় না। এ কথার প্রথম উত্তর—আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে জাতীয়তাবাচক কোন ভাব বা শব্দ ছিল না। স্বাধীনতার লীলাক্ষেত্র রাজপুতানার ভট্ট ও চারণ গীতিতে কি আছে জানি না, তবে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে দেশাত্মবোধের কোন উল্লেখই নাই। "জাতীয় সাহিত্য" কথার বিশেষ কোন অর্থ নাই; সত্য কথা বলিতে কি, সাহিত্যের জাতি নাই—ইহা সার্ব্বভৌম। জাতীয় সঙ্কীর্ণতা সাহিত্যকে পঙ্গু ও ক্ষীণ করিয়া দেয়; তবে জাতির আশা ও আকাঙ্ক্ষা, জাতির চিন্তাধারা, জাতির আদর্শের বৈশিষ্ট্য সাহিত্যে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। সাহিত্যের যে রস, তাহা সনাতন ও সার্ব্বভৌম। ভারতের কালিদাস জগতের কালিদাস, ইংলণ্ডের সেক্‌স্‌পীয়ার জগতের সেক্‌স্‌পীয়ার; সাহিত্যের ক্ষেত্রে জাতিবিচার নাই।

প্রাচীন সাহিত্য আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, পূর্ব্বে সাহিত্যের মধ্য দিয়া ধর্ম্ম অথবা ধর্ম্মের আবরণে সাহিত্য প্রচারিত হইত। পাঁচালী-সাহায্যে এই সাহিত্য দেশে দেশে, গ্রামে গ্রামে আবালবৃদ্ধ-বনিতার মধ্যে প্রচারিত হইত। সুতরাং যদি বাঙ্গালীর সাহিত্যে জাতীয় বৈশিষ্ট্য বলিয়া কিছু ধরিতে হয়, তাহা হইলে বলিতে হয় যে, সে সাহিত্য সর্ব্বৈব ধর্ম্মমূলক ছিল। পৌরাণিক আদর্শ বাঙ্গালীর তখন একমাত্র লক্ষ্য ছিল, তাহাই সাহিত্যে প্রতিফলিত হইত। কিন্তু ইংরাজী আমলের পূর্ব্ব হইতে এবং ঠিক প্রারম্ভকালে তাহার পরিবর্ত্তন হইতেছিল। সকল দেশের ইতিহাসের প্রথম স্তরে ধর্ম্ম-সাহিত্যের বিকাশ দেখা যায়, পরে শিষ্ট-সাহিত্য জন্মগ্রহণ করে। ধর্ম্ম হইতে সাহিত্যের উৎপত্তি হইলেও ক্রমশঃ সাহিত্য ধর্ম্মের নামরূপের গণ্ডী কাটাইয়া বিশাল হইতে বিশালতর হইয়া উঠে। সাহিত্য তখন অতিপ্রাকৃত লইয়া আর ব্যস্ত থাকে না; তখন মানবমনের বিশাল বিকাশের বিচিত্র ভঙ্গী তাহাতে প্রতিফলিত হয়। ধর্ম্ম-সাহিত্যের শেষে শিষ্ট-সাহিত্যে পরিণতি—Secularization of literature সর্ব্বদেশের ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং বাঙ্গালা সাহিত্য যদি লৌকিক ধর্ম্মের গণ্ডী কাটিয়া, অতিপ্রাকৃতের হাত এড়াইয়া স্বাভাবিক ভাব ধারণ করিয়া থাকে, তাহা হইলে সাহিত্যের জাতি গেল বলিয়া চীৎকার করিবার কোন প্রয়োজন দেখি না। জানি না, এই ৭ শত বৎসরের পরাধীন জাতির জাতীয় বলিয়া গৌরব করিবার কি আছে? ছিল আমাদের ধর্ম্ম ও দর্শন; সে উদার উচ্চ ধর্ম্ম আমরা কবে হারাইয়াছি, কিন্তু প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে তাহার জন্য এক বিন্দু অশ্রুপাতও দেখি না। বরং সে স্বজাতিপ্রীতি, দেশাত্মবোধ, লুপ্ত-গৌরবের জন্য হৃদয়ের আকুল আবেগ আধুনিক সাহিত্যেই আছে। প্রকৃতপক্ষে আধুনিক সাহিত্যই জাতীয় সাহিত্য। কারণ, আমরা যে একটা আত্মবিস্মৃত জাতি, আমাদের যে একটা গৌরবময় অতীতের ইতিহাস আছে, আমরা যে কতদূর অবনত হইয়া পড়িয়াছি, আমাদের এই জাতিগরিমার গৌরব, আমাদের সেই লুপ্ত মহিমার আক্ষেপ, আমাদের এই জাতীয়তার অনুভূতির তীব্র জ্বালার প্রকাশ একমাত্র আধুনিক সাহিত্যেই আছে।

পূর্ব্বপক্ষ বলিবেন,—ইহা ত কয় জন শিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে আবদ্ধ, দেশের লোকের সর্ব্বস্তরে ইহা পৌঁছায় নাই। একটু সহানুভূতির সহিত ভাবিয়া দেখিলে বলা যায় যে, আধুনিক সাহিত্যের বয়স অধিক নহে। বিগত ৫০।৬০ বৎসরের মধ্যে বঙ্গ-সাহিত্যের যেরূপ উন্নতি হইয়াছে, তাহা ভাবিলে বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হইতে হয়। সুতরাং তীব্র সমালোচনা না করিয়া ইহার বয়সের দিকে লক্ষ্য করিলে বলা যায় যে, যদিও আধুনিক সাহিত্যের বাণী সমাজে সর্ব্বস্তরে ব্যাপ্ত না হইয়া থাকে, কালে তাহা সমাজের সর্ব্বত্রই প্রচারিত হইবে। পূর্ব্বে যাত্রা, পাঁচালী, কীর্ত্তন, গান, কথকতা প্রভৃতির সাহায্যে সাহিত্য প্রচারিত হইত, সুতরাং এক কালে তাহা সহস্র

সহস্র লোকের মধ্যে প্রচারলাভ করিত। মুদ্রাযন্ত্রের সহায়তায় আধুনিক সাহিত্যের প্রচার। আমাদের দেশে শিক্ষাও আশানুরূপ বিস্তারিত হয় নাই; কাযেই আধুনিক সাহিত্যের বাণী সমাজের সর্ব্বস্তরে পৌছায় নাই। মানব যেমন যে দেশে থাকে, তাহার জলবায়ুর প্রভাব অতিক্রম করিতে পারে না, সেইরূপ দেশের মধ্যে যে আন্দোলন চলে, সাহিত্যে ও সমাজে যে ভাবের বায়ু বহে, তাহার প্রভাব হইতে কি শিক্ষিত কি অশিক্ষিত কেহই মুক্ত হইতে পারে না। আধুনিক সভ্যতার সংস্পর্শ সমাজের সর্ব্বস্তরেই দৃষ্ট হইতেছে; ক্রমশঃ আধুনিক সাহিত্যের বাণী সমাজের সর্ব্বত্রই ছড়াইয়া পড়িবে। জাতি যেমন সাহিত্যের সৃষ্টি করে, সাহিত্যও সেইরূপ জাতির সৃষ্টি করিয়া থাকে। সমাজের উচ্চ স্তরে যে চিন্তার বিকাশ ঘটে, ক্রমশঃ তাহা পুষ্ট হইয়া সমাজের নিম্ন স্তরে পরিব্যাপ্ত হয়। যে সাহিত্যের বয়স পঞ্চাশ ষাট বৎসর, তাহার দ্বারা যাহা হইয়াছে, তাহা অল্প নহে; সুতরাং অপর পক্ষের কোলাহলের কোন মূল্যই নাই।

পরিশেষে বক্তব্য, আমাদের যাহা গৌরবের ও পরম শ্লাঘার বস্তু, যাহা আমাদের মস্তকের মণিস্বরূপ, কাচজ্ঞানে তাহা পদদলিত করা মহামূর্খতা। সত্য বটে, আধুনিক সাহিত্যে বিলাতী আদর্শ কিছু আসিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু তাহা যুগধর্ম্মের লক্ষণ বলিতে হইবে। দেশে ও সমাজে যখন ভাবের বিপ্লব আইসে, তখন তাহার চিহ্ন সাহিত্যে কিছু কিছু থাকিয়া যায়। প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যে বৌদ্ধ ও মুসলমান প্রভাবের নিদর্শন আছে। আধুনিক সাহিত্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘর্ষের ফল—ইহাতে সেই সংঘর্ষের ইতিহাস থাকিয়া যাইবে। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব আমরা সমূলে উৎপাটন করিতে পারিব না; যেহেতু, এখন সর্ব্বদেশেই পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদানপ্রদান চলিতেছে। এ যুগে কোন দেশ বা জাতি জগতের সহিত সম্পর্ক ছাড়িয়া চলিতে পারিবে না। পরিবর্ত্তন ও গতি স্বাভাবিক; চলিতেই হইবে, পঙ্গু হইবার উপায় নাই। আধুনিক সাহিত্যে য়ুরোপীয় প্রভাব কতকটা থাকিবেই; কারণ, য়ুরোপীয় সভ্যতার সবটাই ছাঁটিয়া ফেলিবার নহে। অতীতে প্রত্যাবর্ত্তন করা অসম্ভব; অতীতে যদি যাইতে হয়, বর্ত্তমানের মধ্য দিয়া যাইতে হইবে—Back to the past through the present, সুতরাং আধুনিক সাহিত্যের বিরুদ্ধে যে মামলা আনা হইয়াছে, তাহার যুক্তির কোন সারবত্তা নাই। তবে দ্রষ্টব্য এই যে, বিজাতীয় প্রভাব যেন আমাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য নষ্ট না করে। নবীনতার উত্তেজনা কাটিয়া গিয়াছে, "ইয়ং বেঙ্গলের" হুঙ্কার থামিয়াছে, এক্ষণে ধীরভাবে আমাদের মধ্যে চেতনার সঞ্চার হইতেছে। অনুচিকীর্ষার মোহ শীঘ্রই অপগত হইবে সাহিত্যে জাতির নবজাগরণ অবশ্যম্ভাবী। অতএব এই আধুনিক সাহিত্য উপেক্ষণীয় নহে, ঘৃণার বস্তু নহে,—ইহা আমাদের আদরণীয়, আমাদের পূজার বস্তু; ইহাতেই আমাদের আশাভরসা এবং ইহাই আমাদের নবজীবনের বা নবচেতনার একমাত্র উপায়।

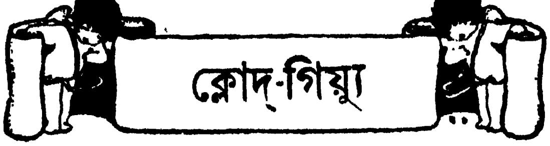
শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

মুক্তি

(কবীর)

প্রয়াগ মথুরা কাশীবাসে কভু
মুক্তি না পাওয়া যায়,
সারা দেহ ভরি' ভস্ম মাখিলে
বাঁধন না ঘুচে তায়।
হৃদাকাশ হ'তে দূরে যাবে যবে
ভ্রমের আঁধাররাশি,
আপনা জাগায়ে প্রেমের আলোক
উঠিবে যে দিন ভাসি;'
মুক্তি সে দিন আসিবে নিকটে
বাঁধন যাইবে দূরে,
প্রিয়তম স্বামী দিবে ভালবাসা
একটি কথার সুরে।

শ্রীকমলকৃষ্ণ মজুমদার।



ক্লোদ্-গিয়্যা

(VICTOR HUGO)

ক্লোদ্-গিয়্যা এক জন গরীব শ্রমজীবী। ৮ বৎসর পূর্ব্বে তাহার উপপত্নী ও শিশুসন্তানের সহিত সে প্যারিসে বাস করিত। যদিও সে ভাল শিক্ষা পায় নাই, এমন কি, সে পড়িতেও পারিত না, তবু লোকটা স্বভাবতঃ বেশ চতুর ও বুদ্ধিমান্ ছিল, সকল বিষয়েই সে গভীরভাবে চিন্তা করিত। শীত ঋতুর সঙ্গে সঙ্গে শীতের নিত্য-সহচর দুঃখ-ক্লেশ আসিয়া জুটিল,—কাযকর্ম্মের অভাব, খাদ্যের অভাব, জ্বালানি কাঠের অভাব হইল। স্বামী, স্ত্রী, পুত্র তিন জনই শীতে জমিয়া গেল, অনশনে ক্লিষ্ট হইল। লোকটা চোর হইয়া দাঁড়াইল। জানি না, কি চুরি করিয়াছিল। তাহাতে কি আসিয়া যায়, পরিণামটা ত একই? স্ত্রী ও পুত্রটি তিন দিন খাইতে পাইল, গরম হইতে পাইল। স্বামী ৫ বৎসরের মিয়াদে জেলে গেল। উহাকে "ক্লেয়ারভো" মঠে লইয়া গেল; মঠ এখন কারাগৃহে পরিণত হইয়াছে, উহার ক্ষুদ্র কুঠরীগুলা কারাকক্ষে পরিণত হইয়াছে এবং উহার পূজাবেদীটাও একটা শাস্তি-যন্ত্রে পরিণত হইয়াছে। ইহাকেই উন্নতি বলে।

এই সাধু শ্রমজীবী ক্লোদ্-গিয়্যা অবস্থা-চক্রে পড়িয়া চোর হইয়া পড়িয়াছিল বটে, কিন্তু ইহার মুখ দেখিলে উহাকে এক জন ভাল লোক বলিয়াই মনে হয়। ভাবনা-চিন্তার ঈষৎ রেখাঙ্কিত উচ্চ ললাট, কালো চুলে ইহারই মধ্যে একটু সাদা রেখা দেখা দিয়াছে, 'কোটরে ঢোকা' নেত্রদ্বয় যেন দয়ার আলোকে জ্বল্‌জ্বল্ করিতেছে এবং মুখের নিম্নাংশে আত্মসম্ভ্রমমিশ্রিত একটা দৃঢ়তা প্রকাশ পাইতেছে। সে বড় একটা কথা কহিত না, তবু তাহার এমন একটা গাম্ভীর্য্য ছিল, যাহাতে করিয়া সে লোকের সম্মান ও আনুগত্য আকর্ষণ করিত। বড় চমৎকার চরিত্র;—এখন দেখা যাইবে, সমাজ এই চরিত্রকে কি করিয়া তুলিয়াছে।

জেলের কর্ম্মশালার এক জন পরিদর্শক ছিল, সে কখনই ভুলিত না যে, সে তাহার অধীন কর্ম্মচারীদিগেরও কারারক্ষক; সে এক হাতে যেমন তাহাদিগকে হাতিয়ার দিত, তেমনই আর এক হাতে তাহাদের উপর শৃঙ্খল নিক্ষেপ করিত। বড়ই অত্যাচারী, নিজে কিছুই বিবেচনা করিয়া দেখিত না; সে যাহা মনে করিত, তাহার উপর আর আপীল ছিল না। দৃঢ়তা অপেক্ষা কঠোরতাই তাহার চরিত্রের লক্ষণ ছিল। এমন কি, কখন কখন সে পরিহাসপ্রিয়ও হইয়া উঠিত। সে উত্তম পিতা, উত্তম স্বামী ছিল; আসলে লোকটা বদ্‌মাইস নহে—কিন্তু খারাপ। সে সেই রকম ধাঁচার লোক—যাহারা কোন নূতন কথা বা ভাব গ্রহণ করিতে পারে না,যাহারা বাহ্যতঃ কোন আবেগের দ্বারা পরিচালিত হয় না; বিদ্বেষ ও রোষে উহাদের হৃদয় এতটা ভরপুর থাকে যে, দেখিলে মনে হয়, যেন কতকগুলা কাষ্ঠপিণ্ড, যাহার এক দিক তাতিয়া উঠিয়াছে এবং আর এক দিক ঠাণ্ডায় জমিয়া গিয়াছে। লোকটার প্রধান চরিত্রলক্ষণ—একগুঁয়েমি। এই একগুঁয়েমির জন্যই সে এত গর্ব্বিত ছিল যে, সে আপনাকে নেপোলিয়ানের সঙ্গে তুলনা করিত। এ একটা চাক্ষুষ বিভ্রম—যেমন মিট্‌মিটে বাতির আলোককে নক্ষত্র মনে করা, এ সেই রকম। একটা কোন কিছু করিবে বলিয়া মনস্থির করিলে, যতই অসঙ্গত হউক্ না কেন, সেই অসঙ্গত সঙ্কল্পকে কার্য্যে পরিণত না করিয়া সে ছাড়িত না। এমন কতবার ঘটিয়াছে—একটা কোন বিপত্তি উপস্থিত হইলে, যখন উহার কারণ অনুসন্ধান করা হয়, তখন দেখা যায়, এক জনের একগুঁয়েমিই ইহার মূল এবং সে লোকটা নিতান্ত অযোগ্য হইলেও তাহার নিজের ক্ষমতার উপর তাহার অসীম বিশ্বাস।

এইরূপ ধরণেরই লোক ছিল ক্লেয়ারভোর জেল-কর্ম্মশালার পরিদর্শক। এই পাষাণ-হৃদয় লোকটাকে সমাজ কয়েদীদের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত করিয়াছিল; মনে করিয়াছিল, ঐ চকমকি পাতর হইতে শুধু ফুলিঙ্গই বাহির হইবে; কিন্তু ঐরূপ সামগ্রী হইতে নিঃসৃত স্ফুলিঙ্গ একটা অগ্নিকাণ্ডে পর্য্যবসিত হইতে পারে, সে কথা তাহারা ভাবে নাই।

পরিদর্শক ক্লোদ্-গিয়্যাকে বাছিয়া লইয়া, তাহার উপর নম্বর বসাইয়া তাহাকে কর্ম্মশালার কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছিল; এবং উহাকে কার্য্যকুশল দেখিয়া উহার প্রতি ভাল ব্যবহার করিত। এক দিন ক্লোদ্‌কে বিষণ্ণ দেখিয়া (সে প্রায়ই তাহার উপপত্নীর কথা ভাবিত—তাহাকেই সে "স্ত্রী" বলিত) খোস্-মেজাজে থাকায় পরিদর্শক, ক্লোদ্‌কে সান্ত্বনা দিবার জন্য পরিহাসচ্ছলে বলিল,—ঐ রমণী সন্ন্যাসিনী-সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছিল, তাহার পর এখন কলঙ্কিনী হইয়া পড়িয়াছে; এবং শিশুটির কোন খোঁজ-খবর পাওয়া যায় নাই।

কিছুকাল পরে ক্লোদ্ জেলের নিয়মাদিতে আপনাকে অভ্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল এবং উহার শান্ত ব্যবহারে এবং কতকটা তাহার দৃঢ় সঙ্কল্পের দরুণ (যাহা তাহার মুখে স্পষ্ট অঙ্কিত ছিল) সে তাহার সঙ্গীদের উপর একটা আধিপত্য অর্জ্জন করিয়াছিল। তাহার উপর তাহার সঙ্গীদের এতটা শ্রদ্ধা ছিল যে, তাহারা তাহার পরামর্শ চাহিত এবং সর্ব্বপ্রকারে তাহার অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিত। লোকটার স্বভাব তাহার চোখের ভাবেই প্রকাশ পাইত। চক্ষু কি অন্তরাত্মার গবাক্ষ নহে? যাহাদের বেশী কিছু মতামত নাই, সেই সব লোক এই রকম এক জন বুদ্ধিমান্ লোকের দ্বারা যে পরিচালিত হইবে, চুম্বকের দিকে ধাতু যেরূপ আকৃষ্ট হয়, সেইরূপ আকৃষ্ট হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? তিন মাসেরও কম সময়ের মধ্যেই ক্লোদ্ কর্ম্মশালার প্রকৃত কর্ত্তা হইয়া পড়িল। "কার্ডিনাল"-পরিবৃত বন্দী পোপের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করা হয়, উহার প্রতি কতকটা সেইরূপ ব্যবহার করায় সে রাজা কি কয়েদী, এইরূপ তাহার মনে একটা যেন সংশয় উপস্থিত হইল।

এইরূপ জনপ্রিয়তার নিত্য-সহচর বিদ্বেষ; কয়েদীরা যদিও তাহাকে ভালবাসিত, কিন্তু কারারক্ষীরা তাহাকে দু'চোখে দেখিতে পারিত না। ক্লোদের পক্ষে দুই জনের খোরাকও যথেষ্ট নহে। ইহাতে পরিদর্শক হাসিত, কেন না, পরিদর্শকেরও ক্ষুধা খুব বেশী ছিল। এক জন ডিউকের পক্ষে যাহা ঠাট্টাতামাসার ব্যাপার, এক জন কয়েদীর পক্ষে তাহাই ঘোর বিপত্তি। যখন মুক্ত ছিল, তখন ক্লোদ্ দুই সের ওজনের রুটী প্রতিদিন অর্জ্জন করিত এবং অর্জ্জন করিয়া উপভোগ করিত। কিন্তু এখন বন্দী অবস্থায় সে তিন পোয়া ওজনের রুটী ও এক পোয়া ওজনের মাংস পায়। সুতরাং সে সব সময়েই ক্ষুধিত হইয়া থাকে।

তাহার এই যৎসামান্য আহার ক্লোদ্ সবে শেষ করিয়াছে এবং ক্ষুধার জ্বালা ভুলিবার আশায় আবার কাযে প্রবৃত্ত হইবে মনে করিতেছে, এমন সময় একটি ক্ষীণকায় যুবক তাহার নিকটে অগ্রসর হইল। তাহার হাতে একখানা ছুরি ও তাহার অভুক্ত খাদ্য রহিয়াছে,

সে ক্লোদ্‌কে একটা কথা বলিতে চাহে, কিন্তু বলিতে ভয় পাইতেছে। ক্লোদ্‌ রূঢ়ভাবে বলিল, "কি চাই ?"

যুবক ত্রস্তভাবে উত্তর করিল, "আমি একটা অনুগ্রহের প্রার্থী।"

ক্লোদ্‌ বলিল, "কি অনুগ্রহ ?"

"আমার এই খোরাক গ্রহণ ক'রে আমাকে অনুগৃহীত করুন ; আমি এতটা খেয়ে উঠতে পারছিনে। আমি যা খেতে পারি, তার চেয়ে আমার খোরাকের পরিমাণ বেশী।"

মুহূর্ত্তকাল ক্লোদ্‌ বিস্ময়ে অবাক্‌ হইয়া রহিল। কিন্তু তাহার পরেই আর কোন ভদ্রতার আড়ম্বর না করিয়াই খাদ্যটা দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া, এক ভাগ তখনই গলাধঃকরণ করিল।

যুবক বলিল,"অনুগৃহীত হলেম ; প্রতিদিন আমার খোরাক আপনার সহিত ভাগাভাগি করব—আপনার কাছ থেকে এই অনুমতি চাই।"

ক্লোদ্‌ বলিল, "তোমার নাম কি ?"

"আল্‌বাঁ।"

"এখানে কেন ?"

"আমি চুরি করেছিলাম।"

ক্লোদ্‌ বলিল, "আমিও ত তাই করেছিলেম।"

এই অকাল-বৃদ্ধ (বয়স ৩৬ বৎসরমাত্র) এবং এই ২০ বৎসর বয়স্ক বালক—এই দুই জনের মধ্যে প্রতিদিন এইরূপ ব্যাপার চলিতে লাগিল। ভাইয়ে ভাইয়ে যে রকম ভালবাসা, তাহা অপেক্ষা উহাদের মধ্যে পিতা-পুত্রের ভালবাসার ভাবই যেন বেশ একটু ছিল। প্রত্যেক জিনিষই উহাদের মধ্যে একটা মিলনের বন্ধন সৃষ্টি করিল—একসঙ্গে খাটুনীর কষ্ট ভোগ করা, একই যায়গায় নিদ্রা যাওয়া, একই অঙ্গনে ব্যায়াম করা। উহারা সুখী হইয়াছিল—কেন না, উহারাই পরস্পরের সমস্ত জগৎ ছিল না কি ? কয়েদীরা পরিদর্শকের এত বিদ্বেষী ছিল যে, অনেক সময় নিজের কর্তৃত্ব বজায় রাখিবার জন্য পরিদর্শককে ক্লোদের শরণাপন্ন হইতে হইত ; যখন কোন দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধিবার উপক্রম হইত, তখন দশ জন রক্ষীর প্রভুত্ব অপেক্ষা ক্লোদের দুইটা কথায় বেশী কায হইত। যদিও পরিদর্শক আবশ্যক হইলে ক্লোদের সাহায্য গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইত না, তথাপি তাহা সত্ত্বেও সে ক্লোদকে ঈর্ষা করিত এবং সর্দ্দার কয়েদীর উপর তাহার একটা আন্তরিক বিদ্বেষ ছিল। "জোর যার মুলুক তার" এই নীতির ইহা একটা দৃষ্টান্তস্থল—এই ক্ষেত্রে এই নীতি আরও ভয়ানক, কেন না, ইহা গূঢ়ভাবে পরিপোষিত হইয়াছিল। কিন্তু ক্লোদ্‌ আলর্বাঁকে এতটা ভালবাসিত যে, সে পরিদর্শকের কথা একটুও ভাবিত না।

এক দিন প্রাতে যখন রক্ষীরা রোঁদ্‌ ফিরিতে বাহির হইয়াছিল, উহাদের মধ্যে এক জন আল্‌বাঁকে ডাকিয়া বলিল, তাহাকে পরিদর্শকের কাছে যাইতে হইবে। সেই সময় আল্‌বাঁ ক্লোদের সহিত কাযে নিযুক্ত ছিল।

ক্লোদ্‌ বলিল, "কি জন্য তোমার ডাক পড়েছে ?"

রক্ষীর পিছনে পিছনে যাইতে যাইতে আল্‌বাঁ উত্তর করিল, "আমি জানি না।"

ক্লোদ্‌ সমস্ত দিন আল্‌বাঁকে খুঁজিতে লাগিল, কিন্তু খুঁজিয়া পাইল না ; এবং রাত্রিতেও যখন দেখিল, সে অনুপস্থিত, তখন ক্লোদ্‌ তাহার স্বাভাবিক মৌনভাব ভঙ্গ করিয়া দ্বাররক্ষককে জিজ্ঞাসা করিল, "আল্‌বাঁ কি পীড়িত হয়েছে ?"

লোকটা উত্তর করিল, "না।"

"তবে আজ সে এল না কেন ?"

রক্ষী বলিল, "তার যায়গা বদলী হয়েছে।"

ক্লোদ্‌ মুহূর্ত্তের জন্য কাঁপিয়া উঠিল, তাহার পর বেশ শান্তভাবে বলিল, "কে হুকুম দিয়েছে ?"

"পরিদর্শক মহাশয়।"

পরদিন রাত্রে পরিদর্শক মহাশয় নিত্য নিয়মানুসারে রোঁদ্‌ ফিরিতে বাহির হইলেন। ক্লোদ্‌ দূর হইতে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া তাড়াতাড়ি পশমী টুপীটা উঠাইয়া এবং জামার বোতাম গলা পর্য্যন্ত আঁটিয়া দিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইল। জেলের আইনকানুন অনুসারে ইহা উপরিওয়ালাদের প্রতি সম্মান দেখাইবার চিহ্ন।

ক্লোদ্‌ বলিল, "মহাশয়, সত্যই কি আল্‌বাঁকে অন্য যায়গায় থাকতে দেওয়া হয়েছে ?"

পরিদর্শক উত্তর করিলেন, "হাঁ।"

"মহাশয়, আমি তাকে ছেড়ে থাকতে পারব না। আপনি ত জানেন, আমার খোরাকের পরিমাণটা যথেষ্ট নয়, আর আলর্বাঁ তার প্রাপ্য খোরাক আমার সঙ্গে ভাগাভাগি করে। আপনি কোন রকম ক'রে তার যায়গাটা আবার আমার কাছে ক'রে দিতে পারেন না কি ?"

"অসম্ভব, হুকুম ফেরানো যায় না।"

"কে হুকুম দিলেন ?"

"আমি।"

ক্লোদ্‌ উত্তর করিল, "আপনার উপর আমার জীবন নির্ভর করছে।"

"একবার একটা হুকুম দিয়ে আমি কখনও তা রদ্‌ করিনে।"

"আমি আপনার কি অনিষ্ট করেছি ?"

"কিছুই না।"

ক্লোদ্‌ বলিয়া উঠিল, "তবে কেন আপনি আল্‌বাঁকে আমা থেকে পৃথক্‌ ক'রে দিলেন ?"

"কারণ আর কি ?—পৃথক্‌ করেছি এইমাত্র।" পরিদর্শক এই কথা বলিয়াই চলিয়া গেলেন, সঙ্গী কুকুরটির সঙ্গ হইতে বঞ্চিত হইলে বেচারা পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের যেরূপ হয়—ক্লোদের মাথা সেইরূপ নীচে নুইয়া পড়িল। এই গভীর দুঃখেও তাহার ক্ষুধার কোন ব্যতিক্রম হয় নাই—সে অনশন-ক্লেশ সমানে ভোগ করিতেছিল। অনেকেই তাহার সহিত খোরাকের ভাগাভাগি করিতে চাহিল, কিন্তু সে স্থিরভাবে প্রত্যাখ্যান করিল এবং নিস্তব্ধভাবে তাহার নিত্য-নিয়মিত কায করিয়া যাইতে লাগিল। কেবল প্রতিদিন একবার করিয়া পরিদর্শককে জিজ্ঞাসা করিত, "আর আল্‌বাঁ ?" এই কথা বলিবার সময় তাহার কণ্ঠস্বরে রোষ ও দুঃখ মিশ্রিত ছিল, উক্ত কথা দুইটি—অনুনয় ও ভয়প্রদর্শন, এই দুয়ের যেন একটা কিছু মাঝামাঝি।

পরিদর্শক কোন উত্তর করিলেন না—কেবল একবার কাঁধ ঝাঁকাইয়া আবার চলিতে লাগিলেন। কিন্তু খুব লক্ষ্য করিলে তিনি দেখিতে পাইতেন, ক্লোদের একটা স্পষ্ট পরিবর্ত্তন হইয়াছে ; উপস্থিত সকলেই তাহা লক্ষ্য করিয়াছিল। লক্ষ্য করিয়া দেখিলে তিনি বুঝিতে পারিতেন, ঐ নিম্নলিখিত কথাগুলি ক্লোদ্‌ সম্মানের সহিত অথচ দৃঢ়ভাবে বলিয়াছিল :—"মহাশয়, আমার কথা শুনুন, আমার সঙ্গীকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিন। আমি আপনাকে নিশ্চয় ক'রে বলছি, আপনার পক্ষে তা হ'লে ভাল হবে। আমার কথাগুলি মনে রাখবেন !"

রবিবারে ক্লোদ্‌ মাথা নীচু করিয়া এবং হাতের ভিতর মাথা রাখিয়া অঙ্গনের মধ্যে অনেক ঘণ্টা বসিয়া ছিল ; এবং ফাইএৎ নামক এক জন কয়েদী যখন হাসিতে হাসিতে তাহার নিকট আসিল, ক্লোদ্‌ বলিল, "আমি এক জনের বিচার করছি।"

১৮৩১ খৃষ্টাব্দে ২৫শে অক্টোবর, যখন পরিদর্শক রোঁদ্‌ ফিরিতে বাহির হইয়াছিলেন, ক্লোদ্‌ তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য পথিমধ্যে হাতঘড়ীর মুখ-ঢাকা একটা আয়নার চাকতি পাইয়াছিল

তাহা ছুড়িয়া চুরমার করিয়া ফেলিল। ইহাতে তাহার ঈপ্সিত ফললাভ হইল।

ক্লোদ্ বলিল, "এ আমারই কায। আমার সঙ্গীকে আমার নিকট ফিরিয়ে দিন।"

উত্তর হইল, "অসম্ভব।"

ক্লোদ্ পরিদর্শকের মুখের পানে তাকাইয়া, দৃঢ়ভাবে আরও এই কথা বলিল, "এখন বেশ ক'রে ভেবে দেখুন! আজ ২৫শে অক্টোবর, ৪ঠা নভেম্বর পর্য্যন্ত আপনাকে সময় দিচ্ছি।"

এক জন রক্ষী বলিল, "ক্লোদ্ পরিদর্শক মহাশয়কে ভয় দেখাচ্ছে, ওকে এখনই অন্ধ কুঠরীতে পুরে রাখা উচিত।"

অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া পরিদর্শক মহাশয় উত্তর করিলেন, "এটা জেলের আঁধার ঘরে পুরে রাখবার মত অপরাধ নয়—এই ধাতুর লোকদের সম্বন্ধে একটু বিবেচনা করা দরকার।"

তাহার পরদিন বোর্নো নামক আর এক কয়েদী যখন তাহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন সে অঙ্গনে বসিয়া কি একটা কথা মনে মনে ক্রমাগত তোলাপাড়া করিতেছিল।

"কি হে ক্লোদ্, তোমাকে আজ যে বড় বিষণ্ণ দেখছি, ব'সে ব'সে কি ভাবছ?"

ক্লোদ্ উত্তর করিল, "আমার আশঙ্কা হচ্ছে, সদাশয় পরিদর্শক মহাশয়ের শীঘ্রই একটা কিছু অমঙ্গল হবে।"

ক্লোদ্ প্রতিদিন পরিদর্শকের মনে এই কথাটা মুদ্রিত করিয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল যে, আল্বর্‍্যার সহিত ছাড়াছাড়ি হওয়ায় তাহার কতটা মনে আঘাত লাগিয়াছে, কিন্তু তাহার ফল এইমাত্র হইল যে, তাহাকে ২৪ ঘণ্টার জন্য নিঃসঙ্গ কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইল।

ক্লোদ্ ৪ঠা নভেম্বরে তাহার কুঠরীর মধ্যে একটা জিনিষ খুঁজিতেছিল—তাহার পূর্ব্বজীবনকে মনে করিয়া দিবার ঐ একমাত্র সামগ্রী অবশিষ্ট ছিল। একটা কাঁইচি ও Emile নামক একখানি উপন্যাস গ্রন্থ। যে রমণীকে সে এত ভালবাসিত (তার ছেলের মা), ঐ দুইটি জিনিষ তাহারই ছিল। কিন্তু যে লোকের কোন কায নাই, যে লোক পড়িতে পারে না, তাহার পক্ষে ঐ দুটো জিনিষই নিরর্থক!

ক্লোদ্ যখন সেই পুরাতন মঠের কুঠরীর ভিতর দিয়া চলিতেছিল, তখন সে লক্ষ্য করিল, ফেরারি নামক এক জন কয়েদী কতকটা আগ্রহের সহিত তাহার জানালার মোটা মোটা লৌহ গরাদেগুলা দেখিতেছে। ক্লোদের হাতে একটা কাঁইচি ছিল, সেই কাঁইচিটা ফেরারিকে দেখাইয়া ক্লোদ্ বলিল, "আজ রাতে এই কাঁইচি দিয়া ঐ গরাদেগুলা আমি কাটিয়া ফেলিব।"

ফেরারি অবিশ্বাসের ভাবে হাসিয়া উঠিল, সেই হাসিতামাসায় ক্লোদ্‌ও যোগ দিল। ক্লোদ্ দিনের বেলায় সচরাচর অপেক্ষা বেশী আগ্রহের সহিত কায করিতে লাগিল, ব্রেসিয়ে নামক এক জন ব্যবসাদার খড়ের টুপী তৈয়ারী করিবার জন্য কিছু আগাম টাকা দিয়াছিল। তাই সে এই টুপীটা শীঘ্র শেষ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিল।

মধ্যাহ্নের কিছু পূর্ব্বেই যখন রক্ষীরা অনুপস্থিত ছিল, ক্লোদ্ একটা অছিলা করিয়া ছুতার মিস্ত্রীদের ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। ছুতার মিস্ত্রীরা তাহার নীচের তলাতে কায করিত। ক্লোদ্ উহাদের নিকট হইতে আন্তরিক আদর অভ্যর্থনা পাইল। ক্লোদ্ সর্ব্বত্রই জনপ্রিয় ছিল। ক্লোদ্ বলিল, "তোমাদের মধ্যে কেউ আমাকে একটা কুড়ালী ধার দিতে পারে?"

"কি কাযের জন্য?"

গোপন রাখিবার জন্য অঙ্গীকারের কোন দাবী না রাখিয়াই সে তখনই উত্তর করিল, "আজ রাতে, ঐ দিয়ে পরিদর্শককে হত্যা করব।"

তখনই উহারা কতকগুলি কুড়ালী উহাকে দিতে উদ্যত হইল। একটা খুব ছোট কুড়ালী সে বাছিয়া লইল এবং উহা জামার ভিতর লুকাইয়া রাখিয়া প্রস্থান করিল। সেই সময় ২৭ জন কয়েদী সেখানে উপস্থিত ছিল, তাহাদের মধ্যে কেহই বিশ্বাসঘাতকতা করে নাই; এমন কি, উহারা আপনাদের মধ্যেও এই বিষয়ের কোনও উচ্চবাচ্য করিত না। কেবল উহারা সেই ভীষণ ঘটনার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল।

ক্লোদ্ যাইতে যাইতে দেখিল, একটি ১৬ বৎসরের যুবক সেখানে অলসভাবে কেবল হাই তুলিতেছে, ক্লোদ্ তাহাকে লিখাপড়া শিখিবার জন্য খুব জোরের সহিত পরামর্শ দিল। ঠিক সেই সময় ফাইএৎ জিজ্ঞাসা করিল, "ক্লোদ্, তুমি কি লুকোচ্ছো?"

ক্লোদ্ ইতস্ততঃ না করিয়াই বলিল, "যে কুড়ালী দিয়ে আজ রাতে পরিদর্শক মহাশয়কে হত্যা করব, সেই কুড়ালী, কিন্তু তুমি কি কুড়ালীটা দেখতে পাচ্ছো?"

ফাইএৎ বলিল, "একটুখানি।"

৭টার সময় কয়েদীদিগকে তাহাদের নিজ নিজ কর্ম্মশালায় বদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল। পরিদর্শকের রোঁদ্ ফিরিয়া আসা পর্য্যন্ত তখন কয়েদীকে এইরূপ বদ্ধ করিয়া রাখিবার প্রথা ছিল।

ক্লোদের কর্ম্মশালায় একটা অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার দেখা গেল। এ রকম ব্যাপারের লিপিবদ্ধ নজির আর কোথাও মেলে না। ক্লোদ্ দাঁড়াইয়া উঠিয়া ৮৪ জন লোককে এইরূপ অভিভাষণ করিল,—"তোমরা সকলেই জান, আমি ও আল্বর্‍্যা আমরা দুই ভায়ের মত ছিলেম। প্রথমে তাকে আমার ভাল লেগেছিল—আমার সঙ্গে খোরাকের ভাগাভাগি করার দরুণ; তার পর তাকে আমি ভালবাসতেম—সে আমাকে ভালবাসতো ব'লে। আমার সামান্য রোজগারের পয়সা দিয়ে আমি রুটী কিনি, কিন্তু তাতে আমার পেট ভরে না। আমাদের দু'জনের একসঙ্গে থাকাতে পরিদর্শক মহাশয়ের কি ক্ষতিবৃদ্ধি? কিন্তু তিনি আমাদের দু'জনকে তফাৎ ক'রে দিলেন—শুধু আমাকে যন্ত্রণা দেবার জন্য; তিনি যন্ত্রণা দিতে ভালবাসেন। লোকটা বড়ই খারাপ। আমি তাঁকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করলেম, তাকে আমার কাছে আবার পাঠিয়ে দিতে। কিন্তু কোন ফল হ'ল না। আর যখন তাঁকে একটা নির্দ্দিষ্ট সময় দিলেম—৪ঠা নভেম্বর, তখন তিনি আমাকে জেলের অন্ধ-কুঠরীতে পুরলেন। সেই সময়ে আমি তাঁর বিচারক হলেম এবং বিচার ক'রে তাঁর মৃত্যুদণ্ড আদেশ করলেম। দুই ঘণ্টার মধ্যে তিনি এখানে আসবেন; তোমাদের আগে থাকতে ব'লে রাখছি, আমি তাঁকে হত্যা করব ব'লে স্থির করেছি। তোমাদের কিছু বল্‌বার আছে?"

সকলেই নিস্তব্ধ, একটি টুঁ শব্দ নাই। ক্লোদ্ তার সাথের সাথী ৮৪ জন চোরকে এই সম্বন্ধে তার মতামত বলতে লাগল। সে বল্লে, "আমি একটা ভীষণ শেষ সীমায় এসে পৌছেছিলেম—কোন গত্যন্তর না দেখে, আমার নিজের হাতেই বিচারের ভার নিলেম; আমি বেশ জানি, আমার নিজের প্রাণ বিসর্জ্জন করতে প্রস্তুত না থাকলে, পরিদর্শকের প্রাণ নিতে পারব না। কিন্তু উদ্দেশ্যটা যখন ন্যায্য, তখন ইহার যা কিছু ফলাফল, আমাকেই তো ভোগ করতে হবে। দুই মাস শান্তভাবে ভেবেচিন্তে দেখে তবে এই সিদ্ধান্তে আমি এসেছি। যদি তোমাদের মনে হয়, আমি রাগের মাথায় তাড়াতাড়ি এই কাযটা করতে উদ্যত হয়েছি, তোমরা আমাকে তাই স্পষ্ট বল; আর এই দণ্ডাজ্ঞা কাযে পরিণত করবার সম্বন্ধে তোমাদের কি কি আপত্তি আছে, তাহাও আমাকে বলতে পার।"

শুধু একটি লোকের কণ্ঠস্বর এই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিল। সে বলিল, "পরিদর্শককে হত্যা করবার আগে, তা'র মেজাজটা নরমে আন্‌তে তা'কে একটা অবসর দেওয়া উচিত।"

ক্লোদ্ বলিল, "এ কথা ন্যায্য; সন্দেহের অজুহাতে তাঁ'কে মুক্তি দেওয়া যেতে পারে।"

তাহার পর ক্লোদ্ যে অল্প-স্বল্প জিনিষ কয়েদীদিগকে দেওয়া হয়, সেই সব জিনিষ বাছিয়া বাছিয়া, আলৃব্যাঁর পরেই যাহাদিগকে সব চেয়ে বেশী ভালবাসিত, তাহাদিগকে দান করিল। কেবল কাঁইচিটি রাখিয়া দিল। তাহার পর ক্লোদ্ তাহাদের সকলকেই আলিঙ্গন করিল। উহাদের মধ্যে কেহ কেহ সেই সময়ে অশ্রুসংবরণ করিতে পারিতেছিল না। এই অন্তিমকালে ক্লোদ্ সকলের সঙ্গে বাক্যালাপ করিতে লাগিল; এমন কি, তাহার বাল্যকালের একটা মজার তামাসা—নাকের নিঃশ্বাসে বাতি নিবাইয়া দেওয়া, তাহাও উহাদিগকে দেখাইল। তাহার এইরূপ আচরণ দেখিয়া, তাহার সঙ্গীরা মনে করিয়াছিল, বুঝি ক্লোদ্ তাহার দারুণ সংকল্পটা ত্যাগ করিয়াছে। একটি তরুণবয়স্ক কয়েদী ক্লোদের মুখের পানে একদৃষ্টে তাকাইয়া ছিল এবং আসন্ন ঘটনার কথা মনে করিয়া কাঁপিতেছিল। ক্লোদ্ ধীরভাবে তাহাকে বলিল, "ওহে ছোকরা, সাহস কর, ভয় পেয়ো না; কাযটা এক মিনিটের ওয়াস্তা।"

ক্লোদের কর্ম্মশালাটা একটা দীর্ঘ কামরা; উহার দুই প্রান্তে এক একটা দরজা; প্রত্যেক দিকেই জানালা আছে—সেই জানালা দিয়া কর্ম্মশালার বেঞ্চিগুলি দেখা যায়—কামরার মধ্যস্থল পর্য্যন্ত একটা পথ উঠিয়াছে, এই পথে দাঁড়াইয়া পরিদর্শক দুই দিকেরই কায পরিদর্শন করিতে পারেন। এই সময় ক্লোদ্ আবার তাহার কায আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল।

যখন ঘড়ীতে পৌনে ৯টা বাজিল, তখন ক্লোদ্ উঠিয়া দাঁড়াইল এবং বাহ্যতঃ শান্তভাবে প্রবেশপথের নিকট আসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। তাহার পর গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে ঘড়ীতে ঢং ঢং করিয়া ৯টা বাজিল, দরজা খুলিয়া দেওয়া হইল; এবং নিত্য-নিয়মানুসারে পরিদর্শক একাকী আসিলেন। মুখ বেশ হর্ষ-প্রফুল্ল ও আত্মপরিতুষ্ট, তাড়াতাড়ি চলিতেছেন; চলিতে চলিতে কাহারও দিকে বা মাথা উর্দ্ধে উৎক্ষেপ করিতেছেন, কাহাকে বা চিবাইয়া চিবাইয়া দুই চারিটা কথা বলিতেছেন। এ দিকে যে এক জোড়া চোখ ভীষণভাবে একদৃষ্টে তাঁহার দিকে চাহিয়া আছে, তাহা তিনি লক্ষ্য করেন নাই। ঠিক্ এই সময় ক্লোদের পদশব্দ শুনিতে পাইলেন এবং তখনই ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "এখানে তুমি কি করছ? তোমার নিজের যায়গায় তুমি নেই কেন?" একটা কুকুর-বিড়ালকে যে ভাবে বলিতে পারিতেন, সেইরূপ ভাবে এই কথাগুলা বলিলেন।

ক্লোদ্ সম্মানের সহিত উত্তর করিল, "মহাশয়, আপনাকে একটা কথা বল্‌তে চাই।"

"কি বিষয়ে?"

"আল্‌ব্যাঁ।"

"আবার?"

ক্লোদ্ বলিল, "হাঁ, সেই এক কথা।"

পরিদর্শক চলিতে চলিতে উত্তর করিলেন, "তা হ'লে দেখছি, অন্ধ-কুঠরীতে ২৪ ঘণ্টা থাকাও তোমার পক্ষে যথেষ্ট হয়নি।"

ক্লোদ্ পরিদর্শকের পিছনে পিছনে খুব কাছাকাছি চলিতে চলিতে উত্তর করিল, "আমার সঙ্গীকে আমার কাছে ফিরিয়ে দিন।"

"অসম্ভব!"

যাহা শুনিয়া সয়তানও বিচলিত হইতে পারে, এইরূপ স্বরে ক্লোদ্ তখনও বলিতে লাগিল,—"আমি আপনাকে অনুনয় করছি, আলব্যাঁকে আমার কাছে ফিরে পাঠিয়ে দিন; তখন আপনি দেখতে পাবেন, আমি কেমন কায করি। আপনি স্বাধীন, আপনার কিছুই ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না। যা'র একটিমাত্র বন্ধু, তা'র মনের ভাবটা আপনি বুঝতে পারছেন না। জেলের প্রাচীরের মধ্যে আমি বদ্ধ—এই বন্ধুত্বই আমার সর্ব্বস্ব। আপনার ইচ্ছামত আপনি যাওয়া-আসা করছেন, আমার শুধু আছে একমাত্র আল্‌ব্যাঁ। মহাশয়, সে আমার কাছে আবার ফিরে আসুক! আপনি ত বেশ জানেন, সে আমার সঙ্গে তা'র খোরাক ভাগাভাগি করত। এই যায়গায় ক্লোদ্-গিয়ু নামে এক ব্যক্তির কাছে আল্‌ব্যাঁ নামে আর এক ব্যক্তি থাকবে, তাতে আপনার কি এসে যাবে? আপনার কেবল 'হাঁ' এই কথাটি বল্‌লেই হবে, আর কিছুই না। মহাশয়, ধর্ম্মাবতার, ভগবানের দোহাই দিচ্ছি, আমার প্রার্থনা পূর্ণ করুন।"

ক্লোদ্ মনের আবেগে অভিভূত হইয়া উত্তরের প্রতীক্ষায় রহিল।

পরিদর্শক অধৈর্য্যসহকারে উত্তর করিলেন, "অসম্ভব। আমার কথা আমি ফিরাইব না। এখন যাও, আমাকে বিরক্ত করো না।" এই কথা বলিয়া তিনি বাহর্দ্বারের দিকে তাড়াতাড়ি চলিতে লাগিলেন। ৮৪ জন চোর নীরব—নিস্তব্ধ।

ক্লোদ্ পরিদর্শকের পিছনে পিছনে চলিয়া, তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া নম্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "অন্ততঃ আমি জানতে চাই, কি জন্য আমার উপর মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হয়েছে—কেন আপনি আমাদের দু'জনকে তফাৎ ক'রে দিলেন?"

পরিদর্শক উত্তর করিলেন, "আমি ত পূর্ব্বেই তার জবাব দিয়েছি; আমার খুসী।"

এই কথা বলিয়া তিনি দ্বারের খিলটা উঠাইতে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময় ক্লোদ্ কুঠার উত্তোলন করিল; পরিদর্শক কোনরূপ চীৎকার না করিয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন। বিদ্যুদ্বেগে প্রদত্ত তিনটা গুরুতর আঘাতে পরিদর্শকের মাথার খুলী বিদীর্ণ হইল। চতুর্থ আঘাতে তাঁহার মুখ বিরূপ হইয়া গেল, তথাপি ক্লোদ্ আর একটা আঘাত করিল, কিন্তু সেটা নিরর্থক। কেন না, ইতিপূর্ব্বেই পরিদর্শকের প্রাণ বাহির হইয়া গিয়াছিল।

ক্লোদ্ কুঠারটা পাশে ছুড়িয়া ফেলিয়া বলিয়া উঠিল, "এইবার আর এক জনের পালা!"

সে আর এক জন নিজেই; তাহার স্ত্রীর কাঁইচিটা দিয়া নিজের বক্ষ বিদ্ধ করিল। কিন্তু ফলাটা ছোট ও বক্ষোদেশ গভীর হওয়ায় সে মারাত্মক আঘাত করিতে পারিল না। তাহার চেষ্টা বিফল হইল। অবশেষে রক্তাপ্লুত হইয়া পরিদর্শকের মৃতদেহের উপর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। উহাদের মধ্যে কে হত্যাকারী?

যখন ক্লোদের চৈতন্য হইয়াছে, তখন সে শয্যাশায়ী, চারিদিক হইতে সেবা-যত্ন চলিতেছে, আঘাতের স্থানে পটি লাগানো হইয়াছে। তাহার নিকটে রহিয়াছে কতকগুলি "সেবা-ভগিনী" এবং এক জন আদালতের সেরেস্তাদার জবানবন্দী লইবার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে। সেরেস্তাদার খুব ঔৎসুক্যের সহিত আহতের কুশল জিজ্ঞাসা করিল। ক্লোদের অনেকটা রক্তহানি হইয়াছিল। কাঁইচি তাহার কোন উপকার করে নাই, বরং অপকারই করিয়াছে—কাঁইচির একটা আঘাতও মারাত্মক রকমের ছিল না। পরিদর্শকের শরীরের উপর যে আঘাত হইয়াছিল, তাহাই মারাত্মক আঘাত। তখন প্রশ্নকারী সেরেস্তাদার এইরূপ প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিলেন,—

"ক্লেয়ারভোর জেল-কর্ম্মশালার পরিদর্শককে কি তুমিই হত্যা করেছ?"

উত্তর—"হাঁ।"

"কেন হত্যা করেছিলে ?"

"কারণ, আমি করেছিলেম এইমাত্র।"

ক্রমে ক্লোদের ক্ষতগুলা একটু খারাপ হইয়া দাঁড়াইল, ক্লোদের জ্বর হইল ; ইহাতে উহার জীবন সংশয়াপন্ন হইল। নভেম্বর, ডিসেম্বর, জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী সেবাশুশ্রূষায় ও উদ্যোগ আয়োজনেই কাটিয়া গেল—পর্য্যায়ক্রমে একবার এক ডাক্তার, একবার এক জজ ক্লোদের নিকট আসিতে লাগিলেন—ডাক্তার আরোগ্যবিধানের জন্য এবং জজ জবানবন্দী সংগ্রহ করিয়া তাহাকে ফাঁসী-কাঠে চালান দিবার জন্য।

১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ১৬ই মার্চ্চ তারিখে ক্লোদ্ আরোপিত অপরাধের জবাব দিবার জন্য আদালতে উপস্থিত হইল। উহার চেহারা দেখিয়া উহার সম্বন্ধে আদালতের একটা অনুকূল ধারণা হইল। দাড়ি কামানো, খোলা মাথা, কিন্তু তখনও কয়েদীর পোষাক-পরা। সাক্ষীদিগকে ঠিক রাখিবার জন্য আদালত সৈনিক-রক্ষীদিগের দ্বারা সুরক্ষিত ছিল,—কেন না, সকল সাক্ষীই অপরাধিদলভুক্ত।

কিন্তু একটা অপ্রত্যাশিত বাধা উপস্থিত হইল। উহাদের মধ্যে কেহই সাক্ষ্য দিতে রাজী হইল না। কি প্রশ্নজিজ্ঞাসা, কি ভয়-প্রদর্শন কিছুই তাহাদের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতে পারিল না। তাহার পর যখন ক্লোদ্ তাহাদিগকে অনুরোধ করিল, তখনই তাহারা সাক্ষ্য দিতে সম্মত হইল। তাহারা একে একে সকলেই ভীষণ ঘটনাটা সঠিক বর্ণনা করিল। বিস্মৃতি প্রযুক্তই হউক্, কিংবা ভালবাসার খাতিরেই হউক্, ঘটনাসংক্রান্ত কোন কথা উহারা বাদ দিলে ক্লোদ্ নিজেই তৎক্ষণাৎ তাহা পূরণ করিয়া দিতে লাগিল। এই সময় দেখা গেল, রমণীরা অজস্রধারায় অশ্রু বর্ষণ করিতেছে।

এই সময় আদালতের দ্বারপাল, অপরাধী আল্‌ব্যাঁকে ডাক দিল। সে আবেগভরে কাঁপিতে কাঁপিতে এবং ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ক্লোদের বাহুর ভিতর ঝাঁপাইয়া পড়িল। সরকারী অভিযোক্তা উকীলের দিকে ফিরিয়া ক্লোদ্ বলিল, "এই অপরাধীটি ক্ষুধিত, ইহাকে অন্নদান করুন।" এই কথা বলিয়া ক্লোদ্ নত হইয়া আলব্যাঁর হস্ত চুম্বন করিল।

সাক্ষীদিগের জবানবন্দী শেষ হইলে, সরকার তরফের কৌঁসুলি উঠিয়া আদালতকে অভিভাষণ করিলেন, "জুরর মহোদয়গণ! উহার ন্যায় মহা অপরাধীদিগকে যদি সরকারী অভিযোক্তা অপরাধী সাব্যস্ত না করেন, তাহা হইলে সমাজের মধ্যে ভয়ানক বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবে—এই সব অপরাধী, যাহারা ইত্যাদি।"

সরকার উকীলের দীর্ঘ অভিভাষণের পর ক্লোদের কৌঁসুলি উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

তাহার পর ফৌজদারী আদালতে যাহা নিত্য হইয়া থাকে, অনুকূলে ও প্রতিকূলে উকীলদিগের বক্তৃতা চলিতে লাগিল।

ক্লোদের জবানবন্দী গ্রহণ করা হইল ; ক্লোদের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া সকলেই বিস্মিত হইল। এই গরীব শ্রমজীবীর কথাবার্ত্তার ভিতর খুনী অপেক্ষা বাগ্মীর ভাবই বেশী লক্ষিত হইল। ঠিক যাহা সত্য, তাহাই বলিবে, এইরূপ মনস্থ করিয়া, গর্ব্বিতভাবে আদালতে দাঁড়াইয়া, সুস্পষ্ট ও সোজাসুজি ভাবে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, আনুপূর্ব্বিক সমস্তই বলিল। এক এক সময় জনতা তাহার বাগ্মিতায় আত্মহারা হইয়া পড়িতেছিল। এই ব্যক্তি—যে লিখাপড়া জানে না, সে যুক্তিধারার শক্ত অংশগুলিও আয়ত্ত করিয়াছে এবং বিচারকদিগের প্রতি সম্মানপ্রদর্শন করিতেও বিরত হইতেছে না। একবার কেবল ক্লোদের ধৈর্য্যচ্যুতি হইয়াছিল—যখন সরকারী উকীল বলিয়াছিলেন যে, ক্লোদ্ পরিদর্শককে বিনা উত্তেজনায় বিনা কারণে হত্যা করিয়াছে।

ক্লোদ্ বলিয়া উঠিল, "কি ? হত্যার কোন ক্রোধ-উত্তেজনার হেতু ছিল না ? বটেই ত! এক জন মাতাল আমাকে আঘাত করিল—আমি তাহাকে হত্যা করিলাম ; তখন তোমরা বলিবে, উহার উত্তেজক কারণ ছিল, আর তখন তোমরা মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্ত্তে উহার জন্য কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করিবে। কিন্তু যে ব্যক্তি চার বৎসর ধ'রে সর্ব্বতোভাবে আমাকে আঘাত করেছে, চার বৎসর ধ'রে আমার অপমান করেছে এবং চার বৎসর ধ'রে প্রতিদিন প্রতি ঘণ্টায় আমাকে ঠাট্টাবিদ্রূপ করেছে, আমার উপর রাশি রাশি অপমান বর্ষণ করেছে, তার পরিণাম কি হ'তে পা'রে ? আমার স্ত্রীর জন্য আমি চুরি করেছিলেম, পরিদর্শক তাই উল্লেখ ক'রে আমাকে যন্ত্রণা দিতেন। আমার ছেলের জন্য আমি চুরি করেছিলেম—তিনি ঐ ছেলের উল্লেখ ক'রে আমাকে বিদ্রূপ করতেন। আমি ক্ষুধিত ছিলেম, এক জন বন্ধু আমার সহিত তাহার খোরাক ভাগাভাগি করত। আমার বন্ধুকে আমার কাছে ফিরিয়ে দিতে তাঁ'কে কত অনুনয় করলাম—তিনি আমাকে কারাগারের অন্ধ-কুঠরীতে নিক্ষেপ করলেন। আমি তাঁ'কে বল্লেম, আমি বড়ই কষ্ট পাচ্ছি— তিনি বল্লেন, আমার কথা শুনতে তাঁর ক্লান্তি বোধ হয়। এই অবস্থায় তোমরা আমাকে কি করতে পরামর্শ দেও ? আমি তাঁ'র প্রাণবধ করলেম। এই লোকটাকে মেরেছি ব'লে তোমরা আমাকে এক জন রক্তপিপাসু পিশাচ ব'লে মনে করেছ এবং আমার শিরশ্ছেদ করবে ব'লে স্থির করেছ—ভাল, তাই কর।"

এইরূপ রোষোত্তেজনা আইন আমলে আনে না ; কেন না, আঘাতের নিদর্শন কোন দাগ নাই।

তাহার পর জজ মোকর্দ্দমা বিচার করিয়া বেশ সুস্পষ্টভাবে ও অপক্ষপাতিতাসহকারে এইরূপ উপসংহার করিলেন,—ক্লোদ্ এক জন পতিতার সহিত প্রকাশ্যভাবে জীবনযাপন করিয়াছে, চুরি করিয়াছে, অবশেষে নরহত্যা করিয়াছে। জুরী অন্য ঘরে যাইবার পূর্ব্বে জজ ক্লোদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার কোন প্রশ্ন করিবার আছে কি না, কিছু বলিবার আছে কি না ?

ক্লোদ্ বলিল, "আমার কিছুই বল্‌বার নেই ;—আমি খুনী, আমি চোর ; কিন্তু আমি এই জুরর ভদ্রলোকদিগকে জিজ্ঞাসা করি, কেন আমি খুন করেছিলেম ? কেন আমি চুরি করেছিলেম ?"

জুররা কিয়ৎকালের জন্য অন্য ঘরে প্রস্থান করিলেন এবং এই ১২ জন পল্লীবাসী—তথাকথিত জুরর ভদ্রলোক—ইহাঁদের বিচারে, ক্লোদ্-গিয়ুর মৃত্যুদণ্ড হইল। গোড়া হইতেই উঁহাদের মধ্যে কতকগুলি লোকের "গিয়ু" (লক্ষ্মীছাড়া) এই নাম দেখিয়া ক্লোদ্ সম্বন্ধে একটা প্রতিকূল ধারণা হইয়াছিল, এবং সেই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া উহারা এইরূপ বিচার নিষ্পত্তি করিলেন।

যখন জুরীর রায় শুনানো হইল, ক্লোদ্ শুধু বলিল,—"বেশ ; কিন্তু এই ভদ্রলোকরা দুইটি প্রশ্নের উত্তর দেন নাই। এই লোকটা চুরি করিল কেন ? কেমন করিয়া সে খুনী হইয়া দাঁড়াইল ? আমার ৩৬ বৎসর কেটে গেছে"—এই বলিয়া ক্লোদ্ সে রাত্রি বেশ পেট ভরিয়া আহার করিল। সে আপীল দায়ের করিতে অস্বীকৃত হইয়াছিল, কিন্তু যে "সেবা-ভগিনী" তার সেবাশুশ্রূষা করিয়াছিল, তার অনুরোধে সে শেষ মুহূর্ত্তে সম্মত হইল।

আমরা পূর্ব্বেই লক্ষ্য করিয়াছিলাম, ক্লোদের কয়েদী-ভাইরা তাহার একান্ত ভক্ত ছিল। তাহার পলায়নের সুযোগ করিয়া দিবার জন্য তাহাদের যাহা কিছু ছিল, ক্লোদ্‌কে দিয়াছিল। বায়ুরন্ধ্রের মধ্য দিয়া তাহার কারাকক্ষের ভিতর একটা পেরেক, খানিকটা লোহার তার, একটা কেঁড়ের হাতল ফেলিয়া দিয়াছিল। ক্লোদের মত লোক ইহার একটা কিছু পাইলেই কারা-শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইতে পারিত ; কিন্তু ঐ সমস্ত জিনিষ সে রক্ষীর হাতে সমর্পণ করিল।

১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ৮ই জুন তারিখে পরিদর্শকের হত্যার চার দিন পরে, আদালতের সেরেস্তাদার আসিয়া ক্লোদকে বলিল, আর এক ঘণ্টা মাত্র সে বাঁচিবে, কেন না, আপীল অগ্রাহ্য হইয়াছে।

ক্লোদ্ উদাসীনভাবে বলিল. "তাই না কি। গত রাত্রে আমি বেশ ঘুমিয়েছিলেম, নিশ্চয়ই আজ রাত্রিতে ঘুমটা আরও ভাল হবে।"

প্রথমে আসিলেন পাদ্রী, তাহার পর জল্লাদ। ক্লোদ খুব বিনীত-ভাবে মনোযোগ দিয়া পাদ্রীর কথা শুনিতে লাগিল; সে ধর্ম্মশিক্ষার সুযোগ পায় নাই বলিয়া দুঃখ করিতে লাগিল। অতীত জীবনে যাহা কিছু মন্দ, তাহার জন্য নিজেকেই দোষী করিল। জল্লাদের সহিত বেশ-ভদ্রভাবে ব্যবহার করিল; এক কথায়—তাহার যাহা কিছু ছিল, সমস্তই বিসর্জ্জন করিল। অন্তরাত্মাকে পুরোহিতের হাতে এবং শরীরকে জল্লাদের হাতে সমর্পণ করিল।

তাহার যখন চুল ছাঁটিয়া দেওয়া হইয়াছিল, কে এক জন বলিল, "ওলাউঠা রোগ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে, আমাদের গ্রামেও হয় ত দেখা দিবে।" এই কথোপকথনে ক্লোদ্‌ও যোগ দিল এবং হাসিতে হাসিতে বলিল, "একটা কথা বল্‌তে হবে—আমি ওলাউঠাকে ডরাই নে।" সেই ভাঙ্গা কাঁইচির যে আধখানা অবশিষ্ট ছিল, সেই আধখানা আলবাঁকে দিতে জেল-রক্ষীকে অনুরোধ করিল; বাকী আধখানা তাহার বুকের ভিতরেই বিদ্ধ ছিল। আবও সে অনুরোধ করিল, যেন তাহার ঐদিনের পোষাক তাহার বন্ধুর নিকট হইতে লইয়া যাওয়া হয়। কেবল তাহার 'সেবা-ভগিনী" স্নেহের নিদর্শনস্বরূপ তাহাকে যে একটি রৌপ্যমুদ্রা দিয়াছিল, সেইটি শুধু সে তাহার নিকট রাখিল। তাহাকে যখন বন্ধন করা হয়, তখন তাহার দক্ষিণ হস্তে এইটি রাখিয়া দিয়াছিল।

পৌনে ৮টার সময় এই সব ব্যাপারে যাহা সচরাচর হইয়া থাকে—একটা বিষাদময় মিছিল জেলখানা হইতে বাহির হইল। ত্রাণকর্ত্তা যীশুর কষ্ট-যন্ত্রণার প্রতীকস্বরূপ পাদ্রী যে ক্রুশ হস্তে ধারণ করিয়াছিল, তাহার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া পাণ্ডুবর্ণমুখশ্রী ক্লোদ্-গিয়ু দৃঢ়পদক্ষেপে, ধীরে ধীরে ফাঁসী-মঞ্চের উপর উঠিল। পাদ্রীকে ধন্যবাদ ও জল্লাদকে ক্ষমা জানাইবার উদ্দেশে, ক্লোদ্ উভয়কেই আলিঙ্গন করিতে চাহিল। জল্লাদ শুধু একটা ঠেলা দিয়া তাহা প্রত্যাখ্যান করিল। উহাকে ফাঁসী-কাষ্ঠে বাঁধিবার ঠিক্ পূর্ব্বে সেবা-ভগিনীপ্রদত্ত রৌপ্য-মুদ্রাটি ক্লোদ্ পাদ্রীকে দিয়া বলিল, "এটি গরীবদের জন্য।"

ঢং ঢং করিয়া ঘড়ীতে যেই ৮টা বাজিল, অমনই সেই মহদন্তঃকরণ বুদ্ধিমান্ শ্রমজীবীর মস্তক এক আঘাতেই দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল।

একটা হাটের দিন দেখিয়া প্রাণদণ্ডের দিন স্থির করা হইয়াছিল—কেন না, ঐ দিনে অনেক লোক জড় হইবার কথা। ফ্রান্সে এখনও এমন কতকগুলি ছোট ছোট নগর আছে, যাহার অধিবাসীরা প্রাণদণ্ডের ব্যাপারটা একটা গৌরবের বিষয় বলিয়া মনে করে। সে দিনও গিলোটিন্‌যন্ত্র জনতার কল্পনাবৃত্তিকে এতটা উত্তেজিত করিয়াছিল যে, আর একটু হইলেই এক জন টেক্স-তহসীলদা'রের প্রাণ যাইত। প্রকাশ্য স্থানে ফাঁসী দিবার এইরূপই চমৎকার ফল।

একটা কঠিন সমস্যাসমাধানের নিমিত্তই আমরা ক্লোদ্-গিয়ুর জীবনের এই ইতিহাস বিবৃত করিলাম। আমাদের অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই। তাহার জীবনে দুইটা প্রশ্ন বিবেচনা করিয়া দেখিবার আছে—তাহার অধঃপতনের পূর্ব্বে এবং তাহার অধঃপতনের পরে। সে কি শিক্ষা পাইয়াছিল এবং তাহার কি শাস্তি হইল? সাধারণতঃ ইহা সমাজের একটা ভাবিবার কথা; কেন না, এই লোকটার বেশ বুদ্ধিশুদ্ধি ছিল, ইহার সহজ সংস্কারগুলাও ভাল ছিল। তবে অভাব ছিল কিসের? এইটিই একটা মস্ত সমস্যা, এই সমস্যার সম্যক সমাধানই সমাজকে দৃঢ় পত্তনভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত করিবে।

যে কায প্রকৃতি, ব্যক্তিবিশেষের ভিতরে আরম্ভ করিয়াছে, সমাজ তাহা সম্পূর্ণ করিয়া তুলুক। এই দেখ না কেন—ক্লোদ্-গিয়ু এক জন বুদ্ধিমান্ সদাশয় ব্যক্তি, কু-পারিপার্শ্বিকের মধ্যে স্থাপিত হওয়ায় চোর হইয়া দাঁড়াইল। সমাজ উহাকে কারাগারে স্থাপন করিল—যেখানকার পারিপার্শ্বিক আরও খারাপ এবং সেইখানে গিয়া সে খুনী হইয়া দাঁড়াইল। বাস্তবিকই কি সে অপরাধী, না আমরাই অপরাধী? এই সকল প্রশ্ন খুব গম্ভীরভাবে ভাবিয়া দেখা দরকার—নচেৎ ফল হইবে এই যে, এমন দরকারী বিষয়টাকে আমরা বাধ্য হইয়া এক পাশে ফেলিয়া রাখিব। তথ্যগুলা এক্ষণে আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে, এই বিষয়ে সরকার যদি একটুও মনোযোগ না দেন, তাহা হইলে সরকারের কাযটা কি?

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অনাহূত

আপনার মাঝে আপনি মগন
ভক্ত ভাবিল মনে,
দেবতারে সে যে ভালবাসে, তাহা
কেহ যেন নাহি শোনে!

হাস্য-রোদনে কর্ম্মে বাহিরে
চির গম্ভীর নত হয়ে ফিরে,
অন্তর-ছবি লুকাইতে চাহে
ভিতরে সঙ্গোপনে!

সাধনা যখন স্ফুরিয়া উঠিল
গোপন সত্তা ঘেরি,
বিস্মিত চিত্ত ভক্ত সহসা
কাঁদিয়া ফেলিল হেরি

তাহারি নামের পূত সৌরভে
মাতোয়ারা আজি বিশ্বের সবে,
তাহারি ধ্যানের জয়-জয় রবে
মুখরিত জনে জনে!

শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক

গ্লাসগো

২৪শে অক্টোবর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পর গ্লাসগো ষ্টেশনে পৌঁছিয়া আমরা ক্যালিডোনিয়ান রেলওয়ে কোম্পানীর সেন্ট্রাল ষ্টেশন হোটেলে আসিলাম—তথায় আমাদের জন্ত সব ব্যবস্থা ছিল। প্রভাতে উঠিয়া হোটেল হইতে বাহিরে চাহিয়া এডিনবরার সহিত গ্লাসগোর প্রভেদ বুঝিতে পারিলাম। এডিনবরা সৌখীন সহর—গ্লাসগো কারখানার কেন্দ্র। রাজপথ হইতেই উভয় সহরে প্রভেদ বুঝিতে পারা যায়। এডিনবরার পরিস্কৃত রাজপথ কাষ্ঠের ইষ্টকে আস্তৃত—গ্লাসগোর পথ পাতরের।



হোটেল

সমস্ত দিনের জন্য আমাদের কাযের সব ব্যবস্থা গ্লাসগো কর্পোরেশনের কর্ত্তারা পূর্ব্বেই করিয়া রাখিয়াছিলেন—প্রাতরাশের পর বেলা ৯টায় আমাদিগকে বাহির হইতে হইবে।

তাহার পূর্ব্বে আমি একা রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলাম। হোটেল হইতে বাহির হইয়াই একটি বাড়ীতে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। সেটিতে লিখিত ছিল, 'স্কটিশ ফার্ম্মারের' কার্য্যালয়। কৃষি ও কৃষিসম্পর্কিত শিল্পে আমার বিশেষ অনুরাগ আছে; এই অনুরাগ আমাকে সাহিত্যের ক্ষেত্র হইতে একবার গোপালনের কার্য্যেও আকৃষ্ট করিয়াছিল, অভিজ্ঞতার ও অবসরের অভাবে সে কাযে আমি সাফল্যলাভ করিতে পারি নাই। আমি সিঁড়ি দিয়া দ্বিতলে উঠিয়া কার্য্যালয়ের কক্ষে প্রবেশ করিলাম। তখন এক জন মাত্র ভদ্রলোক বসিয়া কায করিতেছিলেন। তাঁহাকে সংবাদপত্রের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি খাতা হইতে মুখ না তুলিয়াই বলিলেন, "এখনও কায আরম্ভ হয় নাই—১০টার পর আসিবেন।" আমি বলিলাম, "তাহা হইলে আমার আর আসা ঘটিবে না।" তিনি মুখ তুলিলেন, আমাকে বিদেশী দেখিয়া বসিতে বলিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি ভারতীয় সংবাদপত্রের সম্পাদক—তাঁহাদের দেশে অতিথি জানিয়া তিনি আমাকে তাঁহাদের কাযের পরিচয় দিলেন। তিনি বলিলেন, তাঁহারা বৎসর বৎসর যে "আলবাম" প্রকাশ করেন, যুদ্ধের জন্য তাহার নিয়মিত প্রচার বন্ধ করিতে হইয়াছে। তিনি সাদরে আমাকে শেষ ২ বৎসরের "আলবাম" ও কয়খানি সংবাদপত্র দিলেন। শেষ বৎসর যে সব ঘোড়া প্রদর্শনীতে পুরস্কার পাইয়াছে, সেগুলির ফটোও তিনি আমাকে উপহার দিলেন। "আলবাম" ২ খানি আমি সযত্নে রক্ষা করিয়াছি। তাহাতে পুরস্কারলাভকারী গো, মেষ ও অশ্বের যে সব প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইয়াছে, সে সব দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, সে দেশের লোক এক দিকে যেমন কলকারখানার উন্নতিসাধনে ব্যস্ত, অপর দিকে তেমনই গবাদি পশুর উন্নতিসাধনে তৎপর। সে দেশে গবাদির উন্নতিসাধনের জন্য অশেষ চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। উৎকৃষ্ট গবীর সহিত উৎকৃষ্ট বৃষের, উৎকৃষ্ট অশ্বীর সহিত উৎকৃষ্ট অশ্বের যৌন সম্মিলন ঘটাইয়া উৎকৃষ্টতর গরু ও ঘোড়া উৎপন্ন করা হয়। এ দেশের কোচিন হইতে মুর্গী লইয়া যাইয়া এইরূপ নির্ব্বাচনফলে যেরূপ উৎকৃষ্ট মুর্গী বিলাতে উৎপন্ন করা হইয়াছে, ভারতে তাহার তুলনা নাই। এক একটি ঘটোধ্নী গবী দেখিলে যেন চক্ষু জুড়ায়। সে দেশের



গবী—পার্ক বাটারকাপ

ভারতবর্ষ হইতেও ষণ্ড লইয়া যায়, তখন বিস্মিত হইয়াছিলাম। কিন্তু বিস্ময়ের কোনই কারণ নাই। এখনও এ দেশ হইতে বিদেশে উৎকৃষ্ট গবী রপ্তানী হয়। আর আমাদের দেশে গো-বংশের অবনতি হয়! এই প্রবন্ধে আমরা ১টি ষণ্ডের ও ১টি ঘোড়ার ছবি দিলাম। ষণ্ডটি আর্জ্জেণ্টাইনে পাঠাইবার জন্য মিষ্টার সেফার্ড ৩৭ হাজার ৫ শত টাকায় ক্রয় করিয়াছিলেন। আর ঘোড়াটি প্রায় সাড়ে ৭ হাজার টাকায় বিক্রীত হয়।

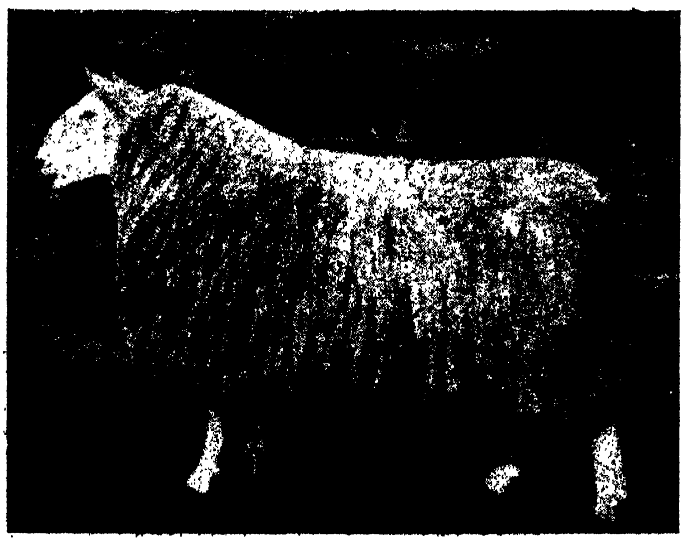
যখন হোটেলে ফিরিলাম, তখনই রাজপথে জনস্রোতঃ—চারিদিকে

একটি গবী যে দুগ্ধ দেয়, বাঙ্গালায় ১০টি গবীর দুগ্ধও ততটা হয় না। "পার্ক বাটারকাপ" নামক যে গবীর চিত্র প্রবন্ধে প্রদত্ত হইল, সেটি ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের রয়াল এগ্রিকালচারাল সোসাইটীর প্রদর্শনীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিল।

উৎকৃষ্ট পশুর দামও আমাদের কল্পনাতীত। এই সঙ্গে "নিউ টাইম" নামক যে ভেড়ার চিত্র দেওয়া হইল, সেটি ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে পশুমেলায় ১ হাজার ৮ শত টাকায় বিক্রীত হইয়াছিল। একটি ভেড়ার দাম ১ হাজার ৮ শত টাকা! যাহারা এত দাম দিয়া ভেড়া কিনে, তাহারাও ব্যবসায়ী। ঐ ভেড়ার দ্বারা ভেড়ার বংশের উন্নতি সাধিত হইবে—লোম অধিক ও উৎকৃষ্টতর হইলেই সে সব ভেড়ারও দাম অধিক হইবে। এ যেন ব্যবসায়ে মূলধন ফেলা—শেষে লাভ হইবে।

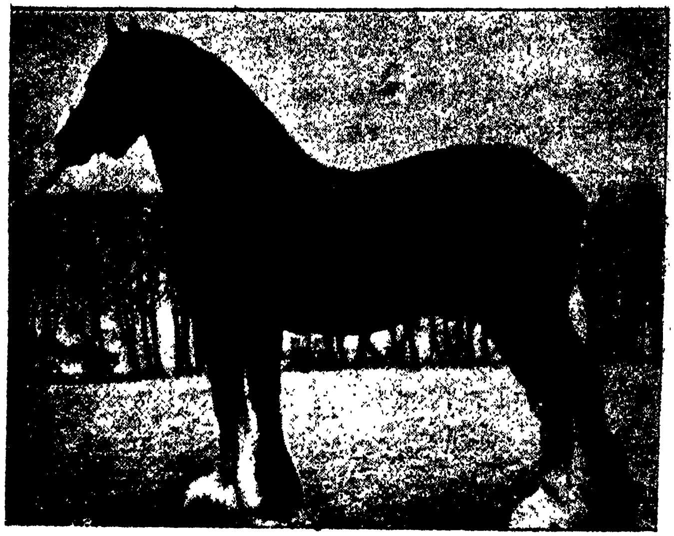
অন্যান্য দেশের লোকও এই সব পশু ক্রয় করিয়া লইয়া যায়। বহুদিন পূর্ব্বে যখন ফরাসী কোবিন্ন টেনের পুস্তকে পাঠ করিয়াছিলাম, বিলাতের লোক

কর্ম্মকোলাহল। বিলাতে গ্লাসগো দ্বিতীয় সহর—লণ্ডনের পরেই ইহার স্থান। ইহার রাজপথ কার্য্যের জন্য ব্যস্তভাবে গতায়াতকারী নরনারীতে পূর্ণ; যাত্রীতে পূর্ণ বৈদ্যুতিক ট্রাম গতায়াত করিতেছে; বন্দরে জাহাজের গতায়াত—মাল বোঝাই করা ও মাল খালাস করা। বন্দরটিও বৃহৎ। বাস্তবিক এই বন্দরেই গ্লাসগোর উন্নতির আরম্ভ। আমেরিকার আবিষ্কার হইতে



"নিউ টাইম"

গ্লাসগোর উন্নতি—বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। গ্লাসগোর প্রাকৃতিক সংস্থানে মার্কিণের সহিত ইহার বাণিজ্যের সুবিধা হয়—মার্কিণ হইতে এই বন্দরে তামাক ও চিনি আমদানী হইতে থাকে এবং আমেরিকা যখন স্বাধীনতার সমরে প্রবৃত্ত হয়, তখন ইংলণ্ডের তামাকের ব্যবসার অর্দ্ধাংশ গ্লাসগো বন্দরে নির্ব্বাহিত হয়। তখন হইতে লোক গ্লাসগো বন্দরে জাহাজে চড়িয়া মার্কিণে যাইতে আরম্ভ করে।



উৎকৃষ্ট অশ্ব

গ্লাসগোর সমৃদ্ধির আর কারণ—ক্লাইড নদী আর কয়লার খনির সান্নিধ্য।

কলিকাতার নিম্নে গঙ্গায় যে সব বড় বড় সাগরগামী জাহাজ নোঙ্গর করিয়া থাকে, সেগুলির অধিকাংশেরই গাত্রে তাহাদের নির্ম্মাণস্থান লিখিত—গ্লাসগো। জাহাজ প্রস্তুত করিবার ব্যবসা গ্লাসগোর সর্ব্বপ্রধান ব্যবসা। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে যখন য়ুরোপের সর্ব্বপ্রথম বাষ্পীয় পোত "কমেট" নদীতে ভাসান হয়, তদবধি ক্লাইড নদীর তীরে বড় বড় জাহাজ নির্ম্মাণের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। নদীতীর সহস্র সহস্র হাতুড়ীর আঘাতশব্দে মুখরিত।



উৎকৃষ্ট ষণ্ড

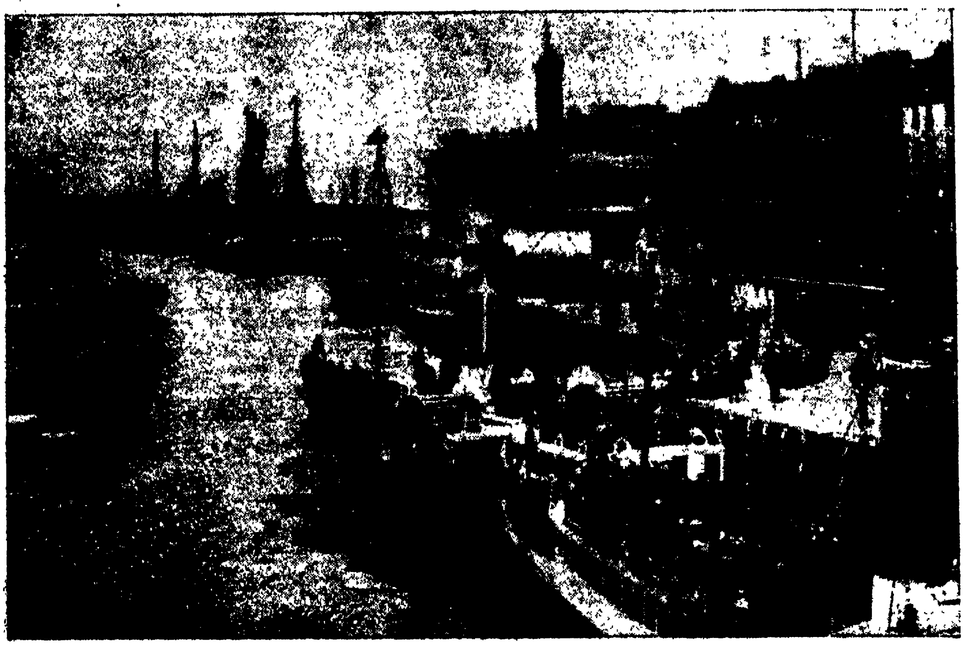
হোটেলে ফিরিয়া প্রাতরাশের পর আমরা এইরূপ একটি কারখানা দেখিতে গেলাম। জন ব্রাউন কোম্পানী আমাদিগকে কারখানা দেখিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন—কারখানা দেখিয়া আমরা তথায় মধ্যাহ্নে আহার করিব।

কারখানায় ঢুকিয়া যেন "দিশাহারা" হইয়া যাইতে হয়। সহস্র সহস্র হাতুড়ীর শব্দে আর কিছুই—পরস্পরের কথোপকথনও শুনিতে পাওয়া যায় না। পরে শুনিয়াছি, এই সব কারখানায় কয় বৎসর কায করিলেই লোক বধির হইয়া যায়। আমরা গ্লাসগোয় যাইব শুনিয়া রয়টারের কর্ম্মকর্ত্তা আমাকে পূর্ব্বাহ্লেই বলিয়া দিয়াছিলেন, তথায় জাহাজের কারখানায় কেহ কাহারও কথা শুনিতে পাইবে না—এমনই ঠকাঠক শব্দ। আসিয়া তাহাই দেখিলাম বটে। কোম্পানীর কর্ত্তারা আমাদিগকে বুঝাইবার জন্য যতই চেষ্টা করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হইতে লাগিল। কেন না, কেহ কাহারও কথা শুনিতে পায় না।

একটি ব্যাপার দেখিয়া বিস্ময় ও

আনন্দ অনুভব করিলাম। কারখানায় অন্য সময় প্রায় ১২ হাজার শ্রমজীবী কায করে; যুদ্ধের জন্য তত লোক খাটিতেছে না বটে, কিন্তু তবুও বাহিনী বিরাট। অথচ তাহাদের কায দেখিয়া লইবার জন্য—তাহাদিগকে তাগাদা দিবার জন্য লোকের প্রয়োজন নাই; যে যাহার কায করিয়া যাইতেছে। আমাদের দেশে কারীগরদিগের তামাক খাইতে, অস্ত্র শাণাইতে, গল্প করিতে যে কত সময় নষ্ট হয়, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। এই সব কারখানায় শ্রমজীবীরা চলিয়া গেলে উপরস্থিত কর্ম্মচারীরা সে দিনের কায মিলাইয়া লইয়া পরদিনের জন্য

যে সব জাহাজ আমরা নৌবহরে দেখিয়া আসিয়াছিলাম, সে সকলের কয়খানি এই কোম্পানীর কারখানায় গঠিত হইয়াছিল। তাহাদের প্রতিকৃতি ও আদর্শ রহিয়াছে। কোন জাহাজ প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বে তাহার ছোট আদর্শ গঠন করা হয়; সেখানিকে জলে ভাসাইয়া দেখা হয়। সেই ছোট্ট আদর্শ কিরূপ শক্ত হইবে—কিরূপ চলিবে—ইত্যাদি হিসাব করিলে বড় জাহাজের প্রকৃত অবস্থা কিরূপ হইবে, বুঝিতে পারা যায়। এই স্থানেই অঙ্কশাস্ত্র—হিসাবের রাজ্য আসিয়া পড়ে এবং কারীগরী বিদ্যা গণিতের নিকট পরাভব



গ্লাসগো বন্দর

কায ঠিক করিয়া কাগজে তাহা আঁকিয়া বা লিখিয়া রাখেন—পরদিন শ্রমজীবী আসিয়া তাহা লইয়া যাইয়া কায করে। কোনরূপ গোলমাল নাই; সব যেন কলে কায চলিতেছে! আমাদের দেশের লোকের এই সব এখনও শিখিবার প্রয়োজন আছে।

দেখিলাম, কারখানার কোন কোন বিভাগে স্ত্রীলোকরাও কায করিতেছে। এই যে স্ত্রীলোকরা যুদ্ধের জন্য এই সব কষ্টসাধ্য কায করিতে আরম্ভ করিল—ইহার পরিণতি কোথায়? সে সমস্যার সমাধানের জন্য সমাজকে এক দিন ব্যস্ত হইতে হইবে।

স্বীকার করে। একটি ছোট্ট আদর্শ জাহাজ লইয়া—চালাইয়া আমাদিগকে সব বুঝাইবার চেষ্টা করা হইল। কিন্তু কলকব্জার কাযে অনভিজ্ঞ আমরা যে বিশেষ কিছু বুঝিতে পারিলাম না, তাহা বলাই বাহুল্য।

ভারতবর্ষে যে সব জাহাজ গতায়াত করে, তাহাদের মধ্যেও অনেকগুলি জন ব্রাউনের এই কারখানায় প্রস্তুত। কারখানার কর্ত্তারা সেরূপ অনেকগুলি জাহাজেরও নাম করিলেন। সেগুলির মধ্যে কয়খানি যুদ্ধের সময় জার্ম্মাণ সাবমেরিণের দ্বারা বিনষ্ট হইয়াছে।

কারখানায় শ্রমিকদিগের বাসের যে ব্যবস্থা আছে,

আমরা তাহাও দেখিলাম। অবশ্য সব শ্রমিকই কারখানার শ্রমিকাবাসে বাস করে না।

জন ব্রাউনের খারখানার মত কারখানা আরও অনেকগুলি গ্লাসগোয় ক্লাইড নদীর তীরে আছে। ইহাতেই বুঝা যাইবে, এই সহরে জাহাজ প্রস্তুত করিবার কারখানা কত এবং সে সব কারখানায় কত দেশের জন্য কত জাহাজ নির্ম্মিত হয়। আমাদের দেশে সে কালে জাহাজ নির্ম্মিত হইত—তখন জাহাজ পালে চলিত। কলকব্জার প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের নৌগঠনশিল্প প্রায় লোপ পাইয়াছে। গ্লাসগোর এই সব বিরাট কারখানা দেখিলে, মনে কেমন হতাশার সঞ্চার হয়; আমাদিগকে নূতন করিয়া এই সব শিল্পের পত্তন করিতে হইবে; তখন আমরা প্রতিযোগিতায় ইহাদিগের সঙ্গে পারিয়া উঠিব ত? পারিবার প্রথম সম্বল—সরকারের সাহায্য। আমাদের বিদেশী সরকার তাহাতে সম্মত হইবেন কি?

কিন্তু হতাশায় অবসন্ন হইলে ত আমাদের আর উপায় থাকিবে না। পথ দুর্গম—কিন্তু সে পথ আমাদিগকে অতিক্রম করিতেই হইবে। সে জন্য চাহি—উদ্যম, আর শিক্ষা করিতে হইবে—ত্যাগ।

জন ব্রাউন কোম্পানীর কারখানায় মাধ্যাহ্নিক আহার শেষ করিয়া আমরা জেপলিনের কারখানা দেখিতে চলিলাম। ইংরাজ জাতিটার একটা বৈশিষ্ট্য, যে জিনিষটা তাহাদের নহে, তাহারা তাহারই নিন্দা করে। জেপলিন জার্ম্মাণ বিমান—বৃহৎ গগনচারী জাহাজ। এই জাহাজে আসিয়া জার্ম্মাণরা বিলাতে বোমা বর্ষণ করিয়া গিয়াছে; অথচ ইংরাজের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়, জেপলিন কোন কাষের নহে—সহজে নষ্ট হয়, হাওয়া বেশী হইলে ঠিক রাখা যায় না—ইত্যাদি। কিন্তু জার্ম্মাণীর অনুকরণে ইংরাজ গ্লাসগোয় জেপলিন প্রস্তুত করিতেছে। এরোপ্লেন জেপলিনের তুলনায় অতি ক্ষুদ্র।

এক একখানা জেপলিনে শত শত অংশ একত্র করা—সে সব জুড়িয়া একখানি বৃহৎ হাওয়া-জাহাজ হয়। এই কারখানায় তাহাই হইতেছে। অধিকাংশ কারিগরই স্ত্রীলোক। কাযটা বিশেষ শ্রমসাধ্য বা শক্তিসাধ্য নহে বুঝিয়া এ কাযে স্ত্রীলোকরাই নিযুক্ত হইয়াছে। শত শত স্ত্রীলোক ছাটা আঁটা পোষাক পরিয়া কায করিতেছে। স্ত্রীলোকদিগের একটু বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাদের মুখে হাসি—কাযে যেন আনন্দ আছে।

আমরা ফিরিবার সময় একটি দৃশ্য দেখিয়া বিরক্ত হইলাম। একটি ঘরে কতকগুলি স্ত্রীলোক কায করিতেছিল; আমাদের মোটর গাড়ীর দিকে চাহিয়া তাহারা পরস্পরকে বিদ্রূপ করিয়া হাসিতে লাগিল। আমাদের সঙ্গী ইংরাজরাও তাহার প্রতিদানে কার্পণ্য করিলেন না—তাঁহারা রুমাল দুলাইলেন; মেয়েরা শেষে আপনাদের হাত তুলিয়া করতল চুম্বন করিয়া হাসাহাসি করিতে লাগিল। ভারতভৃত্য সমিতির মিষ্টার দেবধর ইংরাজের কোন দোষ দেখিতে পায়েন না; স্ত্রীলোকগুলির এই নির্লজ্জ ব্যবহারও তিনি—"নির্দ্দোষ কৌতুক" বলিয়া অভিহিত করিলেন! তিনি কাহাকে "সদোষ" মনে করেন, তাহা আমরা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না—এমনই তাঁহার ইংরাজপ্রীতি।*

জেপলিনের কারখানা দেখিয়া আমরা জর্জ্জ টাউন দেখিতে গেলাম। গ্লাসগোর উপকণ্ঠে একটা জলার জলনিকাশ করিয়া তথায় বিরাট কারখানা স্থাপিত হইয়াছে—নাম, জর্জ্জ টাউন। এই কারখানায় সেলের মধ্যে বিস্ফোরক পূর্ণ করা হয়। কাযটা যে কিরূপ বিপজ্জনক, তাহা সহজেই অনুমেয়—অতি সামান্য ঘর্ষণে বা অগ্নিস্ফুলিঙ্গপাতে সমগ্র কারখানাটি উড়িয়া যাইতে পারে। সহরটির নামকরণ কি রাজার নামে করা হইয়াছে?—দেবধর এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে কারখানার এক জন প্রধান কর্ম্মচারী বলিয়াছিলেন—"না, এখন অপর জর্জ্জেরই প্রাধান্য"—(It is the other George that counts) অপর জর্জ্জ—প্রধান মন্ত্রী লয়েড জর্জ্জ। তখন তিনি ইংলণ্ডে ত্রাতা বলিয়া প্রায় পূজিত।

কারখানা হইতে প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূরে প্রবেশের প্রধান দ্বার। সেই দ্বারে প্রহরী আমাদের মোটর গাড়ী থামাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দেশলাই আছে?" যাহাদের কাছে দেশলাই ছিল, তাঁহাদিগকে তাহা জমিয় করিয়া দিতে হইল। তখন গাড়ী আবার অগ্রসর হইল। আমরা অবতরণ করিবার পূর্ব্বেই আমাদের জুতার উপর রবারের ওয়াড় বা উপর-জুতা পরাইয়া দেওয়া হইল।

কারণ, জুতার তলস্থ ক্ষুদ্রকায় পেরেকের ঘর্ষণেও বিস্ফোরক জ্বলিয়া সর্ব্বনাশ হইতে পারে।

এই বিপজ্জনক কাষ যাহারা করিতেছে, তাহাদের অধিকাংশই যুবতী। মোট প্রায় ১৫ হাজার লোকের মধ্যে ১৩ হাজার যুবতী। আমি যখন বিলাতে যাই, তখন মিষ্টার (এখন সার জন) কার বাঙ্গালা সরকারের চীফ সেক্রেটারী। তাঁহার ভগিনী এই কারখানায় তত্ত্বাবধানকারিণীদিগের অন্যতম। আমি কলিকাতা হইতে আসিয়াছি জানিয়া চা-পানের সময় তিনি আমার পার্শ্বে আসিয়া বসিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট অবগত হই, এই ১৩ হাজার যুবতীর মধ্যে অন্ততঃ ৭ হাজার গ্লাসগোর ভদ্রপরিবারের দুহিতা—ইতঃপূর্ব্বে কখন উদরান্ন সংস্থানের জন্য কায়িক শ্রম করে নাই। সে কায যে করিতে আসিয়াছে, সে কেবল অর্থার্জ্জনের জন্য নহে; তাহার মধ্যে দেশের কাষ করিবার উৎসাহও আছে। এই যে দেশাত্মবোধ, ইহা স্বাধীন জাতির পক্ষে স্বাভাবিক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দেশ আমার—দেশের মান-সম্ভ্রম রক্ষা করা আমার কর্ত্তব্য—এই যে বোধ, ইহা স্বাধীনতার অবশ্যম্ভাবী ফল।

এই দেশাত্মবোধের উত্তেজনায় ইংলণ্ডের নারীরা যে কাষ করিতেছে, তাহা সত্য সত্যই বিস্ময়কর—আমাদের মত বিজিত জাতির পক্ষে বুঝি কল্পনাতীত। বাল্যকালে কবিতায় পাঠ করিয়াছিলাম, দেশের জন্য লোক অনেক ত্যাগস্বীকার করিতে পারে—

"সুকেশিনী শিরঃশোভা কেশের ছেদনে
ক্ষুব্ধা নহে যদি তাহে হয় উপকার।"

কিন্তু সে যে সময়ের ঘটনা—তখন দেশাত্মবোধ দেশ হইতে দূর হয় নাই; তখনও দেশের নরনারী স্বাধীনতার উপাসক ছিল।

যে সব স্ত্রীলোক এই কারখানায় কাষ করিতেছে, তাহাদের পায় রবারের উপর-জুতা, হাতে রবারের দস্তানা, পোষাকের উপর আস্তরণ, মুখের উপর পাতলা কাপড়ের অবগুণ্ঠন—বিস্ফোরকের বিষাক্ত বাষ্পে বর্ণ বিকৃত—হরিদ্রাভ হয়। অনেকেরই তাহা হইয়াছে। এই বিকৃতির কখন অবসান হইবে কি না, সন্দেহ। যে দেশে রূপ নারীর সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান সম্বল—যে দেশে রূপবর্দ্ধন ও রূপের প্রসাধন জন্য যুবতীরা বহুবিধ ক্লেশ স্বীকার করে, সে দেশে স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে "রূপহরণ" এই কাষে প্রবৃত্ত হওয়া কত বড় ত্যাগ, তাহা সহজেই অনুমেয়। অথচ এই সব যুবতী সে দিকে দৃক্পাতও করিতেছে না। তাহারা সানন্দে তাহাদের কাষ করিতেছে। বিপদের কল্পনা যেন তাহাদিগের হৃদয় স্পর্শ করিতে পারিতেছে না। মিষ্টার আয়াঙ্গারের পাগড়ী দেখিয়া তাহারা হাসি যেন আর চাপিতে পারিতেছিল না। তাহাদের একখানি নিজস্ব মাসিকপত্রও প্রকাশিত হয়।

গ্লাসগো হইতে ইহাদের গতায়াতের জন্য প্রত্যহ ১১খানি স্পেশাল ট্রেণ গতায়াত করে।

মিষ্টার কারের ভগিনীর সহিত কথোপকথনের সময় আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এই যে প্রায় ৭ হাজার যুবতী—এই ভাবে কায়িক শ্রম করিয়া অর্থার্জ্জনে অভ্যস্ত হইল, ইহাতে কি সমাজে কোনরূপ বিপর্য্যয়-সম্ভাবনা নাই?" তিনি বলিলেন, "আছে। ইহারা প্রতি সপ্তাহে যথেচ্ছা ব্যবহার করিবার জন্য (to sport with) ৩০।৪৫ টাকা পাইতেছে। ইহার পর ইহারা যে স্বাধীনতাপ্রিয় হইবে—হয় ত বা অভিভাবকদিগের আর ততটা বশ্যতা স্বীকার করিতে চাহিবে না—এমন সম্ভাবনা অবশ্যই আছে। কিন্তু সে পরের কথা।" সত্যই "সে পরের কথা"—এখন কথা, দেশ রক্ষা করা। সেই কাষেই সকলে আত্মনিয়োগ করিয়াছে। তাহাতে যুবতীরা যে ভার লইয়াছে, উপরে আমরা তাহারই পরিচয় প্রদান করিলাম। সে ভার বড় সাধারণ নহে; তাহাদের ত্যাগপুণ্যে যে জাতির পরম কল্যাণ সাধিত হইবে এবং তাহাদের এই দেশাত্মবোধ যে ইংরাজ জাতির অমূল্য সম্পদ, তাহাতে কি সন্দেহ আছে?

সেই কথা মনে করিতে করিতে হোটেলে ফিরিয়া আসিলাম এবং আসিয়া দেখিলাম, আমার এক বন্ধুপুত্র আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। তিনি তখন গ্লাসগোর রেলে কাষ শিখিতেছিলেন; পিতার নির্দ্দেশে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। বিদেশে তাঁহাকে পাইয়া পরম আনন্দ অনুভব করিলাম। শ্রীমান্ উপেন্দ্র এখন পূর্ব্ববঙ্গ রেলওয়েতে চাকরী করিতেছেন—সে বিভাগে তিনিই প্রথম ভারতীয় চাকুরীয়া।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।



সঙ্গীতের প্রভাব

১

শেষকালে দোজবর!

ক্ষোভে, দুঃখে, ঘৃণায়, অভিমানে এক একবার আত্মহত্যার ইচ্ছা মনে জাগিয়া উঠিতে লাগিল। আমার স্নেহময়, হৃদয়বান্ পিতা—যিনি চিরদিন এমন অশোভন সম্মিলনের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া আসিয়াছেন, তিনি নিজেই শেষে এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন? এ দুঃখ কাহার কাছে নিবেদন করিব? কে তবে আর আমার হৃদয়ের এই নিদারুণ ব্যথা বুঝিবে?

আমরা ধনীর, ঐশ্বর্য্যবিলাসীর সন্তান না হইলেও আমাদের বংশমর্য্যাদা, আভিজাত্য ও সামাজিক সম্মান কম ছিল না। বাবা লাট-দপ্তরের কেরাণী হইলেও দারিদ্র্যদুঃখ কাহাকে বলে, তাহা আমরা জানিতাম না। সংসারে প্রাচুর্য্য না থাকিলেও অভাব ছিল না। বাবা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র, সুপণ্ডিত। মা ও বাবা বিশেষ যত্নেই আমাদের চারি ভাই-ভগিনীকে লালন-পালন করিয়া আসিয়াছেন। মা আমার নিপুণা গৃহিণী ছিলেন, তাঁহার কাছে এ বিষয় আমরা ভাল শিক্ষাই পাইয়াছিলাম। বাবা অত্যন্ত বিদ্যানুরাগী—তিনি যত্ন করিয়া বাড়ীতে মাষ্টার রাখিয়া আমাদিগকে লিখাপড়া শিখাইয়াছিলেন, নিজেও শিক্ষা দিতেন। বিদ্যার প্রতি অনুরাগ, ললিতকলার প্রতি আসক্তি আমাদের বংশানুগত। সুতরাং আমরা সুশিক্ষাই পাইয়াছিলাম। আমরা কখনও স্কুলে যাই নাই—বাবা যাইতে দিতেন না; শুধু ছোট ভাইটি স্কুলে পড়িত।

অবস্থার অতিরিক্ত ব্যয় করিয়া বাবা আমার দুই দিদিকে ভাল ঘর ও বরে অর্পণ করিয়াছিলেন। তাহারা পরম সুখে শ্বশুরঘর করিতেছিল। আমি শেষ কন্যা; তাই বাবা আমাকে অপেক্ষাকৃত বড় করিয়া ঘরে রাখিয়াছিলেন। মনোমত সুপাত্র মিলিতেছিল না। তিনিও সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, সুপাত্র না পাওয়া গেলে বিবাহ দিবেন না। শুনিয়াছি, এই বাছাবাছির হিড়িকে বহু পাত্রকেই তিনি প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন।

তবে অবশেষে আমার জন্য দ্বিতীয় পক্ষের পাত্র মনোনীত করিলেন কি করিয়া? কত দিন গল্পচ্ছলে বাবা আমাদের কাছে বলিয়াছিলেন, বিবাহ একবারই হয়—নারী অথবা পুরুষ কাহারও পক্ষে দুইবার বিবাহ সঙ্গত নহে। মানবসমাজে এরূপ বিবাহপ্রথা প্রচলিত থাকিলেও দুইবার বিবাহ ব্যভিচারের নামান্তর মাত্র। বাবার কথা আমাদের কাছে বেদবাণীবৎ সত্য বলিয়া মানিতে হইত। সেই তিনি তাঁহার কন্যার জন্য দ্বিতীয় পক্ষের পাত্রকে কিরূপে নির্ব্বাচিত করিলেন?

শয্যায় শয়ন করিয়া দুঃখে, ক্ষোভে, শোকে বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। পিতা-মাতার আদর্শ ও শিক্ষার প্রভাবে অন্যায়কে, মন্দকে ঘৃণা করিতে শিখিয়াছিলাম। সংস্কারের প্রভাবে এইরূপ সম্মিলনকে আমি অবৈধ বলিয়া বিশ্বাস করিতাম, তাই আজ নিদারুণ ঘৃণা ও ব্যথায় অন্তর টন্‌টন্ করিতে লাগিল।

কিন্তু আকারে প্রকারে বা ব্যবহারে আমার প্রাণের এই গোপন ব্যথার সংবাদ কেহ জানিতেও পারিল না। ইহাও পিতামাতার শিক্ষার ফল। গুরুজনের প্রতি অশ্রদ্ধা অথবা অবিনয় প্রদর্শন করা কত গুরু অপরাধ, তাহা জানিতাম। ঔদ্ধত্য এবং মানুষের মুখের উপর অপ্রিয় সত্য কথা বলা যে নারীর পক্ষে আদৌ শোভন নহে, তাহা বিশ্বাস করিতাম। সমস্ত জীবনে আমরা এইরূপ শিক্ষাই পাইয়া আসিয়াছি। তাই বুক ফাটিয়া গেলেও প্রতিবাদের একটি শব্দও আমার মুখ হইতে

বাহির হয় নাই। সযত্নে মনের অবস্থাকে আমি লোক-চক্ষুর অন্তরালে রাখিয়াছিলাম। শুধু গভীর দুঃখ ও অভিমানে বুকের মধ্যে মেঘ জমিয়া উঠিতেছিল। নিশীথের অন্ধকারে, শয্যায় শয়ন করিয়া আর আপনাকে সংবরণ করিতে পারিলাম না।

সাহিত্যের ভিতর দিয়া নূতন সম্প্রদায়ের দামামার ধ্বনি বাঙ্গালার সমাজবক্ষে ধ্বংসের সংবাদ বহন করিয়া আনিতেছিল, সে সংবাদ আমাদের অগোচর ছিল না। আমরা আধুনিক সাহিত্যের পোকা ছিলাম। বাবা প্রায়ই বলিতেন যে, এ সকল সমস্যা বস্তুতন্ত্রহীন—ভারতীয় প্রকৃতিতে ইহার সামঞ্জস্যের অভাব দেখা যায়। নবতন্ত্রের পুরোহিতরা খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া বল-পূর্ব্বক পাশ্চাত্য ভাবের পঙ্কিল প্রবাহধারাকে ভাগী-রথীর পুণ্য সলিলে মিশাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছেন মাত্র। বাবার এই ধারণা যে কিরূপ সত্য এবং দৃঢ়, তাহা আমরা জানিতাম। আমিও কায়মনোবাক্যে বাবার কথা বিশ্বাস করিতাম। কিন্তু বিদ্রোহের উত্তে-জনার প্রভাবকে সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করিতে পারি নাই। নবতন্ত্রোক্ত মতবাদকে ঘৃণা করিতাম, মনোরম ও লোভনীয় বলিয়া বিষবৎ পরিত্যজ্য মনে করিতাম; কিন্তু সত্য বলিতে কি, আকাশে বাতাসে বিদ্রোহের জয়ধ্বনি মাতালের মত ফিরিতেছিল, তাহার প্রভাব সম্পূর্ণরূপে জয় করা অসম্ভব।

সারা দিনের পরিশ্রমের পর মা পার্শ্বে শুইয়া অঘোরে ঘুমাইতেছিলেন। আমার নয়ন বিনিদ্র। বোধ হয়, মানসিক যন্ত্রণার আতিশয্যে আমি কোনও রূপ শব্দ করিয়া থাকিব। অন্য শয্যায় বাবা ও বীরেন্দ্র। সম্ভবতঃ বাবা তখনও ঘুমান নাই। তিনি ডাকিলেন, "মিনু মা! কি হয়েছে রে?"

বুঝিলাম, আমার মানসিক চাঞ্চল্য, রাত্রির অন্ধ-কারে সাবধানতার সীমা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। না, বাবাকে আমার বুকের ব্যথার সংবাদ দিব না। অনেক দুঃখের পর আমার যোগ্য পাত্র পাইয়াছেন ভাবিয়া আজ তাঁহার মুখে প্রসন্নতার স্নিগ্ধ ছবি দেখিয়াছি। তিনি যেন আজ নিশ্চিন্ত, এমন কথা মা'কে বহুবার বলিয়াছেন। তাঁহার সে তৃপ্তি দেখিয়া মন অভিভূত হয়। না, কোনও মতেই আমি তাঁহার হৃদয়ে নৈরা-শ্যের অন্ধকার জাগাইয়া তুলিতে পারিব না। নিজেই জ্বলিয়া-পুড়িয়া মরিব—উহাই বিধিলিপি! বাবাকে কষ্ট দিতে পারিব না।

মুহূর্ত্তমধ্যে ইন্দ্রিয়গণকে আয়ত্ত করিয়া ফেলিলাম; মৃদুস্বরে বলিলাম, "কিছু হয়নি ত বাবা!"

আলোক জ্বালিয়া বাবা উঠিয়া আসিলেন; আমার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "ঘুম হচ্ছে না, মা?"

বাবার কণ্ঠস্বরে উৎকণ্ঠা যেন ঝরিয়া পড়িতেছিল। আমি সহজকণ্ঠে বলিলাম, "এখনই ঘুম আস্‌বে। আপনি ঘুমিয়ে পড়ুন, নইলে অসুখ করবে, বাবা।"

বাবা কয়েক মুহূর্ত্ত স্নেহদৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মিনু মা, তুই যেন তোর বাবাকে ভুল বুঝিস্ নে! তোর সুখের জন্যই আমি এই বিয়ে ঠিক করেছি। আমি আশীর্ব্বাদ করি, এতে তোর সব দিকেই ভাল হবে।"

বাবা কি কিছু বুঝিয়াছেন?—বুক ফাটিয়া বিশ্ব-জোড়া কান্নার সুর যেন বাহির হইতে চাহিল। দৃঢ় বলে আত্মসংবরণ করিয়া বলিলাম, "আপনি ঘুমুন, বাবা। একটু বাতাস দেব?"

"কোন দরকার নেই, মা।"

বাবা শয্যার দিকে ফিরিয়া গেলেন।

২

বাড়ীতে বিবাহের উৎসব জাগিয়া উঠিয়াছিল। আমার সহস্র কল্পিত, অমূর্ত্ত বাধা-বিঘ্নকে বিদ্রূপ ও ব্যর্থ করিয়া নিরূপিত দিন ও লগ্ন আসিয়া উপস্থিত হইল। আত্মীয়-স্বজন, পিতা, মাতা সকলেরই মুখে আনন্দের হাসি ধরিতেছিল না। শুধু আমিই মনে মনে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছিলাম। দ্বিতীয় পক্ষের পত্নী হওয়া কত বড় দুর্ভাগ্যের ফল, তাহা যাহার না হইয়াছে, সে কেমন করিয়া বুঝিবে?

শুনিয়াছিলাম, আমার দাদা—পিসীমা'র ছেলেই এই বিবাহের ঘটক। আমাদের জ্যেষ্ঠ সহোদর ছিলেন না; তিনিই আমাদের সে অভাব পূর্ণ করিয়াছিলেন। আমার কৌমার্য্যকে বিদায় দিয়া, সীমন্তে নারীজাতির

আশীর্ব্বাদরেখা আঁকিয়া দিবার জন্য যিনি আসিতেছেন, তাঁহার সহিত দাদার নাকি প্রগাঢ় বন্ধুত্ব এবং উভয়ে একত্র একই স্কুল-কলেজে পড়িয়াছিলেন। দাদা কলেজের অধ্যাপক হইয়াছিলেন; সংপ্রতি একটা বড় পরীক্ষা দিবার জন্য বিলাতে গিয়াছেন। সেখান হইতে তিনি নাকি বাবাকে এই পাত্রে আমাকে সমর্পণ করিবার জন্য লিখিয়াছিলেন। দাদার বন্ধুটি পাঁচ বৎসর বিপত্নীক—বিবাহের ইচ্ছা ছিল না। অবশেষে মত হইয়াছে। তিনি আমাকে দেখিতেও আসেন নাই। আমার ফটো দেখিয়া নাকি মত দিয়াছিলেন। শুধু লৌকিক প্রথা বজায় রাখিবার জন্য তাঁহার দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় ও বন্ধুরা পাকা দেখিয়া গিয়াছিলেন। সংসারে তাঁহার আপনার বলিবার কেহ নাকি নাই—পিতা, মাতা, ভাই-ভগিনী বহুদিন মৃত। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উচ্চশিক্ষা পাইয়া পৈতৃক কয়লার ব্যবসায় ও খনির কার্য্য লইয়া আছেন। পাহাড় অঞ্চলে খনির কাছেই পৈতৃক বাড়ীও বিদ্যমান, সেইখানেই অধিকাংশ কাল থাকেন। কলিকাতাতেও বাড়ী আছে, কিন্তু সেটা প্রায় ভাড়া দেওয়াই থাকে। বাড়ীতে আত্মীয়স্বজনের মধ্যে তাঁহার সম্বন্ধে যে আলোচনা হইত, তাহা হইতে এই সকল সংবাদ আমার কানে গিয়াছিল। প্রচুর অর্থের তিনি মালিক। পৃথিবীতে যাহা সকল প্রকার সুখ ও আরামের শ্রেষ্ঠ উপাদান, সেই অর্থ নাকি ভগবান্ তাঁহাকে মুক্তহস্তে দান করিয়াছেন।

কিন্তু আমার মন ইহাতে অভিভূত হয় নাই। অর্থের প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু তাহা ত চরম লক্ষ্য নহে। আমার এই তরুণ হৃদয়ে কত আশা, কত আকাঙ্ক্ষা, অর্থ কি সার্থক করিয়া তুলিতে পারে? যে পুরুষ একবার অন্য নারীকে হৃদয় দান করিয়াছে, ভালবাসিয়াছে, সে কি করিয়া পুনরায় অপর আর এক জন নারীকে ভালবাসিতে পারে? নারীহৃদয় দিয়া এইরূপ অসম্ভব ব্যাপারের মীমাংসা করিতে পারি নাই। তাই অনুক্ষণ আমার হৃদয় ঘৃণায় ও কুণ্ঠায় শিহরিয়া উঠিতেছিল।

যাহা অনিবার্য্য, অল্পক্ষণ পরে চিরজীবনের জন্য যে অবস্থার বন্ধনে শৃঙ্খলিত হইয়া পড়িব, সে সম্বন্ধে ক্ষুব্ধ হওয়া উচিত নহে বুঝিতেছিলাম, কিন্তু মনকে কোন মতেই আয়ত্ত করিতে পারিতেছিলাম না।

জ্যোৎস্নাময়ী ফাল্গুনের রাত্রিকে নহবতের মধুর রাগিণী অভিনন্দিত করিতেছিল। কিন্তু আমার যেন বোধ হইতেছিল, ইহা আনন্দের উচ্ছ্বাস নহে, আমার হৃদয়ের—শোকপূর্ণ অন্তরের ক্রন্দননির্ঝর বাধাবন্ধন চূর্ণ করিয়া রাগিণীর সুরে সুরে ছুটিয়া বাহির হইতেছে। ছেলেবেলা হইতেই আমি সঙ্গীতের একান্ত অনুরাগিণী। যত্ন করিয়া গান-বাজনাও শিখিয়াছিলাম। আত্মীয়স্বজন একবাক্যে প্রশংসা করিয়া বলিতেন, আমার মত সুকণ্ঠ গায়িকা সাধারণতঃ দেখা যায় না। সেটা হয় ত আত্মীয়স্বজনের অতিশয়োক্তি হইতে পারে; কিন্তু গান যে আমাকে সহজেই পাগল করিয়া তুলিত, তাহা মিথ্যা নহে। তবু আজ নহবতের সুরে যেন বিষ মাখান ছিল!

আনন্দকোলাহল ও চীৎকারের মধ্যে আমি বিবাহ-সভায় নীত হইলাম। আমার হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া তখন কিরূপ চলিতেছিল, তাহা জানি না। তবে আমি যে স্বপ্নাবিষ্টার মত, স্থাণুর মত বসিয়া ছিলাম—আমার হাত-পা নাড়িবার, এমন কি, চিন্তা করিবারও শক্তি পর্য্যন্ত ছিল না, তাহা অতিরঞ্জন নহে।

সম্প্রদান হইয়া গেল। অদৃষ্ট আর ফিরিবে না।

শুভদৃষ্টির সময় আমার নয়নযুগলে কে যেন সীসা ঢালিয়া দিয়াছিল। তখন ঘৃণা, সঙ্কোচ অথবা লজ্জা—কিছুই বোধ করিতেছিলাম না। শুধু যেন ঘোর নৈরাশ্যের বোঝা বুকের উপর চাপিয়া বসিয়াছে। কাহার তুষারশীতল হস্তের স্পর্শে যেন সমস্ত ইন্দ্রিয় আবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল।

চারিদিক হইতে অনুরোধ-উপরোধের তাড়া সত্ত্বেও আমি চাহিতে পারিতেছিলাম না। অবশেষে পার্শ্ব হইতে বাবার কণ্ঠস্বর শুনিলাম, "চোখ চাও, মা, চাইতে হয়।" তখন যেন আর নিশ্চল থাকিতে পারিলাম না। আমার আদর্শদেবতা বাবার আদেশ—পালন করিতেই হইবে।

কিন্তু সম্মুখে টোপরের উপর দৃষ্টি পড়িয়াই আবার

গলদেশে এক ছড়া মালা আসিয়া পড়িল। আমার হাত ধরিয়া কেহ আমার শিথিল হাতের মালা তাঁহার গলায় পরাইয়া দিল। পবিত্রতম শ্রেষ্ঠ বন্ধনের মূল্য এতই তুচ্ছ! এত বড় প্রহসন শুধু আমাদেরই মত হতভাগীদিগকে লইয়াই বুঝি রচিত হইয়া থাকে!

পরক্ষণেই মনে হইল, ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, যাহা স্বীকার করিয়া লইলাম, তাহাকে সর্ব্বান্তঃকরণে মানিয়া না চলিলে গুরু অপরাধই হইবে। সুতরাং মনের এ অবস্থাকে—প্রবৃত্তিকে দমন করিতে হইবে। ভারতবর্ষের পবিত্র ভাবধারা, চিরন্তন পদ্ধতি ও আদর্শকে মনের মন্দিরে স্থাপন করিতে হইবে।

বাসরঘরে আত্মীয়পরিজনের অসম্ভব ভীড়। বরকে লইয়া সকলেই হাস্য-পরিহাসে আসর জমাইতে ব্যস্ত। তাঁহাকে গান গাহিবার জন্য তরুণীদিগের পক্ষ হইতে প্রচণ্ড অনুরোধ চলিতে লাগিল। অবগুণ্ঠনের অন্তরালে আমি ঘামিয়া উঠিতে লাগিলাম।

বড়দিদি ও মেজদিদি গান গাহিবার জন্য তাঁহাকে খুবই পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। কিন্তু তিনি গান গাহিলেন না; জানাইলেন, তাঁহার সামর্থ্যে কুলাইবে না।

এক জন বলিয়া উঠিল,"আমাদের মিনু বড় গাইয়ে। বর একেবারে ও রসে বঞ্চিত, এটা ত ঠিক হ'ল না!"

কোন্‌টাই বা ঠিক হইয়াছিল?

অনেকের অনুরোধে আমার বড়দিদি হারমোনিয়ম বাজাইয়া গান ধরিল। সে-ও চমৎকার গাহিতে পারিত। গান আরম্ভ হইলেই তিনি সহসা উঠিয়া একটা কাযের অজুহতে বহির্ব্বাটীতে চলিয়া গেলেন; কাহারও অনুরোধ কানে তুলিলেন না। মিষ্ট দৃঢ়তার সহিত সকল আপত্তির খণ্ডন করিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। এ ব্যাপারটা কাহাকেও আঘাত করিল কি না, জানি না, কিন্তু আমার হৃদয়ে যেন ব্যথাটা টন্‌ টন্‌ করিয়া উঠিল। উনি গানেরও ভক্ত নহেন! চেষ্টা করিয়া মনটাকে অনুকূল পথে চালাইবার উপক্রম করিতেছিলাম, সহসা তাহাতে বিষম ধাক্কা লাগিল। যে গান ভালবাসে না, আমি তাহাকে ভক্তি করিতে পারি না।

গান থামিবার পর তিনি ফিরিয়া আসিলেন।

৩

সংসারচক্রের রথ ঘর্ঘর শব্দে দ্রুত চলিতেছিল। আমার বিবাহিত জীবনের দিনগুলিও কোথাও থমকিয়া দাঁড়ায় নাই। কাহারই বা দাঁড়ায়? বিবাহের অনুষ্ঠান শেষ হইয়া গেলে স্বামী কর্ম্মস্থলে চলিয়া গিয়াছিলেন। সকলেই ভাবিয়াছিল, তিনি আমাকেও সঙ্গে লইয়া যাইবেন। সেটা আদৌ অসঙ্গত হইত না। কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। এ জন্য আমি সত্যই একটা স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিয়াছিলাম।

কিন্তু আমার দুঃখটা কি? বাস্তবিক দুঃখ করিবার কিছু আছে কি?—আমার স্বামী রূপবান্, অনতিক্রান্ত-যৌবন, সুশিক্ষিত, সুস্থ, সবল এবং প্রচুর ঐশ্বর্য্যশালী। শুনিয়াছি, তাঁহার পরিচিত সকলেই তাঁহার গুণমুগ্ধ। তবে আমার দুঃখ ও ক্ষোভের কারণ কি?

সত্যই, শুধু ভাবপ্রবণতার দিক দিয়াই আমি নিজেকে মহা দুঃখী ভাবিয়াছিলাম। আমার হৃদয় অনাস্বাদিত প্রেমের ধ্যানে মগ্ন হইতে চাহিতেছিল। কিন্তু যাঁহার সহিত বিবাহ হইল, তাঁহাতে কি প্রেম আছে? তিনি ত রিক্তসর্ব্বস্ব। তাঁহার যাহা কিছু ছিল, সবই ত প্রথমা পত্নীকে দান করিয়াছেন, সুতরাং তিনি আমাকে কিছুই দিতে পারেন না। দিতেই যখন অশক্ত, তখন তাঁহার বিবাহ করা উচিত হয় নাই। এইরূপ ধারণা আমার মনে দৃঢ় হইয়া গিয়াছিল। তাই তাঁহাকে আমি শ্রদ্ধা করিতে পারিতেছিলাম না। কিন্তু সেটা যে আমার অপরাধ, তাহাও ভুলিতে পারি নাই। যে দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, যাহার আকাশ বাতাস সাধ্বী নারীর নিশ্বাসে সুপবিত্র, হিন্দুনারীর আদর্শ জীবনযাত্রার লক্ষ লক্ষ দৃষ্টান্ত যে দেশের ইতিহাসে, পুরাণে এবং সাধারণ ক্ষেত্রেও দেখিতে পাওয়া যায়, সেই দেশের নারী হইয়া আদর্শচ্যুত হওয়া ত বাঞ্ছনীয় নহে।

কিন্তু তথাপি মনকে ফিরাইতে পারিতেছিলাম না। কারণ, আমার মনে তাঁহার সম্বন্ধে একটা ধারণা দিন দিন দৃঢ় হইতেছিল—তাঁহাতে হৃদয় নামক পদার্থের অভাব! কোনও বিষয়ে তাঁহাকে একবারও উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিতে দেখি নাই। তিনি মিষ্টভাষী,



সেতার-শিক্ষা

শান্তস্বভাব, বিনয়ী, সে বিষয়ে মতভেদ হইবে না ; কিন্তু সংসারের প্রত্যেক বিষয়ে মানুষ যদি ওজন করিয়া চলে, তবে কি মনে হয় না, তাহাতে যথার্থ প্রাণ-স্পন্দনের অভাব আছে? শুনিয়াছি, পুরুষ দ্বিতীয় পক্ষের পত্নীর মনোরঞ্জনের জন্য নানাভাবে অভিনয় করিয়া থাকে, কিন্তু আমি ত তাহার কোনও পরিচয় পাইলাম না। অবশ্য তেমন নাটকীয় অভিনয় আমার পক্ষে সহ্য করা কঠিন হইত।

বাবা ও মা'র উপদেশবাণী, চিরাচরিত সংস্কার আমাকে সর্ব্বদা স্মরণ করাইয়া দিত যে, আমার এরূপ মানসিক অবস্থা সমাজ ও সংসারের পক্ষে কল্যাণকর নহে—মনটাকে নিশ্চয়ই মোড় বাঁকাইয়া ফিরাইতে হইবে। অবশ্য স্ত্রীর যাহা সাধারণ কর্ত্তব্য, কলের পুতুলের মত সেগুলি আমি পালন করিয়া যাইতাম। বাহিরের দিক হইতে সে বিষয়ে কেহ আমার অপরাধ লইতে পারিত না।

তিনি মাঝে মাঝে কলিকাতায় আসিতেন। কিন্তু সর্ব্বদাই যেন কাযে ব্যস্ত। আমি এমন দিন দেখিলাম না যে, তিনি দুই দণ্ড বসিয়া কাহারও সহিত আলাপ করিতেছেন। কলিকাতায় নিজের বাড়ী ছিল, সেখানে তিনি থাকিতেন না, আমাদের এখানেই উঠিতেন। যে দুই চারি দিন থাকিতেন, বাহিরে বাহিরেই অধিকাংশ সময় কাটাইতেন, আহার ও শয়নের সময় শুধু দেখা পাইতাম। এত যাঁহার কায, তাঁহার পক্ষে পুনরায় বিবাহ কি সঙ্গত হইয়াছে?

আমার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় ধরাবাঁধা—নিক্তির ওজনেই হইয়াছিল। প্রয়োজনীয় কথা ছাড়া অন্য প্রসঙ্গের আলোচনা করিতে আমি কখনও তাঁহাকে দেখি নাই। তাঁহার প্রাণে সৌন্দর্য্যস্পৃহা, রসানুভূতি আছে, ইহা আমি বিশ্বাস করিতে পারিতাম না। তিনি আমাকে প্রচুর বস্ত্রালঙ্কার দিয়াছিলেন। যখনই কলিকাতায় আসিতেন, কোন না কোন নূতন বস্ত্র বা অলঙ্কার আনিয়া দিতেন, এ সকল বিষয়ে অভিযোগের কিছু ছিল না। কিন্তু আমার বেশভূষার দিকে যে তিনি কোনও দিন মুগ্ধনেত্রে দেখিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিতে পারি না। ইহা যে অনাদরপ্রসূত, তাহা নহে। তাঁহার সৌন্দর্য্যানুভূতির অভাব।

এজন্য প্রায়ই আমার মনে হইত, তাঁহার হৃদয় মরুভূমির মত শুষ্ক। তাঁহার পত্রহীন শুষ্ক তরুদেহে নবপল্লবিত লতার স্নিগ্ধ আবেষ্টন তবে কেন তিনি কামনা করিয়াছিলেন? যাহার জীবনে দিবার কিছু নাই, ভোগ করিবার কিছু নাই, সে শুধু কাঙ্গালের মত হাত পাতিয়া থাকে কেন? তাঁহার এই স্বার্থপরতার কথা মনে করিয়া আমি তাঁহাকে ক্ষমা করিতে পারিতাম না।

আমার পল্লবিত দেহ, উজ্জ্বল যৌবন, মধুভরা কণ্ঠ সবই ব্যর্থ হইয়া গেল! তিনি মুগ্ধ দৃষ্টিতে কোন দিন আমার দিকে চাহিয়া দেখিয়াছেন—এমন মুহূর্ত্তের কথা আমার মনে পড়ে না। অবশ্য এ কথাও ঠিক, আমিও কখনও লক্ষ্য করিয়া দেখি নাই, তিনি আমার দিকে চাহিয়া আছেন কি না। তবে এ কথাও অস্বীকার করিতে পারি না যে, আমার মন তাঁহার দিকে ধাবিত হউক বা না হউক, তিনি আমার দিকে চাহিয়া থাকিবেন, মুগ্ধ হইবেন, এমন কামনা আমার মনের প্রান্তে কখনও উদিত হয় নাই।

তাঁহার প্রতি আমার মন নিতান্ত বিরূপ হইয়া পড়িত—যখন গানের প্রতি তাঁহার ঔদাসীন্য দেখিতাম। গান আমার সকল দুঃখের সান্ত্বনা ও ঔষধ ছিল। প্রাণ খুলিয়া গান গাহিতে পারিতাম বলিয়া আমার এই মর্ম্মান্তিক, শোচনীয় অবস্থার কথা আমাকে তেমন অভিভূত করিতে পারিত না। বাড়ীতে গানের বিশেষ চর্চ্চা ছিল সত্য, কিন্তু অনাত্মীয় পুরুষের সাক্ষাতে কোনও দিন আমরা গান গাহি নাই। বাবা তাহা ভালবাসিতেন না, আমাদেরও ইচ্ছা হইত না। কিন্তু আমার সঙ্গীত যিনি একবার শুনিয়াছেন, তাঁহাকেই মুগ্ধ হইতে হইয়াছে। ইহা অহঙ্কারের কথা নহে। সত্যই অশেষ যত্নে আমি সঙ্গীতকলাকে বহুলাংশে আয়ত্ত করিয়াছিলাম।

কিন্তু অদৃষ্টের এমনই পরিহাস, আমার স্বামী কোনও দিন তাহাতে মুগ্ধ হয়েন নাই। এমন অনেকবার হইয়াছে যে, আমি গান গাহিতেছি, তিনি ঘরে আসিয়া পড়িয়াছেন, কিন্তু দাঁড়াইয়া বা বসিয়া শুনা

তিনি চলিয়া গিয়াছেন। যেন সঙ্গীতরাজ্যের সীমা ছাড়াইতে পারিলেই তিনি বাঁচেন।

এইরূপ ব্যবহার আমি ক্ষমা করিতে পারি নাই। গানে যাহার হৃদয় মুগ্ধ হয় না, তাহাকে বিশ্বাস করা চলে না। যে নরনারীর হৃদয় সঙ্গীতে মুগ্ধ নহে, পৃথিবীতে তাহাদের দ্বারা সকল প্রকার কুৎসিত ও নিষ্ঠুর অনুষ্ঠান ঘটিতে পারে। এ জন্য তাঁহার প্রতি আমার চিত্ত তিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

সে দিন আকাশ ঘিরিয়া মেঘের খেলা চলিতেছিল। পুঞ্জীভূত নিবিড় মেঘজালে বিশ্বের সঙ্গীত স্তব্ধ হইয়াছিল কি না, জানি না, কিন্তু মনের মধ্যে সুরের ঝঙ্কার—অতি করুণ ও উদাস ভাবের প্রবাহ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল। বাতাসের সঙ্গে বৃষ্টি পড়িতেছিল। আজ দুই দিন তিনি এখানে আসিয়াছেন। পথে ঠাণ্ডা লাগিয়া ও জলে ভিজিয়া সর্দ্দি হইয়াছিল, সামান্য জ্বর দেখা দিয়াছিল। বাবার বিশেষ আপত্তি দেখিয়া তিনি আজ ঘরের বাহির হইতে পারেন নাই। মা'র আদেশে আমিও ঘরের মধ্যে বসিয়া ছিলাম, যদি তাঁহার কোন কিছুর দরকার হয়। স্বামীর পরিচর্য্যা স্ত্রীর প্রধান কর্ত্তব্য, এ কথাটা মা সকল সময়েই আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেন।

নীরবে বসিয়া আমি কার্পেটের আসন বুনিতেছিলাম। উনি বোধ হয়, খবরের কাগজ লইয়া তারের সংবাদ পড়িতেছিলেন। এমন সময় মেজদিদি সে ঘরে আসিল। সে-ও কয়দিন হইল শ্বশুরবাড়ী হইতে আসিয়াছে। মেজদিদি অত্যন্ত গল্পপ্রিয় এবং পরিহাসরসিকা। সে নিতান্ত মূককেও কথা বলাইতে পারিত। দেখিলাম, মেজদিদির সঙ্গে তিনি দুই চারিটা কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

মেজদিদি বলিল, "এমন বাদলার দিনে চুপ ক'রে থাকা দায়। মিনু, একটা গান গা না, ভাই! সুধীন বাবু, মিনুর গান শুনেছেন? বড় চমৎকার গান করে।"

ধিক্কারে আমার মাথা যেন নত হইয়া পড়িল। মেজদিদি ত জানে না, সঙ্গীতে যাহার এতটুকু আসক্তি নাই, তাহার কাছে গানের কথা বলা শুধু সঙ্গীতের অপমান করা।

তিনি বলিলেন, "গান শুনবার অবকাশ আমার কোথায়, বলুন?"

মেজদিদি বলিল, "আজ ত আর কায নেই, আকাশে মেঘ, বাতাসে জলের ফোঁটা, গুরু গুরু মেঘের ডাক, এমন অবকাশ ত সকল দিন আসে না রায় ম'শায়! আজ গান বড় মিষ্টি লাগবে। মিনুর গান শুনলে আপনি খুসী হবেন। মিনু, হারমোনিয়মটার কাছে গিয়ে বস্।"

না—মেজদিদির সাধারণ বুদ্ধিরও অভাব দেখিতেছি। ছিঃ, কি লজ্জা! কিন্তু তাহাকে ঠেকাইয়া রাখাও দায়। সে যখন একবার জিদ ধরিয়াছে, তখন গান গাহিতেই হইবে। বিশেষতঃ আমি ত এ কথা বলিতে পারিব না, উনি গানের অনুরাগী নহেন। আমাদের স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে যাহাই থাকুক না কেন, তৃতীয় ব্যক্তিকে তাহা জানিতে দিবার অবকাশ দিব কেন?

বার কয়েক প্রতিবাদ করা সত্ত্বেও আমাকে অবশেষে হারমোনিয়মের কাছে গিয়া বসিতে হইল। একবার তাঁহার দিকে অলক্ষ্যে চাহিয়া বুঝিলাম, তিনি যেন কিছু ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার কি সঙ্গীতাতঙ্ক-রোগ আছে? প্রথমতঃ একটু কুণ্ঠা ও লজ্জা বোধ হইতেছিল, কিন্তু গান করা অথবা গান শুনার সময় এমন একটা তন্ময়তা আসিত যে, অনেক সময় আমি আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িতাম। সুধু সুরের রাজ্যে তখন মন পড়িয়া থাকিত।

প্রথম চরণ শেষ করিয়া অন্তরার মুখে একবার গানটাকে হারমোনিয়মে বাজাইয়া লইতেছি, এমন সময় মেজদিদির কণ্ঠস্বরে ফিরিয়া চাহিলাম। সে বলিতেছিল, "রায় ম'শায়, বাইরে ঠাণ্ডায় যাবেন না!"

দেখিলাম, স্বামী মহাশয় সম্মুখের বারান্দা অতিক্রম করিতেছেন।

এই উপেক্ষার অপমান আমাকে সহসা যেন পাগল করিয়া তুলিল। কেহ যেন বিষের প্রলেপ আমার সর্ব্বাঙ্গে মাখাইয়া দিয়াছিল! কিন্তু গান থামাইতে পারিলাম না। আমার দিদির কাছে এ দীনতা কি প্রকাশ করা যায়? বাজাইতে বাজাইতে মৃদুস্বরে,

সহজকণ্ঠে বলিলাম, "তুমি ব্যস্ত হয়ো না, এখনই ফিরে আস্‌ছেন।"

দৃঢ়বলে মনকে সংযত করিয়া গানের দিকে মন দিলাম। সুরের প্লাবনে চারিদিক ডুবাইয়া দিবার অধীর কল্পনায় গান গাহিতে লাগিলাম। একটা করুণ রাগিণীতে গান ধরিয়াছিলাম। গানের সুরে আমার হৃদয়ের পুঞ্জীভূত ব্যথা মূর্ত্ত হইয়া উঠে নাই কি ?

মেজদিদি চিরদিনই আমার গানের ভক্ত। গান শেষ হইলে সে আমার গলা জড়াইয়া বলিল, "মিনু, তোর মত গলা পেলে, আমি আর কিছুই চাইতাম না। সত্যি, তুই কি গানই গাস্‌ !"

দিদির সে স্নেহভরা পক্ষপাতদোষদুষ্ট প্রশংসারও মূল্য আছে ; কিন্তু তাহাতে আমার বুকের যন্ত্রণার তীব্রতা কমিল না।

গান শেষ হইবার পরে তিনি ঘরের মধ্যে আসিলেন। মেজদিদি বলিল, "কোথায় গিয়েছিলেন ? এমন গানের সবটা শুন্‌লেন না ?"

উত্তরে মৃদুস্বরে তিনি বলিলেন, "নিকটেই ছিলাম !"

আশ্চর্য্য এই লোকটি! তাঁহার ভাববর্জ্জিত মুখের দিকে চাহিয়া আমি শিহরিয়া উঠিলাম। আমি তাঁহাকে আন্তরিক ঘৃণা করিতে পারি, মনের এমন অবস্থা দেখিয়া নিজের জন্য অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া উঠিলাম। অধঃপতনের কোন্ পথে আমি চলিয়াছি !

৪

দাদা বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। প্রায় দুই বৎসর তিনি প্রবাসে ছিলেন।

আমার বিবাহের পর এক বৎসর চলিয়া গিয়াছে ; কিন্তু এ পর্য্যন্ত স্বামী তাঁহার কর্ম্মস্থলে আমাকে লইয়া যায়েন নাই। পরম্পরায় শুনিতে পাইতাম, সেখানকার নির্ব্বান্ধব, নির্জ্জনপ্রায় পুরীতে গিয়া আমি দুই দিনও থাকিতে পারিব না—কষ্ট পাইব, এই জন্যই তিনি আমাকে লইয়া যায়েন নাই। আমাকে কোনও দিন এ বিষয়ে তিনি নিজেও কিছুই বলেন নাই, আমিও প্রশ্ন করি নাই। সে ভালই হইয়াছিল ; কারণ, অমন শুষ্ক-হৃদয়, সর্ব্ববিধ কলানুরাগ-বিবর্জ্জিত মানুষের সাহচর্য্যে সেরূপ নির্ব্বান্ধব দেশে আমি এক দিনও টিকিতে পারিতাম না।

দাদা বিলাত যাইবার সময় বৌদিদিকে লাহোরে তাঁহার পিত্রালয়ে রাখিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার বালিগঞ্জের বাড়ী এত দিন বন্ধ ছিল। দাদা আসিয়াই বৌদিদিকে আনাইয়াছেন। আমার বিবাহের সময় পিতার কঠিন পীড়ার জন্য বৌদিদি আসিতে পারেন নাই।

দাদা সকালে আসিয়া মা'কে বলিলেন, "মামীমা, কাল বালিগঞ্জের বাড়ীতে সকলকে যেতে হবে। জনকতক বন্ধুবান্ধবকে খেতে বলেছি। আপনি না গেলে সব বে-বন্দোবস্ত হয়ে যাবে। মামাবাবু চন্দননগরে যাবেন, তিনি থাক্‌তে পারবেন না।"

আমরা তিন ভগিনীই তখন একসঙ্গে ছিলাম। দিদিরা শ্বশুরবাড়ী হইতে আসিয়াছেন। আমাদিগকে দাদা বলিলেন, "তোরা সকাল সকাল যাবি। ওরে মিনু, তুই ত গান-পাগলা। কালকে ভারী চমৎকার গান হবে রে ! এমন গান জীবনে শুনিস্ নি। বাঙ্গালা দেশে এর চেয়ে ভাল গাইয়ে যে কে, তা আমি জানি নে। দেখতে পাবি কাল !"

আমরা খুব উৎসাহিত হইয়া উঠিলাম। দাদা যেমন পণ্ডিত, তেমনই সদানন্দ। এমন দাদা পাইয়া আমরা গৌরব বোধ করিতাম। দাদার "সাহেবীয়ানা" চাল আদৌ ছিল না। তিনি ভাল অধ্যাপক ছিলেন, বিলাত হইতে আরও বড় উপাধি লইয়া আসিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই। গোঁড়া না হইলেও হিন্দুধর্ম্মের তিনি পরম ভক্ত। তিনি যে বাঙ্গালী, তাহা তিনি ভুলেন নাই। আজকাল দেখিতে পাই, অনেকে বিলাত হইতে আসিয়া বাঙ্গালীয়ানার অভিনয় করেন—অর্থাৎ কায়মনোবাক্যে শ্বেতদেবতা ও তাঁহার আচার অনুষ্ঠানের ভক্ত হইলেও বাহিরে লোক দেখাইয়া বাঙ্গালীয়ানার অভিনয় করেন, আমার দাদা ঠিক তাহার বিপরীত। দাদার বাড়ীতে বাবুর্চ্চি বা 'বয়' ছিল না।

বৌদিদি আমাদিগকে পাইয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। পাচক ব্রাহ্মণের সাহায্যে, মা'র নেতৃত্বে রন্ধনের ভা'র

আমরাই লইলাম। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই দাদার ফরমাস-মত নানাবিধ ভোজ্য প্রস্তুত হইয়া গেল। দাদা আসিয়া বলিলেন, এখন ঠাকুরদের হাতে সব বুঝাইয়া দিয়া আমরা সন্ধ্যার আসরের জন্য যেন প্রস্তুত হইয়া থাকি।

গা ধুইয়া, প্রসাধনশেষে আমরা গানের মজলিসের জন্য উৎসুক হইয়া রহিলাম। যে ঘরে গানের আসর হইয়াছিল, তাহার পার্শ্বের এক কক্ষে আমাদের বসিবার স্থান হইয়াছিল। কিন্তু প্রত্যেক জানালা ও দরজায় রেশমের যবনিকা ঝুলিতেছিল। পুরুষরা আমাদিগকে দেখিতে পাইবেন না, আমরাও দেখিতে পাইব না; কিন্তু গান শুনার কোন বাধা হইবে না। দাদার এতটা পর্দ্দাপ্রিয়তার প্রশংসা করিতে পারিলাম না। চেহারা দেখা গেলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া যায়?

সে দিন বোধ হয় দশমী তিথি। শরতের নির্ম্মল আকাশে চাঁদের স্নিগ্ধ প্রকাশ বড়ই মধুর বোধ হইতেছিল। একটা খোলা জানালার ধারে বসিয়া আমরা বৌদিদির সঙ্গে নানা বিষয়ের আলোচনা করিতে লাগিলাম। খানিক পরে সংবাদ আসিল, দাদার বন্ধুরা আসিয়াছেন, এইবার গান আরম্ভ হইবে।

হলঘর হইতে মৃদু গুঞ্জন আমাদের কানে আসিতে লাগিল। খানিক পরে সেতারের মধুর রনন্, ঝনন্ শব্দ উত্থিত হইল। সেতার বাজাইতে আমিও শিখিয়াছিলাম। অল্পক্ষণ পরে বুঝিলাম, যিনি বাজাইতেছেন, তিনি শুধু উচ্চশ্রেণীর বাদক নহেন—রীতিমত সাধনা না থাকিলে, ভক্ত সাধক না হইলে এমন সুরের কসরত, এমন অপূর্ব্ব নৈপুণ্য প্রকাশ করা অসম্ভব। সেতারে যখন আলাপ আরম্ভ হইল, আমার মনে হইতে লাগিল, আমারই হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে সুরের ঝঙ্কার বাহির হইতেছে। দাদার এই বন্ধুটি সার্থক সঙ্গীতচর্চ্চা করিয়াছেন।

আমি স্তব্ধভাবে শুনিতে লাগিলাম।

তাহার পর যন্ত্রবাদ্য বন্ধ হইল। হারমোনিয়মে গান আরম্ভ হইল। আমি উৎকর্ণ হইয়া বসিলাম। সেতারের আলাপের সময় আমাদের অনেকের মধ্যে একটু আধটু চাঞ্চল্য ছিল; কিন্তু গানের সময় সবই যেন মুহূর্ত্তে থামিয়া গেল। এ কি সঙ্গীত! যেন ধারায় ধারায় নন্দনপুর হইতে সুধানির্ঝরস্রোত নামিয়া আসিতেছে! আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় সেই সঙ্গীতসুধাসমুদ্রে অবগাহন করিয়া যেন ধন্য হইল। দাদা সত্যই বলিয়াছিলেন, এমন গান আগে আমি কাহারও কণ্ঠে শুনি নাই। যেমন কণ্ঠ, সুরের আরোহ, অবরোহ তেমনই বিস্ময়কর। বহু দিনের সাধনা, প্রাণপাত পরিশ্রম এবং বিধিদত্ত প্রতিভা না থাকিলে এমন গান কেহ করিতে পারে না। গায়ক যেন ধ্যানের মূর্ত্তিকে কথা ও সুরে জীয়ন্ত করিয়া তুলিতেছিলেন! কবি সার্থক লিখিয়াছেন,—

"তুমি কেমন ক'রে গান কর হে, গুণি!
আমি অবাক্ হয়ে শুনি, কেবল শুনি!—"

গানের সুরে সুরে আমার জমাটবাঁধা অশ্রুস্তূপ নয়নপথে গলিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। আকাশ ও মর্ত্ত্যে গানের সুর ভরিয়া উঠিল। আত্মবিস্মৃত হইয়া আমি সুরের সাগরে যেন ডুবিয়া যাইতে লাগিলাম। জগৎ-সংসার সবই যেন আমার নয়নে মিলাইয়া গেল।

এক গান থামিয়া আর একটা গান আরম্ভ হইল। এইরূপে কতক্ষণ গান চলিয়াছিল, ঠিক স্মরণ নাই। তবে আমার বোধ হইতেছিল, এই সঙ্গীতের প্লাবন যেন অনন্তকাল ধরিয়া চলিতে থাকে, আর আমি তাহারই স্রোতে ভাসিয়া চলিয়া যাই।

সহসা বৌদিদির কণ্ঠস্বরে আমার চমক ভাঙ্গিল।

"মেজ ঠাকুরঝি, তুমি অবাক্ করলে। সুধীন বাবুর গান তোমরা আগে কখন শোন নি? ওঁর মত গাইয়ে পেশাদারের মধ্যেও বড় একটা দেখা যায় না। কীর্ত্তনে ওঁর জুড়ি নেই বলেই ত মনে হয়!"

মেজদিদি সবিস্ময়ে বলিলেন, "সুধীন বাবু আবার কে?"

"বাঃ!—আমাদের সুধীন, ঠাকুরজামাই। কেন, এত দিনের মধ্যে—"

আমার সর্ব্বদেহ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। আমি কি জাগিয়া আছি?—এও কি সম্ভব?

সহসা বৌদিদি আমাকে ধরিয়া না ফেলিলে সেইখানেই পড়িয়া যাইতাম। কিন্তু চোখে সবই যেন ঝাপ্‌সা দেখিতেছি!

৫

কয় দিন যেন স্বপ্নঘোরেই কাটিয়াছে। সম্পূর্ণ জ্ঞান হারাইয়া দৌর্ব্বল্য প্রকাশ করি নাই বটে ; কিন্তু আমার অন্তররাজ্যে যে বিপ্লব ঘটিয়াছিল, তাহাতে ধারাবাহিকভাবে সব ঘটনা, সব কথা মনে রাখিতে পারি নাই।

রাত্রিতেই দাদার ওখান হইতে বাড়ী ফিরিয়াছিলাম। তাহার পরদিবস আমরা সকলে রেলে চড়িয়া আজ এই রাজ্যে আসিয়া পড়িয়াছি। মনে পড়ে, বাবা বলিয়াছিলেন যে, আমার স্বামী মহাশয় সকলকে লইয়া তাঁহার পাহাড়রাজ্যে যাইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়া পাঠাইয়াছেন। দাদা ও বৌদিদিকে স্বতন্ত্রভাবে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন।

আমার যেন কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্বই এই কয় দিন ছিল না। শুধু মা ও বাবা যাহা করিতে বলিয়াছেন, যন্ত্রচালিতবৎ তাহাই করিয়াছি। মা, বাবা, দাদা ও বৌদি এবং আমি এই কয় জন আসিয়াছি। দিদিরা তাহাদের কর্ত্তাদের অনুমতি পাইলে পরে আসিতে পারে।

একটা বড় টিলার উপর কি সুদৃশ্য অট্টালিকা! ইহাই আমার স্বামীর বাসভবন। বাড়ীর চারিপার্শ্বে প্রকাণ্ড বাগান। তাহাতে কি নাই? এমন চমৎকার বাগান সহরে কাহার আছে? শিল্পী যেন যত্ন করিয়া কল্পনার সাহায্যে খালি সৌন্দর্য্য রচনা করিয়াছে।

বাড়ীর কোথাও এতটুকু আবর্জ্জনা পর্য্যন্ত নাই। প্রত্যেক ঘর এমন সুসজ্জ থাকিতে পারে, ইহা আমি কল্পনাও করিতে পারি নাই! প্রত্যেক শয়ন-কক্ষের পারিপাট্য শুধু কবির কল্পনাতেই সম্ভবপর।

এখনও পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত আমার দেখা হয় নাই। সন্ধ্যার কিছু আগেই আমরা বাড়ীতে আসিয়া পৌছিয়াছি। দাসী ও ভৃত্যরা আসিয়া আমাকে একটু বিশেষভাবেই যেন অভিবাদন করিয়া গেল। আমি কি এখানকার গৃহিণীর যোগ্য হইতে পারিব?

অন্তরের অনুশোচনার জ্বালা কত তীব্র, তাহার পরিমাপের যন্ত্র কি আবিষ্কৃত হইয়াছে?

কিন্তু কেন তিনি আপনাকে আমার কাছে এমন করিয়া গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন? নিজের অতীত ও বর্ত্তমানকে মানুষ যে এমন করিয়া চাপিয়া রাখিতে পারে, তাহা ত জানিতাম না!

যে দিকে চাহিতেছি, সেই দিকেই গভীর সৌন্দর্য্যানুরাগের প্রকাশ দেখিতেছি। অথচ তাঁহার ব্যবহারে মুহূর্ত্তের জন্যও আমি বুঝিতে পারি নাই, কত মহৎ ও বৃহৎ হৃদয়ের তিনি মালিক!

একটা বড় ঘরের খোলা জানালার ধারে দাঁড়াইয়া আকাশপাতাল ভাবিতেছিলাম। অদূরে আমাদের কয়লার খনির বাহিরের কারখানা-ঘরগুলি দেখা যাইতেছিল। ঘরে উজ্জ্বল আলোক জ্বলিতেছিল। ভাবিতেছিলাম, এই ঘরেই বুঝি তিনি রাত্রিবাস করেন।

এমন সময় "মিনু" বলিয়া দাদা ঘরের মধ্যে আসিলেন। মা ও বৌদিদি রন্ধনের তদ্বিরে গিয়াছেন। আমাকে সকল বিষয়েই আজ রেহাই দেওয়া হইয়াছে।

"কি ভাবছিস, মিনু?"

মৃদু হাসিয়া বলিলাম, "কই, বিশেষ কিছু না।"

সহসা দাদা গম্ভীর হইয়া গেলেন ; একটু থামিয়া বলিলেন, "সুধীন আমার ছেলেবেলার বন্ধু। তা'র জীবনের প্রত্যেক দিনের কথা আমি জানি।"

আমি দাদার মুখের দিকে চাহিলাম।

"বিলাতে থাকার সময় প্রতি মেলে সে আমাকে প্রতি সপ্তাহের ঘটনার কথা লিখে পাঠাত। তা'কে আমি এত ভাল জানি বলেই তোর সঙ্গে তা'র বিয়ে দেবার জন্য মামাকে লিখেছিলাম।"

আমি আবার দাদার দিকে শঙ্কিত নেত্রে চাহিলাম।

দাদা বলিলেন, "তা'র সব আছে, তবু সে বড় দুঃখী। এত বড় হৃদয়বান্ মানুষ আমি দেখিনি। তা'র প্রথম স্ত্রী তা'র সব সুখ হরণ ক'রে নিয়েছিল। তাই সে জীবনে আর বিয়ে করবে না স্থির করেছিল। কিন্তু আমি জানতুম, তোর সঙ্গে বিয়ে হ'লে সে সুখী হবে—যা তা'র অভাব, তা দূর হবে।"

দাদা আজ এ সকল কি কথা বলিতেছেন? আমার হাত-পা যেন ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল।

"কিন্তু তুই তাকে বুঝতে পারিস নি।—"

"দাদা!" বলিয়া আমি জানালার ধারে বসিয়া পড়িলাম।

"না বোন্, দোষ যে তোর একার, তা বল্‌তে পারিনে। অদৃষ্টই এই বাদ সেধেছে। সুধীনের আগের স্ত্রী মাত্র এক বছর বেঁচে ছিল। তা'র সবই ভাল ছিল; কিন্তু একটা দোষ ছিল, সে সকল রকমে সুধীনকে অধিকার ক'রে থাক্‌বে—অন্য কোন বিষয়ে স্বামী আসক্ত হ'তে পারবে না, এই ছিল তা'র সঙ্কল্প। সুধীন যেমন কাযের ভক্ত, সঙ্গীতকে তা'র চেয়েও সে ভালবাসত। তা'র এমন সাধনা ছিল যে, গানকে সত্যই সে মূর্ত্তি দিতে পারত। স্ত্রীর সেটা মোটেই ভাল লাগত না। সতীন যেমন দুই চোখের বিষ হয়, সুধীনের সঙ্গীতচর্চ্চাও তা'র কাছে তেমনই বিষের মত বোধ হ'ত। সে নিজে গান জান্‌ত, ভালও বাস্‌ত; কিন্তু সুধীনের একনিষ্ঠ সঙ্গীতচর্চ্চা সে সহ্য করতে পারত না।"

আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম। দাদার কাছে সরিয়া আসিলাম। বিস্ময়ে আমার বুকের মধ্যে যেন কেমন করিতে লাগিল।

দাদা বলিয়া চলিলেন, "এক দিন রাগ ক'রে সে সুধীনের সেতার আছড়ে ভেঙ্গে দিয়েছিল, তা'র পর সুধীন ৩।৪ দিন তা'র সঙ্গে কথা বলেনি, সেই রাগে, অভিমানে সে বিষ পান ক'রে আত্মহত্যা করে।"

আমি চমকিয়া উঠিলাম।

"সেই দিন থেকে সুধীন প্রতিজ্ঞা করেছিল, সে বিয়ে করবে না—আর যদি কখনও বিয়ে করতে হয়, স্ত্রীর কাছে নিজের সঙ্গীতপ্রিয়তার বিন্দুমাত্র আভাস দিবে না। কোন নারীর গান সে শুন্‌বে না। যে গানের জন্য একটা মানুষ আত্মহত্যা কর্‌তে পারে, সে সঙ্গীত-চর্চ্চা লোকচক্ষুর অন্তরালে হওয়াই ভাল।"

সহসা কালো রঙ্গের বৃহৎ যবনিকা আমার নেত্রপথ হইতে যেন অন্তর্হিত হইয়া গেল। অনুতাপ, অনুশোচনার ভারে হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়িল। আমার মত হতভাগী কে? এত বড় মহৎ হৃদয়কে আমি উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছি! আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে কি?

দাদা বলিলেন, "আমার বিশ্বাস ছিল, তুই তা'কে বুঝতে পার্‌বি। এত দিন কিন্তু একটু ভুল হয়েছিল। সুধীন অতটা আত্ম-গোপন না করলেই ভাল হ'ত; সে তোকে আপনার ক'রে নিতে পারত। কিন্তু বাধা কি সে পায় নি? আমি সত্য বল্‌বো, মিনু, তোর যা কর্ত্তব্য ছিল, তা পালন করিস নি। আমি তোকে খুব ভাল জানি, তোর দুর্ব্বলতা কোথায় বুঝতে পেরেছিলাম। যাক্, ভগবানের আশীর্ব্বাদে এখন তোর ভালই হবে।"

নতমস্তকে আমি দাঁড়াইয়া রহিলাম। যদি কেহ ভুক্তভোগী থাক, তবে আমার তখনকার মনের অবস্থা বুঝিতে পারিবে। ভাষায় তাহা ব্যক্ত করা যায় না।

মাথা তুলিয়া যখন চাহিলাম—দাদা ঘরে নাই। দ্বারপ্রান্তে ও কে দাঁড়াইয়া?

দ্রুত চরণে অগ্রসর হইয়া তাঁহার চরণে লুটাইয়া পড়িলাম। কি বলিয়াছিলাম, মনে নাই, তবে অশ্রুতে আমার বক্ষের বসন যে ভিজিয়া গিয়াছিল, তাহা পরে বুঝিয়াছিলাম।

তিনি শুধু তাঁহার বলিষ্ঠ বাহুযুগলমধ্যে সস্নেহে আমাকে ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নয়নে যে দীপ্তি, যে ভাবের প্রবাহধারা তখন দেখিয়াছিলাম, তাহা মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত আমাকে সীমাহীন আনন্দই দান করিবে।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

বাসনা

আমি চাই ফুলে ফুলে ছড়াইতে তোমার সৌরভ
মিশাইতে মলয়ে সুবাস;
প্রতি জনে বিলাইতে তোমার গৌরব—
এই শুধু নিশি-দিন আশ।
আমি চাই তোমার সুষমা-রাশি উঠুক ফুটিয়া
রবি শশী হউক মলিন,
তোমার সৌন্দর্য্য-রাশি লউক লুটিয়া
শিখী চন্দ্র কহ্লার নলিন।
আমি চাই তুমি হও সকলের; দুই হাত দিয়া
সকলে লুটুক তব মধু,
আমি চাই আমরণ তোমারি হইয়া
তোমাতেই তৃপ্ত হ'তে শুধু।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভঞ্জ।

অভিভাষণ

কাঁঠালপাড়া নব্যবঙ্গের মহাতীর্থ—তীর্থরাজ প্রয়াগ! এ নবপ্রয়াগে স্বদেশপ্রীতিরূপ অক্ষয়বটের শান্ত শীতল ছায়ায় প্রবাহিত বাঙ্গালার মনীষা, কল্পনা ও প্রতিভার পুণ্য ত্রিবেণীসঙ্গমে অবগাহন করিয়া বাঙ্গালী যে মৃতসঞ্জীবন মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছে, সেই মহামন্ত্রের দ্রষ্টা নব্যবঙ্গের মহর্ষি বঙ্কিমচন্দ্রের পুণ্য স্মৃতিময়ী মধুর মূর্ত্তির উদ্দেশে আমি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা, ভক্তি ও প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি উপহার দিতেছি এবং সেই সঙ্গে কোটি কোটি বঙ্গনরনারীর ভাব-বিহ্বল সমবেত কণ্ঠে প্রস্ফুরিত, বঙ্কিমচন্দ্রের অথবা বাঙ্গালীর সুপ্তপ্রবুদ্ধ বিশ্ববিজয়িনী জীবনীশক্তির জয়ঘোষণার সঙ্গে স্বীয় দুর্ব্বল কণ্ঠস্বর সম্মিলিত করিয়া বঙ্কিম সাহিত্য-সম্মিলনীর অভ্যর্থনা সমিতির প্রতিনিধিরূপে বঙ্কিমপূজার্থ সমবেত প্রত্যেক বঙ্গসাহিত্যিক ও সাহিত্যানুরাগী ভদ্রমহোদয়গণকে আমাদের সবিনয় স্বাগতাভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

নব্যবঙ্গের এই মহামহিমময় মহাতীর্থের মহাভাবপ্রবাহে অবগাহন করিয়া অমরধামে বিরাজমান, নব্যবঙ্গের ভাবগঙ্গার ভগীরথ মহাকবি মহাদার্শনিক মহাশক্তিশালী স্বদেশপ্রেমিক মহাত্মা বঙ্কিমচন্দ্রের বিশ্ববিজয়িনী প্রতিভার উদ্দেশে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি উপহার দিয়া পূত হইবার জন্য, ধন্য হইবার জন্য, আর তাঁহার বড় সোহাগের—বড় গৌরবের—বড় আশার—বাঙ্গালী জন্ম সার্থক করিবার জন্য আজ আমরা তীর্থযাত্রিরূপে এই পুণ্যতীর্থে সমবেত হইয়াছি। শাস্ত্র বলিতেছে—

"যস্য হস্তৌ চ পাদৌ চ মনশ্চৈব সুসংযতম্।
শ্রদ্ধা তপশ্চ কীর্ত্তিশ্চ স তীর্থফলমশ্নুতে॥" (কাশীখণ্ড)

যাহার হস্ত ও পাদ সুসংযত, যাহার অন্তঃকরণ সুনির্ম্মল ভাবে সংযত—যাহার তীর্থে শ্রদ্ধা আছে—বিহিত ক্লেশকর কর্ম্ম করিবার শক্তি আছে—যাহার ধার্ম্মিক বলিয়া কীর্ত্তি আছে—সেই ব্যক্তিই তীর্থফল লাভ করিতে সমর্থ হয়।

সহস্র বৎসরের পরাধীনতার কঠিন লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ আমরা, সুতরাং আমাদের হস্ত ও পাদ যে সুসংযত, তাহাতে সন্দেহ করিবার অণুমাত্রও কারণ নাই। বল থাকিলে, শক্তিশালী হইলে, মন অসংযত হইতে পারে, দুর্ম্মূল্য সুদুর্ল্লভ অথচ বেজায় ভেজাল অন্নের প্রভাবে বাঙ্গালীর দুর্ব্বল মন অশক্তিবশতঃ আপনিই সুসংযত হইয়া উঠিয়াছে; পরমুখপ্রেক্ষিতার প্রবল আসক্তি পরকীয় প্রচণ্ড পদাঘাতে শিথিল হইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং স্বাবলম্বনে বিশ্বাসরূপিণী শ্রদ্ধা আসিয়াছে বা অচিরকালের মধ্যেই আসিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এ অবস্থায় বিহিত ক্লেশকর কর্ম্ম না করিলে আর বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং তপস্যা ও অবশ্যম্ভাবিনী অন্য কিছু না হউক, দেশমাতৃকার সেবার জন্য আত্মবলিদানে আজ বাঙ্গালী যে পরাঙ্মুখ নহে—বাঙ্গালীর অতিবড় শত্রুও বোধ হয় আজ বাঙ্গালীর এই কীর্ত্তিগানে বাধা দিতে সাহস করে না। সুতরাং স্বদেশ-মাতৃকার পীঠস্থানে তীর্থযাত্রার অধিকারে আমরা যে আজ বঞ্চিত নহি—তাহা সুনিশ্চিত।

অধিকারী হইয়া বিহিত আবশ্যক কার্য্য না করিলে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয়, ইহা শাস্ত্রসিদ্ধান্ত। তাই বলি, বাঙ্গালার অভ্যুদয়কামী নরনারীগণ, এস, নবজাগরণের এই মঙ্গল-মুহূর্ত্তে নব নব আশার মধুর বংশীধ্বনিতে বাঙ্গালার আকাশ অনিল সলিল মুখরিত হইতেছে—এই শুভলগ্নে আমরা দেশমাতৃকার পূজার উপযুক্ত মাতৃমন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য বদ্ধপরিকর হই, যেখানে জননী সর্ব্বপ্রথমে নিজ ভুবনমোহিনী মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়াছেন—এই সেই বঙ্কিমজন্মভূমি কাঁঠালপাড়া, ইহা অপেক্ষা পুণ্যতর ভূমি পৃথিবীতে বাঙ্গালীর পক্ষে আর কোথায় পাইব?

ঐ সম্মুখস্থিত ক্ষুদ্র বৈঠকখানায় বাঙ্গালার সিদ্ধসাধকাগ্রণী বঙ্কিমচন্দ্রের সাধনাপূত মানসাকাশে বাঙ্গালীর সর্ব্বস্ব বাঙ্গালীর আরাধ্যতম দেবতা জননী জন্মভূমি যে মনোহারিণী ভুবনবিজয়িনী মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন

—তাহার সমুজ্জ্বল বিবরণ তাঁহারই অমর ভাষায় লিখিত হইয়াছে—

"সহসা তাঁহাদিগের চক্ষুতে প্রাতঃসূর্য্যের রশ্মিরাশি প্রভাসিত হইল। চারিদিক্ হইতে মধুকণ্ঠ পক্ষিকুল গাহিয়া উঠিল। দেখিলেন, এক মর্ম্মরপ্রস্তর-নির্ম্মিত প্রশস্ত মন্দিরের মধ্যে সুবর্ণ-নির্ম্মিতা দশভুজা প্রতিমা নবারুণ-কিরণে জ্যোতির্ম্ময়ী হইয়া হাসিতেছে। ব্রহ্মচারী প্রণাম করিয়া বলিলেন, এই মা, যা হইবেন, দশভুজ দশদিকে প্রসারিত, তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত, পদতলে শত্রু বিমর্দ্দিত, পদাশ্রিত বীরকেশরী শত্রুপীড়নে নিযুক্ত, দিগ্‌ভুজা—বলিতে বলিতে সত্যানন্দ গদ্‌গদকণ্ঠে কান্দিতে লাগিলেন।

"দিগ্‌ভুজা নানা প্রহরণধারিণী শত্রুবিমর্দ্দিনী বীরেন্দ্র-পৃষ্ঠবিহারিণী—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী,বামে বাণী বিদ্যা-বিজ্ঞানদায়িনী, সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয়, কার্য্যসিদ্ধিরূপী গণেশ। এস, আমরা উভয়ে মাকে প্রণাম করি, তখন্ দুই জনে ঊর্দ্ধমুখে এককণ্ঠে ডাকিতে লাগিল—

'সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥'

উভয়ে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া গাত্রোত্থান করিলে মহেন্দ্র গদ্‌গদকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মা'র এই মূর্ত্তি কবে দেখিতে পাইব?'

ব্রহ্মচারী বলিলেন, 'যবে মা'র সকল সন্তান মাকে মা বলিয়া ডাকিবে, সেই দিন উনি প্রসন্ন হইবেন'।"—

আনন্দ মঠ।

বঙ্কিমচন্দ্রের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইবার দিন নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, সুদীর্ঘকালব্যাপিনী মোহনিদ্রার অবসানে নিদ্রাবসাদে অনতিপরিবিকসিত নেত্রে ব্যাকুল বাঙ্গালী মায়ের ভুবনমনোমোহিনী জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি আবছাওয়ার মত দেখিতে পাইয়া "মা মা" বলিয়া কান্দিতে আরম্ভ করিয়াছে—এবার সত্য সত্যই মা আসিবেন, আর বিলম্ব করিবার সময় নাই, মা আমাদের বড় অভিমানিনী, তাঁহাকে বড় যত্নে বড় আদরে পূজা করিতে হইবে, সেই পূজার যোগ্য মন্দির—এই তাঁহার বড় আদরের পুত্র বঙ্কিমচন্দ্রের পুণ্যস্মৃতিবিজড়িত পুণ্যক্ষেত্রে নির্ম্মিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। এ মন্দিরের দ্বার সর্ব্বদা সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকিবে। ইহার ভিতরে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন, পার্শী, খৃষ্টীয়ান বলিয়া কোন ভেদ থাকিবে না, আমরা সকলেই এক ভুবনমনোমোহিনী, বিশ্ববিজয়িনী মায়ের আদরের সন্তান, আমরা সকলেই সমান, বাহিরের দুর্নিবার বৈষম্যের প্রবল সন্তাপে ব্যাকুল হইলে মায়ের মুখ দেখিয়া সকল তাপ জুড়াইবার জন্য আমরা এই মন্দিরে প্রবেশ করিয়া ভাইয়ে ভাইয়ে এক হইয়া চতুর্ব্বর্গসাধিনী করুণাময়ী জননীর রাতুল চরণ আমাদের অশ্রুধারায় ধৌত করিব,প্রাণ ভরিয়া কণ্ঠ ছাড়িয়া "মা মা" বলিয়া ডাকিব। এখানে আমরা মায়ের কথা ছাড়া অন্য কথা কহিব না।

মায়ের পূজার উপযুক্ত সকল দ্রব্যসম্ভার একত্র করিয়া আমরা মায়ের সেই মন্দির সাজাইব, এই মন্দিরে মাতৃ-পূজার প্রধান উপকরণ হইবে বঙ্কিম-সাহিত্য। যিনি আমাদিগকে মা চিনাইয়াছেন, কেমন করিয়া ডাকিয়া মায়ের কোলে ঝাঁপ দিয়া পড়িতে হয়, তাহা শিখাইয়াছেন, আমরা এখনও তাঁহাকে ভাল করিয়া বুঝি নাই, বাজে উপন্যাসের চটকে দিশাহারা হইয়া আমাদের ছেলেরা তাঁহার গ্রন্থরাশি ভাল করিয়া পড়ে না—out of time বলিয়া হতাদর করিতে সাহসী হয়। দোষ তাহাদের নহে, দোষ আমাদের। এ পর্য্যন্ত আমরা তাঁহার গ্রন্থরাশি ভাল করিয়া মুদ্রিত করিয়া অতি সুলভমূল্যে প্রত্যেক বাঙ্গালীর ঘরে পৌঁছাইতে পারি নাই এবং তাহার জন্য বিহিত চেষ্টাও করি নাই, আমাদের দেশের শতকরা নিরানব্বইটি সাধারণ পুস্তকালয়ে তাঁহার প্রিয় বঙ্গদর্শনের অস্তিত্ব নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, নব-জাগরণের অভিমানগ্রস্ত বাঙ্গালীর পক্ষে ইহা শ্লাঘার কথা নহে, প্রত্যুত বড়ই ক্লেশকর ও অপমানকর। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি ভারতে অন্যান্য জাতিবৃন্দের মধ্যে কি ভাবে সমাদৃত হইতেছে, হিন্দী, মারাঠী, গুজরাটী, মৈথিলী, পঞ্জাবী প্রভৃতি ভাষায় তাঁহার উপন্যাসগুলি কি ভাবে মুদ্রিত হইয়া ভারতের শিক্ষিত নরনারীবৃন্দের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিতেছে, আমরা এ সকল বিষয়ের কোন খবরই রাখি না। মায়ের শ্রেষ্ঠ সন্তানের প্রতি এই অনাদর, এই অবজ্ঞা মায়ের যে ভাল

লাগিতেছে না, তাঁহাকে যে আবার উন্মনা করিয়া তুলিতেছে—এই প্রত্যবায়ের আশু প্রতীকার করিতে হইবে। এই কাঁঠালপাড়ার সংকল্পিত মাতৃপূজার মন্দির যাহাতে বঙ্কিমসাহিত্যানুশীলনের বিরাট কেন্দ্রে পরিণত হয়, তাহার জন্য জাতিবর্ণধর্ম্মনির্ব্বিশেষে প্রত্যেক বঙ্গসন্তানকে অকপট চেষ্টা করিতে হইবে।

এই সকল অবশ্য-কর্ত্তব্য কার্য্যনিচয়ের জন্য কাঁঠালপাড়া বঙ্কিম-সাহিত্য-সম্মিলনীর অনুষ্ঠাতৃবর্গ আপনাদের সম্মুখীন হইয়াছেন, এই বিষয়ে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবার ভার আপনাদের উপর ন্যস্ত করিয়া আমি অদ্য অবসর গ্রহণ করিবার প্রার্থনা করিতেছি। একটু কর্ত্তব্য বাকী আছে, তাহা এই—আপনারা আজ আমাদের বড় সাধের, বড় সৌভাগ্যের অতিথি, আপনাদের উপযুক্ত সেবা করিবার সম্পূর্ণ ইচ্ছা হৃদয়ে সযত্নে পোষণ করিয়াও অসামর্থ্যবশতঃ আমরা উপযুক্ত দ্রব্যসম্ভার সংগ্রহ করিতে পারি নাই ; কখনও যে পারিব, সে আশাও বড় অল্প। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, অনেক পরামর্শ করিয়া শেষে কিন্তু অনুকল্পের ব্যবস্থা করিয়াছি, হয় ত তাহা দৈববিড়ম্বনায় দ্বিকল্পে বা বিকল্পেও পরিণত হইতে পারে।

আপনারা সর্ব্বরসময়ী বঙ্গজননীর রসিক সন্তান আসিয়াছেন—বঙ্গের অনন্যসাধারণ রস-সাহিত্যগুরু বঙ্কিমচন্দ্রের রসভাণ্ডারের দ্বার উদ্ঘাটন করিতে। এ ক্ষেত্রে পান্তুয়া, রসগোল্লা বা সন্দেশ প্রভৃতি পরিণতিবিরস মিষ্টরসের আস্বাদনের জন্য আপনাদের কাহারও যে বিশেষ প্রবৃত্তি রসনায় রস সৃষ্টি করিতে পারে, তাহা সম্ভবপর মনে হয় না। তাই সর্ব্বাগ্রে সেই রসিকচূড়ামণি রসরাজের দুই একটি রসময়ী ভারতী আপনাদের সেবার জন্য উপহার দিতে চাহি, অনুগ্রহ করিয়া ক্ষমা করিবেন, পরিবেষণের ত্রুটি গ্রহণ করিবেন না, ইহাই আন্তরিক প্রার্থনা ও বিনীত নিবেদন।

আমাদের উত্তর-পশ্চিমদেশীয় ভ্রাতৃবৃন্দ ফলাহার করিতে বসিয়া অগ্রেই মিষ্টান্নের রস আস্বাদনে অভ্যস্ত। আমরা বাঙ্গালী, কিন্তু তিক্তরসপ্রধান শুক্তানী বা নালিতার ঝোল যকৃতের ক্রিয়াবিশেষের উপযোগী বলিয়া সর্ব্বাগ্রে গ্রহণ করিয়া থাকি, এটি আমাদের বংশপরম্পরাগত অবর্জ্জনীয় অভ্যাস। তদনুসারে আমি প্রথমে তিক্তের ব্যবস্থা করিব, বিরক্ত হইবেন না, রসনাতৃপ্তি না হইতে পারে—যকৃতের ক্রিয়া যে ভাল হইবে, তাহা আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি। হতাশও হইবেন না—শেষে প্রচুর পরিমাণে মিষ্টান্নের সম্ভাবনা যে নাই, তাহা বলিতেছি না।

বাঙ্গালীর অধঃপাতের নমুনা—বিবিধ প্রবন্ধ

"আমরা কোন্ মতাবলম্বী ? আমরাও বাঙ্গালীর পশুত্ববাদী, আমরা ইংরাজী সংবাদপত্র হইতে এ পশুতত্ত্ব অভ্যাস করিয়াছি। কোন কোন তাম্রশ্মশ্রু ঋষির মত এই যে, যেমন বিধাতা ত্রিলোকের সুন্দরীগণের সৌন্দর্য্য তিল তিল সংগ্রহ করিয়া তিলোত্তমার সৃজন করিয়াছিলেন, সেইরূপ পশুবৃত্তির তিল তিল সংগ্রহ পূর্ব্বক এই অপূর্ব্ব নব্যবাঙ্গালী-চরিত্র সৃজন করিয়াছেন—শৃগাল হইতে শঠতা, কুক্কুর হইতে তোষামোদ ও ভিক্ষানুরাগ, মেষ হইতে ভীরুতা, বানর হইতে অনুকরণপটুতা এবং গর্দ্দভ হইতে গর্জ্জন এই সকল একত্র করিয়া দিঙ্মণ্ডল উজ্জ্বলকারী ভারতবর্ষের ভরসার বিষয়ীভূত এবং ভট্ট মক্ষমূলরের আদরের স্থল, নব্যবাঙ্গালীকে সমাজাকাশে উদিত করিয়াছেন।

"যেমন সুন্দরীমণ্ডলে তিলোত্তমা, গ্রন্থমধ্যে রিচার্ডসন্স্ সিলেক্সন্, যেমন পোষাকের মধ্যে ফকিরের জামা, মদ্যের মধ্যে পঞ্চ, খাদ্যের মধ্যে খিচুড়ি, তেমনই এই মহাত্মাদিগের মতে মনুষ্যের মধ্যে নব্যবাঙ্গালী। যেমন ক্ষীরোদ-সমুদ্র মন্থন করিলে চন্দ্র উঠিয়া জগৎ আলো করিয়াছিল—তেমনই পশুচরিত্র-সাগর মন্থন করিয়া এই অনিন্দনীয় বাবুচাঁদ উঠিয়া ভারতবর্ষ আলো করিতেছেন। রাজনারায়ণ বাবুর ন্যায় যে সকল অমৃতলুব্ধ লোক রাহু হইয়া এই কলঙ্কশূন্য চাঁদকে গ্রাস করিতে যায়েন, আমরা তাঁহার নিন্দা করি ; বিশেষতঃ রাজনারায়ণ বাবুকেই বলি যে, আপনিই এই গ্রন্থমধ্যে গো-মাংস ভক্ষণ নিষেধ করিয়াছেন, তবে বাঙ্গালীর মুণ্ড খাইতে বসিয়াছেন কেন ? গোরু হইতে বাঙ্গালী কিসে অপকৃষ্ট ? গোরুও যেমন উপকারী, নব্যবাঙ্গালীও তদ্রূপ। ইহারা সংবাদপত্ররূপ ভাণ্ড ভাণ্ড সুস্বাদু দুগ্ধ দিতেছে, চাকরী-লাঙ্গল কাঁধে লইয়া জীবনক্ষেত্র কর্ষণ পূর্ব্বক ইংরাজ-চাষার

ফসলের যোগাড় করিয়া দিতেছে, বিদ্যার ছালা পিঠে করিয়া কালেজ হইতে ছাপাখানায় আনিয়া ফেলিয়া চিনির বলদের নাম রাখিতেছে, সমাজ-সংস্কারের গাড়ীতে বোঝাই দিয়া রসের বাজারে চোলাই করিতেছে এবং দেশহিতের ঘানিগাছে স্বার্থসর্ষপ পেষণ করিয়া যশের তেল বাহির করিতেছে। এত গুণের গোরুকে কি বধ করিতে আছে?"

বাঙ্গালীর ধর্ম্ম

"অস্বার্থপর প্রেম এবং ধর্ম্ম, ইহাদের একই গতি একই চরম, উভয়েরই সাধ্য অন্যের মঙ্গল। বস্তুতঃ প্রেম ও ধর্ম্ম একই পদার্থ, সর্ব্বসংসার প্রেমের বিষয়ীভূত হইলে ধর্ম্ম নাশ প্রাপ্ত হয় এবং ধর্ম্ম যত দিন না সার্ব্বজনীন প্রেম-স্বরূপ হয়, তত দিন সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না, কিন্তু মনুষ্যগণ কার্য্যতঃ স্নেহকে ধর্ম্ম হইতে পৃথগ্‌ভূত রাখিয়াছে, এ জন্য ভালবাসার অত্যাচার নিবারণ জন্য ধর্ম্মের দ্বারা স্নেহের শাসন আবশ্যক।" (ভালবাসার অত্যাচার বিবিধ প্রবন্ধ)

সুখ

"প্রীতি সংসারে সর্ব্বব্যাপিনী। ঈশ্বরই প্রীতি—প্রীতিই আমার কর্ণে এক্ষণকার সংসারগীত। অনন্তকাল এই মহাসঙ্গীত সহিত মনুষ্য-হৃদয়তন্ত্রী বাজিতে থাকুক। মনুষ্যজাতির উপর যদি আমার প্রীতি থাকে, তবে আমি অন্য সুখ চাই না।" (কমলাকান্তের দপ্তর)

নব্যবাঙ্গালীর মাতৃদর্শনের ব্যাকুলতা।—জন্মভূমি

"এই কি মা? হাঁ, এই মা! চিনিলাম, এই আমার জননী জন্মভূমি—এই মৃন্ময়ী মৃত্তিকারূপিণী অনন্তরত্ন-ভূষিতা, এক্ষণে কালগর্ভে নিহিতা—রত্নমণ্ডিত দশভুজ দশদিকে প্রসারিত, তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত, পদতলে শত্রু বিমর্দ্দিত, পদাশ্রিত বীরজনকেশরী শত্রুনিপীড়নে নিয়োজিত, এ মূর্ত্তি এখন দেখিব না, আজি দেখিব না, কালি দেখিব না, কাল-স্রোত পার না হইলে দেখিব না, কিন্তু এক দিন দেখিব, দিগ্‌ভুজা নানাপ্রহরণধারিণী—শত্রুমর্দ্দিনী বীরেন্দ্রপৃষ্ঠ বিহারিণী, দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বাণী বিদ্যা-বিজ্ঞানমূর্ত্তিময়ী—সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয়, কার্য্যসিদ্ধিরূপী গণেশ। আমি সেই কালস্রোতোমধ্যে দেখিলাম, এই আমার মা সুবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমা।

"ডাকিলাম, সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে আমার সর্ব্বার্থ-সাধিকে! অসংখ্য সন্তানকুলপালিকে! এসো, মা, গৃহে এসো, ছয় কোটি সন্তানে একত্রে এককালে দ্বাদশ কোটি করযোড় করিয়া তোমার পাদপদ্ম পূজা করিব, ছয় কোটি মুখে ডাকিব, মা অম্বিকে——শক্তি দাও সন্তানে, অনন্তশক্তিদায়িনি! তোমায় কি বলিয়া ডাকিব, মা! এই ছয় কোটি মুণ্ড ঐ পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত করিব, এই ছয় কোটি কণ্ঠে ঐ নাম করিয়া হুঙ্কার করিব, এই ছয় কোটি দেহ তোমার জন্য পতন করিব; না পারি, এই দ্বাদশ কোটি চক্ষে তোমার জন্য কাঁদিব। এসো মা, গৃহে এসো, যাঁহার ছয় কোটি সন্তান, তাঁহার ভাবনা কি?

"উঠ মা হিরন্ময়ি! বঙ্গভূমি! উঠ মা, এবার সুসন্তান হইব, সৎপথে চলিব, তোমার মুখ রাখিব, উঠ মা দেবি দেবানুগৃহীতে! এবার আপনা ভুলিব, ভ্রাতৃবৎসল হইব, পরের মঙ্গল সাধিব, অধর্ম্ম, আলস্য, ইন্দ্রিয়াসক্তি ত্যাগ করিব। উঠ মা। এস ভাই সকল, আমরা এই অন্ধকার কালস্রোতে ঝাঁপ দেই, এস, আমরা দ্বাদশ কোটি ভুজে ঐ হিরন্ময়ী প্রতিমা তুলিয়া ছয় কোটি মাথায় বহিয়া ঘরে আনি। এস, অন্ধকারে ভয় কি? ঐ যে নক্ষত্র সকল মধ্যে মধ্যে উঠিতেছে নিবিতেছে, উহারা পথ দেখাইবে; চল চল, অসংখ্য বাহুবিক্ষেপে ঐ কালসমুদ্র তাড়িত, মথিত, ব্যস্ত করিয়া আমরা সন্তরণ করি, ওই স্বর্ণপ্রতিমা মাথায় করিয়া আনি। ভয় কি? না হয় ডুবিব, মাতৃহীনের জীবনে কায কি?"

ভদ্রমহোদয়গণ, আমার কথা শেষ হইল, বড় দুঃখ রহিয়া গেল—অনেক কথা বলিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু কি জানি কেন, তাহা আর বলি বলি বলা হ'ল না। *

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ।

* বঙ্কিম সাহিত্য-সম্মিলনের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত।

বাঙ্গালার বিপ্লব-কাহিনী

সপ্তম পরিচ্ছেদ

১৯০৬ খৃষ্টাব্দের প্রথমে ক'বাবু কলকাতায় আবার ফিরে এলেন। ক'বাবুর সহযোগী আর এক জন নেতাও এই সময় বাঙ্গালা দেশে এসেছিলেন। পূর্ব্বে তাঁ'কে গ'বাবু ব'লে পরিচয় দিয়েছি। এঁ'রা দু'জন এবং আরও তিন চার জন নেতা ও অনেক সহকারী নেতা মিলে কলকাতায় এই সময় গুপ্তসভার একটি অধিবেশন করেছিলেন। তা'তে তখনকার গুপ্তসমিতির কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে কতকগুলি মতলব আঁটা হয়েছিল। তা'র মধ্যে এই কয়টি উল্লেখযোগ্য ;—এক্‌সন্ (action) সুরু করা, স্থানে স্থানে ভবানীমন্দির স্থাপন করা এবং বিপ্লববাদের মুখপত্রস্বরূপ একখানা সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র প্রকাশ করা।

তখন এক্‌সন্ (action) বল্‌তে প্রধানতঃ আমরা এই বুঝতাম যে, ইংরাজ কর্ম্মচারীকে গুপ্তহত্যা এবং সরকার বা ইংরাজের টাকাকড়ি লুঠ করা। (প্রথমে কিন্তু "বিধবার ঘটী চুরির" বিধান মঞ্জুর হয় নি।) ঐ "এক্‌সনের" উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমাদের তখনকার ধারণা এই ছিল যে, উল্লিখিত রকমের একটা ঘটনা ঘটাতে পার্‌লে, সে সংবাদ দেশময় তীব্রবেগে রাষ্ট্র হয়ে সে বিষয় আলোচনার জন্য সর্ব্বসাধারণের মনকে আকৃষ্ট কর্‌বে। আর সে ঘটনার উদ্দেশ্য যে তা'রা আপনারাই সহজে ধ'রে নিতে পার্‌বে, সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ ছিল না। তা'তে ক'রে আপামরসাধারণের মধ্যে বিপ্লববাদের আদর্শ প্রচার সহজসাধ্য হ'বে, ইহাই নাকি ছিল বৈপ্লবিক গুপ্তসমিতির আদর্শ প্রচারের প্রধানতম পন্থা। দেশের জনসাধারণের মধ্যে ইংরাজের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণতা পূর্ব্ব হ'তে ক্রমে বেড়ে উঠার ফলে দেশের লোক মনে মনে এতে বেশ তৃপ্তি অনুভব কর্‌বে। এই প্রকারে বিপ্লববাদের প্রতি উত্তরোত্তর তা'দের সহানুভূতি গজিয়ে উঠবে। এ হেন সহানুভূতিই নাকি বিপ্লবকে সফল কর্‌বার ভিত্তিস্বরূপ।

অন্য উদ্দেশ্য ছিল--ইংরাজবধ বা ডাকাতীর দ্বারা নরহত্যা, বলপ্রয়োগ এবং নিষ্ঠুরতার প্রতি আমাদের স্বভাবসুলভ বিমুখতা, ভয় বা আতঙ্ক দূরীভূত করা; ডাকাতী কর্‌তে গিয়ে মারামারি কাটাকাটি ব্যাপারে যুদ্ধের উপযোগী সাহস, শক্তি ও অভ্যাস অর্জ্জন করা; আর ইহার দ্বারা গুপ্তসমিতির ব্যয়নির্ব্বাহ জন্য অর্থ সংগ্রহ করা; বিশেষ ক'রে ধনীদের কাছ থেকে মোটা-মুটি রকমের অর্থ-সাহায্য লাভ করা। কারণ, তখন অনেকে দু'পাঁচ হাজার টাকা, যে কোন একটা বড় ইংরাজের মুণ্ডপাতের জন্য পুরস্কার বা মজুরীস্বরূপ দিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন।

এই তথাকথিত "এক্‌সনের" উদ্দেশ্য সাধনের পথে যে কি বিষম অন্তরায় বা দোষ থাক্‌তে পারে, তা' আমাদের নেতাদের মাথায় আসেই নি। নেতারা যদিও অন্য দেশের বিপ্লবের ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞানসম্মত ঐতিহাসিক গবেষণা প্রভৃতি পুরাদস্তুর অধ্যয়ন করেছিলেন, এবং নিজেরাও গবেষণাপূর্ণ মতামত প্রকাশ কর্‌তেন, তথাপি তা'র অভিজ্ঞতা তাঁ'রা কেন যে কাযে না লাগিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের অভিনয় কর্‌তে গেলেন, তা' বোঝা মুস্কিল।

মনে হয়, একটা মারাত্মক রোগে আমরা—ভারতবাসী—প্রায় সকলে—প্রবলরূপে আক্রান্ত। সেটা হচ্ছে অনুকরণ-আতঙ্ক, বৈদেশিক বিপ্লবের অভিজ্ঞতার দ্বারা পরিচালিত না হওয়ার হয় ত ইহাই ছিল কতকটা কারণ। এ দেশের লোকের মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতাই হয় ত বা ইহার আর একটা কারণ। অথবা নেতাদের মানসিক দুর্ব্বলতা ও আলস্য অন্যতম কারণ ব'লেও নির্দ্দেশ করা যেতে পারে।

যাই হ'ক, একটা অন্তরায় সম্বন্ধে এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। বৈপ্লবিক খুন বা ডাকাতীর ফলে সকল দেশেই সরকারের পক্ষ হ'তে শান্তিশৃঙ্খলা অর্থাৎ দেশে তাঁ'দের প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য, দেশের লোকের উপর কৃত অপরাধের দণ্ডস্বরূপ অনেক প্রকার অন্যায় অত্যাচার সাধিত হয়ে থাকে। এটা অতিশয় মামুলী কথা। অবস্থাভেদে বিপ্লববাদীদের পক্ষে ইহার ফল ভালও হ'তে পারে, মন্দও হ'তে পারে।

ছুনিয়ার অনেক জাতির পক্ষে অন্যায় অত্যাচার নির্ব্বিবাদে সহ্য করা প্রকৃতিবিরুদ্ধ। তা'রা অন্যায়ের প্রতিশোধ দিতে গিয়ে মৃত্যুকেও শ্রেয়ঃ ব'লে মনে করে, তথাপি অন্যায় অত্যাচার সহ্য ক'রে বেঁচে থাক্‌বার প্রবৃত্তি তা'দের হয় না। এ স্থলে বৈপ্লবিক "এক্‌সন্" সুরু করার পর গভর্ণমেণ্টের তরফ থেকে যে উৎপীড়ন সংঘটিত হয়, তা'তে উক্ত "এক্‌সনের" উদ্দেশ্য সফল হওয়াই সম্ভব। কিন্তু ক্বচিৎ কোন জাতি অন্যায় অত্যাচারে এমনই অভ্যস্ত যে, অন্যায়কারীকে দণ্ড দেওয়ার বা অন্যায়ের প্রতীকার কর্‌বার প্রবৃত্তি তা'দের মনে জাগে না (অথবা ক্বচিৎ জাগলেও তা' ঘরে ব'সে কান্নাতে পর্য্যবসিত হয়), বরং যা'রা এ রকম অন্যায় অত্যাচার করে, তা'দের প্রতি গৃহপালিত পশুর মত ভয় বা ভক্তিপরায়ণ হওয়াটা তা'দের স্বভাবে পরিণত হয়েছে। তা'দের এই রকম সহনশীল ও ভয় বা ভক্তি-পরায়ণ স্বভাবের পরিবর্ত্তন না করিয়ে উল্লিখিত "এক্‌সন" সুরু কর্‌লে তা'র ফল অতি শোচনীয় হয়ে দাঁড়ানই সম্ভব। অর্থাৎ গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হ'তে ভীষণ উৎ-পীড়নের ফলে সমস্ত জাতিটা এমন ভীরু কাপুরুষ হয়ে পড়ে যে, তা' থেকে তা'দের উদ্ধার করা দুষ্কর ও সুদূর-পরাহত হয়ে যায়। আমাদের ভারতের পক্ষেও কি এই কথাটা খাটে না? আমাদের দেশটা যে এখন সেই "উদার তাঁত্তির" দেশে পরিণত হয়েছে, আর আমরা যে এই ক' বছরে এত রকমারি "কিছুমিছু" খাচ্ছি, এটা কিসের পরিণাম?

তা'র পর revolution শব্দের বাঙ্গালা অর্থ আমরা ক'রে নিয়েছি, বিপ্লব। দেখা যায়, ইতিহাসে revolution শব্দটা একটা বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কোন দেশের শাসনপ্রণালী যদি হঠাৎ কোন ভীষণ (violent) উপায়ে আমূল পরিবর্ত্তিত হয়, যদি সেই পরিবর্ত্তন সে দেশের জনসাধারণের সাহায্যে বা চেষ্টায় সাধিত হয়, যদি পরিবর্ত্তিত শাসনকার্য্যে সে দেশের সর্ব্বসাধারণের সম্যক্ অধিকারলাভ হয়, তবে সেই পরিবর্ত্তনকে "রিভলিউসন্" বলা হয়ে থাকে। কিন্তু বিপ্লবের চেষ্টাজনিত সংঘর্ষের পরিণামে যদি ঐ প্রকার পরিবর্ত্তন সাধিত না হয়, তবে কেবল পরিবর্ত্তন আন্‌বার চেষ্টাকে পরে "রিভলিউসন্" বলা হয় নি। আর এই চেষ্টার ফলে শাসনপ্রণালীর উক্ত প্রকার আমূল পরি-বর্ত্তন না ঘটে, যেখানে খালি শাসনকর্ত্তার পরিবর্ত্তন ঘটেছে, সেখানেও তা "রেভলিউসন" ব'লে অভিহিত হয় নি।

রাজতন্ত্রের পরিবর্ত্তে যখন ঐ উপায়ে গণতন্ত্র, সাধারণতন্ত্র বা সমাজতন্ত্র শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হয়েছে, তখনই সেই পরিবর্ত্তনকে "রেভলিউসন" বলা হয়েছে। কিন্তু গণতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র প্রভৃতির বদলে যখন রাজতন্ত্র শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করা হয়েছে, তখন সে পরিবর্ত্তনকে বিশেষ ক'রে "রেভলিউসন" বলা হয় নি।

বিপ্লব শব্দটি আমাদের দেশে ঐ রকম অর্থে ব্যবহৃত হয়েছিল কি না সন্দেহ। যদি হ'ত, তবে যে জনসাধা-রণের জন্য তথাকথিত বিপ্লবসংঘটন কর্‌বার চেষ্টা হচ্ছিল, সেই জনসাধারণের অন্ততঃ কাউকেও জান্‌তে দেওয়া হ'ত যে, ইংরাজের শাসনপ্রণালীর বদলে কি প্রকার নতুন শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করা হ'বে। এইটি স্পষ্ট ক'রে জানান হচ্ছে বিপ্লববাদ প্রচারের গোড়ার কথা।

অধিকন্তু জনসাধারণ ত' অনেক দূরের কথা, আমা-দের গুপ্তসমিতির শতকরা ৯৯ জনের মনে এ সম্বন্ধে কোন চিন্তাই আসে নি। আমরা জান্‌তাম, ইংরাজ-রাজের বদলে দেশের কোন লোক রাজা হ'লে সেই রাজাটি রামচন্দ্র প্যাটার্ণ হবেই। আর সেই সঙ্গে ইহাও জান্‌তাম, রামরাজ্য হচ্ছে আদর্শের চরম। রামরাজ্যের পূর্ণ পত্তন হ'লেও ইংরাজ রাজার পরিবর্ত্তে স্বদেশী রাজার আমদানীকে বিপ্লব বলা যেতে পারে না; কারণ,

ইংরাজের বেলায় যে রাজতন্ত্র শাসন প্রণালী আছে, স্বদেশী হবু রাজার (মহেন্দ্র প্রতাপের ?) বেলায়ও তাই হ'বে। অর্থাৎ এতে কেবল রাজার পরিবর্তন,—শাসনপ্রণালীর পরিবর্ত্তন নয়। কাযেই একে বিপ্লব আখ্যা দেওয়া অসঙ্গত।

তা'র পর ইতিহাসে এ-ও দেখতে পাওয়া যায় যে, বিপ্লবের কায বা "একসন্" আরম্ভ কর্‌বার পূর্ব্বে দেশবাসীর চরিত্রে কতকগুলি সদ্‌গুণ ফুটিয়ে তোল্‌বার চেষ্টা হয়ে থাকে। ইহা বহুকালব্যাপী শিক্ষাসাপেক্ষ। কিন্তু ইহাই প্রকৃত জাতীয় শিক্ষার লক্ষ্য এবং ইহাই বিপ্লববাদ প্রচারের ভিত্তিস্বরূপ। সেই গুণগুলি যত দিন না জাতীয় চরিত্রে সম্যক্ পরিস্ফুট হয়, তত দিন বিপ্লবকার্য্য অর্থাৎ "একসন্" আরম্ভ করা সম্ভব হয় না, অথবা আরম্ভ কর্‌লে বিপ্লবচেষ্টা ব্যর্থ হয়। তিনবার ফরাসী-বিপ্লবের মধ্যে আগের দু'বার তাই ব্যর্থ হয়েছিল।

যাই হ'ক্, সর্ব্বপ্রধান গুণ হচ্ছে যুক্তিপ্রবণতা, অর্থাৎ শাস্ত্র, লোকাচার বা পূর্ব্ববর্ণিত ঠাকুরমা'র সিদ্ধান্ত অথবা আদেশের অপেক্ষা নিজের যুক্তির দ্বারা নিষ্পন্ন সিদ্ধান্তের উপর অধিক নির্ভর কর্‌তে, শুধু শেখা নয়, তা'তে অভ্যস্ত হওয়া। "পরের বুদ্ধিতে রাজা হওয়ার চেয়ে নিজের বুদ্ধিতে ফকির হওয়া ভাল" এই নীতিতে অভ্যস্ত হওয়া।

তা'র পর অতীতে বীতশ্রদ্ধা, বর্ত্তমানে অতিষ্ঠতা, ভবিষ্যতে উন্নতির জন্য অসহিষ্ণুতা, পরিবর্ত্তনে আগ্রহ, নূতনত্বে স্পৃহা ইত্যাদি গুণ সকলও জাতীয় চরিত্রে ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা সম্যক্ সফল না হ'লে এবং উন্নতির পথরোধক বা অবনতির কারণ কত যুগের অভ্যস্ত জাতীয় চরিত্রের বদ্‌গুণগুলো অন্ততঃ পরিহারের যোগ্যতা সম্যক্ অর্জ্জন কর্‌বার পূর্ব্বে বৈপ্লবিক কার্য্য আরম্ভ ক'রে কোন দেশে কোন বিপ্লব সম্পূর্ণরূপে কখনও সাধিত হয়েছে ব'লে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় না। শুধু বিফলতা নহে, বরং পুনরায় বিপ্লবসংঘটনের আশা পর্য্যন্ত সুদূরপরাহত হয়েছে বলেই দেখতে পাওয়া যায়। ভারতের পক্ষেও কি ইহা সত্য নহে? ইহার জন্য দায়ী কে?

যাই হ'ক্, গোড়াতে আমাদের যে "একসন্" আরম্ভ হয়েছিল, তা'র নমুনা হচ্ছে দুই একটা ফিরিঙ্গী ঠেঙান আর তা'দের ছড়িটা কিংবা টুপীটা কেড়ে নেওয়া; তাও সত্যি ক'রে ঘটেছিল কি না সন্দেহ। এই কাযের জন্য বাহাদুরী দিতে শুনেছি মাত্র।

ভবানী-মন্দির

এই সময়ের কিছু পূর্ব্ব হ'তে 'আনন্দ-মঠের' অনুকরণে "ভবানী-মন্দিরে"র খেয়াল দেবব্রত বাবুর মাথায় এসেছিল। শুনেছিলাম, তাঁ'র মৎলব এই ছিল যে, লোকচক্ষুর আড়ালে, পাহাড়ে বা জঙ্গলে এক একটি কুঠরী তয়ের ক'রে তা'তে কালীমূর্ত্তি স্থাপন করা হ'বে। ভক্তদের ভয় ও ভক্তি উদ্রেকের জন্য যত রকম আড়ম্বর ও উপসর্গ হ'তে পারে, তা'তে তা থাক্‌বে। এক জন সত্যানন্দের মত গেরুয়াধারী পূজারী সেখানে থেকে ভবানীর নানা রূপের নানা রকম ব্যাখ্যা দিয়ে ভক্তদিগকে ভবানীরূপী দেশ উদ্ধারের জন্য সম্মোহিত কর্‌বে। খরচ সঙ্কুলানের এবং পুলিসের চোখে ধূলা দেওয়ার জন্য সেখানে চাষ-আবাদের চেষ্টা হ'বে। শক্তি অনুশীলনের জন্য লাঠী, তলোয়ার, বন্দুক, পিস্তল প্রভৃতি ব্যবহার শিক্ষার ব্যবস্থা থাক্‌বে। আর সেখানে থাক্‌বে সংগৃহীত বন্দুক, গোলাগুলী প্রভৃতি অস্ত্র-শস্ত্র লুকিয়ে রাখবার সুবিধা। যখন ইংরাজের সঙ্গে যুদ্ধ বেধে উঠ্‌বে, তখন ঐ ভবানী-মন্দির দুর্ভেদ্য কেল্লায় পরিণত হ'বে। দুর্ভেদ্য, কারণ, মন্দিরে প্রবেশ ক'রে ধর্ম্মের পবিত্রতা নাশ করা ইংরাজের আইনে নিষিদ্ধ।

এই সকল মৎলবের আভাস ও 'আনন্দ-মঠের' অনুকরণে গুপ্তসমিতি পরিচালনের কায়দা-কানুনের ইঙ্গিত দিয়ে 'ভবানী-মন্দির' নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশিত ও বিলান হয়েছিল।

এই সময় হ'তে ইংরাজ-বিদ্বেষমূলক পুস্তিকা ও বিজ্ঞপ্তিপত্র ডাকে স্কুল-কলেজে, উকীল ও মোক্তার বার প্রভৃতিতে প্রেরিত হ'তে সুরু হয়েছিল।

ইহার কিছু দিন পরে "ভবানী-মন্দির" স্থাপনার জন্য মেদিনীপুর ও বাঁকুড়ার সীমানায় "কনকুলমা" বা "ছেলাপাতর" নামক স্থানে কয়েক বিঘা জমী বন্দোবস্ত নিয়ে স্বদেশের কাযে সমর্পিতপ্রাণ কয়েক জন ছেলেকে আবাদ কর্‌তে পাঠান হয়েছিল। দারুণ গ্রীষ্মকাল

পাহাড় যায়গা; তু' তিন মাইল দূর থেকে জল বয়ে এনে, রান্না, মাজা, ধোয়া প্রভৃতি সারতে হ'ত। খাদ্যের মধ্যে মিল্‌ত মোটা চাল, মসুর ডাল, আর চিঁড়ে-গুড়। বলা বাহুল্য যে, ছেলেরা নিজেরাই বামুন-চাকরের কায কর্‌ত। তা'র উপর পাহাড়ে যায়গায় শুক্‌নো মাটী কেটে বাঁধ দিতে হ'ত। এ রকম হাড়ভাঙ্গা খাটুনি ও চেষ্টার পরেও আবাদের কোন সম্ভাবনা না দেখতে পেয়ে এবং অসুস্থ হয়ে ছেলেরা একে একে স'রে পড়্‌তে বাধ্য হয়েছিল। শেষ পর্য্যন্ত যে ছেলেটি "মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীরপাতন" পণ ক'রে প'ড়ে ছিল, সেই "তুর্গাকে" এক দিন বৈশাখের তুপুর রোদে খালি মাথায় (মনে হয় খালি পায়েও) ১০৪ ডিগ্রী জ্বর নিয়ে পাতুরে রাস্তায় প্রায় ৪০ মাইল হেঁটে মেদিনীপুরে ফিরে আস্‌তে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেছলাম। তা'র মত দেশের জন্য এতদূর কর্ত্তে পারি নি ব'লে অন্ততঃ তখনকার মত আমার মনে আত্মগ্লানি এসেছিল। এ হেন ছেলেরা ক্রমে নেতাদের বেগতিক দেখে ঘরে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছিল। এত কাল ইহারা যে রকম দৈন্যক্লেশ প্রভৃতি স্বইচ্ছায় ভোগ করেছিল, সশ্রম কারাদণ্ডের সঙ্গেও তা'র তুলনা হয় না।

যাই হ'ক, মতলব অনুযায়ী "ভবানী-মন্দির" আর কোথাও তখন গ'ড়ে ওঠে নি। তবে "ভবানী-মন্দির" স্থাপনের চেষ্টা বিফল হ'লেও তা'র উদ্দেশ্যসিদ্ধির চেষ্টা অন্য রকমে হয়েছিল।

তখন আমরা শুনেছিলাম, ক'বাবু অলৌকিক শক্তি-লাভের জন্য কোন এক সিদ্ধপুরুষের কাছে মন্ত্র নিয়ে এসেছেন এবং সাধনা কর্‌ছেন। তিনি প্রাতঃস্নানের পর চণ্ডীপাঠ ও পূজা সমাধা ক'রে তবে বাহিরে আস্‌তেন। গুজরাটী বা মারাঠী গুরু চণ্ডীপাঠের ব্যবস্থা কেমন ক'রে দিয়েছিলেন, তখন তা ভেবে পাই নি, কারণ, আমার ধারণা ছিল, তুর্গাপূজা ও চণ্ডীপাঠের চলন বাঙ্গালাদেশের বাইরে কোথাও নাই। এখন মনে হয়, চণ্ডীর অসুরবধ ব্যাপারের সঙ্গে বর্ত্তমান যুগের ইংরাজবধ ব্যাপারটার উপমা বেশ খাপ খায়। তা'তে আবার আমাদের মনটা এমনই যুক্তিবিমুখ যে, যুক্তির মধ্য দিয়ে আমাদের মন সত্য ধর্‌তে অভ্যস্ত নয়। আমরা উপমার দ্বারাই সহজে সত্য দেখতে পাই,আর অন্ধবিশ্বাস এবং ভক্তি দ্বারাই তা' সম্যকরূপে উপলব্ধি করি। এ বিষয় আমরা পূর্ব্বেই ধর্ম্মের মধ্য দিয়ে স্বদেশ-উদ্ধারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আলোচনায় লিখেছি। চণ্ডীর দ্বারা সে উদ্দেশ্য-সাধনের অধিক সম্ভাবনা ছিল। তা' ছাড়া বঙ্কিম বাবুর 'আনন্দমঠে' ভবানী ও দশমহাবিদ্যার অভাব ছিল না, কিন্তু তা'তে গীতাপাঠেরও ব্যবস্থা ছিল। সে যেমন হ'ক, ক'বাবু অল্পদিন পরে মনে হয় বুঝতে পেরেছিলেন যে, বাঙ্গালাদেশে তুর্গাপূজার ও চণ্ডীর প্রচলন সত্ত্বেও গীতার প্রভাব অপেক্ষাকৃত ঢের বেশী। অথচ চণ্ডীর সুবিধা-মত হরেক রকম গবেষণাপূর্ণ দার্শনিক ব্যাখ্যা বোধ হয় চলে না। কিন্তু গীতার দার্শনিক ব্যাখ্যার অন্ত হয় না, তাই বোধ হয়, ক'বাবু চণ্ডী ছেড়ে অবশেষে গীতা ধরেছিলেন।

বস্তুতঃ ধ্যানধারণাদির দ্বারা অলৌকিক শক্তি লাভ ক'রে ভক্তকে তাক্ লাগান ছাড়া সাধারণের হিতজনক কোন বড় রকম বাস্তব কায (সে কালে নাকি সাধিত হ'ত) কিন্তু এ কালে সত্যি ক'রে সাধিত হয় নি; আপাততঃ হওয়ার সম্ভাবনা আছে ব'লে সুস্থ ও স্বাভাবিক মস্তিষ্কে ধারণা করাও যায় না। তবে এর দ্বারা বিপুল অলৌকিক শক্তি লাভ করা যায়; অর্থাৎ এই উপায়ে লোকমত (popularity) সংগ্রহ যে চূড়ান্ত মাত্রায় হয়ে থাকে, বিশেষতঃ আমাদের ভক্তির দেশে, আর সেই পপুলারিটী যে লৌকিক ব্যাপারে অতুলনীয় শক্তি, সে বিষয়ে অন্ততঃ এখন কাহারও সন্দেহ করবার বোধ হয় কিছু নেই।

যুগান্তর

আমাদের বারীণও এই সময় বাঙ্গালায় ফিরে এসেছিল। আবার সে গুপ্ত সমিতি গঠনে উঠে প'ড়ে লেগে গেল। তা'র প্রধান কায হয়েছিল উল্লিখিত সংবাদপত্র বাহির করা। প্রথমে অতি সামান্যভাবে 'যুগান্তর' নাম দিয়ে একখানা সাপ্তাহিক প্রকাশ করা হ'ল। ভাষা ও ভাবের নূতনত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব দেখে অনেকে 'যুগান্তরের' পক্ষপাতী হ'তে লাগলেন। কলিকাতায় চাঁপাতলা লেনে একটি বাড়ী ভাড়া নিয়ে সেখানে 'যুগান্তর' আফিস খোলা হ'ল। প্রথমে 'যুগান্তরে' যাঁ'রা লিখতেন, তাঁ'রা

বিলাতী শিক্ষায় ও স্বাধীন হওয়ায় অভ্যস্ত এবং বোধ হয়, বাঙ্গালা খবরের কাগজ পড়তে অভ্যস্ত ছিলেন না। কাযেই সে কালে এ দেশের বাঙ্গালা কাগজে যে ধরণে প্রবন্ধাদি লিখিত হ'ত, তা থেকে 'যুগান্তরের' লেখবার ধারা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল। তাঁ'দের লিখিত যে সকল বাঙ্গালা প্রবন্ধ 'যুগান্তরের' জন্ম দিতেন, তা' প্রায়ই ইংরাজী বাঙ্গালা শব্দ মিশিয়ে লেখা হ'ত। দেবব্রত বাবু, সখারাম বাবু, ভূপেন বাবু ও অন্য দুই এক জন ইংরাজী শব্দগুলির বাঙ্গালা অনুবাদ দিয়ে ঐ প্রবন্ধগুলির ভাষাকে প্রাঞ্জল করতেন। দেবব্রত বাবু ও সখারাম বাবু নিজেরাও সুন্দর লিখতেন। অন্যান্য লেখকদের উপরও তাঁ'দের প্রভাব যথেষ্ট ছিল। গ্রাহকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে লেখকও অনেক বাড়তে লাগল।

প্রথম প্রথম 'যুগান্তরের' লেখার মধ্যে হিন্দুয়ানীর ভাব খুব বেশী না থাকলেও, একবারে secular অর্থাৎ ধর্ম্মসম্পর্কবিহীন ছিল না। প্রথমেই সম্পাদকীয় স্তম্ভের উপর গীতার একটি শ্লোক থাকত, তা'র পর ক্রমে হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র হ'তে মাঝে মাঝে উপমা, quotation, allusion, প্রবন্ধ প্রভৃতি থাকত। প্রচ্ছদে একটি পতাকা, তা'তে খড়্গধারী কালীর হাতের ছবি ছিল। এতে মনে হয়, ইহার পরিচালক নেতারা মুসলমান-সমস্যা সম্বন্ধে চিন্তা করেন নি।

বিপ্লববাদ সমর্থন ক'রে যে সকল প্রবন্ধাদি বাহির হ'ত, তা' খুব মনোজ্ঞ হ'ত এবং সে জন্য লোককে বিপ্লবপন্থীর দলে টেনে আনার সুবিধা হ'ত। দেশের লোক ধারণাই কর্ত্তে পারত না যে, এই নিজ্জীব শান্তি-প্রিয় বাঙ্গালী, যা'রা যুদ্ধের নামে মূর্চ্ছা যায়, তা'রা কি রকম ক'রে হঠাৎ দলে দলে ইংরাজ পল্টনের বন্দুক-কামানের সামনে লড়বে। বন্দুক, গোলাগুলী, বারুদই বা কোথা হ'তে আসবে? এত টাকাই বা কে দেবে? এই রকম সকল অসম্ভব কেমন ক'রে সম্ভব হ'তে পারে, নানাভাবে 'যুগান্তরে' তাই লিখে দেশের লোকের ধারণা বদলে দেওয়ার চেষ্টা হ'ত।

'যুগান্তরে' স্বদেশপ্রীতির চাইতে ইংরাজবিদ্বেষ বাড়াবার চেষ্টা বেশী হ'ত। 'আনন্দ-মঠের' যুদ্ধবিগ্রহের লক্ষ্য ছিল কেবল সনাতন ধর্ম্মের উদ্ধার। ইংরাজকে তাড়িয়ে ভারতকে স্বাধীন করবার উদ্দেশ্য যে সনাতন ধর্ম্মের পুনরুদ্ধার ছাড়া আরও কিছু ছিল, এবং সে কিছু যে কি, তাহা কোন রকমে স্পষ্ট ক'রে দেশকে বোঝাবার চেষ্টা যুগান্তরে হয়েছিল ব'লে মনে হয় না। তবে দেশ স্বাধীন হ'লে যে নুণের ট্যাক্স, চৌকিদারী ট্যাক্স বা আরও অনেক ট্যাক্সের মধ্যে কোনটা বা একেবারে দিতে হ'বে না, আর কোনটা অনেক কম দিতে হবে, বড় বড় চাকরীগুলো সব আমরাই পা'ব, আবশ্যক দ্রব্যের মূল্য ইচ্ছামত কমিয়ে দিতে পারব ইত্যাদি মামুলী স্তোকবাক্যগুলি 'যুগান্তরে'ও স্থান পেত।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে মার্চ্চ কিংবা এপ্রিল মাসে প্রথম 'যুগান্তর' বেরিয়েছিল। সে সময় প্রায় অন্য সকল গুপ্ত সমিতি ক'বাবুর দলে অল্প-বিস্তর যোগ দিয়েছিল। এক বছরের মধ্যেই ঐ সকল দলের নেতারা বারীণের আধিপত্যপ্রিয়তার জ্বালায় ও বারীণের প্রতি ক'বাবুর পক্ষপাতিতায় স'রে পড়তে বাধ্য হয়েছিলেন। প্রায় এক বছর পরে 'যুগান্তরের' যখন বেশ আয় হচ্ছিল, তখন ক'বাবুর দলের হাত থেকে যুগান্তরের ভার ব্যবসায়-বুদ্ধিসম্পন্ন অন্য এক দলের হাতে গেছল। তখন 'যুগান্তরের' প্রথম সম্পাদক ভূপেন বাবু জেলে। এ বিষয় আমরা পরে বলব।

ঐ 'যুগান্তর' আফিসেই তখনকার গুপ্তসমিতির আড্ডা ছিল। ইহাই বঙ্কিম-বাবুর আনন্দমঠের বা দেবব্রত বাবুর ভবানী-মন্দিরের স্থানীয় ছিল বললেও হয়। কিন্তু ভবানী-মূর্ত্তি এতে ছিল না। নীচের তলায় ছিল প্রেস। উপরের তলায় একটি ছোট্ট কুঠরীতে একটি কাঠের সিন্দুক ছিল। তা'তে থাকত নাকি অস্ত্র-শস্ত্র। তা'র সারান ও পর্য্যবেক্ষণের ভার ছিল একটি অজাতশ্মশ্রু বালক নেতার উপর। ইঁহার কাছে অস্ত্র-শস্ত্র সংগ্রহের একটু বেশী রকম লম্বা-চওড়া বচন শুনে এক দিন গোটা-কত রিভলবার কিনতে গেছলাম। দেবব্রত বাবু সে দিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সেই অস্ত্রাগারে তিনি আমায় খুব ভারী চালে অন্ততঃ আধ ঘণ্টা অনেক রকম বচন দিলেন। আমি রিভলবারের কথা তুলতে তিনি সেই বালক নেতাকে ডেকে রিভলবার দেখাতে আদেশ

দিলেন। একটি সেকেলে রিভলবার আমায় দেখান হ'ল। আমি নগদ মূল্যস্বরূপ কয়েকখানা নোট বার ক'রে তিনটে কি চারটে রিভলবার চেয়ে বসলাম। তা'তে বুঝলাম, সেই একটিমাত্র সম্বল। আর বুঝলাম, অস্ত্রাগারের শূন্যতা পূরণের জন্য ছিল এত বচন। শীঘ্র পাঠিয়ে দেওয়ার কড়ারে মূল্য জমা নিলেন। তা'র পর অনেক তাগাদা ক'রে দু' মাস পরে একটামাত্র ভাঙ্গা পুরান রিভলভার আদায় করতে পেরেছিলাম। তা'ও সারাইবার জন্য পাঠিয়ে আর ফেরত পাইনি।

এই চাঁপাতলার আড্ডাতেই প্রথম নরেন গোঁসাইর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। তা'র সুন্দর সুঠাম দেহে গৈরিক ছিল। অনুসন্ধানে জেনেছিলাম, তখন সে যোগ-সাধনা কচ্ছিল। মেদিনীপুরে আমর্শীর কাছে তা'দের জমীদারী আছে। তা'দের বাড়ীর অবস্থা সম্বন্ধে পূর্ব্ব হ'তেই জানতাম। তা'র স্ত্রী ছেলেপিলেও ছিল। এ অবস্থায় সে আগে গৃহত্যাগী বৈরাগী হয়েছে, তা'র উপর গুপ্তসমিতির মরণমন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছে ভেবে যেমন অবাক্ হয়েছিলাম, তেমনই তা'র প্রতি আমার শ্রদ্ধাও গজিয়ে উঠেছিল।

[ক্রমশঃ।

শ্রীহেমচন্দ্র কানুনগোই।

কেন ?

তুমি, ভাব, সখি, কেন শুধু আমি
ফেলি নয়নের জল,
কেন ?—কেমনে বুঝাব বল্।

কেন ঝরে জল কি কহিব তা'র,
মুখে হাসি এ যে অন্তর আঁধার,
পরাণের সাথে দিন দিন আর,
করিব কতই ছল।

দেখিছি স্বপনে, প্রাণেশ আমার,
এসেছিল ফিরি—নাহি ভুল তার,
পরশ এখনো রয়েছে লো জাগি—
কেমনে দেখাব বল্॥

ফিরি চাই শুধু বাতায়ন পানে,
উঠি বসি, খুঁজি আকুল নয়ানে,
কই আসে সখি—বল্ লো আমার,
সে নিরদয় চঞ্চল।

ডাকিলে কোকিল—নাচিলে ময়ূর,
ভাবি মোর প্রিয় নহে বহু দূর,
ক্ষণে ক্ষণে যেন শুনি পদধ্বনি,
কেঁপে উঠে হৃদি-তল॥

আসিবে যখন কহিব কি কথা ?
ঝরি' আঁখি-জল জুড়াবে কি ব্যথা ?
তনু-লতা মোর তুলে লবে কি সে –
নিভে যাবে তুষানল॥

কত নিতি নিতি রচিব স্বপন,
সকলি যে সখি—হায় পুরাতন,
তাই নব বেদনা আবরি' দু'হাতে
ফেলি নয়নের জল।

কেন কাঁদি, সখি, কেমনে বুঝা'ব—
—শূন্য হৃদয়-তল॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়



পর্দ্দার অন্তরালে

২

ইরাক ও রুম

ইরাক ও রুম দেশেও পর্দ্দাপ্রথা প্রচলিত। এই দুইটি দেশে—বিশেষতঃ রুম বা এসিয়ামাইনারে ভারতের মত বিস্তর জাতির বাস, যথা,—ওসমানলি তুর্ক, সার্কেসিয়ান, জর্জ্জিয়ান, কুর্দ্দ, তাতার, তুর্কী, গ্রীক, আর্ম্মাণী, ইহুদী, আরব ইত্যাদি। এই সকল 'নানা' জাতির 'নানা' আচার-ব্যবহার; সুতরাং সকলেই মনে করিতে পারেন যে, আচারব্যবহারভেদে এই দুই দেশে পর্দ্দার আইনও বিভিন্ন। কিন্তু পর্দ্দার আইনের কড়াকড়ি সর্ব্বত্র সমান না হইলেও দেখা যায়, দুই দেশের সাধারণ নারীর মধ্যে আচার-ব্যবহারের বিশেষ পার্থক্য নাই।



তুর্কী নারী—জলাধার কক্ষে

রুমের নারী সৌন্দর্য্যের জন্য বিখ্যাত। সামান্য গ্রাম্যবালিকা হইতে আরম্ভ করিয়া বে ও পাশার পর্দ্দানশীনা মহিলা পর্য্যন্ত প্রায় সকলেই অনবদ্যাঙ্গী সুন্দরী। তুর্কী রুম মহিলা এবং গ্রীক ও সার্কেসিয়ান মহিলা সুকেশী, সুনয়না, সুদতী, সদা হাস্যস্ফুরিতাধরা। ইহুদী ও আরবের মধ্যেও সুন্দরীর অভাব নাই। ইহাদের মধ্যে আবার স্মার্ণা বন্দরের ও বসফোরাস প্রণালীর তটের সুন্দরীরা ভুবনমোহিনী। কুর্দ্দ ও সার্কেসিয়ান নারীরা অতীব সুন্দরী। কিন্তু যে ভাবে এ সব দেশের সাধারণ নারীকে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়, তাহাতে সে সৌন্দর্য্য যে একবারে অন্তর্হিত হয় না, ইহাই আশ্চর্য্য।

শিক্ষার বিস্তার

এখন রুম ও ইরাকে শিক্ষার ও সভ্যতার বিস্তার হইতেছে। দেশের সর্ব্বত্র মুসলমান, খৃষ্টান ও ইহুদী বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, তবে সে সব বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষাদান করা হয়। ধনবান্ মুসলমানরা তাঁহাদের পুত্রদিগকে য়ুরোপের নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভার্থ প্রেরণ করেন

বটে, কিন্তু নারীদিগের সম্বন্ধে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা। গাজী মুস্তাফা কামাল পাশা যে দিন হইতে তরবারি হস্তে তুর্কীর স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, যে দিন হইতে বর্ত্তমান তুর্কী কর্ত্তৃপক্ষ খলিফা সুলতানকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তুরস্কে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, সেই দিন হইতেই তুর্কী মহিলারও অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এখন তুর্কী মহিলা (অন্ততঃ য়ুরোপে) পুরুষের ন্যায় পূর্ণ স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা পুরুষের ন্যায় দেশের সকল কাযে আত্মনিয়োগ করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন। গাজী মুস্তাফা কামাল পাশার পত্নী স্বয়ং উচ্চশিক্ষিতা মহিলা। এখন তুর্কী মহিলারা প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা দিয়া থাকেন। তাঁহাদের শিক্ষা-দীক্ষারও স্বতন্ত্র ব্যবস্থা হইয়াছে।

তুর্কী কৃষাণ-নারী

সার্কেসিয়ার নারীর মত পরিশ্রমী ও কার্য্যদক্ষ। তাহাদের পুরুষরা তাহাদের শ্রমের অংশ সমানভাবে গ্রহণ করে। কিন্তু তুর্কী কৃষাণ-পুরুষরা নারীর ন্যায় শ্রমশীল



পথিভ্রমণে তুর্কী মহিলা



পার্ব্বত্য ঝরণার ধারে তুর্কী বালিকা

নহে। তুর্কী কৃষাণ-নারীরা অধিকাংশ কায করে, তাহারা চরকায় সূতা ও পশম কাটে, কার্পেট ও গৃহের পরিধেয় বস্ত্র বয়ন করে, তাঁবু ও থলিয়া প্রস্তুত করে। কেবল ইহাই নহে, তাহারা ডাল ভাঙ্গে, গম গুঁড়া করে, পশু চরায়, রুটী তৈয়ার করে,—বস্তুতঃ ঘরের কায সবই তাহাদের দ্বারা সম্পাদিত হয়। এ দিকে গৃহনির্ম্মাণের জন্য তাহারা সূর্য্যপক্ক ইট তৈয়ার করে।

পর্দ্দা-প্রথা

এই শ্রেণীর নারীর মধ্যে পর্দ্দা-প্রথা যে অতীব শিথিল, তাহা বোধ হয় কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। তুর্কোমান, কুর্দ্দ, সার্কেসিয়ান, ইহুদী ও গ্রীকদিগের মধ্যে পর্দ্দা-প্রথা নাই, উহাদের নরনারী অবাধে মিলামিশা করিয়া থাকে। অবশ্য ইহাদের নারীরাও মস্তকে অবগুণ্ঠন দেয়, কিন্তু উহা সূর্য্যতাপ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য, আবরুর জন্য নহে। মাথার উপর উহাদের অবগুণ্ঠন থাকে বটে, কিন্তু মুখ কখনও আবরিত হয় না



বেথলেহেমের ইহুদী বালিকা

পথে অপরিচিতের সহিত সাক্ষাৎ হইলে উহাদের নারীরা মুখের উপর অবগুণ্ঠনটুকু একটু টানিয়া দিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দণ্ডায়মান হয়।

আচারব্যবহারের এমনই সংক্রামক গুণ যে, ইহুদী ও গ্রীকদিগের মধ্যে পর্দ্দা বা আবরুর প্রথা প্রচলিত না থাকিলেও উহাদের স্ত্রীলোকরা সমুদ্রতীর হইতে দূরে অবস্থিত রুম বা ইরাকের মধ্যস্থ বিলায়েৎ সমূহের অধিবাসী হইলে পথে অপরিচিত পুরুষ দেখিলে কুর্দ্দ ও তুর্কোমান নারীদের মত মুখমণ্ডলের উপর অবগুণ্ঠন টানিয়া দেয়। এই স্বভাব তাহারা তুর্কী ভদ্রমহিলাদের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছে। গ্রীক ও আর্ম্মাণী কৃষাণ ও দিনমজুর নারীদের অবস্থা ও আচারব্যবহার ঐ শ্রেণীর মুসলমান নারী হইতে বিশেষ বিভিন্ন নহে।

বিদেশীর ধারণা এইরূপ যে, তুর্কী হারেমে তুর্কী নারীরা জেল-কয়েদীর মত বাস করেন, এবং তাঁহাদের অভিভাবকরা তাঁহাদের প্রতি ভীষণ অত্যাচার আচরণ করেন। বিদেশীয় অনেক নাটক নভেলে এইরূপ হারেমের চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্রে এ কথা সত্য নহে। কারণ, যদিও তুর্কী নারীরা স্বামী বা অতি নিকট পুরুষ আত্মীয় ব্যতীত পরপুরুষের সহিত কোনও সম্পর্ক রাখিতে পারেন না, তথাপি তাঁহার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা কঠোররূপে নিয়ন্ত্রিত নহে। গৃহকর্ত্রী স্ত্রী তাঁহার সংসারের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী; কাহারও অনুমতি গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে ঘরে বাহিরে আসা যাওয়া করিতে হয় না; পরন্ত তাঁহার নিজস্ব সম্পত্তির ও ঘরের ক্রীতদাসদাসীর উপর পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব থাকে। এক বিবাহই স্বাভাবিক; যাঁহারা ধনী ও বিলাসী, তাঁহারাই একাধিক বিবাহ করিয়া থাকেন; এ জন্য স্বামিস্ত্রীর মধ্যে যথার্থ ভালবাসার অভাব হয় না। বিশেষতঃ মুসলমান তুর্কী দেশে নারী যদি পুত্র-সন্তানের জননী হয়েন, তাহা হইলে তাঁহার সম্মান অসাধারণ। এই হেতু যদি কেহ ক্রীতদাসীর গর্ভে পুত্র-সন্তান উৎপাদন করেন, তাহা হইলে আইন অনুসারে সেই ক্রীতদাসীকে বিক্রয় করিতে পারেন না। ক্রীতদাসীর গর্ভজাত পুত্রও ঘরের



এশিয়ামাইনারের মধ্যভাগের গ্রীক মহিলা

পুত্ররূপে গণ্য হয়, এবং অন্যান্য পুত্রের মত পিতৃ-সম্পত্তির অধিকারী হয়।

বিবাহ-চুক্তি

মুসলমান তুর্কীর বিবাহ আইন চুক্তির উপর নির্ভর করে। ঐ চুক্তির দ্বারা স্ত্রীর অধিকার সাব্যস্ত হয়। পরন্তু ঐ চুক্তির দ্বারা স্বামী স্ত্রীকে ভরণ-পোষণ করিতে বাধ্য থাকে এবং তালাক হইলে স্ত্রীর যাবতীয় ব্যক্তি-গত (স্ত্রীধনের মত) সম্পত্তি ফিরাইয়া দিতে ত বাধ্য হয়ই, অধিকন্তু তাহার খোর-পোষের জন্য (বিবাহকালে ধার্য্য) একটা নির্দ্দিষ্ট মাসহরা দিতেও আইনতঃ বাধ্য হয়।



কুর্দ্দ যুবতী

ইহুদীদের বিবাহ

ইহুদীদের মধ্যেও বহু বিবাহ প্রচলিত আছে, তবে যখন প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে কোন সন্তান-সন্ততি না হয়, তখনই পুরুষ এই অধিকারে অধিকারী হয়। শিক্ষিত ইহুদীরা কিন্তু স্ত্রীর গর্ভে সন্তান না হইলেও বিবাহ করে না, পোষ্যপুত্র গ্রহণ করে। ইহুদীদের তালাকের ব্যবস্থাও মুসলমান তুর্কীর মত।



তুর্কী কৃষক-নারী

বিবাহব্যবস্থা

কি মুসলমান তুর্ক, কি ইহুদী, কি আর্ম্মাণী, কি সার্কেসিয়ান, কি কুর্দ্দ,—সকল জাতির মধ্যেই বাল্য-বিবাহ প্রচলিত। আমাদেরই দেশের মত সে সব দেশেও পিতা-মাতা বা অন্য অভিভাবক পুত্রকন্যার বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করেন।

মুসলমান তুর্কীর গৃহের ব্যবস্থা

অবস্থাপন্ন তুর্কী মুসলমানের গৃহের দুইটি অংশ থাকে, (১) হারেমলিক বা অন্দর, (২) সেলামলিক বা সদর। তাতার ও ইরাণের মত তুর্কী সদর ও অন্দরের সম্বন্ধ একই। তবে তাতার ও ইরাণের অন্দর হইতে তুর্কী অন্দরের প্রভেদ এই যে, প্রথমোক্ত অন্দরে যাইবার পথ সদর দিয়া, শেষোক্ত অন্দরের প্রবেশ-পথ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এমন কি, শেষোক্ত অন্দর অনেক সময়ে সদর হইতে স্বতন্ত্র ইমারতে নির্দ্দিষ্ট হয়। তুর্কী অন্দর প্রায়ই প্রশস্ত হয়। সদর সকল আকারেরই হইতে পারে, কখনও সদর

একটা পূর্ণ ইমারত, কখন বা সদর মাত্র একখানা বৈঠকখানা। ইরাণের অন্দরেও যেমন কার্পেট ও অন্যান্য আসবাবপত্র থাকে, তুর্কীতেও তাহার অভাব নাই। অন্দরের কক্ষগুলি এমনভাবে সজ্জিত থাকে যে, প্রায় সমস্ত কক্ষই শয়নকক্ষরূপে ব্যবহার করা যায়। অতিথি-সেবার আয়োজনের উপযোগী রন্ধনশালাও অন্দরে খুব প্রশস্ত। বলা বাহুল্য, সেলামলিকের অতিথিদিগের জন্য হারেমলিকের পাকশালা হইতে খাদ্যাদি প্রস্তুত হইয়া প্রেরিত হয়।



গ্রীক যুবতী

হারেমের কর্ত্রী কে ?

এই হারেমের কর্ত্রী কে? গৃহকর্ত্তার বিধবা জননী জীবিতা থাকিলে তিনিই সর্ব্বময়ী কর্ত্রী। তিনি হয় করুণাময়ী, না হয়, উগ্রচণ্ডা হইতে পারেন। কিন্তু তিনি যাহাই হউন, তাঁহার কর্ত্তৃত্বের প্রতিদ্বন্দ্বী কেহ নাই। প্রায়ই দেখা যায়, তাঁহার শাসনে পুত্র, কন্যা, পুত্রবধূ, ক্রীতদাসী, আত্মীয়া ইত্যাদি সকলেই সুখে থাকে। তুর্কী পুত্র মাতাকে যেমন ভক্তি-শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন, মাতাও তেমনই পুত্র ও কন্যার



সন্তান-সন্ততিকে স্নেহ করিয়া থাকেন। মাতার অবর্ত্তমানে পত্নীই গৃহকর্ত্রী, যেখানে একাধিক পত্নী থাকেন, সেখানে প্রধানা পত্নীই গৃহকর্ত্রী।

ক্রীতদাসী

তুর্কী হারেমে ক্রীতদাসী রাখিবার প্রথা আছে। এ প্রথা অপরিহার্য্য। তুর্কী হারেমে আবরু প্রথা হেতু স্বাধীনা মুসলমান মহিলা তথায় দাসীর কার্য্য গ্রহণ করিতে পারে না, কেন না, মুসলমান আইন অনুসারে তাহার আত্মীয় ব্যতীত কোন পরপুরুষই তাহার মুখাবলোকন করিতে অধিকারী নহে। ক্রীতদাসী তাহার মনিবের কেনা গোলাম, কাযেই তাহার পক্ষে এই আইন খাটে না। প্রায়শঃ জর্জ্জিয়ান, সার্কেসিয়ান ও কুর্দ্দ জাতীয় নারীরা তুর্কী হারেমে ক্রীতদাসীর বৃত্তি গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। তাহাদের পিতা-মাতা তাহাদিগকে বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহ করে। ক্রীতদাসীদের প্রতি হারেমে খুবই ভাল ব্যবহার করা হয়। তাহারা তাহাদের মনিবের মত আদ

পায়, তাহাদের মনিবের আমোদ-প্রমোদে যোগদান করিতে পায়। পরন্তু ক্রীতদাসীকে মনিব বিবাহ করিলে সমাজে নিন্দনীয় হয় না।



ঘরবেশ শেখের হারেম মহিলা

ইহুদী ও গ্রীক সংসার

রুমের সমুদ্রোপকূল হইতে দূরে অবস্থিত অভ্যন্তরের বিলায়েৎ সমূহে ইহুদী ও গ্রীক সংসারের বন্দোবস্তও কতকটা মুসলমান তুর্কীর মত। তবে ইহাদের সদর অন্দরে পার্থক্য বা ব্যবধান অধিক নহে। ইহাদের সংসারেও গৃহকর্ত্তার জননী সর্ব্বেসর্ব্বময়ী কর্ত্রী।

মুসলমান তুর্কী নারীর জীবনযাত্রা

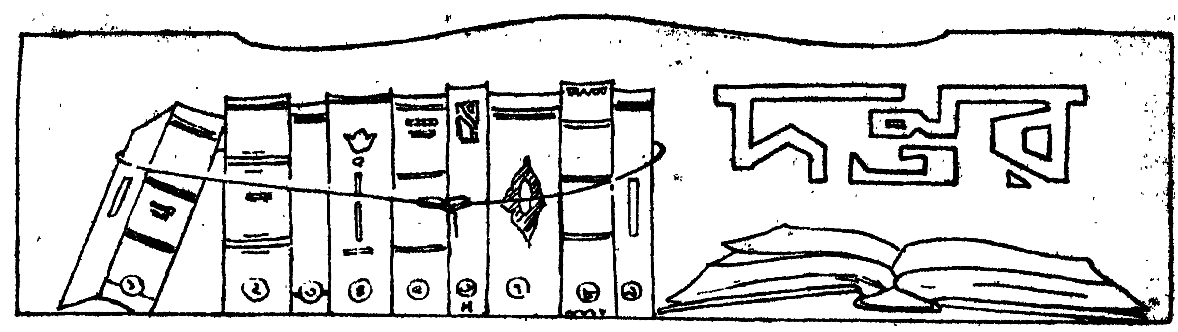
তুর্কী নারীরা হারেমে আবদ্ধ হইয়া থাকেন না, তাঁহারা ইচ্ছামত ঘরে বাহিরে যাতায়াত করিতে পারেন, এ কথা আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি। তাঁহারা সঙ্গীদের সাক্ষাৎকারের প্রতিসাক্ষাৎকার করিতে যাইয়া থাকেন, বন্ধু-পুত্র-কন্যার বিবাহে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া থাকেন, পদব্রজে বা শকটারোহণে অথবা অশ্ব বা গর্দ্দভ আরোহণে ভ্রমণ করিতে যাইয়া থাকেন। ইহা ছাড়া মসজিদে ভজনাকালে যোগদান করিতে (যদিও পুরুষ হইতে স্বতন্ত্র স্থানে পর্দ্দার আড়ালে বসিয়া) যায়েন। আর হামামে স্নান ইরাণ ও তাতার অপেক্ষা তুর্কীতে নিত্যকর্ম্মপদ্ধতি বলিয়া গণ্য। হামামে সমস্ত দিন অতিবাহিত করিয়া ঘরে ফিরা তুর্কী মহিলার পক্ষে অস্বাভাবিক নহে।

যাঁহারা সহরবাসিনী, তাঁহারা সহরতলীতে বা পল্লী মফঃস্বলে চড়ুইভাতি করিতে অত্যন্ত ভালবাসেন। এ জন্য প্রায় প্রত্যেক সহরের অনতিদূরে অতি চমৎকার বিশ্রাম-পরব দৃষ্ট হয়। মুঘল বাদশাহদের আমলে কাশ্মীর-যাত্রার পথে এমন কত চমৎকার বিশ্রাম-পরবেরই না সৃষ্টি হইয়াছিল! আমি রাওলপিণ্ডি হইতে কিছু দূরে হাসান আবদাল নামক প্রকৃতির অতি মনোরম ক্ষেত্রে এইরূপ একটি ধ্বংসোন্মুখ বিশ্রাম-পরব দেখিয়াছিলাম। রুমে এমন বিশ্রাম-পরব নাকি যত্র তত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

এ সকল আমোদ-প্রমোদেই যে তুর্কী মহিলার জীবনযাত্রা নির্ব্বাহিত হয়, তাহা নহে। তাঁহাদের দৈনন্দিন 'সংসারের কাযও' অনেক। তাঁহাদের দাসদাসীর অভাব নাই, এ কথা সত্য, কিন্তু তাহা হইলেও স্বামি-পুত্রের সুখস্বাচ্ছন্দ্যবিধানেও তাঁহাদিগকে যত্নবতী থাকিতে হয়।

বর্ত্তমানে ধনবান্ তুর্কীর গৃহের নারীরা য়ুরোপীয়ের সংসর্গে আসিয়া সংসারের কায দাস-দাসীর উপর ফেলিয়া দিয়া, ইংরাজ বা ফরাসী গভর্ণেস রাখিয়া নানা য়ুরোপীয় ভাষা, পিয়ানো বাজান, ড্রয়িং ও বয়ন ইত্যাদি শিক্ষা করিতেছেন। ইহাতে তাঁহারা তাঁহাদের মাতৃ ভাষার চর্চ্চা ও গৃহকর্ম্ম ভুলিয়া যাইতেছেন। ইহা ভাল কি মন্দ, কালই তাহার বিচার করিবে।

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু।



তারকেশ্বরের ইতিহাস

বিগত বৈশাখের "মাসিক বসুমতীর" ৯৫ পৃষ্ঠায় শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র-কুমার বসু মহাশয় 'হুগলী গেজেটিয়ার' হইতে তারকেশ্বরের ইতিহাস যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি "অযোধ্যাপ্রদেশে মোহাবা-গরকা-লিঙ্গ" নামক স্থানে রাজা বিষ্ণুদাস সিংহের বা তাঁহার ভ্রাতা রাও ভারামল্লসিংহের বাসস্থান ছিল, উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু অযোধ্যাপ্রদেশে কিংবা সারা হিন্দুস্থানে ঐ নামে কোন স্থান নাই। "মোহাবা-গরকা-লিঙ্গ" শব্দটি ভুল। নিশ্চয়ই মাহোবার গড় কালিঞ্জরকে লক্ষ্য করা হইয়াছে।

Crawford's "History of Ancient Temples and Monuments in Bengal" পুস্তকে "There lived at Mohaba Garkalinjar in Oudh, Raja Vishnudas ... .." উল্লেখ আছে। এ স্থলে আমার বক্তব্য এই যে, গড় কালিঞ্জরকে রাজা বিষ্ণুদাসের আদি আবাসস্থান নির্দ্দেশ করাই ভ্রম হইয়াছে। কারণ, প্রথমতঃ, মাহোবার গড় কালিঞ্জর অযোধ্যাপ্রদেশের অন্তর্গত নহে, উহা বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত স্থান। দ্বিতীয়তঃ, গড় কালিঞ্জর চান্দেল-বংশীয় রাজপুতগণের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ গড়। ঐ স্থানে রঘুবংশীয়গণের কখনও অধিকার ছিল না। রাজা বিষ্ণুদাস রঘুবংশীয় ক্ষত্রিয় ছিলেন। তিনি অযোধ্যাপ্রদেশ হইতে আসিয়াছিলেন, তাহা ঠিক। জিলা জৌন-পুরের ডোভী পরগণার অন্তর্গত গোমতীতীরস্থ হরিহরপুর তাঁহার আদি-বাসস্থান। রাজা বিষ্ণুদাসের পূর্ব্বপুরুষ হরিহরসিংহ নামক জনৈক রঘুবংশী সর্দ্দার দ্বারা হরিহরপুর স্থাপিত হইয়াছিল। এখনও গোমতী-তীরে হরিহরসিংহের পরিখাবেষ্টিত দুর্গের ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমান রহিয়াছে। এখনও সেই ধ্বংসের স্তূপমধ্যে সতীকূপ রহিয়াছে এবং এখনও স্থানীয় রঘুবংশীয়া কুমারীগণ বিবাহকালে সেই কূপের তটে সঙ্গিনীগণ সহ ভোজন করিয়া অতীতের সতীগণের সম্মান ও স্মৃতি রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। এই ভোজন তাঁহাদের বিবাহে কুলাচার-বিশেষে পরিগণিত হইয়াছে।

রাজা বিষ্ণুদাস যে ৫ শত আত্মীয় বন্ধুবান্ধব, ১ শত কান্য-কুব্জ পুরোহিত ও ভাট সহ আসিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে বা রাও ভারা-মল্ল কর্ত্তৃক তারকেশ্বর আবিষ্কার সম্বন্ধে যাহা 'গেজেটিয়ারে' বর্ণিত আছে কিংবা Crawford যাহা বলিয়াছেন, তাহা সব মিল আছে এবং সত্য। রাজা বিষ্ণুদাসের এরূপ ভাবে দেশত্যাগের প্রকৃত কারণ কি, তাহা জানিবার জন্য আমাদের স্বভাবতই কৌতূহল হয়। এ সম্বন্ধে গত ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে ৮ই ফেব্রুয়ারী বর্দ্ধমান বিভাগীয় কমিশনার Mr. S. L. Maddox I. C. S. মহোদয় তারকেশ্বরের দাতব্য ঔষধালয়ের উদ্বোধনকালে বলিয়াছেন,—

"...Raja Vishnudas, a kshatriya by caste, rather than live under the rule of the Mohamedan Nawabs of Oudh, came and settled——here." Mr. Crawford লিখিয়াছেন,—"The supremacy of the Mohamedan Nawabs of the Province having deprived his residence of safety and comfort, the Raja came away." এখন এই সকল উক্তি হইতে বিষ্ণুদাসের দেশত্যাগের কারণ সম্বন্ধে যেরূপ আভাস পাওয়া যায়, তাহা দেশের সেই সময়ের অবস্থাক্রমে সঙ্গত বলিয়া মনে হওয়া অসম্ভব নহে। আমার মনে হয়, সেই জন্য এ যাবৎ ইহার সত্যাসত্য নির্ণয় জন্য কোন প্রতিবাদ হয় নাই। কিন্তু যদি স্বদেশে মুসলমানের আধিপত্য বা মুসলমানের অধীনে বাস করা তাঁহার অপ্রীতিকর হইয়াছিল, তবে কেন তিনি নবাব সাদৎ আলির রাজ্য ছাড়িয়া নবাব মুর্শিদকুলীর রাজ্যে বাস করিতে আসিলেন? স্বভাবতঃ মনে এরূপ একটা প্রশ্নের উদয় হয়।

আমরা অনুসন্ধানে জ্ঞাত হইয়াছি যে, কাশী নরেশবংশের প্রতিষ্ঠাতা রাজা মনসারামসিংহের পুত্র রাজা বলবন্তসিংহের সহিত সংঘর্ষই রাজা বিষ্ণুদাসের দেশত্যাগের প্রকৃত কারণ। ইহার বিশেষ বিবরণ এই যে, অযোধ্যার নবাব সাদৎ আলি বেণারসজিলার ৯২টি পরগণা তাঁহার জনৈক বন্ধু মীর রোস্তম আলীকে বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া ঐ প্রদেশের শাসনভার তাঁহারই উপর ন্যস্ত করেন। রোস্তম আলী অলস ও রাজকার্য্যে অপটু ছিলেন বলিয়া নবাব তাঁহাকে অপসৃত করিয়া তৎপদে গঙ্গাপুরের জমীদার রাজা মনসারাম-সিংহকে নিযুক্ত করেন। ইনি বিচক্ষণ ও দক্ষ ব্যক্তি ছিলেন। ইঁহার উপযুক্ত পুত্র বলবন্তসিংহ দিল্লীর সম্রাট দ্বিতীয় আলমগীরের নিকট হইতে "রাজা" উপাধি অনুমোদিত করাইয়া লইয়া অযোধ্যার নবাবের অধীনতা অস্বীকার করিয়া স্বাধীন হইলেন এবং রাজ্য সুরক্ষিত করিবার জন্য চতুর্দ্দিকে দুর্গ নির্ম্মাণ করিলেন। পরে স্থানীয় সর্দ্দারগণকে স্ববশে আনিবার জন্য তাঁহাদের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। এই উপলক্ষে ডোভীর রঘুবংশীগণের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। কথিত আছে যে, হিরাতীসিংহ নামক জনৈক রঘুবংশী ফৈজাবাদের পথে মনসারামকে আক্রমণ করিয়া নিহত করেন এবং তাঁহার ছিন্ন মুণ্ড বলবন্তসিংহের নিকট উপহারস্বরূপে প্রেরণ করেন। ফলে ঘোরতর যুদ্ধ বাধিল, কিন্তু রঘুবংশীরা কিছুতেই বশ্যতা স্বীকার করিলেন না। বলবন্তসিংহ বিরক্ত হইয়া পানীয় জলের ইন্দা-রায় বিষপ্রয়োগাদি দ্বারা নানারূপ উৎপীড়ন আরম্ভ করিলেন। এই বিপ্লবের সময় বিষ্ণুদাস সদলে দেশত্যাগ করিয়া ক্রমে বঙ্গদেশে আসিয়া উপস্থিত হয়েন। নিকটস্থ স্থানে যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা শান্তি স্থাপনের পর ডোভীতে ফিরিয়া যায়েন। ডোভী রেল-ষ্টেশন হইতে হরিহরপুর ২ মাইল দূরে।

রাজা বিষ্ণুদাসের জীবনীই তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বাঙ্গালার "বালীগড়ী রাজপুত সমাজের" ইতিহাস, এবং তারকেশ্বরের ইতিহাস এই ইতিহাসের বা বিষ্ণুদাসের জীবনীর বিশেষ অংশ। বিগত ১২৯২ সালের ৮ই চৈত্র তারিখের "বঙ্গবাসী"তে "বাঙ্গালার ক্ষত্রী সমাজ" শীর্ষক প্রবন্ধে চকদিঘীর জমীদার রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত বাবু ললিতমোহন সিংহ রায় মহাশয় বলিয়াছেন,—"আজ সকলেই শুনিয়া রাখুন যে, ইনিই

(বিষ্ণুদাসজা) সেই তারকেশ্বরের প্রতিষ্ঠাতা রাও ভারামল। ব্রাহ্মণ-তনয়কে মন্ত্রশিষ্য (চেলা) করিয়া তাঁহার পরলোক হয়। তদবধি ঐ মঠে যত যত মোহান্ত হইয়াছেন, সকলেই আমাদের সহিত একত্র সামাজিক আহারাদি করিতেন। মধ্যে আমাদের কয়েক ব্যক্তি ক্রমে কয়েক ঘর 'মানত' হিসাবে ,তারকেশ্বরের অর্থাৎ মোহান্তের শিষ্য হওয়ায় গুরু-শিষ্য একত্র আহার বন্ধ আছে।" তারকেশ্বরের মোহান্তগণের সহিত বিষ্ণুদাসের সমাজের কিরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাহাই বুঝাইবার জন্ত রায় বাহাদুরের আজ ৩৮ বৎসর পূর্ব্বের উক্তি উদ্ধৃত করিলাম। পূর্ব্বের মোহান্ত এই উক্তির প্রতিবাদ করিতে সাহসী হয়েন নাই। বর্ত্তমান মোহান্ত সতীশচন্দ্র গিরি এই সম্বন্ধ বা সংস্রব স্বীকার করিতে অবশ্য রাজী নহেন।

আমার উর্দ্ধতন দশম পুরুষ গোবর্দ্ধন সিংহ রাজা বিষ্ণুদাসের ভগিনী ভানুমতী দেবীকে বিবাহ করেন। আমার কিংবা আমাদের সমাজের প্রত্যেকের বংশ-ইতিহাস বিষ্ণুদাসের সমাজের ইতিহাসের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত রহিয়াছে। সেই জন্ত এই সকল ঐতিহাসিক বিষয়ের কথা বংশানুক্রমে আমাদের মধ্যে প্রচলিত রহিয়াছে। এই ইতিহাসকে প্রামাণিক সত্যের উপর স্থাপন জন্ত আমার পূজনীয় শ্বশুর স্বর্গীয় দেওয়ান বাহাদুর হরিনাথ রায় মহাশয় অনুসন্ধানকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। আমি এ বিষয়ে তাঁহার অনুবর্ত্তী থাকিয়া সহযোগিতা করিতাম। হরিহরপুরের অবস্থান ও ইতিহাস 'জৌনপুর গেজেটিয়ার' হইতে সংগ্রহ করিয়া গত ১৩২০ সালে আমরা তথায় স্থানীয় অনুসন্ধান জন্ত উপস্থিত হইয়াছিলাম। সেখানে কয়েক জন ৯০ বৎসরের বৃদ্ধ ব্যক্তির সাক্ষাৎলাভ হওয়ায়, কার্য্যের অনেক সুবিধা হইয়াছিল। এই সকল প্রবীণ ব্যক্তিদিগকে লইয়া স্থানীয় রঘুবংশীদের সহিত একটি সভায় আমরা সম্মিলিত হইয়া নানা আলোচনা ও অনুসন্ধান করিয়াছিলাম। এই অনুসন্ধানের ফলে যে তথ্য সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহাই আজ আমি শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রকুমার বসু মহাশয়ের লিখিত "তারকেশ্বরের ইতিহাস" অবলম্বন করিয়া এই প্রথম প্রকাশ করিতেছি। স্বর্গীয় দেওয়ান বাহাদুর এ বিষয় প্রকাশ করিয়া যাইতে পারেন নাই।

শ্রীমনোমোহন সিংহ রায়।

আদর্শ সত্যাগ্রহী হজরত মোহম্মদ

সাধারণতঃ অ-মুসলমান ইসলাম ধর্ম্ম সম্বন্ধে এইরূপ ধারণা পোষণ করেন যে, ইহা হিংসা ও বিদ্বেষের ধর্ম্ম,—ইহা যুদ্ধ ও অশান্তির প্রশ্রয়দাতা। ইহা অনুদার ও সংগ্রামশীল। নবযুগের তথাকথিত মুসলমানের ধারণা যে সাধারণ অ-মুসলমানের ধারণা হইতে বেশী তফাৎ নহে, তাহা বলা বাহুল্য।

এইরূপ অবস্থায় যদি বলা যায় যে, ইসলাম ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক হজরত মোহম্মদ এক জন আদর্শ সত্যাগ্রহী ছিলেন, তাহা হইলে অনেকে হয় ত বিস্মিত হইবেন। তাই ত, হজরত মোহম্মদ যিনি আরবের তদানীন্তন অ-মুসলমানদের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলেন, তিনি কেমন করিয়া সত্যাগ্রহী বলিয়া অভিহিত হইতে পারেন? কিন্তু সত্যাগ্রহের আদর্শ যে ইসলামী শিক্ষা ও নীতির বহির্ভূত নহে, তাহা আমরা মহাগ্রন্থ পবিত্র কোর্-আন শরিফ ও পয়গম্বরশ্রেষ্ঠ হজরত মোহম্মদেরই জীবনী হইতে প্রতিপন্ন করিতে পারি। ইসলামবিদ্বেষী য়ুরোপীয় লেখকদের লেখনীপ্রসূত মিথ্যা ভ্রমপূর্ণ গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া হিন্দু ভ্রাতৃগণ ইসলাম ও হজরত মোহম্মদ সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিয়া থাকেন। ইসলাম ধর্ম্ম সত্যাগ্রহের অনুমোদন করে কি না, তাহা মহাগ্রন্থ কোর্-আনের "আল্ আসর" নামক অধ্যায়টি মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলেই জানিতে পারা যাইবে। বিশ্বস্রষ্টা মহাপ্রভু সুরা "আল্ আসরে" বলিতেছেন—"সময়ের শপথ,—অতি নিশ্চয় মানব ক্ষতিগ্রস্ত—তাহারা ব্যতীত যাহারা (ঈশ্বরের উপর) বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে ও সৎক্রিয়া করে ও পরস্পর পরস্পরকে সত্য (সত্যাগ্রহ) অবলম্বন করিতে অনুজ্ঞা করে এবং পরস্পর পরস্পরকে সবর বা সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিতে অনুজ্ঞা করে।" পাঠকপাঠিকা দেখুন! উপরি-উক্ত সুরাটির সহিত সত্যাগ্রহের কি আশ্চর্য্য রকমের মিল বা সাদৃশ্য। ১৩ শত বৎসর পূর্ব্বে ইসলাম ধর্ম্ম বিশ্বমানবের পরিত্রাণ ও মুক্তির একমাত্র উপায়স্বরূপ সত্য (সত্যাগ্রহ) ও সবর বা সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিবার জন্ত যে অমূল্য উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছে, আজ বিংশ শতাব্দীতে মহাত্মা গন্ধী ইসলামের সেই শাশ্বত বাণীর প্রতিধ্বনি তুলিয়া বলিতেছেন :—"নির্ভীক হইয়া ও কোনরূপ দ্বিধাবোধ না করিয়া সত্যের প্রতি একনিষ্ঠ অনুরাগ প্রদর্শন কর এবং সমুদয় বিপদ আপদ ধৈর্য্যের সহিত সহ্য কর।" তদ্ব্যতীত হজরত মোহম্মদ কিরূপ আদর্শ সত্যাগ্রহী ছিলেন, তাহা তাঁহার পূত পবিত্র জীবন-চরিত হইতে বর্ণনা করিয়া সকলের সন্দেহ ভঞ্জন করিতে চেষ্টা করিব।

মহানবী হজরত মোহম্মদও তাঁহার শত্রুহস্তে নির্ম্মম নির্যাতন, উৎপীড়ন ও লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছিলেন। আরবের তায়েফ নামক স্থানের অত্যাচারকাহিনী এই ভাবে বর্ণিত আছে :—"তিনি পথে পথে আল্লার কথা বলেন। মানুষের মঙ্গল করাই তাঁহার কায। কিন্তু অন্ধ তায়েফবাসী মঙ্গলের কথা বুঝিল না, পথে ঘাটে তাঁহাকে পাতর ফেলিয়া মারিতে লাগিল। পাগল ভাবিয়া ছেলের দল ছুটিয়া আইসে, হো, হো করিয়া হাসিয়া উঠে, আর ইট-পাতর ছুড়িয়া মারে। সোনার অঙ্গে রক্ত ঝরে, তবুও তাঁহার দুঃখ নাই। কেমন করিয়া তাহাদের ভাল করিবেন, সেই কথাই চিন্তা করেন। এক দিন সেই সয়তান লোকরা করিল কি? ছোট ছোট পাতর ফেলিয়া মারিতে লাগিল। মারিয়া মারিয়া সেই যে সোনার শরীর, তাহা একেবারে জখম করিয়া ফেলিল। সারা অঙ্গ বহিয়া রক্ত ছুটিল। (ইসলামে সত্যাগ্রহের মহান্ আদর্শ দেখুন) রক্তে তাঁহার কাপড় ভিজিল,—রক্তে পায়ের জুতা ভরিল। তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন ; মরার মত পড়িয়া রহিলেন। মরা ভাবিয়া শত্রুরা চলিয়া গেল। অনেকক্ষণ পরে তাঁহার জ্ঞান হইল। জ্ঞান হইলে তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। কি জন্ত তিনি কাঁদেন? কাঁদেন তিনি মনের দুঃখে। তিনি বলিলেন,—'হায়! এই সব লোক—ইহাদের ভাল করিতে আমি আসিয়াছিলাম, ইহারা নিজের ভাল বুঝিল না।' কেন তাহারা এমন হইল, এই তাঁহার ব্যথা। গায়ের ব্যথা তাঁহার ব্যথাই নহে, লোকের দুঃখেই বুক ফাটে। কত জনে শাপ দেয়, তিনি তাহাতে কিছুই করিলেন না। তিনি শুধু আল্লার কাছে প্রার্থনা জানাইলেন :—'হে সখা! ইহারা অবোধ! ইহাদিগকে ক্ষমা কর ও সুপথ প্রদর্শন কর'।" পাঠক, হজরত মোহম্মদের সত্যাগ্রহের আদর্শ দেখিলেন। এই একটিমাত্র তাঁহার জীবনের ঘটনা নহে—এইরূপ ভূরি ভূরি উদাহরণ তাঁহার পূত পবিত্র জীবনী হইতে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। হজরত মোহম্মদ অন্ত স্থানে এইরূপ বলিয়াছেন :—"যদি লোকে আমার হিত করে, তবে আমিও তাহাদের হিত করিব, এবং যদি আমার প্রতি অত্যাচার করে, তবে আমিও তাহাদের প্রতি অত্যাচার করিব—এইরূপ কখনও বলিও না। কিন্তু ইহাই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা কর যে, লোক আমার ভাল করিলে আমিও তাহাদের ভাল করিব এবং আমার প্রতি অত্যাচার করিলে আমি কখনও তাহাদের প্রতি অত্যাচার করিব না।" ইহাতেও কি প্রমাণ হয় না যে, মহাপুরুষ হজরত মোহম্মদ এক জন আদর্শ সত্যাগ্রহী ছিলেন?

কামশক্তিতে বলীয়ান্ অন্ধবিশ্বাসী প্রতীচ্য সজোরে ডঙ্কা বাজাইয়া থাকেন যে, "মোহম্মদ এক হস্তে কৃপাণ ও অপর হস্তে কোর্-আন লইয়াই জগতে ইসলাম ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন।"

যদিও দাবলোঁডের অবতার ইসলামবিদ্বেষী খৃষ্টান লেখকগণের পবিত্র ইসলামের প্রতি এই স্বকপোলকল্পিত ভিত্তিহীন ঈর্ষাপূর্ণ মিথ্যা দোষারোপের বহু যুক্তিসঙ্গত প্রতিবাদ হইয়া গিয়াছে এবং এই সম্বন্ধে বহু গভীর গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থরাজি লিখিত হইয়াছে, তথাপি অদ্য আমরা জগদ্গুরু মহামানব হজরত মোহম্মদের পবিত্র জীবনকথা হইতে নিয়ে এমন একটি চিত্তাকর্ষক চির-স্মরণীয় সত্য ঘটনার উল্লেখ করিতেছি, যাহা চোখে আঙ্গুল দিয়া সকলকে দেখাইবে যে, খৃষ্টান লেখকগণের প্রাগুক্ত মন্তব্য একেবারে ভিত্তিহীন ও ঈর্ষাপূর্ণ। যে দিন পয়গম্বরশ্রেষ্ঠ হজরত মোহম্মদের পুত্র হজরত এবরাহিম প্রাণত্যাগ করেন, সে দিন আকাশ সূর্য্যগ্রহণের ফলে অন্ধকারময় হইয়া গিয়াছিল। এই দুই ব্যাপার একই সময়ে ঘটিতে দেখিয়া মক্কার কয়েক জন অ-মুসলমান (বিধর্ম্মী) বিশেষরূপে বিচলিত হইয়াছিল। তাহারা এই অকস্মাৎ ব্যাপারকে হজরত-পুত্রের শোকপ্রকাশার্থে ঘটিয়াছে বলিয়া ধরিয়া লইল এবং তাহারা ইহাও ভাবিল যে যে ব্যক্তির পুত্রের অকালমৃত্যুতে প্রকৃতি পর্য্যন্ত শোকপ্রকাশ করিতেছে, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই এক জন প্রকৃত ঈশ্বর-প্রেরিত পয়গম্বর—তত্ত্ববাহক। অতঃপর ইসলামধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার জন্য তাহারা দলবদ্ধ হইয়া হজরত মোহম্মদের সন্নিধানে আগমন করিল। হজরত তাহাদের মনোভাব জ্ঞাত হইয়া স্পষ্টরূপে তাহা-দিগকে বুঝাইয়া বলিলেন, "তোমরা ভাবিয়াছ যে, বাহ্যজগৎ আমার পুত্রের অকস্মাৎ মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিতেছে। কিন্তু আমি তোমাদিগকে আশ্বস্ত করিয়া বলিতেছি যে, তোমাদের ঐই ধারণা ঠিক নহে। কারণ, মানব-জীবনের জন্ম ও মৃত্যুর সহিত প্রকৃতি-জগতের কোন সম্বন্ধ নাই। আর এই কারণেই যদি তোমরা আমাকে এক জন স্বর্গীয় তত্ত্ববাহক বলিয়া মনে করিয়া থাক, তাহা হইলে আমি বলিব, তোমরা আমাকে প্রকৃতরূপে বুঝিতে পার নাই—আমার ক্ষুদ্র জীবনের উদ্দেশ্য তোমরা হৃদয়ঙ্গম করিতেও পার নাই। এই কারণে আমি তোমাদিগকে ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে চাহি না, বরং তোমরা এখান হইতে চলিয়া যাও।" তাঁহার এই দৃঢ়তাব্যঞ্জক কথা শুনিয়া অনেকেই ব্যর্থমনোরথ হইয়া প্রস্থান করিল। এখন জিজ্ঞাস্য—ইহা অপেক্ষা সরলতা, সততা ও সাধুতার সুমহান্ দৃষ্টান্ত জগতে আর কি হইতে পারে? ইহা কোন "প্রতারকের" (Imposter prophet) কার্য্য হইতে পারে কি? যে সময়ে হজরত মোহম্মদ মুষ্টিমেয় অনুচর লইয়া সনাতন ইসলাম ধর্ম্ম প্রচারে ব্রতী হইয়াছিলেন, সে সময়ে তাঁহার অধিকতর দলপুষ্টি করিবার বাসনাত্যাগটি বড়ই মধুময় ও আদর্শস্থানীয়। সত্যই Mr. poole বলিয়াছেন:—"The frank friendship, the noble generosity, the dauntless courage and hope of the man, all tend to melt criticism into admiration. কুসংস্কারাপন্ন মক্কাবাসিগণ ভ্রমবশতঃ তাঁহাকে এক জন স্বর্গীয় দূত বা পয়গম্বর বলিয়া মনে করিয়াছিল। তিনি এই সুযোগে ঐ সকল অশিক্ষিত লোককে অনায়াসে নিজ ধর্ম্মের আশ্রয়তলে আনিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া কি করিলেন? তিনি পরিষ্কাররূপে, সরলভাবে তাহাদিগকে তাহাদের ভ্রম বুঝাইয়া দিলেন। এমন কি, তিনি যদি প্রাগুক্ত ঘটনায় কেবল নীরব থাকিতেন, তাহা হইলেও তাহাদের মধ্যে অনেকে তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিত! কিন্তু তিনি ইহাও করেন নাই। বরং প্রকৃত কথা খুলিয়া বলিয়া ছিলেন। এইখানেই হজরত মোহম্মদের মহত্ত্ব।

অনেকের ধারণা যে, বলপ্রয়োগ দ্বারা ধর্ম্মপ্রচার করা বুঝি ইসলামের আদেশ। কিন্তু ইহা সর্ব্বৈব মিথ্যা—ইহার মূলে আদৌ ভিত্তি নাই। যদিও ইসলাম ধর্ম্ম প্রচারশীল ধর্ম্ম—তথাপি কোর-আন এই সম্বন্ধে কঠোর আদেশ প্রদান করিয়া বলিতেছে—"লা এক্রাহা ফিদ্দিন"—অর্থাৎ ধর্ম্মে বলপ্রয়োগ আদৌ করিতে পারিবে না। তদ্ব্যতীত হজরত মোহম্মদও এই সম্পর্কে এইরূপ বলিয়াছেন:—"অ-মুসলমানকে তোমার ধর্ম্মের বাণী শুনাইয়া দিবে; ইহাতে যদি তাহারা ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করে, তবে ভালই; নচেৎ তাহাদিগকে তাহাদের পূর্ব্বমতে অবস্থান করিতে দাও। ইসলাম যথেষ্ট উদার হইতে বলে।" অন্য স্থলে তিনি মুসলমানদিগকে সাবধান করিয়া বলিয়া গিয়াছেন—"মহাবিচারের দিনে (Day of Judgment) মুসলমানের কৃত অন্য কোন দুষ্কৃতির জন্য মহাবিচারক আল্লাহর নিকট তাহার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আমি আনয়ন করিব না; তবে যে মুসলমান অন্য এক জন অ-মুসলমানকে উৎপীড়ন করিবে, কেবল তাহারই বিরুদ্ধে আমি আল্লাহর নিকট অভিযোগ আনয়ন করিব।" পর-ধর্ম্মাবলম্বীকে কোনরূপে নির্য্যাতন না করিয়া সদ্ভাবের সহিত বসবাস করিবার এই উপদেশ হইতেও কি প্রমাণ হয় না যে, ইসলাম বলপ্রয়োগের ধর্ম্ম নহে?

মুসলমানগণ ভারতবর্ষে তরবারির সাহায্যে ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন বলিয়া অনেকে অনুযোগ করিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা যতদূর জানি, তাহা হইতে বলিতে পারি যে, ইহা ঠিক নহে। ইহা কেবল মুসলমান-দের পক্ষের কথা নহে; বরং নিরপেক্ষ খৃষ্টান লেখক যথা—সার টমাস আরনল্ডও ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। অধিক কি, নব্য-ভারতের জন্মদাতা স্বপ্নদর্শী স্বামী বিবেকানন্দ এ সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন:—

"The Mohamedan conquest of India came as salvation to the downtrodden, to the poor. That is why onefifth of our peop'e have become Mahomedans. It was not the sword that did it all. It would be the height of madness to think it was all the work of sword and fire" (Swami Vivekananda's works, Mayavati Memorial edition, Vol, III, p 652)

মঈনউদ্দীন হোসায়ন।

সন্ধ্যাতারা

আয় ভেসে আয় সন্ধ্যাতারা নীলের বুকে সাঁতার দিয়ে,
অজানা সেই শোভন-পুরীর নিঝর-আলোর ধারা বেয়ে!
ছড়িয়ে দে তোর উজল হাসি, হাসুক কালো চিকুর-জাল,
সন্ধ্যা-সুন্দর-বুধ আকাশে থম্‌কে দাঁড়া নিমেষ-কাল!

পথের আঁধার ঘনিয়ে আসে, নাইক রে আর আলোর লেশ,
জাল্ রে প্রদীপ পথিক-বধূ, যাত্রী যাবে অচিন্-দেশ!
দীর্ঘপাড়ি জম্‌বে ভাল, তাই বলি রে সাধের মেয়ে,
ভিড়িয়ে তরি তুলে নে' মোরে আদি-দেশে চল্ রে বেয়ে!

শ্রীমতী রেণুবালা দেবী।



নারিকেল

উষ্ণদেশজাত বাণিজ্যোপযোগী ফল-শস্যের অনুসন্ধানে এ দেশে আসিয়া জনৈক য়ুরোপীয় অভিজ্ঞ ব্যক্তি নারিকেল সম্বন্ধে এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন :—

"It may be doubted whether the arboreal treasury of nature contains another tree so valuable to the Human Race as the Coconut Palm There is no part of the tree or of its fruit that is not useful to man in one form or another."

অর্থাৎ প্রকৃতির তরুজাতীয় সম্পদমধ্যে নারিকেলের ন্যায় ফল আর দ্বিতীয় নাই। এই বৃক্ষের বা ইহার ফলের এমন কোন অংশ নাই, যাহা কোন না কোন আকারে মানুষের প্রয়োজনসাধনে নিয়োজিত না হইয়া থাকে।

ভারতীয় ফলশস্যাদি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ প্যারেরা (Pareira) বলেন, নারিকেল হইতে প্রায় ৮৩ রকমের জিনিষ প্রস্তুত হইতে পারে। অবশ্য তাঁহার বর্ণিত সেই সকল সামগ্রীর অনেকগুলিরই আর্থিক মূল্য অতি সামান্য ; সুতরাং সেই সকল সামগ্রীর দীর্ঘ তালিকা প্রকাশের কোন প্রয়োজন দৃষ্ট হয় না। কৌতূহলী পাঠকগণ, Sir George Wattএর Dictionary of Economic Products গ্রন্থে তাহার পরিচয় পাইবেন। লণ্ডনের Imperial College of Science and Technologyর অধ্যাপক J. W. Henchly নারিকেল হইতে নিম্নোক্ত কয়েকটি প্রয়োজন সাধিত হয় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন,—



দ্বিখণ্ডিত নারিকেল

১। কাণ্ড হইতে খড়ের ঘরের আড়া, বাতা প্রভৃতি প্রস্তুত হয়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেতু ও জলাশয়ের ঘাটের সোপান, নৌকা এবং ডোঙ্গা ও দুই একটি গৃহের আসবাব প্রস্তুত হয়।

২। পাতায় ঘর ছাওয়া, বসিবার বা বিছাইবার মাদুর বা চেটাই, টুকরী, চালুনি, মশাল ও মাথার টুপী নির্ম্মিত হয়।

৩। পাতার শিরে ঝাড়ু ও চিরুণী প্রস্তুত হয় এবং কোথাও উহা জ্বালানী কাষ্ঠরূপে ব্যবহৃত হয়।

৪। ফুল হইতে এক প্রকার রস বাহির হয়, তাহাতে গুড়, চিনি, তাড়ী, আরক ও সির্কা বা ভিনিগার প্রস্তুত হয়।

৫। ছোবড়ায় কাতা-দড়ী, রশি ও কাছি, ঘরের মেঝেতে বিছাইবার matting, সম্মার্জ্জনী, গদী, ব্রুস এবং কাগজ প্রস্তুত করিবার মণ্ড তৈয়ার হয়।

৬। খোলা বা মালায় প্রদীপ, পানপাত্র, হাতা ও উকৃড়ী, অঙ্গার, বোতাম ইত্যাদি প্রস্তুত হয়।

৭। শাঁস হইতে তৈল, মাখন ও ঘৃত, খৈল, সাবান, বাতি ও নানাবিধ মিষ্টান্ন প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ইহা ব্যতীত নারিকেলের শিকড় দাক্ষিণাত্যে, সিংহলে এবং অন্যান্য স্থানে জ্বরের ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়।

উপরি উল্লিখিত তালিকার ১, ২, ও ৩ দফার বিশেষ বিবরণ নিষ্প্রয়োজন, যেহেতু, এ দেশে উহা সকলেই বিশেষরূপে অবগত আছেন। বাঙ্গালায় নারিকেল বৃক্ষ হইতে নৌকা প্রস্তুত হইতে দেখা যায় না, কিন্তু দাক্ষিণাত্যে অতি সুন্দর সুন্দর ডিঙ্গী-নৌকা নির্ম্মিত হইয়া থাকে। বাঙ্গালার বন-বিভাগের ভূতপূর্ব্ব Conservator J. S. Gamble তাঁহার একখানি গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—"It (coconut wood) makes very pretty and durable furniture and is also converted into spear handles, walking sticks and other fancy articles."

নারিকেলের জল যেমন সুমিষ্ট পেয়, উহার রস তদ্রূপ না হইলেও উৎকৃষ্ট পেয় বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। বাঙ্গালা দেশে তাল ও খেজুরের ন্যায় নারিকেল গাছে রস পাতা হয় না। কিন্তু ঝড়ে বা অন্য কোন কারণে গাছ উন্মূলিত হইলে কাণ্ডটির মাঝে মাঝে আধা-আধি কাটিয়া রস বাহির করিতে আমরা দেখিয়াছি এবং তাহা পান করিয়াছি, উহা খুব মিষ্ট ও স্নিগ্ধ। কিন্তু বোম্বাই প্রদেশে নারিকেল গাছে রস পাতা একটি ব্যবসায়মধ্যে পরিগণিত। এ দেশে যেমন তাল গাছে রস পাতিয়া থাকে, বোম্বাইয়ে সেইরূপ নারিকেল গাছের শীর্ষদেশে ভাঁড় পাতিয়া ফুল বা মুচি হইতে রস সংগ্রহ করা হয়। যেমন তালের রসে তাড়ীও হয় আবার গুড়, চিনি, মিছরি প্রভৃতি প্রস্তুত হয়, নারিকেলের রসেও সেইরূপ তাড়ী প্রস্তুত হয় এবং গুড় ও চিনিও হয়। কেহ কেহ বলেন, নারিকেল গাছ যখন প্রথম মুকুলিত হয়, সেই সময় তাহাতে রস পাতিলে গাছ শীঘ্র শীঘ্র বড় হয়। কিন্তু প্রতি বৎসর রস পাতা ভাল নহে, এবং এক-বার রস পাতিয়া এক বৎসর গাছকে বিশ্রাম দিয়া পর-বৎসর রস পাতা উচিত। গাছে ভালরূপ ফল ধরিতে আরম্ভ করিলে রস পাতা একেবারে বন্ধ করা কর্ত্তব্য। বোম্বাইয়ে নারিকেল-রস হইতে যে তাড়ী প্রস্তুত হয়, তাহাতে অল্প ব্যয়ে নেশা হয় বলিয়া বহু লোক পান করে, আবার তাড়ী বিশোধিত করিয়া এক প্রকার আরক প্রস্তুত হয়, তাহাও ঐরূপ নেশার জন্য পান করে। ঐ আরক জালা বা কলসে পুরিয়া উহার মুখ বন্ধ করিয়া, জালা বা কলসের গলা পর্য্যন্ত মাটীতে পুতিয়া রাখিলে এবং দুই কিংবা তিন মাস পরে উহার মুখ খুলিলে দেখা যাইবে যে, তাহা উৎকৃষ্ট সির্কা বা ভিনি-গারে পরিণত হইয়াছে। তাড়ী আগুনের উত্তাপে বা কিছু দিন রৌদ্রে রাখিলেও তাহা হইতে ভিনিগার প্রস্তুত হইয়া থাকে। খেজুর বা ইক্ষু-রস জ্বাল দিয়া যেমন গুড় প্রস্তুত হয়, এবং সেই গুড় হইতে যেমন চিনি তৈয়ার হয়, নারিকেল-রস হইতেও ঠিক সেই প্রণালীতে গুড় ও চিনি প্রস্তুত হইয়া থাকে। বোম্বাইয়ের ন্যায় মাদ্রাজেও নারিকেলের রস হইতে গুড় ও চিনি প্রস্তুত হয়। তথাকার লোক খেজুরের চিনি অপেক্ষা নারিকেলের চিনির পক্ষপাতী। নারিকেলের গুড়ে চিনি মাখাইয়া ইমারতের গাঁথনিতে ব্যবহার করিলে তাহা এক প্রকার সিমেন্টের কায করে।



নারিকেল গাছের ডোঙ্গা

অতি প্রাচীনকাল হইতে নারিকেলের ছোবড়া বা ছাল হইতে রজ্জু প্রস্তুত করিবার প্রথা এ দেশে বিদ্যমান

আছে। একাদশ শতাব্দীতে আলবিরুণী এবং চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে ইবন্ বাটুটা নামক আরবদেশীয় ভ্রমণকারীরা নারিকেল-রজ্জুর বিষয় লিখিয়া গিয়াছেন ; ১৫১০ খৃষ্টাব্দে কান্নানোরের গবর্ণর আলবোকার্ক এই রজ্জু প্রস্তুত বিষয়ে বিশেষ যত্ন প্রকাশ করিতেন। ১৬১০ খৃষ্টাব্দে মালদ্বীপের লোক নারিকেল-রজ্জু দ্বারা রাজস্ব প্রদান করিত। এই রজ্জু তথায় 'কৈরু' নামে অভিহিত হইত, এবং সম্ভবতঃ সেই শব্দ ক্রমে ইংরাজী ভাষায় "কয়ার" (Coir) এবং বাঙ্গালায় কাতা শব্দে পরিণত হইয়াছে। কৈরু শব্দের অর্থ পাকান, নারিকেল-সূত্র পাকাইয়া রজ্জু হইতে থাকে, এবং সরকারী নৌ-বিভাগে এবং বাণিজ্য-পোতের জন্য ইহা প্রভূত পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। নারিকেল-রজ্জুর ব্যবহার ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে দেখিয়া য়ুরোপের অনেক রশি-প্রস্তুতের কারখানা এ দেশ হইতে নারিকেল-ছালের সূত্র—যাহা "কয়ার" নামে অভিহিত হইয়া থাকে—লইয়া গিয়া সেখানে নানা আকারের দড়ী, রশি, কাছি প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া জাহাজওয়ালাদিগকে বিক্রয় করিতেন। আমরা দেখিয়াছি, বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতবর্ষ হইতে ৭০ হাজার হন্দরের অধিক কয়ার য়ুরোপে রপ্তানী হইয়াছে ; তদ্ব্যতীত প্রায় ১ লক্ষ ৩০ হাজার হন্দর



নারিকেলের সূত্র

প্রস্তুত হইত বলিয়াই বোধ হয় উহা ঐ নামে অভিহিত হইত।

১৮৫১ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে নারিকেল-রজ্জুর বিষয় য়ুরোপে অজ্ঞাত ছিল। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে এক ইংরাজ লেখক ইহার কথা লিখিয়া বলিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষের নানা স্থানে প্রচুর পরিমাণে নারিকেল-রজ্জুর ব্যবসা হইয়া থাকে। ইহাতেই বোধ হয়, ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে যে প্রথম প্রদর্শনী হইয়াছিল, তাহাতে ভারতের অন্যান্য শিল্পসামগ্রীর সহিত নারিকেল-রজ্জুও প্রদর্শিত হইয়াছিল। সেই সময় হইতে য়ুরোপে ইহার ব্যবসা ক্রমেই প্রসারিত ওজনের রশি ও কাছি প্রভৃতি রপ্তানী হইয়াছে। ইদানীং এ দেশে, বিশেষতঃ দক্ষিণ-ভারতে নারিকেল-রজ্জু প্রস্তুত করিবার অনেক কারখানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় "কয়ারের" রপ্তানী হ্রাস হইয়াছে।

রজ্জু প্রস্তুত ব্যতীত বহু পরিমাণে নারিকেল "কয়ার" গদী, পা-পোস, **Matting** বা মেঝেতে বিছাইবার আস্তরণ ও বুরুষ প্রভৃতি তৈয়ারের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। "কয়ার" যেমন টেকসই, দীর্ঘকালস্থায়ী ও হাল্কা, তেমনই উহা স্থিতিস্থাপক ও নমনীয়। এই হেতু উহা গদী প্রস্তুত করিবার পক্ষে বড়ই উপযোগী। [illegible]

গদী যেমন তাহার উপর শয়ন করিলে নামিয়া যায় এবং তাহা হইতে উঠিলে যেমন পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়, কয়ারের গদীরও কিয়ৎপরিমাণে সেই গুণ আছে। এই জন্য অনেকে তূলার গদী অপেক্ষা কয়ারের গদী পছন্দ করেন। তাহার পর, ইহা জলবৃষ্টিতে নষ্ট হয় না এবং ভিজা সেঁতসেঁতে স্থানে ইহার কোনরূপ বিকৃতি হয় না। কয়ারের গদী, ম্যাটিং বা রজ্জু কীটে নষ্ট করে না, ইহার ঐরূপ আক্রমণ নিবারণের শক্তি আছে। এই জন্য জাহাজের মাস্তুলের রশি ও জাহাজ বাঁধিবার কাছির জন্য উহা বিশেষরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

নারিকেলের ত্বক্ হইতে সূত্র বাহির করিবার প্রণালী নানা স্থানে নানারূপ। সাধারণতঃ নারিকেলের ছোবড়া চৌবাচ্চায় বা বড় বড় হৌজে ভিজান হয়, তাহার পর একটি সরু শলাকার ন্যায় তীক্ষ্ণমুখবিশিষ্ট লৌহদণ্ড দ্বারা ত্বক্ হইতে সূত্রগুলি বাহির করা হয়। তৎপরে হাতের দ্বারা আরও সূক্ষ্মরূপে সূত্রগুলি স্বতন্ত্র করা হয়। কোথাও কোথাও বা ছোবড়া জলে ভিজাইয়া, তাহার উপর ক্রমাগত লৌহদণ্ড আঘাত করিয়া, সূত্র বাহির করা হয় ও শেষে পূর্ব্ববৎ হাতে করিয়া সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সূত্রগুলি বিচ্ছিন্ন করা হয়। মাদ্রাজ, বোম্বাই ও দক্ষিণ-ভারতের নানা স্থানে নারিকেলসূত্র বাহির করিয়া বহু নর-নারী জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। তাহাদিগের মধ্যে স্ত্রী-লোকই অধিক। ইদানীং এই সূত্র বাহির করিবার জন্য নানারূপ যন্ত্র ব্যবহৃত হইতেছে, তাহাতে অল্প সময়ের মধ্যে অধিক পরিমাণে সূত্র বাহির হইলেও তাহা হাতে প্রস্তুত সূত্রের ন্যায় পরিষ্কার ও সূক্ষ্ম নহে। শুনা যায়, এক এক ব্যক্তি এক দিনে হাজার নারিকেলের ছোবড়া হইতে "কয়ার" বাহির করিতে পারে। সচরাচর ৪০টি, কোথাও ৫০টি নারিকেলের ছোবড়া হইতে তিন সের কয়ার বাহির হয়। পক্ষান্তরে, মাদ্রাজে ১৮টি নারিকেল হইতে ঐ পরিমাণ সূত্র বাহির হয়। কিন্তু মাদ্রাজের ঐ পরিমাণ সূত্র হইতে যে পরিমাণে রশি বা দড়ি প্রস্তুত হয়, তাহা অন্য স্থানের (সিংহল, লাক্ষা দ্বীপ প্রভৃতি) প্রস্তুত দড়ি অপেক্ষা অনেক কম। "কয়ার" প্রস্তুত কার্য্যে যেমন দক্ষিণ-ভারতের বহু লোক নিযুক্ত, তেমনই "কয়ারের" ম্যাটিং ও পা-পোস প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়াও বহু লোক জীবিকা অর্জ্জন করিয়া থাকে। দড়ি প্রস্তুত করিবার কয়ার প্রায় ৪ শত হইতে ৫ শত টাকা এবং ম্যাটিং প্রস্তুতের কয়ার ২ শত ৫০ হইতে ৩ শত ৫০ টাকা পর্য্যন্ত টন দরে বিক্রয় হয়।

"কয়ার" প্রস্তুত করিবার কালে তাহা হইতে যে ধূলিবৎ গুঁড়া নির্গত হয়, এক্ষণে উহাও নষ্ট হয় না। উহা হইতে এক প্রকার Card Board প্রস্তুত হয়। ঐ কার্ড বোর্ডে যদি কোন ছিদ্র থাকে, উহা জলে ডুবাইয়া লইলে তাহা বন্ধ হইয়া যায়। এক সময়ে এইরূপ কার্ড বোর্ডে যুদ্ধজাহাজ নির্ম্মাণ করিবার কথা উঠিয়াছিল, যেহেতু, সে জাহাজ শত্রুর কামানের আঘাতে জলমগ্ন হইবার সম্ভাবনা অল্প। ইদানীং নারিকেল-ছোবড়ায় কাগজ প্রস্তুত করিবার চেষ্টা হইতেছে। যেমন ঘাস বা বাঁশের মণ্ড প্রস্তুত করিয়া কাগজ হইতেছে, নারিকেল-ছোবড়াকেও সেইরূপ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় মণ্ডে পরিণত করিয়া কাগজ প্রস্তুত করা যায়, পরীক্ষার দ্বার তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। তবে ইহা কোন কাগজের কলে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে কি না, তাহা এখনও জানিতে পারা যায় নাই।

নারিকেলের মালা বা খোলার প্রয়োজনীয়ত এ বাঙ্গালা দেশে কাহারও অবিদিত নহে; বাঙ্গালীর শ্রান্তি অপনোদনের একমাত্র সহায়, শিষ্টাচার প্রদর্শনের প্রধান ও প্রকৃষ্ট উপাদান তাম্রকূট সেবনের যন্ত্র হুঁকা যে এই নারিকেল-খোল হইতে প্রস্তুত হয়, তাহা সকলেই অবগত আছেন। এই জন্য উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে হুঁকা "নারথিলি" বা "নারিয়েল" নামে প্রসিদ্ধ। যে হুঁকা ব নারিকেল-খোল তাম্রকূটসেবনকালে "ফুড়ুক ফুড়ুক" "ভুড় ভুড়, ভুড় ভুড়" ইত্যাদি তাম্রকূটসেবীর শ্রুতিসুখকর নানা শব্দ বাহির করে, সেই নারিকেল-খোল আবার সারঙ্গ, বেহালা প্রভৃতি মধুর বাদ্যযন্ত্র নির্ম্মাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আইন-আকবরীতে ও সম্রাট বাবরের স্মৃতিলিপিতে নারিকেল-খোলে এইরূপ বাদ্যযন্ত্র নির্ম্মাণের উল্লেখ দেখা যায়। আইন-আকবরীতে ঐ বাদ্যযন্ত্র "ঘীচক" নামে উল্লিখিত হইয়াছে। যে নারিকেলে হুঁকা প্রস্তুত হয়, তাহাতে একটিমাত্র ছিদ্র করিয়া তন্মধ্যে "লোনা" জল পূরিয়া বালুকামধ্যে পতিয়া রাখা হয়

এইরূপে কিছু দিন রাখিলে খোলের ভিতরের শাঁস পচিয়া জলবৎ হয় এবং ছিদ্রমুখ দিয়া তাহা বাহির করিয়া লওয়া হয়। কিন্তু অপেক্ষাকৃত অপক্ক খোলে "লোনা" জল পূরিলে খোলটি পর্য্যন্ত পচিয়া যায়। মাদ্রাজ প্রদেশে নারিকেলের খোলে নানাচিত্রসমন্বিত ফুলদান, চায়ের পেয়ালা, চিনিদান, চামচ ইত্যাদি প্রস্তুত হয়। অপেক্ষাকৃত অপক্ক খোলে সুন্দর নস্যদানি নির্ম্মিত হয় এবং আরও অনেক প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপন্ন হয়। ইদানীং নারিকেলের খোলে আর একটি প্রয়োজন সাধিত হইতেছে। দক্ষিণ-ভারতে যে সকল রবারের আবাদ আছে, সেখানে নারিকেলখোল জ্বালাইয়া তাহার ধূমে রবার শুকান হয়। নারিকেলখোলের এই প্রয়োজনীয়তা অতি অল্পদিনমাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। নারিকেলখোলের অঙ্গারেও নানা কায হইতেছে। সম্প্রতি উহাতে ছাপিবার কাল কালী প্রস্তুত হইয়াছে।

নারিকেলের শাঁস যেমন সুখাদ্য, তেমনই পুষ্টিকর। এই জন্য অধুনা ইহার প্রতি য়ুরোপীয়দিগের বিশেষ দৃষ্টি পড়িয়াছে এবং ইহা হইতে তাঁহাদিগের দেশের উপযোগী খাদ্য উৎপাদন করিবার জন্য কিছুকাল হইতে চেষ্টা চলিতেছিল। য়ুরোপীয়দিগের প্রধান খাদ্য রুটী, মাখন না মাখাইলে গলাধঃকরণ করা যায় না এবং স্বাদুও হয় না। কিন্তু আপামর সাধারণ সকলের পক্ষে মাখন ক্রয় করা ক্রমে সাধ্যাতীত হইয়া দাঁড়াইতেছে। এই হেতু কিছু কাল হইতে মাখনের ন্যায় একটি পুষ্টিকর ও উপাদেয়, অথচ সুলভ সামগ্রী উৎপাদনের জন্য অনেক দিন হইতে চেষ্টা হইতেছিল। যাহাতে পারিসের দীন দুঃখী পর্য্যন্ত (every Paris gamin) তাহাদের শুষ্ক রুটী সুস্বাদু করিবার জন্য সন্তাদরে মাখনের ন্যায় উপাদেয় সামগ্রী প্রাপ্ত হয়, ইহা সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ানের চিরস্বপ্ন ছিল। তাঁহার এই ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য Mege Mouries নামে এক রাসায়নিক বহু চেষ্টার পর Beef suet (গরুর এক প্রকার চর্ব্বি) হইতে মাখনের পরিবর্ত্তে ব্যবহারোপযোগী একটি সামগ্রী আবিষ্কার করেন। এক্ষণে মাখনের পরিবর্ত্তে মার্গারিন (Margarine) নামে যে সামগ্রী বিলাতের নিম্নশ্রেণীর লোক রুটীর সহিত ভোজন করে, Mege Mouriesএর চেষ্টাই তাহার উৎপত্তির আদি কারণ। কিন্তু গো-মহিষাদির চর্ব্বি হইতে এই মার্গারিন প্রস্তুত হওয়ায় ইহার ব্যবহার যে সকল সময়ে নিরাপদ নহে,তাহা বহুদিনের পরীক্ষায় প্রতিপন্ন হইয়াছে। অনেক মার্গারিনে নানা রোগের জীবাণু পরিদৃষ্ট হইয়াছে। তাহার পর আমাদের দেশের ঘৃতের ন্যায় এই নকল মাখনেও বহুকাল ভেঁজাল চলিয়াছে। এই হেতু ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে মার্গারিন আইন বিধিবদ্ধ হয়, তাহাতে বিশুদ্ধ মার্গারিন পাইবার সুযোগ হইলেও, যে উদ্দেশ্যে এই সামগ্রী আবিষ্কৃত হয়, তাহা সিদ্ধ হয় নাই। মার্গারিন প্রস্তুত করিবার জন্য বহু পরিমাণে গো-মহিষ বধ করায় ঐ সকল জীবের সংখ্যা ইংলণ্ডে ও অন্যত্র হ্রাস হইতে থাকে, তাহাতে ক্রমে সুলভে মার্গারিন প্রস্তুত করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। ইহা দেখিয়া আমেরিকাবাসীরা মার্গারিন প্রস্তুত করিতে মনোযোগ প্রদান করেন। মার্কিণ যুক্তরাজ্যের দক্ষিণাঞ্চলের অধিবাসীরা গো-পালনে বিশেষ সুদক্ষ। তাহারা মার্গারিন ব্যবসায় চালাইবার জন্য তাহাদিগের গো-বংশ যাহাতে বৃদ্ধি পায়, সে জন্য বিশেষ যত্ন করিয়া, সম্প্রতি তাহারা বুঝিয়াছে যে, মার্গারিনের জন্য গো-বধ করিলে শীঘ্র না হউক, অদূর ভবিষ্যতে তাহাদিগের গো-বংশ নির্ম্মূল হইবার সম্ভাবনা। এই জন্য তাহারা তৈলাক্ত উদ্ভিদ-বীজ হইতে মার্গারিন প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করে এবং Soya Bean নামক শিম্বী হইতে নকল মাখন প্রস্তুত করে। কিন্তু ইহাতে তাহারা যত দূর আশা করিয়াছিল, তাহা সফল হয় নাই।

য়ুরোপেও যে এ বিষয়ে চেষ্টা হইতেছিল না, এমন নহে। সেই চেষ্টার ফলে বিগত যুদ্ধের অনতিকাল পূর্ব্বে এক জার্ম্মাণ বৈজ্ঞানিক নারিকেলের শাঁস হইতে মাখন প্রস্তুত করিয়া য়ুরোপবাসীর সুলভে একটি পুষ্টিকর আহার্য্য সামগ্রী পাইবার যেমন উপায় করিয়া দেন, তেমনই একটি নূতন লাভজনক ব্যবসায়ের পথ খুলিয়া দেন। এই নারিকেলের মাখন যে য়ুরোপের Food of the Future, ভবিষ্যতের প্রধান খাদ্য সামগ্রী, ইহা খ্যাতনামা রাসায়নিকগণ ও চিকিৎসকগণ একবাক্যে প্রকাশ করিতেছেন। ফরাসী সৈন্যদলের প্রথম শ্রেণীর সার্জ্জন এবং Society of Hygiene Medicineএর মেম্বর ও

Officer of the Legion d' Honneur ডাক্তার সার্লা (Dr. Challan) নারিকেলের মাখন সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার দুই একটি এ স্থলে উদ্ধৃত হইল,—

(i) Coconut butter is a production of incomparable purity, thoroughly free from contamination of microbes and from atmospheric ferments. It has the incontestable advantage over all vegetable fats of very rapid digestibility, and a thoroughly complete assimillation. It can be kept for a long time without undergoing the least alteration from contact with atmosphere, it would consequently, make a very useful food supply for keeping in stock.

অর্থাৎ নারিকেলের মাখনের ন্যায় বিশুদ্ধ সামগ্রী আর নাই, ইহাতে কোন রোগের জীবাণু উৎপন্নও হয় না, বাতাসের সংস্পর্শেও উহা নষ্ট হয় না। ইহা সহজে পরিপাক হয় ও বহুদিন রাখিলেও ইহার কোনরূপ পরিবর্ত্তন হয় না। এই হেতু এই খাদ্য-সামগ্রী সঞ্চয় করিয়া রাখাও যায়।



নারিকেলের শাঁস বাহির করা হইতেছে

নারিকেল-শাঁসের এই গুণ হেতু যুদ্ধের পর হইতে য়ুরোপ ও আমেরিকায় মাখন ও অন্যান্য সামগ্রী প্রস্তুত করিবার জন্য ভূরি পরিমাণে উহা রপ্তানী হইতেছে। যে নারিকেলের শাঁস দুধের মত সাদা, সুস্বাদু ও সুগন্ধযুক্ত এবং যাহা সহজে মুট মুট করিয়া ভাঙ্গিয়া যায়, তাহার আদর অধিক। বলা বাহুল্য, এ দেশ হইতে ছোবড়া সমেত নারিকেল রপ্তানী হয় না। শাঁস খুলিয়া তাহা রৌদ্রে শুকাইয়া বাক্সবন্দী করিয়া জাহাজে চালান দেওয়া হয়। আনুমানিক ৩ হাজার ৭ শত নারিকেল হয়। আবার ছোট নারিকেল হইতে ৫ হাজারটিতে ঐ পরিমাণ শাঁস বাহির হয়। এই পরিমাণ শুষ্ক শাঁসের মূল্য ৩০ হইতে ৩২ পাউণ্ড। কিন্তু য়ুরোপে যুদ্ধের পূর্ব্বে উহার মূল্য ১০ হইতে ১২ পাউণ্ডের অধিক ছিল না। ইহাতেই বুঝা যাইবে, নারিকেল-শাঁসের চাহিদা কিরূপ বাড়িয়াছে। যাঁহারা এই ব্যবসায়ে নিযুক্ত আছেন, তাঁহারা বলেন, প্রতি বৎসরই নারিকেল-শাঁসের মূল্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে এবং ভবিষ্যতে যে আরও বাড়িবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

নারিকেল হইতে মাখন প্রস্তুত করিবার প্রণালী জার্ম্মাণ বৈজ্ঞানিক কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইলেও ফ্রান্স যেরূপ আগ্রহের সহিত উহা গ্রহণ করিয়াছেন, জার্ম্মাণী সেরূপ করে নাই। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের একমাত্র মার্সেল সহরে ৭৫ হাজার টন নারিকেলের মাখন প্রস্তুত হইয়াছিল, আর জার্ম্মাণীর হাম্বার্গ নগর ও সুইজার্ল্যাণ্ডের জেনিভা নগর মিলিয়া ৩৬ হাজার টনের অধিক উৎপাদন করিতে পারে নাই। এই নূতন মাখন বা মার্গারিনের শতকরা ৩৩ ভাগ বৃটিশ দ্বীপে রপ্তানী হইয়াছিল। ইংলণ্ডে এই নূতন সামগ্রীর আদর দেখিয়া সেখানেও ইহা প্রস্তুত করিবার জন্য কারখানা স্থাপিত হইয়াছে এবং লণ্ডনের অনতিদূরে একটি কারখানায় প্রতিদিন প্রয়োজনানুরূপ ৫ শত ৫০ টন পর্য্যন্ত নারিকেলের মাখন তৈয়ার করিবার যন্ত্রাদি বসান হইয়াছে। নারিকেলের মাখন আবিষ্কৃত হওয়ার পর য়ুরোপের লোক অধিক পরিমাণে চর্ব্বিযুক্ত আহার-সামগ্রী ভোজন করিতেছে।

হয়, তাহাতে দেখা যায়, য়ুরোপে প্রতি জন বৎসরে ২৫ পাউণ্ড করিয়া এইরূপ সামগ্রী ভোজন করিতেছে, আর গ্রেট বৃটেনের লোক বৎসরে পাঁচ পাউণ্ড মাত্র ব্যবহার করিয়াছে। কেবল য়ুরোপ নহে, আমেরিকাতেও এই নূতন মাখনের ব্যবহার শনৈঃ শনৈঃ প্রচলিত হইতেছে। ভারতেও ইহা প্রচলনের চেষ্টা হইয়াছিল। এ দেশে যখন প্রথমে ভেজাল ঘৃতের বিরুদ্ধে আন্দোলন উপস্থিত হয়, তখন এক উদ্যমশীল ফরাসী ব্যবসায়ী ভারতবাসীকে গব্য ও মাহিষ ঘৃতের পরিবর্ত্তে নারিকেলের বিশুদ্ধ মাখন গলাইয়া তাহার ঘৃত খাওয়াইবার জন্য যত্নবান্ হইয়াছিলেন। উহা "কোকোটিন" নামে তিনি অভিহিত করিয়াছিলেন। উহার আস্বাদন ঘৃতেরই অনুরূপ হইয়াছিল, কিন্তু তাহা এ দেশে চলিল না। এ দেশে এক্ষণে যে ঘৃতে ময়রার দোকানের মিষ্টান্ন প্রস্তুত হয়, তাহার পরিবর্ত্তে এই নারিকেলজাত ঘৃত ব্যবহার করিলে খাদ্যসামগ্রী যেমন স্বাস্থ্যকর হইত, তেমনই সুলভে প্রস্তুত হইতে পারিত। কিন্তু এ দেশে প্রাচীন সংস্কার ও ব্যবহারের সত্বর পরিবর্ত্তনসাধন এক প্রকার অসম্ভব ব্যাপার।

নারিকেল হইতে মার্গারিন বা মাখন প্রস্তুত ব্যতীত ঐ প্রকারের আর একটি খাদ্যসামগ্রী উৎপন্ন করা হইতেছে। নারিকেলের শাঁস হইতে খাইবার উপযোগী তৈল বাহির করিয়া তাহা দুগ্ধের সহিত মিশাইয়া, মন্থন পূর্ব্বক নবনীত বাহির করা হইতেছে। ইহার নাম Maypole margarine। ডেভন্ ও ডর্সেটসায়ার হইতে নিত্য ট্রেণ বোঝাই করিয়া এই মেপোল মার্গারিনের কারখানায় শত শত মণ দুধ আমদানী হয়, এবং বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে তাহা জীবাণুমুক্ত করিয়া ঐ খাদ্য প্রস্তুত হয়। যাহাতে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত এই খাদ্যসামগ্রী বিশুদ্ধভাবে প্রস্তুত হয়, সে জন্য বহু রাসায়নিক নিযুক্ত আছেন, তাঁহারা উহা প্রস্তুতের প্রত্যেক প্রণালী তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া থাকেন। কোন সংবাদপত্রের প্রতিনিধি এই কারখানার পরীক্ষাগার দেখিয়া বলিয়াছেন,—The laboratory is worthy of any University."

এ দেশ হইতে যে শুষ্ক নারিকেলের শাঁস চালান যায়, এক্ষণে সেই শাঁস কলের সাহায্যে বাহির করিয়া, কলের সাহায্যে শুকাইয়া ও কলের সাহায্যে বাছাই করিয়া বাক্সবন্দী করা হয়। ইহাতে অনুমান হয়, অনতিকালমধ্যে মার্গারিন প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার জন্য এ দেশেও কলকারখানা বসিবে এবং য়ুরোপীয় ধনীরাই সেই ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইবেন।

বিস্কুট ও অন্যান্য রকমের মিষ্টান্ন প্রস্তুতের জন্যও য়ুরোপ এবং আমেরিকায় নারিকেলের শাঁস যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। ইদানীং চকোলেট (chocolate) ব্যবসায়ীরাও ইহা ব্যবহার করিতেছেন।

নারিকেল হইতে তৈল প্রস্তুত এ দেশে অতি প্রাচীন কাল হইতেই প্রচলিত আছে। নারিকেল-তৈল মাথায় মাখিলে চুলে আঠা হয় না বলিয়া এ দেশের স্ত্রীলোকরা ইহা চিরকাল মাখিয়া আসিতেছেন, কিন্তু ইহার গন্ধ ভাল নহে বলিয়া তাঁহারা নানা প্রকার মশলা সংযোগে ইহা সুরভিত করিয়া থাকেন। এখনকার "কুন্তলবৃষ্য" বা "জবাকুসুম" অদ্যাপি বাঙ্গালীর ঘর হইতে নারিকেল-তৈলকে বিদায় করিয়া দিতে পারে নাই। ইদানীং দাক্ষিণাত্যে নূতন প্রথায় যে নারিকেল-তৈল প্রস্তুত হইতেছে, তাহা দুর্গন্ধহীন ও জলের ন্যায় বর্ণহীন। দক্ষিণ-ভারতের লোক রন্ধনকার্য্যে নারিকেল-তৈলই ব্যবহার করিয়া থাকেন, ইহাতে যে তাঁহাদের খাদ্যসামগ্রী অপেক্ষাকৃত পুষ্টিকর হয়, তাহা বলা বাহুল্য। যখন এ দেশে গ্যাস বা ইলেক্‌ট্রিক লাইট অথবা কেরোসিন তৈলও ছিল না, তখন বাবুদের বৈঠকখানা ও সাহেবদের ড্রয়িংরুম এই নারিকেল-তৈলই আলোকিত করিত। এখন তাহার অন্যথা ঘটিলেও আলোর জন্য নারিকেল-তৈলের ব্যবহার একেবারে লোপ পায় নাই। এখনও ইংলণ্ড ও আমেরিকায় বহু বাতির কারখানা আছে, যাহাতে বাতি প্রস্তুত করিতে নারিকেল-তৈল ব্যবহার হইয়া থাকে, আর কলের যন্ত্র সকল পরিষ্কার করিতে নারিকেল-তৈলই প্রশস্ত। কিছু দিন পূর্ব্বে নানা প্রকার lubricant আবিষ্কৃত হওয়ায় কলে নারিকেল-তৈলের ব্যবহার হ্রাস হইয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে সে সকলের পরিবর্ত্তে আবার নারিকেলতৈল ব্যবহৃত হইতেছে।

প্রস্তুত করিবার উৎকৃষ্ট উপাদান বলিয়া সিদ্ধান্ত হওয়ায়, এক্ষণে সাবানের কারখানায় উহা সমাদৃত হইতেছে। সাবানের কারবার যেরূপ বাড়িতেছে এবং জন্তুর চর্ব্বি যেরূপ দুষ্প্রাপ্য হইতেছে, তাহাতে নারিকেল-তৈলের ব্যবহার যে আরও বৃদ্ধি পাইবে, অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা তাহা দৃঢ়তাসহকারে বলিতেছেন। এই তৈল প্রস্তুত করিতে নারিকেলের যে অংশ খৈলে পরিণত হয়, তাহাও এক দিকে গো-মহিষাদির খাদ্য, অপর দিকে ভূমির সারের জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয়। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় এই খৈল গো-মহিষাদির সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। এই জন্য য়ুরোপে নারিকেলতৈলের কারখানায় যে খৈল উৎপন্ন হয়, তাহা গো-মহিষাদির খাদ্যে পর্য্যবসিত হয়।

নারিকেল কিরূপ অর্থোৎপাদক সামগ্রী,এই প্রবন্ধের আলোচনায় তাহা সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি হইবে। নারিকেলের ব্যবসাও যে উত্তরোত্তর প্রসারিত হইবে, তাহাও সুস্পষ্টরূপে বুঝাইতেছে। এক অভিজ্ঞ ব্যক্তি বলেন, এক্ষণে পৃথিবীতে ৬ শত ৫০ কোটি নারিকেল জন্মায়, কিন্তু যে পরিমাণ নারিকেল প্রয়োজন, তাহার তুলনায় ইহার পরিমাণ অত্যল্প। এই কারণেই দাক্ষিণাত্যে, সিংহলে, মালয় দ্বীপে ও অন্যত্র য়ুরোপীয়গণ নারিকেলের আবাদ করিবার জন্য সহস্র সহস্র বিঘা জমী লইতেছেন ও সেজন্য প্রচুর মূলধন নিয়োগ করিতেছেন। আমাদের বাঙ্গালাদেশে কি এ বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা হইতে পারে না? চেষ্টা করিলে যে তাহা একেবারে ব্যর্থ হইবে না, দক্ষিণ-ভারতের ও সিংহলের দৃষ্টান্তে তাহা বুঝা যায়। আমরা একটি বাগানের হিসাব দেখিলাম, তাহাতে প্রতিদিন ৫০ হাজার নারিকেল হইতে তৈল প্রস্তুত হয়, "কয়ার" বাহির করা হয় ও পা-পোস, ম্যাটিং ইত্যাদির জন্য সূত্র বাহির করা হয় এবং খৈল উৎপন্ন হয়, ইহাতে প্রতিদিন ৭৯ পাউণ্ড হিসাবে লাভ হইয়াছে। এরূপ বিরাট ব্যাপারে নিযুক্ত না হইলেও, ক্ষুদ্র আকারে কার্য্য আরম্ভ করিলেও যে তদনুরূপ লাভ হইতে পারে, এ আশা দুরাশা নহে।

শ্রীতিনকড়ি মুখোপাধ্যায়।

রিক্ত

প্রেমের ঘরে বন্ধ চাবি,
  হৃদয় তোমার রাজ্যহীন;
নেইক কোথাও স্নেহের দাবী,
  বিশ্বে তুমি নিঃস্ব ক্ষীণ।

রিক্ত তুমি, কাঙ্গাল তুমি,
  ক্ষুদ্র হতেও ক্ষুদ্র প্রাণ;
অন্তরে নাই কণিকা প্রেম
  কোন্ মুখে চাও প্রতিদান?

শান্তি কোথায়? তৃপ্তি কোথায়?
  মুক্তি? সে ত অনেক দূর!
সার্থকতা? কোন্‌খানে সে?
  বিফলতায় হৃদয় চূর!

আঁখির আগে কৃষ্ণ নিবিড়
  পর্দ্দা তোমার ঝুলছে ওই,
কই গো কোথায় আজকে তোমার
  প্রেমের ঘরের চাবি কই?

মিথ্যা কেন, প্রয়াস হেন?
  বিফল কেন যত্ন আর?
ঝঞ্ঝাবাতে, দুর্য্যোগেতেও
  খুলবে না গো রুদ্ধ দ্বার।

কঠিন ও যে, পাষাণ সম
  রুদ্ধ দুয়ার চিরদিন;
হৃদয় তোমার রইল শুধুই,
  রাজা এবং রাজ্যহীন!

বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যহানি ও তাহার কারণ

সেকালের বাঙ্গালা

বাঙ্গালা কি বরাবরই এখনকার মত রোগ, শোক, দুর্ভিক্ষের বাসভূমি ছিল? বাঙ্গালীজাতি কি চিরকালই এইরূপ দুর্ব্বল, ম্যালেরিয়াগ্রস্ত, "প্লীহারেখাঙ্কিত টিনুটিনে পেটধারী" ছিল? ইতিহাস এ বিষয়ে কি সাক্ষ্য দেয়, তাহা একবার দেখা যাউক। হিন্দু-রাজত্বের কথা ছাড়িয়া দিলে মুসলমান-রাজত্বের সময়েও আমরা দেখিতে পাই, সারা ভারতে বাঙ্গালার জল, বাঙ্গালার বায়ু অতুলনীয় ছিল, বাঙ্গালার পল্লী অতিশয় ঘনবসতিযুক্ত ছিল। এমন কি, বঙ্গে বর্ষা ঋতুও স্নিগ্ধ ও স্বাস্থ্যকর ছিল; বর্ত্তমান সময়ের মত ম্যালেরিয়ার অগ্রদূত ছিল না। আবুল ফজল 'আইন-ই-আকবরী'তে বলিতেছেন,—

"The whole extent of this vast empire is unequalled for the excellence of its waters, salubrity of air, mildness of climate and the temperate constitution of the natives. Every part is cultivated and full of inhabitants, so that you cannot travel the distance of a 'cos' (two miles) without seeing towns, and villages, and meeting with good water. Even in the depth of water, the earth and the trees are covered with verdure; and in the rainy season, which in many parts af Hindusthan commences in June and continues till September, the airs are so deligthfully pleasant that it gives youthful vigour to old age."

ভাগীরথীর উভয় তীরবর্ত্তী স্থানসমূহ, যাহা এক্ষণে ম্যালেরিয়ার প্রধান আকর,—তাহা পূর্ব্বে বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ অংশ,—খুবই স্বাস্থ্যকর ছিল, এ কথা বাঙ্গালার স্বাস্থ্য-কমিশনার ডাক্তার বেণ্টলীও স্বীকার না করিয়া পারেন নাই (Report on Malaria in Bengal)। কোম্পানীর রাজত্বের প্রথম ভাগেও এখনকার ম্যালেরিয়া-ভান্সিটার্টের এবং সুখচর ওয়ারেণ হেষ্টিংসের স্বাস্থ্যনিবাস ছিল। এখনকার বাঙ্গালী সহজে এ কথা বিশ্বাস করিতে পারিবেন না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও স্বাস্থ্যসঞ্চয়ের জন্য বর্দ্ধমানে যাইতেন; পরে সেখানেও ম্যালেরিয়া দেখা দেওয়ায় কর্ম্মাটারে যাইতে আরম্ভ করেন। বর্দ্ধমান সম্বন্ধে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে সরকারী রিপোর্টে দেখা যায়,—

"A fatal fever has of late years become epidemic, with seasonal outbreaks of extreme severity over a large tract of country which includes districts formerly among the healthiest in the Province."

স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় তাঁহার 'ভারতবর্ষীয় উপাসকসম্প্রদায়ে' এবং রাজনারায়ণ বসু তাঁহার 'সেকাল ও একাল' নামক বহিতেও এ বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন; বাহুল্যভয়ে সে সকল হইতে কোনও কথা উদ্ধৃত করা গেল না। ডাক্তার বেণ্টলী স্পষ্টই স্বীকার করিতেছেন যে, বিগত ৫০ বৎসরের ভিতরে বাঙ্গালার স্বাস্থ্যের অবস্থার শোচনীয় অবনতি ঘটিয়াছে। কোন কোন স্থানে বিগত ৮।১০ বৎসরের মধ্যেই ম্যালেরিয়ার আক্রমণ অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। "Recent investigation has shown also that in certain localities a rapid increase of infection has occurred within the course of the last 10 years."

প্রায় এক শত বৎসর পূর্ব্বে লর্ড মিণ্টো বাঙ্গালার লোকদিগকে যেরূপ সবল ও সুস্থ দেখিয়াছিলেন, সে কথা আলোচনা করিলে মনে যুগপৎ বিস্ময় ও দুঃখের উদয় হয়। সে সময়ের বাঙ্গালীকে দেখিয়া তিনি বলিতেছেন,—

"I never saw so handsome a race. They are much superior to the Madras people whose form I admired also. Those were slender. These are tall, muscular, athletic figures, perfectly shaped and with the finest cast of countenance and features. Their features, are of the most classical European models

হায় সেকাল আর এ কাল! অতঃপর বাঙ্গালার, তথা বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যহানির কয়েকটি প্রধান কারণ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে।

(১) প্রাকৃতিক অবস্থার বিপর্য্যয়

নানা কারণে বিগত শত বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালার আবহাওয়ার বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। পূর্ব্বাপেক্ষা বর্ত্তমান সময়ের হাওয়া অনেক শুষ্ক হইয়া গিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। পূর্ব্বের ন্যায় আর বৃষ্টি হয় না, জলকষ্ট এক প্রকার দেশব্যাপীই হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বে শীতকালে কখন কখন হুগলী, বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থানেও তুষারপাত হইত বলিয়া শুনা যায়। পূর্ব্বের মত কাল-বৈশাখী ঝড় এক প্রকার নাই বলিলেও চলে। বন-জঙ্গলের ধ্বংস ইহার একটি প্রধান কারণ বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। * ডাঃ ভোয়েল্‌কারের (Dr. Voelcker) মতে—"there is reason to believe that the climate was not formerly what it now is, but that the spread of cultivation accompanied, as it has been, by the wholesale and reckless denudation of forests and wooded tracts without reservation of land to afford wood or grazing has done much to render the climate what it now is," (Report on the Improvement of Indian Agriculture.) বন-জঙ্গলের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম ও উত্তর-বঙ্গের অনেক স্থানে জলাভাব ও তজ্জনিত কৃষি ও স্বাস্থ্যহানি দিন দিনই বাড়িয়া চলিতেছে।

(২) জলনিকাশের বাধা

ইহাকে বাঙ্গালার ম্যালেরিয়াবৃদ্ধির সর্ব্বপ্রধান কারণ বলিলেও কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। এখন গঙ্গা, যমুনা, শোণ প্রভৃতি নদীতে বাঁধ দিয়া সেচের খাল (irrigation canal) বাহির করিয়া লওয়া হইয়াছে; সেই কারণে পদ্মা, ভাগীরথী প্রভৃতি নদীতে স্বাভাবিক জল সরবরাহ অনেক কমিয়া গিয়াছে। সুতরাং পদ্মা ও ভাগীরথীর সঙ্গে সঙ্গে উহাদের উপনদীগুলিও ক্রমে মজিয়া উঠিতেছে। দামোদরের বাঁধ, রেলপথ এবং জিলাবোর্ড ও পাবলিক ওয়ার্কস্‌এর রাস্তা সমূহও বাঙ্গালার কম সর্ব্বনাশ করে নাই। বাঙ্গালায় রেলপথ বিস্তারের পূর্ব্বে কৃষিভূমি বর্ষে বর্ষে নূতন পলিমাটীর দ্বারা উর্ব্বর হইত; খাল, বিল ও নদীতে জলধারা বহিত, প্রচুর মৎস্য জন্মিত এবং কৃষিক্ষেত্রে আদৌ জলাভাব হইত না। তখন বর্ষার জলপ্লাবনে পল্লীগ্রামের শীত ও গ্রীষ্ম ঋতুর সঞ্চিত আবর্জ্জনাদি ধুইয়া যাইত; সোনার বাঙ্গালা শস্যে, স্বাস্থ্যে ও আনন্দে পরিপূর্ণ থাকিত। বাঙ্গালার কোন্ কোন্ অংশের জল নিঃসারণের পথ কোন্ কোন্ রেলওয়ে লাইনের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে, এ স্থলে সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করা যাইতেছে—:

(ক) ভাগীরথীর পশ্চিমতীরবর্ত্তী জিলাসমূহ (মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলী, বর্দ্ধমান ও বীরভূম) প্রধানতঃ ইষ্ট ইণ্ডিয়ান ও বেঙ্গল-নাগপুর রেলপথের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে।

(খ) চব্বিশ পরগণা, যশোহর, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলপথ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। খুলনা জিলার মধ্য দিয়া আড়াআড়িভাবে কোনও রেলপথ না গিয়া থাকিলেও নদীয়া ও যশোহরের জলস্রোতগুলি রুদ্ধ হওয়ায় খুলনারও বিশেষ অনিষ্ট ঘটিয়াছে; অনেক খাল বিল মজিয়া যাইতেছে।

(গ) রাজসাহী বিভাগ—সারা-সিরাজগঞ্জ লাইন, সান্তাহার-ফুলছড়ি লাইন, দিনাজপুর-রংপুর লাইন ও জলপাইগুড়ি-লালমণির হাট লাইন এই ৪টি রেলপথই পর পর আড়াআড়িভাবে উত্তরবঙ্গের জিলাসমূহের স্বাভাবিক জলনিকাশের পথে বাধা জন্মাইতেছে; ফলে ভূমির আর্দ্রতাবৃদ্ধি, জলপ্লাবন ও শস্যহানি এবং ম্যালেরিয়ার বিস্তার।

(ঘ) আসাম-বেঙ্গল রেলপথের দ্বারাও ত্রিপুরা, মৈমনসিংহ, শ্রীহট্ট প্রভৃতি জিলায় ক্রমে ম্যালেরিয়ার বিস্তার হইতেছে।

বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব স্যানিটারী কমিশনর ডাক্তার স্মিথ এবং স্বাস্থ্যবিভাগের বর্ত্তমান বড় কর্ত্তা ডাক্তার বেণ্টলীও এ কথা স্বীকার না করিয়া পারেন নাই। *

* See (i) The Climatic, National and Economic Influence of Forests. by J. Nisbet.

(ii) National Afforestation. by A. D. Webster.

(iii) মৎপ্রণীত "বাঙ্গালার পল্লীসমস্যা"।

* "There is a constant and close connection between humidity of the soil and high rates of sickness, * * * the fever of the Bengal districts ...

রেলপথ নির্ম্মাণের সঙ্গে সঙ্গে যদি প্রত্যেক স্বাভাবিক জলনিকাশের স্থলে সেতুর ব্যবস্থা থাকিত, তবে রেলপথের দ্বারা বাঙ্গালার এ সর্ব্বনাশ ঘটিত না। রাস্তা নির্ম্মাণের সময় স্বাভাবিক জলনিকাশের ব্যবস্থার দিকে আদৌ দৃষ্টি রাখা হয় নাই। খরচ বাঁচাইবার জন্য যেখানে সেতু না করিলে রাস্তা ভাঙ্গিয়া যাইবার ভয় আছে, কেবল সেইখানেই বাধ্য হইয়া সেতুর ব্যবস্থা করা হইয়াছে; অন্যথা ছোটখাট খাল-নালাগুলিকে একেবারে বন্ধ করিয়াই রাস্তা প্রস্তুত করা হইয়াছে। জিলাবোর্ড ও পাবলিক ওয়ার্কস্‌ও এ ব্যাপারে কম অপরাধী নহে।

(৩) দারিদ্র্য ও খাদ্যাভাব

একটু চিন্তা করিলেই দেখা যায়, বাঙ্গালার স্বাস্থ্যহানির মূলে দারিদ্র্য বিষম কারণ রহিয়াছে। দরিদ্র ব্যক্তি পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, উপযুক্ত বস্ত্র ও আচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিতে পারে না। তাহাকে অস্বাস্থ্যকর আবেষ্টনের মধ্যে বাধ্য হইয়া বাস করিতে হয়, তদুপরি দারিদ্র্যজনিত উদ্বেগ ও মানসিক দুশ্চিন্তা ত আছেই। এ সকলের সমবায়ে যদি স্বাস্থ্যহানি না ঘটে, তবে আর কিসে ঘটিবে? জনৈক লেখকের মতে "Fever is a euphemism for insufficient food, scanty clothing, and unfit dwelling." বাঙ্গালার দরিদ্র কৃষক ও চাকুরীজীবী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় দারিদ্র্যের পেষণে দিন দিন ক্ষীণবীর্য্য ও অল্পায়ু হইয়া পড়িতেছে। এই শ্রেণীর লোকই অতি সহজে পীড়ার দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং আক্রমণমাত্রেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। শিশু-মৃত্যুর হারও এই জন্য ক্রমশঃ বৃদ্ধির দিকে চলিয়াছে। স্বচ্ছল ও দরিদ্র লোকদিগের মধ্যে শতকরা মৃত্যুর হারের অনুপাত তুলনা করিলে দেখা যায়, দরিদ্র-দিগের মধ্যেই মৃত্যুর অনুপাত অত্যন্ত অধিক। এই জন্যই দুর্ভিক্ষ ও দুর্ম্মূল্যের সময়ে মৃত্যুর হার সস্তার বৎসর অপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি পাইতে দেখা যায়। * বর্ত্তমান সময়ে মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী সন্তানগণ যে ভাবে দারিদ্র্যের পেষণে নিষ্পেষিত হইতেছেন, তাহা একান্তই হৃদয়বিদারক। চাকুরীজীবী মধ্যবিত্ত পরিবারের দৈনিক খাদ্যতালিকা হইতে মাছ, মাংস, দুধ, ঘি প্রভৃতি পুষ্টিকর উপাদান প্রায় লোপ পাইয়াছে; বা কচিৎ "হোমিও-প্যাথিক" মাত্রায় পরিণত হইয়াছে!! য়ুরোপ ও আমেরিকার দিনমজুরদিগের খাদ্যও ইহা অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট ও সারবান্। মাংস, ডিম, পনীর, মাখন ও গোল আলু তাহাদের দৈনিক খাদ্য-তালিকার অন্তর্ভুক্ত।

কলকারখানার প্রভাব

বিগত ৪০।৫০ বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালা দেশে,—বিশেষতঃ কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে কলকারখানার বহুল বৃদ্ধি ঘটিয়াছে। এই সকল কলকারখানায় কায করিয়া, ইহার অস্বাস্থ্যকর ও দুর্নীতিপূর্ণ আবেষ্টনের মধ্যে থাকিয়া প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র লোক ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া পড়িতেছে। কুলীদের বাসস্থান ও জীবনযাত্রা-প্রণালী স্বাস্থ্যের অনুকূল নহে। অপর দিকে সহস্র সহস্র বাঙ্গালী ভদ্রসন্তান রেলে ও ষ্টীমারে চাকরী করিয়া অতিরিক্ত পরিশ্রম, রাত্রিজাগরণ ও পায়রার খোপের ন্যায় সঙ্কীর্ণ ও বদ্ধ "কোয়ার্টারে" বাস করিয়া সপরিবারে ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া পড়িতেছেন। বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পানীয় জলের আধার—গঙ্গা আর এখন "মনোহারি মুরারিচরণচ্যুতম্" নহে; হরিদ্বার হইতে আরম্ভ করিয়া কানপুর, এলাহাবাদ, কাশী, পাটনা প্রভৃতি বড় বড় সহরের মল, মূত্র, আবর্জ্জনা এবং উভয় তীরস্থ

---

beyond all doubt an epidemic malarial disease due to local causes, chiefly want of drainage, partial or complete stagnation of water-courses and saturation of the soil with moisture."

১৯২১ খৃষ্টাব্দের স্বাস্থ্যবিভাগের রিপোর্টে গভর্ণমেণ্টকে বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইতেছে—"In the Dacca and Chittagong Divisions, the mean fever indices show a serious increase, and this phenomenon is traced to the restriction of normal inundation, which the multiplication of embankments tends to cause."—Govt. of Bengal Resolution No. 154. P. H. the 27th January,

* ম্যালেরিয়ার কারণ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া ডাক্তার বেণ্টলী বলেন—"Two main factors are concerned. In the first place the presence of an agent of infection, and in the second place the occurrence of intense economic stress, short of actual famine, but leading to privation among a large or small portion of the population."

কলকারখানার "সেপ্‌টিক্ ট্যাঙ্কে"র ধোয়া জল প্রভৃতি সমস্তই গঙ্গাস্রোতে বাঙ্গালীর জন্য নামিয়া আসিতেছে! ইংরাজরাজত্বের পূর্ব্বে অন্ততঃ এ ভাবের অত্যাচার গঙ্গাকে—তথা গঙ্গাতীরস্থ অধিবাসীদিগকে সহিতে হয় নাই। উপরে উক্ত কারণগুলির সমবায়ে প্রতি বৎসর কত সহস্র সহস্র বাঙ্গালী যে অকালে শমনসদনে যাইতেছে, তাহার হিসাব কে করিবে?

বিকৃত রুচি

একে ত অস্থিমজ্জাপেষণকারী দারিদ্র্যের জন্য বাঙ্গালী উপযুক্ত অশন-বসনের ব্যবস্থা করিতে পারিতেছে না, তদুপরি তাহাকে আবার কাল্পনিক ভদ্রতার ও ফ্যাশনের চাল রাখিতে গিয়া কম ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইতেছে না। আহারে বিহারে এখন আমরা "শ্রেয়ঃ"কে পরিত্যাগ করিয়া "প্রেয়"কে গ্রহণ করিতেছি; খাদ্যবিচারের সময় কোন্ খাদ্য পুষ্টিকারক ও প্রকৃত হিতকর, তাহার প্রতি দৃষ্টি না করিয়া আপাতঃ মুখরোচক বা হাল ফ্যাশনদুরস্ত খাদ্যেরই পক্ষপাতী হইয়া পড়িতেছি। আহার বিষয়ে আমাদের বিকৃত রুচি সম্বন্ধে পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দের নিম্নলিখিত কথাগুলি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য—"ভাজা জিনিষগুলো আসল বিষ। ময়রার দোকান যমের বাড়ী। * * * ময়দায় কিছুই নাই, দেখতেই সাদা। গমের সমস্ত ভাগ যাতে আছে, এমন আটাই সুখাদ্য। আমাদের বাঙ্গালা দেশের জন্য এখনও দূর পল্লীগ্রামে যে সকল আহারের বন্দোবস্ত আছে, তাহাই প্রশস্ত। * * * * গরীবরা খাবার জোটে না ব'লে অনাহারে মরে, ধনীরা অখাদ্য খেয়ে অনাহারে মরে। * * * * ময়রার দোকানের খাবারে খাদ্যদ্রব্য কিছুই নাই, একদম উল্টা আছেন বিষ—বিষ—বিষ।—পূর্ব্বে লোকে কালে ভদ্রে ঐ পাপগুলো খেত; এখন সহরের লোক, বিশেষ বিদেশী যারা সহরে বাস করে, তাদের নিত্যভোজন হচ্ছে ঐ। এতে অজীর্ণ রোগে অপমৃত্যু হবে, তায় কি বিচিত্র! ক্ষিদে পেলে ও কচুরী জিলিপী খানায় ফেলে দিয়ে, এক পয়সার মুড়ী কিনে খাও—সস্তাও হবে, কিছু খাওয়াও হবে। ভাত, ডাল, আটার রুটী, মাছ, শাক, দুধ যথেষ্ট খাদ্য। * * * * মাংস খাবার পয়সা থাকে, খাও; তবে ও পশ্চিমী নানাপ্রকার গরম মশলাগুলো বাদ দিয়ে। * * * * আবার ঐ যে পাঁউরুটী, উনিও হচ্ছেন বিষ, ওঁকে ছুঁয়ো না একদম। খামীর মিশলেই ময়দা এক থেকে আর হয়ে দাঁড়ান। কোনও খামীরদার জিনিষ খাবে না; এ বিষয়ে আমাদের শাস্ত্রে যে সর্ব্বপ্রকার খামীরদার জিনিষের নিষেধ আছে, এ বড় সত্য। * * * * যার দুপয়সা আছে আমাদের দেশে, সে ছেলেপিলেগুলোকে নিত্য কচুরী মণ্ডা মেঠাই খাওয়াবে!! ভাত রুটী খাওয়া অপমান!! এতে ছেলেপিলেগুলো নড়ে-ভোলা পেটমোটা আসল জানোয়ার হবে না ত কি? * * * নানান্ দেশ দেখছি, নানান্ রকমের খাওয়াও দেখছি। তবে আমাদের ভাত, ডাল, ঝোল, চচ্চড়ি, শুক্তো, মোচার ঘণ্টোর জন্য পুনর্জ্জন্ম নেওয়াও বড় বেশী কথা মনে হয় না। দাঁত থাকতে তোমরা যে দাঁতের মর্য্যাদা বুঝছো না, এই আপ্‌শোস্।"

গত ১৫।২০ বৎসরের মধ্যে কেবল কলিকাতায় কেন, অনেক মফঃস্বলের সহরে,—এমন কি,—পাড়াগাঁয়ের বাজারে পর্য্যন্ত চা, রুটী, বিস্কুট ও চপ্-কাটলেটের দোকান গজাইয়া উঠিতেছে! এগুলিও বাঙ্গালীর শরীর ও অর্থের কম সর্ব্বনাশ করিতেছে না। উপরে উক্ত জিনিষগুলি একেই বাঙ্গালা দেশ ও বাঙ্গালীর ধাতের উপযোগী নহে, তদুপরি যে প্রকার উপাদানে ও যেরূপ অবস্থায় এ সব খাদ্য প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহাতে স্বাস্থ্যের পক্ষে এক প্রকার বিষতুল্য হইয়া দাঁড়ায়, তাহা বলাই বাহুল্য। অন্ধ অনুকরণ ও ফ্যাশনের দাস হইয়া আমরা মিশ্রী ও ঘোলের সরবত অপেক্ষা লেমনেড ও সিরাপ বেশী ধরিয়াছি; পুষ্টি ও রুচিকর Vitamineযুক্ত মোটা লাল চাল ছাড়িয়া সারশূন্য কলে ছাঁটা সরু চাল পছন্দ করিতেছি। চিঁড়ে দই প্রভৃতি নির্দ্দোষ ফলার পরিত্যাগ করিয়া, পচা তেল ও ঘিয়ে ভাজা, ধূলি ও মাছিযুক্ত ভাজা ফুলুরি ও মিঠাই-এর শরণাপন্ন হইতেছি। রন্ধনের ব্যবস্থা ক্রমে গৃহলক্ষ্মীদের হাত হইতে অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন, প্রায়শঃ কুৎসিত ব্যাধিযুক্ত, অজ্ঞাতকুলশীল পাচক ও পাচিকার

হাতে ন্যস্ত হইতেছে। বাড়ীতে গোপালনের ব্যবস্থা উঠিয়া যাইতেছে ; কারণ, এখন আমরা পচা ডোবার জল-মিশ্রিত গোয়ালার দুধেই সন্তুষ্ট। প্রত্যেক পরিবারে চা সিগারেটে যে টাকা উড়িয়া যায়, তাহার দ্বারা দুধ, মাখনের ব্যবস্থা করিলে কত উপকার হইত !

প্রায় খাদ্যেই এখন ভেজাল চলিতেছে ; নিত্য-ব্যবহার্য্য সরিষার তৈলে অর্দ্ধেকও সরিষার তৈল থাকে কি না সন্দেহ। ঘি, চিনি, ময়দা প্রভৃতি অন্যান্য জিনিষের অবস্থাও তদ্রূপ। ইহাতে স্বাস্থ্য থাকে কি করিয়া ?

নৈতিক অবনতি

সংযত জীবন স্বাস্থ্যের প্রধান ভিত্তি। পাশ্চাত্য "সভ্যতার" সংস্পর্শে আসিয়া আমাদের প্রাচীন সংযমের আদর্শ বিলুপ্তপ্রায়। শিক্ষিত ও অর্দ্ধ-শিক্ষিত বাঙ্গালী পরিবারের বালকবালিকার মধ্যে অতি অল্পবয়স হইতেই নানা প্রকারের কুৎসিত অভ্যাস দেখা দেয় ; পিতামাতা দেখিয়াও দেখেন না। তাহার পর উপন্যাস, নাটক, সিনেমা এই ৩টি দাবানলের ন্যায় বর্ত্তমান সমাজকে দগ্ধ করিতেছে। * সহর, বর্দ্ধিষ্ণু পল্লী, কলকারখানার আবেষ্টন, বাজার, গঞ্জ প্রভৃতিতে মদের দোকান এবং প্রকাশ্য ও গুপ্ত পাপের স্রোতঃ প্রবাহিত হইতেছে। ক্রমে মেলার স্থানগুলিও ভীষণ উচ্ছৃঙ্খলতা ও পাপব্যবসায়ের কেন্দ্র হইয়া উঠিতেছে। ইহার ফলে কত সহস্র সহস্র পরিবারের মধ্যে জঘন্য ব্যাধি, অকালমৃত্যু, শিশুমৃত্যু প্রভৃতি প্রবেশ করিতেছে, তাহা চিন্তা করিলে শরীর-মন অবসন্ন হইয়া পড়ে। একমাত্র নৈতিক উচ্ছৃঙ্খলতা হইতেই গণোরিয়া, উপদংশ, মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা, দৃষ্টিশক্তির হানি, হৃদ্‌রোগ ও ফুস্‌ফুসের পীড়া প্রভৃতি বৃদ্ধি পাইতেছে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশ এবং স্বভাবতঃ অলস ও ক্ষীণবীর্য্য জাতি বলিয়া এই নৈতিক উচ্ছৃঙ্খলতার ফল আমাদের পক্ষে আরও মারাত্মক হইতেছে। এই ধ্বংসোন্মুখ জাতিকে রক্ষা করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে পারিবারিক জীবনে ও দেশের সর্ব্বত্র উৎকৃষ্ট নৈতিক আদর্শের পূজা প্রচলন করিতে হইবে। আইন করিয়া হউক বা যেরূপেই হউক, নগর ও পল্লী হইতে দুর্নীতির আড্ডাগুলিকে তাড়াইতে হইবে।

আধুনিক অস্বাভাবিক জীবন

বর্ত্তমান যুগের উত্তেজনা ও উদ্বেগপূর্ণ জীবনপ্রণালীও আমাদের কম স্বাস্থ্যহানি করিতেছে না। শরীরের সহিত মনের অতি নিকট সম্বন্ধ, সুতরাং মানসিক শান্তির বিনাশের সহিত শারীরিক স্বাস্থ্যনাশেরও সম্ভাবনা। আদিম জাতি সকল প্রধানতঃ মানসিক দুশ্চিন্তারহিত এবং আধুনিক সভ্য (?) জীবনের উত্তেজনার বাহিরে আছে বলিয়া অতি সাধারণ অশন-বসনযুক্ত হইয়াও উৎকৃষ্ট স্বাস্থ্য উপভোগ করিয়া থাকে। মহাত্মা সুশ্রুতাচার্য্য সুস্থ ব্যক্তির লক্ষণ বর্ণনা করিতে গিয়া বলিতেছেন—

> "সমদোষঃ সমাগ্নিশ্চ সমধাতুমলক্রিয়ঃ।
> প্রসন্নাত্মেন্দ্রিয়মনাঃ স্বস্থ ইত্যভিধীয়তে॥"

স্বস্থ অর্থাৎ সুস্থ ব্যক্তির লক্ষণ—যাহার বাতাদি দোষত্রয়, জঠরাগ্নি, রসাদি ধাতুসমূহ ও মল সমানভাবে অবস্থিত, যে শরীরাত্মরূপ কার্য্যকারী এবং যাহার আত্মা, ইন্দ্রিয় ও মন প্রসন্ন, তাহাকেই স্বস্থ (সুস্থ) বলা যায়। সহর ত দূরের কথা, বর্ত্তমান পল্লীজীবনেও আর পূর্ব্বের শান্তি নাই। রোগব্যাধির আক্রমণ, অভাব-অনটন, মামলা-মোকদ্দমা, দলাদলি এগুলি যেন জীর্ণ মন্দিরের বটের শিকড়ের ন্যায় আমাদিগকে ক্রমশঃ দুশ্ছেদ্য বন্ধনে ঘিরিয়া ফেলিতেছে। এ অবস্থায় পল্লীবাসীর স্বাস্থ্য আশা করা বৃথা। পূর্ব্বে সকালে বিকালে টোলে বা পাঠশালায় পড়া চলিত ; ছাত্রগণ আহারান্তে বিশ্রাম করিত। কিন্তু এখন ১০টা বাজিবার পূর্ব্বেই তাড়াতাড়ি নাকে মুখে কোন রকমে চারিটা গুঁজিয়া রাশীকৃত পুস্তকের ভারসহ স্কুলের দিকে ছুটিতে হয় এবং সেখানে গরম ও বদ্ধ বাতাসের মধ্যে পড়াশুনা (না আত্মহত্যা ?) করিতে হয়। তাহার পর পরীক্ষার চিন্তা, পড়ার খরচের

* "If any man can invent a more speedy way for sinners to go to the hell than theatre, he ought to have a patent right for his infernal ingenuity"—
Dr. Lyman Beecher.

চিন্তা, এবং স্কুল-কলেজের ঘানি অতিক্রম করিলে চাকরীর চিন্তা ত আছেই। আর নাগরিক জীবনেও উন্মত্তবৎ দ্রুত অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা, হিংস্র শ্বাপদতুল্য মারামারি কাড়াকাড়ি—("Madding crowd's ignoble strife"—Gray's Elegy) এবং উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতা ছাড়া আর কি আছে? এ অবস্থায় শারীরিক স্বাস্থ্য ও মানসিক শান্তি কি করিয়া আশা করা যায়? শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন—

"চিতা চিন্তা সমাযুক্তা বিন্দুমাত্রং বিশেষতঃ।
সজীবং দহতি চিন্তা নির্জ্জীবং দহতি চিতা॥"

চিতা ও চিন্তা এই উভয়ের মধ্যে প্রভেদ অতি সামান্য। চিতা মৃত মনুষ্যকে দগ্ধ করে, কিন্তু চিন্তা সজীব মনুষ্যকেই দগ্ধ করে।

এইরূপে চারিদিক হইতে পীড়া, মহামারী, দারিদ্র্য প্রভৃতি দ্বারা যুগপৎ আক্রান্ত হইয়া, স্বকৃত ও পরকৃত পাপের ফল ভোগ করিয়া—ভারতের এই "চলমান শ্মশানে" বাঙ্গালী জাতি যে কত দিন আত্মরক্ষা করিতে পারিবে, তাহা ভগবান্‌ই জানেন! *

শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র দাসগুপ্ত।

* বাঙ্গালার মানচিত্রে মাত্র প্রধান প্রধান রেলপথগুলি দর্শিত হয়। "সার্ভে অব ইণ্ডিয়া" আফিসের বড় ম্যাপে পাঠক দেখিতে পাইবেন যে, রেলওয়ে লাইন, পাবলিক ওয়ার্কস্‌ ও লোকাল বোর্ডের রাস্তায় বাঙ্গালার স্বাভাবিক জলনিকাশের পথ কিরূপ ভাবে অবরুদ্ধ হইয়াছে।

সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাপ্রয়াণে

দিগঙ্গনা হুলুধ্বনি করে,
অপ্সরা সব সাজায় আজি পথ!
দেবাঙ্গনে কিবা কোলাহল!
আস্‌ছে বসুন্ধরার রথ!
দেববালা আনন্দে গান গায়,
বেদ-ধ্বনি উঠ্‌ছে অমরায়;
অর্ঘ্য হাতে কাহার প্রতীক্ষায়,
উৎসুক আজি অযুত মনোরথ?

থাম্‌ল সে রথ, নাম্‌ল সে বীর;
শাঁখ বাজে ওই পুলক-কোলাহলে!
দণ্ড মুকুট রাখল ধীরে,
বিশ্ব-বাণীর শুভ্র চরণ-তলে!
তুল্‌লে বুকে মাতা, চুমো খেয়ে,
শান্ত ছেলে লুট্‌ল বক্ষ পেয়ে;
বিশ্ব-জগৎ স্বর্গ পানে চেয়ে,
আপনা হারায় প্রতি পলে পলে!

জয় ভারতের সাধন-বাণী,
জড়ের দেশে নবযুগের সাড়া!
জয় জগতের মায়ের ছেলে,
লুটায় বুকে আজ যে বাঁধন-হারা!
বীর-কেশরী জাগ্‌লে তন্দ্রাহত,
রক্ত আঁখি শঙ্কা অবনত;—
কিসে মহা-মানব শক্তিচ্যুত,
রাখবে বেঁধে বাংলা স্নেহ-ধারা?

ভারতবাসী খোল আপন আঁখি,
বিলাপ ঘুচাও স্বদেশ-জননীর!
বোঝ কোথায় প্রাণের চমক-ব্যথা,
নইলে বৃথা যতেক আঁখি-নীর!
বিশ্ব-মানব! করো নমস্কার,
লুট্‌ল তোমার বক্ষজ্যোতি-হার;
বঙ্গ-জগৎ স্তব্ধ মরণ-পার,
অসীম পানে নোয়ায় শত শির!

জানি, তুমি আস্‌বে আবার হেথা,
বাংলা সারা তোমার পরাণ যাচে!
কর্ম্মী তুমি, থাক্‌তে পারো কি গো?
ডাক শুনে ওই সুখের পরশ-আঁচে!
শ্রান্ত; তো তাই নিলে অবসর,
নবীন প্রাণে জাগ্‌বে ভয়ঙ্কর!
এ দীন কবির তপ্ত বুকের' পর,
সে দিন যেন গানের তালে নাচে!

শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়।

মানুষ যে উপরে উঠিতে পারে না, পূর্ণ সত্যে, পূর্ণ জ্ঞানে, পূর্ণ আনন্দে, পূর্ণ শক্তিতে—দেবত্বে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না, তাহার কারণ পৃথিবীর টান, স্থূলের অধোমুখী আকর্ষণ। বৃহতের ঋতম্ভর চেতনা ফুটিয়া উঠে না, কারণ, মনের ইন্দ্রিয়ের চাঞ্চল্য, প্রাণের বাসনা, বিক্ষোভ, চিত্তের অন্ধ আবেগ, আর এই সকলের মূল হইতেছে অজ্ঞানমূলক গাঢ় দেহ চেতনা, ইহারা সব কেন্দ্রীভূত হইয়া জমাট হইয়া আছে ঐ জড়ের আয়তনে। জড়ের যে তামসী শক্তি, তাহারই নাম বৃত্র অর্থাৎ তাহার কায সত্ত্বকে প্রকাশকে আবৃত করিয়া রাখা। দৈহিক চেতনার তমঃ প্রাণে চিত্তে মনে, সমস্ত আধারে আপনাকে চারাইয়া ছড়াইয়া দিতেছে, মানুষের সাধন-যজ্ঞের প্রগতিকে বাধা দিতেছে। এই শক্তিকে যে দেব-শক্তি দীর্ণ করিতেছে, তাহারই নাম ইন্দ্র। যাঁহার ইন্ধন হইতেছে জ্যোতিঃ, কিন্তু বৃত্র হইতেছে বিরোধী দানবীশক্তির একটা রূপভেদ। কারণ, স্থূল দেহায়তন যে কেবলই অন্ধকারাবৃত তমোময়, তাহা নহে। এই জড় প্রতিষ্ঠানের উপরেই দাঁড়াইয়া আছে বহুতল-সমন্বিত আধার-সৌধটি। অধ্যাত্মস্থাপিত আধিভূতেরই উপরে। "সেখানে যাহা আছে, এখানেও তাহা আছে; এখানে যাহা নাই, সেখানেও তাহা নাই।" জড় চেতনার ক্রমিক বিকাশেই তুরীয় চেতনা, তুরীয় চেতনার ক্রমিক সম্পুটনেই জড় চেতনা। অন্য কথায়, অধ্যাত্ম-সম্পদ্ এই আধিভূতেরই মধ্যে আছে, কিন্তু ঢাকা, চাপা—বীজ অবস্থায়। উপরের যে আলো, তাহা নিম্নতম স্থূল চেতনারই মধ্যে আছে, তবে নিগূঢ়, লুক্কায়িত। দেহের যে সত্য, যে প্রেরণা, তাহা সমুচ্চের প্রেরণারই উল্টা দিক বা বিকৃতি। এই যে বিকারের শক্তি, উপরের আলোকে সত্যকে আনন্দকে যাহা দেহগত অনুভূতি প্রতীতি সুখভোগে পরিবর্ত্তিত করিয়া ধরে, তাহার নাম পণি। পণিরা যে দেব-শক্তিকে চায় না, তাহা নহে, কিন্তু চায় তাহাকে ক্ষুদ্র খণ্ডিত ভাবে, আপনাদের ভোগে লাগাইবার জন্য। পণিশক্তি ইন্দ্রলোকে উঠিয়া চলিতে চায় না বটে, কিন্তু ইন্দ্রকে, ইন্দ্রের শক্তিকে নীচে নামাইয়া তাহাদের বন্ধু তাহাদের ভগিনীরূপে বাঁধিয়া রাখিতে চায়—অর্থাৎ নিজেদের সেবায় লাগাইতে চায়।

সূর্য্য হইতেছে পূর্ণ জ্ঞান, দিব্য দৃষ্টির আয়তমুক্তি; আর সূর্য্যের যে রশ্মি সমুদয় অর্থাৎ বিচিত্র প্রকাশ, তাহা হইতেছে গোরাজী। এই পূর্ণ সত্যের দিকে গতি, বিশুদ্ধ প্রাণের উর্দ্ধায়ন, দিব্য আনন্দভোগ, তাহাই হইতেছে অশ্ব। পণিরা সূর্য্যকে, গো-যূথকে, অশ্বরাজীকে অদ্রিগুহার মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছে। অবিদ্যা মায়ার বশে আমরা চিনিতে ধরিতে পারিতেছি না, এই দেহগত সত্য ও প্রেরণাদির অন্তরালে রহিয়াছে কোন বৃহৎ দিব্য সত্য ও প্রেরণা—দেব-মন্দিরকে আমরা বানাইয়াছি ব্যসন-গৃহ। মানুষের সমস্ত সাধনা হইতেছে পাহাড় ভেদ করিয়া পণিদের কবল হইতে সূর্য্যকে মুক্ত করা, গোরাজী উদ্ধার করা—স্থূল চেতনার মধ্যে দিব্য চেতনা বাঁধা পড়িয়া গিয়াছে, স্থূল চেতনাকে বিদীর্ণ করিতে হইবে, দিব্য চেতনাকে উন্মুক্ত করিয়া উপরের সমুচ্চের পরমলোকের চেতনায় অর্থাৎ তাহার স্বরূপে ও স্বভাবে লইয়া গিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

পার্থিব চেতনাকে জয় করিতে হইবে—কিন্তু কি রকমে, কোন্ দিব্যশক্তির সহায়ে? প্রথমে চাই শুদ্ধ-বুদ্ধি, সাধকের মধ্যে সেই সত্য পুরুষের জাগরণ, যাহার বলে সাধক বুঝিতে পারে, হৃদয়ঙ্গম করে—পার্থিব চেতনা কি আর দিব্য চেতনাই কি, অশুদ্ধ ভোগ কি আর শুদ্ধ ভোগই বা কি। ইন্দ্রই হইতেছে এই শুদ্ধবুদ্ধিময় পুরুষ, তাঁহার প্রতিষ্ঠান স্বর্গ, দ্যৌ অর্থাৎ বিশুদ্ধ মন। ইন্দ্রের এই বৈশিষ্ট্য ঋগ্বেদ অসংখ্য বিশেষণ দিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছে। তিনি "মনোধৃত" মননশক্তি তাঁহাকে ধারণ করিয়া আছে, তিনি "মনায়ুঃ"—মননশক্তিতেই তাঁহার আয়ু বা জীবন-শক্তি, তিনি "মনীষী", তিনি "নৃমনঃ"—নৃ অর্থ বীর, দেবতা দিব্য—শুদ্ধ মনের শক্তি দিয়া তিনি দস্যু হনন করিতেছেন—"দস্যুন্মনসা"; তিনি "সুমেধা", তিনি "অবিতা ধীনাং"—স্থির বুদ্ধি সকলের পোষক, তিনি "পুরন্ধী"—বহুল ধীশক্তির বিগ্রহ, তিনি "বৃষন্ধী"—ধীশক্তিবর্ষণকারী বৃষরূপী পুরুষ, তিনি "বিশ্বপেশসং ধিয়ং ধাঃ"—যে স্থির বুদ্ধি যাবতীয় শুদ্ধরূপ গড়িয়া দিতেছে, তাহাকে ধারণ করিয়া আছেন, তিনি "গোদা"—আলোকদাতা; তিনি "সত্য রাধাঃ"—

সত্যেই তাঁহার আনন্দ। সাধকের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে জাগা চাই এই ইন্দ্র-শক্তি।

ইন্দ্র-শক্তি কি করে? ইন্দ্র-শক্তি অগ্রভাগে পাঠাইয়া দেন তাঁহার দূতী সরমাকে, পণিদের আবাস খুঁজিয়া বাহির করিতে। সরমা হইতেছে শুদ্ধবুদ্ধি বা দিব্য মনের একটা মূল আদি প্রেরণা, সাক্ষাৎ অনুভূতি, বোধি, Intuition। ঋগ্বেদ দিব্য জ্ঞানের চারিটি শক্তি বা ধারার কথা বলিয়াছে—(১) "ইলা" অর্থাৎ দৃষ্টি (Revelation), (২) "সরস্বতী" অর্থাৎ শ্রুতি বা দিব্য শ্রবণ (Inspiration), (৩) "সরমা" অর্থাৎ স্মৃতি বা সাক্ষাৎ অনুভব, বোধি (Intuition), আর (৪) "দক্ষিণা" অর্থাৎ বিবেক, সত্যাসত্যের অপরোক্ষ নির্দ্দেশ (Discrimination)। এই চারিটি শক্তি পৃথক্ পৃথক্ রকমের হইলেও একই শক্তির—"মহী"র অর্থাৎ বৃহতের বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র এবং উহারা পরস্পরে পরস্পরের সহিত ওতপ্রোতঃ মিশ্রিত। মনের উপরে যে মহর্লোক—স্বর্গ বা দ্যৌত্য দ্যুলোকের পিছনে রহিয়াছে যে স্বর্লোক, যে সূর্য্যমণ্ডল সৃজনকারী দেব সবিতার প্রতিষ্ঠান, সেখানেই পূর্ণ জ্ঞানের পূর্ণ প্রেরণার প্রকাশ, সেখানেই রহিয়াছে সকল জাগ্রত রূপায়নের মৌলিক রূপ সব—স্বরূপ ও স্বভাব। এই সূর্য্য-শক্তির, এই দিব্য জ্ঞানের প্রথম আভাস শুদ্ধ মনে যে ফুটিয়া উঠে, তাহাই সরমার শক্তি বা বোধি। সরমাই প্রথমে সমুচ্চের সত্য প্রতিষ্ঠানের অনুভূতি সাধকের জীবপুরুষে, বিশুদ্ধ বুদ্ধির মধ্যে জাগাইয়া ধরে—"ইন্দ্রস্য চেষ্টৌ বিদৎ সরমা তনয়ায় ধাসিং"। ইন্দ্র সূর্য্যলোক হইতে সরমাকে ডাকিয়া পাঠাইয়া দেন—কোথায় অনৃতের অশুদ্ধির শক্তি সব, তাহা খুঁজিয়া পাতিয়া বাহির করিতে। দিব্য মনের দিব্য বোধি, তাই পরম লোক হইতে, ওপার হইতে চলিয়া আইসে, আধারের সকল প্রতিষ্ঠান ঘুরিয়া ঘুরিয়া, সকল ধারা পার হইয়া একেবারে নামিয়া যায় জড় চেতনার সাগরের পারে, এই জড় দৈহিক চেতনায়। কারণ, এই দৈহিক চেতনার মধ্যেই জমাট হইয়া আছে, সকল অনৃতের সকল অশুদ্ধির বীজ—এইখানেই পণিদের আবাস।

দিব্য বোধির সহিত আইসে আর কোন্ কোন্ দিব্যশক্তি? সরমার পিছনে পিছনে আসিতেছেন সুরগুরু বৃহস্পতি। বৃহস্পতি অথবা ব্রহ্মণস্পতি হইতেছেন বৃহৎ সত্তার অধিপতি, অন্তরাত্মার সত্যের বাঙ্ময় বিগ্রহ। পণিদের সত্য হইতেছে পৃথিবীর, জড় চেতনার সত্য। আপাতদৃষ্টিতে যাহা যতই কঠোর অকাট্য হউক না কেন, তাহা এমন কঠোর অকাট্য বলিয়া বোধ হয় তত দিন, যত দিন সাধকের অন্তরাত্মা থাকে সুপ্ত অবস্থায়। জড়ের সত্য হাজার সত্য হইলেও বাহিরের সত্য, সুপ্ত অন্তরাত্মার সায় আছে বলিয়াই তাহা বর্ত্তিয়া থাকে। কিন্তু এই অন্তরাত্মা যখন নিজের সত্যে সচেতন হইয়া উঠে, তখন জড়ের সত্য বাধা হইয়াই দূর হইতে থাকে, অন্তরাত্মার জাগ্রত সত্যই দেহ-আয়তনে ক্রমে ফুটিয়া উঠে। আর এই অন্তরাত্মার সত্য হইতেছে বৃহতের সত্য; কারণ, মানুষের মধ্যে পুরুষ যে, জীব যে, তাহা পুরুষোত্তমের, শিবের সেই মহর্লোকের চেতনার অভিব্যক্তি। তাহার স্বভাব ও স্বধর্ম্ম হইতেছে শুদ্ধ মনের দিব্যচেতনার, ইন্দ্রের, সূর্য্যের স্বভাব ও স্বধর্ম্ম। অন্তরাত্মার বাণী মুখরিত হইয়া উঠিলে, সাধকের মনের ধারা পায় নূতন শুদ্ধ গতি, দেহায়তনও পায় নূতন রূপ ও নূতন প্রেরণা। তাই সরমা পণিদিগকে শাসাইতেছে যে, দেব বৃহস্পতি স্বর্গে বা মর্ত্ত্যে কোনখানেই স্বস্তি বা আনন্দ তাহাদের ভোগ করিতে দিবেন না। কারণ, স্বর্গে অর্থাৎ শুদ্ধ মনে, মর্ত্ত্যে অর্থাৎ দেহায়তনে বৃহস্পতি অন্তরাত্মার তুরীয় ছন্দই ফুটাইয়া ধরিবেন, অজ্ঞানের স্থূল প্রেরণার অহঙ্কারবিধৃত ভোগের স্থান তাহার মধ্যে নাই।

পণিদের সহিত এই যুদ্ধে আরও আসিবেন অঙ্গিরা ঋষি। অঙ্গিরা অগ্নিরই আর এক নাম। অগ্নি-সাধনায় সিদ্ধ যে মানুষ, অগ্নিশক্তির সহিত যিনি একীভূত হইয়া গিয়াছেন, তিনিও অঙ্গিরা। অগ্নি হইতেছে চিন্ময় তপঃশক্তি। বৃহৎ সত্তার যে শক্তি, পূর্ণজ্ঞানের যে তেজ, তাহাই অগ্নি। প্রাণে, জীবনীশক্তিতে ইহারই ছায়া প্রতিফলিত, শুদ্ধ প্রাণে শুদ্ধ জীবনীশক্তিতে ইহারই দিব্যক্রিয়াশক্তি মূর্ত্ত। প্রাণে অগ্নির তেজে সাধক ঊর্দ্ধমুখে উঠিয়া চলে, সকল বাধা ও অশুদ্ধি পোড়াইতে পোড়াইতে

দিব্য উজ্জ্বলতা বৃহতের দিব্যজ্ঞান ও শক্তির (কবি-ক্রতুঃ) মধ্যে যাইয়া প্রতিষ্ঠিত হয়—দেহে, প্রাণে, মনে, শুদ্ধ আনন্দ, শুদ্ধ কর্ম্ম, শুদ্ধ জ্ঞান ফলাইয়া ধরে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সাধকদের অগ্নিসিদ্ধি, ঊর্দ্ধলোক হইতে অগ্নির অবতরণ—নূতন সাধকের মধ্যে তাহাই হইতেছে অঙ্গিরা ঋষি।

তাহার পর হইতেছে "নবগ্ব" ঋষি। "নবগ্ব" অর্থ নব-গোবান্ অর্থাৎ নয়টি গো বা জ্ঞানের জ্যোতির্লেখা যাঁহাদের আছে। ঋগ্বেদে "নবগ্ব" ও "দশগ্ব" বলিয়া দুই শ্রেণীর ঋষির কথা আছে। "নবগ্ব" হইতেছেন তাঁহারা, যাঁহারা নয় মাস সাধন-যজ্ঞ করেন, আর "দশগ্ব" হইতেছেন, যাঁহারা দশ মাস করেন। সাধনার শাস্ত্রে লৌকিক কাল ও কালভেদ—দিন, রাত্রি, পক্ষ, মাস, বৎসর, অয়ন প্রভৃতি একটা বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়, ইহারা রূপক মাত্র। উপনিষদে ও পরবর্ত্তী কালের নানা পৌরাণিক গ্রন্থেও কালের এই রকম ব্যবহারের প্রমাণ আছে। এক আগমশাস্ত্র স্পষ্টই বলিতেছে, কাল দুই রকমের, এক সূক্ষ্ম আর এক স্থূল, স্থূল কাল হইতেছে লৌকিক আর যোগীদের কাল হইতেছে সূক্ষ্ম—'কালঞ্চ দ্বিবিধং প্রোক্তং স্থূলঞ্চ সূক্ষ্মমেব চ। লৌকিকং স্থূলমাখ্যাতং যোগিনাং সূক্ষ্মমেব চ।' উদাহরণস্বরূপ জাবালদর্শনোপনিষৎ হইতে উত্তরায়ণের এই ব্যাখ্যা লওয়া যাইতে পারে, উত্তরায়ণ হইতেছে পিঙ্গলা হইতে ইড়ায় বায়ুসংক্রমণ অর্থাৎ দক্ষিণ নাসারন্ধ্র হইতে বাম নাসারন্ধ্রে নিশ্বাস টানিয়া লওয়া। সে যাহা হউক, পরবর্ত্তী যুগে সূক্ষ্মকালের যে রকম প্রয়োগ দেওয়া হইয়াছে, ঋগ্বেদেও যে তাহাই হইয়াছে, এমন নহে। কারণ, উভয় যুগের সাধনার ধারা ভিন্ন রকমের। কিন্তু আসল কথা ঐ সূক্ষ্ম বা যৌগিক কাল। ঋগ্বেদ অনুসারে কাল নির্দ্দেশ করিতেছে সাধনার ক্রম, প্রগতির ছন্দ। দশ মাস হইতেছে একটা পূর্ণচ্ছেদ। বৎসরের পূর্ণ দশ মাস যে যাজ্ঞিক যজ্ঞ করিয়াছে, তাঁহার সাধনা পূর্ণ হইয়াছে এবং এই দশমাসিক সাধনার দশসংখ্যক জ্যোতিঃ লইয়া যাঁহারা সিদ্ধিপূর্ণ, তাঁহারাই "দশগ্ব"। আর "নবগ্ব" হইতেছেন—যাঁহারা নয় মাস সাধনা করিয়াছেন, যাঁহাদের সাধনপ্রয়াস এখনও চলিতেছে, যাঁহারা সিদ্ধির দুয়ারে গিয়া পৌছিয়াছেন, কিন্তু এখনও কিছু বাকী রহিয়াছে। সাধকের নয় মাস পূর্ণ হইলে, এই নবধা জ্যোতির সহিত আসিয়া মিলেন 'অয়াস্য' ঋষি। অয়াস্য ঋষি হইতেছেন দশম মাসের সিদ্ধ জ্যোতিঃ, এই ঋষি-শক্তিকে লইয়াই দশ মাস পূর্ণ হয়, দশ জ্যোতি অধিকৃত হয়, নবগ্ব দশগ্বে পরিণত হয়েন, পণিশক্তি বিদূরিত হইয়া পূর্ণ সূর্য্যশক্তির বিকাশ হয়।

প্রাকৃত মানুষ থাকে প্রথম অন্ধ জড়শক্তির দাস, তামস দেহায়তনের প্রেরণার মধ্যে আবদ্ধ। সর্ব্বাগ্রে তাহাকে এই পণিশক্তির সম্বন্ধে সচেতন হইতে হইবে, অনুভব করিতে হইবে, কি রকমে তাহার সকল শক্তিই বাঁধা পড়িয়াছে, ব্যবহৃত হইতেছে, ক্ষয় হইতেছে, শুধু এই শারীর প্রচেষ্টার মধ্যে। জড়চেতনার মধ্যে শুদ্ধবুদ্ধির এই প্রথম বিকাশই হইতেছে পণিদের মধ্যে সরমার আবির্ভাব। উপর হইতে বিশুদ্ধ মনের ভিতর দিয়া এই বিশুদ্ধ বোধ জাগিলে সকল তামসশক্তির দলে একটা সাড়া পড়িয়া যায়। তাহারা সেই বিশুদ্ধ বোধকে ভয় দেখাইয়া ফিরাইয়া দিতে চায়, আর তাহা না পারিলে নিজেদের দলে টানিয়া নিজেদের ভোগে প্রয়োগ করিতে সচেষ্ট হয়। সত্যবুদ্ধি জাগিলেই যে সাধক শারীর চেতনার টান সব জয় করিতে পারে, এমন নহে। নানা রকমে সে সত্যবুদ্ধির পতন হইতে পারে। কিন্তু সেই সত্য-বুদ্ধিকে সাধক যদি একনিষ্ঠভাবে ধরিয়া থাকিতে পারে, অন্যান্য দিব্যশক্তিকে জাগাইয়া তাহাদের সহায়ে উহাকে একেবারে পণিদের গুহাভ্যন্তরে শারীর চেতনার মধ্যে নামাইয়া আনিতে পারে, তবে ক্রমে তামসশক্তি সকল হীনবীর্য্য হইতে থাকে, শেষে লুপ্ত হইয়া যায়। সকল পণিশক্তি যখন নিঃশেষ ধ্বংস পায়, তখন শারীর প্রেরণা সব রূপান্তরিত হইয়া জ্যোতির্ম্ময় বৃহতের সত্য-চ্ছন্দের সহিত সম্মিলিত হয়। দেহচেতনার মধ্যে সুপ্ত লুপ্ত সূর্য্যশক্তি সব—গোরাজী উঠিয়া ঊর্দ্ধে সেই সত্যের প্রতিষ্ঠানে, স্বর্লোকের দিকে প্রধাবিত হয়। তখন সাধকের মধ্যে অন্তরাত্মার দিব্যপুরুষের (বৃহস্পতির) ঐশ্বর্য্য ফুটিয়া উঠে, সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয় দিব্য আনন্দের অমৃত-সম্পদ (সোমদেবতা)। সোমলতাকে দুইটি পাষাণ-ফলকের মধ্যে ফেলিয়া পিষিয়া তবে সোমরস বাহির করা হয়—অর্থাৎ সহজ ইন্দ্রিয়গত আনন্দ যত; তাহারা স্বর্গ ও

মর্ত্ত্য, শুদ্ধ মন ও শুদ্ধ দেহ, এই দুইয়ের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার ফলে শুদ্ধ হইয়া উঠে, রূপান্তরিত হইয়া তাহারা হয় অমৃতত্বেরই আনন্দধারা। আধার ভরিয়া তখন লীলায়িত হইয়া উঠে তামস ভোগ প্রেরণা নহে, কিন্তু নিখিল ঋষি-শক্তি, যাবতীয় দিব্যদৃষ্টির শক্তি, পূর্ণ সত্যে প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধ জ্ঞান, সিদ্ধ আনন্দ, সিদ্ধ কর্ম্ম। *

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত।

* ঋগ্বেদে কয়েকটি অতি চমৎকার কথোপকথন আছে, সেগুলির মধ্যে যেটি সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পরিচিত, সেইটির অনুবাদ আমরা দিলাম। গভীর রহস্যপূর্ণ অর্থ-গৌরব ছাড়াও এই কথোপকথনগুলির বিশেষত্ব এই যে, ইহারা একটা অপরূপ নাট্যরসে ভরপুর প্রতিপদে ফুটিয়া উঠিয়াছে—এখানে দৃশ্য কাব্যের, অভিনয়ের নির্দ্দোষ ভঙ্গী। পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা বলিয়া থাকেন যে, সংস্কৃত সাহিত্যের, আর্য্যজাতির নাট্যকলার আদিরূপ এই এখানে।

অর্থের দিক দিয়া কিন্তু আমরা পাশ্চাত্যের কিংবা দেশের আধুনিক কি পুরাতন কোন প্রচলিত মত অনুসরণ করি নাই। শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ মহাশয় বেদের যে নূতন তাত্ত্বিক বা যৌগিক ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহাই ভারতীয় শিক্ষা-দীক্ষার মূলীভূত এই জ্ঞানের ("বেদ" অর্থ জ্ঞান) সম্যক্ মর্য্যাদা দিতে পারিয়াছে, এই বিশ্বাসে তাহারই অনুসরণ করিয়াছি। এই ব্যাখ্যা কতদূর সঙ্গত, তাহা সুধীগণের বিচার্য্য। এই জন্যও বাঙ্গালী পাঠকদের সম্মুখে ইহাকে উপস্থাপিত করিলাম।—অরবিন্দের বেদব্যাখ্যা "আর্য্য" (Arya) পত্রিকায় দ্রষ্টব্য।—লেখক।

ধারা শ্রাবণ

ঝরঝর্ ঝর্ঝর ঝরে জলঝর্ণা
নিবিড় নিতল মেঘে, শিখিনী সুপর্ণা ;
    মাঠেতে সবুজ ধান,
    নদীতে ছুটেছে বান,
ফুটে উঠে দিকে দিকে বিদ্যুৎ স্বর্ণা।

গুরু গুরু গুরু গুরু ঘন দেয়া গর্জ্জে
'আসে রাজা, বিদ্রোহ ভাঙ' বলি তর্জ্জে ;
    ঘেরা ঘোর আঁধিয়ার
    পথে চলা হ'ল ভার,
কানন ছেয়েছে কেয়া কদম্ব সর্জ্জে।

খোলা চোখে আজ লাগে স্বপ্নের মায়াটি,
গৃহকোণে জেগে আছে কুঞ্জের ছায়াটি,
    উত্তরে দিক্-শেষে,
    মন চলে ভেসে ভেসে,
দূর যক্ষের পুরে যেথা একা প্রিয়াটি।

রিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্ বাজে মেঘে মল্লার,
প্রিয় কার কোথা গেছে তাই দু'টি আঁখি ভার,
    কি কথা কহিতে চায়,
    ভাষা খুঁজে নাহি পায়,
অঞ্জনভরা নভে চেয়ে দেখে অনিবার।

ছোটে হাওয়া এলোমেলো—সুরভিত উচ্ছ্বাস,
ফুল যেন কথা কয়, ফেলে যেন নিশ্বাস,
    খসে' পড়ে লাজ ভয়,
    আজি ত্রিভুবনময়,
সবি যেন পরিচিত মনে হয় বিশ্বাস।

এমন মেদুর দিন হবে কি গো নিষ্ফল,
ঝাপটে ঝামর বন, দোলে দোলা চঞ্চল,
    গরজে গগন গুরু,
    কাঁপে হিয়া দুরু দুরু,
পিছল কুঞ্জের পথ, তবু সখি চল্ চল্।

শ্রীঅরীন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায়।



শনির দশা

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

বাসন্তী-সংবাদ

সন্তোষ চলিয়া গেলে, বাসন্তী একেবারে হাল ছাড়িয়া দিল। বিষয়-আশয় সম্বন্ধে সে কাহাকেও কোন কথা বলিত না। কর্ত্তার আদেশমত দেওয়ান সদাশিব মাঝে মাঝে আসিয়া বাসন্তীর নিকট জমীদারী বিষয়ে, প্রজা-বিদ্রোহ সম্বন্ধে, কোথায় কি করিতে হইবে না হইবে, দুই একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতেন এবং কি আদেশ হয়, তাহা শুনিবার জন্য অপেক্ষা করিতেন। কিন্তু বাসন্তী কোন কথাই বলিত না। বহুক্ষণ তাহার আদেশের অপেক্ষায় দণ্ডায়মান থাকিয়া অবশেষে তিনি ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতেন।

ক্রমে ক্রমে চারিদিকে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইতে লাগিল। সুযোগ বুঝিয়া শত্রুর দল মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল, সময়মত লাটের কিস্তী না দেওয়ায় একটা জমীদারী নীলাম হইয়া গেল, তথাপি বাসন্তীর মুখ হইতে কোন কথা কেহ বাহির করিতে পারিল না। সে ভাবিত, আমি কে? ইহারা আমাকে কেন জিজ্ঞাসা করিতে আইসে?

যে দিন মুগ্ধা বাসন্তী কুমারী-হৃদয়ের অমলিন ভক্তি, প্রেম ও ভালবাসা নবাগত অতিথির চরণে উৎসর্গ করিয়াছিল, সে দিন কে জানিত যে, তাহা আবার অনাদৃত হইয়া ফিরিয়া আসিবে, অতিথি ফিরিয়াও চাহিবে না? শুভদৃষ্টির সময় তাহার যে জীবন-দেবতার অনিন্দ্যসুন্দর কান্তি নিমেষের জন্য তাহার নয়নপথে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, আজও যাহার দীপ্তিতে তাহার হৃদয়-মন ভরিয়া আছে, সেই যে তাহার নবপুষ্পিত যৌবনের ঐকান্তিক ভালবাসা এমন করিয়া পায়ে ঠেলিয়া চলিয়া যাইবে, তাহা তখন কে জানিত?

বেদনায় তাহার চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। সে সুপ্ত শান্ত জগতের পানে চাহিয়া মনে করিতেছিল, এই বিশাল জগতের নিভৃত কোণে এমন একটি পবিত্র স্থান আছে যে, এই অট্টালিকার অতুল বৈভব, সুখ-সম্পদ, বিলাসের স্রোত ছাড়িয়া তাহার মন সেইখানে যাইতে চাহে। ওগো সে কোথায়?—কোথায়? দেবতা! আমার হৃদয়ের বেদনা তুমি ভিন্ন কে বুঝিতে পারিবে? আমি এখানে থাকিলে তুমি যদি বিরক্ত হও, তোমার গৃহ যদি তোমার অসহ্য হয়, তবে—তবে বলিয়া দাও, ওগো—বলিয়া দাও, আমি কোথায় যাইব? আমার যাইবার স্থান কোথায়? মরণ ছাড়া আমার যে আর কোন উপায়ই নাই। বিশ্বজগৎ যে আমাকে দেখিয়া ঘৃণায় মুখ ফিরাইতেছে, তাহা ভাবিয়া ঘৃণায় লজ্জায় আমার দেহমন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। সারাদিন সারারাত্রি দীন ভক্তের মত তোমার গৃহতলে একাগ্রচিত্তে তোমারই ধ্যানে মগ্ন রহিয়াছি; তোমার সিংহাসন কি টলিবে না? এই শক্তিহীনার বেদনা কি কঠিন পিঞ্জরাবদ্ধ চিত্ত কোমল করিতে পারে না? সে কি এত দুর্ভেদ্য, এত কঠিন?

সে এখন আর নিতান্ত বালিকা নহে, তাহা ছাড়া নিজের এই অনাদৃত অবস্থাই তাহাকে বয়সোচিত সম্পূর্ণ জ্ঞান আনিয়া দিয়াছে। সে যে কেন স্বামীর পরিত্যক্ত হইল, ইহার কারণ সে খুঁজিয়া পাইত না। পাড়া হইতে সমবয়সীরা আসিয়া যখন নিজ নিজ স্বামি-সৌভাগ্যের কথা বর্ণনা করিয়া যাইত, তখন কি একটা অজ্ঞাত আকাঙ্ক্ষায় তাহার হৃদয় আকুল হইয়া উঠিত, তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারিত না। এই অবস্থা দেখিয়া প্রতিবেশীরা যে নিজেদের সুখসৌভাগ্যের কথাটুকু তাহাকেই শুনাইতে আইসে, ইহা বুদ্ধিমতী বাসন্তীর বুঝিতে বাকী থাকিত না। নিজের অবস্থা ফিরাইবার উপায় যে

তাহার নিজের হাতে নাই, তাহা অন্যে না বুঝিলেও সে বেশ বুঝিতে পারে। তথাপি এই নির্ম্মম নিষ্ঠুর বাক্যগুলি যে তাহার অন্তরে কতখানি কঠিন হইয়া বাজে, তাহা সেই অন্তর্যামী বেদনাহারী ভিন্ন আর কে বুঝিবে? স্বামী তাহাকে দেখিতে না-ই পারুন, ভাল না-ই বাসুন, অপরে কেন সে কথা বলিবে? ইহাতে কি তাহার নারীত্বে আঘাত লাগে না? তখন স্বামীর উপর ক্রোধে ক্ষোভে তাহার হৃদয় ভরিয়া উঠিত, সে ভাবিত যে, তিনি এমন করিয়া লোকচক্ষুর সম্মুখে তাহাকে ঘৃণিত করিয়া রাখিলেন কেন? ইহাতে কি তাঁহার গৌরববৃদ্ধি হইবে?

সে নিজের বিষয়েও খুব কঠিন হইয়াছিল। প্রাতঃকালে উঠিয়া স্নান করিয়া রাধাবল্লভের পূজার যোগাড়-যন্ত্র করিয়া দিয়া, নিজে পূজা ইত্যাদি সারিয়া বেলা ১২টার ১টার সময় রাধাবল্লভের ভোগ রাঁধিয়া তাহা উৎসর্গ করা হইলে জ্যেঠাইমা'র পাতে বসিয়া প্রসাদ পাইত। জ্যেঠাইমা'র সাধ্য-সাধনাতেও সে আর দ্বিতীয়বার জলস্পর্শ করিত না। শ্বশুর যত দিন জীবিত ছিলেন, তত দিন সে তবু যথাসাধ্য নিজেকে সাজাইয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর হইতে ক্রমে ক্রমে সে সমস্তই পরিত্যাগ করিতে লাগিল। জ্যেঠাইমা অনেক কাঁদাকাটা করিয়াও তাহার মতপরিবর্ত্তন করিতে পারিলেন না। সে হাতে দুইগাছি রাঙ্গা শাঁখা ও পরনে একখানি মোটা লালপাড় সাড়ী ভিন্ন আর কিছুই পরিত না। তাহাতেই তাহার সৌন্দর্য্য যেন উছলিয়া পড়িতে লাগিল। বসন-ভূষণ-বিহীনা, প্রসাধনশূন্যা তরুণী শ্বশুরগৃহে নবপুষ্পিত স্তবকের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। লোকে তাহাকে দেখিয়া ভস্মাচ্ছাদিত অনলশিখা জ্ঞানে চক্ষু মুদ্রিত করিত।

এক দিন রাত্রিতে জ্যেঠাইমা শয়ন করিতে আসিয়া কহিলেন,—"হ্যাঁ মা, এমন কোরে বিষয়সম্পত্তিগুলা সব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তুমি কিছু বলবে না? সদাশিব সে দিন খুব দুঃখ করছিল, সে বলছিল, 'এক একটা বিষয় বাবুর এক এক ফোঁটা রক্ত ছিল। সেই বিষয়গুলা এমন ভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, দেখলে বড় কষ্ট হয়। বৌমা ত কিছু বলবেন না, অথচ কর্ত্তাবাবুর উইলে লেখা আছে, তাঁ'র আদেশ ভিন্ন কোন কায সিদ্ধ হবে না।' তুমি কি বাছা একবার দেখে শুনে ব'লে দিতে পার না?"

সে কহিল,—"আমি কি জানি?"

"তা বল্‌লে কি চলে, মা? তোমার অদেষ্টই যখন মন্দ, তখন না দেখলে চলবে কেন? তুমি ত নেহাৎ নির্ব্বোধ নও, মা; কেন এমন ধারা ক'রে নিজের বিষয়গুলা পরের হাতে ছেড়ে দিচ্ছ? সে যখন রইল না দেখলে, তখন মিছেমিছি তা'র উপর রাগ ক'রে নিজের কেন ক্ষতি করছ?"

সে অনুনয়ের স্বরে কহিল,—"কা'র উপর রাগ করবো, জ্যেঠাইমা?"

"কা'র উপর রাগ ক'রে তুমি এ সব করছ, তা তুমিই জান। এ তোমার ঠিক রাগ নয়, মা, এ তোমার অভিমান। কিন্তু অভিমানই বা তুমি কা'র উপর কর? সে যদি মানুষই হবে, তবে এমন ধারা করবে কেন?"

বাসন্তী একটুখানি হাসিয়া কহিল,—"আমার ইচ্ছে হয় না, তাই দেখি না; কারুর উপর আমার রাগ অভিমান নেই। আর থাকলেই বা আমার দুঃখ কে বুঝবে? যিনি এক দিন বুঝতেন, তিনি ত আর—" সে আর বলিতে পারিল না।

জ্যেঠাইমা কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া পুনরায় বলিলেন, "তুমি, বাছা, এই যে না খেয়ে, না প'রে নিজের শরীরটাকে এমন ক'রে মাটী করছ, সে কি তা' দেখতে আস্‌ছে, না শুন্‌তে আস্‌ছে? সে ত কোথাকার কোন্ একটা বেম্মর মেয়ের জন্যে—এমন যে সোনার পিবৃতিমে, একবার চেয়েও দেখলে না, তা'কে নিয়েই উন্মত্ত হয়ে রইল। তা'কে বিয়ে কর্‌তে গেছল বলেই না ঠাকুরপো জোর ক'রে ধ'রে এনে তোমার সঙ্গে বিয়ে দিলে? বাবু ত সেই রাগে এখনও পর্য্যন্ত যে কি করবেন, তা' ভেবে পাচ্ছেন না! ছেলে ত তা'কে বিয়ে করবে ব'লে সমস্ত ঠিকঠাক্ করেছিল। কর্ত্তা না তাই শুনে, পাছে ছেলে হিঁদুর ধর্ম্ম ছেড়ে তাদের ধর্ম্ম নেয়, সেই ভয়ে তাড়াতাড়ি নিজে গিয়ে তা'কে ধ'রে এনে বিয়ে দিলেন। তা'তে ফল যে কি হ'ল, তার ঠিক নেই। তিনি ত গেলেন, এখন তুমিই কষ্ট পাচ্ছ আর আমি বেঁচে থেকে তোমার এই কষ্টগুলা দেখছি।"

তিনি কিয়ৎক্ষণ পরে আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"আমার আর বাঁচতে ইচ্ছা হয় না, বাপু, কি কর্‌ব, মরণ ত আর নেই, পথও চিনি নে যে যাই ; এই সব জ্বলন-পোড়ন যে কত দিন দেখতে হবে, তাও জানি নে। বিয়েই যখন কল্লি, তখন ঘরের ছেলে ঘরে আয় না, তা নয়, সেই ধিঙ্গী মেয়ের শোক বুকে ক'রে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। তুমিও বাছা একটু বোঝ না, তিনি যখন তোমাকেই সব লিখে প'ড়ে দিয়ে গেলেন, তখন না দেখে আর কত দিন চলবে ? একে একে সবই ত যেতে বসেছে, সেও ত সেই রাগে আরও চ'লে গেল। আমি বল্‌তে গেলুম, আমায় ধমকে উঠে বল্লে, 'আমায় কি বৌয়ের খেয়ে থাকতে বল, আমি কি মূর্খ যে, তা'র ভাত খেয়ে থাকব ?' আমি আর কি কর্‌ব, বাপু, তোমাদের রকম-সকম দেখে আমার আর ভাল লাগে না। আমায় এইবার তা হ'লে কাশী পাঠিয়ে দাও।"

জ্যেঠাইমা অনেকক্ষণ ধরিয়া বকাবকি করিয়া, শ্রোতার কোন উত্তর তখনও পর্য্যন্ত না পাইয়া, শ্রান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন।

সরলা বাসন্তী স্বামীর মনের প্রকৃত পরিচয় পাইয়া যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। এত দিন সে যেন অন্ধকারের মধ্যে হাতড়াইয়া বেড়াইতেছিল, এত দিনে তাহার প্রকৃত তথ্য পাইয়া সে যেন কতকটা আশ্বস্ত হইল। সে যদিও স্বামীর অন্যাসক্তির কথা শুনিল, তথাপি তাহার স্বামীর উপর ক্রোধ না হইয়া বেশীর ভাগ দুঃখই হইতেছিল। কারণ, তাহার স্বামী তাহাকে বিবাহ করিবার পূর্ব্বেই ত অপর এক জনকে ভালবাসিয়াছিলেন, এ ভালবাসা তাঁহার কিছু অন্যায় নহে, অবিবাহিত পুরুষ অনেক স্থলে এরূপ ভালবাসিয়া থাকে। তিনি তখন জানিতেন যে, তাহাকেই বিবাহ করিবেন, ঘটনাচক্রে যে তাহা উল্টাইয়া যাইবে, তাহা তিনি তখন কেমন করিয়া জানিবেন ? তাঁহার ভালবাসায় কৃত্রিমতা ছিল না, তিনি যথার্থই তাহাকে ভালবাসিয়াছিলেন ; তাঁহার ভালবাসা যে কত বেশী, তাঁহার বর্ত্তমান ব্যবহারই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতেছে।

বাবা কেন না বুঝিয়া এমন করিলেন ? সন্তানের কষ্ট কি তিনি একটুও বুঝিয়া দেখিলেন না ? তিনি জেদের বশে পুত্রের বিবাহ দিয়া তাঁহার ক্ষোভের ব্যথা কি নিবারিত করিতে পারিয়াছেন ? তবে কেন তিনি এমন ভুল করিলেন, তিনি নিজেও কষ্ট পাইয়া গেলেন, আমাদেরও ইহার মধ্যে আমরণ জ্বলিতে রাখিয়া গেলেন। সে এখন বুঝিতে পারিল, সন্তোষ কেন সে দিন ও কথা বলিয়াছিল যে, সে যাহা পাইয়াছিল, তাহার কাছে এ সমস্ত ঐহিক সম্পদ তুচ্ছ, ধূলিমুষ্টি, পথের আবর্জ্জনা, তাহা ছাড়া আর কিছুই নহে। সন্তোষের গভীর বেদনা যতই সে অনুভব করিতেছিল, ততই তাহার হৃদয় সন্তোষের জন্য 'হায় হায়' করিয়া উঠিতেছিল। তাহার মনে হইতেছিল, যদি সে আবার কখনও সন্তোষের দেখা পায়, তবে তাহার পায়ে ধরিয়া বলিবে যে, "ওগো, তুমি যদি তা'কে পেলে সুখী হও, তবে তা'কে বিয়ে কর, আমি হাসিমুখে সতীনকে নিজের অধিকার ছেড়ে দিয়ে যাব।"

দুই দিন আগে যাহাকে কেহ চিনিত না, কেহ জানিত না, কোথায় কোন্ পল্লীর ক্রোড়ে যে নিজেকে গড়িয়া তুলিতেছিল, তাহারই পূর্ব্বজন্মের কোন একটু সুকৃতি আর এক মহানুভবের দয়া তাহাকে রাজরাণী করিয়াছে ; নচেৎ তাহার ভাগ্যে কি হইত, তাহা কে জানে ? আজ তাহারই জন্য এক জন চিরদিনের আশ্রয় হইতে বিদায় গ্রহণ করিল ; আর তাহারই ঐশ্বর্য্যে সে আজ ধনী হইয়া বসিয়াছে। যাঁহার অন্নে আজ কত লক্ষ লক্ষ ভিখারী উদর পরিপূর্ণ করিতেছে, তিনিই কি না দুইটি অন্নের জন্য কলিকাতায় চাকরী করিতেছেন! তিনি এমন করিয়া নিজের দাবী বিনা বাক্যে ছাড়িয়া দিয়া গেলেন, আর সে নারী হইয়া তাঁহার সুখের জন্য নিজের অধিকার ছাড়িয়া দিতে পারিবে না ? তিনি যদি বিবাহ করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আইসেন, তাহা হইলে দিনান্তেও ত সে একবার তাঁহার দর্শন পাইবে ? এমন করিয়া দিবানিশি জ্বলিয়া পুড়িয়াও তাহাকে মরিতে হইবে না। দেবনারীরাও যদি সপত্নীর যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিয়াছেন, সে মানবী হইয়া কেন তাহা পারিবে না ? হিন্দুর ঘরের মেয়ে স্বামীর সুখের জন্য কি না করিতে পারে ? তাহাদের জন্মই ত যন্ত্রণা সহিবার জন্য ; তবে সে যন্ত্রণা



দরবেশ

বসুমতী প্রেস] [শিল্পী—এম, পি, বর্ম্মা ।

সহ্য করিবে না কেন? সে ত রাজ-ঐশ্বর্য্যের কাঙ্গালী নহে, যে রমণী পতির ভালবাসা হইতে বঞ্চিতা হইয়াছে, তাহার মত দুর্ভাগ্য আর কাহার? নিদারুণ যন্ত্রণায় অলক্ষিতে তাহার গণ্ড বহিয়া জলধারা পড়িল। অজ্ঞাতে তাহার মুখ হইতে নির্গত হইল,—"দয়াময়!"

প্রাতঃকালে উঠিয়া স্নানাদি করিয়া সে রাধাবল্লভের চরণে প্রণত হইয়া কহিল,—"দেব! আপনার শক্তি হইতে এক কণা শক্তি আমায় দিন, আমি যেন কর্ত্তব্য বিস্মৃত না হই, আপনার দান যেন চিনিতে না ভুল করি। আপনি আমায় যাহা দিবেন, তাহাতে যেন ভার বোধ না করি।"

এই বলিয়া সে অনেকক্ষণ ধরিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

জ্যেঠাইমা'র পত্র

এক দিন রাত্রিতে চা-পার্টি হইতে ফিরিয়া আসিয়া সুষমা তাহার মাতাকে কহিল, "মা, তরু দত্ত বিলাত যাচ্ছে, আমিও ঐ সঙ্গে একবার ঘুরে আসি না, মা! নূতন দেশও দেখা যাবে, আর শরীরটাও বেশ সেরে যাবে। বাবাকে বল্লুম, তিনি বল্লেন, আমার বিশেষ আপত্তি নেই, তোর মা'র যদি মত করাতে পারিস ত তুই যা। কি বল্ছো বল না মা?"

মাতা কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "তা কি হয় রে পাগ্‌লি? তোকে ছেড়ে আমি থাকতে পারি না।"

"ঐ ত তোমার দোষ, মা, তরু দত্তর ত মা রয়েছেন, উনি কেমন পাঠিয়ে দিচ্ছেন, ওঁর বুঝি কষ্ট হয় না!"

"সবাই কি সমান হয়, অনিলকেই পাঠাব কি না, তাই ভাবছি। আমরা এখন বুড়ো হয়েছি, এখন তোরা কেউ না থাকলে কি চলে? আগে আমি মরি, তার পর তুই যেখানে ইচ্ছে যাস।"

সুষমা তখন অভিমানমিশ্রিত কণ্ঠে কহিল, "ঐ সব কথা বল বলেই তো আমার দুঃখ হয়।" এই বলিয়া সে মায়ের হাতের উপর মাথা রাখিয়া পুনরায় রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, "তুমি গেলে আমার কি হবে—"

"এ কি রে পাগ্‌লি, তুই কাঁদ্‌ছিস্? এমন মেয়েও ত দেখিনি, আমি কি সত্যি সত্যিই ম'রে যাব? আগে তোদের বিয়ে দিই, তার পর যা হয় হবে।"

সুষমা তখন মাতার গলদেশ বেষ্টন করিয়া কহিল, "তখন তবে ছেড়ে থাক্‌বে কি ক'রে? আর এখন পাচ্ছো না! কেমন নূতন দেশ দেখে আসতুম।"

মা তখন কন্যার মুখচুম্বন করিয়া কহিলেন, "তুই ত নূতন দেশ দেখবি, আর আমি কি ক'রে তোকে না দেখে আর এই পুরানো দেশটাকে নিয়ে দিন কাটাবো?"

"আমি ত দেরী করব না, শীগ্‌গিরই চ'লে আসবো। তোমাকে ছেড়ে কি আমিই থাকতে পারবো?"

"তা কি হয় রে, সুষী, বিদেশে কত দিনের পথে একলা তোকে ছেড়ে দিতে পার্‌ব না, আগে বিয়ে হোক্, তখন তা'র সঙ্গে যাস।"

সে তখন তাড়াতাড়ি কহিল, "তখনই বা কি ক'রে ছেড়ে থাক্‌বে?"

মা তখন মৃদু হাস্যের সহিত কহিলেন, "তখন যে তোকে দেখবার লোক হবে, তা'র হাতে দিয়ে তখন আমরা নিশ্চিন্ত হব, তখন কি আর জোর থাক্‌বে আমাদের?"

এমন সময় অনাদি বাবু আসিয়া কহিলেন, "শুনেছ গা, সুষী যে বিলাত যেতে চায়।"

সুষমা তখন পিতার নিকটে গিয়া বলিল, "দেখুন না, বাবা, মা কিছুতেই রাজী হচ্ছেন না; আপনি একটু বলুন না, বাবা!"

অনাদি বাবু তখন পত্নীর সহাস্য বদনের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "সুষীকে যেতে মত দাও না গো। মেয়েটা যেতে চাইছে, তুমি অমত কচ্ছো কেন?"

"তুমিই তো আদর দিয়ে ওর মাথা খেলে। এখন বুঝতে পার্‌ছি, কে ওকে নাচিয়েছে। বেশ ত, তুমি যদি পারো ত দাও না ওকে পাঠিয়ে।"

অনাদি বাবু কন্যাকে ইঙ্গিত করিয়া কহিলেন, "তবে আর কি রে, সুষী, অর্ডার ত পাশ হয়েছে; তোর তা হ'লে যা কিনতে হয়, আজই দোকানে গিয়ে চল্ কিনে নিয়ে আসি।"

সুষমার মা কোন কথা কহিলেন না দেখিয়া সুষমা পিতার দিকে চাহিয়া কহিল, "দেখুন বাবা, মা রেগে গেছেন," এই বলিয়া সুষমা মাতার বক্ষে নিজের মস্তক রক্ষা করিয়া কহিল; "না মা, আমি তোমায় ছেড়ে কোথাও যাব না। তুমি ভারি দুষ্টু, এত বড় হয়েছি আমি, তবুও তুমি ছাড়বে না আমায়।"

ক্ষণেক পরে পত্নীর নীরবতা ভঙ্গ করিয়া অনাদি বাবু কহিলেন, "দেখ, পাটনা থেকে অখিল বাবু লিখেছেন, সুষমাকে তিনি পুত্র-বধূ কর্‌তে চান। তাঁ'র ছেলে সুধা এবার আই, সি, এস দিয়ে বিলাত থেকে ফিরে এসেছে। সুধারও নাকি সুষীকে বিয়ে কর্‌তে মত আছে। কেবল আমাদের মতামতের উপর নির্ভর কচ্ছেন।"

সুষমার মাতা কহিলেন, "সুধা ছেলেটি বেশ, বিলাত যাবার সময় দু'দিন থেকে গেল; কেমন অমায়িক স্বভাব, দু'দিনেই সে যেন সকলকে আপন ক'রেছিল। বেশ ত, তোমার যদি মত হয়, তা হ'লে লিখে দাও না। তবে একটু খোঁজ-খবর নিয়ে তবে মত দিয়ো।"

এমন সময় "বয়" আসিয়া "খানা তৈয়ার" বলিয়া চলিয়া গেল, সকলেই আহারের জন্য উঠিয়া গেলেন।

প্রাতঃকালে সুসজ্জিত ড্রয়িংরুমে বসিয়া সুষমা খবরের কাগজ পড়িতেছিল। এমন সময়ে বেহারা আসিয়া কতকগুলি চিঠি টেবলের উপর রাখিয়া গেল, সুষমা একে একে সকলগুলি পাঠ করিয়া শেষে অপরিচিত অক্ষরে পিতার নামের একখানি খোলা চিঠি দেখিয়া প্রথমে বিস্মিত হইয়া গেল। সে অনেকক্ষণ নাড়াচাড়া করিয়া অবশেষে পত্রখানি পড়িল, তাহাতে লিখা ছিল,—

পরমকল্যাণবরেষু—

মা, আমি তোমায় চিনি না, তোমার নামও জানি না। তবে ঠাকুরপোর নিকট তোমার পিতার নাম জানিতাম, সেই নামেই চিঠি দিলাম; জানি না, তুমি এই চিঠি পাইবে কি না। আমাকেও তুমি চিনিবে না, আমি সন্তোষের জ্যেঠাইমা। আজ বড় বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া তোমায় চিঠি লিখিতেছি। লক্ষ্মী মা আমার, তুমি আসিয়া যাহা হয় একটা বন্দোবস্ত কর।

আমার দেবর সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি বৌমার নামে দেওয়াতে সন্তোষ চটিয়া গিয়া এ বাড়ী ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে; কোথায় যে গিয়াছে, তাহা ভগবান্ ভিন্ন কেহ জানেন না। আজ প্রায় দেড় মাস হইল, তাহার কোন খবর পর্য্যন্ত আমরা পাই না। বধূমাতা সন্তোষ চলিয়া যাওয়া অবধি কিছুই দেখিতেছেন না। এমন কি, তিনি আহার অবধি ছাড়িয়া দিয়াছেন। আমি তাঁহাকে কোনমতে বুঝাইতে পারিতেছি না।

শুনিয়াছি, তুমি লিখাপড়া জান, তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি আছে। এ সময়, মা, একবার আসিয়া এই বিপদ হইতে আমাদের মুক্তি দাও। তুমি যদি বৌমাকে বুঝাইয়া-সুঝাইয়া যাইতে পার, তাহা হইলেই রক্ষা হয়, নহিলে সমস্ত জমীদারী নীলাম হইয়া যাইবে এবং বৌমাও শীঘ্র মারা যাইবেন। চারিদিকে জ্ঞাতি-শত্রু হাসিতেছে, সে কথা বধূমাতা বুঝেন না, বলিতে গেলেই বলেন—থাক্। আমি কোন দিকে কোন উপায় না দেখিয়া, আজ তোমায় লিখিতেছি। আশা করি, মা, আমার এই অনুরোধ তুমি রাখিবে। আমি যে কি করিব, বুঝিতে পারিতেছি না। তুমি এই পত্র পাইবামাত্র, যে ভাবে আছ, সেই ভাবেই চলিয়া আসিবে, দেরী করিবে না। মা, আমিও তোমার জ্যেঠাইমা। তুমি দুঃখিনী জ্যেঠাইমা'র কথা অবশ্য অবশ্য ঠেলিবে না, এখানে আসিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করিবে না। যদি পার ত সন্তোষকেও সঙ্গে করিয়া এখানে লইয়া আসিবে, এ বিষয় অন্যথা করিবে না।

তোমরা সকলে আমার আন্তরিক আশীর্ব্বাদ জানিবে।

আশীর্ব্বাদিকা—
তোমার জ্যেঠাইমা।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

সুষমা ও সন্তোষ

জ্যেঠাইমা'র পত্র পড়িয়া সুষমা সন্তোষের উপর অত্যন্ত চটিয়া গেল। তাহার মনে সন্তোষের উপরে যে ভক্তি-শ্রদ্ধা ছিল, তাহা কমিয়া গেল। ক্রোধে, ক্ষোভে তাহার

কেবলই কান্না আসিতে লাগিল। তাহার কেবলই মনে হইতেছিল, তিনি এত নিষ্ঠুর!

নিরপরাধিনী বাসন্তীর শোচনীয় অবস্থার কথা পড়িয়া সে মনে অত্যন্ত মর্ম্মপীড়া অনুভব করিতেছিল। সে মনে মনে বলিল, "ছি ছি, তুমি এত হীন! আমি তা জানিতাম না। যে পুরুষের চরিত্রে দৃঢ়তা নাই, সে আবার পুরুষ কিসের? সে আবার বাঁচিয়া থাকে কেন?"

বৈকালবেলা কলেজ হইতে আসিয়া সন্তোষ নিজের কক্ষে বসিয়া একখানি বই পড়িতেছিল। তাহার চেহারা অত্যন্ত খারাপ হইয়া গিয়াছে। কঠোর পরিশ্রমে দেহ একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। তাহার অনিন্দ্যসুন্দর কান্তিতে কে যেন কালী ঢালিয়া দিয়াছে। হঠাৎ কেহ তাহাকে দেখিলে এখন চিনিতে পারে না। তাহার মুখ সর্ব্বদাই ম্লান ও শুষ্ক। সে একাগ্রচিত্তে বইখানি পড়িতেছিল, এমন সময় চাকর আসিয়া বলিল, "হুজুর, একঠো মেমসাব আয়া।" সে প্রথমে বিস্মিত হইয়া গেল। ভৃত্য অগ্রসর হইয়া তাড়াতাড়ি তাহার হাতে একখানি কার্ড দিল; সে দেখিল, তাহাতে লিখা রহিয়াছে "মিস্ সুষমা দত্ত।" সে তাড়াতাড়ি একটি জামা গায়ে দিয়া নীচে গেল।

কিয়ৎক্ষণ পরে উভয়ে দ্বিতলের গৃহে আসিয়া দুইখানি চেয়ারে উপবেশন করিল। সন্তোষ কহিল, "আপনি যে আসবেন, আমি তা—"

তাহার কথায় বাধা দিয়া সুষমা কহিল, "কেন? আমার আসা কি এত অসম্ভব?"

সে কহিল, "অসম্ভব বই কি?"

সুষমা সে কথা চাপা দিয়া কহিল, "সন্তোষদা, আমি একটা বিশেষ কাযের কথার জন্য আপনার কাছে এসেছি। আপনাকে আমি গোটাকতক কথা বলতে চাই, আপনার পক্ষে হয় ত কথাগুলা অপ্রিয় হ'তে পারে। কিন্তু আশা করি, সে জন্য আপনি আমার উপর অসন্তুষ্ট হবেন না।"

সুষমার কথা শুনিয়া সন্তোষের বুকের মধ্যে কাঁপিতে লাগিল। তাহার দেহের সমস্ত রক্ত মাথার দিকে ছুটিল, মুখ, চোখ লাল হইয়া উঠিল। বহু কষ্টে সে আবেগ দমন করিয়া রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, "আপনার যদি কিছু বলবার থাকে, আপনি তা স্বচ্ছন্দে বলুন। আমার পক্ষে যদি তা অপ্রিয় হয়, আমি তাতে রাগ করব না।"

সুষমা তখন গম্ভীরস্বরে বলিল, "সন্তোষদা, আপনি বিয়ে করেছিলেন কেন?"

তাহার প্রশ্ন শুনিয়া সন্তোষ প্রথমে চমকিত হইয়া উঠিল, সে ভাবিল, এ আবার কি রকম কথা, সুষমা তাহাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করে কেন? সে কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া কহিল, "এ কথা জিজ্ঞাসা কচ্ছেন কেন?"

সুষমা কহিল, "জিজ্ঞাসা করতে কি দোষ আছে? আপনি রাগ করবেন না। আমার কিছু দরকার আছে, তাই জিজ্ঞাসা কচ্ছি।"

সন্তোষ ধীর কণ্ঠে কহিল, "আমি দোষের কথা বলছি না, তবু—তবু—"

সুষমা দৃঢ় কণ্ঠে কহিল, "আপনি হয় ত ভাবতে পারেন, এত দিন পরে এ কথা কেন? দরকার কিছু হয়েছে বলেই আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি। আপনি আমায় বলুন, বিয়ে করেছিলেন কেন?"

সে রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, "বাবার হুকুমে বিয়ে করেছিলুম।"

সুষমা সংযত কণ্ঠে কহিল, "বিয়েই যদি কল্লেন, তবে তাকে এমন ক'রে ত্যাগ কল্লেন কেন? এ বিষয়েও কি আপনার পিতার এই রকম আদেশ ছিল?"

সন্তোষ কোন উত্তর দিল না দেখিয়া সে পুনরায় কহিল, "আপনি যদি মনে জানতেন যে, বিয়ে ক'রে তা'কে সুখী করতে পারবেন না, তবে তা'কে বিয়ে কল্লেন কেন?"

সন্তোষ ক্লিষ্ট স্বরে কহিল, "আমার ইচ্ছে ছিল না, বাবা জোর ক'রে—"

সুষমা তাহার কথায় বাধা দিয়া কহিল, "জোর ক'রে কেউ কি কিছু করাতে পারে? এ যে ছেলেভুলান কথা —মন কি কাহারও বলের বশীভূত হয়? আপনাকে কি কেউ বন্দী ক'রে রেখেছিল? আপনার হাত-পাগুলো তখন কি নিশ্চেষ্ট ছিল? আপনি কি চ'লে আসতে পারেন নি, আপনি কি পুরুষ?"

সন্তোষ রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে কহিল, "ভুল—ভুল করেছি, সেই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত এখন কচ্ছি। নিজের অন্যায় হয়েছে বলেই নিজেকে দূরে—দূরে রেখেছি, এতেও কি আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে না?"

সুষমা উত্তেজিত কণ্ঠে কহিল, "না, আপনার পাপের প্রায়শ্চিত্ত নেই, একটা অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত কত্তে এসে আপনি কতগুলো অন্যায় করেছেন, তা জানেন? নিজের ক্ষণিক দুর্ব্বলতায় আপনি একটি নির্দ্দোষ বালিকার কি সর্ব্বনাশ করেছেন, তা কোন দিন ভেবে দেখেছেন কি? এ জলের দাগ নয়, সন্তোষদা, এ ঈশ্বরদত্ত বন্ধন। এ বন্ধন কেউ কখনও ছাড়িয়ে যেতে পারে নি, আপনিও পারবেন না। জেনে রাখবেন, আজ যা'কে আপনি তুচ্ছ ভেবে দূরে ত্যাগ ক'রে এসেছেন, হয় ত সে ততটা তুচ্ছ নয়। হয় ত এক দিন এক সময়ে এমন দিন আসবে, সেই তুচ্ছ অপদার্থ জিনিষটাই এক দিন জীবনের সর্ব্বোত্তম উৎকৃষ্ট দ্রব্য ব'লে গ্রহণ করতে হবে।"

সে পুনরায় আরম্ভ করিল,—"এই কি আপনার ন্যায়-নিষ্ঠতা? এই কি পুরুষোচিত আদর্শ! এই কি আপনার আত্মসংযম? যা'র নিজের সহ্যশক্তি নেই, সে অপরকে তা ভোগ করায় কি ব'লে? দেবদ্বিজ-ব্রাহ্মণ-অগ্নি সাক্ষী ক'রে পবিত্র বেদমন্ত্র পাঠ ক'রে আপনি যা'র সুখ-দুঃখের অংশ নিয়েছেন, দুঃখদুর্দ্দিনে যা'কে রক্ষা করতে প্রতিশ্রুত হয়েছেন, আজ তা'কে নিঃসহায়ভাবে একাকিনী বিপদের মাঝে ফেলে আসতে আপনার অন্তরাত্মা কি কম্পিত হয় নি? আপনার বিবেক কি আপনাকে বাধা দেয় নি? এই কি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষিত মানবের আদর্শ?"

সন্তোষ এতক্ষণ নীরবে সুষমার সমস্ত কথা শুনিয়া যাইতেছিল। সুষমাকে নীরব হইতে দেখিয়া সে কহিল, "আমি সমস্ত বুঝতে পারি, কিন্তু মন বশীভূত করতে পারছি না। আমি নিজেকে ফিরাতে যথেষ্ট চেষ্টা করছি, কিন্তু কি জানি কেন, আমার সমস্ত চেষ্টা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, শত চেষ্টাতেও আমি আমাকে ফেরাতে পারছি না। তুমি কি আমার এ কথা বিশ্বাস কর?"

সুষমা রুক্ষ কণ্ঠে কহিল, "না, আমি আপনাকে বিশ্বাস করি না।"

সন্তোষ শুষ্ক কণ্ঠে কহিল, "কেন? আমার অপরাধ?"

"আপনি যদি বিশ্বাসের কায করতেন, তা হ'লে আমি আপনাকে নিশ্চয়ই বিশ্বাস করতাম, কিন্তু আপনি ত তা করেন নি! তা হ'লে কেমন ক'রে আপনাকে বিশ্বাস করবো? আপনার বিবাহিতা পত্নীর উপর কি আপনি বিশ্বাসঘাতকতা করেন নি? বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন কি না, তা আপনি আপনার মনকেই জিজ্ঞাসা করুন, সে আপনার প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিবে। সাধ্বীর অমল-ধবল প্রেম যা সে বিয়ের দিনে পরিপূর্ণ বিশ্বস্ত চিত্তে আপনাকে অর্পণ করেছিল, সেই বিশ্বাসের কি এই পুরস্কার? জানবেন, এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নেই। জানবেন, এ অপরাধ অমার্জ্জনীয়।"

আর্ত্ত কণ্ঠে সন্তোষ বলিয়া উঠিল, "আর না—আর না—আপনি—আমায় এত হীন ভাববেন না, আমি আর যা হই, কিন্তু বিশ্বাসঘাতক—" সে আর বলিতে পারিল না, অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া লইল।

সুষমার চক্ষুতে জল আসিতেছিল; তথাপি সে নিজেকে সংযত করিয়া কহিল, "বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া আপনি একে কি বলতে চান? যদি তা'র উপরে আপনার যথার্থ ভালবাসা থাকত, তা হ'লে কি আপনি তা'র সঙ্গে এমন নিষ্ঠুরতা করতে পাত্তেন? পবিত্র প্রেম ত মানবকে কর্ত্তব্য হইতে বিচ্যুত করে না, সে যে কর্ত্তব্য শিখায়; কামনাহীন মানবের মনে উচ্চতা আনিয়া দেয়। হিন্দু-শাস্ত্রমতে প্রেম পবিত্র, আকাঙ্ক্ষাবর্জ্জিত, সেই কামনা ও আকাঙ্ক্ষাকে যে দমন করতে পারে, সে-ই সংসারের মধ্যে দেবত্বলাভই করতে পারে। আপনি পুরুষ হয়ে বলছেন, আমি পারছি না; এ কি রকম কথা? আপনাকে বিশ্বাস কর্‌ব কি ক'রে? যে নিজের চিত্তকে বশীভূত কর্‌তে পারে না, তা'কে কি কেউ বিশ্বাস ক'রে থাকে? আপনি পুরুষ হয়ে যদি এতটা ছেলেমানুষী করতে পারেন, আর সেই কোমলপ্রাণা বালিকা কি ক'রে এত বড় কষ্ট সহ্য করবে?"

সন্তোষ কহিল, "আপনি যা'র জন্য এত কর্‌ছেন, সে হয় ত ততটা বোঝে না।"

সুষমা কম্পিত কণ্ঠে কহিল, "ও কথা মনেও স্থান দেবেন না। বয়সের ধর্ম্মে এ আপনা হ'তেই জেগে

ওঠে, কাউকে শেখাতে হয় না। ওটা মানুষের স্বাভাবিক মনোবৃত্তি।" আপনি তা'কে যতটা নির্ব্বোধ ভাবেন, সে ঠিক ততটা নয়। আপনি তা'র মনের ভাব কোন দিন জানতে চেষ্টা করেছেন কি? সে আপনাকে কতটা ভালবাসে, তা কোন দিন বুঝতে চেষ্টা করেছেন কি? আপনি যে অন্ধ, আপনার বোঝবার শক্তি কোথায়? আপনি জানেন, আপনার জন্ত সে সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসিনী; আপনার অমনোযোগিতায় সমস্ত বিষয় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে? আপনি সে খবর রাখেন? আপনি জানেন, তা'র প্রতি আপনি কি অন্যায় করেছেন?"

সন্তোষ ম্লান মুখে কহিল, "বাবা যখন তাকে বিষয় দিয়ে গেছেন, তখন আমি কি কর্‌ব? আমার এতে কি দোষ আছে?"

সুষমা রুষ্ট স্বরে কহিল, "আপনার পিতার অপরাধের জন্ত কি সে দোষী হবে? তিনি যা ভাল বুঝেছেন, তাই করেছেন, তা'র জন্তে সে ত শাস্তিভোগ করতে পারে না। আমি এত দিন আপনাকে মানুষ ব'লে জানতুম, এখন দেখছি, আপনি পশুরও অধম। একটা মেয়েমানুষের দেহে যতটা দৃঢ়তা আছে, আপনার তাও নেই।"

সন্তোষ তখন ভাবিতেছিল, "কেন পশু হয়েছি, যদি বুঝতে, যদি জান্‌তে, তা হ'লে এমন ক'রে আমায় বলতে না।"

সুষমা পুনরায় বলিল, "যা হয়ে গেছে, তা ভুলে যান, আমার অনুরোধ—তাকে—সুখী কর্‌তে চেষ্টা কর্‌বেন।"

সন্তোষ দুই হস্তে মুখ ঢাকিয়া কহিল, "জান না—জান না। এ আমি পার্‌ব না, আমায় আপনি ক্ষমা করুন, আমি—পার্‌ব না—"

সুষমা আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, "সন্তোষদা, আপনাকে অনেক কথা বল্লুম, কিছু মনে কর্‌বেন না। আজ বেলা গেল, আমি চল্লুম। আমি কাল সিরাজগঞ্জে যাচ্ছি, আপনাকে যেতে হবে, আপনি ষ্টেশনে থাক্‌বেন।" এই বলিয়া সে মোটরে গিয়া উঠিল।

[ক্রমশঃ।

শ্রীমতী কাঞ্চনমালা দেবী।

জাগ্রত

রুদ্রের বাণী যেই ক্ষুদ্রের আত্মায় বাজ্‌লো,
জাগ্রত মানী সেই আপনার সত্তায় সাজ্‌লো।

সত্যের চন্দনে ভালে তার অঙ্কিত ধর্ম্ম,
মুক্তির বন্দনে উল্লাসে ঝঙ্কৃত মর্ম্ম!

হাতে তার পাশুপত শম্ভুর মহাদান তীক্ষ্ণ,
লঙ্ঘিতে আশু পথ চলে করি খান খান বিঘ্ন!

হৃদে তার [illegible] পুণ্যের [illegible],
প্রাণে [illegible] [illegible] সাত্বিক [illegible]!

বুকে তার শোভা পায় নন্দন-মন্দারগুচ্ছ,
গান্ধারে গীতি গায় ছন্দিত মন তার উচ্চ!

জয়যুত সুকুমার চলে ওই মহাভাগ দৃপ্ত,
অন্তর-শিখা তার রাজসূয়-পূতযাগ-তৃপ্ত!

স্বার্থের আহুতিতে সার্থক হোম তার পূর্ণ,
অমৃতের আহুতিতে অনৃতের গুরুভার চূর্ণ!

আত্মায় [illegible] যে [illegible] ঝঙ্কার সাম্য,
মধুবারে ঋষি [illegible] [illegible] [illegible] কাম্য!

"হেমচন্দ্র"

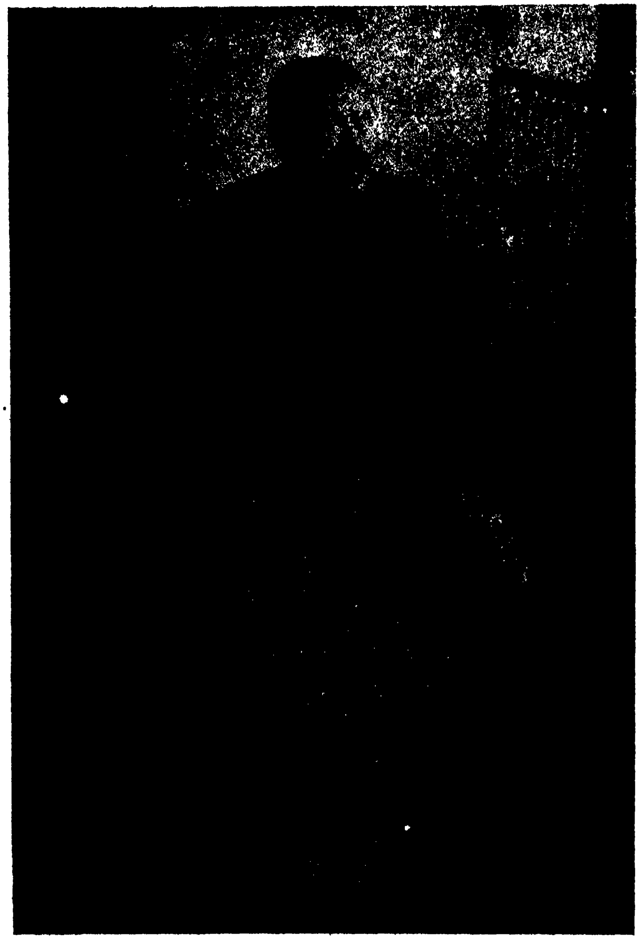
নামটা যতই রমণীয় বা romantic হৌক, উহা গল্প, উপন্যাস, কাব্য, নাটক ইহার কোনটিরই ধার ধারে না ! এমন কি, এ একখানি ভ্রমণবৃত্তান্তও নয়; নিছক নিরেট জীবন-চরিত মাত্র ! তা' আবার এক নয়, দুই নয়, একেবারে তিন খণ্ডে সমাপ্ত ! যা'দের 'জীবন' থাকিয়াও নাই, তা'দের আবার 'চরিত' ? —অক্ষমতার এ নাকি কান্নার দিকে কাণ দিলে 'হেমচন্দ্র'-লেখক শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ অল্প দিনের মধ্যেই বঙ্গ-সাহিত্যের জীবন-চরিত বিভাগে একটা পাকা কায়েমী অধিকারের দাবী করিতে পারিতেন কি ?

দেশের বড় মাথা-ওয়ালা বড় কলিজার লোকদের জীবন বুঝিতে বা বুঝাইতে যে বঙ্গ-সাহিত্যসেবীর প্রবৃত্তি নাই, তা' নয়। কিন্তু সনাতন প্রথায় কল্পনায় রূপকে পল্লবে অলঙ্কারে ইতিহাসকে উপন্যাস করিয়া বাজারে জীবনচরিত নামে কাটাইবার সুবিধা যে আর নাই ! সে ভেজাল আর ত চলে না ! এ দিকে জীবনচরিতের উপকরণ সংগ্রহ আমাদের দেশে এক সঙ্গীন ব্যাপার ! শ্রুতিধরের আমল যে শেষ ! অথচ সে যায়গায় journal বা diaryর চলন তেমন হইয়াছে কই ? জীবনচরিতের মাল-মসলার জন্য ঘরে-বাহিরে সাহায্যলাভ ত বিড়ম্বনা ! সময়, শ্রম, অর্থ-ব্যয় করিয়া মৃত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনের বিরাগ ও বিরোধেরও অপেক্ষা ! এ সব ঝঞ্ঝাট মাথায় করিয়া এ ঝুঁকির কাযে কে ঝুঁকিতে চায় ? তা'র চেয়ে বাঙ্গালা হরফে ইবসনী নায়ক-নায়িকার সৌখীন রঙ্গীন রঙ্গঢঙ্গের মসাল ঝাঁকাল স্বদেশী নবন্যাস লিখিলে, বরং নগদ কিছু আসে ! সৌভাগ্যের বিষয়, মন্মথ বাবু তিন গুণ মূল্যে বিক্রয়ের লোভ সংবরণ করিয়া একটা Thankless taskএ হাত দিয়াছেন, এবং সেই সঙ্কট-কণ্টক-কঙ্করের পথ বাহিয়া প্রতিষ্ঠার পাহাড়ে উঠিতে সমর্থ হইয়াছেন !

'হেমচন্দ্র' ধারাবাহিক যখন টাট্‌কা টাট্‌কা মাসিকে বাহির হইতে আরম্ভ করিল, ঠিক যেন খাঁটি গাওয়া ঘিয়ে ভাজা গরম গরম লুচি ! পাতে পড়িতে পায় না ! পাঁচ পদ দিয়া উপভোগের তর্ সয় না ! এখন একত্রে অল্পে অল্পে রসগ্রহণের অবসর পাইয়া বাসি টাট্‌কার চেয়েও আমা-দিগকে ফাঁদে আট্‌কাইয়াছে। হৌক বড়, হেমচন্দ্রের মত বড় কবির জীবনী এত বড়ই ত মানায়; কিন্তু এত দিন এত সব কথা আমরা কোথায় হারাইয়া ফেলিয়াছিলাম ? ভাগ্যে এই সৌভাগ্যবান্ লোকটি তা'র খোঁজ পাইলেন, খোঁজ দেখাইলেন ! এমনই করিয়া আমাদের কত না অতুল্য জীবনের অমূল্য ইতিহাস বিস্মৃতিতে লুকাইতেছে !

অমরতার বয়স নাই। এ কথা ছাড়িয়া দিলেও, হেমচন্দ্রের অভ্যুদয় এমন ত বেশী দিনের কথা নয় ! ইহারই মধ্যে 'সপ্তমীতে বিসর্জ্জনের' ব্যবস্থা তাঁহারই দেশবাসী কেন করিবে ? হেমচন্দ্রের মৃত্যুর পর প্রথামত শোক-সভা ডাকার কসুর ত বাঙ্গালীর হয় নাই ! তবে কথা কি, আমরা পরের দেখাদেখি শোক-সভা ডাকিয়া প্রেতাত্মার শান্তিভঙ্গ করিতে শিখিতেছি বটে, কিন্তু এ লেফাপা-দুরস্ত Public অশ্রুপাত আমাদের ধাতে নাই ! দল বাঁধিয়া সাজিয়া-গুজিয়া বুক চাপড়াইতে গিয়া mock mourningএর হাস্যজনক কসরৎ দেখানই সার হয় ! প্রকাশ্যে কিরূপে বৃহৎ মৃতের সম্মান করিতে হয়, সে শিক্ষানবিশী এখনও আমাদের দেশ শেষ করিতে পারে নাই। তাই শোক-সভায় বক্তৃতা ও সংবাদপত্রে কবিতার উচ্ছ্বাসেই আমরা হাঁপাইয়া পড়ি। তবে আগমনী অপেক্ষা বিজয়ার ঢাক আমাদের বাজে জোরে; এবং সেই জন্যই টে কেও কম। কবির চিতায় কবিতারও সহমরণ ঘটাইয়া খালাস হইতে আমাদের আরামপ্রিয় প্রকৃতি বা প্রবৃত্তি অজ্ঞাতে তা'র কায করিয়া যায়। হেমচন্দ্রের বেলাই বা ইহার অন্যথা হইবে কেন ? Bolshevic সমালোচকগণ সুযোগ বুঝিয়া কবির ভাষায় হিংস্র সুর মধুর করিয়া আওড়াইবেনই ত,—

এক কবি যাবে, পুনঃ অন্য কবি হবে,
বাঙ্গালার সিংহাসন শূন্য নাহি রবে।



কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (অন্ধাবস্থায়)

বীণাপাণি কিন্তু তাঁর কমল-কাননের চতুঃসীমাতেও সাহিত্য-রাষ্ট্রনীতির এই ধ্বংসবাদ ঢুকিতেই দিলেন না। বিপ্লবের মেঘ হাসিয়াই উড়াইলেন। সে হাসির অর্থ—বিশেষত্ব কালের অবধ্য।

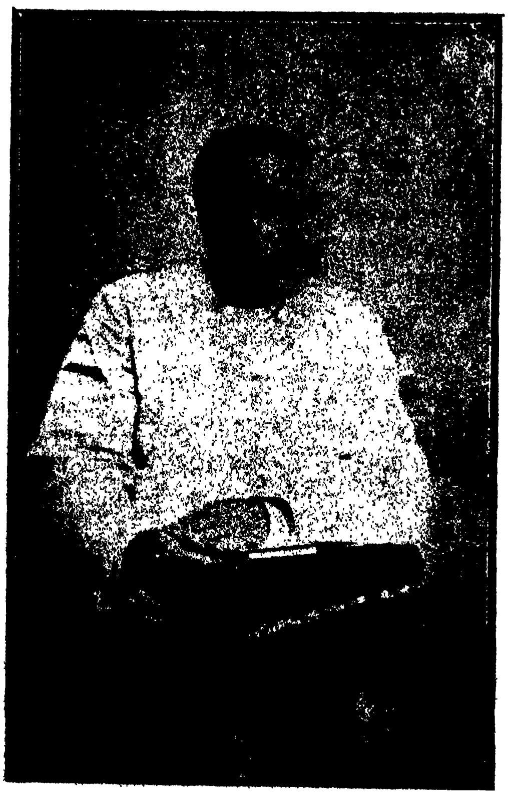
হেমচন্দ্রের অমরতা ঘোষণা সর্ব্বপ্রথম যিনি করিয়াছিলেন, তিনি আর কেহ নহেন, স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র। এক দিন 'বঙ্গদর্শনে' বঙ্গ-সাহিত্যের সেই সেরা ওস্তাদ হেমচন্দ্রের আগমনীর যে মঙ্গলাচরণ করিয়াছিলেন, সে পাঞ্চজন্যের বিজয়-নিনাদ ত বিজয়ার কাঁদুনে সানাই নয়; উহা যুগ হইতে যুগান্তরের কর্ণে পৌঁছিয়া অনন্তকালের দিকে চলিয়াছে। তাই বলিতে হয়, হেমচন্দ্র বিসর্জ্জনের প্রতিমা নহেন, নিত্যপূজার ঠাকুর। আমরা যে তাঁহাকে ঝাপ্‌সা দেখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, সে কেবল আমাদের দৃষ্টির দোষ। মন্মথ বাবু পাকা Surgeonএর মত যাঁহাতক সেই চোখের ছানি উড়াইয়া দিলেন, আমাদের গৃহদেবতাকে উজ্জ্বলতর-রূপে কাছে পাইলাম। কিন্তু যিনি গোড়ায় আমাদিগকে হেমচন্দ্রের সহিত পরিচিত করিলেন, তাঁহার প্রতি মন্মথ বাবু



কবিবর হেমচন্দ্র (১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে)

সজ্ঞানে একটা অপরাধ করিয়া বসিলেন।—'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীত হেমচন্দ্রের জাতীয় কবিতার নিকট শুধু ঋণীই নহে, তার প্রতিধ্বনি!—এ সত্যের অপলাপ কি মন্মথনাথের যোগ্য হইয়াছে? বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসের ভিতর দিয়া একটা অজ্ঞাতপূর্ব্ব দেশাত্মবোধ গড়িয়া তুলিতেছিলেন, 'বন্দে মাতরম্' তাহারই পূর্ণ পরিণতি। হেমচন্দ্র কি অন্য কোন লেখকের তাহাতে কোনই হাত ছিল না। মন্মথ বাবু বেশ জানেন, হেমচন্দ্রকে কমাইবার চেষ্টাই শুধু নিষ্ফল নহে, তাঁহাকে বাড়াইতে যাওয়াও অকারণ! তাই না, হেমচন্দ্রের চরিত্রই শুধু তিনি নিরপেক্ষতার সহিত আলোচনা করেন নাই; কবির কাব্যচিত্রগুলিরও একটা খাঁটি বিশ্লেষণ করিয়া ছাড়িয়াছেন।

মন্মথনাথের বিশেষত্ব, তিনি এক একটি তথ্যকে দেহের রক্তবিন্দু জ্ঞান করেন। সত্যকে মাথার মণি জানিয়া দুর্গম খনি হইতে বহু ক্লেশে আহরণ করেন। আদর্শে না পৌঁছান পর্য্যন্ত তাঁহার শান্তি নাই, তৃপ্তি নাই। মন্মথনাথের জীবনী-রচনা এ হিসাবে ঠিক যেন







হেমচন্দ্রের জীবন-চরিত-রচয়িতা শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ

খতাইয়া দেখা মহাজনী হিসাব। যদিও কাব্যে ভরা, কল্পনার ভরও সয় না! এই কঠিন কষ্টিপাথরে তিনি হেমকে নিজে কষিয়া দেখিয়া তবে পরকে দেখাইয়াছেন।

হৈমী কবি প্রতিভা বহুমুখী। দীর্ঘ রচনা অপেক্ষা 'ছোট'তে 'বড়' ফুটাইতে ও ফলাইতে যেন অধিকতর দক্ষ। গম্ভীর ভাবের কবি হাস্যরসেও হাত পাকাইয়াছিলেন বেশ। তাঁ'র পরিহাস ব্যঙ্গ নয়; রঙ্গ। উহা সমাজ বা ব্যক্তিবিশেষকে বন্ধুর মত লজ্জা দিয়া শোধ্‌রাইতে চায়, শত্রুর মত অবমানে বিদ্ধ করিয়া মনঃপীড়া দিতে জানে না। তাঁ'র কাব্যাভিব্যক্তি আদিরসে খোলে, কিন্তু বীররসে নিজকে নিঃশেষে তোলে। সেকেলে কবির আদি ও হাস্যরসের শ্লীলতা একেলে রুচিবাগীশেরও অপ্রত্যাশিত। কবির 'দশমহাবিদ্যা'র করুণরসে পাষাণের চোখ ফাটিয়া ধারা বহিয়া যায়। যুবক-যুবতীর প্রেম বিশেষভাবে পরকীয়া প্রীতি গীতির শ্রেষ্ঠ উপাদান বলিয়া যাঁ'দের গোঁড়ামি, তাঁ'রা বলিবেন—হেমের প্রেমের পরিকল্পনা কবিতায় গীতি জিনিষটিকে তেমন দাঁড় করিয়া যাইতে পারে নাই। শুধুই কি তাই? ইংরাজীশিক্ষিত কবির 'বৃত্রসংহার' 'মেঘনাদবধে'র চুরি!—এও এক দলের আবিষ্কারের বাহাদুরী হইয়া আছে! এই সব সাহিত্যিক C. I. D. মাইকেল মিল্‌টনের, মিল্টন হোমারের, হোমার বাল্মীকির, এইরূপ ইনি ওঁর, তিনি তাঁ'র জাল বা চুরি বলিয়া সেকেলে একেলে ভাবরাজ্যের Criminalদের report সম্মুখ ও পশ্চাৎ হইতে ভারতীর দরবারে পেশ করিয়া আসিতেছেন। এই সব চোরের সাক্ষী পদচিহ্ন মুছিয়া চলিতে জানিলে, পরের ছিদ্রান্বেষী বলিতে গিয়া আনাড়ী ছন্দানুবর্ত্তী বলিয়া ধরা পড়িতেন না! তথাপি সাহিত্যে গুপ্ত-প্রয়াস এ হেন উপায়ে সুখের বা সখের কলমপেশা বাহাল রাখিতে চায়! পরের ধনে পোদ্দারী, অন্যের খরচায় গোয়েন্দাগিরি ছলে-কৌশলেই বজায় রাখিতে হয়। এঁরা পরকে ত পাতালের গর্ভে লইতেছেন, নিজেরা যে পড়িয়া গিয়াছেন retrenchmentএর কর্দ্দমের আবর্ত্তে! বাণী রাণীর কমলালয়ে বেচারীদের জন্য কোন পাকা কোতোয়ালী তৈয়ারী হয় নাই, হইবেও না; কিন্তু হেমচন্দ্রের ন্যায় সিদ্ধ সেবকের জন্য বাগ্দেবীর নওরতনের সভা চিরদিন দ্বার উন্মুক্ত করিয়া প্রতীক্ষায় রহিয়াছে।

হেমচন্দ্রের জীবন শেষ দিকে বড় কষ্টেই কাটিয়াছে। মন্মথ বাবু অনুরক্ত ভক্তের ন্যায় গলদশ্রু মিশাইয়া সে করুণ কাহিনীকে করুণতর করিয়াছেন। কিন্তু কোথাও স্বাধীনতায় কবিকে কৃপার পাত্র করিয়া পাঠক-সাধারণের সমবেদনা উদ্রেকে চেষ্টা পান নাই। হেমচন্দ্রের ভুলগুলিও তাঁহার জীবনীকারের নিকট উঁচু মাথা, সিনা টান্! তাই এমন যে প্রাণাধিক প্রিয়, মানসের আরাধ্য, তিনি যদি উদরান্নের জন্যও অপরের নিকট হাত পাতেন, মন্মথ বাবু সহানুভূতি ভুলিয়া ক্ষোভে অভিমানে বাঁকিয়া বসেন। স্বাধীনতায় কবির মানসিক অপঘাত তাঁ'র জীবনীকারের স্বভাবসুলভ লিপিসংযমও ভুলাইয়া দেয়! কবির সঙ্গে কবির অতি বড় আপনার লোককেও বেশ দু' কথা শুনাইতে গিয়া তাই অনেক স্থলে মন্মথনাথ বাবু মাত্রা ঠিক রাখিতে পারেন না।

হেমচন্দ্র ত কল্পনার দেবতা নহেন, রক্ত-মাংসের মানুষ। তাই যখন হেমচন্দ্র-যোদ্ধা, কবিবরের সভ্যতা, উদারতা, পরদুঃখকাতরতার ভক্ত সমজদার মন্মথ বাবুকেও হেমচন্দ্রের দুর্ব্বলতায় অতটা তীব্র কটাক্ষ করিতে দেখি, তখন বলিতে ইচ্ছা হয়,—"Et tu Brute!"

আমরা হেমচন্দ্রের অসতর্ক বিষয়-বুদ্ধির প্রশংসা করি না, তাঁ'র অসংযমেরও পক্ষপাতী নই; কিন্তু এ কথা ভুলিতে পারি না, তাঁ'র কবি-জীবনের সব চেয়ে বড় অপরাধ,—দানের সংযমকে প্রাণের সঙ্কোচ ভাবা! বিকাশ-স্পৃহাকে ধনের কোঠা হইতে নিঃশেষে তুলিয়া মনের প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে ছাড়িয়া দেওয়া! এ কথা নিশ্চিত, চিত্তকেই বিত্তজ্ঞান-প্রকৃতি ভারতসঙ্গীতের কবিকে এক দিন দেশবাসীর দ্বারে ভিখারীর ন্যায় উপস্থিত করিয়াছিল; আবার এই স্বভাবের প্রভাবই সাধারণের নিকট তাঁ'কে রাজপূজা পাইবারও অধিকার দিয়াছিল! অনন্যসাধারণ চরিত্রের এ রহস্যগুলি যদি কেহ না বুঝেন, আমাদের দেশে বৃথায় তবে কবি জন্মগ্রহণ করে; কর্ম্মী বৃথায় ভিখারী বনিয়া জাতিকে রাজাভরণে সাজায়! হেম বাবুর জীবনে অমার্জ্জনীয় ত্রুটি-প্রমাদও আছে। মন্মথ বাবুর সত্যনিষ্ঠা সে সব দেখাইতে ছাড়ে নাই। তবে সে কলঙ্ক আমাদের হেমচন্দ্রের চির-পূর্ণিমায় কখনও গ্রহণ লাগাইতে পারিবে না; কিন্তু সেই মধুপূর্ণিমায় মোহন মুরলী মন্মথনাথের 'হেমচন্দ্র' বঙ্গসাহিত্যের আকাশকে প্লাবিত করিয়া রাখিবে।

শ্রীপ্রমথনাথ রায়চৌধুরী।

প্রবাসে দাসত্ব

গেল বছর ঠিক এই সময় গিয়েছিনু কল্‌কাতায়,
এ বছরও তাই মন আমার—থাক্‌তে চায় না আর হেথায়।
যতই বুঝিয়ে মনকে বলি ছুটী পাব না এখন আর,
ভিত্‌, বিত্‌, হ'য়ে ছুটীর তরে গেল কানুন দরবার,
লিখ্‌লেন তার কোণে মনিব, "কানুন তোমার দরখাস্ত নয়"।

শ্রীঅনিলনাথ রায়চৌধুরী।



যুক্তরাজ্যের নূতন রণতরী "কলোর‍্যাডো"

যুক্তরাষ্ট্রের এই রণতরী আকারে বৃটিশ রণতরী "হুড" অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ক্ষুদ্র। হুডের ওজন ইহার ওজন অপেক্ষা



ওজন—৩২ হাজার ৬ শত টন বেগ ২১ ৭৭ নট (নট – ২০২৫ গজ) অর্থাৎ প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ২৫ মাইল ১৬ ইঞ্চ ব্যাসযুক্ত ৮টি এবং ৫ ইঞ্চ ব্যাসযুক্ত ৫টি তোপ ইহাতে বসান হইয়াছে

৯ হাজার ৮ শত টন অধিক। কিন্তু হুড প্রকৃতপক্ষে প্রথম শ্রেণীর রণতরী নহে, ইহাকে ক্রুজার বলাই সঙ্গত। অস্ত্র-শস্ত্রসজ্জায় কলোর‍্যাডো জগতে অতুলনীয়। কারণ, ইহার তোপগুলির ব্যাস ১৬ ইঞ্চ, বৃটিশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রণতরী "কুইন এলিজাবেথ" এবং "রয়াল সভারেণ"এর রণসজ্জা ১৫ ইঞ্চ তোপ। বিশেষতঃ কলোর‍্যাডো যে ভাবে গঠিত, তাহাতে শত্রুর আক্রমণে ইহা সহজে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে না। ইহার অবয়ব অতি কঠিন ও স্থূল ইস্পাতে নির্ম্মিত। ইহার যে অংশ জলের নীচে থাকে, তাহার নির্ম্মাণে এরূপ কৌশল অবলম্বন করা হইয়াছে যে, টর্পেডোর আঘাতে সহজে সে স্থান বিদীর্ণ হইবে না। কলোর‍্যাডো সম্প্রতি য়ুরোপে সফর করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। য়ুরোপের বিশেষজ্ঞগণ সকলেই একবাক্যে ইহার নির্ম্মাণকৌশলের প্রশংসা করিয়াছেন।

কুকুরের আরাম-গৃহ

কুকুরকে সুখে-স্বচ্ছন্দে রাখিবার জন্য য়ুরোপ ও আমেরিকায় নানাপ্রকার ব্যবস্থা আছে। সম্প্রতি মিল্‌ওয়াকী প্রদেশের এক ব্যক্তি কুকুরের বাসের জন্য বাংলো ফ্যাসানের ঘর তৈয়ার করিয়া দিয়াছেন। এই ঘরে আলোক ও উত্তাপের বন্দোবস্ত আছে গৃহের মধ্যে দুইটি "তাক" আছে। উপরের তাকে কুকুরের শয্যা। দরজার ভিতর দিয়া ঘরের মধ্যে কুকুর প্রবেশ করিবামাত্র আপনা হইতে বিদ্যুতের আলো জ্বলিয়া উঠিবে। কুকুর উপরের তাকে উঠিবামাত্র আলোক নির্ব্বাপিত হইবে। দরজা এমনই কৌশলে নির্ম্মিত যে, উহা খোলা ও বন্ধের সহিত আলোক ও উত্তাপ প্রয়োজনমত নির্গত হইবে।



বামের চিত্রে কুকুরের শয়ন করিবার ব্যবস্থা; দক্ষিণে আলোক ও তাপনিয়ামক যন্ত্র

হৃদ্‌রোগ-নির্ণায়ক যন্ত্রে সূক্ষ্ম আবিষ্কার

অবস্থা—কোথায় কি ত্রুটি আছে ধরিয়া ফেলেন। সম্প্রতি মার্কিণ পুলিস যাত্রীর বাক্স-পেটরার উপর ঐ যন্ত্র লাগাইয়া নিষিদ্ধ তরল পদার্থ (মদ্যাদি) তাহাদের মধ্যে লুক্কায়িত আছে কি না, তাহা পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কোন সুটকেস্, ব্যাগ প্রভৃতির উপরিভাগে যন্ত্র বসাইয়া দুই চারিবার নাড়িয়া দিলে, তরল পদার্থের টল্ টল্ জাতীয় শব্দ কর্ণগোচর হইবেই। তখন আধার খুলিয়া পর্য্যবেক্ষণ-কার্য্য নিঃসন্দেহ করা যাইতে পারে। নিষিদ্ধ সুরা প্রায়ই গোপনে ভিন্ন স্থান হইতে আনীত হয়, অথবা অন্যত্র রপ্তানী করা হইয়া থাকে বলিয়া মার্কিণ-পুলিস ডাক্তারী শাস্ত্রের শরণাপন্ন হইয়াছে।



ষ্টেথস্কোপ সাহায্যে অনুসন্ধান করিতেছে

বিচিত্র টেবল

জনৈক প্রসিদ্ধ ইতালীয় সূত্রধর ১২ বৎসর ধরিয়া এক বিচিত্র টেবল প্রস্তুত করিয়াছে। উহার উপরিভাগ ৪বর্গ ফুট। বিবিধ বর্ণের কাষ্ঠ দ্বারা এই টেবল নির্ম্মিত। মানুষের আকৃতিও খণ্ড খণ্ড কাষ্ঠের দ্বারা উহার স্থানে স্থানে করা হইয়াছে। টেবলে দর্পণ সংযুক্ত করায় উহা ৮ ফুট উচ্চ হইয়াছে। সূত্রধরের শিল্প-নৈপুণ্য এই বিচিত্র টেবলে সপ্রকাশ।



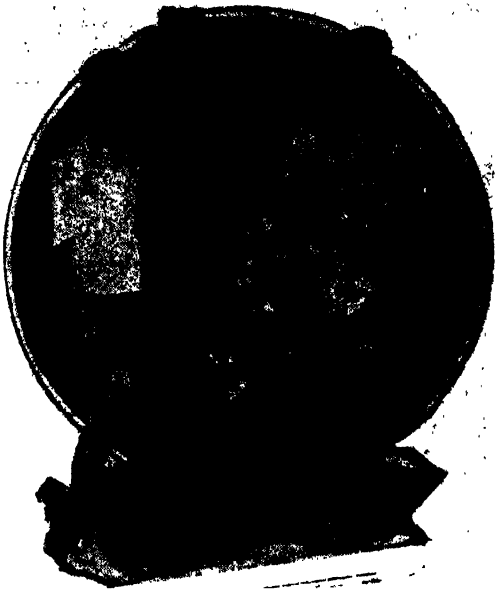
বে-তার বৈদ্যুতিক দীপ-শলাকা

যাহারা চুরুট বা চুরুটিকায় অভ্যস্ত, মোটর যানে গমনকালে দিয়াশলাই দ্বারা উহা ধরাইয়া লইতে অনেক সময় তাঁহাদিগকে মোটর থামাইতে হয় বা নানা অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, এই সকল ধূমপায়ীর সুবিধার জন্য আমেরিকায় এক প্রকার বৈদ্যুতিক দীপশলাকা নির্ম্মিত হইয়াছে। একটি চোঙ্গার আকারবিশিষ্ট আধারের দুই দিকে সূক্ষ্মাগ্র কার্ব্বণ আছে। আধারের উপর একটা টিপিবার যন্ত্র আছে। উহা এমনই বৈজ্ঞানিক কৌশলে সন্নিবিষ্ট যে, উপরে চাপ দিবামাত্র উপরের সূক্ষ্মাগ্র কার্ব্বণ তলদেশস্থ অনুরূপ কার্ব্বণএর সহিত অকস্মাৎ মিলিত হয়। কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই দুই দিকের সূক্ষ্মাগ্রভাগ আগুনের মত লাল হইয়া উঠে। সেই সময় ছিদ্রপথের সাহায্যে সেই আগুনে চুরুট অথবা চুরুটিকা অনায়াসে ধরাইয়া লওয়া যায়। ইহাতে তারের সমাবেশ নাই। কার্ব্বণই চুরুট ধরাইবার অগ্নি-উৎপাদনের পক্ষে পর্য্যাপ্ত।



মার্কিণে প্রাচ্য

ব্রহ্মদেশে এক প্রকার



আধুনিক প্রাচ্য ক্রীড়া—চীন-লু

আছে, তাহাব নাম 'চীন-লু'। ব্রহ্মেব বালকগণ এই ক্রীড়াব অনুবাগী। তাহাদেব ক্রীড়া-নৈপুণ্যে মুগ্ধ হইয়া মার্কিণগণ এই ক্রীড়াপদ্ধতি এখন আমেরিকায় প্রচলিত কবিয়াছে। বেতেব বল পা ও জানুব দ্বাবা ঊর্দ্ধদেশে উৎক্ষিপ্ত কবিয়া এই খেলা খেলিতে হয়। ইহাতে শবীবেব অঙ্গ প্রত্যঙ্গেব চালনা হয়। মার্কিণ বালকগণ এই খেলাব ভক্ত হইযা উঠিতেছে। বয়স্কগণ তাহাদেব খেলা দেখিবাব জন্য ক্রীডাস্থলে সমবেত হইয়া থাকেন। এই ক্রীডায় যথেষ্ট আমোদ আছে।

যুগ্মশৃঙ্গ-বেহালা

বেহালা বাজাইবার সময় যদি যন্ত্রের সহিত দুই মুখবিশিষ্ট শৃঙ্গ (horn) সন্নিবিষ্ট কবা যায়, তাহা হইলে বেহালাব স্বব বহুদূব পর্য্যন্ত শ্রুতিগোচব হইতে পাবে। সুরেরও তাব-তম্য তাহাতে হইয়া থাকে। এই শৃঙ্গ অনেকটা রেডিও যন্ত্র-সংযুক্ত শৃঙ্গের আকারবিশিষ্ট।

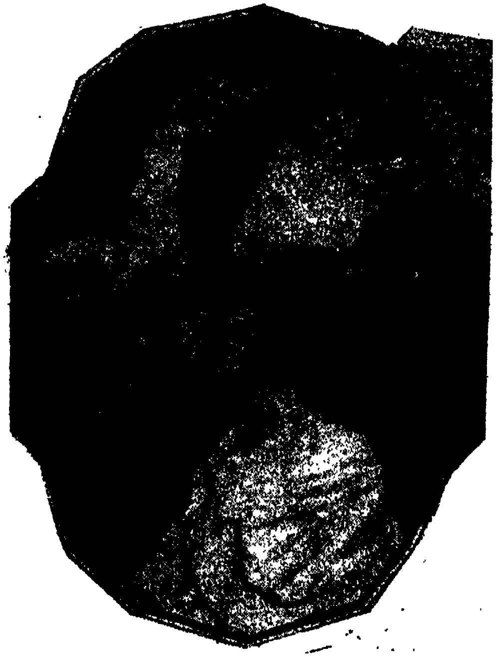


যুগ্মশৃঙ্গ-বেহালা

ছোট্ট নলটি বাদকের কানের কাছে থাকে। ইহার সাহায্যে বাদক ইচ্ছানুসারে বেহালার তন্ত্রীতে ছড়ির আঘাতে সুরের হ্রাস-বৃদ্ধি করিয়া লইতে পারেন। এই যুগ্মশৃঙ্গ-বেহালা বাজাইতে বাদকের কোনও অসুবিধা হয় না। এক স্থান হইতে অন্যত্র লইয়া যাইবার সময় যে আধার ব্যবহৃত হয়, তাহাও অসুবিধাজনক নহে।

আগামী শতাব্দীর শিরোভূষণ

একবিংশ শতাব্দীর প্রথম বৎসরে, বসন্ত ঋতুতে প্যারীর



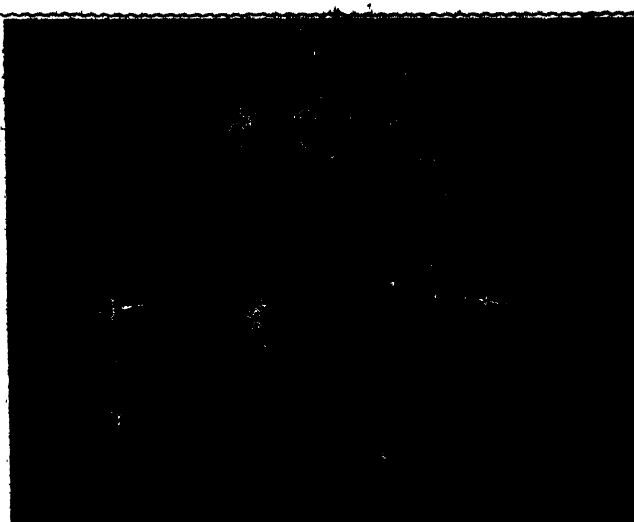
আগামী শতাব্দীর বিলাসিনীদিগের টুপী

মহিলাবা কিরূপ শিরোভূষণ (টুপী) পরিধান করিবেন, তাহার নমুনা কোনও বল-নৃত্যসভায় প্রদর্শিত হইয়াছে। টুপীতে প্রচুর পালক ও পত্র-বল্লরীর সমাবেশ থাকিবে। এই পালকগুলি টুপীপরি-হিতার মাথার চারিদিকে সুন্দররূপে প্রলম্বিত হইয়া পড়িবে। প্যারীর বিলা-সিনীরা এইরূপ টুপী আগামী

শতাব্দীর প্রারম্ভে পরিধান করিয়া সভ্যজগতে বিলাসিতার প্রচার করিবেন।

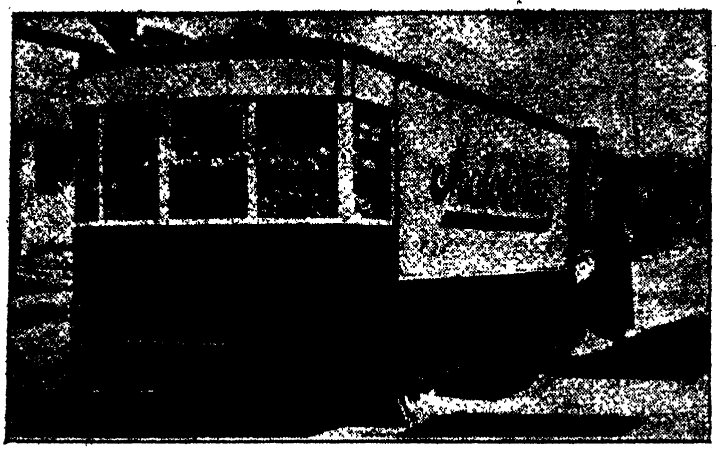
মোটোটেরিয়া বা মোটরে মুদিখানা

মোটোটেরিয়া: একখানি প্রকাণ্ড মোটর-যান। ইহাতে গৃহস্থের প্রয়োজনীয় ও মুদির দোকানে প্রাপ্তব্য প্রায় যাবতীয় পদার্থই আছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের নানা স্থানে এই ভ্রাম্যমাণ মুদির দোকানগুলি রাজপথে যাতায়াত করিতেছে এবং গৃহিণীগণ গৃহে বসিয়াই আবশ্যক দ্রব্যাদি ক্রয় করিতেছেন।

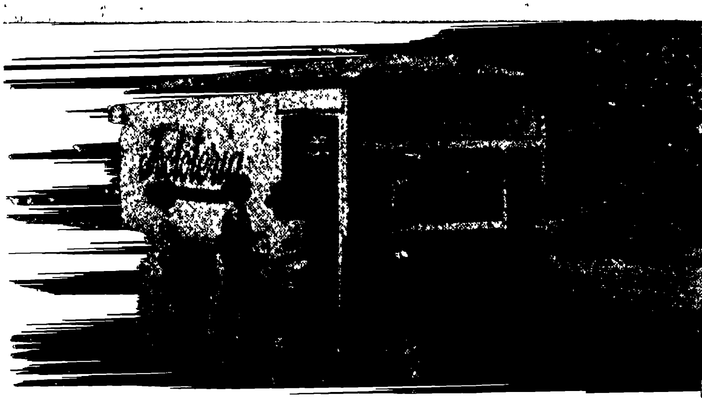


দোকানের পশ্চাদ্ভাগে কাচের আবরণ—সজ্জিত দ্রব্যাদি বাহির হইতেই দেখা যায়

যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিদিন ৪ কোটি ২০ লক্ষ ডলার অর্থাৎ প্রায় ১৫ কোটি টাকা গৃহস্থের বাজার-খরচ জন্য ব্যয় হইয়া থাকে। সম্ভবতঃ মোটোটেরিয়া এই বিপুল দ্রব্য-সম্ভার গৃহস্থের দ্বারে আনিয়া দিবে।



মোটোটেরিয়ার বাহ্যিক দৃশ্য



খড়ের নৌকা

টিটিকাকা হ্রদের তীরবর্ত্তী প্রদেশে যে সকল পেরুভীয় 'ইণ্ডিয়ান' বাস করে, তাহারা বার্লি খড় লইয়া নৌকা প্রস্তুত করে। বার্লি তৃণদণ্ডগুলির মধ্য হইতে দীর্ঘাকার খড়গুলি বাছিয়া লইয়া এমন ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট করা হয় যে, জল কোনও মতে নৌকায় প্রবেশ করিতে পারে না। এই খড়ের নৌকা লঘুভার। এক জন লোক অনায়াসে উহা বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারে। পেরুভীয়রা এই নৌকা-যোগে টিটিকাকা হ্রদের [illegible] উত্তীর্ণ হইয়া থাকে। এই নৌকার নাম 'বাল্সা'। বাল্সা ২১ মণ [illegible] ভার বহন করিতে পারে। এই নৌকা [illegible] অধিক [illegible]



বাল্‌সা নৌকাযোগে পেরুভীয়গণ হ্রদ পার হইতেছে

তরঙ্গের আঘাতে এত দুলিতে থাকে যে, সমুদ্রচর প্রবীণ নাবিকেরও সমুদ্রপীড়া জন্মিয়া থাকে। তবে নৌকাগুলি বড়ই নিরাপদ বলিয়া উহার বহুল প্রচলন আছে। টিটিকাকার জল এমন শীতল যে, সাঁতারে অত্যন্ত দক্ষ ব্যক্তিও জলে পড়িলে সাঁতার দিয়া কূলে পৌছিতে পারে না।

চিনির বায়ুতাড়িত কল ও মিছিরির পুষ্পপাত্র

সান্‌ফ্রান্সিস্কো হোটেলের প্রধান পাচক চিনির সাহায্যে একটা বায়ুতাড়িত কল (wind-mill) ও মিছিরি হইতে একটা গোলাপের পুষ্পপাত্র নির্ম্মাণ করিয়াছে। বায়ুতাড়িত কলটি প্রাচীন ওলন্দাজ স্থপতিশিল্পের আদর্শে নির্ম্মিত। চিনির দ্বারা নির্ম্মিত হইলেও স্থপতি-শিল্প-নৈপুণ্যের বিশিষ্ট প্রকাশ ইহাতে দেখিতে পাওয়া



চিনির কল ও মিছিরির গোলাপাধার

যাইবে। মিছিরির গোলাপাধারটি আরও চমৎকার। গোলাপের পাপড়ি ও পাতাগুলি স্বাভাবিক বর্ণরঞ্জিত বলিয়া ভ্রম হইবে। গোলাপের বৃন্তটিও সবুজ বর্ণের চিনি হইতে নির্ম্মিত। পাচক-শিল্পীর নৈপুণ্য দেখিয়া অভিজ্ঞগণ বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন।

রাঙ্গা আলুর সুরাসার

দক্ষিণ-আফ্রিকার কৃষিবিভাগ হইতে প্রকাশিত একখানি পত্রিকায় উল্লিখিত হইয়াছে যে, মিঠা আলু বা রাঙ্গা আলু হইতে এক প্রকার সুরাসার প্রস্তুত হইতে পারে, তাহা জ্বালানী কাঠের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইবার উপযোগী। সাধারণ আলু অপেক্ষা এই আলুর চাষ সহজে হয় এবং প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন করা যাইতে পারে। ইহাতে শতকরা ৭৫ ভাগ জল ও ২৫ ভাগ শ্বেতসার ও শর্করা আছে। পক্ষান্তরে, সাধারণ আলুতে শতকরা ১৬ হইতে ২৪ ভাগ শ্বেতসার ও ৭৫ ভাগ জল আছে। এ কারণ ইহাতে ইন্ধনের উপযোগী সুরাসার প্রস্তুত হইতে পারে।

ক্ষমা

(Non-violence)

৪

৭। পঞ্চপাণ্ডবের ক্ষমা

এক্ষণে পাণ্ডবভ্রাতৃগণের চরিত্র যে অসামান্য ক্ষমাগুণে মণ্ডিত, তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

পিতা পাণ্ডুর স্বর্গগমনের পর হস্তিনাপুরে আগমন পূর্ব্বক যখন যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতা মাতা কুন্তীর সহিত রাজভবনে বাস করিতেছিলেন এবং ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণের সহিত নানারূপ বাল্যক্রীড়ায় কালাতিপাত করিতেছিলেন, তখন হইতেই ক্রূরপ্রকৃতি, দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন তাঁহাদের প্রতি হিংসাপরায়ণ হইয়া তাঁহাদিগকে বিনাশ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিল, এবং এই উদ্দেশ্যবশবর্ত্তী হইয়া ভীমসেনকে কালকূট ভক্ষণ করাইয়া অচেতন অবস্থায় লতাপাশে বন্ধন পূর্ব্বক জলে নিক্ষেপ করিয়াছিল। ঘটনা জানিতে না পারিয়া মাতা কুন্তী যখন দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক ভীমসেনের বধ আশঙ্কা করিয়া ব্যাকুলা হইয়াছিলেন, তখন বিদুর আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন,—

"মৈবং বদস্ব কল্যাণি শেষসংরক্ষণং কুরু।
প্রত্যাদিষ্টো হি দুষ্টাত্মা শেষেঽপি প্রহরেৎ তব ॥"

হে কল্যাণি! আপনি এরূপ কথা ব্যক্ত করিবেন না, অবশিষ্ট পুত্রগণকে রক্ষা করুন, কারণ, দুরাত্মা দুর্য্যোধন তিরস্কৃত হইলে আপনার অবশিষ্ট পুত্রগণকেও প্রহার করিতে পারে।

বিদুর যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য। বলবান্ দুর্জ্জনদিগের কার্য্যের প্রতিবাদ করিলে তাহাদের দুষ্টাগ্রহ বা জেদ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। সুতরাং তাহাদিগের অত্যাচার, উৎপীড়ন, দ্রোহ ইত্যাদি দুর্ব্বলের পক্ষে নীরবে সহ্য করাই উচিত। বিশেষতঃ দুর্য্যোধন অতিশয় ক্রূর, নীচাশয় ও চক্ষুর্লজ্জাবিহীন ছিলেন—

"ক্রূরোঽসৌ দুর্ম্মতিঃ ক্ষুদ্রো রাজ্যলুব্ধোঽনপত্রপঃ।"

তাই মহাকবি বলিয়াছেন,—"শাম্যেৎ প্রত্যপকারেণ নোপকারেণ দুর্জ্জনঃ"—"যেমন কুকুর তেমনি মুগুর"—কিন্তু এ বাক্য উভয় পক্ষের তুল্যবলস্থলেই প্রযোজ্য। এক পক্ষ দুর্ব্বল হইলে বলবান্ দুর্জ্জনের প্রতি প্রত্যপকার কিরূপে সম্ভবে? সেরূপ প্রত্যপকারচেষ্টা দ্বারা নিজের সর্ব্বনাশের পথই প্রশস্ত করা হয়। সুতরাং এরূপ স্থলে দুর্ব্বলের পক্ষে ক্ষমা (Non-violence) অবলম্বন করা ভিন্ন গত্যন্তর কি হইতে পারে? মহাত্মা গান্ধীও বলিয়াছেন যে, ক্ষমাগুণটি আধ্যাত্মিক শক্তি—(a moral force) ইহা শারীরিক পশুবল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইহার আন্তরিক অনুষ্ঠানে আপাততঃ নির্জ্জিতের মত বোধ হইলেও জয় অবশ্যম্ভাবী। আরও, প্রত্যপকার দ্বারা দুর্জ্জনের প্রশমনের কথা—কূট রাজনীতিরই অন্তর্গত—ধর্ম্মশাস্ত্র ঐরূপ কথা বলেন না। তাই ধর্ম্মের অবতার বিদুর কুন্তীকে দুর্য্যোধনের অত্যাচার নীরবে মুখ বুজিয়া সহ্য করিতে বলিলেন। ভীমসেন মৃত্যুমুখ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলে—ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরও বিদুরের কথার প্রতিধ্বনি করিয়া ভীমকে বলিলেন,—

"তূষ্ণীং ভব ন তে জল্প্যমিদং কার্য্যং কথঞ্চন।
ইতঃ প্রভৃতি কৌন্তেয়া রক্ষতান্যোন্যমাদৃতাঃ ॥"

নীরবে থাক,—এ সমস্ত বৃত্তান্ত কোন প্রকারে ব্যক্ত করিও না;—এখন হইতে নিজেরা অতীব সাবধানে পরস্পর যত্ন সহকারে রক্ষা করিতে হইবে।

এই ঘটনার পরও দুর্য্যোধন, কর্ণ ও শকুনি পাণ্ডবগণকে পুনঃ পুনঃ বিষপ্রদান ইত্যাদি নানা উপায়ে বিনাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু পাণ্ডবগণ তাহা জানিয়াও বিদুরের মতানুবর্ত্তী হইয়া ঐ সকল অত্যাচারে কোনওরূপ উষ্মা প্রকাশ না করিয়া নীরবে সহ্য করিতেন।

পাণ্ডবগণের 'ক্ষমা' শিক্ষার প্রথম হাতেখড়ি তখন হইতেই আরম্ভ হইল এবং তাঁহাদের জীবনব্যাপী নানারূপ অবর্ণনীয় উৎপীড়ন ও বিপদের মধ্যে উহা তাঁহাদের চরিত্রে যেরূপ ফুটিয়া উঠিয়াছিল,—তাহা ভারতবাসীমাত্রেরই পর্য্যালোচনা করা উচিত। ভীমসেন বলদর্পী—অযুত মাতঙ্গের মত বলশালী হইলেও (বলং হি ভীমস্য নাগাযুতসমং মহৎ—১৬২ অঃ আদি পঃ)—জতুগৃহদাহ হইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হইয়া বৈরনির্য্যাতন করিতে সম্যক্ সমর্থ হইলেও, ঐরূপ কর্ম্ম হইতে নিরত্ত ছিলেন।

ইহার পর কপট অক্ষক্রীড়ায় পাণ্ডবগণ পরাজিত। পত্নী দ্রৌপদী দুঃশাসন কর্ত্তৃক কেশাকৃষ্ট হইয়া সভায় আনীত, শত্রুকুল হইতে নানা ভাবে উপহসিত। ইহা অপেক্ষা মানুষের কষ্টকর অসময় আর কি কল্পনা করা যাইতে পারে? বলদৃপ্ত ভীমসেন এমনই কুপিত হইয়াছিলেন যে,—

"ক্রুদ্ধস্য তস্য স্রোতোভ্যঃ কর্ণাদিভ্যো নরাধিপ।
সধূমঃ সস্ফুলিঙ্গার্চ্চিঃ পাবকঃ সমজায়ত ॥"

তাঁহার কর্ণাদি ইন্দ্রিয়নিচয় হইতে ধূম, স্ফুলিঙ্গ ও শিখার সহিত অগ্নি উৎপন্ন হইতে লাগিল। যুগান্তকালীন কৃতান্তের ন্যায় তাঁহার ভ্রূকুটি-কুটিল মুখমণ্ডল দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিল। তখন ভীমের এই অবস্থা দেখিয়া স্থিরমতি যুধিষ্ঠির কি করিলেন?

"যুধিষ্ঠিরস্তমাবার্য্য বাহুনা বাহুশালিনম্।
মৈবমিত্যব্রবীচ্চৈব যোযমাস্বেতি ভারত ॥"

যুধিষ্ঠির বাহুসঞ্চালন দ্বারা মহাবাহু ভীমকে নিবারণ করত কহিলেন, —এরূপ কুপিত হইও না—নিঃশব্দে অবস্থান কর। অতঃপর ক্রুদ্ধ ভীমকে নিবারিত করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্রসমীপে উপস্থিত হইলেন। পুত্রস্নেহান্ধ হইলেও ধৃতরাষ্ট্র—যুধিষ্ঠিরের গুণে একান্ত মুগ্ধ ছিলেন। তিনি যুধিষ্ঠিরকে সমুচিত প্রশংসা করিয়া বলিলেন,—"যেখানে বুদ্ধি, সেইখানেই ক্ষমা,—অতএব তুমি দুর্য্যোধনাদির অত্যাচারে ক্রুদ্ধ হইও না,—পরন্তু শান্ত হও। উত্তম পুরুষগণ শত্রুকৃত বৈরাচরণ স্মরণ করিয়া রাখেন না, দোষ পরিহার পূর্ব্বক গুণ সমস্তই দর্শন করেন,—বিরোধ আশ্রয় করেন না। কেহ বৈরাচরণ করিলেও সৎপুরুষরা তাহা গ্রাহ্য করেন না। বিবাদস্থলে নরাধমরা কটূক্তি করিয়া থাকে,—মধ্যম পুরুষরা সেই পরুষবাক্য শ্রবণে তাহাদিগকে প্রত্যুত্তর করে, কিন্তু ধীর উত্তম পুরুষরা কেহ অহিত কঠোর বাক্য বলুক আর নাই বলুক, কদাচ তাহার প্রত্যুত্তর করেন না। সজ্জনগণ আত্মপ্রত্যয় লাভ করিয়া, নিত্য ও অনিত্য বিষয় অবগত হইয়া পরকৃত বৈরাচরণ মনে রাখেন না।"

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধৃতরাষ্ট্রের এই বাক্যই ক্ষমা বা non-violenceএর জয় উদ্ঘোষিত করিতেছে।

ইহার পর পাণ্ডবগণ অজ্ঞাতবাসকালে বিরাটরাজগৃহে কীচক কর্ত্তৃক দ্রৌপদীর নির্য্যাতনকালে যুধিষ্ঠিরের মতানুবর্ত্তী হইয়া যে ধৈর্য্য ও ক্ষান্তির পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। তাঁহারা শ্রীভগবান্ ও তাঁহার ন্যায় বিচারের উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করত ধীর ও সংযতভাবে সকল উৎপীড়ন সহ্য করিয়াছিলেন;—ধর্ম্ম-হীন পশুবল অতীব হেয় মনে করিয়া তাহা গ্রাহ্যও করেন নাই, তাহাতে অণুমাত্র ভীতও হয়েন নাই—তাহার ফলে বিজয়-লক্ষ্মী স্বয়ং বরমাল্য লইয়া তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন।

শ্রীভববিভূতি বিদ্যাভূষণ।

সভাপতির অভিভাষণ



আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

বন্ধুগণ,

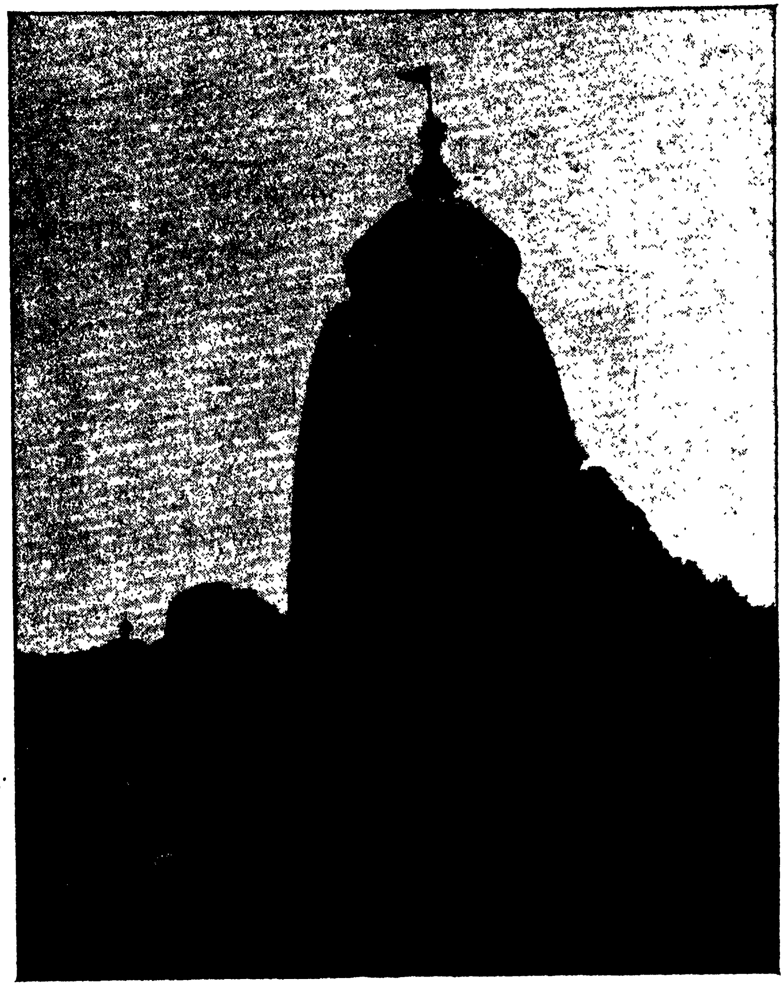
আপনারা যে আপনাদের প্রাদেশিক সমিতির বার্ষিক অধিবেশনের মত প্রয়োজনীয় সভায় উৎকলের বাহিরের এক জন লোককে সভাপতি হইবার জন্য আহ্বান করিয়া আনিয়াছেন, তাহাতে আমি যে আপনাকে সম্মানিত বোধ করিতেছি, তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু যে বিজ্ঞানাগারের নির্জ্জন পরিবেষ্টন-মধ্যে আমি স্বচ্ছন্দে থাকি, তথা হইতে আমাকে আনিয়া—জাতীয় জীবনের এই সঙ্কটসময়ে আপনাদের রাজনীতিক সম্মিলন পরিচালনার গুরুভার আমার স্কন্ধে ন্যস্ত করায় আমি যে বিশেষ কৃতজ্ঞভাব অনুভব করিতেছি, এমন বলিতে পারি না। বাস্তবিক আমি যেন শঙ্কিত ও স্বাভাবিক পরিবেষ্টনবিচ্যুত ভাব অনুভব করিতেছি; কারণ, আমি রাজনীতিক নহি। তাই আমি আশা করি, আপনারা আমার নিকট যাহা পাইবার আশা করিয়াছেন, তাহা না পাইলে আমাকে ক্ষমা করিবেন। অনেক সময় যাঁহারা খেলা দেখেন; তাঁহারা ক্রীড়ারত ব্যক্তিদিগের অপেক্ষা খেলার অধিক দেখিতে পাইয়া থাকেন এবং সেই কারণে বাহিরের লোক আমার উক্তির মূল্য অধিক হইতে পারে—ইহা মনে করিয়াই কেবল আমি এই অনভ্যস্ত কার্য্যের ভার বহন করিতে পারিতেছি।

একাধিক কারণে আমি উৎকল প্রাদেশিক সমিতিতে বাহিরের লোক। আমি বাঙ্গালী—উড়িষ্যা বাঙ্গালা নহে, অন্তত: ১৯১২ খৃষ্টাব্দ হইতে সরকারী হিসাবে উড়িষ্যা বাঙ্গালা হইতে স্বতন্ত্র। কিন্তু আবার আমার মনে হইতেছে—আমি আপনাদের পর নহি; পরন্তু

আপনাদেরই এক জন দীন ভ্রাতা। কারণ, উড়িষ্যার সহিত বাঙ্গালার সম্বন্ধ এত দীর্ঘকালাগত, এত ঘনিষ্ঠ, আধ্যাত্মিকতায় এত ওতপ্রোত যে, শাসনবিষয়ক আদেশে তাহা বিচ্ছিন্ন হয় না। ভারতের ইতিহাসের যে বিস্মৃতপ্রায় কুজ্ঝটিকান্ধকার যুগে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ—অচ্ছেদ্য ত্রয়ীরূপে একসঙ্গে উল্লেখিত হইত—সেই অতীত যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া—খৃষ্টপূর্ব্ব অষ্টম শতাব্দীতে যখন আর্য্যগণ এ দেশে আসিয়া বসবাস করেন, তখন ও পরবর্ত্তী যে বৌদ্ধযুগের অমর স্মৃতিচিহ্ন চারিদিকে ছড়াইয়া আছে—সে সময়; যে বিপ্লবের যুগে বাঙ্গালার শেষ স্বাধীন নরপতি মুসলমানের ভয়ে রাজ্যত্যাগ করিয়া সকলের আশ্রয় জগন্নাথের চরণে আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন, সেই যুগে; তাহার পর আধ্যাত্মিক উত্তেজনার ও ধর্ম্মোন্মাদনার যে যুগে নদীয়ার অবতার উড়িষ্যার ধর্ম্মগুরুরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেই যুগে ও তাহার পর খৃষ্টীয় এই বিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর বাঙ্গালা হইতে লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালী তীর্থযাত্রী দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া জগন্নাথের চরণে সকল দুঃখ নিবেদন করিতে ও জগন্নাথের দর্শনপুণ্যে আপনাদিগকে ধন্য জ্ঞান করিতে এই উৎকলে আগমন করিয়াছে। এই দীর্ঘ ৩০ শতাব্দীকাল উড়িষ্যায় ও বাঙ্গালায় আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ নিবিড়তায় অপরাজেয় রহিয়া গিয়াছে। খৃষ্টানদিগের কাছে জেরুসালেম যেমন পুণ্যতীর্থ—হিন্দুর, বিশেষতঃ বৈষ্ণব বাঙ্গালীর কাছে উড়িষ্যা তেমনই পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। কিন্তু উভয় প্রদেশের মধ্যে এই আধ্যাত্মিক সম্বন্ধই একমাত্র বন্ধন নহে। উভয় প্রদেশের মধ্যে জ্ঞান ও ভাষাগত সম্বন্ধ এবং গত ১০ বৎসরের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শাসনগত সম্বন্ধও ঘনিষ্ঠ ছিল। উড়িয়া ভাষা ও সাহিত্যের সহিত বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ—উভয় ভাষার ব্যাকরণ প্রায় একরূপ; কেবল বর্ণমালার আকারে ও উচ্চারণে উভয় ভাষা বিভিন্ন। আর শাসনব্যাপারে কেবল যে পূর্ব্বকালে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ একত্র গ্রথিত ছিল, তাহাই নহে; পরন্তু মোগল শাসনকাল হইতেও বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যা একই শাসনমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী "দাওয়ানী" পাইলে এই ৩ দেশ একসঙ্গে কোম্পানীর হস্তগত হয়। সম্পদে বিপদে, সুখে দুঃখে, আমরা একসঙ্গে থাকিয়া আনন্দবিষাদ ভোগ করিয়াছি। আশা করি, যত দিন যাইবে, তত পরস্পরের প্রতি আমাদের ভালবাসা, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস বর্দ্ধিত হইবে।

বাঙ্গালা আজ উড়িষ্যার জন্য গর্ব্বানুভব করে। কেবল বাঙ্গালা কেন—উড়িষ্যার কীর্ত্তির জন্য—তাহার গৌরবোজ্জ্বল অতীতের জন্য—তাহার স্বাধীনতাসংরক্ষণকল্পে প্রয়াসের জন্য—শিল্পে, সাহিত্যে ও আধ্যাত্মিক অনুশীলনে তাহার সাফল্যের জন্য সমগ্র ভারতবর্ষ আজ গর্ব্বানুভব করিতেছে। আমি এ সব বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নহি—তাই আমি কেবল এই পুণ্যপূত দেবক্ষেত্রের ইতিহাসের প্রশংসাবাদ করিয়াই নিরস্ত হইব। উৎকলের ভূমির প্রতি রেণু বিশ্বপতির প্রতি মানবের ভক্তির সৌরভে সুরভিত। ইহার ধর্ম্মক্ষেত্র চারি ভাগে বিভক্ত—পার্ব্বতীক্ষেত্র, অর্কক্ষেত্র, হরক্ষেত্র ও পুরুষোত্তমক্ষেত্র। সহস্র সহস্র বৎসর হইতে এই ভূমি লক্ষ লক্ষ ভক্তের চরণস্পর্শে পবিত্রিত। এই ক্ষেত্রে মানুষ প্রথম গঠনশীল বিশ্বের প্রতীক দারুব্রহ্মের উপাসনামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিল। এই ক্ষেত্রের বিহারে ও গুহায় বৌদ্ধধর্ম্মের সার সত্য বহুকাল নিরাপদ আশ্রয় লাভ করিয়াছিল। এই উৎকলের নগর ও বন্দরসমূহ জলপথবাহিত বাণিজ্যের কোলাহলে মুখরিত ছিল। ইহারই বন্দর তাম্রলিপ্ত হইতে ভারতীয়গণের দ্বারা পরিচালিত পোতসমূহ সাগরোর্ম্মি অবহেলায় অতিক্রম করিয়া প্রাচ্য দ্বীপপুঞ্জে ও অজ্ঞাত পূর্ব্বসাগরসমূহে গমন করিত। ইহারই সন্তানরা যবদ্বীপে ও বলিদ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া তথায় আর্য্য সভ্যতার যে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, তাহা প্রশান্ত মহাসাগর পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছিল। ইহারই নৃপতিদিগের বাহুবলে—ভারতের অন্যান্য ভাগ মুসলমান-শাসনাধীন হইলেও উড়িষ্যা স্বাধীনতার বিজয়-বৈজয়ন্তী—তাহার বন্দরে তরণীগুণস্থিত চীনাংশুকের মত—উড্ডীন রাখিয়াছিল। জগতের ইতিহাসে উড়িষ্যার স্থপতিদিগের তুলনা বিরল—তাহাদিগের স্থাপত্য-নিদর্শন উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি প্রভৃতি গুহামন্দির হইতে ভুবনেশ্বরের গগনচুম্বী বিরাট মন্দির পর্য্যন্ত নানা স্থানে বিদ্যমান। নদীবহুল দেশে কিরূপে দূরস্থিত পর্ব্বত হইতে

এই মন্দিরের বৃহৎ বৃহৎ শিলা-খণ্ড নীত হইয়াছিল, তাহা মনে করিয়া আজ দর্শকরা বিস্ময়-বিহ্বল হইয়া থাকেন। জগন্নাথের মন্দিরের কারুকার্য্য চিত্ত-বিনোদন। আর সাগর-সৈকতে ঊর্ম্মিমালার সান্নিধ্যে দণ্ডায়মান ভগ্ন কনার্ক-মন্দির হৃদয়ে যুগপৎ শ্রদ্ধা ও বিস্ময় সঞ্চার করে। এই সব কীর্ত্তি দেখিয়া বিদেশীয়রা বলিতে বাধ্য হইয়াছেন—ভারতীয়রা দানবের মত গৃহ নিশ্মাণ করিত এবং মণিকারের মত তাহার প্রসাধন করিত। এই উৎকলে বহু কবির আবিভাব হইয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে নারায়ণ পণ্ডিত, হলধর দাস, জগন্নাথ দাস, দীনকৃষ্ণ দাস বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। উপেন্দ্র ভঞ্জ একাধারে গীতি-কবিতায়, মহাকাব্যে, নাট্যকাব্যে ও ধর্ম্মসঙ্গীতে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। সরল দাসের মহাভারত বাঙ্গালায় অনূদিত ও বঙ্গে আদৃত হইয়াছে। আরও কত কবি ভক্তকল্পনার শ্রীবৃন্দাবনে চির-কিশোর কৃষ্ণের নিত্য নব প্রেমলীলা গান করিয়াছেন! সে সব স্মরণ করিলে আজিকার উৎকলবাসীরা আক্ষেপ করিয়া বলিতে পারেন,—"তাঁহারা আজ কোথায়? আমরা কেন তাঁহাদের যুগে জন্মগ্রহণ করি নাই?"



পুরী—জগন্নাথ দেবের মন্দির

আমার মত নীরস বিজ্ঞান-ভক্ত যে উৎকলের পূর্ব্ব-গৌরব সম্বন্ধে এত উক্তি করিতেছে, সেজন্য আপনারা আমাকে ক্ষমা করিবেন।

আজিকার কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে আমাদের নেতা মহাত্মা গন্ধীর কারা-মুক্তিতে আমাদের হৃদয়ের আনন্দ প্রকাশ না করিয়া আমরা থাকিতে পারি না। সেই সাধু পুরুষ কারারোধে বা মুক্তিতে বিচলিত হয়েন না। যখন তিনি কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন, তখন তিনি হৃদয়ে যে আশা পোষণ করিয়াছিলেন—স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি মুক্ত হইবেন—তাঁহার সে আশা যে পূর্ণ হয় নাই, ইহা তাঁহার দেশবাসীর পক্ষে লজ্জার কথা। আমরা জানি, তাঁহার অভাব আমরা কিরূপ মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছি, তাঁহার অনুপস্থিতিতে আমাদের মুক্তির সংগ্রামে আমরা কত পরাভব স্বীকার করিয়াছি। আর আজ যে তিনি মুক্ত হইয়া আসিয়া তাঁহার তূর্য্যনাদে আমাদিগকে মুক্তির পথে পরিচালিত করিবেন, ইহাতে আমাদের হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইয়াছে। তাঁহাকে অভিনন্দিত করা নিষ্প্রয়োজন; তাঁহার মুক্তিতে আমরা আমাদিগকেই

অভিনন্দিত করিতে পারি। আমার একমাত্র প্রার্থনা, আমরা যেন আমাদের নেতার উপযুক্ত শিষ্য হইতে পারি। উৎকলমণি গোপবন্ধু দাস প্রমুখ উড়িষ্যার যে সব স্বদেশভক্ত সুসন্তান দেশসেবার পুরস্কার-স্বরূপ নানারূপ ত্যাগস্বীকার ও লাঞ্ছনাভোগ করিয়া—স্বদেশ-বাসীর জন্য সমুচ্চ আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, আমি তাঁহাদিগকেও অভিনন্দিত করিতেছি। কিছু দিন হইতে দেশে যে উৎসাহের অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে, তাঁহাদের পুনরাবির্ভাবে সেই উৎসাহেরও পুনরাবির্ভাব হইবে, এমন আশা কি আজ করিতে পারি না?



ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মন্দির

দিয়া ভারত সরকারের ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে হয়—ব্যয়ের সঙ্কুলান করিতে হয়। এ বিষয়ে বাঙ্গালার অবস্থা সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয়। কারণ, মেষ্টনী বন্দোবস্তে বাঙ্গালার রাজস্বের দুই-তৃতীয়াংশ ভারত সরকারের প্রাপ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এ অবস্থায় যে অর্থাভাবে জাতির গঠনজন্য প্রয়োজনীয় সব কায বন্ধ রাখিতে হয়, তাহাতে বিস্ময়ের কারণ কোথায়? দেড় শত বৎসর ইংরাজ-শাসনের পর আজ বাঙ্গালার শতকরা ৫ জনের অধিক লোকের অক্ষর-পরিচয় নাই। জনগণ অজ্ঞতার অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। ১৮৭০

আপনারা অবগত আছেন, বঙ্গভঙ্গজনিত আন্দোলনের সময় মিষ্টার র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তিনি তাহার ফলে 'ভারতের জাগরণ' (Awakening of India) নামক পুস্তক ১৯১১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশ করেন। তাহাতে তিনি বিশেষভাবে এ দেশের আর্থিক অবস্থার আলোচনা করেন এবং বলেন, ভারতের সামরিক ব্যয়ের নয়-দশমাংশ বৃটিশ সাম্রাজ্যের জন্য করিতে হয়, সে ব্যয়ভার ইংলণ্ডেরই বহন করা কর্ত্তব্য। অর্থাৎ ভারতের অর্থে যে বিরাট বাহিনী পালন করা হয়—সে প্রধানতঃ এসিয়ায় ইংরাজের প্রাধান্য রক্ষা করিবার জন্য। গত জার্ম্মাণ যুদ্ধের সময় ভারত হইতে প্রায় সব শ্বেতাঙ্গ ও ভারতীয় সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল, তখন পুলিসের দ্বারাই ভারতে শান্তি রক্ষিত হইয়াছিল। লর্ড হার্ডিঞ্জ তখন বলিয়াছিলেন, রক্তমোক্ষণে ভারতবর্ষ শ্বেতবর্ণ হইয়াছিল। ইহাতেই ভারতশাসনের তত্ত্বকথা বুঝিতে পারা যায়। বর্ত্তমানে সামরিক ব্যয়েই ভারতের রাজস্বের অর্দ্ধাংশ নিঃশেষ হইয়া যায়; ফলে প্রাদেশিক রাজস্ব

খৃষ্টাব্দে পুনরুত্থান হইতে জাপান এ বিষয়ে এত দ্রুত অগ্রসর হইয়াছে যে, আজ জাপানের প্রায় প্রত্যেক অধিবাসীই লিখিতে ও পড়িতে পারে। যুরোপীয়-দিগের নিষ্ঠুর নাগপাশ হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়াই পারস্য দেশে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করিয়াছিল এবং মিশর সেই পথের পথিক হইয়াছে। ভারত সরকার তাঁহার বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা-বিষয়ক আইনে অনবরত বাধা দেওয়ায় আমার বন্ধু গোখলে মহাশয় প্রায় ভগ্নহৃদয় হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। বিস্ময়ের বিষয়, এক দিকে অর্থাভাবে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতি-সাধন করা হয় না—আর এক দিকে উচ্চ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার নামে নানারূপ ব্যয়সাধ্য অনুষ্ঠান করা হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপে বলা যাইতে পারে, সম্প্রতি ঢাকায়? ফলোয়ানীতে ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের গৃহ-নির্ম্মাণের প্রস্তাব হইয়াছে। এ দেশে উচ্চশিক্ষা বলিতে এখন যেন চূণসুরকী খরচ অর্থাৎ বৃহৎ বৃহৎ গৃহনির্ম্মাণ বুঝাইতেছে! আমাদের করুণাময় সরকার সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষাবিষয়ে কত অবহিত, তাহা কলিকাতা

বিশ্ববিদ্যালয়ের, বিশেষ বিজ্ঞান-কলেজের প্রতি তাঁহাদের ব্যবহারের আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। অর্থাভাবে আমাদের কাযকর্ম্ম প্রায় স্তম্ভিত হইয়াছে; আর আমরা যখন টাকা চাহি, তখন আমাদিগকে অতি সামান্য কিছু অর্থ প্রদান করা হয়। আমি দৃঢ়তাসহকারে বলিব যে, বিহার ও উড়িষ্যা সরকার প্রাসাদতুল্য গৃহনির্ম্মাণকল্পে যে ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন, সে টাকা কেবল প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের জন্য ব্যয় করা কর্ত্তব্য। এই যে প্রস্তাব, ইহা বিকৃতবুদ্ধির কার্য্য—সাধারণের টাকার এই অপব্যয় অসঙ্গত অপরাধ।

সামরিক বিভাগের ব্যয়ের পরই সিভিল সার্ভিসের বিষয়ে আমাদিগকে অবহিত হইতে হয়। এই আলালের ঘরের দুলাল চাকরীয়ারা কেবল "দেহি! দেহি!" রব তুলিয়া গগন-পবন পূর্ণ করিতেছেন। সত্য বটে, তিক্ত বটিকা মুখরোচক করিবার চেষ্টায় সিভিল সার্ভিসে ভারতীয়দিগকে যৎকিঞ্চিৎ প্রদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যখন লর্ড ইসলিংটনের সভাপতিত্বে কমিশন নিযুক্ত হয়, তখন আমরা সিভিল সার্ভিসে ও ইম্পিরিয়াল সার্ভিসসমূহে অধিকসংখ্যক ভারতীয়ের নিয়োগ চাহিয়াছিলাম। তাই সার হেনরী কটন আমাদিগকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "যে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে গেল, দেশের কোন কাযে আর তাহাকে পাওয়া যাইবে না।" এ কথা যথার্থ। ভারতীয় সিভিলিয়ানও আমলাতন্ত্র সরকারের অঙ্গ হইয়া যায়—তাহারও মনোভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। সে কেবল সরকারী কর্ম্মচারীর দিক হইতেই সব ব্যাপার দেখে। এক কথায় সে আর ভারতীয় থাকে না। এ দেশে যে দ্বিধাবিভক্ত শাসন-পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাতে ভারতীয় মন্ত্রীও এইরূপ কায করেন। ক্ষুদ্র ক্ষমতাগর্ব্বে গর্ব্বিত ভারতীয় সিভিলিয়ানকে দেখিলে আমার যত দুঃখ হয়, তত আর কিছুতে হয় না। প্রকৃত কথা এই যে, সিভিল সার্ভিস যে কালের উপযোগী ছিল, সে কাল গত হইয়াছে—কাযেই সে সার্ভিস এখন বাতিলের মধ্যে পড়িয়াছে। ভারতীয় সিভিলিয়ানকে বিবেকবুদ্ধি বিকৃত করিতে হয়—অন্নের জন্য বহু নষ্ট করিতে হয়।

বিজ্ঞবর এমার্সন এক স্থানে বলিয়াছেন, জনক জননী যদি প্রাপ্তবয়স্ক পুত্রকন্যাকে শাসন করেন, তবে তাহাদের হিতসাধন না করিয়া অহিতই করেন। এ দেশে সরকারের মনোগত অভিপ্রায়—রাজস্ব প্রদান কর, তাহার পর নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাক, আমরা তোমার সব কায করিয়া দিব, তোমরা কিছুই করিতে পাইবে না। যে সরকার স্বার্থসিদ্ধির জন্য আমাদিগকে অনন্তকাল নাবালক রাখিতে চাহেন, সে সরকার কিছুতেই স্বীকার করিতে চাহেন না যে, লালনকাল বর্দ্ধিত হইলে শিশু অক্ষমতাহেতু অসহায় হইয়া পড়ে।

মাদ্রাজের গভর্ণর সার টমাস মনরো ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে বড় লাট লর্ড হেষ্টিংসকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে অনেকগুলি স্পষ্ট কথা ও সারগর্ভ উক্তি ছিল। তিনি লিখিয়াছিলেন :—

"দেশের লোকের অবস্থা দেশীয় নৃপতিগণের অধীনে যেরূপ ছিল, তদপেক্ষা উন্নত হইবে কি না, সে বিষয়ে আমার বিশেষ সন্দেহ আছে। শক্তির আতিশয্যহেতু বৃটিশ সরকার বিদ্রোহ দলিত করিতে ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রহত করিতে পারেন; এমন কি, সে সরকার প্রজাদিগকে যেরূপে রক্ষা করিতে পারেন, সেরূপে রক্ষা করা কোন ভারতীয় সরকারের পক্ষে সম্ভব ছিল না। বৃটিশ সরকারের আইনে ও প্রতিষ্ঠানে ভারতীয় প্রজারা দেশে অনাচার অত্যাচার হইতে যেরূপ অব্যাহতি লাভ করে, তাহা পূর্ব্বে অজ্ঞাত ছিল। কিন্তু যে মূল্যে এই সব ক্রয় করিতে হইয়াছে, তাহার তুলনায় এ সব তুচ্ছ। স্বাধীনতা, জাতীয় চরিত্র এবং যাহাতে জাতিকে সম্ভ্রমসম্পন্ন করে, সেই সকলের বিনিময়ে ভারতবাসী এ সব লাভ করিয়াছে। ইংরাজের ভারতীয় প্রজারা নির্ভয়ে যে যাহার ব্যবসার অনুসরণ করিতে পারে- বণিক, কৃষক সকলেই যে যাহার কাযের ফল সম্ভোগ করিতে পারে; কিন্তু ইহার অতিরিক্ত আর কিছুই লাভের আশা তাহারা করিতে পারে না—জীবজন্তুর মত তাহারা কেবল শান্তিতে থাকিতে পারে, আর কিছু নহে। তাহারা কেহই দেশে আইন করিবার অথবা শাসন বা সামরিক বিভাগে কার্য্যের অংশ লইবার আশা মনে পোষণ করিতে পারে না। যাঁহারা বড় চাকরীয়া, ভারতের লোক তাঁহাদেরই আদর্শে গঠিত হয়; যে স্থানে

সেরূপ লোক নাই, সে স্থানে সমাজের অন্যান্য স্তরে উৎসাহেরও অভাব হয়। ভারতের ইংরাজ-শাসিত সকল প্রদেশেই ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়; সে সব প্রদেশের অধিবাসীরা যতটা হীন, তত আর কোথাও নহে। যে স্থানে লোক সামরিক বিভাগে সুবাদার অপেক্ষা উচ্চ পদ লাভ করিতে পারে না এবং শাসনবিভাগে সামান্য বিচার বা রাজস্বসম্বন্ধীয় চাকরী করিয়া অসদুপায়ে কিছু অর্থলাভ মাত্র করিতে পারে, সে স্থানে চরিত্রের উন্নতি হইতে পারে না।"

তিনি লিখিয়াছেন :—"ইংরাজ কর্ত্তৃক ভারতবিজয়ের ফলে ভারতের লোক উন্নত না হইয়া অবনতই হইবে। বৃটিশ শাসনে ভারতবাসীরা তাহাদের দেশের শাসনকার্য্য হইতে যেরূপে অপসৃত হইয়াছে, আর কোন শাসনে সেরূপে অপসৃত হয় নাই।"

ঐতিহাসিক মার্শম্যান বলিয়াছেন :—

"লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময় হইতে এ দেশে ইংরাজের শাসনে ভারতীয় সমাজের উচ্চ স্তরে উচ্চাকাঙ্ক্ষার বিশেষ অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে—আমাদের শাসন-পদ্ধতিতে তাহাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষাপরিতৃপ্তির কোন উপায় নাই; তাহারা স্বদেশে অবসাদের পঙ্কে লুণ্ঠিত হয়।"

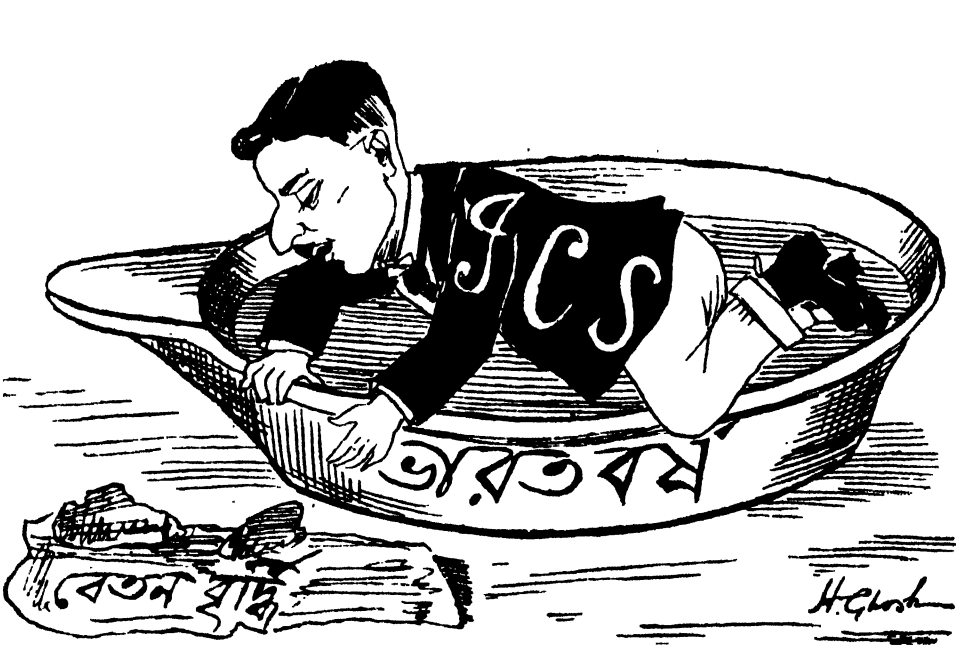
বর্ত্তমান শাসন অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে। ইহাতে আমাদের মনুষ্যত্বের বিকাশপথ বিঘ্নবহুল হয়। সার উইলিয়ম ভিনসেণ্ট ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র-সচিব ছিলেন। সরকারী চাকরীর বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া বিলাতে যাইয়া তিনি একটি সভায় এই শাসনের ত্রুটি প্রদর্শন করিয়া বলিয়াছেন, "দেশের জনগণ অজ্ঞতার অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে, সামরিক বিভাগে উচ্চ পদ না পাইয়া তাহারা সামরিক মনোবৃত্তি হারাইয়াছে।" কোন উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী বৃটিশ শাসনের ইহার অপেক্ষা অধিক নিন্দা করেন নাই।

এই সকল ব্যাধির একমাত্র ভেষজ—স্বরাজ। সেই স্বরাজলাভের জন্য আমরা বিশেষ চেষ্টা করিব এবং আমাদের সাম্প্রদায়িক বা অন্যবিধ সব ভেদ ভুলিয়া যাইব। *

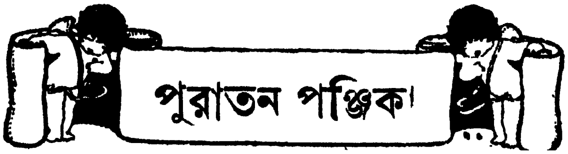
[ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়।

* উৎকল প্রাদেশিক সমিতিতে (২৮শে জুন, ১৯২৪) সভাপতির অভিভাষণের বঙ্গানুবাদ।



ভারতবাসী—"সিভিল সার্ভিস! বেতন যতই কেন বাড়াও না, ও আরও বাড়াইতে বায়না ধরিবে। সেটা উহার স্বভাব। একমাত্র উপায়—দেশের লোককে দেশের চাকরী দেওয়া।"



১১

ছুটী ফুরোল, স্কুল খুলল, বাঁচা গেল। স'বাজারের মোড়ের দোকান থেকে এক পয়সা দিয়ে এক পাত মাখম আনিয়ে চীনের বাড়ীর বার্ণিস করা জুতোয় ভাল ক'রে মাখিয়ে বই শ্লেট নিয়ে স্কুলেতে যাওয়া গেল। সে দিন আর স্কুল বসবার আগে উঠানে দৌড়োদৌড়ি নেই, পরস্পরের জুতোয় জুতোয় মিলনো,আমার চেয়ে যা'র জুতো জোড়াটি ভাল, তা'র উপর মনে মনে হিংসা, আর যা'র জুতো আমার চেয়ে একটু নিরেশ, তা'র পানে চেয়ে মনে মনে একটু গর্ব্ব। ক্লাস বসল, মাষ্টার মশাই এলেন, তাঁ'কে সবার প্রণাম; নজর তাঁ'র হাতের বেতের প্রতি, আর পায়ের প্রতি, জুতোর প্রতি নয়। এখনকার বাবাজীরা মাষ্টার ক'টাকার জুতো পায়ে দিয়েছে, তা নজর ক'রে দেখে, মাষ্টার পণ্ডিতের মাইনের খবর নেয়, হেডমাষ্টার হেঁটে স্কুলে এলে মনে মনে তাঁ'কে একটু অবজ্ঞা করে; বেচারীদের বিশেষ দোষ নেই; প্রহারের পাট উঠে গেছে, ছেলেদের উপর মাষ্টার যদি একটু চোখ রাঙালে, গোপাল অমনই ভ্যা ক'রে কেঁদে জানালে, আর মায়াময়ী পিসীমা বললেন, "অহহ! কোথাকা'র পোড়ারমুখো মাষ্টার, আমার ননীর বাছাকে বকে, জানে না মিন্‌যে—ক' টাকা বা মাইনে পায়!" বাড়ীতে এই শিক্ষা পেলে ছেলের আর কি সদ্‌গতি হবে? আমাদের বাপ-মা, ঠাকুরদা-ঠাকুরমা, পিসী-মাসী বলতেন, মাষ্টার পণ্ডিত গুরুলোক, বাপের মতন, তাঁ'দের মান্য করতে হয়, সুতরাং তাঁ'দের জুতো কাপড়ের দামের উপর নজর-ও পড়ত না, আর অন্ততঃ ১২ বছর বয়সের আগে মাষ্টারদের আবার যে মাইনে আছে এ কথা-ও মনে উঠত না। শিক্ষককে একটু ভয় করতুম, সঙ্গে সঙ্গে একটু ভক্তি-ও আসত। একটু ভয় না থাকলে সংসারী লোক ঈশ্বরকেই ভয় করে না, তা মানুষ কোন্ ছার। কলকেতায় কোটা বাড়ী হয়ে ব্রহ্মার পূজা উঠে গেছে, কিন্তু 'মা শীতলা' ব'লে মন্দিরে বাজিয়ে ডোমের পণ্ডিত বাড়ী ঢুকলে এক মুটো চাল দিতে-ই হবে, তখন আর ভিখিরী ফেরাবার অব্যর্থ মহৌষধ 'শুভাশৌচ হয়েছে' কথাটা মুখ দিয়ে বার হয় না। আমরা শিক্ষকদের ভয় করতুম, ভক্তি করতুম, ভালবাসতুম, যেমন বাবাকে মাকে ভাবতুম, ঠিক যেন তাই। তাঁ'রা-ও আবার (২।১ জন ছাড়া) আমাদের ঠিক সন্তানের মত-ই দেখতেন। আমাদের মদনমোহন তর্কালঙ্কারের 'শিশুশিক্ষা' পড়াতেন যে পণ্ডিত মহাশয়, তাঁ'র নাম ছিল নৃসিংহ পণ্ডিত; ব্রাহ্মণ, স্থূলকলেবর, দীর্ঘাকার, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, মুণ্ডিত মুখ আর মাথার ধবধবে চুলের ভার একটি খোঁপায় বাঁধা; কিন্তু প্রায় কোন ছেলে-ই তাঁ'কে পণ্ডিত মহাশয় ব'লে ডাকত না, কেউ বলত ঠাকুরমা, কেউ জ্যেঠাইমা, কেউ পিসীমা; তাঁ'র একটি সখের গালাগাল ছিল 'র‍্যাজলা,' আর এমনি লম্বা চড় তুলতেন, মনে হ'ত, এক চপেটাঘাতে-ই ভূমিসাৎ, কিন্তু নরম হাতখানি পিঠে পড়লেই পিঠ যেন জুড়িয়ে যেত; ছেলেরা কাঁদলে-ই তিনি কোলে ক'রে বেড়াতেন, পবিত্র দেহমন নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণের গাত্রে কত শিশু ছাত্র যে মূত্রত্যাগ করেছে, তা বলা যায় না; হায়! সে পণ্ডিত-ও নাই—সে পোড়ো-ও নাই! আর রমানাথ গুরুমশায়ের বেত ও তাড়িপাতের বাড়ি প্রহার; প্রৌঢ় বয়সে যখন আসর জমকে বসেছি, তখন-ও সেই সেকালের গুরুমশাই দেখা করতে এলে প্রাণটা যেন ভয়ে ছাঁৎ ক'রে উঠত; আহা! সে ভয়-ও কি আনন্দময়!

১২

'গুরুমশাই' জিনিষটা কি, তা এ কালের ছেলেদের একটু বুঝিয়ে বলা দরকার।

য়ুরোপে বোধ হয় জার্ম্মাণী-ই প্রথমে জনশিক্ষার প্রথা প্রবর্ত্তিত করলে, স্কুলে পড়তে যেতে-ই হবে, এই রকম আইন-ও হ'ল, বিনা দক্ষিণায় শিক্ষাদানের-ও ব্যবস্থা

হ'ল; ইংলণ্ড প্রভৃতি য়ুরোপের অন্যান্য দেশ-ও ঐ পথ সোজাসুজি বা একটু এঁকে বেঁকে অনুসরণ করলে; আমরা ব'লে উঠলুম, বা বা, কি আশ্চর্য্য, কি অদ্ভুত, কি মহত্ত্ব! বিদ্যার প্রতি কি বিপুল অনুরাগ! এমন ত কোথা-ও কখন দেখিনি,—পোড়া দেশ আমাদের! যখন রুস-জাপানে যুদ্ধ হয়, তখন জাপানের খবর পড়াটা সকলের একটা বাই হয়ে উঠেছিল; এক দিন কাগজ খুলে দেখি, জাপানীরা বড় চমৎকার জাতি, এরা পূর্ব্বপুরুষের পূজা করে। আমরা অমন ই বললুম, বা, কি আশ্চর্য্য! আমাদের যে পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ না ক'রে কোন-ও মঙ্গল কায, কোন-ও তীর্থযাত্রা, কোন-ও উৎসবক্রিয়া সম্পাদন করতে নেই, সে কথাটা একবার-ও মনে এল না; আসবে কেমন ক'রে? আপিসের বেলা হবার অছিলায় বাপ-মার একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধের পাট উঠিয়ে দিয়েছি, আর মেয়ের বিয়ের সময় বাড়ী বাঁধা দেবার দলিলে সই করব কি নান্দীমুখ শ্রাদ্ধের ভুর্জ্জি সাজাব, তাই ঠিক করতে পারিনি, কাযে-ই পূর্ব্বপুরুষের পূজা না ক'রে যে হিন্দুকে কোন কার্য্য-ই করতে নেই, এ কথাটা জাপানের খবর প'ড়ে-ও নিজের মনে উঠল না।

দরখাস্ত লিখতে আমাদের মত মজবুত জাত জগতে আর আছে কি না সন্দেহ; প্রথম ইংরাজী শিক্ষার আমল থেকেই—"Being given to understand that there is a vacancy in your honorable lordship's office ব'লে যে চাকরীর দরখাস্ত লিখতে শিখেছি, আজ লাট সাহেব থেকে পার্লিয়ামেণ্ট পর্য্যন্ত সেই দরখাস্ত লেখা-ই চলেছে। বিলাতে যখন আইন ক'রে জনশিক্ষা চলেছে, তখন আমারের দেশে জন-শিক্ষা চাই ব'লে গবর্ণমেণ্টকে দরখাস্ত পাঠান হ'ল। কি আইন-ই চাইতে শিখেছি আমরা, আর কি আইন-ই করতে শিখেছে ইংরাজরা! এক এক জন লাটের এক একটা আইন মজলিস্ আর ফি মজলিস ৪ শত ঘোড়ার জোরের ইঞ্জিন চালিয়ে মাসে মাসে আইন তৈরী করছে! ধান গম পাট চাষে হাজা শুকো আছে, এ পোড়া আইন বন্যাতে হেজে-ও যায় না, অনাবৃষ্টিতে-ও জ্ব'লে যায় না! বিদ্যাশিক্ষা ভিক্ষা করতে ভারতবাসী কি বাঙ্গালী যে কখন রাজার দরজায় গিয়ে 'জয় রাধে কৃষ্ণ' ব'লে ধামি হাতে ক'রে দাঁড়িয়েছে, এ কথা ত কখন শুনেছি ব'লে মনে পড়ে না। উচ্চশিক্ষা দিতেন পণ্ডিতরা টোল ক'রে ছাত্রদের অন্ন খাইয়ে, আর সাধারণের বৈষয়িক ও নৈতিক শিক্ষার জন্য নিযুক্ত হতেন গুরুমহাশয়।

গুরু মহাশয়কে সাধারণে তিনটি নামের মধ্যে যা হয় একটা নামে অভিহিত করতেন;—যথা, 'গুরুমশাই', 'মশাই' বা 'সরকার।' পশ্চিম বাঙ্গালায় অধিকাংশ গুরুমশাই আমদানী হতেন বর্দ্ধমান অঞ্চল হ'তে। গ্রামের আয়তন বুঝে প্রত্যেক পল্লীতে-ই এক হ'তে ৫।৭টি পর্য্যন্ত পাঠশালা বসত, এই কলকেতা সহরে-ও পাড়ায় পাড়ায় পাঠশালা ছিল; যে গৃহস্থের বাড়ীতে একটা দালান, উঠান ও গুরুমশাইকে শুতে দেবার একটা খালি ঘর থাকত, তিনি-ই প্রায় মাসিক ৪।৫ টাকা বা তার-ও কম বেতন, গ্রাসাচ্ছাদন ও থাকবার একটা ঘর দিয়ে এক জন গুরুমশাই নিযুক্ত করতেন। গুরুমশাইরা প্রায় কায়স্থ জাতি হতেন, ব্রাহ্মণ বা অন্য জাতীয় গুরুমশাই ছিলেন, কিন্তু অতি অল্পসংখ্যক। গৃহস্থরা বাড়ীতে যে বিদ্যালয় বসাতেন, তা'র নাম ছিল পাঠশালা, সাদা কথায় —পাঠশাল। সেকালে শালা স্থলে শাল শব্দ ব্যবহৃত হ'ত, যথা;—পাকশাল, ঢেঁকিশাল, ঘোড়াশাল, হাতিশাল; এখন-ও কোন কোন "শালা" বোনের বাস্তুতে এসে বাঁশগাড়ি ক'রে ভগ্নীপতির "শাল" হয়ে দাঁড়ান।

পাঠশালে পড়ত গৃহস্থের নিজের বাড়ীর ছেলেরা আর পাড়ার যত ছেলে-মেয়ে; এই কলকেতা সহরে-ই যখন মেয়ে স্কুলের এত ধূমধাম হয়নি, তখন আমি ভাই-বোনকে একসঙ্গে তাড়ি বগলে পাঠশালে যেতে দেখেছি। পাঠশালে বর্ণভেদ-ও ছিল না, স্বর্ণভেদ-ও ছিল না; জমীদার, মহাজন, সরকার, গোমস্তা, কারকুন, কেরাণী, মুহুরি, দোকানদার, কৃষক, মুটে, আবার ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, নবশাক, গোপ, কৈবর্ত্ত, দুলে, বাগ্দী সবার-ই ছেলে-মেয়ে এক দালানে বা উঠানে ব'সে লিখত। লিখা আরম্ভ হ'ত তালপাতে, শেষ হ'ত কাগজে—মধ্যে কলাপাত। প্রত্যেক পোড়োকে-ই

নিজের বসবার মত ছোট মাদুর কিনতে হ'ত, সেই মাদুরে লিখবার তালপাতাগুলি জড়িয়ে বগলে ক'রে পোড়োরা পাঠশালে যেত। কলকেতায় অবশ্য তাল-পাত কলাপাত কিনতে হ'ত, কিন্তু পল্লীগ্রামে কারুর বা বাড়ীর চাকর-বাকর, কারুর বা বাপ-খুড়ো গাছে উঠে কেটে দিত। কলম ছিল কঞ্চির, কল্মীর বা শরের; এই কল্মীশাক, যা আজকাল আমরা কলকে-তায় এক পয়সায় ছোট্ট একটি আঁটি কিনে সড়সড়ি ক'রে খাই, তারির-ই পাকা শক্ত ডাল থেকে যা কলম হয়, তা সর্ব্বোৎকৃষ্ট, কল্মীশাক পুকুরে হয়, এ কথাটি ব'লে দি; নইলে কলকেতার কোন গ্রাজুয়েট মাষ্টার মনে করতে পারেন, কল্মী হয় ত আইভির সঙ্গে বিলেত থেকে আমদানী। দোয়াত ছিল—মাটী, চীনেমাটী, দস্তা কিংবা পিতলের; আমার একটি সহপাঠীর পিত-লের দোয়াতের প্রতি এত লোভ ছিল যে, সেটি যে চুরি করিনি, ধর্ম্মভয়ে কি ধরা পড়বার ভয়ে, এখন ঠিক মনে হয় না। গুরুমশাই প্রথম শিক্ষা দিতেন তাল-পাতে দাঁড়ি টানা; তা'র পর একে একে ছেলেদের হাত ধ'রে নিজে ক খ লিখে পোড়োদের তা'র উপর দাগা বুলুতে বলতেন। তা'র পর ক্রমে ক কিও (ক্য) কর (ক্র) কল (ক্ল) আঙ্ক (ঙ্ক) আস্ক (স্ক) ইত্যাদি ফলা বানান। ফলা বানান শেষ হ'লে আরম্ভ হ'ত নাম লিখা। ঠাকুরদেবতার নাম, নিজের পিতৃপুরুষের নাম; 'গদাধর' 'হলধর' 'ভজহরি' থেকে সুরু ক'রে 'রুক্মিণীকান্ত' 'জনার্দ্দন শর্ম্মা' 'গোবর্দ্ধন গাঙ্গুলী' প্রভৃতি নানাবিধ বানানের নাম; যখন এ সব নাম লিখতে আরম্ভ করেছে, তখন ছেলেরা কলাপাতের ক্লাশে উঠেছে। এ দেশের কাগুজী মুসলমানরা পুরোনো কাগজ ভিজিয়ে তা'র মাড় বার ক'রে এক রকম কাগজ প্রস্তুত করতো, তা'র নাম ছিল বাঙ্গালা কাগজ; ছেলে-দের পাঠশালে লিখা থেকে কাছারী গদীর খাতাপত্র পর্য্যন্ত সেই কাগজে প্রস্তুত হ'ত। হাতিবাগানে যে জমীতে এখন ষ্টার থিয়েটার, সেইখানে অনেক কাগুজে মুসলমানের বাসা ও কারখানা ছিল। আতপ চাল হাঁড়িতে চড়িয়ে চুঁইয়ে তা থেকে লিখবার বাঙ্গালা কালি তৈরী লিখা সুরু হ'ত 'সেবকশ্রী' 'মহামহিম' 'পরম-পূজনীয়' প্রভৃতি পাঠ দিয়ে পত্র লিখা থেকে আর শেষ হ'ত 'দলিল' 'কওলা' 'কবচ' 'দাখিলা' 'দানপত্র' 'বন্ধকী-পত্র' লিখার পর। আর একটা লিখার যন্ত্র সে সময় ছিল বলতে ভুলে গিয়েছি, তা'র নাম 'রামখড়ি'; দেখতে কতকটা পটোলের মত লম্বা এক রকম নরম পাতর, মেঝেতে টানলে সাদা দাগ পড়ে; এখন-ও বোধ হয় বেণের দোকানে পাওয়া যেতে পারে। ছেলে পাঁচ বছরে পড়লে-ই গৃহস্থরা তা'র হাতে খড়ি দেওয়াতেন; শ্রীপঞ্চমী বা অন্য কোন একটা শুভদিনে হাতে-খড়ি হ'ত; পুরোহিত আসতেন, নারায়ণের পূজা, সরস্বতীর আরা-ধনা, হোমাদি সম্পাদনের পর ছেলেকে ঐ রামখড়ি ধরিয়ে তা'র হাত হ'তে প্রথম অক্ষর বার করা হ'ত; সে দিন গ্রাম্য গুরুমহাশয়-ও একটি বড় রকম ভোজ্যপাত্র পেতেন।

পড়বার একখানি বই ছিল, তা'র নাম 'শিশুবোধক'; ঐ নামে বটতলায় এখন-ও এক রকম বই পাওয়া যায়; কিন্তু সেগুলা খাঁটি 'শিশুবোধক' নয়, অপুষ্ট বিকৃতদেহ গর্ভস্রাব মাত্র। আসল শিশুবোধকে থাকত প্রথমে-ই অক্ষর-পরিচয়, পরে ফলা বানান, যুক্ত অক্ষর। এখন বাঙ্গালা স্কুলে-ও আলাদা দ্বিতীয় ভাগ পড়ান উঠে গেছে, তাই ছাত্রবৃত্তি পাশ করে-ও কোন কোন ছেলে 'তদ্ধেতু' বানান করে 'তদ্‌ধেতু' লিখে। যুক্ত অক্ষরগুলির সঙ্গে বালক ভালরূপে পরিচিত হবার পর তা'র কথাসাহিত্য পাঠ আরম্ভ হ'ত ঐ শিশুবোধক হ'তেই। কথা-সাহিত্যে প্রথম থাকত গঙ্গা-বন্দনা,—

"বন্দ মাতা সুরধুনী, পুরাণে মহিমা শুনি,
পতিতপাবনী পুরাতনী";

শিশুবোধকের এই 'বন্দ মাতা' শব্দটিকে-ই বঙ্কিম বাবুর "বন্দে মাতরম্‌" শব্দের আদি পুরুষ ব'লে মনে হয়। গঙ্গার বন্দনার পর আসত 'গুরুদক্ষিণা'; শ্রীকৃষ্ণ বলরাম বাল্য-জীবন বৃন্দাবনে গোচারণে ও ননীহরণে যাপন করেছেন, বিদ্যাশিক্ষা হয় নাই, মথুরার সিংহাসনে ব'সে সভাসদ্-গণের পাণ্ডিত্য দেখে তাঁদের মনে আপনাপন বিদ্যা-

রাজমর্য্যাদার অভিমান বিসর্জ্জন দিয়ে সাধারণ বালকদের সঙ্গে ব'সে সন্দীপন মুনির পাঠশালায় পাঠাভ্যাসে প্রবৃত্ত হলেন। পরমপূজনীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় জ্ঞান-পিপাসার এই আদর্শটিকে পরিত্যাগ ক'রে মেষ-পালক ডুবালের চরিত্র লিখে হিন্দুসন্তানগণকে আশী-র্ব্বাদ করলেন। বোধ হয়, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আশঙ্কা হয়েছিল যে, এই গল্প পড়লে দেশের বালক-গণের মনে একটা কুসংস্কার জন্মে যাবে, কারণ, ঐ গুরুদক্ষিণার শেষটা অলৌকিক ঘটনাপূর্ণ। রাজশিষ্যরা গুরুদক্ষিণা দিতে প্রার্থনা করায় সন্দীপন মুনি তাঁ'র জলমগ্ন ও কুম্ভীরভক্ষিত পুত্রের জীবন গুরুদক্ষিণাস্বরূপ দিতে আজ্ঞা করেন, আর শ্রীকৃষ্ণ কুম্ভীরের উদর চিরে গুরু-পুত্রের দেহকে পুনর্জ্জীবিত ক'রে দক্ষিণা দান করেন;—এটা ঘোরতর অসম্ভব কথা। কিন্তু ইংরাজরা অলৌকিক ও অসম্ভব ঘটনাপূর্ণ পরীর গল্পের পুস্তক নিজ নিজ শিশুপুত্রদের নির্ভয়ে পড়তে দেন, আর সেই পাপের ফলে চিরকাল যে কোন ইংরাজ নরনারী 'ফেয়ারী টেলে' বিশ্বাসবান্ থেকে আপন জীবন নষ্ট করে, এমন ত শুনা যায় না। তা'র পর দাতা কর্ণ, প্রহ্লাদচরিত্রাদি পাঠ। পরে ঐ পুস্তকে-ই পত্রলিখন-প্রণালী, দলিল, কবচ কবলাদি লিখনপ্রণালী থাকত; এর দ্বারা ছেলেরা নিজে নিজে-ই আপনাদের এটর্ণীগিরি আপনারা কর্বার মত কতকটা শক্তি লাভ কর্তে পার্ত। শেষে থাকত সব্যাখ্যা চাণক্য-শ্লোক; বড় হ'লে সভায় ব'সে দুটা সংস্কৃত নীতিবচন-ও দরকার-মত ছেলেরা আউড়ে দিত। ঐ শিশুবোধক-ই আবার অঙ্ক-পুস্তক; শটকে, কড়াঙ্কে, গণ্ডাকে, বুড়কে, সেরকে, মণকে, নামতা, সইয়ে, আড়াইয়ে, তা'র পর তেরিজ, জমাখরচ, গুণ, ভাগ, বাজারদরকষা, সুদকষা, কাঠা-কালি, বিঘেকালি, পুষ্করিণীকালি, ইটের পাঁজাকালি প্রভৃতি গৃহস্থ, দোকানদার, মহাজন, জমীদার, মুহুরী, গোমস্তা প্রভৃতির নিত্যপ্রয়োজনীয় ব্যবহারিক অঙ্ক সমস্ত-ই ঐ পাঠশালায় শেখান হ'ত। এখন ছেলেরা শেখে গরিষ্ঠ-সাধারণ-গুণনীয়ক আর কনিক্সেক্সান, তা'র পর এগার টাকা মাইনের চাকরের তের দিনের মাইনে

এক কথায় পাঠশালার পাঠ সমাপ্ত ক'রে যে ছেলে বেরুত, সংসারী লোকের জ্ঞাতব্য অনেক বিষয়-ই সে এক রকম মোটামুটি শিখে নিত। সকল ছেলে কিন্তু শেষ অবধি পড়ত না; মোটামুটি খানিকটা লিখতে পড়তে গুণতে শিখলেই চাষাভূষো ছোটখাট দোকানী কারিগর প্রভৃতি লোক তাদের পাঠশালা থেকে ছাড়িয়ে এনে নিজের নিজের কর্ম্মে শিক্ষায় ভর্ত্তি ক'রে নিত। পাঠশালায় ছেলেদের বেতন দিতে হ'ত মাসিক দু'পয়সা থেকে চার আনা পর্য্যন্ত। তা ছাড়া যে যার ক্ষমতা বুঝে গুরুমশাইকে প্রতি পালপার্ব্বণে, বিশেষতঃ পৌষসংক্রান্তি, শ্রীপঞ্চমী, দুর্গোৎসবের সময় একটা ক'রে সিধা, নারিকেল, গুড়, গামছা, কাপড় ইত্যাদি উপহার দিত। বাড়ীর গাছে লাউ, কুমড়া, বেগুন, কলা, এ সব ফল্‌লে বা পুকুরে মাছ ধরলে গুরুমশাই তার-ও একটা ভাগ পেতেন; ফলতঃ তখনকার গুরুমশাই, বৈদ্য, রজক, নাপিত, পুরোহিত-টুরোহিতকে গৃহস্থরা নিজ পরিজনের এক জন বলিয়া গণ্য করতেন। যে চাষার ছেলে পাঠশালা থেকে হাত তৈরী ক'রে হিসেব-দোরস্ত হয়ে বেরুত, পরিবারমধ্যে তা'র একটা বিশেষ আদর ও সম্মান লাভ হ'ত; সর্ব্বকনিষ্ঠ হ'লে-ও সে ভাত খাবার সময় বসবার জন্য একখানা পিঁড়ে আর ভাতের পাতে আলাদা একটু লবণ পেত; সংসারে তা'র খেতাব হোতো "দরবেরে" অর্থাৎ রাজ-কাছারিতে কাযের কথা কওয়ার উপযুক্ত। বিদ্যার যে একটা সম্মান আছে, বাঙ্গালার চাষার মেয়েরা-ও এ কথা জানত।

বৎসরের মধ্যে পাঠশালে সর্ব্বপ্রধান পর্ব্ব ছিল মকর সংক্রান্তির দিবস। পোড়োদের গঙ্গার বন্দনা গাইতে গাইতে গ্রাম প্রদক্ষিণ ক'রে সুরধুনীসলিলে বা অন্য নদী বা পুষ্করিণীতে স্নান। এই থেকেই বন্দমাতাদলের সৃষ্টি। আজকাল কলকেতায় বন্দমাতার দল বেরোয় বেলা ১২টার পর, সং সাজে আর গান গায় বুড়ো বুড়ো মুস্কো জোয়ানরা, কিসের কি একটা গন্ধ যেন মাঝে মাঝে বেরোয়, মাঝে যতটা দাঙ্গা-মারামারি হ'ত, এখন ততটা নেই। এই জনশিক্ষার ভিতর কম্পলসারী আইন-ও ছিল, কিন্তু ধরপাকড় ধাক্কা দেওয়ার কাযটা পুলিসের হাতে না

কথাটা পাঠশালে ছিল না, ছেলেটাকে কিছু না কিছু শিখতেই হবে, নয় গ্রাম ছেড়ে মামার বাড়ী, পিসীর বাড়ী পালাতে হবে। পোড়ো পাঠশাল কামাই করলেই গুরুমশাই অনুপস্থিত পোড়োর দৈহিক শক্তি বুঝে ৪ হ'তে ৬।৭টি বলবান্ পোড়োকে তা'কে ধ'রে আনতে পাঠাতেন, পোড়োরা ধরতে আস্‌ছে দেখে পলাতক লুকাল বাঁশঝাড়ের আড়ালে, সেখান থেকে তাড়া খেয়ে উঠল তেঁতুলগাছের উপর, পোড়ো-পাহারাওয়ালারা-ও পাছু পাছু গাছে উঠল (পুলিসের পাহারাওলার বাবার সাধ্য নেই যে তা করে), তেঁতুলগাছের ডাল বেয়ে আসামী ধরলে আমগাছের ডাল, সে ঝুল্‌ছে, আর ধরতে যারা গেছে, তা'রাও সঙ্গে সঙ্গে ঝুল্‌ছে, সকলের হাত ছেড়ে দিলে মাটীতে ঝম্প, সেখান থেকে এক দৌড়ে পোড়ো পড়ল পুকুরের জলে, খানিক ডুবে রইল, কেউ দেখতে পায় না, যেই উঠল ভেসে, অন্য পোড়োরা-ও পড়ল ঝাঁপিয়ে; সাঁতরে পুকুর পার হয়ে দুষ্ট ছেলে দৌড়ে নিজেদের রান্নাঘরে ঢুকে মায়ের আঁচল ধ'রে চীৎকার ক'রে কাঁদতে আরম্ভ করলে; মা বলে, 'ও বাবা, আজকে ছেড়ে দে, কাল আমি কোঁচড়ে জলপান বেঁধে দিয়ে পাঠশালে পাঠিয়ে দেব', গুরুমশায়ের পুলিস বলে, "মাসি, তুমি ও সব কথা বলো না, মশাই হুকুম দেছে, আমরা ধ'রে নিয়ে যাব, তুমি কথা কবার কে?" মা-ও কাঁদে, বেটা-ও কাঁদে, কিন্তু সে শুনে কে? দু'জনে দু'খানা হাত আর দু'জনে দু'খানা পা ধ'রে ঝোলাতে ঝোলাতে নে' গে' পাঠশালে পৌঁছে দিলে, বলে, "গুরুমশাই, গুরুমশাই, তোমার পোড়ো হাজির, এক দণ্ড ছুটী দাও জল খেয়ে আসি।" সুর ক'রে এই অপূর্ব্ব অমিত্রাক্ষর ছন্দ আবৃত্তি করার পর ধৃতকারী বালকরা মিনিট পাঁচ সাত আড়ালে গিয়ে ছুটাছুটি করবার অবসর পেলে, এইবার পলাতকের শাস্তি-বিধান।

১৩

অবাধ একজিকিউটিভ ক্ষমতা হাতে পেলেই অথরিটির কতকগুলি দোষ জন্মে যায়। অল্প মদ খেলে একটু নেশা হয়, তাতে স্ফূর্ত্তি আছে, উত্তেজনা আছে; শক্তিসঞ্চার-ও আছে; আর সেই মদ বেশী খেলে-ই লোক মাতাল হয়, তাতে বে-ফাঁস বাজে বকুনি আছে, ঝগড়া-মারামারি আছে, শেষ নর্দ্দামায় প'ড়ে ডোরা-টানা-ও আছে। অতিরিক্ত মদ খেয়ে যে বলে, আমি মাতাল হইনি, সে যেমন মিথ্যাবাদী, অতিরিক্ত ক্ষমতা পেয়ে যে বলে, উৎকট ব্যবহার করি না, সে তেমন-ই সত্য কথা কয় না। কবে ঘি খেয়েছেন, আজ-ও হাতে গন্ধ; অধিক শক্তি সঞ্চার ক'রে দুর্ব্বাসা প্রভৃতি মুনিরা শাপ দিয়ে ভস্ম ক'রে গেছেন ব'লে আজ-ও পাচক-পাঁউরুটীওয়ালা বামুনরা পৈতে ছেঁড়বার ভয় দেখান। মদের নেশা এক রাত্রি ঘুমুলে পরে কাটে, ক্ষমতার নেশা বোধ হয় যুগান্তরে-ও কাটে না। এ দেশে রাজপ্রতিনিধি বড় লাট সাহেবের-ও যে ক্ষমতা নাই, এক জন পুলিস-পাহারাওয়ালার-ও সে ক্ষমতা আছে; বড় লাট তাঁহার পদমর্য্যাদা ও সৎশিক্ষার প্রভাবে এবং আইনের বিধিতে-ও এক জন সামান্য লোককে-ও একটা শক্ত কথা বল্‌তে পারেন না, কিন্তু পাহারাওয়ালা সাহেব অনায়াসে এক জন পথচারী দেশীয় ভদ্রলোকের হাত ধ'রে টেনে নিয়ে যেতে পারে, কটু গালি দিতে পারে, প্রত্যুত্তরে যদি ভদ্রলোক তা'কে একটি মুষ্ট্যাঘাত করেন, তবে ধৃত ভদ্রলোকের ডবল সাজা হয়।

প্রভূত ক্ষমতা হাতে থাকায় গুরুমশাইরা ছাত্রদের দণ্ডবিধানের মাত্রা অত্যন্ত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। যেমন অতিশয় মূল্যবান্ ঘোড়াকে-ও তা'র অশ্বত্ব স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য মাঝে মাঝে চাবুকের চেহারা দেখাতে হয়, তেমন-ই ছাত্রদের বালকত্ব বজায় রাখবার জন্য শিক্ষকের হস্তে একগাছি বেত্র থাকা প্রয়োজন, এ কথা নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করি, কিন্তু বেত্রাঘাতে ছাত্রের চর্ম্মের ভিতর সৎশিক্ষা প্রবেশ করিয়ে দেওয়া যেতে পারে, এটা দানবীয় কল্পনা। অনেক গুরুমশাই ছাত্রদের শাসিত করতে গিয়ে নিজের মানবত্ব ভুলে যেতেন। তাঁ'দের ব্যাকরণের প্রথম সূত্র ছিল, বেত্র। ছেলেদের হাজরে লিখা বা গোণা পর্য্যন্ত ঐ বেত্র দ্বারা সম্পাদিত হ'ত। যে ছেলে প্রথম হাজির হ'ত, তা'র হাতের তেলোয় বেতের একটি নরম গোঁজা, তা'র নাম 'শন্তি'; দ্বিতীয় হাজিরের

হাতে এক ঘা, তৃতীয়ের দু'ঘা, ক্রমে ১২।১৪।২০।২৫ ঘা, আর লেটের মিনিটের পরিমাণে আঘাতের তীব্রতা-ও বর্দ্ধিত হ'ত। সাজা ছিল, হাতে পিঠে বেত্রাঘাত, চেয়ারের মত দেয়ালে পিঠ দিয়ে বসা, তা'র নাম ছিল চিলে বসা; এক পায়ে কান ধ'রে দাঁড়ান, ডান হাতের তেলোয় একখানি ইট দিয়ে নাড়ুগোপাল হয়ে বসা, বিছুটী গাছ জলে ডুবিয়ে কোমরের নীচের কাপড় তুলে তার-ই দ্বারা আঘাত ইত্যাদি ইত্যাদি। তা ছাড়া গুরুমশাইদের দোষ ছিল, ছেলেদের বাড়ী থেকে তামাক চুরি ক'রে আনতে বলা, শালা প্রভৃতি অবৈধ সম্বন্ধ পাতিয়ে গালাগাল দেওয়া প্রভৃতি। এগুলো কতকটা গুরুমশায়ের দোষ, কতকটা সময়ের-ও দোষ।

১৪

গবর্ণমেণ্টের কাছে আবেদন পৌছেছে যে, জনশিক্ষা দেশে চালাতে-ই হবে; গবর্ণমেণ্ট-ও একটা বৃষোৎসর্গের লম্বা ফিরিস্তি দিয়ে দিয়েছেন। ইংরাজী মেজাজ ছোট বাড়ী, কম লোকলস্কর এ সব দেখতে পারে না, তাই হাঁসপাতাল করবার সময় রুগীর ভাল ওষুধ, পুষ্টি ও রুচিকর পথ্যের যোগাড় করবার আগে প্রকাণ্ড একটা বাড়ীর বন্দোবস্তে বিপুল অর্থ ঢালা হয়, অনাথ-আশ্রমের জন্য-ও ঐ ব্যবস্থা, তার উপর আবার অনাথিনীদের টেনিস খেলবার জন্য হ্যারিসন রোডে বহুবাজার ষ্ট্রীটের মত রাস্তার উপর ১॥০ বিঘা ২॥০ বিঘা জমী কিনতে হবে। গরীবের ছেলেকে অমনি এনে পড়াবে, তা'রা এমন কিছু শিখে যাবে, যাতে চাষাগিরি, কারিগরী, দোকানদারী প্রভৃতি কায চালাবার মত কতকটা জ্ঞান লাভ হবে, এর জন্য ইন্‌স্পেক্টারের উপর ইন্‌স্পেক্টার, তা'র উপর ইন্‌স্পেক্টার, চাঁচাছোলা বেঞ্চি টেবল এ সব কেন রে বাপু, বেঞ্চিতে ব'সে পা ঝুলিয়ে "সাবান দিয়া গাত্র পরিষ্কার করিলে ত্বকে আর মলা মৃত্তিকা থাকিতে পায় না", ব'লে যে ছেলে 'স্বাস্থ্যসংস্থাপন' পড়বে, সে কি আর হাল ছোঁবে, রেদা ধরবে না দাঁড়ীপাল্লা হাতে করবে? শিক্ষা-বিভাগ যদি সচেষ্ট হয়ে বাঙ্গালা শুভঙ্করী আঁক ভাল ক'রে জানা, হস্তলিপিকুশল, কাশীদাস গুটিকয়েক গুরুমশাই তয়ের করতে পারেন, আর প্রাচীন "শিশু-বোধক" একখানা খুঁজে তা'র একটা পরিশোধিত সংস্করণ করাতে পারেন, তা'র পর একটু চেষ্টা ক'রে জন কয়েক স্বদেশানুরাগী শিক্ষিত ভদ্রলোকের দ্বারা মাস কয়েক মাত্র একটা প্রোপাগাণ্ডা কায চালান, তা হ'লে আবার সহরের এবং গ্রামের অনেক ধনী ও গৃহস্থ সেই গুরুমশাইকে নিযুক্ত ক'রে নিজ নিজ বাটীতে পাঠশালার পুনঃ প্রতিষ্ঠা করতে সম্মত হবেন। একেবারে বিনা বেতনে ছাত্র কোন কাযের কথা নয়; হাতের অক্ষর দোরস্ত করবার জন্য কাগজে লিখবার সময় 'বিদ্যা অমূল্য ধন' বেশ উপযোগী, কিন্তু কিছু মূল্য না দিয়া যা পাওয়া যায়, গ্রহীতার চক্ষুতে তা'র কোন মূল্য-ই নেই। এই কারণে-ই অন্ততঃ একটা তুয়ানি 'তৈলবট' না দিয়ে আত্মীয় স্মার্ত্তের নিকটে-ও কোন ব্যবস্থাপত্র নিলে সে "ব্যবস্থা" কার্য্যকরী হয় না। ব্যারিষ্টারকে-ও একটা 'ফি' না দিলে "অপিনিয়ানের" খাতির নেই। দু'পয়সা থেকে চার আনা মাসিক গুরুদক্ষিণা ধানভানানীর ছেলেরা-ও দিতে পারে, তবে দু' এক জন যারা নেহাত দিতে না পারে, তা'রা না হয় ফ্রি হ'ল। বৃত্তি বা স্কলারশিপ একেবারে বন্ধ, ঐ বৃত্তি পেতে পেতে-ই লিখাপড়া শিখে 'সাহেবের' দোরে টাকা টাকা ক'রে ছুটে যাওয়াটা সংস্কার হয়ে দাঁড়ায়।

এ দেশে পুরুষরা কারুর উপর বেশী রাগলে বড় জোর বলে, "জুতিয়ে তোর মুখ ভেঙ্গে দেব," লাথিমারাটা পুরুষের বড় অভ্যাস ছিল না; ও শাস্তিদানটা কলহপ্রিয়া কামিনীদেরই কস্ত ছিল, "মেয়ে লাথি মেরে দূর ক'রে দেব" এই গ্রাম্যকথাটাই তা'র প্রমাণ; এই জন্য ফুটবল খেলার মত লাথিমারা অভ্যাস করা বোধ হয় আমাদের দেশে ছিল না, সাধারণতঃ গ্রাম্যছেলেরা ভাঁটা খেলত, আপনা-আপনি ঘোড়দৌড় করত, হাঁডুডুডু, কপাটী, গাদি, নিজে ঘুড়িনাটাই তৈরী ক'রে উড়ান, মোগল-পাঠানের যুদ্ধাভিনয়, পুকুরে ডুবসাতার, চীৎসাঁতার প্রভৃতি শরীরের বলবর্দ্ধক অনেক খেলা খেলত। ছোট ছোট মেয়েরা-ও জল ডিঙ্গাডিঙ্গি খেলা খেলে, ঢেঁকিতে পা দিয়ে পকবক্তল লিয় চরকা

উপকার করৃত। এ ছাড়া পাঠশাল পালিয়ে পরের বাগান লুটতে, গাছে চড়া এক রকম ব্যায়রাম ছিল, এ জন্য সে দিন পর্য্যন্ত সহরের চেয়ে পল্লীগ্রামের বালক ও যুবকরা অনেকটা পুরুষত্বলাভ করৃত, এদের নাম-ও ছিল, অর্জ্জুন, জনার্দ্দন, কৃত্তিবাস, গোবর্দ্ধন, শঙ্কর, আর এখন যামিনী, কামিনী, নলিনীবাবুরা কলেজের হষ্টেলে শুয়ে শুয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে প্রাণায়াম অভ্যাস করেন, আর যাঁ'রা ক্রিকেট, ফুটবল, হকিটকি খেলেন, তাঁ'দের অভিভাবকদের সর্ব্বনাশ হয়, খেলার সরঞ্জাম যোগাতে আর শ্রান্তদেহের পিপাসা মেটাতে গোলাপী ঘোলের সরবতের জন্য প্রতি গ্লাসে আট আনা দিতে।

কাসুন্দীর হাঁড়ি মাঝে মাঝে রৌদ্রে না দিলে ভেপ্‌সে ওঠে, তাই পুরাতন পঞ্জিকার পাতাগুলি মাঝে মাঝে আধুনিক চিন্তার রৌদ্রে তাতিয়ে নিচ্ছি। [ক্রমশঃ।

শ্রীঅমৃতলাল বসু।

পল্লী-মঙ্গল

এস ফিরে আজি ধনীর দুলাল
পল্লীর কোলে তুমি,—
সেই ত তোমার চির-দিবসের
সাধের জন্ম-ভূমি।
অতীতের কত সুখে-দুখে-ভরা—
স্মৃতি দিয়ে ঘেরা বাড়ী,
কোন্ প্রাণে ছাড়ি, রয়েছ সুদূর
সহরে, বুঝিতে নারি!
তোমারি বিহনে শ্রীহীন পল্লী
দেখ না আসিয়া কত!
নাহি জানি হেথা বসতি তোমার
নহে কেন মনোমত।
হেথা নাহি বটে বিলাস-চাতুরী
হাব ভাব নগরীর,—
পল্লী-রাণীর নয়নে জড়িত
সরলতা অমরীর।
যত না রমণী নন্দন-বন-
মদিরা-পূর্ণ-হিয়া,
পতি-পুত্রেরে বেঁধেছে হেথায়
সুকোমল বাহু দিয়া।
বেশ-ভূষা তারা জানে না করিতে
চাহে নাকো চোরা-চোখে;
ঘরে ঘরে তারা লক্ষ্মী বলিয়া
ঘোষিত সকল লোকে।
শাঁখা সিন্দূরে মঙ্গল ক'রে
তারাই রেখেছে গেহ;
ধন্য, তা'দের জীবন ধন্য,
ধন্য তা'দের স্নেহ!
রুদ্ধ-বাতাস সহরে তোমার
মমতা কিসের তরে?
সেথাকার মায়া জানি কালো-ছায়া
এস ফিরে এস ঘরে।

হেথায় তোমার কত পুরুষের
নিহিত পুণ্য-দেহ;
তা'রা ত পারেনি যাইতে কোথাও
কাটায়ে পল্লী-স্নেহ।
জ্ঞানে মানে গুণে তোমা চেয়ে তারা
নাহি ছিল হীন কভু,
সোনার পল্লী ছাড়িয়া তাহারা
যায়নি কোথাও তবু।
কেন জানো তা'রা পল্লী ছাড়িয়া
যেতো নাকো যেথা সেথা?
স্নিগ্ধ পবন স্বরগ-সুরভি
বহিয়া আনে যে হেথা।
কল কল ভাষে পল্লী মায়ের
চরণ দুখানি চুমি,
গাহে যে তটিনী অমরার গীতি
উছলিয়া বন-ভূমি।
গুঞ্জরি নিতি বনে বনে হেথা
মত্ত ভ্রমর যত,
ফুল্ল কুসুম চুম্বি সোহাগে
কহে কি যে কথা কত!
হেথায় জোছনা করে ঝল্ মল্
পড়িয়া বৃক্ষ-শাখে,—
কবি-কল্পিত স্বরগ এই ত—
যদি সে সত্য থাকে।
ফলে-ফুলে-ভরা এ হেন পল্লী
ঘৃণ্য কি লাগি তব?
কোথা পাবে এত অমরার সুখ
নিতি নিতি নব নব?
সুরভি-সেবিত পল্লী-বীথিকা
ঝঙ্কৃত পিক-রবে,
কোথায় সহরে স্বরগের দ্বার
খুলে দিবে বল সবে?

শ্রীঅসিতমোহন ঘোষ।

হিমালয় অভিযান

ইংরাজ জাতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই, তাহারা যাহা একবার ধরে, তাহার চরমে না গিয়া হাল ছাড়িয়া দিবে না। দুর্জ্জয় গৌরীশৃঙ্গ অধিকার করিবার বাসনা দীর্ঘকাল হইতে তাহাদের চিত্ত অধিকার করিয়া রহিয়াছে।

আলোচ্য বর্ষের অভিযানে ২৬ জন ইংরাজ যোগদান করিয়াছেন। তন্মধ্যে ১৯২২ খৃষ্টাব্দের অভিযানকারীদিগের কেহ কেহ আছেন। ইঁহাদিগের মধ্যে পুরাতন দলের জেনারেল ব্রুস, কর্ণেল নর্টন, কাপ্তেন জিওফ্রে



...TAIN MORRIS ARRIVING WITH A CONVOY AT NO 2 CAMP SITUATED AMIDST THE STERNEST SCENERY ON THE BANK OF THE EAST RONGBUK GLACIER



THE SAHIBS (MEMBERS OF THE EXPEDITION) COOLIES COOKS AND FOLLOWERS ASSEMBLED AT THE RONGBUK BASE CAMP



হিমালয় অভিযানের কয়েকটি দৃশ্য—(১) পূর্ব্ব রংবক্ তুষারনদীর তীরের দৃশ্য;
(২) হিমালয় অভিযানকারী য়ুরোপীয় ও দেশীয় কুলী প্রভৃতির চিত্র;
(৩) এভারেষ্ট চূড়ায় পৌঁছিবার তুষারনদীর দৃশ্য। এই পথে অভিযানকারীরা আরোহণ করিয়াছিলেন

পুনঃ পুনঃ চেষ্টার পর বিগত ১৯২২ খৃষ্টাব্দের অভিযানে কর্ণেল হাউয়ার্ডবারির নেতৃত্বাধীন অভিযানকারীরা হিমালয়ের দুরধিগম্য তুষারনদী ও গিরিশিখর সমূহ উত্তীর্ণ হইয়া যে পর্য্যন্ত উঠিয়াছিলেন, বর্ত্তমান বর্ষের অভিযানে তাঁহারও অধিক পথ অতিক্রম করিয়াছিলেন। ১৯২২ খৃষ্টাব্দের অভিযানের বিবরণ বিগত বর্ষের "মাসিক

ব্রুস, কাপ্তেন মরিস্, কাপ্তেন নোয়েল, মিঃ ম্যালোরী এবং ডাক্তার সমারভিল্ উল্লেখযোগ্য। নূতন সদস্যগণের মধ্যে মিঃ ওডেল্, মিঃ বিথাম্, মিঃ আরভিন্, মিঃ হ্যাজার্ড, মিঃ সেবিয়ার এবং মেজর হিংষ্টন্ আছেন।

অভিযানকারীদিগের নিকট হইতে বিগত ২৮শে মে তারিখের একখানি বিবরণপত্র পাঠে জানা যায় যে,



হিমালয় অভিযানকারীদিগের কয়েক জন সদস্য। ম্যালোরী ও আরভিন ক্রুশচিহ্নযুক্ত

সংঘটিত হইবার বিশেষ কোনও সম্ভাবনা তখন ছিল না। তবে দুর্যোগ উপস্থিত হইলে তাঁহারা কি উপায়ে আত্মরক্ষা করিবেন, তাহার উপায় উদ্ভাবনে বিরত হয়েন নাই।

উল্লিখিত ২৬শে মে তারিখের বিবরণের পর কিছু দিন কোনও সংবাদ পাওয়া যায় নাই। পরে ৮ই জুন তারিখে কর্ণেল নর্টন ৩নং শিবির হইতে এক বিস্তৃত বিবরণ পাঠাইয়া দেন। সে সময়ে তিনি তু ষা র-অ ন্ধ (snow-blind) হইয়াছিলেন। জিওফ্রে ব্রুস তাঁহার হইয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। পত্রখানি এইরূপ:—

"আমাদের সম্মুখে গৌরীশৃঙ্গের তুষারধবল মূর্ত্তি দেখা যাইতেছে। এখনও তুষারপাত হইতেছে, বায়ুপ্রবাহ, নাই বলিলেই চলে। এক প্রকার জলপূর্ণ মেঘের সঞ্চার দেখা যাইতেছে—বোধ হয়, উহা বর্ষা ঋতুর পূর্ব্বাভাস। আমরা সকলেই উৎসুকনেত্রে গিরিচূড়ার দিকে নিবদ্ধ-দৃষ্টি। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের অভিযানের চরম পরীক্ষার দিন সম্মুখে।

"আমাদের সঙ্গী অনুচরগণের দৃঢ়তা ও স্বাস্থ্যের উপর এই পরীক্ষার শুভাশুভ ফল নির্ভর করিতেছে।

সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। কর্ণেল নর্টন অভিযানকারীদিগের দলপতি বা নেতা হিসাবে যে বিবরণ পাঠাইয়াছিলেন, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এইরূপ:—

"পূর্ব্ববারের অভিজ্ঞতার ফলে এবার আমরা যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছি। আমাদের ৩নং শিবির ২১ হাজার ফুট উচ্চ পর্ব্বতগাত্রে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ৪নং শিবির ২৩ হাজার ফুট উচ্চ স্থানে অবস্থিত। এখনও ৬ হাজার ফুট ঊর্দ্ধে উঠিতে পারিলে তবে দুর্জ্জয় গিরিশৃঙ্গকে অধিকার করা যাইতে পারিবে।

"গত বৎসর আমাদের দলের ৭ জন তুষারসমাধি লাভ করিয়াছিল। এবার আমরা তেমন বিপদকে অতিক্রম করিতে চাই; অবশ্য তাহাতে মানুষের হাত বড় নাই, তাহা জানি। ৪নং শিবিরে নিরাপদে গমনাগমন করা কিরূপ দুরূহ ব্যাপার, তাহা আমরা বুঝিতেছি। গৌরীশৃঙ্গ সত্যই দুর্জ্জয় নহে কি?"

বিগত ২০শে মে তারিখে মিঃ ম্যালোরী, কর্ণেল নর্টন, মিঃ ওডেল্ চ্যাং-লা গিরিশৃঙ্গে ৪নং শিবিরে গমন করিয়াছিলেন। পরিদর্শন করিয়া তাঁহারা জানিতে পারেন যে, পথটা দুর্গম হইলেও আকস্মিক দুর্ঘটনা



জিওফ্রে ব্রুস ও সোমারভিল তাঁহাদের মনস্তত্ত্বের শ্রেষ্ঠ সমালোচক; তাঁহাদের মতে ২৩ হাজার ফুটের উপরে উঠিবার যোগ্য অনুচর দ্বাদশ হইতে পঞ্চদশ জন মাত্র হইতে পারে। ১নং শিবির হইতে যাত্রার পূর্ব্বে আমরা বিচার-বিতর্কের পর স্থির করিয়াছিলাম যে, অক্সিজেন যত কম পরিমাণে ব্যবহার করা যায়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। ২৩ হাজার ফুটের উপর উঠিবার সময় শিবিরে অন্ততঃ দুই রাত্রি বিনা অক্সিজেনে যাপন হইয়াছে। কিন্তু তথাপি এ কথা সত্য যে, যে কোনও মুহূর্ত্তে বর্ষা আসিতে পারে।

"প্রথম দুই অভিযানে ম্যালোরী, ব্রুস্, সমারভিল্, ওডেল্, আরভিন্ এবং আমি যাইব, এইরূপ স্থির হইয়াছিল। আমরা ৩০শে তারিখে ৩নং শিবিরে পৌছিয়াছিলাম। হ্যাজার্ড ৩নং শিবিরে থাকিয়া আমাদের সহায়তা করিবেন। তিনি এক দিন পরে তথায় আইসেন। ৩নং শিবির হইতে বাছাই অনুচরবর্গ লইয়া যাত্রা করা স্থির



ঝটিকার সময় শিবিরসন্নিবেশ

করিবার জন্য দুইবার প্রচেষ্টা করা যাইবে, ইহাও স্থিরীকৃত হইয়াছিল। তাহার পর যেমন ব্যবস্থা হয়, তাহাই করা যাইবে।

"এখন ঋতুর অবস্থা আশাপ্রদ। প্রতিদিনই আকাশ নির্ম্মল বোধ হইতেছে। নীল আকাশবক্ষে গৌরীশৃঙ্গের বিরাট মূর্ত্তি স্পষ্টতর দেখা যাইতেছে। যে সামান্য মেঘসঞ্চার ইতঃপূর্ব্বে দেখা গিয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হইল। তাহাদের সংখ্যা ১৫। আমরা তাহাদের নাম দিয়াছি 'ব্যাঘ্র'।"

১লা জুন তারিখে মিঃ ম্যালোরী ও কাপ্তেন ব্রুস্ ১৫ জন 'ব্যাঘ্র' সহ উপরে উঠিতে থাকেন। ৪নং শিবিরে ওডেল্ ও আরভিন্ অবস্থান করিয়া উঁহাদিগকে সাহায্য করিবেন বলিয়া সঙ্গে গমন করেন। ২রা জুন তারিখে আকাশ অত্যন্ত নির্ম্মল ছিল। মিঃ ম্যালোরী ও কাপ্তেন

ক্রস্ ৮ জন অনুচর সহ ৫নং শিবির স্থাপন করিবার জন্য আরোহণ করিতে থাকেন। কিন্তু গৌরীশৃঙ্গের ঋতু দীর্ঘকাল এক প্রকার থাকে না। তুষারনদী অতিক্রম করিতে করিতে অভিযানকারীরা তুষারঝটিকামধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েন। তুষারপাত অপেক্ষা বায়ুপ্রবাহের তীক্ষ্ণতা অধিক মাত্রায় ছিল। তাঁহারা এ জন্য প্রস্তুতই ছিলেন। তথাপি বাহকের দল মধ্যে মধ্যে পদস্খলিত হইতেছিল। কিন্তু সাংঘাতিক কোনও দুর্ঘটনা হয় নাই।

সম্পূর্ণ নিরাপদ স্থান নহে। তবে সেখান হইতে বরফ গলিয়া পড়িবার আশঙ্কা ছিল না। ঢালু পর্ব্বতগাত্রে শিবির সন্নিবিষ্ট করিয়া তথায় বিশ্রাম ও রাত্রিবাসের জন্য অভিযানকারীরা প্রস্তুত হইল। দুইটি শিবির—এক একটার ওজন ৫ সেরের অনধিক। বিগত ১৯২২ খৃষ্টাব্দে যেখানে শিবির সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল, তাহার পাতরগুলি এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। সেই স্থানের ২ শত ফুট ঊর্দ্ধে বর্ত্তমান শিবির সংস্থাপিত হইয়াছিল।



তুষারনদীর ধারে প্রাতরাশ

২৫ হাজার ফুট ঊর্দ্ধে শিবির সংস্থাপিত হইল। সেখানে পৌঁছিয়া বাহকের দল অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িল। তাহাদের আর চলিবার শক্তি ছিল না। কেবল ৪ জন কোন রকমে শিবিরসন্নিবেশে সহায়তা করিয়াছিল। শুধু 'ব্যাঘ্র' দলের নেতা নব্‌সাং য়েরিটিং তেমন ক্লান্ত হয় নাই। সে স্বয়ং দুইবার নীচে নামিয়া পরিত্যক্ত দ্রব্যগুলি বহন করিয়া আনিয়াছিল।

শিবির-সংস্থাপনের পর ৫ জন অনুচর ৪নং শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। দৃঢ়দেহ, শ্রমসহিষ্ণু ৩ জন অনুচর আরও লঘুভার শিবির লইয়া পরদিবস অতিরিক্ত ২ হাজার ফুট ঊর্দ্ধে আরোহণ করিবে। শিবিরে তাহারা বিশ্রাম করিতে লাগিল। তাহারা সুস্থ থাকিলে তবে অভিযানকারীরা আরোহণকার্য্যে মনোনিবেশ করিবেন।

কাতর হইয়া পড়িয়াছে, শৈত্য বায়ুর তাড়নায় এমন ভীত হইয়াছে যে, কোনওমতে তাহারা আর আরোহণ করিতে চাহিল না। তখন বাধ্য হইয়া অভিযানকারীরা ৪নং শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

পরদিবস প্রভাতে অবস্থার বহুল পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। সূর্য্যের আলোকে চারিদিক সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। পূর্ব্বদিনের প্রচণ্ড শৈত্য অনেক কমিয়া গিয়াছিল। ৩ জন অনুচর পর্ব্বতারোহণে স্বীকৃত হইল।

তেমন মহান্ দৃশ্য আর কখনও দেখি নাই। পরিশ্রান্ত দেহ মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম চাহিতেছিল। মাঝে মাঝে না দাঁড়াইলেও শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া স্বাভাবিক হইতেছিল না।

"শিবির সংস্থাপনের পর আমরা কফি তৈয়ার করিয়া পান করিলাম। আগামী দিনের জন্য 'থার্মফ্লাস্কে' কফি ভরিয়া রাখিলাম। প্রভাতালোকের সঙ্গে সঙ্গেই কল্য আবার যাত্রা করিতে হইবে। রাত্রিতে সুনিদ্রা হইল



শিলিং শিবির

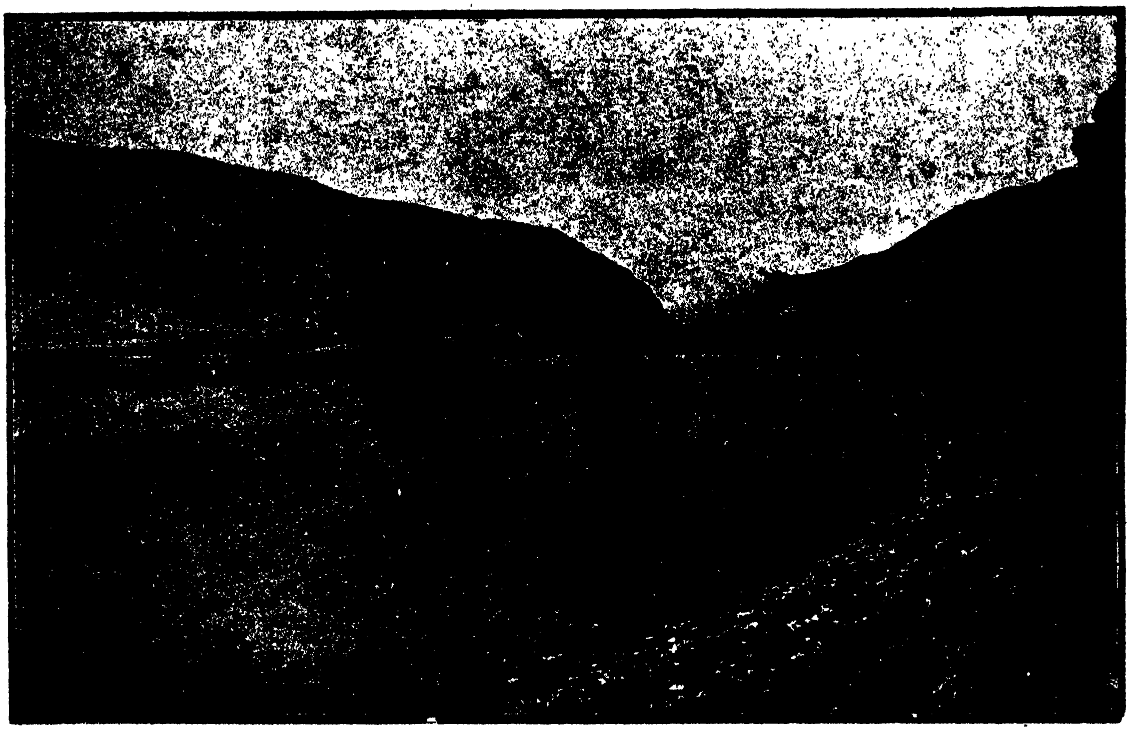
সমারভিলের বিবরণে এইরূপ দেখা যায়;—"২৫ হাজার ফুট হইতে ২৬ হাজার ৭ শত ফুট ঊর্দ্ধে উঠিতে আমাদের অত্যন্ত বেগ পাইতে হইয়াছিল। প্রতি পদক্ষেপেই পদস্খলনের সম্ভাবনা। অতি সাবধানে আমরা পা রাখিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

না, তবে কিছু বিশ্রাম করা গেল। প্রত্যুষে আশাপূর্ণ হৃদয়ে আমরা শয্যাত্যাগ করিলাম। কিন্তু থার্মফ্লাস্কের ছিপি রাত্রিতে পড়িয়া গিয়াছিল। তখন বরফ গলাইয়া পানীয় জল আহরণ করিতে ১ ঘণ্টা সময় অনর্থক নষ্ট হইল। পানীয়ের অভাবে বিগত বর্ষে অভিযানকারী-

এবার আমরা পর্য্যাপ্ত তরল পদার্থ না লইয়া শেষ আরোহণের চেষ্টা করিব না, ইহা পূর্ব্ব হইতেই স্থির হইয়াছিল।

"পৌনে ৭টার সময় আমি ও নর্টন যাত্রা করিলাম। কয়েক পদ অগ্রসর হইবার পর শ্বাসকৃচ্ছ্রতা আরম্ভ হইল। প্রায় ২৭ হাজার ফুট পর্য্যন্ত উঠিয়াছি, এমন সময় কষ্ট আরও বেশী বোধ হইতে লাগিল। কিছু নিম্নে

"উত্তরভাগে যে আরোহণকারী দল ছিলেন, আমাদের বৈদ্যুতিক মশালের আলোকদীপ্তি দেখিতে পাইয়া তাঁহারা তৎপর হইয়া উঠিলেন। ম্যালোরী ও ওডেল্ লণ্ঠন লইয়া আমাদের পথ দেখাইতে লাগিলেন। আরভিন্ চা-র জল ও ঝোল চড়াইয়া দিলেন। তখন রাত্রি প্রায় সাড়ে ৯টা। নর্টনের চোখে তুষারধাঁধা লাগিয়াছিল, তিনি তখনও পূর্ণ দৃষ্টিশক্তি ফিরাইয়া পায়েন নাই।

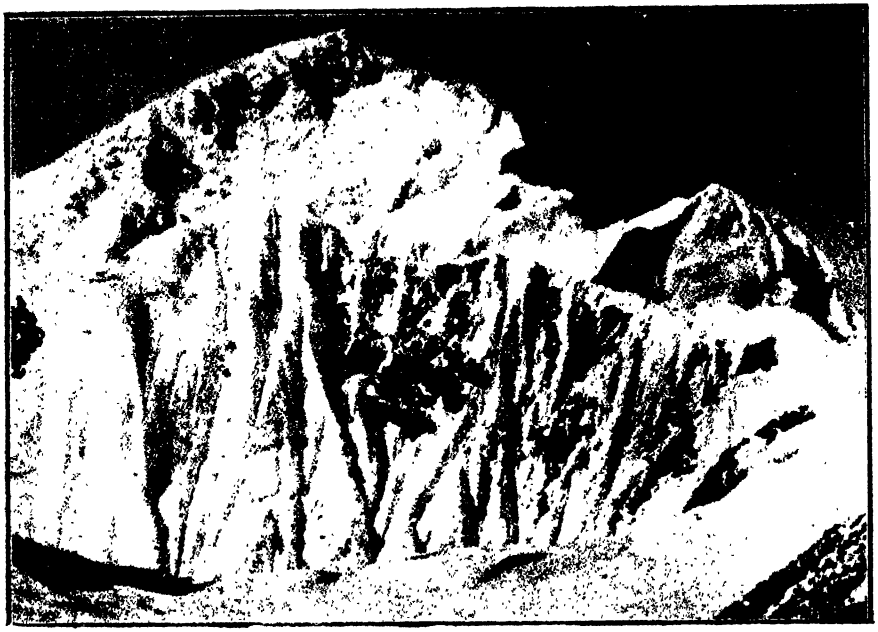


শিলিংএর সন্নিহিত রন্ধ্রপথ—৪৮ মাইল দূর হইতে প্রথম এভারেষ্টের দৃশ্য

আমরা অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছন্দে পদক্ষেপ করিতে পারিতেছিলাম; কিন্তু এখন এক পা হাঁটিতে গেলে আট দশবার শ্বাসপ্রশ্বাস নিক্ষেপ করিতে হইল। এমনভাবে চলিলে বেশী দূর অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর নহে। প্রায় ২৮ হাজার ফুট পর্য্যন্ত উঠিবার পর আমি নর্টনকে বলিয়া দিলাম যে, আমার দ্বারা আর হইবে না। তিনি যদি পারেন ত বাকী পথ শেষ করিয়া ফেলুন। কিন্তু তাঁহারও যে অবস্থা দেখিলাম, তাহাতে আশার ক্ষীণ আলোকরেখামাত্রও ছিল না। আমরা হতাশ হইয়া নিম্নের শিবিরে ফিরিয়া আসিলাম।

আমারও কণ্ঠস্বর ধরিয়া গিয়াছিল। পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পর্ব্বত—হিমালয়ের সহিত সংগ্রাম, ইহাতে পরাজিত হইলেও গৌরবের কথা আছে। ম্যালোরী ও আরভিন্ এইবার শেষ চেষ্টা করিবেন। তাঁহাদের চেষ্টা সার্থক হউক।"

মিঃ ওডেল্ ম্যালোরী ও আরভিন্এর হিমারণ্য অতিক্রমের বিবরণ সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই দুই বীর যুবকের অদম্য সাহস ও শ্রমসহিষ্ণুতা সম্বন্ধে অভিযানকারীরা মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়াছেন। মিঃ ওডেল্ শেষ পর্য্যন্ত ম্যালোরী ও আরভিনের



সূর্য্যাস্তে এভারেষ্টের দৃশ্য

সঙ্গে ম্যালোরী পত্র দিয়াছিলেন। উহাতে জানিতে পারা গেল যে, অতি সামান্য মাত্রায় 'অক্সিজেন' ব্যবহার করিয়া তাঁহারা ২৭ হাজার ফুট পর্য্যন্ত উঠিয়াছেন। ঋতুর অবস্থাও আশাপ্রদ। আমার শিবির হইতেও তাহা আমি বুঝিয়াছিলাম। পরদিন প্রভাতে দিনটা যে আরও ভাল হইবে, এমন আশা আমিও করিয়াছিলাম। লক্ষণগুলি অনুকূল ছিল।

পর্ব্বতারোহণ ব্যাপার লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তাঁহার নিজের উক্তি নিম্নে সংক্ষেপে প্রকাশিত হইল।

"৬ই জুন প্রভাতে প্রাতরাশের পর ম্যালোরী ও আরভিন্ উত্তর প্রান্তের শিবির হইতে ৫নং শিবিরের দিকে যাত্রা করেন। ২৫ হাজার ফুট উর্দ্ধে এই শিবির সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। ৫ জন অনুচর তাঁহাদের সঙ্গে গমন করিল। তাহারা খাদ্যাদি এবং অক্সিজেনপূর্ণ আধারগুলি বহন করিতেছিল। পূর্ব্বদিবস ম্যালোরী ও আরভিন্ ২ হাজার ফুট নিম্ন হইতে আড়াই ঘণ্টায় অক্সিজেন ব্যবহার করিয়া ৩নং শিবির হইতে ৪নং শিবিরে আসিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহাদের আশা হইয়াছিল যে, তাঁহারা হিমগিরির শৃঙ্গে নিশ্চয় উঠিতে পারিবেন।

"নর্টন ও সমারভিল্ ২৭ হাজার ফুট উর্দ্ধে যে ৬নং শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন, উঁহারা তথায় পরদিন যাত্রা করিলেন। আমিও ৫নং শিবির রক্ষার জন্য সেই দিন যাত্রা করিলাম। ইতোমধ্যে হাজার্ড আসিয়া আমার কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

"সেই দিন রাত্রিতে যে অনুচরগণ ম্যালোরী ও আরভিনের নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়াছিল, তাহাদের

পশ্চিমদিকে 'চুয়ো' শৃঙ্গের ভীমকান্ত রূপ সোনালী ও পীত আভায় অতি মনোরম বোধ হইতেছিল। দক্ষিণে ঠিক বিপরীত দিকে এভারেষ্ট বা গৌরীশৃঙ্গের উত্তরচূড়া উত্তর দিকচক্রবালকে দৃষ্টিপথের অন্তরাল করিয়া রাখিয়াছে। বহুদূরে—মধ্যতিব্বতে আর একটা বিরাট গিরিচূড়া দেখা যাইতেছিল। জেনারেল পেরিরা গৌরীশৃঙ্গের প্রতিযোগী বলিয়া যে অদ্রিশিখরের নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, উহা কি তাহাই? পূর্ব্বদিকে কাঞ্চনজঙ্ঘার তুষারকিরীটী শীর্ষদেশ ঝক্ ঝক্ করিতেছিল। অবশেষে গায়ান্‌কার অদ্রিমালার ছবিও নয়নসমক্ষে প্রতিভাত হইল। এমন উচ্চস্থান হইতে সূর্য্যাস্তের দৃশ্য যে কি মনোরম, তাহা যে না দেখিয়াছে, সে কোনও মতেই বুঝিতে পারিবে না।

"৮ই জুন প্রভাত মেঘলেশশূন্যরূপে দেখা দিল। অতিরিক্ত শীতবোধও হইতেছিল না। আমার সঙ্গে যে দুই জন বাহক আসিয়াছিল, তাহারা অসুস্থ বোধ করিতে লাগিল। আমি তাহাদিগকে নীচের শিবিরে ফিরিয়া যাইতে বলিলাম। ম্যালোরী ও আরভিনের আরোহণ অবরোহণ লক্ষ্য করিবার জন্য আমি তখন

স্বাধীনভাবে থাকাই সঙ্গত মনে করিয়াছিলাম। বাহকদের অসুখ বাড়িলে আমাকে বিব্রত হইতে হইবে, তাহা হইলে সকল বিষয় ভাল করিয়া লক্ষ্য করিতে পারিব না।

"যাত্রার পরক্ষণেই মেঘ আসিয়া দেখা দিতে লাগিল বটে; কিন্তু বাতাস তখনও অত্যন্ত লঘু। শুধু মাঝে মাঝে সামান্য তুষারপাত হইতে লাগিল। উর্দ্ধদিকে দৃষ্টি রাখিয়া আমি দেখিতে পাইলাম যে, নিম্নে তুষারপাত বা মেঘসঞ্চার হইলেও উপরে তখনও বেশ উজ্জ্বল আলোকের সমাবেশ আছে। তাহাতে বুঝা গেল, উপরের দিকে কোনও গোলমাল নাই। সেখানকার আকাশ নির্ম্মল। আমার আশা হইল, ম্যালোরী ও আরভিন্ কুজ্ঝটিকাসমাচ্ছন্ন প্রদেশের উপরে উঠিয়া গিয়াছেন।

"প্রায় ১টার সময় চারিদিক্ পরিষ্কার হইয়া গেল। গৌরীশৃঙ্গের উন্নত চূড়া এবং দেহের অধিকাংশ ভাগ সূর্য্যালোকে বেশ স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। আমি লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, একটি কালো বিন্দু পর্ব্বতগাত্রে দেখা যাইতেছে, সে বিন্দুটি স্থির নহে, সঞ্চরণমান। আর একটি বিন্দুও প্রথম চলমান বিন্দুর পশ্চাতে চূড়ার উপর উঠিতেছে। প্রথম বিন্দুটি যেন পর্ব্বতের চূড়ার উপর উঠিল; দ্বিতীয় বিন্দুটিও ঠিক তাহার অনুসরণ করিল। সহসা সে দৃশ্য যেন যবনিকার অন্তরালে মিলাইয়া গেল। মেঘে মেঘে চারিদিক্ আচ্ছন্ন হইয়া গেল। এই দৃশ্যের একমাত্র ব্যাখ্যা এই হইতে পারে যে, ম্যালোরী ও তাঁহার সঙ্গী-ই ঐ দুই কালো বিন্দু। যে সময়ে বিন্দুযুগল পর্ব্বতশিখরে দেখা গিয়াছিল, তখন বেলা ঢলিয়া পড়িয়াছিল। সেখান হইতে ৬নং শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে দিবার আলো নিশ্চয়ই মিলাইয়া যাইবে।

"ম্যালোরী যে ভাবে আরোহণের নক্সা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহাতে কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বেই তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট স্থলে পৌছান উচিত ছিল। সম্ভবতঃ ৬নং শিবির হইতে তাঁহারা নিরূপিত সময়ে যাত্রা করিতে পারেন নাই। হয় ত তখন ঋতুর আকস্মিক কোনও গোলযোগ ঘটিয়াছিল। যাহাই হউক, যে স্থানে আমি তাঁহাদিগকে শেষ দেখিয়াছিলাম, তথা হইতে যাত্রা করিলে যদি কোনও বিঘ্ন না ঘটিয়া থাকে, তবে অপরাহ্ণ ৪টার সময় তাঁহারা পর্ব্বতচূড়ায় উঠিতে পারিয়াছিলেন। দুরবীণযোগে আমি পর্ব্বতের ঢালুর অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বুঝিয়াছি যে, অবরোহণ অত্যন্ত কঠিন নহে।

"আমি তাঁহাদিগকে তদবস্থায় দেখিবার পরই ৬নং শিবির অভিমুখে যাত্রা করি। সেখানে পৌছিবার পূর্ব্বেই তুষারঝটিকায় আমায় বিব্রত হইতে হইয়াছিল। শিবিরটি অতি ক্ষুদ্র। দুরারোহ পর্ব্বতগাত্রে উহা সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। আমি কিছু আহার্য্য লইয়া আসিয়াছিলাম। দ্রব্যগুলি শিবিরমধ্যে রাখিয়া খানিক বিশ্রামের পর আমি বাহির হইলাম। যে পথে তাঁহারা গিয়াছিলেন, সেই দিকে আমি চলিলাম।

"মাঝে মাঝে আমি শিস্ দিতেছিলাম। সেই শব্দ শুনিয়া তাঁহারা পথ খুঁজিয়া পাইতে পারেন। কিন্তু পরিশেষে আমি বুঝিলাম, এরূপ চেষ্টায় কোনও ফল হইবে না। কারণ, এত শীঘ্র তাঁহারা কখনই ফিরিয়া আসিতে পারেন না। যে তুষারঝটিকায় আমি নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলাম, উহা উপরের দিকে হয় ত আদৌ সংঘটিত হয় নাই। আমি পুনঃ পুনঃ উপরের দিকে চাহিতে লাগিলাম; কিন্তু উভয়ের কাহারও দেখা পাইলাম না। ম্যালোরীর সহিত পূর্ব্ব-বন্দোবস্তমত আমি উত্তর প্রান্তের শিবিরে ফিরিয়া আসিলাম। হাজার্ডের সহিত সেই শিবিরে আমরা তাঁহাদের প্রতীক্ষায় রহিলাম।

"পরদিবস প্রাতে তাঁহাদের কোনও সন্ধান না পাইয়া ভাবিলাম যে, তাঁহারা হয় ত ৬নং শিবিরে ফিরিয়া আসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন। দুরবীণযোগে দূরবর্ত্তী ৬নং শিবির দেখা যাইতেছিল; কিন্তু তাম্বুর মধ্যে বা বাহিরে কোনও লোক যে আছে, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। মধ্যাহ্নে সংকল্প স্থির করিলাম যে, আমি ৫নং শিবিরে ফিরিয়া গিয়া পরদিবস ৬নং শিবিরে গমন করিব। হাজার্ডের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া সাঙ্কেতিক অভিজ্ঞান নির্ণীত হইল। তুষারের উপর বালিস রাখিয়া দিলেই তিনি বুঝিতে পারিবেন যে, অবিলম্বে সাহায্য প্রেরণের প্রয়োজন হইয়াছে।

"দুই জন বাহক সঙ্গে আমি ৫নং শিবিরে আসিলাম। কিন্তু তাহারা অসুস্থ হইয়া ৪নং শিবিরে ফিরিয়া গেল। সে রাত্রিতে অত্যন্ত শীত পড়িয়াছিল। পরদিন প্রভাতে ৬নং শিবিরের দিকে আমি যাত্রা করিলাম। এবার একটা অক্সিজেনভরা যন্ত্র ও খাদ্যদ্রব্য সঙ্গে লইলাম। বৈকালে তথায় পৌছিলাম। দেখিলাম, শিবির শূন্য। আমি দুই দিন পূর্ব্বে যে ভাবে খাদ্যদ্রব্যাদি রাখিয়া গিয়াছিলাম, জিনিষগুলি ঠিক তদবস্থায় রহিয়াছে। আমি বাহিরে আসিয়া কিয়দ্দূর উঠিলাম। তাঁহারা যে পথে গিয়াছিলেন, সেই দিকে চাহিয়া চাহিয়া কোন না কোন সন্ধান পাইবার আশা করিতে লাগিলাম। কিন্তু এই বিরাট পর্ব্বতে সে আশা দুরাশা মাত্র! বহু লোক মিলিয়া সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরিয়া অনুসন্ধান করিলেও কোনও সন্ধান পাওয়ার সম্ভাবনা পর্য্যন্ত নাই! এ রহস্য উদ্ঘাটিত হইবার নহে!

"গভীর দুঃখে শিবিরে ফিরিয়া হ্যাজার্ডকে সঙ্কেতে জানাইলাম যে, কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না। শিবির রুদ্ধ করিয়া আমি অবতরণ করিতে লাগিলাম। পাথমধ্যে তুষারবাত্যায় অনেকবার বিপন্ন হইয়াছিলাম। সন্ধ্যার সময় শিবিরে ফিরিয়া আসিলাম। পরদিবস শিবির ছাড়িয়া পূর্ব্ব রংবক্ তুষারনদীর বুকের উপর দিয়া নীচে নামিয়া আসিলাম।"

চির-রহস্যময়, তুষারকিরীটী হিমালয় এবারও কি তাঁহার জটাসঞ্চালন করিয়াছেন? মিঃ ম্যালোরী ও আরভিন্, দুই অকুতোভয় যুবক, যুগযুগস্থায়ী বিরাট-দেহ, সমুন্নতশীর্ষ গৌরীশৃঙ্গের চির-রহস্যময় শিখরে উঠিতে গিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। এবারও হিমালয়ের জয়। এবারও মানুষের বিজয়কেতন তাহার শীর্ষদেশে উড্ডীন হইতে পায় নাই। কিন্তু মানুষের অধ্যবসায়, উৎসাহ এবং নিষ্ঠা কালে জয়লাভ করিবে না, কে বলিতে পারে?

অভিযানকারীরা নামিয়া আসিতেছেন। এ বৎসরের মত অভিযান বন্ধ রহিল। ইংরাজ জাতি সহসা হতোদ্যম হইবার নহে। পুনঃ পুনঃ বিপৎপাত সত্ত্বেও আগামী ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে নবোৎসাহে অভিযান আরব্ধ হইবে। সুইজারলাণ্ডবাসী জনৈক দক্ষ আরোহণকারী আগামী বারে যোগদান করিবেন। হিমালয় আরোহণ বা অবরোহণ সম্বন্ধে তাঁহার নাকি বিশেষ অভিজ্ঞতা আছে। শুনা যাইতেছে, ৩৫ বৎসরের অধিকবয়স্ক কাহাকেও দলে গ্রহণ করা হইবে না; সেরূপ ব্যক্তি নাকি এ কার্য্যে সমর্থ নহে। শ্রমসহিষ্ণু বাছা বাছা লোক আগামী অভিযানে নিযুক্ত হইবেন।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

মুক্তি-অভিনন্দন

সর্ব্বগ স্বাধীন আত্মা স্বপ্রকাশ নিজ মহিমায়,
কেবা পারে রুধিবারে তা'য়?
মুক্ত আত্মা যে মহাত্মা, কহ, তাঁর বন্ধন কোথায়?
আত্মা কভু রুদ্ধ নয় পাষাণ-কারায়!
তবু বাহ্য এ মুক্তি তোমার—
আসন্ন বিশ্বের মুক্তি উচ্চকণ্ঠে করিছে প্রচার।

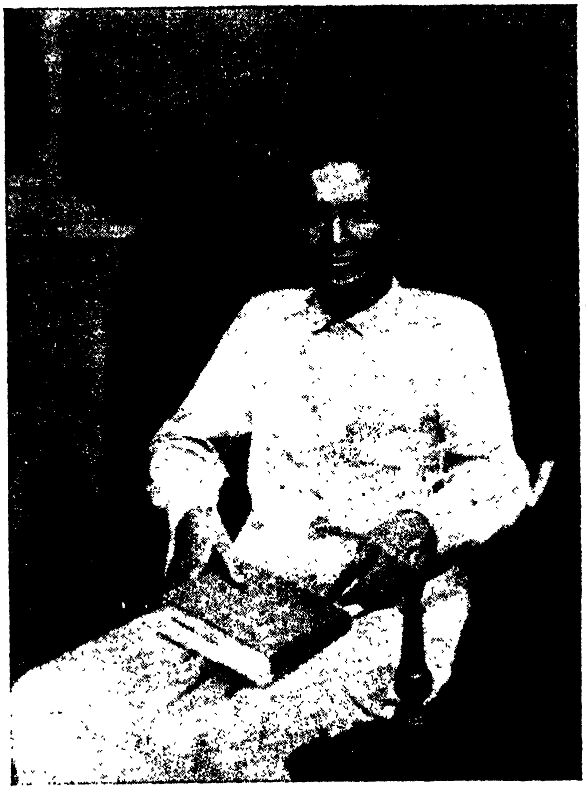
ধন্য তুমি হে মুক্ত, মহান্!
বিশ্বমানবের মুক্তি করিতে বিধান
স্বেচ্ছায় নিয়েছ তুমি করিয়া বরণ,
আপনার অনন্ত বন্ধন।

লভিয়াছ বন্ধনের মাঝে, হে আত্মন্!
মুকতির দিব্য আস্বাদন।
কারাক্লেশে তাই আজীবন,—
চিরবন্দী তাই তুমি হে মুক্ত বন্ধন।

মুক্তি-মন্ত্র-প্রচারক হে তপস্বী নির্ভীক স্বাধীন!
বিশ্বে কেহ নাহি দাস, নাহি ভৃত্য, নাহি পরাধীন,
প্রভু ভৃত্য কেহ কারো নাই,
ভ্রাতৃ সনে মিলিবেক ভাই,—
বিশ্ব ভরি গাও তব উন্মত্ত এ মুক্তি-মন্ত্র-গান।
দাসত্বের হোক্ অবসান!

শ্রীসাহাজী।

স্বর্গীয় অধ্যাপক কুঞ্জলাল নাগ



অধ্যাপক কুঞ্জলাল নাগ

বিগত ১২ই আষাঢ় বৃহস্পতিবার রাত্রি ১টার সময় সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক কুঞ্জলাল নাগ মহাশয় কুমিল্লায় নরদেহ রক্ষা করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৫ বৎসর হইয়াছিল।

গ্রীষ্মাবকাশে আত্মীয়-সম্মিলনের জন্য তিনি সপরিবারে ঢাকায় আসিয়াছিলেন। তথা হইতে মাসাধিক কাল হইল কুমিল্লায় জ্যেষ্ঠ পুত্র সকাশে গমন করেন। দেহ পূর্ব্ব হইতেই ভগ্ন ছিল, সেখানে যাইয়া কফ ও পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হয়েন। চিকিৎসায় নিরাময় হইতেছিলেন, কিন্তু বৃহস্পতিবার দ্বিপ্রহরে তিনি সহসা আপনাকে অত্যন্ত অসুস্থ বোধ করেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে যাতনার অনেক উপশম হয়, কিন্তু রাত্রি ১টার সময় সহসা তাঁহার হৃৎস্পন্দন চিরদিনের জন্য থামিয়া যায়,—পণ্ডিতাগ্রগণ্য, ধর্ম্মপরায়ণ, দরিদ্রের আশ্রয়, ন্যায়নিষ্ঠ, প্রবীণ অধ্যাপক তাঁহার যোগ্য লোকে চলিয়া যায়েন।

১২৬৫ সালের ১লা শ্রাবণ বৃহস্পতিবার কুঞ্জলাল জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এম, এ, পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া, অনেক উচ্চ পদের লোভ সংবরণ করিয়া, অপরিসীম বিদ্যানুরাগের বশে শিক্ষাবিভাগকে একমাত্র বরণীয় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। অন্য জীবন অবলম্বন করিলে অপূর্ব্ব মেধা ও শক্তিবলে তিনি তাহার শিখরে আরোহণ করিয়া অসামান্য যশস্বী হইতে পারিতেন; কিন্তু শিক্ষাবিভাগে নীরবে জীবনপাত করিয়াও তাঁহাকে কখনও অনুতাপ করিতে দেখা যায় নাই। যখন শ্মশ্রুগুম্ফহীন যুবক, সেই সময় তিনি অধ্যক্ষরূপে জীবন আরম্ভ করেন, শিক্ষানবিশী তিনি করেন নাই,—অথচ ঐ তরুণ বয়সে প্রথম শ্রেণীর কলেজগুলি সুশৃঙ্খলার সহিত তিনি পরিচালনা করিয়াছেন, ইহা সামান্য শক্তির ও গৌরবের কথা নহে।

অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা তিনি তাঁহার জীবনের ব্রত বলিয়া মনে করিতেন এবং ছেলেদের তিনি শুধু পড়াইতেন না, তাহাদিগকে গঠিত করিতেন,—বিদ্যায়, পাণ্ডিত্যে, চরিত্র-গৌরবে, ধর্ম্মানুরাগে তাহাদিগকে মানুষ করিতে চেষ্টা করিতেন। তাঁহার ও তাঁহার ছাত্রদের সম্পর্ক পুরাকালের আশ্রমবাসী গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ স্মরণ করাইয়া দেয়।

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভিতর তাঁহার ছাত্রের অভাব নাই। তাঁহাদের মুখে তাঁহার শিক্ষাপদ্ধতির যে অজস্র প্রশংসাবাদ শুনি, কলেবরবৃদ্ধির ভয়ে এ প্রবন্ধে তাহার আলোচনা করিলাম না।

তাঁহার প্রত্যেক শিষ্যের অন্তরে তিনি যে স্থায়ী সশ্রদ্ধ স্থান করিয়াছিলেন, তাহা অপূর্ব্ব। কারণ, এই অপ্রিয় সত্যটুকু অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, এ যুগে অধিকাংশ ছাত্র ও গুরুর সম্পর্ক স্কুল-কলেজের প্রাচীরটুকুর ভিতরই সীমাবদ্ধ থাকে,—সেই সীমাটি অতিক্রম করিলেই তাহা স্মরণাতীত হইয়া পড়ে।

তাঁহার জীবনের যে দিকটা বিশেষভাবে আলোচনা করিবার, তাহা তাঁহার স্বধর্ম্মনিষ্ঠা, গুরুভক্তি, দেশপ্রাণতা, পরহিতৈষণা ও আত্মপ্রতিষ্ঠা-প্রয়াসহীন অনাড়ম্বর সংযমশীল জীবনযাপন।

তিনি বারদীর বিখ্যাত নাগবংশোদ্ভব। জমীদারী ও নিজের আয়ে ইচ্ছা করিলে তিনি অপরাপর ধনীদিগের মতই পরম স্বচ্ছন্দে জীবনযাপন করিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার জীবনের আদর্শ ছিল—"plain living and high thinking," কোনও দিন তিনি ইহার ব্যতিক্রম করেন নাই।

দরিদ্র ছাত্র ও নিঃস্ব ব্যক্তির সাহায্যে তিনি মুক্ত-হস্ত ছিলেন। তাঁহার কলিকাতার আবাসে প্রতি বৎসর কত প্রার্থী উপস্থিত হইয়া আশাতীত সাফল্য লাভ করিয়াছে, কত দরিদ্র বিদ্যার্থী তাঁহার সাহায্যে বিদ্যার্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু এই সব নীরব দানের কথা অপরে, এমন কি, অনেক সময় তাঁহার নিজের পরিজনবর্গও জানিতে পারেন নাই।

সাধারণতঃ দেখা যায়, অবস্থাপন্ন ব্যক্তিরা দরিদ্রের খোঁজ বড় করেন না, কিন্তু দুঃস্থ ও দরিদ্র পরিচিতদের খোঁজ করা কুঞ্জলালের একটি দৈনন্দিন কার্য্য ছিল। সে বার ট্রাম ষ্ট্রাইকের গোলযোগের সময় তিনি অবিচারের নীরব প্রতিবাদকল্পে ট্রাম চড়া ছাড়িয়া দেন, অথচ প্রায় অকর্ম্মণ্য পা লইয়া খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া দুঃস্থ ও দরিদ্রের খোঁজ লইয়া বেড়াইতেন এবং অনেক স্থলে অর্থসাহায্য করিতেন।

দেশের প্রতি তাঁহার ভালবাসাও ছিল অন্তঃস্রোত ফল্গুর মত নীরব। বঙ্গব্যবচ্ছেদ রদ হইবার পর যখন স্বদেশী আন্দোলন বুদ্বুদের মত মিশিয়া গেল এবং অনেক চরমপন্থীর জীবনযাত্রার পরিবর্ত্তন দেখা দিল, তখনও তিনি নীরবে "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়" ব্যবহার করিতেন।

তাঁহার গুরুভক্তি গুরুভক্তির আদর্শ। জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত অবধি গুরুবাক্য তিনি সাধ্যমত প্রতিপালন করিয়াছেন এবং ইষ্টমন্ত্র জপিতে জপিতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও বারদীর শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী মহাশয় তাঁহার সম্বন্ধে বলিতেন যে, তিনি জীবন্মুক্ত পুরুষ, খালি কর্ম্মখণ্ডন করিবার জন্য পৃথিবীতে আসিয়াছেন। তিনি বলিতেন, "স্ত্রীপুত্রপরিবার সকলকে আমি ত্যাগ করিতে পারি, গুরুকে নহে।" স্বধর্ম্মে তাঁহার নিষ্ঠা ছিল অপূর্ব্ব। হিন্দুর আচরিত পূজা-অর্চ্চনা ও শাস্ত্রানুশাসন তিনি মানিয়া চলিতেন এবং কেহ তাহা লঙ্ঘন করিলে তিনি ব্যথিত হইতেন। ইংরাজী শিক্ষার প্রভাব তাঁহাকে স্বধর্ম্ম হইতে এক তিল বিচলিত করিতে পারে নাই। বিদেশীর অনুকরণ তিনি কখনও করেন নাই—এমন কি, পোষাক-পরিচ্ছদেও নহে। সাধারণ ধুতি, চাদর, জামা, জুতা লইয়া তিনি কলেজ ও বড় বড় সম্মিলনীতে যোগদান করিতেন এবং ময়ূরপুচ্ছধারী যুবকসম্প্রদায়ের বিকৃত আচরণে ক্লেশ বোধ করিতেন। তিনি অনায়াসে পুত্রদিগকে বিলাতে পাঠাইতে পারিতেন; কিন্তু পাছে তাহারা সেখান হইতে বিকৃতভাবাপন্ন হইয়া আইসে, এই ভয়েই পাঠাইতে নিরস্ত ছিলেন।

বিগত কয়েক বৎসর যখন রোগজীর্ণ দেহে তিনি দেওঘর, পুরী প্রভৃতি স্থানে ঘুরিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আইসেন, তখন ডাক্তার ও হিতৈষীদের মধ্যে অনেকে তাঁহাকে কলেজ ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ করেন; কিন্তু বিদ্যানুরাগ ও বিদ্যানুশীলনবৃত্তি তাঁহার অস্থিমজ্জায় জড়াইয়া ছিল; তিনি বলিলেন, "কলেজ ছাড়িলে আমি বাঁচিব না।" মনে আছে, পুরীতে তিনি রোগের উৎকট আক্রমণকালে এই বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছিলেন যে, ছেলেদের না জানি কত ক্ষতি হইতেছে, তাহাদের কোর্স শেষ হয় নাই। ছেলেদের ইষ্টচিন্তা ছিল তাঁহার জীবনের স্বপ্ন।—বায়ুপরিবর্ত্তনের পর একটু সুস্থ হইয়া তিনি কলেজে ফিরিয়া আসিলে কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে স্বল্প পরিশ্রমের কায দিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি কিছুতেই পুরা কায না লইয়া ছাড়েন নাই। তাঁহার অধ্যাপনা-প্রীতি ও কর্ত্তব্যপরায়ণতা অসাধারণ ছিল। কায

করিতে করিতে তাঁহার কঠিন রোগও সারিয়া যাইতে দেখা গিয়াছে,—কর্ম্মে তাঁহার এমনই মত্ততা ছিল। কি অধ্যাপনায়, কি বক্তৃতায় তাঁহার আশ্চর্য্য উন্মাদনা ও জীবনীশক্তি ছিল,—কোনও ভাসা ভাসা (superficial) ভাব তাঁহাতে স্থান পাইত না।

কিছু পূর্ব্বে, বড়দিনের সময়, মফঃস্বলের কোনও কলেজ তাঁহাকে খুব লম্বা বেতনে অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলে তিনি এই কারণে তাহা গ্রহণ করেন নাই যে, তাহা করিলে প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুণ্যস্মৃতিসুরভিত কলেজ ও গঙ্গাতীর ত্যাগ করিতে হইবে, দ্বিতীয়তঃ বিজাতীয় পোষাক-পরিচ্ছদ পরিয়া কলেজের কর্ত্তৃপক্ষদের দরবারে নিয়ত হাজিরা দিতে হইবে।

সে বার বিদ্যাসাগর কলেজে যখন অধ্যাপকদের বেতনবৃদ্ধি হয়, তিমি তাঁহার বর্দ্ধিত বেতন দরিদ্র ছাত্রদের সাহায্যকল্পে দরিদ্র ফণ্ডে দান করেন, অথচ নানা বিষয়ে দান করিয়া তিনি আর্থিক প্রয়োজনের বাহিরে ছিলেন, এমন নহে।

রত্নপ্রসূ বাঙ্গালায় অনেক মহান্ চরিত্রের লোক জন্মিয়াছে ও জন্মিবে; কিন্তু কুঞ্জলালের পূতচরিত্রের মহিমা লইয়া মৌনী ঋষি আবার কবে জন্মিবে, কে বলিতে পারে?

বাহিরে তিনি গৌরবের স্বর্ণপতাকা উড্ডীন করিয়া যায়েন নাই, তাঁহার চারিদিকে হয় ত বিজয়-দুন্দুভি বাজিয়া উঠে নাই; কিন্তু তাঁহার নীরব যাত্রার পথে তিনি যাহাদের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, তাহাদিগকে যে নীরব স্পর্শ দিয়া নীরবে প্রয়াণ করিয়াছেন, সেই স্পর্শ জয়ডঙ্কার গভীর নির্ঘোষ জাগাইয়া না তুলুক, অনেক দুঃস্থ নিঃসহায়ের গোপন মর্ম্মের তারে বীণার মতই মৃদু, অথচ সুকরুণ সুর ঝঙ্কৃত করিয়া তুলিবে।

জীবনে সত্য, ধর্ম্ম ও দয়াকেই তিনি সার বলিয়া অবলম্বন করিয়াছিলেন, জীবনের পরপারে দয়া, সত্য ও ধর্ম্মের যিনি আশ্রয়, তাঁহারই পুণ্যশীতল ছায়ায় তিনি অনন্ত সুখলাভ করিয়াছেন, ইহাই সান্ত্বনার কথা।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বসু।

আগমনে

(কবীর)

১

কি নব সুদিন আজ,
প্রিয়তম মোর দুয়ারে অতিথি,
—হৃদয়ের অধিরাজ।

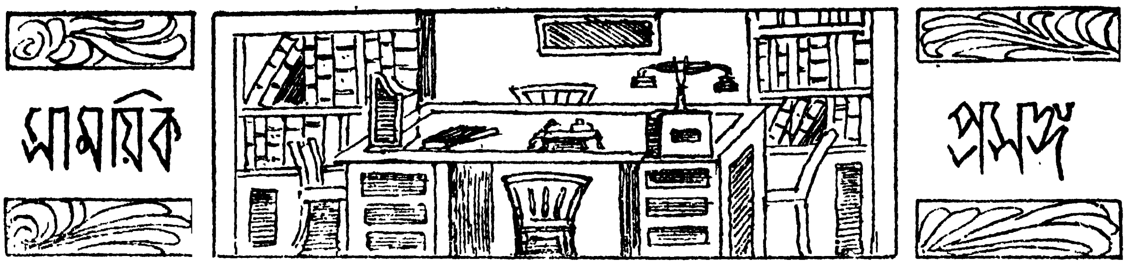
ঘর-অঙ্গন হাসিছে হরষে,
আলোকে উজল চরণ-পরশে,
গগনের কোটি চন্দ্র-তারকা
তার কাছে পায় লাজ।
প্রিয়তম মোর দুয়ারে অতিথি,
কি নব সুদিন আজ।

২

তৃষ্ণা গিয়াছে দূরে,
প্রেমের সাগরে পেয়েছি আজিকে
আপন হৃদয়-পুরে।

তনু-মন-ধন যা' আছে আমার,
সঁপে দিব আজি চরণে তাঁহার,
চরণ ধোয়াবো, বদন হেরিব,
বাঁধিব নয়ন-দ্বারে।
সত্য প্রেমের তৃষ্ণা যে আজ
জেগেছে হৃদয়-পুরে।

শ্রীকমলকৃষ্ণ মজুমদার।



ম্যালেরিয়া ও তাহার প্রতীকার

ম্যালেরিয়ার কথাই এখন বাঙ্গালার মর্ম্মান্তিক কথা। যে ম্যালেরিয়া ব্যাধি এককালে বলদৃপ্ত দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ রোমক জাতিকে হীনবীর্য্য ও নিস্তেজ করিয়া ফেলিয়াছিল, সেই জনপদবিধ্বংসী ম্যালেরিয়া ব্যাধিই এই বাঙ্গালার জনসমূহের বল, বীর্য্য, স্ফূর্ত্তি, কর্ম্মশক্তি, অধ্যবসায় প্রভৃতি হরণ করিয়া লইয়াছে ও লইতেছে। বাঙ্গালার স্বাস্থ্যবিভাগের ডিরেক্টার ডাক্তার বেণ্টলী হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে, কেবল এই বঙ্গদেশে প্রতি ঘণ্টায় গড়ে ৪০ জন করিয়া লোক ম্যালেরিয়া রোগ কর্ত্তৃক শমন-সদনে নীত হইতেছে। যাহারা প্রত্যক্ষভাবে ম্যালেরিয়ার প্রভাবে মরিতেছে, ডাক্তার বেণ্টলী কেবল তাহাদেরই হিসাব দিয়াছেন। কিন্তু পরোক্ষভাবে ঐ ব্যাধির প্রকোপে যে উহার দ্বিগুণ লোক মরিতেছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। কারণ, ম্যালেরিয়া জর মানুষের তেজ হরণ করে, রক্তকণিকাগুলি নষ্ট করিয়া ফেলে, সুতরাং উক্ত জরে জীর্ণ লোকদিগের দেহে আর অন্য রোগের আক্রমণ প্রতিহত করিয়া দিবার শক্তি থাকে না। কাযেই তাহারা অন্য রোগবীজাণু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলেই সহজে মরিয়া যায়। সুতরাং যদি মোটামুটি এইরূপ হিসাব ধরা যায় যে, এই মর্ম্মদাহী জরে যত লোক প্রত্যক্ষভাবে মরে, ঠিক তত লোকই ইহার সহায়তায় অন্য রোগে মরিয়া থাকে, তাহা হইলে এই বঙ্গভূমিতে প্রতি ঘণ্টায় অন্ততঃ ৮০ জন করিয়া লোক যমালয়ে যাত্রা করিতেছে। এই দুরন্ত ব্যাধিতে তরুণবয়স্ক লোক অতি সহজে মরে; সেই হেতু ইহার ভীষণতা অত্যন্ত অধিক।

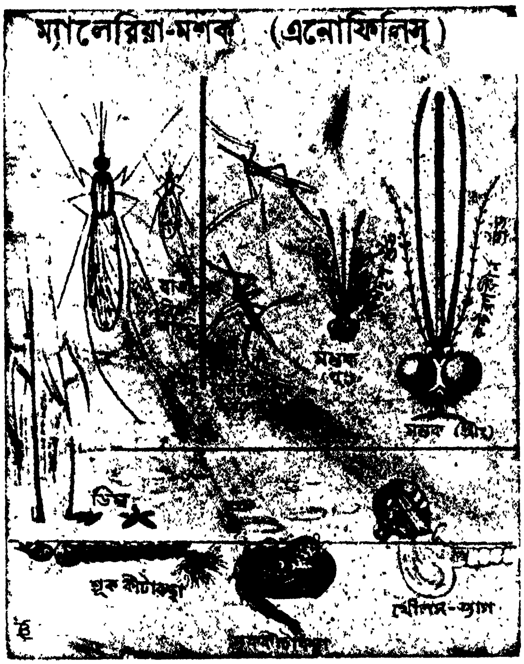
ম্যালেরিয়ায় যে কেবল লোকক্ষয় হইতেছে, তাহা নহে, পরন্তু ধনক্ষয়ও যথেষ্ট হইতেছে। ডাক্তার বেণ্টলী বলিয়াছেন যে, এই ব্যাধি হইতে আরোগ্যলাভ করিবার জন্য যদি প্রত্যেক বাঙ্গালীকে বৎসরে চারি আনা করিয়াও ব্যয় করিতে হয়, তাহা হইলেও এই রোগের জন্য বাঙ্গালার কত অর্থ ব্যয়িত হইতেছে, তাহা সহজেই উপলব্ধ হইবে। তাহার পর লোক যখন জরগ্রস্ত হইয়া শয্যাগত থাকে, তখন সে কায করিতে পারে না। সে সময় কৃষক মাঠে যাইতে পারে না, কর্ম্মকার কর্ম্মশালায় কায করে না, কুম্ভকার হাঁড়ি-কলসী গড়িতে পারে না। সুতরাং তাহাতে তাহাদের যে ক্ষতি হয়, তাহার ইয়ত্তা করা অত্যন্ত কঠিন। সুতরাং সর্ব্বসাকল্যে এই রোগের জন্য বাঙ্গালীর খুব কম করিয়া ধরিলেও ১০ কোটি টাকা ক্ষতি হয়।

গত ১৭ই জুলাই বৃহস্পতিবার কলিকাতা ওভারটুন হলে ডাক্তার বেণ্টলী এই ভীষণ ব্যাধি ও তাহার প্রতীকারের উপায় সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সে বক্তৃতায় বাঙ্গালীর জানিবার, বুঝিবার এবং উপলব্ধি করিবার অনেক কথাই ছিল। তিনি বলিয়াছেন, এই ব্যাধি নূতন নহে, যুগযুগান্তর ধরিয়া ইহা বর্ত্তমান রহিয়াছে। যখন এ কথা এখন সপ্রমাণ হইয়াছে যে, এই ব্যাধির প্রভাবে প্রবলপরাক্রম রোমক জাতি নির্ব্বীর্য্য হইয়া পড়িয়াছে, তখন এ ব্যাধি যে পুরাতন, তাহা বলাই বাহুল্য। আমাদের পুরাণগুলিতেও এই জররোগের প্রাচীনতার পরিচয় পাওয়া যায়। দ্বাপরের যুগাবতার শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁহার পৌত্র অনিরুদ্ধকে উদ্ধার করিবার জন্য বাণরাজার রাজধানী শোণিতপুর অবরুদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই অবরোধের প্রভাবে তথাকার জলনিকাশের স্বাভাবিক পথও ব্যাহত হইয়াছিল, তখন তথায় দুই প্রকারের জর আবির্ভূত হইয়াছিল, একটি বৈষ্ণব-জর আর একটি শৈব-জর। তাহার মধ্যে কোন্ জরটি ম্যালেরিয়া আর কোন্‌টি টাইফয়েড, তাহা প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ বিচার করিয়া দেখিবেন। তবে যখন অবরোধফলে

য়ের দেওয়া মোটা কাপড় ব্যবহার ...

জলনিকাশ রুদ্ধ হওয়াতে এই জ্বর আত্মপ্রকাশ করে, তখন ইহার মধ্যে একটি জ্বর যে ম্যালেরিয়া ছিল, তাহা সহজেই বুঝা যায়। সুতরাং ব্যাধিটি পুরাতন।

ব্যাধিটি পুরাতন হইলেও বাঙ্গালায়, বিশেষতঃ মধ্য ও পশ্চিম-বাঙ্গালায় এই ব্যাধি অধিক দিন আবির্ভূত হয় নাই। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে যশোহর জিলায় মামুদপুর গ্রামের নিকট সরকার জেলের কয়েদীদিগের সাহায্যে একটি রাস্তা বাঁধাইতেছিলেন। সেই কয়েদীদিগের মধ্যেই সর্ব্বপ্রথম এই জ্বর দেখা দেয়। ইহার বিস্তৃত বিবরণ সার উইলিয়ম হাণ্টার তাঁহার গ্রন্থে বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং এ বারই ম্যালেরিয়ার শত-বার্ষিক উৎসব, এ কথা বলা যাইতে পারে। তাহার পর ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলপথ এবং ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলপথ প্রস্তুত হইবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ম্যালেরিয়া সমস্ত বাঙ্গালায় বিস্তীর্ণ হইয়া পড়ে। সুতরাং ব্যাধিটি পুরাতন হইলেও বাঙ্গালায় উহা পুরাতন নহে।



ম্যালেরিয়া মশক

ডাক্তার বেণ্টলী তাঁহার বক্তৃতায় ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রাচীনত্বের কথা বলিয়া উহার নিদান সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, ম্যালেরিয়া জ্বর প্রাচীন হইলেও ইহার নিদান বা উৎপত্তির কারণ অধুনা আবিষ্কৃত হইয়াছে। পূর্ব্বে লোক বিশ্বাস করিত যে, দূষিত বাষ্পই উহার কারণ। পূর্ব্বে লোক দেখিত যে, উচ্চভূমি অপেক্ষা নিম্নভূমিতে এবং শুষ্ক স্থান অপেক্ষা আর্দ্র স্থানে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ হয়; সেই জন্য লোক দুষ্ট বাষ্পই ইহার কারণ মনে করে। আবার ভূমি খনন করিয়া সেই উৎক্ষিপ্ত মৃত্তিকায় রাজপথ ও রেলপথ নির্ম্মিত হইত। যেখানে রাজপথ ও রেলপথ নির্ম্মিত হইত, সেইখানেই ম্যালেরিয়া দেখা দিত দেখিয়া তখনকার বুধমণ্ডলী মনে করিতেন যে, মৃত্তিকামধ্যস্থ দুষ্ট বাষ্প বাহির হইয়াই ম্যালেরিয়ার সৃষ্টি করে। এখন অধিকতর অনুসন্ধানফলে সে ধারণা ভ্রান্ত সপ্রমাণ হইয়াছে। এখন অনুসন্ধান দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে যে, য়্যানোফিলিস নামক এক জাতীয় মশক দংশন দ্বারা মানবদেহের অভ্যন্তরে এই ম্যালেরিয়া বিষ প্রবিষ্ট করাইয়া দেয়। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের আলফান্সো ল্যাভেরিণ ম্যালেরিয়া রোগীর দেহে এক প্রকার পররুহ জীবাণু দেখিতে পায়েন। ইতঃপূর্ব্বে তিনি ঐরূপ জীবাণু আর কখনই দেখেন নাই। ফ্রান্সের ভৈষজ্য-সমিতিতে তিনি এই সম্বন্ধে একটি সন্দর্ভ পাঠ করেন। সেই সময় হইতে এই বিষয়ে অনুসন্ধান আবদ্ধ হইয়াছিল। ইহার ১৭ বৎসর পরে স্কটল্যাণ্ডের সার রোণাল্ড রস মশকের উদরবিবরে এই পররুহ জীবাণুর সন্ধান পায়েন। ক্রমশঃ অনুসন্ধান দ্বারা জানিতে পারা যায় যে, সকল মশকদেহে এই সাংঘাতিক রোগের বীজাণু থাকে না। য়্যানোফিলিস নামক এক প্রকার মশার দেহে রোগবীজাণু পরিণতি প্রাপ্ত হয়। স্ত্রীজাতীয় য়্যানোফিলিসই এই বিষের বাহক। উহারা যখন কোন ম্যালেরিয়াগ্রস্ত মানুষকে দংশন পূর্ব্বক তাহার শোণিত পান করে, তখন সেই নরশোণিতের সহিত ঐ ম্যালেরিয়া বীজাণু উহাদের পাকস্থলীতে প্রবেশ করিয়া থাকে। মশক রক্তটা হজম করিয়া ফেলে। কিন্তু এই বীজাণু পরিপাক করিতে পারে না। উহা জীবিত অবস্থায় পাকস্থলী ভেদ করিয়া উহার লালা গ্রন্থিতে আসিয়া উপস্থিত হয়। এই অবস্থায়

উক্ত স্ত্রীজাতীয় মশক যদি কোন মনুষ্যদেহে তাহাদের হুল বসাইয়া দেয়, তাহা হইলে সেই ম্যালেরিয়া জীবাণুযুক্ত স্ত্রী-য়্যানোফিলিসের লালার সহিত ঐ জীবাণু মানবদেহে ম্যালেরিয়া ব্যাধির সঞ্চার করিয়া দেয়। ম্যালেরিয়ার প্রকারভেদ অনুসারে মশকদেহে এই বীজাণুর পূর্ণ পুষ্টিলাভ করিতে ১২ হইতে ২১ দিন সময় লাগে।

যাহা হউক, ডাক্তার বেণ্টলী বলিয়াছেন যে, অনেক স্থানে দেখা যায়, প্রচুর মশা থাকিলেও এবং লোক মশক কর্ত্তৃক বিশেষভাবে দষ্ট হইলেও তথায় লোক ম্যালেরিয়াগ্রস্ত হয় না। কথা সত্য। তাহার যথেষ্ট কারণ আছে। প্রথম, মশার মধ্যে নানা জাতি আছে। তন্মধ্যে কেবল য়্যানোফিলিস জাতীয় স্ত্রী-মশার দ্বারাই ম্যালেরিয়া বিসর্পিত হয়। আবার সেই য়্যানোফিলিস জাতীয় স্ত্রী-মশক যদি কখনও ম্যালেরিয়াগ্রস্ত লোককে দংশন না করিয়া থাকে, তাহা হইলে সে-ও ঐ রোগ বিসর্পণ করে না। সুতরাং মশক থাকিলে এবং মশকে কামড়াইলেই যে ম্যালেরিয়া হইবে, এমন কোন কথা নাই। তবে ম্যালেরিয়াগ্রস্ত স্ত্রীজাতীয় য়্যানোফিলিস যে ম্যালেরিয়ার বিষ চারিদিকে ছড়াইয়া দেয়, তাহার প্রমাণ যথেষ্ট আছে।

অতঃপর ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধের ও প্রতীকারের কথা। প্রতিষেধ অর্থাৎ যাহাতে ম্যালেরিয়া না হয়, তাহা করিতে হইলে যাহাতে দেশে মশক জন্মিতে না পারে, তাহা করিতে হইবে। অল্প ও স্থির মৃৎসংলগ্ন জলেই মশক ডিম পাড়ে। সুতরাং স্বল্পজলবিশিষ্ট খানা, ডাবা সমস্তই হয় ভরাট করিয়া দিতে হইবে, না হয় কাটিয়া বড় জলাশয়ে পরিণত করিতে হইবে। বাড়ীতে বা বাড়ীর নিকটে ছোট বড় গর্ত্ত, ভাঙ্গা হাঁড়ি কলসী প্রভৃতি রাখা উচিত নহে। উহাতে বর্ষার জল জমে, সেই জলে মশক ডিম পাড়ে, সেই ডিম হইতে জলে পোকা হয়, সেই পোকা মশক হইয়া থাকে। সুতরাং সকল দ্রব্যও সর্ব্বতোভাবে পরিত্যজ্য। জলের উপর ... পরিমাণে কেরোসিন তৈল ঢালিয়া দিলে মশকের ...টিগুলি শ্বাসরুদ্ধ হইয়া মরিয়া যায়। পাতলা কাপড় ... সূক্ষ্ম ছিদ্রবিশিষ্ট লোহার জাল দিয়া ঘরের জানালা ...কিয়া দিলে, গৃহমধ্যে মশক সহজে প্রবেশ করিতে ...রে না। সকলেরই এই উপায়গুলি অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। রাত্রিকালে সকলেরই মশারির মধ্যে শয়ন করা বিধেয়।

রোগীদিগের পক্ষে কিরূপ সাবধানতা ও চিকিৎসা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য, ডাক্তার বেণ্টলী তাহাও বলিয়া দিয়াছেন। তিনি বলেন যে, ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগীর পক্ষে কুইনাইন মহৌষধ। ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগীকে প্রত্যহ অন্ততঃ ৪ গ্রেণ করিয়া প্রত্যেক মাত্রায় ৪ মাত্রা কুইনাইন অর্থাৎ ষোল গ্রেণ কুইনাইন দিতেই হইবে। আর ম্যালেরিয়াপ্রধান স্থানে বাস করিলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে প্রত্যহ পাঁচ গ্রেণ করিয়া কুইনাইন খাইতে হইবে। তাহা হইলে শরীরাভ্যন্তরস্থ ম্যালেরিয়া বিষ ক্রমে নষ্ট হইয়া যাইবে। ইহা ভিন্ন প্রত্যহ পুষ্টিকর খাদ্য ভোজন এবং দেহ বস্ত্রে আবৃত করিয়া রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য।

আসল কথা, মশকনাশই ম্যালেরিয়া প্রতিষেধের একমাত্র উপায়। ইহা করিতে হইলে জলনিকাশের পথ পরিষ্কৃত করিতে হইবে, বাড়ীর নিকট কোথাও জল বাধিতে দেওয়া বা জঙ্গল হইতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। য়্যানোফিলিস মশকরা দিবাভাগে বৃক্ষপত্রের নিম্নভাগে আশ্রয় লইয়া থাকে। বাড়ীর নিকট জঙ্গল থাকিলে মশকরা দিবাভাগে জঙ্গলে থাকে ও রাত্রিভাগে (সন্ধ্যার সময় হইতে) গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া লোককে দংশন করে। অতএব বাড়ীর নিকট জঙ্গল কি ছোট গাছপালা রাখা উচিত নহে।

ডাক্তার বেণ্টলী বলিয়াছেন যে, এই ব্যাপারে আমাদের সরকারের মুখাপেক্ষী হওয়া উচিত নহে। আমাদিগকে স্বাবলম্বী হইয়া ম্যালেরিয়ার সহিত সংগ্রাম করিতে হইবে। সরকার প্রত্যেক বাঙ্গালীর নিকট হইতে গড়ে ১৷৹ এক টাকা বার আনা কর আদায় করেন, কিন্তু লোকের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য বাৎসরিক চারি পাই (এক পয়সার কিছু অধিক) মাত্র ব্যয় করিয়া থাকেন। ইহার উপর মন্তব্য প্রকাশ অনাবশ্যক।

মন্ত্রীদিগের বেতন

মন্ত্রীদিগের বেতনের ব্যাপার ইতোমধ্যে অনেক দূর পর্য্যন্ত গড়াইয়াছে। নূতন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা

মন্ত্রীদিগের বেতন মঞ্জুর করেন নাই—ইহা পাঠক জানেন। তাহার পর বিগত ৭ই জুলাই তারিখে আবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন হইবার এবং সেই অধিবেশনে অন্যান্য আবশ্যক বিষয়ের সহিত মন্ত্রীদিগের বেতনের কথা সরকারপক্ষ কর্ত্তৃক উপস্থাপিত করিবার কথা ছিল। যখন মন্ত্রীদিগের বেতন অগ্রাহ্য করিবার প্রস্তাব ব্যবস্থাপক সভায় আলোচিত হইয়া তৎসম্বন্ধে সদস্যদিগের মতামত গৃহীত হইয়াছিল, তখন স্বরাজ্যপন্থীরা একটিমাত্র ভোটের আধিক্যে সেই প্রস্তাব ব্যবস্থাপক সভায় অনুমোদিত করিয়া লইয়াছিলেন। অর্থাৎ মন্ত্রীদিগের বেতন মঞ্জুর করার পক্ষে যত ভোট হইয়াছিল, উহা না দেওয়ার পক্ষে তদপেক্ষা একটিমাত্র ভোট অধিক হয়। সুতরাং লাট বাহাদুর মন্ত্রী দুই জনকে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত রাখিলেও ব্যবস্থাপক সভার মঞ্জুরী না পাওয়াতে মন্ত্রীদিগকে বেতন দিতে পারেন নাই। ৭ই জুলাই পুনশ্চ মন্ত্রীদিগের সেই বেতনপ্রদান প্রস্তাবটি ব্যবস্থাপক সভায় পেশ হইলে হয় ত সরকার পক্ষেরও দুই একটি ভোট অধিক হইতে পারে, তাহা হইলে মন্ত্রীরা বেতন পাইবেন, এই শঙ্কায় স্বরাজপন্থীদিগের পক্ষ হইতে মিঃ জে এম সেন গুপ্ত এই মর্ম্মে এক মামলা উপস্থিত করেন, মন্ত্রীদিগের বেতন সম্বন্ধে যখন ব্যবস্থাপক সভা এক বার একটা সিদ্ধান্ত করিয়া দিয়াছেন, তখন ঐ বিষয় আর পুনরায় উপস্থিত করা যাইতে পারে না। এ প্রসঙ্গে পরে শ্রীযুত কুমারশঙ্কর রায় চৌধুরী এবং শ্রীযুত কিরণশঙ্কর রায় চৌধুরী মহাশয়দ্বয় কলিকাতা হাইকোর্টে এই মর্ম্মে এক মামলা উপস্থিত করেন যে, "ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি মিঃ কটন যেন ৭ই জুলাই তারিখের অধিবেশনে মন্ত্রীদিগের বেতন মঞ্জুর প্রস্তাব উপস্থিত করিবার অনুমতি না দেন।" হাইকোর্টের বিচারপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ঘোষ মহাশয় ঐ মামলা সম্বন্ধে এইরূপ রায় দেন যে, যত দিন পর্য্যন্ত আসল মোকর্দ্দমায় অর্থাৎ মন্ত্রীদের বেতন মঞ্জুরের প্রস্তাব আইনমতে আবার ব্যবস্থাপক সভায় পেশ করা যাইতে পারে কি না, তাহার চরম মীমাংসা না হইতেছে, তত দিন যেন মন্ত্রীদিগের বেতন মঞ্জুরীর প্রস্তাব বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় পেশ করিতে না দেওয়া হয়। হাইকোর্টের এই 'ইন্‌জংসান' পাইলে ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন প্রথম সাত দিনের জন্য, পরে অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখা হয়। সরকার আবার ঐ ইন্‌জংসানের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীলও করিয়াছিলেন। ১৭ই জুলাই ঐ আপীল শুনানীর দিন ছিল।

ইহার পূর্ব্বেই বাদিদ্বয়ের পক্ষ হইতে ঐ মামলা তুলিয়া লইবার জন্য আবেদন করা হয়। তাঁহারা বলেন যে, তাঁহারা যাহা চাহিয়াছিলেন, তাহার অধিক পাইয়াছেন; সুতরাং তাঁহাদের ঐ মামলা চালাইবার আর



মৌলবী ফজলুল হক

কোন প্রয়োজন নাই। সরকারের তরফ হইতে এড্‌ভোকেট জেনারাল মামলা তুলিয়া লইবার আবেদনে আপত্তি করেন। তিনি বলেন, এই মামলার গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক। সুতরাং হাইকোর্টের বিচারে ইহার একটা চূড়ান্ত মীমাংসা হওয়া আবশ্যক। তাহা না হইলে ভবিষ্যতে অনেক সময় এইরূপ আবেদনও ইন্‌জংসান হইবে। এ দিকে নিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় নামক

জনৈক জমীদার তাঁহার ব্যারিষ্টার মিঃ ল্যাংফোর্ড জেমসের মারফতে ঐ মামলার বাদী হইতে চাহেন। বিচারপতি ঘোষ মহাশয় প্রথম বাদী দুই জনকে বাদিপক্ষ হইতে মুক্তি দিয়া তৃতীয় ব্যক্তিকে অর্থাৎ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে বাদী বলিয়া গ্রাহ্য করিয়া লয়েন। রায় চৌধুরী মহাশয়-দ্বয়কে মিঃ কটনের খরচার জন্য দায়ী হইতে হইয়াছে। অতঃপর শ্রীযুত ধীরেন্দ্রনাথ রায়ও এই মামলায় বাদী হইবার জন্য আবেদন করেন।

হাইকোর্টে আইন লইয়া উভয় পক্ষে যখন এইরূপ কোস্তাকুস্তি চলিতেছিল, সেই সময়ে ভারতসচিবের অনুমতি লইয়া ভারত সরকার শাসন-সংস্কার অনুসারে শাসনযন্ত্র পরিচালিত করিবার জন্য বিধির মধ্যে এই বিধিটি সন্নিবিষ্ট করিয়া দিলেন যে, "পূর্ব্ব কাউন্সিলে কোন বাবদ ব্যয়ের প্রস্তাব বা দাবী যদি একবার নামঞ্জুর হয়, তাহা হইলে আবশ্যকমতে পুনরায় সেই বাবদ ব্যয় মঞ্জুর করাইবার জন্য ঐ দাবী আবার ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থাপিত করা যাইবে।" সুতরাং যাহা লইয়া এত ঠেলাঠেলি, সরকারের এক আঁচড়েই তাহা সমস্তই চুকিয়া গেল। মূল মামলা, ইনজংসান মামলার আপীল সমস্তই ডিস্‌মিস হইল।

নারী-মঙ্গল

বিগত ২৫শে জুলাই শুক্রবার ভারতবর্ষের জন্য নির্দ্দিষ্ট দিনে রাজ্যেশ্বরী মেরী বৃটিশ সাম্রাজ্যপ্রদর্শনীতে এক অভিভাষণ পাঠ করেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছেন,—

"আমি দুইবার ভারতবর্ষে গিয়াছি, তাহাতে ভারতীয় ললনাদিগের মানসিক উচ্চতার, করুণার ও সরলতার অনেক সুখস্মৃতি আমার মনে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। আমি সর্ব্বদাই ভারতীয় নারীদিগের কথা স্মরণ ও তাঁহাদের কল্যাণ কামনা করি। গৃহই স্ত্রীজাতির বিশাল কর্ম্মক্ষেত্র, আমি দুইবার তাঁহাদিগকে গৃহ সম্বন্ধে আমার কথা জানাইয়াছি। গৃহই জাতির ও সাম্রাজ্যের ভিত্তিক্ষেত্র। ভারতবর্ষে গৃহই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হয়। এখন ভারতে সুস্থ-কায় ও শক্তিশালী সন্তানের প্রয়োজন। তাহাদের ধারণা ও আদর্শ যেন সুবুদ্ধির পরিচায়ক ও সুস্থ হয়। ভারতের গৃহ যেমন পবিত্র, পৃথিবীর আর কোন দেশের গৃহ তেমন পবিত্র নহে; ভারতের গৃহ দ্বারা যেমন কায হইতে পারে, পৃথিবীর আর কোন দেশের গৃহের দ্বারা তেমন কায হইতে পারে না। তাহার কারণ, ভারত-বাসীর জীবনের উদ্দেশ্য—গৃহের উপর মমতা, পরিবার-বর্গের প্রতি আকর্ষণ। আমার বিশ্বাস, ভারতে স্ত্রী-জাতির ক্ষমতা যত অধিক, পৃথিবীতে আর কোথাও তাহাদের ক্ষমতা তত অধিক নহে।"

রাজ্যেশ্বরী মেরীর এই উক্তি হইতেই তাঁহার অসাধারণ দৃষ্টিশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি ভারতললনার যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা যথার্থ ও নিখুঁত। ভারতীয় নারীর কর্ম্মক্ষেত্র যেমন বিস্তৃত, তেমনই তাহার অসাধারণ ক্ষমতার পরিচায়ক। যাঁহারা বিদেশী এবং বৈদেশিক শিক্ষার প্রভাবে বিভ্রান্ত, সেই সকল ভারত-বাসী মনে করেন যে, এ দেশের মাতৃজাতি অন্য দেশের নারীজাতির ন্যায় স্বাধীনা ও স্বতন্ত্রা নহেন, সুতরাং তাঁহারা অবজ্ঞাতা ও উপেক্ষিতা। তাঁহাদের ভ্রান্তির অন্ত নাই। এ দেশের নারীর কর্ম্মক্ষেত্র স্বতন্ত্র হইলেও অতি বিস্তৃত, ক্ষমতাও সেইরূপ অতি উচ্চ। তাঁহাদের সেই কর্ম্মক্ষেত্র সঙ্কুচিত ও সেই ক্ষমতা খর্ব্ব করিলে গৃহের অমঙ্গল ও গৃহস্থের সর্ব্বনাশ হয়, ইহাই হিন্দুর তথা ভারতবাসীমাত্রেরই ধারণা। অতি প্রাচীনকাল হইতেই জাতির মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে। ভারতের অতি প্রাচীন স্মৃতিকার মনু বলিয়াছেন,—"যে পরিবারমধ্যে স্ত্রীলোকরা সদাই দুঃখিতা থাকেন, সেই কুল শীঘ্রই বিনষ্ট হয়; যথায় স্ত্রীলোকের কোন দুঃখ নাই, সেই পরিবারের সর্ব্বদা শ্রীবৃদ্ধি হইয়া থাকে। স্ত্রীলোকরা সম্মানিতা না হওয়াতে যে গৃহে অভিসম্পাত করেন, সেই কুল অভিচারহতের ন্যায় বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে" (৩৫৭-৮)। সুতরাং যেখানে নারীর অধিকার, সেখানে তাঁহাদের ক্ষমতা ও স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন করা হিন্দুর শাস্ত্রসঙ্গত নহে।

হিন্দুর দৃষ্টিতে নারী ভোগের বস্তু নহে; তাই এ দেশে নারীর পূজা হয়। এ দেশে কুমারী ও সধবা পূজার ব্যবস্থা সেই জন্য। "স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু" ইত্যাদি

বাক্য নারীমাত্রতেই দেবীবুদ্ধি ও মাতৃবুদ্ধিরই সূচনা করে। এখানে কলত্র ভোগের বস্তু নহে,—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ সাধনের সহায়। সেই জন্য স্ত্রী সহধর্ম্মিণী। সুতরাং তাঁহাদের কল্যাণে জাতির কল্যাণ, তাহা এ দেশের লোক বুঝে। আর তাহারা ইহাও বুঝে যে, সংসারে নারীকে পুরুষের প্রতিদ্বন্দ্বী না করিয়া তাঁহাকে সঙ্গিনী ও শক্তিদায়িনীরূপে প্রতিষ্ঠিত করাই কর্ত্তব্য। সেই জন্য এখানকার স্ত্রী স্বামীর গৃহিণী, সচিব, সখা এবং কল্যাণদায়িনী। সেই জন্য এখানে নারীর কর্ম্মক্ষেত্র স্বতন্ত্র করা হইয়াছে। সে ক্ষেত্রে নারীর কায পুরুষের কায অপেক্ষা জাতীয় হিসাবেও অনেক উচ্চ।

কালবশে, শিক্ষাবিভ্রাটে এবং অজ্ঞতার ও দারিদ্র্যের বৃদ্ধিতে আমরা আজ সেই উচ্চ আদর্শ হইতে স্খলিত। সেই জন্য নারীজাতির প্রতি আমরা আমাদের কর্ত্তব্যসাধনে পরাঙ্মুখ। নানা কারণে নারীদিগের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইতেছে।

সম্প্রতি সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগ হইতে ১৯২২ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয় যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, ১৯২১ খৃষ্টাব্দে প্রথম বাঙ্গালায় প্রসবকালীন ও প্রসবের পর ১৪ দিনের মধ্যে নারীদিগের মৃত্যুর হিসাব রাখিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে এইরূপ কারণে ১ হাজার ৬ শত ৫৬টি মৃত্যুর বিবরণ পাওয়া গিয়াছিল। পরবৎসর ২ হাজার ৫ শত ৬৫টি মৃত্যুর বিবরণ পাওয়া গিয়াছিল। আমরা নিম্নে কয়টি বিভাগের হিসাব প্রদান করিলাম,—

বর্দ্ধমান বিভাগ	৬৪৫
প্রেসিডেন্সী বিভাগ	৬১১
রাজসাহী বিভাগ	১১৬৫
ঢাকা বিভাগ	১৪২
চট্টগ্রাম বিভাগ	৪

পাবনা জিলায় জন্মের হিসাব ৩৮ হাজার ৭ শত ৫৪ জন, আর এইরূপ কারণে মৃত্যুর সংখ্যা ৮ শত ৩ অর্থাৎ প্রতি হাজার জন্মে ২০টি। বাঙ্গালার প্রকৃত অবস্থা ইহা হইতে অনুমান করা যায়। কেহ কেহ হয় ত মনে করিবেন, এই অনুমান অতিরঞ্জিত। কিন্তু তাঁহারা যেন স্মরণ করেন, ১৮৮১-৯০ খৃষ্টাব্দের হিসাবে দেখা যায়, বিলাতেও হাজারটি জন্মে এইরূপ মৃত্যুর হার ৫ ছিল, কোন কোন অঞ্চলে ১০ পর্য্যন্ত ছিল। এই হিসাব বিবেচনা করিলে এবং বাঙ্গালার কয়টি স্থানের অভিজ্ঞতা বিচার করিলে মনে হয়, পাবনার হিসাব অতিরঞ্জিত নহে। প্রসবজনিত মৃত্যুর মধ্যে মাতৃত্বের সর্ব্ববিধ মৃত্যু অবশ্য ধরা হয় না। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের হিসাবে শেষোক্ত মৃত্যুর সংখ্যা ৬০ হাজার বলিয়া ধরা হইয়াছিল। গত বৎসর যে ভাবে হিসাব ধরা হইয়াছিল, সেই ভাবে হিসাব ধরিলে এ বৎসর মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়ায়—৪৫ হাজার অর্থাৎ প্রতি ১ হাজার জন্মে এইরূপ মৃত্যুসংখ্যা ৩৫ ধরা যায়।

এই হিসাব দেখিলেই বুঝা যায় যে, এই বিষয়ে জনসাধারণের অবহিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্বকালে বাঙ্গালার সর্ব্বত্র যেরূপ অভিজ্ঞ ধাত্রী পাওয়া যাইত, এখন আর তাহা পাওয়া যায় না। উপযুক্ত চিকিৎসকও পল্লীগ্রামে পাওয়া কঠিন ও ব্যয়সাধ্য। ফলে প্রসবকালীন মৃত্যুর হার বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহার প্রতীকার করা নিতান্ত আবশ্যক। ম্যালেরিয়ার প্রাবল্যও এই প্রসূতি-মৃত্যুর একটা অতি প্রবল কারণ। সুতরাং ইহার প্রতীকার করিতে হইলে লোকশিক্ষার ও স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার, শিশুমঙ্গল ও মাতৃমঙ্গল সমিতির ন্যায় সমিতির প্রতিষ্ঠা এবং দেশের দারিদ্র্যনাশ ও ম্যালেরিয়ার উচ্ছেদ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। আর সর্ব্বোপরি অধুনা দেশকালপাত্রের অনুযায়ী করিয়া সেই প্রাচীন আদর্শের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

রক্ষাশুল্কের প্রার্থনা

ইস্পাতের উপর রক্ষাশুল্ক ধার্য্য হইয়াছে দেখিয়া এ দেশী কাগজের কারখানাওয়ালা, সিমেন্টের কারখানাওয়ালা এবং দেশলাইয়ের কারখানাওয়ালা প্রভৃতি রক্ষাশুল্ক প্রাপ্তির জন্য আবেদন করিয়াছেন। টেরিফ বোর্ড বা শুল্কসমিতি কাগজওয়ালাদের এই আব্দার রক্ষা করা যায় কি না; সে বিষয়ে তথ্যসংগ্রহকার্য্য সম্প্রতি শেষ করিয়াছেন। এ দেশে কাগজের কারখানাওয়ালা প্রায় সকলেই

য়ুরোপীয়; সুতরাং শুল্কসমিতি তাঁহাদের কথা কতটা ঠেলিয়া ফেলিতে পারিবেন, তাহা বলা কঠিন। কিন্তু অন্যান্য পণ্য হইতে কাগজ সম্বন্ধে একটা বিশেষ বিবেচনা করিবার বিষয় আছে। কাগজ জ্ঞানবিস্তারের এবং লোকশিক্ষার একটি অতি আবশ্যক উপকরণ। সুতরাং ইহা যত সুলভ মূল্যে বিকায়, ততই মঙ্গল। কারণ, ছেলে-মেয়েকে শিক্ষা দিবার জন্য, সাংসারিক হিসাবপত্র রাখিবার জন্য, চিঠিপত্র লিখিবার জন্য কাগজ প্রত্যেক দীনদুঃখীরও দরকার হয়। সে কাগজের উপর অতিরিক্ত হারে কর বসাইলে কেবল শিক্ষাবিস্তারের উপর কর বসান হইবে না, অতি দীনদুঃখীরও অসুবিধার ও দৈন্যবৃদ্ধির সহায়তা করা হইবে। তাহার পর এ দেশে সৎসাহিত্যের সুলভ সংস্করণ ও সংবাদপত্র প্রচারের পথ রুদ্ধ হইয়া যাইবে। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে বিলাতে কাগজের উপর ধার্য্য শুল্ক উঠাইয়া দেওয়াতেই তথায় সৎসাহিত্যের ও সংবাদপত্রের প্রচার দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়াছে। সুতরাং কোন কাগজের উপরই সহজে রক্ষাশুল্ক প্রবর্ত্তিত করা উচিত নহে। সংবাদপত্রাদিতে যে কাগজ ব্যবহৃত হয়, তাহা কাষ্ঠমণ্ড হইতে প্রস্তুত। এ দেশে উহা প্রস্তুত হয় না, হইতেও পারে নাই। সুতরাং উহার উপর রক্ষা-শুল্ক বসাইবার কোন সার্থক হেতুই দেখা যায় না। আমরা এইরূপ শুল্কপ্রতিষ্ঠার বিরোধী। প্রত্যেক বিষয়ের অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করা বিধেয়। কাগজের কারখানাওয়ালারা কারখানার প্রতিষ্ঠাকালে এ দেশের লোককে অধিক পরিমাণে অংশীদারও করিতে চাহেন না। যুদ্ধের সময় সুবিধা পাইয়া তাঁহারা কাগজের দরও বেশ চড়াইয়াছিলেন। যুদ্ধের পূর্ব্বে কাগজের দর যত ছিল, এখনও তাহার দ্বিগুণ দর রহিয়াছে। ইহার উপর শুল্ক বাড়াইলে ভারতবাসীর বিশেষ ক্ষতি হইবে।

শাসন পরিষদে নদীয়ার মহারাজ

বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ শ্রীযুক্ত বিজয়চাঁদ বঙ্গীয় শাসন পরিষদের সদস্য পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিলে লর্ড লিটন বাহাদুর শ্রীযুত ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়কে ঐ পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ভূপেন্দ্র বাবু কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া ঐ পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন। এইবার লর্ড লিটন কৃষ্ণনগরের মহারাজা শ্রীযুত ক্ষৌণীশচন্দ্র রায়কে ঐ পদ প্রদান করিয়াছেন। কৃষ্ণনগরের রাজবংশ বাঙ্গালায় বিশেষ সম্মানিত। তাঁহাদের দান বাঙ্গালায়, বিশেষতঃ মধ্যবাঙ্গালায় সর্ব্বত্র বিদিত। ক্লাইব যখন বাঙ্গালা জয় করিয়াছিলেন, তখন এই রাজবংশ তাঁহাকে অল্প সাহায্য করে নাই। দুর্ভাগ্যক্রমে যে রাজবংশ এককালে বাঙ্গালায় বুধমণ্ডলীর আশ্রয় ও প্রতিপালক ছিলেন, যাঁহাদের পোষকতায় "ভুবনান্ত-গদাধর" নবদ্বীপের যশোভাতি সমগ্র ভারতে বিকীর্ণ হইয়াছিল, বিদ্যাবুদ্ধিপ্রতিভায় আজ সেই রাজবংশ



শ্রীযুত ক্ষৌণীশচন্দ্র রায়

নিষ্প্রভ ও মলিন। সেই রাজবংশের রাজা ক্ষৌণীশচন্দ্র আজ বাঙ্গালায় শাসন পরিষদের সদস্য হইয়া যদি সেক্রেটারীর হস্তে একটা ক্রীড়ার পুত্তলিমাত্র হইয়া থাকেন, নিজে কেবল শোভাসম্পাদক নামমাত্র মন্ত্রী হইয়া সেক্রেটারীকে প্রকৃত মন্ত্রী করিয়া রাখেন, তাহা হইলে আমাদের আর লজ্জা রাখিবার ঠাঁই থাকিবে না। পক্ষান্তরে, তিনি যদি নিজে সকল বিষয় বুঝিয়া সমজাইয়া স্বাধীনভাবে দেশের কল্যাণকল্পে আপনার কর্ত্তব্য পালন করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার কার্য্যফলে নবদ্বীপ রাজবংশের নিষ্প্রভ গৌরব সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিবে।



১লা জ্যৈষ্ঠ—

ঢাকায় বালিকা হরণের মামলায় নারীর কারাদণ্ড। ভাগলপুরে বলশেভিকবাদ প্রচারে এম, এস, সি ও ১১০ জন গ্রেপ্তার। জলপাইগুড়ী সোনাপুর গ্রামে বালিকা হরণ। বহরমপুরে হোলির দিন সিভিল সার্জ্জেনের গায়ে রং দেওয়ায় আসামীদের অর্থদণ্ড। হাওড়া পীলখানা হাঙ্গামার ৪ জন আসামী দায়রায় সোপর্দ্দ। শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন দাশ মেদিনীপুর হইতে পুনরায় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত। রোমনগরে চতুর্থ আন্তর্জ্জাতিক মহাসমিতিতে ভারতের প্রতিনিধির যোগদানে অধিকার। শ্রীরামপুর আদালতে স্বামী বিশ্বানন্দের প্রাণনাশের কথা বিচারে হুলস্থুল। পাবনা জিলায় চাঙ্গাই-কোণায় কায়স্থগণের উপবীত গ্রহণ।

২রা জ্যৈষ্ঠ—

নোয়াখালি রামগঞ্জে মুসলমান কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণ পুরোহিত খুন। তারকেশ্বরে লোমহর্ষণ কাণ্ড, সন্ন্যাসীর রক্তস্রোতে দেবস্থান রঞ্জিত, স্বামী সচ্চিদানন্দ প্রমুখ ৯ জন সাংঘাতিক আহত। রেঙ্গুনে রিকসা-চালকগণের ধর্ম্মঘট। হায়দ্রাবাদ হইতে প্রথম মুসলমান মহিলা বি, এ, পাশ। বিমানবীর লেপ্টেনাণ্ট ডয়েসীর বিপদ, উড়োজাহাজ ভগ্ন। বালী গোস্বামী পাড়ায় হুলস্থুল, পুলিসের বিরুদ্ধে ভীষণ অভিযোগ।

৩রা জ্যৈষ্ঠ—

রামমোহন লাইব্রেরীতে প্রথম খাদি প্রতিষ্ঠানের 'দেশের পরিচয়ে বস্ত্র ও শিল্প' প্রদর্শন। মাদ্রাজের কোটায়াম জিলা হইতে শ্রীযুত রামস্বামী নায়কারকে বহিষ্কারের আদেশ। তারকেশ্বরে মোহান্ত কর্ত্তৃক ভোগের জন্য মন্দিরে বাসন প্রেরণ বন্ধ—মহাবীরদল কর্ত্তৃক মাটীর পাত্রে ভোগ প্রদান। হাঙ্গামা সম্পর্কে জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেটের তদন্ত। মির্জ্জাপুর পার্কে পণ্ডিত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তীর সভাপতিত্বে সভায় তারকেশ্বর সত্যাগ্রহের জন্য লোক আহ্বান। মহাপ্রাণ সি, এফ, এণ্ড্রুজের সভাপতিত্বে ভীল কনফারেন্স। সাতারা জিলায় ঈদ পর্ব্বের দিন মুসলমানগণ কর্ত্তৃক হিন্দু দেব-মূর্ত্তি ভগ্ন। বোম্বায়ে ভীষণ অগ্নিকাণ্ডে বহু লক্ষ টাকা লোকসান। আকালী নেতৃবৃন্দের মামলা সম্পর্কে অমৃতসর খালসা কলেজের অধ্যাপকের পদত্যাগ। ভাইকম সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে পরামর্শ গ্রহণের জন্য প্রতিনিধিগণের মহাত্মার সহিত সাক্ষাৎ। তারকেশ্বরে অবসরপ্রাপ্ত সবজজ শ্রীযুত শ্যামাচরণ উকীল বন্দোপাধ্যায় রিসিভার নিযুক্ত।

৪ঠা জ্যৈষ্ঠ—

শিরোমণি গুরুদ্বার প্রবন্ধক কমিটীর নির্দ্দেশমত কলিকাতায় শিখ পুণ্যাহ উৎসব—সহরে মিছিল ও বক্তৃতা। সোসাইটীর বার্ষিক উৎসবে মহাত্মার যোগদান। মির্জ্জাপুর পার্কে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের সভাপতিত্বে বিরাট সভায় তারকেশ্বর-সমস্যার আলোচনা—স্বামী বিশ্বানন্দের তারকেশ্বরে সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিবার সঙ্কল্প প্রকাশ। তারকেশ্বরে ধৃত মহাবীরদলের স্বেচ্ছাসেবকের উপর শ্রীরামপুর জেলে ভীষণ দুর্ব্ব্যবহার। বরিশালে বিষম ঝঞ্ঝায় বহু বাড়ী ধ্বংস ও কয়েকজনের মৃত্যু। শ্রীযুত শ্রীনিবাস শাস্ত্রীর ৩ মাস বিলাত-বাসের সঙ্কল্প। কুমিল্লা হইতে প্রাদেশিক কনফারেন্সের ৩০ জন প্রতিনিধির পদব্রজে সিরাজগঞ্জ যাত্রা। সাম্রাজ্য প্রদর্শনীতে ভারতের দ্রব্যসম্ভার দেখিয়া সম্রাটদম্পতীর প্রশংসা। মাদ্রাজে বক্তৃতা বন্ধের আদেশ অমান্যে নেতৃবৃন্দের কারাদণ্ড। ৬ শত হজ যাত্রীর স্পেশাল ট্রেণে কলিকাতা ত্যাগ।

৫ই জ্যৈষ্ঠ—

সিটি কলেজের ৩ জন ছাত্রের কলিকাতা হইতে পদব্রজে বৈদ্যনাথধাম যাত্রা। জেলে শ্রীমতী পার্ব্বতী দেবীর প্রতি দুর্ব্ব্যবহারে কলিকাতায় বিরাট প্রতিবাদ সভা। শ্রীযুত বিপিনচন্দ্র পালের সভাপতিত্বে ভারতসভা গৃহে সভায় টারিফ বোর্ডের প্রস্তাবের আলোচনা। আলিপুর ষড়্‌যন্ত্র মামলা সম্বন্ধে বিলাতের কমন্স সভায় আলোচনা। ধারোয়ার হাঙ্গামায় দণ্ডিত উকীলদ্বয়ের কারামুক্তি। লাহোর সেন্ট্রাল জেলে বাবর আকালী ষড়্‌যন্ত্র মামলার শুনানী আরম্ভ। বারাকপুরের কংগ্রেস কর্ম্মী জগন্নাথপ্রসাদের কারামুক্তি। ভারত-সচিব লর্ড অলিভিয়ারের ভারত আগমনের সংবাদ। কুট-এল-আমারার বীর জেনারেল টাউনসেণ্ডের মৃত্যু। তারকেশ্বরে ৭০ জন কনেষ্টবলের সাহায্যে রিসিভার কর্ত্তৃক মন্দির দখলের বিফল চেষ্টা। সিমলায় ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সম্মিলনে বড়লাটের উদ্বোধন বক্তৃতা। প্রসিদ্ধ ভূপর্য্যটক কাপ্তেন ওয়াণ্ডারওয়েল ও তাঁহার ভগ্নী আরেবার ফোর্ড মোটরে মার্কিণ হইতে করাচী আগমন।

৬ই জ্যৈষ্ঠ—

সুপ্রসিদ্ধ আইরিশ নেতা ডি, ভ্যালেরার মুক্তির জন্য মাতার আবেদন। কানপুরে বলশেভিক মামলার রায়—আসামী সৌকত ওসমানী, মজাফর আহম্মদ, অমৃত ডাঙ্গে ও নলিনীভূষণ দাসগুপ্ত প্রত্যেকের ৪ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড। জুহুতে মহাত্মা গন্ধীর সহিত স্বরাজ্যদলের নেতৃবৃন্দের পরামর্শ। গুরুদ্বার সমস্যার সমাধানের জন্য প্রবন্ধক কমিটীর সহিত সরকার পক্ষের মিটমাটের কথা। তারকেশ্বরে সত্যাগ্রহ আরম্ভ—৪ জন স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার। স্বামী সচ্চিদানন্দের বিরুদ্ধে চাবি চুরির অভিযোগে ওয়ারেণ্ট। তারকেশ্বরে পুলিসের লাঠীতে দুই জন মহিলা সাংঘাতিক আহত। বড়লাট লর্ড রেডিংএর বিলাতযাত্রার কথা। পোল ট্যাক্স স্থায়ী হওয়ার কেনি-

৭ই জ্যৈষ্ঠ—

মাদ্রাজে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, সাধারণের পক্ষ হইতে অভিনন্দনপত্র প্রদান। বিমানবীর ম্যাকলারেণের আকিয়াবে গমন। তারকেশ্বরে ১৪৪ ধারার আদেশ অমান্যে স্বামী বিশ্বানন্দ গ্রেপ্তার। লিলুয়া রেল-কারখানার ১৫০ জন মজুরের সত্যাগ্রহে যোগদান মানসে তারকেশ্বরে গমন। ভাইকম সত্যাগ্রহে ৫ জন মহিলা স্বেচ্ছাসেবিকার যোগদান। শ্রীযুত চক্রবর্ত্তী আয়েঙ্গারের কারাদণ্ড, শ্রীযুত নাইকারের বিরুদ্ধে সমন। পুনা সহরে শ্রীযুত কামাতের সভাপতিত্বে প্রাদেশিক মর্ষ্ঠারেট বৈঠক। মক্কা যাত্রীদিগকে খেলাফৎ নোট দ্বারা প্রবঞ্চনা। জৈঠোতে পঞ্চম সাহিদী জাঠা গ্রেপ্তার। পুরীর রাজকুমারের সহিত ময়ূরভঞ্জের রাজকন্যার বিবাহ সংবাদ। সিপাহীবিদ্রোহকালের বীর জেনারেল বরিখানের বিলাতে মৃত্যু।

৮ই জ্যৈষ্ঠ—

লিলুয়া রেলকারখানার ২ শত মজুরের তারকেশ্বরগমনের সঙ্কল্প, লিলুয়ায় হুলস্থুল, তারকেশ্বরে ট্রেণ যাতায়াত বন্ধ। শ্রীযুক্তা সরলা দেবীর সত্যাগ্রহে পুত্র প্রেরণের সঙ্কল্প। মাদ্রাজে মন্ত্রি সংবর্দ্ধনা বন্ধ। এডভোকেট জেনারেল এস, আর, দাশের বিরুদ্ধে ১৪৪ ধারার নিষেধাজ্ঞা জারির প্রার্থনা। বড়বাজার কটন ষ্ট্রীটে জলের খেলায় মাড়োয়ারী দল গ্রেপ্তার। অস্পৃশ্যতাবর্জ্জনে মাদ্রাজের ইয়াকুব হাসান। তারকেশ্বরে সুবিখ্যাত ইন্দ্রনাথ নন্দী গ্রেপ্তার। গুজরাটে প্রাদেশিক সামাজিক সম্মেলন। রাজদ্রোহসূচক পুস্তিকা প্রকাশে আকালী শিখের দ্বীপান্তর।

৯ই জ্যৈষ্ঠ—

তারকেশ্বর সত্যাগ্রহে শ্রীযুক্তা সরলা দেবীর উপদেশ—অধ্যাত্ম বলের স্থলে পাশব বলের উৎপত্তির আশঙ্কা। রঙ্গপুরের বরদাসুন্দরীর মামলার ফরিয়াদী পক্ষের সাক্ষীর বিপদ। তারকেশ্বর সত্যাগ্রহে মুসলমানের যোগদান। কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ সার আশুতোষ চৌধুরীর মৃত্যু,—কলিকাতার সকল আদালত বন্ধ। স্বরাজ্যদলের নেতৃবৃন্দের সহিত পরামর্শের পর মহাত্মা গন্ধীর অভিমত প্রকাশ—দাশ ও নেহরুর সহিত মতভেদ, কাউন্সিল প্রবেশের নিন্দা, কংগ্রেসের গঠনমূলক কার্য্যে দৃঢ় বিশ্বাস। বোম্বায়ের মজুরগণের অসুবিধায় লর্ড অলিভিয়ারের সহানুভূতি। কলিকাতায় কারেন্সী অফিসের কেরাণীবৃন্দের ধর্ম্মঘট। বরিশাল জিলার ভোলায় নারী-হরণের সংবাদ।

১০ই জ্যৈষ্ঠ—

বরিশাল পিরোজপুরে জিলা সম্মিলন ও আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক খদ্দর মেলা উদ্বোধন। শ্রীরামপুরে পাটের কলের কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক দেব-মূর্ত্তি অপসারণে প্রতিবাদ। দিল্লীতে মুসলমান ফকির কর্ত্তৃক ২টি ব্রাহ্মণবালক খুন। লাহোরে মিঃ মহম্মদ আলি জিন্নার সভাপতিত্বে নিখিল ভারত মোসলেম লীগের পঞ্চদশ অধিবেশন। ভাইকম সত্যাগ্রহে রামস্বামী নাইকারের কারাদণ্ড। বৈমানিক ম্যাকলারেণের দ্বিতীয় বিপদ। শ্রীযুত নীলকণ্ঠের ভাইকমে আগমনে বাধা—১৪৪ ধারার নিষেধাজ্ঞা জারি। ২৪ পরগণা ক্যানিং টাউনে ১০ বৎসরের হিন্দু বালিকানিগ্রহে আসামী দায়রায় সোপর্দ্দ। মাদারী-পুর এরিকাটি গ্রামে ভীষণ ডাকাতি, গুলীর আঘাতে জমীদার নিহত।

১১ই জ্যৈষ্ঠ—

বাঙ্গালার ইন্দ্রপাত, পাটনায় সন্ধ্যা ৭টার সময় সার আশুতোষ স্বর্গপ্রাপ্তি। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের পীড়া। ঢাকায় স্বামী জ্ঞানানন্দের বক্তৃতা—তারকেশ্বর সত্যাগ্রহের জন্য ৫২ লক্ষ সন্ন্যাসী প্রস্তুত। শাসন সংস্কার আইন পরিবর্ত্তনের জন্য কমিটী নিয়োগের প্রস্তাব। ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণে আপত্তিতে হায়দ্রাবাদ সিন্ধে গুর্খা কনেষ্টবলের প্রাণনাশ। বরিশাল চরসোনাপুরে খুনের মামলা—দুই জন আসামীর প্রাণদণ্ড ও এক জনের ৩ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড। নদীয়া, মুন্সিগঞ্জ বগাদী গ্রামে লোমহর্ষণ নারীনিগ্রহ। উত্তর-বঙ্গে পণ্ডিত সত্যচরণ শাস্ত্রীর হিন্দুধর্ম্ম প্রচার। চট্টগ্রামে দারোগার উপর গুলী—রেল ডাকাতী মামলার জের।

১২ই জ্যৈষ্ঠ—

সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের শব পাটনা হইতে কলিকাতায় আনয়ন—বিরাট অপূর্ব্ব মিছিল করিয়া শব কালীঘাট কেওড়াতলা শ্মশানঘাটে নীত। তারকেশ্বর-সমস্যায় সরকারী ইস্তাহার—আইন-সঙ্গত উপায়ে আন্দোলন চালাইবার জন্য অনুরোধ। ভাইকম সত্যাগ্রহে মহাত্মা গন্ধীর কথা—আন্দোলন চালনে পরামর্শ। শ্রীযুত ভূপেন্দ্রনাথ বসুর স্থানে বোম্বায়ের শ্রীযুত সমর্থ বিলাতে ভারত-সচিবের কাউন্সিলের সদস্য নিযুক্ত। সিভিল সার্ভিস সম্বন্ধীয় রয়াল কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ। ভারত-সরকারের করনির্দ্ধারণ কমিটী নিয়োগ—সভাপতি সার চার্লস টডহাণ্টার। কুষ্টিয়া ছত্রধরী গ্রামে সধবা ষোড়শী যুবতী অপহরণ। হাইকোর্টের জজ স্বর্গীয় চন্দ্রমাধব ঘোষের পুত্র সতীশচন্দ্র ঘোষের মৃত্যু। বিলাতে শ্রমিক বিল লইয়া মন্ত্রিগণের পদত্যাগের সঙ্কল্প। শ্রীযুত সি, রাজগোপালাচারীর ভাইকম গমন। চট্টগ্রামে দারোগার উপর গুলী সম্পর্কে নানাস্থানে খানাতল্লাস।

১৩ই জ্যৈষ্ঠ—

হুগলী জেলে স্বামী বিশ্বানন্দের প্রতি দুর্ব্ব্যবহার, বিশ্বানন্দের গ্রেপ্তারে হুগলী-চুঁচুড়ায় হরতাল, নানাস্থানে শ্রমিক চাঞ্চল্যের সংবাদ। সিমলায় ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে লৌহ-শিল্প রক্ষা বিলের আলোচনা। চিত্তরঞ্জন দাশের বোম্বাই হইতে কলি-কাতা আগমন। মোস্লাল বৈঠক বন্ধ, তুরস্ক বৃটীশের প্রস্তাবে অসম্মত। রুসিয়ায় উৎকোচ গ্রহণ অপরাধে বিচারকদিগের প্রাণদণ্ড ও নির্ব্বাসন দণ্ড। আসামের প্রতি মহাত্মার বাণী—ঘরে ঘরে চরকা চালাও। সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে পাটনা ও কলিকাতা হাইকোর্টে শোক-সভা।

১৪ই জ্যৈষ্ঠ—

বিলাতে শ্রীমতী বেসান্তের বক্তৃতায় ভারত-প্রসঙ্গ। ভবানীপুর হরিশ পার্কে সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের শোক-সভা। তারকে-শ্বরের সকল অধিবাসীর সত্যাগ্রহে যোগদানের সঙ্কল্প। রঙ্গপুর জিলার শঙ্করপুর গ্রামে এক নারী দুই বার হরণ।

১৫ই জ্যৈষ্ঠ—

কলিকাতা কর্পোরেশনের সভায় মেয়র চিত্তরঞ্জন দাশ কর্ত্তৃক সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শন। মহাত্মা গন্ধীর আমেদাবাদ গমন। কলিকাতা মডেল স্কুলের কাগজপত্র চুরির মামলায় শিক্ষকের সাজা।

১৬ই জ্যৈষ্ঠ—

কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতি হইতে স্বরাজ্যদলকে বহিষ্কৃত করিবার জন্য মহাত্মা গন্ধীর স্পষ্ট কথা। মুলতান জেলের অনশনব্রতধারী আকালী বন্দীদের কারাদণ্ড। মাদ্রাজে ভীষণ রেল ধর্ম্মঘট। তারকেশ্বরে শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন দাশ,সত্যাগ্রহে যোগদানের ইচ্ছা প্রকাশ, লক্ষ্মীনারায়ণ-জীর পূজায় বাধা, টেলিগ্রাম বন্ধ।

১৭ই জ্যৈষ্ঠ—

ভাইকম সত্যাগ্রহে নেতৃবৃন্দের ১৪৪ ধারার আদেশ অমান্য। সিরাজগঞ্জে প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন—সভাপতি মৌলানা আক্রাম খাঁ, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী। সিরাজগঞ্জে শ্রীযুত সাহিদ সারওয়ার্দ্দীর সভাপতিত্বে বঙ্গীয় যুবক সম্মিলনীর অধিবেশন, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি—শ্রীযুত দিলীপ-কুমার রায়। সিরাজগঞ্জে গাড়ী উল্টাইয়া আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় আহত। খাঁ বাহাদুর মসরফ হোসেনের সভাপতিত্বে সিরাজগঞ্জে মুসলেম কনফারেন্স। মাদ্রাজে রেল ধর্ম্মঘটে ট্রেণ চালকদিগের যোগদান। লণ্ডনে বোম্বাইবাসীদিগের বিরাট ভোজ।

১৮ই জ্যৈষ্ঠ—

সিমলায় সরকারী কমিটীতে স্বরাজ্যদলের সদস্যের যোগদান। সিরাজগঞ্জ কনফারেন্সে শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন দাশ, পণ্ডিত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী ও স্বামী শ্রদ্ধানন্দের যোগদান। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক সিরাজগঞ্জে খদ্দর প্রদর্শনী উদ্বোধন। দিল্লীতে বিরলা কটন মিলে দুর্ঘটনায় ১৭ জনের অপমৃত্যু। সিরাজগঞ্জে শ্রীযুত শশধর রায়ের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার অধিবেশন, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুত শৈলেশনাথ বিশি। বোম্বায়ে এক দিনে ৯ শত পাঠান গ্রেপ্তার, সকলের নির্ব্বাসনের ব্যবস্থা। ফরাসী গণ-তন্ত্রের সভাপতি মঁসিয়ে পোয়াঁকারের পদত্যাগ।

১৯শে জ্যৈষ্ঠ—

তারকেশ্বরে রিসিভারের কার্য্যে বাধাপ্রদানে ১৬ জন সত্যাগ্রহীর কারাদণ্ড। শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিকের পুনরায় ওকালতী আরম্ভ। নাগপুরের ডাক্তার মুঞ্জের ইস্তাহার—কংগ্রেস হইতে মহাত্মাকে বহিষ্কারের কথা। ভিয়েনায় ভীষণ ব্যাপার, চান্সেলার সিপেলের উপর গুলী। লণ্ডনে রুসিয়ার বলশেভিক প্রতিনিধিদিগের ভোজে ভারত-নেতাদের যোগদান। ভারত-সচিবের উক্তি—বর্ণভেদই বৃটীশ-সাম্রাজ্যের সর্ব্বনাশের কারণ। ফরাসীতে রাজনীতিক সঙ্কট। রেঙ্গুণে নলেজ সম্পাদকের সশ্রম কারাদণ্ড।

২০শে জ্যৈষ্ঠ—

শ্রীযুত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী বঙ্গীয় জাতীয় বণিক সভা হইতে পুনরায় ব্যবস্থাপকসভার সদস্য নির্ব্বাচিত। এলাহাবাদ মিউনিসিপ্যালিটীতে রাস্তার জাতীয় নাম প্রদানের প্রস্তাব। তারকেশ্বর-সমস্যায় কমিটী নিয়োগের জন্য উত্তরপাড়ার তারক মুখোপাধ্যায়ের প্রস্তাব। তারকে-শ্বরে বিহার-নেতা জগৎনারায়ণ লালের আগমন। তারকেশ্বরে কনেষ্টবলের অত্যাচারের কথা। জেলে স্বামী বিশ্বানন্দের পীড়া। মাদ্রাজে নোট জালে ৪২ জন গ্রেপ্তার। ঢাকা হইতে অনন্তকুমার মুখোপাধ্যায়ের পদব্রজে পেশোয়ার যাত্রার সঙ্কল্প। রেঙ্গুনে ভারত-বাসী ও চীনবাসীতে দ্বন্দ্ব।

২১শে জ্যৈষ্ঠ—

সম্রাটের জন্মদিন উপলক্ষে উপাধি-তালিকা প্রকাশ। ডাক্তার বরদারাজালু নাইডুর লোদাপুর গমনে কর্ত্তৃপক্ষের বাধা—ফলে দক্ষিণ-ভারত রেলপথে ধর্ম্মঘট। বোম্বায়ে সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের শোক-সভা। সিরাজগঞ্জ প্রাদেশিক কনফারেন্সে হিন্দু মোসলেম প্যাক্ট প্রস্তাব গৃহীত। বীরভূম জিলার মকদুমনগর গ্রামে মুসলমান কর্ত্তৃক দুর্গা প্রতিমা ভঙ্গ, হিন্দুগণ প্রহৃত। কলিকাতায় আবার রিভলভার সমেত ভারতীয় গ্রেপ্তার। বঙ্গীয় জাতীয় বণিক সভা হইতে শ্রীযুত যতীন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা পোর্ট ট্রাষ্টের সদস্য নির্ব্বাচিত। বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ শ্রীযুত বিজয়চন্দ মহাতাবের জন্মদাতা পিতা রাজা বনবিহারী কাপুর ও ভাগ্যকুলের রাজা শ্রীনাথ রায়ের মৃত্যু। স্বামী বিশ্বানন্দের জেলে রক্তবমনে সিরাজগঞ্জ কনফারেন্সে চাঞ্চল্য।

২২শে জ্যৈষ্ঠ—

মাদ্রাজে পুলিস ধর্ম্মঘটের ফলে ৩২ জন কনেষ্টবল কর্ম্মচ্যুত। তারকেশ্বরে আবার সন্ন্যাসীর রক্তপাত, স্বামী সচ্চিদানন্দ সাংঘাতিক আহত। মহাত্মাজীর নূতন প্রস্তাব, কংগ্রেস সভ্যদিগের সূতা কাটার কথা। ২৪ পরগণা ক্যানিং লাইনে দক্ষিণ গড়িয়ায় ভীষণ নারী-নির্য্যাতনের সংবাদ। খাসিয়া রমণী-হত্যায় ময়ূরভঞ্জের মহারাজার গুর্খা ভৃত্যের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। বিলাতে ওডায়ার-নায়ার মান-হানি মামলার রায়—সার শঙ্করণ নায়ারের পরাজয়। বেশ্যাবৃত্তি দমন আইনে কলিকাতা হইতে ৩ জন চীনা রমণী নির্ব্বাসিতা। রাজ-সাহী ডাসমারী গ্রামে ভীষণ নারীনির্য্যাতন। মাদ্রাজে শ্রীযুত সত্য-মূর্ত্তির সভাপতিত্বে প্রাদেশিক শিক্ষা সম্মিলন। সিমলা শৈলে সার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারীর সভাপতিত্বে সার আশুতোষের শোক-সভা। সরকারের সহিত আকালী কমিটীর মিটমাট অসম্ভব-সংবাদ।

২৩শে জ্যৈষ্ঠ

তারকেশ্বরে চিত্তরঞ্জন দাশ, তারকেশ্বর-সমস্যায় সারদাপীঠের জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য্যের তার। কংগ্রেস কর্ত্তৃক সত্যাগ্রহ আন্দোলনের ভার গ্রহণ—ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র গুহরায় কর্ম্মকর্ত্তা নিযুক্ত। বর্দ্ধমান সমস্যায় মহাত্মা, সিরাজগঞ্জ কনফারেন্সে গৃহীত 'গোপীনাথ' প্রস্তাবের নিন্দা। ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে গন্ধকের আমদানী শুল্ক উঠাইয়া দেওয়ার প্রস্তাব গৃহীত। সুরাট মিউনিসিপ্যালিটীর অসহযোগী সদস্য-গণের বিরুদ্ধে মামলার রায়—৪০ হাজার টাকা প্রদানের আদেশ। সিমলায় স্বরাজ্যদলের সভায় জেমসেদপুর শ্রমিক-সমস্যায় কমিটী নিয়োগ।

২৪শে জ্যৈষ্ঠ—

শ্রীযুত বসন্তকুমার মজুমদার ও হেমপ্রভা মজুমদারের সত্যাগ্রহে পঞ্চদশ বর্ষীয় পুত্র দান। বগুড়ায় থিয়েটারে পুলিস কর্ত্তৃপক্ষের বাধা প্রদান। ত্রিপুরা ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ভয়াবহ নারীনির্য্যাতন। বরিশালে দারোগা খুনের মামলার রায়—আসামীদিগের মুক্তি। ক্ষিপ্তজন্তু দংশনের চিকিৎসায় সরকারী ইস্তাহার, কলিকাতায় পাস্তুর ইনিষ্টিটিউট। মানহানি মামলার রায় অনুসারে সার শঙ্করণ নায়ারের প্রতি ২০ হাজার ৫ শত পাউণ্ড প্রদানের আদেশ, বিচারপতি ম্যাকার্ডির ব্যবহারের দোষ প্রদর্শন।

২৫শে জ্যৈষ্ঠ—

ভাইকম সত্যাগ্রহে পুলিসের নূতন জুলুম, স্বেচ্ছাসেবকদিগকে মারপিট ও গালাগালি। গোপীনাথ প্রস্তাবে শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন দাশের কৈফিয়ৎ। সিরাজগঞ্জ কনফারেন্সের প্রস্তাব সম্বন্ধে বিলাতে কমন্স সভায় আলোচনা। টাঙ্গাইল নাগোরপুরে বৈষ্ণবী নিগ্রহ। ডুমরাও-রাজ মামলার রায়, মহারাজার পরাজয়। নদীয়া গোয়ালপাড়ায় ভীষণ ডাকাতি। খিদিরপুরে ছেলেধরার গুজব, ফলে একজন শিখ নিহত ও ৩ জন আহত। বৃটেনে রুস ষড়যন্ত্র। ২৪ পরগণা বিষ্ণু-পুরে বালিকা হত্যায় আসামীর দ্বীপান্তর। মিশরে বলশেভিক ষড়যন্ত্র, ১১ জন মিশরবাসী অভিযুক্ত। ইঙ্গ ইরাব সন্ধিতে যোগ-দাদের প্রতিনিধি সভার অসম্মতি। জাপানে হোটেলে মার্কিণগণের উপর অত্যাচার ও অপমান। প্যারিসে প্রেসিডেণ্ট মিলেরাঁকে পদচ্যুত করিবার উদ্যোগ।

২৬শে জ্যৈষ্ঠ—

শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগীর সভাপতিত্বে সিমলায় ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন। কলিকাতার কেল্লা হইতে বন্দুক চুরির সংবাদ। তারকেশ্বর হইতে মোহান্তের চেলা প্রভাত গিরি কর্ত্তৃক গুণ্ডা ও পুলিসের সাহায্যে অস্থাবর সম্পত্তি স্থানান্তরিত। তারকেশ্বরে নলকূপ খননে মহাবীর দলের বিপদ, স্বেচ্ছাসেবকদিগের বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ। পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর পীড়া। বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্য অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিলাতে য়ুরোপীয় মহিলা বিবাহ।

২৭শে জ্যৈষ্ঠ—

তারকেশ্বর সত্যাগ্রহে স্বামী সচ্চিদানন্দ গ্রেপ্তার, ৬২ জন মহিলার স্বামীজির সহিত আত্মদান। আদালত অবমাননায় স্বামী বিশ্বানন্দের কারাদণ্ড। ভারতে বিলাতের মত মাটীর নীচে রেল চালাইবার প্রস্তাব। নাগপুরে পুনরায় জাতীয় পতাকা আন্দোলন আরম্ভ। ডেরাগাজি খাঁ জেলে সর্দ্দার খড়্গ সিংএর প্রতি দুর্ব্ব্যবহার। কলিকাতার খিদিরপুর নূতন ডকের জন্য শিখ ট্যাক্সি চালক কর্ত্তৃক ছেলে ধরার গুজব—ফলে সহরের নানাস্থানে ভীষণ হত্যাকাণ্ড, কড়েয়ায় শিখ মহিলা ও শিখ শিশু খুন। বাঙ্গালার ছয় জন রাজবন্দী মান্দালয় জেলে স্থানান্তরিত। শ্রমজীবী সংঘের সম্পাদকের পদচ্যুতিতে খড়্গপুরে শ্রমিক চাঞ্চল্য। বিলাতে ভারত সরকারের ভূতপূর্ব্ব পররাষ্ট্র সচিব সার হেনরী মার্টিনারের মৃত্যু। ফরাসী প্রেসিডেণ্ট মিলের‍্যাঁর পদত্যাগ।

২৮শে জ্যৈষ্ঠ—

তারকেশ্বরে তরবারির মামলায় স্বামী বিশ্বানন্দের অর্থদণ্ড। শ্রীরামপুরে লোমহর্ষণ কাণ্ড, স্বামী সচ্চিদানন্দ ও বহু সংখ্যক সত্যাগ্রহী স্ত্রীলোক নির্ম্মমভাবে প্রহৃত। যশোহর মনোহরপুরে বালবিধবা হরণ ও দুর্বৃত্ত দল কর্ত্তৃক নারীহরণের হুমকি। প্রজাসভায় যোগদান করায় সাঙ্গলী দরবার কর্ত্তৃক উকীল সরকার শ্রীযুত অভয়শঙ্কর পদচ্যুত। পুনা মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনের জন্য শ্রীমতী সরলা দেবীর পুনা যাত্রা। কলিকাতা ছেলেধরা হুজুগে শিবপুর, সালিমার ও মেটেবুরুজে হাঙ্গামা। স্বরাজের জন্য বিলাতে সকল ভারতীয় সম্প্রদায়ের সম্মিলিত দাবী। চীনে মার্কিণ পাদরী খুন।

২৯শে জ্যৈষ্ঠ—

শ্রীরামপুরে স্বামী সচ্চিদানন্দের উপর প্রহার সম্বন্ধে ম্যাজিষ্ট্রেটের বিবরণ। শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন দাশের তারকেশ্বর সত্যাগ্রহে পুত্র প্রেরণের সঙ্কল্প। পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর ইস্তাহার—মহাত্মা গন্ধীর উপর অচলা ভক্তি প্রকাশ। গয়ায় মহিলা যাত্রীর প্রতি অনাচার, এক জনের মৃত্যু আর এক জন নিরুদ্দেশ। আসাম মন্ত্রীর বিরুদ্ধে ভীষণ অভিযোগ। গোপীনাথ প্রস্তাবে পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর কথা। মুঙ্গেরে ধর্ম্মসভায় বক্তৃতা লইয়া আর্য্যসমাজী ও মুসলমানে দাঙ্গা। পূর্ব্ব-আফ্রিকার নাইরোবীতে কংগ্রেস সভাপতি মিঃ দেশাইএর কারাদণ্ড। বাঙ্গালার শেষ ছোটলাট সার উইলিয়ম ডিউকের মৃত্যু।

৩০শে জ্যৈষ্ঠ—

তারকেশ্বরে ধৃত সত্যাগ্রহীর ভিড়ে হুগলী কারাগারে স্থানাভাব। আলিপুর ষড়্‌যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী নরেন্দ্রনাথ সরকারের কারামুক্তি। কলিকাতায় ছেলেধরা গুজবের হাঙ্গামার ফলে ১৮০ জন লোক গ্রেপ্তার। মুলসীপেটা সত্যাগ্রহে যোগদান করায় মিঃ দাস্তানের ওকালতী বন্ধ। চাঁদপুর ফরিদগঞ্জে য়ুনিয়ান বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট খুন। [illegible] বালিকা হরিতে ৫ জন মুসলমান গ্রেপ্তার। ভিক্ষু উত্তমের ব্রহ্মদেশের সংখ্যা গমনে পুলিসের বাধা প্রদান। বিসুবিয়স আগ্নেয়গিরিতে আবার অগ্ন্যুদ্গম। ফরাসী গণতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট পদে মসিঁয়ে ডুমার্গ নির্ব্বাচিত।

৩১শে জ্যৈষ্ঠ—

রুড়কী খুনের মামলায় আসামীর অব্যাহতিলাভ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের শোক-সভা—সভাপতি লর্ড লিটন কর্ত্তৃক সার আশুতোষের প্রশংসা। খালসা কলেজে ছাত্র ধর্ম্মঘট, কলেজের ফটকে পিকেটিং। তারকেশ্বর সত্যাগ্রহে শ্রীমান্ চিররঞ্জন দাশ গ্রেপ্তার।

১লা আষাঢ়—

বোম্বায়ের মিঃ জিন্নার সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচনে আপত্তি। ২৪ পরগণা ভাঙ্গড় অঞ্চলে বে-আইনি লবণ তৈয়ারীতে ধরপাকড়। কলিকাতা হাইকোর্টে টাটা এণ্ড সন্স বনাম বেঙ্গল ষ্টীমসিপ কোম্পানীর মামলার রায়—খেসারতের টাকা ডিক্রী। ফতেগড় জেল হইতে পার্ব্বতী দেবীর কারামুক্তি। কলিকাতার নানাস্থানে শিখ নির্যাতনের প্রতিবাদ সভা। বক্কানে বলশেভিক ষড়্‌যন্ত্র।

২রা আষাঢ়—

কাশীর ধ্রুবেশ্বর মঠে তারকেশ্বরের মোহান্তের অবস্থান। শোভাবাজার রাজবাটীর দৌহিত্র হৃষীকেশ মিত্রের তারকেশ্বর সত্যাগ্রহে যোগদান। ভাইকম্ সত্যাগ্রহে ৩ সহস্র আকালী বন্দী। করাচীতে লক্ষপতি গ্রীকের আত্মহত্যা। বড়লাটের শাসন-পরিষদের সদস্য সার মিয়া মহম্মদ সফির কার্য্যকাল বৃদ্ধি। ইটালীতে পার্লিয়ামেণ্টের সোসালিষ্ট সদস্য গুম।

৩রা আষাঢ়—

শ্রীরামপুরে হাঙ্গামায় ৩০ জন গ্রেপ্তার। পুনা জিলার জুনারতালুকে অন্নকষ্টে টাকা বন্ধ—ফলে বহু লোক গ্রেপ্তার। পঞ্জাবে সাহিদী জাঠার সাহায্যে এস, এস, সির কারাদণ্ড। বিলাতে সার উইলিয়ম ডিউকের মৃতদেহ দাহ। মুর্শিদাবাদ, কান্দীতে সতীর সহমরণ। মক্কায় তীর্থ যাত্রা লইয়া মিশর ও হেজের বিরোধের মীমাংসা। দক্ষিণ-আফ্রিকার পার্লিয়ামেণ্টের সাধারণ নির্ব্বাচনে জেনারেল স্মাটসের পরাজয়।

৪ঠা আষাঢ়—

নিখিল ভারত সাধু মহামণ্ডলের সম্পাদক স্বামী ব্রহ্মানন্দ ভারতীর তারকেশ্বর সত্যাগ্রহে যোগদান ও গ্রেপ্তার, তাঁহার সহিত মোট ৪১ জন গ্রেপ্তার। লণ্ডনে হিন্দু-মন্দির ও ধর্ম্মশালা প্রতিষ্ঠার আয়োজন। ওডয়ার নায়ার মামলার বিচারক ম্যাকার্ডিকে পদচ্যুত করিবার জন্য কমন্স সভায় প্রস্তাব। এলায়েন্স ব্যাঙ্ক বনাম চার্টার্ড ব্যাঙ্কের মামলায় চার্টার্ড ব্যাঙ্কের জয়।

৫ই আষাঢ়—

তারকেশ্বরের মোহান্তের পক্ষ সমর্থনে শ্রীরামপুরের উকীলগণের অনিচ্ছা প্রকাশ। রেঙ্গুনের নিউ বর্ম্মা পত্রের সম্পাদক ও মুদ্রাকরের কারাদণ্ড। পুনায় শ্রীমতী সরলা দেবী। নারায়ণগঞ্জে দফাদার খুনের মামলা—ধ্রুপতারা কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদকদ্বয়ের অব্যাহতি। নদীয়া জিলা বোর্ডের নির্ব্বাচনে স্বরাজ্যদলের জয়। ডেরা ইস্মাইলখাঁতে হাঙ্গামায় মোহান্ত আহত। শাঁখারীটোলা হত্যাকাণ্ডের আসামী বরেন্দ্রকুমার ঘোষের প্রিভি কাউন্সিলে আপীলের শুনানী। ষড়্‌যন্ত্র ও আত্মঘাতের অভিযোগে আলিপুরে ফিরিঙ্গী সিঙ্গসটনের কারাদণ্ড।

৬ই আষাঢ়

তারকেশ্বরে ৩০ মিনিটের মধ্যে ১৬ জন সত্যাগ্রহী গ্রেপ্তার। আগ্রার বিখ্যাত ডাকাত রাজ্জাক ও তাহার অনুচর করিমের শাস্তি। মাণিকতলা বোমার মামলার রায়, যশোদারঞ্জন পালের ১০ বৎসর ও অবনী ভট্টাচার্য্যের ৭ বৎসর দ্বীপান্তর। নদীয়া মুড়াগাছায় ভীষণ নারীনির্য্যাতন। কলিকাতা শোভাবাজারে বলদেব জিউর মন্দিরের মোহান্তের বহিষ্কার, মহাবীর দলের জয়। লক্ষ্মী মালাকরের ডাকাত-দল সম্বন্ধে সরকারী ইস্তাহার। ভাইকম সত্যাগ্রহী সম্বন্ধে মহাত্মার প্রস্তাব। বিলাতে কমন্স সভায় কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্রের কথা। জৈঠোতে ৬ষ্ঠ সাহিদী জাঠা গেপ্তার।

৭ই আষাঢ়—

সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মভূমি কাঁঠালপাড়ায় বঙ্কিম-সাহিত্য সম্মিলনের দ্বিতীয় অধিবেশন—সভাপতি পণ্ডিতপ্রবর পঞ্চানন তর্করত্ন। নেলোরে রাজ্যোৎসব উপলক্ষে পুলিস কর্ত্তৃক স্বরাজ পতাকা ভস্মীভূত ও মহাত্মার প্রতিকৃতি পদদলিত। পাবনা বেলতায় নারী-নির্য্যাতন মামলার রায়—দুই জন মুসলমানের কারাদণ্ড। ফরাসী প্রতিনিধি সভায় দুই বিরোধী দলে গালাগালি ও ঘুসোঘুসী। বিলাতে গোপীনাথ প্রস্তাব লইয়া গণ্ডগোল। দক্ষিণ-আফ্রিকার জাতীয় দল বৃটেশের সহিত সম্বন্ধরক্ষায় প্রতিশ্রুত। স্বনামধন্য অধ্যাপক ও ব্যবসায়ী শরৎকুমার দত্তের মৃত্যু। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সভায় স্বরাজ্যদলের অদ্ভুত ব্যবহার, বসন্তকুমার মজুমদার ও শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গালাগালি, পরিবর্ত্তনবিরোধী দল তাড়িত।

৮ই আষাঢ়—

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য স্বামী উমানন্দের তারকেশ্বরে আগমন। মীরাট জিলার হাপুর দেবমন্দিরে ডাকাতিতে ১৩ জন মুসলমানের কারাদণ্ড। হায়দ্রাবাদে হিন্দু রমণীর মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণে হিন্দু-মুসলমানে বিবাদ। বঙ্কিম-সাহিত্য সম্মিলনে শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন দাশ। বিলাতে হিন্দুমন্দির ও ধর্ম্মশালা প্রতিষ্ঠাকল্পে কলিকাতায় বিরাট জনসভা। হায়দ্রাবাদের নিজাম কর্ত্তৃক তুরস্কের পূর্ব্বতন খলিফার পেন্সন ব্যবস্থা। হাওড়া জেলার ঝিকরা গ্রামে লোমহর্ষণ নারী-নিগ্রহ। ভূপালরাজ্যে হিন্দুপ্রজা সাধারণের দুর্দ্দশা। মার্কিণের পোর্ট আর্থারে দুই জন জাপানী খুন।

৯ই আষাঢ়—

তারকেশ্বরে ভোট লুটের মামলায় স্বামী সচ্চিদানন্দের অব্যাহতি-লাভ, সত্যাগ্রহে এক মাসে ৬ শত ৪৫ জন গ্রেপ্তার। ভাইকম সত্যাগ্রহে চরকার প্রতি পুলিসের ক্রোধ। পাটনায় সেতুনির্ম্মাণে নর-বলির গুজব, জনতার উপর আক্রমণ ও ২ জন নির্দ্দোষ ব্যক্তি আহত। দিল্লীতে ছেলে চুরির অজুহাতে দাঙ্গা, আর্য্যসমাজীদের উপর মুসলমান-গণের আক্রমণ। কলিকাতায় শিখ হত্যার জের, ৫৮ জন আসামীর বিচার।

১০ই আষাঢ়—

বাঁকুড়া জেলে সত্যাগ্রহী বন্দীরা ভীষণভাবে প্রহৃত। ভাইকম সত্যাগ্রহে স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিচারে সত্যাগ্রহী পীড়ন। ফোর্ড মোটরে ভূপর্য্যটকের দলের কলিকাতা আগমন। সার আশুতোষ মুখো-পাধ্যায়ের মৃত্যুতে বিলাতে শোক-সভা। বলশেভিক ষড়যন্ত্র মামলার পঞ্চম আসামী সিঙ্গারা ভেলুর বিচার।

১১ই আষাঢ়—

২৪ পরগণা ক্যানিংএর নিকট মুসলমানে পেশোয়ারীতে দাঙ্গা, ১০ জন পেশোয়ারী আহত। সুরাটের নবযুগ সম্পাদক শ্রীযুত দেশাই-এর কারাদণ্ড। কাউন্সিল প্রবেশ সম্পর্কে জগদ্গুরু শ্রীশঙ্করাচার্য্য। বোম্বায়ের 'এডভোকেট অফ ইণ্ডিয়া' নামক দৈনিক সংবাদপত্র বিক্রয়। আমেদাবাদে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর অধিবেশনে মহাত্মা গন্ধীর প্রস্তাব বিধিবিরুদ্ধ প্রমাণের চেষ্টা। বিচারপতি মাকার্ডির পদচ্যুতি প্রস্তাবে প্রধান মন্ত্রী। লণ্ডনে মহামান্য আগা খাঁ পীড়িত। বিচারে শ্রীমান্ চিররঞ্জন দাশের দুই মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড।

১২ই আষাঢ়—

ভাগলপুরে স্বামী বিদ্যানন্দের কারাদণ্ড। অমৃতসর হইতে নবম সাহিদী জাঠের জৈঠো যাত্রা। আমেদাবাদে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটীতে মহাত্মার প্রস্তাব গৃহীত। দেওঘরে মণীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের মৃত্যু। স্বামী বিশ্বানন্দের পীড়া, হুগলীর জেল হাঁসপাতালে গমন। নাইরোবীতে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর ষ্টীমারে চড়ায় বাধা। উৎকলের পণ্ডিত গোপবন্ধু দাশ ও ভাগীরথী মহাপাত্রের মুক্তি।

১৩ই আষাঢ়—

হুগলী জেলে স্বামী সচ্চিদানন্দের প্রায়োপবেশন। পঞ্জাবে দুই-খানি সংবাদপত্র অভিযুক্ত, সাম্প্রদায়িক বিরোধ প্রচারের জের। আমেদাবাদে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর অধিবেশন, মহাত্মা গন্ধীর বিরাট সংবর্দ্ধনা, মিটমাটের চেষ্টা। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের কটক-গমন। লর্ড রেডিংএর কথা—শাসনসংস্কার আইনের পরিবর্ত্তন প্রয়োজন। বড় লাট প্রভৃতির ছুটীর ব্যবস্থার আইন।

১৪ই আষাঢ়—

শ্রীহট্টে দ্বিতীয় চরমনাইর কাণ্ড, পুলিসের হস্তে পুরস্ত্রীর লাঞ্ছনার অভিযোগ। ঢাকার নানাস্থানে খানাতল্লাস। ১৮৮ ধারার বিচারে স্বামী বিশ্বানন্দের অব্যাহতি লাভ। আমেদাবাদে স্বরাজ্যদলের সহিত মহাত্মার আপোস, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীতে মহাত্মার প্রস্তাব গৃহীত। মস্কো নগরে আন্তর্জাতিক বলশেভিক কংগ্রেসে মানবেন্দ্র রায়ের প্রস্তাব—বৃটিশরাজ্যে বলশেভিকবাদ প্রচারের আয়োজন।

১৫ই আষাঢ়—

আমেদাবাদে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর অধিবেশনে স্বরাজ্য-দলের সভাগৃহ ত্যাগ ও পুনরায় প্রত্যাগমন, কংগ্রেসে উর্দ্দু ও দেব-নাগরী ভাষা ব্যবহারের প্রস্তাব গৃহীত। গোপীনাথ প্রস্তাবে মিঃ ডে'র হত্যায় দুঃখপ্রকাশ। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে কটকে প্রাদেশিক কনফারেন্স। আমেদাবাদে মহাত্মার 'আদালত বর্জ্জন' প্রস্তাব নিয়মবিরুদ্ধ হওয়ায় নাকচ।

১৬ই আষাঢ়—

আগ্রায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব। মালাবারে ভীষণ জলপ্লাবন—শত শত গৃহ নষ্ট ও বহু মানুষ ও পশুর প্রাণহানি। কেনিয়ায় ভারতীয়ের নির্য্যাতনে হারী ঠাকুর। হাওড়া মাকড়দহে কেরোসিনে মহিলার আত্মহত্যা। বোম্বায়ে দস্যুদলপতি গ্রেপ্তার। মহীশূরে মুদ্রাযন্ত্র আইন পাশ। ক্লিভল্যাণ্ডে ঘূর্ণাবাত্যায় ৭ সহস্র লোক নিরাশ্রয়। লাটগমনে চুঁচুড়ায় হরতাল।

১৭ই আষাঢ়—

এলাহাবাদে মাছ ধরায় কৃষি কলেজের দুই জন ছাত্র জলমগ্ন। তারকেশ্বরে পণ্ডিতপ্রবর পঞ্চানন তর্করত্ন। আমেদাবাদ সিদ্ধান্তে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন দাশ, শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার প্রভৃতির অভিমত প্রকাশ। ভাইকম সত্যাগ্রহে মহাত্মা গন্ধীর মত প্রকাশ। আসামে অদ্ভুত হুকুম—লক্ষ্মীপুর জিলার গরু-মারা চাপারী গ্রাম ধ্বংস। কটকে মহিলা সমিতিতে আচার্য্য প্রফুল্ল-চন্দ্র রায়। বালীগঞ্জের দানশীল [illegible]

১৮ই আষাঢ়—

আমেদাবাদে শ্রমিক ধর্ম্মঘট। তারকেশ্বর মোহান্তের হরিদ্বার-গমন—সাধু মহামণ্ডলের সহিত পরামর্শ। রূঢ় হইতে নির্ব্বাসিত ৪০ হাজার লোকের স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন। কলিকাতায় লাট প্রাসাদে জিলাবোর্ড কনফারেন্স। রাজসাহী জিলায় মাছ ধরায় মারামারি, এক জন লোক খুন। হুগলী জেলে গভর্ণর, সত্যাগ্রহীদের সহিত সাক্ষাৎ। বিলাতে লর্ড সভায় যুদ্ধের ব্যয়ের বৈধতাসংক্রান্ত আইনে সরকারের অষ্টমবার পরাজয়।

১৯শে আষাঢ়—

মুলতানের চকবাজারে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড, ৭৫ হাজার টাকা ক্ষতি। তারকেশ্বর সত্যাগ্রহে ৪৫ দিনে ৮ শতাধিক গ্রেপ্তার। ব্যবস্থাপক সভায় মন্ত্রীর বেতনপ্রস্তাবে বাধাপ্রদানের জন্য হাইকোর্টে মামলা আরম্ভ—বাদী যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত। শিয়াখালায় ডাকাতি, মহিলার মুখে জলন্ত মশাল প্রদান। বৃটিশ সাম্রাজ্যে পেনী ডাক মাশুল পুনঃ প্রবর্ত্তন। সামরিক কর্ত্তৃত্ব সম্বন্ধে মিত্রশক্তির পত্রের জার্ম্মাণী প্রদত্ত উত্তরে ফ্রান্সের অসন্তোষ। হুগলী জিলার নানাস্থানে ডাকাতিতে এক দল ডাকাত গ্রেপ্তার।

২০শে আষাঢ়—

মার্কিণ বিমানপোতবাহিনীর করাচী আগমন। সার জোয়ালাপ্রসাদ পাটনা হাইকোর্টের অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত। শিলংএ চা-বাগানের ম্যানেজার খুন, ১৪ জন লোক গ্রেপ্তার। জাপানে মার্কিণ পতাকা অপহারক ওসাকার গ্রেপ্তার। বারাকপুরের পেলাফৎকর্ম্মী জগন্নাথপ্রসাদের উপর ১১৬ ধারার আদেশ, ক্যাণ্টনমেণ্টে প্রবেশ নিষিদ্ধ। কলিকাতা লাটপ্রাসাদে কৃষি, শিল্প ও সমবায় বৈঠক। ফরিদপুর জিলার ভাঙ্গার হাটে ভীষণ দাঙ্গা, বহু লোক হতাহত। ভারতবাসীদিগের হংকং গমনে বাধা।

২১শে আষাঢ়—

তারকেশ্বরে রিসিভারের নোটীশ—৭ দিনের মধ্যে খাজনা না দিলে নালিশ। হুগলী জেলে শ্রীযুত চিররঞ্জন দাশ প্রভৃতির প্রায়োপবেশন। শ্রীযুত গোপবন্ধু দাশ কটক জিলাবোর্ডের চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেসন, লাট লিটনের বক্তৃতা—সার আশুতোষের স্মৃতিরক্ষার উপায় নির্দ্ধারণ, সহযোগ ও মৈত্রীর জন্য আবেদন। কালিমপং হাঁসপাতালে দার্জ্জিলিংএর গুর্খা-নেতা দলবাহাদুর গিরির কঠিন পীড়া। কলিকাতায় ফুটবল খেলায় ভারতীয় মিলিত দলের নিকট মিলিত ইংরাজ দলের পরাজয়। কলিকাতা কোম্পানী বাগানে কৃষি-শিল্প-সমবায় সভা। ভাইকম সত্যাগ্রহে অত্যাচারপীড়িত স্বেচ্ছাসেবকের আত্মহত্যা।

২২শে আষাঢ়—

তারকেশ্বরে সংবাদপত্রসম্পাদকবৃন্দ, সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ ও তদন্ত; স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত শ্রীযুত কৃষ্ণকুমার মিত্রের গোপনে কথাবার্ত্তা। ভবানীপুর চাউলপটী রোডে চন্দ্রকান্ত ঘোষের বাড়ীতে খাদ্যের দোষে একই দিনে ৬ জনের মৃত্যু। লালমণির হাটে বন্যায় ট্রেণ চলাচল বন্ধ। সিরাজগঞ্জ চৌহালী থানায় ১০ বৎসরের বালিকা নির্য্যাতন। লোকমান্য তিলকের মর্ম্মরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠায় পুনা মিউনিসিপ্যালিটীর সঙ্কল্প। কলিকাতায় পতিতা উদ্ধারিণী সভার অধিবেশনে আশ্রম প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প। আফগানিস্থানে গোপনে কামান প্রেরণের সংবাদ। নরওয়ের রাজধানী কৃশ্চিয়ানার নাম পরিবর্ত্তনের কথা। লাহোরে ভীষণ উত্তাপ—কয়েক জনের মৃত্যু। লণ্ডনে মিত্রশক্তির বৈঠক, ফরাসী সংবাদপত্রের বিরোধিতা। লণ্ডনে দৌড়ের প্রতিযোগিতায় ভারতীয় মল্লগণের পরাজয়। ম্যাঞ্চেষ্টারে মিসেস আনী বেসান্ত।

২৩শে আষাঢ়

কলিকাতা হাইকোর্টে বিচারপতি চারুচন্দ্র ঘোষের বিচারে ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি মিঃ কটনের উপর নিষেধাজ্ঞা, ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন বন্ধ—মন্ত্রীর বেতন প্রস্তাব আলোচনা স্থগিত। মাদ্রাজে পুলিস ধর্ম্মঘটের জের, ১৫ জন কনেষ্টবল কর্ম্মচ্যুত, ১৭ জনের নামে মামলা ও ৮ জন সাসপেণ্ড। মাদ্রাজের দুর্দ্দান্ত ডাকাত হরিকৃষ্ণ থিবনের হাঁসপাতালে মৃত্যু। সিরাজগঞ্জে বরল গ্রামে ৪ বৎসরের বালিকার উপর পাশবিক অত্যাচার। তালতলা থানায় হুলস্থুল, গোরা সৈনিকের দৌরাত্ম্য। বলকানে বলশেভিক সঙ্কট।

২৪শে আষাঢ়

তারকেশ্বর বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ যোগেশ ভট্টাচার্য্য গ্রেপ্তার। স্বামী ব্রহ্মানন্দের ৩ মাস কারাদণ্ড। পাথুরিয়াঘাটায় আহারের দোষে একই দিনে পিতাপুত্রের মৃত্যু। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বাঁকুড়ার সদস্য উমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অদ্ভুত প্রস্তাব—ট্রাম, মোটর, ট্যাক্সি ও সাইকেল বন্ধ। তারকেশ্বর সত্যাগ্রহীদের সশ্রম কারাদণ্ড প্রদানের ব্যবস্থা। হুগলী জেল হইতে স্বামী বিশ্বানন্দের কারামুক্তি। বিলাতে কমন্স সভায় ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদ বন্ধ রাখিবার কথা।

২৫শে আষাঢ়—

কলম্বো বন্দরে জাহাজে ১৯ বাক্স রিভলভার গ্রেপ্তার। অমৃতসরে সাহিদী জাঠার সহিত সরকারীর সংঘর্ষ। কারামুক্ত স্বামী বিশ্বানন্দের তারকেশ্বরগমন, সর্ব্বত্র বিরাট অভ্যর্থনা। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় তারকেশ্বরসংক্রান্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসায় বাধা। পঞ্জাবের লায়ালপুর জেল হইতে লালা শঙ্করলালের কারামুক্তি। ব্রাহ্মণবেড়িয়ায় সুকুমারী হরণের মামলাতে পোষ্ট-মাষ্টারের অব্যাহতি লাভ। ঢাকা হরিরামপুরে নারী-নির্য্যাতন।

২৬শে আষাঢ়—

তারকেশ্বর সম্পর্কে লর্ড লিটনের উক্তি, মির্জ্জাপুর পার্কে বিরাট প্রতিবাদ সভা। দার্জ্জিলিংএ ভীষণ বৃষ্টি, ট্রেণ চলাচল বন্ধ। কুচবিহার, দেওয়ানবশ গ্রামে ছয় বৎসরের হিন্দু বালিকার উপর পাশবিক অত্যাচার। মাদ্রাজের পোলাচীতে বিষম চাঞ্চল্য, হঠাৎ বহু রুগ্ন শ্রমিকের আগমন। সুদান ও মিশর সংক্রান্ত আলোচনার জন্য জগলুল পাশার লণ্ডনযাত্রা। জার্ম্মাণী হইতে গোপনে চীনে অস্ত্র প্রেরণ। রাজসাহী জিলার গহেলাপুর গ্রামে বৈষ্ণবী হরণ। চেতলা হাঙ্গামার ৪ জন আসামীর কারাদণ্ড।

২৭শে আষাঢ়—

জামীন প্রদানে স্বামী সচ্চিদানন্দের মুক্তি। কলিকাতার সেরিফের আহ্বানে ডালহৌসী ইনিষ্টিটিউটে সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের শোকসভা। গৌরীশঙ্কর অভিযানকারীদের প্রত্যাবর্ত্তন। দিল্লীতে হিন্দু-মুসলমানে বিষম সংঘর্ষ। হুগলী জিলায় ছেলে ধরার হুজুগ, পুলিস কনেষ্টবলকে মারপিট। আসামে নওগাঁ জিলায় ৯৬০টি বাড়ী ভস্মীভূত—সরকারী কর্ম্মচারীদের বিরুদ্ধে ভীষণ অভিযোগ। মন্ত্রি বেতন মামলায় সরকার পক্ষের আপীল। অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন আন্দোলনের জন্য কলিকাতার মাড়োয়ারীদের ৬৫ হাজার টাকা দান।

সম্পাদক—শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

কলিকাতা, ১৬৬ বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী' রোটারী মেসিনে শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত



গৃহস্থ-দর্শন

৪

সমবায় ও পর্য্যাপ্তি

অতিথি-সেবা গৃহস্থের ধর্ম্ম, অতিথির আশ্রয় প্রদানের জন্য যদি নিজ পরিবারস্থ কাহারও স্থান ত্যাগ করিতে হয়, সদ্‌গৃহস্থ তাহাতেও কুণ্ঠিত হয়েন না। নিজ পরিবারস্থ কোন ব্যক্তির আশ্রয়স্থানে অতিথিকে স্থাপন করিয়া সদ্‌গৃহস্থ কৃতার্থ হয়েন। এই 'সভ্যতার ও সুশিক্ষার যুগে' এমন অতিথি-সেবা-রত গৃহস্থ নির্ব্বুদ্ধি বলিয়া অনাদৃত হইলেও এখনও তেমন গৃহস্থ দুর্ল্লভ নহেন।

আমাদের এই 'গৃহস্থ-দর্শন'ও গৃহস্থের এ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন নাই। 'গৃহস্থ-দর্শন' প্রবন্ধ পরম আতিথেয়,—মুদ্রাকর বা সংশোধক মহাশয়ের হস্তকৌশল এই প্রবন্ধে অতিথি, আমার লেখনীপ্রসূত অক্ষরাবলী তাঁহার পরিবারবর্গ। 'গৃহস্থ-দর্শন' (বসুমতী ২৯৮ পৃঃ ২ স্তম্ভ ৩১।৩২ পং) 'কুসুম বা কমলের খণ্ড জ্ঞান' আমার অক্ষরবিন্যাসে আছে, অতিথি মহাশয় 'অ' দেহে আশ্রয় লইয়া 'খণ্ড'কে অখণ্ড করিয়াছেন, অতিথির এই অযাচিত সেবা-গ্রহণে গৃহস্থ-দর্শন চরিতার্থ, পাঠক বিস্মিত; এবং (৩৩০ পৃঃ, ১ স্তম্ভ ৩১ পং ও তৎপরবর্ত্তী কয়েক স্থানে) "বিশেষণকে জড়াইয়া" আছে, কিন্তু এখানেও অতিথির অনুগ্রহ—এখানে 'বিশেষণ' এই পদে 'ণ' অতিথিরূপে আসিয়াছেন, পরিবারস্থ 'বিশেষ্য' এই 'য' বা য-ফলা 'ষ'কে ছাড়িয়া গিয়াছেন, নিকটে থাকিলে পাছে অতিথির ক্লেশ হয়—'বিশেষ্যকে জড়াইয়া' এই কথা যেখানে আছে—সেখানেই অতিথির আশ্রয় প্রদানের জন্য 'বিশেষণকে জড়াইয়া' এমনটা হইয়াছে, ইহাতে অর্থ-হানি হইলেও 'গৃহস্থ-দর্শন' অতিথি-সেবা ত্যাগ করেন নাই। আরও এইরূপ অতিথি-সেবা আছে, বাহুল্যভয়ে প্রদান করিতে বিরত থাকিলাম। পাঠকগণ, এরূপ

অতিথিসেবায় আপনারা যেন বিরক্ত না হন, ইহাই প্রার্থনা।

এইবার পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞাত 'পর্য্যাপ্তি ও সমবায়ের' আলোচনা করিব। সেই আলোচনার উপযোগী বিচার প্রথমে কিছু না করিলেই নয়, তাই প্রথমে সেই বিচার বা মুখবন্ধ এই স্থানে সন্নিবেশিত হইতেছে,—

প্রত্যক্ষ ছয় প্রকার, চাক্ষুষ—চক্ষুঃ দ্বারা যে জ্ঞান হয়, রাসন—রসনা দ্বারা যে জ্ঞান হয়, ঘ্রাণজ—ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা যে জ্ঞান হয়, ত্বাচ—ত্বক্-ইন্দ্রিয় দ্বারা যে জ্ঞান হয়, শ্রাবণ—শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা যে জ্ঞান হয়, এবং মানস—মনের দ্বারা যে জ্ঞান হয়, বাহ্য ইন্দ্রিয় যে জ্ঞানে উপযোগী নহে, কেবল মনই যে জ্ঞানের করণ—এই ছয় প্রকার। রূপের প্রত্যক্ষ চাক্ষুষ, রসের রাসন, গন্ধের ঘ্রাণজ, স্পর্শের ত্বাচ, শব্দের শ্রাবণ ও সুখ দুঃখ জ্ঞান প্রভৃতির মানস প্রত্যক্ষ হয়। অহং সুখী, (আমি সুখী) অহং দুঃখী (আমি দুঃখী) অহং জানামি (আমি জানিতেছি) এই সকল জ্ঞান মানসপ্রত্যক্ষ। যে জ্ঞানের মানসপ্রত্যক্ষ হয়, তাহা 'বিশিষ্ট বুদ্ধি'। ফল এই, যে জ্ঞানে বিশেষ্য বিশেষণ থাকে, তাহা বিশিষ্ট বুদ্ধি; ঘট এই জ্ঞানে ঘটত্ব বিশেষণ, ঘট বিশেষ্য। ঘটত্বই জ্ঞানকে অপর জ্ঞান হইতে বিশেষযুক্ত বা পৃথক করিয়াছে, ঘট তাহা করে নাই, কেন না, 'দ্রব্য' এই যে জ্ঞান, ইহাতেও ঘট বিশেষ্য হইয়াছে, দ্রব্যসমূহের মধ্যে ঘটও ত আছে। 'ঘট' এই জ্ঞান ও 'দ্রব্য' এই জ্ঞান যে পৃথক্ প্রকার—তাহা সকলেরই অনুভবসিদ্ধ; এই পার্থক্য বা বিশেষ ঘট বা দ্রব্য দ্বারা হয় নাই, ঘটত্ব ও দ্রব্যত্ব দ্বারাই হইয়াছে। ঘট, দ্রব্য হইলেও ঘটত্ব আর দ্রব্যত্ব এক নহে; ঘটত্ব কেবল ঘটে আছে, দ্রব্যত্ব ঘট-পট প্রভৃতি সকল দ্রব্যেই আছে। জ্ঞানের এই যে বিশেষ্য ও বিশেষণ, তাহার সাধারণ সংজ্ঞা, 'বিষয়'। যাহা বিশিষ্ট বুদ্ধি, তাহাতে যে ধর্ম্ম বিশেষণ হইয়া থাকে (যেমন ঘট এই জ্ঞানে ঘটত্ব বিশেষণ), তাহার নাম 'প্রকার'। বিশিষ্ট বুদ্ধিতে প্রকার বা বিশেষণ এবং বিশেষ্য এ দুটি ছাড়া আরও একটি 'বিষয়' আছে, তাহা বিশেষ্য-বিশেষণের সম্বন্ধ। 'ঘট' এই যে বিশিষ্ট বুদ্ধি, ইহাতে ঘটত্ব বিশেষণ বা প্রকার, ঘট বিশেষ্য এবং ঘট ও ঘটত্বের যে সম্বন্ধ, তাহা সংসর্গ নামক বিষয়। এ সম্বন্ধ সমবায়—যে হেতু, এ সম্বন্ধ—অচ্ছেদ্য,—এই সমবায়ের কথা পূর্ব্ববারেও কিছু বলিয়াছি,—বিশেষ বক্তব্য বলিতেছি,—ঘট ও ঘটত্বের সম্বন্ধ তাদাত্ম্য নহে; অভেদ হইলেই তাদাত্ম্য হয়, যেমন মনুষ্যত্ব ও মনুষ্য এক নহে, তেমনই ঘটত্ব ও ঘট এক নহে; একটি ধর্ম্ম ও অপরটি ধর্ম্মী,—আশ্রয়; এরূপ স্থলে অভেদ বা তাদাত্ম্য সম্বন্ধ থাকিতে পারে না; এখানে অন্য সম্বন্ধ মানিতে হইবে; সেই সম্বন্ধই ন্যায়শাস্ত্রের পরিভাষায় 'সমবায়' নামে কথিত। জাতি, গুণ, কর্ম্ম প্রভৃতি ধর্ম্ম নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট আশ্রয়ে এই সম্বন্ধে থাকে। একত্ব দ্বিত্ব প্রভৃতি সংখ্যাও গুণ,—'একো ঘটঃ' এক ঘট—একত্ব—সংখ্যা,—ঘটে সমবায় সম্বন্ধে আছে। কিন্তু 'দ্বৌ ঘটৌ' এ স্থলে দ্বিত্ব সংখ্যা, পর্য্যাপ্তি সম্বন্ধে আছে—সমবায় সম্বন্ধে নহে। 'দ্বিতীয়ো ঘটঃ' দ্বিতীয় ঘট এইটি—এ স্থলে ঘটে যে দ্বিত্ব আছে, তাহা সমবায় সম্বন্ধে। দ্বিত্ব-সংখ্যার সম্বন্ধ ত্যাগ করিলে 'দ্বিতীয়' এরূপ ব্যবহার হইতে পারে না, যাহার দ্বারা দুই সংখ্যা পূর্ণ হইল, তাহাই দ্বিতীয় কি না। তবে 'দ্বৌ ঘটৌ' এ স্থলে যে দ্বিত্বসংখ্যা ঘটে সমবায় সম্বন্ধে নাই, তাহার হেতু জ্ঞান-ভেদ; সমবায় যেরূপ জ্ঞানের সংসর্গ হয়, পর্য্যাপ্তি সম্বন্ধ সংসর্গ হইলে সেরূপ জ্ঞান হয় না; পক্ষান্তরে, যেরূপ জ্ঞানে পর্য্যাপ্তি সম্বন্ধ সংসর্গ হয়—সমবায় সেরূপ জ্ঞানে সংসর্গ হয় না। সংসর্গতা জ্ঞানেরই অন্যতম বিষয়তা, সেই বিষয়তা লইয়াই সংসর্গ নামক বিষয় উল্লিখিত হইল। "দ্বিতীয়ো ঘটো ন দ্বৌ" এইরূপ জ্ঞান হয়, কিন্তু "দ্বৌ ঘটৌ ন দ্বৌ" এমন জ্ঞান হয় না। ভাবার্থ এই যে, এটি দ্বিতীয় ঘট—কিন্তু দু'টি ঘট নহে, (একটি ঘট ত দু'টি হইতে পারে না) এমন জ্ঞান হইয়া থাকে, অথচ দ্বিতীয় ঘটে যে দ্বিত্ব সমবায় সম্বন্ধে আছে, তাহা ঐ জ্ঞানের বিষয়; পক্ষান্তরে, "দু'টি ঘট দু'টি নহে" এমন জ্ঞান হয় না, এই জ্ঞান বাধিত;—অতএব 'দ্বৌ ঘটৌ' "দু'টি ঘট"—এই যে জ্ঞান,—দ্বিত্ব-সম্বন্ধ—'পর্য্যাপ্তি'—ইহার সংসর্গ, সমবায় নহে;—সমবায় হইলে দ্বিতীয় ঘট দু'টি ঘট নহে, এমন জ্ঞান হইতে পারিত না, যদি তাহা হইত, তাহা হইলে "দু'টি ঘট দু'টি নহে" এমন জ্ঞানও হইতে পারিত। ফল কথা, এই যে জাতির গুণ ও কর্ম্ম প্রভৃতি ধর্ম্ম সমবায় সম্বন্ধে

প্রত্যেক আশ্রয়ে থাকে, আর পর্য্যাপ্তি সম্বন্ধে সংখ্যা সমস্ত আশ্রয় ব্যাপিয়া থাকে, এক একটি আশ্রয়ে থাকে না। দু'টি ঘট—এ স্থলে দ্বিত্ব সংখ্যা পর্য্যাপ্তি সম্বন্ধে একেবারে দু'টি ঘটকেই ব্যাপিয়া আছে, একা একটি ঘটে থাকে না; 'দ্বিতীয় ঘট' এই স্থলে দ্বিত্ব, সমবায় সম্বন্ধে ঐ সংখ্যাসূচক একটি ঘটে আছে। সংখ্যাস্থলে পর্য্যাপ্তি সম্বন্ধের যেমন অভিব্যক্ত উদাহরণ—আবার ধর্ম্মের পর্য্যাপ্তি সম্বন্ধ থাকিলেও তাহার উদাহরণ সাধারণ পাঠকের তেমন বোধগম্য নহে,—সুতরাং সে প্রসঙ্গ এক্ষণে উত্থাপনীয় নহে। স্থূল কথা এই যে, সমবায় এবং সংযোগ প্রভৃতি সকল সম্বন্ধই প্রত্যেক আশ্রয়ে অবস্থিতির নিয়ামক এবং পর্য্যাপ্তি যুগপৎ সকল আশ্রয়ে অবস্থিতির নিয়ামক। এ সম্বন্ধে জগদীশ তর্কালঙ্কারের যে মত, তাহা অধিকতর দুরূহ,এজন্য তাহা এ স্থলে বিবেচিত হইল না। গুণ, সমবায় সম্বন্ধে দ্রব্যে থাকে—অন্যত্র সমবায় সম্বন্ধে থাকে না, কিন্তু 'পর্য্যাপ্তি' সম্বন্ধে থাকে। এই জন্য 'বার্ত্তাকুরেষা গুণসপ্তযুক্তা' 'ষড়্‌রসাঃ' ইত্যাদি প্রয়োগ সঙ্গত হইয়া থাকে। অতএব পূর্ব্ববারের প্রবন্ধে যে দ্রব্যলক্ষণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে 'জাতিমৎ' এই অংশ ব্যাখ্যায় যে জাতিপদের ব্যাবৃত্তি আছে—তাহা পর্য্যাপ্তি ও সমবায় সম্বন্ধের ভেদ বুঝিলেই বিশদভাবে হৃদয়ঙ্গম হইবে।

এক শ্রেণীর ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা এ সব আলোচনাকে নিষ্ফল মনে করেন, এ সব চিন্তাকে 'মস্তিষ্কের অপব্যবহার' বলেন, তাঁহাদিগের সহিত আমরা একমত নহি। কেবল আহারসংস্থানই মনুষ্যজীবনের লক্ষ্য নহে; ভাষা ও জ্ঞানের সূক্ষ্মতত্ত্ব আলোচনা মনুষ্য-জীবনের কর্ত্তব্য; যে চিন্তা বৈষয়িক আবিলতাশূন্য, তাহা যতই গভীর এবং যতই সূক্ষ্ম বিষয়ে নিমগ্ন হয়, মানবের মানসিক শক্তি ততই সুমার্জ্জিত ও সবল হয়। মানসিক শক্তি মার্জ্জিত ও সবল হইলে মানব জীবনের উচ্চস্তরে উত্থিত হয়। মনের দোষেই জীবের বন্ধন, মনের গুণেই জীবের মুক্তি; মন বিষয়ে আসক্ত যতই হইবে, ততই আবিলতাযুক্ত হইবে; যতই আবিল হইবে, ততই দুর্ব্বল হইবে; রজঃ ও তমোগুণের দ্বারা মনের যে আবরণ, তাহাই মনের দুর্ব্বলতা বা তাহার লক্ষণ। ভাষা ও জ্ঞান—অনুশীলনে, ভাষার বিশিষ্টতা রক্ষাবিধানের জন্য যে সূক্ষ্মতত্ত্ব আলোচনা, তাহা ন্যায়শাস্ত্রে নবীন উপায়ে সাধিত। যোগশাস্ত্রে 'যথাভিমতধ্যানাদ্‌বা' চিত্তের একাগ্রতা দ্বারা চিত্তবৃত্তি নিরোধের উপদেশ আছে, ন্যায়শাস্ত্রের প্রাচীন ও নবীন প্রস্থান সেই যথাভিমতধ্যানমার্গ সুপরিশুদ্ধ করিয়াছেন, তাহা 'মস্তিষ্কের অপব্যবহার' ত নহেই, বরং বিশেষ সদ্ব্যবহার।

মনকে একটি ক্ষুদ্র অসমর্থ বস্তু করিয়া রাখিলে চলিবে না,—মনকে ভোগবিলাসের উপকরণ ভাবিলে চলিবে না; চলিবে মনকে শক্তিশালী করিলে এবং তাহার স্বরূপ চিন্তা করিলে; চলিবে মনকে ক্ষুদ্র স্বার্থ হইতে উদ্ধার করিলে, মনকে একাগ্র করিয়া শব্দব্রহ্ম—ভাষাবিজ্ঞানের সূক্ষ্ম তত্ত্বের মধ্য দিয়া পরব্রহ্মতত্ত্বপ্রবেশে যোগ্য করিলে। চলিবে কেন, না তাহাই পরমানন্দরাজ্যের সনাতন পথ, বৈষয়িক উন্নতির উপায়চিন্তা যে আনন্দসম্পাদনে সমর্থ, সে আনন্দ কেবল দুঃখমিশ্রিত, প্রতীচী ত এখন সকলের হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছে, বিজ্ঞানসৌধের শীর্ষদেশে অবস্থিত বলিয়াও নব্য শিক্ষিতগণ মনে করেন, কিন্তু সেই প্রতীচীর আনন্দ কতটুকু আর দুঃখ কতটুকু, তাহা একবার কি ভাবা উচিত নহে? যদি ভাবিতে পার, যদি ভাবিবার মত সামর্থ্য তোমার থাকে, তখন নিশ্চয়ই বুঝিবে—সে আনন্দ আনন্দই নহে, তাহা একটা অভিমানের উষ্ণ উচ্ছ্বাস, তাহা একটা মোহের দুর্ভেদ্য আবরণ; 'যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে।' এ অবস্থা ন্যায়শাস্ত্রের সূক্ষ্মতত্ত্বচিন্তায় উপস্থিত হয়। সে চিন্তা ভাষা-বৈশিষ্ট্যের পদ্ধতি অবলম্বনে স্থাপিত। ভাষা-বৈশিষ্ট্যের যে তত্ত্ব, তাহার মধ্যেই ঐ পর্য্যাপ্তি ও সমবায় স্থাপিত; তাহার মধ্যে সামান্যাভাব বিশেষভাবে স্থাপিত। গঙ্গেশোপাধ্যায়-প্রবর্ত্তিত নব্য ন্যায়ের ভাষা-বৈশিষ্ট্য আলোচনার সময়ে বারান্তরে সে সব কথা বলিব। এখন একটি প্রাচীন নৈয়ায়িকের 'যথাভিমত' নৈয়ায়িক তত্ত্বের ধ্যানে চিত্তৈকাগ্রতার ইতিহাস শুনাইতেছি। বাঙ্গালায় ইংরাজরাজত্বপ্রতিষ্ঠার অল্পদিন পরে কাউগাছি গ্রামে এক জন প্রধান নৈয়ায়িক প্রাদুর্ভূত হয়েন। কাউগাছি গ্রাম এখন ২৪ পরগণার অন্তর্গত, তখন নদীয়ার অন্তর্ভুক্ত

ছিল। এই কাউগাছিতে মহারাষ্ট্র আক্রমণে আত্মরক্ষার্থ বৰ্দ্ধমানাধিপতির একটি দুর্গ ছিল, এখনও তাহার চিহ্ন আছে। কাউগাছি গ্রাম ভট্টপল্লীর দক্ষিণ ও কিঞ্চিৎ পূর্ব্বভাগে ২॥• ক্রোশ ব্যবধানে অবস্থিত। কাউগাছির সেই নৈয়ায়িক মহাশয়ের নাম শঙ্কর তর্কবাগীশ। তিনি আমাদের যৌবনপ্রারম্ভেও 'কাউগাছির শঙ্কর' নামে প্রসিদ্ধিসহ পণ্ডিতগণের নিকট শ্রদ্ধাপুষ্পাঞ্জলি পাইতেন। সেই সময়ে নবদ্বীপের সর্ব্বপ্রধান নৈয়ায়িক শঙ্কর তর্কবাগীশ জীবিত ছিলেন, তাই তিনি 'কাউগাছির শঙ্কর' নামে কথিত হইতেন। শঙ্কর এক দিন নব্যন্যায়ের হেত্বাভাস লক্ষণের সূক্ষ্মালোচনায় অসময়ে নিযুক্ত; অতি প্রত্যুষে যখন তিনি মৃত্তিকাশৌচ করিতেছিলেন, সেই সময়ে সেই সূক্ষ্মচিন্তা আবির্ভূত হইল, আবির্ভাব হইবার কিয়ৎক্ষণ পরেই শঙ্কর বাহ্যজ্ঞানশূন্য, তাঁহার মৃত্তিকা-শৌচসমাপ্তি, গাত্রোত্থান, ও গমন যন্ত্রসঞ্চালনবৎ অজ্ঞানেই সম্পন্ন হইতে লাগিল। গমনের কিন্তু বিরাম নাই, বেলা যখন৴ দেড় প্রহর, তখন তিনি হালিসহরে উপস্থিত। হালিসহর কাউগাছি হইতে ৫ ক্রোশ উত্তরে। তৎকালে হালিসহরের প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক বলরাম তর্কভূষণ শঙ্করকে দেখিতে পাইলেন; দেখিলেন, তাঁহার কর্ণে যজ্ঞসূত্র, হস্ত মৃত্তিকালিপ্ত, দৃষ্টি অন্তর্নিহিত। তর্কভূষণও ধ্যানরসে সুরসিক, তিনি শঙ্করকে আহ্বান করিলেন, প্রথমে উত্তর পাইলেন না; পরে উচ্চস্বরে আহ্বান করিলেন, তখন শঙ্কর সুপ্তোত্থিতের ন্যায় হঠাৎ বাহ্যজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া ও সম্মুখে তর্কভূষণকে দেখিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন, "তর্কভূষণ! তুমি এখানে কখন্ আসিলে?" তর্কভূষণ স্মিতমুখে বলিলেন, "তর্কবাগীশ দাদা, আমি আসি নাই, আপনিই আসিয়াছেন,—এ যে হালিসহর।" তর্কবাগীশ চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার চমক ভাঙ্গিল। তর্কবাগীশ তখন সানন্দে বলিলেন, "তা হউক, একটা জটিল পূর্ব্বপক্ষের সমাধান হইয়াছে, অন্য দোষও তাহাতে দেখি নাই, আর একটু চিন্তা করিতেছিলাম, তখন তোমার আহ্বানে সে চিন্তা ত্যাগ করিতে বাধ্য হই,—এখন তোমাকে পাইয়াছি, এখন কথাটা শুন।" এই দুই নৈয়ায়িকে তখনই সেই শাস্ত্রার্থ আলোচনা চলিতে লাগিল। তর্কভূষণ স্নানে যাইতেছিলেন, তৈলাক্ত দেহ—ভ্রূক্ষেপ নাই, শাস্ত্ররসের আস্বাদনে সকল ভুলিয়াছেন, আত্মহারা হইয়া সেই শাস্ত্র-রসে নিমগ্ন থাকিলেন। বহু বিলম্ব দেখিয়া তর্কভূষণের পুত্র ও ছাত্রগণ তাঁহার অন্বেষণে আসিয়াছেন, দুই নৈয়ায়িকের শাস্ত্রালোচনায় বাধা দিতে কাহারও সাহস হইতেছে না, সকলেই তূষ্ণীম্ভাবে দণ্ডায়মান। বেলা যখন ৩ প্রহর, তখন সেই আলোচনা সাঙ্গ হইল; দু'জনেই প্রসন্নাস্য; এ বিচারে জিগীষা ছিল না, কেবল তত্ত্বনির্ণয়, ফলসিদ্ধি বশতঃ উভয়েই পরমানন্দ লাভ করিয়াছেন,—ক্ষুধাতৃষ্ণা নাই, ক্লান্তি-গ্লানি নাই,—কেবলই শাস্ত্রানন্দ;—এই আনন্দ—কামিনীকাঞ্চনসঙ্গ-পরিশূন্য। এই অনাবিল আনন্দ গৃহস্থ-দর্শনের নিজস্ব, গৃহস্থ-দর্শনের সাধনায় প্রথম সিদ্ধি; এই সিদ্ধিপথই পরম সিদ্ধির উপায়। চরমসিদ্ধি মোক্ষ, তাহাই বেদান্তে ব্রহ্মানন্দ বলিয়া উল্লিখিত। সে ব্রহ্মানন্দপ্রাপ্তির উপায় যোগ, যোগসিদ্ধির উপায় মনের একাগ্রতা, এই একাগ্রতাসিদ্ধি যেমন ন্যায়শাস্ত্রানুশীলনে হয়, বুদ্ধিমানের পক্ষে তেমন সহজে অন্য কোন পথে হয় না। আর মননশুদ্ধি যে ন্যায়শাস্ত্রেরই কার্য্য, তাহা ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি। মননের সহিতও এই পর্য্যাপ্তি ও সমবায়ের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। মননের হেতু ব্যাপ্তিজ্ঞান, পর্য্যাপ্তি ব্যতীত কোন ব্যাপ্তিই পরিশুদ্ধ হয় না। সমবায় ব্যতীতও ঈশ্বরানুমান—অর্থাৎ প্রধান মনন শুদ্ধ হয় না, সেই মনন হেতু ব্যাপ্তিজ্ঞানও হয় না। কেন যে হয় না, তাহা ক্রমে বুঝিতে হইবে।

[ক্রমশঃ।

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন।



পোষ্ট-মাষ্টার

১

মদনমোহনপুরের সব্ পোষ্ট-মাষ্টার পঞ্চানন পালকে 'প্রেমসিন্ধুপুর মিশনে'র পাদ্‌রী রেভারেণ্ড ফাদার অব্র-হ্যাম্ কি কাযে ডাকঘরে আসিয়া, 'মিঃ পল' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন; সেই দিন তাঁহার 'মিঃ পল' নামের প্রতিষ্ঠা। পাদরী সাহেব যাহার প্রতিষ্ঠাতা, তাহা চিরস্থায়ী হওয়াই স্বাভাবিক। সুতরাং পোষ্ট-মাষ্টার পঞ্চাননের পিতৃপ্রদত্ত নামটি মনের দুঃখে অজ্ঞাত-বাসে যাত্রা করিয়াছে; এখন তাহাকে সকলেই 'মিঃ পল' বলিয়া সম্বোধন করে। সকলেই জানে, ক্ষুদ্র মদন-মোহনপুর গ্রামে তিন জন হাকিম বর্ত্তমান। প্রথম, থানার হাকিম—দারোগা মৌলবী রহমতুল্লা চৌধুরী সাহেব; দ্বিতীয়, দলিল রেজেষ্ট্রীর হাকিম—সাহেবজাদা মহম্মদ জনাবালী খাঁ সাহেব; তৃতীয়, ডাকঘরের প্যাকার, পিয়ন ও রনারদের হাকিম—মিঃ পি, পল সাহেব। এক দিন একটা 'রনার' পায়ের বেদনায় কাতর হইয়া, কয়েক দিনের জন্য তাঁহার মাস্‌তুত ভাইকে তাহার স্থলাভিষিক্ত করিবার আশায় এই হাকিমের নিকট 'আরজ' করিয়াছিল। সেই দরখাস্তে সে হাকিমের নাম 'পি, পল এস্কোয়ার' না লিখিয়া লিখিয়াছিল—'মহামহিম মহিমার্ণব শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু পঞ্চানন পাল, সব্ পোষ্ট-মাষ্টার মহাশয় প্রবলপ্রতাপেষু'—এই অপ-রাধে তাহার 'আর্জ্জি' নামঞ্জুর হইয়াছিল; অগত্যা নিবারণ সর্দ্দার রনারকে সেই খোঁড়া পা লইয়াই ডাকের ব্যাগ ঘাড়ে করিয়া দৌড়াইতে হইয়াছিল! তাহা দেখিয়া ডাকঘরের কেরাণীরা তারিফ করিয়া বলিয়া-ছিল, "হাঁ, হাকিম বটে!" মিঃ পল সাধারণের নিকট 'ডেকো হাকিম' বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। সে জানিত, 'ডাকঘরের হাকিম' বলিতে সাধারণতঃ ডাক বিভাগের ইন্‌স্পেক্টরকেই বুঝায়; কিন্তু ইন্‌স্পেক্টরের প্রাপ্য সম্মানটুকু সে এইভাবে অধিকার করিয়া আত্ম-প্রসাদ লাভ করিত। মফস্বলের 'ব্রাঞ্চ পোষ্ট আফিস' সমূহের কার্য্যপরিদর্শন উপলক্ষে ইন্‌স্পেক্টর বাবু তাঁহার 'হেড্ কোয়ার্টার' হইতে কখন কখন মদনমোহনপুরে আসিলে ডাকঘরের পিয়নরা তাড়াতাড়ি কাপড়ের উপর 'হাফ্ প্যাণ্ট' আঁটিয়া, খাকির কোট গায়ে দিয়া ও লাল ঝালরবিশিষ্ট খাকির পাগড়ী মাথায় বাঁধিয়া তাঁহাকে সম্মানপ্রদর্শন করিত; কারণ, তাহারা জানিত, ইন্‌স্পেক্টরই তাহাদের হাকিম, তাহাদের বাহাল-বর-তরফের কর্ত্তা। তাঁহার রিপোর্টেই বড় হাকিম 'সুপা-রিণ্টেণ্ডেণ্ট' বাহাদুর তাহাদের ভাগ্যসূত্র পরিচালন করেন। ইহাতে পোষ্ট-মাষ্টার মিঃ পলের ঈর্ষানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিত; এবং সে ক্ষমতা প্রদর্শনের জন্য পিয়ন ও রনারদের উপর ষোল আনা কর্ত্তৃত্ব করিত। তাহার আদেশে কেহ তাহার বাগান কোপাইয়া তরি-তরকারী লাগাইত, কেহ কপির ক্ষেতে সার দিত ও জলসেচ করিত, কেহ 'ঢ্যারা'য় পাট কাটিয়া দড়ি প্রস্তুত করিয়া দিত, পোষ্ট-মাষ্টার সেই দড়ি বিক্রয় করিয়া দু'পয়সা উপার্জ্জন করিত; কেহ তাহার জন্য কূয়ার দড়ি 'ভাঙ্গাইয়া' দিত, তাহাও গৃহস্থদের নিকট বিক্রয় হইত; কেহ পোষ্ট-মাষ্টারের দুগ্ধবতী গাভীর জন্য ঘাস কাটিয়া আনিয়া 'জাব্‌না' মাখিয়া দিত; কেহ বা কুড়ুল দিয়া কাঠ চেলাইয়া দিত। ষোলটা ব্রাঞ্চ আফিসে ডাক বহিবার 'রনার' অল্প ছিল না।

পোষ্ট-মাষ্টার 'মিঃ পলের' মাছ ধরিবার সখ ছিল; এ জন্য তাহার ছিপ, সূতা, বঁড়শী, সকলই ঘরে ছিল। বর্ষাকালের এক এক দিন সে দুই এক জন 'রনার'কে

ছিপ দিয়া নদী হইতে মাছ ধরিয়া আনিতে পাঠাইত। পোষ্ট-মাষ্টার লোকটা ছিল পাকা তামাকখোর। হুকা তাহার হাত হইতে নামিত না; কিন্তু বাজার হইতে 'মাথা তামাক' কিনিয়া আনিয়া ধূমপান করা তাহার অভ্যাস ছিল না; ডাকঘরের প্রশস্ত আঙ্গিনায় সে তামাকের চারা রোপণ করিত; সেই সকল গাছ পরিপুষ্ট হইলে রনাররাই তাহা কাটিয়া শুকাইয়া দিত; এবং তাহারাই সেই পাতা 'দা' দিয়া কাটিয়া, চিটে গুড় মাখিয়া, গুলী বাঁধিয়া রাখিত। সেই দা-কাটা তামাকে পোষ্ট-মাষ্টারের ধূমপানের পিপাসা-নিবৃত্তি হইত। কিন্তু সেই তামাকের বাজে খরচ হইবার আশঙ্কা ছিল না; কোন ভদ্রলোক কার্য্যোপলক্ষে ডাকঘরে আসিয়া দেখিতেন, পোষ্ট-মাষ্টার তাহার চেয়ারে বসিয়া সবেগে ধূমপান করিতেছে। ভদ্রলোকটি তামাকখোর হইলে স্বভাবতঃই তাঁহার ধূমপানের ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠিত। পোষ্ট-মাষ্টার তাহার আফিসের প্যাকার নবীন ঘোষকে হুঁকা আনিয়া দিতে বলিয়া কলিকাটি তাঁহার হাতে দিত। ভদ্রলোক হুঁকার মাথায় কলিকা বসাইয়া দুই একটা টান দিয়াই 'বাপ্' বলিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিতেন; তাহার পর কাসির চোটে তাঁহার দম বন্ধ হইবার উপক্রম! সুতরাং অল্পদিনেই পোষ্ট-মাষ্টার মিঃ পলের তামাকের খ্যাতি গ্রামের ভিতর এরূপ প্রচারিত হইয়াছিল যে, অতঃপর কেহই পোষ্ট-মাষ্টারের কলিকা স্পর্শ করিতে সাহস করিতেন না। স্থানীয় জমীদারের নায়েব এক দিন পুষ্করিণীতে স্নান করিতে গিয়াছিলেন; সেখানে পোষ্ট-মাষ্টার মিঃ পলের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ। নায়েব মহাশয় কথায় কথায় তাঁহাকে বলিলেন, 'কোষ্টবদ্ধ' হইয়া তিনি বড়ই কষ্ট পাইতেছেন; এমন কি, 'ক্যাষ্টর অয়েলে'ও জোলাপ খুলিতেছে না। ইহা শুনিয়া পোষ্ট-মাষ্টার হাসিয়া বলিয়াছিল, "সে জন্যে চিন্তে কি নায়েব মশায়! এক সময় আমার আফিসে গিয়ে এক ছিলিম তামাক খেয়ে আস্‌বেন, দুই একটা টান দিয়ে আপনি হুঁকো রাখবারও ফুরসৎ পাবেন না। এমনই আমার তামাকের গুণ!"—কিন্তু নায়েব মহাশয় হঠাৎ বেসামাল হইবার ভয়ে সেমুখো হয়েন নাই।

২

ডাক লাইনের ওভারসিয়ার হরিতারণ পরামাণিক পনের বৎসর ডাক পিয়নের চাকরী করিয়া ইন্‌স্পেক্টর বাবুর অনুগ্রহে 'ওভারসিয়ারী'তে বাহাল হইয়াছে। 'ওভারসিয়ার' ডাক রনারদের উপরওয়ালা। পোষ্ট-মাষ্টার নিবারণ সর্দ্দার রনারের 'খোঁড়া পায়ে'র আরজি নামঞ্জুর করিলে ওভারসিয়ার হরিতারণ তাহাকে বলিল, "আপনি আইনমত রনারের আরজি না-মঞ্জুর করতে পারেন না। আমিই ওদের উপরওয়ালা, দরকার মনে হ'লে আমি ওদের দরখাস্ত মঞ্জুর করবো। ইচ্ছে হয়, আপনি আমার বিরুদ্ধে রিপোর্ট করতে পারেন। ডাক টেনে এনে আফিসে ফেলে দিয়ে ওরা যে একটু জিরোবে—তার যো নেই; আপনার ব্যাগার দিতে লাগিয়ে দেবেন। ওদেরও 'মানুষের শরীল'—এটা ত বিবেচনা করতে হয় পাল মশায়!"

মিঃ পল ওভারসিয়ারের মুখে 'পাল মশায়' সম্বোধন শুনিয়াই ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া উঠিল; হুঙ্কার দিয়া বলিল, "তিন দিন ওভারসিয়ারীর বোগ্‌নোভাঙ্গা পেয়েই ধরাকে সরা জ্ঞান করচিস্? অক্সহাম সাহেব বিলাতী গোরার বাচ্চা, সে আমাকে 'মিঃ পল' বল্‌তে পারে, আর তুই বল্‌চিস্ আমাকে পাল মশায়! জানিস্ নে—এ গোবরে পদ্মফুল!"

ওভারসিয়ার হরিতারণ একে নাপিতের ছেলে, তাহার উপর সে মদনমোহনপুরের 'পুরাণ-প্রচার গীতাভিনয়' নামক সখের যাত্রার দলে রাজার বিদূষক সাজে। সেই দিন হইতে সে পোষ্ট-মাষ্টার মিঃ পলের নাম রাখিল "গোবরে পদ্ম।"—এই পদ্মের মধুলুব্ধ ভৃঙ্গ বোধ করি গুব্‌রে পোকা! কয়েক দিনের মধ্যেই মিঃ পলের এই উপনাম চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। পোষ্ট-মাষ্টার তেল মাখিয়া গামছা মাথায় দিয়া পুষ্করিণীতে স্নান করিতে যাইতেছে—এক পাল ছেলে দূরে থাকিয়া চীৎকার আরম্ভ করিল, "গোবরে পদ্ম!" ডাকঘরের চূণকামকরা দেওয়ালে কয়লা দিয়া লেখা 'গোবরে পদ্ম!'—ডাকের বাক্স খুলিলে প্রত্যহ তাহার ভিতর চারি পাঁচখানি চিঠি; লেফাপায় লেখা—

"মহামান্য—

শ্রীল শ্রীযুক্ত গোবরে পদ্ম পালজি মহাশয়

শ্রীঠ্যাং কমলেষু

পোষ্ট-মাষ্টার, মদনমোহনপুর।"

কেবল বাঙ্গালায় নয়, কোন কোন লেফাপার উপর ইংরাজীতে লেখা—

"Cowdung Lotus Paul Esqr.,

Sub Post Master,

Madanmohanpur P. O."

ডাকের বাক্স খুলিবার ভার যে পিয়নের উপর ছিল, সে চিঠিগুলিতে তারিখের ও 'বেয়ারিং'এর মোহর দিয়া 'সর্টিং টেবলে' রাখিয়া আসিল। হেড ক্লার্ক শ্রীহরি মণ্ডল বড় রসিক লোক। সে চিঠিগুলি স্থানীয় চিঠির 'খোপে' রাখিয়া দিল। পরদিন চিঠি বিলির সময় পিয়ন পোষ্ট-মাষ্টারের টেবলের উপর সেগুলি রাখিয়া বলিল, "আপনার পাঁচখান 'বেয়ারিং' চিঠি আছে।" মিঃ পল রাগিয়াই আগুন! সে চিঠিগুলি ছিঁড়িয়া ফেলিবার উপক্রম করিলে হেড ক্লার্ক বলিল, "সরকারের এতগুলি পয়সা আপনি নষ্ট করবেন? ইন্‌স্পেক্টর শুনতে পেলে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাছে যদি 'রিপোর্ট' করেন? আপনার চিঠি না হয়, আপনি 'ডেড লেটার আফিসে' পাঠিয়ে দেন, সেখানে তারা যা জানে করবে।"—পোষ্ট-মাষ্টার অনেক চিন্তার পর চিঠিগুলির উপর লাল কালী দিয়া লিখিয়া দিল,—

"Try Madanmohan Chak P. O.

Dit. Midnapur."

অর্থাৎ 'মেদিনীপুর জিলার মদনমোহন চক ডাকঘরে মালিকের সন্ধান হইতে পারে, সেখানে চেষ্টা কর।'

চিঠিগুলি মদনমোহন চকে প্রেরিত হইল; সেখানে মালিকের সন্ধান না হওয়ায় সেগুলি কলিকাতার 'ডেড লেটার' আফিসে গেল। সেখান হইতে তাহা ডেড লেটার আফিসের চতুষ্কোণ পদাঙ্ক পৃষ্ঠে ধারণ করিয়া মদনমোহনপুরে ফিরিয়া আসিল; কিন্তু পত্র-প্রেরকের সন্ধান হইল না! কারণ, চিঠিতে যে সকল নাম থাকিত, সেই সকল নামের লোক সে অঞ্চলে এক জনও ছিল না। চিঠিগুলি পোষ্ট-মাষ্টারের নিন্দা ও কুৎসায় পূর্ণ।

যাহা হউক, এই সকল চিঠির আমদানী শীঘ্রই বন্ধ হইয়া গিয়াছিল; এবং পোষ্ট-মাষ্টারের 'মিঃ পল' নামই বাহাল রহিল। তাহার পঞ্চানন নাম প্রায় কেহই মুখাগ্রে আনিত না, কেবল তাহার মুরুব্বী বৃদ্ধ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ ব্যানার্জ্জি তাঁহার পাকা দাড়ির নিশান উড়াইয়া 'ইন্‌স্পেক্সন' উপলক্ষে মদনমোহনপুরে আসিয়া যখন বলিতেন, "কি হে পাঁচু, ভাল আছ ত?" তখন মিঃ পল তাড়াতাড়ি জুতা খুলিয়া তাঁহার পায়ের কাছে মাথা লুটাইত, এবং তাঁহার পদরজ লইয়া কণ্ঠে, জিহ্বাগ্রে ও মস্তকে স্পর্শ করিয়া ভক্তিগদ্‌গদস্বরে বলিত বটে, 'হুজুর যেমন রেখেছেন!' কিন্তু হাকিমের মুখে 'পাঁচু' শুনিয়া 'পাঁচু' বড়ই মুখ 'কাঁচুমাচু' করিত; এবং আড়-চোখে আশে পাশে চাহিয়া দেখিত, কথাটা আর কেহ শুনিয়া হাসিল কি না!

৩

পাঁচুর একটু ইতিহাস আছে। চাকুরীজীবী কেরাণী সম্প্রদায়ের জীবনের ইতিহাস প্রায়ই এক ছাঁচে ঢালা। ভাগ্যদেবতা শেষে হয় ত আরম্ভের সহিত শেষের আকাশ-পাতাল ব্যবধানের সৃষ্টি করেন। ললিত নামক একটি বালক শৈশবে পিতৃহীন হয়, মা ভিন্ন সংসারে তাহার দ্বিতীয় অভিভাবক ছিল না। মায়ের সংসার অচল। সে কত দিন তাহার প্রতিবেশিনীদের কাছে দুঃখ করিয়া বলিয়াছে, "দেখ দিদি, ললিত যদি আমার ছেলে না হয়ে মেয়ে হ'তো, তা হ'লে দু'দশ টাকা ভিক্ষে করেও ওকে কায়েতের ঘরের যে কোন একটা গণ্ডমূর্খকে ধ'রে গছিয়ে দিতাম। তার পর একটা পেট! ভাড়াভেনে খেলেও চলত। কিন্তু ললিতকে নিয়েই হয়েছে আমার বিপদ! খেতে দিতে পারিনে, লিখাপড়া শিখাব কি দিয়ে? ওকে যদি কেউ খানসামা ক'রে রাখে ত বেঁচে যাই।"

এ হেন ললিত লিখাপড়া শিখিয়া মানুষ হইবে, ইহা কি কেহ আশা করিয়াছিল? ললিত লিখাপড়া অধিক শিখিতে পারে নাই; দুই তিনখানি ইংরাজী কেতাব শেষ করিয়াই সে মা সরস্বতীর নিকট বিদায় লইয়াছিল এবং মা কমলার প্রসন্নতা লাভের আশায়

রেলের আফিসে সাত টাকার চাকরী লইয়া কর্ম্মজীবন আরম্ভ করিয়াছিল। সেই ললিত এখন পশ্চিমের একটা প্রকাণ্ড ষ্টেশনের ষ্টেশন-মাষ্টার;—দেশে সে প্রকাণ্ড অট্টালিকা, বাগান প্রভৃতি করিয়াছে; একটি পুষ্করিণী কাটাইবার জন্য জমীও মৌরুসি করিয়া লইয়াছে। ললিতের স্ত্রীর তিন 'সুট' সোনার গহনা! ললিতের স্ত্রীর দুঃখ, ভগবান্ নিতান্ত অদূরদর্শী, তিনি জানিতেন না, সকল গহনা পরিবার জন্য তাহাকে আর দুইখানি হাত দেওয়া উচিত ছিল। দুই হাতে কি তত গহনা ধরে?—ললিতের মা এখনও জীবিতা। তিনি বলেন, "এ মা লক্ষ্মীর কৃপা!" উপন্যাসে ইহা অপেক্ষা অধিক আশ্চর্য্য ঘটনা আর কি থাকে? উপন্যাস ত সত্যেরই প্রতিবিম্ব।

যাহা হউক, এখন পাঁচুর কথা বলি।

পাঁচুর পিতা বক্কেশ্বর পাল হাঁড়ি-কলসী গড়িত। সে প্রত্যেক হাটবারে ঝাঁকা ভরিয়া হাঁড়ি-কলসী লইয়া মদনমোহনপুরের হাটে বিক্রয় করিতে যাইত; এবং কোঁচড় ভরিয়া পয়সা আনিয়া একটা মাটীর ভাঁড়ে জমা করিত। সেই পয়সা বাঁচাইয়া পাঁচুর মাকে সে রূপার 'পৈঁছে' ও 'গোট' 'বানাইয়া' দিয়াছিল। পাঁচুর মা গর্ব্ব করিয়া বলিত, "আমাদের উনাদের হাতে যেমন চাক ঘোরে, অমনতর চাক ঘুরোতে এ তল্লাটের কোন কুমোরের ছেলে পারবে না।"

সুতরাং পাঁচুকে চাক ঘুরানো বিদ্যায় তাহার বাপের মত লায়েক করিবার জন্যই পাঁচুর মা'র আগ্রহ হইয়াছিল।

বক্কেশ্বর বলিল, "তুই শালী থাম্। আমাদের জাতের মধ্যে কত বড় বড় উকীল, মোক্তার, ডাক্তার আছে জানিস্? তারা এক এক জন বিদ্যের জাহাজ। আমার 'পুঁইসেলে' যত হাঁড়ি, কলসী ধরে—তাদের বাক্সে তার চেয়ে 'জিয়াদা' টাকা ধরে। আমি ন্যাকাপড়া শিকিয়ে আমার পাঁচুকে ড্যাড়ার মধ্যে একটা গাধা বানিয়ে তুলবো।"

পাঁচুর মা পদী বলিল, "সে আবার কি গো?"

বক্কেশ্বর তামাক সাজিতেছিল। সে কল্‌কেয় ফুঁ দিতে দিতে বলিল, "আরে, যাকে বলে হাকিম। হাকিমের নাম কখন শুনিস্ নি? যারা মুলোচোরের ফাঁসি দেয়?"

পাঁচুর মা বলিল, "সেই হাকিম বানাবা ত হাঁড়ি গড়্‌বে কে?"

বক্কেশ্বর মুখ বাঁকা করিয়া বলিল, "দুত্তোর বোকা মেয়েমানুষ! আরে, পাঁচু হাকিম হয়ে জ্বালা বোঝাই টাকা আন্‌বে, আর আমরা পায়ের ওপর পা দিয়ে, দিব্যি গ্যাঁট হয়ে ব'সে রোজ মুড়ি-মুড়কি ফুঁকিয়ে জল খাব। তখন একটা মুটে নিয়ে হাটে হাঁড়ি বিক্রী কর্‌তে যাব, হাকিমের বাপ কি না।"

অগত্যা পাঁচুর মা পাঁচুকে ইংরাজী স্কুলে পাঠাইতে রাজী হইল।

কিন্তু পাঁচু এক এক ক্লাশে তিন বৎসর করিয়া থাকিয়া বিদ্যায় পাকা হইতে লাগিল। বক্কেশ্বর ইহাতে গৌরব অনুভব করিয়া বলিত, "ছেলের বিদ্যের 'বুনেদ' (বনিয়াদ) পাকা হ'লে ঝড়ে ভেঙ্গে পড়বার ভয় থাক্‌বে না।"

অবশেষে পাঁচু পঞ্চম শ্রেণী ডিঙ্গাইতে না পারিয়া, রাগ করিয়া লিখাপড়া ছাড়িয়া দিল। কিন্তু সে স্কুল হইতে ভদ্রলোক সাজিয়া বাহির হইল; গায়ে সার্ট, শিল্কের চাদর, পরণে বাহারে ধুতি, পায়ে মোজা ও জুতা, মাথায় টেরি!—সে তখনও চশমা কিনিতে পারে নাই, এ জন্য বাপের পয়সার ভাঁড়ে তাহার দৃষ্টি পড়িল।

পাঁচু দুই বেলা খায় আর আড্ডা দিয়া বেড়ায়, দেখিয়া বক্কেশ্বর 'ব্যাজার' হইল। আজ জুতো নাই, কাল একটা জামার দরকার। বক্কেশ্বর দেখিল, হাকিম বানাইতে গিয়া সে পাঁচুকে যাহা করিয়া তুলিয়াছে—গ্রাম্য ভাষায় তাহার নাম 'ষাঁড়ের গোবর!'

বক্কেশ্বর এক দিন বলিল, "ঢের বিদ্যে শিখেছিস্ রে পেঁচো! এখন জাত-ব্যবসায় মন দে। হাটে যা, হাঁড়ি-কলসী বিক্রী হবে, তাতেই বেশ চ'লে যাবে—যদি ঐ জুতো-জামাগুলো ছেড়ে দিস্।"

পাঁচু 'টেরি' ঘুরাইয়া বলিল, "আমি কাদা ঘেঁটে হাঁড়ি গড়তেও পারব না, ঝাঁকায় নিয়ে হাটে বিক্রীও কর্‌তে পারব না। তা কর্‌লে আমি ভদ্দোর লোকদের মুখ দেখাব কি ক'রে? তোমাকে যেন সবাই বকা

কুমোর বলে, আমাকে বলে 'পঞ্চানন বাবু', তা জানলে আর আমাকে কাদা ঘাঁটতে বলতে না।"

বক্কেশ্বর বলিল, "তবে খাবি কি ক'রে?"

পাঁচু বলিল, "আমি চাকরী করবো। আমার ইস্ত্রী করা সার্টে ধুলো লাগবে, টেরি ভেঙ্গে যাবে—এমন চাষাড়ে কায আমি কখখন করব না—তা তোমাকে পষ্ট বলচি।"

কিন্তু এ রকম গণ্ডমূর্খকে কে চাকরী দেবে? উমেদার বিস্তর, কিন্তু দাসত্বের রজ্জু এ দেশে সুলভ নহে।

৪

এই সময় যিনি সেই ডিভিসনের ডাকবিভাগের 'সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট' ছিলেন, তাঁহার যে সকল সখ ছিল, তন্মধ্যে টবের ফুলের গাছ দিয়া গৃহ-সজ্জা একটি। টবের উপর নানা জাতীয় ফুলগাছে তাঁহার বৈঠকখানার বারান্দা, সিঁড়ি, ফুলের বাগান সুসজ্জিত।

তিনি 'ইন্‌স্পেক্সন' উপলক্ষে মদনমোহনপুরে আসিয়া শুনিলেন, বক্কেশ্বর পাল অতি চমৎকার ফুলের টব প্রস্তুত করে। বক্কেশ্বর তাঁহাকে তিন ডজন টব প্রস্তুত করিয়া দিল। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব উপযুক্ত মূল্য ত দিলেনই, তাহার উপর খুসী হইয়া বলিলেন, "পালজী, টবগুলি ভারী সুন্দর হয়েছে, মেমসাহেব খুব পছন্দ করেছেন—কি বকশীস্ চাও বল।"

বক্কেশ্বর পাল ধূলামাখা হাত দু'খানা জোড় করিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া বলিল, "হুজুর, আমার একটা ষাঁড়ের গোবর ছেলে আছে। তাকে ল্যাকাপড়া শিখুতে দিয়েছিলাম, তা হ'ল না। তাকে একটু চাকরী দিয়ে 'পিরতিপালন' করতে হবে। আমি এ ছাড়া আর কিছু বক্‌শীস্ 'পিত্যেশ' করি নে, হুজুর!"

হাকিম হাসিয়া বলিলেন, "ল্যাকাপড়া কদ্দূর শিকিয়েছিলে?"

বক্কেশ্বর বলিল, "তা হুজুর কেঁদে-কত্‌রিয়ে, তিনটে কেলাস না গেলাস কি বলে—তদ্দূর উঠেছিল। তার পর হড়কে প'ড়ে বেরিয়ে এলো।"

হাকিম বলিলেন, "তাই ত! লিখাপড়া একটু ভাল শিখ্‌লে যা হয় তাই করতাম—কিন্তু—"

বক্কেশ্বর এবার গলায় বস্ত্র দিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া বলিল, "ল্যাকাপড়া শিখ্‌লে সে ত হাকিম হ'তো, হুজুর! ল্যাকাপড়া ভাল জানে না ব'লেই ত হুজুরের ছিচরণে দরবার করছি।"

হাকিম বলিলেন, "ইংরাজী নাম ঠিকানাগুলো পড়তে আর নম্বরগুলা চিনতে পারে কি না?"

বক্কেশ্বর বলিল, "হুজুর, সে ইঞ্জিরী কেতাবগুলো গড়গড়িয়ে প'ড়ে যায়, যেন তুব্‌ড়ীতে আগুন দিল। হুজুরের হুকুম হয় ত তাকে নিয়ে আসি।"

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাহাদুর পাঁচুকে মদনমোহনপুরের ডাকঘরের 'এপ্রেণ্টিস্' করিয়া দিলেন। মাসখানেক সে ঘরের খাইয়া বনের মহিষ তাড়াইল; তাহার পর পাঁচু মদনমোহনপুরে কেরাণীগিরিতে বাহাল হইল।—সে এক কাল গিয়াছে!

পাঁচ দশ বৎসর নির্ব্বিঘ্নে কেরাণীগিরি করিল। মদনমোহনপুর হইতে তাহাকে নড়িতে হইল না। কিন্তু নূতন এক জন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তাহাকে দূরবর্ত্তী একটা ছোট পোষ্ট আফিসের পোষ্ট-মাষ্টার করিয়া বদলী করিলেন। স্থানটি সহর, কৃষ্ণভক্তদের একটা বড় আড্ডা। মৃদঙ্গ-ধ্বনিতে সকাল সন্ধ্যায় তাহার গগন-পবন মুখরিত।

দুই বৎসর পরে নূতন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পাঁচুর আফিস দেখিতে আসিলেন। তিনি পরম বৈষ্ণব, মুরগী-টুরগী দেখিলে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠেন, এবং যেখানে হরি-সংকীর্ত্তন হয়—সেইখানেই গিয়া সঙ্কীর্ত্তনে যোগদান করেন, বাহু তুলিয়া নৃত্য পর্য্যন্ত করেন। পরান্ন স্পর্শ করেন না।

পাঁচু তাঁহার কীর্ত্তনানুরাগের সংবাদ রাখিত। সন্ধ্যার সময় সে হাকিমকে পরম ভক্ত শ্রীনারায়ণ বাবুর বৈঠকখানায় লইয়া গেল। সেখানে গ্রাম্য 'হরিবাসর কুটীরের' ভক্তবৃন্দ উপস্থিত হইয়া হরিসঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। পাঁচু তখন এক জন প্রধান ভক্ত। গান জমিয়া উঠিল, হাকিম বাবু ভাবাবেশে বিহ্বল হইয়া 'উদ্দণ্ড নৃত্য' আরম্ভ করিলেন; পাঁচু মুক্তকচ্ছ হইয়া নাচিয়া নাচিয়া খোল বাজাইতে লাগিল। সবেগে তাহার মাথা নড়িতে লাগিল। সে ঘাড় ঘুরাইয়া দুই হাতে যতই দ্রুত তালে খোল বাজাইতে লাগিল,

তাহার পদদ্বয়ের ব্যবধান ততই বিস্তৃত হইতে লাগিল; অবশেষে ভাবের আতিশয্যে সে খোলসমেত মাটীতে পড়িয়া একেবারে নিস্পন্দ! অন্য খুলীয়া আরও বেগে 'বুজ্জতা বুজাং, বুজাং বুজাং' শব্দে মৃদঙ্গধ্বনি করিতে লাগিল, অনেক চেষ্টায় পঞ্চাননের চেতনা হইল। তখন ভাবসমাধিবিমুক্ত পঞ্চাননকে কোলে লইয়া সকলে নাচিতে লাগিল।

সেইবার হাকিম পাঁচুর প্রার্থনায় তাহাকে মদনমোহনপুরের পোষ্ট-মাষ্টার করিয়া পাঠাইলেন। তিনি ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু ছিলেন। পাঁচুর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল।

এই সময় 'টাইম স্কেলে' সকলের বেতন দ্বিগুণ হইয়া গেল। পাঁচুর বেতন তখন পঞ্চাশ টাকা হইয়াছিল; তাহার বেতন শীঘ্রই এক শত টাকা হইবে শুনিয়া, পাঁচু বিস্ময়ে শিহরিয়া উঠিয়া বলিয়াছিল, "এ্যা, আমার মাইনে এক শো টাকা হবে?—এক শো টাকা মাইনে কোন দিন স্বপ্নেও দেখিনি। উঃ, কি সৌভাগ্য! আজ যদি বাবা বেঁচে থাকৃত, তা হ'লে বুঝতে পারত, আমি জাত-ব্যবসা না শিখে কি ভাল কাযই করেছি!"

পাঁচুর বাড়ী মদনমোহনপুরের একপ্রান্তে অবস্থিত। সে তাহার স্ত্রী ও দুইটি কন্যা লইয়া বাস করে। সেই বাড়ী হইতে সে ডাকঘরে পোষ্ট-মাষ্টারী করিতে আসিত।—ডাকঘরের বাড়ীতে তাহার আপিসের দুই জন বিদেশী কেরাণী থাকিত।

বৈষ্ণব সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পেন্সন লইয়া যাইবার পর নূতন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আসিয়াছিলেন; তিনি বড় কড়া হাকিম। মদনমোহনপুরের ডাকঘর দেখিতে আসিয়া তিনি শুনিলেন, পোষ্ট-মাষ্টার রাত্রে ডাকঘরে থাকে না। তিনি হুকুম দিলেন, বাড়ী ছাড়িয়া ডাকঘরে আসিয়া বাস না করিলে তাহার পোষ্টমাষ্টারী খসিয়া যাইবে।

তৎপূর্ব্বেই পাঁচু তাহার শ্যালকের বেনামীতে মদনমোহনপুরে হাঁড়ি, কলসী, গেলাস, ডিস্ প্রভৃতি মৃন্ময় তৈজসপত্রের একখানি দোকান খুলিয়া পুরাদমে ব্যবসায় চালাইতেছিল। বদলী হইলে দোকান মাটী! পোষ্ট-মাষ্টারী ঘুচাইয়া কেরাণী হইবার ইচ্ছাও তাহার ছিল না। কাযেই সে সপরিবারে ডাকঘরের পাকা বাড়ীতে উঠিয়া আসিল। খড়ো বাড়ীর উঠান জঙ্গলে ভরিয়া উঠিল, এবং ইঁদুর, ছুঁচো, চামচিকে আর তেলাপোকা তাহার পৈতৃক বাসগৃহ মনুষ্যবাসের অযোগ্য করিয়া তুলিল। ডাকঘরের বাড়ীতে উঠিয়া আসিয়া তাহার মেজাজ পর্য্যন্ত বিগড়াইয়া গেল। সে হাঁড়িনির্ম্মাতা নগণ্য বক্কেশ্বর পালের পুত্র—ইহা ভুলিয়া গিয়া, সে যে মদনমোহনপুরের পোষ্ট-মাষ্টার, তিন হাকিমের এক হাকিম, এই গর্ব্বে তাহার ও তাহার স্ত্রীর হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল।

৫

এই সময় মদনমোহনপুরের পোষ্ট-মাষ্টার পঞ্চানন পাল, 'মিঃ পি, পল' হইয়া গেল; সে কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। রনার প্রভৃতির প্রতি তাহার ব্যবহারও কতকটা জানিতে পারা গিয়াছে।

মদনমোহনপুরের ডাকঘরটি পূর্ব্বে একটি ক্ষুদ্র 'সাব আফিস' ছিল; কালক্রমে তাহার অধীনে ষোলটি শাখা পোষ্ট আফিস সংস্থাপিত হওয়ায় তাহার কায বিস্তর বাড়িয়া যায়; এবং ভাড়াটে বাড়ী হইতে তাহা সরকার কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বৃহৎ অট্টালিকায় উঠিয়া আইসে। এক জন কেরাণীর স্থানে ক্রমে তিন জন কেরাণী নিযুক্ত হইল।

এই ডাকঘরের কেরাণীরা গ্রামের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাসা লইয়া বাস করিত। দূরবর্ত্তী রেলষ্টেশন হইতে তিন জন রনার ডাক বহিয়া আনিত। বেলা দশটার সময় ডাক আসিত; আবার সন্ধ্যার পূর্ব্বে 'ব্রাঞ্চ আফিস'-গুলির ডাক আসিলে, রেলষ্টেশনে ডাক রওনা করা হইত।

বর্ষাকালে তিন জন কেরাণীর এক জন ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইয়া এক মাসের ছুটী লইয়া গেল। বিভাগীয় সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট লিখিলেন, "অতিরিক্ত লোক নাই, তোমরা তিন জনে অনুপস্থিত কেরাণীর কায ভাগ করিয়া লইবে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, তোমার আফিসের কাযে আড়াই জন কেরাণীর অধিক লাগিবার কথা নয়; সুতরাং দুই জন কেরাণী লইয়া তুমি কায চালাইতে পারিবে।"

পোষ্ট-মাষ্টার আর আপত্তি করিতে পারিল না;

কিন্তু অবশিষ্ট কাযের ভার দুই জন কেরাণীর ঘাড়ে চাপাইয়া স্বয়ং আরাম ভোগ করিতে লাগিল।

ইহাতে কেরাণীদ্বয়ের কষ্ট ও অসুবিধার সীমা রহিল না; তাহারা রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত কায করিয়াও কায শেষ করিতে পারিত না। পোষ্ট-মাষ্টার আহারান্তে দিবানিদ্রা উপভোগ করিয়া বেলা চারিটার সময় আফিসে আসিয়া বসিত, এবং মনি-অর্ডারের হিসাব শেষ করিয়া ৫টার সময় বেড়াইতে বাহির হইত। তাহার হাঁড়ি-কলসীর দোকানের হিসাবপত্র শেষ করিয়া তহবিল মিলাইয়া ডাকঘরে ফিরিতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইত। সন্ধ্যার পর ল্যাম্প জ্বালিয়া সে প্যাকারকে সঙ্গে লইয়া 'ইন্‌সিওর' ওজন ও গালামোহর করিতে বসিত। ডাক ছাড়িবার পূর্ব্বে কেরাণীদের ছুটী পাইবার উপায় ছিল না।

মনি-অর্ডারের কেরাণী পোষ্ট-মাষ্টারকে বলিল, "রেজেষ্ট্রী ও মনি-অর্ডারের সকল কায আমার ঘাড়ে চাপাইয়াছেন; আমি অত কায একা পারিয়া উঠি না। আপনি যদি সন্ধ্যার পূর্ব্বে দু'ঘণ্টা না বেড়াইয়া ইন্‌সিওরের কাযগুলা শেষ করেন, তা হ'লে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত আমাদের ব'সে থাক্‌তে হয় না। আমরা দস্তরমত আট ঘণ্টা খাটবো, দশ এগার ঘণ্টা ত আমাদের খাটবার কথা নয়।"

কেরাণীর এই প্রতিবাদে পোষ্ট-মাষ্টার পালজীর ক্রোধ হইল; সে বলিল, "আমি কাযের ভাগ ক'রে দিয়েছি, তুমি তাতে আপত্তি কর্‌বার কে? দশ ঘণ্টা খাটতে হয়, তাই খাটবে; না পার—আফিস থেকে চ'লে যাও। আমি রিপোর্ট করবো—তোমার মত গেধো কেরাণী নিয়ে আমার কায চল্‌বে না। বি, এ, পাশ করেছ ব'লে কি চতুর্ভুজ হয়েছ?"

কেরাণী বলিল, "গাল দেবেন না, পাল মশায়! মুখ সাম্‌লিয়ে কথা বল্‌বেন। আপনি পোষ্ট-মাষ্টার হয়েছেন ব'লে আমাদের মাথা কিনে রেখেছেন না কি?"

একে মুখের উপর উত্তর, তার সঙ্গে 'পাল মশায়' সম্বোধন! পোষ্ট-মাষ্টার আগুন হইয়া বলিল, "বেরিয়ে যাও, আমার আফিস থেকে এখনই বেরিয়ে যাও। খাটতে না পার, চাকরী ছেড়ে দিয়ে যাও। তোমার মত অকর্ম্মা লোক নিয়ে আমার কায চল্‌বে না; এ কথা আমি সুপারিন্টেণ্ডেণ্টকে রিপোর্ট করবো—করবো—করবো।"

এই কেরাণীটির নাম বাঁশী। বাঁশী বি, এ, পাশ করিয়া ডাক বিভাগে প্রবেশ করিয়াছিল। সে বিভাগীয় সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের আফিসে 'রিজার্ভড্' ক্লার্ক ছিল; অল্পদিন পূর্ব্বে মদনমোহনপুরে একটিনী করিতে আসিয়াছিল।

বি, এ, পাশ করিয়া অগত্যা সে 'ডেকো' চাকরী জীবিকার সংস্থানরূপে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। পূর্ব্বে যাহারা এন্‌ট্রেন্স পাশ করিয়া অর্থকষ্টে চারিদিক অন্ধকার দেখিত, তাহারা উপায়ান্তর না দেখিয়াই ডাক বিভাগে প্রবেশ করিত। এন্‌ট্রেন্স পাশ-করা কোন প্রার্থী 'ডেকো' চাকরী গ্রহণ করিতে চাহিলে তাহাকে সাধ্যানুসারে প্রত্যাখ্যান করা হইত না। এখন আর সেকাল নাই,—'তে হি নো দিবসা গতাঃ।' এখন ডাক বিভাগে বেতন দ্বিগুণ হইয়াছে, 'টাইম স্কেলে'র ব্যবস্থা হইয়াছে; ছুটীর পরিমাণ পূর্ব্বাপেক্ষা বর্দ্ধিত হইয়াছে; এবং আব্রহ্ম ভারতের 'ডেকো' কর্ম্মচারীরা তাঁহাদের অবস্থার উন্নতিসাধনের জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া এক সমিতির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহার মূলমন্ত্র—'সংহতিঃ কার্য্যসাধিকা।'—তাঁহারা 'লেবার' নামক যে এক মুদ্গরের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা খোদ পোষ্ট-মাষ্টার জেনারেলের পর্য্যন্ত খাতির করে না! তিনি কোন অন্যায় কায করিলে, কি কোন রকম দুর্ব্বলতার পরিচয় দিলে তাঁহাকেও আক্রমণ করে। ইহার উপর 'ডেকো' কেরাণীদের পক্ষাবলম্বন করিয়া, 'মাল্‌সী'র দল কর্ত্তৃপক্ষের অন্যায় জুলুম সম্বন্ধে আন্দোলন আলোচনা করেন, কখন কখন শ্রাদ্ধ বৃটিশ পার্লিয়ামেণ্ট পর্য্যন্ত গড়ায়! সুতরাং এখন দলে দলে বেকার 'গ্র্যাজুয়েট' ডাক বিভাগে প্রবেশ করিতেছে। তাহারা সেকেলে নিরক্ষর পোষ্ট-মাষ্টারদের অন্যায় জুলুম-জবরদস্তি সহ্য করিতে রাজী হয় না; খাতিরও করে না। বিপদ!

পোষ্ট-মাষ্টার পালজীর ব্যবহারে বাঁশীর আত্মসম্মানে আঘাত লাগিল। সে বিভাগীয় সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট

বাহাদুরের নিকট প্রতীকার প্রার্থনা করিয়া, নিঃশব্দে পোষ্ট-মাষ্টারের আদেশ পালন করিতে লাগিল।

মদনমোহনপুর ডাকঘরের পার্শেলের কেরাণী গিরিধারী সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলে; আর্থিক অবস্থা মন্দ হওয়ায় এবং লিখাপড়া শিখিতে না পারায় অগত্যা সে ডাক বিভাগে চাকরী লইয়াছিল। তাঁবেদার হইয়াও সে পোষ্ট-মাষ্টার 'মিঃ পলের' খাতির করিত না; তাহাকে এক কথা বলিলে সে পোষ্ট-মাষ্টারকে দশ কথা শুনাইয়া দিত। এ জন্ম পোষ্ট-মাষ্টার তাহার উপর ইচ্ছামত হুকুম চালাইতে ভয় করিত।

এক দিন বেলা ১০টার সময় ডাকের 'পার্শেল ব্যাগ' গিরিধারীর টেবলের কাছে পড়িয়া আছে; কিন্তু তাহা কাটিবার পিয়ন নাই! গিরিধারী হাঁকিল, "ভজা! ভজা কোথায় রে? পার্শেল ব্যাগ কাটতে হবে না? না, তিন ঘণ্টা প'ড়ে থাকবে?"

বাঁশী বলিল, "ভজা পোষ্ট-মাষ্টারের মাছ-তরকারী কিনতে বাজারে গিয়েছে।"

গিরিধারী বলিল, "ডাক এসে প'ড়ে থাক্‌লো, সে বাজারে গিয়াছে? সরকারী কায আগে, না পোষ্ট-মাষ্টারের বাজার আগে? এবার ইন্‌স্পেক্টর এলে তাঁকে জিজ্ঞাসা করব, পোষ্ট মাষ্টারের খানসামাগিরি করবার জন্মই কি আফিসের পিয়ন রনার প্রভৃতিকে গবর্মেণ্ট মাইনে দিয়ে রেখেছে?"

গিরিধারী পোষ্ট-মাষ্টারের শ্রুতিগম্য স্বরেই এ কথাগুলি বলিল; পোষ্ট-মাষ্টার কণ্ঠস্বর সপ্তমে তুলিয়া বলিল, "তোমার ভারী আস্পর্দ্ধা বেড়ে গিয়েছে, গিরিধারী বাবু! তুমি আমার অধীন একটা 'পেটি' কেরাণী, আমাকে তুমি উপরওয়ালা ব'লে গ্রাহ্যই করতে চাও না; 'জায়বেজায়' বল; তুমি জান, আমি রিপোর্ট করলে সাত দিনের মধ্যে এখান থেকে তোমার অন্ন উঠবে?"

গিরিধারী বলিল, "ওঃ, পোষ্ট-মাষ্টার হয়ে উনি আমার মাথা কিনে রেখেছেন! হাকিম হয়েছেন! তা কর গে তুমি রিপোর্ট, আমার যা করতে পার, কোরো। আমাদেরও মুখ আছে। নূতন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছোকরা হাকিম, 'কুটকথায় সেখানে চিঁড়ে ভিজবে না।"

কিন্তু পোষ্ট-মাষ্টার সর্ব্বদা 'শতং বদ মা লিখ,' এই নীতির অনুসরণ করিত; বিশেষতঃ সে জানিত, ডাকের সময় পিয়নকে বাজারে পাঠাইয়া সরকারী কাযের ক্ষতি করা তাহারই অন্যায় হইয়াছে; সুতরাং গিরিধারীর বিরুদ্ধে রিপোর্ট করিতে সাহসে কুলাইল না। গিরিধারী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে সকল কথা লিখিয়া প্রতীকার-প্রার্থী হইল।

৬

ইহার পর পোষ্টাল ইন্‌স্পেক্টর হঠাৎ এক দিন মদনমোহনপুরে আসিয়া গোপনে পোষ্ট-মাষ্টারের কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া সদরে প্রস্থান করিলেন। তিন দিন পরে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আদেশ করিলেন, পোষ্ট-মাষ্টার পঞ্চানন পালকে সদরের কেরাণীদলে বদলী করা হইল; সদরের যে কেরাণী তাহার 'চার্জ্জ' বুঝিয়া লইতে যাইতেছে, তাহাকে 'চার্জ্জ' বুঝাইয়া দিয়া পোষ্ট-মাষ্টার যেন ৩ দিনের মধ্যে তাহার সদরের কার্য্যভার গ্রহণ করে।

এই আদেশে পোষ্ট-মাষ্টারের মস্তকে বজ্রাঘাত হইল! সে ভাবিয়াছিল, 'সার্ব্বিসের' অবশিষ্ট কয়েক বৎসর মদনমোহনপুরেই কাটাইয়া পেন্সন লইবে, ডাকঘর ছাড়িয়া দুই পাঁচ বৎসরের মধ্যে আর তাহাকে তাহার জঙ্গলাবৃত, বাসের অযোগ্য, ভাঙ্গা বাড়ীতে প্রবেশ করিতে হইবে না। পোষ্ট-মাষ্টারের ভাই, ভ্রাতৃবধূ ও অন্যান্য আত্মীয় ছিল, বহু পূর্ব্বেই সে তাহাদিগকে পৃথক্ করিয়া দিয়াছিল এবং তাহাদিগের সহিত আত্মীয়তা স্বীকার করিতে লজ্জাবোধ করিত। স্বামীর পদগৌরবে পঞ্চাননের স্ত্রীও মানুষকে মানুষ জ্ঞান করিত না। স্বামীর আত্মীয় ও আত্মীয়াগণের সংস্রব সে দুঃসহ মনে করিত। এমন ঘর-বাড়ী, এমন তরিতরকারীর বাগান, এতগুলি বিনা মাহিনার চাকর প্রভৃতি ছাড়িয়া তাহাকে তাহার স্বামীর ভাঙ্গা খড়ো বাড়ীতে আশ্রয় লইতে হইবে শুনিয়া, তাহার মস্তকেও যেন বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হইল; সে কাঁদিয়া বলিল, "কুড়ে মিন্‌ষে! তোর আপিসের কেরাণীরা তোকে আপিস থেকে তাড়ালে, আর তুই তাদের কিছুই করতে পারলি নে! গলায় দড়ি দিয়ে মরতে পারিস্ নে?"

ক্ষোভে, মনস্তাপে, ক্রোধে সেই সাধ্বীর ঘন ঘন মূর্চ্ছা হইতে লাগিল।

শ্যালকের বেনামীতে ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া পোষ্ট-মাষ্টার অনেকগুলি টাকা বাহির করিয়া দিয়াছিল, সে সদরে গিয়া চাকরী আরম্ভ করিলে ব্যবসায়টি নষ্ট হইবে বুঝিয়াই পোষ্ট-মাষ্টার অধিকতর কাতর হইল; কিন্তু সে তাহার সাধ্বী পত্নীর অভিপ্রায়ানুযায়ী কায না করিয়া অর্থাৎ গলায় দড়ি দিয়া না মরিয়া সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে লিখিল, তাহার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ শুনিয়া, তাহাকে বদলী করায় তাহার প্রতি অত্যন্ত অবিচার করা হইয়াছে, তাহার শরীর অত্যন্ত অসুস্থ, স্ত্রীও রুগ্না; এ অবস্থায় সদরে গিয়া কার্য্যভার গ্রহণ করা তাহার অসাধ্য; আপাততঃ তাহাকে পূরা বেতনে দুই মাস ছুটী দেওয়া হউক। তাহার প্রচুর ছুটী পাওনা আছে।

তাহার এই আবেদনের উত্তরে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব লিখিলেন, "তোমাকে শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে বদলী করা হয় নাই। চিরকাল বাড়ী বসিয়া গবর্ণমেণ্টের চাকরী করা চলে না; বরং তুমি যে এই সুদীর্ঘকাল বাড়ী বসিয়া চাকরী করিয়া বাড়ীর সুখ-সুবিধা (Home comforts) উপভোগ করিতে পারিয়াছ, সে জন্য তোমার অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দাও। সরকারী কার্য্যের সুব্যবস্থা করিবার জন্য তোমাকে বদলী করা আবশ্যক হইয়াছে। এখন তোমার ছুটীর প্রার্থনা মঞ্জুর হইতে পারে না; তোমাকে সদরে আসিয়া কার্য্যভার গ্রহণ করিতে হইবে।"

সুতরাং পোষ্ট-মাষ্টার পঞ্চানন পালকে অগত্যা চার্জ্জ বুঝাইয়া দিয়া সপরিবারে পোষ্ট আফিসের বাড়ী হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হইল। তাহার স্ত্রী অশ্রুধারায় রোষানল নির্ব্বাপিত করিতে না পারিয়া তরিতরকারীর গাছগুলি কতক ছিঁড়িয়া, কতক সমূলে উৎপাটিত করিয়া, কতক বা গরু দিয়া খাওয়াইয়া, সেই বাড়ীতে তাহাদের ব্যবহারযোগ্য যাহা কিছু ছিল, সমস্ত গরুর গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া তাহাদের বাস্তভিটায় গিয়া আশ্রয় লইল। বর্ষার এক দিন সিক্ত অপরাহ্ণে পোষ্ট-মাষ্টার তাহার স্ত্রী ও মেয়ে দুইটিকে সঙ্গে লইয়া অব্যবহার্য্য, জীর্ণ, জঙ্গলাবৃত পৈতৃক কুটীরে প্রবেশ করিয়া, ঘরবাড়ীর অবস্থা দেখিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিল। তাহাদের আত্মীয়স্বজনরা সেই ভিটার অন্য দিকে বাস করিত; তাহারা দীর্ঘকাল পরে পোষ্ট-মাষ্টার ও তাহার স্ত্রীকে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া, তাহাদের অভ্যর্থনার জন্য তাহাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল; কিন্তু তাহারা তাহাদের দিকে ফিরিয়াও চাহিল না। মনে করিল, তাহাদের আত্মীয়রা দুর্দ্দিনে তাহাদিগকে বিদ্রূপ করিতে আসিয়াছে। দুই দিন পরে পোষ্ট-মাষ্টার পঞ্চানন পাল স্ত্রী ও কন্যাদ্বয়কে 'অকূল সমুদ্রে' ভাসাইয়া গরুর গাড়ীতে নূতন চাকরীস্থলে যাত্রা করিল। তাহার স্ত্রী সেই জীর্ণ কুটীরের সিক্ত মেঝের উপর পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল, এবং কাতরভাবে প্রার্থনা করিতে লাগিল, যাহাদের হিংসায় তাহার সুখের সংসারে আগুন লাগিয়া গেল—তাহারা অচিরে নির্ব্বংশ হউক!

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

যাত্রী

(কবীর)

১

আর কেন মিছে ওঠ ওরে জাগি
　　ভেঙ্গে দে ঘুমের ঘোর,
দূরের যাত্রি! নাহি কি স্মরণে
　　কত দূরে পথ তোর?

২

পথে আছে নদী কত না গভীর
　　কত না বিপদ তার,
তোর যে অভাগা জীর্ণ তরণী
　　কেমনে হইবি পার?

৩

বেঁধে নে তরণী ভেঙ্গেছে নিদ্রা,
　　সেধে নে পরাণ-মন,
মিছে সুদ-লোভে হারাবি বা কেন
　　জীবনের মূলধন।

শ্রীকমলকৃষ্ণ মজুমদার

নরওয়ে

নরওয়ে প্রাচীন দেশ, পৃথিবীর ইতিহাসে এই প্রাচীন দেশের বহু বিবরণ পাওয়া যায়; কিন্তু নরওয়েবাসীরা অল্পদিন হইল, জাতীয় স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। বিগত ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নরওয়েবাসীরা পরাধীনতার শৃঙ্খল হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে নাই। সুইডেন দীর্ঘকাল ধরিয়া তাহাদের উপর আধিপত্য করিয়াছিল। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে সুইডেনের সহিত নরওয়ের এ সম্বন্ধে দৌত্য চলিয়াছিল — নরওয়েবাসীরা সুইডেনের কাছে প্রস্তাব করিয়াছিল যে, তাহারা আর সুইডেনের অধীনতাপাশ বহন করিতে অসমর্থ। এ প্রস্তাবে সুইডেন অবশ্যই খুসী হয় নাই—কেই বা হইয়া থাকে? এক রাজ্য যদি অপর রাজ্যের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবার সুবিধা পায়, তবে সে সুবিধা সহজে ত্যাগ করা যায় কি? বিশেষতঃ সুইডেনের আত্মাভিমান অত্যন্ত প্রবল। স্পানিয়ার্ড ছাড়া বোধ হয়, এমন অহঙ্কারী জাতি পৃথিবীতে আর আছে কি না সন্দেহ। য়ুরোপীয় জাতিমাত্রেই অল্পাধিক গর্ব্বিত; কিন্তু সুইডেনের অধিবাসীরা স্পানিয়ার্ডের মত অতি গর্ব্বিত ও দাম্ভিক।

নরওয়ে যখন বিনীতভাবে সুইডেনের কাছে আবেদন করিল যে, সুইডেনাধিপ রাজা অস্কারের শাসনপাশ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া সে স্বাধীনভাবে চলিবে, তখন নরওয়ে এবং সুইডেনের মধ্যে যুদ্ধের আশঙ্কা ঘনীভূত হইয়া উঠিল। সুইডিস্‌গণ সৈন্যসমাবেশ করিতে উদ্যত হইল। অবসর লইয়া যে সকল সেনানী বিশ্রাম উপভোগ করিতেছিলেন, তাঁহারা কর্ম্মক্ষেত্রে ফিরিয়া আসিলেন। চারিদিকে সাজ সাজ রব পড়িয়া গেল। ক্রিষ্টিয়ান্ মাইকেলসেন্ তখন নরওয়ের মন্ত্রী, অর্থাৎ নরওয়ে শাসনব্যাপারে তিনিই প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার চেষ্টার প্রভাবেই অবশেষে যুদ্ধের আশঙ্কা নিবারিত হয়। নহিলে দুইটি প্রাচীন দেশ যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে ধ্বংসপ্রায় হইত।



বিয়ের কনে, বিবাহপরিচ্ছদে—নরওয়ে

ডেনমার্ক, নরওয়ে এবং সুইডেন এই তিনটি স্কান্‌ডিনেভীয় দেশের মধ্যে নরওয়ের জনসংখ্যা অল্প। সুইডেনের লোকসংখ্যা প্রায় ৫০ লক্ষ হইবে, কিন্তু নরওয়ের ২৫ লক্ষের অধিক হইবে না। ডেনমার্কের জনসংখ্যা সুইডেনের অপেক্ষা কিছু অধিক হইতে পারে।

প্রতীচ্যের গণতন্ত্রবাদী দেশসমূহের মধ্যে নরওয়েবাসীরা সর্ব্বাপেক্ষা উদারমতাবলম্বী। জগতের অগ্রগতির সহিত তাহাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয়। আধুনিকতার বিশেষ ভক্ত হইলেও নির্ব্বিচারে তাহারা কোনও বিষয়

গ্রহণ করে না। সংরক্ষণপ্রণালীতে সমাজের কাযে তাহারা অবহিত হয়; কিন্তু সেই সঙ্গে তাহারা দেখে, যদি কোনও নূতন মতবাদ তাহাদের সভ্যতার বিরোধী না হয়, তবে তৎক্ষণাৎ নূতন হইলেও সে মতকে তাহারা সাগ্রহে বরণ করিয়া লয়।

বৈদেশিকগণ তাহাদের প্রকৃতির যথার্থ পরিচয় না জানিয়া অনেক সময় তাহাদিগকে গোঁয়ার-গোবিন্দ আখ্যায় অভিহিত করেন। কিন্তু তাহা যথার্থ নহে। মিঃ মরিস্ ফ্রান্সিস্ ইগান্ দীর্ঘকাল ডেনমার্কে ছিলেন। তিনি আমেরিকা যুক্তরাজ্যের ডেনমার্কস্থিত পররাষ্ট্র-সচিবের কায করিয়াছিলেন। তিনি নরওয়েবাসীদিগের



নরওয়েজীয় যুবতীরা হাস্যমুখে বাতায়নপথে চাহিয়া আছে

সম্বন্ধে প্রচুর অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন। তিনি এক স্থলে লিখিয়াছেন, "বৈদেশিকরা নরওয়েবাসীদিগের সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশকালে বলিয়া থাকেন যে, উহারা অত্যন্ত গোঁয়ার; কিন্তু তাহা ঠিক নহে। উহারা সহজে বিচলিত হয় না। নরওয়েবাসীদিগের মতের দৃঢ়তা আছে, আত্মপ্রত্যয় আছে। বিশেষ বিবেচনার পর তাহারা সঙ্কল্প স্থির করিয়া থাকে এবং একবার কোনও বিষয়ে ধারণা জন্মিলে সে মত সহজে পরিবর্ত্তিত হয় না। তাহাদের আর একটা গুণ আছে, অন্যের মতের উপর তাহারা নিজের মত চালায় না।"

নরওয়ের অধিবাসীরা অত্যন্ত সরলহৃদয়। মনে-প্রাণে তাহাদের বিভিন্নতা নাই। সমুদ্রের ভক্ত বলিয়া সমুদ্রের ন্যায় তাহাদের নীল নয়ন কি না, তাহা ঠিক বলা যায় না। বাস্তবিক, এমন খোলাপ্রাণ য়ুরোপীয় জাতি আর নাই বলিলেই চলে।

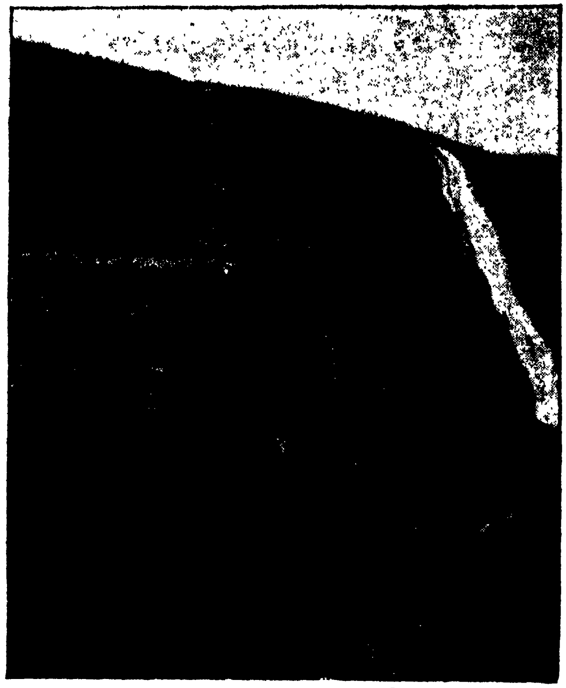
সুইডেনের অধীনতাপাশ হইতে মুক্তিলাভের পর নরওয়েবাসিগণ আপনাদের মতানুযায়ী এক রাজা নির্ব্বাচন করিয়া লইয়াছে। নরওয়েতে লুথারীয় খৃষ্টধর্ম্মমত প্রচলিত আছে। অবশ্য কোনও বিশিষ্ট ধর্ম্মমতের অন্ধবিশ্বাসী তাহারা নহে। তথাপি যে ধর্ম্মমত দেশে প্রচলিত আছে, তাহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করা সঙ্গত, এই বিশ্বাস তাহাদের মধ্যে প্রবল এবং সেই বিশ্বাসবশেই তাহারা লুথারীয় ধর্ম্মবিশ্বাসী রাজাকে আপনাদের নরপতিরূপে নির্ব্বাচিত করিয়াছে। নরওয়ের রাজাও প্রজাতন্ত্রের অত্যন্ত ভক্ত। লোকমতকে তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিয়া থাকেন। সাম্যভাব তাঁহাতে অত্যন্ত প্রবল। রাজার মহিষী-নির্ব্বাচনব্যাপারেও নরওয়েবাসিগণ

গণতন্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিয়াছে। যে নারীর হৃদয় গণতন্ত্রের অনুরক্ত নহে, তাঁহাকে সিংহাসনে রাণীর আসন দেওয়া যাইতে পারে না। এ জন্য কোনও জর্ম্মণ রাজকন্যাকে কখনও তাহারা মনোনীত করিবে না।

ডেনমার্কের বর্ত্তমান রাজার সহোদর প্রিন্স কার্ল সপ্তম হাকন্ নাম গ্রহণ করিয়া নরওয়ের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত আছেন। তাঁহার মহিষী রাণী মড্ ইংলণ্ডেশ্বর সপ্তম এডোয়ার্ডের কন্যা।

রাণী মড্ জনসাধারণের অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্রী। সকলেই তাঁহাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসে। তাঁহার ব্যবহার এমনই মধুর ও সরল, যে, সমগ্র নরওয়েবাসী তাঁহাকে শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি দিতে পারিলে যেন কৃতার্থ হইয়া যায়।

রাজপুত্র ওলাভ্ এখন বিদ্যাশিক্ষা করিতেছেন। তাঁহার অহঙ্কার বা দম্ভ নাই। রাজপুত্র এবং সিংহাসনের উত্তরাধিকারী বলিয়া তিনি স্কুলে সহপাঠিগণের সহিত কোনও প্রকার 'চাল' পর্য্যন্ত দেখান না। দেশগতপ্রাণ প্রত্যেক নরওয়েবাসীই শীতকালে ক্রীড়া ও ব্যায়ামের অনুরাগী। জীবনধারণের পক্ষে এইরূপ ব্যায়াম ও ক্রীড়া যে অবশ্য প্রয়োজনীয়, তাহা নরওয়েবাসীদিগের মজ্জাগত ধারণা। যুবরাজ ওলাভ্‌কে খাঁটি নরওয়েজীয়রূপে গড়িয়া তুলা হইতেছে। সে দেশের জীবনের আদর্শ শুধু অর্থসঞ্চয় নহে—মুক্তবায়ুতে ব্যায়াম ও ক্রীড়া, মনের উৎকর্ষসাধন, বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিক বিষয়ে প্রগাঢ় অনুরাগ প্রভৃতি নরওয়েবাসীর আদর্শ। সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারীকে তাহারা এমনই ভাবে গড়িয়া তুলিতেছে।



নরওয়ের প্রসিদ্ধ রুকান্‌ফো প্রপাত

নরওয়েতে ধনীর বড়ই বিপদ। কারণ, যে ঐশ্বর্য্যবান্, তাহাকে প্রভূত কর দিতে হইয়া থাকে। ইহাতে জীবন দুর্ব্বহ হইয়া পড়ে। মিঃ ইগান্ এ সম্বন্ধে এক চমৎকার মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, "নরওয়ে বাসকালে প্রাচীন একটা কিংবদন্তী বা প্রবাদবাক্যের কথা মনে পড়ে। সেই কাহিনীতে দেখা যায় যে, যাহার সংসারে কিছুই নাই, সেই যথার্থ সুখী। নরওয়েতে এই কথারই যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হয়।"



নরওয়ের রাজপরিবার—শীতকালে ব্যায়ামক্রীড়ায় উদ্যত

নরওয়ের রাজা ও রাণী বিনা আড়ম্বরে কিছু কাল ক্রিশ্চিয়ানিয়া রাজপ্রাসাদে এবং কিছু কাল বাইগড্ মালভূমিস্থিত প্রাসাদে যাপন করিয়া থাকেন। রাজধানীর



মির্ডাল রাজপথ—আঁকিয়া বাঁকিয়া পাহাড়ের উপর দিয়া প্রস্তুত

আদৌ নিন্দনীয় নহে। জনৈক মার্কিণ-মহিলা একবার ক্রিশ্চিয়ানিয়া রাজধানীতে গিয়াছিলেন। রাজপ্রাসাদের বলনৃত্যে এই মহিলাটি আহূত হয়েন। কেশপ্রসাধনের জন্য তিনি কোনও প্রসাধিকার দোকানে গমন করেন। প্রসাধিকা যেমন প্রিয়দর্শনা, তেমনই মিষ্টভাষিণী এবং সুশিক্ষিতা। প্রসাধনশেষে উক্ত মার্কিণ-মহিলা যথাসময়ে রাজপ্রাসাদে গিয়া নৃত্যোৎসবে যোগদান করেন। নৃত্যাগারে পূর্ব্বপরিচিতা প্রসাধিকাকে দেখিয়া তিনি বিস্মিতা হয়েন। সেই প্রসাধিকা তখন স্বামীর বাহু অবলম্বন করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহার স্বামী সেনাবিভাগের কোনও উচ্চপদস্থ সামরিক কর্ম্মচারী। গণতন্ত্রবাদী সমাজে এরূপ কার্য্য অপ্রশংসার নহে।

রাজা হাকন্ কথাপ্রসঙ্গে এক দিন মিঃ ইগান্‌কে বলিয়াছিলেন, "দেখুন, আপনারা আমেরিকার অধিবাসী—আপনারা বলিয়া থাকেন, আমরা নরওয়েবাসীরা অত্যন্ত গণতন্ত্রপ্রিয়। কিন্তু আপনাদের রাষ্ট্রপতি মাত্র ৪ বৎসর ধরিয়া রাজ্য শাসন করিতেছেন। আর আমি সারাজীবন ধরিয়া এই রাজ্য শাসন করিব।"

সভ্যজীবন যাপন করিতে হইলে যে ভোগবিলাসী হইতেই হইবে, নরওয়েতে সে দৃষ্টান্ত নাই। সভ্যতার সঙ্গে বিলাসিতার কোনও নিত্যসম্বন্ধ আছে, নরওয়েবাসীরা রাজপথে যানারোহণে ভ্রমণকালে তাঁহারা শুভ্র ও সুন্দর ভল্লূকচর্ম্মের পোষাক পরিধান করিয়া থাকেন। তাহা ছাড়া বিলাসিতার কোনও প্রকার আড়ম্বর তাঁহাদের চালচলনে দেখা যায় না।

রাজা হাকন্ অতি সুপুরুষ। যৌবনে তিনি নাবিকের কার্য্য করিয়াছিলেন। এ জন্য কর্ত্তব্যবোধ তাঁহাতে অতিমাত্রায় প্রবল। মিতব্যয়িতা সম্বন্ধে তাঁহার পর্য্যাপ্ত জ্ঞান আছে। প্রজার মঙ্গল এবং উন্নতি সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত আগ্রহশীল। তাঁহার কথা বলিবার ভঙ্গী প্রশংসনীয়—বাজে কথা তিনি বলেন না। তাঁহার কণ্ঠস্বর অতি মধুর, কিন্তু প্রকাশ্য বক্তৃতায় তিনি বিরোধী।

নরওয়ে গণতন্ত্রের উপাসক, পরিশ্রম করিয়া অর্থোপার্জ্জন সেখানে



নরওয়েজীয় কৃষক শস্য বোঝাই করিতেছে



নরওয়েজীয় গৃহকর্ত্রী রুটী প্রস্তুত করিতেছে

তাহা স্বীকার করে না। একবার কোনও মার্কিণ অধ্যাপক মহামূল্য পরিচ্ছদভূষিতা পত্নীর সহিত Rolls—Royce মোটরগাড়ী চড়িয়া, ভৃত্য ও পরিচারিকা সহ নরওয়ে গিয়াছিলেন। অধ্যাপকের এই ঐশ্বর্য্যপ্রকাশস্পৃহা এবং বিলাসিতা দেখিয়া নরওয়েবাসীরা তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতে পারে নাই। তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যের খ্যাতি নরওয়ে ও ডেনমার্কের অধিবাসীদিগের নয়নে নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছিল। উহারা জানে, যাঁহারা উচ্চবিষয়ে চিন্তা করেন, তাঁহাদের জীবনযাত্রার প্রণালী অত্যন্ত সাধারণ। ভারতবর্ষের পুরাতন ভাবধারার সহিত এ বিষয়ে নরওয়ের সাদৃশ্য বিদ্যমান। মিঃ ইগান্ উল্লিখিত মার্কিণ অধ্যাপক সম্বন্ধে আর একটা গল্প বলিয়াছেন। তিনি বলেন, "উক্ত প্রসিদ্ধ মার্কিণ অধ্যাপক যে হোটেলে বাস করিতেছিলেন, আমি তথায় গিয়া আমার নামের কার্ড পাঠাইয়া দিলাম। আমার সঙ্গে জনৈক নরওয়েজীয় শিক্ষক ছিলেন। তিনি উল্লিখিত মার্কিণ অধ্যাপককে মোটরে চড়িয়া যাইতে দেখিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন না যে, তিনিই প্রসিদ্ধ মার্কিণ অধ্যাপক। আমার কাছে তাঁহার পরিচয় পাইয়া এই নরওয়েজীয় শিক্ষক বলিয়া উঠিলেন, 'বলেন কি? না —উহা অসম্ভব! তিনি কখনই অধ্যাপক হইতে পারেন না'!"

অনেকের ধারণা থাকিতে পারে যে, নরওয়েবাসীরা অত্যন্ত মিতব্যয়ী—সুতরাং তাহারা দরিদ্র। কিন্তু কথাটা সত্য নহে। নরওয়ে ক্ষুদ্র দেশ, তথাপি ধর্ম্মশিক্ষা, বিদ্যাচর্চ্চা—বিজ্ঞান ও সাহিত্যের জন্য প্রতি বৎসর তাহারা ৬০ লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করিয়া থাকে। একটা ক্ষুদ্র দেশের পক্ষে ইহা কখনই সামান্য নহে।

নরওয়ের সাহিত্যের ভাষা (লিখিত ও কথিত ভাষা) ডেনমার্কের ভাষার সহিত ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্যযুক্ত। তবে উচ্চারণপ্রণালীতে পার্থক্য আছে। নরওয়েবাসীদিগের কথা বলিবার ভঙ্গী বড় সুন্দর—উচ্চারণপ্রণালীতে সুরের মাধুর্য্য লক্ষিত হয়। কিন্তু নিজের মাতৃভাষা উত্তমরূপে উচ্চারণ করিতে পারিলেও, নরওয়েজীয়ের পক্ষে ইংরাজী ভাষা উত্তমরূপে আয়ত্ত করা কঠিন। নরওয়েতে আর একটা মিশ্রভাষা প্রচলিত আছে। তাহার নাম মা-ল (Maal)। এই ভাষা ঠিক কৃষকদিগের কথ্যভাষা নহে। প্রাচীন ভাষার



নরওয়ের প্রাচীন যুগের আলোকাধার

উপর বনিয়াদ খাড়া করিয়া এই ভাষা প্রচলিত আছে। কোন কোন স্বদেশগতপ্রাণ নরওয়েজীয় এই ভাষাকে নরওয়ের সার্ব্বজনীন ভাষারূপে প্রচলিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

নরওয়ের দুই জন প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকের নাম সর্ব্বজনবিদিত। এক জনের নাম Bjornstjerne Bjornson এবং অন্যের নাম Henrik Ibsen. ইঁহাদের রচনা সম্বন্ধে সমাজতত্ত্ববিদ্ এবং সমালোচকদিগের বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত আছে। ইব্‌সেন নাটকরচনায় যুগান্তর উপস্থাপিত করিয়াছেন, এ কথা সকল সভ্যদেশেই স্বীকৃত হইয়াছে।

একটা বিস্ময়ের বিষয় এই, নরওয়ের মত সমুদ্রসলিলবিহারী ও মৎস্যজীবী জনসাধারণের মধ্য হইতে এমন এক দল সাহিত্যিক ও সঙ্গীতজ্ঞ আবির্ভূত হইয়াছেন, যাঁহাদের নাম বিশ্ববিশ্রুত হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আধুনিক সঙ্গীতসম্বন্ধে যাঁহারা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে এডোয়ার্ড গ্রেগ্, ওলিবুন্ এবং ক্রিশ্চিয়ান্ সিনুডিংএর নাম উল্লেখ না করিলে তালিকা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়।

নরওয়েতে নারীর অধিকারের চূড়ান্ত মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। তথায় যে কোনও নারী উপযুক্তসংখ্যক



প্রাচীন যুগের ভোজন ও পানপাত্রাদি



নরওয়ের পল্লী-সুন্দরী

ভোট সংগ্রহ করিতে পারিলেই ধর্ম্মমন্দির এবং কূট রাজনীতিসংক্রান্ত বিভাগ ব্যতীত রাজ্যের সর্ব্ববিধ অনুষ্ঠান ও কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারেন। নরওয়ের কবি হেন্রিক উইলিয়ম্ বারজেলাণ্ড (Wergeland)এর সহোদরা জ্যাকোবাইন্ ক্যামিলা কলেট্ যখন 'গবর্ণরস্ ডটার' নামক উপন্যাস রচনা করেন, সেই সময় হইতেই নারীর অধিকার লইয়া নরওয়েতে সংগ্রাম আরব্ধ হয়।

অন্যান্য অনেক দেশের ন্যায় নরওয়ের সমাজে নারী ও পুরুষের চরিত্রের আদর্শ সম্বন্ধে ভিন্ন ব্যবস্থা ছিল। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ নাট্যকার Bjornson রচিত 'A Gauntlet' প্রকাশিত হয়। সেই যুগের সাময়িক পত্র ও সংবাদপত্রসমূহ পাঠ করিলে দেখা যাইবে যে, ক্রিশ্চিয়ানিয়া এবং নরওয়ের বিভিন্ন স্থানের সাহিত্যিক কেন্দ্র হইতে এই নাটক সম্বন্ধে প্রতিকূল ও অনুকূল সমালোচনার ঝড় বহিয়া গিয়াছিল। এই নাটককে উপলক্ষ করিয়া সাহিত্যিকদিগের মধ্যে প্রচণ্ড দলাদলিও ঘটিয়াছিল। পরস্পরবিরোধী সংবাদপত্রেও ভীষণ আন্দোলন

করিয়াছিলেন, নারীর পক্ষে সতীত্ব যেরূপ আদর্শ, পুরুষের পক্ষেও ঠিক তদ্রূপ। নারীর ব্যভিচারে দোষ ঘটিলে, পুরুষের ব্যভিচারেও সমান অপরাধ ও পাপ হয়। একের পক্ষে যাহা পাপ, অন্যের পক্ষে তাহা পাপ নহে, এ কথা এই নরওয়েজীয় লেখক স্বীকার করিতে সম্মত ছিলেন না। তিনি দৃঢ়তার সহিত পাণিপ্রার্থী যুবকদিগকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহাদের অতীত জীবন নিষ্কলঙ্ক কি না? ইহাতেই পুরুষের দল অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও বিচলিত হইয়াছিল। এই পুস্তক প্রকাশের পর হইতে নরওয়েতে পুরুষের নৈতিক চরিত্র রক্ষা ও উন্নতিকল্পে অনেক প্রতিষ্ঠানের আবির্ভাব হইয়াছিল, এবং যাহারা কোনও রমণীর স্বামী হইবার জন্য অগ্রসর হইত, তাহাদিগকে নাট্যকারের প্রস্তাবিত উপায়ে পরীক্ষা করা হইত। Bjornson ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে নোবেল প্রাইজ পাইয়াছিলেন। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন। তাঁহার ঊর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া উপলক্ষে যে সমারোহ হইয়াছিল, তাহা পৃথিবীশ্বরের



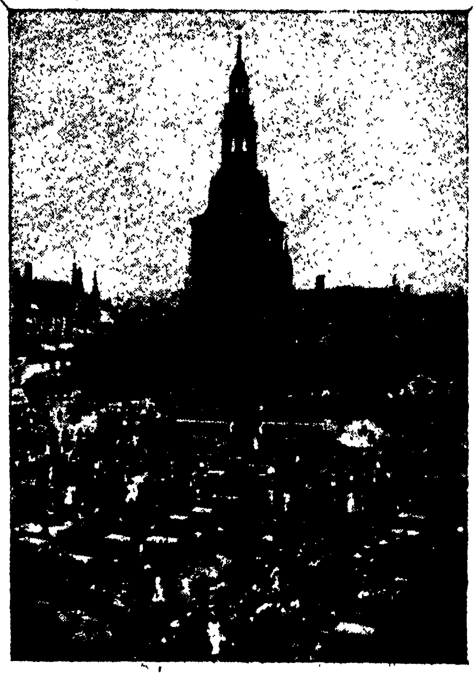
বার্জেনের গির্জ্জা—চৈনিক প্যাগোডার সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে

সুইডেনের ন্যায় নরওয়ের অধিবাসীরা দেশান্তরে গিয়া বসবাসের বিরোধী নহে। কোনও দেশপ্রেমিক সুইডেনবাসীর সহিত আলোচনাকালে তাঁহাকে প্রায়ই বলিতে শুনা যাইবে যে, মার্কিণ যুক্তরাজ্য সুইডেনের সকল লোককে যেন হজম করিয়া ফেলিতেছে। সুইডেন হইতে কোনও লোক যাহাতে অন্যত্র গিয়া বসবাস না করে, সে জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা হইতেছে। নরওয়েবাসীরা অত্যন্ত স্বদেশভক্ত হইলেও দেশত্যাগ করা সম্বন্ধে অতটা ভাবপ্রবণ নহে। নরওয়ে ছাড়িয়া কোনও নরওয়েজীয় যাইতে চাহে না। কিন্তু প্রয়োজন হইলে দলবদ্ধ হইয়া স্থানত্যাগ করিতে পশ্চাৎপদ হইবে না।

জারজসন্তান সম্বন্ধে নরওয়ের সহর ত দূরের কথা, সুদূর [illegible] লেও তেমন বিভীষিকা নাই। অথচ নরওয়েবাসীরা অত্যন্ত সহৃদয়, অত্যন্ত সচ্চরিত্র ও সাধুস্বভাব। তাহাদের সরলতা অনেক সময় সহনাতীত বলিয়া বোধ হইবে। ন্যায় পরায়ণতার দিকে তাহাদের



[illegible] ধীবরের তিমি শিকার



ক্রিশ্চিয়ানিয়ার ফুলের বাজার

প্রখর দৃষ্টি আছে। যে সকল ভ্রমণকারী, নরওয়ের শুধু উত্তরাঞ্চলে ভ্রমণ করিয়াছেন, অথবা যাঁহারা ঔপন্যাসিকের বর্ণনা কিংবা মাসিকপত্রের বিবরণ হইতে নরওয়ের পরিচয় লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা তত্রত্য জনসাধারণের গার্হস্থ্য জীবনের অতি সামান্য পরিচয়ই পাইয়া থাকেন। নরওয়েবাসীরা স্বভাবতঃ উগ্রপ্রকৃতি; সে উগ্রতা অনেকটা পশুত্বের সন্নিহিত। মানুষের মধ্যে যে সহজাত তেজ থাকা দরকার, ঠিক সেইরূপ উগ্রতা তাহাদের চরিত্রে বিদ্যমান। যাহার চরিত্রে ইহা নাই, সে প্রকৃত নরওয়েজীয় নহে, অনেকেরই এইরূপ ধারণা। মার্কিণ সম্বন্ধেও য়ুরোপে এইরূপ ধারণা প্রবল যে, আমেরিকাবাসী হইলেই তাহার কথার ভঙ্গীতে একটা টান থাকিবে। তাহা না থাকিলে সে কখনই মার্কিণ নহে। নরওয়েজীয় সম্বন্ধে উল্লিখিত ধারণা যাঁহাদের আছে, তাঁহারা একটা বিষয়ে উপেক্ষা করিয়া থাকেন। সারা বৎসর ধরিয়াই নরওয়েজীয়রা তুষার ও সমুদ্রে যাপন করে না। তাহাদের দেশে শুধুই দুঃখ-কষ্ট নাই। অনেক সময় সে দেশেও সুখ-শান্তির প্রচুর অবসর আছে।

অনেকের এরূপ ধারণাও আছে যে, নরওয়েজীয়রা বড় সুরাসক্ত—মাতাল। মিঃ ইগানের মত এ সম্বন্ধে উদ্ধৃত হইল। তিনি লিখিয়াছেন, "অনেকের বিশ্বাস যে, দেশীয় মদ্য 'ব্রেন্‌ডেভিন' (Braendevin) পান করিয়া—নরওয়েজীয়রা মাতাল হইয়া থাকে। কিন্তু কথাটা সত্য নহে। তবে এই মিথ্যা ধারণা লোকের মন হইতে দূরীভূত করাও সহজসাধ্য নহে।"

নরওয়েবাসীরা এখন বিজ্ঞান-চর্চায় অবহিত। শীঘ্রই নরওয়ে য়ুরোপের অন্যতম শ্রমশিল্পকেন্দ্রে পরিণত হইবে বলিয়া অনেকে আশা করেন। বার্জ্জেনের বিরাট মাছের বাজার অনেকেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া থাকে। বাস্তবিক এখানকার কার্য্যাবলী পর্য্যবেক্ষণের উপযোগী। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সমগ্র খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী দেশে বার্জ্জেন হইতে শুষ্ক মৎস্য সরবরাহ করা হইত। এখনও কড মৎস্য শুষ্কাবস্থায় প্রচুর পরিমাণে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রপ্তানী হইয়া থাকে। মাছ না শুকাইয়া ইদানীং লবণজর্জ্জরিত করিয়া রাখিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এই জাতীয় মৎস্যকে 'klip fisk' বলে। সমগ্র জগতে বার্জ্জেনের খ্যাতি আছে। এত বড় মৎস্য-বন্দর আর নাই বলিলেই চলে। অগ্রে জেলেডিঙ্গী



কড্ মৎস্য সহ ধীবরদ্বয়

বা খোলা নৌকায় মাছ ধরিবার ব্যবস্থা ছিল। এখন বৈজ্ঞানিক যুগ, কাযেই সকল বিষয়ে উন্নতি হইয়াছে। মোটর বোটে নরওয়েজীয় ধীবরগণ মৎস্য শিকার করিতে আরম্ভ করিয়াছে।



ক্রিশ্চিয়ানিয়ার প্রধান রাজপথ

নরওয়েবাসীরা ধর্ম্মালোচনা করিতে অত্যন্ত ভালবাসে; বিশেষতঃ ঈশ্বরের সম্বন্ধে তত্ত্বালোচনায় তাহাদের আগ্রহ অধিক। বিশ্রামকালে ধীবরগণ পর্য্যায়ক্রমে ধর্ম্ম ও রাজনীতির আলোচনা করিয়া থাকে। অর্থাৎ অবসরকালকে তাহারা এমন ভাবে ভাগ করিয়া রাখে যে, একার্দ্ধ ধর্ম্মালোচনা এবং অপরার্দ্ধ রাষ্ট্রনীতি-চর্চ্চায় ব্যয়িত হয়।

ভূতপূর্ব্ব জর্ম্মাণ সম্রাট কাইসার নরওয়েতে ২৫ বার গিয়াছিলেন। কিন্তু নরওয়েজীয়গণ তাঁহাকে বিশেষ প্রীতির দৃষ্টিতে দেখিত না। এ সম্বন্ধে নরওয়ের অন্যতম ইতিহাস-লেখক মিঃ ইগান্ একটি গল্প লিখিয়াছেন। জর্ম্মণ সম্রাট একদা পথে বিচরণ করিতেছিলেন। তাঁহার শরীররক্ষী দুইটি ঘোড়া লইয়া পশ্চাতে আসিতেছিল। কাইসার পদচারণা করিতে করিতে কিছু দূরে গিয়া পড়িয়াছিলেন। এমন সময় দুই জন নরওয়েজীয় কৃষক রুটী চর্ব্বণ করিতে করিতে



বার্জেনের কাঠের গুদামের তোরণ। তোরণশীর্ষে দারুময় শ্রমজীবীর মূর্ত্তি



সপ্তদশ শতাব্দীর টাউন হলে গ্রাম্য বালিকার দল

সেই পথে চলিতেছিল। তখন সে পথে অপর কোনও লোক ছিল না। কৃষক-যুগল বৃদ্ধ, শ্বেতশ্মশ্রু বিশিষ্ট। কাইসার তখন পথিপার্শ্বস্থ একটা কুঞ্জ দেখিয়া উহা পরীক্ষা করিতেছিলেন। সেই সময় তাঁহার হাতের দস্তানা হঠাৎ মাটীতে পড়িয়া যায়। বৃদ্ধযুগল তাঁহার সন্নিহিত হইলে তিনি এমন ভাবে তাহাদের দিকে চাহিলেন যে, তাহারা উহা কুড়াইয়া তাঁহাকে দিবে। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়, তাহাদের এক জন বলিয়া উঠিল, "আমার চেয়ে আপনি বয়সে ছোট, সুতরাং আপনি নিজেই উহা কুড়াইয়া লইতে পারেন।" এই বলিয়া তাহারা স্বচ্ছন্দ-গতিতে চলিয়া গেল। শরীর-রক্ষী এই দৃশ্যে শঙ্কায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারই মুখে এই ঘটনার কথা পরে অনেকে শুনিয়াছিল।



লোফোটন্ দ্বীপের সন্নিহিত মৎস্য-বন্দর;—সলিলবক্ষে ধীবরদিগের পোতনিচয়

নরওয়ে দেশে এক প্রকার চক্রহীন স্লেজ গাড়ী আছে। প্রত্যেক নরনারী ঐ প্রকার গাড়ী চড়িতে অভ্যস্ত। উহার নাম 'জেল্‌কি' (kjelki)। একটা কাষ্ঠদণ্ডের সাহায্যে উহা চালিত হয়। নরওয়ের নারীরা উহা পরিচালনে অভূতপূর্ব্ব নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়া থাকে। একবার জনৈক প্রসিদ্ধ মার্কিণ ব্যায়ামবীর নরওয়ে গিয়াছিলেন।

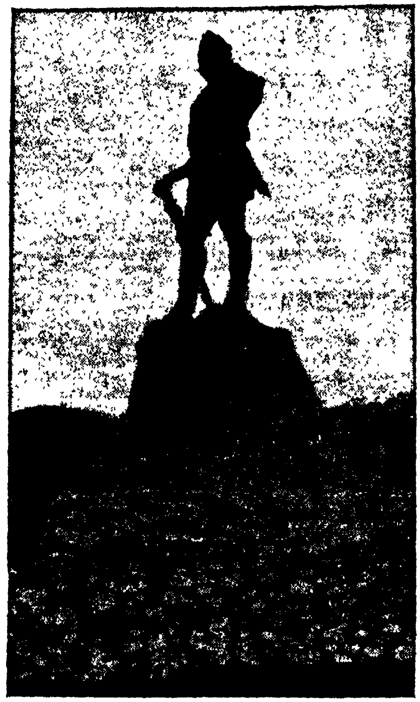


নরওয়ের সুপ্রসিদ্ধ লাভিকো জলপ্রপাত



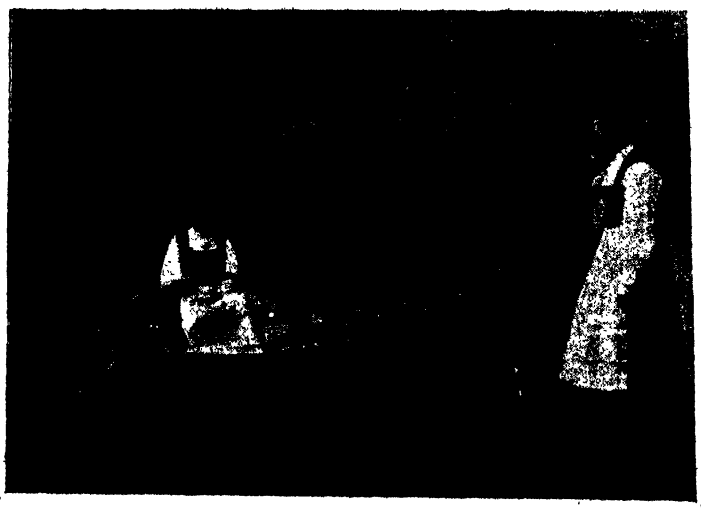


ধীবর-দম্পতি—ধীবর জাল মেরামত করিতেছে



প্রসিদ্ধ নরওয়ের বীর ফ্রিথ্‌জো'র বিরাট ব্রোঞ্জ-মূর্ত্তি

সকল প্রকার ব্যায়াম ও ক্রীড়ায় তিনি পারদর্শী ছিলেন। একদা সন্ধ্যায়—তখন তুষারপাত হইতেছিল—তিনি এক যুবতীকে 'জেল্‌কি' চড়িয়া অন্ধকারে যাত্রা করিতে দেখিলেন। সন্ধ্যার অন্ধকারে এই ক্ষীণাঙ্গী যুবতী একাকিনী দুর্গম পথে ঐরূপ গাড়ী চড়িয়া যাইবে, ইহা তাঁহার নিকট অত্যন্ত বিসদৃশ বোধ হইল। যুবতী রাজধানীতে গিয়া মশালধারী শোভাযাত্রায় যোগদান করিবে। মার্কিণ ব্যায়াম-বীর পূর্ব্বে কখনও এরূপ গাড়ী দেখেন নাই। জেল্‌কিতে দুই জন মাত্র আরোহী বসিতে পারে। সুতরাং তিনি বিশেষ ভদ্রভাবে যুবতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার দ্বারা যদি আপনার কোনও সাহায্য হয়, আমি সাগ্রহে তাহা করিব।" যুবতী ইংরাজীতে বলিল, "তা পারেন।"



নরওয়েজীয় কুমারীরা নৌকাযোগে পার হইতেছে

মার্কিণ যুবক পার্শ্বস্থ আসনে বসিবামাত্র যুবতী স্বয়ং অপূর্ব্ব নৈপুণ্য ও ক্ষিপ্রতার সহিত গাড়ী চালাইতে লাগিল। চড়াই উৎরাই পার হইয়া নক্ষত্রবেগে গাড়ী ছুটিতে লাগিল। এঞ্জিনের গতিবেগ

তাহার গতির অপেক্ষা দ্রুত নহে। যুবক পালোয়ান ও প্রসিদ্ধ খেলোয়াড় হইলেও রুদ্ধ নিশ্বাসে গাড়ীর হাতল চাপিয়া বসিয়া রহিলেন। প্রতি মুহূর্ত্তেই তাঁহার আশঙ্কা হইতেছিল যে, তাঁহার মাথার লোমশ টুপী উড়িয়া যাইবে।



চিত্রমুগ্ধা নরওয়েজীয় বালিকাত্রয়

জ্বালিয়া শোভাযাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। যুবতী তাঁহার দিকে কর প্রসারণ করিয়া মধুর স্বরে বলিল, "এখন নামুন, আমার সাহয্যের প্রয়োজন আছে কি?"

যুবক আর কখনও এই যুবতীকে দেখেন নাই। ভবিষ্যতে সাক্ষাতের স্পৃহাও

পরিশেষে তিনি স্বীকার করিয়াছিলেন, যুদ্ধের সময় ট্রেঞ্চের মধ্যেও তিনি এরূপ দুশ্চিন্তা কখনও ভোগ করেন নাই। বহুক্ষণ পরে জেন্‌কি ক্রিশ্চিয়ানা নগরের এক রাজপথে আসিয়া থামিল। তথায় বহু ব্যক্তি মশাল তাঁহার ছিল না—বীরের অযোগ্য হইলেও এ কথা তিনি বন্ধুবর্গের নিকট স্বীকার করিয়াছিলেন। শীতকালে এইরূপ ব্যায়ামক্রীড়ায় প্রত্যেক নরওয়েজীয় নর-নারী দক্ষতা প্রকাশ করিয়া থাকে।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

যাত্রাশেষে

এত দিন পরে বরষের পথ
ফুরা'ল আজি রে ফুরা'ল,
ওই যে অদূরে মন্দির-চূড়া
হেরিয়া নয়ন জুড়া'ল!

এত দিনকার কঠোর সাধন,
সারা জীবনের মরম-দাহন,
ওইখানে আজ হবে সমাপন,
আজ সব ব্যথা ফুরা'ল,
চির-জীবনের আঁখিজল মোর
যেন কে নিমেষে মুছা'ল!

ওই যে তাঁহার করুণার ধার
ভাসিছে মুগ্ধ গগনে,
স্নিগ্ধ তাঁহার শীতল পরশ
কাঁপিছে শান্ত পবনে।
আরতির ধ্বনি ওই শোনা যায়,
পূজার পুষ্প গন্ধ বিলায়,

কে যেন ডাকিছে "আয় চ'লে আয়—
চ'লে আয় শুভ লগনে,
শ্রান্ত পথিক, আর কেন চেয়ে
অশ্রু-সজল-নয়নে।"

চ'লে আয় ওরে ক্লান্ত পথিক
কেটেছে দীর্ঘ রজনী,
ওই যে অদূরে কনকবরণে
ভাসিছে আশার তরণী!

উৎসাহে সবল হউক চরণ,
নিদ্রালস-হীন হউক নয়ন,
এত দিন পরে ফুরাবে যখন,
দীর্ঘ কঠিন-সরণী!
সম্মুখে ওই এসেছে শান্তি
স্নিগ্ধ অরুণ-বরণী!

শ্রীবিমলকান্তি মুখোপাধ্যায়।

স্বাগতম্ *

স্বাগত—আসুন। বসুন বলিবার ক্ষমতা নাই। বসিতে দিবার স্থান নাই। গাছতলায় বসাইব, তাহারও উপায় নাই। অভিরামের শাপে শাপগ্রস্ত দারকেশ্বর—কাণা-পুতের বড় নামই হয়—বৎসরের অধিকাংশ সময় "কাণা" হইলেও সময় পাইলেই প্রবল প্রকোপ প্রকাশ করে। কাণা-খোঁড়ার চিরদিন একগুণ বাড়া। ঘর বাড়ী, মানুষ, গরু, ফল-ফসল, পথ-ঘাট, গাছপালা সব ভাসাইয়া লইয়া যায়। তাই বলিতেছি যে, গাছতলায় "তৃণাণি" বিছাইয়া বসুন বলিব তাহারও সংস্থান নাই। এ দেশে আসিবার সুপথ নাই। রেলওয়ে কোম্পানীর বাঁধ রক্ষা করিতে হইবেই হইবে বলিয়া বহু বর্ষব্যাপী শত চেষ্টাতেও বন্যার প্রকোপ হইতে দেশকে রক্ষার উপায় হয় নাই। রমাপ্রসাদ রায়ের আমল হইতে এ চেষ্টা চলিতেছে—মহারাজ বর্দ্ধমান চেষ্টা করিয়াছেন, স্বর্গীয় বিপিনচন্দ্র ঘোষ মহাশয় চেষ্টা করিয়াছেন, ললিতমোহন সিংহ রায় চেষ্টা করিয়াছেন, ভূপেন্দ্রনাথ বসু বহু চেষ্টা করিয়াছেন, নগণ্য আমি—আমিও বহু চেষ্টা করিয়াছি, কিছুতেই কিছু হয় নাই। জানি না, শ্রীযুক্ত তারকনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যগণের চেষ্টায় ভবিষ্যতে কি ফল ফলিবে। কোম্পানীর কয়লা এ পথে আর আসিবার প্রয়োজন হইবে না বলিয়া প্রস্তাবিত রেলওয়ের কাগজপত্র ছেঁড়া কাগজের টুকরীর অন্তর্গত। বন্যার পর বন্যায় রাস্তা-ঘাট, ঘর-বাড়ী, ক্ষেত-বাগান চিরদিনের জন্য শ্রীভ্রষ্ট। খাইবার পরিবার সংস্থান নাই—যাহারা মাটী কামড়াইয়া পড়িয়া আছে, তাহাদের অবস্থা স্বচক্ষে আপনারা দেখিতেছেন। ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বর বন্যার ধ্বংসকার্য্যের বাকী যেটুকু ছিল, তাহা শেষ করিয়াছে।

পথের কষ্ট, আসার কষ্ট, থাকার কষ্ট, যাওয়ার কষ্ট, আহার-পানীয়ের কষ্ট, অভ্যর্থনার ত্রুটি এ সকলের প্রতি লক্ষ্য ভ্রূক্ষেপ না করিয়া যাঁহারা দয়া করিয়া নিজগুণে আসিয়াছেন, পল্লীমাতার গৌরব বাড়াইয়াছেন, তাঁহারা আমাদের নমস্য। তাঁহাদিগকে যথোপযুক্ত অভ্যর্থনা করিবার আমাদের শক্তি নাই। তাঁহাদিগকে সাদরে অভিবাদন করি, তাঁহাদিগের নিকট অবনতমস্তকে ত্রুটি স্বীকার করি ও ত্রুটি জন্য মার্জ্জনা ভিক্ষা করি।

এই অধুনা অবজ্ঞাত নগণ্য গ্রামে দূর দেশ-দেশান্তর হইতে এত সুধীসমাগম এ যুগে সম্ভব হইবে, এ দুরাশা কখনও কাহারও মনে স্থান পায় নাই। আমরাই সকলে পলাইয়া বিদেশে বাস করিতেছি। খানাকুল কৃষ্ণনগর সমাজের সভাপতিরূপে একবার মোটামুটি আমাদের এ অঞ্চলের লোকের তালিকা করাইতে হইয়াছিল। তাহাতে দেখিয়াছিলাম, খানাকুল কৃষ্ণনগর রাধানগর অঞ্চলের প্রায় ৩।৪ হাজার লোক কলিকাতা ও কলিকাতার সহরতলীর একপ্রকার স্থায়ী বাসিন্দা। দেশী বিদেশী এত লোকের একত্র সমাবেশ দেখিয়া আজ আমার বিশেষ আশার সঞ্চার হইয়াছে। এই অসহ্য গরমে এত কষ্ট সহিয়া বহুদূর গ্রামান্তর হইতে—এত ভদ্রলোকের—এত সাহিত্যানুরাগীর সমাগম আমাদের যেমন গৌরবের কথা, তেমনই আশার কথা। দেশের এখনও ভরসা আছে বলিয়া মনে হইতেছে।

এত বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও, আমাদের এত ত্রুটি ও বিচ্যুতিসত্ত্বেও এত জনসমাগম হইয়াছে, তাহা অভ্যর্থনা সমিতির কৃতিত্বের ফলে নয়, যে মহাজনের জন্মগৃহের আঙ্গিনায় আজ আমরা সমবেত, তাঁহারই অক্ষয় পুণ্য-ফলে এ অদৃষ্টপূর্ব্ব অঘটন ঘটিয়াছে।

গত বৎসর অমর বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মভিটায় সাহিত্য-সম্মিলনের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে অনিবার্য্য কারণ বশতঃ যাইতে পারি নাই। ত্রুটি স্বীকার করিয়া মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়কে যে পত্র লিখিয়াছিলাম; তাহাতে লিখিয়াছিলাম যে, বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মভূমিতে সাহিত্য-সম্মিলনের আয়োজন বড় শোভন হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে লিখিয়াছিলাম যে, এই প্রণালীতে

---

* রাধানগর সাহিত্য-সম্মিলনে অভ্যর্থনা সমিতির সহকারী সভাপতি অনারেবল্ সার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের অভিভাষণ।

যদি সম্মিলনের ভবিষ্যৎ কার্য্যপ্রণালী নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালা সাহিত্য, বাঙ্গালা ভাষা, বাঙ্গালা ব্যাকরণ, আধুনিক বাঙ্গালার যা কিছু নূতন, যা কিছু ভাল, যা কিছু স্থায়ী, যা কিছু গৌরবজনক, যা কিছু আশাপ্রদ, সে সকলের জন্মভূমি মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জন্মভূমি রাধানগরে জঙ্গলের মাটীতে আসিয়া মাথা ঠেকাইতে হয়। খেয়ালের ঝোঁকে অসাবধানে এ কথা লিখিয়া পাঠাইয়াছিলাম। উৎসাহের ও আনন্দের সহিত কৃপাপরবশ হইয়া এ দীন আমন্ত্রণ,—সাহিত্যিক সমাজে ও পূর্ব্ব সাহিত্য-সম্মিলনীর কর্ম্মকরী সভা কর্ত্তৃক গৃহীত হয়। তাহার ফলে আজ আপনারা এখানে সমাগত।

এ অসম্ভব সম্ভব হইয়াছে মহাত্মা রামমোহনের পুণ্য-বলে। খানাকুল ও কৃষ্ণনগর রাধানগরের শাপান্তের বোধ হয় সময় উপস্থিত, তাই এত মহাজনের এখানে সমাগম। অভিরামের শাপে দারকেশ্বরের কাণা হওয়ার খ্যাতি বহু দিন এখানে প্রচলিত। কোপন গোস্বামীর কৌপীন ভাসাইয়া লইয়া গিয়া নদী শাপগ্রস্ত হওয়ার এবং মালিনী কুখ্যাতি কাহিনী রটনাতে সমাজ-নেতা চৌধুরী-দিগের প্রতি অভিশাপের কিংবদন্তী বহু দিন প্রচলিত।

কিন্তু তদপেক্ষা গুরুতর অভিশাপের কারণ রাম-মোহন-নির্য্যাতন। স্বগৃহ হইতে তাড়িত রামমোহন যখন বাঙ্গালার নাম, বাঙ্গালীর নাম জগতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিলেন, তখনও তাঁহার গ্রামবাসী—তাঁহার দেশবাসীরা তাঁহার স্মৃতির যথেষ্ট মর্য্যাদা করিতে শিখিল না। দেশ-দেশান্তরে তাঁহার স্মৃতিস্তম্ভ, স্মৃতিমন্দির স্থাপিত হইল,কিন্তু তাঁহার জন্মভূমি রাধানগরে হইল না। এত বড় মনস্তাপের কথা বহু দিন রহিয়া গেল। সম্প্রতি হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্ম ও খৃষ্টীয়ান ভ্রাতৃগণের আনুকূল্যে সে ত্রুটি অপনোদনের চেষ্টা হইতেছে—সেই স্মৃতিগৃহের অঙ্গনে আপনারা আজ সমবেত। দক্ষিণে যে অর্দ্ধভগ্ন দোলমঞ্চ দেখিতেছেন, তাহাই রাজার কুলদেবতা রাজ-রাজেশ্বরের দোলমঞ্চ, এবং বামে যে তুলসীস্তূপ দেখিতে পাইতেছেন, তাহাই রাজার সূতিকাগারের নিদর্শন।

আপনারা পুণ্যভূমিতে সমাগত, পবিত্র স্থানে উপস্থিত, আপনাদিগকে সাদরে আহ্বান করিবার, অভি-নন্দিত করিবার, স্বাগত বলিবার অধিকার পাইয়া আমি আজ ধন্য ও কৃতার্থ।

এ অধিকার ন্যায্যমত আমার প্রাপ্য নহে। আমাদের দুর্ভাগ্য অনেক—তাহার বহু পরিচয় পূর্ব্বে পাইয়াছেন, আরও কিছু পাইবেন। সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ভাগ্য আমাদের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় নিতান্ত পীড়িত। দারুণ শোক-ভারে কাতর মন ও রুগ্ন দেহ লইয়াও গুরুতর রাজ-কীয় দায়িত্ব গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তথাপি ভূপেন্দ্র বাবু আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির পদ গ্রহণে স্বীকৃত হইয়া সমগ্র খানাকুল প্রদেশের লোককে ধন্য করিয়াছিলেন; কিন্তু রোগবৃদ্ধির জন্য তিনি আসিতে পারিলেন না, আপনাদিগের সংবর্দ্ধনার ভার আমার অযোগ্য হস্তে সমর্পণ করিয়া আপনাদিগকে যে আমন্ত্রণ-পত্র পাঠাইয়া-ছেন, তাহা এখনই আমি আপনাদিগের নিকট পাঠ করিব। আপনারা সকলে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করুন যে, তিনি যেন শীঘ্র নিরাময় হন; তাঁহাকে আন্তরিক আশীর্ব্বাদ করুন ও তাঁহার আরোগ্য জন্য শুভ ইচ্ছা প্রকাশ করুন, ইহাই আমার প্রার্থনা। আপনাদের অনুমতিক্রমে এই শুভ ইচ্ছা আমি আপনাদিগের হইয়া তাঁহাকে জ্ঞাপন করিব।

ভূপেন্দ্র বাবুর আমন্ত্রণ-পত্র পাঠ করিলেই আমার সহকারী সভাপতির কার্য্য একরূপ শেষ হয়। কিন্তু সভার প্রারম্ভে শ্রদ্ধেয় সভাপতি মহাশয় ও শাখা সভা-পতি মহাশয়গণ এবং সম্মিলনের সম্পাদক, সহকারী সম্পাদকগণ এবং সাহিত্যামোদী কুমার শরচ্চন্দ্র রায়ের ন্যায় মনীষিগণ নির্দ্দেশ করেন যে, অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ হইতে সমবেত প্রতিনিধিগণকে আপ্যায়নসময়ে সনাতন রীতি অনুসারে স্থানীয় ইতিহাস, কিংবদন্তী ও সাহিত্য সংবাদের কথঞ্চিৎ আলোচনা প্রয়োজন। খানা-কুল কৃষ্ণনগর সমাজের ন্যায় বহু প্রাচীন সমাজের একতাদৃশ সমালোচন অল্প সময়ের মধ্যে অসম্ভব; তাহার জন্য সামান্য চেষ্টাতেও সভাপতি মহাশয়ের ও শাখা সভাপতি মহাশয়গণের অভিভাষণ পাঠের সময়সংক্ষেপ করিলে

রসভঙ্গের সম্ভাবনা। অথচ শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ও শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত-নির্দ্দিষ্ট সনাতন নিয়ম ক্ষুণ্ন করিবার সাহস ও স্পর্দ্ধা আমি রাখি না। বড় দুঃখের বিষয় যে, দেশপ্রাণ বিপিনচন্দ্র ঘোষ ও পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি আজ পরলোকগত। এ বিষয়ে যথোপযুক্ত আলোচনা তাঁহাদের ন্যায় লোকেরই সাধ্য। এ কথার কোথায় আরম্ভ করিব, কোথায় শেষ করিব, ভাবিয়া পাই না। আধুনিক কাল হইতে আরম্ভ করিলে আমাদের অভ্যর্থনা সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের কথাই এই অল্প সময়ের মধ্যে বলিয়া উঠা কঠিন। আজ তিনি বঙ্গেশ্বরের অন্যতর প্রধান অমাত্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার—এই ক্ষুদ্র গ্রাম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য দুই জন ভাইস-চ্যান্সেলার পাঠাইতে পারিয়াছে, হিসাব খতিয়ানের সময় এ কথা উঠিতে পারে—তিনি সেক্রেটারী অফ ষ্টেটের কাউন্সিলে প্রথম বে-সরকারী সভ্য। কৃতী ব্যবহারাজীবী বলিয়া, দেশহিতৈষী বলিয়া, উদ্যোগী পুরুষসিংহ বলিয়া ভূপেন বাবুর যে খ্যাতি আছে, সে কথা সবিস্তারে বলিলেই এ প্রস্তাবের উপসংহার হইতে পারিত। কিন্তু এইমাত্র বলিলেই কথা শেষ হওয়া দূরে যাক, আরম্ভ হইবে মাত্র। এক ব্যবহারক্ষেত্রের কথাই যদি ধরা যায়, কলিকাতার আদালত এই কৃষ্ণনগর রাধানগরের অনেক গণ্যমান্য সন্তান দ্বারা পরিপুষ্ট। হাইকোর্টের প্রথম বাঙ্গালী জজ রাজা রামমোহন রায়ের সুযোগ্য পুত্র রমাপ্রসাদ রায়। দুর্ভাগ্যক্রমে আদালতে বসিবার পূর্ব্বে এবং এই উচ্চ পদপ্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই রমাপ্রসাদ পরলোক গমন করেন। রমাপ্রসাদ শুধু কৃতী ব্যবহারাজীবী ছিলেন এবং একনিষ্ঠ সাহিত্যসেবক ছিলেন, এমন নয়, সাহিত্যসেবীর বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষকও ছিলেন। তাঁহারই উৎসাহে রাজকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয় "ইংলণ্ডের শাসনপ্রণালী" নামে বাঙ্গালায় প্রথম Constitutional Law সংক্রান্ত গ্রন্থ রচনা করেন এবং তদুপলক্ষে যে বীজবপন হইয়াছিল, তাহা কালে Talukdari Settlement of Oudh ও Hindoo Law of Inheritance আকার ধারণ করে। প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের "পাটীগণিত" ও "বীজগণিত" যে গণিতক্ষেত্রে প্রথম ও প্রকৃষ্ট চেষ্টা, সমবেত সাহিত্যিকগণকে সে কথা স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে না। যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের "সঙ্গীতলহরী" ও "তীর্থভ্রমণ" ৭০ বৎসর পূর্ব্বে রচিত হয়। "তীর্থভ্রমণ" বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। বৈকুণ্ঠনাথ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের "ঊষাহরণ নাটক" ৭৫ বৎসর পূর্ব্বে রচিত। পুরাতন নাটক, মধ্যকালের যাত্রা ও বর্ত্তমান যুগের গীতি-নাট্যের উপকরণ এই গ্রন্থে বহুল পরিমাণে ছিল; দুর্ভাগ্যক্রমে সে গ্রন্থ এখন দুষ্প্রাপ্য।

কবি ভারতচন্দ্র রায় গৃহ-বিরোধকালে শ্বশুরালয়ে কিছু দিন এই প্রদেশে থাকিয়া সাহিত্য-চর্চ্চা করিয়াছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারীর আবাল্য সুহৃদ্ ছিলেন। একত্রে তাঁহাদের সাহিত্যসেবা, একত্রে তাঁহাদের পদব্রজে যাওয়া ও বড় নদী পার হইয়া একবার সাঁতরাইয়া আসার গল্প অনেকের মুখে শুনিবেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাড়ী বীরসিংহ গ্রাম ভৌগোলিক মতে এখন মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত হইলেও এখান হইতে অধিক দূর নয়। মৃচ্ছকটিক নাটক বাঙ্গালায় "বসন্তসেনা" নামে রূপান্তরিত করিয়া যিনি বাঙ্গালাভাষার সম্পদ্ বাড়াইয়া গিয়াছিলেন, সেই মধুসূদন বাচস্পতি মহাশয়ের নিবাসগ্রাম পাতুল এখান হইতে অধিক দূর নয়। পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের জন্মস্থান আমাদেরই মহকুমার অন্তর্গত কামারপুর গ্রামে। আমাদের এই ক্ষুদ্র গ্রামে অনেক প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকের হাতেখড়ি হইয়াছিল, তাহার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি পিতৃদেবের কিশোর বন্ধু ছিলেন—শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ মহাশয় রচিত হেমচন্দ্রের জীবনচরিতে তাহার পরিচয় পাইবেন। প্রসন্নকুমারের রাধানগরে স্থাপিত বিদ্যালয় Anglo-Sanskrit schoolএ হেম বাবু কিছু কাল প্রধান শিক্ষকের কায করিয়া গ্রামকে ধন্য করিয়া গিয়াছেন। তাহার পর তাঁহার কোনও রচনার পাণ্ডুলিপি আমাদের কলিকাতা বহুবাজার, ৫৩ নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট বাটীতে না শুনাইয়া ছাপাখানায় যায় নাই। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য ও তদগ্রজ রামকমল ভট্টাচার্য্যের সাহিত্যচর্চ্চা এইখানে আরম্ভ

হইয়াছিল। কৃষ্ণকমল বাবুও এককালে এই গ্রামের বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। অন্যান্য শিক্ষকদিগের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম,—নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়, প্রথম বাঙ্গালা ভূগোল-রচয়িতা তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায়, উত্তরকালে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক শিবচন্দ্র গুঁই, জয়পুর মহারাজ কলেজের অধ্যক্ষ দীননাথ মুখোপাধ্যায়, উত্তরপাড়া কলেজের অধ্যক্ষ শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়, সংস্কৃত কলেজের লাইব্রেরিয়ান উমেশচন্দ্র গুপ্ত, সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও নীলমণি মুখোপাধ্যায় এবং কবি Sturgeon.

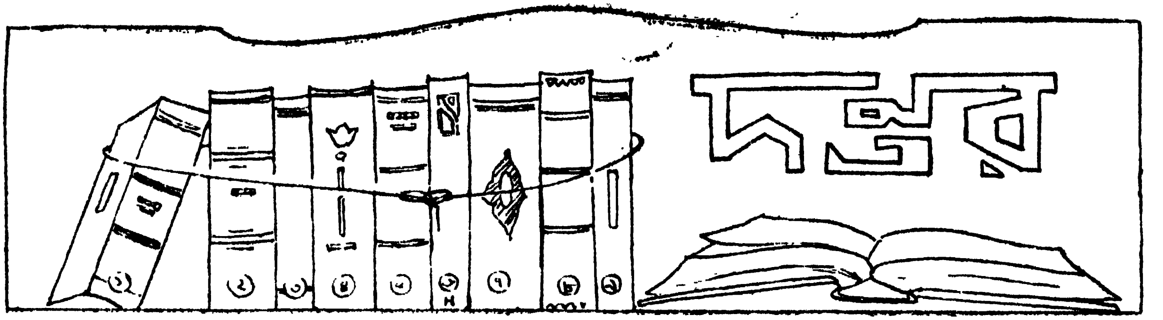
প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয় তাঁহার Anglo-Sanskrit বিদ্যালয়ের জন্য উপরি উক্ত মনীষিগণের ন্যায় শিক্ষক সংগ্রহ করিতেন এবং মাঝে মাঝে দেশ-বিশ্রুত পণ্ডিত ভরতচন্দ্র শিরোমণি, তারানাথ তর্কবাচস্পতি, জগন্মোহন তর্কালঙ্কার প্রভৃতির ন্যায় পণ্ডিতগণকে আনিয়া গ্রামের গৌরববর্দ্ধন করিতেন, কাযেই উমেশচন্দ্র বটব্যালের ন্যায় ছাত্র এখানে শিক্ষালাভ করিত। কিন্তু "তে হি নো দিবসা গতাঃ"। প্রসন্নকুমারের বিদ্যালয় নদীগত, গ্রামের মান-মর্য্যাদা ও সাহিত্যসেবা সব নদীগত। অমর কবি বঙ্কিমচন্দ্র এ প্রদেশটাকে ভালবাসিতেন; তাঁহার গড়মান্দারণ এই মহকুমার অন্তর্গত. তাঁহার কপালকুণ্ডলা ও লুৎফ-উন্নিসা আমাদের গ্রামের অনতিদূরের রাজপথ ধরিয়া বর্দ্ধমানের দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন—সেই পথই ৺জগন্নাথপুরী যাইবার এ প্রদেশের একমাত্র সুপথ। বহু সাধু সন্ন্যাসী এই পথে যাইতেন, আসিতেন, গ্রামে অতিথি হইতেন। রামমোহন বাল্যজীবনে তাঁহাদের অনেকের সঙ্গলাভের সুবিধা পাইয়াছিলেন এবং সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃত শাস্ত্রে অনুরাগের অবসর পাইয়াছিলেন। আবার মুন্সী রামনারায়ণ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের "মুন্সী চালায়" বসিয়া আরবী ফারসী অধ্যয়নের সুযোগ পাইয়াছিলেন। পিতৃমাতৃবংশে তিনি বৈষ্ণব-শাক্তের ঘোর দ্বন্দ্ব আবাল্য দেখিয়া আসিতেছিলেন। নিকটেই ঘণ্টেশ্বর শিব, অভিরামের স্থাপিত গোপীনাথ, যাদবেন্দু চৌধুরীর স্থাপিত রাধাবল্লভ, রামনারায়ণের পূর্ব্বপুরুষস্থাপিত রাধাকান্ত, আগমবাগীশের পঞ্চমুণ্ডীর আসন, কণাদের অধ্যাপনার স্থান, কৃষ্ণনগরের ঠাকুর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়গণের কীর্ত্তিস্থান অবস্থিত। এইরূপ অপূর্ব্ব ঘটনাসমবায়ের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া রামমোহনের ন্যায় প্রতিভাশালী মহাপুরুষ যে সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের চেষ্টায় সফল হইবেন, Comparitive Religion শাস্ত্রের একচ্ছত্র সম্রাট হইবেন, তাহার আশ্চর্য্য কি!

কথাবাহুল্যের সময় নাই, তথাপি সমাগত মনীষিগণের নির্দ্দেশ অনুসারে দুই একটা স্থানীয় পুরাতন কথার আরও কিঞ্চিৎ আলোচনা হয় ত অপ্রাসঙ্গিক নহে। কিন্তু আমার এ সামান্য বক্তব্যের আকার অযথা না বাড়াইয়া পরিশিষ্ট আকারে তাহা আলোচিত হওয়াই সুবিধা।

যদি রামমোহনের পুণ্যস্মৃতির সম্মান উপলক্ষে ও আপনাদের শুভাগমনে গ্রামের ও প্রদেশের অভিশাপমোচন হয়, তবে খানাকুল কৃষ্ণনগর ও রাধানগর হয় ত আবার পূর্ব্বগৌরবের অধিকারী হইলেও হইতে পারে। আমরা ক্রমশঃ গ্রামে ধীরে ধীরে লাইব্রেরী স্থাপন করিতেছি, পল্লীসমিতি গঠন করিতেছি, ম্যালেরিয়ার সহিত যুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছি। আপনাদের পুণ্যবলে ও ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের সভাপতি শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত তারকনাথ মুখোপাধ্যায়ের কৃপায় তাঁহাদের প্রদত্ত টিউব ওয়েলে আজ শুষ্ক নদীগর্ভ হইতে জল উঠিয়া স্বর্গগঙ্গার সৃষ্টি করিয়া আপনাদের সেবার সুবিধা করিয়াছে। ভগবান্ করুন, মরুভূমিতে যখন আপনাদের পুণ্যফলে এই অঘটন সংঘটন হইয়াছে, এ স্রোত যেন শুখাইয়া না যায়।

রামমোহনের সুযোগ্য প্রপৌত্র শ্রীযুক্ত ধরণীমোহন রায় ও তাঁহার পৌত্রবধূ শ্রীমত্যা গোলাপসুন্দরী দেবী আমাদের কাযে বড় সহায়তা করিয়াছেন। এখন জল-হাওয়া ফিরিয়াছে। এমন দিন ছিল যে, রামমোহনের বংশধরগণ ও তাঁহার গ্রামবাসিগণ রামমোহনের নামমাত্রও করিতেন না।

রামমোহন-স্মৃতির প্রতি তাচ্ছিল্য-মহাপাপের প্রায়শ্চিত্তেরও শেষ হইতে বোধ হয় বেশী বাকী নাই। এই স্থাপত্যের হোতা আপনারা; আমাদের প্রায়শ্চিত্ত শেষ করিয়া দিয়া যান। রামমোহনের নাম করিয়া এ প্রদেশের গৌরবধ্বজা আবার গরিমাভরে উড্ডীন হউক।



ক্ষমা

কি "Non-violence ?"

কলিকাতা University Institute গৃহে পঠিত ও "মাসিক বসুমতী"র বিগত চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধে পণ্ডিত শ্রীভববিভূতি বিদ্যাভূষণ এম, এ, মহাশয় হিন্দু, বৈষ্ণব, বৌদ্ধ, খৃষ্টান প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়গত শাস্ত্র ও সাহিত্য মন্থন পূর্ব্বক 'ক্ষমার' পরিভাষা ও স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়া উহা মহাত্মা গন্ধীর আচরিত ও প্রচারিত 'Non-violence'এর সহিত একপর্য্যায়ভুক্ত প্রতিপাদন করিয়াছেন ও দেশবাসীকে তাহা পালন করিতে উপদেশ দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের উদ্দেশ্য মহৎ এবং অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণকুশলতা মনোজ্ঞ; বাস্তবিক ক্ষমার স্বরূপ নির্ণয়ে একাধারে এতগুলি বিভিন্ন মতের সমাবেশ ও সমন্বয় অন্যত্র দুর্লভ। তবে তাঁহার মীমাংসা অভ্রান্ত কি না,—অর্থাৎ শাস্ত্রপ্রতিপাদিত ক্ষমা এবং শ্রীমদ্ গন্ধীপ্রচারিত non-violence একই গুণ কি না, ইহার যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করাই এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয় কর্ত্তৃক উদ্ধৃত মহর্ষি অত্রি ও বৃহস্পতি কথিত লক্ষণ দ্বারা ক্ষমা ও দম সমপর্য্যায়ভুক্ত বোধ হইলেও- মানবধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মলক্ষণে দশের মধ্যে ঐ দুইটি পৃথক্ পৃথক্ গুণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে,—

> "ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
> ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণম্ ॥"

বস্তুতঃ দমগুণের সংজ্ঞানিরূপণে পুরাণকার বলেন,—

> "কুৎসিতাৎ কর্ম্মণো বিপ্র যচ্চ চিত্তনিবারণম্।
> স কীর্ত্তিতো দমঃ প্রাজ্ঞৈঃ সমস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥"

দুষ্কর্ম্ম হইতে চিত্তনিবৃত্তিই দম। সে হিসাবে Non-violenceও যে 'দম', সে পক্ষে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। কিন্তু 'ক্ষমা' লইয়াই কথা। উল্লিখিত পারিভাষিক অর্থের সহিত 'ক্ষমা'র কোন সম্পর্ক নাই; অতএব ক্ষমা ও non-violence সমধর্ম্মাত্মক নহে।

মহাত্মা যীশু কর্ত্তৃক উপদিষ্ট "এক গণ্ডে চপেটাঘাত করিলে অপর গণ্ড পাতিয়া দিবে," আর শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর উক্তি,—

> "মেরেছে কলসীর কাণা,
> তা' ব'লে কি প্রেম দিব না ?"

একই গুণের অভিব্যক্তি বটে, কিন্তু মহাত্মা গন্ধীর অনুসৃত non-violence কি সেই গুণের সহিত সমভাবাপন্ন? তাহা হইলে ত তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীকে, পরন্তু দেশবাসীমাত্রকে নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিতে হয়, আর প্রেমের আকর্ষণে, এখনও দেশের যে কোন সম্বল আছে, সমস্ত ইংরাজসরকারকে সম্প্রদান করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিতে হয়। সেরূপ অনুষ্ঠান বা পন্থা যখন এ পর্য্যন্ত কাহারও দ্বারা অবলম্বিত হয় নাই, তখন বুঝিতে হইবে—এবংবিধ 'ক্ষমা' Non-violence পদবাচ্য নহে। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয় যে গীতোক্ত ক্ষমা-প্রসঙ্গে শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যপ্রমুখ ভাষ্যকারগণের ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করিয়াছেন, Non-violence অর্থে তাহা বুঝায় কি না, দেখা যাউক,—

১। শঙ্কর ও নীলকণ্ঠ—"অপর ব্যক্তি কর্ত্তৃক আক্রোশ পূর্ব্বক তাড়িত হইলে চিত্তের বিকারোৎপত্তিশূন্যতার নাম ক্ষমা।" ইতঃপূর্ব্বে হয় ত দেশবাসীর সেরূপ ক্ষমাগুণ ছিল, কিন্তু তাঁহাদিগের অন্তরে দেশাত্মবোধের উন্মেষ হওয়া অবধি সে নির্ব্বিকারভাব যে তিরোহিত হইয়াছে—ইহা বোধ করি, সর্ব্ববাদিসম্মত।

২। রামানুজ ও হনুমান—"অপর কর্ত্তৃক পীড়ানুভব সত্ত্বেও, বা ক্রোধের কারণ বিদ্যমান থাকিতেও, চিত্তের যে অবিকৃতি— তাহাই ক্ষমা।" যে অনুভূতির প্রেরণায় বর্ত্তমান দ্বন্দ্ব উপস্থিত, তাহাতে চিত্তবিকার অবশ্যম্ভাবী; অতএব এ ক্ষেত্রে ক্ষমা আসিতেই পারে না।

৩। শ্রীধর, বলদেব ও বিশ্বনাথ—"অপরকৃত পরিভব ও অপমানাদি উৎপন্ন হইলেও যে ক্রোধের দমন, বা প্রতীকারের সামর্থ্য সত্ত্বেও পরিভবকারীর যে কোপের অনুদ্রেক, তাহাই—অর্থাৎ সর্ব্বাবস্থায় সহিষ্ণুতাই—ক্ষমা।" বৌদ্ধশাস্ত্রোক্ত "বৈরিগণের মধ্যে নির্ব্বৈর থাকিবার" ব্যবস্থাও এই শ্রেণীর ক্ষমার অন্তর্গত।

এই শেষোক্ত ক্ষমাই মহাত্মা গন্ধীর উপদিষ্ট Non-violence বটে। কিন্তু সর্ব্বজীবে বিদ্বেষরাহিত্যই ঐ জাতীয় ক্ষমার প্রাণ। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ও 'গীতা' ও 'ধম্মপদ' হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তাহার পরিচয় দিয়াছেন। বাস্তবিক, সম্যক্ বিদ্বেষশূন্য না হইলে প্রকৃত ক্ষমার উদয়ই হইতে পারে না। এখন প্রশ্ন হইতেছে—সমগ্র দেশবাসীর জাতীয় আন্দোলন, বা মহাত্মা গন্ধীর অনুসৃত অসহযোগ, বিদ্বেষ-পরিশূন্য কি না? তাহা হইলে, boycot, civil-disobedience. Council wrecking প্রভৃতি অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য বা তাৎপর্য্য কি? সম্পূর্ণ বিদ্বেষবিরহিত অবস্থাতে পূর্ব্বোক্ত খৃষ্টীয় বা বৈষ্ণব ভাব জন্মে, এই সমস্ত অনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে না। অতএব, এরূপ প্রবৃত্তিপ্রণোদক Non-violenceকে ক্ষমা বলা যায় না।

ফলতঃ যে অভিমানের ঐকান্তিক বর্জ্জন বিদ্বেষশূন্যতার নামান্তর, সেই অভিমানবশেই অসহযোগনীতির উৎপত্তি। যখন অসহযোগনীতির সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও সরকার প্রজাসাধারণের প্রার্থনায় কর্ণপাত করিলেন না, তখনই মহাত্মা ক্ষোভে, দুঃখে, অভিমানে অসহযোগনীতি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইলেন। এ অবস্থায় চিত্তের নির্ব্বিকল্পতা জন্মিতেই পারে না। তবে, পরিণামদর্শিতাগুণে, তিনি এই নীতির অনুশীলনফলে অত্যাচার-উপদ্রবের সংঘটন সম্ভাবনা বুঝিয়াছিলেন,—আর তাঁহার সহস্র নিষেধ সত্ত্বেও উহার ফলে স্থলবিশেষে সত্যই অত্যাচার-উপদ্রব দেখা দিয়াছিল ও তজ্জন্য তাঁহাকে আন্তরিক অনুতাপ ভোগ করিতে হইয়াছিল,—তাই তিনি উক্ত নীতির অনুসরণকল্পে দেশবাসীকে সম্পূর্ণরূপে নিরুপদ্রবপন্থী হইতে উপদেশ দিয়াছিলেন। এই নিরুপদ্রবই 'Non-violence'—বিদ্যাভূষণ মহাশয় বর্ণিত 'ক্ষমা' উহার সহিত একার্থবাচক বলিয়া বোধ হয় না।

বিদ্যাভূষণ মহাশয় সঙ্কলিত অন্যান্য যাবতীয় প্রসঙ্গই উল্লিখিত একই 'ক্ষমা'র পরিপোষক। অতএব তাহার পৃথক্ পৃথক্ আলোচনা দ্বারা প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করা অনাবশ্যক।

শ্রীপাঁচকড়ি ঘোষ।

ঐতিহাসিক কুকুর

জন্তু-জগতে গাভীর তুল্য উপকারী জীব যে আর নাই, এ কথা সর্ব্ববাদিসম্মত। আমরা হিন্দু—গাভী আমাদের গোমাতা, গোপ্পদেই আমাদের মুক্তি। গাভী হিন্দুর তেত্রিশ কোটি দেবতাকেই আপনার মধ্যে একত্রীভূত করিয়া রাখিয়াছে। এই গো,—চন্দ্র, সূর্য্য, বৃষ, পশু, স্বর্গ, ঋষি, যজ্ঞ, কিরণ, বজ্র, বাণ, জল, কেশ, লোম, চক্ষু, ইন্দ্রিয়, দৃষ্টি, সৌরভেয়ী, বাণী, মাতা, ধেনু, বাক্য, পৃথিবী, গায়ত্রী, দিক্, ভূমি এবং বাগীশ্বরী। এগুলির আবার দার্শনিক ভাবার্থ করিতে গেলে এক সীমাহীন অনন্ত তথ্যের অবতারণা করিতে হয়, এবং আমার সে পাণ্ডিত্যের একান্ত অভাব। বিশেষতঃ বর্ত্তমান প্রসঙ্গে আমি গাভীর বিষয় বলিতে বসি নাই—ঐতিহাসিক কুকুরের কথা বলিতে বসিয়াছি। গাভীর পরই ইতর প্রাণীর মধ্যে আমরা আরও দুইটি প্রাণীর উপকারিতা বহুল পরিমাণে উপলব্ধি করিতে পারি। ইহার একটি অশ্ব এবং অপরটি কুকুর।

ঐতিহাসিক অশ্ব সম্বন্ধে অনেকেই অল্পবিস্তর আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য বাস্তব ঘটনা শুনিয়া বা পড়িয়া থাকিবেন। আজ শুধু ইতিহাসের কুকুর সম্বন্ধে সামান্য যাহা কিছু জানিতে পারিয়াছি, তাহাই খুব সংক্ষেপে ব্যক্ত করিতে প্রয়াসী হইলাম।

আমাদের দেশে কুকুরের প্রভুভক্তি, কৃতজ্ঞতা এবং বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে অতি সুন্দর সুন্দর বাস্তব ঘটনা শুনা যায়। এখনও এই শ্যামলা বঙ্গমাতার পল্লীপ্রাঙ্গণে এমন অনেক বিশ্বাসী, প্রভুভক্ত এবং সাহসী "বাঘা-ভুলোর" বংশধর বিদ্যমান আছে, যাহারা আজও বলবীর্য্যে কোন অংশেই "লিউলীনের কুকুর" অপেক্ষা হীন নহে। তাহা ছাড়া বাঙ্গালা দেশের নবাবী আমলের ভীষণ "ডালকুত্তার" কথা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অমর হইয়াই আছে। কিন্তু পাশ্চাত্যখণ্ডে এই সারমেয়জাতি, এই বিগত মহাযুদ্ধেও যে আশ্চর্য্য কার্য্য-কুশলতা ও চতুরতা প্রদর্শন করিয়াছে, তাহা ভাবিতে গেলে বিস্ময়াবিষ্ট না হইয়া থাকা যায় না। য়ুরোপের ও আমেরিকার প্রায় প্রত্যেক বড় বড় সহরে আজ কুকুর পুলিস-প্রহরীর এবং "সি—আই—ডির" কার্য্য করিয়া মানুষের উপরেও "টেক্কা" দিতেছে। এই সব এক একটা কুকুর-পোষার খরচা সচরাচর মানুষ প্রতিপালনের অপেক্ষা অনেক বেশী। কোন কোন সহরে কুকুরের সতর্কতায় চুরি-ডাকাইতীর সংখ্যা পূর্ব্ব হইতে অনেক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। কুকুর তাহার প্রবল ঘ্রাণ-শক্তির প্রভাবে ৮।১০ মাইলের অধিক দূরে যাইয়াও অপরাধীকে গ্রেপ্তার করিতেছে। অপরাধী ব্যক্তি সমুদ্রে লাফাইয়া পড়িলে—যেরূপ স্থলে তাহাকে গ্রেপ্তার করা মানুষের অসাধ্য ব্যাপার—সেখানে কুকুর যাইয়া চক্ষুর নিমেষে তাহাকে দাঁতে করিয়া আটকাইয়া ধরে। বড় বড় অর্গলবদ্ধ শূন্য নির্জ্জন গৃহে বা প্রাসাদে—যেখানে বাহির হইতে লোক বুঝিতে পারে না যে, অপরাধী আছে, সেখানে কুকুর অজ্ঞাতে প্রাচীর টপ্‌কাইয়া লুক্কায়িত ফেরার আসামীকে ধরিয়া ফেলে। বনে-জঙ্গলে, পাহাড়ে-পর্ব্বতে যত প্রকার মানুষের অসাধ্য দুর্গম স্থানে এই সব কুকুর অপরাধীকে ধাওয়া করিতে পেছ-পা হয় না। এই সব কার্য্যে ব্লাড্ হাউণ্ড (Blood Hound), বুল্ ম্যাষ্টিফ্ (Bull Mastiff), এয়ারডেল্ (Airedale), টেরিয়ার (Terrier) এবং কলিস্ (Collies) প্রভৃতি জাতীয় কুকুরই বেশী উপযোগী। সামরিক অ্যাম্বুলেন্সের (Ambu'ance) কার্য্যে এই সব কুকুর আজকাল বহুসংখ্যায় নিযুক্ত হয়। কুকুরকে এই সব কার্য্যে রীতিমত শিক্ষা দিবার জন্য এক এক বিরাট প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে। তাহা ছাড়া পাশ্চাত্যখণ্ডে শিকারের জন্যও এক প্রকার কুকুর তৈয়ারী করা হয়।

আমাদের মহাভারতে কুকুররূপী ধর্ম্ম মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে মহা-প্রস্থানের পথ অগ্রে অগ্রে প্রদর্শন করিয়াছিল,—সে আজ কয় হাজার বছরের কথা, ঐতিহাসিকরাই তাহা নির্ণয় করিবেন। তবে খৃষ্টের জন্মের হাজার বৎসরেরও পূর্ব্বে মিশর আক্রমণকালে কেম্বিসিস্‌কে (Cambysis) কুকুর নিযুক্ত করিতে দেখা যায়। মেণ্টিনিয়া (Mantinea) অবরোধকালে এগিসলস্‌ও (Agislaus) নাকি কুকুর নিযুক্ত করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালে প্লুটার্ক (Plutarch) এবং প্লিনিকে (Pliny) তাঁহাদের লিপার মধ্যে সামরিক কুকুরের কথা উল্লেখ করিতে দেখা যায়।

কুকুরের গলায় বাঁধিয়া বার্ত্তার আদান-প্রদানের ব্যবস্থা সম্বন্ধে ইনিস্ (Æneas) উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। হুনেদের রাজা এত্তিলা (Attila) তাঁহার শিবির পাহারা দিবার জন্য বহুসংখ্যক কুকুর নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। রাজা প্লিং (Pling—King of Garamante) তাঁহার বিশ্বাসী কুকুরগুলির সাহায্যেই সিংহাসন পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কুকুররাই তাঁহার শিবির রক্ষা করিয়াছিল। রোম্যানরা তাহাদের দুর্গের চারি সীমায় কুকুর প্রহরী নিযুক্ত রাখিত। পূর্ব্বে দুর্গতোরণের চূড়াদেশে খুব প্রখর ঘ্রাণ-শক্তিসম্পন্ন কুকুরদিগকে শোওয়াইয়া রাখার ব্যবস্থা ছিল,—উহারা দূর হইতে শত্রুর আগমন আঘ্রাণের দ্বারা বুঝিতে পারিয়া সমুচ্চ স্বরে চীৎকার করত দুর্গস্থ সেনানীদিগকে পূর্ব্ব হইতে সতর্ক করিয়া দিত।

মধ্যযুগে বর্ম্মাচ্ছাদিত কুকুরের দ্বারা যুদ্ধকালে মাল এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম বহন করাইতে দেখা যায়। ঐ সকল দলবদ্ধ কুকুর বর্শা এবং অন্যান্য তীক্ষ্ণধার অস্ত্রফলকে সজ্জিত হইয়া শত্রু-সেনার মধ্যে ভীতি এবং ত্রাসের সঞ্চার সৃজন করিত।

স্পেনের সম্রাট ৫ম চার্লস যখন ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত হয়েন, তখন ইংলণ্ডের রাজা ৮ম হেনরী তাঁহাকে ৪ শত যোদ্ধা-কুকুর ("garnished with good yron collers") পাঠাইয়া সাহায্য করেন এবং ভেলেনসিয়া (Valencia) অবরোধকালে উহারা এমনই আশ্চর্য্য সমরকৌশল প্রদর্শন করিয়াছিল যে, চার্লস উহাদের বীরত্বে অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়া তাঁহার স্পেনিস যোদ্ধাদিগের সম্মুখে উহাদিগকে উদাহরণস্বরূপ দাঁড় করাইয়াছিলেন। এই চারি শত মাত্র কুকুর শত্রুদের কেবল সমস্ত কুকুরকেই আহত এবং পরাজিত করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, পরন্তু বহুসংখ্যক শত্রুসেনাকেও বিধ্বস্ত করিয়াছিল।

স্পেনের ফিলিপ্, "মাউণ্ট ফিলিপ্" এবং "ইটোল" (Etole) দুর্গের জন্য কুকুর প্রহরী নিযুক্ত করিতেন। উহারা ঘ্রাণের দ্বারা সৈন্যের অগ্রবর্ত্তী লুক্কায়িত শত্রুকে ঝাড়-ঝোপ্ হইতে তাড়া করিয়া বাহির করিত।

আমেরিকা আবিষ্কারক বিখ্যাত নাবিক খৃষ্টোফার কলম্বাসের (Christopher Columbus) দুইটি বিখ্যাত কুকুর "বার্সিলো" (Bercillo) এবং "লিওনসিলো" (Leoncillo) সাহসিকতায় এবং বীরত্বে পৃথিবীর ইতিহাসে অমর হইয়া আছে। ইণ্ডিয়ানদের পশ্চাৎ ধাওয়া করিবার জন্য এই দুইটি কুকুর কলম্বাসকে আশাতীত সাহায্য করিয়াছিল। কেবলমাত্র ২ শত পদাতিক সৈন্য, ২০টি অশ্বারোহী সৈন্য এবং ২০টি "ব্লাড্‌-হাউণ্ডের" (Blood Hound) সাহায্যে কলম্বাসের মেক্সিকো (Mexico) বিজয়ের পথ অনেকটা উন্মুক্ত হইয়াছিল।

ফ্রেডারিক দি গ্রেট (Fredarick the Great) [illegible]

ফিল্ডমার্শ্যাল্ কেথকে (Keith) সাস্ত্রীর কার্য্য করিবার জন্য কলিস্-জাতীয় (collies) কুকুর যোগাইবার আদেশ দিয়াছিলেন। ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে তুর্কীরা Dubnitza অবরোধকালে কুকুরের সাহায্যে অষ্ট্রেলিয়ান্ সৈনিক প্রহরীদিগকে বিতাড়িত করিয়াছিল।

নেপোলিয়ান যুদ্ধকালে কুকুরের উপযোগিতা উপলব্ধি করিতেন। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দের ২১শে জানুয়ারীতে তিনি Marmontকে যে চিঠি লিখেন, তাহাতে কুকুর সম্বন্ধে এই কয়টি কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন—

"They ought to have at Alexandria......A large number of dogs which you can easily make use of by fastening a large number at a short distance from your walls."

কন্সালেট্ (Wars of the consulate) যুদ্ধের বিখ্যাত কুকুর মুষ্টাচের (Moustache) নাম অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ইতালীতে বিগ্রহের সময় এক দল অষ্ট্রীয়ান সৈন্য ফরাসী-দিগকে হঠাৎ আক্রমণ উদ্দেশে যখন বেল্‌বো (Balbo) উপত্যকায় অন্ধকারে আশ্রয় লইয়াছিল, তখন এই চতুর কুকুরটির অবিরত চীৎকার ফরাসীদিগকে পূর্ব্ব হইতে সতর্ক করিয়া না দিলে বড়ই বিপর্য্যয় ঘটিত। এই কুকুরটি প্রায় সমস্ত consulate যুদ্ধেই কৃতিত্ব দেখাইয়াছে। এক জন অষ্ট্রীয়ান গুপ্তচর ফরাসী সৈনিক শিবিরে ছদ্মবেশে প্রবেশ করিতে যাইয়া এই কুকুর কর্ত্তৃক ধৃত হয়। Austerlitz যুদ্ধের সময় এই "মুষ্ট্যাচই" তাহার নিজের রেজিমেণ্টের পতাকা রক্ষা করিয়াছিল। রেজিমেণ্টের পতাকাবাহী সৈনিকটি মৃত্যুমুখে পতিত হইবামাত্র এক জন অষ্ট্রীয়ান শত্রু উহা হস্তগত করিয়া নিজের সৈন্যশ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইবার উপক্রম করিতেছিল, এমন সময় এই তেজস্বী কুকুর তাহার হস্ত হইতে ছিন্নভিন্ন রক্তাক্ত পতাকাটি সগৌরবে উদ্ধার করিয়া আনে। এই মহৎ কার্য্যের পুরস্কারস্বরূপ ফিল্ড ম্যার্শ্যাল লানেস্ (Field Marshal Lannes) তাহাকে স্বহস্তে সামরিক-গৌরবজনক অলঙ্কার আবরণে সজ্জিত করিয়াছিলেন।

১৮৮২ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয়বার গ্রিসীয়ানদের দ্বারা আথেন অবরোধ-কালে কুকুররাই নগরবাসীদিগকে সাবধান করিয়া দিয়াছিল। আমেরিকার উত্তর এবং দক্ষিণ ষ্টেটসমূহের যুদ্ধকালে সামরিক কার্য্যে কুকুর নিযুক্ত হইয়াছিল এবং উহা দেখিয়া ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মাণীতে বিশেষভাবে এই নীতির প্রবর্ত্তন হয়। রুসো-তুর্কী যুদ্ধে দুই পক্ষেই কুকুর সামরিক কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল।

দেখা যায়, মধ্যযুগে প্রায় সমগ্র যুরোপে Blood Hound জাতীয় কুকুর পুলিস-প্রহরীর পরিবর্ত্তে পল্লীরক্ষার কার্য্য করিত। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে সেণ্টমেলোতে (St. Malo) যথারীতি পুলিস-কুকুর নিয়োগের প্রথা প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়।

ইংলণ্ডবিজয়ী প্রথম উইলিয়ম ব্লাড হাউণ্ড জাতীয় কুকুরকে বড়ই পছন্দ করিতেন এবং তিনি ইংলণ্ডে বিশেষভাবে এই জাতীয় কুকুরের প্রচলন করান। তাঁহার সময় হইতেই ঐ জাতীয় কুকুর "ইংলিস ব্লাড হাউণ্ড" নামে পরিচিত।

শ্রীঅবনীকুমার দে।

পৃথিবীর বয়ঃক্রম

হিন্দু-ঋষিমত

হিন্দু ঋষিরা সৃষ্টিকে অনাদি বলেন। জীব অনাদি, প্রাণিপর্য্যায় অনাদি। আমরা Mrs. Beasant, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতির থিয়োজফিকাল্ সম্প্রদায়ের পণ্ডিতের পুস্তকপাঠে প্রাণিপর্য্যায়ের ৭টি ক্রমোন্নতি স্তর জানিতে পারি,* তাঁহারা হিন্দুশাস্ত্র হইতে ঐ মত সঙ্কলন করিয়াছেন। উহা হিন্দু ঋষিদের মত।

জীব পরমপিতার বক্ষোদেশে অবস্থিত। জীব ৭টি রাজ্যের মধ্য দিয়া গমন করে। জীব সচ্চিদানন্দময় ভগবান্ হইতে বিচ্যুত হইয়া অবরোহণপ্রণালীমতে ক্রমশঃ স্বর্গলোকের উচ্চ স্তরে, পরে দিব্য দেহ ধারণ করিয়া স্বর্গলোকের নিম্ন স্তরে এবং ক্রমশঃ গন্ধর্ব্বদেহ লাভ করিয়া ভুবর্লোকে আগমন করে। এইরূপে প্রথম সূক্ষ্ম ভৌতিক রাজ্য, দ্বিতীয় সূক্ষ্ম ভৌতিক রাজ্য ও তৃতীয় সূক্ষ্ম ভৌতিক রাজ্য এই তিন রাজ্যের প্রত্যেক রাজ্যে জীবকে ১২ শত ৩৪ কোটি ৮০ আশী লক্ষ বৎসর অতিবাহিত করিতে হয়। ইহাই one chain period. ঐ তিন রাজ্যে জীবের স্থূলদেহও এত সূক্ষ্ম যে, উহা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। তৎপরে জীব স্থূলদেহ ধারণ করিয়া খনিজ-রাজ্যে ৪র্থ ক্রমে আগমন করে, পরে খনিজ-রাজ্যস্থ জীবের আত্মচৈতন্য ধীরে ধীরে প্রকাশিত হইয়া—জীব উদ্ভিদ্-রাজ্যে প্রবেশ করে। পরে জীব ক্রমোন্নতি evolution মতে পশু-রাজ্যে আগমন করে। পশু-রাজ্যে ৮৪ লক্ষ যোনি আছে। জীব প্রথমে নিম্নশ্রেণীর কীট-পতঙ্গাদি ৮৪ লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া অবশেষে সপ্তম ক্রমে মানব-রাজ্যে আগমন করে। ঐ মতানুসারে পৃথিবীর মানবসৃষ্টির জন্যই বহু কোটি বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। সে কারণ হিন্দু ঋষিরা বলেন, পৃথিবীর বয়স অনাদি কাল।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মত

পাদরী জেমস্ উশর সাহেব তাঁহার "Annals of the old and new Testament" পুস্তকে পৃথিবীর বয়স খৃষ্টজন্মের ৪ হাজার বৎসর পূর্ব্বে স্থির করিয়াছেন। পণ্ডিত বুথ, বুনসেন, লেপসিয়সের মতে পৃথিবীর বয়স খৃষ্টজন্মের ৩ হাজার বৎসর পূর্ব্বমাত্র। পণ্ডিত সার্প, নোলন ও পুল বলেন যে, পৃথিবীর বয়স খৃষ্টজন্মের ২ হাজার বৎসর হইতে ৩ হাজার বৎসর পূর্ব্বে মাত্র। কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত-গণ পৃথিবীর বয়স খৃষ্টজন্মের ৯ হাজার বৎসর পূর্ব্বে সাব্যস্ত করিয়াছেন। কিন্তু ঐ সমস্ত মত ঠিক নহে।

হিন্দুশাস্ত্রমতে সৃষ্টিকর্ত্তার বয়ঃক্রম

হিন্দুশাস্ত্রমতে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার বয়স ১ শত ব্রহ্ম বর্ষ। ব্রহ্মার দিন আমাদের ৪ শত ৩২ কোটি বৎসর। সেইরূপ ব্রহ্মার রাত্রিও ৪ শত ৩২ কোটি বৎসর। ঐ প্রকার অহোরাত্রে এক কল্প। ব্রহ্মার দিবায় সৃষ্টি ও রাত্রে লয় কার্য্য হয়। ব্রহ্মার ৩০ কল্পে ১ মাস,† বার মাসে ১ বৎসর হয় এবং ঐ প্রকারের ১ শত বর্ষ ব্রহ্মার পরমায়ুঃ।

ব্রহ্মার এক্ষণে ৫০ বর্ষ অতীত হইয়া ৫১ বৎসরে শ্বেত বরাহকল্প

---

* (1) Elemental kingdom (i). (2) Elemental kingdom (ii). (3) Elemental kingdom (iii). (4) Mineral kingdoom. (5) Vegetable kingdom. (6) Animal kingdom. (7) Human kingdom.

† ত্রিশ কল্প :—

(১) শ্বেতবরাহ, (২) নীললোহিত, (৩) বামদেব, (৪) গাথান্তর, (৫) রৌরব, (৬) বৃহৎ, (৭) কন্দর্প, (৮) আগ্নেয়, (৯) বিষ্ণুজ, (১০) সৌর, (১১) সোম, (১২) ভাবন, (১৩) সুপ্তমালী, (১৪) বৈকুণ্ঠ, (১৫) আচর্চীষ, (১৬) বল্মী, (১৭) বৈরাজ, (১৮) গৌরী, (১৯) মাহেশ্বর, (২০) পিতৃ, (২১) প্রাণ, (২২) সত্য, (২৩) ঈশান, (২৪) ধ্যান, (২৫) সারস্বত, (২৬) উদান, (২৭) সমাধি (২৮) গরুড়, (২৯) কৌর্ম্ম, (৩০) নারসিংহ।

চলিতেছে। ব্রহ্মার দিন সহস্র দিব্য চতুর্যুগে। চতুর্দ্দশ মন্বন্তরে * এক ব্রহ্ম দিন। এক মন্বন্তর ৭১ চতুর্যুগে হয়। চতুর্যুগ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি যুগের পরিমাণ ৪৩ লক্ষ ২০ হাজার। এক সহস্র চতুর্যুগে ব্রহ্মার ১ দিন। ব্রহ্মার দিনের পরিমাণ ৪৩২ কোটি বৎসর।

এক্ষণে সপ্তম মন্বন্তর চলিতেছে। সপ্তম মন্বন্তরের ২৭ চতুর্যুগ অতীত হইয়া ২৮ চতুর্যুগের সত্য ত্রেতা দ্বাপর অন্তে, কলিযুগের ৫ হাজার ২২ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। অর্থাৎ ১৯৭ কোটি ২৯ লক্ষ ৪৯ হাজার ২১ বর্ষ অতীত হইয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে ভূ-সৃষ্টি ১৯৫ কোটি ৫৮ লক্ষ ৮৫ হাজার ২১ বৎসর হইয়াছে। সুতরাং এই পৃথিবীর বয়স হিন্দুশাস্ত্রকারের মতে ১ শত ৯৫ কোটি ৫৮ লক্ষ ৮৫ হাজার ২১ বর্ষ হইয়া গিয়াছে। † কিন্তু এখন অবধি ব্রহ্মার এক দিন পুর্ণ হয় নাই।

এই ভাবে হিসাব করিয়া ধরিয়া ব্রহ্মার ৫১ বৎসর অতীত হইয়া ১ দিনও অদ্যাপিও হয় নাই। এই কল্পের সৃষ্টির পরিমাণ উল্লিখিত ১৯৭ কোটি ২৯ লক্ষ ৪৯ হাজার ২১ বৎসর। তন্মধ্যে ভূ-সৃষ্টির বয়স ১৯৫ কোটি ৫৮ লক্ষ ২১ হাজার বৎসর হইয়াছে। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, ব্রহ্মার দিবসে সৃষ্টি ও রাত্রে লয়কার্য্য হয় এবং এক দিবারাত্রে এক কল্প হয়। এই কল্পের দিবার পরিমাণ ৪৩২ কোটি বৎসর। তন্মধ্যে মাত্র ১৯৭ কোটি ২৯ লক্ষ ৪৯ হাজার ২১ বর্ষ অতীত হইয়া গিয়াছে। এইরূপ অসংখ্য অসংখ্য মন্বন্তর হইতেছে ও অসংখ্য অসংখ্য বার বিশ্বের সৃষ্টি ও লয় হইতেছে। এক্ষণে ধারণা করুন যে, পৃথিবীর বয়স কত লক্ষ কোটি বৎসর।

হিন্দুমতে এক এক কল্পে এক এক মন্বন্তরে এক এক সত্য ত্রেতা দ্বাপর ও কলিযুগে সৃষ্টিপ্রবাহ চক্রের ন্যায় ঘুরিয়া ফিরিয়া আইসে; এবং যে সৃষ্টির যে বীজ পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পে বিদ্যমান ছিল, তাহাই পরবর্ত্তী কল্পে প্রকাশিত হয়। তবে কর্ম্ম ও কালভেদে কিছু কিছু সামান্য রূপান্তর হয় মাত্র। পর্যায়ক্রমে শীতবর্ষাদি ঋতুর পুনরভিগমনের সময় যেমন ঋতুচিহ্ন পূর্ব্ববৎ লক্ষণাক্রান্ত হয়, সেইরূপ যুগাদিতেও পূর্ব্ব পূর্ব্ব লক্ষণ ও ভাবপরম্পরার উৎপত্তিও যথাপূর্ব্ব দৃষ্ট হয়। এই জন্য হিন্দু ঋষিগণ সৃষ্টি অনাদি বলিয়াছেন। তাঁহাদের মতে পৃথিবীর ইতিহাস অনন্ত কালসাগরে ভাসমান। ঈশ্বর অনাদি, প্রাণি-পর্য্যায় অনাদি ও সৃষ্টিও অনাদি. এই পৃথিবী অনন্তকাল বিরাজমান ব্রহ্ম মহাসাগরের জলবুদ্‌বুদের ন্যায় সৃষ্টসামগ্রী। তাহাতেই উৎপন্ন হইয়া তাঁহাতেই লয় প্রাপ্ত হইতেছে। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডই ঐ প্রকার ঈশ্বর সমুদ্রে লহরীর মত উদিত হইয়া আবার তাঁহাতেই বিলয়প্রাপ্ত হইতেছে। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা ও তাঁহার বয়ঃক্রম ১ শত বৎসর পূর্ণ হইলেই আবার পরমেশ্বর-মহাসমুদ্রে বিলীন হইতেছেন। আবার ব্রহ্মার সৃষ্টি হইতেছে, আবার ব্রহ্মার লয় হইতেছে। কবি ও সাধক বিদ্যাপতি গাহিয়াছেন,—

"কত চতুরানন মরি মরি যাওল
ন তুয়া আদি অবসানা।
তোঁহে জনমি পুন তোঁহে সমায়ত
সাগরে লহরী সমানা॥"

এই কারণেই ঋষিগণ পৃথিবীর সৃষ্টি বয়ঃক্রম নির্ণয় না করিয়া পৃথিবীর সৃষ্টি অনাদি কাল হইতে হইয়াছে বলিয়াছেন!

পাশ্চাত্য ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের মত

পাশ্চাত্য ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের মতেও পৃথিবীর বয়স বহু কোটি বৎসরের। তাঁহারা পৃথিবীর স্তর দেখিয়া বয়স নির্ণয় করিয়াছেন। আমরা ভূতত্ত্ব- (Geology) সংক্রান্ত পুস্তক পাঠে জানিতে পারি যে, পৃথিবীর তিনটি প্রধান যুগ বা কাল ধরা হয়;—(১) টারশিয়ারি এজ বা কাল, (২) সেকেণ্ডারি এজ বা কাল, (৩) প্রাইমারি এজ বা কাল।

উক্ত প্রথম টারশিয়ারি কাল আবার নিম্নলিখিত চারি ভাগে বিভক্ত;—(১) প্লিষ্টোসিন, (২) প্লিওসিন, (৩) মিয়োসিন এবং (৪) ইয়সিন।

দ্বিতীয় কাল আবার তিন ভাগে বিভক্ত যথা;—(১) ক্রেটাসিয়স, (২) জুরাসিক এবং (৩) ট্রিয়াসিক।

তৃতীয় কাল ঐরূপ অষ্টধা বিভক্ত, যথা;—(১) পারমিয়ান, (২) কারবনিফারাস, (৩) ডিভোনিয়ান, (৪) সিলিউরিয়ান, (৫) আরওভিসিয়ান, (৬) ক্যামব্রিয়ান, (৭) প্রিকামব্রিয়ান, (৮) আরকেইয়ান। *

* চতুর্দ্দশ মনু,—(১) সায়ম্ভুব, (২) স্বারোচিষ, (৩) উত্তমি, (৪) তামস, (৫) রৈবত, (৬) চাক্ষুষ, (৭) বৈবস্বত, (৮) সাবর্ণি, (৯) দক্ষসাবর্ণি, (১০) ব্রহ্মসাবর্ণি, (১১) ধর্ম্ম-সাবর্ণি, (১২) রুদ্রসাবর্ণি, (১৩) দেবসাবর্ণি, (১৪) ইন্দ্রসাবর্ণি।

† মনু-সংহিতা ও সূর্য্যসিদ্ধান্ত।

* Leyell's Element of Geology.—first edition 283 page.

বিড়াল তপস্বী

গুরু। খাও দাও আর বগল বাজাও,
জন্মের মত আশ পূরে,
যে যেমনে পার মধু পান কর,
কেড়ে ধ'রে মেরে চুরি ক'রে।

চেলা। অসার জগতে সংসার চিনিতে,
কে পারে আমরা ভিন্ন,
পুড়ে হ'লে ছাই, ঘুচিবে বালাই,
কে ভুগিবে পাপ-পুণ্য?

উভয়ে। এ ঘোর কলিতে, পাতকী তারিতে,
কে পারে আমরা ভিন্ন,
(এস) দলে ভিড়ে যাও, বগল বাজাও,
রবে নাক দুঃখ-দৈন্য।

ব্রঃ শ্রীভৈরব-চৈতন্য।



যুবকের প্রেম

[গল্প]

১

বিবাহের পর তিনটি বৎসরও ঘুরিল না -মহেন্দ্র বিপত্নীক হইল।

মাত্র ২ বৎসর ৯ মাস পূর্ব্বে তাহার বিবাহ হইয়াছিল। মেয়েটির নাম ছিল চঞ্চলা। হিন্দুর মেয়ের চঞ্চলা নাম রাখা ভাল হয় নাই—কারণ, বধূ হইয়া তাহাকে পতি-কুলে ধ্রুবতারার মত স্থির হইয়া থাকিতে হইবে। ছেলে-বেলায় সে বড় দুষ্ট ছিল বলিয়াই বাপ-মা তাহার চঞ্চলা নাম রাখিয়াছিলেন; তখন তাঁহারা কি জানিতেন, তাহার জীবন-কুসুমটি ভাল করিয়া ফুটিতে না ফুটিতেই, চপলা চঞ্চলার মতই সে আকাশের গায়ে লুকাইবে?

মহেন্দ্র তাহাদের জিলায় অবস্থিত মিশনরী কলেজ হইতে দুইবার বি-এ পরীক্ষা দিয়া, অকৃতকার্য্য হইয়া পড়া ছাড়িয়া দিয়াছিল। পড়াশুনায় মন তাহার কোন কালেই ছিল না। তাহার মন ছিল খেলায়—তাস-পাশা খেলায় নয়—ক্রিকেট, ফুটবল, জিম্‌ন্যাষ্টিক ইত্যাদিতে। কলেজের ফুটবল টীমের সেই ছিল কাপ্তেন, জিম্‌ন্যাষ্টিকের আখড়ায় সেই ছিল মাষ্টার। দেহে তাহার বিলক্ষণ বলও জন্মিয়াছিল।

পাস করিতে না পারিলেও, আর একটা জিনিষ সে বেশ আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিল, ইংরাজী ভাষা এবং আদব-কায়দা। মিশনরী "সাহেবগণের" সহিত সর্ব্বদা মিশিবার ইহা ফল। খেলায় তাহার নিপুণতা ও দেহবলের জন্য "সাহেবরা" তাহাকে খুব পছন্দ করিতেন।

মহেন্দ্র বাড়ীর জ্যেষ্ঠ পুত্র—পিতার মৃত্যুর পর সে-ই বাড়ীর কর্ত্তা হইয়াছিল। সংসারটি নিতান্ত ছোট ছিল না, সামান্য কিছু জমীজিরাৎ ছিল, তাহাতেই কষ্টেসৃষ্টে সংসার চলিত। সকলেই আশা করিয়াছিল, মহেন্দ্র মানুষ হইয়া উপার্জ্জন করিতে শিখিলে সংসারের কষ্ট ঘুচিবে; কিন্তু লিখাপড়া শিখিয়াও মহেন্দ্র মানুষ হইবার কোনও লক্ষণই দেখাইল না। তখন পাড়ার প্রবীণাগণ তাহার মাকে পরামর্শ দিতে লাগিলেন—"ছেলের বিয়ে দাও; তা হ'লেই সংসারের দিকে টান হবে, টাকা রোজগারের চেষ্টা করবে।"—তাই, একুশ বৎসর বয়সে মা তাহার বিবাহ দিয়া বধূ ঘরে আনিয়াছিলেন,—চঞ্চলার বয়স তখন এগারো। বৎসরখানেক হইল, চঞ্চলা "ঘরবসত" করিতে আসিয়াছিল। প্রবীণাদের ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ করিয়া মহেন্দ্র ঘরেই বসিয়া রহিল, উপার্জ্জনের কোনও চেষ্টা দেখিল না। শেষের এক বৎসর সে ত বউ লই-য়াই মাতিয়াছিল। সেই বউ, কাল বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইয়া মহেন্দ্রকে ফাঁকি দিয়া চলিয়া গেলে সেই শোকে মহেন্দ্র কিছু দিন যেন পাগলের মত হইয়া গিয়া-ছিল। সারা সকালবেলাটা মাথাটি নীচু করিয়া, উঠা-নের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পায়চারী করিয়া বেড়ায়; সাত ডাকেও কেহ তাহার উত্তর পায় না। শ্রান্ত হইলে, তক্তপোষের উপর উপুড় হইয়া বালিসে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া থাকে। "রান্না হয়ে গেছে, স্নান ক'রে এস"—বলিলে সে কথা কানেই তোলে না। অবশেষে বিস্তর তাগিদে স্নান করিয়া আসিয়া খাইতে বসে, কিন্তু পাতে অর্দ্ধেক ভাত-তরকারী ফেলিয়া রাখিয়া উঠিয়া যায়। বিকালে জিম্‌ন্যাষ্টিক বা ফুটবলের আড্ডা হইতে কেহ ডাকিতে আসিলে, তাহাকে ফিরাইয়া দেয়—যায় না। রাত্রিতে বিছানায় শুইয়া বহুক্ষণ ঘুমায় না—এপাশ ওপাশ করে, শুইয়া শুইয়া মাঝে মাঝে কাঁদে। ইহা দেখিয়া বাড়ীর মেয়েরা গোপনে বলাবলি করে—"আহা! বড্ড দু'জনে ভাব হয়েছিল কি না!"—আর, আঁচলে আপন আপন চক্ষু মুছে।

পাড়ার প্রবীণারা মহেন্দ্রর মাকে পরামর্শ দিতে লাগিলেন, "শীগ্‌গির একটি ভাল মেয়ে দেখে ছেলের বিয়ে দাও—তা হ'লেই মন আবার ভাল হবে।" মা বলিতে লাগিলেন, "না দিদি, এখন আমি ওকে ও কথা

বলতে পারবো না। বজ্জ শোকটা পেয়েছে—আর কিছু দিন যাক্—একটু সামলে উঠুক আগে।"

২

ছয় মাস কাটিয়াছে। এখন মহেন্দ্র অনেকটা সামলাইয়া উঠিয়াছে। আহারে আবার রুচি জন্মিয়াছে। কেহ হাসির কথা বলিলে এখন সে পূর্ব্বের মতই হাসিয়া উঠে। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের সঙ্গে ফুটবলের ম্যাচ খেলিতে যায়। পূর্ব্বের মত সবই করে, কিন্তু কিছুতেই সে স্বাদটুকু আর পায় না।

অবসর বুঝিয়া এক দিন মা তাহার নিকট পুনরায় বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। মহেন্দ্র মাথা নাড়িয়া বলিল—"না মা, ও কায আর করছি নে।"

মা বলিলেন, "পাগল ছেলে! এখন তোর বয়স কি! তোর বয়সে কত ছেলের প্রথম বিয়েই হয় না যে! তোর দ্বিগুণ বয়সের কত লোক, পরিবার মরবার পর ছ'মাস যেতে না যেতেই আবার বিয়ে করছে—তুই করবি নে কেন? ঐ ওপাড়ার চাটুয্যেদের মেঝকর্ত্তা—"

মহেন্দ্র বাধা দিয়া বলিল, "যার যা প্রবৃত্তি হয়, সে তা করুক মা, আমার দ্বারা কিন্তু ও কার্য্যটি হবে না।"

সে দিন এই পর্য্যন্ত। তাহার পর কোনও দিন মা, কোনও দিন মাসী, কোনও দিন পিসী, কোনও দিন পাড়ার খুড়ী-পিসী-ঠান্‌দিদিরা এ বিষয়ে মহেন্দ্রকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহাদের পীড়াপীড়িতে মহেন্দ্র উত্ত্যক্ত হইয়া স্থান ত্যাগ করাই স্থির করিল। এক দিন মাকে বলিল, "মা, আমি ভেবে দেখলাম, এ রকম ভাবে আমার ঘরে ব'সে থাকাটা ঠিক নয়। একটা কায-কর্ম্মের উপায় না হ'লে সংসারই বা চলবে কি ক'রে? তাই মনে করছি, তুমি যদি মত কর, তবে কলকাতায় গিয়ে একটা চাকরী-বাকরীর চেষ্টা দেখি।"

এত দিনে ছেলের সুবুদ্ধি হইয়াছে জানিয়া মাতা পুলকিত হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, "তাই ত করা উচিত বাবা। লিখাপড়া শিখেছ, একটু চেষ্টা করলে অবশ্যই একটা ভাল কায-কর্ম্ম জোটাতে পারবে। তা, কলকাতায় যাও—এস গিয়ে—তাতে আমার কোনও অমত নেই।"—মনে ভাবিলেন, কায-কর্ম্ম করিতে করিতেই ছেলের মন ভাল হইবে,—আবার বিবাহ করিতে রাজী হইবে—সংসারটা বজায় থাকিবে।

সেই গ্রামের এক জন কায়স্থ কলিকাতায় লোহার ব্যবসায় করিয়া থাকেন। বড় কারবার। তিনি বাড়ী আসিয়াছেন শুনিয়া মহেন্দ্র গিয়া সাক্ষাৎ করিয়া, তাঁহার সহায়তা প্রার্থনা করিল। তিনি শুনিয়া রাজী হইলেন; বলিলেন, "বেশ ত! আমার সঙ্গেই তুমি চল বাবাজী। আমার গদীতে থাকবে—খাবে-দাবে—আর কায-কর্ম্মের চেষ্টা ক'রে বেড়াবে। আমার আড়তেও অনেক লোক প্রতিপালিত হচ্ছে—কিন্তু তুমি ভাল রকম লিখাপড়া শিখেছ, সে রকম সামান্য চাকরী ত তোমার উপযুক্ত হবে না, ভবিষ্যতেও তেমন কোনও উন্নতি নেই। কোনও একটা ভাল আপিস-টাপিসে ঢোকবার চেষ্টাই দেখতে হবে তোমায়। কারবারসূত্রে ২।৪ জন বড়লোকের সঙ্গে আমার আলাপ-পরিচয় আছে, আমিও তোমার জন্যে চেষ্টা দেখবো।"

যথাদিনে মহেন্দ্র আম্রশাখাযুক্ত ঘট প্রণাম করিয়া, জননী প্রভৃতিকে প্রণাম করিল। মা, তাহার কপালে দধির ফোঁটা দিয়া, "চিরজীবী হও—রাজরাজেশ্বর হও" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। একটি ব্যাগে নিজ সামান্য বস্ত্রাদি, পত্নীলিখিত খানকতক পুরাতন চিঠি, এবং মাতৃদত্ত ১০টি মাত্র টাকা লইয়া, মহেন্দ্র কলিকাতা যাত্রা করিল।

৩

মহেন্দ্র মফঃস্বলে প্রতিপালিত হইলেও, সে নেহাৎ পাড়া-গেঁয়ে নহে—কলিকাতা তাহার নিতান্ত অপরিচিত ছিল না, পিতার জীবনকালে তাঁহার সহিত কয়েকবার সে কলিকাতায় আসিয়া এক মাস দেড় মাস করিয়া থাকিয়া গিয়াছে।

কলিকাতায় পৌছিবার দুই দিন পরে সেই কায়স্থ বাবুটি মহেন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া বাহির হইলেন এবং কয়েক জন বড়লোকের নিকট তাহাকে পরিচিত করিয়া দিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "চেষ্টা করা যাবে। মাঝে মাঝে এসে খবর নিও।"

মহেন্দ্র ২।৪ দিন অন্তর তাঁহাদের বৈঠকখানায় গিয়া ধর্ণা দিতে লাগিল; সব দিন যে কর্ত্তা মহাশয়ের দেখা পাইত, তাহা নহে; দেখা পাইলেও, বিশেষ কোনও আশার বাক্য শুনিতে পাইত না। "বি-এটা পাস করা থাকলে চট্ ক'রে একটা কিছু হয়ে যেতে পারতো।—যা হৌক, চেষ্টায় আছি, ২।৪ জন লোককে বলেও রেখেছি, দেখি কি হয়।"—এইরূপ কথা শুনিয়াই ফিরিতে হইত।

আফিস অঞ্চলেও মহেন্দ্র ঘোরাঘুরি আরম্ভ করিল। সারাদিন ধূলায় রৌদ্রে ঘুরিয়া, শ্রান্ত-ক্লান্ত হইয়া গদীতে ফিরিয়া আসিত। আহার করিয়া সকালে সকালে শয়ন করিতে যাইত; মৃতা পত্নীর মুখখানি ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িত। নির্জ্জন পাইলে ব্যাগ হইতে চঞ্চলার পত্রগুলি বাহির করিয়া পড়িত; পড়া শেষ করিয়া, সজলনয়নে সেগুলি আবার নেকড়ায় বাঁধিয়া তুলিয়া রাখিত।

কলিকাতায় এই ভাবে এক মাস কাটিয়া গেল, কিন্তু কায-কর্ম্মের কোনও কিনারা হইল না। এই সময় পূর্ব্বোক্ত বড়লোকগণের মধ্যে এক জন প্রাতে দুই ঘণ্টা তাঁহার পুত্রকে চতুর্থ শ্রেণীর পাঠ্য পড়াইবার জন্য মাসিক ১০৲ টাকা বেতনে তাহাকে নিযুক্ত করিতে চাহিলেন। মহেন্দ্র তাহা গ্রহণ করিল—তবু পকেট-খরচটা ত চলিবে।

যখন দুই মাস কাটিয়া গেল, তখন মহেন্দ্র প্রায় হতাশ হইয়া পড়িল। এরূপ ভাবে বসিয়া বসিয়া সরকার মহাশয়ের অন্ন ধ্বংস করিতে তাহার মনে লজ্জাও হইতে লাগিল। ভাবিল, আর একটা মাস দেখিব—কিছু যদি না জুটে, তবে দেশে ফিরিয়া গিয়া, চাষবাস কিছু বাড়াইবার চেষ্টা করা যাইবে।

কিন্তু সেটা তাহাকে করিতে হইল না—ভাগ্যদেবী তাহার পানে মুখ তুলিয়া চাহিলেন, এবং প্রসন্ন-বদনে হাসিয়া, তাহার আশার সুসার করিবার জন্য এক অভাবনীয় ঘটনার সৃষ্টি করিলেন।

৪

সে দিন শনিবার ছিল, আফিসগুলি বেলা ২টার সময় সব বন্ধ হইয়া গেল। মহেন্দ্র আর কি করে, গদীতে ফিরিয়া গিয়া জন্তুটির মত চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে ইচ্ছা হইল না—ভাবিল, তার চেয়ে যাই, গড়ের মাঠে গিয়া গাছের ছায়ায় একটু শুইয়া থাকি। তাই সে করিল। রাস্তা হইতে অল্প দূরে, একটা খালি বেঞ্চি দেখিয়া তথায় গেল এবং গায়ের উড়ানিখানি খুলিয়া, গুটাইয়া সেটিকে উপাধানস্বরূপ করিয়া, বেঞ্চির উপর শয়ন করিল। ঝিরঝির করিয়া বাতাস বহিতে লাগিল, আরামে মহেন্দ্র চক্ষু মুদ্রিত করিল।

ঘণ্টা দুই এই ভাবে নিদ্রা যাইবার পর, সে জাগিয়া উঠিল। শরীরে আবার বেশ স্ফূর্ত্তি অনুভব করিল। রৌদ্র তখন পড়িয়া গিয়াছে। বাসায় ফিরিবার অভিপ্রায়ে, উঠিয়া ধীরে ধীরে রাস্তার উপর আসিল। পথে তখন অনেক বায়ুসেবনকারী বহির্গত হইয়াছে।

কিয়দ্দূর পথ আসিয়া, মহেন্দ্র দূরে একটা গোলমাল শুনিতে পাইল। দেখিল, কেল্লার দিক্ হইতে একখানা বগীগাড়ী নক্ষত্রবেগে ছুটিয়া আসিতেছে। সেই গাড়ীকে থামাইবার জন্য রাস্তার লোক হো-হা করিয়া পথরোধ করিয়া দাঁড়াইতেছে—কিন্তু ঘোড়া নিকটে আসিবামাত্র তাহারা সরিয়া দাঁড়াইতেছে। দেখিতে দেখিতে গাড়ী মোড় ঘুরিয়া, মহেন্দ্র যে রাস্তায় ছিল, সেই রাস্তা লইবার চেষ্টায় কোণের লাইটপোষ্টে ধাক্কা খাইল, পশ্চাতে যে সহিস দাঁড়াইয়াছিল, সে ছিটকাইয়া রাস্তায় পড়িয়া গেল; গাড়ী বিদ্যুদ্বেগে, মহেন্দ্রের দিকে আসিতে লাগিল।

ক্ষণকালমধ্যেই দৃষ্টিগোচর হইল, এক জন অল্পবয়স্কা শ্বেতকায়া মহিলা মধ্যস্থলে বসিয়া, তাঁহার দুই পার্শ্বে দুইটি শিশু—একটি বালক, একটি বালিকা। তিনি গাড়ী হাঁকাইতেছিলেন, অশ্বের ছিন্ন বল্গা তখনও তাঁহার হাতেই রহিয়াছে।

মহেন্দ্র যেখানে ছিল, সে স্থানের কাছাকাছি ৪।৫ জন ইংরাজ ভদ্রলোক বেড়াইতেছিলেন এবং খিদিরপুর ডকের বহুসংখ্যক কুলী সেই সময় উত্তরদিক্ হইতে সেই স্থানে আসিয়া পৌছিয়াছিল। "সাহেবরা" লম্ফ দিয়া,সেই সব কুলীর মধ্যে পড়িয়া, ছড়ি উঁচাইয়া ধমক দিয়া, তাহাদিগকে আনিয়া, পথের প্রস্থভাগ জুড়িয়া তাহাদিগকে দাঁড় করাইয়া দিলেন এবং নিজেরা বিপদের স্থান—

মধ্যভাগ জুড়িয়া রহিলেন। তাঁহারা চীৎকার করিতে করিতে ছড়ি আস্ফালন করিতে লাগিলেন, কুলীরাও হল্লা করিতে লাগিল। মহেন্দ্র স্বেচ্ছায় এই কুলীদের সঙ্গেই স্থানগ্রহণ করিয়াছিল।

অশ্ব কাছাকাছি আসিয়া, পথ এইরূপভাবে অবরুদ্ধ দেখিয়া, সহসা ফিরিয়া ময়দানের দিকে মুখ করিল এবং নিমেষমধ্যে খানা পার হইয়া, ময়দানে প্রবেশ করিয়া ছুটিতে লাগিল। মহেন্দ্র তৎক্ষণাৎ নিজ গলা হইতে চাদরখানা নামাইয়া, তাহার উভয় প্রান্ত একত্রে গাঁইট দিয়া গাড়ীর পশ্চাদ্ধাবন করিল। কিয়দ্দূর প্রাণপণে ছুটিয়া অশ্বের নাগাল পাইয়া, সেই চাদরের ফাঁস তাহার গলায় লাগাইয়া, বিপুল বলে তাহা টানিতে টানিতে আড় হইয়া ছুটিতে লাগিল।

কিয়দ্দূর পশ্চাতে পূর্ব্বোক্ত "সাহেবরাও" ছুটিয়া আসিতেছিলেন, মহেন্দ্রর এই সাহস ও কৌশল দেখিয়া, "ব্রাভো ইয়ংম্যান—হোল্‌ড অন্" (সাবাস যুবক, ধরিয়া থাক) বলিয়া তাঁহারা চীৎকার করিতে লাগিলেন। অশ্বের গতিবেগ প্রতি মুহূর্ত্তে হ্রাস হইয়া আসিতেছিল। ক্রমে "সাহেবরা" আসিয়া পৌছিলেন এবং সেই চাদর দুই তিন জনে মুষ্টি বদ্ধ করিয়া টানিতে টানিতে ছুটিতে লাগিলেন। আর কিয়দ্দূর গিয়াই অশ্ব পরাজয় স্বীকার করিল—সে দাঁড়াইল।

দুই জন "সাহেব" তখন মেমসাহেব ও শিশুদ্বয়কে বগী হইতে নামাইলেন। মেমসাহেবের মুখ শাকের বর্ণ ধারণ করিয়াছে, তিনি ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছেন, দাঁড়াইতে পারিলেন না, সেইখানে ভিজা ঘাসের উপর বসিয়া পড়িলেন। কথা কহিবার শক্তি নাই যে, কাহাকেও ধন্যবাদ দিবেন। শিশু দুইটি তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। মেমসাহেবের মূর্চ্ছার উপক্রম দেখা গেল।

সৌভাগ্যক্রমে এক "সাহেবের" পকেটে ব্র্যাণ্ডী-ভরা ফ্ল্যাস্ক ছিল, তিনি সেটি বাহির করিয়া, মেমসাহেবের মুখে ধরিলেন। মেমসাহেব ঢক ঢক করিয়া খানিকটা পান করিয়া ফেলিলেন।

"সাহেবরা" কেহ মহেন্দ্রের সহিত করমর্দ্দন করিলেন, কেহ তাহার পিঠ চাপড়াইলেন, সকলেই তাহাকে অজস্র প্রশংসাবাদ করিতে লাগিলেন।

মেমসাহেব একটু চাঙ্গা হইলে, তাঁহার পরিচয় পাওয়া গেল। তিনি কেল্লায় থাকেন, মেজর গ্রীণের পত্নী। শিশু দুটি তাঁহার নিজস্ব নহে—কর্ণেল হ্যামিল্টনের সন্তান—তিনি তাহাদিগকে লইয়া হাওয়া খাইতে বাহির হইয়াছিলেন।

ইতোমধ্যে সহিসটা খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে আসিয়া পৌছিয়াছিল। গাড়ী-ঘোড়া তাহার জিম্মায় রাখিয়া, "সাহেবরা" বিবি গ্রীণ ও শিশুদ্বয়কে রাস্তার উপর লইয়া আসিয়া একটা ঠিকাগাড়ী ডাকিয়া দিলেন। বিবি, "সাহেবদিগকে" ও মহেন্দ্রকে মধুর ভাষায় ধন্যবাদ দিয়া গাড়ীতে উঠিলেন। মহেন্দ্রকে বলিলেন, "বাবু, তুমি আমাকে কেল্লায় পৌছাইয়া দিবে চল।"

মহেন্দ্র কোচবাক্সে উঠিতে যাইতেছিল, বিবি বলিলেন, "না না—তুমি ভিতরে আসিয়া ব'স।" মহেন্দ্র তাহাই করিল, গাড়ী কেল্লা অভিমুখে ছুটিল।

বাড়ী পৌছিয়া, বিবি গ্রীণ মহেন্দ্রকে ড্রয়িংরুমে বসাইয়া বলিলেন, "আমার স্বামীকে ডাকিয়া আনি।"

কিয়ৎক্ষণ পরে এক স্থূলকায় বর্ষীয়ান্ "সাহেবকে" সঙ্গে লইয়া বিবি ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "জন্, এই বাবু আমার জীবনদাতা।" মহেন্দ্রর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "ইনি আমার স্বামী, মেজর গ্রীণ।"

ইঁহারা প্রবেশ করিতেই মহেন্দ্র দাঁড়াইয়া উঠিয়াছিল। মেজর সাহেবকে সে সেলাম করিল। "সাহেব" মহেন্দ্রর করমর্দ্দন করিয়া, তাহাকে অনেক ধন্যবাদ জানাইলেন। এক সোফার উপর নিজ পার্শ্বে বসাইয়া, তাহার নাম-ধাম পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। মহেন্দ্র উত্তর দিতে লাগিল। "সাহেব" বলিলেন, "বাঃ, তুমি ত বেশ ইংরাজী বল, বাবু! তুমি এক জন সুশিক্ষিত লোক!"

বেহারার মুখে সংবাদ পাইয়া, কর্ণেল হ্যামিল্টনও এই সময় আসিয়া পড়িলেন এবং মহেন্দ্রর প্রতি সময়োচিত শিষ্টাচার প্রদর্শন করিলেন। প্রায় ১০ মিনিট কাল উভয় "সাহেব" বসিয়া, মহেন্দ্রর সহিত নানা কথোপকথন করিলেন। তাহার পর উভয় "সাহেব" উঠিয়া গিয়া কি পরামর্শ করিলেন। পরে কর্ণেল "সাহেব" মহেন্দ্রকে আসিয়া বলিলেন, "বাবু, তুমি আজ আমাদের যে উপকার

করিয়াছ, তাহা আমাদের আজীবন স্মরণ থাকিবে। তোমার উপস্থিতবুদ্ধি ও সাহস অত্যন্ত প্রশংসার্হ। আমাদের কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ তোমাকে যদি আমরা সামান্য কিছু উপহার দিই, তাহাতে তুমি বিরক্ত হইবে কি?"—বলিয়া তিনি পকেট হইতে একখানি এক শো টাকার নোট বাহির করিয়া টেবলের উপর রাখিলেন।

মহেন্দ্র নোটখানির প্রতি একবার চাহিয়া দেখিয়া, সলজ্জ হাসি হাসিয়া বলিল, "আমি কোনও উপহার বা পুরস্কারের আশায় ত এ কার্য্য করি নাই। প্রত্যেক ভদ্রলোকের যাহা কর্ত্তব্য, তাহাই আমি করিয়াছি মাত্র। টাকা না লইবার অপরাধ আপনারা গ্রহণ না করেন, ইহাই আমার প্রার্থনা।"

"সাহেব" দুই জন আবার কি বলাবলি করিলেন। তাহার পর মেজর সাহেব বলিলেন, "তুমি চাকরীর সন্ধানে কলিকাতায় আসিয়াছ বলিলে; কোনও স্থানে কোনও আশা পাইয়াছ কি?"

"না সাহেব, এ পর্য্যন্ত পাই নাই।"

"আমাদের আফিসে একটি চাকরী খালি আছে। বেতন ১০০৲ টাকা, সেটি পাইলে তুমি খুসী হও?"

"হাঁ সাহেব—সেটি পাইলে নিজেকে আমি সৌভাগ্যবান্ মনে করিব।"

"বেশ! কাল তুমি একটি দরখাস্ত লিখিয়া আনিও এবং বেলা ১টার সময় আমার সহিত আসিয়া সাক্ষাৎ করিও।"

"নিশ্চয় আসিব! আমার বহু ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।"

"কিছু না—কিছু না। তবে ঐ কথা ঠিক রহিল। আমরা এখন ক্লাবে চলিলাম। (স্ত্রীর প্রতি) এল্‌সি, বাবুকে একটু চা খাওয়াইবে না?"

বিবি গ্রীণ বলিলেন, "চা আনিতে হুকুম দিয়াছি। তোমরা চা খাইয়া যাইবে না?"

মেজর সাহেব বলিল, "না প্রিয়তমে, আজ বিলম্ব হইয়া গিয়াছে—আমরা ক্লাবে গিয়াই যাহা হয় পান করিব।"—বলিয়া তিনি কর্ণেল সাহেবের সঙ্গে বাহির হইয়া গেলেন।

'যাহা হয়' কথাটির অর্থ বুঝিয়া, বিবি গ্রীণ আপন মনে একটু হাসিলেন। চায়ের অপেক্ষায় মহেন্দ্রকে নিকটে বসাইয়া তাহার সহিত গল্প করিতে লাগিলেন।

[ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

শ্রাবণ-রাতে

১

বৃষ্টি ধোওয়া শ্রাবণ-রাতে,
চাঁদের আলোক ঝরে;
অপূর্ব্ব এক শোভার রসে
উঠছে নয়ন ভ'রে!
কেতকী তার সুবাস-ডালি
বাতাস-কোলে দিচ্ছে ঢালি;—
চাঁদের আলো, রাতের কালো
আঁধারটি লয় হ'রে,
তরল সোনা, মাখিয়ে দিয়ে,
গাছের পাতার 'পরে।

২

স্তব্ধ রাতে, বনের মাঝে,
বাতাস-পরশ পেয়ে,
তরুলতার চোখে এল
স্বপন-আবেশ ছেয়ে।
নীল আকাশে তারার হাসি,
গাছের কোলে জোনাকরাশি,
করুণ সুরে, মরম পুরে
কে উঠে গান গেয়ে;—
পরাণ রহে, পথের পানে,
কাহার আশায় চেয়ে!

শ্রীদেবীদাস মুখোপাধ্যায়।

রবার্ট বয়েল

মানব সভ্যতার ইতিহাসে দেখা যায়, লক্ষ্মী-সরস্বতীর মিলনের দৃষ্টান্ত বিরল। তবে লক্ষ্মীর বরপুত্র হইয়াও অনেকে কবি ও শিল্পী বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন ও করিতেছেন, এ দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিরল না হইলেও লক্ষ্মীর বরপুত্র হইয়াও কেহ বৈজ্ঞানিক খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন, এমন বড় দেখা যায় না। পরন্তু বিজ্ঞানের সেবকরা প্রায় সকলেই সাধারণ বা সমাজের তথাকথিত অধস্তন স্তরের গৃহস্থের কুটীরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কাহারও পিতা কর্ম্মকার, কাহারও বা কুম্ভকার, কাহারও হয় ত বা সূত্রধর ছিলেন। কেহ শৈশবে চর্ম্মকারের কায করিতেন; কেহ বা ছিলেন ঔষধবিক্রেতার গোমস্তা; কেহ বা দপ্তরীর দোকানে বই বাঁধিতেন। ফ্যারাডে, ডেভি প্রভৃতি জগদ্‌বরেণ্য অমর বৈজ্ঞানিকদিগের ইতিহাস এইরূপ।



অনারেবল রবার্ট বয়েল

কিন্তু আজ এমন এক জন বিজ্ঞান-সেবীর পরিচয় দিব, যিনি অভিজাতবংশে জন্মগ্রহণ করিলেও,—আশৈশব বিপুল ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে লালিত-পালিত হইয়াও, পৈতৃক আভিজাত্যানুরূপ শিক্ষালাভ করিলেও এবং পরবর্ত্তী জীবনে বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইলেও, সর্ব্বথা বিলাস-বাসনা ও তথাকথিত আভিজাত্য-গৌরব পরিত্যাগ করতঃ চিরকৌমার্য্যব্রত অবলম্বন করিয়া কেবল বিজ্ঞান-সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহারি নাম রবার্ট বয়েল। আজ এই মহাত্মার জীবন-কথা লিখিতে বসিয়া স্বতঃই বাঙ্গালার স্বদেশপ্রেমিক, আর্ত্ত-বন্ধু, রাসায়নিকের কথা মনে পড়ে। তিনি রসায়নাগারের নিগড়েই বাঁধা পড়েন নাই; পরন্তু যে স্থানেই আর্ত্তের ক্রন্দন, সেই স্থানেই তাঁহার পদার্পণ। সমগ্র ভারত আজ তাঁহার কর্ম্মস্থল, একমাত্র তিনিই কারাবাসী মহাত্মার "খদ্দর বাণীর" শুভ্র পতাকা হস্তে ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে পরিভ্রমণ করিয়াছেন। এইরূপ স্বদেশ-প্রেমের আহ্বানেই এক দিন ফরাসী রাসায়নিক ল্যাভোয়াশিয়ে রসায়ন ছাড়িয়া দেশের জন্য, স্বজাতির কল্যাণের জন্য মৃত্যু বরণ করিয়াছিলেন।

অনারেবল রবার্ট বয়েল ১৬২৬ খৃষ্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারী তারিখে বিলাতের ওয়াটারফোর্ড জিলার লিশমোর (Lismore) নগরে এক অভিজাতবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম রিচার্ড বয়েল, তিনি বিপুল অর্থশালী ও নানা সদ্‌গুণের অধিকারী ছিলেন। ইটন বিদ্যালয়ে বয়েলের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত হয়। তৎপরে ১২ বৎসর বয়সে তাৎকালীন অভিজাতবংশের প্রথানুসারে তাঁহাকে বিদ্যাশিক্ষার্থ ফ্রান্সে পাঠান হয়। তথায় ৬ বৎসর অতিবাহিত করিয়া তিনি দেশে ফিরিয়া আইসেন। তখন বিলাতের রাজনীতিক গগন ঘনঘটাচ্ছন্ন, রাজশক্তির স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে প্রজাশক্তির বিরাট অভ্যুত্থান। রাজা প্রথম চার্লসের শিরশ্ছেদনে তাহার পরিণতি হয়। বয়েল তখন নিজের মনকে দেশের দুঃখকষ্টের চিন্তা হইতে দূরে রাখিবার জন্য অধ্যয়নে ও বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ব্যাপৃত রহিলেন। প্রায় এই সময়েই বয়েল শিক্ষিত ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্বানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিদিগের



মাইকেল ফ্যারাডে

Invisible Club নামক এক সঙ্ঘের সভ্য হয়েন। তাহার পর ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দে রাজা দ্বিতীয় চার্লসের রাজত্বকালে রাজার অনুমতি অনুসারে যাঁহাদের চেষ্টায় বিজ্ঞানচর্চ্চার জন্য রয়েল সোসাইটী (Royal Society) স্থাপিত ও উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হয়, অনারেবল রবার্ট বয়েল তাঁহাদের অন্যতম। তিনি এই সভার সদস্যও ছিলেন।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন পণ্ডিতদিগের পদার্থবিদ্যা, বিশেষতঃ বায়বীয় পদার্থ সম্বন্ধে জ্ঞান বিশেষ কিছু ছিল না বলিলেই চলে। তাঁহাদের ধারণা ছিল, প্রকৃতির রাজ্যে শূন্য স্থানের অস্তিত্ব অসম্ভব, এমন কি, ফরাসী পণ্ডিত রেণে ডেকার্টের (Rene Descarte) মত বিজ্ঞ লোকও বলিতেন, "প্রকৃতির রাজ্যে শূন্য স্থান (Vacuum) থাকা দূরে থাকুক, তাহার অস্তিত্ব ধারণা করাও অসম্ভব।" দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখান হইত—সরু মুখওয়ালা কোন জলপূর্ণ পাত্রের নিম্নে যদি একটি ছোট ছিদ্র থাকে এবং যদি পাত্রটির মুখ ভাল করিয়া বন্ধ রাখা যায়, তাহা হইলে সেই ছিদ্র দিয়া পাত্র হইতে জল পড়িবে না, কিন্তু মুখ খুলিয়া দিলেই জল পড়িয়া যাইবে, আবার মুখ বন্ধ করিলে জল পড়াও বন্ধ হইবে। জলনিষ্কাশনের সঙ্গে সঙ্গে পাত্রের ভিতর যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়, বায়ু তৎক্ষণাৎ তাহা পূর্ণ করে। কাযেই ক্রমশঃ সবটুকু জল বাহির হইয়া পাত্রটি বায়ুপূর্ণ হইয়া যায়। এই ত গেল পাত্রটির মুখ খোলা অবস্থার কথা। কিন্তু যখন পাত্রটির মুখ বন্ধ, তখন যুগপৎ ঐ ছিদ্রটির ভিতর দিয়া জল নিষ্কাশন ও বায়ুর প্রবেশ অসম্ভব—শূন্য সৃষ্টি হয় না, যেহেতু, তাহা পূর্ণ হইবার উপায় নাই—অর্থাৎ জল পড়ে না—কাযেই Nature abhors vacuum. কিন্তু এমন সুন্দর যুক্তিপূর্ণ উদাহরণটি সত্ত্বেও পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ এ বিষয়ে সন্দেহ করিতেন; আর তাহার কারণও ছিল।

"এক দিক বন্ধ, এক দিক খোলা"—এমন একটি প্রায় ৪০ ফিট লম্বা কাচের নল যদি সম্পূর্ণরূপে জলপূর্ণ করিয়া এমন ভাবে একটি জলপূর্ণ চৌবাচ্চায় রাখা যায় যে, বন্ধদিক ঊর্দ্ধদিকে ও খোলা মুখ জলের নিম্নে থাকে, তবে দেখা গিয়াছে যে, নলের ভিতরের জলের উচ্চতা কমিয়া গিয়া চৌবাচ্চার জলের উপরিভাগ হইতে প্রায় ৩৩ ফিট দাঁড়ায় ও নলের ভিতরের জলের উপরে প্রায়

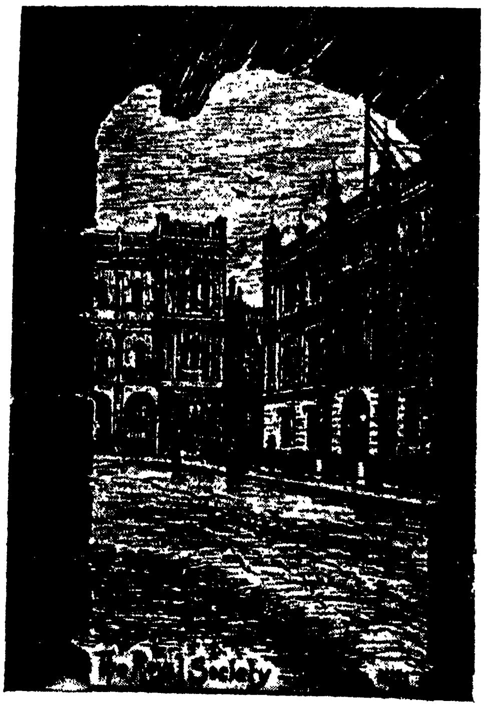


সার হামফ্রী ডেভী

৭ ফিট পরিমিত স্থান শূন্য হইয়া যায়। যতবারই ঐরূপ করা যায় এবং যত বড় নলই লওয়া হউক না কেন, জলের উচ্চতা ৩৩ ফিটের বেশী হয় না। কিন্তু ৩৩ ফিটের অপেক্ষা ছোট নল লইলে এরূপ শূন্য সৃষ্টি হয় না, পরন্তু সমগ্র নলটিই জলপূর্ণ থাকে। এইরূপ ভাবে ভিন্ন ভিন্ন তরল পদার্থের পরীক্ষায় ভিন্ন ভিন্ন উচ্চতা দেখা যায়। পারদ জলের অপেক্ষা ১৩ গুণ ভারী অর্থাৎ একটি বোতল জলের ওজন যদি ১ সের হয়, তবে ঠিক সেই বোতলপূর্ণ পারদের ওজন ১৩ সের হইবে। এই পারদ দ্বারা যদি ঐরূপ একটি নল পূর্ণ করা যায় এবং পারদেই পূর্ণ একটি ছোট চৌবাচ্চার উপর উক্ত নলটি পূর্ব্ববৎ রাখা যায়, তবে নলের ভিতর পারদের উচ্চতা জলের উচ্চতার ১৩ ভাগের ১ ভাগ হয়, কোন মতেই এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না। তবে যদি নলটিকে চৌবাচ্চা সমেত লইয়া কোন উচ্চ পর্ব্বতের উপর আরোহণ করা যায়, তবে দেখা গিয়াছে যে, পর্ব্বতের উচ্চতার সঙ্গে সঙ্গে নলের ভিতরকার পারদের উচ্চতা ক্রমশঃ কমিতে থাকে; কিন্তু তাহার উপরে শূন্য স্থানের পরিমাণ বাড়িতে থাকে। আবার পর্ব্বত হইতে অবতরণের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বাবস্থা ফিরিয়া আইসে।

এইরূপ অবস্থায় পণ্ডিতগণের মনে স্বতঃই এ প্রশ্ন উদিত হইল—জল বা পারদের এরূপ ব্যবহারের কারণ কি? জল বা পারদের উপরিস্থিত স্থানে নলের ভিতরে কি আছে? ডেকার্টের সিদ্ধান্ত এ প্রশ্নের কোনই মীমাংসা করিতে পারে নাই।

ইতাপূর্ব্বেই জার্ম্মাণীতে ভন গ্যারিক নামক (Von Garick) এক জন প্রতিভাশালী ব্যক্তি একটি বায়ু-নিষ্কাশনী যন্ত্র (Air-pumping-machine) আবিষ্কার করিয়াছিলেন। বয়েল মনে করিলেন, বায়ুর কোন বিশেষ ধর্ম্মের সঙ্গেই উপরে উক্ত ঘটনাগুলির সম্বন্ধ আছে। সুতরাং বায়ুতারল্য পরীক্ষার জন্য রবার্ট হোকের সাহায্যে তিনি উন্নততর প্রণালীতে একটি বায়ুনিষ্কাশন যন্ত্র নির্ম্মাণ করিলেন।



রয়েল সোসাইটী

লোক পূর্ব্বে মনে করিত, বায়ু ভৌতিক পদার্থ। কিন্তু বয়েলই প্রথম ইহার জড়ত্ববাদ প্রচার করেন; তিনি কার্য্যতঃ দেখাইলেন, বায়ুর ওজন আছে। কারণ, বায়ুপূর্ণ একটি চর্ম্মথলির ওজন সাধারণ অবস্থায় যাহা, বায়ুহীন পাত্রের ভিতর তদপেক্ষা অধিক। বায়ুর অবস্থা ধাতুনির্ম্মিত স্প্রিঙের অবস্থার সহিত তুলনীয়।

তিনি আরও বলিয়াছেন, স্থলচর আমরা বায়ু-সমুদ্রের সর্ব্বনিম্নস্তরে চলাফিরা করিতেছে। আকাশে বহু উর্দ্ধ পর্য্যন্ত এই বায়ুর অস্তিত্ব আছে। কিন্তু উপরিস্থিত বায়ুর চাপে আমাদের চারিদিকের বায়ু উপরের বায়ুর অপেক্ষা ঘন। উচ্চ পর্ব্বতের বায়ুর চাপ কম, আর এই জন্যই নলের ভিতরের পারদের উচ্চতাও তথায় কম হয়। কারণ, এই বায়ুর চাপেই নলের ভিতরে পারদ উচ্চ থাকে। কাযেই যে স্থানে বায়ুর চাপ অধিক, সেইখানেই নলের ভিতরের পারদের উচ্চতা বেশী। এইরূপ হওয়ায় পারদের উচ্চতার দ্বারা বায়ুর চাপের পরিমাণ ও পর্ব্বতের উচ্চতা বা সমুদ্রের গম্ভীরতা নির্দ্ধারণ করা যায়। এই যন্ত্রকেই বায়ুমান (Barometer) যন্ত্র কহে। ১ ইঞ্চ পরিমিত স্থানের উপর তাহার

উপরিস্থিত বায়ুস্তর যে চাপ দেয়, তাহার পরিমাণ প্রায় সাড়ে ৭ সের। কাযেই আমাদের এই ক্ষুদ্র দেহের উপর বায়ু কি পরিমাণ চাপ দেয়, তাহা সহজেই অনুমেয়। আর সে চাপ যদি কেবল অধোমুখী হইত, তবে স্যাণ্ডোর মত বীরেরও মাটীর উপরে খাড়া থাকা শক্ত হইত—কিন্তু সে চাপ সব দিক্ হইতেই সমান। তাহা না হইলে মশা, মাছি প্রভৃতি ক্ষুদ্র প্রাণীও কিরূপে স্বচ্ছন্দে ইতস্ততঃ উড়িয়া বেড়ায়? ইহার প্রমাণ, কোন পাত্রের মুখের উপরটা যদি হস্ত দ্বারা চাপিয়া ধরা যায় ও তাহার পর উহার ভিতরের বায়ু বাহির করিয়া ফেলা যায়, তবে খুব বীরের পক্ষেও তাহার হাত সরাইয়া লওয়া কঠিন হয়। কিন্তু পাত্র-টিকে পুনরায় বায়ুপূর্ণ করিলে হাত সরাইতে কোন কষ্টই হয় না।

তাহার পর তিনি প্রমাণ করিয়াছেন, তাপ দ্বারা বায়ুর শক্তি বর্দ্ধিত করা যায়। বায়ু দ্বারা অর্দ্ধপূর্ণ রবারের একটি থলিয়ার মুখ ভাল করিয়া বন্ধ করিয়া আগুনের তাপে গরম করিলে থলিয়াটির আকার ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয় ও সঙ্গে সঙ্গে উহা শক্ত হয় এবং অবশেষে ভিতরকার বায়ুর চাপ সহ্য করিতে না পারিয়া সশব্দে বিদীর্ণ হইয়া যায়।



মধ্যস্থলে রয়েল সোসাইটীর স্থাপয়িতা রাজা দ্বিতীয় চাল স; বামে রয়েল সোসাইটীর মেম্বর; দক্ষিণে রয়েল সোসাইটীর প্রথম প্রেসিডেন্ট

তাহার পর তিনি বায়ুর সঙ্গে প্রদীপের সম্বন্ধ বিচার করিয়াছেন। একটি প্রজ্জালিত মোমবাতি একটি কাচ-পাত্রের ভিতর রাখিয়া তাহা হইতে ক্রমশঃ বায়ু নিষ্কাশন করিলে—পূর্ণ নিষ্কাশনের পূর্ব্বেই বাতিটি নিবিয়া যায়। প্রথমতঃ দীপশিখাটি ক্রমশঃ নীলবর্ণ ও ছোট হইতে থাকে ও সলিতার উপরের দিকে উঠিতে থাকে, অবশেষে শিখা নিবিয়া যায়।

কাচের পাত্রের ভিতর স্থাপন করিয়া উক্ত পাত্রের ভিতরকার বায়ু নিষ্কাশন করিলে নলের ভিতরের পারদের উচ্চতা ক্রমশঃ কমিতে থাকে ও অবশেষে প্রায় কিছুই থাকে না, কিন্তু পুনঃ বায়ুপ্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই পারদ পূর্ব্বের উচ্চতা প্রাপ্ত হয়। এইরূপে যে ব্যাপারটি প্রদর্শনের জন্য পূর্ব্বে পর্ব্বতারোহণের দরকার হইত, বয়েল ঘরে বসিয়াই তাহা দেখান।

একটি শব্দায়মান চলন্ত ঘড়ি উপরে কথিত কাচের পাত্রের ভিতরে রাখিয়া তাহা হইতে বায়ু নিষ্কাশন করিলে ঘড়িটির টিক্ টিক্ শব্দ ক্রমশঃ লোপ পাইতে থাকে ও অবশেষে আর কিছুই শুনা যায় না; কিন্তু বায়ুর পুনঃ প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে ঘড়িটি শব্দায়মান হয়। ইহার দ্বারা তিনি প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন, বায়ুই শব্দের বাহন। তাহার পর বায়ুহীন স্থানে একটি ইন্দুর রাখিয়া তিনি দেখিয়াছেন, উহা অচিরাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়—অতএব বায়ুই প্রাণি-জগতের জীবন।

পারদ জলের অপেক্ষা প্রায় ১৩ গুণ ভারী, জল আবার বায়ুর অপেক্ষা ১ হাজার গুণ ভারী এবং বায়ুর ঘনত্ব উচ্চে নিম্নে সর্ব্বত্রই সমান—এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া ইনি গণনার দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, বায়ু-সমুদ্রের গভীরতা বা পৃথিবী হইতে উহার উচ্চতা প্রায় ৭ মাইল। বস্তুতঃ উচ্চতা ইহার অপেক্ষা অনেক বেশী—কারণ, বায়ুর ঘনত্বে উপরে ও নিম্নে অনেক প্রভেদ আছে।

অফুটন্ত গরম জলের পাত্র কোন কাচের ঢাকার ভিতরে রাখিয়া তাহা হইতে বায়ু নিষ্কাশন করিয়া ইনি দেখাইয়াছেন, অফুটন্ত জল টগ্‌বগ্ করিয়া ফুটিতে থাকে, কিন্তু বায়ুপ্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে আবার ফুটা বন্ধ হইয়া

যায়। ইহা হইতে তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, কোন তরল পদার্থের ফুটন্তাবস্থার তাপের সঙ্গে তৎসংলগ্ন বায়ুর চাপের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। বায়ুর চাপ যদি বেশী হয়, তবে তাপের মাত্রাও বেশী হইবে, কিন্তু চাপ যদি কম হয়, তবে তাপও কম হইবে।

তাহার পর একটা কাচের নল আংশিকভাবে বায়ুপূর্ণ ও আংশিকভাবে পারদপূর্ণ করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন যে, যদি বায়ুর উপরের চাপ দ্বিগুণ করা যায়, তবে উহার পরিমাণ অর্দ্ধেক হয়, আবার চাপ অর্দ্ধেক করিলে বায়ুর পরিমাণ দ্বিগুণ হয়—ইহাই বয়েলের জগদ্‌বিখ্যাত সিদ্ধান্ত বা Boyle's Law.

তিনি আরও প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন যে, জল জমিয়া বরফ হইলে তাহার আকার বাড়িয়া যায়। সাগরের লবণাক্ত জল হইতে পানীয় জল, কাষ্ঠ হইতে স্পিরিট ও অন্যান্য পদার্থ প্রস্তুত করিবার প্রণালীও তিনিই বাহির করিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু বায়ু-সম্পর্কে যে সব মৌলিক গবেষণা তিনি করিয়া গিয়াছেন, তাহাই তাঁহাকে আবহমানকাল মানুষের কাছে স্মরণীয় করিয়া রাখিবে। বস্তুতঃ অনারেবল রবার্ট বয়েল শূন্যতার পরীক্ষা করিতে গিয়া মানবের জ্ঞানভাণ্ডারের অনেকটা স্থান পূর্ণ করিয়া গিয়াছেন।

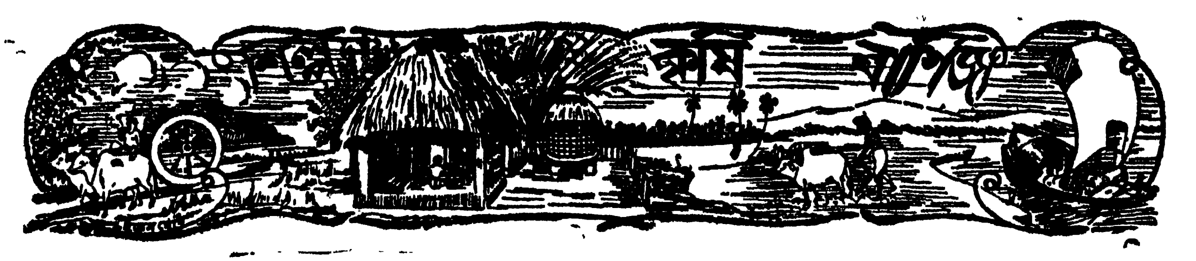
শ্রীযোগেন্দ্রমোহন সাহা।

তাল

একচ্ছত্র আধিপত্য, যার ভাদ্রমাসে,
বন্দি সেই তালে, তার অনুগ্রহ আশে।
রক্ত কিংবা কৃষ্ণ সাজে সজ্জিত শরীর,
সমুজ্জ্বল, রাজোচিত কিরীটেতে শির।
দীর্ঘ উচ্চ বৃক্ষশিরে প্রাসাদ-আবাস,
তুঙ্গ তার শৃঙ্গদেশ, পরশে আকাশ।
বসন্তের শেষে, তাল জন্মিবার তরে,
গাছের মাথায় মোচ ফেলে থরে থরে।
এইরূপে বড় জোর মাস দুই যায়,
কাঁধি কাঁধি কচি তাল গাছে শোভা পায়।
কচিবেলা তালশাঁস, মরি কি মধুর,
বৈশাখের ক্লান্তিটুকু করে সব দূর।
রসনার তৃপ্তিকর ভরা মধুজল—
নেয়াপাতি ডাব সম, স্নিগ্ধ সুশীতল।
তার পর সুখ দিতে মানব সকলে,
ভাদ্রমাসে পাকা তাল নামে ধরাতলে।
হেরি তাল, সবাকার হর্ষে ভরে প্রাণ,
সুপ্রসন্নচিত্তে সবে করে জয়গান।
গাছতলা হ'তে শুধু এনে কষ্ট ক'রে,
একটা খেলেই যাবে পেট তব ভ'রে।
খেতে চাও ভাল ক'রে যত্ন কর তবে,
খেতে ব'সে তাহা হ'লে, সুধাভ্রম হবে।
সযতনে নাও ধীরে রসটুকু ছেঁকে,
গুড় কলা আর তাহে গুঁড়া চাল মেখে।
উনানে চাপায়ে দাও তেল এক কড়া,
মহানন্দে তার পরে ভাজো তার বড়া।
এ বড়া খাইলে হয় অরুচির রুচি,
কেড়ে খাবে ফেলে দূরে মোণ্ডা আর লুচি।
ভাজিতে ভাজিতে ঝরে রাঁধুনীর লাল;
সুবাস মধুর এত ছড়ায় এ তাল।
মধুলোভে ফুলপাশে মধুকর মত,
রাঁধুনীরে ঘিরি বসে ছেলেমেয়ে যত।

গরম গরম বড়া, মুচ্‌মুচে বেশ,
মহাসুখে খায় তারা ফেলিয়া সন্দেশ।
বৃদ্ধ হ'তে শিশু কেহ যান নাক বাদ,
তালবড়া খেতে প্রাণে:সকলের সাধ।
গণ্ডার হিসাব ক'রে কর্ত্তা ভয়ে খান,
গিন্নী খান পেটে তাঁর আছে যত স্থান।
ভুলিতে পারে না কেহ খেলে একবার,
সব বড়া চেয়ে এর সুমধুর তার।
বড়াতে আপত্তি যার খাও ক'রে পিঠে,
মনোহর তৃপ্তিকর চমৎকার মিঠে।
দুধে ফেলে খাও, হবে অপূর্ব্ব আহার—
গুরুপাক বটে তবু নহে ভুলিবার।
পাটালি করিয়া খাও ছেঁকে তালরস,
তাতেও পাইবে মনে অপূর্ব্ব হরষ।
ছানিয়া তালের রস ক'রে খাও রুটী,
কিংবা চিবাইয়া খাও গোল গোল সুটি।
সার কথা, তাল তুমি নানা ভাবে খেও,
যখনি পাইবে ফলে গুণগান গেও।
গুণ কত! আঁটিটিও ফেলা নাহি যায়,
দুই মাস পরে দেখি খাদ্য জমে তায়।
তালের ফোঁপল, সেও অতি চমৎকার,
নরম তুলার মত; সুমধুর তার।
ব্রত, পূজা, পার্ব্বণেতে এই তাল চাই;
তাল বিনা ভাদ্রমাসে অন্য গতি নাই।
উচ্চ দীর্ঘ বৃক্ষপরে জন্মে এই ফল;
পিঠেই পড়িলে শুধু, ঘটে অমঙ্গল।
তালের মাহাত্ম্যকথা, হয়ে একমন,
যেই জন পড়ে কিংবা করয়ে শ্রবণ।
অতুল সুখেতে তার, কাটে চিরকাল;—
পিঠে কভু পড়ে নাক তার 'ভাদ্র তাল'।

শ্রীদেবীদাস মুখোপাধ্যায় বি, এ।



বাঙ্গালায় মৎস্যাভাব

অধিকাংশ জীবতত্ত্ববিৎ এই মত পোষণ করেন যে, জীবনের উৎপত্তি প্রথমে সমুদ্রতটেই হইয়াছিল। তৎপরে জৈব পদার্থ প্রসারিত হইয়া এক দিকে অতল সমুদ্রগর্ভে ও অন্য দিকে দুরারোহ পর্ব্বতচূড়ায় গিয়া উপনীত হয়। জৈব পদার্থের দুইটি প্রধান শাখা ;—প্রাণী ও উদ্ভিদ্। উভয়েরই প্রথম বিকাশ নগ্ন কোষে। এমন কতিপয় জীবিত, আবরণহীন কোষ দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা উদ্ভিদ কি প্রাণী, ঠিক বলা যায় না। যেমন উদ্ভিদ ও প্রাণীর প্রথম বিবর্ত্তনের অবস্থায় পরস্পরের মধ্যে সীমা নির্দ্দেশ করা কঠিন, তেমনই প্রাণিরাজ্যের দুইটি প্রধান উপরাজ্যের—অমেরুদণ্ডী (Invertebrata) এবং মেরুদণ্ডী (Vertebrata)—সন্ধিস্থলও কয়েকটি রহস্যময় প্রাণীর দ্বারা অধিকৃত। কিন্তু প্রাণিবিবর্ত্তনের যে স্তরে মৎস্য আসিয়া দেখা দিয়াছে, তথায় মেরুদণ্ডী প্রাণিসমূহ অনেকটা স্বকীয় লক্ষণাবলী প্রাপ্ত হইয়াছে। মনুষ্যের সহিত মৎস্যের সাদৃশ্যের মধ্যে মেরুদণ্ডই অন্যতম। পৃথিবীর কাহিনীতে কোটি কোটি বৎসর পূর্ব্বে এমন এক সময় গিয়াছে, যখন মৎস্য ও অন্যান্য জলচর জীবই বসুন্ধরা অধিকার করিয়া ছিল। সেই পুরাতন মৎস্যরাজ্য আজকাল কতক পরিমাণে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান মৎস্যরাজ্যের ৩টি বিভাগের মধ্যে ডিপ্‌নয় (Dipnoi) নামক ফুস্‌ফুস্‌যুক্ত মৎস্য বিভাগ আমাদের দেশে নাই। দৃঢ় ও স্থিতিস্থাপক পেশীযুক্ত বিভাগের (Elasmobranchii) মধ্যে হাঙ্গর, শঙ্কর প্রভৃতিই প্রধান ; তৎসমুদায় আমাদিগের বর্ত্তমান আলোচ্য বিষয় নহে। তৃতীয় বিভাগের মৎস্যগুলির মুখ পূর্ণ পরিস্ফুট—Teleostomi। উহার দুইটি উপবিভাগের মধ্যে বর্ম্মযুক্ত উপবিভাগ ভারতে দেখা যায় না। সুতরাং এতদ্দেশের খাদ্য-মৎস্য প্রধানতঃ Teleostei উপবিভাগের অন্তর্গত। এই সমুদায় মৎস্যে কঙ্কাল সুস্পষ্টরূপে বিদ্যমান। সেই জন্য ইহাদিগকে Bony অর্থাৎ অস্থিযুক্ত মাছ বলা হয়।

বাঙ্গালার সাধারণ মাছ

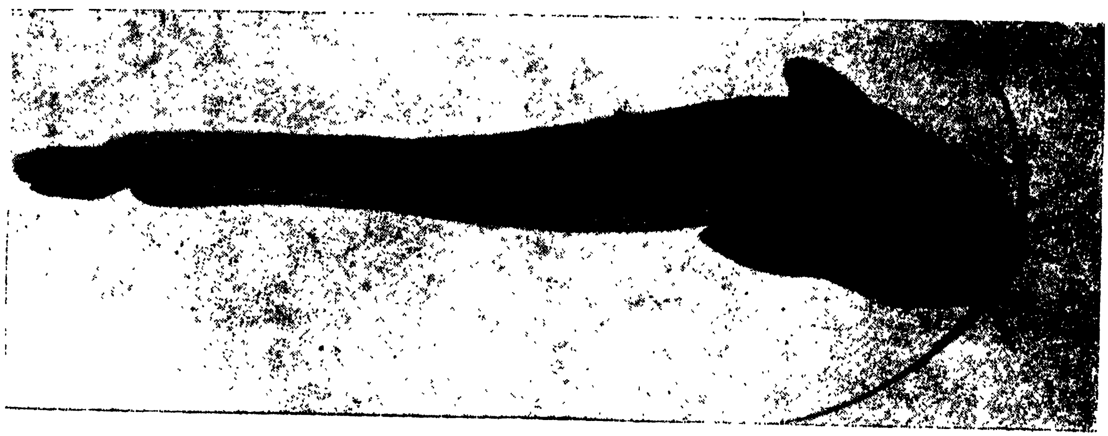
বহু পুরাকাল হইতেই বঙ্গদেশ মাছের জন্য প্রসিদ্ধ এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশে বাঙ্গালীর মৎস্যভুক্ বলিয়া খ্যাতি অথবা অখ্যাতি আছে। বঙ্গ-উপসাগরের শিরোভাগে বহুবিধ সামুদ্রিক মৎস্যের অভাব নাই, কিন্তু এ যাবৎ সামুদ্রিক মৎস্যের কায বাঙ্গালায় প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। হাটে বাজারে যে সব মাছ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার অধিকাংশই মিঠা জলের (Fresh water) মাছ অর্থাৎ নদী, খাল, বিল, পুষ্করিণী প্রভৃতিতে জন্মায়। এতদ্ভিন্ন আর এক শ্রেণীর মাছ আছে, যথা ভেটকি, পায়রাচাঁদা প্রভৃতি ; যেগুলি সমুদ্রের খাঁড়িতে অথবা তৎসন্নিহিত জলাশয়সমূহে পাওয়া যায় (Estuarine)। নিম্নবঙ্গের স্থানে স্থানে এই শ্রেণীর মাছ সহজপ্রাপ্য হইলেও ইহাদিগকে বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র—সাধারণ মাছ বলিতে পারা যায় না। পূর্ব্বোক্ত Teleostei উপবিভাগের মধ্যে অনেকগুলি বর্গ আছে। তন্মধ্যে ৩২।৩৩টি বর্গের মাছ বাঙ্গালার জলাশয়সমূহে পাওয়া যায়। উৎপাদনের প্রাচুর্য্যে অথবা ব্যবসায়ে প্রাধান্যের হিসাবে নিম্নলিখিত বর্গগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য :—

রোহিতবর্গ ঃ—অন্যূন ২ শত ৩০ জাতীয় মাছ এই বর্গের অন্তর্ভুক্ত ও ইহারা সকলেই মিঠাজলবাসী। রুই, কাতলা, মিরগেল প্রভৃতি বৃহদাকার ; বাটা, বাঙরা প্রভৃতি মধ্যমাকার ও মৌরুলা, পুঁটি প্রভৃতি ক্ষুদ্রাকার মাছ বাঙ্গালায় প্রায় সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, বঙ্গদেশই এই বর্গীয় মাছের আদিম উৎপত্তিস্থান। রোহিতবর্গের ক্ষুদ্র মৎস্য বিশিষ্টরূপে কীটভুক্। আমেরিকার স্থানে স্থানে

ইহাদিগের দ্বারা মশক-কীড়া ধ্বংস করাইয়া ম্যালেরিয়া, পীতজ্বর (Yellow fever) প্রভৃতি দমন করা হইয়াছে। রোহিত প্রভৃতি বড় জাতির মাছ প্রৌঢ় বয়সে একবারেই নিরামিষাহারী। পুকুরে রুই, কাতলা প্রভৃতির পোনা হয় না ; নদীতেই হইয়া থাকে। সম্প্রতি কিন্তু জানিতে পারা গিয়াছে যে, সিংভূম, পুরুলিয়া ও পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য স্থানে 'বাঁধ' নামক বড় বড় জলাশয়ে ইহাদের ডিম ফুটে ও পোনা জন্মায়।

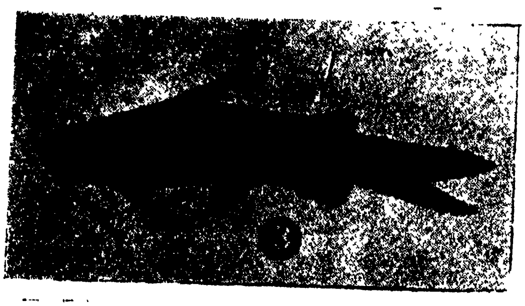


রুই মাছ



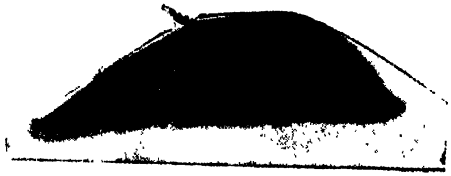
মদ্গুর মাছ

মদ্গুরবর্গ (Siluridæ) :—ইহাদের জাতির সংখ্যা প্রায় ১ শত ২০। রোহিতবর্গের পরেই এই বর্গীয় মাছের বাঙ্গালায় সমধিক প্রাচুর্য্য। এই বর্গের মাছের আঁইস নাই এবং অনেকেরই মুখের নিকট বিড়ালের গোঁফের ন্যায় গোঁফ আছে। সেই জন্য ইহাদিগকে Cat fish বলা হয়। মাগুর, টেঙ্গরা, পাব্‌তা, আড়, পাঙ্গাস, শিঙ্গী, বোয়াল প্রভৃতি এই বর্গের সাধারণ-পরিচিত মাছ। মদ্গুরবর্গের 'শিশোর' নামক মাছ উত্তরবঙ্গে দৃষ্ট হয়। ইহা বাঙ্গালার নিজস্ব ও গৌরবের বিষয়। শিশোরের বহির্দৃশ্য যেমন অদ্ভুত, আকারও তেমনই বৃহৎ ; ৫।৬ হাত পর্য্যন্ত লম্বা হইতে দেখা যায়। বোয়ালের ন্যায় হিংস্র ও ধ্বংসকারী মাছ বিরল। ইহার বিস্তৃত মুখব্যাদান, তীক্ষ্ণ দন্ত ও সাধারণ গঠনপ্রণালী দেখিলেই ইহার হিংস্র স্বভাব প্রতীয়মান হইবে। এই বর্গের মাছ সাধারণতঃ কদর্য্য দ্রব্যাদি আহার করে। ঘোলা জলে বাস করে বলিয়া ইহাদের চক্ষুর তেমন তেজ নাই ; দৃষ্টির কায পূর্ব্বোক্ত গোঁফের স্পর্শ দ্বারাই অনেক পরিমাণে সাধিত হয়। মাগুর, শিঙ্গী প্রভৃতির সাক্ষাৎভাবে বায়ুগ্রহণোপযোগী শ্বাস-প্রশ্বাস-যন্ত্র আছে। অন্যান্য মাছের তাহা নাই ; অধোগণ্ড অথবা 'কানখো' দ্বারা তাহারা জলবিলীন বায়ু পৃথক করিয়া লইয়া শ্বাস-প্রশ্বাসের কার্য্য সম্পাদন করে। মাগুর, শিঙ্গী প্রভৃতি সেই জন্য কর্দ্দমে অথবা প্রায় শুষ্ক জলাশয়ে বাঁচিয়া থাকিতে পারে।



টেঙ্গরা মাছ

ইলিশবর্গ (Clupedideæ) :—ইহার মধ্যে ইলিশই প্রধান, কিন্তু এই বর্গের খয়রা, ফেঁসা, তেলচাপড়ি প্রভৃতি মাছও অনেকের নিকট পরিচিত। ইহাদের অধিকাংশই সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী জলাশয়ের মাছ। বিখ্যাত বিলাতী Herring মৎস্যও এই বর্গের অন্তর্ভুক্ত। বর্ষার প্রারম্ভে বহুসংখ্যক ইলিশ সমুদ্র হইতে গঙ্গার ও সমুদ্রবাহী অন্যান্য নদীর মোহানায় আসিয়া উপস্থিত হয় এবং সমস্ত বর্ষাকাল ব্যাপিয়া উহারা ডিম্ব প্রসব করিবার জন্য নদীর ঊর্দ্ধতর অংশে যাইবার চেষ্টা করে। নদীতে উঠিবার মুখে এই সমস্ত মাছ ধরিয়া ইলিশ মাছের ব্যবসা চলে। ডিম্ব প্রসবের পর ইলিশ আবার সমুদ্রে ফিরিয়া যায়। পূর্ব্ববঙ্গে 'জাতকা' নামে যে মাছ যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়, বৃটিশ মিউজিয়মের (British Museum) প্রসিদ্ধ মৎস্যতত্ত্ববিৎ মিঃ টেট্ রিগ্যান বলেন যে, তাহা ইলিশশিশু ভিন্ন আর কিছুই নহে। মাছের বংশবৃদ্ধির হার যে কিরূপ, তাহা ইলিশ মাছের দৃষ্টান্তেই বুঝিতে পারা যায়। এক একটি স্ত্রী-ইলিশের উদরে প্রায় ৫০ লক্ষ ডিম্ব থাকে। কিন্তু অধিকাংশ মাছই ডিম্ব ফুটাইবার কোন চেষ্টা করে না এবং এমন কি, নিজের ডিম ও পোনা নিজেই খাইয়া ফেলে।



ফলুই মাছ



বোয়াল মাছ



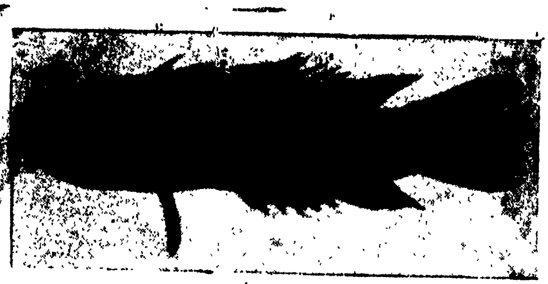
চিতল মাছ



শিশোর মাছ

চিতলবর্গীয় (Notopteridæ) :—মাছের ইলিশবর্গের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ এবং ইহাতেও ২১১টি সামুদ্রিক জাতি আছে। কিন্তু চিতল ও ফলুই প্রধানতঃ পুকুরেরই মাছ। চিতল মাছের ক্ষুদ্র মৎস্য ধ্বংস করিবার প্রবৃত্তি কম নহে।

ভেটকিবর্গ (Percidæ) :—ইলিশের ন্যায় ভেট্‌কিও বাঙ্গালার একটি বিশিষ্ট মাছ। নানাপ্রকারের চাঁদা এই বর্গের অন্তর্গত ও মিঠাজলবাসী। ছোট ও বড়, উভয় জাতীয় ভেটকিই কিন্তু লবণাক্ত জলের মাছ—যদিও আজকাল ইহাদিগকে সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী জিলাসমূহের পুষ্করিণী প্রভৃতিতে দেখিতে পাওয়া যায়। ভেটকি জাতীয় মাছ খুব বড় হইতে দেখা যায়। পূর্ব্বকার সরকারী মৎস্যধরা জাহাজ Golden Crown মাদ্রাজ উপকূলে একটি অতিকায় ভেটকি ধরে। উহার ওজন প্রায় ৭ মণ, দৈর্ঘ্য ৫ হাতের উপর। উড়িষ্যার উপকূলেও ঐ প্রকার একটি মাছ ধরা পড়ে। কিন্তু কলিকাতার যাদুঘরে (Indian Museum) ডায়মণ্ড হারবারের নিকট ধৃত যে ভেটকি মাছ সংরক্ষিত আছে, তাহা পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম ভেটকি। ভেটকির পোটা হইতে উৎকৃষ্ট শিরীষ (Isinglass) পাওয়া যায়। তেঁতুল সহযোগে সংরক্ষিত ভেটকি ও ইলিশ মাছ শ্বেতাঙ্গগণের প্রিয়।



কই মাছ

তপস্বীবর্গ (Polynemidæ) :—বৎসরে

মোটে দুইবার মাত্র পাওয়া গেলেও তপস্বী মাছের কাযে ধীবররা মন্দ লাভ করে না। তারুই, চেলা, শিলি প্রভৃতি মাছও এই বর্গভুক্ত ও খাইতে সুস্বাদু; কিন্তু নিম্নবঙ্গের বড় বড় নদীর সান্নিধ্য ব্যতীত এই সমস্ত মাছ বিরল।

ভাঙ্গনবর্গ (Mugilideæ) :—ভাঙ্গন, খরসুলা, পার্‌সে প্রভৃতি মাছও নিম্নবঙ্গে আবদ্ধ। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী জলাশয় ও ভেড়ীসমূহে এই বর্গীয় মাছ প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। এই বর্গের কয়েক জাতীয় মাছ জলের উপর অনেক দূর লাফাইতে পারে। জল ছাঁকিয়া লইবার বিশেষ যন্ত্র ইহাদের কানখোর নিকট বিদ্যমান থাকায় ইহারা এত ময়লা জলে থাকিতে পারে যে, সেখানে অন্য জাতীয় মাছ বাঁচা কঠিন। দলবদ্ধ পার্‌সে প্রভৃতি মাছের উচ্চ চক্ষুসমূহ জলের উপরিভাগে দেখিয়া অনেক সময় জলবুদ্‌বুদ বলিয়া ভ্রম হয়।

কইবর্গ (Anabautidæ) :—কই, খ্যাদস, খলসেই এই বর্গের প্রধান মাছ। কই মাছের সাক্ষাৎভাবে বায়ু গ্রহণ করিবার বিশেষ যন্ত্র থাকায় ইহারা জল ছাড়িয়া অনেকক্ষণ থাকিতে পারে ও পার্শ্ববর্ত্তী কাঁটার সাহায্যে শুষ্ক জমী অতিক্রম করিয়া দূরবর্ত্তী জলাশয়ে যাইতে পারে। সেই জন্যই কই মাছের তালগাছে উঠিবার গল্প শুনা যায় এবং সেই প্রবাদই ইহার ইংরাজী নামের (Climbing Perch) ভিত্তি।*

শোল, শাল, চ্যাঙ্গ, লেঠা প্রভৃতি যে বর্গের অন্তর্ভুক্ত, বৈজ্ঞানিকরা তাহার নাম দিয়াছেন Oppioceppalidæ অর্থাৎ সর্পমস্তকী। ইহাদের চেপ্টা মস্তকের সহিত সর্পশিরের সৌসাদৃশ্য সুস্পষ্ট। এই সমুদায় মৎস্য কতক মাত্রায় হিংস্র। ইহাদের মধ্যে এক পরিবারগ্রহণ, গৃহনির্ম্মাণ ও সন্তানপালনের প্রথা দেখা যায়। সন্তান মাতার পরিবর্ত্তে পিতা কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়া থাকে এবং পুং-শোল সন্তানরক্ষার জন্য অনিষ্টাকাঙ্ক্ষী মানুষকেও আক্রমণ করিতে পশ্চাদ্‌পদ হয় না। খানা-ডোবায় এই জাতীয় মাছ অধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়।

চিংড়ীকে মাছ বলিয়া গণ্য করা হয় না। ইহা কীটশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু ব্যবসায়ের হিসাবে চিংড়ীকে মাছের মধ্যেই ধরা হয় এবং ইহার কাটুতিও সামান্য নহে।

বর্ত্তমান মৎস্য-ব্যবসায়

আপাততঃ আমাদের দেশে মৎস্য লইয়া যে সকল ব্যবসায় চলে, সেগুলিকে মূলতঃ ৪টি ভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়:—(১) টাটকা মাছ; (২) শুঁটকী মাছ; (৩) লোণা মাছ; ও (৪) পোনা বিক্রয়। ঋতুভেদে ও স্থানানুসারে বাঙ্গালার বাজারসমূহে নানা প্রকার মাছের আমদানী হয়, কিন্তু তন্মধ্যে পূর্ব্বোল্লিখিত মৎস্যগুলিই প্রধান। এক কলিকাতাতেই বৎসরে ৪ লক্ষ মণের উপর মাছ বিক্রয় হয়। ১৯২২-২৩ খৃষ্টাব্দে ৪ লক্ষ ৩৫ হাজার ৩ শত ৪ মণ মাছ নানা স্থান হইতে কলিকাতায় আমদানী হয়। তাহাতেও কলিকাতার অভাবমোচন হয় না; মধ্যবিত্ত ব্যক্তিগণ মাছের অভাব সুলভ সব্জী প্রভৃতি দ্বারা পূরণ করিতে বাধ্য হয়েন। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহেও মাছের সরবরাহ অপেক্ষা চাহিদা অধিক। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, টাটকা মৎস্য-ব্যবসায়ের পরিসরবৃদ্ধির অনেক অবসর আছে।

শুঁটকী মাছের ব্যবসা পূর্ব্বাপেক্ষা কিয়ৎপরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু ভারতের পশ্চিম উপকূলের তুলনায় বাঙ্গালায় শুঁটকী মাছের কারবার নিতান্ত কম। সুন্দরবনের স্থানে স্থানে, প্রধানতঃ খুলনা জিলায়, মেদিনীপুরের গঙ্গার মোহানার নিকটবর্ত্তী অংশে, চট্টগ্রামে ও অন্যান্য স্থানে অল্পবিস্তর পরিমাণ শুঁটকীমাছ উৎপাদিত হয়। ইহার অধিকাংশই বিদেশে চালান যায়। নিখিল ভারতের বাণিজ্যের হিসাবে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ১৯২২-২৩ খৃষ্টাব্দে যথাক্রমে ২৪ লক্ষ ২৯ হাজার ৯ শত ৪৯ টাকার ও ৫৪ লক্ষ ২৫ হাজার ৩ শত ২৭ টাকার শুঁটকী মাছ আমদানী ও রপ্তানী হইয়াছিল। ইহার মধ্যে বাঙ্গালার ভাগ সামান্য। সাধারণতঃ ভদ্রলোকের মধ্যে লোণা মাছ ব্যবহৃত হয় না; ইহার ব্যবসায় অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। মাছের ডিম ও পোনা সাধারণতঃ কাঁসাই, রূপনারায়ণ, [illegible] প্রভৃতি [illegible] বড় নদীর জলমগ্ন চড়ার (Sand-bank) সন্নিহিত অগভীর জলে সংগৃহীত হয় ও ধীবরগণ এই কার্য্যে যথেষ্ট লাভ করে। বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব মৎস্যবিভাগ হইতে

বৎসরে ৫।৬ লক্ষ পোনা বিক্রয় হইত। চড়া দর দিয়া ইঁহাদের নিকট যে কম লোকই পোনা লইতে আসিত, তাহা সহজেই বুঝা যায়। অথচ বাঙ্গালার সর্ব্বত্রই পোনার চাহিদা খুবই অধিক। বৈজ্ঞানিক উপায়ে ডিম ফুটাইয়া পোনা উৎপাদন ও তাহা বাছাই করিয়া বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা প্রত্যেক জিলাতেই থাকা দরকার।

মৎস্যক্ষেত্রসমূহের অবস্থা

মাদ্রাজ ব্যতীত অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাঙ্গালায় মৎস্য সুলভ হইলেও এবং মৎস্য-সংক্রান্ত ২।৪ রকম কারবার চলিলেও, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, পূর্ব্বাপেক্ষা এতদ্দেশে মৎস্য উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। এই হ্রাসের লক্ষণ আজকাল নহে, বহুদিন পূর্ব্বেই দেখা দিয়াছে। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে ব্যুকানন-হ্যামিল্টন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্ত্তৃক বাঙ্গালায় মৎস্য-বিষয়ক অনুসন্ধানে নিযুক্ত হয়েন। তিনি ও তাঁহার পরবর্ত্তী সরকারী মৎস্য-তত্ত্ববিৎ, ডাক্তার ফ্রান্সিস্ ডে স্পষ্টই অভিমত প্রকাশ করেন যে, বঙ্গদেশের মিঠাজলীয় মৎস্যক্ষেত্রসমূহ ক্রমশঃ অধোগতি প্রাপ্ত হইতেছে এবং ইহার আশু প্রতীকার প্রয়োজন। বিশেষজ্ঞগণের এইরূপ সতর্ককারী সঙ্কেত সত্ত্বেও অনেক দিন বাঙ্গালায় মৎস্য-উৎপাদনবৃদ্ধিকল্পে কোন চেষ্টাই হয় নাই। অবশেষে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট যখন সার ফ্রেডরিক নিকলসনকে তৎপ্রদেশের মৎস্যক্ষেত্রসমূহের উন্নতিবিধানের জন্য নিয়োগ করিলেন, তখন বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের চৈতন্যোদয় হইল; পরবর্ত্তী বৎসরে তাঁহারাও সার কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্তকে ঐ প্রকার কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। বিংশ শতাব্দীর মৎস্য-সরবরাহবৃদ্ধি সম্বন্ধীয় যাবতীয় সরকারী চেষ্টার সূত্রপাত এই সময় হইতে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সার কৃষ্ণগোবিন্দর পৃথিবীময় পরিভ্রমণে 'গোল্ডেন ক্রাউন' জাহাজের বঙ্গোপসাগরের মৎস্যক্ষেত্রবিষয়ক অনুসন্ধানে এবং সম্প্রতি-বর্জ্জিত মৎস্যবিভাগ স্থাপনে যে পরিমাণ অর্থব্যয় হইয়াছে, তাহার অনুপাতে বঙ্গদেশবাসীর কার্য্যতঃ [illegible]ভই হইয়াছে। মৎস্যক্ষেত্রসমূহের অবস্থা ডাক্তার. ডের সময় যেরূপ ছিল, তদপেক্ষা আজকাল শতগুণ হীন হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এইরূপ ধারাবাহিক অবনতির মূলে যে দেশের লোকের আলস্য আছে, তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু সরকারী চেষ্টাসকল যে উপযুক্ত পন্থায় পরিচালিত হয় নাই, তাহাও অস্বীকার করা যায় না। যেখানে নদী, জলা, পুষ্করিণী প্রভৃতির সংস্কারের অভাবে চাষের জলের সঙ্কুলান হয় না, সেখানে আগে সে সমুদায় অবস্থার নিরাকরণ না করিয়া মৎস্যের জীবন-ইতিহাস ও ব্যাধি অধ্যয়ন করিতে যাওয়া বৃথা; কারণ, উপযুক্ত জলাশয় ভিন্ন মৎস্যজনন হইবে কোথায়? যেখানে মূলধনের অভাবে পুকুরের মাছ সরবরাহের উপযুক্ত ব্যবস্থা হইতে পারিতেছে না, সেখানে বহু অর্থব্যয়সাপেক্ষ বাষ্পীয় মৎস্যধরা জাহাজ (Steam Trawler) সাহায্যে সামুদ্রিক মৎস্য ধরিয়া সুলভ মূল্যে বাজারে বিক্রয় করার প্রয়াস যে বিফল হইবে, তাহা আর আশ্চর্য্য কি? সরকারী চেষ্টাসমূহের মধ্যে এই প্রকার কাযেরই প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়।

মৎস্যের প্রয়োজনীয়তা

বাঙ্গালা মৎস্যদেশ নামে অভিহিত হয়। এক সময়ে এতদ্দেশে যথেষ্ট পরিমাণে মৎস্য উৎপাদিত হইত বলিয়াই বোধ হয় এই নামকরণ হইয়াছিল। কিন্তু যে কারণেই মৎস্যদেশ নাম হউক না কেন, বাঙ্গালায় মৎস্যের প্রয়োজনীয়তা যে অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা অনেক অধিক, তাহার যথেষ্ট কারণ আছে। দেশমধ্যস্থ জলাশয়সমূহের (Inland waters) বাহুল্যে বাঙ্গালা স্বভাবতঃ যেরূপ মৎস্যজননের উপযোগী, বিহার অথবা যুক্তপ্রদেশের বিস্তীর্ণ তৃণপ্রান্তরসমূহও তেমনই পশুপালনের উপযোগী। সুতরাং প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারেই পুষ্টিকর আহার্য্যের হিসাবে ঘৃত, দুগ্ধ, মাখম ইত্যাদির উপর উত্তর-ভারতবাসীরা যেরূপ নির্ভর করে, বঙ্গবাসীরা সেইরূপ মৎস্যের উপর নির্ভর করে। বস্তুতঃ সাধারণ অবস্থার বাঙ্গালীর পক্ষে গব্য দ্রব্যাদি দুষ্প্রাপ্য। তাহারা খাল, বিল, নদী প্রভৃতিতে যে মাছ সংগ্রহ করিতে পারে, তাহাই ভাতের সঙ্গে খাইয়া শরীরে বলাধান করে। দুগ্ধ, ঘৃত, ছানা, মাখম, মাংস, ডিম্ব প্রভৃতির ন্যায় মৎস্যও শরীরপোষণ ও বৃদ্ধির সর্ব্বাধিক সহায়তা করে এবং পুরুষানুক্রমে অভ্যস্ত

হইয়া বাঙ্গালী অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণ মাছ সহজে পরিপাক করিতে পারে। মাছ অপেক্ষা মাছের ডিমের পোষণশক্তি আরও অধিক। মৎস্যের দুষ্প্রাপ্যতার সহিত এতদ্দেশবাসীর শারীরিক অধোগতির ও তজ্জন্য ব্যাধি প্রভৃতির অধিক প্রাদুর্ভাবের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। অপরাপর সাধারণ খাদ্যদ্রব্যের তুলনায় মাছের পোষণশক্তি নিম্ন-প্রদত্ত তালিকা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে :—

	জল	প্রটিন	মেদ	শ্বেতসারইঃ
ভাত	৫২·৭	৫	·১	৪১·৯
ময়দা	১৩	৯·৫	·৮	৭৫·৩
মটরডাল	১৩	২১	১·৮	৫৫·৮
দুগ্ধ	৮২	৩	৩৫	৪
ছাগমাংস	৩৯·৭৬	২৯·০৪	২৯·৮	×
মাছ	৭২·৫	১৯·৪	৭·১	×
আলু	৭৬·৭৭	১·২	·১	১৯·১

শুদ্ধ ডাল-ভাত দ্বারা শরীরের সম্যক্ পুষ্টি অসম্ভব। ডাল গুরুপাক বলিয়া অধিক মাত্রায় খাওয়া চলে না। তাহার উপর আবার বৎসরের সকল সময় গরীব লোক ডাল খাইতে পায় না। সুতরাং তাহাদিগকে ভাত ও শাক-সব্জীর উপর নির্ভর করিতে হয়। তাহাতে শরীর ক্রমশঃ ক্ষীণবল হওয়া, দুর্ব্বল সন্তান-সন্ততি জন্মান ও লোকসংখ্যা হ্রাস পাওয়া স্বাভাবিক। আদম-সুমারীর হিসাবে দেখা যায় যে, বাঙ্গালায় শতকরা ৮০ জন লোক মৎস্যাহারী এবং ধীবর ও তাহাদিগের পরিবারবর্গের সংখ্যা ১০ লক্ষের কম নহে। এ অবস্থায় এই প্রদেশে মৎস্যশিল্পের যথেষ্ট উন্নতি হওয়া উচিত; কার্য্যতঃ কিন্তু তাহা না হইয়া বরং মৎস্যক্ষেত্রসমূহ দুরবস্থাগ্রস্ত হইতেছে ও মৎস্যের পরিমাণ কমিয়া আসিতেছে।

মৎস্যাভাবের প্রতীকার

ইহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না যে, মৎস্যাভাবের মূল কারণ এই যে, প্রতি বৎসর যে পরিমাণ মৎস্য ধৃত হয়, তাহার অনুরূপ পরিমাণ মৎস্য জন্মায় না। বাঙ্গালীর ন্যায় সুদক্ষ মৎস্য-শিকারী অন্য দেশে বিরল। আমাদিগের নানা প্রকার জালে ও বহুবিধ যন্ত্রাদিতে ক্ষুদ্রতম পোনা পর্য্যন্তও বাদ যায় না। মার্কিণ, জাপান, জার্ম্মাণী প্রভৃতি দেশে নির্দ্দিষ্ট ফাঁদের জাল ব্যবহার করিতে দেওয়া হয় এবং বিশেষ বিশেষ জলাশয়ে বিশেষ বিশেষ সময় নির্দ্দিষ্ট আকার ও ওজনের মাছ ভিন্ন অন্য প্রকার মাছ ধরা নিষিদ্ধ। এইরূপ আইন-কানুনের উদ্দেশ্য, মৎস্যবংশের রক্ষা ও বিস্তারসাধন। ভারতে কিংবা বাঙ্গালায় এইরূপ আইন চালাইবার অনেক অন্তরায় আছে। কিন্তু জন-সাধারণ স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া অপরিণত মৎস্য-ধ্বংসের প্রতীকার না করিলে আইন ভিন্ন অন্য কোন উপায় নাই। মৎস্যবংশ রক্ষার ব্যবস্থার সহিত ইহাও দেখা দরকার যে, বাঙ্গালায় জলাশয়ের পরিমাণ কত কমিয়া গিয়াছে। পশ্চিম-বঙ্গে বহুসংখ্যক জলাশয় যে লুপ্ত হইয়াছে, কিংবা সংস্কারের অভাবে মৎস্যপালনের অনুপযুক্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাহা সকলেই জানেন। পূর্ব্ববঙ্গের যে সমস্ত খাল, বিল কচুরী-পানায় পরিপূর্ণ হইয়া যাইতেছে, তৎসমুদায়ও ২।৪ শ্রেণীর মাছ ভিন্ন অন্য মাছের অনাবাসযোগ্য হইবে। সুতরাং জলাশয়সমূহের সংস্কারই মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার মূল উপায়। যাঁহারা আজকাল পল্লীর উন্নতি-সাধনে বদ্ধ-পরিকর হইয়াছেন, তাঁহারা অবশ্য জানেন যে, জল-সংস্থা-নই সকল প্রকার উন্নতির ভিত্তি। উপযুক্ত পরিমাণে পানীয়জল সংস্থান করিতে হইলেই জলাশয়াদির সংস্কার প্রয়োজন এবং তৎসঙ্গে মৎস্যচাষও সম্ভবপর। এমন কি, সংস্কারের খরচ উৎপাদিত মৎস্য দ্বারা নির্ব্বাহিত হইয়াও যথেষ্ট লাভ থাকিতে পারে। এতদ্ভিন্ন ম্যালেরিয়াদমনে ক্ষুদ্র মৎস্যাদি হইতে যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য পাওয়া যায়। নদী, বিল প্রভৃতির সংস্কার সরকারী সাহায্য ভিন্ন সম্ভবপর নহে। তাহাও কোন কোন জেলায় অতি প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে।

বাঙ্গালার সামুদ্রিক মৎস্য-ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল হইতে পারে; কিন্তু দেশমধ্যস্থ মৎস্য-ক্ষেত্রসমূ-হের ন্যায় সামুদ্রিক মৎস্য-ক্ষেত্রসমূহের সদ্ব্যবহার তেমন সহজসাধ্য অথবা স্বল্পব্যয়সাপেক্ষ নহে। আধুনিক বাষ্পীয় মৎস্যধরা জাহাজ এক একটি বিরাট ব্যাপার। বাঙ্গালী ধনিগণের পক্ষে সেরূপ জাহাজ নিয়োগ করা ব্যক্তিগতভাবে কার্য্যে পরিণত হওয়া কঠিন। যৌথ চেষ্টার দ্বারা অবশ্য এ কার্য্য হইতে পারে। এইরূপ জাহাজ সম্বন্ধে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এক একটি

জাহাজসংযুক্ত জাল (Trawl), যাহা সমুদ্রের তলদেশ হইতে সমস্ত মৎস্য তুলিয়া লয়, তাহা প্রায় ৭০ ফুট চওড়া ও ১ শত ১০ ফুট লম্বা। ৩ শত ফুট গভীরতা পর্য্যন্ত এই সমস্ত জাল চলিতে পারে। তদধিক গভীর জলে অথবা বন্ধুর শিলাময় জমীর উপর দিয়া এই জাল চালান হয় না। আবার শুধু মৎস্যধরা জাহাজ হইলেই হইল না, তাহার সহিত দ্রুতগামী ছোট ছোট বোট থাকাও দরকার। সে সমুদায়ের দ্বারা যথাসম্ভব স্বল্পসময়ে ধৃত মৎস্য বাজারে পৌছাইয়া দেওয়া যায়। যদি মাছধরা জাহাজকে স্বয়ং বাজারে মাছ পৌছাইয়া দিতে হয়, তাহা হইলে তদ্দ্বারা অপেক্ষাকৃত কম মাছ ধরিতে পারা যায়, অথবা পূরা পরিমাণ মাছ ধরিয়া পাঠাইতে হইলে আমাদের দেশের জল-হাওয়ায় অনেক মাছ বিকৃত অবস্থায় আসিয়া পৌছে। সামুদ্রিক মৎস্য-ব্যবসায়ের সহিত ঠাণ্ডা গুদামের (Cold Storage) ব্যবস্থা থাকাও প্রয়োজনীয়। এই সমস্ত বিষয় ভাবিয়া আপাততঃ দেশমধ্যস্থ মৎস্যক্ষেত্রসমূহের উন্নতিবিধানই শ্রেয়ঃ ও সমীচীন বলিয়া বোধ হয়।

শিক্ষিতসম্প্রদায়ের সহযোগিতা

বর্ত্তমান মৎস্যশিল্প ও ব্যবসায়ের যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে শিক্ষিত ভদ্রব্যক্তিগণ যদি এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ না করেন, তবে বিশেষ কিছু উন্নতি হওয়া দুরূহ। ধীবরগণ প্রায়ই অশিক্ষিত এবং মৎস্য ধরা ও বিক্রয় করায় তাহারা নিপুণ হইলেও মৎস্যবংশ বিস্তার করার ব্যবস্থা নানা কারণে তাহাদের পক্ষে অসাধ্য। সুখের বিষয় এই যে, ইদানী মৎস্যজীবিগণের মধ্যে ব্যবসায়ের উন্নতিকল্পে অন্যূন ৫০টি সমবায় সমিতি গঠিত হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালার জলাশয়সমূহ পূর্ব্বের ন্যায় মৎস্যপূর্ণ করিতে হইলে জমীদারগণের ও শিক্ষিতমণ্ডলীর সহানুভূতি একান্ত প্রয়োজন। যত স্বল্প ব্যয়ে ও সামান্য পরিশ্রমে মৎস্যচাষ করিয়া লাভবান্ হওয়া যায়, তেমন খুব কম কাযেই হইতে পারে। যদি আধুনিক উপায়ে ভদ্রসন্তানগণ ডিন ফুটাইয়া পোনা প্রস্তুত ও বিক্রয় করেন, তবে তাহাতেই বেশ দু'পয়সা উপার্জ্জন করিতে পারেন। এতদ্ভিন্ন যাঁহাদের ছোটবড় পুষ্করিণী আছে ও যেখানে নিকটেই বড় বড় বাজার আছে, তাঁহাদিগের পক্ষেও সেরূপ স্থলে মৎস্য উৎপাদনে যথেষ্ট লাভ আছে। কলিকাতার বাজারে যে মূল্যে আজকাল মাছ বিক্রয় হইতেছে, তাহাতে সহরের নিকটবর্ত্তী স্থানে মৎস্য-জনন ও ব্যবসায়ের চেষ্টায় কখনই ক্ষতি হইতে পারে না। উপযুক্ত জলাশয়ে ৩ বৎসরের মধ্যেই রুই, কাতলা প্রভৃতি মাছ ১০ সের পর্য্যন্ত বাড়িতে দেখা গিয়াছে। কই, মাগুর, শিঙ্গী, গুলে প্রভৃতির চাষে এক বৎসরেই লাভ হইতে পারে। ভেট্‌কি, পার্‌সে প্রভৃতি স্বাদু অথবা ঈষৎ লবণাক্ত জলের মাছ চাষ করিবারও কলিকাতার দক্ষিণে যথেষ্ট স্থান আছে।

আজকাল ভারতে মৎস্যশিল্পে মাদ্রাজই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। মাদ্রাজে মিঠা জলের মৎস্যক্ষেত্র কম নাই; কিন্তু সেখানে মাছের কারবার প্রধানতঃ মালাবার উপকূলের সামুদ্রিক মৎস্য লইয়া। সংরক্ষিত মৎস্য, মৎস্য-তৈল, মৎস্যজ ক্ষার, টাটকা মাছ, শিরীষ প্রভৃতির উপর ভিত্তি করিয়া যে মৎস্যশিল্প মাদ্রাজে গঠিত হইয়াছে, বাঙ্গালাতেও সেই শিল্প গঠিত হওয়ার উপাদানের অভাব নাই। কিন্তু এখানে কোন প্রকার মৎস্যশিল্পের উন্নতি দেখা যাইতেছে না। মৎস্য-সংক্রান্ত যে সমস্ত লাভজনক কারবার এখনও আছে, সেগুলিও ক্রমশঃ বিদেশীয় বণিকগণের হাতে চলিয়া যাইতেছে। শুঁটকী মাছের কারবার ইহার উদাহরণস্থল। যদি বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যের উন্নতি-সাধন করিতে হয় এবং দেশের সর্ব্বসাধারণকে স্বল্পমূল্যে পুষ্টিকর খাদ্য যোগাইবার ব্যবস্থা করিতে হয়, তাহা হইলে মৎস্যক্ষেত্রসমূহের উন্নতিবিধান অচিরে প্রয়োজন। বর্ত্তমান ব্যয়-সংক্ষেপের ধূয়ার সময় সরকারী সাহায্যের আশা করা যাইতে পারে না। কিন্তু দেশের লোক নিজেরাই এই কার্য্যে অবহিত হইলে এবং জিলায় জিলায় এক একটি মৎস্যপালনকেন্দ্র স্থাপিত হইলে, অদূরভবিষ্যতে মৎস্যের ন্যায় সহজপ্রাপ্য, সুলভ ও বলকারক খাদ্য আবার বাঙ্গালায় পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উৎপাদিত হওয়া সম্ভব।

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত।

প্রাচীন আমেরিকায় ধর্ম্মবিশ্বাস ও তাহার পরিণাম

কয়েক হাজার বৎসর পূর্ব্বে আমেরিক জাতিগণ এসিয়া হইতে বেরিং প্রণালী পার হইয়া আমেরিকার ভূমিখণ্ডে আবির্ভূত হইয়াছিল। সেই যুগে তাহারা সভ্যতার নিম্ন স্তরে ছিল, সামান্য শিল্প ব্যতীত কিছুই জানিত না। ৪ শত বৎসর পূর্ব্বে স্পেনবাসিগণ কর্ত্তৃক মেক্সিকো ও পেরু অধিকৃত হইবার পূর্ব্বে যে সভ্যতা ও ধর্ম্ম তথায় বর্ত্তমান ছিল, তাহা বেশী পুরাতন নহে। মেক্সিকো দেশে প্রসিদ্ধি আছে যে, মধ্য-আমেরিকা ও মেক্সিকোয় প্রথম সভ্যতার বিকাশ হয় এবং পরে ঔপনিবেশিক ও জেতৃদল ক্রমে ক্রমে উত্তর দিকে বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল। যে স্থানে খাদ্য সহজলভ্য হয়, যে দেশ নদীমাতৃক, যে স্থান জলপ্রণালী ও প্রবহমাণ নদনদীতে পরিপূর্ণ, সেই স্থান প্রাচীন সভ্যতার রঙ্গভূমি—শিল্পকলা ও সৌন্দর্য্যের পরিমূর্ত্ত বিকাশস্থল।

ইতিহাস প্রমাণ করে যে, ধর্ম্ম জাতীয় জীবনের নিয়ামক, মানুষের সামাজিক ও দৈনন্দিন জীবনে ধর্ম্ম প্রধান স্থান অধিকার করিয়া বর্ত্তমান আছে, আবার যথার্থ জ্ঞানের অভাবে ধর্ম্মভ্রান্তি মানুষের বুদ্ধিশক্তি বহু পরিমাণে বৃথা ব্যয়িত করিয়াছে। পেরু ও মেক্সিকো দেশেও ঠিক ইহাই ঘটিয়াছিল। মেক্সিকো নগরের প্রধান দেবমন্দিরে ৫ সহস্র পুরোহিত থাকিতেন, তথায় ৬ শত দেবমন্দির ছিল এবং নাগরিকগণের সংখ্যা প্রায় ৩ লক্ষ ছিল। সেই দেশের নগরসমূহ এক এক অংশে বিভক্ত হইয়া স্থানীয় পুরোহিতের কর্ত্তৃত্বাধীন ছিল এবং তিনি ধর্ম্মের সমস্ত ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রিত করিতেন। মেক্সিকো দেশে পুরোহিতসম্প্রদায়ের অসীম ক্ষমতার জন্য ধর্ম্মের দোহাই দিয়া সেখানে কত ভয়াবহ অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। বহু দেবতা-পূজার মধ্যে একেশ্বরপূজার ভাব অনুস্যূত থাকিলেও পুরোহিতগণ সম্প্রদায়গত পার্থক্য রক্ষা করিয়া নিজেদের স্বার্থ ও দুরভিসন্ধি সিদ্ধ করিতেন। ইঁহাদের মধ্যে ১৩টি দেবতা প্রধান এবং নিম্ন স্তরের দেবগণের সংখ্যা ২ শতেরও অধিক হইবে। ইহা হইতে বেশ বুঝা যায় যে, মেক্সিকো দেশেও ধর্ম্মবিষয়ে বিভিন্ন মানসিক অবস্থা ও ভাব বর্ত্তমান ছিল। তাহাদের উপাসনা ও স্তুতির মধ্যে "ঈশ্বর" বা "আমাদের প্রভু" নামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ঈশ্বরের কল্পনার সহিত সূর্য্যের সৌসাদৃশ্য ছিল। সূর্য্য সমস্ত দেবমন্দিরে দিনে ও রাত্রিতে চারিবার করিয়া পূজা পাইতেন।

বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন দেবতার পূজা হইত। শিশুর নামকরণ সংস্কারের সময় কিওয়াকোয়েট্‌ল্ (Cioacoatl) নাম্নী জলদেবীর আরাধনা হইত। শস্যের নিমিত্ত বৃষ্টির প্রয়োজন হইলে ট্লালক্ (Tlaloc) নামক দেবতার উপাসনা হইত। জলদেবী দয়ার্দ্রচিত্তা ছিলেন, কিন্তু দুগ্ধ-পোষ্য শিশুর বলিতে ট্লালক্ বড়ই প্রসন্ন হইতেন। দয়ার্দ্র ব্যক্তিগণ শিশুবলির উপকারিতা স্বীকার করিতেন; কিন্তু এই হতভাগ্য শিশুদিগকে লইয়া যে শোভাযাত্রা হইত, তাহাতে তাঁহারা যোগদান করিতেন না। রোরুদ্যমান শিশুগণের সেই মর্ম্মস্পর্শী দৃশ্য তাঁহারা সহ্য করিতে পারিতেন না। আবার কেহ বা অশ্রুপাত করিতে করিতে শিশুগণের অশ্রুধারা দর্শন করিয়া প্রচুর বৃষ্টির সম্ভাবনায় আনন্দিত হইতেন। শিশুভক্ষণকারিণী বৃষ্টিদেবতা ও করুণাময়ী জলদেবীর ন্যায় রাজ্যের মঙ্গলকারী যুদ্ধ-দেবতাও ছিলেন। এই যুদ্ধদেবতার ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ছিল। তাঁহার বাম পদে গায়কপক্ষীর পালক সংলগ্ন ছিল। মে মাসে বসন্তের দূতস্বরূপ এই পক্ষী মেক্সিকো দেশে দৃষ্ট হয়। বসন্তকাল যুদ্ধের প্রশস্ত সময় বলিয়া ঐ ঋতুতে যে দেবতার পূজা হইত, তিনি ক্রমশঃ যুদ্ধদেবতা হইয়া পড়িলেন। মেক্সিকোর ন্যায় পৌরোহিত্যপ্রধান দেশে নরবলির সংখ্যা আশ্চর্য্যরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এক সময়ে না এক সময়ে নরবলি প্রায় সকল ধর্ম্মের প্রথম অবস্থাতেই প্রচলিত থাকে, কিন্তু তাহার বৃদ্ধি বা হ্রাস পুরোহিত-সম্প্রদায়ের ক্ষমতার বৃদ্ধি বা হ্রাসের উপর নির্ভর করে। যে দেশে পুরোহিত-সম্প্রদায়ের প্রাধান্য অধিক নহে, তথায় সভ্যতাবিস্তারের সহিত এই নররক্তপাতরূপ কুপ্রথা রহিত হইয়া যায়; কিন্তু মেক্সিকোর পুরোহিত

সম্প্রদায়ের ক্ষমতা রাজ্যের শক্তি ও ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধির সহিত বর্দ্ধিত হইয়াছিল, সুতরাং নরবলির সংখ্যাও অভাবনীয়রূপে প্রসার লাভ করিয়াছিল। প্রায় সমস্ত দেবতার সমক্ষে নরবলি দেওয়া হইত। যুদ্ধে ধৃত বন্দিগণের শোণিতধারায় যুদ্ধদেবতার সন্তুষ্টিবিধান হইত। কেহ কেহ বলেন, মেক্সিকো রাজ্যে প্রত্যেক বৎসর ২০ হাজার হইতে ৫০ হাজার পর্য্যন্ত নরবলি দেওয়া হইত। ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধদেবতার নূতন মন্দির উৎসর্গের সময় ৭০ হাজার বন্দীকে বলি দেওয়া হইয়াছিল।

মেক্সিকোর মন্দিরসমূহ ৪ কিংবা ৫ তল পিরামিডের ন্যায় উচ্চ ছিল। সর্ব্বোচ্চ তলে অগ্নি সর্ব্বদা প্রজ্বলিত থাকিত এবং বলির জন্য সেখানে এক খণ্ড প্রস্তর রাখা হইত। এই প্রস্তরখণ্ডের উপর জীবন্ত মনুষ্যকে শোয়াইয়া প্রস্তরনির্ম্মিত ছুরিকার সাহায্যে তাহার অন্তঃকরণ ছিন্ন করিয়া সর্ব্বদ্রষ্টা সূর্য্যের দিকে ধরা হইত। তাহার পর তাহাকে দেবতার সমক্ষে অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হইত। দেবতার লোলজিহ্বা এবং মন্দিরগাত্র নরশোণিতে রঞ্জিত হইত।

টেজ্‌কাট্‌লিপোকা (Tezcatlipoca) নামক এক দেবতার বাৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠিত হইত। চিরসৌন্দর্য্যশালী এই দেবতা সৃষ্টিকর্ত্তা ও জগতের প্রাণরূপে পূজিত হইতেন। তাঁহার বাৎসরিক উৎসবের সময় এক জন সুন্দর যুবক বন্দীকে বলি দেওয়া হইত। বলির পূর্ব্বে ১ বৎসর ধরিয়া তিনি বিশেষ সম্মান পাইতেন। আড়ম্বরশীল পরিচ্ছদে সজ্জিত ও রাজভৃত্যগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত এই যুবকের সমক্ষে পুষ্প বিকীর্ণ হইত। বলির দিনের এক মাস পূর্ব্ব হইতে তাহাকে অনেক নূতন ভোগ্য বস্তু দেওয়া হইত। প্রধান দেবীগণের নামধারিণী ৪ জন সুন্দরী অবিবাহিতা কন্যা তাহার সেবায় নিযুক্ত হইত। তাহা হইলেও, বলির দিন তাহার এই সমস্ত সম্মান—সমস্ত আনন্দের পরিসমাপ্তি হইত সন্দেহ নাই। রাজার নৌকায় তাহাকে হ্রদের অপর পারে নগর হইতে কিয়দ্দূরে কোন এক বিশেষ মন্দিরে লইয়া যাওয়া হইত। মিছিল করিয়া বহু লোক তাহার সহিত পিরামিডের উচ্চতলে উঠিত এবং তথায় কাল পোষাক পরিধান করিয়া ৬ জন পুরোহিত তাহাকে প্রস্তরখণ্ডের উপর বধ করিত। দেশের সম্ভ্রান্তবংশীয়গণ ধর্ম্মানুষ্ঠানের অঙ্গস্বরূপ তাহার মাংস ভক্ষণ করিত। এই ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড উপলক্ষ করিয়া পুরোহিতগণ মানবজীবনের সুখসম্পদ ক্ষণস্থায়ী বলিয়া সমবেত জনসাধারণের মধ্যে নৈতিক শিক্ষা প্রচার করিতেন।

এইরূপে দেবীগণের সমক্ষে স্ত্রীলোকদিগকেও বলি দেওয়া হইত। ধর্ম্মের দোহাই দিয়া এই যে ভীষণ নরহত্যা সংঘটিত হইত, ইহার বিবরণ পাঠ করিতেও কষ্ট বোধ হয়। আবার বন্দীকে বধ করিবার পর যে সৈনিক তাহাকে বন্দী করিত, তাহাকেই তাহার দেহ দেওয়া হইত। সৈনিক নিহত বন্দীর দেহ রন্ধন করিয়া বন্ধুবান্ধবের মধ্যে ভোজ দিত। মেক্সিকোর অধিবাসিগণ নরমাংস ভক্ষণ করিত না, তবে শাস্ত্রীয়-বিধিমতে নিহত বন্দীর মাংস পবিত্র বোধে খাইত। ভারতে খন্দগণের ন্যায় মেক্সিকোবাসিগণ ঈশ্বর ও নিহত মানুষের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই বলিয়া মনে করিত।

নরশোণিতপিপাসু দেবগণ ব্যতীত কোয়েট্‌জালকোট্‌ল্ (Chetzalcoatl) নামক এক দেবতার উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি টল্‌টেক্ (Toltec) জাতির উপাস্য ছিলেন। অ্যাজ্‌টেক্‌গণ (Aztec) টল্‌টেক্ জাতিকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া বিতাড়িত করিয়াছিল, কিন্তু টল্‌টেক্‌দিগের দেবতা কোয়েটজাল্‌কোট্‌লের পূজা ত্যাগ করে নাই। ইঁহার নিকট নরবলি দেওয়া হইত না। এইজন্য মেক্সিকোবাসিগণের মধ্যে দয়ালু ও বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ তাঁহার প্রতি সমধিক ভক্তি প্রদর্শন করিত বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।

অ্যাজ্‌টেক্ সাম্রাজ্য বেশী পুরাতন নহে। স্পেন কর্ত্তৃক মেক্সিকো অধিকারের দুই শতাব্দী পূর্ব্ব হইতে নরবলিপ্রথা বহুল পরিমাণে প্রচলিত হইয়াছে। টল্‌টেক্‌দিগের এই প্রথা ছিল না বলিতে পারা যায় না; কারণ, তাহারাও বালক-বালিকাগণকে বৃষ্টিদেবতার নিকট বলি দিত। অ্যাজ্‌টেক্ পুরোহিত-সম্প্রদায় প্রথমে দুই একটি মানুষকে যুদ্ধদেবতার নিকট বলি দিত, কিন্তু কালক্রমে এই কুপ্রথা বহুব্যাপকরূপে বিস্তৃত হইয়াছিল। ধর্ম্মভাববৃদ্ধির সহিত পুরোহিতের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছিল, আবার পুরোহিতের সংখ্যাবৃদ্ধির সহিত বলির সংখ্যাও

বৃদ্ধি পাইয়াছিল। অ্যাজ্‌টেক্‌গণ সর্ব্বদা যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকিত বলিয়া বধের জন্য বন্দীর অভাব হইত না। এমন কি, অ্যাজ্‌টেক্‌রাজগণ অপর কয়েকটি রাজ্যের সহিত এই সর্ত্তে আবদ্ধ হইয়াছিলেন যে, বৎসরের কোন নির্দ্দিষ্ট সময় নির্দ্দিষ্ট যুদ্ধক্ষেত্রে পরস্পরের যুদ্ধ হইবে। কারণ, এইরূপ ব্যবস্থার দ্বারা উভয় পক্ষই বলির জন্য সহজে বন্দী পাইতে পারিতেন। যুদ্ধের জন্য সৈন্যের অভাব হইত না। লোকের বিশ্বাস ছিল যে, যুদ্ধে মরিলে স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত থাকিবে এবং যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত সৈনিক স্বর্গের আনন্দভোগের অধিকারী হইবে। সে যাহা হউক, ক্রমে পুরোহিতদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকায় এবং তাহাদিগকে বিস্তর নিষ্কর জমী দান করিতে হওয়ায় রাজ্যের আয় কমিয়া যাইতে লাগিল। সাধারণ প্রজাদের দুর্দ্দশার সীমা রহিল না—করভারে তাহারা বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এই অসন্তুষ্ট করভারপীড়িত প্রজাদের সাহায্যে কর্‌টেস্ (Cortes) অ্যাজ্‌টেক্ সাম্রাজ্য ধ্বংস করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

পেরুর পুরোহিত-সম্প্রদায় বেশী ক্ষমতাশালী ও অত্যাচারী হইতে পারে নাই এবং তাহাদের পূজাবিধি ভয়াবহ আকার ধারণ করে নাই। পেরুবাসিগণ ছোট ছোট পাখী, ইঁদুর ও কুকুর বলি দিত এবং কাঁচা মাংস ভক্ষণ করিত। কখন কখন শিশু কিংবা বালকগণকেও বলি দেওয়া হইত। কিন্তু ক্রমে বধার্হ শিশুর কিয়ৎপরিমাণ রক্তমাত্র বাহির করিয়া লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইত। এইরূপে কালক্রমে এই নৃশংস শিশুহত্যা রহিত হইয়াছিল। হিন্দুস্থানে ন্যায় পেরুতে সতীদাহ-প্রথা বর্ত্তমান ছিল। সাধ্বীগণ, বিশেষতঃ ইন্‌কা রাজমহিষী পরজগতে স্বামীর সঙ্গিনী হইবার অভিপ্রায়ে জীবিত অবস্থায় তাঁহার মৃত স্বামীর সহিত ভূগর্ভে প্রোথিত হইতেন। কিন্তু পরে মৃত ব্যক্তির স্ত্রী ও ভৃত্যগণের প্রতিনিধিস্বরূপ ছোট ছোট পুতুল তাহার কবরে স্থাপিত হইত।

স্পেনীয়গণ কর্ত্তৃক মেক্সিকো ও পেরু অধিকৃত হইবার পূর্ব্বে তথায় যে সভ্যতার বিকাশ হইয়াছিল, তাহা তৎকালীন য়ুরোপীয় সভ্যতা হইতে কোন অংশে ন্যূন ছিল না। কৃষি ও বিচার-কার্য্যে স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠানসমূহ স্পেনীয়গণ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত শাসনপ্রণালী অপেক্ষা উচ্চাঙ্গের ছিল। যখন য়ুরোপের রাজপথ অন্ধকার ও অপরিষ্কৃত, তখন পেরু ও মেক্সিকো নগরের রাস্তাঘাট পরিষ্কৃত ও প্রজ্বলিত দীপ দ্বারা আলোকিত ছিল। ইন্‌কাগণের আমলে পেরুবাসীদিগের আর্থিক অবস্থা অপেক্ষাকৃত সচ্ছল ছিল। কিন্তু জনসাধারণের ভ্রান্ত ধর্ম্মবিশ্বাসের জন্য স্বার্থান্ধ পুরোহিত-সম্প্রদায়ের ক্ষমতা বিশেষরূপে বর্দ্ধিত হইয়া বিদেশীয় কর্ত্তৃক দেশজয়ের পথ পরিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিল। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী জেতৃগণ পেরু ও মেক্সিকোবাসিগণের নরবলিপ্রথা বন্ধ করিয়া দিয়াছিল বটে, কিন্তু যূপকাষ্ঠে বন্ধন করিয়া জীবন্ত মানুষকে পুড়াইবার যে ভীষণ নরমেধের আমদানী তাহারা করিয়াছিল, তাহাতে লোকের মানসিক ও নৈতিক অবস্থা উন্নত কি অবনত হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে।

ডাক্তার টাইলর বলিয়াছেন, ধনলিপ্সু স্পেনবাসিগণ কর্ত্তৃক মেক্সিকো ও পেরু অধিকৃত হইলে মেক্সিকোর জনসাধারণ অধিকতর অজ্ঞানান্ধকারে নিমজ্জিত হইয়াছিল। ডাক্তার ব্রীণ্টন বলেন, সকল দেশে ক্যাথলিক ধর্ম্মপ্রচারকগণ দ্বারা বিজিত জাতির অবনতি ও প্রোটেষ্টাণ্ট প্রচারকগণ কর্ত্তৃক তাহাদের ধ্বংস সংসাধিত হইয়াছে। অতএব যাঁহারা বলেন যে, খৃষ্টধর্ম্মের প্রবর্ত্তনায় দেশে উচ্চতর সভ্যতার বিমল জ্যোতিঃ লোকের কুসংস্কার ও অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত করে, জাতীয় মন নূতন জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করে, প্রচলিত সামাজিক কুপ্রথা ও আবর্জ্জনা বিনষ্ট করিয়া জাতিকে সংস্কৃত ও পরিমার্জ্জিত করে, তাঁহারা ভ্রান্ত, সন্দেহ নাই।

পেরুর অন্ধধর্ম্মবিশ্বাসী ইন্‌কাগণের মধ্যেও অবিশ্বাসী ও সন্দেহপরায়ণ ব্যক্তির অভাব ছিল না, কিন্তু ভারতের ন্যায় পেরুতেও উচ্চজ্ঞানের স্রোতঃ জনসাধারণের মধ্যে প্রবাহিত হইতে দেওয়া হয় নাই। পেরুর ইন্‌কাগণ জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞানবিস্তারের পথ রুদ্ধ রাখিয়াছিল। পেরু ও মেক্সিকোবাসিগণ ইহার বিষময় ফল ভোগ করিয়াছিল। জাতিসাধারণের বুদ্ধি মার্জ্জিত না হইলে, তাহাদের বিচারশক্তি উদ্‌বুদ্ধ না হইলে, তাহারা সংহত হইতে পারে না—তাহাদের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া

যায়—তাহারা দুর্ব্বল, শক্তিহীন ও অপদার্থ হইয়া পড়ে—তাহাদের মনুষ্যত্ব বিকসিত হইতে পারে না—কোন উচ্চ ভাবের অনুপ্রেরণায় তাহাদের কঠিন হৃদয় উদ্বোধিত হয় না—তাহারা স্বার্থপর, প্রাণহীন ও জড়পিণ্ডসদৃশ হইয়া পড়ে—তাহাদের স্বাতন্ত্র্যবোধ, জাতীয়তা, জাতীয়-জীবনগঠনে প্রয়াস, এ সকলই লোপ পায়—মুষ্টিমেয় বৈদেশিক শত্রুর আক্রমণে তাহারা কোথায় ভাসিয়া যায়, তাহা ঠিক থাকে না। জাতিপ্রতিষ্ঠা না থাকিলে দেশের জনসাধারণ শত্রুর সম্মুখীন হইতে পারে না। জাতিসাধারণের মূর্খতা, কুসংস্কার ও অজ্ঞানতার জন্যই আমেরিকায় স্পেনীয় অভিযান সাফল্য লাভ করিয়াছিল এবং মেক্সিকো ও পেরুর পুরাতন সভ্যতা চিরতরে লোপ পাইয়াছিল।

শ্রীহরিপদ ঘোষাল, বিদ্যাবিনোদ।

বিরহিণী

কোন্ বিদেশের বসন্ত আজ
এলো হঠাৎ হাওয়ায় উড়ে!
কই আষাঢ়ে মেঘের ঘটা?
আলোর ছটা আকাশ জুড়ে!
ঠাণ্ডা সাদা চাঁদের আলো
অসময়ে লাগ্‌চে ভালো,
এ সময়ে কে বিদেশী
উদ্দেশে ফুল মার্‌লে ছুঁড়ে!
কোন্ বিদেশের বসন্ত আজ
এলো হঠাৎ হাওয়ায় উড়ে!

ফুর্‌ফুরে এই ঠাণ্ডা হাওয়ায়
আধ জাগা আধ ঘুমের ঘোরে,
শুন্‌চি কানে ডাক্‌চে যেন
নাম ধ'রে কে আদর ক'রে!
আল্‌তো চুমা ঠোঁটের আগে
তার সে ভারি মিষ্টি লাগে,
চোখ চেয়ে যাই দেখ্‌তে যাব,
পালিয়ে কোথায় যায় সে স'রে!
ফুর্‌ফুরে এই ঠাণ্ডা হাওয়ায়
ডাক্‌চে কে মোর নামটি ধ'রে!

যা রে পাখী যা রে উড়ে,
আমার তারে খবর দে না!
এক্ষুনি সে মিটিয়ে দে যাক্—
আমার কাছে তার যা দেনা।
এমন রাতি বিফল যাবে,
এর প্রতিফল পাবেই পাবে;
মিছে আমার ফুল-বাগানে
ফুট্‌লো বকুল গোলাপ হেনা!
যা রে পাখী যা উড়ে যা,
আমার তারে খবর দে না!

পাত্‌লা মেঘের রেশমী রুমাল
হাওয়ার স্রোতের একটানাতে,
রং-বেরংএর ঘুড়ির মত
ওড়ায় কে আজ কাদের ছাতে!
খয়ের রংএর ঐ দুখানা,
চাঁপা ফুলের রং ও'টা না?
কমলা নেবুর রং এটারে
পারে নাক হার মানাতে!
পাত্‌লা মেঘের রঙীন ঘুড়ি
ওড়ায় কে আজ কাদের ছাতে!

এত বাহার দেখাই কারে?
জানাই কারে মনের কথা?
ছেয়েচে আজ সোনার ফুলে
পাতায় পাতায় আলোক-লতা!
বুকের কাছে মুখটি থুয়ে,
কার কাছে আজ রই গো শুয়ে?
কার বুকে আজ বুক মিলিয়ে
শুনবো বুকের গোপন-ব্যথা?
ছেয়েচে আজ সোনার ফুলে
পাতায় পাতায় আলোক-লতা!

যা রে পাখী যা রে উড়ে,
আমার কথা বল্ গে তারে,
এমন সময় কেউ কখনো
একলাটি কি থাক্‌তে পারে?
পাগল আমি হলেম না কি?
কথা ও সে কয় কি পাখী?
কি বল্‌তে যে কি বলি ছাই—
ঘুম তুইও কি আস্‌বি না রে?
যা রে পাখী যা রে উড়ে
আমার কথা বল্ গে তারে।

শ্রীকিরণধন চট্টোপাধ্যায়।